৩৫৩৭

চতুরঙ্গ

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

• পত্রিকায় থাকবে •

- প্রবন্ধ
- উপন্যাস
- গল্প
- কবিতা
- শিল্প ও বাণিজ্য
- দেশের কথা
- সংস্কৃতি
- আলোচনা
- পুস্তক প্রসঙ্গ

ইত্যাদি

প্রথম সংখ্যা আষাঢ় ১৩৬৩

॥ সূচী ॥

	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
আমাদের কথা	১	বিশল্যকরণী—কবিতা ● শ্রীরমেশ দাশগুপ্ত	২৩
কৃষ্ণকীর্তন—শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্ত	৩	দেশের কথা	২৫
বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা—প্রাচীন যুগ —অধ্যাপিকা সুনন্দা দাশগুপ্ত		বিক্রয়-কর আইনের বিবর্তন—শ্রীদেবেশচন্দ্র মুখার্জী	৩২
॥ কবিতা ॥		আদিবাসীদের পাতানো বন্ধুত্ব—শ্রীচারুলাল মুখোপাধ্যায়	৩৫
তাকেই যেন দেখেছিলাম—আবুল কাশেম রহিমউল্লীন	১২	॥ সংকলন ॥	
কুন্তীকন্যা—উষা দেব	১৩	পশ্চিম বাংলার অধোগতি কেন ? (অনূদিত)	৩৮
সত্য হোক, মিথ্যে হোক—সুনীল দাশগুপ্ত	১৩	প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যর্থতা— (অনূদিত)— আচার্য বিনোবা	
শাদুক—ফেদেরিকো গারথিয়া লরকা	১৩	বাংলার বৈশিষ্ট্য—বিপিনচন্দ্র পাল	
মুসাফির (উপন্যাস)—সন্তোষ সেন	১৪	কুলকাটা (গল্প)—অজয় দাশগুপ্ত	
পৃথিবীর আদি মুহূর্ত—শ্রীশঙ্কর সেন	১৮	একালের ছড়া—সংগৃহীত	
লৌহ-শিল্পে হাওড়া—শ্রীহারাধন হাজরা	১৯	পুস্তক প্রসঙ্গ	

॥ পাদপূরণ ॥

শ্রীঅরবিন্দের স্বাধীনতার বাণী। পশ্চিম বাংলায় বাঙালী শিল্পির অনাদর ও অবনতি। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি। মাতৃভাষার অনুশীলন—রাজনারায়ণ বসু। আদর্শ শিক্ষক—রাজনারায়ণ বসু। শ্রীঅরবিন্দের গ্রাম গঠনের আদর্শ।

॥ পত্রিকার প্রচ্ছদ ও অংগসজ্জা ॥

সুবোধ দাশগুপ্ত P/1252

॥ পরিচালনায় ॥

ডাঃ রবেন্দ্রকুমার পাল — শ্রীকালিদাস রায়

শ্রীহারাধন হাজরা — শ্রীঅশোক সেন

শ্রীনারায়ণ পাল — শ্রীঅজয় দাশগুপ্ত

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পাল (সম্পাদক)

॥ পত্রিকা সম্বন্ধে ॥

যুগযাত্রীর বার্ষিক সডাক মূল্য ছ'টাকা। আষাঢ় থেকে বর্ষ সুরু। সব বিষয়ের মৌলিক রচনাই আমরা সাদরে গ্রহণ করব। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে লিখে সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন। অমনোনীত রচনা উপযুক্ত ডাকটিকিট ও ঠিকানা দেওয়া থাকলে যথাসময়ে ফেরৎ দেওয়া হবে। পত্রিকার সমালোচনার জন্য দু'খানা করে বই সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন। চিঠিপত্র ইত্যাদি সম্পাদকীয় কার্য্যালয়ে প্রেরিতব্য। নীচে বিজ্ঞাপনের হার দেওয়া হ'ল।

কভার	৪র্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০৲	ভিতরে	পূর্ণ পৃষ্ঠা	৩০৲
ঐ	২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা	৪০৲	ঐ	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৫৲
ঐ	১ম অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	২৫৲	ঐ	সিকি পৃষ্ঠা	১০৲

সম্পাদকীয় কার্য্যালয়
৪১-এ, বলদেওপাড়া রোড,
কলিকাতা-৬

পরিচালনা কার্য্যালয়
৮৪, মনোহর দাস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-৩২৭১

Index Page No 676

যুগযাত্রী

7563
1030

প্রথম বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৬৩ | প্রথম সংখ্যা

আমাদের কথা

'যুগযাত্রী' নামে যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প আমরা নিয়েছি, ভগবান সে ব্রত পালনে আমাদের শক্তি দিন।

'যুগযাত্রী' নামের সঙ্গে আমাদের চিন্তা ও আদর্শের—সংকীর্ণ অর্থে কেবল আমাদের কেন এদেশের সকলের—একটা

এযুগের প্রধান লক্ষণ দু'টি—মানবতা ও স্বাধীনতা। মানুষকে—সাধারণ সকল মানুষকে—এই যুগ জাঁকড়িয়ে ধরেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তেমনটি কখন হয় নি। মানুষকে বড় করতে ও স্বাধীন ভারতের সভ্যতার দানও কম নয়। আমাদের সংস্কৃতি ও সাধনার চলমান অংশ যেটা—সাধনা কিন্তু প্রাণবন্ত, যার প্রাণতা আমাদেরকে যুগে যুগে সহস্র বিপদের মাঝে বাঁচিয়ে রেখেছে—সেই ভাবধারা বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কাল থেকে আজ পর্যন্ত পুষ্ট হয়েছে প্রধানতঃ সাধারণের দানের দ্বারা। আমাদের সাধনার নানা পথ, বিভিন্ন ভাষা, সংগীতের অমৃত ধারা, কলা ও শিল্পের বহুমুখী প্রকাশ প্রভৃতি সাধারণের চিত্তের আশা ও আকাঙ্খায় জন্ম নিয়ে তাঁদেরই মহাজনদের জীবনে ও বাণীতে রূপ হয়ে উঠেছে। এদেশের জীবন্ত সাধনার ইতিহাসে যাঁরা জানেন, একথা তাঁদের অজানা নয়।

কিন্তু সংস্কৃতি ও সাধনার ক্ষেত্রে সাধারণের দান যে স্বীকৃতি পেয়েছে, রাষ্ট্রে, সমাজে ও অর্থনৈতিক জীবনে সাধারণের প্রাপ্য স্থান ও মর্যাদা কখনো সে প্রতিষ্ঠা পায় নি। মৌর্য সাম্রাজ্যের যুগ থেকে এই শতাব্দীর প্রায় ৫০ বৎসর পর্যন্ত দেশের সাধারণ বা তাঁদের প্রতিনিধিরা শাসন-যন্ত্র পরিচালনা করবার অবসর কখনো পান এখনও গণতন্ত্রের কাঠামো প্রস্তুত হয়েছে এইমাত্র বলতে পারি, প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি সমাজে এখনও অগণিত অন্ত্যজ ভাগ্যহতের অগণিত লোক এখনও অবহেলিত হয়ে আছেন। ধর্ম সাধনার এঁদের মধ্য থেকে অনেকে আচার্যের পদ পূজা পেলেও সমাজে এই বিপুল জনসাধারণ অঙ্গের সঙ্গে সমান শ্রেণীতে উন্নীত হন নি

ও সমাজে তেমন অর্থনৈতিক জীবনে দেশের সাধারণ এখনও লক্ষ্মীর মন্দির রচনা করবার অধিকার পেলেও ভিতরে পূজা করবার বা প্রসাদ পাবার অধিকারী হ'ন নি। আর এগুলি না হ'লে যে মানবতা ও স্বাধীনতা এযুগের বৈশিষ্ট্য তা আমাদের দেশে সমাক সার্থকতা লাভ করতে পারবে না।

দীর্ঘ দিনের চেষ্টায় ও বাংলার এবং অন্যান্য প্রদেশের অগণিত যুবজনের চরম আত্মত্যাগে ভারত বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হয়েছে। পরাধীনতার বন্ধন আমাদের ছিন্ন হয়েছে। পরের অধীনতা গেলেই কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা স্বতঃ আসে না। যেটা আসে তাকে অনধীনতার অবস্থা বলা যেতে পারে। ইংরেজীতে independence—dependence বা অধীনতার অভাব। একে প্রকৃত স্বাধীনতায় পরিণত করার চেষ্টাই আমাদের এখনকার রাষ্ট্রীয় সাধনা। স্ব-এর অধীনতাকে স্বাধীনতা বলে। স্ব অর্থ দেশের সর্বসাধারণ এবং সকল দেশের সর্বসাধারণকে নিয়ে সমগ্র বিশ্বের সকলে। শাসন-ব্যবস্থায় সাধারণের কোন অধিকার যেখানে ক্ষুণ্ণ হয় না, সেখানেই সে দেশ স্বাধীনতার পূর্ণ মর্যাদা দাবী করতে পারে। বিশ্বের সঙ্গে তার তখনই একটা সত্যিকার যোগ স্থাপিত হয়।

স্বাস্থ্যে, শিক্ষায় উন্নত হয়ে শাসনতন্ত্রে ও অর্থনৈতিক জীবনে সাধারণের প্রতিষ্ঠা কাম্য হলেও, প্রশ্ন থাকে সাময়িক পত্রে তার কি সহায়তা হ'তে পারে। সাময়িক পত্রের কাজ প্রকৃত তথ্য প্রচার করা ও চিন্তাকে জাগিয়ে তোলা। সত্য তথ্য প্রচারে আমাদের এই মাসিক পত্রিকার দ্বারা অল্পই সাহায্য হ'তে পারে জানি—যদিও তারও মূল্য আছে। চিন্তাকে জাগ্রত করার কাজে সাময়িক পত্র, নিজে সজাগ থাকলে, কিছু সহায়তা করতে পারে। এটা খুব দরকারী কাজ। দীর্ঘদিন আমাদের দেশে মূলগত চিন্তা বিশেষ হয় নি। বিদেশী শাসন যে আবহাওয়া সৃষ্টি করে তাতে স্বৈরী থাকে ভয় আর তার সঙ্গে লোভ। দেশে স্বাধীন চিন্তা এ দুইয়ের চাপে অনেকটা চাপা পড়ে যায়। এ অবস্থা ও প্রভাবকে অতিক্রম করে রাষ্ট্রে ও সমাজে স্বাধীন চিন্তা লোকোত্তর চিন্তা-নায়কদের দ্বারা যা সম্ভব হয়েছিল, তাও বিদেশী শাসকদের সঙ্গে স্বার্থের সংঘর্ষ তীব্র হ'তে থাকলে ক্রমে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার মধ্যেই নিহিত হয়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমবর্দ্ধমান এক তিক্ত জাতি-বৈরের দ্বারা পুষ্ট হ'তে থাকে। এটা অনিবার্য ছিল। জাতি-বৈরের তীব্রতা ও প্রসার বৃদ্ধিতেই অসহযোগ আন্দোলন শক্তি লাভ করে ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হয়। কিন্তু জাতি-বৈরের আবেগ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের বিভিন্ন মত ও পথকেই কেবল একমুখী করে না, চিন্তার স্বাধীনতাকেও তিমিত ও শুষ্ক করে দেয়। ফলে চিন্তার ক্ষেত্রে নিদারুণ দৈন্য বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতা লাভের পর মৌলিক স্বাধীন চিন্তার দৈন্য দূর করে তার ক্ষতি শীঘ্র পূরণ করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। তা না করতে পারলে সাধারণের কল্যাণের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

সাধারণভাবে 'যুগযাত্রী' চেষ্টা করবে—

দেশে স্বাধীন চিন্তাকে পুনরায় জাগিয়ে তুলতে।

যা কিছু পরিকল্পনা আমাদের দেশে হবে সর্বসাধারণের প্রকৃত কল্যাণের পথে যাতে তা নিয়োজিত হয় তার জন্য দেশবাসীর মধ্যে সক্রিয় উৎসাহ ও সহযোগিতা সৃষ্টি করতে।

বাহিরের সাহায্যে কেবল নয় কিন্তু নিজেদের আদর্শে ও কর্মচেষ্টায় সম্পূর্ণ আস্থা রেখে দেশকে সকলের সম-অধিকারের পথে যাতে দেশের যুবজন গড়ে তুলতে পারেন তার জন্য তাঁদের মধ্যে নূতন প্রেরণা জাগিয়ে তুলতে।

"কৃষ্ণ-কীর্ত্তন"

শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্ত

বিগত ১৩১৮ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় "বাসলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে" এই ভণিতাযুক্ত একখানি হস্ত-লিখিত পুঁথি আবিষ্কার করেন। পুঁথিখানি আদ্যন্তবিহীন ও খণ্ডিত। গ্রন্থের প্রত্যেক খণ্ডের শেষে পুষ্পিকা নাই। খণ্ডিতাংশে কবির পরিচয়, রচনাকাল, লিপিকাল প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যায় নাই—এমন কি পুঁথির নামটি পর্য্যন্ত নয়। পুঁথিখানি দুই ভাঁজ করা তুলোট কাগজে লিখিত; মধ্যস্থলে ছিদ্র। শ্রীযুক্ত বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সম্পাদকীয় বক্তব্যে লিখিয়াছেন, "দীর্ঘকাল যাবৎ চণ্ডীদাস বিরচিত কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অস্তিত্বমাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম। এতদিনে তাহার সমাধান হইয়া গেল। আমাদের ধারণা, আলোচ্য পুঁথিই "কৃষ্ণ-কীর্ত্তন" এবং সেই হেতু অনুরূপ নাম নির্দ্দেশ করা হইল।"

বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়াছেন এবং পাণ্ডিত্য-পূর্ণ টীকাও লিখিয়াছেন কিন্তু "কৃষ্ণ-কীর্ত্তন" গ্রন্থের নাম কতদিন যাবৎ কাহার নিকট হইতে শুনিয়াছেন তাহা লেখেন নাই। অবশ্য অনেকেই এই গ্রন্থের নাম পূর্ব্বে শুনেন নাই। সমস্ত বঙ্গদেশে যখন কয়েক শতাব্দীর মধ্যে দ্বিতীয় পুঁথি আবিষ্কৃত হয় নাই এবং পুঁথিখানি একেবারেই অপরিচিত তখন কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের নাম কি করিয়া শুনিলেন তাহা জানি না।

আমার ধারণা এই পুস্তকের নাম ছিল "শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল"। ১৩১০ সালের ফাল্গুন মাসে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে শ্রীমাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল গ্রন্থ ছাপা হয়। দেবকী-নন্দনের বৈষ্ণব বন্দনায় শ্রীমাধব আচার্য্যের নাম আছে।

"মাধব আচার্য্য বন্দো কবিত্ব শীতল।
যাহার চরিত গীত শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল॥"

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরও তাঁহার বন্দনা করিয়াছেন।

তবে ত বন্দনা কৈল মাধব আচার্য্য।
কৃষ্ণ গুণ বর্ণন সদাই যার কার্য্য॥
যে কৃষ্ণ-মঙ্গল কৈল ভাগবতামৃতে।
যে গীত বিদিত হৈল সকল জগতে॥

"শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গলের" ভূমিকায় লেখা হইয়াছে—"এই দুইটি বন্দনা হইতে কবি মাধবাচার্য্য এবং তাঁহার কাব্য "শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল" প্রাচীনকালে কিরূপ পূজা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও বাঙ্গলার গ্রামে-গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে মৃদঙ্গ মন্দিরা সহযোগে শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল গীত হইয়া থাকে। সে কীর্ত্তন অনেকে শুনিয়াছেন। শুনিয়া কে-ই বা প্রেম পুলকিত না হইয়াছেন। আর কে-ই বা কবির শত মুখে প্রশংসা করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া শ্রীমাধবাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণলীলা অতি সরল ও মধুরভাবে কবিত্বের কোমল তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় শ্রীকৃষ্ণ-লীলা ও চরিতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। আমার মনে হয়, কৃষ্ণ-মঙ্গল পড়িয়া চৈতন্য-মঙ্গল লিখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। অথবা কৃষ্ণ-মঙ্গল নামের অনুকরণে চৈতন্য-মঙ্গল নাম হইয়াছিল। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও শ্রীলোচনদাস ঠাকুর উভয়েই "চৈতন্য-মঙ্গল" লিখিয়াছেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-মঙ্গলের নাম কিছু পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া "চৈতন্য ভাগবত" হয়। কৃষ্ণ-মঙ্গলের পূর্ব্বে মনসা-মঙ্গল চলিয়া আসিতেছিল। বিদ্বদ্বল্লভের আবিষ্কৃত পুস্তকের সঙ্গে মাধবাচার্য্যের কৃষ্ণ-মঙ্গলের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। বিদ্বদ্বল্লভের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মঙ্গলাচরণ নাই। কিন্তু কৃষ্ণ-মঙ্গলে মঙ্গলাচরণের পর গ্রন্থ যেরূপে যে বিষয় অবলম্বনে আরম্ভ হইয়াছে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনেও সেইরূপ আরম্ভ হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভ দুই গ্রন্থেই এক রকম। কৃষ্ণ-মঙ্গলে শ্রীকৃষ্ণচরিত ও লীলার পূর্ণভাবে বর্ণনা আছে। কিন্তু কৃষ্ণ-কীর্ত্তন কেবল রাধা-কৃষ্ণ লীলাতেই প্রায় পূর্ণ। দুই গ্রন্থ এক রকমে আরম্ভ হইয়াছে। পরে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণ

চরিত্রের অন্তর্গত ঘটনা ছাড়িয়া কেবল রাধা-কৃষ্ণ লীলার কয়েকটী বিষয় পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণ-মঙ্গল কৃষ্ণ-চরিতের সকল কথাই লিখিয়াছেন। যাহা কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে আছে তাহা কৃষ্ণ-মঙ্গলেও আছে। কৃষ্ণ কীর্ত্তনে দান-খণ্ড ও নৌকা-খণ্ড আছে। কৃষ্ণ-মঙ্গলেও দান-খণ্ড ও নৌকা-খণ্ড সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে নৌকা-খণ্ড ও দান-খণ্ড অতি বিস্তৃত। আবার যাহা কৃষ্ণ-মঙ্গলে আছে তাহা কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে নাই। কৃষ্ণ-মঙ্গল পূর্ণ, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন আংশিক।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে এইরূপে গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে। রাজা কংসাসুরের অত্যাচারে পৃথিবী ভার সহিতে না পারিয়া যেরূপ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা ধরণীর দুঃখ শুনিয়া দেবতাদের সহিত ক্ষীরোদ সাগরের তীরে উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন এবং পৃথিবীর ভার হরণ করিবার জন্য তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন—"আমি মথুরাপুরে বসুদেবের গৃহে নিশ্চয় অবতীর্ণ হইব।" তিনি আরও বলিলেন—"দেবদেবী সব নিজ অংশে যেন মর্ত্ত্য-ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন।" তারপর দেবতাদিগের প্রতি ব্রহ্মা আদেশ করিলেন :

"প্রভুর আদেশ পায়া হরষিত মন।
সভা করি পিতামহ বলিলা তখন॥"

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে গ্রন্থারম্ভ এইরূপ :—

অথ জন্মখণ্ডঃ।

"পৃথুত্বার ব্যাপাং পৃথ্বী কথয়ামাস নির্জ্জরান্
ততঃ সরঙসন্দেবাঃ কংসধ্বংসে মনো দধুঃ॥
সবদেবে মিলি সভা পাতিল আকাশে।
কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে॥১॥
ইহার মরণ হএ কমন উপাএ।
সন্ধেই চিন্তিআ বুলিল ব্রহ্মার ঠাঁএ॥২॥
ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলাহি সাগরে।
স্তুতীএ তুষিল হরি জলের ভিতরে॥৩॥
তোহ্মে নানারূপে কহলেঁ আসুরে বএ।
তোহ্মার লীলারে কংসের বধ হএ॥৪॥
হেন শুনী ঈষত হাসিআ ততিক্ষণে।
ধল কালো দুই কেশ দিল নারায়ণে॥৫॥
এহি দুই কেশ হৈবে বসুদেবের ঘরে।
হলী ধনঞ্জালী নাম দেবকী উদরে॥৬॥
তাহার হাথে হৈবে কংসাসুরের বিনাশে।
হেন বর পাআ সব দেব গেল বাসে॥৭॥

এই দুইখানি পুস্তকের সম্বন্ধে পশ্চাতে বলিব। দুই-খানিই "কৃষ্ণ-মঙ্গল"। দুই কবিই এক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। কে আগে কে পাছে ক্রমশঃ বলিব। এই পুস্তক রচনার কাল নিরূপণ করিতে পারিলে অনেক সমস্যার মীমাংসা হয়। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যথার্থই মুখবন্ধে লিখিয়াছিলেন—"পুস্তক লইয়া নানা সমস্যা, নানা প্রশ্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে উপস্থিত হইবে।" যদিও গত ৪০ বৎসর যাবৎ নানাপ্রকার বাদানুবাদ পণ্ডিতেরা করিয়াছেন, কিন্তু আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারা এই পুস্তকের রচনাকাল নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। এই পুস্তকের প্রাচীন ভাষা দেখিয়াই ইহা চণ্ডীদাসের কালের ভাষা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। স্বর্গীয় রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্নলিপিতত্ত্ব অনুসারে ইহার বিচার করিয়া একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি ১৩১৮ সালে এই সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল (২২ ভাগ, ১৬১ পৃষ্ঠা)। তিনি পুনরায় ১৩২৩ সালে ২য়া পৌষ পুস্তকের লিপিকাল নির্ণয় করেন। তাহার আলোচনা এই গ্রন্থের ভূমিকায় পাঠকেরা দেখিবেন। তিনি লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণ-কীর্ত্তন গ্রন্থের যে অংশটী আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে এক অথবা একাধিক ব্যক্তির তিন প্রকারের হস্তাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। (১) প্রাচীন হস্তাক্ষর। (২) প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুলিপি। (৩) অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর।" তিনি লিখিয়াছেন—প্রত্নলিপিতত্ত্বে আধুনিক লিপি অথবা প্রাচীন লিপির অনুকরণের প্রয়োজন নাই, কেবল যে সমস্ত পত্রে প্রাচীন হস্তাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় সেই সমস্ত পত্রের অক্ষরাবলী পরীক্ষিত ও আলোচিত হইল।" কিন্তু আমি বলিতেছি ইহা মোটেই সমীচীন হয়

নাই। তিনি আরও বলেন যে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন গ্রন্থে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান অথবা খৃষ্টীয় ১৮ শতাব্দীর বর্ণমালা অপেক্ষা প্রাচীন। অনেক অক্ষরের আকার সেই অক্ষরের বর্ত্তমান আকারের ন্যায়। কিন্তু অনেকগুলি অক্ষরে বর্ত্তমান আকার বা আকারগত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই মন্তব্যে বর্ণমালার প্রাচীনতা প্রমাণিত হয় না। এই সম্বন্ধে তাঁহার মত বিশেষভাবে উদ্ধৃত করিতেছি।

১। অ, আ, ই, ঈ, এ, ঐ, ও, এবং ঔ এই ৮ স্বরে বর্ত্তমান আকার দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যেও অনেক আধুনিক আকার আছে। তিনি আরো লিখিয়াছেন কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের যে পুঁথির আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার প্রাচীন পত্রগুলিতে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অধিকাংশের স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার আধুনিক। যে কয়েক স্থলে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার প্রাচীন তাহা বিচার করিলে গ্রন্থেরলিপিকাল নির্ণয় হইতে পারে এবং এই প্রাচীন আকার যেখানে আছে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহা বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় যে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর প্রথমাংশে লিখিত হইয়াছিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার নামের প্রভাবে এই রায় শুনাইলেন যে এই পুস্তকখানির রচনাকাল ঠিক চণ্ডীদাসের সময়কার। সুতরাং আর সন্দেহ রহিল না যে এই পুস্তক আমাদের সুপ্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের সমসাময়িক। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই বিচারটি আমাদের আগের বৃটিশ কোর্টের বিচারের ন্যায়। প্রমাণ যাহাই থাকুক রায় ঠিক আছে। প্রমাণ বিচারপতিকে কখনও চঞ্চল করিতে পারে না। তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে "কৃষ্ণ-কীর্ত্তন গ্রন্থে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান অথবা খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর বর্ণমালা অপেক্ষা প্রাচীন।" ইহা যদি স্বীকার করেন, তবে এই সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর বর্ণমালা। কিন্তু তিনি আরও লিখিয়াছেন যে অনেক অক্ষরের আকার সেই সেই অক্ষরের বর্ত্তমান আকারের ন্যায়। যদি অনেক অক্ষরের আকার বর্ত্তমান আকারের ন্যায় হয় তবে তাহার কারণ কি? প্রাচীনের সঙ্গে বর্ত্তমানের যোগ কি করিয়া হইল? বর্ত্তমান প্রাচীনকে অনুকরণ করিতে পারে, কিন্তু প্রাচীন বর্ত্তমানকে অনুকরণ করিতে পারে কি? বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় লিখিয়াছেন, এই পুঁথিখানির বয়স প্রায় ১৫০ বৎসর হইবে। ব্যবহৃত কালি ও কাগজ দ্বারাও এটী প্রমাণ হওয়া উচিৎ ছিল। যে যাহা হউক ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে যিনি পুস্তকখানা লিখিয়াছেন, তাঁহার পুস্তকে আধুনিক অক্ষর কিরূপে প্রকাশ পাইল? বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রমাণ প্রত্নলিপি তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া। কিন্তু আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বাহির করিতে পারিলে পুস্তকের সবিশেষ পরিচয় এবং কাল নির্ণয় ঠিক হইতে পারে।

আমি এই প্রবন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রমাণ দিব:—

(১) প্রথমতঃ দেখাইব যে কোন শ্রেষ্ঠ কবি অন্য কোন কবির অনুকরণ করেন না। তাঁহার কাব্যগ্রন্থে অন্য কবির কবিতার অনুবাদ থাকিলে কবির শ্রেষ্ঠত্বের হানি হয়। একজন আর একজনকে অনুকরণ করিলেও সেই অনুকরণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য থাকা চাই। যথা চণ্ডীদাস বলিলেন—"বঁধু হে, নয়ানে লুকায়ে থোব। প্রেম চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া হৃদয়ে তুলিয়া লব॥" জ্ঞানদাস এই পদের অনুকরণ করিয়া বলিলেন—"বঁধু হে এ বুক চিরিয়া পরাণ সেখানে তোমারে থোব।" জ্ঞানদাসের এই পদ রচনার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন গ্রন্থে কবির যত ভালো কবিতা তাহা জয়দেবের অনুবাদ বা বিদ্যাপতির অনুকরণ। কবি রাধাকৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় নিপুণতার সহিত অনেক অলংকার ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু অলঙ্কারগুলি প্রায় বিদ্যাপতি হইতে ধার করা। অনেক স্থলে তাহার অলংকার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। বিদ্যাপতি চারি পাঁচটা কবিতায় যে অলঙ্কার অতি মনোহরভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, এই কাব্যের রচয়িতা তাঁহার একটী কবিতার ভিতর সেই সবগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছেন—ইহা আমি দেখাইয়া দিব। কবি জয়দেবের অনেকগুলি সুপ্রসিদ্ধ

কবিতার অনুবাদ করিয়াছেন কেবল জয়দেবের ভণিতা বাদ দিয়া নিজের ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। আমি জয়দেবের তিন চারিটি গান ও এই কবির অনুবাদ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিতেছি।

(১) আমি আরও দেখাইব যে এই গ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনেক পরে লিখিত। আমি দেখাইব যে কবি "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত", "কৃষ্ণকর্ণামৃত" ও "জগন্নাথ বল্লভ নাটকং" পড়িয়াছেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

(২) কবি পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসেরও কিছু কিছু অনুকরণ করিয়াছেন একটী কবিতার সম্পূর্ণই নকল করিয়াছেন। কবি গোবিন্দদাসের ভাষা ও কোন কোন পদের অধিকল নকল করিয়াছেন।

(৩) কবি মিলন অথবা বিরহে কোন নূতনতর উদ্ভাবনা বা বৈশিষ্ট্য দেখাইতে পারেন নাই। জয়দেব এবং বিদ্যাপতির অনুকরণগুলি বাদ দিলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন রচয়িতার ভাবের ভিতর জলপ্রাহী ও প্রসাদগুণ বিশিষ্ট অংশ খুবই কম থাকে

স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিচারে যেমন গ্রন্থের প্রাচীনতার প্রমাণ হয় না, সেইরূপ এই পুস্তকের মধ্যে কতকগুলি আধুনিক শব্দ আছে, তাহাও ইহার পৌরাণিকতা প্রমাণের অন্তরায়। যে গ্রন্থখানা অন্ততঃ ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল যে গ্রন্থের অনুলিপি কোথায়ও কাহারও নিকট পাওয়া যায় নাই এবং যে গ্রন্থ কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই—তাহার ভিতর আধুনিক অক্ষর সমূহ কি করিয়া প্রবেশ লাভ করিল, তাহাও বিচারের বিষয়।

বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস যে জয়দেবের কবিতার অনুবাদ করিয়া নিজের নামে চালাইবেন, ইহা কেহই বিশ্বাস করিবে না। মূল এবং অনুবাদের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সাধারণের সুপরিচিত কবিতা "রতি সুখসারে" ইত্যাদি এবং অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদন মনোহরবেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বন মনুসর তং হৃদয়েশম্ ॥১॥
ধীরে সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।
পীন পয়োধর পরিসর মর্দ্দন চঞ্চল করযুগশালী ॥২॥
নাম সমেতং কৃত সঙ্কেতম্ বাদয়তে মৃদুবেণুম্।
বহু মনুতে নহু তে তনুসঙ্গত পবন চলিতমপি রেণুম্ ॥৩॥
পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নম্ সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্ ॥৪॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং শীলয় নীল নিচোলম ॥৫॥
উরসি মুরারে রুপাহিত হারে ঘন ইব তরল বলাকে।
তড়িদিব পীতে রতি বিপরীতে রাজসি সুকৃত বিপাকে ॥৬॥
বিগলিত বসনং পরিহৃত রশনং ঘটয় জঘনমাপধানম্।
কিশলয় শয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিনিবহৃর্ধনিধানম্ ॥৭॥
হরিরভিমানী রজনী বিদানী মিয়মপি যাতি বিরামম্।
কুরু মম বচনং সত্বর চরণং পুরয় মধুরিপু কামম্ ॥৮॥
শ্রীজয়দেবে কৃত হরিসেবে ভনতিপরম রমনীয়ম্।
প্রমুদিত হৃদয়ং হরিমতি সদয়ং নয়ত সুকৃত কমনীয়ম্ ॥৯॥

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে অভিসার বর্ণনায় (২০২ পৃষ্ঠায়) উক্ত পদ লহরীর কিছু কিছু বাদ দিয়া কবি নিম্নলিখিত রূপ অনুবাদ করিয়াছেন। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সকল কবিই নূতন নূতন রূপে অভিসার বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের চণ্ডীদাস নিজের কবিত্ব মাধুর্য্যে অভিসার বর্ণনা না করিয়া কেবল জয়দেবের অনুবাদ মাত্র করিয়াছেন। অনুবাদ দুই একটী ছত্রের নহে, ১৮ ছত্রের অনুবাদ বাঙ্গলা ১২ ছত্রে করা হইয়াছে। অনুবাদটীও ভালো হয় নাই। ধীর সমীরের অর্থ কবি জানেন না। অন্যান্য সাধারণ লোকে যেমন ভুল করে তিনিও সেইরূপ ভুল করিয়াছেন। ধীর সমীরের অর্থ লীলাকুঞ্জ। অদ্যাপিও ধীর সমীর কুঞ্জ বৃন্দাবনে আছে। ধীর সমীর এখানে মৃদু পবন নহে।

তোর রতি আশোআঁশে গেলা অভিসারে।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে।
না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে।
তোহ্মার সঙ্কেত বেণু বাজাএ বৃন্দনে ॥১॥

কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে।
তোমাকে চিন্তিতে আছে নান্দের নন্দনে॥
তোর অনুগত রেণু চলিল পবনে।
তারাকো করএ কাহ্ন অতি বহুমানে॥
পাখি বসিতে তরু পাত্র চলনে।
তোহ্মার গতি শঙ্কিলা রচয়ে শয়নে॥২৪
চাহে দশ দিশ কাহ্নে চকিত নয়নে।
কতখনে আইসে রাধা এহি করী মনে।
তেকহ সুন্দরী রাধা মুখর মঞ্জীর।
সত্বরে চলহ কুঞ্জ এ বড় তিমির॥৩৩
কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা রতি বিপরীতে।
শোভে মেঘমালে যেহেন তড়িতে॥
গলিত বসন হীন রসন জঘনে।
আপনে আরোপ গিয়া পল্লব শয়নে॥৪৪
মানী বড় ভৈল কাহ্নাঞি শেষ রজনী।
তার পুর মনোরথ মোর বোল শুনী॥
এবে আনুগত রাধা বিলম্ব গমান।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে॥

জয়দেবের মানভঞ্জন, গীতগোবিন্দ ১০ম সর্গ :—

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতি ঘোরম।
স্ফুরদধর সীধবে তব বদন চন্দ্রিমা
রোচয়তি লোচন চকোরম্॥১॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ি মানমনিদানম্॥২॥
সপদি মদনানল দহতি মম মানসম্
দেহি মুখ কমল মধুপানম্॥৩॥
সত্য মে বাসি যদি সুদতিময়ি কোপিনী
দেহি খরনয়ন শরঘাতম্॥৪॥
ঘটয় ভুজ বন্ধনম্ জনয়রদখণ্ডনম্
যেন বা ভবতি সুখজাতম্॥৫॥
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি ভবজলধিরত্নম্॥৬॥
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্রমম হৃদয়মতি বত্নম্॥৭॥
নীলনলিনীভমপি তব লোচনম্
ধারয়তি কোকনদরূপম্॥৮॥
কুসুমশরবানভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদং এতদনুরূপম্॥৯॥
স্ফুরতু কুচ কুম্ভয়োরুপরি মনিমঞ্জরী
রঞ্জয়তু তবহৃদয়দেশম্॥১০॥
রসতু রসনাপি তব পন জঘনমণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথ নিদেশম্॥১১॥
স্থল কমল গঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনম্
জনিত রতিরঙ্গ পরভাগম্॥১২॥
স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসিমণ্ডনম্
দেহি পদপল্লবমুদারম্॥১৩॥
জলতি ময়িদারুণো মদনকদনানলে
হরতু তদুপাহিত বিকারম॥১৪॥

ইহারই অনুবাদ কৃষ্ণ-কীর্তনে, বিদ্যাপতি খণ্ড ১১৭ পৃষ্ঠায় :—

যদি কিছু বোল বোলেসি তবে
দশন রুচি তোহ্মারে।
হরে ঘুচয়ার তম অন্ধকার
সুন্দরী রাধা আহ্মারে॥
তোহ্মার বদন সংপুন চান্দ
আদর আমিয়া লোভে।
পরতেখ তোর নয়ন চকোর
দুগল নিশ্চল শোভে॥
মদন বাণে জগধ ভৈলে।
তোর অকারণ মানে।
বদন কমল মধু পান দিয়া
রাখহ মোর পরানে॥
যবে সতো কোপ করিলে
তবে মোর হান নয়ন বাণে।
দৃঢ় ভুজ দুর্গে বন্ধন করিআঁ
অধর দংশ দশনে॥
তোহ্মে সে মোহোর রতন ভূষণ
তোহ্মে সে মোহোর জীবনে।

এহ বুঝি রাধা মোরে দয়া কর
বুলি তেঁ আছি বড়রে।
তোহার নয়নে মলিন মলিন
আধরে কোকনদ রূপে
কুচক রহিলেঁ
দুএ তোর আলুথপে।
এ তোর কুচ শোভে মণি (মাল)
তপনে নাহ করউ বদনে।
বোল রূপহত করেঁ। মো তোহোর
খল কমল চরণে।

মদন পরল খণ্ডন রাধা
মাথার মণ্ডন মোরে।
চরণ পল্লব আরোপ রাধা
মোর মাথার উপরে।
পালটি আন্ধার মদন বিকার
সত্বরে করহ আদেশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।

বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা—প্রাচীন যুগ

অধ্যাপিকা শ্রীসুনন্দা দাশগুপ্ত এম-এ

জাতির সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের ইতিহাসও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চিরন্তন সাহিত্যের মাঝেই দেশের বিচিত্র উত্থানপতনের কাহিনী বিধৃত আছে। ইতিহাসকে যেখানে পুরানো সভ্যতার জীর্ণ কঙ্কালরূপে দেখি—সাহিত্য সেখানে পুরাতনকে রূপে রসে রঙে উজ্জীবিত করে, পরিপূর্ণ করে তোলে। তাই জাতির সংস্কৃতির পরিমার্জিত মননশীলতার রূপ ধরা পড়ে সাহিত্যের দর্পণে। এই দৃষ্টিতে জাতির ইতিহাস রচনায় সাহিত্যকে অবহেলা করা চলে না। বাংলা দেশের কৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাসেও সাহিত্যের অবদানকে অস্বীকার করা চলে না। বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাসকে বিস্মৃত-প্রায় অতীত দিনের মহুয়া হতে উদ্ধার করে তার প্রকৃত আসন দিতে হবে রসের আসরে।

বাংলা লেখক তথা সাহিত্যের মননরীতি এবং তদনুযায়ী প্রকাশভঙ্গীর কিছু পরিচয় মেলে বাংলার বিচিত্র নিসর্গ প্রকৃতির পটভূমিকাতে, পূর্ণতর পরিচয় পাওয়া যায় দেশের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক কাহিনী রচনায় দেশের ঝড়ঝঞ্ঝাসঙ্কুল ইতিহাসের পটভূমিকারও যথেষ্ট প্রাধান্য আছে। কেননা, লেখকের মানসবৈশিষ্ট্য দেশের তদানীন্তন অবস্থার প্রভাবসাপেক্ষ।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনের প্রথম সাক্ষাৎ মেলে খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে। এর পূর্বে বাংলা ভাষা বলে কিছু ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বঙ্গদেশ মৌর্য সম্রাটের অধীন হয়। সেই সময় থেকে এদেশে আর্যদের আগমন এবং বসতি সুরু হয়। তার পূর্বে এদেশে কোল, দ্রাবিড় এবং মঙ্গোল জাতির অনার্য ভাষা প্রচলিত ছিল। আর্যগণ শিক্ষা ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মে সংস্কৃত এবং সাধারণ ব্যবহারিক কথাবার্তায় সংস্কৃতোদ্ভূত প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করতেন। বাংলাদেশে আর্যদের আগমনের পর ক্রমে ক্রমে পুরাতন বঙ্গবাসীরাও অনার্য ভাষা ত্যাগ করে প্রাকৃত ভাষা গ্রহণ করেন।

অবশেষে খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতকে প্রাকৃত ভাষা নানা রূপে পরিবর্তিত হয়ে অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে প্রাচীনতম বাংলা ভাষায় পরিণত হয়। তবে আর্যেরা সংস্কৃতেই সাহিত্যচর্চা করতেন। এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেব। তাঁর সংস্কৃতে রচিত "গীতগোবিন্দ" বাঙালীর এবং সমগ্র ভারতের ভক্ত ও রসিক সমাজের মনোহরণ করেছিল।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেকার রচনায় পদ্যেরই অপ্রতিহত প্রাধান্য চলেছে, তদানীন্তন সাহিত্যে গদ্যের নিদর্শন মেলে না। এই আদিযুগকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা যায়—প্রথমেই উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধযুগ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দিকে প্রথম মনোযোগ দেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ। তাঁহাদের রচিত চর্যাপদগুলিকে বাংলা সাহিত্যের আদিম উৎস বলা যেতে পারে। সম্ভবতঃ এগুলির উৎপত্তিকাল খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী। এই পদগুলির প্রভাবেই পরবর্তীকালের বাংলা সহজিয়া গান, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী, বাউলগান প্রভৃতির সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। চর্যাপদগুলি গূঢ় সাধন-প্রণালীর সঙ্কেত। রসের বিচারে এগুলির মধ্যে সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য পাওয়া কঠিন। কিন্তু এগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, দোহার নীতিভাষণ এবং জটিল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব দেশজ ভাষার মাধ্যমে কাব্যরূপ ধারণ করেছে। এই দোহাগুলির মধ্যে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য অভিজাতের সাহিত্য, এখানে জনসাধারণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। চর্যাপদগুলির এই নতুন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মেলে দেশের ইতিহাস বিশ্লেষণে। বাংলাদেশে বৌদ্ধবিপ্লব শুধুমাত্র ধর্মবিপ্লব নয়, এই বিদ্রোহ নিহিত ছিল সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পটভূমিকার মধ্যে। সে বিদ্রোহের অঙ্কুর বলিষ্ঠ হয়েছে সাহিত্যের প্রকাশনায়। তাই বৌদ্ধ গান ও দোহায় যে নূতন মননশীলতা দেখা যায় তার পরিণতির পরিচয় আছে ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের গানে, মঙ্গলকাব্যে। এগুলি একান্তভাবেই জনসাধারণের সাহিত্য, এ সাহিত্য আভিজাত্য গর্বে দেশের অগণিত জনসাধারণকে অপাংক্তেয় করে নি।

চর্যাপদগুলি ছাড়া আদি যুগের বাংলা সাহিত্যে আর যা পাওয়া যায়, তা অনুমান সাপেক্ষ। একথা উল্লেখযোগ্য যে, চালুক্যরাজ তৃতীয় সোমেশ্বরের রাজত্বকালে (১১২৭-১১৩৮ অব্দ) রচিত মানসোল্লাস গ্রন্থের 'গীতবিনোদ' অধ্যায়ে বিভিন্ন দেশীয় অবতার ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কয়েকটি বাংলা গীতের অংশ পাওয়া যায়।

এর পরে নাম করা যায় শূন্য পুরাণের। এই কাব্যের রচয়িতা রামাইপণ্ডিত। রামাইপণ্ডিত মহারাজ দ্বিতীয় ধর্মপালের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিদ্যমান ছিলেন। এই কাব্যে বৌদ্ধ প্রভাব সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।

পুরাতন কাল হতে বাংলাদেশে শিবভক্ত এক যোগী-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। তাঁদের সম্প্রদায়ভুক্ত চারজন সিদ্ধার কাহিনী এদেশে প্রচলিত ছিল। এই কাহিনীগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—(১) মীননাথ ও গোরক্ষনাথের কাহিনী এবং (২) গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর কাহিনী। এই কাব্য কাহিনীগুলি নাথগীতিকা নামে সুপরিচিত। ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্রের গান উত্তর পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই গাথার সর্ব প্রথম রচয়িতার সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কিছু বলা যায় না কিন্তু অনুমান হয়, গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে দ্বাদশ শতাব্দীতে এই কাব্য রচনার সূত্রপাত হয়।

খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত গ্রীয়ারসন এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হতে মাণিকচাঁদের গীতি প্রকাশ করেন। মাণিকচাঁদ একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তরবঙ্গে রাজত্ব করতেন এই পল্লীগাথাটি সাহিত্যিক মূল্যে সমৃদ্ধ।

পুরাতন যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী এবং রামায়ণ মহাভারত কাহিনী। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, এই সময়ে একদিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে দেশে নানাপ্রকার অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, অপরদিকে কালক্রমে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের ফলে ক্রমশঃ ক্ষীয়মান বৌদ্ধধর্মের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা, এবং তারই ফলে নিজেদের দেবদেবীর মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার বাসনায় তাঁদের ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর ছদ্মবেশে উপস্থাপন করা হয়েছে।

অনেক দুই ব্যক্তির মতে এরই ফলে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির উদ্ভব হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের এই বিশেষ শাখাটিতে সমাজের নিম্নস্তরের জনগণই প্রধান স্থান অধিকার করেছে। এই ধর্মমঙ্গল কাহিনীগুলির রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রথম যুগে খেলারাম, রূপরাম, রামদাস আদক ও পরবর্তীকালে ঘনরাম, মাণিকরাম ও সহদেব চক্রবর্তী। ধর্মমঙ্গল-কাহিনীর কোন কোনটির উপর চণ্ডীমঙ্গলের প্রভাব সুস্পষ্ট।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে লেখকের আত্মপরিচয়ে দেশের ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হয়েছে। জনসাধারণের অভাব, অভিযোগ, দারিদ্র্য, দুঃখ এবং অভিজাত ও রাজন্যবর্গের খামখেয়ালী এবং অত্যাচার, এগুলি সবই মঙ্গলকাব্যের আবরণে আত্মপ্রকাশ করেছে। মঙ্গলকাব্যের নিম্নশ্রেণীর চাঁদসদাগর এবং চণ্ডীমঙ্গলের অত্যাচারিত ধনপতি সাধু, দেশের অত্যাচারিত, সাধারণ সম্প্রদায়ের প্রতীক; চণ্ডী ও মনসাদেবী অত্যাচারী ক্ষমতাধান শাসকের প্রতীক; এবং শাসিত সম্প্রদায়ের ক্ষোভ ও ধূমায়িত অসন্তোষ সদাগরদ্বয়ের বিদ্রোহের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে। এই সকল কাব্যের মধ্য দিয়ে তদানীন্তন দরিদ্র, অসহায় জনসাধারণের মানসিক বিক্ষোভ প্রতিফলিত হয়েছে। অবশ্য দেশের ভৌগোলিক পটভূমিকায় প্রকৃতির কাছে মানুষের অসহায়তাও এ কাব্যগুলির মধ্যে অনুভূত হয়। তবে মুখ্যতঃ শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের মর্মন্তুদ কাহিনী মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে।

মনসামঙ্গল কাব্যগুলির সাহিত্যিক মূল্য আছে প্রচুর। ষোড়শ শতাব্দীর কবি বিজয়গুপ্ত এবং সপ্তদশ শতাব্দীর কবি ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস মনসামঙ্গল কাহিনীর সুবিখ্যাত লেখক। ষোড়শ শতাব্দী থেকে মুসলমান রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশে বহু কাব্য রচিত হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ শতকে রচিত দুইখানি মনসামঙ্গলে হুসেন শাহের সপ্রশংস উল্লেখ এই বিদ্যোৎসাহিতার প্রমাণ। চণ্ডী-মঙ্গল কাহিনীগুলির মধ্যে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাণিক দত্ত, মাধব আচার্য ও মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এবং পরবর্তীকালে সপ্তদশ শতাব্দীতে দ্বিজ জনার্দনের মঙ্গলচণ্ডী পাঁচালী ও রূপনারায়ণ ঘোষের দুর্গামঙ্গল উল্লেখযোগ্য। এ সবের মধ্যে সাহিত্য-রসের এবং ঐতিহাসিকতা বিচারে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে। সাহিত্যিক ধর্ম এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের যথার্থ সহজ কবিত্বের মধ্য দিয়ে এ কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মধ্যে কালিকামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর কাব্য পরবর্তীকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে এগুলির রচনা আরম্ভ হয় এবং কাব্যগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের লেখনীতে উৎকর্ষতা লাভ করে। এছাড়া সপ্তদশ শতাব্দীতে দ্বিজ হরিরামের মৃগলুব্ধ, কবিচন্দ্রের এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামেশ্বরের শিবায়ন, সত্যনারায়ণের পাঁচালী এবং অন্যান্য দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক (শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল ইত্যাদি) মঙ্গলকাব্যের নাম করা যেতে পারে।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের বৃহত্তম শাখা মঙ্গল-কাব্যে লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর মিশ্রণে নিজ নিজ সম্প্রদায়গত উপাস্য দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রগত ভাবে চলেছে বিদেশী শাসনের উপদ্রব এবং তারই সঙ্গে তাল মিলিয়েছে বর্ণাশ্রমধর্মের কঠোরতা। এরই মধ্য দিয়ে জনসাধারণের বক্তব্য আমরা যুগপ্রান্তে থেকে অনুভব করি কাব্যরসের ধারার মাধ্যমে।

রামায়ণ-কাব্য নিয়েও সে যুগে সাহিত্য রচনা হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে রামায়ণী-কথার যশ কবি কৃত্তিবাস ওঝা। ষোড়শ শতাব্দীতে পূর্ববাংলার মহিলা-কবি চন্দ্রাবতী দেবী একটি রামায়ণ-কাব্য রচনা করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামায়ণ কাহিনীর বহু লেখকের সন্ধান পাওয়া যায়। মহাভারত কাহিনীর লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীকর নন্দী।

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় এবং পঞ্চদশ শতকের কবি যশ, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনকেই সর্বপ্রাচীন বৈষ্ণব-কাব্য বলে অনুমিত করা হয়। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের যথার্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা মতদ্বৈধ আছে। চৈতন্য-পরবর্তীযুগে বৈষ্ণব-কাব্যের বিশেষ উন্নতিসাধন হয়। বৈষ্ণব-গীতিকাব্যকারগণের মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর মাধবা-

চার্য ও কৃষ্ণরাম দাস, সপ্তদশ শতকে গোবিন্দদাস চক্রবর্তী, যদুনন্দন দাস, ও অষ্টাদশ শতকে নরহরি চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও রাধামোহন ঠাকুরের রচনা সাহিত্যের আসরে উচ্চস্থান পেয়েছে। বৈষ্ণব-পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাস ঠাকুর, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রায় শেখর প্রভৃতি রসিক কবিগণ যে অপূর্ব রসমাধুর্যের প্রবাহ বইয়েছেন, তার তুলনা বিরল, এ অনুভূতি মানবের হৃদয়ের দ্বারে গিয়ে আঘাত করে। ব্যক্তির সঙ্গে লোকাতীতের মিলন, প্রিয়রূপে দেবতাকে একান্ত আপনার করে পাওয়া, বৈষ্ণব কবিতার গীতিমূর্ছনায় এই ব্যক্তিমানসের বৈশিষ্ট্য এবং সংঘোরুক্ত আবহাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, ইতিপূর্বে দেশের রাষ্ট্রিক ও ধর্মগত ইতিহাসে যে বিভিন্ন সংঘাত দেখা দিয়েছে, এই আত্মচেতনা তারই অনিবার্য ফল। শ্রীচৈতন্য-দেবের জীবনসাধনা এই আত্মচেতনাকে বৃহত্তর বোধে উদ্বোধিত করেছে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর চরিতশাখা অভিনব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়ে বঙ্গ-সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করল। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী-লেখকগণের মধ্যে ষোড়শ শতকের বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজের খ্যাতি অতি বিস্তৃত।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেকার বাংলা সাহিত্যের এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে বিভিন্ন লৌকিক কাহিনী (বিশেষতঃ আখ্যানকাব্য রাজসভায় না রচিত হয়েছে), উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গের বিচিত্র গীতি ও গাথাকাব্য, ডাক ও খনার বচন, ইত্যাদির উল্লেখও প্রয়োজন।

সাহিত্যের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীকে যুগসন্ধি বলা চলতে পারে। এই সময়ে দেশের শাসন ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটতে সুরু হয়েছে। সুপ্রাচীন কালের চর্যাপদ হতে সুরু করে অষ্টাদশ শতকে কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর পর্যন্ত প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করা চলে। ভারতচন্দ্রের পরবর্তী যুগকে (বর্তমান কাল পর্যন্ত) আধুনিক যুগ আখ্যায় ভূষিত করা হয়

একটি ঐতিহাসিক জবানবন্দী

শ্রীঅরবিন্দের স্বাধীনতার বাণী

[আলিপুরের প্রসিদ্ধ বোমার মামলায় (১৯০৮) জাতীয়দলের অন্যতম নেতা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ আসামীরূপে আদালতে যাহা বলেন, তাহার আন্তরিকতা ও প্রেরণা আজও অনুভূত হইবে।]

"স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করা যদি অপরাধ হয়, তাহা হইলে আমি প্রধান অপরাধী। স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ যদি আইনবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি দোষী—একথা স্বীকার করি। আমি যাহা করিয়াছি তাহা অস্বীকার করিব কেন? ইহারই জন্য আমি জীবনধারণ করিয়াছি। স্বাধীনতা আমার জাগরণের চিন্তা, আমার নিদ্রার স্বপ্ন। ইহাই যদি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়, তাহা হইলে আর সাক্ষীসাবুদের প্রয়োজন কি? আমি এখানে উপস্থিত এবং এ অভিযোগ আমি স্বীকার করিছি। পাশ্চাত্যের তত্ত্বগুলি আমি গ্রহণ করিয়াছি এবং তাহাদের সহিত বেদান্তের অমর শিক্ষার সমন্বয় করিয়াছি। এই আদর্শই আমি আমার প্রত্যেকটি রচনায় প্রকাশ করিয়াছি। আমি মনে করি, আমাদের কাজ হইতেছে দেশবাসীকে বলা, তাহাদিগকে উপলব্ধি করানো যে পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে ভারতের বিশিষ্ট দান আছে, ভারতের একটি মিশন আছে, সমগ্র মানবজাতির জন্য তাহা করিতে হইবে। ইহাই যদি আমার অপরাধ হয়, তাহা হইলে আপনাদের আইনে যে শাস্তি আছে তাহা আমাকে প্রদান করুন। আপনারা আমায় কারারুদ্ধ করিতে পারেন, শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু আমার এই অপরাধ আমি কিছুতেই অস্বীকার করিব না। আমি অকুণ্ঠভাবেই বলিতে চাই স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা আইনের কোন ধারাতেই অপরাধ নয়।"

কবিতা

তাকেই যেন দেখেছিলাম

আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

এখানে যার তুহিন হাত
নরকে আঁকে আলপনা
ধূসর চোখে কাজল ছলনার,
গলির মোড়ে কুকের চড়া
এখনো খোঁজে সাবনা
মদের ফুলে বাসর রচনার!
তাকেই যেন দেখেছিলাম
পলাশডাঙা দিনশেষে
দিঘির ঘাটে ক্ষণেক নিরালায়,
সুখের বাধা ছড়াতো রঙ
জলের নীল নীল দেশে
হৃদয় ছিল ঢেউয়ের দোলনায়!

নাগিনী যেন নীরবে নয়
রূপের হাটে লাহনা
এখানে যার কলসখালি মন,
শুকনো ঠোঁটে পঞ্চবান
নকল হাসি, আনমনা
পথিক শিবে জাগায় অসুখন!
তাকেই যেন দেখেছিলাম
শিশির দেহে সুচিত
ভোরের ফুলে সাজাতে তার ডালি,
তখন বুকে নদীর দোলা
গলায় সুর গুঞ্জিত
মহুয়া মৌমাছির ভাটিয়ালি!

হয়তো সেই কৃষ্ণকলি
কবিচোখের কল্পনা
মেঘের দিনে মরনাপাড়া মাঠে,
দেখেছি তার ভীরু মনের
ভাষনা মেলে ভালবোনা
মেঘের ডাকে স্বর্গবসা পাটে!

এ কোন্ পাপে মরণমুখি
নগ্ন-নাগ কন্যা সে,
নেই কি তার কিছুই অবশেষ?
নিশাচরের লোলুপ শিসে
আকালডাঙা পঞ্চাশে
এ মেয়ে যেন পোড়ো বাংলাদেশ!

কে তুমি বল বাজাও আজো
বাজাও তুমি কার হাতে
নানান সুরে সনাতনের বীণা,
বন্ধু ওগো ভাকিয়ে দেখো
গলির মোড়ে আখরাতে
এদেশ তুমি চিনতে পার কিনা?
না যদি পার দেখো না দোষ
তোমার নীতিশাস্ত্রকে,
জাগাবাদ না হয় রেখো মেনে—
এখনো দেশে আগুন আছে
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে
ললাট খুঁড়ে দৃষ্টি দেবে জেনে!

কুন্তীকন্যা

উমা দেব

নেমে আসে আরো এক থমথমে অসহ্য আকাশ :
পরিক্লান্ত কল্পনার ঝাউবনে দীর্ঘতর ছায়া
ছায়া নামে এপারে ওপারে,
জীবনের এ আকাশে কী নিঃসীম নিশার ইশারা !
দু'চোখের মণি তবু জেলে রাখি আকাশ প্রদীপ,
জেলে রাখি অন্ধকারে তীক্ষ্ণ তপস্যায়
সূর্যদেব তোমার আশায় !

ধ্যানভঙ্গ সন্ন্যাসীর মতো
দৃঢ়বাহু গাছে গাছে কেঁপে ওঠে স্বপ্নের পলাশ
ব্যর্থতার অস্থির হাওয়ায়,
অশ্রুময় শিশির ঝরে শিউলির শব্দহীন গান,
নির্বাক দিগন্তে স্থির মেঘে মেঘে কুহেলি দৈন্যের !
রাতের আলস্য ভেঙে এদিকে ওদিকে
আশার জোনাকি তবু মন্ত্র পড়ে, জ্বলে যন্ত্রণায়
সূর্যদেব তোমার আশায় !

হে সূর্য আমার গানে সুর নেই ; সুরের আগুন
হে সূর্য তোমারি কাছে, দেখে যাবি সে সুরের দান,
এ শবরী প্রতীক্ষায় কবে বল ফোটাবে ফাল্গুন—
ধোঁয়া বেদনার মতো এ রাতের হবে অবসান ?

এ মেরু-হৃদয় ছুঁড়ে কামনার মটিনী জোয়ার
কঠিন দুয়ারে রুদ্ধ ; আসীমান্ত ধূসর ছায়ায়
পদচারণা উৎকণ্ঠায় চায় হায় হাওয়ার প্রহার,
আহত ধৈর্যের ধ্যান নৈরাশ্যের হিমে ভেসে যায় !

বিনাশের তমসলোকে বিশ্বাসের শঙ্কিত সীমায়
তবুও তোমাকে ডাকি ; রাত্রির চক্রান্ত ভেদ ক'রে
জাগো তুমি, মেলে ধরো জীবনের জীবন উত্তাপ !
এলোমেলো মেরু ঝড়ে সব শেষ, তবু
সর্বনাশ বুকে তুলে কুন্তীকন্যা আছে প্রতীক্ষায়
সূর্যদেব তোমার আশায় !

শামুক

ফেদেরিকো গারথিয়া লরকা

তারা একটা শামুক এনেছে আমার কাছে
সবুজ সমুদ্র সংগীত সে গায়
তার খোলসে।
আমার হৃদয় তালে তালে উছলায়
ধূসর আর রূপালী মাছের সঙ্গে।
তারা একটা শামুক এনেছে আমার কাছে।

অনুবাদ : সবিৎ চৌকদার

সত্য হোক, মিথ্যে হোক

শ্রীসুনীল দাশগুপ্ত

কল্পনায় কাজল বুঝি দুচোখে মেখে
ওই যে মেয়েটী আছে জানলার ধারে,
অনেক স্বপ্ন ওর অনেক কামনা—
মিথ্যে হোক সত্য হোক ভেঙে তা দিও না।
স্বপ্নের সুরভি তার মনের বনে
আর গোপন হৃদয়ে ঝরে নীলিম নির্ঝর—
সত্য হোক মিথ্যে হোক, ওর যত বুকের বাসনা
যতদিন বেঁচে থাকে থাক, যেন ভেঙে দিওনা, দিওনা।
ওর প্রাণে আকাশচুম্বী কোন সাধের সৌধ ;
ওর এ আশাকে যেন ভুলেও তোমরা ভেঙোনা ভেঙোনা।
ও যদিও বাস্তবের কঠিন কর্তব্যে ম্লান-নিয়মান,
ও যদিও ঝড়ে-জলে, চোখে আজ পঙ্গু হয়ে আছে—
তবু বুঝি কুসুম গোপন গভীরে ওর অনন্ত প্রেরণা
অপ্রস্ফুট হয়ে আছে। সে কুসুম ভুলেও তুমি
ছিঁড়ো না ছিঁড়ো না।

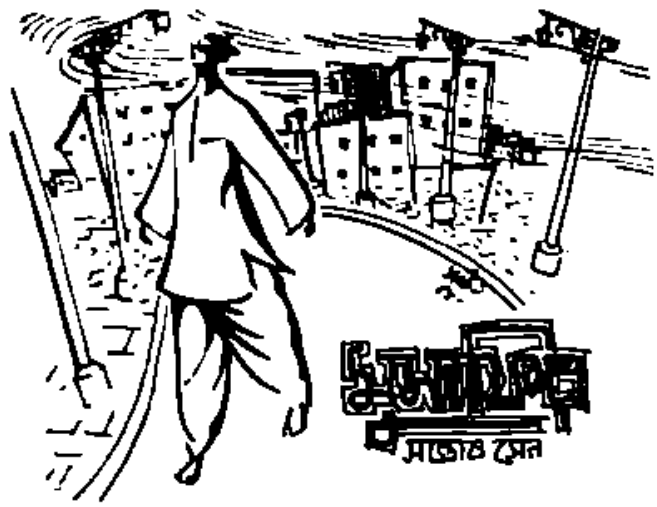

মৃত্যুঞ্জয় বিরাট সরীসৃপটার ক্ষত বিক্ষত দেহ তখনও স্তব্ধ হয়ে পড়েনি। তার বুকের উত্তপ্ত নিশ্বাসের আগুনে জ্বলে যাওয়া বিরাট জীবনগুলো বাঁচবার তাড়নায় ইতঃস্তত ছিটকে পড়েছিল সেদিন। আমিও বেরিয়ে পড়েছিলাম, এক বিরল ছায়া ঘেরা পৃথিবীর বুকে—এক টুকরো ঘোড়ের ছাদি আর একটুখানি জীবন স্পন্দন—এইটুকু আশ্রয় করে। ঘরছাড়া দিকহারা উদ্‌ভ্রান্ত পথিক আমি। আমার সেই ভ্রমণপথের আহরণে যা কিছু সঞ্চয় করেছিলাম ক্ষীণ দৃষ্টি আর স্বল্প পরিসর মনের মধ্যে তাকে ধরে রাখতে পারিনি সেদিনের সেই কাহিনী তাই আজ খাপছাড়া অসমাপ্ত বলেই মনে হবে।

কলকাতা মহানগরীর প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে হেঁটে চলেছি। মৌচাক থেকে মৌমাছির মত ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে চলেছে মানুষ। প্রত্যেক ঘর থেকে তারা এসেছে। বেঁটে, খাটো, মোটা, লম্বা কত বিচিত্র রকমের লোক। কত ভাষা, কত রঙ, কত বেশ ভূষা! মনে হোল আমার পৃথিবীর পরিধি বিস্তৃত হ'তে চলেছে আর তারই প্রসারিত বৃত্তের মধ্যে আমি হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে।

এ এক বিরাট রহস্যময়ী নগরী। ঐশ্বর্য্যই এখানে সব কিছু নয়। ঐশ্বর্য্যের অন্তরালে আরও একটা জগৎ যেন আকাশ ছোঁয়া জলস্তম্ভের মত গগনচুম্বী হয়ে হঠাৎ এক জায়গায় হুড়মুড় ক'রে ভেঙ্গে গেছে।

চলতে চলতে নজরে পড়ে রাস্তার বাঁ দিকের গলির গাত বের-করা দেওয়ালের ওপরে এক কালি মর্চ্চে ধরা লোহার ফলক। তাতে বড় ইংরেজী হরফে লেখা—একটি গলির নাম—সাহিত্য পরিষদের কাছে। আঁকা বাঁকা গলি। দু'ধারে দোকানের সারি অ্যাটেন্‌শন হ'য়ে নিশুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায়ই লোহার ছাঁট আর পুরানো লোহার দোকান। পথের চারিদিকের বিক্ষিপ্ত লোহার টুকরোগুলো একটু অসাবধান হলেই পথিকের বিপদের কারণ হতে পারে। ফুটপাথের উপর ইতঃস্তত অনেকগুলো বাবুই দড়ির খাটিয়া বিছানো। মাঝে মাঝে গো-মহিষের আস্তর। তাদের খড়-জলের বস্তু পেট কাটা ড্রাম। রাস্তার ধার বেয়ে গঙ্গা যমুনার মত প্রবাহিত হ'চ্ছে গো-মল আর গোমূত্র। একটু আগেই একজন চলতে গিয়ে পা ছড়কে বর্ষাভেজা ফুটবল মাঠের মত গোময়ে গড়িয়ে উঠেছেন, তার স্পষ্ট দাগ জল জল করছিল। শকুনের চোখ ভাগাড়ে, নইলে এত পথ থাকতে এমনি একটা পথে মরতে আসব কেন! আজও লিখতে গিয়ে তাই গা ঘিন্‌ঘিন্ করছে। সাহিত্য পরিষদের পি-এইচ-ডি, ডি-লিট-দের

আশেপাশে এমনিতর পরিবেশ আমার বিচিত্র বলেই মনে হয়। এ যেন আলোর নীচে অন্ধকার।

ভগবানের অশেষ দয়া তাই এই নরক যন্ত্রণা বেশীক্ষণ ভোগ করতে হল না। পিঠের ওপর মৃদু আঘাত করে কে যেন বলে উঠল, কোথায়?

তাকিয়ে দেখি বীরেনদা। বিস্ময় ও আনন্দ একযোগে এসে আমায় নির্বাক করে দিল। একটু সামলে নিয়েই প্রত্যুত্তর দিলাম, আরে বীরেনদা যে! আপনি কি এইখানেই থাকেন?

আমার দিকে মৃদু হেসে উত্তর দিলেন বীরেনদা,—হ্যাঁ, তোদের খবর কি? মা কেমন আছেন বল!

আমি যেন অন্য জগতে ফিরে গেলাম। গাঢ় মেঘের মত মনের মধ্যে নেমে এল অপ্রসন্ন অস্বস্তি। মুখে বললাম, এতদিন পর আজ মনে পড়ল বুঝি? ভুলেও তো একবার খবর নেন নি!

চলতে চলতে অনেকটা এগিয়ে এসেছি। সামনেই একখানা হলদে রঙের পুরনো বাড়ী। বালির খসে-পড়া আস্তরণের ভেতর দিয়ে হাঁ করা ইটগুলোর চাপা কান্নাকে ঢেকে, ইতঃস্তত কারুকার্যের অবশেষ আজও ভুলতে চাইছে না—অতীত স্মৃতি-বিজড়িত সুখসমৃদ্ধির দিনগুলোকে। খড়খড় প্রায় একখানা মাত্র কাঠের ফাঁক করা ঘিয়াট পাল্লার ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলেন বিরেনদা।

পেছনে একবার মুখ ঘুরিয়ে শুধু বললেন, ভেতরে আয়।

আমিও এগিয়ে গেলাম। আমার মনের কোণে একখানা পরদার ওপর তখন দ্রুততর গতিতে সিনেমার মত পট পরিবর্তিত হচ্ছিল। জীবনের কচি অধ্যায়ে সবুজের ওপর তখনও কোন দাগ কাটেনি। সেই তরুণ প্রভাতে এক ঝলক আলোর মত যাঁরা এই জীবনের চলমান চাকাটাকে ডানে থেকে বাঁয়ে আবার বাঁয়ে থেকে ডানে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন—ইনি তাদেরই একজন। মানুষের মঙ্গল কামনার অন্তরাল স্পর্দ্ধা নিয়ে মানুষের বন্ধন সৃষ্টি করতে আজ আর তিনি চান না। আমিও খুশি হয়েছি কারণ ধর্ম-প্রচারের নামে জীবনকে পঙ্গু না করাই ভাল।

দরজায় আসমানী রঙের পর্দা আঁটা। পর্দাটাকে আলতো ভাবে সরিয়ে ঘরে ঢুকতে যাব ছায়ামূর্তির মত একটা পরিচিত মুখের অস্পষ্ট আভা চোখের ওপর ঠিক্ ঠিক্ করেই আবার আঁধারে মিলিয়ে গেল।

বীরেনদা ডাকলেন, আয় ভেতরে আয়।

আর দ্বিধা না ক'রে সটান ঢুকে পড়লাম ঘরের ভেতরে।

ব্যক্তিগত জীবনের উপর আমার কোন অধিকার নেই, আজকে এটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি আমার হয়েছে। তাই পুরোকার ঘনিষ্ঠ একাত্মবোধ লক্ষ্য দিয়ে চাপবার চেষ্টায় মুখ নীচু করে বসেছিলাম। বীরেনদার দৃষ্টি এড়াতে পারিনি মনে হয়। তিনি কিন্তু অত্যন্ত সহজ ভাবেই বিষয়টা হাল্কা করে দিলেন।

—জানিস আমি বিয়ে করেছি।

মুখে বললাম, না জানালে কি করে জানব বলুন। মিষ্টান্নের ভাগটুকুও ইতরজনকে দেবেন না, ভেবেছিলেন কিন্তু আজ আর ছাড়ছিনে—মুদেমূলে উসুল করব। আমার কথায় উচ্চৈঃস্বরে হো হো করে হেসে উঠলেন বীরেনদা।

পাশের ঘর থেকে বীরেনদার বৌ বেরিয়ে এলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, অত হাসি কিসের? কি হলো?

বীরেনদা হাসির টানটুকু অসমাপ্ত রেখেই বলে উঠলেন, শুনছ তোমার এই দেওরটিকে একটু ভাল করে আজ খাইয়ে দাও। আমাদের বিয়ের সময় ওকে খবর দেওয়া হয়নি, তাই ওর অভিমান হ'য়েছে।

—না, না—আমি ঠিক তা বলিনি আর আমার কোন চালচুলোর হদিশ নেই, খবর দেবেনই বা কি করে

—নিপুমাসী—বলতে গিয়েই কেমন যেন জিভটা কঠিন হ'য়ে গেল; ঘুরিয়ে বললাম, বৌদি কেমন আছেন?

নিপুমাসী মানে—নিরুপমা রায়, আমাদের দেশের এক বড় উকিল মহিমচন্দ্র রায়ের কন্যা বছর পাঁচেক আই-এ ক্লাসে যাতায়াত করেও কৃতকার্য না পেরে শেষ পর্যন্ত পড়া ছেড়ে দিলেন আমাদের বছরে।

আমি মনে মনে একটু হাসলাম। বিয়ে ত সবাই করে। ছেলে পিঠা হওয়াই হয়ত জীবনের উদ্দেশ্য কিন্তু এই কথা কয়টি সময় থাকতে কেউই বিশ্বাস করে না। উচ্চাকাঙ্ক্ষায় প্রলোভিত হয়ে লম্বা ঝুলির আড়ালে যারা সংসারে বিতৃষ্ণা করে তাদের পরিণতির জলন্ত প্রমাণ রয়েছি বীরেনদাকে।

বীরেনদার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি করছেন আজকাল?

—কি আর করব যা সবাই করে।

—হুঁ

—চাকরী, বেঙ্গলের দোকানের ম্যানেজার।

আমি শুনতে শুনতে কৌচের উপর আরাম কোরে পা তুলে বসলাম। ঘরের চতুর্দিকে নিমেষে চোখটা ঘুরে এল। বিরাট ঘর। হলঘর বলা চলে। তিনদিকে সাজান রয়েছে সোফা, মাঝখানে একটা গোল টেবিল। ঘরের জানলাগুলোর ভেতর থেকে দিচ্ছে হলদে রঙের পর্দা দেওয়া। মনে মনে ভাবলাম তাহোলে যা শুনি তা মিথ্যে নয়। মুখে বললাম, এত বেশ চাকরী—দু পয়সা হচ্ছে হাঁ হোলে।

বীরেনদা বিনীতের মত মৃদু হাসতে লাগলেন। সেই হাসিতে মাধুর্য না থাকলেও নিরঙ্কুশ শুষ্কতা ছিল।

—রাজনীতি করছেন না আজকাল? মুখের উপর মুখ তুলে চাইলাম। দেখলাম, একটা অপরাধী মনের অস্বস্তিকর চঞ্চলতা মাখান চোখ এড়িয়ে যেতে চায় আমাকে।

নিপুমাসী কথার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে উঠলেন—ওর সখ, ওকি চিরকালের জন্যে? সখ মিটে গেছে রাজনীতিও উঠে গেছে।

বীরেনদার মুখখানা সহসা কাল হয়ে গেল। অতীতের পারিবারিক জীবনের মধ্যে এসে কাউকে ছোট করতে চাইনি আমি। আমার লজ্জা হোল, কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলাম। বীরেনদাকে একটু উৎসাহ দিয়ে বলে উঠলাম, তা হোলে দাদার সাথে আমার মিলবে এবার।

নিপুমাসী খুশী হলেন আমার কথায়। তাই উৎসাহ ভরে নিজের কথাটাকে ভাল করে প্রতিষ্ঠিত করতে বলে উঠলেন, সংসারে একদল পদমর্যাদাহীন বেকার আছে এ হচ্ছে তাদের কাজ। যাদের দায়িত্ববোধ আছে তাদের দ্বারা রাজনীতি হয় না।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার সমর্থন লাভের আশায় নিপুমাসী প্রশ্ন করলেন, কেমন ঠিক বলিনি?

আমি একটু হাসলাম, যেন মৌন হাসির মধ্য দিয়ে আমি তাঁকে সমর্থন করছি।

কিন্তু তবু কেন মাসীর যেন বিশ্বাস হ'ল না, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আবার মুখ তুলে বললেন, ঠাট্টা নয়, সত্যি কথা বল তুমি!

—নানা ঠাট্টা কর'ব কেন? আমি কি বলেছি আপনি মিথ্যে বলছেন! জীবন-মূলো কেউ কি মিথ্যেকে আশ্রয় করতে চায়?

—তা হয়ত করে না, তবে ভুলও ত করতে পারে।

—ভুল! ভুলই ত জগত। ভেবে শুনে এমনি দু চারটে ভুল করতে পারলে অনেকেই খুশী হত।

—সেদিন আমি ভাবতেও পারিনি অনিচ্ছাকৃত আমার সেই উক্তি মানুষের জীবনে কত বড় চরম বাস্তব।

নিপুমাসী বললেন, ঠিক বলেছ—যারা মানুষকে সোজা-সুজি আঘাত করে, তাদের চেনা যায় কিন্তু যারা সত্যের মুখোসের আড়ালে অন্ধ করে দেয় মানুষের দৃষ্টি, তারা ভয়ঙ্কর!

কস করে বেরিয়ে পড়ল মুখ থেকে, আমার বীরেনদাও কিন্তু কম যেতেন না।

—তা জানি আর সেই চালেই ত নিজেই ধরা পড়েছেন।

হেসে ফেললাম আমি—হো হো করে।

—খয়েরি হয়ে উঠল নিপুমাসীর গাল দুটো। নেহাৎ কাল নইলে টকটক করত রক্তের আভায়।

বীরেনদা আমাদের কথা এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন। হাতে একখানা খবরের কাগজ নিয়ে ঝুকে পড়েছিলেন কিন্তু তখনকার মত ঐ পাতলা কাগজটুকুই

ছিল তাঁর একান্ত আশ্রয়, সৈনিকের বোমার সেন্টার থেকেও নির্ভরযোগ্য। এবার তিনি মুখ তুললেন, আমাকে নিয়ে তোরা ঠাট্টা করছিস ?

আমি জিভ কেটে বললাম, ছিঃ তাও কি হয় !

—না না বল্, বলতে পারিস তোরা। অন্তত তোর কাছে আমি অশেষ ঋণী।

—কি রকম ! আমি বিস্মিতের ন্যায় মুখের দিকে চাইলাম।

—তা নয়ত কি ? তুই না থাকলে বি. এ. পরীক্ষাই আমার দেওয়া হোত না আর আজকের এই কলকাতার জীবনেও বেঁচে থাকবার মত যোগ্যতা আমার হোত না।

—ফুল শোধ করছেন বুঝি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে।

—কৃতজ্ঞতা সে'ত সাধারণ জিনিস কিন্তু আমি তোদের কাছে—অন্ততঃ তোর কাছে অপরাধী। বাবার শেষ কথা কটি আমার কানে বাজছে 'গরীবের ছেলের পড়ার সখ কিসের, চাষার ছেলে মাঠে এসে লাঙ্গল ধর'।

তারপর, উঠল ঝড় ! তার দুরন্ত বেগে ক্ষত বিক্ষত হলাম। স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়ে জেগে উঠল—শ্মশান-সুস্তব্ধতা। তারই উপর বীজ ছড়িয়ে ভেবেছিলাম জীবনকে আবার সুন্দর করে গড়ে তুলব কিন্তু সেই রঙীন জীবন-স্বপ্ন আজ আর আমার নেই। স্বদেশ সেবার ব্রত নিয়ে তোদের মধ্যে নেমে এসেছিলাম। সে ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারি নি। আমি সত্যভ্রষ্ট হয়েছি। যা গেছে তা আর ফিরে আসবে না। সে আমার সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল না—তবে কেন যেন বুঝতে পারছি রিক্ত হয়েছি আমি।

বলতে বলতে তিনি মোহাবিষ্ট হলেন। ওদিকে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একখানা মেঘ সূর্যকে ঢেকে ফেলেছে। চারিদিকে অন্ধ গুহার নিস্তব্ধতা, হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেলেন তিনি। বুকের মধ্যে মোচড় খেয়ে উঠল একটা অব্যক্ত বেদনা। পশ্চিম দিগন্তকে ধীরে ধীরে রক্তাক্ত করে ততক্ষণ আকাশে ছড়িয়ে পড়ছিল রাঙা মেঘ।

আমার মনে এল প্রতিভার বিজয় আর মানুষের আদিম দিনের কথা। সে'ত বিজয়ের নেশায় পরাজয়ের গ্লানি। সভ্যতার ঢেউ যাদের অতিক্রম করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে চমড়ি খেয়ে পড়ছে অন্ধকারের গহ্বরে। ঘরের ভেতরে তখন চার চারটে চোখ দুঃস্বপ্নের বুক তাকিয়ে থাকে—জ্যোতি বিহীন, নিরীহ, শান্ত। অস্বীকার করতে পারিনে উন্মত্ততা এই মানব জাতিকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে—ধর্মের নামে, দেশের নামে তারা পাগল। নিয়তির জয়-যাত্রা শুরু হয়েছে। জীবন পূর্ণ হতে চাইছে নিজেরই কবরের মধ্যে। সৃষ্টই বুঝি পূর্ণের পরিণতি।

বীরেনদা আবার বলতে সুরু করলেন, সংসার করতে বসে দেখছি এ এক হীন কদর্য জীবন-যাত্রা। এর চার দিক ঘিরে শুধু স্বার্থপরতা, হীন তোষামোদ, ভণ্ড রুচি, নির্লজ্জ ছাড়লাপনা আর অন্যায় অবিচার। তাদের এখানে স্থান নেই। এখানে যারা দুহাত দিয়ে লুঠ করতে জানে না, যাদের পশ্চাতে শয়তানের দুর্বুদ্ধি, ষড়যন্ত্রের কুটচক্র, কামনার বহ্নিশিখা নেই তারা'ত ক্রীতদাস। এই সমাজ তাদের জন্য নয়। আমাদের ঘিরে হিংসার উৎসব বসেছে, চলেছে শ্মশান কুকুরের কাড়াকাড়ি। আজ তাই বিরূপ বলে মনে হয় মহত্ত্বের কথা শুনলে।

আমি চুপ করে শুনছিলাম; বলে উঠলাম, কিন্তু প্রবঞ্চনা আমরা নিজেকে নিজেরা যতটা করি অন্যের দ্বারা কি ততটা সম্ভব ? বোকা কেউই নয়। সবারই ত বোঝবার শক্তি আছে, সামনে দেখবার দুটো চোখও রয়েছে; আগুনে যদি হাত পড়ে একটু হয়ত পুড়বে কিন্তু তাতে কি এসে যায় ! দুঁ দিতে দিতে বেরিয়ে আসবেন হাসিমুখে।

বীরেনদা নিরুত্তর রইলেন। আমিও আর কথা বললাম না। কথা বলাই তখন কষ্টকর বলে মনে হচ্ছিল। নিশুমাসী আমাদের গাম্ভির্যের মাঝখানে বসে চললেন তাঁর সাধারণ সাংসারিক কাহিনী। কিযে তিনি বলছিলেন শুনিনি মন দিয়ে।

বেলা পড়ে এল, বললাম, আজ তবে উঠি। মাসী ততক্ষণে চা এর কাপ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তাই সৌজন্যের খাতিরে বললাম, ওহো বলতে একদম ভুলে গেছি। চা খাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি। বলতে বলতেই

উঠে দাঁড়ালাম। আমার ভেতরে তখন ঝড় উঠেছে। ভেতরের বেগ আমাকে ঝড়ের মতই বাইরে নিয়ে এল।

নিসঙ্গ আমি, পায়ে চলার পথই আমার সম্বল। বীরেন-দাকে জানতে চাইনি কোন দিন, তাই আজও তাঁর কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছিলাম। প্রতিদিনের অন্ন জুটি, অন্যান্য জীবনের হেলাফেলার মধ্যেও যে আর একটি পথ আছে সে কথা বিস্মৃত হই।

চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছলাম। আমার শক্তিকে কে যেন পথের কাদায় মত মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেছে। নিতান্ত নির্বিকার চিত্তে একখানা ট্রেনে চেপে বসলাম।

(ক্রমশঃ)

পৃথিবীর আদি মুদ্রক

শ্রীশঙ্কর সেন, বি, কম্, ডিপ্, ইন্ প্রিন্টিং (ম্যাঞ্চেষ্টার)

খৃষ্টের জন্মের বহু শতবর্ষ আগে এশিয়ার মধ্যভাগে এক জাতির বসতি হয় যারা জানত যে জ্ঞানই সব শক্তির মূল। এরা চীনদেশের অধিবাসী—এদের চেষ্টায় জ্ঞানমার্গের অনেক ধারাই বহুলাংশে পুষ্ট হয়েছে। মুদ্রণ-এর আবিষ্কার তাদের এক প্রাচীনতম কীর্তি।

ক্রমবিকাশের বীরত্ব সত্ত্বেও চৈনিক মুদ্রণ-শিল্পের ইতিহাস আকর্ষণীয় এইজন্য যেহেতুইউরোপীয়রা যখন পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুদ্রণ-এর ব্যবহার শুরু করে, তার বহু শতাব্দী পূর্বে এ শিল্প চীনদেশে ছিল বহুল প্রচারিত।

চীনদেশে যারা এ শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করেছেন তাঁদের সংখ্যা অল্প নয়। কিন্তু কার্যকরী ভাবে এ শিল্পের প্রচলনের কৃতিত্ব কনফুসীয় পণ্ডিত এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের। ছেন রাজত্বে (খৃঃ পূঃ ২০১ থেকে ২২০ খৃঃ) কনফুসীয় পণ্ডিতেরা সংরক্ষণের জন্য তাঁদের গ্রন্থরাজি পাথরে খোদাই করতে লাগলেন। পরে ১০৪ খৃষ্টাব্দে সাইলুন নামে এক পণ্ডিতের আবিষ্কৃত কাগজে তাঁরা লিখলেন এই শিলা লিপির ছাপ নিতে। পাথরের গায়ে রাখতেন ফেল্ট আর তার পরে শক্ত ভিজে কাগজ। ফেল্টের ওপর কাগজটাকে বসতেন যাতে কাগজে ছাপ পড়ত লিপির উঁচুনিচুর। কাগজটিতে তখন কালি মাখান হ'ত যাতে দাঁড়াত কালো পটে সাদা সাদা অক্ষর।

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবিষ্কারে মুদ্রণ-শিল্পের উন্নতি হ'ল দ্রুততর। এ বিষয়ে তাঁদের ঔৎসুক্য জাগে গৌতমের মূর্তির কাঠ খোদাই করতে গিয়ে। এই ব্লকগুলোতে কালি মাখিয়ে কাগজে ছাপা হ'ত। ধর্মগ্রন্থের বহু মুদ্রণের ইচ্ছা প্রণোদিত হয়ে তাঁরা ব্লক মুদ্রণ প্রবর্তন করেন। এটা ৯০৭ থেকে ৯৬০ খৃষ্টাব্দের কথা, চীনের ইতিহাসে "Five little ages" রূপে পরিচিত। চৈনিক মুদ্রণ-শিল্পের ইতিহাসে এ যুগ একটি সৌধ বিশেষ, কারণ বইয়ের মুদ্রণ এসময়ই প্রথম।

এই মুদ্রাকরেরা 'movable type' এর সুবিধা দেখতে অসমর্থ হননি। স্বভাবতঃই যাঁরা ছবি, কাঠ খোদাই করতেন, তাঁদের পক্ষে কয়েকটা অক্ষর খোদাই করা কষ্টকর ছিল না। মাটির টাইপ সৃষ্টি হল এর পরে, সেগুলোকে ব্যবহারের আগে ভালকরে পুড়িয়ে নেওয়া হ'ত। একটা মোমের আস্তরণ দেওয়া লোহার পাতের ওপর সাজান হ'ত। 'টাইপের' তাপে মোম বেঁকে গলে আর ঠাণ্ডা হ'লে শক্ত করে আটকে ধরত। এগুলোকে কালি মাখিয়ে সুবিধামত ছাপ নেওয়া হ'ত।

প্রায় ১০১৪ সালে অক্ষরগুলো খোদাই করা হ'ত

কাঠের টুকরোর মাথায়, যে গুলোকে ছাপাবার আগে একটা কাঠের ফ্রেমে শক্ত করে সেট্ করা হ'ত।

শোনা যায় যে কাঠের স্থানে ধাতব টাইপের আবির্ভাবের কাল ১৪০০ খৃঃ, সে সময়ে কোরিয়ায় তাদের ব্যবহার হয়েছিল। এটা লক্ষণীয় যে চীনজাতি বৈদেশিক সাহিত্যের একটা বড় অংশ রক্ষা করতে পেরেছিল এবং অধুনা এর অনেক কিছুই পুনরাবিষ্কৃত হ'চ্ছে। চীনের পণ্ডিতদের ভারত এবং তিব্বতের মত প্রতিবেশী দেশে সাংস্কৃতিক মিশনের জন্যই এটা সম্ভবপর হ'য়েছে। কেরার পথে এঁরা প্রায়ই রাশি রাশি পুঁথি নিয়ে আসতেন। জানা গেছে যে ভারতীয় লেখকদের এরকম আট হাজার লেখা পুঁথি Sung-Pao নামক সংকলনে পাওয়া যায়। এরকম কতগুলো বই চীন ভাষায় অনূদিত হয়ে ছাপা হয়। আবার অনেক বৈদেশিক বইও তাদের স্বীয় ভাষাতেই প্রকাশিত হ'য়েছিল। সংস্কৃত কতগুলো বই চীন ভাষায় প্রকাশিত হ'য়েছিল অতি প্রাচীন যুগে। বহু ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য এইভাবে চীনের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হয়েছিল।

চীনের মুদ্রণ-শিল্প অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং অবশেষে পাশ্চাত্যের পথে পৌঁছয় ইয়োরোপের দেশ-সমূহে। ইয়োরোপীয়ানরাই আধুনিক মুদ্রণ-শিল্পের স্রষ্টা; আসল চীনা পদ্ধতি পুরোনো হ'য়ে পড়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এর কারণ হ'চ্ছে চৈনিক পদ্ধতি; তিনটি জিনিষের অভাব—(১) টাইপ ছাঁচ। (২) বর্ণমালার টাইপ; (৩) প্রেস।

এসত্ত্বেও প্রথম বই ছাপার গৌরব চীনদেশেরই।

লৌহ-শিল্পে হাওড়া

শ্রীহারাধন হাজরা [সদস্য, হাওড়া ম্যানুফাকচারার্স এসোসিয়েসন]

কলিকাতার পাশে বাংলার এবং ভারতের লৌহ-শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হাওড়া সহর। ৪০।৬০ বৎসরে ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা বাংলার কারীগরী শিল্পীদের গর্বের বিষয়। অন্যান্য চেষ্টা ও শিল্প-দক্ষতা, বড় মূলধন নিয়োজন না থাকিলেও, যে গৌরবোজ্জল এক শিল্প-নগরী গড়িয়া তুলিতে পারে, হাওড়ার লৌহ-শিল্পাঞ্চল তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।

হাওড়া সহরের ঘাঁটরা অঞ্চল তথা বেলিলিয়স রোডকে কেন্দ্র করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বর্গীয় রাজারাম দাস, রামনারায়ণ ব্যানার্জি, পাঁচকড়ি ঘোষ, যোগীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ও ফকিরচাঁদ দাস মিস্ত্রী মহাশয়গণ কর্তৃক হস্তচালিত দেশীয় প্রথায় পাঁচটি লৌহ-শিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছু দিনের মধ্যে এতদঞ্চলে যেন কিছু সংখ্যক ঐ শ্রেণীর কারখানা গড়িয়া উঠে; এগুলি অধিকাংশই আর হস্তচালিত ছিল না, বিদ্যুতের শক্তি ব্যবহৃত হইয়াই এগুলি বাড়িয়া উঠে।

১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যখন যুদ্ধ ও যন্ত্রের অংশ এদেশে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা হয়। গভর্ণমেণ্টের ও দেশের শিল্প প্রয়োজনে কাজের চাহিদা প্রচুর বাড়িয়া উঠে। হাওড়ার বাঙ্গালী লৌহ-শিল্পীরা এই সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের দ্বারা নিজেদের কারখানাগুলিকে শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিতে সমর্থ হ'ন। যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালে কর্মবীর আশুতোষ দাস, শ্রীঅশ্বিনীকুমার মণ্ডল, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীকালিপদ দাস, শ্রীবিভূতিভূষণ ধর, শ্রীগোপীনাথ রায়, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ পাড়ুই, ৺ বি, এন্

পাইন, ৬ এস. সি. লাহা, ৬ মতিলাল রায়, ৮ অনন্তরাম চাটার্জি প্রভৃতি উক্ত হাটইয়া অঞ্চলে অনেকগুলি বড় ও মাঝারি আকারের লৌহ-শিল্পের কারখানা স্থাপন করেন। হাওড়ার এই অঞ্চল লৌহ-শিল্পের জন্য সমস্ত ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বিভিন্ন রেলওয়ের, সরকারী নানা বিভাগের, মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌর-প্রতিষ্ঠানের, ও বিভিন্ন প্রদেশের নানা প্রকার ছোট বড় কলকারখানার প্রয়োজনীয় লৌহ-শিল্পের কাজ এই হাওড়া অঞ্চল বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে সংবরাহ করিতে লাগিল। নানাবিধ সম্পূর্ণ মেসিনও এই সকল কারখানায় প্রস্তুত হইয়া সুখ্যাতি অর্জন করিল।

১৯১৮ সালে যুদ্ধ থামিয়া গেল, দেশ বিদেশী শাসনের অধিকারে থাকায় গভর্ণমেণ্টের পূর্বের শিল্প নীতিতে ফিরিয়া গেল। এদেশে শিল্পের প্রসারে বৈদেশিক গভর্ণমেণ্টের স্বার্থ বা সহানুভূতি ছিল না। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের উদ্ভব কালে সুপ্রতিষ্ঠিত বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এদেশের নবজাত ও সকল সাহায্য হইতে বঞ্চিত হাওড়ার লৌহ-শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল; বিশেষ করিয়া জাপানী মালের দামের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠা কঠিন হইল।

নানা বাধা ও অসুবিধায় আরও ২০ বৎসর কাটিয়া গেল। ১৯৩৯ সালে আবার বিশ্বব্যাপী সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পুনরায় হাওড়া লৌহ-শিল্পের অভূতপূর্ব সুযোগের সম্ভাবনা হয়। এই মহাসমর ছিল সামগ্রিক যুদ্ধ—total war; এতদ অঞ্চলের লৌহ-শিল্প যুদ্ধের বিরাট প্রয়োজনকে সাধ্যমত মিটাইবার চেষ্টা করিল। মধ্য প্রাচ্যে যুদ্ধের সফলতায় ভারতের দান কতখানি তাহার ভাল হিসাব এখনও হয় নাই। তবে একথা স্বীকৃত যে ভারত হইতে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় মালের অকুণ্ঠ সরবরাহ এই সফলতার জন্য অনেকখানি দায়ী। আর এই সরবরাহে হাওড়ার লৌহ-শিল্পাঞ্চলের বিশিষ্ট অংশ ছিল। অপর্যাপ্ত কাঁচের চাহিদাও এসময় হয়; বাটরা ও হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে অলিতে-গলিতে কুটির-শিল্পের ন্যায় অসংখ্য ছোট ছোট লৌহ শিল্পের কারখানাও এই চাহিদার মুখে স্থাপিত হইল। যুদ্ধের তাগিদে কাজের অভাব ছিল না, কাজ চলিলে অর্থেরও সাময়িক অভাব হয় না।

যুদ্ধ শেষ হইল। দেশ স্বাধীনতা লাভ করিল। ভারতীয় সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশে নূতনভাবে শিল্পোন্নতির কাজ আরম্ভ হইল। শিল্প-চেষ্টা দেশে বিস্তৃত আকার প্রাপ্ত হইল। কিন্তু তাহার অনেকটা কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল বড় বড় শিল্পপতিদের বিরাট বিরাট কারখানায়। অনেকে হাওড়ার লৌহ-শিল্পাঞ্চলকে ভারতের সেফিল্ড (Sheffield) বলেন। যিনি এ অঞ্চল ভাল করিয়া পরিদর্শন করিয়াছেন তিনি ইহার যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন। এই সকল কারখানায় যুদ্ধের সময়ের মত কাজ পূর্ণোদ্যমে এখন আর হয় না। এঁদের কাজ কম, যদিও বিরাট পরিকল্পনায় দেশের শিল্পসমূহ গড়িয়া উঠিতেছে।

সরকার ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলিষ্ঠ হইয়া দাঁড়িতে দিবার সুযোগ না দিলে এগুলি টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। এতদ অঞ্চলের লৌহ-শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নত করিবার জন্য ১৯৫০-৫৫ সালের মধ্যে কমিশন, তদন্ত, বিদেশী ও স্বদেশী অভিজ্ঞদের বৈঠক আলোচনা প্রভৃতি বহু হইয়াছে কিন্তু যথা-প্রয়োজন ব্যবস্থার কোন কার্যকরী পথ এখনও গ্রহণ করা হয় নাই। ফলে এতগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠান দুর্দশার শেষ প্রান্তে আসিয়া শীঘ্র পৌঁছিতেছে। হাওড়া ম্যানুফাক্চারার্স এসোসিয়েসন গত কয়েক বৎসর এই দুর্দশার প্রতীকারের জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করিতেছেন; বর্তমান অন্ধকারে ইহাই আশার কথা।

১৯৫৩ সালের সরকারী হিসাবে প্রধানতঃ সাতটী পর্য্যায়ে যথা—(ক) মেসিন, মেসিন্ পার্টস্ বা যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক (খ) সীট মেটাল প্রস্তুতকারক (গ) ঢালাই (ঘ) নাট-বল্টু, রিভেট প্রস্তুতকারক (ঙ) ওয়েল্ডিং (চ) গ্যালভানাইজিং ও (ছ) ম্যাথমেটিকেল যন্ত্র প্রস্তুতকারক—এরূপ ৭৭৭টী প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ আছে। কিন্তু যে-সরকারী সূত্রে জানা যায় যে বর্তমানে এতদঞ্চলে কারখানার সংখ্যা

দেড় হাজারের কম হইবে না এবং ঐগুলিতে পঁচিশ হাজার লোক কাজ করে। সাধারণভাবে এই সমস্ত শিল্পে স্থানীয় লোকই নিযুক্ত আছেন, অনেকে আবার তিনচার পুরুষই এই কার্যে লিপ্ত থাকিয়া বংশানুক্রমে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। উপরোক্ত কারখানাগুলিতে বাৎসরিক কয়েক কোটী টাকা মূল্যের পণ্য তৈয়ারী হইয়া থাকে।

স্বভাবতই এই অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্য সারা ভারতের বিভিন্ন অংশে, সিংহল ও ব্রহ্মদেশেও প্রেরিত হইত। পাকিস্তান হওয়ায় এখানকার ব্যবসা অনেকাংশে ব্যাহত হইয়াছে। সারা ভারতের শতকরা ৬০ভাগ এই শ্রেণীর কারখানা পশ্চিম বাংলায় অবস্থিত এবং সারা পশ্চিম বাংলার শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী মাল এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চল হইতে পূর্বেই বলিয়াছি, সরকারী, বে-সরকারী, রেলওয়ে, মিউনিসিপ্যালিটী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শতকরা ৮০ ভাগ মাল সরবরাহ করা হইত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে বে-সরকারী তো দূরের কথা সরকারী রেলওয়ে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে কি এক জোনাল (zonal) বা প্রাদেশিকতার ছোঁয়াচে এখন আর হাওড়া লৌহ-শিল্পাঞ্চল সে "প্রেফিল্ড" নাই। যে স্থানে শিল্পের প্রতিষ্ঠান আছে এবং যে প্রতিষ্ঠানের চাহিদা আছে তথায় কাঁচামাল না যাইয়া লোকসংখ্যার অনুপাতে শিল্পপ্রতিষ্ঠান না থাকিলে বা কম থাকিলেও কাঁচামালের নূতন সরকারী বণ্টন-নীতিতে এখানকার শিল্প প্রায় ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে।

এতদঞ্চলের লৌহ-শিল্পকারখানাগুলিতে যে সকল বস্তু প্রস্তুত হয় তাহার একটা তালিকা দিলাম। এ তালিকা ছাড়াও অন্য বহুবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

এই কারখানাগুলিতে লেদ্, ড্রিল, প্লেনিং, শেপিং, মিলিং, গ্রাইণ্ডিং, শেয়ারিং, স্লিটিং, পেয়ারিং, পলিশিং, প্রেস্, ডাইস্, সারফেস্ প্লেট, ব্লক, ট্যাপ, ডাইস্, প্রিন্টিং প্রেস, লেদ্‌চক্, আখমাড়া কল, কাপড় কল, চট কল, চিনি কল, ময়দা কল, তেল কল, চাউল কল সমূহের পার্টস্ ও মেরামত, কয়লাখনি ও চাষাগানের উপযোগী দ্রব্যাদি, রবার শিল্পের, স্বর্ণ রৌপ্য ও অন্যান্য ধাতু-শিল্পের উপযোগী দ্রব্যাদি, কাগজ ও খড় কাটা কল, কাঁচ-শিল্পের উপযোগী মেসিন, সাবান ও ষ্টার্চিং মেসিন, ওজনের মেসিন, করাত কল, স্লিটিং লেদ্ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

রেলওয়ের উপযোগী লোকো, গাড়ী ও ওয়াগনের যাবতীয় ফিটিংস্ কাজের উপযোগী বহুপাতি, ব্যাণ্ডেজ মেসিন, রেল-সিলং ও ষ্ট্রেটিং মেসিন, বাঁকিং মেসিন, সুপারীকাটা কল, বিস্কুট তৈয়ারী কল, বাতি তৈয়ারী কল, পলিসিং মেসিন, পটারী মেসিন, বয়লার ফিটিংস্ ও মেরামত, বল্ট্, নাট, ওয়াসার, রিভেট, ব্রাইট্ ষ্টাফ্‌ট্, ক্রাঙ্ক ষ্টাফ্‌ট, ব্যাকেট, সিটার্স, কড়াই, ড্রাম, কপলিংস্, ডগ্ স্পাইকস্ ও ডগ্ নেলস্, ইলেক্‌ট্রিক ফিটিং ও এক্সেসরীজ্, এঞ্জিন মেরামত, ফিল্ড-প্লেটস্, ফিল্ড বোল্ট ও নাট, অগ্নি নিরাপক যন্ত্র, ক্লাচেস্, কর্ক, বেল মেকিং মেসিন, পেপার ও কার্ডবোর্ড কাটিং মেসিন, পেপার প্যাকিং মেসিন, পাইপ, পাইপ ফিটিংস্, পৌর সংস্থার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, পিনিয়নস্, পিক এক্স, ম্যামার ব্লক, পুলি, ব্রাকেট, প্লাগ (বিভিন্ন প্রকারের) ইন্‌জেকটর কোনস্, টার-বয়লার, জ্যাক্, টুলি, টেক্সটাইল্ মেসিনারী, কেবলস্ ও ড্রেণ্ট বক্স, চিমনী, কক্ ভ্যাল্ভস্, (ষ্টীম, ওয়াটার ও গ্যাস), কনডিউড পাইপ, কোলাপ্সিবল্ গেট, পাখা, ফিউজ বোড, গ্যাস ও ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডিং ভোস্ কনেকসন্ ও ফিটিংস্, হাইড্রণ্ট, ম্যানহোল কভার, রেনওয়াটার পাইপ্ ও ফিটিংস্, স্পেনারস্, স্পেডস, ট্যাবলেট মেকিং মেসিন, টেলিগ্রাফ ফোন ফিটিংস্, স্লিং, হুক, ফোরাস ও নন্ ফোরাস্ ম্যালাবেল ও এলয় কাষ্টিংস্ ইত্যাদি।

বর্তমানে হাওড়ার এই শিল্পে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে সেই সমস্ত সমস্যাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি।

(১) কারখানাগুলি সুসংবদ্ধ ভাবে বৈজ্ঞানিক পথায় প্রতিষ্ঠিত নহে, অধিকাংশ ঘরই কারখানার উপযোগী নহে, স্থানও অল্প।

(২) অধিকাংশ কারখানায় অতি পুরাতন ধরণের মেসিনে কাজ হয়, ইহাদের জীবনী-শ উৎপাদন

P11252

লক্ষিত এর কম যে বেশী ঘরে ও বেশী সময়ে কম উৎপাদন হয়

(৩) কাঁচা মালের প্রয়োজনের দশ ভাগের এক ভাগ আমদানী করা যায় কিনা সন্দেহ। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহ আদৌ সন্তোষজনক নহে।

(৪) নিয়ন্ত্রণের বাহিরে যাঁহারা মাল সংগ্রহ করেন তাঁহাদিগকে অধিক মূল্য দিতে হয়। নানাভাবে উৎপাদনের খরচ বেশী হয়, ফলে প্রতিযোগিতায় ইহারা উত্তীর্ণ হইতে পারেন না।

(৫) উচ্চ-শিক্ষা প্রাপ্ত কারিগর, সুপারভাইজর বা ইঞ্জিনিয়ার বলিতে গেলে নাই।

(৬) সেক্রেটারী, সরেজপাম্প বা টেষ্ট হাউস্ নাই।

(৭) উৎপন্ন দ্রব্যের পার্টস্ অতি পুরাতন পদ্ধতিতে তৈয়ারী হয়

(৮) স্যানেডানাইজিং ও ইলেকট্রোপ্লেটিং এর পুরাপুরি কারখানার একান্ত অভাব।

(৯) উৎপাদন মূল্য এত বেশী যে বৃহৎ শিল্প ও বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অক্ষম।

(১০) তৈয়ারী মাল ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের কেন্দ্র না থাকায় কম মূল্যে বিক্রয় করিতে হয়। যথাসময় অর্থ না পাওয়ায় আর্থিক অবনতি প্রায় সমস্ত কারখানাতেই লক্ষিত হয়

(১১) মূলধনের অভাব।

(১২) আবশ্যক আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব।

উপরোক্ত সমস্যাগুলি দেখিয়া নিরাশ হইলে চলিবে না। ইহার প্রতিকারের পন্থা প্রয়োজন এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করিলে বহু কিছু প্রতিকার হইবে আশা করা যায়।

(১) সর্ব্ব প্রথমে উপযুক্ত মূলধন সংগ্রহ করা দরকার। এ বিষয় জাতীয় সরকারকে অগ্রণী হইতে হইবে। প্রত্যেক সাহায্যপ্রার্থী কারখানাকে উপযুক্ত মূলধন সরবরাহ করা অবিলম্বে প্রয়োজন।

(২) আধুনিকতম যন্ত্রপাতি দ্বারা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কারখানাগুলিকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে। ইহাতে উৎপাদন ব্যয় কম হইবে এবং প্রতিযোগিতায় টিকিতে হইবে না।

(৩) কাঁচামালের প্রচুর সরবরাহ চাই। বর্ত্তমান নিয়ন্ত্রণ প্রথায় সুষ্ঠু সরবরাহ হওয়া সম্ভবপর নহে। যদি অসম্ভব না হয় কাঁচামালের নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(৪) উচিত মূল্যে উৎপন্ন মাল সমবায় বিক্রয় কেন্দ্র দ্বারা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারী ও বে-সরকারী যে কোন ব্যবস্থায় হউক মূলধন লইয়া বিভিন্ন কেন্দ্রে বিক্রয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য হাওড়া ম্যানুফাকচারার্স এসোসিয়েসনকে অগ্রণী হইতে হইবে।

(৫) বৈদেশিক মাল আমদানী নিয়ন্ত্রণ ও করভার শিথিল করিয়া রপ্তানী বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

(৬) Standarization বা প্রমিতকরণের দ্বারা উৎপন্ন শিল্পের মান নির্ণয় করা আবশ্যক।

(৭) নিয়মিত বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচারের ভাল ব্যবস্থা প্রয়োজন। অনেকেই এ বিষয়ে মাথা ঘামাইতে চান্ না, ইহার অভাব কিন্তু ব্যবসার সাফল্যের এক বড় অন্তরায়।

(৮) সরকারী করভার ও রিটার্ণ ষ্ট্যাটিস্টিক্স (Statistics) এর যতদূর সম্ভব বাহুল্য হইতে কারখানাগুলির পরিত্রাণ পাওয়া দরকার।

(৯) মালিক ও শ্রমিকগণের মধ্যে প্রীতির বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়োজন।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন রায়ের
GITA FOR ALL Rs. 1/8/ : গীতাসার ১।০
৪২, কবীর রোড : কলিকাতা-২৬

বিশল্যকরণী

কবিরাজ শ্রীভূপেশ দাশগুপ্ত

প্রকৃতির ভাণ্ডারে এত বিভিন্ন প্রকারের লতা গুল্মের সঞ্চয় আছে যে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহার মধ্যে এক সামান্য অংশের গুণাগুণ মাত্র আজ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানে আমাদের গোচরে আসিয়াছে। এখনও অসংখ্য বৃক্ষলতা আছে যা হয়তো অদূর ভবিষ্যতে মানুষের জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে উন্মীলিত হইয়া আর্ত্তজনের কল্যাণ সাধন করিবে।

এদেশের উর্ব্বর মৃত্তিকা ও অনুকূল জলবায়ুর গুণে বহু বৃক্ষ লতা গুল্ম বিদেশ হইতে আনীত হইয়া এদেশে জন্মাইয়া আজ এদেশের নিজস্ব হইয়া গিয়াছে। আয়াপান বা বিশল্যকরণীও সেইরূপ একটি গুল্ম জাতীয় বৃক্ষ। ইহার আদি জন্মস্থল আমেরিকার ব্রেজিল দেশে, কিন্তু আজ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মাইতেছে। মধ্য বাংলা ও পূর্ব্ব বাংলায় ইহা যথেষ্ট জন্মায়। বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলায় উদ্যান-কৃষি হিসাবে ইহার চাষ দেখিতে পাওয়া যায়। শিবপুরের বোটানিক গার্ডেনে ইহা যথেষ্ট জন্মায়।

অনেকে গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানে ফুলের কেয়ারির চারিদিকে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য ইহা রোপন করেন। গাছগুলি যখন বেশ ভাল ভাবে বৃদ্ধি পায় তখন সুন্দরভাবে সেইগুলি ছাঁটিয়া দিলে দেখিতে মনোরম হয়।

সংস্কৃত পর্য্যায়—বিশল্যকরণী।

দেশভেদে নাম—বাংলায়—আয়াপান, আসামে—অদলীপান, ল্যাটিনে—Eupatorium Ayapana.

গুণাগুণ ও আময়িক প্রয়োগ—ইহা বলকারক, উত্তেজক, ব্রণসন্ধায়ক, রক্তস্রাব নিবারক, রক্তাতিসার নাশক ও মৃদু বিরেচক।

বর্ণনা—ইহা গুল্ম জাতীয় বৃক্ষ, লম্বায় ২-৩ ফুট উচ্চ হয়, শাখাগুলি সরল ও রক্তাভ এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমে আবৃত থাকে; পত্র ৩" ইঞ্চি লম্বা ও ১" ইঞ্চি চওড়া হয়, স্পর্শে নরম ও মসৃণ অনুভূত হয়, পত্রে তিনটি মোটা শিরা থাকে ও ঈষৎ রক্তবর্ণ হয়। পত্র লম্বাকৃতি ও উভয় দিকে জোড়া ভাবে সন্নিবেশিত থাকে এবং পত্রের গোড়া ডাঁটায় মিলিত থাকে। ফুল বেগুণে রংএর হয়, গাছে উগ্র সুগন্ধ থাকে কিন্তু স্বাদে অত্যন্ত কটু হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ—ইহার পাতার রস ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। প্রথমে পত্রের গাত্রসংলগ্ন বালিমাটি জলে ধুইয়া লইয়া শিলে বাটিয়া বা হামান-দিস্তায় ছেচিয়া পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া রস গ্রহণ করিতে হইবে। তাজা অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে। মাত্রা—৪০ আট আনা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—মধু, চিনি বা মিশ্রি সহ।

বিভিন্ন রোগে ব্যবহার বিধি—

যক্ষ্মা ও ক্ষয় কাসে—যে ক্ষেত্রে কাসিলে বুক বাধা হয় ও সেই সঙ্গে রক্তবমন হয় সেই সকল ক্ষেত্রে—আয়াপানের রস ৪০ আনা হইতে আরম্ভ করিয়া অবস্থা বিশেষে ২ তোলা পর্য্যন্ত চিনি বা মিশ্রি সহযোগে কিংবা মধু সহ প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট উপকার হয়।

রক্তপিত্তে—উর্দ্ধমার্গ বা অধোমার্গের রক্ত নির্গমনে ইহার রস ৪০ আধ তোলা হইতে ১ তোলা মধু সহ প্রয়োগ করিলে অশেষ উপকার লাভ করা যায়।

হস্তপদাদির বাহ্যিক ক্ষতে—ইহার পাতার রস দ্বারা ধৌত করিয়া পত্র বাটিয়া বাঁধিয়া দিলে রক্তস্রাব ও ক্ষত নিরাময় হয়।

রক্তার্শে—প্রলেপ রূপে ইহা প্রয়োগ করিলে আশু সুফল লাভ করা যায়।

রক্তাতিসার রোগে—ইহার পাতার রস ৪০ আধ

তোলা হইতে তোলা দিনে দুইবার মধু সহ গ্রহণ করিলে রক্তাতিসার বন্ধ হয়।

আমাপানের রক্ত রোধক ক্ষমতা অতি আশ্চর্যজনক ; ইহা রক্তের ঘনীভূত হইবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, সেই হেতুই শরীরের আভ্যন্তরিক বা বাহ্যিক যে কোন ক্ষতে রক্ত নির্গমন বন্ধ করিতে ইহা অব্যর্থ মহৌষধ। অধুনা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমাপান হইতে আমাপিন ও আমোপানিন নামক যে দুইটি রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে নিহিত আছে ইহার রক্তরোধক ক্ষমতা। ক্ষয়রোগে ইহা বলকারক ও উত্তেজক ভেষজ ঔষধরূপে আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। বহুদিনের দুঃসাধ্য ক্ষত ইহার দ্বারা নিরাময় হয়। সর্পাঘাতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে (Pharm. Ind)। কলেরা রোগীর অবস্থা যখন অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হয়, শরীরের উত্তাপ ক্রমশঃ কমিয়া যায়, সেইক্ষেত্রে উত্তাপ বৃদ্ধির জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়। প্রবল প্রদাহিক জ্বরে যে ক্ষেত্রে নাড়ীর গতি কমিয়া আসে সে অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট উপকার করে। রক্তপিত্তে যখন প্রবল রক্ত বমন হইয়া শরীর নিস্তেজ হইয়া আসে তখন ইহা বারে বারে প্রয়োগ করিলে রক্ত বমন বন্ধ হয় ও নাড়ী সতেজ হয়।

ইহার গুণাগুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উক্তিটি উদ্ধৃতির যোগ্য :—

বিশল্যকরণী বল্যা ব্রণ সন্ধানকারিণী
বাতরেক্তোল্লিতশ্রাবং রক্তাতীসারমুক্তমম্।

পশ্চিম বাংলায় বাঙ্গালী শিল্পীর অনাদর ও অবনতি

পশ্চিম বাংলার বাঙ্গালী শিল্পীর অনাদর ও অবনতি সম্বন্ধে ১৯৫১ সনের জনগণনার যে মন্তব্যগুলি করা হইয়াছে তাহা অনুধাবনযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের জনসমষ্টির প্রায় এক-চতুর্থাংশ পুরবাসী। কিন্তু পৌরাঞ্চলের অধিবাসীদের হার বহিরাগতদের দ্বারা স্ফীত হইয়াছে। "১৯২১ সনের জনগণনার অধিকর্তা মন্তব্য করিয়াছিলেন যে নাগরিক জীবন বাঙালীর অপ্রিয় ; তাহা ঠিক নহে। পূর্বে বাংলার শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল গৃহশিল্প ও বাণিজ্যের জন্য ; কোন কোনটি প্রসিদ্ধ ছিল নদীতীরের বন্দর বলিয়া। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইহাদের উন্নতি অব্যাহত ছিল। ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে বাঙলার শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানিতে বাধা সৃষ্টি হইবার পর বহির্বাণিজ্যের অতি দ্রুত অবনতি ঘটে। বিলাতী জিনিষে বাঙলার বাজার ছাইয়া গেলে দেশেও স্বদেশী দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাইল। বিপন্ন ব্যবসায়ী ও শ্রমশিল্পিগণ গ্রামে ফিরিয়া কৃষিকে জীবিকারূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। ভূমির উপর চাপ বাড়িয়া গেল। ঘড়ির কাঁটা যেন পিছন দিকে ঘুরাইয়া দেওয়া হইল। উদ্বৃত্ত কৃষিজীবিগণ অকৃষি উপজীবিকা অবলম্বন করিয়া ভূমির চাপ হ্রাস করিবে ইহাই সাধারণ নিয়ম। এ পথে বাঙলা দেশ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যনীতির ফলে কেবলমাত্র অগ্রগতি বন্ধ হইল না, দেশ বহুদূর পশ্চাদপসরণ করিল।

"সময় সময় বলা হইয়া থাকে যে কৃষিক্ষেত্রে প্রচুর অর্থাগমের জন্য অন্য রাজ্যের লোকের মত বাঙালী কল কারখানায় কাজ করিতে ইচ্ছুক নহে, বরং উহাকে অবজ্ঞার চোখে দেখিয়া থাকে। বাঙলার পূর্ব শিল্প-সমৃদ্ধি হইতে প্রমাণিত হয়, বাঙালী স্বহস্তে হাপরে বা অন্য কোন শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত হইতে অনিচ্ছুক ছিল না। অদ্যক্ষেত্রে যাহা গুণ বলিয়া গণ্য হয়, বাঙালী শ্রমিকের তাহাই দোষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"বাঙালী শ্রমিক সুদক্ষ শিল্পী, ভূমি উৎপাদন অপেক্ষা স্বকীয় পরিকল্পনা রচনা করা এবং তাহা স্বাধীনভাবে রূপায়িত করিবার ক্ষমতা তাহার অধিক। রাজ্যের বৃহৎ শিল্পে বাঙালীর শক্তির পরিচয় দিবার ক্ষেত্র অপ্রচুর। যে কাজে সূক্ষ্ম কারিগরির প্রয়োজন, সেখানে বাঙালী নিযুক্ত হইয়া থাকে।" ("আমার দেশ" হইতে)

দেশের কথা

প্লাবন ও প্লাবনের ক্ষতি

প্লাবনে এ বছর পশ্চিম বাংলায় ২৪-পরগণায়, মেদিনীপুরে ও অন্যান্য যায়গায় লোকের দুর্দশা খুব বেড়েছে। ছেলেমেয়েদের পড়বার স্কুল-ঘরও অনেক স্থানে পাকা নয় বলে ঝড়ে পড়ে গেছে। সরকারী হিসাবে দেখা যায় ৩ লক্ষের মত শিশুদের পড়াশুনার ব্যাঘাত হবে যদি না স্কুলের ঘরবাড়ীর শীঘ্র সংস্কারের ব্যবস্থা হয়। সাম্প্রতিক বন্যায় ত্রিপুরা রাজ্যে যে ক্ষতি হয়েছে, তার পরিমাণ হবে প্রায় ১½ কোটি টাকার মত। বাংলা ছাড়া, আসাম, বিহার প্রভৃতি অংশে প্রায় প্রতি বছরের মত এবারেও বন্যার রুদ্র রূপ দেখা দিয়েছে।

প্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে হয়, কিন্তু নিয়মিত তার দুঃখ পাওয়াটা মানুষের অক্ষমতা বা নিশ্চেষ্টতার জন্যই হয়। দুর্গত লোককে সাহায্য করাটা ভাল, কিন্তু অন্য উন্নত দেশে যেটা ক্বচিৎ হয় সেটা যদি আমাদের দেশে নিত্য হয়, তা'হলে তাকে দূর করার সংঘবদ্ধ চেষ্টা করাটাই প্রয়োজন। বিজ্ঞানের পথে প্রকৃতির খেয়ালকে সংযত করা যায়, তা থেকে নতুন সম্পদ সৃষ্টির পথও বাহির করা যায়।

বন্যাকে আমরা অনেক সময় বাঁধ দিয়ে আটকাতে চেয়েছি। এতে আমাদের এ সম্বন্ধে জ্ঞান বা দূরদৃষ্টি প্রমাণ হয় নি। বাঁধে সাময়িক বন্যার প্লাবন বন্ধ করা গেলেও স্থায়ী ক্ষতি হয় বেশী। ১৯৫১ সালের বাংলার জনগণনার সাধারণ বিবরণী হ'তে সংকলিত "আমার দেশ" পুস্তকে বলা হয়েছে :—

"অবিবেচনাপ্রসূত কার্য্যের ফলে নদীর দেশে নদী হইয়াছে অভিসম্পাতস্বরূপ। বহু বাঁধ, হঠকারিতার সহিত স্রোতের স্বাভাবিক গতিতে হস্তক্ষেপ, পরিণাম চিন্তা না করিয়া নদীর উৎপত্তিস্থলের ও নদীতীরের বন ধ্বংস এবং স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া নদীর গতির পরিবর্তন সাধন, এই শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী।"

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার কথা আছে। তাতে দেখা যায় যে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির কথা সব দিক ভাল করে বিবেচনা করে একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা এর আগে হয় নি। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নদীর জলকে বিবিধ কাজে লাগাবার জন্য যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করার ব্যবস্থা হয়েছিল, তাতে বন্যাও নিয়ন্ত্রিত হবে, এটা ভাবা গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৯ সালে বিহার, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে যে অসম্ভব প্লাবন হয়, তাতে সেচ বা তড়িৎ শক্তি উৎপাদনের জন্য নদী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছাড়াও বন্যাকে সংযত করা ও কাজে লাগানোর জন্য পৃথক সংস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় বন্যার ক্ষতি নিবারণের জন্য, বলা হয়েছে, নানা কাজে ৮ কোটি টাকার মত সমগ্র ভারতে সম্ভবতঃ খরচ হয়েছে। কিন্তু এতে স্থায়ী কল্যাণ কতটা হয়েছে বলা কঠিন।

সামনের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৬০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কাজে পরিণত করার জন্য। কিন্তু এই রকম স্কিম বা ব্যবস্থার জন্য যে তথ্যাদি অত্যন্ত প্রয়োজন, তা এখনও সংগৃহীত হয় নি। এই তথ্যাদি সংকলনের জন্য আপাতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করা হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের ৫ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। টাকার অংকে পরিকল্পনাগুলি আমাদেরকে আশ্বস্ত করে; কিন্তু ভয়ও তাতে পাই। এত টাকা সাধারণকেই ত নানা ভাবে দিতে হবে। সাধারণের অবস্থা, আমরা যা দেখি, ক্রমশঃ খারাপের দিকে, অদূর ভবিষ্যতে ভাল হবে তার লক্ষণও দেখা যায় না। সাধারণ এত অর্থব্যয়ের বোঝা বইবার শক্তি পাবে কোথা থেকে? আর এক ভয়—টাকার খরচে কি সে সংঘবদ্ধ ব্যবহার

করা হবে যাতে দেশের প্রতীক সাধারণের প্রতি টাকার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়।

বনজ সম্পদ ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণ

বন্যা-নিয়ন্ত্রণের এক পথ—দেশের বনজ সম্পদ বাড়ান। আমরা বনজ সম্পদের মর্যাদা যোগ্যরূপ ভাল করে জানি না। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিতে, দারিদ্র্যের চাপে, গাছ কেটে বনকে চাষের মাঠে পরিণত করেছি। জনসংখ্যার হিসাবে জমির পরিমাণ আমাদের দেশে এমনি-ই কম। আমাদের দেশে মাথা পিছু জমির ভাগ পড়ে ২ একর বা ৬ বিঘার মত; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মাথা পিছু জমির পরিমাণ এর ৯ গুণ; সোভিয়েট দেশসমূহে ১২ গুণেরও বেশী। মরুভূমি, পাহাড় প্রভৃতি অকল বাদ দিলে বন-বসতিও খুব বেশী; গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে প্রতি বর্গ মাইলে লোকের বাস ৮৩২ আমাদের দেশে চাষ-যোগ্য জমির প্রায় সবটাই চাষ করা হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তার অর্দ্ধেকের বেশী চাষের জন্য দরকার হয় না। সাম্প্রতিক হিসাবে দেখা গেছে যে ভারত এ বিষয়ে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু এ অবস্থাতে বনজ সম্পদকে বাড়ানোর প্রয়োজন যে আরও বেশী তা জানা দরকার। বনসম্ভার বন্যাকে সংহত করে, ভূমির ক্ষতি নিবারণ করে, আর জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়ে দেয়।

কয়েকদিন আগে এক সাময়িক পত্রিকায় বনসম্ভার বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ একজন বাংলা ও সাধারণ ভাবে উত্তর ভারতের বন্যা নিয়ন্ত্রণে বনজ সম্পদ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদেরকে সচেতন করতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেন, বন্যার জলকে নিয়ন্ত্রণের নামে নষ্ট হতে দিলে চলবে না। বনসম্ভার দেশে বাড়লে বন্যা স্বাভাবিক ভাবে শুধু নিয়ন্ত্রিত হয় না, দেশের জমি থেকে বেশী ফসলেরও ব্যবস্থা হয়। "Soil Conservation" বা ভূমি সংরক্ষণ সম্বন্ধে একখানি বৈজ্ঞানিক বইয়ের ভূমিকার অংশ তুলে দিয়ে এই লেখক যা বলেছেন, তা এই :—

"Good and permanent agriculture depends on good and permanent forests. It is a dangerous, and indeed fatal delusion to imagine that the prime essential of land use—for food production—can survive unless Government and farmer alike give jealous attention to the non-farm lands which support or destroy farm enterprise."

অর্থ :—ভাল ফসল দীর্ঘদিন জমি থেকে পেতে হ'লে বনসম্পদ স্থায়ী ও ভাল ভাবে যাতে রক্ষা হয় তাতীয় সরকার এবং কৃষিজীবি উভয়কেই তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বৃথা দরকার যে চাষের জমির—যা থেকে খাদ্য পাই—প্রাণশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসবেই যদি যে জমিতে চাষ করি না অর্থাৎ যেটা আমাদের বন অংশ তার সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা না করি।

বাংলার বনজ সম্পদ কি করে আমরা নষ্ট করেছি তার উল্লেখ "আমার দেশে" আছে :—

"উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও দার্জিলিং, তরাই ও ডুয়ার্সে, কোচবিহারের দিনহাটা ও সদর মহকুমায়, পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জে, মালদহের ভালুকা, রাতুয়া ও মানিকচকে, বীরভূমের মল্লহাটী, রাজনগর, মহম্মদবাজার ও হুবরাজপুর থানায়, আসানসোল মহকুমায়, বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাংশে, মেদিনীপুর জেলায় কাঁসাই নদীর পশ্চিমে এবং সুন্দরবনে নিবিড় অরণ্য ছিল।.....কিন্তু গত একশত বৎসরের ইতিহাস সিকিম, ভুটান ও দার্জিলিং পাহাড়ের বন জংলেরই ধারাবাহিক কাহিনী। চাষের জমির দ্রুত বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম দিনাজপুর ও ও মালদহের বৃক্ষরাজির উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছে। প্রথম বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ভের পর বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের বনের জংলকার্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়াছে। গত এক শতাব্দীতে সুন্দরবনের সহস্রাধিক বর্গ মাইল অরণ্যমুক্ত করিয়া আবাদযোগ্য করা হইয়াছে।"

এই বনজংলের কাজ এখনও চলেছে। "ধান বাড়াও"-এর জন্য সোজা পথ না পেয়ে বহু বনকে আমরা ১৯৪০ সনের দুর্ভিক্ষের পরে 'নিশ্চিহ্ন' করেছি।

বন-মহোৎসব আজকাল হয়। অনুষ্ঠান কবিত্বময় ও প্রীতিপূর্ণও বটে। আর এই বন-মহোৎসবে কর্তৃপক্ষীয়দের যোগদানের ছবি যখন কাগজে বাহির হয় তখন আমাদের

সাধারণ দুর্বল অর্থনিকা পুষ্টিলাভও করে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে বনসম্পদ রক্ষা বা বৃদ্ধির কাজে কতটা এ সাহায্য করছে বলা কঠিন। কিছুদিন থেকে বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে কয়লার অভাবে গরীব লোকেরা বাধ্য হয়ে নিজেদের দামী বা ফলন্ত গাছও কেটে জ্বালানির কাজে ব্যবহার করছেন। এ সম্বন্ধে আইনের নিষেধ হয়ত আছে, কিন্তু অভাব আইনের বাধা মানে না। বন-মহোৎসবের মাঝে ফলন্ত গাছ কেটে স্থানে স্থানে এরূপ মুক্তের ঘড়ি-উৎসবও চলেছে—এই মর্মন্তুদ সত্যটা বনজ সম্পদ রক্ষা ও বাড়ানোর প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল।

দেশের লোকের আয় কি বেড়েছে ?

দেশের সাধারণের আয় বেড়েছে কিনা বলা শক্ত। এটা সত্য, যাদের আয় আগে ভাল ছিল, তাদের হয়ত ভালই বেড়েছে, যাদের কম ছিল, তাদের বোধহয় আরও কমেছে।

পরিকল্পনার প্রথম পাঁচ বছরে আমাদের কি উন্নতি হয়েছে সংক্ষেপে তা এভাবে বলা হয়েছে :—

জাতীয় আয় বেড়েছে	শতকরা	১৮
খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে		২০
তুলা ও তৈলবীজ বেড়েছে যথাক্রমে	„	৪৫ ও ৮
সেচের জল পায় এমন জমি বেড়েছে		৭০ লক্ষ একর

শিল্প-প্রসার হয়েছে—

১৯৪৬=১০০ ধরলে ১৯৫১ সালে ১১৭

এবং ১৯৫১=১০০ ধরলে ১৯৫৫ সালে ১২২

বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৪৫০০০ লক্ষ কিলোওয়াট, সিমেন্টের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ১৮ লক্ষ টন ; এ ছাড়া প্রয়োজনীয় বড় শিল্পোদ্যম সরকার যা গড়ে তোলবার ভার নিয়েছেন তার কতকগুলি সম্পূর্ণ হয়েছে ; আর ছোট শিল্পে সাহায্যতা হয় এমন বড় বড় শিল্প, ইংরেজীতে যাকে capital goods বলে, ও সাধারণের ব্যবহারের বস্তু উৎপাদনের শিল্প, ইংরেজীতে যাকে consumer goods বলে—এই দুই ক্ষেত্রেও শিল্পপতিরা নতুন আয়ও অনেক অর্থ নিয়োগ করেছেন। এসব দেখলে ও সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সার্থক হয়েছে বা সফলতার পথে দেশকে বেশ এগিয়ে নিয়েছে, একথা বলা যায়—বিবৃতিতে এই মন্তব্য করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও দেখি, সম্পদ-সৃষ্টির চেষ্টায় পাঁচ বছরে অর্থনিয়োগ হয়েছে ৩,১০০ কোটি টাকা। ১৯৫০-৫১ সালে এই অর্থ-নিয়োগ বা investment-এর পরিমাণ ছিল ৪৫০ কোটি টাকা; ১৯৫৫-৫৬সালে হয় ৭৯০ কোটি টাকা। জাতীয় আয়, সম্পদ সৃষ্টিতে অর্থনিয়োগ ও ব্যয়ের হিসাব

(১৯৫০-৫১ ও ১৯৫৫-৫১)

১৯৫২-১০-এর)	১৯৫০-৫১
মূল্যের হিসাব)	কোটি টাকা
জাতীয় আয়	৯,১১০
সম্পদ সৃষ্টিতে অর্থনিয়োগ	৪৫০
অর্থ-নিয়োগে আয়ের অংশ	৪'৯
জাতীয় আয়ের মান	
মাথা পিছু আয়ের গড়	
„ ব্যয়ের গড়	১০০ ১০৯

এই সব থেকে দ্বিতীয় পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রামাণ্য গ্রন্থে এই অভিমত ব্যক্ত হয়েছে যে ১৯৫০-৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যখন আরম্ভ হয়, তার অপেক্ষা দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে অর্থাৎ এখন দেশের অর্থনীতিক অবস্থা সুস্পষ্টরূপে ভাল।

অর্থ-বিজ্ঞানীদের কাছে উপরের এই সকল অঙ্কের যে অর্থই থাক না, সাধারণের জীবনে—অঙ্কের হিসাবে কেবল নয়, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সম্পদ বলি না কিন্তু সামগ্রিক স্বাচ্ছন্দ্যের লক্ষণও দেখা না দিলে মনে আশার সঞ্চার হয় না। সাধারণের দিকে তাকিয়ে আচার্য বিনোবাজী দরদী মন তাই বলেছে—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ব্যর্থ, দ্বিতীয় পরিকল্পনাও সম্ভব সমান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কথাটা একেবারে মিথ্যা বোধহয় বলা যায় না।

অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশের বিশ্লেষণে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের সাধারণের জীবনে যথেষ্ট উন্নতি স্পষ্টরূপে দেখা গিয়েছে—এ কথা জোর করে বলা হয় নি। তিনি বলেছেন—চোখে পড়ে এমন অগ্রগতি কোন কোন দিকে হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য

দামোদর প্রভৃতি বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনাগুলি। বিভিন্ন বিজ্ঞান ও শিল্প সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ১৯টি জাতীয় গবেষণাগারও স্থাপিত হয়েছে। সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনা হতে—কম্যুনিটি প্রোজেক্ট ও ন্যাশনাল এক্সটেন্সন সার্ভিস যার অন্তর্গত— গ্রামের জীবনের আমূল পরিবর্তনের আন্দোলন হয়ত জন্ম নিতে পারে। কিন্তু জাতীয় উন্নতি পরিকল্পনার পথেই সুদৃঢ়ভাবে করে যেতে হবে—এই বোধটাই বোধহয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সব চাইতে বড় লাভ।

যে বইয়ে জাতীয় উন্নতির উপরের অঙ্কসমূহ ও আশার ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, সেই বইয়ে-ই সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে :—Notwithstanding these gains, the fact remains that living standards in India are among the lowest in the world.—অর্থাৎ উল্লিখিত এই সকল উন্নতি সত্ত্বেও বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে এখনও আমাদের দেশের সাধারণের জীবন-যাত্রার মান পৃথিবীর অন্য দেশসমূহের তুলনায় প্রায় সব নীচে। আরও বলা হয়েছে—আমাদের দেশে সাধারণের খাদ্য-পুষ্টি, মানুষের পুষ্টিকর খাদ্যের যে মান ধরা হয়, তার চাইতে অনেক কম; মাথা পিছু বছরে ১৬ গজ কাপড়ের বেশী গায়ে-বরণের জন্য এরা পায় না—অনেকে যা পায় তা আরও কম; থাকবার বাড়ী বলতে আমাদের যা, তা সভ্যজাতির তুলনায় হয়ত বাসযোগ্য বিবেচিত হবে না; ৬-১১ বছরের ছেলেমেয়েদের মাত্র প্রায় অর্দ্ধেক মত কোন স্থলে পড়তে পায়—অন্যদেশে প্রত্যেক ছেলেমেয়ে এই সুযোগ পায়। আবার ১১-১৪ যাদের বয়স তাদের মধ্যে লেখাপড়া করতে পায় পাঁচ ভাগের একভাগ মাত্র, অর্থাৎ শতকরা ২০ জন। পড়ে মাসে ১৩৲ টাকার মত মাথাপিছু প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য জিনিষ কিনতে পারে দেশের অর্দ্ধেক লোক। আমাদের দেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ইত্যাদি যা ব্যবহার হয় তা আমেরিকার ৭০ ভাগের ১ ভাগ; ইস্পাতের ব্যবহার আমেরিকার তুলনায় ১২২ ভাগের ১ ভাগ; আমাদের দেশে শক্তি ও ইস্পাতের মাথাপিছু ব্যবহার জাপানের তুলনায় $\frac{1}{8}$ ও $\frac{1}{১৮}$ অংশ মাত্র। ভারতে বছরে ৪৫/৫০ লক্ষ লোক বাড়ছে; তাতে এই মানও বজায় রাখা শক্ত। আর্থিক উন্নতির কোন কার্য্যকরী পরিকল্পনা তাতে আরও কঠিন হয়। যত লোক বাড়ে কাজের চাহিদা সেই হারে বাড়ে না—বেকারের সংখ্যা স্ফীত হতে থাকে।

এই চিত্র খুব আশার চিত্র নয়।

আয়ের অসাম্য বেড়েছে

আমরা দেশের লোকের আয় বেড়েছে কিনা এ প্রশ্ন তুলেছিলাম। আয় বাড়লে উপরের এই ছবি এত নির্মম ভাবে ফুটে উঠ্‌ত না। তা সত্ত্বেও, অর্থবিজ্ঞানীরা বলবেন অঙ্কে যখন বলছে আয় বেড়েছে তখন স্বীকার করতে হবে। কিন্তু বাড়টাও কত বেড়েছে, এবং সম্প্রতি তার উর্দ্ধ গতির যে ভয়াবহ লক্ষণ দেখা গিয়েছে, তার কথা ধরা হচ্ছে না। আমরা সাধারণে দেখি আয়ের অসাম্যটা দ্রুত বেড়েছে এবং আরও বাড়ছে। ছোট বা মাঝারি কারখানা বা কারবার ভাল চলে না। চলে খুব বড় রাস্তায় যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি পৌঁছিয়েছে। আর বড় বড় কারখানার সাধারণ শ্রমিকে ও কর্তৃপক্ষে আয়ের পার্থক্যটা খুব বেশী। ম্যানেজিং এজেন্ট হিসাবে দু'জন যেখানে মাসে প্রায় লক্ষ টাকা পান সেখানে তলার দিকের শ্রমিক মাসে শ' টাকা বা তারও ক'ম পান—এ দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নয়। যৌথ কারবারের আইনের ধারাগুলি সাধারণের চোখ দিয়ে দেখ্‌লে দেখা যাবে যে কারখানা-কারবারে অংশীদার ও পরিচালকরাই আসল; যাদের শ্রমে সম্পদ উৎপন্ন হয় খাটতে রাজী থাকে এমন বেতন তাদেরকে দিলেই হয়। কোম্পানী আইনের নতুন সংশোধনে সরকারও যে এই সম্পদের বড় অংশীদার এ'কথাটাই আগের থেকে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৮৮০০ কোটি টাকা মত প্রয়োজন হবে। তা সংগ্রহ করবার যে হিসাব দেওয়া হয়েছে, তাতে নতুন কর-বৃদ্ধি খাতে ধরা হয়েছে ৪৫০ কোটি টাকা। পুঁজিপতিদেরকে নতুন নতুন ব্যবসায়ে পুঁজি খাটিয়ে বেশী লভ্যাংশ আহরণের জন্য যথেষ্ট সুযোগ সে কারণে দিতে হবে। এঁদের মতে তাতে লোকের কর্ম-

সংস্থান বাড়বে—কর বাড়িয়ে সরকারের আয়ের পথও প্রশস্ত হবে। পুঁজিবাদে শিল্প-প্রসারের এটাই প্রশস্ত পথ। কিন্তু এতে আর্থিক অসাম্য কমে না। কর্মসংস্থান যা বাড়ে জন-সংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে তা অনেকটা খেয়ে যায়। বড় বড় কারখানায় নতুন আধুনিক কল বসিয়ে লোকের প্রয়োজনও সংখ্যায় কমিয়ে রাখা হয়। এ পথে শিল্প-প্রসারে বেকারের সংখ্যা সেজন্য অনেক সময় কমে না, বরং বেড়ে যায়। গত পাঁচ বছরের শিল্প-চেষ্টায় এই পরিণতির দিকেই আমাদেরকে নিয়ে চলেছে। হিসাবে দেখা যায় বেকারের সংখ্যা সহরাঞ্চলে—আর সহরই দেশের শিল্পাঞ্চল—গত ২।৩ বছর বেড়ে চলেছে। অধ্যাপক মহলানবীশের সাম্প্রতিক হিসাবমত সহরাঞ্চলে ৫০ লক্ষ কর্মক্ষম লোকের কোন কর্মসংস্থান নেই।

পুঁজিবাদের পথে আর্থিক উন্নতি ও দেশের বাস্তব অবস্থা

পুঁজিবাদের পথে আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করলে স্থায়ী কল্যাণ আজকের দিনে ও আমাদের অবস্থায় কতটা হবে, সেটা চিন্তা করে কর্মপদ্ধতি স্থির করা প্রয়োজন। দেশের অবস্থাটা ভাল করে জানলে এরূপ চিন্তার প্রয়োজন বুঝা সোজা হবে। অধ্যাপক মহলানবীশের বিবৃতি থেকে আমরা দেশের বর্তমান বাস্তব চিত্রটা বিশদভাবে সেজন্য দিতেছি। অধ্যাপক মহলানবীশ 'বর্তমান অবস্থা' শীর্ষক অধ্যায়ে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাঁর সাম্প্রতিক বিবৃতিতে বলেছেন :—

"ভারতের আয়তন অতি বিস্তৃত—উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় ২০০০ মাইল, আর পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রায় ১৭০০ মাইল। সোয়া দশলক্ষ বর্গ মাইলের বেশী এর ভূমির পরিমাণ। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে অনেক ধর্মের লোক বাস করে; সংখ্যা হিসাবে ৯টী বড় ধর্মাবলম্বীর বাস—হিন্দু (৩০ কোটি), মুসলমান (৪ কোটি), খৃষ্টিয়ান (৮০ লক্ষ), শিখ (৬২ লক্ষ), আদিবাসী (১৭ লক্ষ), জৈন (১৬ লক্ষ), বৌদ্ধ, পারসীক, ও ইহুদী (একত্রে ৩ লক্ষ)। ১২টি প্রধান মাতৃভাষা এই বিরাট জনসংঘের। বাংলা, হিন্দি, উর্দু, হিন্দুস্থানি, তেলেগু, তামিল, মারাঠি, গুজরাটি, কানাড়া, মালয়ালম, ওড়িয়া ও আসামী। এ ছাড়া পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী ও সংস্কৃতেরও উল্লেখ করতে হয়। জনসংখ্যা ৩৮ কোটি, আর বছরে ৪৫ লক্ষ মত লোক বৃদ্ধি হচ্ছে।

"আমাদের দেশে যা উৎপন্ন হয়, তার অর্দ্ধেক ভাগ মত কৃষিজাত; জমি থেকে শর্করা, বস্ত্র প্রভৃতি দেশের শিল্পে কাঁচামাল যে কেবল পাওয়া যায় তা নয়, আমাদের রপ্তানীর বেশীর ভাগই কৃষিজাত দ্রব্য। আমাদের চাষ হয় তিন হাজার লক্ষ একর জমিতে (মোট জমির পরিমাণ ৮১১০ লক্ষ একর); ৫০০ লক্ষ একর আরও জমি চাষযোগ্য, ৭০০ লক্ষ একর জমি চাষের যোগ্য নয়। খাদ্যশস্য উৎপাদনই প্রধান কৃষিকর্ম। শতকরা ৮৫ ভাগ জমিতে খাদ্যশস্য চাষ করা হয়। বাহিরে যা যায় তার মধ্যে চা ও পাট প্রধান।

"গরুর সংখ্যা বেশী, কিন্তু গো-ধনে আমরা ধনী নই। অন্য দেশে গরু পিছু গড়ে বছরে দুধ পাওয়া যায় ২০০০ থেকে ৭০০০ পাউণ্ড, অর্থাৎ দিনে গড়ে ২৷৷০ সের থেকে ১৯০ সের মত; আমাদের দেশে গরু পিছু দুধ পাই এর ৫ ভাগের এক ভাগ—দিনে গড়ে ৷৷০ সের মত।

"আমাদের বনের পরিধি ২ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গ মাইল; সরকারের এর থেকে আয় হয় বছরে প্রায় ১০ কোটি টাকা। (কিন্তু আমরা ক্রমশঃ বহু অংশকে অরণ্যহীন করেছি।)

"আমাদের প্রায় সব জমিতে চাষ করেও খাদ্যের পূরো প্রয়োজন মেটাতে পারি কেবল তখনই যখন বৃষ্টি ঠিকমত হয়। ১৯৪২ থেকে দশ বছর আমাদের খাদ্যশস্য বাহির থেকে আনতে হয়েছে—গড়ে বছরে ২০৩০ লক্ষ টন মত; ১৯৪১ সালে আনতে হয়েছিল প্রায় ৫০ লক্ষ টন। গত কয়েক বছর ভাল ফসল হওয়ায় বাহির থেকে খাদ্য শস্য আনার প্রয়োজন অনেকটা কমে যায়। কিন্তু লোক-সংখ্যা যে হারে বাড়ে, খাদ্যের উৎপাদন তার চাইতে বেশী হারে বাড়িয়ে তুলতে না পারলে এবং একটা স্থায়ী উদ্বৃত্তের অবস্থায় পৌঁছিতে না পারলে বাহির থেকে খাদ্যশস্যের আমদানীর উপর নির্ভর কিছুটা করতেই হবে।

"বৃষ্টি কম হ'লে কোন কোন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ পর্যন্ত দেখা দেয়। আমরা যত জমিতে চাষ করি তার মধ্যে শতকরা ১৭ ভাগ মাত্র সেচের সুবিধা পায়; বাকী জমি অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের দিকে বছরের পর বছর তাকিয়ে থাকে। সেচে ফসল ভাল হয়; দ্বিগুণ থেকে চারগুণ বাড়ে। আমাদের ৫১০ লক্ষ একর মাত্র জমি এখন সেচের জল পায়; তার মধ্যে নদীর জল থেকে পায় ২১০ লক্ষ একর জমি; ১৮০ লক্ষ একর জমির সেচের জল জোগান দেয় পুকুর বা কূপ প্রভৃতি থেকে। আমাদের মহাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় বড় ছোট অনেকগুলি নদী; ভারতের নদী-গুলি দিয়ে বছরে যত জল প্রবাহিত হয় তার হিসাব হচ্ছে প্রায় ১৬০০০ লক্ষ একর-ফুট। এই বিশাল জল-প্রবাহের শতকরা ৫'৬ ভাগ মাত্র সেচের কাজে আমরা লাগাই, বাকীটা কোন কাজে না লেগে আপনি বয়ে যায়। সেচের ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আমরা যে নতুন বড় পরিকল্পনা-গুলিতে হাত দিয়েছি তাতে আরও ১৭০ লক্ষ একর জমি সেচের অন্তর্ভুক্ত হবে; কিন্তু তাতেও কেবল নদী-প্রবাহের সবটার ১৪ ভাগেরও কম আমরা কাজ লাগাতে পারব।

"এতো গেল মোটামুটি কৃষি ও তার আনুষঙ্গিক কথা। প্রাকৃতিক যে যে বস্তু থাকলে দেশে বড় করে শিল্প-সম্পদ গড়ে তোলা যায়, ভারতে তা অপ্রচুর নয়। ভাল জাতের কাঁচা লোহা বা আয়রন ওরের সঞ্চয় পৃথিবীর মধ্যে ভারতের সব চাইতে বেশী। কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, এলু-মিনিয়মের জন্য বক্সাইট, মোনাজাইট (থোরিয়মের জন্য), মাইকা, ক্রোমাইট প্রভৃতিতেও প্রকৃতির দান আমাদের দেশে কম নয়; সোনা, তামা ও অন্যান্য ধাতুও কিছু আছে। ৩৮০ লক্ষ টন কয়লা গড়ে আমাদের খনিগুলি থেকে বছরে তোলা হয়। ম্যাঙ্গানিজে ভারত পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। আমাদের বক্সাইটের পরিমাণ ২৫০০ লক্ষ টন হবে। মাইকা বা অভ্রে আমাদের প্রতিযোগী কেউ নেই বললে হয়। পৃথিবীর অভ্রের চাহিদার ৭০-৮০ ভাগ আমাদের দেশ মেটায়। পেট্রোল কিছু আছে, কিন্তু পেট্রোল পাওয়া যেতে পারে এমন সব জায়গায় অনুসন্ধান ভাল করে এখনও হয় নি। খনিজ সম্পদের জন্য অনুসন্ধানের কাজ চলছে, কিন্তু এখনও কাজ অনেক বাকী আছে।

"কারখানার প্রসার বা উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণে এখনও বেশী নয়। কারখানা বলতে বোঝায় সে সব প্রতিষ্ঠান যেখানে অন্ততঃ ১০ জন লোক নিয়মিত কাজ করে ও বিদ্যুতের শক্তির ব্যবহার হয়; কিম্বা হাতে বা পায়ে চলা যন্ত্র হ'লে যেখানে অন্ততঃ ২০ জন নিয়মিত কাজ করে। আমাদের যত জিনিষ উৎপন্ন হয় তার ১০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র এখন এই সব কারখানায় হয়। জাতীয় অর্থাগমের শতকরা ৮-৭ অংশ মাত্র এদের দ্বারা সম্ভব হয়। এইসব কারখানায় নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ৩০ লক্ষেরও কম, অর্থাৎ আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ১ জনেরও কম। কারখানার সংখ্যা কমবেশী ত্রিশ হাজার; কিন্তু তার মধ্যে পঁচিশ হাজারই ছোট; মাত্র ১০০০ কারখানাকে বড় বলা যায়। মানুষের নিত্য ব্যবহারে লাগে এমন জিনিষই এসকল অধিকাংশ কারখানায় উৎপন্ন হয়। ইস্পাত, সিমেন্ট, রাসায়নিক সার নির্মাণের কারখানা বা শক্তি (কয়লা, বিদ্যুৎ) উৎপাদনের ব্যবস্থা জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত কম। অর্থবিজ্ঞানে যাকে producer goods বলে অর্থাৎ যা থেকে অন্য বহু জিনিষ উৎপন্ন হয়, তা আমাদের উৎপন্ন শিল্পের ৬ ভাগের ১ ভাগ মাত্র। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শিল্প-চেষ্টার ফলেও producer goods অপেক্ষা consumer goods বা ব্যবহারের জিনিষই বেশী তৈরী হয়।

"বস্তুতঃ ভারত ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দেশ; বড় শিল্প-কারখানার প্রতিষ্ঠা সাম্প্রতিক ব্যাপার। আমাদের আর্থিক জীবনের ভিত্তির মূল হচ্ছে ছোট ছোট শিল্প-কেন্দ্র যেখানে মালিক ও শ্রমিক একই ব্যক্তি। কুটির-শিল্পে এখনও কৃষির সঙ্গে নিয়োজিত আছে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ লোক। কিন্তু দারিদ্র্য আমাদের ঘিরে আছে। খুব গরীব, অর্থাৎ আজকালের হিসাবে মাসে ১০৲ টাকাও উপার্জন নেই, এমন লোকের সংখ্যা আমাদের ৫ কোটির মত হবে—অর্থাৎ জনসংখ্যার ১/৯ অংশ।

"আর্থিক দারিদ্র্য শিক্ষার ক্ষেত্রেও ফুটে উঠেছে। গড়ে ১০০ জনের মধ্যে অক্ষর পরিচয় মাত্র আছে এমন

লোকের সংখ্যা ১৭। গ্রামাঞ্চলে—আর আমাদের গ্রামেই শতকরা ৮২ জন লোক বাস করে—স্কুলে যারা যেতে পারে তাদের মধ্যে উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ পায় ১০০ জনের মধ্যে মাত্র ২৬ জন। (সে শিক্ষাও সাধারণ বই মুখস্থের শিক্ষা; প্রকৃত উন্নত মানের বইয়ের শিক্ষা এ কথাও বলা যায় না।) শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা অতি অল্পই আছে।

"যেমন শিক্ষায় তেমন স্বাস্থ্যে। আমেরিকার গড় আয়ু ৬৫ বছর, ইংলণ্ডের যুক্তরাজ্যে ৭০ বছর,—এদেশে ৩৫ বছর। শিশু-মৃত্যুর হার এদেশে হাজারে ১৩০টি; আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ৩০টি। প্রায় ১ কোটি লোক প্রতি বছরে ম্যালেরিয়া ও ক্ষয়রোগে মারা যায়। ব্যাধি বেশী, চিকিৎসক কম। সমগ্র দেশে পাশকরা ডাক্তারের সংখ্যা ৬০,০০০ মত—গড়ে ৬০০০ লোক পিছু ১ জন ডাক্তার—ইংলণ্ডে ১০০০ লোক পিছু ১ জন ডাক্তার। কিন্তু গ্রামের অবস্থা আরও অনেক খারাপ; ২০,০০০ লোক পিছু ১ জন ডাক্তার।

"ভূমির ব্যবস্থাও অনুরূপ। গ্রামের জমির বণ্টনে খুব বেশী পার্থক্য এখনও আছে। গ্রামবাসীর শতকরা ২০ জনের কোন জমি নেই; এক একর বা দেড় একর জমি আছে অর্দ্ধেক লোকের। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের সংখ্যা শতকরা ১০ জন; জমির ৬০ ভাগের এরাই মালিক।

"এই আর্থিক অবস্থার স্বাভাবিক পূর্ণ উপার্জ্জনের সুযোগ যে বহু লোকের নেই এতে বিস্ময় হয় না। সহরাঞ্চলে ২৪।৩০ লক্ষের মত ও গ্রামাঞ্চলেও অনুরূপ সংখ্যার লোক কর্মহীন বলা যায়। এ ছাড়া সুযোগ কাজ নেই এমন অনেক লোক আছে। সব ধরলে কর্মহীনের সংখ্যা কোটির কোঠায় গিয়ে পৌঁছায়।"

পরিকল্পনার পাঁচ বছরের কর্মচেষ্টার পরেও আমাদের দেশের অবস্থার এই প্রামাণ্য বাস্তব ছবি।

সম্পদ-সৃষ্টির নূতন পথ

দেশের এই অবস্থায় এমন এক পথ বাহির করতে চেষ্টা করতে হবে যাতে দেশ জাগবে, সম্পদ-সৃষ্টিও হবে। পুঁজিবাদের পথে সম্পদ-সৃষ্টি হয়ত হতে পারে, কিন্তু বণ্টনে ন্যায় বা নীতি প্রকৃত মর্য্যাদা পায় না বলে অন্যায় ও অশান্তি তাতে বাড়তেই থাকে। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা তাতে হবে না, ধনীর স্বৈরতন্ত্র হয়ত প্রতিষ্ঠিত হবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই নতুন পথের ইঙ্গিত আছে, প্রয়োজন তাকে প্রকৃত কাজে লাগানো। সেটি সমবায়ের পথ। সমবায় সম্বন্ধে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয়েছে :—

"Economic development along democratic lines offers a vast field for the application of co-operation in its infinitely varying forms."

—গণতন্ত্রের আদর্শে সম্পদ-সৃষ্টির প্রশস্ত পথ সমবায় নীতি—অগণিত ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ হতে পারে।

আরও বলা হয়েছে :—

"Our socialist pattern of society implies the creation of large numbers of decentralised units, both in agriculture and in industry. These small units can obtain the advantages of sale and organisation mainly by coming together. The character of economic development in India with its emphasis on social change, therefore, provides a great deal of scope for the organisation of co-operative society. The building up of a co-operative sector as part of the scheme of planned development is, thus, one of the central aims of national policy."

অর্থ—আমাদের সমাজতান্ত্রিক আদর্শে কৃষি শিল্পে ছোট ছোট কেন্দ্র গড়ে এককেন্দ্রিক পদ্ধতির বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন কিন্তু এই ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলি যদি পরস্পর যুক্ত না হয় তাহলে এর বিক্রয়ের সুবিধা বা সুগঠিত হবার সুযোগ পাবে না। সমাজ-ব্যবস্থার যে পরিবর্তন আমাদের কাম্য তাতে অর্থনৈতিক জীবনে সমবায় নীতির সম্প্রসারণের খুব বড় সুযোগ আছে। সুতরাং উন্নততর জাতীয় জীবন গঠনের পরিকল্পনায়

(শেষ অংশ ৫৭-৬০ পৃঃ)

প্রবন্ধ

বিক্রয়-কর আইনের বিবর্তন

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জী, এম. এ., বি-কম্, বি. এল, এ্যাডভোকেট্, ট্যাক্স-বিশেষজ্ঞ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ব্যয়ভার বহন ও রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই বিক্রয়-কর ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল। বঙ্গীয় রাজস্ব (বিক্রয়-কর) আইন ১৯৪১ [Bengal Finance (Sales Tax) Act 1941] অনুযায়ী বাঙ্গলাদেশে সর্বপ্রথম এই কর ধার্য্য হয় ও পরে ভারতের অন্যান্য প্রায় সব প্রদেশেই বিক্রয় কর আইন প্রচলিত হয়। ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনে (Government of India Act 1935) প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের ফলে এই বিক্রয়-কর বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের স্বীয় অধিকারভুক্ত করা হইয়াছিল। তাই অচিরেই বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রূপে বিক্রয়-কর আইন দেখা দিল। সবগুলি এই কর রেজিষ্ট্রীকৃত বিক্রেতার নিকট হইতে তাহার বিক্রয় মূল্যের উপর ধার্য্য হইয়া সরকারী তোষাখানায় আদায় হয়; সেই বিক্রেতা তাহা ক্রেতার নিকট হইতে বিক্রয়-মূল্যের সহিত উহা উশুল করিতে সমর্থ বা অসমর্থ হউন তাহা বিবেচিত হয় না। তবে কোন্ কোন্ মাল (Goods) বিক্রয়-করযুক্ত বা করমুক্ত হইবে (Taxable or Exempted Sales). কত পরিমাণ বিক্রয় করিলে (Turnover) বিক্রেতাকে Dealer) তাহার ব্যবসায় রেজিষ্ট্রী করাইয়া নিদর্শন পত্র লইতে হইবে (Registration Certificate), কি ভাবে বিক্রয় হিসাব (Return) ও কর জমা (Challan) দিতে হইবে ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়ে বিভিন্ন প্রাদেশিক বিক্রয়-কর আইনের ধারা (Sections) ও নিয়মগুলির (Rules) মধ্যে বহুল প্রভেদ আছে। এমন কি মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে একই মালে প্রতিবার বিক্রয়ের বা হস্তান্তরের সময় বিক্রয়-কর ধার্য্য হয় অর্থাৎ বিক্রয়-কর সেখানে বহুমুখী (Multiple Point)। অথচ বাঙ্গলা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে সেই মাল যখন রেজিষ্ট্রীকৃত বিক্রেতা কোন অরেজিষ্ট্রীকৃত ক্রেতাকে বিক্রয় করিবেন—একমাত্র তখনই ঐ বিক্রয়ের উপর কর ধার্য্য হয়; অর্থাৎ বিক্রয়-কর ঐ সব প্রদেশে একমুখী (Single Point)।

বিক্রয়-কর প্রথমে প্রচলিত হইয়াছিল নিতান্ত অস্থায়ী-ভাবেই। কিন্তু দেখা গেল ব্যবসায়ী মহলের কর ফাঁকি (Tax-evasion) দিবার নানারূপ দুর্নীতির পথ গ্রহণ করা সত্ত্বেও বিক্রয়-কর যাবৎ বেলা বেলা করিয়াও যাহা আদায় হইতে লাগিল প্রাদেশিক রাজস্বের তাহা বেশ মোটা অংশই। ক্রমে বর্তমানে ইহা এরূপ অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে সমুদয় রাজ্যের (States) বাৎসরিক বাজেটে রাজস্ব খাতে বিক্রয়-করের পরিমাণই সর্বাধিক। সুতরাং বলা বাহুল্য স্বাধীনতা আসিলেও দেশের ক্রেতাসমাজ বিক্রয়-করের নাগপাশ কাটাইতে পারিলেন না। কারণ মূখ্যত এই কর বিক্রয় মূল্যের উপর ধার্য্য হইলেও কার্য্যতঃ বিক্রেতা তাহা ক্রেতার ঘাড়েই চাপাইয়া দিয়াছেন। বিক্রয়-কর তাই স্থায়ী ও অটুট ভাবেই জাতির অর্থনৈতিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। বাঙ্গলা দেশে টাকায় ১ পয়সা হইতে শুরু করিয়া ৩ পয়সা পর্যন্ত বর্দ্ধিতহারে ও নূতন নূতন মালের (যথা—সোনা, রূপা ও গহনা) উপর বিক্রয় কর আদায় হইতেছে। অন্যান্য রাজ্যেও করের হার ও করযুক্ত মালের তালিকা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

ইহার পর ভারতীয় গঠনতন্ত্র আইনের ২৮৬ ধারায় বর্ণিত ব্যাখ্যা অনুসারে (Explanation to Article 286 (1) (b) of Indian Constitution Act) যে রাজ্যে ব্যবহারের (Consumption) জন্য মাল প্রেরিত (Delivery) হইয়া বিক্রয় হইবে সেই রাজ্যে উহা বিক্রীত হইল বলিয়া ধরিতে হইবে—এই তাৎপর্য্য অনুসারে ও ইউনাইটেড মোটর কোম্পানী বনাম বম্বে রাজ্যের মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায় অবলম্বনে বিক্রয়-কর কেবলমাত্র

রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত বিক্রেতাদের নিকট হইতেই নহে, রাজ্যের বাহিরে অবস্থিত বিক্রেতাদের (Non-Resident Dealer) নিকট হইতেও আদায় হইতে লাগিল। অর্থাৎ মনে করুন আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবাঙ্গলায় অবস্থিত ও আপনি পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে বিভিন্ন রাজ্যে মাল পাঠাইয়া বেচিয়াছেন। সুতরাং ঐ বিভিন্ন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিক্রয় কর আইনানুযায়ী আপনার কারবার রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে ও বিক্রয়-কর দিতে হইবে। কলিকাতা হইতেই বাঙ্গলার বাহিরের রাজ্যগুলিতে বহু পরিমাণে মাল বিক্রয় হয়। ঐ আন্তরাজ্য (Inter State) বাণিজ্যের উপর বিক্রয়-কর আদায় করিবার জন্য বিহার, যুক্তপ্রদেশ, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্য সরকারগুলি কলিকাতা তথা বাঙ্গলা ব্যবসায়ীদের উপর বিক্রয়-কর ধার্য্য করিতে লাগিলেন। ব্যবসায়ীমহল মহাদুশ্চিন্তায় পড়িলেন। সৌভাগ্যবশতঃ সুপ্রীম কোর্টের পুনর্বিচারে (বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানী বনাম বিহার রাজ্য) রাজ্যের বাহিরে অবস্থিত ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে বিক্রয়-কর আদায় ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ সন হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

এই হিসাবে পর্য্যালোচনা করিলে পশ্চিম বঙ্গীয় বিক্রয়-কর আইনটির প্রশংসা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ ভিন্ন রাজ্যের ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে এই রাজ্যে প্রেরিত বিক্রিত মূল্যের উপর কোন বিক্রয়-কর ধার্য্য হয় নাই। আবার জনগণের অত্যাবশ্যক কতকগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় মালের (যথা খবরের কাগজ) উপরও এই রাজ্যে বিক্রয় কর রহিত করা হইয়াছে অথচ সেই একই প্রকার মাল অন্য রাজ্যে (যথা মাদ্রাজে) বিক্রয়-করযুক্ত করা হইয়াছিল।

বিক্রয়-করের ফাঁকি বন্ধ করা, কর আদায়ের ব্যয়হ্রাস, ও রাজস্ব বৃদ্ধির নিমিত্ত বিভিন্ন রাজ্য সরকার নব নব উপায় উদ্ভাবন ও সংশোধিত (Amendment) বিক্রয়-কর আইনগুলি সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। সাধারণ ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে কর আদায় করিবার চেষ্টা না করিয়া ক্রমশঃ মাল সৃষ্টিকারী (Manufacturers) ও আমদানীকারীদের (Importers) নিকট হইতেই তাহাদের বিক্রয় মূল্যের উপর সরাসরি (Direct) কর আদায় করিয়া লইতেছেন। সেই মালের ক্রেতারা (ব্যবসায়ী বা অব্যবসায়ী) যে কেহই পরে আবার তাহা বিক্রয় করুন না কেন তাহাদের আর বিক্রয় কর দিতে হইবে না। মাল তৈয়ারীর বা রাজ্যের বাহির হইতে আমদানীর সূত্রপাত (Source) হইতেই বিক্রয়-কর আদায়ের এই প্রচেষ্টায় পশ্চিম বঙ্গীয় বিক্রয়-কর আইন ১৯৫৪ (The West Bengal Sales Tax Act 1954) পাস হইয়াছে। এই আইনের অন্তর্গত মালের উপর ১৯৪১ সনের আইনানুযায়ী টাকায় তিন পয়সার পরিবর্ত্তে কমাইয়া দুই পয়সা করিয়া কর ধার্য্য হইলেও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী বিক্রয়-কর আদায় হইতেছে ; কেন না আসল ভোগকারী (Consumer) পর্য্যন্ত অন্যূন এক ব্যবসায়ী হইতে অন্য ব্যবসায়ীর নিকট হস্তান্তরের সুযোগে ঐ মালের উপর বিক্রয়কর ফাঁকি দিবার রাস্তা এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সিগারেট, বনস্পতি, সাবান, বিস্কুট, হলুদ, সুপারী, দারুচিনি, গোলমরিচ, মিষ্ট পাউডার ইত্যাদি এক একটী মালকে ১৯৪১ সনের আইনের বহির্ভূত করিয়া ১৯৫৪ সনের আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হইতেছে।

প্রবল আন্দোলন ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও যুদ্ধ-কালীন ব্যবস্থা হিসাবে যে বিক্রয়-করের বীজ ইউরোপ ও কানাডার অনুকরণে এদেশে বপন হইয়াছিল তাহাই বর্ত্তমানে মহীরুহে পরিণত হইয়া জটিল শিকড় ছড়াইয়া দিয়া জাতির জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জাপ্টাইয়া ধরিয়াছে উৎপাটন করা ত দূরের কথা, আইনের বেড়াজালে ইহাকে সুরক্ষিত করিয়া সমগ্র ভারতে রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারও আজ তাই পাঁয়তারা কসিতেছেন।

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ১০০(৩) ধারায় বর্ণিত প্রাদেশিক আইন সভার অন্তর্ভুক্ত বিষয় তালিকার অন্তর্গত ৪৮নং ফিরিস্তির [Entry 48 in the Provincial Legislature list u/s 100(3) of the Government of India Act 1935] বলে বিক্রয়-কর প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনাধীন ছিল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তখনকার কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে

হস্তক্ষেপ করিয়া বিক্রয়-করকে স্বীয় অধিকারভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইলেন। ফেডারেল কোর্ট, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার মোটর তৈলাদি বিক্রয় কর আইন ১৯৩৮ [C. P. & Berar Motor Spirits Sales Tax Act 1938] বিষয়ক মামলায় যে রায় দিলেন তাহাতে বিক্রয় কর প্রাদেশিক শাসনাধীন বলিয়াই বিবেচিত হইল।

স্বাধীনতার পর কেবল মাত্র নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা না লইয়া সমগ্র দেশের হিতার্থে কেন্দ্রীয় (Union) সরকার সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করিলেন। স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্র সংবিধান প্রস্তুতিকালে কেন্দ্রীয় সরকার সুরু হইতেই রাজ্য (State) সরকারগুলির ক্ষমতা কিছুটা সীমাবদ্ধ করিয়া দিলেন। ঐ সংবিধানের সপ্তম ক্রোড়-পত্রের (Schedule) দ্বিতীয় তালিকার ৫৪নং ফিরিস্তি (Entry 54 in List II—State List) অনুযায়ী রাজ্য সরকারগুলি **খবরের কাগজ** ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত মালের উপর বিক্রয়কর আইন প্রণয়নের অধিকার পাইলেন। আবার গঠনতন্ত্রের ২৮৬ ধারার বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা অনুসারে (Restrictions under Article 286 of the Constitution) কোন রাজ্য সরকার ১লা এপ্রিল ১৯৫১ সাল হইতে নিম্নোক্ত খরিদ বা বিক্রয়ের উপর কর ধার্য্য করিতে পারিবেন না :—

(১) রাজ্যের বাহিরে খরিদ বিক্রয়।

(২) ভারতে আমদানীসূত্রে বা রপ্তানীসূত্রে মালের খরিদ বিক্রয়।

(৩) আন্তরাজ্য বাণিজ্যের অন্তর্গত মালের খরিদ বিক্রয়।

(৪) পার্লামেন্ট কর্তৃক ঘোষিত জনগণের জীবনযাত্রার অত্যাবশ্যকীয় মালের খরিদ বিক্রয়।

শেষোক্ত বর্ণিত নিত্যপ্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক মাল-গুলি পরে ৯ই আগষ্ট ১৯৫২ সনে পার্লামেন্টের আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে [The Essential Goods (Declaration and Regulation of Tax on Sale or Purchase) Act 1952] সুতরাং ঐ তারিখের পর হইতে ঐ আইনে বর্ণিত মালের খরিদ বা বিক্রয়ের উপর কোন রাজ্য সরকার আর কর ধার্য্য করিতে পারিবেন না।

ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় রাজস্ব মন্ত্রীর উদ্যোগে আহূত সভায় বিভিন্ন রাজ্যের রাজস্ব সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের উপস্থিতিতে সমগ্র দেশের বণিক সমাজের ও জনসাধারণের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন প্রকার বিক্রয়-কর আইন জনিত ক্রমবর্দ্ধমান অভিযোগ ও বক্তব্য সমূহের বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সংযুক্ত (co-ordinated) কর্মপন্থা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ও প্রস্তাবাদি রচিত হয়। বিক্রয়-করের হার, করযুক্ত ও করমুক্ত বিক্রয় নির্দ্ধারণ ইত্যাদি সকল বিষয় বিভিন্ন রাজ্যের বিক্রয়-কর আইনগুলির মধ্যে যথা-সম্ভব সমতা (uniformity) সাধন কিছু পরিমাণে আজ তাই সম্ভব হইয়াছে। এবিষয়ে রাজ্য সরকারগুলির রাজস্বের বিশেষ ক্ষতি সাধন না করিয়া তাহাদের নিকট শুধু অনুরোধ উপরোধের দ্বারাই ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিতে কেন্দ্রীয় সরকার কৃতকার্য্য হইবেন আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে আশা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। তদুপরি আন্তরাজ্য বিক্রয় কর (Inter State Sales Tax) যে আইনী ঘোষিত হওয়ায় নানাবিধ সমস্যা দেখা দিল। প্রথমে অডিন্যান্স জারি ও পরে ২১ শে মার্চ্চ ১৯৫৬ সনে বিক্রয়-কর চালুকরণ আইন ১৯৫৬ (The Sales Tax Laws Validation Act 1956) পাশ হইল। এই আইনের দ্বারা রাজ্য সরকারগুলি ভিন্ন রাজ্যের ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে ১লা এপ্রিল ১৯৫১ ও ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ সনের মধ্যে তাহাদের ঐ রাজ্যে বিক্রয়ের উপর পুনরায় বিক্রয়-কর আদায়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আন্তরাজ্যের খরিদ বিক্রয়ের কর সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধান হইল না। তাই ঐরূপ কর চূড়ান্ত ভাবে যাহাতে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারই আদায় করিয়া সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বণ্টন করিয়া দিতে পারেন ও এবিষয়ে প্রয়োজনীয় আইন কানুন প্রণয়ন করিয়া সমগ্র দেশের আন্তরাজ্য বাণিজ্যের সুবিধা করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে গঠনতন্ত্র সংশোধিত (Constitution

Tenth Amendment Bill) আইনের খসড়া রচনা সুরু হইয়াছে। গঠনতন্ত্র সংবিধানের সপ্তম ফোড়পত্রের প্রথম তালিকায় নূতন ৯২ এ ফিরিস্তি প্রবেশ করাইয়া (Entry 92 A in List I—Union list) ও অন্যান্য ভাবে গঠণতন্ত্র আইনটীর সংশোধন করিয়া লইয়া অদূর ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকারই কেবলমাত্র এই আন্তর্বাণিজ্যের বিক্রয়-কর আদায় করিবেন।

বর্ত্তমানে রাজ্যগুলি মোট ৫৮ কোটি টাকা বিক্রয়-কর আদায় করিতেছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ঘাটতি পূরণের জন্য সমগ্র দেশে অতিরিক্ত মোট ৮৫০ কোটি টাকা আদায় করিবেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার-গুলি। প্লানিং কমিশন রাজ্যগুলিকে মোট ২২৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব ও তন্মধ্যে বিক্রয়-কর বাবদই ১১২ কোটি টাকা বেশী আদায় করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এ কারণে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কালীন রাজ্যগুলিকে বর্ত্তমান করযুক্ত মালের বিক্রয় করের হার বর্দ্ধন ও আরও অধিক সংখ্যক মালের উপর নতুন করিয়া বিক্রয় কর ধার্য্য করিবার ক্ষমতা দিবেন স্থির হইয়াছে।

পরিশেষে শুধু এই কথাই বলিতে চাই যে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ ক্রমবর্দ্ধমান কর ভারে এমনিতেই জর্জ্জরিত হইয়া আছেন। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান কোন সমস্যাই এই ১৩০ বছরের স্বাধীন রাষ্ট্রের দ্বারা সমাধান হইল না। বেকার সংখ্যা ও দ্রব্যমূল্য বাড়িয়াই চলিয়াছে। ক্রয় ক্ষমতা (purchasing power) তাই আজ প্রায় নিঃশেষিত। তথাপি স্বাধীন দেশের মানুষ দেশের সমৃদ্ধির জন্য ও ভাবী ভারতের কল্যাণের জন্য অতিরিক্ত করভার বহন ও আরও কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করিয়া লইবেন, আমাদের এ বিশ্বাস আছে : কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এ সম্বন্ধে বিশেষ কর্ত্তব্য আছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের আজ প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হইল বিক্রয়-কর ও অন্যান্য কর সংগ্রহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতি দুরীকরণ ও ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা সৃষ্টি করিয়া আদায়ীকৃত করের প্রতিটি পয়সা যাহাতে অপব্যয় না হইয়া বাস্তবিকই দেশের কল্যাণে নিযুক্ত হয় সে দিকে সদা জাগ্রত দৃষ্টি রাখা। তবেই জনগণের এই স্বীকার ফলপ্রসূ হইবে।

আদিবাসীদের পাতানো বন্ধুত্ব

শ্রীচারুলাল মুখোপাধ্যায়

[শ্রীচারুলাল মুখোপাধ্যায় সাঁওতাল ও বিভিন্ন আদিবাসীদের জীবন যাত্রার ও সামাজিক মূল্যবোধের উপর কয়েক বৎসর যাবৎ গবেষণা করিতেছেন। তাঁহার বর্ত্তমান রচনায় আদিবাসীদের সখ্য ও মৈত্রীর ধারণা ও পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত এবং কৌতূহলপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। —সম্পাদক]

ছোটনাগপুর উপত্যকার অধ্যুষিত সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাঁও ইত্যাদি নানা জাতির বিচিত্র আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, এইসব আদিবাসীরা তাহাদের সামাজিক কাঠামো সুদৃঢ় ভিত্তিতে রাখিয়া নানারকমে আত্মীয়তার গণ্ডীকে প্রসারিত করিয়া এক অভিনব সংহতি সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাতে তাহাদের পরিবার ও সমাজকে তাহারা রক্ষা করে। সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে ইহা ছাড়াও এইসব অতি রক্ষণশীল গোষ্ঠীগুলি বাহিরকে

আপন করিতেও জানে। পাতানো বন্ধুত্বের দ্বারা ইহা সম্ভব হইয়াছে দেখা যায় যে, এই সকল আনুষ্ঠানিক সৌভ্রাত্র দ্বারা তাহারা যে আত্মীয়তার সৃষ্টি করিল, তাহা রক্ত বা বৈবাহিক সম্পর্কের তুলনায় কম দৃঢ় নয়: মৃত্যু পর্যন্ত এই পাতান আত্মীয়তা অটুট থাকে।

"ফুল পাতাও"

সাঁওতাল কুমারীরা সমবয়সীদের সঙ্গে ফুল-পাতানো বন্ধুত্ব করে। তাহাদের প্রিয় সুগন্ধ ফুল বা গাছের পাতার নামে এই সখ্য স্থাপিত হয়। এ ব্যাপারে ক্রিয়াকাণ্ডের বড় একটা বালাই নাই। আমোদ-আহ্লাদ করিয়া খাওয়া দাওয়া হয়; হাঁড়িয়া মদ পান চলে। একজন আরেক জনকে শাড়ী উপহার দেয়; শেষে তাহাদের প্রিয় ফুল, যেমন "আকর বাহা", "কেয়া বাহা" (বাহা=ফুল) এক সখী অন্য সখীর খোঁপায় গুঁজিয়া দেয়। কারাম পাতার সম্বন্ধ পাতাইতে হইলে কেরানপূজার সময় এই গাছের পাতা চুলে পরাইয়া দেওয়া হয়। এখন হইতে বন্ধু দুইটি নিজেদের নামে নিজেদের ডাকিবে না—দুইজনাই দুইজনের কারাম দার" বা "আকর বাহা"।

খাড়িয়া জাতির তরুণীদের মধ্যেও এরূপ ফুল-পাতানো সখীত্ব হয়, দু-একটা নাম করা যাইতে পারে; যেমন,—"কেওড়া", "গুলাইচি", "কারাম দার"। শরৎচন্দ্র রায় তাঁহার খাড়িয়াদের সম্বন্ধে নৃতত্ত্বমূলক গ্রন্থে ইহাদের তরুণীদের "সোই" সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্যে সমাজ-বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে একটু বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যেহেতু একজন খাড়িয়ার ভ্রাতা ও স্থালিকা ও ভগ্নী ও শ্যালক পরস্পরের "সোই" (আত্মীয়তার নামকরণ) সম্পর্কীয় ইহাদের মধ্যে বরণ সম্বন্ধে বিবাহ হইতে পারে। মীরহড় জাতির বালিকারাও কারাম পাতা বা কারাম পূজার সময় বন্ধুর শির খোঁপায় গুঁজিয়া দিয়া এরূপ সখ্য-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পার্বত্য দুইজন মেয়েদের মধ্যেও এরূপে চিরকালের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। ওঁরাওদের যুবতীরা "সোই" সম্পর্ক পাতায়—তাহাদের স্বামীরা পরস্পর নিজেদের "সোই" বলিয়া সম্ভাষণ করে।

বিবাহিত স্ত্রীলোকদের সখ্য

ওঁরাওদের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী তাহারা ভিন্ন গ্রামে বিবাহ করে। কাজেই তাহাদের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব হয়। তাহারা সমাজ বিবাহিত স্ত্রীলোকদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করার জন্য এক বিশিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। ইহা দ্বারা তাহারা দূরকে নিকট করে, অনাত্মীয়কে আত্মীয়ের পর্যায়ে ফেলে। ওঁরাওদের দেশে প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর জমির ধান কাটা হইলে সমাজ-কর্তারা ঘোষণা করিয়া দেন যে প্রত্যেক পরিবারের অন্ততঃ একজন বিবাহিত রমণীকে গ্রামস্থ অন্য ওঁরাও পরিবারের বিবাহিতার সঙ্গে "সাহিয়া" বন্ধুত্বে আবদ্ধ হইতে হইবে। নির্দ্ধারিত দিনে দীর্ঘ ক্রিয়া-কাণ্ডের পর এই সখ্য স্থাপিত হয়। ইহার দুই সপ্তাহ পরে সামাজিক পানাহারে, আমোদ আহ্লাদে এই সম্বন্ধ ঘনীভূত হয়। এই সাহিয়া সম্পর্ক স্থাপিত হইলে এই সকল পরিবারের মধ্যে ভিন্ন গোত্রীয় হইলেও বিবাহাদি নিষিদ্ধ, ওঁরাও জাতির দৃষ্টিতে এই সখীত্ব রক্ত সম্পর্কের তুল্য।

সাঁওতালদের মধ্যে সমবয়স্থাক সন্তানের জননীরা "সাইকা" নামে সখ্য-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, পান, ভোজন উপহার আদান-প্রদানে বন্ধুত্বের ভিত্তি দৃঢ় হয়। আমেরিকাবাসীদের মধ্যেও এই পর্য্যায়ের মাতারা সখীত্ব পাতান, কিন্তু এই পদ্ধতিটি কিছু ওঁরাও ধেঁষা যদিও অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়ার প্রাচুর্য্য নাই।

পুরুষদের পাতানো বন্ধুত্ব

বালো ও কৈশোরে মাঠে ঘাটে, গরু চরাইবার সময়, নৃত্যগীতে, পশুপক্ষী শিকারে আদিবাসী বালকদের মধ্যে সাহচর্য্যে ভবিষ্যৎ জীবনের বন্ধুত্ব দানা বাঁধে। যদিও সাঁওতালদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক বন্ধুত্ব একটু কম, অন্যান্য দ্রাবিড়-পূর্ব্ব ও দ্রাবিড়-ভাষী জাতিদের মধ্যে ইহার প্রাচুর্য্য দেখা যায়। তাই আমরা দেখি মেয়েদের মত বীরভূম তরুণরাও পরস্পরের মধ্যে ফুল সম্পর্ক পাতায় ও চিরকালের সৌভ্রাত্রের শপথ গ্রহণ করে। তাহারাও ইহার পর বন্ধুকে

"আমার ফুল" বলিয়া অভিহিত করে। আনুষ্ঠানিক ঐ ফুল গুঁজিয়া দেওয়া হয় কানের উপর। এ জাতির তরুণরা "জিতিয়া" পূজার পর গৃহাঙ্গনে পোতা "জিতিয়া" গাছের ডাল হইতে দুটি পাতা নিয়া একে অন্যের কানে পরাইয়া "জিতিয়া গাছ" বন্ধুত্ব স্থাপন করে। ইহা ছাড়াও ঘাঁরেড়দের মধ্যে ভিন্ন জাতীয় লোকদের সঙ্গে "গঙ্গাজল" ও "প্রসাদ-বন্ধুত্ব" হয়। ইহার ভিতর হিন্দু পরিবেষ্টনীর সংস্কৃতির প্রভাব সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু একবার সখ্য স্থাপিত হইলে ঘাঁরেড়রা নূতন বন্ধুকে রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তার চোখে দেখে। ইহা তাহাদের কাছে এমনি পবিত্র। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহে এক বন্ধুর আরেক বন্ধুর মত ঔরজ হয়, যে পরাই বা কার্ণা একজনের জাতিগত ভাবে নিষিদ্ধ (taboo), তাহারা পরস্পর তাহা নায়া জীবন মানিয়া চলে।*

পাউরি ভুইঞাদের এক নামের লোকেরা একজন আরেক জনকে একমুঠি আতপ চাল ও কয়েক খণ্ড হলুদ দিয়া "জোহার মৈত্র" বলিয়া সম্বোধন করিয়া "মৈত্র" সম্পর্ক পাতায়। "মহাপ্রসাদ" মৈত্রতে পরস্পর মুখে আতপ চাল ও কয়েকটি ফুলের পাপড়ি গুঁজিয়া দেয় ও "কামদিয়ার" বন্ধুত্বে কচি আমের পল্লব কানের উপর পরাইয়া দেয়।

খাড়িয়ারাও নিজেদের মধ্যে বা ভিন্ন জাতিদের সঙ্গে একটি যাবজ্জীবন সখ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়। একটা কাঁসার ঘটি হইতে আম্রপল্লবে একবন্ধু আরেক জনের গায়ে জল ছিটাইয়া খানাপিনা, উপহার দানে ও আমোদ উৎসবের মধ্য দিয়া চিরকালের জন্য হৃদয়ের গ্রন্থি বাঁধিয়া লয়।

ওঁরাওদের বেলা দেখা যায় যদি কোন তরুণ তাহার বন্ধুর সহিত চিরসখ্য স্থাপন করিতে চায়, সে সর্বপ্রথম তাহার পিতামাতা বা অভিভাবকের সম্মতি প্রার্থনা করে। সাধারণে তাহারা সেই অনুমতি দেয় তবে তাহারা দুজনকে সাবধান করে যে এ সমস্ত মৈত্রী চিরকালের, বুঝিয়া সুঝিয়া করা উচিত। ধর্মাদিনে এই "ইয়ার" বা "সাঙ্গি" সম্বন্ধ স্থাপন হয়। খাওয়া দাওয়া, মদ্যপান, কাপড় চোপড় আদান প্রদান ইহার অপরিহার্য অঙ্গ। ইহার পর বন্ধু-যুগল ক্রিয়া-কর্মে পাশে-পার্শ্বনে মাসিক-কোড় হইয়া থাকে, তাহাদের স্ত্রীরাও নিজেদের "ইয়ারিন" বা "সাঙ্গিন" বলিয়া ডাকে। ভিন্ন গোষ্ঠীর হইলেও এই দুই পরিবারে বিবাহাদি অচল।

সাঁওতালদের মধ্যেও এরূপ সম্পর্ক আছে। ইহার উদ্দেশ্য প্রতিবেশীকে গুরুজন স্থানীয় হইলে সম্মান, ও স্নেহাস্পদ হইলে ভালবাসা দেখান। তাই আমরা দেখি বয়সে বড় হইলেও অন্যকে তাহারা গুরুতাত বলিয়া ও বালিকারা বেশী বয়সের নারীকে দিদি সম্বোধনে অভিহিত করে।

এইরূপে নানারকম আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া দ্বারা ছোট-নাগপুর ও ঝারখণ্ড এলাকার আদিবাসীরা তাহাদের নিজেদের জাতীয় পরিধির মধ্যে আত্মীয়তাকে ঘনিষ্ট করিয়া, গোষ্ঠীর বাইরের অনাত্মীয়কে সখ্যে বাঁধিয়া আপন করিয়া সমষ্টির মধ্যে এক বিচিত্র সংহতি সৃষ্টি করিয়াছে

এই ভাবে আর্য-অনার্য নানা জাতীয় লোকেরা বিরাট ভারতবর্ষে যে সাম্য সৃষ্টি করিয়াছে সমাজ বৈজ্ঞানিকের চোখে তাহার বিশিষ্ট রূপটি ধরা পড়ে। এই ভিত্তির উপর ভারত তাহার বুনিয়াদ গাঁথিতে পারিলে আমাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমানে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি ঘাপুগ্রস্ত লোকেরা এই মৈত্রীর মধ্যে যে ভাঙন ধরাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা সফল হইলে দেশের অমঙ্গল নিশ্চিত।

* ঘাঁরেড় গ্রন্থ, শরৎচন্দ্র রায়, পৃষ্ঠা ৪০৩ ; অনূদিত।

পশ্চিম বাংলার অধোগতি কেন ?

(বোম্বাইয়ের ইংরেজী সাপ্তাহিক 'দি ইকনমিক উইক্‌লি'র 'এ কালকাটা ডায়েরী' ২৯শে মে, ১৯৪৯ প্রবন্ধের মর্মানুবাদ)

বাংলা দেশ এক সময়ে রাজনৈতিক চেতনার জন্য সঙ্গত কারণেই বিখ্যাত ছিল। আজকার পশ্চিম বাংলার পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে সন্দেহ জাগে রাজনীতির প্রতি এইরূপ ঔৎসুক্য পূর্বে কখনও ইহার জীবনে প্রকাশ পেয়েছিল কিনা। তবে চায়ের দোকানে বা কফি হাউসে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক প্রশ্ন যে আলোচিত হয় না তা নয়; কিন্তু সুরু হতে না হতেই ইহা ব্যক্তিবিশেষের আলোচনা ও নিন্দাতে পর্যবসিত হয়। পরিতাপের বিষয়, রাজনীতিকদের বা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রায়শঃ সম্পূর্ণ অমূলক নয়। কিন্তু কিছু করার নয় বা কিছু করবার নেই, এমন একটা মনোভাব বাঙালীর মধ্যে যেন সৃষ্টি হয়েছে; এটা ভাববার কথা। মনে মনে কোন রাষ্ট্রের জনসাধারণ যদি গুমরায় ত সেটা ভয়েরও কথা।

বাংলাকে অনেক আঘাত সহ্য করতে হয়েছে, সত্য। বাংলার যে সব অভিযোগ তার অনেকগুলি ভিত্তিহীনও নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলার এই মনের দুর্বলতা বা নৈরাশ্য যে খুব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠ্‌ছে, এটা অস্বীকার করা যায় না। য়ুরোপে 'treason of the intellectuals' বা বুদ্ধিজীবিদের বিশ্বাসঘাতকতা বলে একটা কথা অধুনা প্রচলিত হয়েছে। বাংলার বর্তমান দুর্দশার কারণ খুঁজতে গেলে আমরা মূলে এই জিনিষটাই হয়ত পাব। কিছুদিন আগের বাংলার জীবনেও একটা অংশ অন্ততঃ ছিল যাকে কোন কলুষ স্পর্শ করতে পারত না। এখন বাংলার সেই নিষ্কলুষ অন্তস্তল ক্রমেই যেন খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে উঠ্‌ছে। সাহিত্য-সেবীদল, সংবাদপত্রসমূহ, বিশ্ব-বিদ্যালয় ও অনুরূপ উচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেই ত স্বভাবতঃ আমরা বাংলার সেই নিষ্কলঙ্ক ও নির্মল প্রাণধারার সন্ধান করব—কিন্তু এগুলি এখন আর যেন মনে আশার সঞ্চার করে না, নিরাশায় মনকে ভরিয়ে দেয়। বাংলাকে বিহারের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়ার সাম্প্রতিক প্রশ্নে বাঙালী বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে যে মনোভাব দেখা গিয়াছিল, তা লক্ষ্য করবার বিষয় শুধু নয়, বেদনার বিষয়ও বটে।

বাংলা-বিহার সমস্যার সমাধানের এই পথের সন্ধান স্বাভাবিকভাবে জনগণের মনে জন্ম নেয়নি; এতে কারও স্বীকৃতি ছিল না। সুতরাং এর মৃত্যুতেও কেউ দুঃখিত হয় নি। কিন্তু এই বছর অল্পদিনের আয়ুকালের মধ্যে আজকের বাংলার মনের যে পরিচয়টি ধরা পড়ছে, তা সত্যই ভাববার কথা। বাংলার মুখ্য মন্ত্রী নিজের দায়িত্বে এই প্রস্তাব যাতে গ্রাহ্য হয়, তা চেয়েছিলেন; দেশের লোক তা চায়নি, এবং শেষ পর্যন্ত জনমতের নিকট প্রবল-প্রতাপ মুখ্য মন্ত্রীকেও নতি স্বীকার করতে হয়। ইহা সুষ্ঠুই হয়েছে। কিন্তু যাঁদের কাছে দেশ আশা করে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তা কল্যাণের মাপকাটিতে বিচার করে সাধারণের কাছে উপস্থাপিত করা ও সাধারণকে শিক্ষিত করা, তাঁরা কি তাঁদের কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করতে পেরেছিলেন? কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা রাজনীতি করেন তাঁরা অধিকাংশ এই প্রস্তাব যে কল্যাণকর এটা মনে করেন নি, একথা সকলেই জানেন; কিন্তু এর বিরোধিতা করার সাহস তাঁদের মত মাথাওয়ালাদের ভিতরে একজনেরও হয় নি। যাঁদেরকে বুদ্ধিজীবি বলা হয়, তাঁরা অসন্দিগ্ধচিত্তে এই প্রস্তাবের কল্যাণ-সম্ভাবনা বুঝেছিলেন, একথাও বলা যায় না; কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে এর সমর্থনের বিবৃতিও প্রকাশিত হয়। এর পরে সংবাদপত্রসমূহের কথা। সেখানেও এই একই কথা—

মনে ফুললেও মুখ ফুটে বিরোধিতা করার অক্ষমতা। যাঁরা বাংলাকে জাগিয়ে তুলবেন, এগিয়ে দেবেন ; সাধারণের কল্যাণের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি নেই—সাধারণের আশা, আকাঙ্ক্ষা, মতামতের প্রতি দেখা গেল তাঁদের চরম ঔদাসীন্য। এটাই সাম্প্রতিক বাংলার অধোগতির কারণ রূপে সবচাইতে বেশী লক্ষ্য করবার বিষয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা

আচার্য বিনোবা

স্বাধীন ভারতের প্রথম চেষ্টা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম পাঁচ বছরের কাজ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাঠামো প্রস্তুত হয়েছে, কাজ আরম্ভ হবে বলে। কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সফল হয়নি, ইহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কর্মহীনতা এই পাঁচ বছরে আরও বেড়েছে। গরীবের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছে, এবং যত দিন যাচ্ছে ইহা আরও খারাপের দিকে চলেছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শেষ করার পর যদি দেশের এই দুরবস্থা থাকে, যদি গরীবের দুঃখ না কমে, বা লাঘব হবার কোন লক্ষণ দেখা না দেয়, তা দ্বিতীয় পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার ফলে অবস্থার উন্নতি হবে, এমন ভরসা পাওয়া যায় কি? সরকারী কর্তারা বলেন,—"আমরা কি করব? জনসংখ্যা যে বেড়েছে।" আমি একটা কথা তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে তাঁরা পরিকল্পনা প্রস্তুত করার সময় কি ভেবেছিলেন যে আমাদের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ নৈসর্গিক কোন কারণে লুপ্ত হয়ে যাবে? বস্তুতঃ সাধারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলে দায়িত্ব এড়ান বুদ্ধির কথা বা যুক্তির কথা নয়।

• • •

জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের একটা সমস্যা বটে, কিন্তু এটা একটা পৃথক প্রশ্ন এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়। যাঁরা পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন তাঁদের জনসংখ্যার সাধারণ বৃদ্ধি পাঁচ বছরে কি হবে তা জানা উচিত ছিল প্রথমেই। তাঁরা তার হিসাব নেন নি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভে আজ তাঁরাই আবার বলছেন—এই সময়ের মধ্যে নতুন নতুন কাজের অনেক সুবিধা বাড়বে তাতে বহুলোকের কর্মের সংস্থান হবে কিন্তু এই সময়ের ভিতরই ত জনসংখ্যাও বাড়বে। সুতরাং বেকারের সংখ্যা এখনের চাইতে অনেক কমে যাবে—এরূপ ভাবার সঙ্গত কারণ আছে কি?

দেখা যায় ক্রমশঃ সঙ্গে সঙ্গে যে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে তার হিসাব তাঁরা রাখেন না এবং তার ভিত্তিতে তাঁরা পরিকল্পনা কি করে সফল করতে হবে তা জানেন না। আজকের জনসংখ্যার ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করলে পাঁচ বছর পরে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়ে হয়ত দেখা যাবে আমাদের অবস্থার সত্য কোন উন্নতি হয়নি।

আমাদের জন্য যাঁরা আইন করেন বা পরিকল্পনা রচনা করেন, তাঁরা দিল্লীতে বসে তা করেন। তাঁরা গ্রামে যান না—যেতে পায় না এমন কোটি কোটি লোকের সঙ্গে তাঁদের কোন পরিচয় হয় না। আর এইভাবেই তাঁরা গ্রামের উন্নতির পরিকল্পনা তৈরী করেন। বিলেত ও আমেরিকায় লেখা বই তাঁদের তথ্য দেয়, পথ নির্দেশ করে। দেশের সাধারণের জীবন-যাত্রার ধারা, তাদের সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি, অর্থনৈতিক কাঠামো, পুরুষানুক্রমে শিক্ষার ফলে হাতের শিল্পে নিপুণতা

এবং ব্যবহারিক জীবনে তাদের যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি—এ সকল কথা ভেবেই এদেশের সাধারণের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে।

শাসনভার যাঁদের হাতে আছে তাঁরা গর্বের সুরে বলেন—জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান আমাদের উন্নত করতে হবে। আমি কি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে পারি—সব আগে কি কর্তব্য নয় জনসাধারণকে যা প্রয়োজন সেই আহার দেবার ব্যবস্থা করা? দারিদ্র্যে এরা যে অর্দ্ধমৃত হয়ে আছে। এদেরকে পুরো খেতে দিয়ে আগে এদের বাঁচিয়ে তুলে তবে ত জীবনযাত্রার মান উঁচু করতে হবে। আর পুরো খেতে পেলে তখন আপনিই এই মান উন্নত হবার রাস্তা প্রস্তুত হয়ে যাবে।

সরকারের প্রথম দায়িত্ব হ'ল সাধারণের যা প্রয়োজন সেই খাদ্যের ব্যবস্থা করা; তাতেই জনসাধারণ নতুন প্রাণ পাবে। প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ভাল পানীয় জল—এ দুটির ব্যবস্থা ত সব আগে হো'ক।

চল্লিশ বছর হ'ল আমাদের দেশে স্বদেশী আন্দোলন প্রথম স্পষ্ট রূপ নেয়। গ্রামে থেকে গ্রামবাসী যা উৎপাদন করে, পরিপূর্ণভাবে তাই স্বদেশী। স্বাধীনতা লাভের পর আমরা স্বদেশীর এই সংজ্ঞা সম্পূর্ণ ভুলেছি। কেউ কেউ বলতে আরম্ভ করেছেন, এ ভাবে স্বদেশী মেনে নেওয়া কি মনের একটা সংকীর্ণতা নয়? ওঁরা বলেন—আমরা আন্তর্জাতিক ভূমিতেই সব জিনিষ বিচার করব; আমরা ত সবাই একই পৃথিবীর লোক। এঁরা, মনে হয়, আমাদেরকে বেদান্তের বিশ্ব-মৈত্রীর আদর্শের কথা শেখাতে চান। আমরা স্বদেশী-ধর্ম আচরণ করতে বলি; তাতে কি অন্য দেশের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা হয়? আন্তর্জাতিক মৈত্রীর এতে ব্যাঘাত হয় কি করে?

শেষে, এই কথাই বলতে চাই যে পরিকল্পনা এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে প্রতি গ্রামে কিছু অভাব থাকবে না—গ্রামের খাদ্যের প্রয়োজন, বস্ত্রের প্রয়োজন, গ্রামবাসীর শিক্ষার প্রয়োজন গ্রামের কৃষি ও শিল্প উন্নত হয়ে সম্পূর্ণভাবে গ্রামই মেটাতে পারবে। ভূদানের আদর্শ গ্রামকে এভাবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করে তোলা।

("সর্বোদয়"-এ প্রকাশিত ভূদানের আদর্শ সম্বন্ধে ইংরেজী বক্তৃতা হইতে।)

ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি

১৯২১-১৯৫০—এই ত্রিশ বৎসরে ভারতের জনসংখ্যা মোটামুটি ভাবে বলা যায় ২৫ কোটি থেকে ৩৬ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। ১৯৪১-১৯৫০—এই দশ বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় ছিল শতকরা১৩·২—জন্মের গড় ছিল শতকরা ৪০ ও মৃত্যুর গড় ছিল শতকরা ২৩; জন্ম ও মৃত্যু হারের পার্থক্য থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বুঝিতে পারা যায়। ১৯৫১ সালের জনগণনায় জনসংখ্যার বিবৃতি প্রসঙ্গে বলা হইয়েছে:—দশ বৎসরে শতকরা ১০-১৫ বৃদ্ধির হারকে স্বাভাবিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় গত ত্রিশ বৎসরের হিসাবে অসম্ভব অতিরিক্ত নাও হতে পারে।

যুক্তরাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৪০ সালে ছিল শতকরা ৭; ১৯৫০ সালে হয় শতকরা ১৩·৫।

আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার সমাধানের জন্য একই সঙ্গে দুইটি ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রস্তাব বিশেষজ্ঞেরা করিয়াছেন। প্রথম,—খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি। এখন বৎসরে আনুমানিক ১০০ লক্ষ টন খাদ্য উৎপন্ন হয়; ইহাকে বাৎসরিক ৯০০ লক্ষ টনে বাড়াইতে হইবে। দ্বিতীয়,—অসমর্থ ও দরিদ্র পিতা-মাতার সন্ততির জন্মের হার এখনকার শতকরা ৪০ হইতে শতকরা ৫-এর কাছাকাছি নামাইয়া আনিতে হইবে। ইহা সম্ভব হইলেই জনসংখ্যার অতি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা হইতে জাতি রক্ষা পাইতে পারে। আমাদের জনসংখ্যা ১৯৫১ সালের জন-গণনা হিসাবে ৩৬ কোটি; ১৯৫৪-৫৫ সালে সরকারী হিসাবে আনুমানিক বৃদ্ধি পাইয়া ইহা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৩৮ কোটিতে। এই হারে বাড়িতে থাকিলে ভারতের জনসংখ্যা ১৯৬১ সালে দাঁড়াইবে ৪১ কোটিতে।

[বিপিনচন্দ্র পালের 'নবযুগের বাংলা' হইতে।]

বাংলার বৈশিষ্ট্য

বিপিনচন্দ্র পাল

[এক]

বাঙ্গালী বাংলার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত বাংলার শ্রেষ্ঠতম মনীষিগণ বাংলার যে চিন্তা ও ভাবকে ভিলে ভিলে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, আজিকার বাঙ্গালী যুবকেরা কেবল নহেন অনেক বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত সে বাংলাকে চেনেন না। বাংলার চিন্তারাজ্য আজ নিষ্পন্দ, ভাবের স্রোত বন্ধ, বাংলার যে একটা বৈশিষ্ট্য চিরদিন ছিল, এখনও আছে, যে বৈশিষ্ট্য হারাইলে ভারতবর্ষের সমষ্টিগত চিন্তা, ভাব ও কর্ম্মভাণ্ডারে বাংলার আর কিছুই দিবার থাকিবে না, সে বৈশিষ্ট্যের কথা আজিকার বাঙ্গালী কেবল ভুলিয়াছেন তাহা নহে, তাহার উল্লেখমাত্র তাঁহাদিগকে অধীর করিয়া তুলে।

তাঁরা বলেন, আমরা কি প্রাদেশিকতাকে আবার বাড়াইয়া তুলিয়া ভারতের বিরাট জাতীয় জীবনের ঐক্যকে নষ্ট করিয়া দিব? বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালীত্বের অভিমানে ফাঁপিয়া উঠে, মারাঠা ও পাঞ্জাবী যদি আপন আপন প্রাদেশিক ইতিহাসের গৌরবে মুগ্ধ হইয়া ভারতে আবার নিজকে সকলের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, রাজপুত যদি পাঠান হইতে, তামিল যদি তৈলঙ্গী হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া রাখিতে চাহে, তবে ভারতে আমরা যে বিরাট জাতীয় জীবনের স্বপ্ন দেখিতেছি, তাহার সফলতার সম্ভাবনা কই? প্রাদেশিকতার যুগ চলিয়া গিয়াছে, জাতীয়তার যুগ আসিয়াছে, এ যুগে আবার বাংলার কথা লইয়া অত বাড়াবাড়ি কেন?

যারা এভাবে ভারতের নূতন জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহেন, তাঁরা যেমন বাংলাকে চিনেন না সেইরূপ ভারতবর্ষকেও চিনেন না। তাঁহারা এখনও য়ুরোপের ইতিহাসের মোহে পড়িয়া আছেন। য়ুরোপ যে পথে তার আধুনিক জাতীয়তা বা Nationalism গড়িয়া তুলিয়াছে, ইঁহারা সেই ভাবেই ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ ও নানা জাতিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক ছাঁচে ঢালিয়া একটা নূতন ভারতীয় জাতি বা Indian Nation গড়িয়া তুলিতে চাহেন।

ইঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে তাঁহাদের এই ভাবের মধ্যে ইংরাজের ভাবই প্রাধান্য লাভ করিতেছে। ইংরাজ কহেন, ভারতবর্ষ একটা দেশ নহে কিন্তু একটা মহাদেশ, ভারতবর্ষের এক পর্য্যায়ে আমরা ইতালী বা ফরাসী, ইংলণ্ড বা জার্ম্মানীকে বসাইতে পারি না। ভারতবর্ষের এক পংক্তিতে বসাইতে হইলে গোটা য়ুরোপকেই বসাইতে হয়। য়ুরোপের মধ্যে যেমন ইংলণ্ড আছে, ফরাসী আছে, ইতালী আছে, অষ্ট্রিয়া আছে, জার্ম্মানী আছে, রুশ আছে, সেইরূপ ভারতবর্ষে বাংলা আছে, গুজরাট আছে, পাঞ্জাব আছে, অন্ধ্র আছে, রাজপুতানা আছে, কর্ণাট আছে, মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজ আছে। এ সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যতটা পার্থক্য ও প্রভেদ আছে, য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রেও প্রায় সেইরূপই প্রভেদ আছে। এদের ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, প্রকৃতি এমন কি সমাজ-গঠন পর্য্যন্ত পরস্পর হইতে স্বতন্ত্রভিন্ন বিভিন্ন। গোটা ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে মোটামুটি ধর্ম্মের একটা ঐক্য আছে বটে; এরূপ ঐক্য য়ুরোপেও আছে। তুরস্ককে বাদ দিলে য়ুরোপের সকলে একই খৃষ্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। আর প্রটেষ্টেন্ট, ক্যাথলিক, গ্রীক চার্চ্চ বা রাশিয়ান চার্চ্চ—এ সকলের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, মাদ্রাজের স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব, মহারাষ্ট্রের শৈব ও গাণপত্য, বাংলার শাক্ত ও বৈষ্ণব,—এ ছাড়া নানকপন্থী, কবীরপন্থী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা কম নহে। এ সকলের উল্লেখ করিয়া ইংরেজ কহেন, যাহাকে জাতি বা নেশন কহে, তার উপাদান ভারতে এখন বিদ্যমান নাই। ইংরাজ ভারতের একচ্ছত্র রাষ্ট্রপতি হইয়া এক শাসন শৃঙ্খলে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশকে বাঁধিয়া, একথাতে ভারতের আধুনিক ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের

প্রবাহকে চালাইয়া, ভারতে এই সর্ব্বপ্রথম একটা জাতীয় জীবনের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। এই পথেই যদি সম্ভব হয় ভবিষ্যতে একদিন ভারতবর্ষেও একটা বিরাট জাতির সৃষ্টি হইতে পারে। হইবেই যে এমনও বলা যায় না। এই অনুধাবনেই ইংরাজ এ পর্য্যন্ত আমাদের আধুনিক জাতীয়তার স্পর্দ্ধাকে অগ্রাহ্য করিয়া আপনার শাসন শৃঙ্খলাকে সর্ব্বদাই নানাভাবে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

ইংরাজ বলেন, আমরা চিরদিনের জন্য তোমাদের শাসনভার বহন করিতে আসি নাই। আমাদের দেশ যেমন এক হইয়াছে, এক শাসনে শাসিত, এক ভাষা এক ধর্ম্ম, এক ভাবের ও ঐতিহাসিক গৌরবের বন্ধনে আবদ্ধ, তোমরা যেদিন সেইরূপ হইবে অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষে যেমন এক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইরূপ একভাষা প্রচলিত, এক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত, এক সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, মোটের উপর একই আচার-পদ্ধতি, একই রীতিনীতি, একই আদর্শের প্রেরণা গড়িয়া উঠিবে, সেদিন ভারতে জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হইবে। সেদিন তোমাদের নেশনত্বের দাবী মাথা হেঁট করিয়া মানিয়া লইতেই হইবে। সেদিন আমরা অম্লানবদনে তোমাদের দেশ ও তোমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের ভার তোমাদের হাতে অর্পণ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিব। কিন্তু যতদিন না তোমরা একটা জাতি হইয়াছ ততদিন আমরা যদি না থাকি—তোমাদের ছাড়িয়া যাই, তোমরা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া দেড়শত বৎসরে দেশে যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিবে এবং আমাদের পরিত্যক্ত রাজদণ্ড অন্য কোন প্রবলতর প্রতিবেশী আসিয়া নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া আবার তোমাদিগকে নূতন পরদেশী শাসনের অধীন করিবে।

যাঁরা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক জীবনকে পঙ্গু করিয়া ভারতের একতার নামে প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য করিয়া য়ুরোপের ছাঁচে ভারতীয় জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিবার কল্পনা করেন, তাঁরা ইংরাজের এ আপত্তিকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। তাঁরা জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক ভারতের জাতীয় জীবনের গঠনে, য়ুরোপে যে আদর্শে আধুনিক জাতীয়তা বা Nationality'র প্রতিষ্ঠা হইয়াছে সেই আদর্শেরই অনুসরণ করিতেছেন। তাঁদের য়ুরোপ-বিদ্বেষ যতটা প্রবল হউক না কেন, এই বিদ্বেষের ভিতর দিয়াই তাঁরা সর্ব্বদা সজ্ঞানে য়ুরোপকে সাধন করিয়া য়ুরোপকেই পাইতেছেন। তাঁরা বলেন বটে, ভারতের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করাই ভারতের নূতন জাতীয়তার লক্ষ্য, কিন্তু ভারতের এই বৈশিষ্ট্য কি,—এ প্রশ্নটা সম্যক্ অনুধাবন করিয়া দেখেন না।

[৪ই]

কি ধর্ম্মে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রীয় গঠনে, যখন ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র ছিল—ভারতবর্ষের প্রকৃতি ও সাধনা জীবনের সকল বিভাগে সর্ব্বদাই সমষ্টির ঐক্যের ভিতরে ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কোথাও কোন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া সেই সঙ্ঘের অন্তর্গত ব্যক্তি বা বিষয়ের স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যকে বিনাশ করে নাই। ভারতের দেবতা এক নহেন বহুও নহেন, কিন্তু তিনি সেই এক যাঁহার মধ্যে একের সঙ্গে বহু ও বহুর সঙ্গে একের সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের ধর্ম্ম খৃষ্টীয়ান বা মুসলমান ধর্ম্মের মতন ঠিক একটা ধর্ম্ম নহে; এ ধর্ম্মে কোনও এক অনন্যপন্থা, কোনও একটা মাত্র সাধন, কোনও একটা মাত্র প্রামাণ্য শাস্ত্র, কোনও একজন মাত্র ঈশ্বরের প্রবক্তা বা গুরুর প্রতিষ্ঠা হয় নাই। এ ধর্ম্মের বহু শাস্ত্র, সকলেই নিজ নিজ অধিকারে প্রামাণ্য বলিয়া পরিগণিত; বহু পন্থা; কিন্তু নদীসকল যেমন এক সাগরে যাইয়া পড়ে, সেইরূপ এই সকল বিভিন্ন পন্থা, যিনি "নৃণাম্ একো গম্যস্ত্বং"—সকল নরের একই গন্তব্য—তাঁহারই পদতলে গিয়া মিশিয়াছে। এ ধর্ম্মের বহু অবতার, নিজ নিজ যুগে সকলেই অনন্যপ্রাধান্য রক্ষা করিয়া সেই একেরই মহিমা প্রচার করিয়াছেন। এ অবতার-ধারা সৃষ্টির অনাদি আদি হইতে আরম্ভ হইয়া আজ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইতেছে। এধর্ম্মে অসংখ্য গুরু নিজ নিজ জীবনের প্রামাণ্য ও প্রত্যক্ষ সিদ্ধির পথে মুমুক্ষু মানবকে লইয়া যাইতেছেন। এত

বৈচিত্র্যের মধ্যে এমন অপূর্ব একত্ব, এত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এরূপ বিরাট উদার সমতা, ব্যষ্টিকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন করিয়াও সমষ্টির নিরবিচ্ছিন্ন ঐক্য এমন ভাবে রক্ষিত আর কোথাও দেখিতে পাই না। আর সর্বত্রই প্রায় মানুষকে এক ছাঁচে ঢালিয়া একাকারের উপরে ঐক্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে। সে চেষ্টা সফল হয় নাই। মানুষের প্রকৃতিতে এরূপ নিষ্পেষণ সহ্য হয় না। এই জন্য বারংবার মানুষ ধর্মের এই কঠোর শাসনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে। কিন্তু ভারতের মনীষা স্মরণাতীত কাল হইতে মানব-প্রকৃতির মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া তাহাকে ধর্মের শাসনে ও সমাজের বন্ধনে বাঁধিয়াও বৈষম্যের মধ্যে সাম্য, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

যেমন ধর্মে সেইরূপ সমাজে। আধুনিক মনুষ্যত্বের আদর্শের দিক দিয়া বিচার করিলে বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে অনেক কথা কহিতে পারা যায়। আমাদের প্রাচীনেরাও যে এই বর্ণাশ্রমকে ধর্মের বা সমাজের শ্রেষ্ঠতম পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। বৈদিক যুগ হইতে জ্ঞানের পথ ও কর্মের পথ—এই দুইটি প্রশস্ত পন্থা বিভাগ হইয়া, কেহ বা জ্ঞানকাণ্ড, কেহ বা কর্মকাণ্ডের আশ্রয়ে নিজ নিজ জীবনের সার্থকতা অন্বেষণ করিয়াছেন। আর জ্ঞানের পথে যাঁহারা চলিতেন তাঁহারা যজ্ঞাদি কর্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্ম—উভয়কেই অগ্রাহ্য করিতেন। গীতাতে প্রথমে বর্ণাশ্রমের কর্তব্য বিধান করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন, এই যে বর্ণাশ্রম ধর্ম, ইহা শেষ কথা নহে, প্রকৃত জ্ঞানী যাঁহারা, তাঁহারা সর্বভূতে আত্মদৃষ্টি লাভ করিয়া গরু, হাতী, কুকুর, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে একই চক্ষে দর্শন করেন। বর্ণাশ্রমের উপরেও কথা আছে; সে কথা—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।

বর্ণাশ্রমাদি সকল প্রকারের লোকধর্ম উপেক্ষা বা বর্জন করিয়া, কেবলমাত্র সর্বান্তর্যামী ভগবান যে আমি, তাঁহারই শরণাপন্ন হও। আমিই তোমাকে এই বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম পরিত্যাগজনিত যে পাপ তাহা হইতে রক্ষা করিব।

সেই প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের মধ্যে কত ভাঙ্গাগড়া হইয়াছে, কত নূতন মতের প্রতিষ্ঠা, কত নূতন পন্থার প্রচার, কত নূতন সাধনের আবিষ্কার হইয়াছে। ইহারা প্রত্যেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকিয়া একই হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই ভাবে সমাজের কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, বাহিরের বর্ণাশ্রম রক্ষা করিয়াও ভিতরে ভিতরে তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়াছে। অথচ হিন্দুসমাজ বলিয়া যে বিরাট বস্তু তাহার অঙ্গহানি কেহ করে নাই, করিতে পারে নাই, কাহাকেও করিতে দেওয়া হয় নাই। হিন্দুসমাজ কাহাকেও একান্ত বর্জন করে নাই, সকলকেই আপনার বিশাল অঙ্কে তাহাদের নিজ নিজ কোটে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া রক্ষা করিয়াছে। যেমন হিন্দুধর্মে, সেইরূপ হিন্দু সমাজজীবনেও এই ভাবে স্মরণাতীত কাল হইতে ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য পরিপূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখিয়া সমাজের সাধারণ একতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

যখন হিন্দুর নিজের অধিকারে রাষ্ট্রশক্তি ছিল তখন রাষ্ট্রীয় ঐক্য বন্ধনেও হিন্দু নীতিজ্ঞেরা এবং রাষ্ট্রপতিগণ এই আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। হিন্দু মহারাজ-চক্রবর্তীরা রোমান বা আধুনিক য়ুরোপীয় জাতিদিগের মত এক একটা বৃহদায়তন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন নাই, কিন্তু প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের সঙ্গে সখ্যবদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সকলের অভিমতানুযায়ী তাহাদের অধিনেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন। কাহারও সঙ্গে বিরোধ হইলে তাহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া পরাজিত রাষ্ট্র আত্মসাৎ করিতেন না, কিন্তু পরাজিত রাষ্ট্রপতির কোনও উপযুক্ত দায়াধিকারীকে শূন্য সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহারই হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতেন, এবং তাঁহাকে আপনার সখা বা সামন্তরাজ রূপে গ্রহণ করিতেন।

এইরূপে কি ধর্মে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে—সর্বত্র হিন্দু বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়াই সাম্যের, স্বাধীনতাকে বজায় রাখিয়াই ঐক্যের, ব্যষ্টির ও ব্যক্তির আত্মবিকাশ ও আত্মচরিতার্থতার পথ অবাধ রাখিয়া সমষ্টির মনোনিবিষ্টতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। মুসলমানেরা যখন এদেশে

আসিল তখনও ভারতীয় সাধনার এই বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় নাই। মতবাদের বিরোধ সত্ত্বেও হিন্দু মুসলমান সাধনার সার্বজনীন সত্যকে আপনার করিয়া লইয়াছে, এবং ক্রমে, বিশেষতঃ এই বাংলা দেশে, এমনও দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে হিন্দুর অকুণ্ঠভাবে মুসলমান দরগায় সিন্নি দিত এবং মুসলমানেরাও সরল ভক্তিভরে হিন্দু দেবদেবীর নিকট বলি আনিয়া দিত। মুসলমান যুগে এইরূপে হিন্দু-মুসলমানের একটা সমন্বয় সাধনের বহুতর চেষ্টা হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমানকে হিন্দু করিতে চাহে নাই, নিজেও মুসলমান হয় নাই, কিন্তু নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির সার্বজনীন সাধনে এবং মানবত্বের উচ্চ ভূমিতে হিন্দু-মুসলমানের একটা ঐক্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আর সে চেষ্টা যে বিফল হয়, এখনও বলা যায় না। আধুনিক য়ুরোপীয় চিন্তা এই আদর্শকেই Federalism নামে অভিহিত করিয়াছে। আধুনিক সভ্যতা এবং সাধনা এই আদর্শের অন্বেষণেই চলিয়াছে। এই আদর্শে স্বাধীনতার সঙ্গে বন্ধুতার, স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে ঐক্যের, বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমতার সমন্বয় সাধন হইয়াছে। এই আদর্শের সন্ধান য়ুরোপ সবে মাত্র পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ পথ ভারতের চির-পরিচিত পথ।

ভারতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করাই যদি ভারতের জাতীয়তার লক্ষ্য হয়, তবে ভারতের এই নব জাতীয়তার সাধকেরা তাঁহাদের সাধনার এই সনাতন প্রকৃতিকে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভারতের বৈশিষ্ট্য যে কি, ইহা যাঁহারা বোঝেন এবং সর্বদা স্মরণ করিয়া চলেন, তাঁহারা সমগ্র ভারতের ঐক্য সাধনের লোভে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যকে কখনই উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভারতের এই বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান প্রায় লোপ পাইয়াছে বলিয়াই আজ বাঙ্গালী প্রত্যক্ষ বাংলাকে ভুলিয়া, অপ্রত্যক্ষ যে ভারতবর্ষ নামে কল্পিত বস্তু, তাহার পশ্চাতে ছুটিতে চাহে।

[তিন]

ভারতের সমষ্টিগত সমাজ ও চরিত্রের এবং সাধারণ ভারতীয় সাধনার যেমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেইরূপ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক সাধনা ও সভ্যতার মধ্যেও বাংলারও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। জগতের বিভিন্ন সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার যেমন একটা বিশেষত্ব আছে, ভারতের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে বাংলার সভ্যতা ও সাধনার সেইরূপ একটা বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বই বাঙ্গালীকে ভারতের অপরাপর জাতি হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে; ইহাই বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব। বাংলার ইতিহাসে, বাংলার ধর্মে, বাংলার সাহিত্যে ও শিল্প-কলাতে, বাংলার সমাজ-জীবনে—সকল বিষয়ে বাঙ্গালীর এই বিশেষত্বটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বিশেষত্বটা আধুনিক নহে—অতি পুরাতন। যতদিন বাঙ্গালী সৃষ্টি হইয়াছে ততদিন হইতে এই বিশেষত্ব ইহাকে গড়িয়াছে। এই বিশেষত্বকে রক্ষা করিয়া, এই বিশেষত্বের মধ্যে যাহা সার্বজনীন তাহাকে বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া, তাহার দ্বারা ভারতের সাধনা ও জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টি সাধন করাই বর্তমান যুগে বাংলার প্রধান কর্তব্য। বাংলা, পাঞ্জাব বা মাদ্রাজ, গুজরাট বা অন্ধ্র নহে বলিয়াই বিচিত্র ভারতীয় সাধনাতে তাহার একটা বিশেষ স্থান আছে। এই স্থানটুকু হইতে ভারতবর্ষকে বাংলার কিছু দিবার থাকিবে না, আর যাহার বিশ্বকে কিছু দিবার থাকে না, সে প্রাচীনের স্মৃতিচিহ্ন রূপে পড়িয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার বাঁচিবার অধিকার থাকে না। বাঙ্গালী যদি বাংলাকে ভুলিয়া যায় তাহা হইলে তাহারও আর জীবনের উপরে কোনও দাবী থাকিবে না। সে বাঁচিল কি মরিল, ইহাতে কি ভারতের, কি জগতের কিছুই আসিয়া যাইবে না। এই কথাটাই আজ বাঙ্গালীকে সকলের আগে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

[চার]

বাংলা সম্বন্ধে অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে। আধুনিক বাংলাকে ইংরাজই গড়িয়া তুলিয়াছে, ইংরাজের ও এ অভিমান আছেই, অনেক শিক্ষিত ভারতবাসীর মনেও এরূপ একটা সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে যে এ সংস্কার নাই, এমন নহে। এ সকল বাঙ্গালী

সহসা প্রাচীনের প্রতি অত্যধিক আসক্তিবশতঃ ভারতচন্দ্রের পরে রাজা রামমোহনের সময় হইতে বাংলার যে নূতন সাহিত্য ও সাধনা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা ইংরাজের অনুচিকীর্ষার ফল ভাবিয়া তাহাকে অত্যন্ত হেয় মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহারা কল্পনা করেন যে এই আধুনিক বাংলা সত্যকার বাংলা নহে। সে বাংলা ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সুতরাং, এ বাংলার কথা লইয়া আর অত বাড়াবাড়ি কেন?

কিন্তু বাংলা কি সত্যই ইংরাজি শিখিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে? এই ইংরাজী শিক্ষা ত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বাংলা না হয় সকলের আগে ইংরাজী সাহিত্য ও য়ুরোপীয় সাধনার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু, ক্রমে সে সাহিত্য ও সাধনা সমগ্র ভারতবাসীর চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। অথচ, একই ইংরাজী শিক্ষার ফলে বাঙ্গালী যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে অন্য প্রদেশে ইংরাজি-শিক্ষিত ভারতবাসী সে ভাবে ত ফুটিয়া উঠে নাই—এমনটা কেন হইল? এ সমস্যার ত সমাধান করা চাই।

এ প্রশ্নটা তুলিলেই আমরা দেখিতে পাই, আধুনিক বাংলার এই বিশেষত্ব কেবল ইংরাজী শিক্ষার ফলে নহে, কিন্তু বাংলার পুরাতন সাধনা ও মনীষার উপরে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা ও শিক্ষার জ্যোতিঃ পড়িয়া সেই প্রাচীন প্রাণকে অভিনব ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা বাংলায় একটা নূতন যুগ আনিয়াছে, একথা মানিতেই হইবে। কিন্তু বাংলার চরিত্র ও ইতিহাসের অনুসন্ধান করিলে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে এই নূতন যুগেও সেই পুরাতন বাঙ্গালী চরিত্র ও সাধনাই অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র। কেবল রূপের পরিবর্তন হইয়াছে, মূল বস্তু নষ্ট হয় নাই; তাহা যেমন ছিল, তেমনই আছে।

সে মূল বস্তুটী স্বাধীনতা। বাংলা চিরদিন—কি সমাজের কি ধর্ম্মের—সকল প্রকারের বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া মুক্তভাবে আপনার সার্থকতার অন্বেষণ করিয়াছে, প্রাচীন শাস্ত্র মানিয়াও তাহার অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া সেই শাস্ত্র বন্ধনকে সর্ব্বদা শিথিল করিয়া আসিয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুগণ যেকালে পুরাতন স্মৃতির দুর্গে বাঁধা পড়িয়াছিলেন, তখনও স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন নূতন স্মৃতি রচনা করিয়া বাংলার হিন্দু-সমাজকে প্রাচীনের নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতের হিন্দু-সমাজের আর কোথাও এরূপভাবে এত বড় একটা বিপ্লব ঘটিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। ব্যবহার-শাস্ত্র এবং অর্থনীতি সম্বন্ধেও বাংলা প্রাচীনকাল হইতেই আপনার একটা নিজের পথ গড়িয়া তুলিয়াছিল। একাদশ খৃষ্টীয় শতাব্দীর শেষ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মার্ত্ত ভট্টনারায়ণের বংশধর ব্যবহারবিদ্ ও স্মার্ত্তশিরোমণি জীমূতবাহন বাঙ্গালা হিন্দুর দায়াধিকার নির্ণয় করিয়া দায়ভাগ প্রণয়ন করেন। এই দায়ভাগ কেবল বাংলার হিন্দু-সমাজেই প্রচলিত, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুগণ মিতাক্ষরার অধীন। মিতাক্ষরাতে পুত্রের নিজের ধনের উপরে সম্পূর্ণ স্বাধীন অধিকার নাই। দায়ভাগে পুত্রকে তাহার মৃত্যুর পরে বা পূর্ব্বে স্বেচ্ছামত নিজের ধন সম্পত্তি বা অ-সম্পত্তি যাহাকে ইচ্ছা দান করিবার অধিকার দিয়াছে; এ বিষয়ে কোন প্রকার বাধাবাধি নাই। জীমূতবাহনই যে ইহা নিজে সৃষ্টি করিলেন, এরূপ কল্পনা করা যায় না; সমাজে যাহা প্রচলিত ছিল, সমাজের রীতি ও প্রকৃতি যেদিকে চলিতেছিল, তাহার উপরেই আপনার নূতন বিধান প্রতিষ্ঠিত করেন। জীমূতবাহনের চারিশতাধিক বৎসর পরে স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন দায়ভাগ প্রচার করিয়া জীমূতবাহনের দায়ভাগই কোনও বিষয়ে নূতন ব্যাখ্যার দ্বারা আরও উদার করিয়া তুলিলেন। মিতাক্ষরা অনুসারে সম্পত্তি সমগ্র পরিবারেতে সমষ্টিভাবে আবদ্ধ থাকে; পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন লোকের সম্পত্তির নিজ নিজ অংশ পরিবারের অন্যান্য অংশীদারের অনুমতি ব্যতীত হস্তান্তরিত করিতে পারেন না। অনুসারে বাঙ্গালী হিন্দুর এ অধিকার আছে বাংলার হিন্দু-সমাজে অর্থ-ব্যবহার সম্বন্ধে এমন

স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হয়, যাহা মিতাক্ষরার অধীন হিন্দু-সমাজে হয় নাই। মেইন সাহেব কহেন যে, বাংলা অতি প্রাচীন কাল হইতে বাণিজ্য-প্রধান দেশ ছিল বলিয়াই মিতাক্ষরার বাঁধাবাঁধি নিয়ম তাহার সহ্য হয় নাই। কীমূত-বাহন কহিয়াছেন যে, শত শাস্ত্রবচনের দ্বারাও বস্তুর পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। ইহাতেই বাংলার মনীষার সনাতন স্বাধীনতা প্রবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

মুসলমান সভ্যতা ও সাধনার প্রভাবে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে অনেক নূতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। নানক, কবীর প্রভৃতি যে সাধনা প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা হিন্দুসাধনার অন্তর্গত হইলেও ঠিক সে সাধনার ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখে নাই। সিখেরা ত সম্পূর্ণরূপেই পৃথক হইয়া পড়েন। কিন্তু ঐ যুগেই মহাপ্রভু বাংলা দেশে যে যুগধর্ম্মের প্রচার করেন তাহাতে হিন্দু সাধনাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই এক নূতন প্রাণতার সঞ্চার করিয়া তাহাকে সে যুগের উপযোগী এক নূতন আকার প্রদান করেন। ফলতঃ বাংলার বৌদ্ধযুগের অবসান হইতে বাঙ্গালী ধর্ম্ম-সাধনে, সিদ্ধান্তে, মতবাদে ও সামাজিক আচার-ব্যবহারে এমন একটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, যাহা ভারতবর্ষের অন্যান্য কোনও হিন্দুসমাজে দেখা যায় না। সাধক এবং সিদ্ধপুরুষেরা নূতন নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ সকল সাধনার লোকেরা সমাজের মধ্যে থাকিয়াই আপনাদের অন্তরঙ্গ ধর্ম্মজীবনে প্রাচীন শাস্ত্র কিম্বা আচার-বিচারের বন্ধন মানিয়া চলেন নাই। সমাজও ইহাদিগকে এই স্বাধীনতা দিয়া আসিয়াছে। কুলগুরুর সঙ্গে সঙ্গে সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়া স্বাধীন ভাবে ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধনার কথা আর কোথাও শুনি নাই। "লোকের মধ্যে লোকাচার, সদ্‌গুরুর কাছে সদাচার" ইহার অনুরূপ কথা অন্যত্র নাই। আপাততঃ কথাটা কেমন কেমন শোনায় বটে—অনেকে ইহাকে মিথ্যাচারও বলিতে পারেন, কিন্তু ইহার ভিতরে যে স্বাধীনতার প্রেরণা আছে, ইহাতে সমাজের বন্ধুতার সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যে একটা সঙ্গতির চেষ্টা রহিয়াছে, একথাও অস্বীকার করা যায় না। বামাচারী তান্ত্রিকদিগের চক্রে কোনও প্রকারের জাতিভেদ মানা হয় না। "প্রবর্ত্তে ভৈরবী চক্রে সর্ব্ববর্ণাঃ বিশেষতঃ"—ভৈরবী চক্রে বসিলে চণ্ডালও শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণের সমান হন; তখন চণ্ডালের মুখের অন্ন ব্রাহ্মণ নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারেন। ইহার মধ্যে কোনও লুকোচুরি ছিল না। অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধনমণ্ডলীতে জাতিবর্ণের বিচার হয় নাই। ইহা বাংলার বিশেষত্ব। এ সকলের দ্বারা স্বাধীনতা-স্পৃহা বাংলার প্রকৃতির ভিতরে কতটা যে বলবতী, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলায় দক্ষিণের শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত সমগ্র হিন্দুসমাজের কোনও অধিনায়ক ছিলেন না এবং নাই। বাংলায় কুলগুরু আছেন, সদ্‌গুরু আছেন, কিন্তু সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবান ব্যতীত "জগদ্‌গুরু" বলিয়া কোনও মানুষ বা মোহান্ত নাই। বাংলায় ব্রাহ্মণ আদি বর্ণ আছেন। কিন্তু মাদ্রাজ বা দাক্ষিণাত্যের মত ব্রাহ্মণ্য প্রভাব নাই। বাংলায় চণ্ডালেরা মাদ্রাজ বা মহারাষ্ট্রের "পারিয়া"-দিগের মত একান্তভাবে কখনও "অস্পৃশ্য" বলিয়া বিবেচিত হন নাই। পারিয়ারা হিন্দুর দেবমন্দিরের ছায়ার নিকটও যাইতে পারেন না—মন্দির-সংলগ্ন জলাশয় স্পর্শ করিতে পারেন না, মন্দির-পার্শ্ববর্ত্তী পথে বিচরণ করিবার তাঁহাদের অধিকার নাই। বাঙ্গালীর চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গণে বাংলার চণ্ডালেরা পূজার সময় দেবতার ভোগ-আরতিকালে ঢোল বাজাইয়া থাকেন। মাদ্রাজে "দৃষ্টিদোষ" মানা হয়,- অর্থাৎ ব্রাহ্মণের খাদ্যের উপরে অ-ব্রাহ্মণের চক্ষু পড়িলে তাহা অশুচি হইয়া যায়, বাংলায় "দৃষ্টিদোষ" বলিয়া কোনও বস্তু নাই। এরূপ কি সামাজিক জীবনে, কি ধর্ম্মসাধনে বাংলার সাধনার মধ্যে বৌদ্ধযুগ হইতেই একটা অপূর্ব্ব স্বাধীনতার প্রেরণা জাগিয়া আছে। ইহাই বাংলার প্রধান বিশেষত্ব।

বাংলার সনাতন সাধনার আর একটা বিশেষত্ব—ইহার মানবতা—ইহাকে আর কি বলিব, সহসা ভাবিয়া পাই না। বাংলায় দেব-বাদ আছে সত্য, কিন্তু বাংলায় যে সকল দেবদেবীর পূজা প্রচলিত তাঁহাদের সকলের মধ্যেই একটা অদ্ভুত মানবতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালী, দুর্গা, সরস্বতী, ইঁহাদের কাহারও চারি বা দশ হাত আছে বটে, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এসকল যে অপূর্ব্ব মাতৃ-মূর্ত্তি ইহা আশ্চর্য্য-রূপে প্রত্যক্ষ হয়। এই অতিপ্রাকৃত হাতগুলি বাদ দিলে

ইহাদিগকে ম্যাডোনার সঙ্গে তুলনা করা যায়। দুর্গা ও সরস্বতীর মুখের অণুতে অণুতে আমরা যে মাতৃভাবে পালিত পালিত, সেই সার্বজনীন মানবীয় মাতৃভাব যেন ফাটিয়া পড়ে। দক্ষিণের হিন্দুরা হনুমানের ও গণপতির পূজা করেন। পশ্চিমদেশে মহাবীরের আরাধনা বহুলোক-প্রচলিত। কিন্তু বাংলার মূর্তিপূজাতে কেবলমাত্র দুর্গা-প্রতিমার সঙ্গে গণেশের মূর্তি থাকে। জনসাধারণের উপাস্যরূপে আর কোথাও গণপতির পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত নহে, কেবল বাংলার বণিকসম্প্রদায় সিদ্ধিদাতারূপে গণেশের ছবি আপনাদের খাতার শিরোদেশে অঙ্কিত ও গণেশের প্রতিমূর্তি ব্যবসায়-স্থানের দ্বারদেশের উপরে স্থাপন করিয়া থাকেন। এছাড়া বাংলার মূর্তিপূজার বা প্রচলিত দেবোপাসনার অতিপ্রাকৃতের বা অতি-মানবতার প্রভাব অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে কম।

তারপর বাংলার অবতারবাদকে আশ্রয় করিয়া পৃথিবীর সর্বত্র ধর্মের গোড়ার অতিপ্রাকৃতের ও অতি-মানবতার প্রভাব স্বল্প-বিস্তর ক্ষীণ হইয়া মানুষের আরাধ্য দেবতাকে মানবত্বের ভূমিতে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারতবর্ষের পৌরাণিক ধর্মেও অবতারবাদের আশ্রয়ে পরম দেবতা মানব-দেহ ধারণ করিয়া মানবত্বের ভূমিতে আসিয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন। পশ্চিমে এবং দাক্ষিণাত্যে এইরূপে শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা ধর্মকে মানবত্বের ভূমিতে আনিয়াছে। কিন্তু বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে এই অবতার-বাদ যে অদ্ভুত বিকাশ লাভ করিয়াছে সেরূপ আর ভারতের অন্য কোথাও হয় নাই। ভারতের অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা আছে। কিন্তু এ সকল কৃষ্ণোপাসকেরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলিয়াই জানেন। কেবল বাঙালী বৈষ্ণবেরাই শ্রীকৃষ্ণকে অবতাররূপে নহে, কিন্তু "অবতারী" রূপে—অর্থাৎ যাহা হইতে সকল অবতার-প্রবাহ প্রকাশিত হয় সেই পরম পুরুষ শ্রীভগবানরূপে—প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং"—আমরা যে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করি, তিনি স্বয়ং ভগবান। শ্রীজীবগোস্বামী 'লঘু-ভাগবতামৃতে' স্পষ্ট করিয়াই কহিয়াছেন যে, যদু-সম্ভূত যে শ্রীকৃষ্ণ তিনি অন্য। আমরা যে শ্রীকৃষ্ণের কথা কহি, তিনি এই যদু-সম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ নহেন। যদু-সম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার রাজা ছিলেন, ভারতযুদ্ধে পাণ্ডবদিগের সহায় ছিলেন, কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের রথের সারথী হইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের যে শ্রীকৃষ্ণ—

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচ্চিৎ নৈব গচ্ছতি।

বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কদাপি তিনি অন্যত্র গমন করেন না।

এই বৃন্দাবন তাঁহার চিদানন্দময় নিত্যধাম। এই শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ বা ষড়ভুজ নহেন—তিনি সর্বদাই দ্বিভুজ। এইরূপ সিদ্ধান্তের দ্বারা বাংলার বৈষ্ণব মহাজনেরা স্বয়ং ভগবানের পরিপূর্ণ মানবত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভগবান নিরাকার নহেন, জড়াকারও নহেন, কিন্তু চিদাকার। তিনি বিদেহী নহেন, অপচয়-উপচয়শীল জড়দেহধারীও নহেন, কিন্তু চিদ্দেহধারী, নিখিল রসামৃতমূর্তি। তিনি অতীন্দ্রিয় বটেন অর্থাৎ প্রাকৃত মানবীয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না, তাই বলিয়া তিনি নিরীন্দ্রিয় নহেন, কিন্তু চিদিন্দ্রিয়-সম্পন্ন। তিনি নিরংশ নহেন, কিন্তু তাঁহার নিত্যলীলা পরিকর ও পরিকরের সঙ্গে নিত্যকাল বিরাজিত। এইরূপে বাংলার বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ভগবানের পরিপূর্ণ মানবত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া মানবের মনুষ্যত্বের ভূমিতে মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে এক নিত্য মাধুর্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীভগবানের অনন্ত লীলা, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি জীবের সঙ্গে তিনি অনন্তভাবে লীলা করিতেছেন।

কিন্তু—

কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।

এমন কথা ভারতের অন্যত্র কেন, জগতের আর কোথাও কেহ কহিয়াছেন বলিয়া জানি না। এই সিদ্ধান্ত ও সাধনার বলেই বাংলার কবি চণ্ডীদাস দুনিয়ার মানুষকে ডাকিয়া কহিয়াছেন—

শুন হে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

আধুনিক যুগের করাচীর সম্প্রদায়ের কবি ইহারই যেন সৃষ্টি নি করিয়া গাহিয়াছেন,—

"কি আর বলিব রে, কে করিবে প্রত্যয়
এই মানুষে আছে সত্য, নিত্য চিরানন্দময়।"

অতি সংক্ষেপে এবং সামান্য ভাবেও বাঙ্গালার চিন্তার ও সাধনার ইতিহাস লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এক দুর্লক্ষনীয় স্বাধীনতার স্পৃহা এবং সাধনের ধীরা দেবতাকে মানুষ বলিয়া ধরা এবং মানুষের মধ্যে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করা, ইহাই বাঙ্গালীর পুরাগত সাধনার মূল লক্ষণ বলিয়া দেখিতে পাই। এই স্বাধীনতার ভাব ও মানবতার আদর্শ আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়াছিল বলিয়াই ইংরাজ যখন য়ুরোপের এই যুগের নূতন স্বাধীনতার ও নূতন মানবতার সংবাদ লইয়া আমাদের নিকট আসিল, আমাদের সেই সুপ্ত স্মৃতিকে জাগাইয়াই তাহার এই নূতন শিক্ষা আমাদিগকে এমনভাবে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। যদি এই নূতন শিক্ষা আমাদের পুরাতন প্রাণের স্মৃতিকে না জাগাইত, তাহা হইলে কখনও আমরা ইহাকে এমন করিয়া প্রাণ দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিতাম না। একই ইংরাজী শিক্ষা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া বাংলার যেভাবে ফলিত হইয়া উঠিয়াছিল, অন্যত্র যে সেভাবে হয় নাই, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল বাংলার পুরাগত সাধনার বৈশিষ্ট্য। বাহিরে নূতন হইলেও এই শিক্ষার মূলমন্ত্র আমাদের নিকট নূতন ছিল না বলিয়াই প্রাক্তনলব্ধ বিদ্যার মত ইহা আমাদের মধ্যে এমন অপূর্ব্ব-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

মাতৃভাষার অনুশীলন

—রাজনারায়ণ বসু

জননীর স্তন্যদুগ্ধ যদ্রূপ অন্য সকল দুগ্ধ অপেক্ষা বল বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ জন্মভূমির ভাষা অন্য সকল ভাষা অপেক্ষা মনের বীর্য্য প্রকাশ করে।.....পর ভাষার আলোচনায় মনের শক্তি স্ফূর্ত্তি হয় না, এবং আত্ম-ভাষার অনুশীলন বিনা কোন দেশে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তার উদয় হয় নাই।.....সামান্যত দেখ ইউরোপ খণ্ডে যে পর্য্যন্ত লাটিন ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত ছিল, সে পর্য্যন্ত সেখানে বিদ্যার স্ফূর্ত্তি হয় নাই, এবং উত্তম গ্রন্থ সকলও প্রকাশ হয় নাই। তৎখণ্ডের লোক সেই কালের অন্ধকাল সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তৎপরে ইটালী, স্পেন, পোর্টুগেল ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের লোকেরা যখন স্ব স্ব দেশ ভাষার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, তদবধি ইউরোপ খণ্ড গ্রন্থকারদিগের যশেতে আমোদিত ও জ্ঞান-জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইতে লাগিল। ইহা কি সুখের চিহ্ন! যে যদি এই মহাত্মাদিগের ন্যায় আমরা আত্মভাষাকে সুশোভিত করিতে পারি, তবে তাহাতে যদি সুরচিত গ্রন্থসকল প্রকাশ হয়, তবে আমারদিগের অতি অনুপম সন্তোষ লাভ হইবে.....। আমারদিগের দেশ ভাষা যে এমত সুললিত হইবে ইহা সম্যক সম্ভব, কারণ তাহার বর্ত্তমান আকর যে রত্নাকর সংস্কৃত তাহার ন্যায় সুশোভন সর্ব্বার্থ প্রতিপাদক মহাভাষা এই ভূমণ্ডলে কদাপি আর বিরাজমান হয় নাই।

(১৮৪৮ সালে হেয়ার স্মৃতি-সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা—সাহিত্য সাধক চরিতমালা হইতে উদ্ধৃত)

রাত দশটার পরও যে কোন সময় আপনি যদি শ্যাম-বাজারের পাঁচমাথার মোড়ের কাছে দাঁড়ান, দেখতে পাবেন তখনও সেখানে কত আলোর রোশনাই। লোকজন, হৈ-হল্লা। এখানে কিন্তু ওসব নেই।

শ্যামবাজার ছাড়িয়ে স্ট্রীটটা দিয়ে আপনি এগোতে থাকুন, যতদূর খুশী। যত এগোবেন ততই দেখবেন ক্রমশঃ আলোর রেখা স্তিমিত হয়ে আসছে। কমে যাচ্ছে জন-কোলাহল।

বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে এইভাবে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে আরও খানিকটা। বেশ কিছুদূর। ছুটো একটা মোড় পেরোলেই পাবেন টপেন রোডের মোড়টা—যে জায়গার কথা আমি বলছি। এখানে দশটার পরই রাত নিঝুম। চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়েছে। ঝিমিয়ে গেছে যেন বেঁচে থাকার তাগিদ। হয়ত দু-একটা বাড়ীতে তখনও পাওয়া যাবে বাসন-কোসনের মৃদু আওয়াজ—শুয়ে পড়ার আগে জেগে থাকবার শেষ-ব্যস্ততা। নয়ত রেডিয়োর খাট সুরের সুরেলা দেতার ঝঙ্কার। তাও সেই রাত এগারোটা পর্যন্ত। তারপর সব চুপ।

জনবিরল রাস্তাটাও নির্জীব। যাত্রীবাহী বাস বা প্রাইভেটের সংখ্যা অনেক আগে থেকেই কমতে কমতে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শুধু মাঝে মাঝে রাত-বিরেতির অখণ্ডতা ভঙ্গ করে চলাচল করছে দূরপাল্লার ভারী ভারী দৈত্যের মত ট্রাকগুলো। হেডলাইট ছুটোকে তখন ঠিক মনে হবে জলজলে দৈত্যের চোখের মতই। সমস্তের সামান্য একটা ভগ্নাংশকে আলো মাখিয়ে আধার তারা ডুব মারবে। থাকবে শুধু ঘন কালি।

রাত যত বাড়বে, ততই এই ট্রাকগুলোর আনাগোনা বেড়ে উঠবে। চলবে সারা রাত ধরে। রেখে যাবে চকচকে অ্যাসফাল্টের উপর একটানা গুড়গুড় একটা যান্ত্রিক শব্দ।

আর থাকবে সারা রাত খোলা মোড় থেকে এগিয়ে ওই পেট্রোল পাম্পটা। সংগে সংগে জ্বলবে অনেক উঁচুতে একটা ঘড়ের পর পাম্পিং স্টেশনের মার্কারি ল্যাম্পটা, আলো ছড়াবে বহুদূর পর্যন্ত। ছায়া ছড়াবে তার চেয়েও বেশি বুঝি।

এরই পেছনের বাড়ীটাই সুমিতাদের। এখানের বাতিগুলোও নিভে গেছে তখন। শুধু জ্বলছে দোতালার পেট্রল পাম্প বরাবর ঘরটায় এক টুকরো ফিকে নীল

ওটাও জলছে সারারাত।

সুমিতার ঘর ওইটেই। ওর ঘরেই আলোটুকু জলছে সমানভাবে। বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সুমিতাও শুয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। গা এলিয়ে দিয়েছে দুধ-সাদা নরম বিছানায়। কিন্তু সুমিতা মোটেই ঘুমিয়ে পড়েনি। কি যে এক দুর্দিন হয়েছে ওর এ বাড়ীতে এসে, তা ও কাউকেই বলে বোঝাতে পারে না। রাতে কিছুতেই ঘুম আসে না। আজ নয়; রোজই এ রকম। দিনের সমস্ত চিন্তা যেন একজোট হয়ে রাতে সুমিতার মাথায় ভর করে। বিছানায় শুধু এপাশ-ওপাশ করে সুমিতা। মাথার ভেতর কিলবিল করতে থাকে যত রাজ্যের চিন্তা। পাক খায় নানান রকম কথা।

মাঝে মাঝে নিশুতি রাতের চুপ-পরিবেশকে ভেঙ্গে ফেলে ওর কানে হাসি ভেসে আসে।

বিছানা ছেড়ে সুমিতা হয়ত জানালায় উঠে আসে। দেখতে পায় নীচের ভারবাহী কোন লরী এসে পাম্পিং স্টেশনে দাঁড়িয়েছে। তেল নেবে।

রাত জাগা লোকটা এতক্ষণে কাজ পেয়েছে। ড্রাইভারটার গলা শোনা যায়। দুজনেই কথা বলে কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে। তেল নেয় গাড়ীটা। স্পষ্ট কথা কিছু শোনা যায় না। শুধু ভেসে আসে ওদের হাসিটুকুই।

তারপর তেল নেওয়া হয়ে যায়। গাড়ীটা গুড়গুড় করে এক সময় চলে যায়। তখন আবার সেই আগেকার নিরিবিলি। প্রশান্ত সব কিছু। চুপ হয়ে যায় পাম্পিং স্টেশনের লোকটাও।

সুমিতা ফিরে যায় তার বিছানায়। ঘুমোনোর চেষ্টা করে। কিন্তু ঘুম আসতে চায় না একেবারেই। শুধু চোখ বুজে পড়ে থাকা।

সুমিতার দাদা এ বাড়ীটা নতুন কিনেছেন মাসখানেক হল। চেনা-জানা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাই এসেছে, দেখে গেছে বাড়ীটা। প্রত্যেকেই বলেছে, খাসা হয়েছে বাড়ীখানা। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর এ রকম ফাঁকা জায়গায় চুপও বসে বিশ্রাম করলেও নতুন বল লাভ করা যায়। এক কথায় সুন্দর ছবির মত বাড়ী।

অথচ সেই থেকেই—মানে এ বাড়ীতে আসা থেকেই সুমিতার মনে শান্তি নেই। আর সেই সঙ্গে দূর হয়েছে ঘুমটা। কোথায় যেন হঠাৎ উবে গেছে। এ বাড়ীর সবকিছুই অদ্ভুত ওর কাছে। কেমন যেন হাহাকার মেশা এক শূন্যতার ছাপ। কাছে পিঠে ওরা ক'জন ছাড়া যেন আর কেউ নেই।

এমনিতে বাড়ীটা সত্যিই সুন্দর। ছোট, দোতলা। আনকোরা ঝকঝকে রং করা। খোলা ছাদ। ছাদে দাঁড়ালে ওদিকে ডানলপ ব্রীজ, এদিকে আরও অনেকদূর চোখের সামনে খুলে যায়।

ছোট ছোট অনেকগুলো ঘর। ফাঁকা উঠোন। বাইরে আলাদা করে সাজান বসবার ঘর। সুমিতারা ঐ'ত ও'কজন লোক। তাই এখানে সবসময় মনটা বুঝি ফাঁকাই থেকে যায়। দোতালায় এরই একটা ঘর এখন সুমিতার। একদম নিজস্ব।

সে ঘরের শান্তি কেউই ভংগ করবে না। একা একা নিজের ঘরে বসে যা খুশী করো। কাজকর্ম কিছুই ওকে করতে হবেনা বলতে গেলে। যেটুকুও বা ছিল এ বাড়ী এসে আরও কমেছে। সকাল, সন্ধ্যে, রাত তাই ভেবে ভেবেই কাটায় সুমিতা। মোটের উপর এই নিস্তব্ধ শান্ততা ওর ভাল লাগে না।

কাজ করলে তবু কিছুক্ষণ ভুলে ভুলে কাটান যায়। তখন আর এসব মনে হয় না। কিন্তু কাজই বা কি! সকালে উঠে ঘন্টা দুয়েক পড়ার পর হয়ত নীচে নামে সুমিতা। একটু এদিক ওদিক পাইচারী করে। স্কুলের তাড়া নেই আর আগের মত। এ বাড়ী আসার পর তাও গেছে। কোনও দিন বা হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ পেরিয়ে ক্রমে ও এসে দাঁড়ায় ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড পর্যন্ত। বেশীক্ষণ কাটে না। বউদি হাঁক-ডাক শুরু করেন। ফিরে যায় সুমিতা। একটু ঘোরে বুঝি বউদির কাছে কাছেই, দু'এক পাক। অল্পক্ষণ বাদেই আর ভাল লাগে না। হাতে কোন কাজ না থাকায় তখন বাথরুমেই ঢুকে পড়ে সুমিতা।

বাথরুমে কাটে জল ঝির-ঝির অনেকগুলো সময়।

ঝির্-ঝির্ করে কলের ঠাণ্ডা জল পড়ে। সেই জলে স্নান করে চলে সুমিতা। বাথরুম বন্ধ করে জলের তলে পড়ে থাকে, আধার বউদি যতক্ষণ না ডাকাডাকি শুরু করেন ততক্ষণ উঠে আসে না ও।

দাদারা তিনজনই বেরিয়ে যায় অনেক আগেই। যে যার অফিসে। বাড়ীতে তখন শুধু দুটো প্রাণী, বউদি আর সুমিতা। ওদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলেই ফাঁকা হয়ে যায় নীচের তলাটা। শূন্য একফালি উঠোন আর এক ঝলক গনগনে রোদ শুধু পড়ে থাকে।

খালি উপরটাও। কেউ নেই, কিছু নেই। এ সময়টায় একটা চড়াইয়ের কিচির-মিচিরও সুমিতার কানে আসে না। ঝিরিঝিরি, নির্জন। নিজের ঘরেই ঢুকে পরে সুমিতা। ঘরে এসে এটা-সেটা নাড়াচাড়া করে খানিক-ক্ষণ ও।

বউদি তখন শুয়ে পড়েছে। বউদির ঘরে মাথার পাশে রেডিয়োটা খোলা। টুং টাং টুকরো সুর যাও বা আসে তাও সুমিতার ভাল লাগে না। একটা গল্পের বইয়ের পাতা খুলে সময় কাটানর চেষ্টা করে।

এরপর রোদের তেজ কমতে থাকে চকচকে রাস্তার অ্যাসফাল্টের গা থেকে। কমতে কমতে একসময় মুছে যায় একদম। বিকেলের আমেজ নামে। তাইপো দুটো স্কুল থেকে বাড়ী আসে। সুমিতা উঠে পড়ে ঘর ছেড়ে। নেমে আসে নীচে।

দাদাদের অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে ছটা বেজে যায়। সন্ধেটা আবার একটু সোরগোল, দু'এক কাপ চা, খাবার চলে সাতটা পর্যন্ত। তারপরই সবচেয়ে অসহ্য বুঝি। সবকিছুর অভাব বরিবা পূরণ হয়, এ সময়টা কোনমতেই সহ্য হয় না সুমিতার। সেই সঙ্গে সহ্য হয় না ওর এই নতুন বাড়ীর নির্জনতা।

পড়তে বসে এসে ও জানালার পাশ ঘেঁষে। পড়তে বসে মনটা চোকাতে চায় বইয়ের পাতায়। কিন্তু মনটা কোথায় যেন ডুব দেয় তখনই। একদম তলিয়ে যায়। বাইরে চোখ ফেরাতেই দৃষ্টি বাধা পায় পাশের সেই মার্কারি ল্যাম্পটায়। ভেতরে তাকাতেই আবার ফিরে আসে মন পুরানো সেই স্মৃতিতে। যে স্মৃতিটা সুমিতার মাথার যেন চেপে বসে কখন। কিছুতেই যেতে চায় না। বহু চেষ্টা করেও তাড়ান যায় না। অবশেষে হার মেনেছে সুমিতা, হার মেনেছে মনের এই দুর্বলতার কাছে।

দর্জিপাড়ার সেই টুকরো জীবনটুকু! যা অহরহ-ফাঁক পেলেই সুমিতার মনে এসে ভীড় করে। দর্জিপাড়ার ছোট একটা পুরানো বাড়ীতে ওরা থাকত। এও বাড়ী, সেও বাড়ী! ভাংগাচোরা ঘিঞ্জী একরাশ। জীবনটা ওখানে যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে জড়িয়ে থাকত। হাত-পা ছড়ানর অবসর মিলত না।

হাত পাঁচেক গলির একটা ব্যবধান। এপাড়-ওপাড় বাড়ী। ঠাসাঠাসি। গায়ে গা লাগিয়ে। এক বাড়ীর জানালা দিয়ে আরেক বাড়ীর সবকিছু দেখা যায়। ওখানকার চলার ছন্দটা ছিল কেমন একটা সার্বজনীন—নিজস্ব ছিল না কিছুই। তবু সুমিতার ওই বাড়ীটাই কেন যেন ভাল লাগত। এখনও তাই সময় পেলেই মনটা ঘুরে ঘুরে ওখানে ঢুকতে চায়। ফিরে যেতে চায় দর্জিপাড়ার কলরব-মুখরতায়।

ওখানকার দিনগুলোও কাটত অন্য রকম। এতবড় রাস্তা ছিল না। এত গাড়ীর গতি ছিল না। তবু ছিল সব কিছু। জীবনের অন্য সুর। যে সুর নির্জন নয়, কোলাহল পূর্ণ। মৃত নয় ব্যস্ত। স্বতন্ত্র নয় মিলিত।

দর্জিপাড়ার সকাল আসত কুয়াশা মেখে। আসত না রোদের ঝিলিক। কিন্তু মনে আসত ভীড়। ভীড়ে ভেসে চলত সুমিতা, সকাল থেকে সন্ধে। ঘুম ভাঙার চোখে পড়তে বসত সুমিতা। পড়ত আর শুনত ঠিক তাদের বিপরীত দিকের বাড়ীটার ব্যস্ততা। অফিস যাওয়ার তাড়া। ও বাড়ীর সবাইকেই চিনত ও। সবকটা লোকের চলা ফেরাও ওর মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। জানত ও, একটু বাদেই সুরথবাবু অফিসে যাবেন। তারপরেই অনিমা তৈরী হবে স্কুলের জন্য। অনিমা বেড়িয়ে গেলেই আর এই সব ব্যস্ততা থাকবে না। দাড়াশব্দ কমে আসবে। অনিমার দাদা নিশ্চয়ে কখন এক সময় বাড়ী ঢুকবে।

মাথে ছেলেতে চুপচাপ খেয়ে নেবে। নিরিবিলি কাটবে দুপুর।

সুমিতাও অবশ্য তখন থাকত না। যেত স্কুলে তারপর ফিরত সেই পাঁচটায়। ফিরত একসংগেই, অনিমা আর ও. দুটীতে—কথা আর গল্প বলতে বলতে।

বাড়ী ফিরে আবার একবার বেরোত ওরা। সেও দুটীতে একসাথে। এবাড়ী-ওবাড়ী। নয়ত বা কাছিকল্প ব্রাঞ্চিয়োরারেই। তারপর একসময় হঠাৎ কখন চুপ করে সন্ধে নামত। ওপাড়ার সন্ধে নামবার আগেই বাড়ীগুলো জ্বলে উঠত।

সন্ধের পর বাড়ী ফিরে প্রথমেই পড়তে হত। মাষ্টার মশায় আসতেন বাঁধা টাইমে। এলোমেলো খাপছাড়া মনটা তুব দিত পরের দিনকার স্কুলের টাস্কে। অঙ্ক বা গ্রামারের খাতায়। বসিতে অনেকগুলো সময় কাটত। এক সময় মাষ্টার মশায় চলে যেতেন। তখন আর সুমিতার অতটা মনযোগ থাকত না। সন্ধে থেকেই দক্ষিণমুখো জানালাটাও খোলা থাকত। ইচ্ছে না করলেও মাষ্টার মশায় উঠে গেলে রোজই ওর চোখটা বাইরে চলে যেত তখন। নিরিবিলি হত অন্য কোথাও। তা যোলহয় সুমিতা নিজেও জানত না। বইমুখে ওইভাবেই বসে থাকত অনেকক্ষণ। পড়ায় আর মন লাগত না। অথচ ইচ্ছেও করত না উঠে গিয়ে ঘরের বাইরের কোলাহলে নিজেকে মিলিয়ে দিতে। চেয়ে থাকত বাইরেই সুমিতা, খোলা জানালাটা দিয়ে। উল্টোদিকে খোলা থাকত অনিমাদের জানালাটাও। খোলা থাকত ওই রকমই।

কখন এক সময় অনিমার দাদা এসে পড়ত। আসত সে রোজই। বসত এসে ওই ঘরটাতেই। বসতও ঠিক সুমিতার মুখোমুখি একটা টেবিলের পাশে। কিন্তু একবারও ওর দিকে তাকাত না, সুমিতা তাও জানত। শুধু সুমিতা চেয়ে থাকত রোজই একভাবে। এটা যেন কতকটা ওর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল আর কতকটা বুঝি কেমন একরকম ভালই লাগত। দেখত সবকিছু সেই অনিমার দাদা আসার পর থেকে—যতক্ষণ ও বইমুখে বসে থাকত, ততক্ষণ।

খোলা জানালাটার পাশে চুপচাপ বসে পড়ত অনিমার দাদা। একটু পরেই বই-পত্তর বার করত। তারপর নিঃশব্দে কাগজ টেনে শুরু করে দিত লিখতে। উঁহু হয়ে অনেকক্ষণ লিখত কি যেন। একদিন নয়, প্রায়ই একই ভাবে। সুমিতা অবশ্য এও জানত, কি লেখে অনিমার দাদা। শুনেছে অনিমার কাছেই—অনেকদিন আগে, ওর দাদা নাকি একজন মস্ত লেখক! অনেক অনেক গল্প লেখে। সে সব কত রাজ্যের গল্প, কত লোকের কথা! হয়ত তার মধ্যে সুমিতার মত কত মেয়ের কথাও লেখা আছে।

লজ্জা করলেও অনিমার কাছে মাঝে মাঝে চেয়ে-চিন্তে দু'একটা লেখা সুমিতা পড়েও ফেলেছে। ওইসব লেখা পড়তে কি রকম যে ভাল লাগত! কত সুন্দর লেখা—কত কথাই না লোকটা লিখতে পারে। ইচ্ছে হয় একদিন গিয়ে ওর সংগে একটু আলাপ করে, দু'একটা গল্প শোনে।

অনিমাই ত' বলেছে কতদিন, চলনা একদিন।

ও রাজী হয়নি কিন্তু—কেমন যেন লজ্জা করত।

অনিমার দাদা যদি ওর এই দুর্বলতার কথা জানতে পারে, তবে না জানি কিইবা ভাববে।

মুখে বলেছে অনিমাকে সুমিতা, আজ নয় অনি, আর একদিন যাব।

এখন ভাবে সুমিতা এই বরাহনগরে, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাড়ীতে এসে—আর একদিন যাব যাব করেই অনেকদিন কেটে গেছে। অনিমারা ওই বাড়ীটায় এসেছিল তিন বছর—কিন্তু এই তিন বছরে সুমিতার আর সময় হয়নি আলাপ করবার। ওখানে অবশ্য তখন এ নিয়ে এমন কিছু মনে হয়নি। রোজই রাতে মুখোমুখি বসেছে দিনের পর দিন। মনে হয়েছে একদিন আপনা থেকেই আলাপ হয়ত হয়ে যাবে। তাই আর আলাপ না থাকলেও সুমিতার খারাপ লাগেনি—বা বিশেষ কিছু ধারণায় আসেনি।

অথচ এখানে এসে সুমিতা আশ্চর্যজনক ভাবে জেনে ফেলেছে, ওই লোকটাকে ওর খুব ভাল লাগত। ভাল লেগে গিয়েছিল হঠাৎ বুঝি। নিজের অজান্তেই। এমন

কি ওই লোকটাকে না জেনে-শুনেই।

সব সন্ধ্যেগুলোই তাই উন্মুখ হয়ে কেটেছিল সুমিতার লজিপাড়ার ওই বিজী গলিতে। সকাল থেকে শুরু করে শুধু বুঝি রাতের ওই অবসরটুকুরই আশায় ও কাটিয়ে দিয়েছিল ওর কিশোরী রাঙা মনটা নিয়ে।

এখানে এসে সুমিতা যেন আরও বড় হয়ে গেছে। বড় হয়ে গেছে ভাবতে ভাবতে। তাই আর একা একা এখানে কিছুতেই ভাল লাগে না। বি. টি রোডের পর এতবড় বাড়ী আর এত ভাল বাড়ী সত্ত্বেও ভাল লাগে না। এখানে কিছুই নেই। কোলাহল নেই, ব্যস্ততা নেই। আশা নেই, আকাঙ্খা নেই। এই বাড়ীর উঁচু ছাদে দাঁড়িয়ে মনটাকে অনেকদূরে হয়ত ছড়িয়ে দেওয়া যায়—কিন্তু কিছুতেই একক ভাবে কারও কথা ভাবা যায় না।

এখানে কোন প্রতীক্ষা নেই। ঘুমজড়ান কৌতূহলী চোখের কোন প্রত্যাশা নেই। যে প্রত্যাশা নিজেকে ভালবাসায়, নিজেকে ভরিয়ে দেয়। ভুলিয়ে দেয় অন্তসুরে। ভাবিয়ে তোলে সুমিতাকে—নিজে ছাড়াও, সবাই ছাড়াও আরও কেউ, অন্য একজন।

এ বাড়ী তাই শূন্য। না, না, এখানে কিছু নেই। আছে শুধু ধূমকেতুর মত সন্ধ্যের পর থেকে সারারাত পর্যন্ত পেট্রল পাম্পের একচোখা মার্কারি ল্যাম্পটা। মরীচিকার স্বপ্ন নিয়ে আর একরাশ কড়া উগ্র আলো ছড়িয়ে। চোখ ঝুড়ে ওই আলো শুধু জিইয়ে রাখে মানুষের মনের উষ্ণতা। মন ভরিয়ে ছড়ায় শুধু নিঃসঙ্গতা।

রাতের পর রাত কত ভাবে তাই লজিপাড়ার ছবিটুকু সাজিয়ে চলে সুমিতা। পর পর, বার বার। তবু সেই রাতগুলো আগের মত ফেরে না। ফিরে আসে না।

এখানে এসে স্কুল ছেড়েছে সুমিতা। এমনিতেই পড়তে মন বসে না। তবুও মাসিক, সাপ্তাহিক পড়ে বা গল্পের বইতে সুমিতার সময় কাটে। মাসিক, সাপ্তাহিক-গুলো খুব মনযোগ দিয়ে পড়তে চেষ্টা করে। পড়ার চেয়েও সুমিতার আগ্রহ যেন অন্য কিসে? কি যেন খোঁজে ও কাগজগুলোর পাতায় পাতায়। নতুন পুরানো অনেক লেখকের লেখাই সেখানে থাকে; কিন্তু কোনটাই ওর মনমত হয় না। যাকে খোঁজে বা যার লেখা খোঁজে সুমিতা, তাকে যেন বিস্মৃতির কোন অতল তলে হারিয়ে ফেলেছে ও, মনে পড়ে না। কিছুতেই মনে পড়তে চায় না।

তাকে ত কোনদিনই ও পরিচয় দেয়নি নিজের বা জানতে দিতে চায়নি ওর মনের অবচেতনে হঠাৎ আঁকা এই আর একটুকরো ছবি—যা ওর নিজস্ব নয়, একার নয়, ওদের দুজনের। মিলিত দুটী মনের। এখন তাই এ বাড়ীর নিরালায় শুধু ছটফট করে সুমিতা আর রাতদিন নিদ্রাহীন ভাবে। ভাবনায় একরাশ কুল-কাঁটা বেঁধে ওর বুকে। বেঁধে প্রতি মুহূর্তে, এ বাড়ীর প্রতিটী পদক্ষেপে।

হারিয়ে যাওয়া ওই স্মৃতির কুল-কাঁটা বিঁধেই বুঝি কাটবে ওর বাকী জীবনটুকু!

নূতন বই

কুসুমেষু ৩৲

সুবোধ ঘোষ

ক্লাসিক প্রেস

৩১এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

শ্রীশৈলেশ্বর সান্যাল বি. ই. প্রণীত

গীতা-প্রসঙ্গ ২৲

গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব ২৲

উচ্চ প্রশংসিত দুইখানি অমূল্য ধর্ম গ্রন্থ

১৯ডি, ফার্ণ রোড, বালিগঞ্জ

কলিকাতা-১৯

একালের ছড়া

"বুঝলাম অভাগিনি এই দর্শক আছে। আর আছে পুতুল নাচের অনাদার ক্লিষ্ট শিল্পীরা। ততদিন পুতুল নাচ মরে ও মরবে না"

[—পুতুল নাচের কথা, অনিল ঘোষ, পপুলার্স, শ্রাবণ, ১৩৫৯, পৃঃ ১০]

পুতুল নাচ মরে ও মরবে না, তেমনি মরে ও মরবে না পল্লী বাংলার লোক সংস্কৃতির নানা রূপ। যদি না বাংলার সংস্কৃতি কর্মীরা তার মৃত্যু ঘটাতে বদ্ধ পরিকর হন।

বিষ্ণুপুর থেকে বাওয়ালী, সরবে, বুড়ুল···গ্রামের পর গ্রাম। আমতলা, রাজার হাট, উদয়রামপুর, ডালা, শ্রীকৃষ্ণপুর, মুকুন্দপুর, এপারে গা, হুলতান গঞ্জ, গোবিন্দপুর, বোরহাট, ভাজরপুর, শুকদেবপুর, পেরিয়ে চললাম—কাদা ভেঙে, পালকি চড়ে। সম্বল কিন্তু নেই—কিছু ছড়ার বই ছাড়া যেখানে গেছি, লোককে বলেছি: ছড়ার বই মেলেন? উত্তর এসেছে: শোনাও আগে। শুনিয়েছি লোকশ্রির ছড়া আবৃত্তি করে:

রাজা রাজা রাজ্য গেল হবে কি উপায়;
লক্ষ্মণ যদি শক্তি পেলে সীতা কাঁদে হায়।

ভিড় করে দাঁড়িয়েছে গাঁয়ের ছোট ছোট কিশোর ছেলে মেয়েরা। নিলে আর হাউ কিউ জিরে চেয়ারা নিয়ে: আর যারা ঘাড়ে আড়ালে, হাওয়ার এক পাশে হেলান দিয়ে যা পকর ভাবনার আজলায় যা ভাষার পাশে উবু হয়ে বসা অল্প বয়সী বউ মেয়েরা। কান খাড়া রেখেছে শোনার জন্য গ্রামের পালা।

পথের মাঝে পালা বসেছে। আয়োজন উপকরণ দরকার হয়নি। চারণ কবি কথার মালা গেঁথেছেন। পুরাণো ছন্দে নতুন কথা। দেশের কথা। দুর্দশার কথা। আজকের কথা। শোনালাম:

বাংলা দেশ আজ শোকাচ্ছন্ন
অন্ন নাইকো ঘরে;
অর্ধ বিনা শুষ্ক পুষ্প টিকি কাটে ডরে।

ভ্যাব ভ্যাব করে তাকাচ্ছে সাইকেল থামিয়ে গ্রামের ফিট্ ডাক্তার। নাপিত অতুল তার পেছন পেছন এসে দাঁড়িয়েছে। নতুন কথা শুনবার ইচ্ছা এদের এতটুকু কম নয়; কিন্তু তারা স্থায়ী লোক, তাই কৌতূহল একটু চেপেচুপে রাখতে হয়।

গ্রাম্য কবির গান শোনালাম:

নাপিত তারা খেউরি ছেড়ে পকেট কাটতে যায়—
সবার পকেট এমনি ভারী—ইঁদুরে ডন দেয়।

ডাক্তার বিষ্ণুরামের গোঁফ জোড়া ভেদ করে হাসি ফুটে ওঠে। "বেশ বলেছ ব্রাদার। দেশের যে অবস্থা করেছে এই সব দেশ নেতারা.", বলে ওঠেন। ডাক্তারের শিষ্য ফিট ফিটি চেয়ে বলেন: ওরে, তোদের নামে কবিতাটা সেই কি যে···বানিয়েছিল হাবুডুবু। শিষ্য নিরুত্তর। ডাক্তার বাবু নিজেই বলে দেন কবিতার কলিগুলি:

তারা যাইতি পাঁজি পড়ে অর্ধেক যায় তার ভুল
শিবু নাপিত চুল ছাঁটে অর্ধেক থাকে তার চুল।

কবির জবাব দেওয়া দরকার? বলে উঠি:

ডাক্তার কাদা ভারী চালাক
ডাক্তার দাদা ঠিক করেছে মন্ত্রী হবে বলে

আর চাষীরা সব আবার ছেড়ে চুকবে এবার মিলে।

কম মানুষ হাবুডুবু। সেও এসে দেখা দেয়:

জীবন পোড়ে তামাক খায়। কেউ কোরোনা আশা।
হাজা মোড়ল ঘর ছায় বাবুই পাখীর বাসা
আর হরি মোড়ল ইঁট কাটে অর্ধেক হয় তার আধা
অধিনী মোড়ল ইঁট কাটে অর্ধেক হয় তার আধা।

গ্রামের ছড়া বেঁধে গ্রামের চিরাচরিত দুঃশার রূপ দিতে চেয়েছিল বীরু। সে পারেনি দুঃশাকে ঐতিহাসিক বিচার দিয়ে ব্যাখ্যা করতে। তবু শোনায়—তার গ্রামের দুঃখের ছড়া। তাতে আবেগ আছে। কিন্তু ভবিষ্যতের সন্ধান নেই। এমনকি বর্তমানের কথাও স্পষ্ট ভাবে বলা তার হয়ে ওঠেনি।

বঙ্গীর শেহনে এসে দাঁড়িয়েছে মদন ঘাটা। দশ বারো বছরের ছেলে; সে দেখেছে জলে ঝড়ে চাষ আবাদ করতে তার গ্রামবাসী—কাকা দাদারা—কি ভাবে মাঠে নেমে পড়ে। দুঃখ দুর্দশার প্রতিবিধানের ডাক দিতে সে শেখেনি। ঠাট্টাও করেনি গ্রামের নানান বুদ্ধি আসরী মানুষদের জীবনের অসম্পূর্ণতা আর ব্যর্থতাকে নিয়ে।

কবি গলায় মদন বলে ওঠে :

নগেন সাত হাল করে হুড়মুড় করে
গরুর সঙ্গে কথা কয় তেঁতুল ছড়ি ঘরে।

আমি শোনাই। শোনাতে ভাল লাগে না। কিন্তু না শুনিয়েই বা উপায় কি ?

চাষীরা সব আবাদ ছেড়ে চুকছে এবার মিলে
মিলের মধ্যে ধন্যবাদ, ছাঁটাই হল শুরু—
আর দেশ শুদ্ধ পটল তোল, কুঁচকোনা কেউ ভুরু।

ভিড় বেড়ে গেছে। আমি উসখুস করছি কলকাতা যেতে হবে। হঠাৎ সাগতি এসে ধরলো হাটতলায়। নামলেন তার ভেতর থেকে আমার চারণ কবি। বলেন : মাঠার দাদা যাওয়া চলবে না আজ। নতুন ছড়া শিখে এসেছি। আমার ছড়াকে কাটান দিয়েছে চাপাডাঙ্গা হাটির কৃষক কবি। সাফ বলে দিয়েছে "কুঁচকোনা কেউ ভুরু" বলে সাদ দিলে চলবে না। ভিড়ের মানুষদের ঘিরে জমাট একতা আনতে হবে। তাই কেন দেশ শুদ্ধ পটল তুলছে তার কথাও শুনিয়ে দিয়েছে সে।

কৃষক কবির সেই ছড়া—নামহীন লোক কবির ছড়া :

চাষের তরে রইছি বসে
লাঙল আমার নাই,
মহাজনে বন্দ দিল
করব কি যে ছাই।
দেশের নেতা টাকের পরে
বসে বসে চাবটি করে
এবার হতে ওধার হতে টাকা এসে ঘরে ;
আমার লাঙল নেইকো ঘরে
আমি চাষ করব কেমন করে ?

এ কবির প্রতিষ্ঠা নিশ্চয় জোটেনি। গ্রামের কথা কেই বা ছাপাবে। এত রসোত্তীর্ণ নয়। এমন কি সুছন্দও নয়।

আমরা সবাই চাষী মিলে
ভাবতেছি তাই বসে—
লড়াই করেই মরব মোরা
থাকবো নাক' বসে।
মোদের জমি বলদ সবই নেব
তোদের শাসন নেশা ঘুচিয়ে দেব
সর্বহারা সবাই মিলে মোদের জমি
ছিনিয়ে নেব।

চারণ শুনে এসেছেন স্কুলের ছাত্রী মহুলা শ্রীমানী লিখেছে :

কোন দেশেতে শেয়াল রাজা, মাথায় বাঘের ছাতি ?
বানর ভায়া হাকিম আছা, বেড়াল সেনাপতি ?
সেই দেশেতে বাঘের ছেলে ভেড়ার পায়ে চাটে
বেজীর ভয়ে পালায় হাতী, রাম ছাগলের হাটে।

আরো শুনিয়েছে যাওয়ালীর শম্ভু দাস :—

ইংরাজেরা আজ নাইকো এখন। সুখের খবরাত
বাংলা (বে ভাই)
(কত) ভেসে যেতেছে চুনোপুটি। (বেঁচে) থাকবে
কই আর কাতলা
আনন্দে বাজায়
তবলা
(এখন) কাঠ খিড়কীর নৃত্য করে। কেঁদে বেড়ায়
আর্সলা।

গলি গলি খুলছে সিনেমা। গৃহস্থের ঘর সামলা।
ঘটি বেচে যায় যাত্রাতোপে যাত্রা পাড়ায় হাঙ্গামা।
ধনিক রাজা ঐ কায়েম হল। কোথায় করব নালিশ

কৃষক মজুর এক হয়ে ভাই। পড়ব নূতন বেদ। ঋষিক শকুন্তলা বলে, আমার মন হয়েছে পাগলা (এখন) গান করিতে লাগবে আমন।

পুতে হবে কবলা

এখন আরো কত নামহীন প্রতিষ্ঠাহীন পল্লীর কৃষক কবি আছেন! নাম ডাক যাদের আছে তারা এদের কবিতা সংগ্রহ করে হয়তো একে রসোত্তীর্ণ করে তুলতে পারেন।

[বিশেষ সাময়িক প্রতিনিধি কর্তৃক সংকলিত]

আদর্শ শিক্ষক

প্রধানতঃ মেদিনীপুর স্কুলেই বালকদিগকে ভালবাসা দ্বারা চালিত করা আমার শিক্ষকতা কার্যের নিয়ম ছিল। প্রথমে কার্যে বসিয়া দুই একজন বালককে শারীরিক দণ্ড প্রদান করিয়াছিলাম কিন্তু উহা হইতে পরে একেবারে নিবৃত্ত হই। শিক্ষা দিবার সময় অনেক শিক্ষাপ্রদ অথচ আমোদজনক গল্প করিতাম তাহাতে বালকদিগের মন আমার প্রতি বড় আকৃষ্ট হইত। পুস্তকের কোন স্থলের অর্থ একেবারে বলিয়া দিতাম না, প্রশ্নশ্রেণী দ্বারা প্রকৃত অর্থ তাহাদিগের মুখ হইতে বাহির করিতাম। এখন (১৮৯০) শুনিতে পাই কলেজে ছাত্রেরা কেবল শ্রোতা। শিক্ষক ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেছেন, বালকেরা কেবল নোট লিখিতেছেন। বৈশম্পায়ন বক্তা, পরীক্ষিৎ শ্রোতা, না আছে বালক কর্তৃক শিক্ষককে জিজ্ঞাসা, না আছে শিক্ষক কর্তৃক বালককে জিজ্ঞাসা, আমি শিক্ষার এই প্রণালী ঘৃণা করি।

আমি বালকদিগের জন্য বিতর্ক সভা সংস্থাপন করিয়াছিলাম। তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও বক্তৃতাশক্তি সজীব হইবার জন্য তাহা স্থাপন করি।

আমি কেবল বালকদিগের মানসিক উন্নতির প্রতি মনোযোগী ছিলাম এমন নহে, শারীরিক উন্নতির প্রতি যত্নবান ছিলাম।

রাজনারায়ণ বসু

আত্মচরিত পৃষ্ঠা—৭১

দেশের কথা (৩১ পৃষ্ঠা হইতে)

সমবায়ের প্রসারকে এক মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।"

কথা ভাল ; কিন্তু যে যে কারণে তথাকথিত সমবায় আন্দোলন আমাদের দেশে গত ৫০ বছর ধরে (সমবায় আইন ১৯০৪ সালে পাশ হয়) একরূপ ব্যর্থতাই আহরণ করেছে, সে সকল কারণ সম্পূর্ণরূপে অপসৃত না হ'লে এ উদ্দেশ্য সফল হবে না অথচ সমবায়ের মূলনীতি আমাদের সাধনার সম্পূর্ণ নতুন ও বাহিরের জিনিষ হয়ত নয়। আমাদের গ্রামের জীবন ছোট ছোট কেন্দ্রের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল স্মরণাতীত কাল থেকে। আর মানুষের মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতার ভিত্তি গড়া হয়েছিল একান্নবর্তী পরিবারের ব্যবস্থার মধ্যে। বিদেশী কেন্দ্রীয় শাসনের চাপে এ দু'টিকেই অনেকটা ভেঙেচুরে দিয়েছে। স্বাধীনতার পর সমবায়ের মাধ্যমে আমাদের সাধনার প্রাচীন এ দু'টি বৈশিষ্ট্য নতুন রূপ নিতে পারে, সমাজতন্ত্রও জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যদি রাষ্ট্রে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একদিকে বিকেন্দ্রীকরণ অন্যদিকে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার আদর্শ সম্পূর্ণ সততার সহিত আমরা গ্রহণ করিতে পারি

সমবায় একটা নীতি—তার মূল কথা যারা একত্র হয়ে কোন পণ্য উৎপাদন করবে বা ব্যবসা করবে তাদের পরস্পরের মধ্যে স্বার্থের কোন বিরোধ যেন না থাকে। পুঁজিবাদে মালিকে বা পরিচালকে ও শ্রমিকে এই বিরোধ সর্বদাই আছে—কোন সময় বাহিরে প্রকাশ পায়, কোন সময় চাপা থাকে। কোন জাতির অর্থনৈতিক জীবনে পুঁজিবাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে সমবায় তার প্রাপ্য মর্যাদা পায় না, পেতে পারে না। সমবায়কে আংশিকভাবে সফল করতে হলেও সেজন্য শিল্প বা কৃষি উদ্যমের কিছুটা ক্ষেত্র একে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে হয়। পশ্চিমের উন্নত কোন কোন দেশে দুধের ব্যবসা বোধ হয় সম্পূর্ণ সমবায় পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশে ২৪-পরগণায় গোসাবার সমবায় কৃষিকেন্দ্র একসময় কিছু সফলতা অর্জন করেছিল একারণে যে জমি বন্টন, ধানের চাষ, ফলে চাল তৈরী ও চাল বাজারে বিক্রী—এ সমস্তই সমবায়ের মাধ্যমে হবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

সমবায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল যা হওয়া উচিত সম্পদ সৃষ্টি করা, মহাজনী করা নয়—কম সুদে হলেও টাকা ধারদিয়ে। কৃষিকে লাভজনক বৃত্তি না করতে পারলে ঋণ নিয়ে চাষী তার অর্থের অভাব স্থায়ীভাবে মেটাতে পারে না। কুটীর বা গ্রামের শিল্প সম্বন্ধেও তাই। এগুলি লাভজনক হওয়া চাই। সমবায়ের পথে এগুলি লাভজনক হলেই সমবায় আন্দোলন সত্য অর্থে সার্থক হয়। কিন্তু এখনও সমবায় সমিতিগুলির বেশীর ভাগ ঋণদান সমিতি মাত্র।

পুঁজিবাদের পথ থেকে দেশের কৃষি বা শিল্পকে সম্পূর্ণ সরিয়ে এনে সমবায়ের নীতিতে গঠন করা এখনি হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু দু'এক ক্ষেত্রে সমবায়কে সম্পূর্ণ প্রাধান্য দেওয়া কি সম্ভব নয়? দুগ্ধ উৎপাদনের সবটা—গোপালন থেকে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত বস্তুর ব্যবসা—সমবায়ের পথে সংগঠন করা কি যায় না? হাঁস, মুরগী পালন, মধুর জন্য মৌমাছি পালন, ও মাছের চাষ ও ব্যবসা—পুকুর, বিল, নদী ও সমুদ্রের উপকূলবর্তী মাছের ব্যবসাও—সমবায়ের পথে সংগঠন করার চেষ্টা করা কি যায় না? এর সঙ্গে ফলের চাষ, ফল সংরক্ষণ ও তার ব্যবসা সংযুক্ত হ'তে পারে। এগুলি সবই গ্রামের লোকের উপজীবিকার অন্তর্গত ও শহরের লোকের প্রয়োজনীয় খাদ্য। কিন্তু এসকল ক্ষেত্রে সমবায়কে সম্পূর্ণ প্রাধান্য দিতে হবে। পুঁজিবাদের পথে ব্যবসা এর কোন অংশে বা কোন স্তরে প্রবেশ করতে পারবে না। এর সঙ্গে সঙ্গে কুটীর শিল্প ও গ্রামের শিল্পও সমবায়ের মাধ্যমে নতুন ভাবে গঠিত ও সম্প্রসারিত হ'তে পারে। যাঁরা আমাদের পরিকল্পনা তৈরী করেছেন, এদেশের অবস্থা ও বিদেশের ব্যবস্থার সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ট পরিচয় আছে, সমবায়ের বিস্তৃতিতে তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন আছে, তার কথা প্রথমেই বলেছি। ছোট শিল্প বা গৃহ-শিল্পের মাত্রায় যে দেশের সম্পদ বাড়ে না বা লাভজনক ভাবে বাড়ে না, এ কথা সত্য নয়।

পুস্তক প্রসঙ্গ

জীবন-ইয়ু—ইংরাজী কবিতা, রচয়িতা: স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী; প্রকাশক পি. ঘোষ, ২০, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা; মূল্য—একটাকা চার আনা।

ভারতের যোগীমহলে তথা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে আজ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন। যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে বাণীর রহস্য-দ্বার উদ্ঘাটিত হয়ে যায়, বীণাপাণি স্বয়ং জিহ্বায় এসে অধিষ্ঠান করেন, স্বামিজীর জীবন প্রত্যক্ষভাবে আমার কাছে সেই অপরূপ সিদ্ধির জীবন্ত নিদর্শন। বহুবর্ষের সাধনার ফলে কবিরা যে অনায়াস আনন্দে কাব্য রচনা করেন, বাণী-সিদ্ধ যোগীরা সেই অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে ছন্দ সৃষ্টি করতে পারেন। প্রাচীন ভারতের বড় বড় যোগীরা বড় কাব্য-স্রষ্টাও

জিজ্ঞাসু তীর্থযাত্রীরূপে ফরাসী দেশ থেকে সম্প্রতি এক বিদুষী মহিলা ভারতবর্ষে আসেন। স্বামিজীর সাক্ষাৎ লাভের পর তিনি স্বামিজীকে জীবনের কতকগুলি জিজ্ঞাসার উত্তর প্রার্থনা করেন। কবিতাগুলি সেই জিজ্ঞাসার উত্তর। তাই জিজ্ঞাসু চিত্তের কাছে এই কবিতাগুলির একটা স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে, এবং এই আপাত বিচ্ছিন্ন তেরোটি কবিতার ভেতর একটা অন্তর্গূঢ় একতা আছে। কবিতাগুলি আয়তনে ছোট কিন্তু এই ছোট আয়তনের ভেতর মানুষের মনের আশ্চর্য্য ও সংগ্রামের একটা পরিপূর্ণ ছবি আছে এবং সেই সঙ্গে আছে সকল জিজ্ঞাসার একটা পরিপূর্ণ উত্তর, যে উত্তর এসেছে অন্তরের উপলব্ধি থেকে। সত্তিকারের "মিষ্টিক" কবিতার মতন, এই কবিতাগুলির মানে, অভিধানের বাইরে, জিজ্ঞাসু মনের আকুলতার সততা ও তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকে ধরা দেয়। তখন যে আনন্দ পাওয়া যায় তার তুলনা নেই। এই তেরোটি কবিতার ভেতর সেই আনন্দ ভোগের আসন পাতা আছে।

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

প্যাট্রিয়ট পার্লবাক্—অনুবাদিকা পুষ্পময়ী বসু, প্রথম প্রকাশ—১৩৬২ শ্রীপঞ্চমী, নবভারতী, ৪নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। মূল্য—চারটাকা আট আনা।

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারে চীন-দেশ ছিল বাইরের জগতের কাছে 'ড্রাগন' আর আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা একটা জাতি। এই চীনের জাতীয় ইতিহাস যে গতিবেগ সঞ্চয় করে গণতন্ত্রের পথে পা বাড়িয়ে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষে, গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রী শাসনের প্রতিষ্ঠা করলো তা পৃথিবীর শোষিত জনগণের কাছে আশার বর্তিকা। এই পটভূমিকায় শ্রীমতী পার্লবাকের চীনদেশের সাধারণ জীবন নিয়ে লেখা 'গুড আর্থ' সার্থক ব্যতিক্রম।

আলোচ্য উপন্যাসে চীনদেশের সেই ক্রান্তিকালের এক অধ্যায়ের মর্মস্পর্শী বর্ণনা আছে। মহাচীনের জাতীয় সংগ্রাম ক্রমে ক্রমে যে সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে এবং ইতিহাসের সেই বিপুল গতিবেগ যে কোন সাম্রাজ্য-বাদী শক্তির সামর্থ্য নাই ঠেকিয়ে রাখতে, তার জীবন্ত অভিযান এই গ্রন্থের চরিত্রের মাঝামে। নায়ক আই-ওয়ান জন্মভূমি ছেড়ে জাপানে গিয়ে জাপানী কন্যাকে বধূ-রূপে বরণ করলো, কিন্তু স্বদেশের ডাকে, চীন জাপান যুদ্ধে, সে পারলো না দেশের আহ্বান উপেক্ষা করতে—তাই স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে বৃহত্তর কর্তব্যের আহ্বানে দেশে এল। সব কিছু নিষ্ঠুরতা হিংস্রতা সত্ত্বেও তার দৃঢ় আশা,—"লড়াই শেষ হলে, দেশে শান্তি স্থাপিত হলে ওদের নিয়ে আসবো এখানে—আমার ছেলেরা এদেশের মানুষ..... আর ওদের মা একান্ত অনুগতা..... ।" বিপুল প্রাণশক্তি সম্পন্ন দেশের আশ্চর্য্য আন্তরিক আর মানবিক পরিচয় পাই পার্লবাকের এই গ্রন্থে।

অনুবাদে শ্রীযুক্তা বসু তাঁর পূর্ণ সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাঁর ভাষার স্বচ্ছতায় পড়তে বসলে মনে হয় না অনুবাদ বলে। বইটির পরিবেশন সর্বাঙ্গসুন্দর।

স. ভ.

জি, এন, দাস এণ্ড কোং

২০, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা-১

ফোন ২২-২৪১৮

এম, এস, ষ্টোরেজ ট্যাঙ্ক, সেলফ সাপোর্টিং চিমনী, পিলার শেল্‌স, বল মিল্‌স
গ্যালভানাইজিং বাথস, চাল কলের হাড়ি, (Rice Mill handies)

কারখানা :—পি ৫০, বেথারস রোড, হাওড়া

সবরকম আধুনিক ও সুরুচিসম্পন্ন
পুস্তক প্রকাশই আমাদের
একমাত্র লক্ষ্য

ইউনিভার্সাল বুক বাইণ্ডার্স

১২৩ লোয়ার সারকুলার রোড
কলিকাতা-১৪

ফোন ৩৪-৪৭৬৯

শিক্ষা সমবায়

মুদ্রণ-কেন্দ্র :	কেন্দ্রীয় কার্যালয় :
৪১-এ, বলদেওপাড়া রোড,	৮৫, মনোহরদাস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬	বড়বাজার, কলিকাতা
ফোন : বড়বাজার ৩৭৩২	ফোন : ৩৩-৩২৭১

স্কুল-কলেজের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য, উৎকৃষ্ট ও নির্ভুল ছাপা সকল রকম ফর্ম, রেজিষ্টার প্রভৃতি, গ্রন্থাগারের জন্য সকল প্রকার ভাল বই, ব্লাক বোর্ড, চার্ট, মডেল, ম্যাপ, গ্লোব, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ম্যাজিক লণ্ঠন ও স্লাইড, ও খেলার যাবতীয় সরঞ্জাম পাইবার অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান মফঃস্বলের অর্ডার সত্বর ও সযত্নে সরবরাহ করা হয়।

স্কুল-কলেজের সকল প্রকার ছাপার কাজ সুচারুরূপে দীর্ঘদিন করিয়া আমরা অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি।

আপনাদের শিক্ষালয়ের প্রশ্নপত্রাদি সকল ছাপার কাজ আমাদিগকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন।

Regd. No. June-July 1956 প্রতি সংখ্যা আট আনা

বিপিনচন্দ্র পালের ইংরেজী রচনাবলী

শ্রীঅরবিন্দ এঁকে বলেছেন :—"One of the mightiest Prophets of Nationalism"

1. Swadeshi & Swaraj : The Rise of New Patriotism

স্বদেশী যুগের প্রেরণার উৎস-সন্ধান পাওয়া যাইবে মূল্য ৬৲

2. Study of Hinduism

হিন্দুধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা—কারাবাস কালে রচিত মূল্য ৪৷৷০

3. Beginning of Freedom Movement in India

ভারতের নবজাগরণের গোড়ার কথা মূল্য ১৷০

4. Character Sketches :

of Rammohan Roy, Keshub Chunder Sen, Anandamohan Bose, Surendranath Banerjea, Bal Gangadhar Tilak, Sri Aurobindo, Aswinikumar Dutta, Sister Nivedita, Rabindranath Tagore, Mrs. Annie Besant, Ashutosh Mukherjee, Taraknath Palit, Syamsundar Chakravarty, Monoranjan Guha Thakurta and Krishnakumar Mitra.

ভারতের পনের জন মনীষীর জীবনালেখ্য ও চরিত্র-বিশ্লেষণ মূল্য ৬৲

5. Writings & Speeches

মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বক্তৃতা ও রচনাবলী—
জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মর্ম্মকথা মূল্য ৩৲

যন্ত্রস্থ :—

BENGAL VAISHNAVISM (২য় সংস্করণ) মূল্য ৩৲
SREE KRISHNA (২য় সংস্করণ) মূল্য ৩৲
SOUL OF INDIA (৪র্থ সংস্করণ) মূল্য ৪৲
MY LIFE & TIMES : Vol. I & Vol. II (২য় সংস্করণ) মূল্য ১০৲

প্রকাশক : যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড
৪১।এ, বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা-৬
ফোন : বড়বাজার ৩১০২

নারায়ণ পাল কর্ত্তৃক ৪১এ, বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা-৬ নিউ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোঃ প্রাইভেট লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও ৮৪ নং মনোহর দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭ হইতে প্রকাশিত।
সম্পাদক—জ্ঞানাঞ্জন পাল।

মুসাফির

দ্বিতীয় সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৬৩

॥ সূচীপত্র ॥

আসামে মহাপুরুষীয়া ধর্ম—হরেশ্বর দাস ৬১
সেঁউতির বিল—বিমল কর ৬৪
ভারত ও অক্ষশ—অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ৬৮
পাড়ি—সমর চট্টোপাধ্যায় ৭৭
আবার আষাঢ়—পরিতোষ খাঁ ৮১
নবীনের আহ্বানে মিশর—অধ্যাপক শৈলেন্দ্র নাথ ঘর ৮৩
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও তদীয় পত্নী
প্রসন্নময়ী দেবী—শোভনা নন্দী
সীমা—পরিৎ তোকদার
লোকমান্য তিলক ও জাতীয়তার উন্মেষ
— জানাঞ্জন পাল
মুদাফির—সন্তোষ সেন
অন্ধ—মৌপাসা
সমসাময়িক সাহিত্য
পুস্তক প্রসঙ্গ
দেশের কথা

॥ পাদপূরণ ॥

মহাপুরুষ— রবীন্দ্রনাথ ॥ বাংলার নব-জাগরণে বিদ্বৎ-সভার দান—বিনয় ঘোষ ॥
সমবায় নীতি—রবীন্দ্রনাথ ॥ পতিত কাহারা ? জগদীশচন্দ্র বসু ॥

॥ পত্রিকা সম্বন্ধে ॥

যুগযাত্রীর বার্ষিক সডাক মূল্য ছ'টাকা। আষাঢ় থেকে বর্ষ সুরু। সব বিষয়ের মৌলিক রচনাই আমরা সাদরে গ্রহণ করব। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণরচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে লিখে সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন। অমনোনীত রচনা উপযুক্ত ডাকটিকিট ও ঠিকানা দেওয়া থাকলে যথাসময়ে ফেরৎ দেওয়া হবে। পত্রিকার সমালোচনার জন্য দু'খানা করে বই সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন। চিঠিপত্র ইত্যাদি সম্পাদকীয় কার্য্যালয়ে প্রেরিতব্য। নীচে বিজ্ঞাপনের হার দেওয়া হ'ল।

কভার	৪র্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০৲	ভিতরে	পূর্ণ পৃষ্ঠা
ঐ	২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা	৪০৲	ঐ	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা
ঐ	১ম অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	২৫৲	ঐ	সিকি পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় কার্য্যালয়
৪১-এ, বলদেওপাড়া রোড,
কলিকাতা-৬
ফোন : বড়বাজার ৩১০২

আমাদের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা যুগ্মভাবে একত্রে পূজার পূর্বে প্রকাশিত হবে। দাম এক টাকা। এই সংখ্যায় যাঁদের লেখা থাকবে :

সুবোধ ঘোষ	জীবনানন্দ দাশ
বিমল কর	পরিতোষ ঘা
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য
অজয় দাশগুপ্ত	ভূমেন্দ্র গুহ
সুবোধ দাশগুপ্ত	আবুল কাশেম রহিম উদ্দিন
এজরা পাউণ্ড (অনুবাদ)	ফেদেরিকো লরকা (অনুবাদ)

এ ছাড়া,

রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীদের চিঠি-পত্র, একাদশ শতাব্দীর ফরাসী কাব্য-কাহিনী 'অকাসিন-নিকোলেত' (অনুবাদ), ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পালের সোভিয়েত ভ্রমণ কাহিনী এবং

স্বদেশী যুগের কথা ও

বিপিনচন্দ্র পালের দুর্গাপূজা সম্বন্ধে প্রবন্ধ।

এই সংখ্যার বিজ্ঞাপনের হার

কভার ৪র্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫৲	সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	
২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা	৫০৲	অর্দ্ধ ,,	
		সিকি ,,	

যুগযাত্রী

৪১এ, বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা-৬

ফোন : বড়বাজার ৩৭৩২

CALCUTTA
CENTRAL
LIBR

প্রথম বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৬৩ | দ্বিতীয় সংখ্যা

আসামে মহাপুরুষীয়া ধর্ম্ম

শ্রীঃরেশ্বর দাস

ঈশ্বরেচ্ছায় ধর্ম্ম প্রচারার্থ মহাপুরুষদের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের আবির্ভাব দেশ ও কালের অধীন কোন কালে, কোন দেশে এক একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া সেই দেশের ভাষায় তিনি ধর্ম্ম প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম মাত্র সেই দেশের লোকের জন্যই নহে, উহা সর্ব্ব জীবের জন্য। উহার অনুষ্ঠান দ্বারা জীব মাত্রেরই অসীম মঙ্গল সাধিত হয়। শঙ্করদেব প্রচারিত মহাপুরুষীয়া ধর্ম্ম বা চৈতন্যদেব প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম কেবল আসামী বা বাঙ্গালীদের জন্যই নহে; উহাতে সর্ব্ব জীবের অধিকার আছে।

শ্রীশঙ্করদেব ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে আসামে আবির্ভূত হইয়া আসামে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন; উহা মহাপুরুষীয়া ধর্ম্ম নামে খ্যাত। শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খৃঃ বাংলায় আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন; উহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম নামে খ্যাত। বয়সের তারতম্য থাকিলেও উভয়ে প্রায় একই সময়ে তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্ম্মমত প্রচার করেন। উভয়ের কোন সময়ে সাক্ষাৎ হইয়াছিল কিনা তাহার ঐতিহাসিক তবে শঙ্করদেব বহুবর্ষ ধরিয়া আসামের বাহিরে করিয়াছিলেন, সেই কালে উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়া থাকিলেও থাকিতে পারে। উভয়েই তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মমত শ্রীমদ্ভাগবতের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রকাশ করেন। তজ্জন্য উভয়ের প্রচারিত ধর্ম্মে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

শঙ্করদেব প্রচারিত মহাপুরুষীয়া ধর্ম্মের বুঝিবার জন্য আমরা এখানে তৎপ্রণীত শ্রীমদ্ভাগবতের একটি নামঘোষা গ্রন্থের প্রথম শ্লোকটির আলোচনা করিব। এই গ্রন্থখানি মহাপুরুষীয়া ধর্ম্মে বেদের ন্যায় পূজিত হইয়া থাকে। শ্লোকটি এই—

মুক্তিতো নিস্পৃহ যিটো,
রসময়ী মাধোহো ভকতি।
সমস্ত মস্তক মণি নিজ ভকতর বন্ধু,
ভজো হেন দেব যদুপতি
যে ভক্ত মুক্তিতেও নিস্পৃহ, তাঁহাকে

করি; রসময়ী ভক্তি প্রার্থনা করি। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হইয়াও নিজ ভক্তের বন্ধু, সেই দেব বৃহস্পতিকে ভজনা করি।

এইটি মঙ্গলাচরণ শ্লোক। ইহাতেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট আছে। মঙ্গলাচরণে তিনটি মূল তত্ত্বের ইঙ্গিত থাকে।

সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার।
বস্তু নির্দ্দেশ আশীর্ব্বাদ নমস্কার॥

—চৈতন্যচরিতামৃত।

এখানে বস্তুনির্দ্দেশ করিতেছেন দেব বৃহস্পতিকে (সাধ্য তত্ত্ব), নমস্কার করিতেছেন ভক্তকে (সাধক তত্ত্ব) এবং আশীর্ব্বাদরূপে প্রার্থনা করিতেছেন ভক্তি (সাধন তত্ত্ব—পূর্ব্বোক্ত উভয় তত্ত্বের যোগসূত্র)। এই তিনটিই মূল তত্ত্ব এবং নিত্য। একটির অভাবে বাকী দুইটি নিরর্থক হইয়া পড়ে। এই তিন তত্ত্বের নিত্যত্বই ভাগবতোক্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল বৈশিষ্ট্য।

উপরোক্ত শ্লোকে এই তিন তত্ত্বের প্রতিটিতে এক একটি বিশেষণ যুক্ত আছে। যথা—ভক্ত, যিনি মুক্তিতেও নিস্পৃহ; ভক্তি, যাহা রসময়ী এবং দেব বৃহস্পতি—যিনি নিজ ভক্তের বন্ধু।

মুক্তিতেও নিস্পৃহ—ইহা দ্বারা ইহা বোঝা যাইতেছে যে ভক্ত অনেক প্রকার হইতে পারে—মুক্তিতে স্পৃহাযুক্ত, মুক্তিতে নিস্পৃহ ও মুক্তি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে স্পৃহাযুক্ত অন্যান্য বিষয়ে স্পৃহাযুক্ত ভক্ত হইতে মুক্তিতে স্পৃহাযুক্ত ভক্ত শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মুক্তিতেও নিস্পৃহ ভক্তই সর্ব্বোত্তম। একমাত্র তিনিই শুদ্ধভক্তপদবাচ্য ও নমস্য।

মুক্তি পঞ্চ প্রকার :—

সার্ষ্টিসালোক্যসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ॥

—ভাগবত।

সার্ষ্টি = কৃষ্ণের সমান শক্তিমান হওয়া;
সারূপ্য = কৃষ্ণের সমান রূপবান হওয়া;
সামীপ্য = কৃষ্ণের সমীপে বাস করা;
সালোক্য = কৃষ্ণের সহিত এক লোকে বাস করা;
একত্ব বা সাযুজ্য = কৃষ্ণের সহিত লীন হওয়া;

এই পাঁচ প্রকার মুক্তি কৃষ্ণ দিলেও ভক্ত তাহা গ্রহণ করে না।

সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য॥

—চৈতন্যচরিতামৃত।

তবে ভক্ত কি লইবে?

ভক্তিই ভক্তের ফল। সাধনকালে অনুষ্ঠিত হইয়া ফললাভকালে ভক্তিই ভক্তের প্রাপ্য হইয়া থাকে। ভক্ত ভক্তিই অর্থাৎ কৃষ্ণসেবাই প্রার্থনা করেন।

ভকতির ফল ভকতিলি যাত্র
জানিবা আক নিশ্চয়।
এই পরমার্থ উদ্ধবর আগে
কৈলা কৃষ্ণ কৃপাময়॥

—ভক্তিরত্নাবলী।

অর্থাৎ, কৃপাময় কৃষ্ণ উদ্ধবকে পরমার্থতত্ত্ব বলিতেছেন, ইহা নিশ্চয় জানিবা যে ভক্তিই ভক্তের একমাত্র ফল

ভক্তের এই বিশেষণটির দ্বারা ভক্তিমার্গে সাযুজ্য মুক্তি কামনা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

বকুতিত করি যেন ভকতি গরিষ্ঠ অতি
কহোঁ শুনা সাবধান মনে।
সাযুজ্য মোক্ষকো মোর নযাহয় কদাচিত
আমার একান্ত ভক্তগণে॥

—ভক্তিরত্নাকর।

রসময়ী ভক্তি—

ভক্তগণ পাঁচ প্রকার রসে কৃষ্ণসেবা করেন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। তত্ত্বতঃ ভেদ থাকিলেও যে ভক্ত যে রসের সাধক তাহাই তাহার কাছে উৎকৃষ্ট বোধ হয়। কিন্তু সমস্ত রসেরই মূল ভিত্তি দাস্যরস অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা। রসময়ী ভক্তি বলিতে সাধারণতঃ এই পঞ্চ রসকেই বুঝায় কিন্তু বিশেষ ভাবে মধুর রসকে বুঝায়। শঙ্করদেব দাস্যরসের সেবাই প্রচার করেন। চৈতন্যদেব সর্ব্বসাধারণের জন্য দাস্যরসের সেবা নির্দ্দেশ করিলেও

অন্তরঙ্গসনে মধুর রসের আলোচনা করিতেন ও মধুর রসকেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেন।

ভক্তির এই বিশেষণটির দ্বারা কেবলাদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য প্রচারিত পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত বিষ্ণুপূজাবাদ নিরস্ত করা হইয়াছে। এই বিষ্ণুপূজা চিত্ত সংযম ক্রমে চিত্তশুদ্ধি লাভের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাতে বিষ্ণুসেবারূপ কোন ভাব বিদ্যমান নাই। চিত্তশুদ্ধি লাভ করিলে এই পূজার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। পঞ্চরসের ইহাতে কোন স্থান নাই। ইহা রসময়ী ভক্তির অন্তর্ভুক্ত নহে।

নিজ ভক্তের বশ—

ঈশ্বর স্বরাট পুরুষ, নিজ ইচ্ছায় পরিচালিত হন, স্বয়ং প্রকাশ বস্তু, কাহারও অধীন নহেন। তাহা হইলে তো তাঁহাকে জানিবার কোন উপায় থাকে না এবং চেষ্টা করাও নিরর্থক। তাই তিনি নিজ ভক্তের বশ হন বলিয়া আশ্বাস দিতেছেন। ইহা তাঁহার একটি বিশেষত্ব।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

—কঠোপনিষদ।

অর্থাৎ, এই আত্মাকে (ভগবানকে) প্রকৃষ্ট বচন (তর্ক), মেধা বা পাণ্ডিত্য দ্বারা লাভ করা যায় না। যাহাকে ভগবান কৃপা করেন, সেই মাত্র তাঁহাকে লাভ করিতে পারে, আর ভগবান তাহাকে নিজ তনু প্রদর্শন করিয়া কৃপা করেন।

দিয়া যাক অনুগ্রহ করা কৃপাময়।
তবু মহিমার তত্ত্ব সেহিসে জানয়॥

—ভক্তিরত্নাকর।

অনুমান প্রমাণে নহে ঈশ্বরতত্ত্ব জানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরের কেহ নাহি জানে॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে।
সেই সে তাঁহার তত্ত্ব জানিবারে পারে॥

—চৈতন্যচরিতামৃত।

এই বিশেষণটির দ্বারা গ্রন্থকার নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ নিরস্ত করতঃ সাধ্য তত্ত্বকে ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান বলিয়া স্থাপন করিতেছেন। মহাপুরুষীয়া ধর্মে ইনিই উপাস্য তত্ত্ব।

মহাপুরুষ

জগতে যে সকল মহাপুরুষ ধর্মসমাজ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যাহা দিতে চাহিয়াছেন, তাহা আমরা নিতে পারি নাই, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। শুধু পারি নাই যে তাহা নয়, আমরা ধর্মের আসনে সাম্প্রদায়িকতাকে বরণ করিয়া হয়ত নিজেকে সার্থক জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছি।.....ধর্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতারা নিজের নিজের সাধ্যানুসারে আমাদের জন্য, মাটির ছোক আর সোনার ছোক এক একটা পাত্র গড়িয়া দিয়া যান। আমরা যদি মনে করি, সেই পাত্রটা গড়িয়া দিয়া যাওয়াই তাঁহাদের মাহাত্ম্যের সবচেয়ে বড় পরিচয়, তবে সেটা আমাদের ভুল হইবে। কারণ.....তাহা কখনই পৃথিবীর সকলেরই কাছে সমান প্রিয় এবং সমান সুবিধাকর হইতে পারে না।. ...শাস্ত্রীয় ধর্মমত ও আনুষ্ঠানিক ধর্মসমাজ স্থাপনের দিক হইতে পৃথিবীর ধর্মগুরুদিগকে দেখা তাঁহাদিগকে ছোট করিয়া দেখা।

—রবীন্দ্রনাথ

নাম সুন্দর, জায়গাটা সুন্দর নয়। জল চোখে পড়ে না; দিগন্তকোল কুয়াশাচ্ছন্ন আর বাঁটাগাছে ভর্তি—ফুলের চিহ্ন নেই কোথাও—শুধু তার নাম সেঁউতির বিল। শ' শ' মাঠের মধ্যে, রুক্ষ মাটির চৌচির বুক হঠাৎ এই সবুজ ছবিটি কেমন করে আঁকা হয়ে গিয়েছে কেউ জানে না। কেই বা এই ছবির নাম দিয়েছে সেঁউতির বিল, কেনই বা এমন সুন্দর নাম, আর কোথায় বা সেঁউতি ফুল কে বলবে! সবই নীরব। শুধু বিলের কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে জোনাকিরা উড়ে আসে, মেলা বসায়, পাখা ছড়িয়ে পুলির ছন্দে নাচে। আর দক্ষিণ থেকে চড় চড়ে হাওয়া ভেসে আসে। নিস্তব্ধ মাঠের বুক উজাড় করা সেই হাওয়া—তার সুরই অদ্ভুত। যেন অনেক জমান দীর্ঘনিশ্বাস এই সন্ধ্যের অন্ধকারে আড়ালে আড়ালে বুক থেকে নামিয়ে দিয়ে একটু হালকা করে নিচ্ছে মনটা। আকাশের মাথায় হয়ত কোনদিন চাঁদ উঠেছে, পূর্ণিমার আলোয় সেঁউতি বিল ভরে গেছে—হয়ত কোনোদিন চাঁদ উঠেনি কৃষ্ণপক্ষ বন থেকে বনতর হয়েছে, অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকারে সেঁউতি বিলের ছবিটা ঢাকা পড়ে গেছে। না, সেঁউতি বিল ঢাকা পড়ত না। তার জল ঢাকা পড়ত কিন্তু বহুত ঢাকা পড়ত না। জোনাকিরা জ্বলত, আর জ্বলত বিলের উত্তর কোণে একটি অদ্ভুত আলো। আলেয়ার আলো নয়, মশালের দাউ দাউ আলো—তাও নয়। মৃদু, স্থির, শান্ত একটি আলোর শিখা সেঁউতি বিলের উত্তর কোণে সন্ধ্যের অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠত, আর জ্বলত সারা রাত—সারা রাত ধরে, সকালের শুকতারার সঙ্গে নিভে যেত। আশ্চর্য এই আলো, প্রদীপ শিখার মতন ম্লান অথচ নরম সুন্দর শান্ত শিখা—সেঁউতি বিলের এক লুকানো অন্ধকার থেকে রোজ জ্বলে উঠত আর সারারাত জ্বলে সকালের আলোয় নিভে যেত। বৈশাখের ঝড়ে সে দীপশিখা নিভত না, বর্ষায় কত জল ঝরে যেত শুধু সেই আলো নুইল না কোনদিন, শীতের হিম আর কুয়াশা ঢেকে দিতে পারল না ওই মৃদু ম্লান শীর্ণ শিখাটিকে।

এই মৃদু প্রদীপ শিখা নেভার নয়। কত বছর আগে, কেউ তার হিসাব রাখে নি—হয়ত তখন, যখন বাঙলা দেশের বুকের ওপর বন্যার ঢেউয়ের মতন বার বার লোভী আর হিংস্র আঘাত আছড়ে পড়েছে—মোগল সাম্রাজ্যের

অন্তিম পর্বে যখন আর ধান্যের লুণ্ঠন চলেছে অকাতরে রক্তরাঙা তরবারি আর অশ্বপুরের ধূলিতে বাংলার শ্যামল চেহারা বিবর্ণ—পুব সম্ভব তখন সৈউতি ঝিলের এক নক্ষোপন কোণে একটি অচঞ্চল আশা আর বিশ্বাসের ওই আলো জ্বলে উঠেছিল—জ্বালিয়ে দিয়েছিল এক নারী—তরুণী তরুণী রাজকুমারী। নাম তার লবঙ্গলতা।

আজ নেই, কিন্তু তখন ছিল। সৈউতি ঝিলের গা ছুঁয়ে ধবল মেঘের মত একটি প্রাসাদ। স্বর্ণের আলোয় প্রাসাদ-শিখরের নীলাভ চূড়াটি জ্বলত, সৈরিক রঙের একটি পতাকা উড়ত বাতাসে। রাজা শঙ্খনারায়ণের সুরক্ষিত প্রকোষ্ঠের নিস্তব্ধ মুহূর্তগুলি ভরা থাকত, বাজত ভেরী আর দুন্দুভি মধ্যাহ্ন বেলায়, রাজমহলের কক্ষে কক্ষে শত চরণের ধ্বনি উঠত—আর রাণীমহলে মহেশ্বরের পূজা সাঙ্গ হলে দাসীদের পায়ের শব্দে মুখর হয়ে থাকত অন্তঃপুর। লবঙ্গলতা এই মুখরতা ভালবাসতে পারেনি। রাণীমহলের সবচেয়ে ছোট নির্জন ঘর—একেবারেই এক প্রান্তে, সম্পর্ক নেই যার অন্তঃপুরের চাপল্য আর চঞ্চলতার সঙ্গে—লবঙ্গলতা সেই ঘরের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল। লবঙ্গলতার এই নির্বাসন অস্বাভাবিক। জীবনে যার একটি অশ্রুবিন্দু চোখের কোণে জেগে ওঠার কথা নয়, একটি দীর্ঘ-নিশ্বাসও যার পক্ষে অকারণ—তার এই স্বেচ্ছায় আনন্দ, বিলাস, সুখ আর সৌভাগ্য থেকে দূরে সরে যাওয়া কেন?

তবে কি লবঙ্গলতার জীবনে কোনো অভিশাপ বেদনার কণ্টক হয়ে বিঁধে আছে! না; লবঙ্গলতার নিত্য যৌবনের কোথাও একটি কাঁটা বিঁধে নেই। এখন প্রথম বসন্তের মৃদু উত্তাপে একটি পুষ্পতরুর মতন সে কুঁড়ি মেলেছে তার শাখা প্রশাখায়। একটি ঘ্রাণ উঠেছে। ভ্রমর গুঞ্জনের কাল সুরু হল বুঝি। কিন্তু লবঙ্গলতার চোখে বসন্ত দিনের সেই ব্যাকুলতা কোথায়, কোথায় তার মনে সেই রঙ-লালিমা! কেন তার হাসি আজও একটি বিচিত্র হেঁয়ালি হয়ে ফুটে ওঠে না!

মনে হতে পারে, শঙ্খনারায়ণের রাজ্যসীমানায় শত্রুদল বার বার হানা দিচ্ছে, যুদ্ধবিগ্রহ অশান্তির মধ্যে রয়েছেন পিতা, তাই লবঙ্গলতার মনেও শান্তি নেই। মনে হতে পারে এই সম্ভাবনার কথা কিন্তু তা সত্য নয়। রাজা শঙ্খনারায়ণের ভবিষ্যৎ নিরাপদ। একটা সন্ধি করে ফেলেছেন শঙ্খনারায়ণ—শত্রুরা ফিরে গেছে, বৎসরান্তে একবার করে আসবে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে নয়, খালি হাতে—ফিরে যাবে স্বর্ণ আর শস্য নিয়ে। আর একটি শর্ত—রাজা শঙ্খনারায়ণ সন্ধির চুক্তি অনুসারে মঙ্গলদেবকে সাহায্য করতে পারবেন না।

লবঙ্গলতা এই শর্তের কথা জানে,

শুনেছে তবু আশ্বাস না দিয়ে পারে নি।

কেন দিতে গেল এই আশ্বাস? তার সামর্থ্য কতটুকু? ভাবতে বসলে নিজেকে বার বার ধিক্কার দেয় লবঙ্গলতা।

কিন্তু না দিয়ে উপায় ছিল না। একটি অদ্ভুত স্বপ্নের মত মনে হয় সব। আশ্বিনের এক অপরূপ কুহক জ্যোৎস্নায় কে যেন এসেছিল। রাণী মহলের নিস্তব্ধ কাননের নির্জনতা স্পর্শ করে ছল ছল জল বয়ে যাচ্ছিল অঞ্জনার। আকাশের শিশির ঝরছিল পাতায়, ফুলে ঘাসে। আর একা—সম্পূর্ণ একা ছিল লবঙ্গলতা এবং অন্যমনস্ক।

আকস্মিকতায় চমকে উঠেছিল লবঙ্গলতা

—কে কে তুমি?

'নাগরঙ্গ।'

শুভ্রবাস যুবক সংযত শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল। নাম তার নাগরঙ্গ। মঙ্গলদেবের রাজ্যের অধিবাসী। সে কবি, সে গায়ক।

এখানে কেন—শঙ্খনারায়ণের প্রাসাদে, রাণীমহলের এই সুরক্ষ সম্পর্কহীন নির্জন কাননে! লবঙ্গলতা রূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করতে গিয়েও পারেনি। নীরব হয়ে গিয়েছিল শুধু চোখের অস্থির আর অন্তর্ভিমুখ এক দৃষ্টি দিয়ে নাগরঙ্গর ধৃষ্টতাকে ধিক্কার করল।

হয়ত ঈষৎ লজ্জিত হয়েছিল নাগরঙ্গ। কিন্তু লজ্জাই সব নয়, প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। নাগরঙ্গ বললে, আমি গোপনেই সাক্ষাৎ করতে চেয়েছি রাজকুমারী। প্রকাশ্য পথ দিয়ে এলে প্রাসাদের বাইরে

থেকেই ফিরে যেতে হত।

লবঙ্গলতা বিস্ময় বোধ করেছিল। গোপনে সাক্ষাৎ এসেছে তার সঙ্গে। এ কে? মঙ্গলদেবের চর না চতুর কোনো অনুগ্রহপ্রার্থী।

—আপনার সাক্ষাতের উদ্দেশ্য? লবঙ্গলতা সামান্য বিরক্ত হয়েই প্রশ্ন করলে।

সহজেই সব কথা বলতে পারেনি নাগরঙ্গ। কিন্তু বলেছিল ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে সব কথা। নিরাপত্তা আর নিরুদ্বিগ্নতাই সব নয় রাজকুমারী। হয়ত জীবনের সার কথাও তা নয়। নিরাপত্তা আর নিরুদ্বিগ্নতা শিশুদের জন্যে, হয়ত নারীদের জন্যেও। কিন্তু তাও বোধ হয় সত্য নয় যুদ্ধ-বিগ্রহে, অশান্তি আর অস্থিরতার দিনে সংকটে তো নয়ই। আদিকবি জানকীকে প্রাসাদ থেকে পথের ধুলোয় নামিয়ে এনেছেন, ব্যাসদেব পাঞ্চালীকে অসম্মানের আর নিঃস্বতার আত্মযন্ত্রণার চরমে ঠেলে দিয়েছিলেন। আজকের এই রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে আপনি কি শুধু নিরাপত্তা আর নিরুদ্বিগ্নতাই কামনা করবেন রাজকুমারী! তার চেয়ে সত্য কি কিছু নেই, মহত্তর কোনো আনন্দ!

নাগরঙ্গর কথা শুনে মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল লবঙ্গলতা। অথচ আশ্চর্য এক উত্তেজনাও বোধ করছিল।

নাগরঙ্গ তার গোপন সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলে। শঙ্খনারায়ণের সঙ্গে বিধর্মী শত্রুদলের সন্ধি চুক্তি ব্যর্থ করতে হবে। এমনভাবে যাতে শত্রুপক্ষ শঙ্খনারায়ণকে আর বিশ্বাস না করে কোনো দিন। এই বিশ্বাসের বিষ চারা আমূলে উপড়ে ফেলে দিতে হবে।

লবঙ্গলতা চমকে ওঠে। বুকের নিশ্বাস কণ্ঠে এসে থেমে যায়। কি বলছে নাগরঙ্গ! অর্বাচীন কবি!

'একটিই শুধু পথ আছে রাজকুমারী।' নাগরঙ্গ অটুট বিশ্বাসে কিন্তু নিষ্ঠুরের মতন বললে, 'আপনাকে মঙ্গলদেবের পুত্রবধূ হতে হবে। কুমার কল্যাণের বধূ।'

লবঙ্গলতা কেঁপে ওঠে। মঙ্গলদেবের পুত্রবধূ হতে হবে তাকে! পিতার যিনি শত্রু, নিজ রাজ্যের শান্তি আর নিরাপত্তার জন্যে যাকে কোনো রকম সাহায্য করবেন না এই শর্তে সন্ধি ক্রয় করেছেন শঙ্খনারায়ণ..... । না, এ কি করে সম্ভব!

নাগরঙ্গ বললে, বিচার করুন রাজকুমারী মানুষ হিসাবে কোন্‌টা আপনার কাম্য। শত্রু, স্বর্ণ আর স্বজাতি শত্রুতার বিনিময়ে অর্থহীন অসম্মানজনক শান্তি, নিরাপত্তা, নিরুদ্বিগ্নতা—না দুঃখ, যন্ত্রণা, নির্যাতন এবং সংগ্রামের বিনিময়ে স্বাধীনতা?

লবঙ্গলতা নীরব, নতমুখ হয়ে থাকল। মেঘ ভরা আকাশের মতন থমথম করতে লাগল অপরূপ সেই মুখ। কতক্ষণ যেন ভাবল লবঙ্গলতা, শেষে মৃদু ম্লান স্বরে প্রশ্ন করলে, 'এতেও যদি সন্ধি চুক্তি ব্যর্থ না হয়?'

তা হলে বুঝবো, একান্তই দুর্ভাগ্য আমাদের।' নাগরঙ্গ জবাব দিল বিষণ্ণ হাসি হেসে, 'কিন্তু রাজকুমারী, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এ চুক্তি ব্যর্থ হয়ে যাবে। শত্রুপক্ষ এই আত্মীয়তা সহজ মনে নেবে না। তারা সন্দেহ করবে। রাজা শঙ্খনারায়ণকে অবিশ্বাস করবে। কোনো বিজাতিই স্বজাতি আত্মীয়তাকে লঘু মনে মেনে নিতে পারে না।'

লবঙ্গলতা সম্মতি দিল। কুমার কল্যাণ কেমন পুরুষ, তিনি রূপবান না কুৎসিত, উদারচিত্ত না নীচ, হীনশক্তি না শক্তিমন্ত পুরুষ কিছুই জানল না লবঙ্গলতা, কিছুই জানতে চাইল না। দেশের এই মাটি যদি দস্যু আর লুণ্ঠনকারীর হাত থেকে মুক্তি পায়, শস্য আর স্বর্ণ যদি যথার্থ জনের ভোগ্য থাকে—কি আসে যায় এই স্বার্থত্যাগে!

নাগরঙ্গ বলে গেল—আগামী পূর্ণা তিথিতে সে আসবে। অঞ্জনার ওই উত্তর কোণে মহেশ্বরের মন্দিরের চত্বরে এই অদ্ভুত বিবাহের অনুষ্ঠান হবে। কেউ জানবে না। শুধু তারা তিনজন। আর নদীর জল, আকাশের তারা থাকবে এই বিবাহের দর্শক।

লবঙ্গলতা শপথ করলে। নির্দিষ্ট দিনে সে অপেক্ষা করবে অঞ্জনা॥ উত্তর কোণে মহেশ্বরের মন্দিরে। একা—সম্পূর্ণ একা। শুধু একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবে সে তার উপস্থিতি বুঝাবার জন্যে। আর কিছু না, কিছু নয়।

কিন্তু লবঙ্গলতা শুধু প্রদীপই জ্বালেনি। সেউতি

ফুলের একটি মালাও গেঁথেছিল। সেঁউতির ফুলে ফুলে ভরা আর ঢাকা ছিল মাধবের ক্ষুদ্র মন্দিরটি। অপেক্ষা করে করে লবঙ্গলতা খুব সুন্দর আর সহজ করে গেঁথেছিল মালা, প্রদীপ জেলে বসেছিল অপেক্ষায়। কুমার কল্যাণ আসবেন। আসবে কল্যাণ। সময় বয়ে গেল, রাত বাড়ল, অন্ধকার ঘন হল—ঝড়ের উদ্দাম হল, প্রদীপের শিখা কাঁপতে থাকল—এই বুঝি নিভে যায়। কিন্তু লবঙ্গলতা তবু স্থির, অচঞ্চল। তিনি আসবেন—সন্দেহ নেই। ভয় নেই, উদ্বেগ নেই।

হুঁশ এল—কল্যাণ নয় অকল্যাণ। লক্ষ্মনারায়ণ এই দুঃসাহসী অবাধ্য কন্যাকে ক্ষমা করতে পারলেন না। ক্ষমা করতে পারলেন না তার চাতুরী আর শিক্ষদ্রোহীতা। অঞ্জনার জলে, সেঁউতি ফুলের ঘোপে লবঙ্গলতার আয়ু নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল। কিন্তু প্রদীপ নিভল না। তারপর আজ কত বছর কেটে গেছে—অঞ্জনার জল শুকিয়েছে কবে, লক্ষ্মনারায়ণের প্রাসাদ মাটিতে মিশে গেছে—ধুলোয় ঝরে গেছে সব স্মৃতি আর ঐশ্বর্য—সেঁউতির ফোপ সাপের বিষে বিষে শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে—! বিরাট এক শূন্যতা আর রিক্ততা ছাড়া আর কিছু নেই। শুধু আছে ঘরে যাওয়া নদীর একটু ক্ষত চিহ্নের নাম নিয়ে। আর আছে সেই আশ্চর্য নরম আলো—দীপশিখার মত জ্বলছে সারা রাত ভরে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্তে—ঝড়তে ঝড়তে। সেঁউতি ফিলে আজ আর মানুষের পায়ের শব্দ শোনা যায় না—জোনাকিরাই শুধু জ্বলে আর ঘুরির ছকে নাচে অন্ধকারে—হাওয়ায় হাওয়ায়।

বাংলার নবজাগরণে বিদ্বৎ-সভার দান

রামমোহনের যুগ থেকে বিদ্যাসাগরের যুগ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিদ্বৎ-সভার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদ থেকে ধীরে ধীরে সেগুলি লোপ পেতে থাকে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—আলোচনার স্বাধীনতা, মতামতের উদারতা, পারস্পরিক মিলন ও ভাব-বিনিময়, প্রখর সমাজচেতনা, বিদ্বৎ-সমাজের সামাজিক দায়িত্ববোধ, নবীন বিদ্যোৎসাহীদের প্রেরণাদান ইত্যাদি।.....আজকের রাজনৈতিক সংঘাতের তীব্রতার যুগে যে ফুল অপ্রায় বাধার সৃষ্টি হয়েছে, সেদিন সে-বাধার সৃষ্টি হয়নি। সাধারণভাবে আজ প্রায় সকল শ্রেণির সভা-সমিতির চরিত্রই বদলে গেছে। রাজনৈতিক চেতনার প্রভাব সর্বত্র সমান স্পষ্ট না হলেও, তা থেকে একেবারে মুক্ত কারও অস্তিত্ব আছে কি না, অথবা সম্ভব কি না সন্দেহ। বিদ্বৎ-সভার ক্ষেত্রেও এই প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। রাজনৈতিক সমস্যা ছাড়াও, সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের সমস্যাও আজ আগেকার তুলনায় অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাব-বিনিময়ের স্বাভাবিক সামাজিক ইচ্ছা-বাসনা পর্যন্ত স্তিমিত হয়ে আসছে মনে হয়। মানবোচিত সাধারণ উদারতাবোধটুকুও যেন আমরা হারিয়ে ফেলছি।...তাই সেকালের মতন কোনো বিদ্বৎ-সভা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কথা চিন্তা করা আজ আর সম্ভব নয়।...অথচ মানুষের জীবনের সামনে আজ এত জিজ্ঞাসা, এত সমস্যা এসে ভিড় করেছে যে বিজ্ঞজনদের পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে তার উত্তর বা সমাধানের নির্দেশ দেওয়ার সম্ভব নয়। বিজ্ঞজনদের ঐতিহাসিক ভূমিকারই আজ বৈপ্লবিক রূপান্তর হয়ে গিয়াছে। যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মানবতন্ত্র ও যুক্তিবাদের বাতি জ্বালিয়ে মানুষ মধ্যযুগের অন্ধকার গহ্বর থেকে আধুনিক যুগের আলোকরাজ্যে প্রবেশ করেছিল, তা আজ 'সমষ্টির' অতিপার্থিব প্রতিভূ 'রাষ্ট্রের' খাপটায় নির্বাপিতপ্রায়। এই অবস্থায় কোন বিদ্বৎ-সভার পক্ষে তার প্রকৃত ভূমিকা বজায় রেখে গড়ে ওঠা সুদূরপরাহত বলে মনে হয়।

বিশ্বভারতী পত্রিকা। বিনয় ঘোষ

ভারত ও অঞ্চল

অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বর্তমান আয়তন ৮১০,৮০২,০০০ একর বা ১২,৭৯,৬০০ বর্গ মাইল বর্তমানে এই রাষ্ট্রে প্রায় ৩৫০ কোটি লোকের বাস। সমগ্র রাষ্ট্রটি ৮টি প্রকার রাজ্যে বিভক্ত।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র ও রাজ্যসমূহ

		আয়তন (হাজার বর্গমাইল)		লোক সংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ মাইলে)
	অন্ধ্র			৩২২
	আসাম			
	বিহার			
	বোম্বাই			৩২৩
	মধ্য প্রদেশ			১৮৩
	মাদ্রাজ			৪৪২
	উড়িষ্যা			২৭৪
	পাঞ্জাব		১২৬'৪	৩৩৮
	উত্তর প্রদেশ		৬৩২'২	৪৪৭
	পশ্চিমবঙ্গ	৩১'৮	১৪৮'৬	৮০৮
'ক' রাজ্যগুলির মোট		৭৬২'৭	২৭৮০৮	৩৬৫
'খ'	হায়দ্রাবাদ	৮২'১	১৮৪'৬	২২৭
	মধ্যভারত	৪৭'৪	৭৯'৪	১৭১
	মহীশূর	৩৩'৩	৯৮'৪	২৯৬
	পেপসু		৩৫'৯	৩৪৭
	রাজস্থান		১৫২'৯	১১৭
	সৌরাষ্ট্র		৬১'৪	১৪০
	ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন		৯২'৮	
	কাশ্মীর-জম্মু	৯২'৮	৪৬'১	৪৯
'খ' রাজ্যগুলির মোট		৫২৫'৬	৭৩০'৭	১৭০

'গ'

	১০'৯	১১'১	
কচ্ছ	১৬'৭	৫'৭	
মণিপুর	৮'৬	৪৮	
ত্রিপুরা	৯'০	৬'৭	
বিন্ধ্য-প্রদেশ	২৩'৬	৩৪'৭	১৪১
'গ' রাজ্যগুলির মোট	৭৪'৪	৯০'৭	১৩২
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৩'২	'৩	
সিকিম	২'৭	১'৪	৫০
'ঘ' রাজ্যগুলির মোট	৫ ৯	১'৭	২৮
ভারতীয় প্রজাতন্ত্র	১২৬২'৬	৩৬১২'৯	২৮৬

ভারতে জমি কিভাবে ব্যবহৃত হয়, উহার সংখ্যা-তথ্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বর্তমানে যতটা জমিতে কৃষিকার্য চলিতেছে, উহার আয়তন কিছুটা বাড়ান যায়। উহার জন্য প্রয়োজন আধুনিক প্রথায় চাষবাস, জমিতে সার দেওয়া, উচ্চতরের বীজ ব্যবহার এবং জলসেচ নিয়ন্ত্রণ। পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে উৎপাদন-বৃদ্ধি যে সুনিশ্চিত উহা গিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, রাজ্যসীমা বন্টন উহাদের মানো কিনা।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে জমির ব্যবহার (১৯৫৪-৫৫)

(দশ লক্ষ একর)

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ভৌগোলিক আয়তন—	৮১০'৮
জমির খসড়া হইতে আয়তন—	৭২১'৮ (পার্বত্য অংশ ও নদী বাদে)
বনভূমি—	১৩৩'৪
কৃষির অনুপযুক্ত জমি—	১২১'৮
পতিত জমি—	১৫১'৫
কৃষিকার্যে নিযুক্ত জমি—	৩১৪'৯
জলসেচ জমি—	৫৪'৪

ভারতের আছে কৃষিজ-সম্পদ, উদ্ভিজ্জ, খনিজ সম্পদ ও প্রাণীজ সম্পদ। ইহা হইতে ভারতবাসী গড়িয়াছে শ্রম-শিল্প ও কুটীর শিল্প। কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের ভাববারা ও পণ্য সামগ্রীর আদান-প্রদানের জন্য গড়িয়া উঠিয়াছে পরিবহনের পথ, যানবাহন, বন্দর ও কেনাবেচার বাজার। এই সমস্ত বিষয়ের অর্থাগমে জাতির অবস্থা নির্দ্ধারিত হয়। ঐ অর্থাগমের বা আমদানীর উপর ভারতীয় অঞ্চলের পরিসীমা নির্ভর করে। সুতরাং ঐ অঞ্চলগুলি নির্দ্ধারণ করিতে বর্ত্তমান রাজ্য-সমূহের আয়তন, লোকসংখ্যা ও জমির ব্যবহার জানা আবশ্যক। অতঃপর আঞ্চলিক খনিজ, বনজ, প্রাণীজ ও শিল্পজ আয় হইতে আঞ্চলিক অধিবাসীর অবস্থা বুঝিয়া অঞ্চল বা গণ্ডীগুলির সীমা স্থির করা যাইবে। এই বিষয়ে পরিবহন শেষ নির্দ্দেশ দিবে। ঐ সমস্ত অঞ্চল লইয়া প্রজাতন্ত্রের শাসন-ব্যবস্থা ও সমাজ-তন্ত্র বিধি-অনুযায়ী পরিচালিত হইবে। এক্ষণে দেখা যাক্ অঞ্চলগুলি কিরূপ।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র—(১) পূর্ব্ব অঞ্চল

(দশ লক্ষ)

	সমূহ আয়তন (একর)	লোকসংখ্যা (জন)	বনভূমি (একর)	আবাদের অযোগ্য জমি (একর)	আবাদী জমি (একর)	অনাবাদী পতিত জমি (একর)	জলসেচ জমি (একর)	প্রধান খনিজ ফসল সম্পদ
আসাম								খাদ্য শস্য কয়লা
পশ্চিমবঙ্গ								ধান, ছুটা অভ্র
সিকিম								লোহার খনিজ
বিহার								বাক্সাইট লাল লৌহ
উড়িষ্যা								ভোগ্য শস্য ও
আন্দামান-নিকোবর								তামাক তাম্র
ত্রিপুরা	২·৬		১·৬	·০৭	·৪	·৪		পাট, বাক্সাইট
মণিপুর			·০৪		·২	·১		ইক্ষু, চা ইত্যাদি
নেফা								ইত্যাদি
মোট	১১৯·৬	৮৯·৯৭	৭০·৫৮	১৪·২৯	৫১·২১	২৩·৯	১০·৭	

পূর্ব্ব অঞ্চলটিতে প্রাকৃতিক সম্পদ অনেক। বিবিধ খনিজ সম্পদ ও বনজ সম্পদ অঞ্চলটিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। ইহা ছাড়া আঞ্চলিক পরিবহন ও জলবায়ু যেমন কৃষিকার্য্যের তেমন শ্রমশিল্পের উন্নতি করিয়াছে। বর্ত্তমানে উন্নত জলসেচ-প্রথায় আঞ্চলিক সুবিধা বৃদ্ধি পাইবে। অঞ্চলটিতে কাঁচা তুলার অভাব যেমন আছে, তেমন অন্যান্য ভোগ্য ফসল প্রচুর রহিয়াছে। বস্ত্র-শিল্পে, চিনি উৎপাদনে অঞ্চলটি এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। পরন্তু অন্যান্য শ্রমশিল্পে অঞ্চলটির স্থান বেশ উচ্চ। পাট-শিল্পে অঞ্চলটির একাধিপত্য বলা চলে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে অঞ্চলটির স্থান বেশ উচ্চ। মোট কথা, অঞ্চলটি কৃষি ও শ্রম-শিল্পে সমরূপ উন্নত। ইহা ছাড়া কলিকাতা বন্দরের স্থান অপরিসীম। উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূল স্বাস্থ্য-নিবাস স্থাপনের সুযোগ দিয়াছে। অঞ্চলের পর্ব্বত ও তটভূমি প্রতি বৎসর বহু পর্য্যটককে আকৃষ্ট করে।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র—(২) দক্ষিণ অঞ্চল

(দশ লক্ষ)

	আয়তন (একর)	লোকসংখ্যা (জন)	বনভূমি (একর)	আবাদের অযোগ্য জমি (একর)	আবাদী জমি (একর)	অনাবাদী পতিত জমি (একর)	জলসেচ জমি (একর)	প্রধান ফসল	খনিজ সম্পদ
অন্ধ্র				৮·১	১৬·২	৮·৪	৫·২	ধান, অভ্র, খনিজ	
মাদ্রাজ				৬·৫	১১·৬	৯·৩	৫·৬	তুলা, লৌহ, চূ.	
মহীশূর				২·৪	৭·২	৭·০	১·১	ভোগ্য লিগনাইট	
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	৫·৯	৯·৩	১·৮	·৮	২·৮	·৫		শস্য, ইক্ষু, স্বর্ণ, চা কফি	মাঙ্গা-নিজ
কুর্গ	১·০	·২	·৩	·০	·২	·২	·০১		
মোট	১০৭·৫	৭৫·৬	১৮·৩	১৭·৯	৪৩·৭	২৫·৪	১১	ইত্যাদি	ইত্যাদি

এই দক্ষিণ অঞ্চলটি কৃষিকার্যে উন্নত। উপকূল ও নদী পর্যায়ে চাষাবাদ প্রধান। ইহা ছাড়া উপকূলে মৎস্য-শিকারে কত শত লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহার পর খনিজ সম্পদের কথা। আবাদী অঞ্চলে রবার, চা ও কফি প্রধান সামগ্রী। ঐ সমস্ত আবাদী অঞ্চলে যেমন অনেক লোক নিযুক্ত রহিয়াছে, তেমন ঐ সমস্ত সামগ্রী বিক্রয়ে রাজস্ব কম হয় না। ইহা ছাড়া বনভূমি অঞ্চলে চন্দন বৃক্ষ ও মসলার গাছপালা হইতে আমদানী বেশ উচ্চ। বর্তমানে চন্দন তৈল কারখানায় বহু লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। নদী পর্যায়ে খাদ্য-শস্য যেমন উৎপন্ন হয়, তেমন হয় ভোগ্য-শস্য। ভোগ্য-শস্যের মধ্যে তামাক, ইক্ষু ও তুলার স্থান বেশ উচ্চ। এই অঞ্চলের জলসেচ অঞ্চলে উচ্চ-আঁশের তুলা উৎপন্ন হয়। ঐ তুলা দীর্ঘ-আঁশ বিশিষ্ট। এই অঞ্চলের তামাক সিগার ও সিগারেট প্রস্তুতে বিশেষ কাজে আসে। অঞ্চলটিতে সর্বপ্রকার খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় না বলিলে মিথ্যা বলা হয়। যাহা হউক, লৌহ-ইস্পাত কারখানা, বস্ত্রশিল্প, জাহাজ-নির্মাণ শিল্প, বিমানপোত নির্মাণ কারখানা, রেলের গাড়ী নির্মাণ শিল্প, এ্যালুমিনিয়াম শিল্প এবং রবার শিল্প বেশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অঞ্চলটিতে শ্রমশিল্পের সংখ্যা কম হইলেও, যে সমস্ত শ্রমশিল্প স্থাপিত রহিয়াছে, উহাদের মান শিল্প-জগতে বেশ উচ্চ। মোটের উপর, অঞ্চলটি কৃষি-কার্যে, খনন-কার্যে, মৎস্য-শিকারে, আবাদী-কৃষিতে ও শ্রমশিল্পে বর্দ্ধিষ্ণু। অঞ্চলের ছয় শ্রেষ্ঠ বন্দর বলিতে মাদ্রাজ ও বিশাখাপত্তনম। ইহা ছাড়া কয়েকটি ছোট বন্দর উপকূল বাণিজ্যে কম সহায়তা করে না। উহাদের মধ্যে অন্যতম হইল—মাঙ্গলিপটম, কোকনদা, কারীকল, কোচিন, টুটিকরন, কালিকট ও মাঙ্গালোর।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র—(৩) মধ্য অঞ্চল

(দশ লক্ষ)

	আয়তন (একর)	লোকসংখ্যা (জন)	বনভূমি (একর)	আবাদের অযোগ্য জমি (একর)	আবাদী জমি (একর)	অনাবাদী পতিত জমি (একর)	জলসেচ জমি (একর)	প্রধান ফসল	খনিজ সম্পদ
মধ্যপ্রদেশ	৮৩·৭	২১·২	৩২·৭	৫·১	৩১·০	১৪·১		ভোগ্য ফসল	ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ,
বিন্ধ্যপ্রদেশ	৫২·৬	৩·৬	৩·৩	২·৩	৪·৬	৪·৭	·২	ধান, গম,	কয়লা
ভূপাল	৪·৪	·৮	১·৪	·৩	১·৮	·৯	·৩	ডাল, রবি,	গ্রাফাইট,
হায়দ্রাবাদ	১৫·১	১৮·৭	৫·০	৫·২	২৯৫	১১·৪	২·০	তৈলবীজ,	ম্যাঙ্গানিজ
মোট—	১৪৫·৫	৪৪·৩	৪২·৪	১২·৯	৬৬·২	৩১·১	৪·৪	ভোগ্য ফসল তুলা, মেসটা	

ভূপ্রকৃতির প্রকারভেদের মধ্যাঞ্চলটি এতদিন বিশেষ করিয়া কৃষিকার্যে নিযুক্ত ছিল। বনভূমি অঞ্চলে সাল, সেগুন, নিম, হরীতকী, মহুয়া নামক বৃক্ষগুলি অধিক। প্রাচীন প্রথায় বৃক্ষচ্ছেদন করিয়া এতদিন পর্যন্ত সরকার যৎসামান্য রাজস্ব পাইতেন। বর্তমানে ঐ রাজস্বের উন্নতির প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত বৈজ্ঞানিক প্রথায় বনভূমি সংরক্ষণ করার চেষ্টা হইতেছে। বনভূমি অঞ্চলে হিংস্র ও নিরীহ পশু বাস করে। সময় সময় ঐ সকল পশু শিকার করা হয়। নদী-উপত্যকায় কৃষি উন্নত। শুষ্ক অঞ্চলে মিলেট প্রভৃতি শস্যের চাষ হয়। অঞ্চলটিতে খনিজ সম্পদ আছে, সত্য। কিন্তু নানা কারণে ঐ সমস্ত সম্পদ নিয়ন্ত্রিত করিয়া কাজে লাগান হয় নাই। বর্তমানে কয়েকটি ভ্রমশিল্প ঐ অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে। মোটকথা, অঞ্চলটি কৃষি-অঞ্চল বলিয়া কোন কোন বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ইহা সত্য যে, আঞ্চলিক কৃষিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিনিময়ে সন্নিকটস্থ অঞ্চলের এবং বৈদেশিক শিল্পজাত সামগ্রী আমদানী করা হয়। লোক-বসতি হইতে আঞ্চলিক উন্নতি কতটা হইয়াছে অনুমান করা যাইতে পারে। অঞ্চলটি প্রজাতন্ত্রের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র—(৪) পশ্চিম অঞ্চল

(দশ লক্ষ)

		বনভূমি (একর)	আবাদের অযোগ্য ভূমি (একর)	আবাদী ভূমি (একর)	অনাবাদী পতিত ভূমি (একর)	জলসেচ ভূমি (একর)	প্রধান ফসল	খনিজ সম্পদ
বোম্বাই				৪৩·২	৯·৪	২·৩	ফসল	
মধ্যভারত				১২·০	৭·৬		গম,	
রাজস্থান				২৫·৮	৩২·৯		ধান,	
কাশ্মীর				·৪	·৬		মিলেট	
সৌরাষ্ট্র		৪·১	·৬	৮·২	১·০	·৭	ভোগ্য	
কচ্ছ	১০·২	·৯	·১	১·২	১·৪	·১	ফসল	
মোট	২১০·৪	৬৪·৬	১৭·৯	৯৬·০	৯০·৬	৪৩·১	তুলা,	

প্রজাতন্ত্রের পশ্চিম অঞ্চলটিতে বারিপাত অল্প এবং ভূমি খুব উর্বর নহে। নদী-উপত্যকায় এবং জলসেচ অঞ্চলে ধান ও গম জন্মে। সাধারণতঃ শুষ্ক ভূমিতে জোয়ার, বাজরা ও রাগী নামক মিলেটের চাষই অধিক। কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে তুলার চাষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই অঞ্চল হইতে ভিলাম ও লম্বা প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র প্রেরিত হয়। ইহা ছাড়া উপকূল অঞ্চলে লবণ প্রস্তুতের কারখানা বিদ্যমান। অঞ্চলটির সমুদ্র-উপকূলে শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাধান্য দেখা যায়। ভ্রমশিল্পের মধ্যে বস্ত্র-শিল্পের স্থান সর্বপ্রথম। বর্তমানে বোম্বাই অঞ্চলে আরও কয়েকটি শিল্প-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে খনিজ তৈল পরিশোধন কারখানা, মোটরগাড়ী নির্মাণ কারখানা, বিলাসদ্রব্য ও চলচ্চিত্রের ফিল্ম তুলিবার কারখানা অন্যতম শ্রেষ্ঠ। অঞ্চলটিতে যে কয়েকটি বন্দর রহিয়াছে, উহাদের মধ্যে বোম্বাই, কান্ডলা ও পোর্টওখা বেশ নামকরা। প্রাচীনকালে সুরাট ছিল অন্যতম বন্দর। মোটামুটিভাবে দেখিলে অঞ্চলটির আর্থিক অবস্থা অনুন্নত। অধিকাংশ স্থলে কৃষিই একমাত্র উপজীবিকা। অঞ্চলটির পশ্চিমার্ধে ভ্রম-শিল্প কারখানা স্থাপিত হওয়ায় বসতি ঘন এবং অধিবাসীর আর্থিক অবস্থা বেশ উন্নত।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র—(৫) উত্তর-অকল

(দশ লক্ষ)

	আয়তন (একর)	লোক সংখ্যা (জন)	বনভূমি (একর)	আবাদের অযোগ্য জমি (একর)	আবাদী জমি (একর)	অনাবাদী পতিত জমি (একর)	জলসেচ জমি (একর)	প্রধান ফসল	খনিজ সম্পদ
				১১·০	৪১·৭	১১·২	১২·২	খাদ্য-শস্য: গম,	হিমালয় অকলে
				৭·৩	১৩·৩	২·৪	৫·৩	যব,	লিগনাইট ও
					৪·৭		২·৪	চাউল, মিলেট	অন্যান্য খনিজ
			·৪					তোগ্য-শস্য:	সম্পদ
			—					তুলা, ইক্ষু,	
কাশ্মীর জম্মু	২·৪	৪·৪	১·০	১·৭	১·৭	১·১	·৭	তামাক	
মোট	১৬২·৭	৮৬·৬	১৩·১৫	৪০·৮	৬২·৩	১৭·১	২০·৮		

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের উত্তর অকলটি জলসেচ-প্রধান উন্নত ধরণের। বর্তমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী নলকূপ খনন করিয়া এবং খাল কাটিয়া এই অকলে অতিরিক্ত জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইতেছে। এই অকলে পূর্বে রবিশস্য অধিক জন্মিত। গম এখানকার প্রধান খাদ্য-শস্য। ভোগ্য-ফসলের মধ্যে তামাক, ইক্ষু ও তুলা প্রধান। জলসেচ অকলে তুলার জমি বৃদ্ধি পাইতেছে। অকলটিতে খনিজ-সম্পদ যৎসামান্য পাওয়া যায়। উচ্চস্তরের কয়লা ও খনিজ লৌহ পাওয়া যায় না বলা চলে। সুবিধার বিষয় এই যে, এই অকলে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদিত হওয়ায় বস্ত্র-শিল্প, চিনির কারখানা, জুতার কারখানা, কৃষিজ তৈল-নিষ্কাশন কারখানা বেশ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া এই অকলে কুটীরশিল্প উন্নতধরণের। কার্পেট, কম্বল, শাল, বাসনের তৈজসপত্র, এবং আতর প্রভৃতি সামগ্রী নানা স্থানে প্রস্তুত হয়। এখানকার অধিবাসী কৃষিকর্মে ও কুটীর-শিল্পে বেশ নিপুণ।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে উপরি কথিত পাঁচটি অকলের বিষয় মোটামুটি আলোচনা করা হইল। এক্ষণে দেখা যাক্, রাষ্ট্রের আয়তন ও সম্পদে কাহার কতটা অধিকার এবং রাজস্বে কাহার কতটা দান

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র ও অকল

অকল	ভৌগোলিক আয়তন (একর)	মোট আয়তনের	লোক সংখ্যা	লোক-সংখ্যার	বনভূমি		আবাদী জমি মোট আবাদের	
			জন	শতকরা	একর	শতকরা	একর	শতকরা
পূর্ব	১৬২·৬		৮২·২৭	২৪	৪০·৪৮	৩০	৪১·২১	
দক্ষিণ	১০৭·৪		৭৪·৬০	২১	১৮·৩	১৪	৪৩·৭০	
মধ্য	১৪৪·৪		৪৮·৩০	১২	৪২·৪	৩২	২৬·২০	
পশ্চিম	২১০·৪		৬৪·৪০	১৮	১৭·৯	১৪	৯০·৮০	
উত্তর	১৭৯·৭		৯৬·৯০	২৪	১৩·১৫	১০	৬২·৩০	

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র ও অঞ্চল

(দশ লক্ষ)

পশ্চিম	জন-বহুল, সম উন্নীত কৃষি, খনিজ এবং শ্রমশিল্প অঞ্চল
	জন-বহুল অধিক কৃষি ও শ্রমশিল্প এবং সামা খনিজ অঞ্চল
	অল্প-লোক-বিশিষ্ট, কৃষি ও খনিজ অঞ্চল, বনভূমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক
	মধ্যম-লোক-বিশিষ্ট, অধিক আবাদের অযোগ্য ও পতিত জমি সমেত মধ্যম কৃষি ও শ্রমশিল্প অঞ্চল
	জন-বহুল, অধিক্ জলসেচ-জমিবিশিষ্ট কৃষি ও মধ্যম শ্রমশিল্প অঞ্চল

প্রত্যেক অঞ্চলের কার্য্যকলাপ মোটামুটিভাবে বুঝা গেল। এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে, অঞ্চলগুলিতে নিজ নিজ মোট আয়তনের শতকরা কি পরিমাণ জমি আবাদী, অনাবাদী পতিত এবং আবাদের অযোগ্য। ঐরূপ তথ্য হইতে ভবিষ্যৎ কার্য্য-কলাপ স্থিরীকৃত হইবে। এইরূপ অবস্থার পিছু মাথা কতটা আবাদী জমি প্রত্যেক অঞ্চলে বিদ্যমান জানা প্রয়োজন।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র ও অঞ্চল

আঞ্চলিক আয়তনের তুলনায় শতকরা

অঞ্চলগুলি	আয়তন (দশ লক্ষ একর)	বনভূমি	আবাদের অযোগ্য ভূমি	অনাবাদী পতিত জমি	আবাদী জমি	জলসেচ জমি	মাথাপিছু আবাদী জমি (একর)	মন্তব্য
পূর্ব্ব								আয়তনের অবশিষ্ট
দক্ষিণ								পর্ব্বত ও নদীতে
মধ্য								লিপ্ত। এই কারণে
পশ্চিম								শতকরার যোগফল
উত্তর								১০০ হইল না।

মনে রাখিতে হইবে যে, একজন প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য মাথা পিছু ২·৪ একর আবাদী জমি হইলে, সে ঐ জমি হইতে বাৎসরিক নিজ খাদ্য-শস্য উৎপন্ন করিতে পারে। যাহা হউক, সমগ্র ভারতে মাথা-পিছু আবাদী জমির পরিমাণ ৎসামান্য। উহা ১ একরের কম। কেবল মাত্র মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলে মাথা-পিছু আবাদী জমি ১ একরের উর্দ্ধে। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার রহিয়াছে যে, দক্ষিণ, মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলগুলিতে নিজ নিজ মোট আয়তনের শতকরা ৮০ ভাগ জমি আবাদী। উত্তর ও পূর্ব্ব অঞ্চলে নদী ও পর্ব্বতে কিছুটা জমি অধিকার করিয়াছে। হিমালয় পর্ব্বতে বনভূমি ও খনিজ সম্পদ অর্থপ্রসূ করিতে হইলে পরিবহন উন্নত ধরণের আবশ্যক। তৎসহ বনভূমির উপযুক্ত রক্ষাদি ব্যবস্থা আরও থাকা আবশ্যক। বর্ত্তমানে ঐ সমস্ত অঞ্চল হইতে রাজস্ব-বাবদ আয় কিছুই নাই বলা চলে। দক্ষিণ ও উত্তর অঞ্চলদ্বয়ে জলসেচ জমি অধিক। দুই কৃষি অঞ্চল—মধ্য ও পশ্চিম—ঐ দুই অঞ্চলে বর্ত্তমানে জলসেচ জমির পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা কম। কারণ আর কিছুই নহে, নদীর সংখ্যা কম এবং যে সমস্ত নদী রহিয়াছে, উহাতে জল সারা বৎসর সামান্যই থাকে। এক্ষণে ঐ দুই অঞ্চলে বনভূমি দ্বারা জলসেচ সম্ভব কিনা গবেষণা হইতেছে। এই সমস্ত তথ্য হইতে অঞ্চল গুলির প্রকৃত ভৌগোলিক রূপ অনুমান করা যায়। এক্ষণে আর্থিক রূপ দেখা আবশ্যক।

অঞ্চলগুলি	প্রধান প্রধান শ্রমশিল্প	রাজস্ব (কোটী টাকা)	মন্তব্য
পূর্ব্ব	জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা, পাটকল, ইস্পাত কারখানা, বস্ত্র-শিল্প, এ্যালুমিনিয়াম কারখানা, কাগজ কল, সার প্রস্তুতির কারখানা, রেল ইঞ্জিন কারখানা, রবার শিল্প, মোটর নির্ম্মাণ কারখানা, চায়ের কারখানা, ইক্ষু কারখানা, রসায়ন শিল্প ইত্যাদি	১০০·৬	উন্নত কৃষি, খনিজ ও শিল্পাঞ্চল
	লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, রবার প্রস্তুত কারখানা ব্যোমযান প্রস্তুত কারখানা, বস্ত্রশিল্প, চন্দন তৈলের কারখানা, তামাক ও ইক্ষু কারখানা ইত্যাদি		উন্নত কৃষি এবং মধ্যম খনিজ ও শিল্পাঞ্চল
	সংবাদপত্রের কারখানা, তৈল-বীজ কারখানা, বস্ত্রশিল্প, ইত্যাদি		
পশ্চিম	বস্ত্রশিল্প, বিলাস, ও রসায়নদ্রব্য কারখানা, মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ কারখানা, খনিজ তৈল পরিশোধন কারখানা, ইত্যাদি		
উত্তর	বস্ত্রশিল্প, চামড়ার কারখানা ও কুটীর শিল্প, ইত্যাদি		উন্নত কৃষি ও কুটীরশিল্প এবং মধ্যম শিল্পাঞ্চল
		মোট রাজস্ব ৫০৫·৩	

রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের স্ব স্ব রূপ বুঝা গেল। সমাজতন্ত্র হিসাবে উন্নয়ন করিতে হইলে, প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব রূপ-পরিচয়ের দ্বারা বিশ্লেষণ-করা আবশ্যক। বর্তমানে রাজ্যের সীমা পুনর্বিন্যাসের যে চেষ্টা হইতেছে, উহাতে স্থানে স্থানে যে ব্যাপার হইতেছে, উহাতে রাজ্যগুলি ঘুঁষাঘুঁষি সমস্ত পূর্বক আমরা অখিল ভারতের বুলি আওড়াই। কিন্তু কার্যকালে অন্তর্নিহিত মনোভাব কিরূপ কূপমণ্ডুকতার পূর্ণ উহার পরিচয় দিই। যদি আমরা সকলেই ভারতবাসী এবং ভারত আমাদের জন্মভূমি, তবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য সীমারেখা রদবদল করিলে কেন বিচলিত হই? ঐ সীমারেখা পরিবর্তনে ব্যক্তি-বিশেষের কতটা ক্ষতি বা লাভ হয়? তবে রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে উহাদের সুবিধা হয়। ঐ সুবিধা ভারতবাসী সকলেরই উপভোগ্য। যদি ঐরূপ সীমা পুনর্গঠনে মতভেদ হয়, যেন অঞ্চল বা খণ্ড স্থির করা হইলে, আঞ্চলিক পরিস্থিতি হইতে কিরূপ উন্নয়ন সম্ভব স্থির করা সহজ হইবে। উপরি-কথিত অঞ্চলে ভারত-বিভাগে ভারতের কোন অংশ কিরূপ প্রকৃতি সম্পন্ন উহা বুঝা যায়। ঐ সমস্ত অঞ্চল যাহাতে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হয় সেই ব্যবস্থা আবশ্যক। বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রগুলিতেও ঐরূপ অঞ্চল স্থির করা হইয়াছে। অঞ্চলগুলির বিশেষত্ব অনুযায়ী পারস্পরিক আদান-প্রদানে প্রগাঢ় হইয়াছে। ইহা ছাড়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যের সম্মান করে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি রাজ্য-সীমার পুনর্গঠন লইয়া মনোমালিন্য, বিবাদ-বিসম্বাদ, মারামারি হয়, তবে রাষ্ট্রকে অঞ্চল বা খণ্ডীতে বিভক্ত করিয়া কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক রাজত্বের কিছুটা শিক্ষা, পরিবহন, শান্তিরক্ষা, এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা যাবৎ ন্যস্ত করিলে প্রত্যেক অঞ্চলের উন্নতি সমরূপ হইবে। অঞ্চলস্থিত প্রত্যেক রাজ্য নিজ নিজ রাজত্বের সামান্য অংশ আঞ্চলিক তহবিলে পূর্ব-কথিত উন্নয়ন বাবদ জমা দিবে। উহা ছাড়া কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে কিছু অর্থ আমদানী হইবে। বর্তমান রাজ্যগুলি নিজ নিজ রাজত্ব বর্তমান নিয়মানুপাতে খরচ করিবে। প্রত্যেক রাজ্যের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলে কালে প্রত্যেক অঞ্চল একটি ভাবধারায় গঠিত হইবে। এইরূপ গঠনে ভাষা লইয়া বিবাদ থাকিবে না। প্রত্যেক অঞ্চলে নানা ভাষা-ভাষীর লোক বসবাস করিবে।

অঞ্চল	প্রধান প্রধান ভাষা
পূর্ব	বঙ্গভাষা, অসমিয়া, তিব্বতী, বিহারী হিন্দী, মুণ্ডা, সাঁওতালী, খেরওয়ারী, কান্দা, উরকা, ওড়িয়া, পাহাড়ী।
দক্ষিণ	তেলেগু, তামিল, মালয়ালাম, কানাড়ী, ও গণ্ড।
মধ্য	গণ্ড, কানাড়ী, পূর্ব হিন্দী।
পশ্চিম	মারাঠি, গুজরাটী, রাজস্থানী, ও গণ্ড।
উত্তর	পশ্চিমা হিন্দী, পাঞ্জাবী, পাহাড়ী, বাল্টি, লাডকি।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের উপরি-কথিত অঞ্চলগুলির ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য বেশ স্পষ্ট। উহাদের উন্নয়ন নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হইলে, অধিবাসীদের জীবন সুখময় ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হইবে। মনে রাখিতে হইবে, প্রত্যেক অঞ্চলে মনুষ্য-বসতির সংখ্যা সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। এই কারণে লোক-বসতির সমন্বয় বিকেন্দ্রীয় হওয়া আবশ্যক। আধুনিক কৃষি-প্রথায় আমাদের উপযুক্ত সমস্ত জমিতে ফসল উৎপাদন, লুক্কায়িত খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান করিয়া, উহার উদ্ধার, উপেক্ষিত বা অবহেলিত বনভূমি বৈজ্ঞানিক প্রথায় কাজে লাগান, কাঁচা মাল বিশিষ্ট অঞ্চলে শিল্প-কারখানা স্থাপন এবং পরিবহন উন্নয়ন নামক বিবিধ কার্য দ্বারা ভারতকে ক্রমোন্নতির দিকে চালিত করিতে হইবে। এই বিষয়ে প্রত্যেক ভারতবাসীকে নিঃস্বার্থভাবে দেশ-সেবা করিতে হইবে। ভারতবাসীই ভারতকে সর্ববিষয়ে পূর্ণরূপ দিয়া শ্রীসম্পন্ন করিবে। সেই দিন যত শীঘ্র আসিবে দেশবাসীর ততই মঙ্গল।

পাড়ি

সমর চট্টোপাধ্যায়

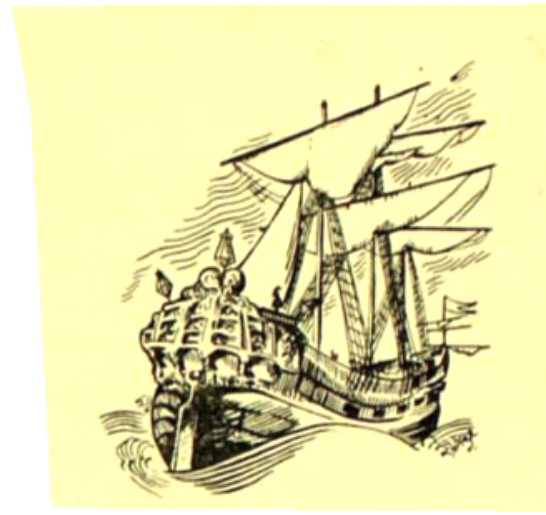

চার্চ অব দি ডার্কিন মেরী অব দি রোজারী—বড্ড বড় নাম তাই আজকের সংক্ষেপের যুগে পুরো নামটা মুখে মুখে বাতিল হয়ে গেছে—কায়েমী হয়েছে মুর্গিহাটার চার্চ্চ নামটাই। কিন্তু নামটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় আরো কিছু জানলেই ভাল হত। চার্চটা পর্তুগীজদের।

মুর্গিহাটার খিচ্চি অঞ্চল। লোহার দোকানের কোলাহলের পিছনেই শান্ত পরিবেশের মাঝে ঔষধের কটু ঝাঁঝালো গন্ধ। ফলের পাশেই ফুলুরি। ক্ষণিক ইতস্ততঃভাব পর ঢুকে পড়লাম চার্চটায়। আজকের চার্চটার সঙ্গে মিল নেই ১৭০০ সালের পুরাণো চার্চটার, যেমন আজকের পর্তুগীজ জীবনের সঙ্গে মিল নেই সেদিনকার পর্তুগীজ ইতিহাসের। সেদিনকার চার্চটার পাশে আজকের চার্চটার ফটো রাখলে আজকের চার্চটা অনেক উন্নত আর পরিবর্তিত বলে মনে হয় কিন্তু সেদিনকার পর্তুগীজ ইতিহাসের সঙ্গে আজকের পর্তুগীজ নীতি বিচার করে দেখলে পরিবর্তন হয়ত চোখে পড়ে, কিন্তু উন্নতি—কে জানে?

অস্তগামী সূর্যের একটা রক্তিম দীর্ঘ-রেখা পাষাণ চত্বরের বুকটা লাল করে দিয়েছে—যেন অত্যাচারীর শিথিল মুঠি থেকে খসে পড়া একটা তীক্ষ্ণধার লম্বা ছোরা বিঁধে আছে পাষাণ চত্বরের বুকে—অত্যাচারের রক্তে রাঙা, যা অতীতের ইতিহাসের পাতায় জমাট বেঁধে আছে—চাপচাপ, কালো কালো।

অত্যাচারের বন্যায় পর্তুগীজ ইতিহাসের পাওনা সম্মানটুকু হারিয়ে গেছে রক্তের টুকরো টুকরো ঢেউয়ে। সে ঢেউয়ের টানে তলিয়ে গেছে কার্ভালার ইতিহাস। গোয়ার নির্মম অত্যাচারে মা হারিয়েছে আপন শিশুকে, স্ত্রী হারিয়েছে আপন স্বামীকে, আর চাষী হারিয়েছে চাষের লক্ষ্মী মাটি। ওদের দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে পর্তুগীজ ভারতের ইতিহাস আপন সরণী ভাঙতে ভাঙতে হারিয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির অতলে।

হয়ত ওদের অত্যাচারের পাতাটার দিকে চেয়ে কোন পাঠক ঘৃণায় চোখ সরিয়ে নেবেন, তবু ওদেরও ইতিহাস আছে, গল্প আছে, কাহিনী আছে। রাত্রির আঁধার-ওড়না চার্চটাকে আস্তে আস্তে ঢেকে ফেলছে; এইবার চার্চটা হারিয়ে যাবে রাতের কালো পর্দায়! তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম, ওদের ইতিহাস আমায় পীড়া দেয়।

এরা সেই পর্তুগীজ—যারা সাগর কূলের লিসবন থেকে স্বপ্ন দেখত বেঙ্গালার দাওসাগরের পারের সেই অদ্ভুত দেশ—যেখানে দূরের মাটি জমলে নুনীলে মিশে একাকার হয়ে আছে, যেখানে মাটিতে মিশে রয়েছে সোনা, যেখানে সাগরের নিচে টলমল করছে সাগরকন্যার চমকান অশ্রুবিন্দু—মুক্তা! সেখানে সুনীল তরঙ্গ রৌদ্রজ্জ্বল ফেনিল সাতরাঙা মুকুট মাথায় করে ক্রমে লুটিয়ে পড়ে সুপারি আর নারকেল মূলে। সেখানে সুপারি আর নারকেল পাতা বাতাসের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয় শিশুদের। বাতাসে হিল্লোলিত হয় আড়-বাঁশীর সুর—দূর, কতদূরে সে দেশ!

কোথায় সে দেশ? যেখানে মশলার মদির গন্ধে বাতাস

হয়ে ওঠে মাতাল! সেখায় স্বপ্ন বুনে বুনে তৈরী হয় জীবন, আর জ্যোৎস্না বুনে বুনে তৈরী হয় বস্ত্র—মসলিন। যার সন্ধানে পাগলের মত হয়ে গেছলেন কোভিলহান, ভাস্কো আর কারভালেরা। যার ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন ভাস্কো-ডা-গামা কালিকটের দরবারে—এক দুঃস্বপ্নের মতই।

বেজালা, বেজালা, গামার রক্তে রক্তে ধ্বনিত হয়!

•

কালিকটের দরবার! পর্তুগীজ কল্পনার মণিমহল! বাণিজ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র জামোরিণ—কালিকটের রাজার চূড়াবদ্ধ কেশের মাঝে আকাশের তারার মত ঝিকমিকিয়ে উঠছে একগাদা মণির ঝলকানি। নীলার আলোয় চঞ্চল হয়ে উঠেছে সিংহাসনের রেশমী কিংখাবের রং।

—যা জেরীর জয় হোক। জয় হোক রাজা মনোএলের। —বলে পর্তুগীজ সেনাপতি, সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা নীচু করে আপন লোলুপ দৃষ্টিটাকে আড়াল করে আর অনুচরেরা একবার অপাঙ্গে দেখে নেয় জামোরিণের পারিষদদের।

তার মাঝে বসে আছে আরব আর মোপলা বণিকের দল। তারাও অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে পর্তুগীজদের দিকে—সব যেন রোদে ঝান সেরে এসেছে। তার উপর সাদা-কালো ডোরাটানা জামা। ঘাড়ের কাছের কুঁচিগুলো ছড়িয়ে আছে সিংহের কেশরের মত। মাথায় উল্টো ভাঁজের অদ্ভুত আকৃতির টুপি ডানপাশে অনেকখানি হেলান। একটা চোখ আঘাতের আড়ালে ঢাকা—আর একটা চোখ হিংস্র কুটিল—যেন বাজের চোখ। একটা হাত সামনে ছড়ান আর একটা হাতে চেপে ধরে আছে ছোরার বাঁটটা।

কত লম্বা ওদের ছোরাগুলো—আর সাপের জিভের মত তীক্ষ্ণ। মোপলা বণিকদের মেরুদণ্ডের উপর দিয়ে একটা ভয়ের শিহরণ বয়ে যায়। পর্তুগীজ সেনাপতি মেলে ধরে রাজা মানোএলের উপঢৌকন—এত গরীব এরা! ঘৃণায় চোখ সরিয়ে নেয় মোপলা বণিকেরা।

পর্তুগীজ সেনাপতি একবার ঘোলাটে চোখ দু'টো বুলিয়ে নেয় সভার উপর। শত্রুর অবগুণ্ঠনে আরব বণিকদের মুখের ভাব লুকানো। ছোরার মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পর্তুগীজদের মুখের উপর উদ্যত—হাতটা বুঝি আপনা হতেই কাজকার্য করা বাঁকা ছোরার মুঠটা চেপে ধরে।

আরবদের ক্ষুধিত দৃষ্টি আর বাঁকা হাসি, যার বিরুদ্ধে, সদ্যজাগ্রত স্পেন আর পর্তুগালের মিলিত শক্তিতে গড়ার যুবরাজ হেনরী, দৃঢ় হাতে অস্ত্র ধরে, আরবদের দাম্ভিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। তাদেরই আলবুকার্কের হাতে গড়ে উঠল ভারতে প্রথম পর্তুগীজ উপনিবেশ 'গোয়া' —তারপর ধীরে ধীরে পর্তুগীজ শক্তি শিকড় বিস্তার করতে লাগল সেই মাটির বুকে যেখানে আছে সোনা।

• •

ওরা এসেছিল পোর্টো গ্রান্ডি বেলালায়।

মামুদ শা' তখন বাংলার শাসক। সাগরে গ্রহণ করতে পারেন নি তাদের কারণ কালিকটে ওদের অত্যাচারের কাহিনী ডালপালা মেলে আপনা মেরেছিল তাঁর কানে—তাঁর মনে তখন চলছে অশান্তির ঝড়ের আপনা। ঘুমের মাঝে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন, "প্রহরী—প্রহরী"! দুটো হাত বারবার ঘষে দেখেন ফিরোজশাহী খুনের কলঙ্ক লেগে আছে কি না। সিংহাসনে বসলে চোখের সামনে জ্বলতে থাকে ক্ষুধার্ত দুটো ভয়াবহ চোখ—অপরিসীম ক্ষুধা নিয়ে যা চেয়ে আছে গৌড়ের দিকে—শের শা!

জোড়াবী জানায় "খোদাবন্দ এরা বাণিজ্যিক চুক্তি করতে চায়।"

অবাক চোখে চেয়ে থাকেন মামুদ শা "চুক্তি—বাণিজ্য—কাদের সঙ্গে?"

—খোদাবন্দ এরা বিদেশী, পর্তুগালের লোক।"

—কোতল, কোতল, আমকোতল। 'বীভৎস ভাবে চীৎকার করে ওঠেন মামুদ শা।' তাম্বুলিকের হাত থেকে একটা পান নিয়ে আপন অজান্তে সেটাকে পিষে ফেলেন হাতের মাঝে।—লাল হয়ে যায় হাতের চেটোটা।

—রক্ত!—রক্ত—!

চমকে ওঠেন, চলতে চলতে সভা ত্যাগ করেন মামুদ শা।

রক্ত!

হ্যাঁ—রক্ত। চাপ চাপ রক্তে কালো হয়ে গেল বাংলার শ্যামলিমা। পর্তুগীজ কামানের অগ্নিজিহ্বা সব কিছু পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

কালিকটের রক্তমাখা কূলে দাঁড়িয়ে একদিন অট্টহাস্য করে উঠেছিলেন ভাস্কো-ডা গামা। ঘোড়ো বিহঙ্গের ডানার ভর করে সে হাসির স্পন্দন ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে—আর মুখর হয়ে উঠল পর্তুগীজদের কামানগুলো। আবার সুরু হল, রক্ত আর ধ্বংসের খেলা। ওদের প্রবেশ ঝোড়ো হাওয়ার মত। আবার মিলিয়েও গেছে ঝড়ের শেষে ঘূর্ণির মত। আজ সেই ঘূর্ণির শেষ পাক গোয়াতে—পর্তুগীজদের আদি এবং অবশিষ্ট উপনিবেশ গোয়াতে।

ইতিহাস মনে করিয়ে দেয় ওদের অতীতকে—গামা, আলবুকার্ক আর আলমীডাকে — পর্তুগীজ ভারতের অতীতকে —যা রক্তে দিয়ে মড়ান একটানা ধ্বংসের ইতিবৃত্ত। .. ..

ক্রীশ্চান চাই। হিন্দু থেকে চট্টি জিনিষ সংগ্রহ করতে হবে, ঐশ্বর্য আর ক্ষমতা—লোকবল। রাজা মনোএলের আদেশ আর গামা, আলমীডা, আলবুকার্কদের পণ। নিকট করতে হবে সেই অনাগত ভবিষ্যতকে যেদিন উদ্ধত চূড়া ইগ্রেজার আড়ালে হারিয়ে যাবে জেন্টুদের মন্দিরগুলো—সেদিন মেরীর জয়গানের নীচে চাপা পড়ে যাবে জেন্টুদের প্রার্থনা। তাই ছলেবলে এরা ভারত-বাসীর মুখে ক্রীশ্চানী মুখোস আঁটার চেষ্টা করেছে। মন্দিরের সঙ্গে দেবতাও মিশে গেছে মাটিতে আর সেই ধ্বংসস্তূপে কোথাওবা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ইগ্রেজা।

সন্দ্বীপের সাগরবেলা বুকের মাঝে বলে এরাই একদিন ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে দক্ষিণ বাংলার পেলব বক্ষ। সেদিন অত্যাচার আর লুণ্ঠনে এরাই ছারখার করে দিয়েছিল দক্ষিণ বাংলাকে—যার কাহিনী ছড়িয়ে আছে গল্পে, গাথায় আর ইতিহাসে—সুনীল সাগরের বুকে ওদের পতাকাটা রাতের চোরা আঁধারের সঙ্গে মিশে শিরশির করে কেঁপে উঠেছে পরবর্তী সময়কে কল্পনা করে। ওদের আর্শাডা ছিল ধ্বংসের বেপরোয়া পরওয়ানা। যাকে দেখে রাতের বাতাসও ফিসফিসিয়ে কানাকানি করে প্রকৃতির সঙ্গে—হার্শাদ—হার্শাদ। শিশুরা কান্না থামিয়ে মায়ের কোল আঁকড়ে ধরত—মায়েরাও আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে ফেলত আপন শিশুদের—। তবু কি নিস্তার ছিল? মাতৃকোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নির্বিকারে পাশবিক অত্যাচার করেছে তাদের উপর। দ্বিধাবোধ করত না পুজারীর শোণিতে দেব-আসনকে কলুষিত করতে—। তাই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লোপ পেয়েছে তাদের সভ্যতার ইতিহাস।

সন্দ্বীপ থেকে ব্যাটরা শালুকে—হুগলী—

গর্জে ওঠেন বাদশা। রংমহলে নর্তকীর পদযুগল কেঁপে ওঠে—ছন্দ ভুল হয়ে যায়। বাদশার মণির বিহ্বল দৃষ্টিটা হঠাৎ যেন খুব তীক্ষ্ণ মনে হয়। তীক্ষ্ণ ছোরার মত সে দৃষ্টি ঘুরতে ঘুরতে ক্রমে আটকে যায় সেনাপতির উপর। সে দৃষ্টির সামনে চঞ্চল হয়ে ওঠেন সেনাপতি। বাদশার ইঙ্গিত বুঝতে দেরী হয় না তাঁর—আদাব জানিয়ে বার হয়ে আসেন।

এ যেন আর এক রংএর খেলা—লাল রংএর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটবে লাল রক্তের তুফান। পর্তুগীজ কেরা মাথার হার্শাদ পতাকাটা এখনও দিল্লীর তক্তকে চোখ রাঙাতে সাহস করছে—বেয়াদপ!—বেতমিজ!

চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাদশার মৌলাখা মুখ-কন্টিটা আর মনে পড়ে যায় শাহেনশার ফরাক দিলের খবর। পর্তুগীজ কামানের মুখে হাসিমুখে পড়েন সেনাপতি।

শাজাহানের দরবার। সম্রাটের মুখে ঘনিয়ে এসেছে সর্বনাশের ছায়া। আবক্ষ সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে উজির বলেন "জাহাপনা, এদের আর অবহেলা করা উচিৎ নয়। প্রশ্রয় পেয়ে হার্মাদগুলোর অত্যাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।"

হঠাৎ বেজে দরবার কক্ষে বেজে পড়ল—একজন প্রতিহারী এসে প্রবেশ করল। যথারীতি আদাব জানিয়ে বললে, গালামের পোষাকী মাপ হয় কি'হাপনা। হার্শাদ শুনছো হারামের একজন বাঁদীকে লুটে নিয়ে গেছে।

—কী কাশেম খাঁ! আহত ব্যাঘ্রের মত চীৎকার করে ওঠেন সাজাহান। বাঁ হাতের ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ধরেন মখমলের তাকিয়াটা আর ডান হাত দিয়ে চেপে ধরেন পাশে শোয়ান সুদীর্ঘ তরবারির মুঠটা। ছটো চোখ নীলকান্তর মনির মত জ্বলজ্বল করে ওঠে।

সামনের রেকাব থেকে পেস্তার অংশ মুখে তুলেছিলেন মহামান্য সেনাপতি কাশেম খাঁ। তাঁর হাত কেঁপে উঠল পেস্তার অংশটা মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। কুর্ণিশ করতে, করতে দরবার ত্যাগ করলেন তিনি।

চুটি মুষ্টিবদ্ধ হাত পিছনে করে আহত শার্দুলের মত পায়চারি করছেন বাদশা সাজাহান আর মাঝে মাঝে অস্ফুট কণ্ঠে চীৎকার করে উঠছেন—হার্শাদ—হার্শাদ—শয়তানের দল।

এমন সময় প্রতিহারিণী এসে জানায় মহামান্য সেনাপতি যুদ্ধে পর্তুগীজদের বন্দী করে কয়েক হাজার বন্দী পর্তুগীজসহ রওনা হয়েছেন দিল্লির দিকে।

—জিতেছে, কাশেম খাঁ জিতেছে। শয়তান পরদেশী কাফের কুত্তাগুলোকে আমি এমন সাজা দেব যা ভাবতেও শিউরে ওঠবে ওরা।

হুগলীর পতনের পর।

হুগলীর দল উন্মাদ হয়ে উঠল ধ্বংসের খেলায়। শয়তানী সাহস—পরাজিত হলে শুয়ে পড়ত পায়ের নীচে আর সুযোগ বুঝে লম্বা ছোরাটা আমূল ঢুকিয়ে দিত নিরীহের বুকে—এই ছিল তাদের বীর্য। সবলের কাছে হেরে আর দুর্বলকে মেরে তারা চরিতার্থ করত আপন প্রতিহিংসা। (চলবে)

[ইতিহাস-আশ্রয়ী কাহিনীটির কোন কোন অংশের সম্পূর্ণতার জন্য সুসাহিত্যিক গ্রন্থের শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট বিশেষভাবে ঋণী — লেখক]

॥ অকাসিন-নিকোলেত ॥

ঐতিহাসিকেরা 'রেণেসাসে'র কাল নির্ণয় করেছেন, মোটামুটি ত্রয়োদশ হতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত। কিন্তু ওয়ালটার পেটারের মতে পণ্ডিতগণ নির্দেশিত সময়ের পূর্বেই রেণেসাসের বহিঃস্ফুরণ প্রকাশ পেয়েছিল একাদশ শতাব্দীতে; আর সে বন্ধন মুক্তির জাগরণ প্রথম অনুভূত হয়েছিল ফরাসী দেশে। যদিও তখনকার প্রচেষ্টা যাজক সম্প্রদায়ের বিরোধিতায় সার্থকতা লাভ করতে পারে নি।

কিন্তু সেই যে মানুষ প্রথম সমাজ জীবনে মুক্তির আনন্দ আস্বাদ করতে পারল তার প্রকাশ হল, শিল্পে, সাহিত্যে বিজ্ঞানে এবং প্রায় দু' শতাব্দী পরে পরিপূর্ণ রূপে পেল ইতালীতে। ফরাসী দেশেই যে প্রথম 'রেণেসাসের' 'স্পিরিট' অনুভূত হয়েছিল তার প্রমাণ 'ত্রুবাদুর' কবিদের গাওয়া চারণ গাঁথায় (chant-fable), এবং প্রধানতঃ "এ্যাথেলার্ড ও "অকাসিন-নিকোলেতে"র কাহিনীই সেই বিপুল মুক্তিযজ্ঞের স্মারকরূপে পরবর্তীকালে রসপিপাসুদের কাছে একাধারে কাব্যরস ও অঙ্কক্ষেত্রে সে যুগের অন্তরাত্মার পরিচয় বহন এনেছে। সেই অবিস্মরণীয় প্রেম-কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ আগামী শারদীয় সংখ্যা 'যুগযাত্রীতে' প্রকাশিত হবে।

আষাঢ় এসো —

পরিতোষ খাঁ

তোমাকে পাবার জন্যে আমার কতোনা সাধনা।
কত অশান্ত দিগন্তে দূর পদচারণায়
দুর্বাদুখীর বনে কাঁটা। মাটি ক্লান্ত। মনের পিপাসু কান্নায়
পাগল চুমুক। কাঠ ফাটা রোদ। বুক ভরা ক্ষত। খতে ভারী দেনা।

এখন আষাঢ়। আশার শিখায় খল হাওয়া। ভিজে
বাসে হীরেজলা রোদ ঝিকিমিকি। এখনও তুমি কি
অসাধ্য? ছেঁড়া পালে বুনো বেগ। মেঘে মেঘে মেঘে
আকাশে নিবিড় কার স্বাদ! আহা কি সাধে আমার
পাথুরে মাটিতে সবুজ হাওয়ার দোলা দেবে তুমি,
ছড়াবে আমার মরা কাঁকরের হতাশায় সুখী কামনার পলি!

হায়রে আষাঢ়! কি হবে আশার ভীরু দিন গুনে,
রাতজাগা জানালায় বৃষ্টির ছেঁড়া সুর শুনে!
কি হবে বিলাপে বিকেলের আলো রাতের কান্না
যদি নিয়ে আসে, যদি বলে দিন এগান থাকাও এখনি—আর না!

যদি বলে দিন। যদি থামে দিন। আলো নিভে যায়!
ভরা উৎসবে ডাকাতের মতো আঁধার ঘনায়!
কাঁচে কালি লাগে, পথ কালো হয়!
হতাশ হৃদয় শেষ হাটুরের ক্লান্তিতে যদি
ভারী হয়ে ওঠে, হঠাৎ ভাগাদা আসে যদি তাকে
চলে যেতে হয়, এলোমেলো এই সুখোসের হাটে
হিসেব হারিয়ে!
আমি তো পুরনো পাটীগণিতে পাতাগুলি ছিঁড়ে
গর হিসেবের খেরালি হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছি।
মেকি সদাগরি করিনি, কপালে কাঁচ তুলে উঁচু
চোখে ভাঁজ টেনে যাচাই করিনি কড়ির খেলনা।
আমি তো সাঁঝের সওদায় পুঁজি ভাঁপাতে সকালে
পসরা সাজিয়ে বসিনি। আমিতো

তমার অংকে ঢেঁরা কেটে যাও।
তবে শুধু বাঁকা স্বাক্ষর টেনে দিন কাটালাম।
তবু এ আষাঢ়ে এ নিরালা কেন
কেন সারবেলা শাদা হেওয়ালের ভাওলায়
দুটি চোখ রেখে মন
কী খুঁজেছে ? কার আত্মার নীড়ে খুঁজেছে উষ্ণ নিভৃতে স্বাগত ?
শাদা হেয়ালের ভাওলায় প্রাণ।
সে প্রাণও আমার সতীর্থ। তার
সবুজে বিকাল, ঘুনো ঘাসে মাটী,
নিরালা হাঁসের পাখীদের গান।
কতো গান আর কতো প্রাণ আর আমি তো মানুষ।
আমি তো মানুষ সড়ক বানাই, সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে
আমি মঙ্গলায় আকাশকে ছিঁড়ি।
আমি শিরিষরি কান্নার মরু জয় করে নিয়ে
বালির পাহাড়ে সবুজ জাগাবো।
তবু তো আমার ভরা ঘাসে গান
জাগে না তোমাকে খুঁজে ফিরি তাই
তোমাকে কখন নিজের মতন করে কাছে পাবো !
পাখী বুঝি ছিল। দূরের আকাশে পাখা হয়েছিল
বুঝি কারো মন। মনে বুঝি ছিল ছাতছানি কার।
গোপন দুঃখের জলে ছায়া তার
সময়ের মতো গভীর নীরব।
যেন আমি তার চার কিনারায়
উলুবনে ফুল খুঁজে সারাবেলা
ধারে বসে নীল সময়ের জলে
পা ডুবিয়ে সোনা জড়ানো বিকেলে
আশা ভরা মন তোমারই জন্যে।
সোনা ঝরা সেই আবেশী হাওয়ায় ঝিরিঝিরি ঢেউ।
ঝিরিঝিরি ঢেউ, হারায়ে সময়।
বয়সের পারে মেঘ ছায়া মন।
শুধু সেই পাখী আর সেই ফুল,
শরতের মেঘ, শীতের সকাল,
সারা পৃথিবীর সেই চেনা রঙ্।
শুধু শুধু এই শরীরের স্বাদ অকথা বেকার।

নবীনের আহ্বানে মিশর

অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ ধর

কায়রো রেলস্টেশনের প্রাঙ্গনে একটি উঁচু চত্বরের উপরে দু'টি প্রস্তর মূর্তি আছে যা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি স্ফিংস, (সিংহের দেহ ও মানুষের মস্তক বিশিষ্ট কাল্পনিক প্রাণী- গিজার বালুকাময় প্রান্তরে যার একটি শিলাময় প্রতিমূর্তি আছে।) তারই গা ঘেঁষে এবং সিংহস্কন্ধের উপর নিজের একখানি হাত রেখে দণ্ডায়মানা এক কৃষকরমণী। এই স্ফিংসটি কিন্তু গিজার স্ফিংসের মত অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় নাই, এর সামনের পা দুটি সজোরে প্রসারিত, এর মাথা পিছোনের দিকে হেলানো; কৃষক রমণীটিও অসাধারণ; তার মুখটি অবগুণ্ঠনমুক্ত, তার দৃষ্টি অকুণ্ঠ—সুদূরপ্রসারী। এই দুটি মূর্ত্তির মধ্য দিয়ে শিল্পী নবীনমিশরের রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন; স্ফিংসটি জন-জাগরণের এবং কৃষক রমণীটি আত্মশক্তির প্রতীক।

প্রাচীন দেশ মিশর

অধ্যাপক ব্রেস্টেড মিশরদেশকে সভ্যতার জ্যেষ্ঠা দুহিতা বলে অভিহিত করেছেন। একথা সত্য যে, সভ্যতার অন্যান্য বিকাশভূমি,—গ্রীস, রোম, পারস্য, এমন কি হয়তো, ভারত, চীন আশিরিয়া বাবিলনও যখন আঁধারে নিমগ্ন ছিল, তখন নীল-উপত্যকায় জ্ঞানের আলো ফুটে উঠেছিল। মানবসভ্যতার অভিব্যক্তির প্রারম্ভে প্রাচীন মিশরের অবদান কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল আজ তা বিশেষভাবে জানা গিয়েছে। কিন্তু মিশরবাসীর কাছে কঠোর বাস্তব হচ্ছে মাত্র ৫০।৬০ বৎসর আগে পর্য্যন্ত, তাদের দেশ ছিল পরাধীন। প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বছর মিশর পরাধীনতার শৃঙ্খল গলায় পরেছিল। খৃষ্টপূর্ব ৫২৫ সালে পারসিকগণ এদেশ জয় করেছিল, এবং তারপর, পর্য্যায়ক্রমে, গ্রীক, রোমান, আরব, তুর্ক, ইংরাজ তাদের উপর প্রভুত্ব করেছিল। আশীবিষের দংশন শেষ হয়েছে, কিন্তু তার জ্বালা এখনো মেটে নি।

সাম্রাজ্যবাদ প্রাচীন ও আধুনিক

তাদের সকলের শেষের প্রভু ইংরাজদের অধিকারের সময় ঘটেছিল তাদের চরম দুর্গতি, আত্মার অপমান। প্রাচীনকালের সাম্রাজ্যগুলি ও আধুনিক কালের সাম্রাজ্য-গুলির মধ্যে একটা পার্থক্য দেখা যায়। পুরাকালের সাম্রাজ্যস্থাপনের মূলে সাধারণতঃ থাকত কোনও জাতির সামরিক শক্তি। বাহুবলে হেরে গেলেও বিজিতের মনুষ্যত্ব বজায় থাকত। এযুগের সাম্রাজ্যবাদের মূলকথা—মনুষ্য জাতি দুটি ভাগে বিভক্ত; তার একভাগে আছে কয়েকটি জাতি, ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান বা এরপই আরো দুয়েকটি, যারা হল প্রভুর নিকেশে 'শ্রেষ্ঠ' জাতি—হেরেনভোক (Herren-volk); বাকী সকল মানুষ হল অন্যভাগে; তারা "শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কষ্ট-ক্লিষ্ট প্রাণ" কোনোমতে বজায় রেখে, ঐ তথাকথিত সভ্য জাতিদের শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের পথ সুগম করবে। তারা প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদন করবে এবং এদের থেকে প্রস্তুত শিল্পসামগ্রী উঁচুদামে কিনবে।

আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ এবং তার উপরে প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতার এই হল স্বরূপ। অবশ্য, স্থান, কাল বা অবস্থাবিশেষে এর কিছু কিছু বৈচিত্র্য ঘটেছে। অর্থনৈতিক শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদ অনেক রকমের বড় আদর্শের গল্প ফেঁদে দিতে চাইছে এখন এক নবজাগরণের দিন। যার প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করছি—ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েৎনাম ও আরব দেশগুলিতে, (মিশরে এবং আফ্রিকার নিগ্রোজাতি সমূহ)। অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছে মিশর এখন কেমন করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, এই

প্রবন্ধে তার পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

সাম্রাজ্যবাদের কবলে মিশর

মিশরের দিকে ইংরাজদের দৃষ্টি যে আকৃষ্ট হয়েছিল সে তার প্রাচীন গৌরবের কাহিনীর জন্য নয়, তার ধনসম্পদের জন্যও নয়, মিশর বাস্তবিক বৈভবহীন ছিল—এটা ঘটেছিল তাদের সাম্রাজ্যলোলুপতার জন্য। মিশরের এই দুর্ভাগ্যের মূলে ছিল এবং এখনও আছে, তার ভৌগলিক অবস্থান এবং এতদ্ভিন্ন দেশটির বাণিজ্যিক ও সামরিক গুরুত্ব। ইংলণ্ড হতে ভারতবর্ষে আসবার প্রায় মাঝামাঝি পথে এক বাণিজ্যের চলাচলের একেবারে রাস্তার উপরে শায়িত এই দেশটি এই বিষয়ে ইংরাজদের চক্ষু উন্মীলিত করে দেয় নেপোলিয়ন বোনাপার্টি—তাঁর মিশর অভিযানের (১৭৯৮ সাল) উদ্দেশ্য ছিল সুয়েজ-প্রণালী; তিনি সঙ্গে শুধু সৈন্যসামন্তই আনেননি, একদল যাচা যাচা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকও এনেছিলেন। এঁরাই খুঁজে পেয়েছিলেন শিলালিপি খোদিত এক প্রস্তরখণ্ড (Rosetta Stone), যা থেকে প্রাচীন মিশরের শিলালিপিগুলির পাঠোদ্ধার করবার সন্ধানসূত্র পাওয়া যায়। কিন্তু কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করা সত্ত্বেও বিফল-মনোরথ হয়ে তাঁকে ফ্রান্সে ফিরে যেতে হয়। মিশর সম্বন্ধে ইংরাজদেরকে তিনি জাগিয়ে দিলেন মাত্র।

আধুনিক মিশর—মহম্মদ আলি

এই ঘটনার সূত্র অবলম্বন করেই এই প্রাচীন দেশের বিচিত্র ইতিহাসে "আধুনিক" যুগ সূচিত হল। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে তুর্কী সুলতান মহম্মদ আলি নামক জনৈক সাহসিকের নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। মহম্মদ আলির ঘটনাবহুল জীবনের কাহিনী বিস্তারিতভাবে বিবৃত করা এখানে সম্ভবপর নয়। এক কথায় তাঁকে মিশরের "আধুনিক" যুগের উদ্গাতা বলা যেতে পারে। তিনি স্বীয়-সামরিক প্রতিভাবলে দেশটি সম্পূর্ণভাবে নিজের আয়ত্তাধীনে আনেন; ইংরেজ যখন এর কৃষ্ণসাগরীয় প্রদেশ হতে আলেকজান্দ্রিয়া দখল করতে চেষ্টা করেন, তখন প্রবল বাধা দিয়ে তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করেন; এবং পরিশেষে, সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে তুর্কী সাম্রাজ্যের বহু প্রদেশ, একের পর এক কবলিত করে, তাঁর শেষ লক্ষ্য কনস্তান্তিনোপলের সিংহাসন করতলগত করবার প্রাক্কালে, ইংলণ্ড ও রাশিয়ার কাছ থেকে প্রবল বাধা পেয়ে একটি আপোষ মীমাংসায় রাজী হন। সুলতান তাঁকে বংশানুক্রমিক ভিত্তিতে মিশরের উপরাজ বা Viceroy বলে স্বীকার করেন (১৮৪১ সালে)।

এই সময় থেকে মিশর কার্যতঃ এক নূতন মর্যাদা পেল। নামে তুর্কী সাম্রাজ্যের হলেও সে একটি স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করল। মহম্মদ আলি মিশরে শিক্ষার বিস্তার অর্থনৈতিক উন্নতি, দেশরক্ষার নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি তুলার চাষের প্রবর্তন করেন; আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দর উন্মুক্ত করেন; তিনি তদানীন্তন জলাধারে জল সঞ্চয় করে জলসেচের (basin irrigation) পরিবর্তে 'শাশ্বত' জলসেচের (perennial irrigation) আরম্ভ করেন। তাঁর পরবর্তী শাসনকর্তারা এই উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করে চলেন। মহম্মদ সাইদ (১৮৫৪-১৮৬৩) সর্বপ্রথম নীল উপত্যকায় রেলপথ নির্মাণ করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী ইসমাইল (১৮৬৩-১৮৭৯) সেচ ব্যবস্থার বিস্তৃতিসাধন করেন; নূতন নূতন রেলপথ বসান এবং বৈদ্যুতিক বার্তাবহের প্রচলন করেন। তিনি ফরাসী যান্ত্রিকর ফার্ডিনাণ্ড্ দ লেসেপ্‌সকে সুয়েজ খাল নির্মাণে বিশেষভাবে সহায়তা করেন।

কিন্তু মিশরের এই উন্নয়নই হল তার কাল। মহম্মদ আলি বহু জনহিতকর সংস্কার প্রবর্তিত করেছিলেন। কিন্তু এর জন্য তিনি কারও কাছে হাত পাতেন নি। তাঁর বংশধরেরা প্রথমতঃ বিলেতী ছিলেন অমিতব্যয়ী; একারণে এবং দেশের উন্নয়নকল্পে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বিশেষতঃ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ব্যাঙ্কের মালিকদের কাছে উঁচু সুদের হারে এবং অপরিমিত বাটা দিয়ে টাকা ধার করে বা তাদের চক্রান্তে এইভাবে ধার করতে বাধ্য হয়ে দেশটিকে তাদের কাছে বিকিয়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে, একদিন এল সেই ভীষণ কিন্তু অবশ্যম্ভাবী সঙ্কটের মুহূর্ত, যখন বিদেশী মহাজনরা এবং তাঁদের পিছনে ইংরাজ এবং ফরাসী সরকার তাঁদের হিসাবের প্রমাণ সুদ ও অসল

পাওনাগণ্ডা আদায়ের সৌকার্যের জন্য দেশের শাসন ব্যাপারে তাঁদের হস্ত নিক্ষেপ করলেন। ইসমাইল প্রথমে তাঁর সুয়েজ খাল কোম্পানীতে যতো শেয়ার ছিল, মোট ১৭৬,৬০২টী, ব্রিটিশ সরকারের কাছে বিক্রী করলেন। এইরূপে, তিনি ৩,৯৭৬,৫৮২ পাউণ্ড পেলেন এবং মহাজনদের দিলেন। কিন্তু এতেও রেহাই মিলল না। ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের পরামর্শে তুর্কীর সুলতান তাঁকে পদচ্যুত করলেন। তাঁর গদীতে তাঁর নাবালক পুত্র তিউফিক্‌কে বসানো হল। উক্ত দুই বিদেশী সরকার এবার দেশের অর্থনৈতিক যাবতীয় ব্যাপার সুষ্ঠোপুরি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলেন।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজেরা সারা পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব স্থাপন করবার শতাব্দীব্যাপী চেষ্টা এবারে সফল হল। প্রাচ্যে তাঁদের অধিকৃত দেশগুলির সঙ্গে সর্বাপেক্ষা সুগম ও অল্পপরিসর পথে চলাচল নিরুপদ্রব হল। ইসমাইলের শেয়ারগুলি কিনে কোম্পানীর শাসনব্যাপারে তাঁরা প্রভুত কর্তা হয়ে বসলেন এবং মিশরও তাঁদের হাতের মুঠোর মধ্যে রাখবার জন্য খালের এলাকায় এবং মিশরেও সৈন্যদলের ঘাঁটি বসিয়ে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমধ্যসাগরীয় সকল অঞ্চলে একরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হলেন। এ নিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে তাঁদের মনোমালিন্য হল। কিন্তু, পৃথিবী বিপুলা, তাই ভাগবাটোয়ারা চলতে পারে। ইংরাজ মরোক্কোতে ফ্রান্সের প্রভুত্ব মেনে নিলেন। ফ্রান্স এর প্রতিদানে মিশরে ইংরাজের কর্তৃত্বের দাবী মেনে নেন। তাছাড়া, জার্মাণ সামরিক শক্তির অভ্যুত্থানে, এবং বিশেষ করে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে জার্মাণীর বৌলশক্তিসংক্রান্ত নীতিতে ভীতচকিত হয়ে রুশিয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্বভাবাপন্ন হতে বাধ্য হচ্ছিলেন। রুশিয়া এবং ফ্রান্স এই দুইটি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে রেহাই পেয়ে ভূমধ্যসাগরীয় ব্যাপারে ইংলণ্ড নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ফলাফল

কিন্তু বিপদ ঘনিয়ে আসতে লাগল এক অদ্ভাবা দিক হতে। মিশরে একটা জনজাগরণ দেখা দিল। এর সর্বপ্রথম মুখপাত্র হলেন মিশরীয় সেনাদের এক নায়ক; কর্ণেল আহম্মদ ওরাবি। ইংরাজ সরকার এই আন্দোলনকে মিশর সরকারের বিরুদ্ধচারী সৈনিকদের বিদ্রোহেবলে ঘোষণা করলেন। ফ্রান্স সহযোগিতা করতে অসম্মত হওয়ায় মিশরে এক ইংরাজ নৌবহর ও সেনাদল পাঠানো হল। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরস্থিত মিশরীয় দুর্গগুলি গুলিসাৎ করা হল, ওরাবি টেল-এল-কেবিরের যুদ্ধে পরাস্ত হলেন। মিশরে বৃটিশ অধিকার শিকড় গেড়ে বসল। ইংরাজ এবার কার্যতঃ রাজা হয়ে বসে মিশরকে গড়ে তোলার ভার নিজের হাতে নিলেন। ইংরাজসরকার নিযুক্ত এজেণ্ট ও কনসাল-জেনারেল লর্ড ক্রোমার মিশরবাসীদের তিনটি কুপ্রথা বিলুপ্ত করলেন: তিনটিরই আরম্ভের "C" যথা courbash অর্থাৎ জলহস্তীর চর্ম নির্মিত যষ্টি, যা দিয়ে মিশরবাসীদের পৃষ্ঠে সজোরে আঘাত করা হত তাদেরকে কাজ করানোর জন্য, corvee অর্থাৎ বেগারপ্রথা এবং corruption অর্থাৎ দুর্নীতি। তাঁরা দেশব্যবহার উন্নতি সাধন করলেন, কৃষিকার্যের সহায়তা করলেন। মিশরের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পেল; জনসংখ্যা হু হু করে বাড়তে লাগল।

বলাবাহুল্য, এই সকল উন্নতির ফলে মিশরের চিরকালের সাথী—দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা, ব্যাধি,—এদের প্রাদুর্ভাব সৃষ্ট হয়েছিল আমাদের দেশে তাঁরা যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন—তাদের ভারত অধিকার চিরস্থায়ী ও দৃঢ়তর করার পক্ষে যা কিছু, অনুকূল তার সংরক্ষণ এবং যা কিছু এই গোড়ার প্রয়োজনের পরিপন্থী তার বিরুদ্ধাচারণ তথা যথাসাধ্য উচ্ছেদসাধন,—মিশরেও এই নীতি অবলম্বিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনে কি মিশরের কোনও লাভই হয় নি? এক পক্ষ বলেন—আর কোনও লাভ না হোক,—এই মহাযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে তার 'স্বাধীনতা' রক্ষিত হয়েছে; দেশে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়েছে; সুয়েজ খাল কাটা এবং শান্তিপূর্ণভাবে ও সুব্যবস্থায় তার মধ্য দিয়ে নিরপেক্ষভাবে সকল দেশের বাণিজ্যপোতের চলাচল সম্ভবপর হয়েছে। মিশরের 'উন্নতির' পথ এতে সুগম হয়েছে বৈকি? মিশরবাসীরা

বলেন—আমেরিকানের সাথে কি তথাকথিত সুশাসনে আর ব্রিটিশের 'সুশাসন'—সেতো তার পুঁজি-বাদী স্বার্থের প্রয়োজনে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা মাত্র? আর বিদেশীর পরিকল্পিত "জাতীয়" উন্নয়ন; সে শোষণের নামান্তর মাত্র। তাঁরা তুলার চাষ বিস্তৃত করেছেন, এবি প্রয়োজনে 'শাশ্বত' সেচের ব্যবস্থা করেছিল (কারণ তুলার চাষে গ্রীষ্মকালে জলের প্রয়োজন হয়)। কিন্তু সে তাঁদেরই মালিকদের মুনাফালাভের সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে। মিশরবাসী এই সমৃদ্ধির ভাগ পায় নি

বর্তমান মিশরের অবস্থা ও সমস্যা—ভূমি

এবারে আমরা মিশরের অবস্থা ও সমস্যাগুলির আলোচনা করি আজ দেশের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যে জনজাগরণ দেখা দিয়েছে, যার বলে বলীয়ান হয়ে প্রেসিডেন্ট নাসের সুয়েজখালকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার মতো সাহসিক কাজে লিপ্ত হতে পেরেছেন; তার স্বরূপ উপলব্ধি করার সঙ্কেত এরই মধ্যে পাওয়া যাবে। মিশরের ভূমির মোট পরিমাণ ৩৮০ হাজার বর্গ মাইল। কিন্তু এর শতকরা ৯৬'৫ ভাগ মরুভূমি। এবং পরিমাণ শতকরা ৩'৫ ভাগ বা ১৩ হাজার ৩০০ বর্গ মাইলের মত ভূমি মাত্র বাসযোগ্য; মিশরের অধিবাসীগণের শতকরা ৯৯ ভাগ এই ভূমিখণ্ডেই বাস করে এবং কৃষিকার্যের জন্য জমিও এ হতেই নিতে হয়। এই বাসযোগ্য বা কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ একটুও বাড়ানো দুঃসাধ্য। এর জন্য চাই জল; কিন্তু মিশরের বৃষ্টিপাত সামান্য, সামুদ্রিক উপকূলে ৪ হতে ৮ ইঞ্চি; কায়রো এবং তার দক্ষিণে ২ ইঞ্চিরও কম বার্ষিক বৃষ্টিপাত হয়। অনেক স্থানে ২।৩ বৎসরে একবার বৃষ্টিপাত হয়। ফলতঃ মিশর বলতে বুঝতে হয় নীল নদের উপত্যকাটুকু। এর পরিসর কোথাও ৬ মাইলের বেশী নয়। যুগ যুগ ধরে নীলনদ তীরে বার্ষিক প্লাবনের সময়ে মধ্য আফ্রিকা হতে পলিমাটি বহন করে এনে এখানে সঞ্চিত করে এবং এই ভূভাগের অত্যধিক কর্ষণ জনিত ক্ষয়ের পূরণ করে।

জল ও বাঁধ

এ হতে মনে হতে পারে মিশরের কৃষি সমস্যা হচ্ছে কার্যত জলসমস্যা। চাই জল—আরো জল। অতএব চাই, বাঁধ, নদীর উপত্যকায় বাঁধ দিয়ে জল সঞ্চয় করে দরকারের সময়ে সেই জলের সদ্ব্যবহার করা। মিশরে বাস্তবিকই তারই ব্যবস্থা হচ্ছে। পূর্বে প্রচলিত ছিল বলেছি 'বেসিন' সেচ-ব্যবস্থা। এগুলিকে এখন পরিবর্তিত করা হচ্ছে শাশ্বত সেচ ব্যবস্থায়। অর্থাৎ জল এখন বাঁধ দিয়ে ধরে রেখে সঞ্চিত করা হচ্ছে, যাতে প্রয়োজন মত তাঁকে ছেড়ে দিয়ে কাজে লাগানো যায়। এই সকল আধুনিক পরিকল্পনার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—আসোয়ান বাঁধ পরিকল্পনা, যা নিয়ে সম্প্রতি সর্বত্র আলোচনা চলছে। এরূপ প্রস্তাব করা হয়েছে যে আসোয়ানে বর্তমানে যে বাঁধটি রয়েছে তার পরিবর্তে, অন্য এক স্থানে—যেখানে নদীর উপত্যকা সুগভীর ও সংকীর্ণ, সেখানে এমন একটি বাঁধ নির্মাণ করা হবে যার স্বাভাবিক উচ্চতা হবে খুব বেশী। সন্নিহিত মরুভূমিতেও তা হলে কিছু কিছু অংশে সেচের ব্যবস্থা করা যাবে। এ করে কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ বাড়ানো যাবে।

কৃষিসামগ্রী তুলা

মিশরে উৎপন্ন কৃষিসামগ্রীর মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বস্তু হচ্ছে তুলা; শতকরা ১৫ ভাগ কৃষিযোগ্য জমিতেই তুলা চাষ হয়। মিশরের তুলা, লম্বা আঁশযুক্ত, পৃথিবীতে এত সুন্দর তুলা আর কোথাও জন্মে না। পৃথিবীর সর্বত্র তা উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়, এবং এই অর্থের বিনিময়ে মিশর তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের শতকরা ৭০ ভাগ কলকব্জা, ঔষধ, প্রসাধন সামগ্রী, তৈরী খাদ্য ইত্যাদি কেনে। তুলার উৎপাদন বিষয়ে কিন্তু চটি অসুবিধা আছে; প্রথমত তুলা খাদ্য নয়; যারা এর চাষ করে, অর্থাৎ কৃষককুল,—প্রত্যক্ষভাবে তাদের প্রয়োজনের সামগ্রী যোগাতে এর কোনও সার্থকতা নাই। দেশীয় ভাগ্যবিত্ত বা উচ্চ শ্রেণীর লোকের প্রয়োজনের সামগ্রী গুলির সরবরাহের ব্যবস্থাই এ হতে হয়। দ্বিতীয় কথা;

পৃথিবীর বাজারে এত ভাল জাতের উচ্চ মূল্যের তুলার চাহিদা কমে আসছে। যে সব কাজে এতদিন এর প্রয়োজন ছিল, তার অনেকগুলিই এখন নানারকমের কৃত্রিম অংশুময় সামগ্রী দিয়ে তৈরী হচ্ছে। মিশরের অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মক্কা, দেশের প্রধান খাদ্য-শস্য। তারপরে স্থান পায় গম, চাউল, (এর চাষ ক্রমশ বাড়ছে, কারণ এর বিদেশে চাহিদা আছে), জোয়ার, যব, লিম, পেঁয়াজ ইত্যাদি। মিশরে গবাদি পশু পালন করা দুষ্কর, কারণ, মানুষের মতো, এদেরও খাদ্য দরকার এবং কৃষির উপযোগী ভূমি এদেশে প্রচুর নয়। তবুও বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে এর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। দেশের এই অবস্থায়, সাধারণ লোকের খাদ্য বেশীর ভাগই মক্কার রুটি, তার সঙ্গে তাজা শাক সবজী। সপ্তাহে একদিন মাংস, তাও প্রায়ই জোটে না। ফলে গ্রামবাসীদের মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী এবং তারা প্রায় সকলেই প্রাণঘাতক-জনিত রোগে ভুগে। তবুও জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। বিগত ২ শতাব্দীতে তা ৯।১০ গুণ বেড়ে গিয়েছে।

মিশরের অধিবাসী

বলাবাহুল্য, মিশরের বেশীর ভাগ লোকই কৃষক, মিশরীয় ভাষায় তাদের বলা হয় "ফেলাহীন" তাঁরা কুড়ের বাস করে; ঘুঁটে জালিয়ে রান্না করে, আর তার ধোঁয়ায় মশা ও অন্যান্য কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা পায় বটে কিন্তু চোখের অসুখে প্রায় সকলেই ভোগে। তাদের মধ্য থেকেই ক্রমে বেড়িয়ে আসছে একটা দ্রুত বর্দ্ধমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, তারা ছোটখাটো জমির মালিক বা কারখানার মজুর বা ব্যবসায়ী বা ছাত্রশ্রেণী। দেশে যে জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে তা অনেকাংশে এদেরই দান। মিশরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিবাসী হচ্ছে বড় ভূম্যধিকারী সাধারণের ভাষায় যাদের বলা হয় "পাশা"। দেশের শাসন ব্যাপার অনেকটা এদেরই হাতে, এদের মধ্যে আছে অনেক শিল্পপতি, উন্নতধরণের কৃষিসংক্রান্ত সকল বিষয়েই এরাই অগ্রণী। পাশ্চাত্যশিক্ষা এদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রবেশ করেছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এদের অনেকেই দেশের সেবায়, আত্মনিয়োগ করেছে। আধুনিক মিশরে শিল্পোন্নতি যেটুকু হয়েছে, তা প্রধানত এই শ্রেণীর নেতৃবর্গের অর্থ, পরিশ্রম আর শিক্ষাদীক্ষার গুণেই হয়েছে। গত বিশ বছরে বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে, মিশরের শিল্পোন্নতি দ্রুতভাবে এগিয়েছে। মিশর এখন শিল্পবিষয়ে পশ্চিম এশিয়া ও ও সন্নিহিত দেশগুলির মধ্যে সব চেয়ে উন্নত।

উপরে মিশরের যে বর্ণনা দেওয়া হল সেই পটভূমিকায় এবার আমরা এদেশের আধুনিক কালের ইতিহাসের একটা চিত্র সহজেই পাবো। কর্ণেল ওরাবির 'বিদ্রোহ' দমন করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজ সরকারকে মিশরের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত সুদান প্রদেশে হস্তক্ষেপ করতে হল। সুদান মিশরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ৪টি শাখা নদী, শ্বেত নীল 'নীল' নীল এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে নীল নদে তাদের জলরাশি মিশিয়ে দিচ্ছে অতএব যে নীলনদ মিশরের প্রাণস্বরূপ তার জল বেশীর ভাগই সুদান দিয়ে আসছে। দ্বিতীয় কথা, সুদানে তুলার চাষে ইংরাজদের প্রভূত অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে—এবং এই তুলা না পেলে তাঁদের দেশের কাপড়ের মিলগুলি চলতে পারে না। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড কিচেনার "বিদ্রোহী" মুসলমান নায়ক মাহ্‌দির সৈন্যদলকে ওমদুরমানের যুদ্ধে পরাজিত করে সুদান ইংরাজ সরকারের আয়ত্তাধীনে আনেন।

এই সময়ে এক তরুণ ব্যবহারজীবী ও সাংবাদিক মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে মিশরের সর্ব্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল—Nationalist Party-গঠিত হয় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মতো এই দলের নেতৃবর্গও প্রথম দিকে দেশের স্বায়ত্তশাসন লাভই তাঁদের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন। কামালের মৃত্যুর পর সাদ্‌দ তখন জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ও 'ওয়াফদ' দল গঠিত করেন। বিদেশীয় শাসনের বিরুদ্ধে মিশরবাসীর সংগ্রাম এখন হতে কঠোরতর হতে লাগল। একদিকে ধরিয়াভাব ও অন্যদিকে দুঃসংভাবে শান্তি প্রদান চলল। মিশরের যখন এইরূপ রাজনৈতিক আং-

এবং ইহার প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। ইংরাজগণ মিশরে সমরিক আইন জারি করে দেশটি তাদের অন্যতম সামরিক ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করতে লাগলেন। তুর্কী সুলতান এযাবৎ দেশটির আইনত অধীশ্বর ছিলেন। তিনি এই যুদ্ধে জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন বলে ইংরাজগণ তাঁর কর্তৃত্বের অবসান ঘটেছে বললেন এবং মিশরকে তাদের 'রক্ষিত দেশ' (Protectorate) বলে ঘোষণা করলেন। এই সময়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডাঃ উডরো উইলসন তাঁর চতুর্দশ প্রস্তাব (Fourteen Points) নামধেয় ঘোষণায় 'আত্মনিয়ন্ত্রণ' নীতির উপর বিশেষভাবে জোর দিলেন। ফলাফলে মিশরবাসীরা আশা করতে লাগলেন যুদ্ধের অবসানে তাঁদের দেশের স্বাধীনতা স্বীকৃত হবে। এই দাবী জানিয়েই নেতৃবৃন্দ জোর আন্দোলন চালাতে লাগলেন। যুদ্ধের অবসানে কিন্তু স্বাধীনতা এল না—এল অধিকতর নিগ্রহ। জগলুলকে বন্দী করে মাল্টাতে বন্দীরূপে পাঠানো হল। এর প্রতিবাদে সারা মিশরে এবং বিশেষ করে কায়রো এবং অন্যান্য শহরে যে সকল ছাত্রদের পরিচালিত আন্দোলন শুরু হল, বিমান হতে বোমাবর্ষণ করে এবং অন্যান্য উপায়ে তার অবসান ঘটানোর চেষ্টা করা হল। এতেও বিশেষ কাজ হল না বলে ব্রিটিশ সরকারকে আবার জগলুল প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা-বার্তা চালাতে হল। ১৯২২ সালের বৃটিশ সরকার একক ঘোষণার দ্বারা চারটি বিষয় সংরক্ষিত রেখে অপর সকল বিষয়ে মিশর স্বাধীন দেশ বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু সংরক্ষিত চারটি বিষয়ই ছিল মিশরের স্বাধীনতার সারবস্তু। বৃটিশ সাম্রাজ্যের চলাচল সংক্রান্ত সকল ব্যবস্থা, দেশরক্ষার ব্যবস্থা, সাম্বালযুদ্ধের স্বার্থসংরক্ষণ এবং সুদান। ইসমাইলের দ্বিতীয় পুত্র, ফুয়াদ মিশরের রাজা বলে ঘোষিত হলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ : জগতে নূতন পরিস্থিতি

জাতীয় আন্দোলন চলতে লাগল। ইতিমধ্যে (১৯২৪ সালে) একটি দুর্ঘটনা ঘটল, সুদানের গবর্নর জেনারেল স্যার লী ষ্ট্যাক কায়রোর রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে, আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন। এই ওজুহাতে বৃটিশ সরকার, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সুদান হতে মিশরের সৈন্যদল ও শাসন সম্পর্কিত কর্মচারিগণকে অপসারিত করে নেবার জন্য মিশর সরকারকে চরম নোটিশ দিলেন। দশ বৎসর ঝগড়াঝাটির পর ১৯৩৬ সালে দুই সরকারের মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসা হল এবং তারই ফলে একটা সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল। কিন্তু এই সন্ধির সর্তানুযায়ী কাজ আরম্ভ হবার পূর্বেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হল (১৯৩৯ সাল)। বৃটিশ সরকার পুনরায় মিশরকে যুদ্ধ ঘাঁটিতে পরিণত করলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে জগতের রূপই বদলে গেল ; কিন্তু ইংরাজ, মিশরের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ ১৯৩৬ সালের সন্ধির ভিত্তিতেই বজায় রাখার চেষ্টা করলেন। ১৯৪৬ সালে মিশরের প্রধান মন্ত্রী সিদ্‌কি পাশা এবং ইংলণ্ডের বৈদেশিক মন্ত্রী আর্ণেষ্ট বেভিনের এ নিয়ে বহু আলোচনা হল। মিশরে প্রধান দাবী, তাঁদের রাজ্য হতে সকল বৃটিশ সৈন্যের অপসারণ, বৃটিশ সরকার কিছুতেই রাজী হলেন না।

হয়তো এ ব্যাপারে তাঁদের নিজেদেরও সম্পূর্ণ হাত ছিল না। কারণ এই সময়ে জগতের রাজনীতিক্ষেত্রে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। তা হচ্ছে, আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে দারুণ মনকষাকষি ; এবং একারণ উভয়ের নিজস্ব পরিপোষক শক্তিসংঘ (power bloc) সৃষ্টির চেষ্টা। ফলে ঘটল একটা পৃথিবীব্যাপী সংকট, ইংরেজীতে যাকে cold war (শীতল যুদ্ধ) বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই পরিবেশে, সুয়েজ খাল অঞ্চলে ইংরাজদের সামরিক আধিপত্য বজায় রাখা অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হল—তাঁদের ক্ষয়মান সাম্রাজ্যের স্বার্থের অনুরোধে না হলেও শীতল যুদ্ধের প্রয়োজনে। ইঙ্গ-মিশরীয় বিবাদে মধ্যস্থতার অজুহাতে এগিয়ে এসে আমেরিকান সরকার বস্তুতঃ নিজের স্বার্থের দিকেই লক্ষ্য রাখায় সমস্যাটি মীমাংসার পথে না গিয়ে আরও সংকটের মধ্যেই এগিয়ে গেল। ১৪ই অক্টোবর, ১৯৫১, মিশরের মন্ত্রিসভা ১৯৩৬'র ইঙ্গ-মিশরীয় সন্ধি একাই নাকচ করে দিলেন। মিশরের রাজা ফারুককে মিশর ও সুদানের রাজা বলে ঘোষণা করা হল।

একটা সঙ্গীন অবস্থার সৃষ্টি হল। প্রথমতঃ বৃটিশ সৈন্য

মিশর ও সুদানে ঘাঁটি করে রয়েছে। তাদের কে বিতাড়িত করতে পারে? তাছাড়া লড়তে গেলে লড়াই কি আকারে পরিণত হবে কে জানে? এখন এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে বৃটিশ সিংহের পেছনে লক্ষত্র খচিত পতাকা হাতে এক বিরাট জাতি দাঁড়িয়েছে। এরূপ দুঃসাহসিক ব্যাপারে কে নেতৃত্ব করবে? রাজা ফারুক? তিনি ব্যক্তিগতভাবে বৃটিশের পরম শত্রু হলেও তাঁর এককালের জনপ্রিয়তা এখন নানাকারণে হারিয়েছিলেন। ওয়াফদ মন্ত্রিমণ্ডলী। তাঁদের স্বদেশ-প্রেম দেশের কাছে তাঁদের বরণীয় করেছিল, কিন্তু দলীয় নেতাদের পারস্পরিক কলহ এবং বহুদিন ধরে শাসন ক্ষমতা তাঁদের হাতে থাকার দরুণ রাজনীতিতে গতানুগতিকতার প্রভাব, তাঁদেরকে এই সময়ে নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছিল। দেশে অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী আর একটা দল ছিল, তার নাম "মুসলিম ব্রাতৃসংঘ (Muslim Brotherhood)।" এদের আদর্শ ছিল, ধর্মের ভিত্তিতে রাজ্যগঠন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পাশ্চাত্য শক্তিগণ যে ইহুদী-সমর্থক নীতি অবলম্বন করেছিলেন এবং যার পরাকাষ্ঠা হয়েছিল প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের স্থাপন, এই সংঘ ছিল তার পরম বিদ্বেষী। ১৯৪৯ সালে জানুয়ারী মাসে এক যুবক, ওয়াফদ দলীয় মিশরীয় প্রধান মন্ত্রী নেকরাশি পাশাকে হত্যা করে। এই হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মিশর সরকার মুসলিম ব্রাতৃসংঘকে বেআইনি বলে ঘোষণা করেন। ফলে তারা গোপনে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

মিশরের সর্বময় কর্তৃত্ব, জেনারেল নাগুইব—২৩শে জুলাই, ১৯৫২

ইংলণ্ডের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্বন্ধে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হল। কিন্তু দেশে এমন কেউ বা প্রকাশ্যে এমন কোনও দল ছিল না, যে, বা যারা—একটা নূতন পথ দেখিয়ে দেশকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। ইংরেজ সেনাদের উপর এলোমেলো ভাবে এদিক ওদিকে আক্রমণ আরম্ভ হল এবং ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে কায়রোতে ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধল। স্পষ্টই বোঝা গেল, একটা চরম সংকটের মুহূর্ত আসন্নপ্রায়। এই সময়ে দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন এক শক্তিশালী পুরুষ—তিনি ছিলেন অন্যতম উচ্চপদস্থ সেনানায়ক মেজর জেনারেল মহম্মদ নাগুইব। তাঁর সহকর্মী অন্যান্য সেনানায়কদের সমর্থনের বলে তিনি একদিন সহসা আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনি কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দখল করলেন, কেহই তাঁকে বাধা দিতে সাহস করল না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মন্ত্রীমণ্ডলী পদত্যাগ করলেন, এবং তিনদিন পর রাজা ফারুক তাঁর শিশুপুত্রের উপর নিজ সিংহাসনের দাবী অর্পণ করে দেশ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হলেন। নাগুইবের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মিশরে এক নবযুগের সূচনা হল। পাশা, পার্লামেন্ট ও প্রাসাদের শাসন, এবং তাঁদের সঙ্গে জড়িত পুরাণো রাজনৈতিক দলাদলির অবসান ঘটল। শাসনযন্ত্রের শিরায় উপশিরায় নূতন শোণিত প্রবাহিত হল। জেনারেল নাগুইবের সহকর্মী কর্নেল গামেল আব্দুল নাসের প্রমুখ তরুণের দল দেশ সেবার ভার গ্রহণ করলেন। মিশরে প্রজাতন্ত্র (republic) প্রতিষ্ঠিত হল। মিশরের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় নীতির পরিচালনায় উক্ত দল এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এলেন। ভূমির অধিকার এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রকৃত সংস্কার সাধিত হল।

১৯৫৩ সালে জেনারেল নাগুইব পদ ত্যাগ করলেন এবং জেনারেল নাসের তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। জেনারেল নাসের সর্বময় কর্তা হলেন; তিনি রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হলেন; ও সর্বসম্মতিক্রমে এই পদে নির্বাচিত হলেন। এবং সেই হতে অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে—১৯৫২ বিপ্লবের আদর্শানুযায়ী নিজের দেশকে নূতনভাবে গড়ে তুলছেন এবং পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনায় দৃঢ়তা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে মিশরকে জগতের চক্ষে সম্মানিত করেছেন

সম্প্রতি জেনারেল নাসের সুয়েজ খালকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে যে অসমসাহসের পরিচয় দিয়েছেন—তার পিছনে রয়েছে সারা মিশরের সকলশ্রেণীর নরনারীর সুগভীর দেশপ্রীতি। বিপ্লব সংঘ যে কয়েকটি সংস্কার সাধন করে তাদের জাতীয় জীবনে যুগান্তর আনয়ন করেছেন তার কিছু

আলোচনা এবার করব।

তাঁরা প্রথমেই সুলতানদাসীদের সঙ্গে একটা আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হলেন।

বিপ্লব সংসদ পরিচালিত মিশর সরকারের দ্বিতীয় কাঁটি ইংলণ্ডের সঙ্গে সুয়েজ খালে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটি সম্পর্কে একটা আপোষ মীমাংসা। ১৯৫৪ সালে ইংরাজ ও মিশর সরকারের মধ্যে একটা চুক্তি, স্বাক্ষরিত হল—যেখানে ইংরাজ সরকার ১৮ মাসের মধ্যে এই অঞ্চলে অবস্থিত তাঁদের সকল সৈন্যদল অপসারিত করে নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এ প্রতিশ্রুতি এখন পালিত হয়েছে। দুটী মাত্র সর্ত আছে—প্রথম, সমষ্টিগত নিরাপত্তাচুক্তির (Collective Security Pact) স্বাক্ষরকারী কোনও রাষ্ট্র (যথা : মিশর, সিরিয়া, ইরাক, লেবানন জর্ডান, সৌদি আরব, ইয়ামেন অথবা তুর্কী যদি আক্রান্ত হয়, তবে মিশর ইংলণ্ডকে এই ঘাঁটিটি যুদ্ধোপযোগী করতে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করবেন। দ্বিতীয়, শান্তির সময় ঘাঁটিটি ইংরাজদের বেসামরিক বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে থাকবে। অনেকে মনে করেন, এই সর্তগুলি বিপজ্জনক। কিন্তু চুক্তিটির ত্রুটি যাই হোক, এর ফলে সুয়েজখাল অঞ্চল বিদেশীর অধিকার হতে মুক্ত হয়েছে। শ্রীনেহেরুর মত নাসেরও সকল দলাদলির বাইরে থাকতে চেয়েছেন, এ হিসাবে পৃথিবীর শান্তিসংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন ব্যাপারে তিনি শ্রীনেহরু, টিটো ও সুকর্ণের সহকর্মী ও সুহৃদ।

প্রেসিডেন্ট নাসেরের শ্রেষ্ঠ কীর্তির কথা সর্বশেষে বলছি। এ চাঞ্চল্যকর কাহিনী নয়, এতে জগতের রাজনীতিমহলে বাহবা পাওয়া যায় না। এতে শুধু পাওয়া যায় নিপীড়িত জনগণের প্রাণভরা আশীর্বাদ। যুগ যুগ ধরে যারা বুভুক্ষু তাদের মুখে দুটি অন্ন যোগানো, যাদের হীন করে রাখা হয়েছে তাদের মনুষ্যত্বের অধিকার দেওয়া—মিশরের এটাই প্রধানতম সমস্যা। সংক্ষেপে বলতে গেলে নাসের কতকগুলি সংস্থার সাধন করেছেন —যাতে করে দেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধি জনিত সমস্যার সমাধান হয়, কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ বিস্তৃত করা যায়; অধিকতর পরিমাণ জলের ব্যবস্থা হয়, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে, স্বদেশী শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে দেশের খনিজ পদার্থের সদ্ব্যবহার হয়। আমদানী কমে, রপ্তানী বাড়ে, দেশের কাপাস একমাত্র রপ্তানীযোগ্য বস্তু তুলা বিক্রয় করার জন্য বিদেশের বাণিজ্যদরের স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে বসে থাকতে না হয়। নাসের একারণ একটি প্রতিষ্ঠান খাড়া করেছেন, তার নাম "সাধারণের সেবায় স্থায়ী সংসদ" (Permanent Council of Public Service)। এরা মিশরের উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল প্রয়োজনীয় কার্যের পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে কতকগুলি উন্নয়নকার্য চালাচ্ছেন। এগুলি কতকাংশে আমাদের দেশের পরিকল্পনা সংসদ (Planning Commission) ও দেশোন্নতি বিধায়ক যোজনাগুলির (Community Development Project) অনুরূপ। এঁদের এক একটি সংস্থা প্রায় ১৫০০০ লোকের উন্নয়নের ভার গ্রহণ করে। এদের কাজ স্কুলের ব্যবস্থা করা, হাসপাতাল স্থাপনা করা, সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে মিলনমন্দির (Assembly Hall) স্থাপনা করা এমন কি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার ভারও এরা নেয়। এইভাবে জনসাধারণের মধ্যে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রচলিত করা হচ্ছে, সারা দেশে স্বাধীনতার ফল সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। পাঁচ বছরে এরূপ আটশতটি সংস্থা গড়ে তুলতে এঁরা সংকল্প করেছেন। আসোয়ান বাঁধ পরিকল্পনার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। দেশের উন্নয়নের ফলে সুখে ও শান্তিতে থাকবে অগণিত নরনারী, তাদের মধ্যে থাকবে সেই কৃষক রমণী যে নবীন মিশরের আত্মশক্তির প্রতীক, কায়রোর রেল স্টেশনের পাশে সিংহদ্বারের উপরে হাত রেখে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ১৯৫২ সালের ২ তারিখে এক যুগান্তকারী সংস্কার সাধন করে বিপ্লবী মিশর সরকার এর ব্যবস্থা করেছেন। ২০০ ফেদান (১ ফেদান = ১·০৩৮ একর) পরিমাণের বেশী আয়তনের সকল ভূমি, ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে, বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং কৃষকদের মধ্যে ক্ষুদ্র কিস্তীতে পরিশোধ্য মূল্যের বিনিময়ে বিলি করা হয়েছে। তাই মিশর এখন সকল মিশরবাসীর আপনার দেশ। রাজার সঙ্গে সঙ্গে পাশারাও গিয়েছে, বিভেদাত্মক সকল পদবী অবলুপ্ত হয়েছে, অর্থনৈতিক সমান সুবিধা ও সামাজিক সাম্যের উপর ভিত্তি-নৈতিক স্বাধীনতা স্থাপিত হয়েছে।

অবিস্মরণীয় স্মৃতি

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও তদীয় পত্নী প্রসন্নময়ী দেবী

শোভনা নন্দী

আজ থেকে প্রায় ৯০ বছর আগে একদিন একটী লক্ষ্মী প্রতিমার মত সুশ্রী অপরিচিতা বালিকা এসে দাঁড়াল পণ্ডিত শিবনাথের ঘরের দুয়ারে। নূতন জায়গা নূতন পরিবেশ, চারিদিকে নূতন লোক। ভয়ে বুক দুরু দুরু। নিরাভরণা এই ছোট্ট মেয়েটীর ভীতি-বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে শিবনাথের কোমল হৃদয় ব্যথার ভরে উঠ্‌ল, অশ্রু সজল চোখে—এস মা এস, ভয় কি! তুমি যে আমার মেয়ে—বলে দু হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিলেন। শিবনাথ পত্নী প্রসন্নময়ীর মাতৃ হৃদয় এই করুণ দৃশ্যের দুঃখের চোখের জলে ঝাপসা হয়ে এল। সংসার ও সমাজের নির্মম ব্যবহারে অভ্যস্তা বালিকা এতখানি মমতা এত দরদ তথাকথিত আপন জনের কাছ থেকেও পায় নি, অপরিচিতদের এ ব্যবহারে তাকে একান্তে অভিভূত করে ফেল্‌লো। এঁরা বুঝি মানুষ নন দেবতা—তার আয়তনেত্র থেকে অঝোরে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল।

সে দিনের এই বালিকাটী ছিলেন আমার মাতৃদেবী স্বর্গীয়া নৃত্যকালী দেবী। মা ছিলেন সে দিনের কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যা, গৌরী দানের অব্যবহিত পরই শৈশবে বিধবা হন। সমাজের কঠিন অনুশাসনে ও উৎপীড়নের মধ্য দিয়ে কয়টী বছর গত হলে স্নেহময় অগ্রজের পরোক্ষ অনুমোদনেও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় বিদ্যাসাগর জীবনী লেখক স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে মা শাস্ত্রী মশায়ের স্নেহাশ্রয় লাভ করে তাঁর পরিবার-ভুক্ত হন ও পরে যথা সময়ে তাঁরই নির্ব্বাচনে আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পালের সহিত পরিণীতা হন।

সেই প্রথম দিনে মা পেয়েছিলেন বাবা-মা আর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পেয়েছিলাম দাদামশাই-দিদিমা। মা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত শাস্ত্রী মশায়ের পরিবারের বড় মেয়ের স্থানে অধিষ্ঠিতা ছিলেন।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিপরীত দিকের দাদামশায়ের প্রকাণ্ড বাড়ীতে সে সময় বহু একান্ন সপরিবারে একান্নবর্ত্তী পরিবারের মত ঘনিষ্ঠ ভাবে বাস করতেন। আমার জ্ঞান হওয়া অবধি দেখেছি আমরা থাকতাম বাহির বাড়ীর আর দাদামশাই ভিতর বাড়ীর দোতলাতে। আমার ৮।৯ বছর বয়স পর্য্যন্ত এ বাড়ীতে কেটেছে। সে অনাবিল আনন্দের দিনগুলি আজও মনের মণি কোঠায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে!

দাদামশাই আমাদের যে কী ভালই বাসতেন! সারাদিন আমরা মন তাঁর ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াত, একটু ফাঁক পেলেই ছুটতাম তিনি এসেছেন কিনা দেখতে। একবার তাঁকে পেলে কোন কিছুরই প্রয়োজন আমাদের দূরে সরিয়ে নিতে পারত না। আমাদের অত্যাচারের সীমা ছিল না। সময় নেই অসময় নেই কত উৎপাত যে করতাম কিন্তু তাতেও দাদামশায়ের এতটুকু বিরক্তি বোধ ছিল না। কাজের মধ্যেও তিনি আমাদের কত গল্প বলতেন, কত খেলা করতেন। চোর, কানামাছি প্রভৃতি খেলা তাঁকে পেলে যেমন জমত এমন আর কাউকে পেলে হ'ত না। কখন কখন আমাদের হুকুমে তাঁকে বুড়ীও হ'তে হতো। তাঁর গল্প বলার ছিল এক অদ্ভুত ক্ষমতা, যেমন ছিল বলার ভঙ্গী, তেমনি ছিল অকৃত্রিম হাসির অফুরন্ত খোরাক! শুনতে শুনতে কখন চোখে জল আসত, কখন আবার হেসে লুটোপুটি খেতাম! নানা দেশ-বিদেশের গল্প, মহাভারতের কথা, আর তাঁর কাছ থেকেই সেই শৈশবে শুনেছিলাম শ্রীচৈতন্য, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, 'ঝুনো' রামনাথ প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনের অপূর্ব্ব কাহিনী! দাদামশাইর "পুষ্পমালা" পুষ্পাঞ্জলীর

কবিতা সেই শিশু বয়সেই আমাদের কণ্ঠস্থ ছিল। আজ "মিমাই সন্ধ্যাসের"—'আজ শচীমাতা কেন চমকিলে' কথাটা যেন মনে মনে গাথা হয়ে আছে। এমন করুণ ও সহজ সরল কবিতা জীবনে খুব কমই পড়েছি।

কোনও দিন যা তাঁকে হয়ত ক্লান্ত হয়ে শুয়েছেন, আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি ও তাঁর বিছানায় চড়াও হয়ে তাঁকে সন্তর্পণে ঘর দিয়ে কেউ হাত কেউ পা কেউ বা পাশে দখল করে বসেছি। তাদের কারুর কারুর—গল্প বল, কেউ বা অভিমান করছে ওর দিকে কেন তাকাচ্ছ আমার দিকে চেয়ে সে এক বিরাট হট্টগোল। বড় দিদিমা (দাদামশাইর প্রথমা পত্নী প্রসন্নময়ী দেবী) কখন কখন এসে বলতেন, ওরে তোরা কি মানুষটাকে একটু জিরোতেও দিবি না যা যেয়ে সব আমার ঘর থেকে। বড় দিদিমার ঘরটুকুতেও তেমন জোর খাটতনা, কাজেই আমাদের ও কথা কানেই যেত না। দাদামশাইও নিজে কত অসহায়ী এমনি হাসি মুখ করে সস্নেহে বলতেন 'না ছেলের মা, ওরা ত আমায় একটুও বিরক্ত করছে না, বরং না এলেই আমার ভাল লাগে না, ওরা কাছে থাকলেই বরং বিশ্রাম হয়, তুমি মিছে উদ্বিগ্ন হয়ো না। মনে পড়ে একবার দাদামশাইর জন্মদিনে কি দেব তাই ভেবে অস্থির। বাবার সঙ্গে উপহার কিনতে গেলাম।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও শঙ্কর ঘোষের লেনের উত্তর পূব কোণায় কেইর দোকান ছিল আমাদের কাছে সে দিনের যেন ওয়াইটওয়ে লেডল; দোকানে এসে নানা সুদৃশ্য বস্তুর মধ্যে একটী ছোট, নানুনে চীনে মাটির বাঁদর আর এক পেন্সিল কুড়ীর লক্ষ্য। দাদামশাইকে দেবার মত কিনিস বলে পছন্দ করলাম, বাবা মুখ ফিরিয়ে হাসলেন। আজও কানে বাজে রাত্রে উৎসব অঙ্গনে নানুনে বাঁদর পেয়ে সে কী হাসির হল্লা! যেমন দাদামশাইয়ের তেমনি নিমন্ত্রিতদের

মাস্ত্রীমশাই বিলাত যান ১৮৮৮ সালে। দাদামশাই বিলাত যাবেন শুনেই আমাদের দুঃখের আর সীমা ছিল না। আজও সে দিনটী যেন চোখে ভাসে, প্রকাণ্ড কালো খানা ধীরে ধীরে গভীর জলের দিকে সরে যাচ্ছে আর দাদামশাই জল ছল ছল চোখে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে চুমা ছুঁড়ে দিচ্ছেন। সেদিন থেকে বাড়ী এসে আর কিছুতে মন বসে না। দাদামশাই কবে আসবেন এই প্রশ্নে বাড়ীর সকলকে উত্যক্ত করাই যেন একমাত্র কাজ হল। দাদামশাই ছিলেন আমাদেরই একজন খেলার সাথী।

দাদামশাইয়ের অর্থ সম্পদ ছিল না, পরিবর্তে ছিল অসাধিব ঐশ্বর্য্যের আধার কোমল স্নেহপ্রবণ বহুৎ উদার অন্তঃকরণ। আর ছিলেন তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিতা। ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী সহধর্ম্মিণী প্রথমা পত্নী প্রসন্নময়ী সমাজের মঙ্গলের ও দশের সেবা ছিল তাঁদের উভয়ের জীবনাপেক্ষাও বড়, আর ছিল তদনুযায়ী অটল নির্ভরতা।

বড়দিদিমার মত সাধ্বী পৃথিবীতে দুর্লভ! সতি ছিলেন তাঁর দেবতা, তাঁর গুরু। তাই হিন্দু পরিবারের একান্নবর্ত্তী সংসারের সুখ আরাম তুচ্ছ করে শিশু পুত্র কন্যাদের হাত ধরে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়াতে তিনি এক মুহূর্ত্তও দ্বিধা করেন নি। দাদামশাই বেছেছিলেন এ পথে কুসুমাস্তীর্ণ নয়, দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম এ পথে অনিবার্য্য, নির্য্যাতন উৎপীড়ন এ পথের পুরস্কার তুমি কিরে যাও, বাবা বাপের কাছে! বড়দিদিমা তবুও সংকল্পে অটল!

কবিরা যাকে বলেন মাতৃমূর্ত্তি আমাদের বড় দিদিমা ছিলেন ঠিক তাই! দেখতে সুন্দরী ছিলেন না কিন্তু তাঁর সেই কালো মোটা মোটা লক্ষ্মীশ্রী যুক্তা নারীর হৃদয়ে অন্তঃসলীলা ফল্গুর মত স্নেহধারা অহর্নিশ প্রবাহিত ছিল। মুখ চোখ তাঁর প্রশান্ত স্নিগ্ধ হাসে সর্ব্বদা উদ্ভাসিত থাকত। বাপ মার রাখা নাম প্রসন্নময়ী নামের এত বড় সার্থকতা খোব হয় খুব কমই দেখা যায়। বড়দিদিমার কপটতাশূন্য উদার মনটি শিশু মনের কাছে কাচের মত স্বচ্ছ হয়ে দেখা দিয়েছিল বলেই সেই শৈশবে তাঁকে আমরা এত ভাল বেসেছিলাম।

দাদামশাই বড়দিদিমা কেউ কক্ষ বা কর্কশ কথা বলতে জানতেন না, এঁদের দুজনের চরিত্র যেন এক ছাঁচে গড়া, এমনটী বড় একটা দেখা যায় না। বড়দিদিমার বসুমি ছিল আমাদের কাছে যেন মমতাময়ী। পরিবারটী

তাদের বড় কম ছিল না—নিজেদের ছেলেমেয়ে, পাতান ছেলে মেয়ে, আর তার ওপর ছিলাম আমরা তাঁর আশ্রয়ের মাত্র মাতৃহীন দল। দাদামশাইকে যেমন আমরা উত্যক্ত করতাম দিদিমারও উপর তেমনি, আমাদের অত্যাচার বড় কম ছিল না।

আচার, মোরব্বার হাঁড়ী ভাঁড়ার থেকে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে ছাতে বসে ভাগাভাগি করে খাওয়ার আনন্দ আজও ভুলতে পারিনি। কখন বা বড়দিদিমার পরিপাটী করে সাজান ভাঁড়ার ওলোট পালট করেছি আচার বা আমসত্ত্বের বা মোরব্বা খেতে, এমন সময় বড়দিদিমা এসে হাজির—ওরে দস্যুরা তোদের জন্য কি কিছু থাকবে না! কিন্তু তবুও সেই ভ্রূক্ষেপ নেই। উত্তর দিলাম—তুমি লুকিয়ে রেখেছ কেন কিছুতে যে খুঁজে পাচ্ছি না, লক্ষ্মীটী বড় দিদিমা আজকের মত হাত বন্ধ দেতে ইচ্ছে করছে। আর তোমার ঘরে আসবো না। সঙ্গে সঙ্গে দশ বারটী ছোট হাত মেলে ধরলো তাঁর সামনে।

জয়নগর ছিল বড়দিদিমার বাপের বাড়ী, সেখানের প্রসিদ্ধ মেয়ের ওপর ছিল আমাদের প্রচণ্ড লোভ। বড়দিদিমার শাসন ছিল মেহের; যা সত্যি ভালবাসতেন না তা আমরা কখনও করতাম না। সত্য কাজের মধ্যে অবসর পেলেই বড়দিদিমা পা ছড়িয়ে বসে কত আদর করতেন, কেউ অন্যায় করেছে জানলে তাকে বোঝাতেন। আজও মনে আছে, একদিন বললেন—দেখ, কোন অন্যায় কাজ করলে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তখন মিথ্যে যে ছাঁ করেছি, বলে 'না' বলা খুব খারাপ তাহলে তাকে ভীরু কাপুরুষ বলে লোকে ঘেন্না করবে; বলে যদি বকুনী খেতে হয় তাও ভাল তাহলে মনে থাকবে বুঝবে যে এটা অন্যায় পরে আর করবে না।

আমার বয়স যখন ৭ বৎসর তখন মা হঠাৎ একটী অপগণ্ড শিশু রেখে সন্ন্যাস রোগে মারা যান। সব ছোট বোনটী তিন মাসের। বড়দিদিমা কাঁদতে কাঁদতে এসে সবকটীকে জড়িয়ে বুকে তুলে নিতে দেরি একটু ইতঃস্তত: করেন নি। নিজের সংসার, আমরা ৭টী আর ছিলেন তাঁর কাছে ৺রামকুমার বিদ্যারত্নের ২টী মাতৃহীন শিশু; মাকে দাদামশাই যে কী স্নেহই করতেন একটী ঘটনা থেকে বোঝা যাবে। বাবা তখন ব্যাঙ্গালোর স্কুলে ফেড মাষ্টার, দাদামশাই স্থিরের তারিখ ফেলেন কিন্তু বাবা ছুটী পেলেন না; তখন অগত্যা স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের প্রস্তাবে উভয়ে মাকে বুকে নিয়ে সেখানে বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। কিছুদিন পর ব্যাঙ্গালোর স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় বাবা কাজ ছাড়ার মনস্থ করে মধোমশাইয়ের কাছে পত্র দিলেন দাদামশাইও নিজে ছিলেন স্বাধীনচেতা, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া অপরাধ মনে করতেন তিনি বাবার মতে মত দিয়া পত্র দিলেন বাবাও পত্র পাঠ কাজে ইস্তফা দিয়ে কলিকাতা ফেরার জন্য প্রস্তুত হলেন। বাবা কোন দিন সঞ্চয়ী ছিলেন না। পাওনাদারদের সব দিয়ে টিকিট কিনে মাত্র কয়েক আনা পয়সা সম্বল নিয়েই ট্রেনে উঠলেন তখনকার দিনে ব্যাঙ্গালোর থেকে বয়ে হয়ে তাঁর দিনে কলকাতা আসতে হ'ত। মা মনে মনে অসোয়াস্তি বোধ করলেও বাবার ভ্রূক্ষেপ নাই, দারিদ্র্যে তাঁকে কোন দিন বিচলিত হতে দেখি নাই। প্রথম দিনটাত খালি পেটেই কাটল। দ্বিতীয় দিন প্রাতে একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ী থেমেছে হঠাৎ শুনতে পেলেন কে যেন চেঁচাচ্ছে 'বিলিম পাল' 'বিলিম পাল' বলে। বাবা আশ্চর্য্য হয়ে এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিতেই লোকটী বলে আপনার টাকা আছে। বাবা ত অবাক দেখেন দাদামশাই টাকা পাঠিয়েছেন। কলকাতা পৌঁছে বাবা দাদামশাইকে জিজ্ঞেস করেন হাত শূন্য অবস্থায় যে রওনা হয়েছি আপনাকে ত তা জানাই নি, আপনি কি করে জানলেন? উত্তরে দাদামশাই বলেছিলেন, হঠাৎ মনটা তোমাদের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল তুমি ত যে বেপরোয়া লোক, নেহার (মার নাম নৃত্যকালী) শরীর অসুস্থ যেমন করে হোক কিছু পাঠান দরকার অথচ হাতশূন্য কি করি এমন সময় ভগবান অপ্রত্যাশিত ভাবে ক'টা টাকা দিলেন—পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

তখন আমি এণ্ট্রান্স ক্লাশে পড়ি। স্কুল বোর্ডিং ছিল বিজ্ঞাপুর হাউসে। দাদামশাই এসেছেন দেখে নীচে গিয়ে

দেখি অনেক মেয়ে তাঁকে ঘিরে রয়েছে। আমি নিঃশব্দে একপাশে দাঁড়িয়ে আছি দাদামশাই ডাকছেন না। মনে করে বড় অভিমান হ'ল, হঠাৎ নজর পড়তেই বলে উঠলেন ঐ যে ওখানে একজন দাঁড়িয়ে ভাবছে দাদামশাই ভুলেই গেছেন বুঝি বলতে বলতে এগিয়ে এসে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরেন পরে বোঝা দাদামশাইকে পরীক্ষা করতে গিয়ে নিজেই ঠকে গেলি! চোখের কি আমি ভুলতে পারি পাগলী! দেখি মুখ খানা, বড্ড অভিমান হয়েছে

না। জল মুখ তুলে ধরলেন, এ আদরে সব অভিমান চোখের জলে ধুয়ে গিয়ে কান্নার মধ্যে হাসি ফুটে উঠল নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। সেদিনের সে কথাগুলো আজও যেন কানে বাজে।

এরপর আর দাদামশাইএর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। তাঁর মহা প্রয়াণ সংবাদ আমার সুদূর পল্লীভবনে পেয়ে পরম আত্মীয় বিয়োগ ব্যথায় বুকটা দুঃখে ভরে গিয়েছিল।

॥ সমবায়নীতি ॥

বর্তমান কাল বর্তমান কালের মানুষের জন্যে বিদ্যা স্বাস্থ্য জীবিকা নির্বাহের জন্য যে সকল সুযোগ সৃষ্টি করেছে সেগুলি যাতে অধিকাংশের পক্ষেই দুর্লভ না হয় সর্বসাধারণের হাতে এমন উপায় থাকা চাই।.....আজ সভ্যতার গৌরব রক্ষার ভার অল্প লোকেরই হাতে—কিন্তু এই অল্পের পোষণ ভার বহুসংখ্যক লোকের অনিচ্ছুক শ্রমের উপর। তাতে বিপুল সংখ্যক মানুষকেই জ্ঞানে ভোগে খাটো। বঞ্চিত হ'য়ে মূঢ় বিকল চিত্ত হ'য়ে জীবন কাটাতে হয়। এত অপরিমিত মূঢ়তা, ক্লেশ অস্বাস্থ্য...অভ্যাস হয়ে গেছে বলে একে অপরিহার্য ভেবেছি বলে এর প্রকাণ্ড পরিমাণ অনিষ্টকে আমরা চিন্তার বিষয় করিনে। কিন্তু...আজ পৃথিবী জুড়ে চারিদিকেই সামাজিক ভূমিকম্প মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছে। ..আজ শক্তিতে যুক্তি দিতে হবে।...

আমাদের এই গ্রাম-প্রতিষ্ঠিত কৃষি প্রধান দেশে একদিন সমবায়নীতি অনেকটা পরিমাণে প্রচলিত ছিল। তখন কিন্তু মানুষের জীবন যাত্রা ছিল বিরলাশ্রিত। প্রয়োজন অল্প থাকাতে পরস্পরের যোগ ছিল; কিন্তু এখন ধনীরা আত্ম-সম্ভোগের দ্বারা যেমন বাধা রচনা করেছে তখন ধনীরা তেমনি আত্মত্যাগের দ্বারা যোগ রচনা করেছিল। আজ আমাদের দেশে যাদের বুদ্ধি ও আয়ের সঙ্কীর্ণতা বেড়ে গেছে বলেই ধনীর ত্যাগ দুঃসাধ্য হয়েছে।....এখন সর্বসাধারণকে নিজের মধ্যেই নিজের শক্তিকে উদ্ভাসিত করতে হবে।....আজ ভারতবর্ষে জীবিকা যদি সমবায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারত সভ্যতার ধাত্রীভূমি গ্রামগুলি আবার বেঁচে উঠবে ও সমস্ত দেশকে বাঁচাবে।

রবীন্দ্রনাথ

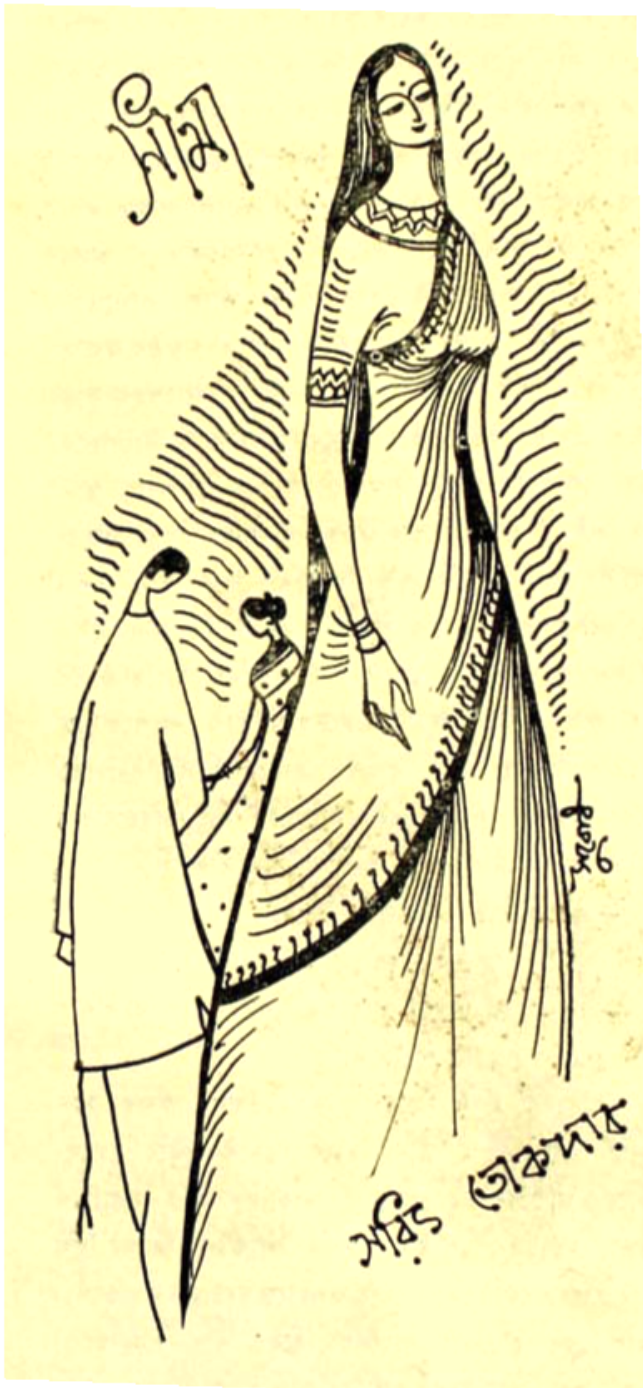

কুন্তলা আর শৈলেন। শৈলেন একটু চুপ করলো—যেন হয় মনে মনে গুছিয়ে নিলো একের পর এক। কুন্তলা তাকিয়ে আছে শৈলেনের দিকে।

—তারপর শৈলেন ?

তারপর ? খুব সুন্দর করে সীমা বললো, জীবনের প্রথম পুরুষ তুমি, বোধ হচ্ছে শেষও। নতুন করে গোড়া থেকে সুরু করতে আমি পারবো না। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে তোমার সঙ্গে পরিচয়। তোমার স্পর্শে আমার যৌবন মুকুলিত হয়ে উঠলো, সমস্ত পৃথিবী নতুন করে দেখতে শিখলাম। প্রতিটি দিন যেন একটা করে না-খোলা খামের মতো আমার কাছে আসতো, আর আমি সেই মহার্ঘ দিনটি একটু একটু করে উপভোগ করতাম। ভাবতাম পৃথিবী কত সুন্দর, এর প্রতিটি মানুষ কি আশ্চর্য মানবিক। তারা সবাই ভিন্ন পথের পথিক—কিন্তু লক্ষ্য সেই এক। আরো আশ্চর্য লাগতো এই ভেবে এ অভিজ্ঞতা তো কোনদিন কল্পনা করিনি—কি মধুর, কি আশ্চর্য !

—তুমি কি উত্তর দিলে শৈলেন ?

উত্তর দিতে গিয়ে থেমে পড়লাম। যে চোখে সীমা এই বিশ্লেষণকে দেখছে তাকে যুক্তি দিয়ে ফেরানো যাবে না। কোন কিছু বললেই ওর গুরুমশায়ের সুর এসে পড়বে। তবু ওকে বললাম, সীমা, তোমাকে অনেক দিন বলেছি আমি বড় অস্থির। জীবনের যে মুহূর্তে স্থির থাকবার প্রয়োজন ঠিক সেইক্ষণেই আমি ছিটকে পড়ি। তবু একথা তো সত্য তোমার সাহচর্যে যে কটি দিন কাটিয়েছি তা মিথ্যা নয়। 'সে দিনের আমি' তোমাকে প্রবঞ্চিত করিনি। জানিনা একথা তুমি মানবে কিনা তবু যদি কোন দিন নিরিবিলিতে ভাবো তাহলে হয়তো আমাকে বুঝতে পারবে।

—এখন কেমন লাগছে ? মুক্তির আনন্দ উপভোগ করছো ?

—মুক্তি ? তা হাঁ একরকম মুক্তি বইকি। কিন্তু

আশ্চর্য তাদের সীমাকে বিদায় দেবার সময় বারবার তোমার কথা মনে পড়ছিলো। ভাবছিলাম, সীমা, ওর তো কোন চাহ নেই। তার সাদা মতো আমাকে আঁকড়ে ধরেছে সব কিছু দিয়ে আমাকে বাঁধবার চেষ্টা করেছে তবু কেন আমি তৃপ্ত হতে পারলাম না। আর যখনি এসব কথা মনে এসেছে তখনি কেন জানিনা তোমাকে ফিরে ফিরে মনে পড়েছে। সীমার কাছ থেকে বিদায় নেবার পর প্রথমেই তোমার কথা মনে পড়েছে তাইতো তোমার কাছেই এসেছি

কুন্তলা হাসলো অতি ধীর, শান্ত আর কি ভয়াট সে হাসি। শৈলেন কুন্তলার দিকে ছ'চোখ ভরে তাকালো। ভাবল কুন্তলার হাসি কি ভয়াট সবটুকু অনুভূতি পূর্ণ করে না মিলে এমনি হাসি কেউ হাসতে পারেনা কুন্তলা এবার সহজ হলো। ছটি চোখ আশ্চর্য নিবিড় করে মমতা মাখিয়ে শৈলেনের দিকে তাকালো। শৈলেন মুগ্ধ চোখে তখনও তাকিয়ে। বলল, দিদি, তোমার এই মৃদু হাসি দেখেই বোধকরি দেবব্রত তোমার প্রেমে পড়েছিলেন। আমি নতুন করে সীমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা ভাবছি

কুন্তলাও ভাবছিলো। ভাবছিলো শৈলেনের কথা। শৈলেন ভাবছে সীমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা। কেন তা সে জানে কুন্তলার মনে পড়ছে সে সব দিনের কথা যখন তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হল প্রিয়ব্রতের। কি একটা অনুভূতি যেন মনে হয় কত সহজেই প্রকাশ করা যায়—কিন্তু করতে গেলে দেখা যায় বলা হল না, যা ভেবেছিলো তার কিছুই প্রকাশ হল না। আজ শৈলেন তার কাছে ছুটে এসেছে। সেও তেমনি এক খর রৌদ্র দীপ্ত দুপুরে সমস্ত জীবনের প্রতি তীব্র বিষাদ নিয়ে দেবনাথের কাছে গিয়েছিলো।.....

শৈলেন ভাবছে সেই প্রথম দিনের কথা। সীমার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে তার পরিচয়। সেবারের শরতকালে আকাশ ছিলো আশ্চর্য নীল: হালকা মেঘের আনাগোনার এতটুকু বিরাম ছিল না কোথাওও। সমস্ত আকাশ বাতাস এক অধীর প্রত্যাশাতুর—কিন্তু শৈলেন সেবার বড় একা। এত একা যে কলকাতার সমস্ত কিছু আনন্দ মিলিয়েও তার মনের শূন্যতা ভরাট করতে পারলো না। প্রতি ক্ষণেই মনে হতো জীবনটা কি তার! বোঝার মত, বহন করা যায় না। রাস্তায় বেড়াতে তার ভালো লাগতো। চওড়া বাঁধানো রাস্তার অনির্দেশ্যভাবে যতদূর মন যায়। কিন্তু সেবার তার রাস্তা বেড়ানোও ভালো লাগত না। চলমান জনস্রোত দেখে তার বিরক্তি আসতো। অথচ আগে এই জনস্রোতই তার কতো ভালো লাগতো। শহরের গতির স্পন্দন সে এই জনস্রোতে অনুভব করতে পারতো। কিন্তু এবার যে কি হলো সমস্ত শহর তার কাছে এমনি বিরূপ হয়ে উঠলো। ভাবলো উঃ শহরে এতো লোক! একটু সস্তর্পণে নিশ্বাস ফেলবার স্থান মাত্র নেই। এতো মানুষ এতো কোলাহল এতো ব্যস্ততা এরা সব কারা। এমনি এক বিস্বাদময় দিনে সীমা এল। তার মনের শূন্যতাকে বুঝি সীমার বাঁধন দিতেই সীমা এল। শৈলেন আশ্চর্য হয়ে গেলো। একজনের উপস্থিতি যে এত দ্রুত কাউকে, কারোর মনের গ্লানিকে নিঃশেষে মুছে নিতে পারে—তা তার ধারণার বাইরে ছিলো। ভাবলো একি সম্ভব? সীমা—এই কিশোরী না উদ্ভিন্নযৌবনা মেয়েটি তার মনের কতটুকু অংশ পূর্ণ করতে পারে?

—কই আমার চিঠির উত্তর দিলেনা?

—চিঠি? হাঁ না উত্তর তো লিখি নাই।

—কেন উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করলে না বুঝি? সরে এলো বাস চাপা পড়বে নাকি?

সেদিনের সেই সন্ধ্যাটার কথা এখনও সুন্দর মনে আছে শৈলেনের। সীমা তাকে ডেকে নিয়ে গেলো কাছের পার্কটায় এক কোণে। ভারী মৃদু আর সপ্রতিভ ভঙ্গী মেয়েটির। পার্কটায় তখন লোকজন বিশেষ ছিল না। একদল ছোট ছেলে মেয়ে কলহাস্যে ছুটোছুটি করছিলো। আর শুধু ছ'একটি বায়ুসেবী বৃদ্ধের ধীর পদচারণা। একটি আত্মা তার মনের মানুষের সঙ্গে সমস্ত দিনের শেষে মিলতে পারার আনন্দে পারিপার্শ্বিক বিস্মৃত। আর বাতাসে একটু হিমের আমেজ।....ওরা ছ'জন গিয়ে কোণটায় একটা বেঞ্চ অধিকার করলো। সীমা বেশ

গুছিয়ে বসে শৈলেনের দিকে তাকালে শৈলেন তখন কি ভাবছে? ভাবছে এই মেয়েটি তার শুভ্রতা কতটুকু ভরাবে? কিন্তু বেশ সপ্রতিভ তো মেয়েটি! হঠাৎ তার মগ্নতা ভেঙে গেলো। সীমা তার দিকে তাকিয়ে আছে।—

আচ্ছা বলতে পারো সব সময় তুমি কি এতো ভাবো? মনে হচ্ছে দারুণ একটা সমস্যা নিয়ে যেন বিব্রত বোধ করছো? শৈলেনের মনে হলো এমন কথা বহুদিন শোনে নি। এমনি করে তাকে বুঝবার চেষ্টা কেউ কোন দিন করেনি। ভারী ভালো লাগলো তার। সে ভাবছিল এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। সে ঠিক করতে পারছিল না কেমন করে প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে এই তীব্র অপ্রত্যাশিত আনন্দকে উপভোগ করবে।

ঠিক তেমনি ভাবে সীমার মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে শৈলেন বললো, সীমা আমার জীবনে অপ্রত্যাশিত পাওয়ার ইতিহাস একেবারে নেই। যা কিছু পেয়েছি সব যেন মৃত, পানসে। পাওয়ার যে আনন্দ, তা বাঁধা পথে আসার জন্যে আমাকে এতটুকু মাদকতা দিতে পারেনি। আজ প্রথম অনুভব করছি এমনি পরম পাওয়াকে হঠাৎ পেলে মানুষ কেমন মাতাল হয়ে যায়। মনে হয় যেন একটা অসহ্য সুখ শরীরের বাঁধনে আর থাকতে চাইছে না প্রতিক্ষণে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তেই তীব্র আবেগে ফেটে পড়বে। সীমা তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। দুটি অবোধ চোখ মেলে কৌতূহল নিয়েই তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সাধারণ কথাও তুমি এত সুন্দর করে বলতে পারো, যাতে নিজের কাজের জন্যে নিজেকেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। ভাবি, কৈশোর উন্মেষের সাথে সাথে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, তা আজ সার্থক হয়েছে—আমি পরিপূর্ণ তৃপ্ত।

শৈলেনের কাছে এমনি অকপটতা একেবারে নতুন। সে যতো ভাবছিলো ততো বিস্ময়ে ভরা একটা কৌটো যেন তার গোপন ভাণ্ডারের দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিলো। সে যতবার এ কথা, আজকের এ বিকেল-টাকে মনে মনে নাড়াচাড়া করছিলো, ততোই নিজের গভীরে প্রবেশ করে দেখছিলো, আরো, আরো কতো রহস্য সেখানে তার জন্যে জমা আছে—যা তাকে উত্তরোত্তর নতুন অভিজ্ঞতার স্বর্ণদ্বার খুলে দেবে। সীমা বলছিলো, তোমার মুখে এমনি আশ্চর্য সরলতা আর শিশু-চিহ্ন মাখানো আছে, যাতে যে কেউই তোমাকে দেখুক না কেন— শৈলেনের মনে তখন কতো কি আনাগোনা। তার মনের মেঘ অনেকখানি উড়ে গেছে। সেখানে সেই খণ্ড ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়ে শরতাকাশের জ্যোৎস্নার মতো ছোটো ছোটো সুখ দুঃখের ঢেউ আবার ওঠা পড়া করছে—আবার চারিদিকের জনতার মাঝে প্রাণ চাঞ্চল্য অনুভব করছে—সকলের কলহাস্যে তার হৃদয়ও সাড়া দিচ্ছে। তার মনে হলো এবারের শরৎকালটা সত্যি সুন্দর। সত্যি এ পৃথিবীও কতো সুন্দর, এই আকাশ—এই বাতাস! প্রতি ধূলিকণা—এর সকলের মাঝেই যে বিপুল প্রাণস্পন্দন লুকিয়ে আছে, যাতে তারা সব কিছু গ্লানি কলুষতাকে প্রতি মুহূর্তে কাটিয়ে জীবনের পথে নবতর বিকাশে ছুটে চলেছে—সব কিছু যেন এক সঙ্গে তার মনের মধ্যে সাড়া দিয়ে উঠলো। সে ভাবলো এই কি পরিপূর্ণতা? এরি নাম কি সফলতা—সব কিছুকে পাওয়া? সীমার হাত দুটো ধরে সে তার চোখে চোখ রেখে বলল, সীমা জীবনের প্রতি ঘাটে ঘাটে যে অপার সৌন্দর্য আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে, তাকে আমরা দেখতে পাই না—আর তাই আমাদের জীবনে এত হতাশা, আশা ভঙ্গের বেদনা। তুমি আমাকে অনাবিষ্কৃত রহস্যের দিকে চোখ মেলে তাকাবার সুযোগ করে দিয়েছে—এর জন্যে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

—শুধু কৃতজ্ঞতা? আর কিছু নয়?

—না, না, তা হবে কেন? যে সেই রহস্যের চাবি কাঠি খুলে দিলো, তাকে শুধু মুখের কৃতজ্ঞতা দিয়ে বিদায় করতে পারি না। তাহলে হয়তো এক দিন দেখবে সে দুয়ার আবার বন্ধ হয়ে গেছে। তাই তাকে পাশে পাশে রাখবো। যদি কোন দিন তেমন দুদিন আসে তাহলে আবার তোমার স্নেহ তেমনি করে সঠিক পথের সন্ধান দেবে।

এলোমেলো ? না কোন ছন্দপতন নেই ; স্পষ্ট মনে আছে তার সেই জ্যৈষ্ঠের খর রৌদ্র দীপ্ত দিনটি। কুন্তলা কি ভুলতে পেরেছে ? না পারে নি ; আজও সে যা ভাবিয়ে তোলেও মাঝে মাঝে উনটন করে ওঠে—বোধ হয় রক্তক্ষরণও হয়। কি বিরূপ, বিস্বাদ সেদিন।....হাজরা পার্কের সেই 'গোল মোহর' গাছটা তার কতো প্রিয় ছিলো। তার ছায়ায় বসে, ঝিরিঝিরি হাওয়াতে, সে আর প্রিয়ব্রত কতোদিন, কতো সময় কাটিয়েছে। প্রভাত সূর্যের রঙ্ সাদা হতে হতে ক্রমে চোখ ধাঁধানো চকচকে পাতের মতো হয়ে গেছে—আবার বাঁধে ম্লান হতে হতে সোনালী হয়ে রক্তবর্ণ ধরেছে, দুজনে মিলে সারা দিন ধরে এই রঙ্ খেলা দেখেছে। প্রতিটি মুহূর্ত যেন একটি করে ঘুঁই ফুলের মতো রূপ, গন্ধ নিয়ে তাদের কাছে এসেছে, আর তারা দু'জন সেই মুহূর্ত গুলি কুড়িয়ে দিনের পর দিন মালা গেঁথে চলেছে। এমনি করে দিন থেকে দিনে কুন্তলা যখন পাখী মায়ের মতো আপন নীড় বেঁধে নতুন এক অভিজ্ঞতার দ্বারে প্রবেশ করবার মুহূর্ত গুণছে, এমনি অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে এলো সেই নিদারুণ আঘাত। তার সমস্ত স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেলো। সেই হালকা হাওয়া, আর ঝিরিঝিরি বাতাস যেন কাল বৈশাখীর পাগল হাওয়া হয়ে তার সাধের নীড় ভেঙে দিয়ে গেলো—আর সে অসহায় হয়ে অসাড়ের মতো তাকিয়ে দেখলো মাত্র একটি কথাও প্রতিবাদে মুখর করতে পারলো না।....শেষ কথা বলে প্রিয়ব্রত উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু সেই কি শেষ কথা ? কুন্তলার কাছে আরেক সুরুর কথা সেটি। যে পথ দিয়ে তারা প্রত্যহ ফিরেছে সেই পথ দিয়েই ফিরলো। কিন্তু কতো পার্থক্য ? প্রতি দিন যে পথ দিয়ে যেতে যেতে ওরা দু'জন আবার পরের দিনের প্রত্যাশায় মৌন-মুখর হয়ে থাকতো—আজ সে পথ শুধু যাবার জন্যেই। ফেরবার জন্যে নয়। কুন্তলা একবারও সাড়া দিতে পারলো না। শুধু মনে হতে লাগলো, এরপর ! এরপর সে কি করবে ? এই বিশালশূন্যতা নিয়ে দিনের পর দিন কেমন করে কাটাবে যখন প্রকৃতি তার সব কিছু সৌন্দর্য নিয়ে অবিরাম গতিতে বয়ে চলবে, তাকবে তাকে তার সাথে চলতে ? পারবে না—পারবে না কুন্তলা এই শূন্যতার মাঝে প্রতিটি মুহূর্ত গুনতে। সে পাগল হয়ে যাবে। এই বিরাট শূন্যতা তার বুকের পর চেপে বসে দম বন্ধ করে দেবে। সে কিছুতেই এই শূন্যতাকে বয়ে বেড়াতে পারবে না। কাকে, কাকে সে ডাকবে এই বোঝার ভার হালকা করতে ? কে সে ? দেবনাথ ? সেই ভীরু শান্ত দেবনাথ ? হাঁ তাকেই তার প্রয়োজন। এই নিঃসীম শূন্যতার মাঝে দেবনাথকেই তার প্রয়োজন।

সীমার সাহচর্যে দিনগুলো যেন একটা করে পাখীর পালকের মতো উড়ে যেতে লাগলো। শৈলেনের জীবনে এ অভিজ্ঞতা প্রথম। সীমারও। আর তাই তারা দু'জন নিবিড়ভাবে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরেছে একেকটি অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণ আস্বাদের পর। বিতৃষ্ণা আসবার সময়ই পায়নি। যে সামান্য বাধা মাঝে মাঝে দেখা দিতো ওরা দু'জন তাকে অনায়াসেই অতিক্রম করে যেতো-তাদের অপার কৌতূহলে। কিন্তু—

মাঝে মাঝে শৈলেনের যে কি হয় ? সে একান্তে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আসে—যেন তাকে বাইরের সব কিছু বিপদের মুখোমুখি হতে দিতে ভয় পায়। ভাবে কই সে তো তৃপ্ত হতে পারছে না। যতদিন যাচ্ছে তার তৃষ্ণা বেড়েই চলেছে ! একেকটা নতুন ঘটনা তার সে তৃষ্ণার হোম-বহ্নিতে নতুন ইন্ধন জোগাতো, সে আরও পাগল হয়ে যেতো তারপরে কি আছে এ কথা জানবার উদগ্র কৌতূহলে। সীমা মাঝে মাঝে হাঁফিয়ে পড়তো। তারও কৌতূহল ছিলো সত্যি,—কিন্তু নারীর স্বভাবজ দৃষ্টির ফলে যে কোন কোন সময় ক্লান্ত হতো—পারতো না শৈলেনের উদ্দাম গতির সঙ্গে তাল রাখতে। কোন কোন সময় শৈলেনকে সে পিছুপানে টানতো—তার অস্থিরতার রাশ টেনে ধরতো।

—শৈলেন, লক্ষ্মীটি আর নয় আজ এই থাক—

—কেন তুমি ভয় পেলে ? আমার যে ঘুমন্ত তৃষ্ণাকে জাগিয়ে তুলেছো তাকে তো তৃপ্ত করতে পারছি না সীমা। সে শুধু চাইছে আরো, আরো কিছু।

—কিন্তু তার জন্যে এত অধৈর্য হচ্ছো কেন ? সমুখে

যে সমস্ত জীবনটাই পড়ে আছে। একেক দিন এক একটা করে কাছে টেনে নিয়ো। এতে জীবনের অনির্দেশ্য গতি নির্দেশ পাবে, স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করবে।

শৈলেনের রাশ বাঁধা পড়তো। কিন্তু সে কতটুকু সময়ের জন্যে? আবার কোন মুহূর্তে তার বুকে উন্মাদনার সুর বেজে উঠতো। সে পারতো না। কিছুতেই নিজেকে সামলিয়ে রাখতে পারতো না। সীমাকে ষড্ড ছোটো মনে হতো। মনে হতো সীমা পারবে না তার গতির সঙ্গে তাল রাখতে—ধীর সংযমী সীমা তার অসংযমকে ক্ষমতে পারবে না। বরং বাধা দেবার চেষ্টা করে আরও অস্থির করে দেবে। অসম্ভব—সে পারবে না, পারবে না এই আবেগ বুকে চেপে রাখতে।

দেবনাথ কি কুন্তলাকে তার প্রার্থিত তৃপ্তি দিয়েছিলো? হয়তো দিয়েছিলো। মানুষ-মানুষীর সাধারণভাবে যা প্রয়োজন তা হয়তো দেবনাথ কুন্তলাকে দিয়েছিলো। নারীর যা স্বাভাবিক আকর্ষণ সেই ঘর, নীড়ের স্বপ্ন, ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি আর মিলিত জীবনের স্বাক্ষর। কিন্তু এই কি সব শেষ? এই কি কুন্তলার একমাত্র প্রার্থিত কামনা? সে কি এর জন্যই ব্যাকুল হয়ে দেবনাথের কাছে ছুটে এসেছিলো?

একি শুধুমাত্র শূন্য স্থান পূরণ? একজন যাবে, আরেক জন এসে সেই জায়গা, ফাঁক পূর্ণ করবে? তা'হলেই সব কিছু পরম পাওয়া হবে?

না তা নয়। তা কিছুতেই নয়। কুন্তলা এ চায়নি। সে দিনের সেই তীক্ষ্ণ নিঃসীম মুহূর্তে হয়তো একজনকে তার বুকের নিভৃতে চেয়েছিলো, ঠিক যেমনিভাবে প্রিয়তম তার কাছে কাছে সর্বক্ষণের সান্নিধ্য দিয়ে থাকতো। কিন্তু কই দেবনাথ তো সেই শূন্যতাকে পরিপূর্ণ করতে পারলো না। বরং তার আশ্চর্য শীতলতা দিয়ে কুন্তলাকে আরো নিজের গভীরে ঠেলে দিলে। কুন্তলা বুঝতে পারে না সে কি করবে? ভুল, ভুল, মস্ত বড় ভুল সে করেছে। সে দিনের তীব্র বঞ্চনায় সে যাকে সামনে পেয়েছে তাকেই ডুবন্ত মানুষের মতো কূটোর আশ্রয়ে আঁকড়ে ধরেছে, তীরে পৌঁছে দেবার জন্যে কিন্তু সে আশ্রয় তাকে তীরে পৌঁছায়নি, বরং নিজের আবর্তে আরো ঘূর্ণিত করেছে দিনের পর দিন।

সে চেষ্টা করেছে দেবনাথকে তার সুরে সাড়া দেওয়াতে। কিন্তু দেবনাথ আশ্চর্য নীরব। তার নীরবতা শুধু কথায় নয় শুধু কাজে নয়—চোখেও। কতোদিন কুন্তলা সেছে তীব্র আবেগ নিয়ে, দারুণ প্রতিজ্ঞায় পূর্ণ হয়ে, আজ সে দেবনাথের শৈত্য গলাবেই। কিন্তু তার দুটি আশ্চর্য চোখের দিকে তাকিয়ে সে শিহরিয়ে এসেছে। মুখের কথা বেরোতে পারে নি; বেরোলেও অর্থহারা হয়ে দেবনাথের নীরবতা আরো গম্ভীর করেছে।

মাঝে মাঝে সে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছে। দেবনাথ কি তাকে নিয়ে তৃপ্ত নয়? যদি না হয় তবে কেন? দেবনাথের সঙ্গে তার পরিচয় স্বল্প দিনের নয়। দেবনাথ তাকে জানতো—তার অনেক কাজে দক্ষিণ সমর্থন জানিয়েছে, উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে দিয়েছে—সব শেষে সেই দারুণ দুর্দিনে দেবনাথ তাকে পরম অন্তরঙ্গতার কাছে টেনে নিয়েছে এতটুকু দ্বিধার ছাপ কুন্তলা তার মাঝে পায় নি। তবু কেন দেবনাথ এমনি শীতল?

কুন্তলা দেবনাথের মনের গতি বুঝতে চেষ্টা করেছে। অনেক বার নীরবতার মর্মমিতা করতে এগিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য! দেবনাথ তাতেও সাড়া দেয়নি, বরং পাথরের মতো নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। কুন্তলা হার মেনেছে—সে পারেনি।

কুন্তলা হাসতে ভুলে গেলো। সে পারেনা তেমনি ঝর ঝর করে উজ্জ্বল হয়ে, হাসি সব কিছু চারিদিকের রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়াকে এক নিমিষে মিলিয়ে দিতে। সারাক্ষণের জন্যে একটা পাথরের মতো তার তার বুকে চেপে বসে থাকে। জীবন যেন শুধু একটা দিকেই গতি বেগ সঞ্চয় করতে লাগল, সে দিকে মৃত্যুর হিম শীতল অন্ধকার।....

ঠিক এমনি এক রুদ্ধশ্বাস, অস্থির দিনে কুন্তলার সাথে পরিচয় শৈলেনের। কুন্তলার মাঝে যে বন্যতা একটু আলোর জন্যে আকুলি-বিকুলি করছিলো, তার যেন এক রশ্মি পেল সে শৈলেনের মধ্যে। শৈলেন তখন অবদমনের

শেষ পর্যায়ে। সে ভাবে এ যদি না হতো হবেই ভালো ছিলো। আজ তার হৃদয়ে সেই ঘুমন্ত তৃষ্ণা জেগেছে—তাকে সীমা তৃপ্ত করতে পারছে না, অথচ সে নিজেও যার কোন উপায়ে নিজেকে তার মুক্ত করতে।

—আচ্ছা দিদি বলোতো ভালবাসা মানুষকে এমনি করে মরীচিকার আশা দেখিয়ে ছুটিয়ে মারে কেন? আর নারীর এমনি ভীরু কেন?

কুন্তলা নিবিড় সহানুভূতিতে শৈলেনের দিকে তাকালো। আগেই সে শুনেছে তার মনের অস্থিরতা। সে জানে কি অসহ্য আবেগে শৈলেন সারাদিন কস্তুরী মৃগ হরিণের মতো ছুটে বেড়ায়। সে নিজেও একথা অনুভব করে, তাই একদিকে যেমন ব্যথা পায় তেমনি অন্যদিকে ভয়ও করে।

—শৈলেন, নারী স্বভাবতঃ ধীর। তারা, যখন তোমরা তৃপ্তির চরম শিখরে উঠতে চাও, তখন পথ চলা সুরু করে। তাই তোমার কাছে কাছে এমনি বড় মনে হয় দীমার সাহচর্য।

—কিন্তু আমি তো দেখেছি প্রথমে তারও কৌতূহল ছিলো, সে নিজে হতেই অনেকবার নতুন অভিজ্ঞতার দিকে এগিয়েছে।

—সে প্রথম যৌবনের কৌতূহল। কৈশোরের তীব্র কামনা, যা এতোদিন বদ্ধ ছিলো, কোন পথে বাহির পথ খুঁজে ফিরছিলো, তা যখন প্রথম মুক্তির আস্বাদ পায় তখন তো তীব্র হবেই। কিন্তু তারপর যে ভাঁটা এসেছে তাই তোমাকে এমনি আকুল করে তুলেছে।

—কিন্তু তুমি? তুমি কি নিজেও বিশ্বাস করো, অনুভব করো? আর সেই অনুভবকে নিজের জীবনে ব্যক্ত করো?

কুন্তলা অন্যমনস্ক হলো! সে—! সত্যিই তো সে কি করে? সে কি এমনি করে তার কৌতূহলকে দাবিয়ে রেখেছে? না বরং যৌবনারম্ভের অস্বাভাবিক শুষ্কতাই তাকে নিজের গণ্ডীতে ঠেলে দিয়েছে। তবে সে কি মিথ্যা বলছে। সে কি নিজেকে দিয়ে নিজেকেই ধাপ্পা দিচ্ছে?

শৈলেন তখনো তার মুখের দিকে তাকিয়ে। কি ভাবছে—

কুন্তলা কি সত্যিই যা বললো তা বিশ্বাস করে? যদি করে তবে কেন তার সঙ্গ এত আগ্রহ ব্যাকুল হয়ে কামনা করে? সে কি এক মুহূর্তের জন্যেও একথা মনে করে না, শৈলেনের যে ব্যথা তা তারও আছে। সেও এমনি অহরহ নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে? যদি তার এই ধারণা সত্য হয়, তবে কেন এই মিথ্যা আত্মপ্রতারণা? কেন কুন্তলার এই আত্মনিপীড়ন? সে কি পারে না শৈলেনকে সব কিছু বাধার ভার দিতে। কেন পারেনা? লোক ভয়? সমাজ নিন্দা? এ কি সত্যই একটা সমস্যা? হঠাৎ তার চমক ভাঙলো, কুন্তলা বলছে,—জানো শৈলেন আমরা প্রত্যেকেই নিজের সঙ্গে অবিরত প্রতারণা করে চলেছি। কেউ সজ্ঞানে করে নিজের ভীরুতা ঢাকতে, কেউবা অজ্ঞানে করে আত্মঅহংকারে। আসলে প্রত্যেকেই আমরা ভীরু—কিন্তু প্রকাশে করতে ভয় পাই।

—তাহলে ভীরুতাই শেষ কথা? জীবনের এই কি শেষ গন্তব্য? যা মানিনা তাই মানিয়ে চলতে হবে, যা ত্যাগ করবার জন্যে ছটফট করে মরি তাই কুষ্ঠের মতো আজ জড়িয়ে থাকতে হবে? আর সমস্ত কিছু ব্যর্থতা নিয়ে শুধু অভিনয় করে যেতে হবে?

—শৈলেন! নিবিড় করে ডাকলো কুন্তলা।

—কুন্তলা—মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো? মনে হয় সব কিছু দু'হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলি। যা কিছু আবরণ আছে তোমার আমার মাঝে—যে বাধা অচলায়তনের মতো দাঁড়িয়ে আছে—। কিন্তু সাহস পাইনা বড় ভয় করে। একা এ সংস্কারের সাথে লড়াই করতে। হয়তো হতাশা আসবে, ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবো। তুমি পারো, পারো, কুন্তলা এ কাজে, এ লক্ষ্যে পৌঁছুতে সাহায্য করতে? শৈলেন অধীর প্রত্যাশায় কুন্তলার দিকে চাইলো।

কুন্তলা এগিয়ে এলো। তেমনি আন্তরিক চোখে তাকিয়ে তার গলায় দুটি হাত জড়িয়ে বলল, শৈলেন আজ মনে হচ্ছে আমি সেই পাঁচ বছর আগেকার জীবন ফিরে পেয়েছি—যখন প্রথম প্রিয়ব্রতের সঙ্গে আমার পরিচয়। আমার মনে হচ্ছে জীবনটা বুঝি ব্যর্থ নয়। সম্মুখে যে পথ

তা গন্তব্যকে শুধু দূর করবার জন্তে নয়—কাছে এগিয়ে নিয়ে আসবার জন্তেও বটে। কি যে ভাল লাগছে আমার তা শুধু আমিই অনুভব করছি।

শৈলেন পরম প্রশান্তিতে কুন্তলার বুকে মুখ রাখলো। সে তার মুক্ত। সীমা-না সীমার বাঁধনেই তার জীবন।

* * *

কুন্তলার সাহচর্যে শৈলেনের উদ্দাম রাশ বাঁধা পড়লো। সে স্থির হলো। কিন্তু সে কি তৃপ্তি পেলো? হ্যাঁ তৃপ্তি পেয়েছে বই কি? জিজ্ঞাসার অবসানে সে সাধারণভাবে পরিপূর্ণ তৃপ্ত। কিন্তু—তবু কোথায় যেন একটা অতৃপ্ত বাধা থেকে যায় যা সে মাঝে মাঝে অনুভব করে যখন মনের সঙ্গে মুখোমুখি হয়। ভাবে এই কি শেষ? এই বিপুল রহস্য রাজ্যের এই কি শেষ তোরণ? এরপর আর কিছু নেই শুধুমাত্র পুনরাবৃত্তি? তা হলে? এর মাঝেই সে নিঃশেষ, কুন্তলা ক্লান্ত—?

—কুন্তলা কদিন হতে লক্ষ্য করছি তুমি কেমন অন্যমনস্ক?

হ্যাঁ শৈলেন, ভাবছি জীবনের বৈচিত্র্যের কথা; আর সেই বৈচিত্র্য অতিক্রমের বিভিন্ন সুখ বেদনার স্মৃতি। মানুষ সামনে যা' পায় তাকেই সব কিছুর পরিপূর্ণতা বলে ধরে। তাই তো মাঝে মাঝে আশা ভঙ্গের বেদনা এত নিদারুণ হয়ে বুকে বাজে।

—তুমি কি আমাদের সম্পর্কের বিষয় কিছুই ইঙ্গিত করছো?

—একভাবে বলতে পারো। নিজের অভিজ্ঞতাটাই মানুষের জীবনে মূল নিয়ামক। তুমি তোমার দিক হতে ঠিক—আমি আমার। যুক্তিতে কোথায়ও গরমিল নেই, তবু মাঝে মাঝে যেন ছন্দপতন হয়ে যায়।

শৈলেন নিজের দিক হতে ভাবে সত্যিই তো। সে নিজেও তো এমনি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। ভাবে কিসের যেন অভাব বোধ তাকে পীড়িত করছে।

কুন্তলার ভাবনা অন্য পথে। সে ভাবে আজ তারা তৃপ্ত—কোন প্রশ্ন নেই, কিন্তু এ কদিনের জন্তে? দু দিন পরেই সমস্যা কাঁটার মতো মাথা তুলবে। শৈলেন এড়িয়ে যেতে চাইবে—সে এড়িয়ে যেতে পারবে না। এপার হতে টানবে কাঁটার মুখোমুখি না হতে। সে চায় ভবিষ্যতের অঙ্গীকার—শৈলেন চায় অফুরন্ত জিজ্ঞাসার উত্তর। শৈলেনের রক্তে যে যাযাবরতা আছে যা তাকে নিত্য নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন করে, তা কতোদিন সে তৃপ্ত রাখতে পারবে? শৈলেন কি বাঁধা পড়বে তার কাছে? না পড়বে না। কুন্তলা স্পষ্ট বুঝতে পারে শৈলেন পারবে না একই বৃত্তের চার পাশে আবর্তন করতে।

—তুমি কি মনে করছো আমরা সেই পুরাতন পথ ধরেই চলেছি। অর্থাৎ নিজেরা প্রতারণা সুরু করেছি?

—তাই—তাই বোধ হয় শৈলেন আমি পারছি না শুধু 'আজ'-কে নিয়ে নির্ভাবনা হয়ে থাকতে—পারছি না কালকের ভাবনা হতে নিজেকে নিবৃত্ত করতে। তোমার কথা যতো না ভাবছি তারো চেয়ে বেশি ভাবছি নিজের কথাই—।

শৈলেন একটু চমকে উঠলো। সত্যিই তো। শৈলেনও সে কথা ভাবছে। ভবিষ্যতের যে ভাবনা তাকে মাঝে মাঝে স্তব্ধ করে দেয়, তাতে কুন্তলার স্থান নেই সে যে নিজেকে নিয়েই বিব্রত।

আশ্চর্য কুন্তলা—আমিও সেই কথাই ভাবছি। সীমার কৌতূহল ছিল না, তোমার কৌতূহল আছে। কিন্তু তুমি নিঃশেষিত। আমি সীমার অভাব তোমার মাঝে খুঁজে পেয়েছিলাম কিন্তু সীমা যে অংশ পূর্ণ করেছিলে তুমি তাতে কোন যোগ করতে পারো নি আবার তোমার ক্ষেত্রে তুমি অনন্তা। তোমাদের দু'জনেই নিজেদের দিক থেকে সম্পূর্ণা, কিন্তু আমি এক ছাড়া অপরকে ধরতে পারছি না।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাস্তার বাতিগুলো একে একে জ্বলে উঠলো। শৈলেন সেই দিকে অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়েছিল সে উঠে দাঁড়ালো। জিনটার সামনে কয়েকটা বাতির প্রতিচ্ছায়া পড়েছে শান্ত জলের বুকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে ভাবলো এই সত্তা চেতনার তটে এক নতুন ঝাড় বাতি জ্বলে উঠলো কতকটা বাতির মতোই। যেটুকু তার ক্ষমতা তাতেই সে

শৈলেন মৃদু হাসলো। বললো, চলো কুন্তলা তোমাকে পৌঁছে দিই। ঠিক তেমনি তারা দুজন এক বছর আগেকার মতো পথের কাদের আকাশ। গত বারের কথা শৈলেনের মনে এলো। সেবার কি অমিল হয়েছে না সে এমনি দিনে ঘুরে বেড়িয়েছিল। সেদিন সে ছিলো একা। আজও একা কিন্তু কত পার্থক্য! সেদিন তার সঙ্গে ছিলো না কিছুই। আজ সে পরিপূর্ণ। নাই বা থাকলো সীমার শান্ত স্নেহ টান—নাই বা থাকলো কুন্তলার উদ্দাম উষ্ণতা তবু সে পেয়েছে দু'জনকেই পেয়েছে। তারা দু'জনেই তাকে নিরন্তর এগিয়ে দেবে জীবনের নবতর অভিজ্ঞতার দ্বারে—নতুন এক পথ ধরে সে পথ দূরকে নিকট করে, নিকটকে কিছু দূরে—কিছু অজানা দিয়ে পথের নেশায় মাতিয়ে চালাবে। দীপন নেই, কিন্তু অদৃশ্য ভাবে তাকে নিয়ন্ত্রিত করে সর্বক্ষেত্রে। সে পরিপূর্ণ, শুদ্ধ, মুক্ত।

ভবিষ্যতের চক্ষু সজল হয়ে ওঠে

শৈলেন আবার কথা কয়

পথের চালকা ছাওয়ায় পা ফেলে চললো শৈ

সদ্য প্রকাশিত

মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের

রাষ্ট্রনীতি

রাষ্ট্রনীতির মূল কথা সহজ ভাষায় ও সরলভাবে বিভিন্ন প্রবন্ধে বর্ণিত।
ও সমাজনীতি সম্বন্ধে এই ছোট সংকলন গ্রন্থে সকলেই শিক্ষা ও প্রেরণা লাভ করিবেন

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

প্রগতি প্রকাশক লিমিটেড

৬১-এ, বলরামপাড়া রোড, কলিকাতা-৩

লোকমান্য তিলক ও জাতীয়তার উন্মেষ

জানাঞ্জন পাল

অনেক দিনের কথা, কিন্তু ভুলবার নয় বলে ভুলে যাই নি, মনে আছে স্পষ্ট। লোকমান্য তিলকের বাড়ীতে পুণায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ তিলকের আমন্ত্রণে বোম্বাইয়ের কংগ্রেসের পর (১৯১৮ সাল) পুণায় এসেছেন, তিলকের অতিথি। সকাল বেলা; তিলক ভিতর থেকে বাহিরে এলেন, দোতলায় একটা বড় ঘরে অতিথিরা আছেন। এরই একতলায় "কেশরী" ও ইংরেজী "মারাঠা" পত্রিকার আফিস। প্রেসও এই বাড়ীতে। লম্বা বারান্দা দিয়ে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে দেওয়ালে টাঙ্গান তাঁর স্ত্রীর ছবি দেখিয়ে দেশবন্ধু দাশকে বললেন—'আমার স্ত্রীর অবশিষ্ট যা আছে তা এই ছবি।' তিলক যখন দীর্ঘ কারাবাসে মান্দালয়ে, তখন তাঁর সহধর্মিনী স্বর্গতা হন।

বাহিরে থেকে তিলককে যেমন গড়াইয়ে প্রকৃতির বলে মনে হয়, কাছে দেখলে ঠিক তার উল্টা ধারণা হয়। এত নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির—রুক্ষতার কোন ছাপ পর্যান্ত চেহারায় নেই। কথাগুলি ধীর, কারো উপর রাগ বা দ্বেষ আছে, লেশ মাত্র তা মনে হয় না। সেদিন বিশেষ করে মনে হয়েছিল—এই সংযতবাক্, স্নিগ্ধ-চরিত্র পুরুষটি রাজনীতির কলহ কোলাহলে এলেন কেন? আর যদিবা এলেন এর উত্তেজনা এঁকে স্পর্শ করে না এই বা কিরূপে সম্ভব? ভিতরের একটা তীব্র বেদনা বা অনুভূতি তিলকের যুগে অনেককে রাজনীতির মধ্যে এনে ফেলেছিল। স্বধর্মে তাঁদের কেউ প্রেমিক ভক্ত, কেউ বা জ্ঞানের সাধক। দেশের প্রয়োজনে ও নিজের অন্তরের বেদনায় রাজনীতির আবর্তে এসে পড়েছেন। বাংলার অশ্বিনীকুমার দত্ত ও মহারাষ্ট্রে তিলক এর উজ্জ্বল দু'টি দৃষ্টান্ত। কিন্তু তিলকের রাজনৈতিক জীবনের মূল উপাদান রূপে আর একটা বস্তু ছিল। এটা ভারতের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ।

এই জাতীয়তা বোধটা সাধারণ স্বদেশ-প্রীতি থেকে ভিন্ন। উচ্চ প্রকৃতির চরিত্রে স্বদেশ-প্রীতি কম বেশী আপনি ফুটিয়া উঠে। পরাধীন জাতির কবির কণ্ঠে ইহা ধ্বনিত হয়। হেমচন্দ্রের

'বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?'

রঙ্গলালের

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?

বা গোবিন্দচন্দ্র রায়ের

কত কাল পরে বল ভারত রে
এ দুঃখ সাগর সাঁতারি পার হবে।

কবিতা বা সঙ্গীত এই সাধারণ স্বদেশ-প্রীতিকেই আমাদের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছিল। পরাধীনতার শৃঙ্খল প্রতি পদে কত যে দুঃখ এনেছিল আমাদের জীবনে তার ছবি মনোমোহন বসুর কবিতায় ফুটে উঠেছিল—

ভীতি কর্মকার করে হাহাকার,
ছুতা নাতা টেনে অন্ন মেলা ভার
দেশী বস্ত্র-অস্ত্র বিকায় নাকো আর
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন।

আমার কথা ধ্বনিত হয়েছিল
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে
"মিলে সবে ভারত সন্তান,

একতান মনপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।

নাটকেও এই স্বদেশ-প্রীতি প্রকাশ পেয়েছিল। উপেন্দ্রনাথ দাসের "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটকের প্রথম

'ভাই কি ভারতী তিনি ভারত দুখ চাকিল'

এই সাধারণ দেশপ্রেমেরই গান।

যেমন সাহিত্য তেমন রাজনৈতিক কর্ম-চেষ্টায় এই সাধারণ স্বদেশ-প্রীতি আমাদের চৈতন্যে প্রথম চেতনার সঞ্চার করে। সুরেন্দ্রনাথ আনন্দমোহন বসুর সাহচর্যে কলিকাতায় যেদিন ১৮৭৬ সালে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সংগঠন করেন; এবং ম্যাট্‌সিনি, ভারতবর্ষের ইতিহাসের শিক্ষা, শিখ শক্তির অভ্যুদয়, শ্রীচৈতন্য আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতার দ্বারা এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। ১৮৭৬ সালে ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা হয়। ভারত-সভা রাষ্ট্রীয় কর্মজীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ১৮৭৬-১৮৮৫ এই বৎসরে এই প্রতিষ্ঠান কেবল বাংলার নয়, সমগ্র উত্তর ভারতে এবং কিছু পরিমাণ বোম্বাই ও মাদ্রাজ অঞ্চলেও শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে জাতীয় মর্যাদাবোধ অভূতপূর্ব রূপে জাগাইয়া তোলে। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্ম হয়; এবং সমগ্র দেশের সমবেত রাষ্ট্রকর্ম জাতীয় মহাসমিতির মাধ্যমেই চালিত হইতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারত-সভার কর্মচেষ্টার ফলে জাতীয় চেতনার ভাব ও আদর্শের যে উচ্চ সুর জাগিয়া উঠিয়াছিল—বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃত্ব ও বিশিষ্ট নেতাদের সহযোগে পরিচালিত কংগ্রেসে তাহা অনেকটা মৃদু হইয়া পড়ে। একথা বিপিনচন্দ্র পাল সুরেন্দ্রনাথের চরিত-চিত্র অঙ্কনের সময় স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছেন।

"In fact, there is every reason to think that if the Indian National Congress had not been started under much greater influential auspices than what Surendranarh or his friends had then secured for their organisation, and if this new institution, with all its glamour of wealth and rank, and its character as an all-India organisation had not captivated the imagination of the educated classes, and diverted the course of our political evolution from the less ostentatious but decidedly more vital channels along which it was being quietly directed by the Indian Association—our political activities and organisations would have been, I think, much stronger and of a far more constitutional character than what they are to-day."

মর্মার্থ: দেশের প্রখ্যাত ও বিত্তশালী নেতাদের দ্বারা জাতীয় মহাসমিতি সারা ভারতের প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'লে শিক্ষিত সাধারণের মন সহজেই এর প্রতি আকৃষ্ট হ'ল। ভারত-সভার এরূপ পদ বা প্রতিষ্ঠা ছিল না; কিন্তু রাষ্ট্রকর্মে যে বলিষ্ঠ ধারা ইহা প্রবর্তন করেছিল, কংগ্রেসের হাতে তা অনেকটা ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

কিন্তু ভারত-সভার রাষ্ট্রীয় আন্দোলন বা কংগ্রেসের রাষ্ট্র কর্ম-চেষ্টা সাধারণ দেশপ্রীতিকেই আশ্রয় ও অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। গভীর স্বদেশ-প্রেম দেশের সাধনার সঙ্গে যুক্ত না হ'লে সত্যভাবে গড়ে উঠে না। এদেশের সনাতন সাধনার সঙ্গে বাপাতে প্রভৃতি কয়েকজন ছাড়া কংগ্রেসের নেতাদের কোন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, এমন বোধ হয় বলা যায় না। আর দেশের সাধারণের জীবনধারা—তাদের দুঃখ ও দুর্বলতা, আশা ও আকাঙ্খা বা অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা—এ সকলের সঙ্গে অবশ্য কারো বিশেষ পরিচয় ছিল না।

প্রায় ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত এইভাবে রাষ্ট্রীয় কর্ম-চেষ্টার ধারা মৃদুমন্থর গতিতে চলতে থাকে। ক্রমে আর এক নতুন চেতনার উদয় হয়। ইহাই জাতীয়তা-বোধ। দেশের সাধনার সঙ্গে ক্রমে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থেকে এই নতুন স্বাজাত্যাভিমান জেগে ওঠে। চিন্তায় ও আদর্শে দেশের সকলকে না নিলে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হয় না। রাষ্ট্রচিন্তায় ও রাষ্ট্রকর্মে দেশের সর্বসাধারণের বিশিষ্ট সত্তা সর্বপ্রথম বোধ হয় আমাদের দেশে স্বীকৃতি পেলো। এভাবে যে দেশপ্রেম জাগ্রত হল তা

পূর্বের সাধারণ স্বদেশপ্রীতি থেকে ভিন্ন। দেশের মাটীর সঙ্গে এই নতুন স্বদেশ-প্রেমের নিবিড় সম্বন্ধ; এই মাটিতেই তার জন্ম ও পুষ্টি। একে রাষ্ট্রনীতিকেরা ইংরেজীতে 'New Patriotism' নাম দিলেন। ১৯০২ সালে সাপ্তাহিক "নিউ ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় লেখা হল :—

"Agitation is not, in any sense, a test of true patriotism. That test is self-help and self-sacrince; and the time perhaps is coming, faster than we had thought, when Indian patriotism will be put to this test. Will it be able to stand it? Time will show."

মর্মার্থ:—প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমের পরীক্ষা কোন অর্থেই রাষ্ট্রীয় আন্দোলন নয়। স্বদেশ প্রেমের পরীক্ষা হয় আত্ম-নির্ভরতায় ও আত্মত্যাগে। এমন দিন শীঘ্র আসছে যখন আমাদের স্বদেশ-প্রেম এই পরীক্ষায় সম্মুখীন হবে। ভবিষ্যই জানে আমরা তাতে উত্তীর্ণ হতে পারব কি না।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। তাঁর 'বন্দেমাতরম' গান এই নব জাতীয়তার মন্ত্ররূপে গৃহীত হয়। এই নব জাতীয়তাই লর্ড কার্জনের আমলে 'বঙ্গ ভঙ্গ' আন্দোলনকে আশ্রয় করে বাংলায় এক অভূতপূর্ব প্লাবনের সৃষ্টি করে। লোকমান্য তিলক এই নবজাতীয়তাকে তাঁর দেশসেবার ধর্মরূপে গ্রহণ করেন; ইহাকে সারা ভারতে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী রাষ্ট্রকর্মের মূল প্রয়াস হয়।

আমাদের দেশের পূর্বের সাধারণ দেশ-প্রীতি ও এই নূতন স্বদেশ-প্রেম সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল ১৯০৪ সালে এক প্রবন্ধে লেখেন—

"There was patriotism of a kind among the educated classes 30 or 40 years back. It was, however, inspite of its sincerity and exuberance, something positively more outlandish than indigenous, and decidedly more sentimental than real...We were then under the spell of Europe...Our old admiration for Europe has been largely supplanted now by an ardent love for our own country..."

অর্থ:—ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে আমাদের দেশে যে দেশ-প্রীতি জেগে উঠেছিল তাতে উচ্ছ্বাস বা আন্তরিকতা থাকলেও, এ অনেকটা বাহিরের বস্তু ছিল, দেশের মাটির সঙ্গে এর যোগ ছিল কম; আর সেজন্য ইহা বাস্তবতর হয়নি; কল্পনাই এতে বেশী ছিল। য়ুরোপের মায়ায় তখন আমরা মুগ্ধ ছিলাম। আমাদের এই অস্বাভাবিক য়ুরোপ-প্রীতির স্থান এখন বাস্তব স্বদেশ-প্রীতি অনেকটা গ্রহণ করেছে।"

অবশ্য পূর্বের সাধারণ দেশ-প্রীতিই এই নতুন স্বদেশ-প্রেমের ভূমি প্রস্তুত করে রেখেছিল। যেমন বাংলা দেশে তেমনি মহারাষ্ট্রে—বিশেষতঃ মারাঠী শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে দেশাত্মবোধের উন্মেষ ধীরে ধীরে অনেক দিন ধরে হচ্ছিল; দেশের জন্য নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ত্যাগের শিক্ষা তাঁরা পান মহামতি রাণাডে প্রমুখ মনীষীর জীবনে ও কর্মে। 'ডেকান এডুকেশন সোসাইটি', 'পুণা সার্বজনিক সভা' প্রভৃতি এই স্বার্থ-ত্যাগের প্রেরণার জন্ম দেয়, এবং মেধাবী মারাঠী যুবকদিগকে দেশসেবায় আত্মনিয়োগের দীক্ষা দেয়। বাংলায় রামমোহন থেকে সুরেন্দ্রনাথ পর্যন্ত নায়কেরা নবজাগরণের মুখে যে কাজ করেছিলেন বোম্বাই, অঞ্চলে প্রধানতঃ রাণাডের নেতৃত্বে অনেকটা তারই সূচনা হয়। গোপালকৃষ্ণ গোখলে লোকমান্য তিলক উভয়েই এই পূর্বের সাধনার ফল কিন্তু গোখলের আদর্শ য়ুরোপকে অনুকরণ করে ইংরেজের সাহচর্যে ও সহযোগেই ভারতের কল্যাণ এই নীতি অনুসরণ করে। ইংরেজী শিক্ষার সাধারণ ও স্বাভাবিক ফল ইহাই। লোকমান্য তিলকের জীবনের প্রেরণা ছিল এদেশের সনাতন সাধনা, ও তাঁর রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্র রচিত হয় এই দেশের ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় কেবল নয় কিন্তু তথাকথিত অশিক্ষিত সর্ব-সাধারণকে লইয়া। দেশের সাধারণকে রাষ্ট্রীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবার জন্য তিনি গণপতি উৎসব, শিবাজী উৎসব ও ভবানী পূজার প্রবর্তন করেন। আর এই কারণেই তিনি নতুন জাতীয়তার আদর্শকে সহজে ও সমস্ত অন্তরে গ্রহণ করে সারা ভারতে প্রতিষ্ঠা করতে

পেয়েছিলেন।

তিলকের সঙ্গে বাংলার একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, কেবল ব্যক্তিগত সম্পর্কের নয়, আদর্শের। এই নতুন জাতীয়তার জন্ম হয় বাংলায়। শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৮ সালে বোম্বাইয়ে "বর্তমান অবস্থা" সম্বন্ধে এক বক্তৃতায় বলেন:

"There is a creed in India to-day which calls itself Nationalism, a creed which has come to you from Bengal What is Nationalism? Nationalism is not a mere political programme. Nationalism is a religion that has come from God...Nationalism is immortal; National sm cannot die, because this no human thing .....it is God who is working in Bengal."

মানে: "এক নতুন মতবাদ ভারতে প্রচারিত হয়েছে—তার নাম জাতীয়তা। এই মতবাদ বাংলাদেশে উদ্ভূত হয়। জাতীয়তা কি? জাতীয়তা একটা রাজনৈতিক কর্মপন্থা কেবল নয়। এটা একটা ধর্ম, ভগবানের সৃষ্টি। জাতীয়তার মৃত্যু নাই, এ অমর; এটা কোন মানুষ তৈরী করেনি; বাংলাদেশে ভগবানই কাজ করছেন।"

বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর "রাষ্ট্রনীতি" বইয়ে সংগৃহীত "স্বাধীনতার আদর্শ" নামে প্রবন্ধে লিখেছেন:

"আমাদের বর্তমান জাতীয় সাধনার বা স্বাপনা-লিজমের উৎপত্তি এই বাংলা দেশে। মহারাষ্ট্রীয় লোকনায়ক বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয় আপনার আলোকসামান্য প্রতিভা প্রভাবে বাংলার এই নতুন চিন্তা ও সাধনার পরিচয় পাইবা মাত্রই এই নব জাতীয়তা বা স্বাপনালিজমকে আধুনিক যুগের ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির স্বভাবরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।"

ভারতের নব জাতীয়তার ত্রিমূর্তি হিসাবে এক সময়ে "লাল-বাল-পাল" বলে যে তিন জনের নাম একসঙ্গে গ্রথিত হয়েছিল তার হেতু এই ইতিহাসটুকু জানলে বুঝতে পারা যায়। বাংলায় বিপিনচন্দ্র পাল এই জাতীয়তার তত্ত্বকে চিন্তার দ্বারা পরিস্ফুট করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। লালা লাজপত রায়ের দ্বারা ইহা পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়ে। আর লোকমান্য তিলক সমস্ত ভারতে ইহার প্রধান নায়ক ছিলেন।

বাংলায় ও ভারতে এই নব জাতীয়তা আরও দুই জনের দ্বারা অসাধারণ পুষ্টিলাভ করে। শ্রীঅরবিন্দের চরিত্রে, ত্যাগে, বিদ্যায় ও সাধনায় এই নব জাতীয়তা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা ও প্রবন্ধ অবিশ্রান্ত ধারায় বর্ষিত হয়ে এতে অভূতপূর্ব প্রেরণার সঞ্চার করে। পূর্বের সাধারণ দেশ-প্রীতির তুলনায় নতুন স্বদেশ-প্রেমের গভীরতা যে কত বেশী, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানগুলি মনে করলেই সহজে তা ধরা পড়ে। তাঁর এই সময়ের অনেক গানের মধ্যে

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে।"

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।"

কিম্বা বেদনার সুরে ভরা,

যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে
হে মোর স্বদেশ,
মোরা হারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে
পরি তারি বেশ।"

বা,

"(তবু) পারিনে সঁপিতে প্রাণ!
পলে পলে মরি সেও ভাল, সহি পদে পদে অপমান।"

প্রকৃত গানে ও কবিতায় যে স্বদেশ-প্রেম ফুটে উঠেছে তা পূর্বে ছিল না।

তিলক দেশের সাধারণকে এই জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই নতুন স্বাদেশিকতাকেও দেশের সর্বসাধারণের জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিলক নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, বাহিরের আবরণে গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তাঁর গোঁড়া হিন্দুয়ানীর মূল প্রেরণা, মনে হয়, এই স্বাদেশিকতা ছিল।

শিবাজী উৎসব কেবল মহারাষ্ট্রে নয়, বাংলাতেও

অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথের শিবাজী সম্বন্ধে বিখ্যাত কবিতা এই সময়ে লেখা হয়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোন গোঁড়ামির লেশমাত্র ছিল না। কিন্তু তিনিও ছত্রপতি শিবাজীর হিন্দু রাজ্য গঠনের চেষ্টাকে ভারতের নতুন জাতীয়তার প্রেরণারূপে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হননি। বোঝা যাবে—

বিপিনচন্দ্র পালও চিরদিন বিদ্রোহ করেছেন গতানুগতিক ধর্ম ও সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে। ১৯০৬ সালে শিবাজী উৎসব ও ভবানী পূজা সম্বন্ধে প্রবন্ধে তিনি লেখেন :

"এবারকার (১৯০৬) শিবাজী-উৎসবের বিশেষত্ব ইহার হিন্দুত্ব।...রাজকীয় অত্যাচারের প্রতিবিধানই শিবাজীর জীবনের মুখ্য লক্ষ্য বা একমাত্র শিক্ষা নহে। মোগল অত্যাচারের প্রতিরোধ শিবাজীর জীবনের অভাবাত্মক দিক।...শিবাজী মহারাজের জীবনের ও চরিত্রের ভাবের ও আদর্শের একটা বিরাট ভাবাত্মক দিক ছিল। আমরা সেই দিকটা ধরিয়াই তাঁহার নামে একটা জাতীয় মহোৎসবের সূচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।...শিবাজী মহারাজ হিন্দু সমাজে এক বিরাট ও উন্নত রাষ্ট্রতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।..."

"ধর্মকে যদি জাতীয় জীবনের বাহিরে না রাখিতে হয়, তবে হিন্দু-মুসলমানে মিলিত হইয়া ভারতে এক বিশাল জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হইবে কিরূপে? ইহাই বর্তমান যুগের প্রধান সমস্যা।...ভারতের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন 'ফেডারেশনের' আদর্শে গঠিত হইবে। এই জীবনের এক অঙ্গ হিন্দু, অপর অঙ্গ মুসলমান...। কিন্তু ইহারা প্রত্যেকে আপন-আপন বিশেষত্বকে রক্ষা করিয়া ও সেই বিশেষত্বেরই বিকাশ সাধনের দ্বারা, ভারতের সাধারণ জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট করিবে।...এই আদর্শ যাঁহারা আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহারা শিবাজী-উৎসবের হিন্দুত্বে ভারতে জাতীয় জীবন গঠনের ও জাতীয়-একত্ব সম্পাদনের কোনো ব্যাঘাত উৎপাদন করিবে, এরূপ আশঙ্কা করিতে পারেন না।"

আমাদের নতুন স্বাদেশিকতার বা জাতীয়তার আদর্শে হিন্দু প্রভাবের আধিক্য অস্বীকার করা যায় না। হিন্দু সংখ্যায় এদেশে বেশী, হিন্দুরা শিক্ষায় ও বিত্তে বড়, আর হিন্দুরাই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে বা স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, মুসলমানেরা পড়েননি। এ সকলকেই আমরা আমাদের জাতীয়তায় হিন্দু ভাবের প্রাবল্যের কারণরূপে নির্দেশ করি। কথাটা তলিয়ে দেখলে, মনে হয়, সবটা সত্য নয়। গতানুগতিক হিন্দুধর্মের প্রভাব আমাদের উপর অত্যন্ত প্রখর ছিল, এখনও আছে। এই গতানুগতিক ধর্মের প্রভাবে আমরা হিন্দু সাধারণকে শুধু বেঁধে রাখিনি, চেপেও রেখেছি। ইংরেজের সংস্পর্শে এ চাপ কমেনি, মনে হয়, আরও বেড়ে গিয়েছিল। মুষ্টিমেয় ইংরেজী শিক্ষিতদের এক অংশ য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন হয়ে দেশের সঙ্গে যোগই অনেকটা ছিন্ন করে দেন; বাকী তথাকথিত উচ্চবর্ণের শিক্ষিত হিন্দুরা গতানুগতিক হিন্দুত্বকে আরও বেশী আঁকড়াইয়া হিন্দু সাধারণের উপর এর চাপ পূর্বের অপেক্ষাও বোধ হয়, বাড়াইয়া দেন। আমাদের জাতীয়তা এক নব-জাগরণের ফল সত্য; কিন্তু এই জাগরণ তথাকথিত উচ্চবর্ণের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা অল্পবিত্ত হিন্দুদের মধ্যেই ফুটে উঠে তাদেরই মধ্যে বেড়ে উঠেছিল। আমাদের নতুন ধর্ম ও সামাজিক আদর্শ, সাহিত্যে, শিল্পে ও শিক্ষায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, সবই এই অল্প পরিসর ও স্বল্পসংখ্যক হিন্দুদের মধ্যেই অনেকটা আবদ্ধ থাকে। হিন্দু সাধারণকে আমরা এর সম্পূর্ণ ভাগী করতে পারিনি। জাতীয়তার আন্দোলনের এক বড় অংশ বিদেশী শাসনের অবসানের আন্দোলন। এই শেষোক্ত ভাগেই আমরা হিন্দু সাধারণকে সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসকে বলিষ্ঠ করতে চেষ্টা করি। হিন্দু সাধারণের মধ্যেও যদি নব জাগরণের পূর্ণ বান ডাকত, তাহলে আমাদের ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এই প্লাবনে পরিশুদ্ধ হয়ে নতুন রূপ নিত; জাতীয়তার আদর্শে সংকীর্ণ হিন্দুত্বের ছাপ থাকত না। এই প্লাবনে বিচারহীন ধর্মের খোলার পরিবর্তে হিন্দু সাধারণ সর্বাঙ্গীণ বাস্তব কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে পারত; রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তখন সাধারণ হিন্দু হিন্দুত্বের আবরণে আসত মানুষ হিসাবে

অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার টানেই আকৃষ্ট হয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ত। আর জাতীয়তাবাদী নেতারা তখন গতানুগতিক হিন্দু ধর্মের পুরা পার্বণের আশ্রয়ে সাধারণ হিন্দুর রাষ্ট্রীয় চেতনাকে জাগাতে এত ব্যগ্র হতেন না। এটা আমরা ভাবছি —যা হতে পারত কিন্তু হয়নি হিন্দু সাধারণের মনকে গতানুগতিক ধর্ম ও সামাজিক আচার থেকে অনেকটা মুক্তি দেবার জন্য বাংলায় শেষ আন্দোলন—চৈতন্যের আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রভাব ইংরেজ এদেশে আসবার আগেই ক্ষীণ হয়ে পড়ে। হিন্দু সাধারণের ধর্ম ও সমাজ জীবনে বা অর্থনৈতিক অবস্থায় কোন মূল পরিবর্তন আমাদের এ যুগে এখনও সাধিত হয়নি। প্রথমদিকের সমাজ ও ধর্ম সংস্কারকেরা বা স্বদেশী আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী নেতারা বা পরের জাতি-গঠন আন্দোলনের একচ্ছত্র নায়ক মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত সহকর্মীরা—কেহই এ পথে স্থায়ী ও সার্থক কিছু করতে পেরেছেন একথা বোধ হয় বলা যায় না। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকদের প্রেরণা ছিল য়ুরোপীয় আদর্শ, দেশের মাটিতে তা প্রাণ পায়নি। স্বদেশী যুগের নেতারা হিন্দু সাধারণের বাস্তব জীবনের ভিত্তির উপরই জাতীয়তার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সাধারণের এ জীবন গতানুগতিক ধর্ম ও সমাজের চাপে বদ্ধ জীবন, মুক্ত জীবন নয়। ফলে এই নব-জাতীয়তার আন্দোলন বিদেশী শাসনের অবসানের চেষ্টাতেই প্রধানতঃ রূপ পেল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরের জাতি-গঠন আন্দোলনে এই লক্ষ্যই আরও তীব্র হয় ও সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

তিলকের রাষ্ট্রীয় প্রেরণা ছিল ভারতের নব জাতীয়তাবোধ, আর তাঁর শক্তির মূল ছিল সাধারণের উপর তাঁর অসামান্য প্রভাব। সুরেন্দ্রনাথ, গোখলে প্রভৃতির প্রভাব ছিল শিক্ষিত সাধারণের উপর; তিলক ছিলেন সর্বসাধারণের নেতা, সার্থক লোকমান্য। লোকের উপর তাঁর অনন্যসাধারণ প্রভাবের জন্যই তাঁকে সারা জীবন নানা অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। এই যুগে ইংরেজ তাঁকে যত ভয় করেছে তত আর কাউকে করেনি, কেননা সংগঠিত এই নব জাতীয়তায় ইংরেজের বা কোন বিদেশীর রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের চিরস্থায়ী স্থান ছিল না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

কৃষি-বিজ্ঞান—২য় খণ্ড

ফসল, সবজী ও ফল

(৬০৭ + ১৯ পৃষ্ঠা—ডিমাই ৮ পেজী)

রায় রাজেশ্বর দাশগুপ্ত বাহাদুর এম, আর, এ, এস. (ইংরাজী প্রণীত)

দেশী ও বিলাতী যাবতীয় ফসল, সবজী ও ফলের

বিস্তৃত বিবরণ ও চাষ প্রণালী সম্বলিত প্রামাণ্য গ্রন্থ।

"রাজেশ্বর ভবন" মূল্য—১০৲ টাকা ও—(কাপড়ে বাঁধাই) ১২৷৹ টাকা

১১, গুপটাদ মুখার্জি লেন, ভবানীপুর

কলিকাতা-২৫ : ফোন—৪৮-১৬৩৯

বিস্তৃত বিবরণের জন্য উক্ত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কোথায় যাব জানি না। কতক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম মনে নেই। শুধু শুনে যাচ্ছি সমস্ত যাত্রীদের দেখছি। যাত্রীর ভীড় ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। গাড়ীতে আর তিলধারণের জায়গা নেই। গার্ড সাহেবের হুইসল শুনে আমার চমক্ ভাঙল। মুখ বাড়িয়ে দেখতে পেলাম গার্ডের হাতের সবুজ নিশান দুলছে। মৃদু একটু ঝাকুনি দিয়ে গাড়ী চলতে শুরু করল। পাদানিতে একজন লোক তখনও দাঁড়িয়ে। তার গলার আওয়াজে চোখটা সেদিকে ফিরিয়ে দেখছি, একটি লোক গাড়ীর ভিতর ঘরে ছুটছে পরণে ছিলো পা'জামা আর গায়ে আলখাল্লা আঁটা। মনে হচ্ছিল গুণ্ডলোর আটকে এখনই লোকটা পড়ে যাবে। সে ত পরিত্রাহি চীৎকার করছিল, হঠ যাইয়ে, হঠ যাইয়ে ছোড় দিয়া!

পাদানিতে দাঁড়িয়ে যে লোকটি ছিল তার নড়বার জায়গা নেই! সেও চিৎকার করছিল, জায়গা নেহি যে যাইয়ে। ইসমে বিলকুল আদমি নেহি।

কে কার কথা শোনে। শেষ পর্যন্ত সে উঠে পড়ল, দুর পায়ের উপরেই পা দিয়ে।

ওখানে দাঁড়িয়েই শুরু হয়ে গেল হাতাহাতি। তখন ভেতর থেকে দু' একজন অগ্রণী হয়ে লোক দুটোকে ভেতরে টুকিয়ে নিলেন। পরক্ষণেই সকলে মিলে লোকটিকে আক্রমণ শুরু করল। আমি ব্যাপারটা দেখে ওকে ডেকে এনে আমার কাছে দাঁড়াতে জায়গা দিলাম। লোকটি তখন থেমে গিয়ে গেছে। সে আমার দিকে একটু তাকিয়ে নিল। চোখের ভাবে মনে হল সেই এক গাড়ী লোকের মধ্যে আমিই তার একমাত্র আপন জন। আমাকে সে কিছু বলতে চাইছে আমি তখনও কোন কথা কইনি এখানেই বসে পড়ল লোকটি. কোন দ্বিধা নেই মনে গাড়ী তখন চলে ছেড়ে এগিয়ে চলেছে ক্রান্তিতে দুচোখ বুজিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছি। গাড়ীর দুলের আবেশের মত কোন সাড়া নেই চুপ করে পড়েছিলাম—একটানা গাড়ীর শব্দ যাত্রীদের সাথে একতানে মিশে করছিল। মাঝে মাঝে কানের কাছে অস্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। তখন গাড়ীর ঘরে কাল ভাবে আকাশের তারাগুলোকে দেখা যাচ্ছে। কখনও কখন, কখনও মাঠ পেরিয়ে চলেছি। অন্ধকারে দুরের গুহাবাসগুলিকে ঘটনা সাক্ষ্যে কয়েক কালের স্তূপের মত দেখাচ্ছিল। পাশে তাকিয়ে দেখলাম সেই আলখাল্লা পরিহিত লোকটি নেই

করে পাঙীর ভেতরে আশে পাশে নজর করলাম। এরই মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। পরিচিত চেনামুখ-গুলোর অনেককেই দেখতে পাচ্ছি না। সহসা দেখতে পেলাম সেই আলখাল্লা পরিহিত লোকটিকে। সে-ও দেখছিল আর তাকে ঘিরে আরও গুটি কয়েক লোক। কথার বাঁকায় বুঝতে কষ্ট হল না এরাও ওরই সমজাতীয়। লোকটি বেশ জমাট হয়ে গল্প বলছিল। আমি কান পেতে ওদের গল্পে মনোনিবেশ করলাম। একটা অন্ধকার ঘরে শুয়ে ছিল বুরহান-উদ্দীনের জন্ম-মুহূর্তটি সেই তার বৈ হয়োতে, আর কান্নাকাটিতে। সমস্ত চেষ্টাকে বিফল করে দিয়ে শিশু বুরহানউদ্দীন চুপ করেছিল। কিছুতেই তার মুখ দিয়ে শব্দ বেরুল না দেখে পরিবারের লোকজন বিহ্বল হয়ে পড়ল। সেই বিচলিত অবস্থায় এক ফকীর এসে ভবিষ্যৎ বাণী দিয়ে বলে গেলেন কোন বাইজী এসে যদি ওর সামনে নাচে তা হলে ও কথা কইবে। তিনি আরও বলে গেলেন জন্ম মৃত্যু এবং বিবাহ এই তিন অবস্থাতেই ওর জীবনে বাইজীর প্রয়োজন হবে। তারপর থেকে বুরহানউদ্দীন এক নূতন জীবনের স্বাদ পেল। নানি ঠাট্টা করলেন, বাইজীর মোসাহেব বলে। পিতা খান-দানের অপমান হবে কল্পনা করে ঘর ছেড়ে দিলেন। আস্মাজানের জীবনে নেমে এল দুঃখের রাত্রি।

শেষ পর্যন্ত দেখতে দেখতে বুরহাউদ্দীন বড় হয়ে উঠল এবার বুরহানকে সাদি দিয়ে নানি তার কর্তব্য শেষ করবেন। কাউকেই নানির পছন্দ হয় না। অসংখ্যের পাহাড় জমে উঠল ঘরে। বুরহান-উদ্দীনের বুকের ভেতর দুরু দুরু ক'রে ওঠে কি জানি কি হয়। নসরই বছরের বুড়ী শেষ পর্যন্ত যা তা একটা চাপিয়ে না দেয় ঘাড়ে। বিরক্ত হয়ে নানি কনে দেখা বন্ধ করলেন। বললেন, কনে আমি ঠিক করে ফেলেছি। নূরের সঙ্গে সাদি হবে ওর। নূরের তোলনা মেলা ভার—ঠিক যেন বেহস্তের তাজা কাটা হুরী!

বুরহানের মনের মুলবাগে তখন সবে ছড় ধরেছে। চোখ দুটোও তখন তাই ধরে রঙীন স্বপ্নে গলে গিয়ে বুরহান দেখে, দেখে কখনও বা বে-হুকুল ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। মুহূর্তের শুভক্ষণ কিন্তু সেই সময়টুকুকে নিয়েই কত কল্পনা। কত রঙীন হাত বিছিয়ে দেয় বুরহান। মুখে বলে মরা চাঁদের খুসবুটুকুই সার, আর থাকে না কিছু।

তারপর একদিন উৎসবের রোশনাই জ্বলে উঠল। নানি লোক পাঠিয়েছেন বাঈজী আনতে। বাড়ীর সামনের আঙিনায় ছাউনি বাঁধা হয়েছে। মেহমানের দল গিস্ গিস্ করছিল চারদিকে। তাদের সোরগোল আওয়াজ। বুরহান চুপ করে বসেছিল। কলিজার মধ্যে কাঁপছিল তার প্রাণ স্পন্দন। এমন সময় খবর এল বাঈজী নেই বুরহানপুরে। সবাই গেছে রাজদরবারের মাহফিলে। মাথায় হাত দিয়ে বসল আস্মাজান। বুরহান চমকে উঠল অনস্তিত আশঙ্কায়।

নানি কিন্তু হটবার পাত্র নন। তিনি জানিয়ে দিলেন বুরহা আজ বাঈজী হয়ে আসবে, নাচবে। অতিথিরা এ ওর মুখ চাওয়া-চায়ি করছিলেন। এমন সময় নূরের আবির্ভাব হল। বুরহান প্রতিক্ষা করছিল নূরের। তার বুকের ভেতর গুরু গুরু মেঘ, দুরু দুরু তাল ঠুকছিল। নূরের আগমনে চারিদিকের নিস্তব্ধতা গুপ্তগুঞ্জিয়ে উঠল। দৌচাকের মৌমাছির মত নূর এল সভার মাঝখানে। তার হাত কাঁপছিল, কাঁপছিল পায়ের তলা। মাটির বুকে জেগে উঠল প্রাণ। পায়ের প্রতি পদক্ষেপ যেন কান্নায় নুয়ে পড়া। ওদিকে তখন সভা জমে উঠেছে মাচের তালে তালে। মেহমানদের মুখে শুধু কেয়াবাত আর ফেকৌনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বুরহানের হৃদয়ে আজ কী আনন্দ! শানাইয়ের সুরে সুরে সেও দুলছিল। এবার 'সাদির' সময় হোল। নাচ থেমে গেছে, সবাই অপেক্ষা করছিল উন্মুখ হয়ে। ঠিক এমনি সময়ে গৃহের ভেতরে মৃদু গুঞ্জন উঠল কিসের। দেখতে দেখতে সেই গুঞ্জন কান্নায় মর্মরিত হল। বুঝতে না পেরে বুরহান উঠে গেল ভেতরে। ভেতরে যেতেই মাতির গলা জড়িয়ে ধরে নানি কেঁদে উঠলেন হাউ, হাউ করে।

তার সেই বিলাপ ও হাহাকারের ভেতর থেকে যতটুকু বোঝা যায় তাতে বুরহান জানতে পারল, 'নূর

সাদি করবে না।' সে বলছে, আমি যখন বাইজী ছিলে সভার মাঝে বেচেছি তখন আমি বাইজী ছিলে গেছি। এই সাদি আমি করব না। এখন থেকে বাইজী ছিলেই জীবন কাটাব।

পুঁথিখানা মাথায় ভেঙে পড়লেও বুঝি বুরহানের এত কষ্ট হত না, যতটা কষ্ট হল তার এই কথা শুনে। কিন্তু তার মুখ থেকেও আর কথা বেরুল না।

সেই থেকে বুরহানের জীবনে নেমে এল, অন্ধকার। আজও সে বিয়ে করেনি। এখনো আশা আছে তার নূরকে সে পাবেই। তাই কোথাও যদি কোন নাচের আসর দেখে তাহলে সেখানেই ছুটে যায়। সন্ধান করে নূরকে।

নিজের সৃষ্টি করা গল্পে একটা শোকার্ত আবরণে সেই আলখাল্লা পরিহিত ভদ্রলোকটী বুঝি নিজেই বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। তাই গল্পটা শেষ হতেই অন্যান্য সঙ্গীর সঙ্গে সেও চুপ করে গেল! সমস্ত কামরাটাই চুপ। শুধু ঝিক্ ঝিক্ করে ছুটে চলা গাড়ীটার একটা যান্ত্রিক শব্দ। গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে শোনা গল্পটার করুণতায় আমার মনেও একটা ভাবের অদ্ভুত দোল দোলানী।

বিপিনচন্দ্র পাল বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা-আকাঙ্খার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কার। বাংলার নব-জাগরণে তাঁর দান শুধু বিপ্লবীর ক্ষেত্রেই নয়, মানসিক নব-জাগরণেও। দেশবাসীর, বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায়ের চিত্তে স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারে এবং নানা রচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি সেই মুক্তি যজ্ঞের তর্পণ করেছেন। আজকের দিনে, স্বাধীন ভারতে, নতুন সমাজ গড়বার মুখে আমরা তাঁর রচনাবলী হতে শিক্ষা আহরণ করব। সে শিক্ষা শুধুমাত্র পূর্বসূরীর কাছে ঋণ স্বীকার নয়, আমাদের জাতীয় জীবনের দীক্ষাগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের রচনাবলী

নবযুগের বাংলা	৬৲
মার্কিণে চারিমাস	২৲
রাষ্ট্রনীতি	২৲
জেলের খাতা (২য় সংস্করণ)	২৲
Swadeshi & Swaraj : The Rise of New Patriotism	6/-
Study of Hindulism	4/8
Beginning of Freedom Movemet In India	1/4
Character Sketches :	6.-

of Rammohan Roy, Keshab Chunder Sen, Anandamohan Bose, Surendranath Banerjee, Bal Gangadhar Tilak, Sri Aurobindo, Aswini Kumar Dutta, Sister Nivedita, Rabindranath Tagore, Mrs. Annie Besant, Ashutosh Mukherjee, Taraknath Palit, Syamsundar Chakravarty, Monoranjan Guha Thakurta, and Krishna Kumar Mitra.

Writings & Speeches—Vol. I

যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড ঃ ৪১এ বলরেপোড়া রোড, কলিকাতা-৬

প্রতিদান

প্রথম প্রাণের সবখানি তাজা আগুনের ফুলকি যেন। নীল রঙে ছোপান আকাশ। গাঁয়ের গাছপালাগুলো সবুজ পাতায় ছেয়ে গেছে। এইসব দেখে মন ভরে ওঠে। কিন্তু অন্ধ মানুষের তো এ সুখ নেই। তাদের কাহিনীও চিরকালই বেদনাকরুণ। তাদেরই একজনের কথা আজ মনে পড়ছে। যার কথা না বলে স্বস্তি পাচ্ছি না।

নর্মাণ্ডির এক কৃষকের ছেলে। বাপ-মা যতদিন বেঁচে ছিলেন তার দিনগুলো কাটত সুখেই। দুঃখ শুধু ছিল ওর দৃষ্টিহীনতার জন্য। কিন্তু বাপ-মার মৃত্যুর পরেই শুরু হল তার নরক-যন্ত্রণা। দূর সম্পর্কের এক বোনের বাড়ীতে গেল ও। ভগবানের রাজ্যে সে ঠাঁই পেয়েছিল কিন্তু বোনের বাড়ীতে প্রতিটি লোকের কাছে সে করুণার পাত্র হয়ে দাঁড়াল। সবাই তাকে ভাবত ভিখারী বলে। ওর খাওয়া-পরাটাও ওদের কাছে ছিল চোখের বিষ। খাওয়ার সময় প্রতিবারই তারা বলত, ওরে হতভাগা, তোর বেঁচে থেকে লাভ কি। নিতান্ত বেঁচে থাকতে যতটুকু দরকার তার এককণাও বেশী আহার বেচারীর ভাগ্যে জুটত না।

মানুষের এই নিষ্করুণতা বুঝে লজ্জা করত সে। নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখত তার মনের দুঃখ। ছোটবেলা থেকেই ভালবাসার আস্বাদ বিশেষ কিছুই পায়নি। এমন কি মা-বাবার কাছ থেকেও নয়।

গরমের দিনগুলো কোনরকমে সে দরজায় বসেই কাটিয়ে দিত। শীতকালে সে বসে থাকত চিমনির ধারে। শুধু মাঝে মাঝে জলে বুজে আসত তার শূন্য গর্ত চোখের পাতাদুটি। এমনিভাবে কেটে গেল কটা বছর। কিন্তু মানুষের নির্মমতা অন্ধের জীবনের এমনি বন্ধ্যা দিনগুলোকেও যেন সইতে পারত না। অসহায়, উদাসমনা সেই অন্ধের অস্তিত্ব ওই পরিবারের প্রতিটী মানুষের কাছে যেন কাঁটার মত বিঁধতে লাগল। ও যেন এক উপহাসের বস্তু। অমানুষিক ব্যবহার আর অশ্লীল বিদ্রূপ শুধু তফা হ'ত ওর অন্তরালে। তার সামান্যতম খাবারটুকুতেও গাঁয়ের লোকের পর্যন্ত ঈর্ষার সীমা ছিল না। খাবার সময়টাতেই ছিল তাদের প্রতিশোধ গ্রহণের চরম মুহূর্ত; আশেপাশে সবাই এসে ভীড় করত চারপাশে, অন্ধের মনের ব্যথা কেউ বুঝতে চাইত না। খাবার টেবিলের সামনে ওরা ছেড়ে দিত বিড়াল বা কুকুর। পশুগুলিও বুঝি বুঝতে পারত সে অন্ধ। নিঃশঙ্কে তারা তার প্লেটের কাছে এসে চেটে খেয়ে চলে যেত বেচারীর আহার্য। কখনও বা তাদের সামান্য আওয়াজ পেয়ে অন্ধ তার হাতের চামচখানা অনুমানে চালিয়ে দিত পশুর দিকে, কিন্তু বুদ্ধিমান পশু তার আগেই সরে পড়ত।

দর্শকরা রোজ এই ঘৃণ্য দেখে নিষ্ঠুর কৌতুক উপভোগ করত। বিদ্রূপে ভরা চোখ দিয়ে একে ইশারা করত অন্ধকে। কখনও বা ওর খাবারের সংগে তারা

খোতলের ছিপি, টুকরো কাঠ দিয়ে দিত—তাই তো দেখি ব্যাটা অন্ধ কি করে!

খোনের স্বামীও এভাবে অন্ধ শালাকে বসিয়ে খাওয়াতে আর রাজী নয়। তাই অথথা ওর পর দৈহিক অত্যাচার করেই সে যেন তুলে নিতে লাগল তার ভাত কাপড়ের ন্যায্য মূল্য। মার খেতে খেতে অসহায় অন্ধ যখন মারের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করত, তখন তাই দেখে নিষ্ঠুর জামাইবাবুটীর চরম আনন্দ হত।

এ তবুও একরকম ভালই ছিল। এর পরে নাটকের শেষ দৃশ্যটুকু আরও মর্মান্তিক। সবাই মিলে পরামর্শ করে অন্ধকে এবার ভিক্ষে করতে পাঠাল। কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি তার জাত ব্যবসা নয় বলে সারা সপ্তাহ পরিশ্রম করেও সে কিছু আনতে পারত না। এর ফলে বাড়ীর সকলের তার প্রতি একটা ঘৃণা, বিদ্বেষ আর অবহেলার মাত্রা দিন দিন বেড়ে গেল। সেই বিদ্বেষ থেকে নেমে এল একদিন বেচারীর মৃত্যু—এ কাহিনীর যবনিকা! তখন শীতকাল। বরফে বরফে ছেয়ে গেছে পথঘাট। কঠিন হয়ে উঠেছে খোতাঙ তুষার ফলকগুলো। ঠিক এমনি এক দিনে অন্ধকে নিয়ে বেরোল জামাই বাবু। বড় রাস্তা ধরে অনেকক্ষণ হেঁটে অবশেষে একটা জায়গায় অন্ধটীকে ভিক্ষের বসিয়ে সে চলে গেল। দিন কেটে রাত হল। রাত্রে বাড়ী ফিরে জামাই-বাবু বাড়ীর লোকদের কাছে একটা হতাশার সুরে বললে, ওর কথা বাদ দাও, তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ওকে কোথায় পেলাম না।

অন্ধ কিন্তু অসহায়ের মত সারাদিন ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ওখানেই অপেক্ষায় ছিল। শেষ পর্যন্ত সে আর না পেরে বরফ ঢাকা পথ দিয়ে আন্দাজ করে কোন রকমে বাড়ী ফিরে চলল। পথ চিনে পথ চলতে প্রতিবার ওর ভুল হয়। পড়ে যায় কখনও। কিন্তু তখন সে অবৈর্য হয়ে গেছে। পড়ে গিয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়। অদৃষ্টে ওর মুখ দিয়ে শুধু বেড়োয়, আমি ঘরে যাব।

তবু ফেরা আর হয় না। খোলা মাঠে এক জায়গায় শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে ধপ্ করে ও বসে পড়ে। বারে বারে আবার উঠবার চেষ্টা করে—পারে না, সে কিছুতেই পারে না। আস্তে আস্তে ওর সমস্ত দেহটা অবসন্ন হয়ে ওখানেই নেতিয়ে পড়ে। তার উপরে এদিকে তুষার ঝরতে থাকে অঝোরে। বরফের শুভ্র আস্তরণে একটু একটু করে ঢেকে গেল তার দেহ। ক্রমে দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে গেল বেচারী। হারিয়ে গেল ওর অসাড় গোটা দেহটাও!

অন্ধের আত্মীয়রা লোক দেখান খোঁজ করল কিছুদিন। মনে মনে কিন্তু খুশী তারা—বাঁচা গেছে। লোকটার নিখোঁজ হওয়ায় ওদের কোন ক্ষোভ নেই।

সপ্তাহ দুই পরের এক অমনি শীতার্ত তুষার ঝরা দিনে হঠাৎ কয়েকজন চাষী দেখল—একটুকরো সমতল জায়গায় চার পাশে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে কতকগুলো শকুন। শকুন-গুলো বার কয়েক ঐ জায়গাটুকুতে উঠা নামা করছিল। সারা আকাশ কাল হয়ে গেল শকুনের পাখায়। গলিত মাংসের গন্ধ পেয়েছে বোধ হয় পাখীগুলো।

চাষীদের মধ্যে একটী ছেলে ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য একটু এগিয়ে গেল। দেখল, শকুনগুলো সেই হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া অন্ধের দেহখানা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল। এমন কি ওর শূন্যগর্ভ চোখ দুটোও তারা উপড়ে নিয়ে গেছে।

সেদিনের ওই অন্ধের কথা ভুলতে পারিনি আজও। তাই প্রচণ্ড শৈত্য করোজ্জ্বল গ্রীষ্মের এই দিনগুলোও আমার কাছে আর মধুময় ঠেকে না। আগের সেই শিহরণ ও আর পাই না। বেদনাতুর একটুকরো স্মৃতি জড়িয়ে থাকে সে সব সূর্য দীপ্ত দিনগুলোর সাথে। অন্ধের কথা মনে পড়ে প্রায়ই। যার মৃত্যুতে স্বার্থপর, হিংস্র, বিরাট এক মানুষের দল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে।

ভাবানুবাদ : বিজিত দত্তগুপ্ত

॥ সমসাময়িক সাহিত্য ॥

Gloom and Gold in Ezra Pound
—Robert Fitzgerald.
Encounter, July '56.

রবার্ট ফিটজেরাল্ড্ এজরা পাউণ্ড সম্বন্ধে আলোচনার প্রারম্ভে বলছেন, পাউণ্ডের কবিতার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় 'Personae'এর মাধ্যমে যখন তিনি স্কুলের ছাত্র। তিনি এখনও স্মরণ করতে পারেন, মোটা, ঘন, খসখসে কাগজে সুন্দরভাবে মুদ্রিত গ্রন্থটি প্রথমেই তাঁর মন টেনেছিল।

যখন আমেরিকাতে Draft of XXX Cantos প্রথম প্রকাশিত হল তখন তাঁর বন্ধু Dudley Fitts এটির সমালোচনা করেছিলেন 'The hound and horn' কাগজে এবং ফিটজেরাল্ড্ স্পষ্ট মনে করতে পারেন ঐ সমালোচনার শেষে Fitts বলেছিলেন, "a gallant and proud attempt to assert the positive value of experience. The phrases sound to me rather desparate". ফিটজেরাল্ড্ এর পর নিজে Cantos পড়েন, তাতে তাঁর মনে হয় 'likewise affected in the higher sensory regions mainly by a paradisal sense of style".

১৯৩২ এর প্রথম দিকে ফিটজেরাল্ড্ সুইজারল্যাণ্ডে ছিলেন। তিনি তখন পাউণ্ডের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে তাঁকে একটা চিঠি পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। পাউণ্ড তখন Rapalloতে একটা উঁচু ফ্ল্যাটে থাকেন। জানালা দিয়ে শহরের কর্ম কোলাহল ও দূরে সমুদ্রের বিস্তার চোখে পড়ে। পাউণ্ড বললেন তিনি এই ঘরে ইয়েটস্‌কে 'কোক্সিং' লিখিয়েছিলেন। টেবিলের উপর আনেস্ট হেমিংওয়ের একটা চিঠি ও ছবি পড়েছিল। ছবিতে হেমিংওয়ের বিশাল শরীরে মৎস শিকারীর পোষাক। পাশে সদ্য মৃত একটি হাঙরের কম্পিত দেহ।

তারপর পাউণ্ড, জেমস জয়েসের নিজের হাতে লেখা দীর্ঘ প্রবন্ধসহ একখণ্ড 'ইউলিসিস' দেখালেন। এরপর পাউণ্ড ফিটজেরাল্ড্‌কে সঙ্গে নিয়ে জানুয়ারীর শীতেই বিকেলে বেড়াতে বেরোলেন। একটা রেঁস্তোরাতে তাকে ডিনার খাওয়ালেন। ফিটজেরাল্ড্ ট্রেণে চড়ে বিদায় নেবার পূর্ব পর্যন্ত পাউণ্ড তাঁর সঙ্গে বেড়ালেন। Rapalloতে পাউণ্ড সব সময় সঙ্গীতের মধ্যে ডুবে থাকতেন। এরপর পাউণ্ডের Chinese Classic Anthology ও '80-90 Cantos' আলোচনা প্রসঙ্গে লিখছেন, চীনা সাহিত্যের অনুবাদ এক আশ্চর্য সাহিত্যকর্ম, আর এ কাজ শুধু তাঁর পক্ষেই সুষ্ঠুভাবে সম্ভব যিনি সারা জীবন ধরে ইংরাজী কাব্য সাহিত্যে সব রকম সম্ভাব্য আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এজরা পাউণ্ডের অন্যান্য রচনার মধ্যে চারশ পৃষ্ঠা টাইপ করা 'হোয়ে রেডিও' থেকে বক্তৃতা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ফিটজেরাল্ড্ বলছেন, সব রকম রাজনীতি বহির্ভূত মন নিয়ে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় এগুলি কোন প্রতিভাবান শিল্পীর সব চেয়ে নিকৃষ্টতম রচনা।

যে অপরাধের জন্যে পাউণ্ড আমেরিকার 'গ্রাণ্ড জুরিদের' দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তার চাইতে বেশী অপরাধ করেছেন পাউণ্ড নিজে ঐ সব রচনা করে। তিনি নিজে তার জিনের কোঠায় যদি ঐ সব রচনা করতেন, তবে বোধ হয় ফাঁসীই একমাত্রই শাস্তি হিসেবে বিবেচনা করতেন।

১৯৪৫ এর পর পাউণ্ড যখন আমেরিকায় ফিরে এলেন তখন তিনি ও তাঁর উকীল, বিচার প্রার্থী হলেন না এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি স্বীকার করে নিলেন। ওয়াশিংটন এ অদ্ভুত প্রস্তাব পাউণ্ড তার নিজের বিচার অনুসারে আত্মগোপনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে ঠিক করেছিলেন এবং তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ তাঁকে এ সংকল্প হতে বিচ্যুত করতে পারবে না।

আর এখন যদি তিনি সুস্থ হিসেবে বিবেচিত হন তাহলে 'রেডিও রোমের' বক্তৃতাবলীর জন্যে তাকে আবার বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।

ফিটজেরাল্ড্ বলছেন, পাউণ্ডের এই স্বেচ্ছা-নির্বাচিত অবস্থা তাকে পিরানদেল্লোর Enrico iv নাটকের নায়কের

কথা মনে করিয়ে দেয়—যাকে পাগলের ভূমিকাতে চিরকাল অভিনয় করে যেতে হ'বে কারণ সে সুস্থ মানুষ বলে নিজেকে সমাজে দাখী করতে পারবে না।

এ অবস্থা কোন প্রকারেই সহনীয় নয়। কারণ একদিক দিয়ে এ ভূমিকার কিছু অংশ সত্য কিছু অংশে সহানুভূতি জাগায়। কিন্তু একথা সন্দেহ করবার কারণ নেই, যে গত কয়েক বছরে 'St Elizabeth' হাসপাতালে পাউণ্ড যে রচনা করেছেন তাতে আমরা কয়েকটী সংক্ষিপ্ত মাত্র অংশ ছাড়া 'বেডিও' বক্তার প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাই।

কাব্য সাহিত্যে পাউণ্ডের স্থান নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। দিনের পর দিন তা আরও দৃঢ় হ'বে।

সবশেষে, ফিটজেরাল্ড্ বলছেন, এই প্রবন্ধে তিনি একজন কনিষ্ঠ কবি, যিনি পাউণ্ডের রচনার প্রতি আগ্রহী এমনি একজনের কথা বলবার চেষ্টা করেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে কবিতা রচনায় আমরা তার কাছে সর্বাংশে ঋণী!

Time Weekly, Tokyo 13th Aug. 1950

ইজিপ্ট ও মধ্য প্রাচ্যের বর্তমান রাজনীতি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে Time লিখছেন :

আরব দেশগুলিতে নাসেরের প্রতিপত্তি শক্তিহীন নয়। ইজিপ্টের এই শক্তিশালী পুরুষ বলেছেন, "তিনি আতলান্তিকের পার হতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত স্বদেশের সীমা বাড়াবেন।" আর এ বিষয়ে তিনি রাতারাতি প্রায় সালাহিনের মত বীর পূজা পেয়েছেন! খবরে প্রকাশ, ৩২টি গভর্ণমেণ্ট, চীন হতে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া পর্যন্ত তার এই কাজ সমর্থন করেছেন। সউদি আরবের রাজা তার বিশেষ দূতকে বলেছেন, "আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে ইজিপ্টের পাশে আছি"! জর্ডানের তরুণ রাজা 'তারে' করেছেন "আরব দেশ তার কাছে আশা করতে পারে, আগামী কাল তাদের হারানো ভূ-খণ্ড (প্যালেষ্টাইন) ফিরে পাবে"!

জাতীয়করণ সপ্তাহের সুরুতে নাসের চারটি বৃটেনগামী জাহাজের তুলা নামিয়ে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবশ্য কিছু পরে এ আদেশ প্রত্যাহৃত হয়।

গত সপ্তাহে প্রায় ৪০০টি জাহাজ সুয়েজ খালে যাতায়াত করেছে! জাহাজের কর্তৃপক্ষ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লণ্ডন কিম্বা প্যারিসে ভাড়ার যার এমন 'চেকে' মাশুল দিয়েছেন। তাই প্রকৃতপক্ষে মিশরের অর্থ ভাণ্ডারের অতি অল্পই মুদ্রা জমা পড়েছে। এই অর্থ বিনিয়োগ অসুবিধার জন্যেই, তাদের আশা করেন, নাসের কোন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় খাল নিয়ন্ত্রণে স্বীকৃত হবেন।

নাসের এমনি কোন ব্যবস্থা মেনে নিলেও খাল কোম্পানী তার নিজস্ব থাকবে। আর এই ব্যবস্থার সাফল্য লাভ করলে পরমুহূর্তেই দাবী উঠবে প্রাচ্যের সব তৈলখনি ও পাইপ লাইন জাতীয়করণ করতে হ'বে। এরূপ সম্ভাবনার আভাষ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে ছোট শহর Kuswait-এ যার বাৎসরিক আয় ২৫০ মিলিয়ন ডলার।

তাহলে এ অবস্থা বৃটিশ, ফরাসী ও আমেরিকার পক্ষে যুক্তভাবে চিন্তনীয় যে, ১) জগতের ২৩ অংশ তেল মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত। ২) আমেরিকা ২/৩ ভাগ ঐ কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ করে।

New Times, Moscow No 31, July. 1956.

New Times এর খবরে প্রকাশ, ব্রিটিশের ক্ষুদ্র শহর 'Parnaiba'র কর্তৃপক্ষ এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার আভাষ পেয়েছেন। তাঁরা খবর পান যে দু'টো আমেরিকান প্লেনের কর্মচারী বেশ কিছু পরিমাণ 'রেডিয়াম আকর' গোপনে নিয়ে যাবার চেষ্টায় ছিল।

অবশ্য এটা তাদের এ ধরণের প্রথম চেষ্টা নয়। গত বছর একদিন ব্রেজিলের কৌ-কর্তৃপক্ষ আশ্চর্য হয়ে জানতে পারলেন যে কয়েকটি আমেরিকান জাহাজ কোন বাণিজ্যিক মাল না নিয়ে, বালি ভর্তি করে স্বদেশের অভিমুখে যাত্রার আয়োজন করেছে। তদন্তে প্রকাশ পায় ওগুলি সাধারণ বালি নয় বরং প্রচুর পরিমাণে রেডিও এ্যাকটিভ থোরিয়াম পূর্ণ মোনাজাইট বালি। আমেরিকা এভাবে প্রায় ৬৫০০০ হাজার টন বালি পাচার করেছে এবং বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেছেন ঐ পরিমাণ বালি

হতে অন্তত: ২৭৫ মিলিয়ন কলম্বা অথবা ৩৫০ মিলিয়ন ডেলের সম পরিমাণ শক্তি নিঃসারিত হ'বে

দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নেই এবং গবেষণার অনুবিধা হবে এই ভাবিয়ায়, "বাস্তিক সাহায্য" এর মাধ্যমে আমেরিকা যথেষ্ট পরিমাণ আনবিক আকর সংগ্রহ করছে। ব্রেজিলের বৈজ্ঞানিকদের অনুমান যে ৩৫০,০০০ হতে ৬০০,০০০ টন 'থোরিয়াম আকর' এবং ১৫০,০০০ হতে ৩৫০,০০০ টন য়োনাসাইট খনি তাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। তারা তাদের দেশের এই বিপুল সম্পদকে শান্তির কাজে নিয়োজিত করবার চেষ্টা করছেন।

ভারতীয় সম্পদকে সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনবার জন্যে গত মাসে রিও-ডি-জেনিরোতে ব্রাজিলের কংগ্রেস সমবেত হয়েছিলেন। উভয়ের সংবাদপত্র El Debate বলছেন আমেরিকার উদ্বৃত্ত 'লাতিন আমেরিকার' দেশগুলিকে 'এ্যাটমিক কলোনীতে' পরিণত করা। কিন্তু জনগণ তা রুখবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

তিলক গত মাসিকীতে 'New Times' লিখছেন "২৩শে জুলাই ভারত ও তার বন্ধু দেশগুলি, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুসন্তান তিলকের শত-বার্ষিকী উৎসবে তাঁকে স্মরণ করছে। তাঁকুশী, কৃতীছাত্র এবং শক্তিশালী লেখক তিলক স্বদেশের মুক্তি সাধনায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করে গেছেন।

গত শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রথমতঃ শিক্ষা-সংস্কার নিয়ে তিনি আন্দোলন সুরু করেন। তিনি বিখ্যাত 'মারাঠী' সাপ্তাহিক ও 'কেশরী' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা যাতে তিনি ভারতের মুক্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবার জন্য দেশবাসীকে মর্মস্পর্শী আবেদন জানিয়েছিলেন। তিনি ও তাঁর বন্ধু সহকর্মীদের অবদান বহু পরিমাণে ভারতীয় জাগরণে সহায়তা করেছিল। ১৮৮৫ খৃঃ ভারতীয় কংগ্রেস গঠিত হলে তিলক ইহার গণতান্ত্রিক অংশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রামের আহ্বান জানান। তাঁর লেখা ও বক্তৃতায় তিলক জন-সাধারণের আন্দোলন গড়ে তুলবার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, আবেদন-নিবেদন স্বাধীনতা আনতে পারবে না, তার জন্য চাই জনগণের পূর্ণ চেতনা ও সংগ্রাম। ১৯০৪-৮ সালে যখন এই বিপ্লবী আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে এবং তিলক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতারূপে বন্দিত হন, তখন তিনি বিনা বিচারে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা নির্বাসিত হন। তিলক ১৯২০ সালে মারা যান। তিনি তাঁর মহান দেশের মুক্তি দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু আজকের যে স্বাধীন ভারত বিশ্বে তার উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে—তারই জন্য তিলক সংগ্রাম করেছিলেন।

ইতিহাস [বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ-কলিকাতা]

—ষষ্ঠবর্ষ ২য় সংখ্যা :

তাঁতিয়াটোপীর পরিচ্ছদ নীরব আলোচনায় বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখছেন, ১৮৫৭-৫৮ সনে ভারতে ইংরেজের বিরুদ্ধে যে বিপ্লব ঘটেছিল তাঁর কাহিনীর সঙ্গে তাঁতিয়াটোপীর নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কিছুদিন পূর্বে সংবাদ পাওয়া যায়, তাঁহার সামরিক পরিচ্ছদ এখনও লণ্ডনে রক্ষিত আছে। এ বিষয়ে যাহা জানা গিয়াছে তাহা এই—লণ্ডনের হোয়াইট হলে, 'রয়াল ইউনাইটেড্ সার্ভিস মিউজিয়ামে' জরির কাজ করা কালো পশমের তৈরী একটি আচকান রক্ষিত আছে। পাশে লিখিত আছে—

"ইংরেজী ১৮৫৯ সনের ১৮ই এপ্রিল ভারতবর্ষের বিদ্রোহী নায়ক তাঁতিয়াটোপীর ফাঁসী হয়—ইহা তাহারই পোষাক"। এর পাশে পেন্সিলে আঁকা তাঁতিয়াটোপীর একটি ছবি এবং তাহার সঙ্গে ভারতীয় সৈন্য বিভাগের অবসর প্রাপ্ত মেজর বগের (Bough) এক খানি চিঠি আছে—"আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে উক্ত ছবি সুখ্যাত ও গুণবান তাঁতিয়াটোপীর প্রতিকৃতি। আমার পিতা পরলোকগত মেজর জেনারেল আর, সি, বগ ইহা আঁকিয়াছিলেন। তিনি মেজর ডীনের অধীনে সৈনিক দলে এক পদাতিক বাহিনীর নায়ক ছিলেন। এই বাহিনীর কয়েকজন সৈন্য বিশ্বাসঘাতক মানসিংহের সহায়তায় তাঁতিয়াটোপীকে বন্দী করে। ফাঁসীর দিন তাঁতিয়াটোপীর শিকল খুলিয়া লওয়ার

অব্যবহিত পূর্বে আমার পিতা এই ছবি আঁকেন। প্রথম বারে ঘড়ি ছিঁড়িয়া যায়। তারপর আবার তাহাকে ঝুলাইয়া দেওয়া হয় এবং এবারে আর আর কোন গোলমাল হয় নাই।"

সবশেষে শ্রীযুক্ত মজুমদার লিখছেন, যাতে টোপীর এই পরিচ্ছদ ভারতে আনীত হয় সে জন্য ভারত সরকারের অবহিত হওয়া কর্তব্য।

Economic Weekly (Bombay)
No. 22 Aug. 56

সুবিধাবাদী সমাধান

দিল্লী সাধারণতন্ত্রী ভারতের রাজধানী। কিন্তু বোম্বাই, পুণা, নাগপুর হতে দিল্লী বহুৎ দূর। দিল্লী যেমন পুণা, নাগপুর, আমেদাবাদের অনুভূতি বুঝবার চেষ্টা করে না, তেমনি কংগ্রেস সরকার আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে একাত্ম নন। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন সম্পর্কে 'সরকার' ও জনসাধারণ একমত হতে পারেন নি। যেহেতু কংগ্রেস সরকার দ্বি-ভাষিক বোম্বাই রাজ্য গঠনে নতুন প্রস্তাব নিয়েছেন—এর দ্বারাই প্রমাণ হয় না গুজরাটী কিম্বা মারাঠিরা তাদের স্বতন্ত্র ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের মত বিসর্জন দিয়েছেন। বোম্বাই ও আমেদাবাদও নয়। পণ্ডিত পন্থ "জাতীয় সমস্যার জাতীয় সমাধান" বলে এ প্রস্তাব জনসাধারণের সামনে ধরেছেন। যেহেতু এই প্রসঙ্গে পার্লিয়ামেন্ট জনসাধারণের মতামতের ধার ধেন নি—সেহেতু এই সমাধানও 'জাতীয় সমাধান' হতে পারে না। পার্লিয়ামেন্ট ও কংগ্রেস সরকার আইনতঃ তাদের মতামত জনসাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু নৈতিকভাবে তারা জনগণের মতামত না নিয়ে এমন একটা বিতর্কের বিষয়কে নিজেদের খুশী মত চাপা দিতে কখনই পারেন না।

যদি বৃহত্তর বোম্বাই রাজ্য প্রস্তাব সাফল্য লাভ করে—তাহলে কিছুদিন পরেই বৃহত্তর আঞ্চলিক রাজ্য প্রস্তাব আবার দেখা দেবে। এমনিভাবে ভারতবর্ষকে চারটি ও পাঁচটি বৃহত্তর ভাগে ভাগ করা পণ্ডিত পন্থ ও রাজাজীর পূর্ব অভিপ্রেত। কাকাসাহেব কালেলকারের আশা, এমনি ভাবে যদি বোম্বাই প্লানে সাফল্য লাভ করে, তাহলে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মনে উভয় রাজ্যের একীকরণ প্রস্তাব আবার উঠতে পারে। যদি বৃহত্তর বোম্বাই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয় তবে নিশ্চিতভাবে ছটি বড় রাজ্য অন্যান্য ছোট রাজ্যগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করবে। এভাবে আঞ্চলিক রাজ্য গঠনের স্বপক্ষে দৃঢ় যুক্তি খাড়া হবে। আর এ ব্যবস্থা নিশ্চিতভাবে ভারতবর্ষের পক্ষে ক্ষতিকর। কংগ্রেস এমন জাতীয় সংকটের মুখে স্পষ্টভাবে উদাসীন।

[এই বিভাগটী সুষ্ঠুভাবে পরিবেশনের জন্য কয়েকটি পত্রিকার সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। 'সহযোগী পত্রিকাগুলির' কর্তৃপক্ষ যদি এ বিষয়ে সক্রিয় সহায়তা করেন, তবে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা স্বীকৃত হবে সন্দেহ

শ্রীযুত মনোরঞ্জন রায়ের
GITA FOR ALL Re.1/- গীতাসার ১৲
৪২ কবির রোড, কলিকাতা-২৬

পুস্তক প্রসঙ্গ

রাষ্ট্রনীতি—বিপিনচন্দ্র পাল। যুগযাত্রী প্রকাশক লিঃ। ৬১।এ বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য ২৲ টাকা।

মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের এই গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে লেখা কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি। গণতন্ত্রের আদর্শ ও সমাজ বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব আমাদের দেশের সাধনার সঙ্গে মিলিয়ে সহজ ভাষায় ও সরলভাবে বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে আমাদের চিন্তার দৈন্য খুব বেশী; এই ছোট পুস্তকের মৌলিক আলোচনা আমাদের দৃষ্টি নূতন দিকে খুলে দেবে। প্রবন্ধগুলি মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। রাষ্ট্রনীতি, স্বাধীনতার আদর্শ, স্বরাজের প্রয়োজন, স্বরাজ গড়া ও মানুষ গড়া প্রবন্ধগুলিতে স্বরাজের আদর্শ আলোচিত হয়েছে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রতা, নির্বাচন-নীতি, এবং নির্বাচন-নীতি ও সামাজিক কল্যাণ প্রবন্ধে বিলাতের অনুকরণে শাসন-পরিষদ প্রভৃতি গঠন করলেই প্রকৃত গণতন্ত্র এদেশে প্রতিষ্ঠিত নাও হতে পারে তাহা দেখান হয়েছে সমাজ-বিজ্ঞানের আলোকে অনুন্নত জাতির উন্নতি সাধন আলোচিত হয়েছে। রুষের বাদশাহ ও ভারতের মুসলমান সমাজ প্রবন্ধে ধর্মমত ও রাষ্ট্রীয় জীবন পৃথক না রাখলে যে সাংঘাতিক বিপদ ঘটতে পারে, তাহা নির্দেশ করা হয়েছে। ১৩১৮ সালে লিখিত এই প্রবন্ধে রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ বিপিনচন্দ্র যে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তাহা ভারতের দুর্ভাগ্যে ভবিষ্যৎ-বাণীতে পরিণত হইয়াছে। পুস্তকের শেষ প্রবন্ধ—নরীদের আকাঙ্খা। সাধারণের অন্তরের এই আকাঙ্খা পূর্ণ হলে ভারতে কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা সার্থক হবে।

পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা—আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত ও সিগনেট প্রেস প্রকাশিত। মূল্য সাড়ে চার টাকা।

বাংলাদেশে বই প্রকাশের ব্যাপারে অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে প্রকাশকেরা নির্ভয়। সেটি হচ্ছে 'সংকলন' গ্রন্থ প্রকাশ করা। কোন মতে দশ, পনেরটি রচনায় একটি সংকলন বের করতে পারলে নিশ্চিত ব্যবসায়িক সাফল্য।

সিগনেট প্রেস প্রকাশিত "পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা" এমনি একটি সংকলিত কবিতা গ্রন্থ, যা রবীন্দ্রনাথ হতে শুরু করে তরুণতম কবির রচনায় শোভিত। উদ্দেশ্য মহৎ—এবং একই উপলক্ষ্য নিয়ে এর আগেও একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। যার কাল ও পরিমাণ ছিল উভয় অর্থেই ব্যাপক। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ব্যাপকতার ফলে যেমন অনেক 'লেখা লেখা খেলাও' সংকলিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল, তেমনি বিপরীত ভাবে এ গ্রন্থে নির্বাচন এত বেশী 'পরিশোধিত' হয়েছে যাতে করে কোন বিশেষ একটি কবিতা পত্রিকার নিয়মিত 'তরুণ' লেখকরাই স্পষ্টভাবে বিজ্ঞাপিত। এতেও আপত্তি ছিল না যদি তাদের রচনার সুনির্বাচন হত। তা ছাড়া বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রচিত কবিতাও প্রেমের কবিতার শিরোনামায় স্থান পেয়ে পাঠককে প্রেমের সংজ্ঞা নির্ধারণে দিশাহারা করেছে; বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে।

'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতার' ভূমিকাটির কথা সর্বশেষে উল্লেখ করছি যদিও এটি গ্রন্থের আরম্ভে বিস্তৃত আয়তন নিয়ে বহু উদ্ধৃতি কণ্টকিত হয়ে প্রথমে পাঠকের সতৃষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে সম্পাদকের বিদ্যাবত্তার প্রতি। ভূমিকাটিও সংকলন গ্রন্থের উপযুক্ত হয়েছে। সেখানেও সম্পূর্ণ লেখার কবিতা ও প্রেমের কোন সংজ্ঞা পাওয়া গেল না। এবং সেইজন্যই বোধ করি সম্পাদক নিজেও সবশেষে বিদ্যাপতির শরণ নিয়ে পরিত্রাণ খুঁজেছেন। তাই আমরা তাঁর 'কবিতা আমার বিষয় নয়' ইত্যাদি সকপট স্বীকারোক্তি বলেই গ্রহণ করলাম। বইয়ের প্রকাশনায় সিগনেট প্রেস তাদের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন!

—চারুবাক

শবরী। দেবদাস পাঠক। দাম ৩টাকা
ক্লাসিক প্রেস, ৩১এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলি-১২।

দেবদাস পাঠক বাংলা ছোট গল্পের আসরে নবাগত হলেও একেবারে নতুন নন। বই আকারে শবরীই তাঁর প্রথম সাহিত্য-সৃষ্টি। এর আগে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তিনি পাঠক মহলে পরিচিত হয়েছেন। অল্প কয়েকটি লেখার দ্বারাও যে একটা স্বাক্ষর লাভ করা যায় এটাই দেবদাসবাবুর লেখার বৈশিষ্ট্য। দেবদাসবাবু মূলতঃ কবি—তাই তাঁর গল্পগুলি সাধারণত গীতিকাব্যধর্মী (lyrical)। তাঁর লেখার ভেতর রচনাশৈলী বা আঙ্গিকের বাহুল্য বাদে বিশেষ করে পাওয়া যায় মনের ছোঁয়া।

এই সংকলনের প্রতিটি গল্পের মাধ্যমে সেই ছোঁয়ার আভাষটুকু পাওয়া যায়। এটা একজন গল্প লেখকের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। বিশেষ করে গল্পগুলির মধ্যে—বৃত্ত, অভিজ্ঞান ও ছায়াপথের করুণ মর্মস্পর্শী আবেদন রচনার উৎকর্ষতার পরিচায়ক। ভবিষ্যতে এঁর কাছে আমরা আরও আশা করি। বইটির পরিবেশনা, প্রচ্ছদ পারিপাট্য ক্লাসিক প্রেসের রুচির পরিচয় বহন করে।

অরুণ দাশগুপ্ত

বিমল কর
দেওয়াল
মূল্য ৪৷৷০ টাকা
রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস
লালবাঈ
মূল্য ৫৲ টাকা
প্রথম প্রহর
মূল্য ৪৷৷০ টাকা
সুবোধ ঘোষ
ত্রিযামা
মূল্য ৬৲ টাকা
অন্নদাশঙ্কর রায়
রত্না ও শ্রীমতী
মূল্য ৩৲ টাকা

যার যেথা দেশ	৫৲	অজ্ঞাতবাস	৫৲
কলঙ্কবতী	৫৲	দুঃখ মোচন	৫৲
মর্ত্যের স্বর্গ	৫৲	অপসরণ	৫৲
মা	৪৷৷০	কন্যা	৩৲
আগুন নিয়ে খেলা	৩৲	পুতুল নিয়ে খেলা	৩৲

প্রবোধ কুমার সান্যাল
পুষ্পধনু
মূল্য ৫৲ টাকা
হেমেন্দ্রকুমার রায়
স্মরণের যাদুঘরে
টাকা
ঘোষ
কপুরের কবি ছোটের মহল ২৷৷০
বুদ্ধদেব বসু
নির্জন স্বাক্ষর
গোপাল হালদার
বাংলা সাহিত্য ও মানব-স্বীকৃতি ২৷৷০
নরেন্দ্রনাথ মিত্র
সহৃদয়া
মূল্য ৪৷৷০ টাকা
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
সাহিত্যে ছোটগল্প
মূল্য ২৷৷০ টাকা

ডি, এম্‌, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬

শিল্প-প্রসার

এদেশে শিল্প-প্রসার যে খুব বেশী প্রয়োজন, একথা বোধ হয় আর করার হয় না। আমরা যেসব জিনিষ নিত্য ব্যবহার করি, কেবল সেসব তৈরীর ব্যবস্থা বাড়ান নয়, কিন্তু যেসব যন্ত্র, যন্ত্র ও রসায়ন ইত্যাদির সাহায্যে এগুলি তৈরী হয় বা ভাল করে হতে পারে তার জন্য যন্ত্রপাতি ও রসায়ন প্রভৃতি উৎপাদনেরও ব্যবস্থা করা দরকার; এর সঙ্গে সঙ্গে দরকার বহুল পরিমাণে শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা, যাতে করে এসব যন্ত্রাদির ব্যবহার সুগম হয়।

ইংরেজ আসার আগে আমাদের দেশ এখন কৃষি-প্রধান বলে যে আখ্যা পেয়েছে, সে নাম তার ছিল না। আমরা চাষ করতাম, সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রকারের শিল্পও উৎপাদন করতাম; বেশ বড় বাণিজ্যও আমাদের ছিল। ইংরেজ এ দেশে ব্যবসার জন্য রাজত্ব, আর রাজত্বের জন্য ব্যবসা—এই নীতি কুশলতার সঙ্গে—ও বর্বরতার সঙ্গেও—অনুসরণ করে আমাদের শিল্প ও বাণিজ্য নষ্ট করে। ক্রমে এই মহাদেশের বিশাল জনসমষ্টির অধিকাংশ জীবিকার জন্য কেবলমাত্র চাষের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। তখন থেকে অর্থনীতির বইয়ে লেখা হতে আরম্ভ হয়—ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ। কি করে ইংরেজ দুর্ভাগ্যে কৃষি এবং শিল্প ও বাণিজ্য-প্রধান এই মহাদেশকে কৃষিতেই নির্ভর করতে বাধ্য করে, তার প্রথম দিকের কাহিনী রমেশচন্দ্র দত্তের 'India under early British Rule'—বইয়ে লেখা আছে—

"India in the 18th century was a great manufacturing as well as a great agricultural country and the products of the Indian looms supplied the markets of Asia and Europe. .....England killed Indian industries so that British manufactures might flourish."

মানে :—অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারত শিল্প ও কৃষি দুইতেই খুব বড় ছিল। ভারতের বস্ত্র এশিয়া ও য়ুরোপের চাহিদা মেটাত.....ইংরেজ তার নিজের শিল্প-সমৃদ্ধির জন্য ভারতের শিল্পকে নষ্ট করে।

এভাবে শোষণে লোক অসহায় হয়, অসহায়ে শাসনের সুবিধা হয়। শাসন ও শোষণ দীর্ঘ দেড়শ বছর চলে আমাদের স্বাধীনতায় এর সমাপ্তি ঘটে। এজন্যই স্বাধীনতার দাম সাধারণের কাছে এত বেশী। অবশ্য, অনেকদিনের সঞ্চিত অজ্ঞতা, অস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্য স্বাধীনতার সঙ্গেই চলে যাবে না। কৃষিকে অর্থকরী করে, শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে, শিক্ষাকে প্রসস্ত করে ও জন-স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সাধারণের জন্য সুগম করে দীর্ঘদিন সততার সঙ্গে ভ্রান্তিহীন চেষ্টা করলে দেশ আবার আগের মতন কেবল নয় তার চাইতেও সমৃদ্ধ হবে। এটা দুরাশা নয়। কিন্তু আমরা সত্য সত্য কল্যাণের পথে এগিয়ে চলেছি কি না তা' ভাল করে বিচার করা প্রয়োজন।

কল্যাণের পথ, কথায় নয় কাজে, সকলের এগিয়ে যাবার পথ। স্বাধীনতার পরে এ পথে কি আমরা সত্য চলেছি? দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চারটি বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে; বাংলায় বলা যায় :—

(১) আমাদের জীবন-যাত্রার মান বাড়াতে হবে, জাতীয় আয় বাড়িয়ে;

(২) দ্রুত শিল্প-প্রসার করতে হবে, বিশেষতঃ সেই সব মূল শিল্পের—যার সাহায্যে অন্য শিল্পসমূহ উৎপন্ন হতে পারে;

(৩) সাধারণের কর্মের ক্ষেত্র অনেক বেশী বাড়াতে হবে, স্থায়ী বা সাময়িক বেকারের সংখ্যা যাতে হ্রাস হয়; এবং

(৪) সাধারণের ও শ্রেণিবিশেষের মধ্যে আয়ে ও বিত্তে যে অসাম্য আছে তা কমিয়ে আনতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণের অধিকার আরও বেশী লোকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।

এ অতি উত্তম মাপকাঠি, এই মাপ-কাঠিতেই আমরা আমাদের বর্তমান শিল্প-প্রসারের পথ ও চেষ্টা বিচার করব। শিল্প-প্রসার সম্বন্ধে যে নীতি সম্প্রতি প্রচারিত হয়েছে (আচরিত এখনো নয়) তাতেও বলা হয়েছে—আমাদের রাষ্ট্র (ও অর্থনৈতিক জীবন) ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না—এটা হবে সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় গঠিত কল্যাণ-রাষ্ট্র। কিন্তু কাজে কি এ পথে আমরা চলেছি? সর্বসাধারণের জীবনযাত্রার পথ সুগম হলে দেশে কি বেকার এত বাড়তে থাকে? অর্থনীতিকেরা বলেছেন, জনসংখ্যার ৪৫'৮৪ জনের বয়স ১৯-৬১ বৎসরের মধ্যে; উপার্জনের এটাই সাধারণ বয়স। অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশের সম্প্রতি সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায়, উপার্জনশীল নরনারীর সংখ্যা এর এক-তৃতীয়াংশ মাত্র; অর্থাৎ উপার্জন করতে পারে সেই বয়সের লোকের মধ্যে তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র লোক কোন না কোন কাজে নিযুক্ত আছে—বাকী লোকের অর্থকরী পুরো কাজ আছে, বলা যায় না। উপার্জন যারা করে তাদের পোষ্য সংখ্যা গড়ে ৪ জন। আর এদের মধ্যে শতকরা ৬০ জনের আয় মাসে একশত টাকার বেশী নয়। মাসে পঞ্চাশ টাকা আয় এমন উপার্জনশীল লোকের সংখ্যাও কম নয়। সুতরাং দাঁড়ায়—এই চড়া দামের বাজারেও—দাম চড়ারও যেখানে শেষ নেই—মাথা পিছু সাধারণ লোকের আয় মাসে ১২৲-২৪৲ টাকার মধ্যে, যারা উপার্জন করে কেবল সেই সব পরিবারের হিসাব ধরলে। যারা উপার্জন করে না তারা এর বাহিরে। কর্মহীনতা আমাদের কমছে না—বাড়ছে। কেবল সহরাঞ্চলে বেকার ও অর্ধ-বেকারের সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ। অধ্যাপক মহলানবীশ বলেছেন—"অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যতিরেকে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।"

অর্থনৈতিক উন্নতি, হিসাবে বলে, কিছু হয়েছে; আমাদের জাতীয় আয় ১৯৪০-৪১ সালে ৯,১১০ কোটি টাকা ছিল, পাঁচ বছরে (১৯৪৪-৪৯ সালে) বেড়ে ১০,৮০০ কোটি টাকা হয়েছে। মাথা পিছু গড় আয় পাঁচ বছরে ১১০ থেকে ১২১ সংখ্যায় দাঁড়িয়েছে। এই বাড়তিটা যদি অনেকটা সমানভাবে হ'ত তাহলে তাকে সত্য অর্থে কিছু পরিমাণ দেশের আর্থিক উন্নতি বলতে পারতাম। কিন্তু তা হয় নি। দেশে কৃষি উৎপাদন, বলা হয়েছে, পাঁচ বছরে বেড়েছে ২৬ থেকে ১১৫ সংখ্যায়। কিন্তু জন-সংখ্যাও বেড়েছে এই সময়ে প্রায় আড়াই কোটি স্বাভাবিক ভাবেই। আর বিশেষ করে বাংলায় বাস্তু ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে প্রায় ৪০ লক্ষ; সুতরাং এখনো আমরা নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়নি; কৃষি-প্রধান দেশে সাধারণের আর্থিক উন্নতির এ চেহারা হয় না। শিল্প-প্রসারও হয়েছে; হিসাবে বলে, পাঁচ বছরে ২৬ অঙ্ক মত বেড়েছে। এই শিল্প-প্রসারে এমন সব বস্তু আছে, যার উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাধারণের আর্থিক উন্নতি হয়েছে বলা যায় না—যথা মোটর গাড়ী, রেডিও, ডিজেল ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ও যন্ত্রাদি, ব্যাটারি,রবার, সাইকেল, সেলাইয়ের কল, প্রভৃতি। সিমেন্ট, ইস্পাত প্রভৃতির উৎপাদন বাড়লেও চাহিদার তুলনায় তা এখনও অনেক কম; এগুলো নিয়ন্ত্রিত পদার্থ, সাধারণের নাগালের অনেক বাহিরে।

অন্ত জিনিষ যা সাধারণে বেশী ব্যবহার করেন, যেমন মিলের কাপড়, কয়লা, চিনি, চা, এলুমিনিয়মের বাসন প্রভৃতি—এদের উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু দাম কমেনি; আর এদের দাম মালিকেরা ঠিক করেন—চোখ রেখে, লাভের হিসাব যেন কখনো না কমে। দেশের সাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে জাতীয় সরকারও মধ্যে মধ্যে দাম নির্ধারণ করেন, কিন্তু সেটা প্রায় দাম বাড়িয়ে; তার সাম্প্রতিক উদাহরণ কয়লা ও মিলের কাপড়।

যাদের আয় আগে ভাল ছিল, তাদের আয়ই যে বেড়েছে ও বাড়ছে, এর আরও প্রমাণ আছে। সৌদাগরবারে গরীব সাধারণ অর্থ নিয়োগ করে না বা করতে

পারেন বললে বোধ হয় ভুল হয় না। তাহাতে বোধ-করি হবে মূলধন ১২৮৭-৮৮ থেকে ১৯৪৪-৪৫ এই ছ'বছরে ৯,২৭,১৪ লক্ষ টাকা থেকে লক্ষে গড়িয়েছে। আমাদের দেশে বিদেশী কোম্পানি এখনও অনেক আছে, তার ঠিক সংখ্যা ৮২২; এর মধ্যে বিলাতী কোম্পানির সংখ্যা ৪৭৭; এটা ১৯৪৩-৪৪ সালের হিসাব। আর এই দেশী ও বিলাতী কোম্পানির সহযোগে (এখন স্বদেশী ও বিদেশী পুঁজিপতিদের সহযোগিতার যুগ) যে সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে, তা দেশের গরীব সাধারণের হাতে অনেকটা যাচ্ছে, এ কথা বলা যায় কি? অর্থনৈতিক জীবনে ক্ষত অসাম্য বাড়ছে: দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সাধারণের জীবনযাত্রার মান যে এখনো খুব নীচে, এ কথা স্পষ্ট বলা হয়েছে। আর এই অসাম্য কমাবার জন্য দীর্ঘ পাঁচ পাতার আলোচনা পরিকল্পনার প্রামাণ্য বইয়ে আছে। আলোচনা ভাল, তাতে জ্ঞান বাড়ে, কিন্তু এই জ্ঞান কাজে যদি না লাগানো হয়, তাহলে ইহা চিত্তের বিভ্রান্তিই কেবল ঘটায়। শিল্প-প্রসারের যে লক্ষ্য আমরা কথায় বলেছি—সাধারণের কল্যাণ—মনে হয়, কাজে তা বিপরীত পরিণতির দিকে দেশকে নিয়ে চলেছে।

পতিত কাহারা?

ছেলেবেলার সময়ে ছোট ছোট জাতি বলিয়া যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রাণী আছে এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে এক সমস্যা আছে তাহা বুঝিতেও পারি নাই। সেদিন বাঁকুড়ার পতিত, অস্পৃশ্য জাতির অনেকে ঘোরতর দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়াছিল। তাহাদের সাহায্যের আবেদন লইয়া সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে অনশনে শীর্ণ পুরুষেরা সাহায্য অস্বীকার করিয়া দুর্দশা ছাত্রদিগকে দেখাইয়া দিল। শিশুরাও মুষ্টিমেয় আহার পাইয়া তাহা ছাত্রদের মধ্যে বণ্টন করিল। ইহার পর প্রশ্নটির আর অর্থ করা কঠিন হইয়াছে। বাস্তবপক্ষে কাহারা পতিত,

আমরা ৯৫

—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

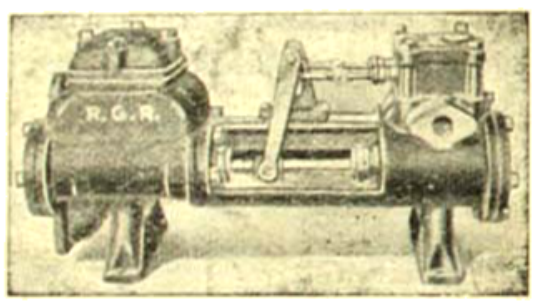

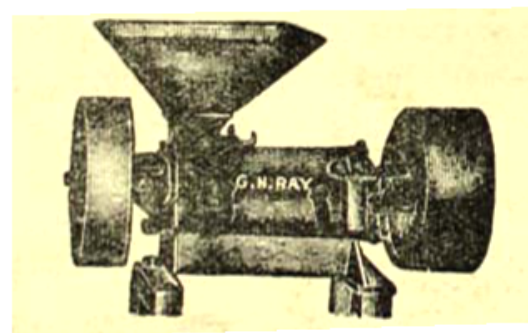

ধানভা'ঙা কল, তেলের ঘানি, কক্, ভাল্ভ্, টিউব-ওয়েল পাম্প, ষ্টিম পাম্প, ওয়েল পাম্প, তুলের চুল্লী বা ছাসক্ দারমের নির্মাতা, ইণ্ডিয়ন মেরামতকারক ও অর্ডার সাপ্লায়ার্স

●

● ●

গোপীনাথ রায় এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

৬৯, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া ফোন: হাওড়া ৫৬৩

উচ্চশ্রেণীর সর্ব রকম

ভাল্‌ভ (Valve) ও কক্‌ (Cock) প্রস্তুতকারক

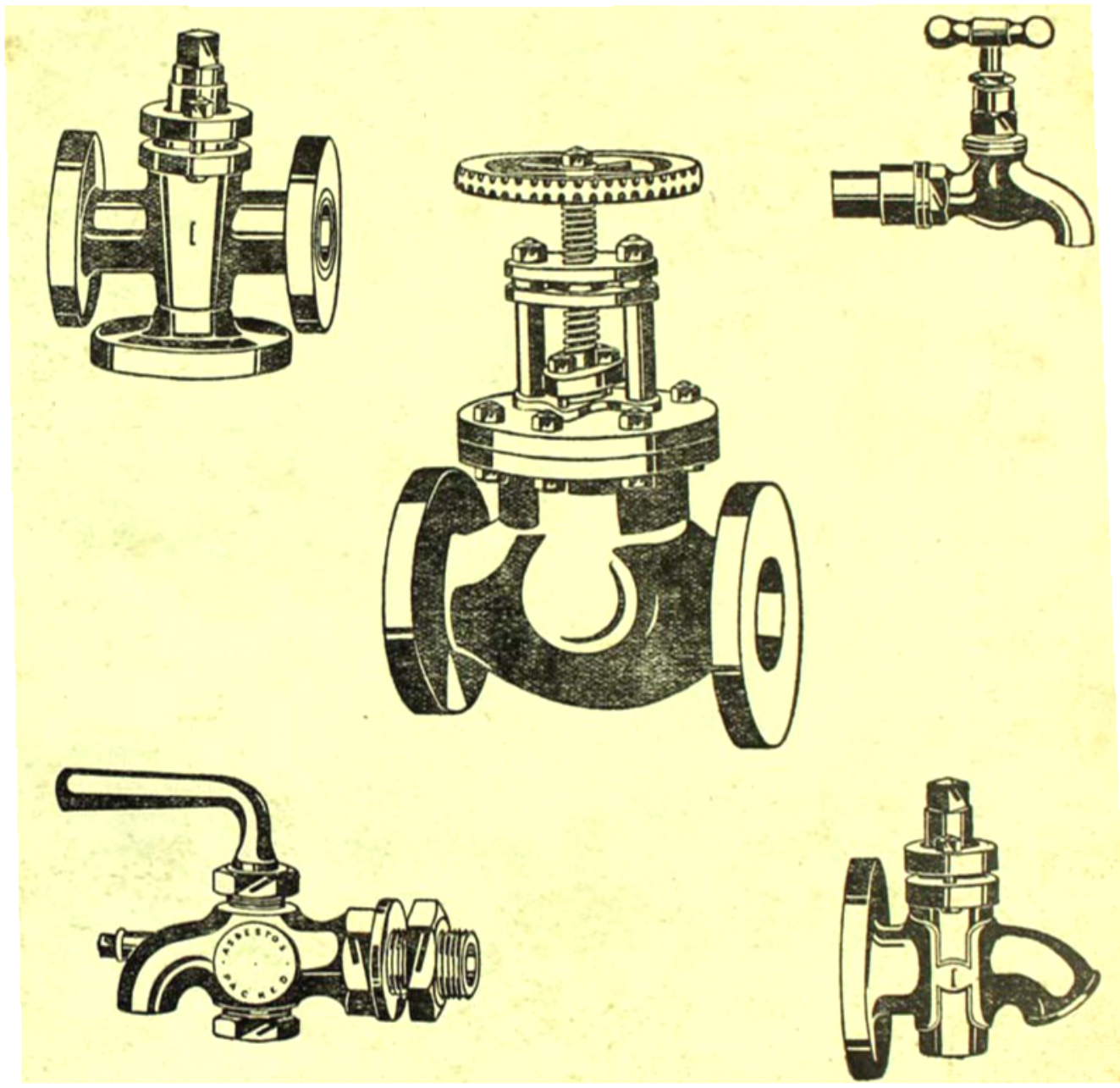

অন্নপূর্ণা মেটাল ওয়ার্কস

কলিকাতা-৩৯

Regd. No. July-August 1956 প্রতি সংখ্যা আট আনা

With best compliments of

The Central Trading Co.

137, CANNING STREET
CALCUTTA 1

SPECIALISTS OF ALL TYPES OF BALL,

ROLLER & TAPER ROLLER BEARINGS

Telephones : { 22-5838
22-5839

'CUCKOO'

নারায়ণ পাল কর্তৃক ৫১এ, বলাইচন্দ্র বোড, কলিকাতা-১ নিউ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোঃ প্রাইভেট লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও ৮৭ নং মনোহর দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭ হইতে প্রকাশিত।

মুসলিম

তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৩

॥ সূচীপত্র ॥

বাঙ্গালীর প্রতিমা পূজা ও দুর্গোৎসব—বিপিনচন্দ্র পাল ১২৩

আমার চোখে দেখা সোভিয়েৎ দেশ—ডাঃ ক্ষেত্রেন্দ্রকুমার পাল ১৩৮

রূপান্তরের জন্য—পরিতোষ বাঁ ১৪৬

আস্বাদ (গল্প)—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ১৫৪

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
(ইংরাজী হইতে) অনুবাদক—মণিষা গচি

সংগত (গল্প)—বিমল দত্ত

কবিতা:—

আবার ঘরি—জীবনানন্দ দাশ

মস্ত মহুয়ার দেশে—আবুল কাসেম রহিমউদ্দীন

জন্মদিনে—কালিদাস রায়

সান্ধ্য সাধনা—স্নেহাঙ্কর ভট্টাচার্য

দীপেনকে চিঠি—জগদীশ মণ্ডল

বিংশ শতাব্দী—অরুণচন্দ্র চক্রবর্তী

তোমারই জন্য—কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনটি কবিতা—এজ্‌রা পাউণ্ড—অনুবাদক ভূমেন্দ্র গুহ

পাখি (গল্প)—সুবোধ ঘোষ

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান : ভারত-সভা—জ্ঞানাঞ্জন পাল

॥ পাদপূরণ ॥

পূজার অর্ঘ্য—ভক্তি না উত্তেজনা—রবীন্দ্রনাথ
আদাম কুরীর জীবন কথা—ইভ কুরী (অনুদিত)
বাংলার বাউলদের সাধন—ক্ষিতিমোহন সেন
নগর ও গ্রাম—রবীন্দ্রনাথ

॥ পত্রিকা সম্বন্ধে ॥

যুগযাত্রীর বার্ষিক সডাক মূল্য ছ'টাকা। আষাঢ় থেকে বর্ষ সুরু। সব বিষয়ের মৌলিক রচনাই আমরা সাদরে গ্রহণ করব। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে লিখে সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন। অমনোনীত রচনা উপযুক্ত ডাকটিকিট ও ঠিকানা দেওয়া থাকলে যথাসময়ে ফেরৎ দেওয়া হয়। পত্রিকায় সমালোচনার জন্য দু'খানা করে বই সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন। চিঠিপত্র ইত্যাদি সম্পাদকীয় কার্য্যালয়ে প্রেরিতব্য। নীচে বিজ্ঞাপনের হার দেওয়া হ'ল।

কভার	৪র্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০৲	ভিতরে	পূর্ণ পৃষ্ঠা	৩০৲
ঐ	২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা	৪০৲	ঐ	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৮৲
ঐ	১ম অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	২৫৲	ঐ	সিকি পৃষ্ঠা	১০৲

সম্পাদকীয় কার্য্যালয়
৪১-এ, বলদেওপাড়া রোড,
কলিকাতা-৯
ফোন : বড়বাজার ৩৭০২

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

দুর্গোৎসব

প্রথম বর্ষ | ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৩ | তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা

বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজা ও দুর্গোৎসব

বিপিনচন্দ্র পাল

প্রাচীনেরা দুর্গাকে যে-চক্ষে দেখিতেন, সে-চক্ষু আমরা হারাইয়াছি। "দুর্গা! দুর্গা!" বলিতে তাঁদের চক্ষে জল, শরীরে পুলক, হৃদয়ে ভক্তি, প্রাণে বল, আত্মাতে আরাম আসিত। দুর্গানামের সে শক্তি আমাদের নিকটে আর নাই। তাঁরা যে-ভাবে দুর্গাপূজা করিতেন, আমাদের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। অথচ এই পূজার সময়ে আমাদের মনটাও কেমন কেমন করিয়া উঠে!

জানি না কেন, শরতের প্রাতঃকাল বড় মিষ্টি লাগে। শরতের বাল-সূর্য্য প্রাণের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া কত সুপ্ত স্মৃতিকে জাগাইয়া তোলে। শরতের বায়ু কাণে কাণে কি কথা কহিয়া যায়, বুঝি না; কিন্তু তাহাতে হৃদয়ে কি যেন একটা সাড়া পড়ে। আমরা পূজা ছাড়িয়াছি। আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের বিশ্বাস হারাইয়াছি। মনকে যত কেন চোখ ঠার দেই না, প্রতিমায় সত্য সরল ঈশ্বরবুদ্ধি আমাদের হয় না। তবুও কেন, পূজার সময়ে চারিদিকে যখন পূজার বাদ্য বাজিয়া উঠে, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতে অলক্ষিতে আমাদের সকল জ্ঞানবিজ্ঞান এবং যুক্তিতর্ক সত্ত্বেও প্রাণ নাচিয়া উঠে!

সকলের হয়ত এমনটি হয় না। আমাদের সন্তানদিগের এটি না হইবার কথা। কিন্তু এটি যার হয় না, তার বড় দুর্ভাগ্য নয় কি? আমাদের ছেলেপিলেরা এ বস্তু নিঃশেষে হারাইতেছে বলিয়া, তাদেরে কৃপা-পাত্র বলিয়া মনে হয়। তাদের মতবাদ হয়ত তাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মতবাদ অপেক্ষা বিশুদ্ধতর হইবে। তাদের তত্ত্বসিদ্ধান্ত হয়ত তাঁদের পিতামহদিগের তত্ত্বসিদ্ধান্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও সমধিক সত্যোপেত হইবে। তারা হয়ত বিশুদ্ধতর ঈশ্বরসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিবে। কিন্তু কেবল মতে বা সিদ্ধান্তে ধর্ম্মজীবনের বুনিয়াদ গড়ে কি?

ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা অতিপ্রাকৃতে। যাহা চক্ষে দেখি, কাণে শুনি, হাত দিয়া ধরি,—যাহা এসকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করি, যাহা এই মনের দ্বারা চিন্তা করি, যাহা লইয়া আমাদের প্রতিদিনের আহারবিহারাদি সম্পাদন করি, তাহার অতীতে, অপ্রাকৃতে তাহা হইতে পৃথক, আর একটা কিছু আছে, তাহার কিছুই দেখি শুনি না, অথচ তাহা আছে অনুভব করি; তাহার কিছুই ধারণা হয় না, অথচ তাহা যে নাই এমন ভাবিতে পারি না; তাহা ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ যাবতীয় বস্তুকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে;—এই যে বিশ্বাস, এই যে ধারণা, এই যে ভাব, ইহাই মানুষের ধর্ম্মের মূল বুনিয়াদ। এটি যে হারাইল, তার সব গেল। তার কেবল ধর্ম্ম গেল যে তাহা নয়, তার সর্ব্বস্ব গেল। সে মনুষ্যত্বের অধিকার নিজের হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া, সাধারণ পশুত্বের ভূমিতে যাইয়া দাঁড়াইল। আর দুর্গোৎসব যেমন করিয়া বাঙ্গালীর প্রাণে এই অতিপ্রাকৃতের ভাবটি জাগাইত, এমন আর কিছুতে ক'রত না। তারই আমেজ এখনও প্রাণের মধ্যে লাগিয়া আছে বলিয়া এই পূজার সময় প্রাণের ভিতরটা অমন করিয়া নড়িয়া চড়িয়া উঠে।

বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজা

প্রতিমা-পূজা বাংলার বিশেষত্ব। ভারতবর্ষের আর কোথাও এভাবের মূর্ত্তিপূজা নাই। অন্যত্র দেবতার মূর্ত্তি আছে, কিন্তু সে-সকল মূর্ত্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। সে-সকল মূর্ত্তি সর্ব্বদা রহিয়াছে। যজমানেরা পর্ব্বাহে কিম্বা গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে দেউলে যাইয়া দেবতার পূজা করিয়া আসেন। তাদের ঘরে ঠাকুরের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হয় না। বাংলাতেও দেউল আছে, পীঠস্থান আছে। সেখানে দেবতার মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতিদিন সে-মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। কিন্তু এসকল বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম্মজীবনের মূল প্রস্রবণ নহে। এগুলির দ্বারা বাঙ্গালী-চরিত্র গড়িয়া উঠে নাই। বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর চরিত্র, বাঙ্গালীর সংসার ও পরমার্থ গড়িয়া উঠিয়াছে তার নিত্য সন্ধ্যাবন্দনা ও নৈমিত্তিক পূজাদির দ্বারা। আধুনিক জ্ঞানের চক্ষে এই প্রতিমা-পূজা হীন এবং হেয় মনে হইলেও, ভাবের রাজ্যে ও রসের রাজ্যে এসকলের একটা বিশেষ মূল্য আছে।

ত্রিবিধ বৈদান্তিক উপাসনা

প্রাচীন বেদান্তে তিন প্রকারের উপাসনার বিধান আছে। প্রথম স্বরূপ-উপাসনা, দ্বিতীয় সম্পদ্-উপাসনা, তৃতীয় প্রতীকোপাসনা। আত্মার উপাসনা স্বরূপ-উপাসনা। আত্মার মধ্যে পরমাত্মার উপলব্ধি, নিজের স্বরূপেতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভ, অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন, ধ্যানযোগে ব্রহ্মাত্মৈক্য অনুভব করা, ইহাই স্বরূপ-উপাসনা। এই উপাসনা কেবল সমাধির অবস্থাতেই সম্ভব হয়। এই উপাসনার জন্য সকল ইন্দ্রিয়ের একান্ত নিরোধ আবশ্যক। সর্ব্বেন্দ্রিয়-চেষ্টার নিঃশেষ নিবৃত্তি না হইলে এ উপাসনা সম্ভব হয় না। ইহা যোগের পথ। যতক্ষণ না সাধকের এই অবস্থা লাভ হইয়াছে, যতক্ষণ না তাঁর ইন্দ্রিয়সকল নিবৃত্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়াছে, ততক্ষণ তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে স্তবস্তুতি প্রভৃতির আবৃত্তি করিতে হয়। বেদান্তে এ পথও প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্ত্রেতেও এই সকল স্তুতিবন্দনার উপদেশ আছে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ব্রহ্ম-স্তব এই স্বরূপ-উপাসনার দ্বারস্বরূপ। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর দেবীস্তবও তাহাই। সে কথা পরে বলিব। কিন্তু এই

স্বরূপ-উপাসনা উচ্চ অধিকারীর পক্ষেই সম্ভব। নিম্নতর অধিকারীর পক্ষে ইহা অসাধ্য। যাঁরা এই স্বরূপ-উপাসনার অধিকার লাভ করেন নাই, অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিবার শক্তি জন্মে নাই, যাঁহারা এখনও গভীর ধ্যান সাধন করেন নাই, তাঁহাদের জন্য সম্পদুপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে। দুটি বস্তুর মধ্যে কোনও সামান্য ধর্ম্ম থাকিলে, সেই ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া, তাহাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতর বস্তুর চিন্তা ও ধ্যানের দ্বারা বৃহত্তর বস্তুর জ্ঞানলাভ ও ধ্যানধারণার চেষ্টা করাই সম্পদুপাসনা। স্বরূপ-জ্ঞানের উপরে স্বরূপ-উপাসনার প্রতিষ্ঠা। আর সম্পদ-জ্ঞানের উপরে এই সম্পদুপাসনার প্রতিষ্ঠা। বালকেরা ভূগোল পড়িবার সময় পৃথিবীর আকারকে কমলালেবুর আকারের মতন ভাবিতে শিখে। পৃথিবীর সঙ্গে কমলালেবুর আকার-সাদৃশ্য আছে। পৃথিবীর আকার আমাদের চক্ষুগ্রাহ্য নহে। জ্যোতির্ব্বিদেরা গণিতের দ্বারা এই অদৃশ্য ও অদৃষ্ট পৃথিবীর আকার-আয়তনাদির প্রতিষ্ঠা করেন। এই গণনার দ্বারা তাঁরা ঠিক করিয়াছেন যে, পৃথিবী পূর্ব্বপশ্চিমে গোল বা বৃত্তাকার, কিন্তু তার উত্তরদক্ষিণ একটু চাপা। এইটি স্থির করিয়া তাঁরা তাঁহাদের পরিচিত কমলালেবুর আকারের সঙ্গে পৃথিবীর আকারের সাদৃশ্য রহিয়াছে বুঝিলেন। তখন জনসাধারণকে পৃথিবীর আকার কিরূপ, ইহা বুঝাইতে যাইয়া, কমলালেবুর সাহায্য লইলেন। এইভাবে, কমলালেবুর আকার দেখাইয়া পৃথিবীর আকারের যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকে বেদান্তে সম্পদ-জ্ঞান কহে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে সূর্য্য, মন, প্রাণ প্রভৃতির সাহায্যে এই সম্পদ-জ্ঞান লাভ হইতে পারে। ব্রহ্ম চিদ্বস্তু। ব্রহ্ম সর্ব্বেন্দ্রিয়াতীত। ব্রহ্ম অবাঙ্মনসোগোচর, বাক্য, মনের সহিত তাঁহাকে খুঁজিতে যাইয়া, না পাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই ব্রহ্মের সঙ্গে কিন্তু এই যে দৃশ্যমান সূর্য্য, তাহার একটা সামান্য-ধর্ম্ম আছে। পরম-চৈতন্যরূপে ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ এবং বিশ্ব-প্রকাশক। সূর্য্যও জ্যোতিষ্করূপে স্বপ্রকাশ, আপনি উদিত না হইলে, কেহ কোন কিছুর দ্বারা সূর্য্যকে দেখিতে পায় না। আর সূর্য্য জগৎ-প্রকাশক। সূর্য্য উদিত হইয়া একই সঙ্গে আপনাকে প্রকাশ করে এবং চক্ষুগ্রাহ্য জগৎকেও প্রকাশিত করে। এইজন্য স্বপ্রকাশত্ব ও জগৎ-প্রকাশত্ব সম্বন্ধে ব্রহ্মের সঙ্গে সূর্য্যের একটা গুণ-সামান্য বা ক্রিয়াসামান্য আছে। এই গুণ-সামান্যকে আশ্রয় করিয়া, সূর্য্যের এই স্বপ্রকাশত্ব ও জগৎ-প্রকাশত্ব ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া সূর্য্যের ধ্যান-সহায়ে ব্রহ্মের ধ্যান করা, সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের চিন্তা করা, সম্পদুপাসনা। এইরূপে মনের উপাসনা, প্রাণের উপাসনাও সম্পদুপাসনা। যে বস্তুর সঙ্গে ব্রহ্মের যত অধিক গুণসামান্য থাকে, তাহার আশ্রয়ে ব্রহ্মোপাসনা সে পরিমাণ শ্রেষ্ঠতর সম্পদুপাসনা বলিয়া গণ্য হইবে। এইজন্য সূর্য্যোপাসনা অপেক্ষা মনোপাসনা, মনোপাসনা অপেক্ষা প্রাণোপাসনা, প্রাণোপাসনা অপেক্ষা আত্মবান সদ্‌গুরুর উপাসনা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতর উপাসনা বলিয়া গণ্য হয়। সূর্য্যাদির উপাসনা অপেক্ষা এই জন্য অবতারাদির ভজনা অশেষগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ ইঁহাদের সঙ্গে ব্রহ্মের স্বরূপের সাদৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বেদান্তমতে অবতারপূজা ও তান্ত্রিকমতে গুরুপূজা উভয়ই সম্পদুপাসনার অন্তর্গত। আর এই অবতারপূজা এবং গুরুপূজাই শ্রেষ্ঠতম সম্পদুপাসনা।

প্রতীকোপাসনা

নিম্নতম অধিকারীর জন্য প্রতীকোপাসনার ব্যবস্থা। বেদান্ত এই প্রতীকোপাসনাকে অধ্যাসজনিত

উপাসনা বলিয়াছেন। অধ্যাস অর্থ—অন্যত্রদৃষ্টঃ পরত্রাবভাসঃ। একস্থানে যে বস্তু দৃষ্ট হইয়াছে, অন্যত্র —যেখানে প্রকৃতপক্ষে তাহা নাই সেখানে—তাহার সত্তার আরোপ করার নাম অধ্যাস। জঙ্গলে সাপ দেখা গিয়াছে, ঘরের দৈঠায় দড়ী পড়িয়া আছে, এই দড়ীতে ঐ পূর্ব্বদৃষ্ট সর্পের সত্তা আরোপ করা বা কল্পনা করার নাম অধ্যাস। এই অধ্যাস প্রতীকোপাসনার প্রাণ। যে ঈশ্বরতত্ত্বের বা ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান পূর্ব্বে অন্যসূত্রে লাভ হইয়াছে, তাহাকে সম্মুখের ঘটপটাদিতে কল্পনা করিয়া, সেই ঘটপটাদির পূজাই প্রতীকপূজা। ঈশ্বরতত্ত্বের বা ব্রহ্মতত্ত্বের যে পূর্ব্বজ্ঞানের উপরে এই প্রতীকপূজার প্রতিষ্ঠা হয়, সেই জ্ঞান নিতান্ত অপরোক্ষ জ্ঞান। প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে সাধকের অন্তরে ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের কোনরূপ সাক্ষাৎজ্ঞান জন্মে নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। এ জ্ঞান শোনা জ্ঞান মাত্র; এ জ্ঞান শব্দ-জ্ঞান, বস্তু-জ্ঞান নহে। এই শ্রুত-জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া প্রতীকোপাসনা হইয়া থাকে। এই প্রতীকোপাসনাতে কেবল অতি-প্রাকৃতের অনুভূতির অনুশীলন হয় মাত্র। কোনরূপ সত্য ঈশ্বরজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান ইহা হইতে জন্মে না।

প্রতীকোপাসনা ও তত্ত্বস্ফূর্ত্তি

ফলতঃ কেবলমাত্র প্রতীকোপাসনার দ্বারা তত্ত্বস্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। যাঁরা ইহা মনে করেন এবং কোনও কোন সর্ব্বজনপূজনীয় সাধকেরা এপথে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বলেন, তাঁরা প্রতীকোপাসনার সঙ্গে অন্য যেসকল সাধন-ভজন অবলম্বিত হয়, তাহার কথা ভুলাইয়া দেখেন না। এদেশে কেবল প্রতীকের পূজা কেউ করে না। দিনে প্রতীকের পূজা একবার মাত্র হয়। কিন্তু সন্ধ্যাবন্দনা তিনবার করিতে হয়। সন্ধ্যাবন্দনার মন্ত্রও স্বতন্ত্র। ব্রাহ্মণেরা গায়ত্রী জপ করেন। অন্যেরা গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করেন। এসকল মন্ত্র ঈশ্বরপ্রতিপাদক বা ব্রহ্মপ্রতিপাদক। এই সকল ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি হয়, মন্ত্রে তাঁরা তন্ময়ত্ব লাভ করেন। মন্ত্র তাঁহাদের সর্ব্বময় হইয়া উঠে। এইভাবে এই নাম বা জপমন্ত্র যখন তাঁহাদিগকে নিঃশেষে আচ্ছন্ন ও একান্তভাবে অধিকার করে, যখন তাঁহাদের দেহমনপ্রাণ এই অজপার প্রভাবে মন্ত্রময় ও নামময় হইয়া উঠে, তখন তাঁহারা যোগ-সমাধির অবস্থা লাভ করেন। এইভাবে এই পথেই তাঁরা সিদ্ধিলাভ করেন, প্রতীকোপাসনার দ্বারা নহে। তাঁদের অন্তরঙ্গ সাধনের কথা বাহিরের লোক জানে না। বহির্মুখ লোকে সে খবর রাখে না। সুতরাং কেবল তাঁদের ক্ষণকালের বাহিরের সাধন-ভজন দেখিয়া, তাহারই ফলে সিদ্ধিলাভ হয়, এরূপ মনে করে।

বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজা

বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজাকে কিন্তু ঠিক প্রতীকোপাসনার শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তিকে প্রতীক বলা যায় না। অন্যদিকে এগুলিকে বেদান্তোক্ত সম্পদুপাসনার অবলম্বনরূপেও গ্রহণ করা অসম্ভব। সম্পদুপাসনার গুণসামান্যটা প্রত্যক্ষ ও বাস্তব হওয়া চাই। কালী, দুর্গা, প্রভৃতির সঙ্গে ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের সেরূপ কোনও প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব গুণসামান্য আছে, একথা বলা যায় না। আমাদের এসকল প্রতিমা-পূজাকে ফলতঃ বেদান্তের সম্পদুপাসনা বা প্রতীকোপাসনা, কোনও শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এগুলি খাঁটি প্রতীকোপাসনাও নহে, খাঁটি সম্পদুপাসনাও নহে।

এগুলি একটা মিশ্র বস্তু। এখানে প্রত্যেকে সম্পদে অদ্ভুত রকমে মাখামাখি হইয়া গিয়াছে। আর এই মাখামাখিটা বাঙ্গালীর ভাবুকতার বিশেষ ফল। এসকল প্রতিমা-পূজার মধ্যে বাঙ্গালী চরিত্রের বিশেষত্বটি অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এসকল প্রতিমা-পূজার ঐতিহাসিক তত্ত্ব পণ্ডিতেরা অনুসন্ধান করুন। এগুলি চীন হইতে আসিয়াছে, না তিব্বত হইতে আসিয়াছে, না আমাদের মাটিতেই জন্মিয়াছে; এগুলির সঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ও ভিন্ন ভিন্ন শাখার বৌদ্ধ-সাধনার সম্পর্ক কি ও কতটা; এগুলি প্রাচীন না অর্ব্বাচীন; এসকল কথার বিচার প্রত্নতত্ত্ববিদেরা করিতেছেন। সে সকল কথা আমি সাক্ষাৎভাবে বেশী জানি না। তার আলোচনা আমার সাধ্যাতীত এবং বর্ত্তমান প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন। যেখান হইতেই আসিতে এই প্রতিমা-পূজা বাংলাদেশে আসুক না কেন, এখন যে আকারে এসকল আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালীর হাতে গড়া বস্তু। এই প্রতিমা-পূজার মধ্যে বাঙ্গালী আপনার রস ও ভক্তি সঞ্চার করিয়া, তাহাকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। আর এখানেই বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব ফুটিয়াছে। এগুলির মূল ও পূর্ব্ব-ইতিহাস যাহাই হউক না কেন, বর্ত্তমান আকার ও উদ্দীপনা বাঙ্গালীর দেওয়া। পরের ঘর হইতে আসিলেও, বাঙ্গালী এগুলিকে নিঃশেষে আত্মসাৎ করিয়া বসিয়াছে। না করিলে, এগুলির এই মহত্ত্ব ও মর্য্যাদা থাকিত না।

বাঙ্গালী কবি। আমরা কবির জাত। কবি-কল্পনা বস্তুটি আমাদের অস্থিমজ্জাগত। ইহাতে বাঙ্গালীর ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে, সে বিচার যে করিতে চাহে করুক। কেহ কেহ ভাবেন, জানি যে বাঙ্গালী অমন ভাবপ্রবণ না হইলেই তার পক্ষে ভাল ছিল। তাহা হইলে সে শিখ বা মারাঠার মতন একটা ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিত। ইঁহারা শিখের বা মারাঠার জাতীয় চরিত্রের দাঁড়িপাল্লায় বাঙ্গালীকে চড়াইয়া তার ভালমন্দের ওজন করেন। এরূপ ওজন আমি করি না। বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব নষ্ট করিয়া আমি তাহাকে বড় করিতে চাই না। কেউ আপনার বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিয়া এ জগতে বড় হইতে পারে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। এজন্য বাঙ্গালীর ভাবুকতা, অপরের অপর গুণের তুলনায়, ভালই হউক আর মন্দই হউক, অতি মহার্ঘ বস্তু বলিয়া মনে করি। এটি গেলে বাঙ্গালীর সব গেল। আর বাঙ্গালী ভাবুকের জাত, কবির জাত বলিয়াই বাঙ্গালার ধর্ম্ম অমন মিষ্ট। এই জন্য বাংলার শাক্তও ভক্তির হিসাবে বৈষ্ণবের চাইতে কোনও দিন ছোট হন নাই। এইজন্য বাঙ্গলার প্রতিমা-পূজা বেদান্তের পুরাতন উপাসনার সকল শ্রেণীবিভাগকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

প্রতিমা-পূজার মর্ম্ম

মধ্যযুগের বৈদান্তিক মায়াবাদী বাঙ্গালী নিজেও এই প্রতিমা-পূজার নিগূঢ় মর্ম্ম ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই। এই জন্যই নিম্ন অধিকারীর জন্য বিহিত বলিয়া, এগুলির পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সত্যভাবে যিনি প্রতিমা-পূজা করিতে পারেন, তিনি ত নিম্ন অধিকারী নন, তিনি যে শ্রেষ্ঠতম অধিকারী।

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"

সাধকদিগের হিতার্থে ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়া এসকল প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে,—সকলেই একথা বলেন। কিন্তু এই পুরাতন শ্লোকের মর্ম্ম যে কি, ইহা অতি অল্পলোকেই তলাইয়া দেখেন। প্রথমতঃ ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হয়,—"সাধকানাং হিতার্থায়"—সাধকদিগের হিতের নিমিত্ত। কিন্তু "সাধক" কাহারা? মানুষমাত্রেই ত সাধক নয়। সাধক হইবার আগে, "সাধ্য" নির্ণয় আবশ্যক। যার সাধ্য নির্ণয় হয় নাই, তাহাকে সাধক বলা যায় কি? সাধকাবস্থা ধর্ম্মজীবনের প্রথমাবস্থা নহে, দ্বিতীয় অবস্থা। ধর্ম্মের প্রথম অবস্থাকে সাধুর প্রবর্ত্তাবস্থা বলিয়াছেন। এই প্রবর্ত্ত-অবস্থা অতিক্রম করিলে পরে, সাধকের অবস্থা লাভ হয়। এই প্রবর্ত্তাবস্থাতেই সাধ্য নির্ণয় হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইবার পূর্ব্বে সাধনারম্ভ হয় না, হইতেই পারে না। সাধন আরম্ভ না হইলে, কেহ সাধক হন না, হইতেই পারেন না। অতএব সাধকের অবস্থা ধর্ম্মের নিম্নতম অবস্থা নহে। সাধক নিম্ন অধিকারী নহেন। তাঁর চাইতে নিম্ন অধিকারী প্রবর্ত্তাবস্থায় যিনি আছেন তিনি। আর যে প্রবর্ত্তাবস্থা পর্য্যন্ত লাভ করে নাই, অর্থাৎ যার কোন ধর্ম্মজিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত উদয় হয় নাই, সে নিম্ন অধিকারীও নহে; একান্ত অনধিকারী। এ সংসারে জিজ্ঞাসুর সংখ্যা অতি কম, হাজারে এক জনও মিলে কি না সন্দেহ। সাধন-ধর্ম্মে সাধারণলোকের কোন অধিকার জন্মে না। তারা নিম্ন অধিকারী নহে, অনধিকারী।

"সাধকদিগের" হিতার্থে ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হয়, এ যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এই রূপ-কল্পনা সাধারণ লোকের জন্য নয়, ইহা মানিতেই হইবে। তারপর, এ কল্পনা করে বা করিবে বা করিতে পারে কে? ব্রহ্মের এসকল রূপ কাহার দ্বারা কল্পিত হয়, এ প্রশ্নটা কেউ তোলে না। এই প্রশ্নটা তুলিলেই এসকল প্রতিমা-পূজার মূল মর্ম্মটা খুলিয়া যায়। কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ তিনি জানেন, যিনি সে-স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন; তিনি কেবল ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিতে পারেন, অন্যে পারেন কি? রূপ বলিলেই যে স্বরূপ আসে। বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান যার নাই, সে কি কখনও তার রূপ আঁকিতে পারে? অতএব ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিতে গেলে, তাঁর স্বরূপের প্রত্যক্ষ লাভ প্রয়োজন। যিনি রূপ-কল্পনা করিয়াছেন বা করেন, তিনি ব্রহ্ম কি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যে সাধকের হিতার্থে এই রূপের কল্পনা হইল বা হইয়াছে, সে সাধক ব্রহ্ম স্বরূপতঃ কি ইহা শুনিয়াছেন, কিন্তু দেখেন নাই। এই যোগাযোগ হইলে পরে তবে "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" সম্ভব এবং সার্থক হয়।

প্রেম-ধর্ম্ম ও প্রতিমা-পূজা

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা"—বলিয়া যাঁরা প্রথমে প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁরা নিজেরা কেবল সাধক নহেন, কিন্তু সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁরা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে তত্ত্বের প্রত্যক্ষ ও রসের উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাকেই বাহিরে ফুটাইতে যাইয়া এই সকল প্রতিমার প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেবল ভিতরে, কেবল সমাধিতে সে বস্তুকে দেখিয়া তাঁদের তৃপ্তি হয় নাই। সমাধি ত দেহীর নিত্য অবস্থা নহে। সমাধি ভাঙ্গিলেই ইষ্টদেবতার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়। এই বিচ্ছেদের

কালে তাঁহাকে ইন্দ্রিয় সমক্ষে জাগাইয়া রাখিবার জন্যই এই সকল রূপ-কল্পনা হইতে লাগিল। যাঁরা রূপ-কল্পনা করিলেন তাঁরা প্রথমে নিজের সাধনের জন্যই ইহা করেন, অপরের জন্য নহে। এই কল্পিত রূপ তাঁহাদের সম্ভোগের বস্তু হয়। ভক্ত আপনার ইষ্টদেবতাকে কেবল প্রাণের ভিতরে দেখিয়াই পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। আপনার সাধনের ধনকে কেবল ধ্যান ও সমাধিতে পাইয়াই তাঁর সাধ মিটে না। সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তিনি তাঁহাকে ভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হন। যে ইন্দ্রিয়-চেষ্টার একান্ত নিবৃত্তি করিয়া প্রথমে তিনি আপনার ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, পরে অন্তরে অন্তরতম তাঁর সঙ্গে নিগূঢ় আলাপ পরিচয় হইলে, বাহিরেও, সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহাকে ধরিতে ছুঁইতে না পারিলে তাঁর আনন্দ ও তৃপ্তি যেন পরিপূর্ণ হয় না। সকল প্রেমের সম্বন্ধেতেই এটি হইয়া থাকে। প্রণয়ীযুগল প্রথমে নিভৃতে, দু'জনার একাকিত্বের মধ্যে, একান্ত অব্যবহিতভাবে পরস্পরকে পাইতে চাহে। তখন বাহিরের সমস্ত সকল প্রেম-সম্ভোগের অন্তরায় বলিয়া মনে হয়। তখন অপর কাহারও দৃষ্টি তাঁহাদের সহ্য হয় না। কিন্তু ক্রমে এমন সময় আসে যখন বিশ্বের মাঝে, বিশ্বের জনসঙ্ঘের সঙ্গে একাত্ম হইয়া, তাঁরা নিজেদের প্রিয়তমকে দেখিতে চাহেন। নিভৃতে প্রিয়তমকে নিজের হাতে সাজাইয়া, একেলা সে রূপ দেখিয়া তাঁদের আর তৃপ্তি হয় না; জগতকেও দেখাইতে ইচ্ছা হয়। সকল প্রেমিকের মনেই এক সময়ে না এক সময়ে প্রেমের এই বহির্মুখীনতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। অন্তরের সম্ভোগকে বাহিরে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতা সাধারণ প্রেম-ধর্ম্ম। এই ব্যাকুলতা কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। এই ব্যাকুলতা সাধকেরও হয়। আর প্রেমিক, সাধক, কবি ইহাঁরা সকলে যে একই-জাতীয় লোক। কবি প্রাণের ভিতরে যে রূপের বা রসের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাহাকে বাহিরে ফুটাইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়েন। এ অস্থিরতা, এ বেদনা প্রসূতির প্রসব-বেদনার মতন। এ ব্যাকুলতা, এ বেদনা সৃষ্টির অলঙ্ঘ্য বিধান। এ বেদনা প্রেমিকে জানেন। এ বেদনা কবি জানেন। এ বেদনা সাধকেও ভোগ করিয়া থাকেন। এই বেদনার মধ্য দিয়াই কবির অন্তরের রসমূর্ত্তি শব্দে ও বর্ণে, ছন্দে ও সঙ্গীতে বাহিরে ফুটিয়া উঠে। ইহারই ভিতর দিয়া সাধকের ধ্যানমূর্ত্তি প্রতিমার রূপে আবির্ভূত হন। বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজার মর্ম্ম বুঝিতে হইলে প্রেম-ধর্ম্মের এই সাধারণ প্রকৃতিটি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

ভাবাঙ্গ গঠন ও প্রতিমার সৃষ্টি

প্রেমিক, কবি, সাধক সকলেই আপনাপন প্রাণের এই রসবস্তুকে বাহিরে প্রতিষ্ঠা করিতে চান বটে, কিন্তু পারেন না। এ যে বাহিরের বস্তু নয়। এই রূপ যে অতীন্দ্রিয়। এই লাবণ্য যে ভাবের, বর্ণের নহে। এই সৌন্দর্য্য যে রসের, গঠন-পারিপাট্যের নহে। এ বস্তু অনঙ্গ, ভাবাঙ্গেতেই কেবল ফুটিয়া উঠে। সে ভাবাঙ্গের পরিপূর্ণ আলোক-চিত্র বা ফটোগ্রাফ তুলিতে পারে এমন যন্ত্র দুনিয়ায় নাই। যা আপনার মর্ম্মপটে সন্তানের যে রূপ দেখেন, বাহিরের চিত্রপটে তাহাকে পরিপূর্ণরূপে ফুটাইয়া তোলেন, এ শক্তি বিধাতা তাঁহাকে দেন নাই। প্রেমিক-প্রেমিকা প্রাণ-পটে আপনার প্রেম-পাত্রীর বা প্রেম-পাত্রের যে রূপ প্রত্যক্ষ করেন, কোনও চিত্রপটে তাহাকে নিঃশেষে অঙ্কিত করিতে পারেন না। কবি আপনার প্রাণের

'উভয়ে যাহা দেখেন, এমন শব্দ ও ছন্দ আজিও জগতে আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার দ্বারা সে-বস্তুর পরিপূর্ণ মূর্তি ফুটাইতে পারা যায়। এইজন্য রসমূর্তি মাত্রেই একটা অতৃপ্তি জাগাইয়া রাখে। এরাজ্যে ব্যর্থ চেষ্টাই সার্থক, নিষ্ফল প্রয়াসই সর্বাপেক্ষা অধিক সফলতা লাভ করে।

মানুষের রসের সম্বন্ধসকল বিশিষ্ট-আধারকে ধরিয়া ফুটে; কিন্তু এসকল আধারকে ছাপাইয়া উঠে। সাগর-দৃশ্যে যেমন ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গগুলি দিগন্ত-প্রসারিত হইয়া ক্রমে অনন্ত আকাশের গায়ে মিলিয়া মিশিয়া যায়, মানুষের রসের সম্বন্ধ সকলও সেইরূপ বিশিষ্টকে ধরিয়া গড়িয়া উঠে, কিন্তু গড়িতে গড়িতেই ক্রমে নির্বিশেষে যাইয়া মিশিয়া পড়ে। মাতার স্নেহ ক্ষুদ্র শিশুকে ধরিয়াই প্রথমে ফুটে, কিন্তু ক্রমে বাৎসল্যের অনন্তঘনিরঞ্জন বিশ্বরূপেতে যাইয়া মিলিয়া যায়। তখন সকল সন্তান, বিশ্ব সন্তান তাঁর বাৎসল্যের মূর্তি হইয়া উঠে। কিন্তু এ ত মূর্ত নহে। বিশিষ্ট সন্তানই মূর্ত, সাকার; বিশ্ব-সন্তান একই সঙ্গে মূর্ত ও অমূর্ত, সাকার ও নিরাকার। প্রথমে যে আধারকে আশ্রয় করিয়া সন্তানের মাতৃভক্তি জাগিয়া উঠে ও বাড়িতে থাকে, তাহা বিশিষ্ট বস্তু, সন্দেহ নাই। এ যে আমার মা। প্রথমে কারও সঙ্গে ভাগা-ভাগি সহ্য হয় না। আর কেউ তাকে মা বলিয়া ডাকিলে প্রাণ জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু ক্রমে যখন সন্তান আপনার ভক্তিবলে প্রাণের মধ্যে মাকে পরিপূর্ণভাবে পায়, তখন তার এই বিশিষ্ট জননীর মধ্যে সে বিশ্ব-জননীকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। এক কণ্ঠে মা বলিয়া তার প্রাণ জুড়ায় না। জগৎ-জোড়া সে মা-নাম শুনিতে চায়। তখন দুনিয়ার লোককে ডাকিয়া, মা ডাক শুনিবার জন্য তার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে। তখন তার বাহিরের মাতৃরূপ অন্তরের মধ্যে বিশ্বমাতারূপে ফুটিয়া উঠেন। তখন সে যে মাতৃমূর্তি আঁকিতে চায়, তাহা কেবল তার নিজের মা নয়, সকলের মা। কেবল মানুষের মা নয়, সকল জীবের মা। সকল সৃষ্টির মা। এই মা মূর্তও নহেন, অমূর্তও নহেন। এই মাকে সাকারও বলিতে পারি না, নিরাকারও বলিতে পারি না। এই মা একই সঙ্গে মূর্ত ও অমূর্ত; সাকার ও নিরাকার। মূর্তকে ছাড়িয়া অমূর্ত শূন্য, মিথ্যা, বন্ধ্যাপুত্রবৎ অলীক-কল্পনা। অমূর্তকে ছাড়িয়া মূর্ত অপূর্ণ, অর্থহীন, শুষ্ক জড়পিণ্ড, চক্ষুর ক্রীড়নক মাত্র, অমৃতের প্রেরণা তাহাতে পাওয়া যায় না। সত্য যাহা, বস্তু যাহা, তাহা যুগপৎ মূর্ত ও অমূর্ত, সাকার ও নিরাকার। যতটুকু যখন প্রকাশিত হয় ততটুকুই তখন মূর্ত ও সাকার; আর যাহা প্রকাশিত হয় না, তাহা সর্বদাই অমূর্ত ও নিরাকার। কিন্তু প্রকাশ যাহা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাকে ছাড়িয়া তার পেছনে যাহা অপ্রকাশিত আছে, তার কোনও সন্ধান পাওয়া সম্ভব কি? প্রকাশ ও সত্তা, রূপ ও স্বরূপ, গতি ও শক্তি, আবির্ভাব ও ভাব, মূর্ত ও অমূর্ত, সাকার ও নিরাকার, সসীম ও অসীম এ সকল একে অন্যকে ছাড়িয়া কদাপি থাকে না। এই যুগ্ম বস্তুকেই প্রাচীন ব্রহ্মবাদীগণ ছায়াতপের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন।

বিশিষ্ট সন্তান মূর্ত; বিশ্ব-সন্তান অমূর্ত। বিশিষ্ট জননী মূর্ত; বিশ্ব-জননী অমূর্ত। বিশিষ্ট সখা মূর্ত, বিশ্ব-সখা অমূর্ত। বিশিষ্ট নায়ক ও বিশিষ্ট নায়িকা মূর্ত, বিশ্ব-নায়ক ও বিশ্ব-নায়িকা অমূর্ত। এক ও এক যোগ করিয়া যেমন দুই হয়, এভাবেভিন্ন ভিন্ন সন্তান বা মাতা, সখা, প্রণয়ী-প্রণয়িনীকে যোগ করিয়া

তাদের যোগফলরূপে বিশ্ব-সন্তান বা বিশ্ব-মাতা বা বিশ্ব-সখা বা বিশ্ব-নায়ক বা বিশ্ব-নায়িকা প্রকাশিত হয় না। গণিতের পথে এই বিশ্ব-বস্তুর সন্ধান মিলে না। সে পথ জীবনের পথ। ইহার সঙ্কেত গণিতে নাই, জীব-তত্ত্বেই কেবল ইহার আভাস পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এক করিয়া তাদের যোগফল-রূপে জীববস্তুকে বা জীবন-বস্তুকে পাওয়া যায় না। এই জীবন প্রত্যেক অঙ্গের মধ্যে, অথচ প্রত্যেক অঙ্গকে ছাড়াইয়া, সকল অঙ্গসমষ্টির মধ্যে, অথচ সে সমষ্টিকে অতিক্রম করিয়া আছে। এই জীবনের ছাপ প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপরে আছে। এই জীবনের প্রেরণায়, এই জীবন-বস্তুকে পরিপূর্ণ করিবার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়। এ বস্তু সকলের নিয়ামক, সকলের নিয়তি। অঙ্গসকল এই অনঙ্গ বস্তুকেই প্রকাশ করে, এই অনঙ্গ বস্তুকে পাইয়াই অঙ্গের সার্থকতালাভ হয়। বিশ্ব-সন্তান, বিশ্ব-মাতা, বিশ্ব-সখা, বিশ্ব-নায়ক ও বিশ্ব-নায়িকা সম্বন্ধেও ইহাই খাটে। প্রত্যেক বিশিষ্ট সন্তান, মাতা, সখা ও প্রণয়ী-প্রণয়িণীর মধ্যে এই বস্তু আছে। এই বস্তুকে প্রত্যেক বিশিষ্ট সন্তানাদি প্রকাশ করে, কিন্তু কেহই নিঃশেষ করিতে পারে না। এই অমূর্ত্ত রসবিগ্রহই সন্তানাদির টান, তাহাদের বিকাশ-গতির নিয়ন্তা। ইহাই বাৎসল্যাদি রসের সার্থকতা লাভের এক ও অনন্য নিদান। সখ্য বাৎসল্যাদির রসমূর্ত্তি-সকল এই অমূর্ত্ত রসবিগ্রহকেই ফুটাইতে চেষ্টা করে।

বৈদিক দেব-বাদ ও উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান

এজগতের সর্ব্বত্র বিশিষ্টে ও বিশ্বজনীনে, মূর্ত্তে ও অমূর্ত্তে, সাকারে ও নিরাকারে, রূপে ও স্বরূপে এই অদ্ভুত মখামাখি রহিয়াছে। আর বিশিষ্টের মধ্যে বিশ্বজনীনকে, মূর্ত্তের মধ্যে অমূর্ত্তকে, সাকারের মধ্যে নিরাকারকে, রূপের মধ্যে স্বরূপকে ধরিবার চেষ্টা করিতে যাইয়াই মানুষ তার যাবতীয় ধর্ম্ম, নীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প ও সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে। অতি আদিকালে মানবের শৈশব সাধনা মূর্ত্তের মধ্যেই অমূর্ত্তকে নিঃশেষে ধরিতে যাইয়া ইন্দ্র-বরুণ, ইলোহিম-জিহোভা, অহিমান-অহর্মজদা প্রভৃতি পুরাতন দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ইন্দ্রবরুণাদি চাক্ষুষ দেবতা ছিলেন। কিন্তু চাক্ষুষ হইলেও, তাঁদের সবটা মানুষ দেখিতে পাইত না। যাহা দেখিত তার মধ্যেও একটা রহস্য জাগিয়া থাকিত। তখন এসকল চাক্ষুষ দেবতার মধ্যে ঐ রহস্যটুকুই অতীন্দ্রিয়ের ও অমূর্ত্তের সঙ্কেতটি জাগাইয়া রাখিত। ক্রমে মূর্ত্ত হইতে অমূর্ত্ত, চাক্ষুষ হইতে অচাক্ষুষ, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা হইতে যাহা ইন্দ্রিয়াতীত, পৃথক হইয়া পড়িল। তখন মানুষের ভেদবুদ্ধি প্রবল হইয়া উঠিল। সে হাঁ ও না'র রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। যাহা হাঁ, তাহা না নয়; যাহা সৎ তাহা অসৎ নয়, যাহা নৃত তাহা অনৃত নয়, যাহা মর্ত্য তাহা অমৃত নয়, যাহা পরিণামী তাহা নিত্য নয়, এইভাবে সে দুনিয়াটাকে কাটিয়া চিরিয়া ভাগ করিল। দেবতাকে খুঁজিতে যাইয়া সে যাহা কিছু দেখে, তাহাকেই তখন নেতি নেতি বলিয়া বিদায় দিতে লাগিল। না-টা তখন হাঁ অপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। প্রত্যক্ষ অসৎ; এই আছে, এই নাই। অপ্রত্যক্ষ অজ্ঞেয় কিম্বা শুদ্ধ সত্তামাত্র-জ্ঞেয়। এইজন্য অমূর্ত্তকে মূর্ত্ত হইতে, স্বরূপকে রূপ হইতে, অতীন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়জগত হইতে একান্ত পৃথক করিতে যাইয়া, মানুষ এক মহাশূন্যে, এক প্রলয় অন্ধকারে পড়িয়া গেল। এই অন্ধকারে

ও মহাশূন্যে তার প্রাণ হাহাকার করিতে লাগিল বটে, কিন্তু জ্ঞান পরিষ্কার হইল। আগে সে রূপের আর স্বরূপের প্রভেদ বুঝে নাই। এবারে বুঝিল, রূপ আর স্বরূপ ভিন্ন বস্তু। তবে বিবেক জাগিল বটে, কিন্তু প্রাণ জুড়াইল না। তখন সে সেই মহা-শূন্য-সিন্ধু মন্থন করিয়া, তাহা হইতে সকল রূপের সার শ্রীকে ও সকল রসের নিদান অমৃতকে তুলিল। বাক্তিরেকী পথে যাইয়া মানুষ নিরাকারে, অরূপে, শূন্যে পৌঁছিয়াছিল। এবারে ফিরিয়া অন্বয়ী পন্থা ধরিয়া আসিয়া সকল আকারকে সেই নিরাকারের দ্বারা, সকল রূপকে সেই অরূপের দ্বারা, সকল শূন্যকে সেই পরিপূর্ণের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। আমাদের প্রাচীন উপনিষদের সাধক এই অবস্থা লাভ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ

ঈশ্বরের দ্বারা এই চঞ্চল বিশ্ব-রাজ্যকে আচ্ছাদন করিয়া তিনি এই ঈশ্বরের সঙ্গে যাবতীয় কা ভোগ করিতে লাগিলেন। তাহার এই শ্লোক হইল—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদো নিহিতং গুহায়াং
পরম ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ।
ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।

সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত ব্রহ্মকে যিনি আপনার নিগূঢ়তম অন্তরের শ্রেষ্ঠ আকাশে নিহিত জানিয়াছেন, তিনি এই সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হইয়া সমুদায় কামাবস্তু ভোগ করেন।

ভক্তি-সাধন ও রসমূর্তি

কিন্তু ইহাতেও তাঁর সকল আশা পূরিল না, সকল সাধ মিটিল না। ইহাতে বিষয়রস শুষ্ক, নির্মল, ভক্তিসিক্ত হইল মাত্র। কিন্তু যাঁহার রসের কণামাত্র পাইয়া এবিষয় এমন মিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাকে ভাল করিয়া, প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন করা গেল না। পরম সুন্দর যিনি, যাঁর সৌন্দর্যের ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আভা পাইয়া জগতের সকল সুন্দর বস্তু অমন মিষ্ট হয়, তাঁর সাক্ষাৎকারলাভ হইল না। অন্তরের মধ্যে, প্রাণের ভিতরে, মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেও, চক্ষে তাঁহাকে দেখা গেল না। অথচ চক্ষুর ঐটীই গভীরতম পিপাসা। চক্ষু চারিদিকে সেই অলখনিরঞ্জনের রূপই যে খুঁজিয়া বেড়ায়। যতক্ষণ মনে করে এই মুখে, এই দেহে, এই বিগ্রহে, এই আধারে সেই রূপ লুকাইয়া আছে, ততক্ষণ লুব্ধ মধুপের মতন চক্ষু নির্নিমেষে তাহার উপরে বসিয়া থাকে। দর্শনে ধ্যানে তাহাতেই ডুবিয়া রহে। কিন্তু যখন দেখিল, এই রূপে সেই রূপ নিঃশেষে লুকাইয়া নাই, তখন ইহাকে ছাড়িয়া অন্যমুখে যাইয়া বসিল। ইহাই ত জীবের ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যের কারণ। ইন্দ্রিয় যাহা চায়, তাহা পায় না বলিয়াই ত এরা অমন উড়ো উড়ো ভাবে অস্থির হইয়া বিষয়ে বিষয়ে ঘুরিয়া মরে। ভিতরে পাইয়া সাধ পূরিল না। বাহিরে ঘুরিয়াও প্রাণ জুড়াইল না। তখন সাধক ভিতর-বাহির এক করিবার জন্য অস্থির হইলেন। তখন তিনি রূপে ও অরূপে, মূর্ত্তে ও অমূর্ত্তে, সাকারে ও নিরাকারে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যে ও অতীন্দ্রিয়ে, সজাগে ও সমাধিতে মাখামাখি করিয়া আপনার ইষ্ট-মূর্ত্তি রচনা করিতে আরম্ভ করেন।

আদিতে দৃষ্টে ও অদৃষ্টে, চাক্ষুষে ও অচাক্ষুষে, সাকারে ও নিরাকারে, সসীমে ও অসীমে, মূর্ত্তে ও অমূর্ত্তে একটা মাখামাখি ছিল। বৈদিক দেব-পিতৃবাদে শৈশব-জীবনের সেই স্মৃতি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সে মাখামাখি ছিল অজ্ঞানের ভূমিতে। তখন বিবেক জাগে নাই। আত্মা ও অনাত্মার ভেদজ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই। সে মাখামাখি ছিল প্রদোষের আলো-আঁধারের সৃষ্টি। এ মিশামিশি তাহা নহে। এখানে জ্ঞান পূর্ণ হইয়াছে। এখানে অনাত্মে আত্মভ্রম, আত্মাতে অনাত্মবুদ্ধি নাই। এ মাখামাখি অজ্ঞানতার বা অল্প-জ্ঞানের সৃষ্টি নহে। ইহা রসের সৃষ্টি। এখানে রসে মাখামাখি হইয়া জড় ও চেতন, চাক্ষুষ ও অচাক্ষুষ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, সাকার ও নিরাকার এক হইয়াছে।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং—

ঈশ্বরের দ্বারা এই সকলকে আচ্ছাদন করিতে হইবে—এখানকার উপদেশ এ নয়। এখানকার কথা—এই সকলের দ্বারা ঈশ্বরকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এখানকার কথা এ নয় যে "সকল কামনাকে ব্রহ্মের সঙ্গে ভোগ করিবে।" এখানকার কথা—"ব্রহ্মকে সকল কামনার সঙ্গে ভোগ করিবে।" পূর্ব্বকার কথা ছিল—অরূপের দ্বারা রূপকে ভোগ করিবে। এখানকার কথা হইল—রূপের দ্বারা অরূপকে ধরিবে। পূর্ব্বকার কথা ছিল—অশব্দের দ্বারা শব্দকে, অরসের দ্বারা রসকে, অগন্ধের দ্বারা গন্ধকে, অস্পর্শের দ্বারা স্পর্শকে অতিক্রম করিয়া যাইবে। এখানকার কথা হইল—শব্দের দ্বারা অশব্দকে প্রবুদ্ধ করিবে; রসের দ্বারা অরসকে পূর্ণ করিবে; গন্ধের দ্বারা অগন্ধকে ফুটাইবে; স্পর্শের দ্বারা অস্পর্শকে প্রাণের মর্ম্মে মর্ম্মে টানিয়া ধরিবে। কোথায় আনিলে, ঠাকুর! এ উল্টাপথে চলি কেমন করিয়া? অসহায় সাধকের আর্ত্ত প্রার্থনাতে ভক্ত-বৎসলের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। ইন্দ্রিয়ের বনে বনে, হৃদয়ের কুঞ্জে কুঞ্জে পশিয়া, সে বংশীধ্বনি প্রাণ-যমুনাকে উজান বহাইতে লাগিল। তখন অরূপে রূপ ফুটিল, অশব্দে শব্দ জাগিল, অগন্ধে গন্ধ বহিল, নিরাকারে আকার গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এ আকার জড় নহে, মানস-বস্তু। ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, শুদ্ধ ধ্যানগম্য। আর এ আকারও হঠাৎ ফুটে না, তিলে তিলে অদৃশ্য হইতে দৃষ্টিপটে ফুটিতে আরম্ভ করে।

ছবি ফুটাইতে হইলে, প্রথমে পট প্রস্তুত করিতে হয়। পটে আগের যদি কিছু দাগ, লেখা বা রং থাকে, সকলের প্রথমে তাহা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হয়। পটখানিকে সাদা করিতে হয়। তার পরে তাহাকে এক-রঙ্গা করা আবশ্যক হয়। ইষ্ট-মূর্ত্তির প্রকাশের পূর্ব্বে সাধকের চিত্তপটও এরূপ এক-রঙ্গা হইয়া থাকে। তখন সর্ব্বজীবে সাধকের ব্রহ্মভাবের উদয় হয়। স্থাবর-জঙ্গম সমুদায়ের উপরে একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব আলোর আভাস পড়ে। তখনই সাধক

স্থাবর জঙ্গম দেখে, দেখে না তার মূর্ত্তি।
যাঁহা নেত্র পড়ে, হয় ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥

এখনও কিন্তু ভাব গাঢ় হয় নাই। চক্ষে নূতন রসের কাজল মাখিয়াছে মাত্র। দৃষ্টি খুলিয়াছে, কিন্তু সৃষ্টি আরম্ভ হয় নাই। সমাধিতে সাধক তত্ত্ববস্তুর সাক্ষাৎকারলাভ করেন। সমাধি ভাঙ্গিলে

যখন তাঁর মনশ্চক্ষু প্রভৃতি আবার বিষয়-রাজ্যে ফিরিয়া আসে, তখন কিছুক্ষণ পর্যন্ত সেই সমাধির রেশ তাঁর চক্ষে লাগিয়া থাকে। এই অবস্থাতেই বৈষ্ণব মহাজন-পদে শ্রীরাধার ভাবাল দেখিয়া কৃষ্ণভ্রম হইয়াছিল। এখানে ভাবস্তুর অন্তর্ধান দূর হইয়া, সমাধিভঙ্গ লাভ হইয়াছে মাত্র। এখানে রূপ ফুটিয়াছে, কিন্তু এখনও ভাবাঙ্গ সঞ্চিতে আরম্ভ করে নাই। অনুভব হইতে ভাব ফুটে। ভাবাঙ্গ গড়ে কেবল অনুভূতি নয়, কিন্তু কল্পনা। কল্পনা অনুভূতিকে লইয়া, ভাবের অঙ্গসোষ্ঠব করিতে আরম্ভ করে। সাধনে, সমাধিতে সর্বমাতৃত্বের অনুভব হইল। সমাধিভঙ্গে প্রথমে যার উপরে চক্ষু পড়ে, তাকেই মা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু ইন্দ্রিয়সকল সম্পূর্ণ সজাগ হইয়া উঠিলে, এ ভাব রক্ষা করা কঠিন হইল। ভেদ-জ্ঞান জন্মান ইন্দ্রিয়ের সাধারণ ধর্ম। অথচ প্রাণ সেই সর্বমাতৃত্বকে চাক্ষুষ করিবার জন্য আকুল হইল। কল্পনা তখন সর্বমাতৃত্বকে গড়িতে লাগিল। এই ভাবেই মাতৃ-প্রতিমার উৎপত্তি হইল। সাধক পরের জন্য নয়, নিজের প্রাণের দায়ে, আপনার গভীরতম অন্তরঙ্গ অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া, অচাক্ষুষ তত্ত্বকে চাক্ষুষ করিবার চেষ্টায়, অতীন্দ্রিয় বস্তুকে সংবেদনের দ্বারা সম্ভোগ করিবার লালসায়, কল্পনা-সহায়ে মানস-মূর্তি রচনা করেন। এই ভক্তিপন্থার সাধারণ ধর্ম। কিন্তু বিদ্যাকারণবাদীগণ পর্যন্ত এপথে চলিতে যাইয়া ব্রহ্মের মানস-মূর্তি রচনা করেন। বিদ্যাকারণবাদীর উপাসক যখন আপনার ইষ্টদেবতাকে "পিতা নোঽসি" বলিয়া প্রণাম করেন, অথবা উপাসনা-কালে "মা"! "মা"! বলিয়া চক্ষুজলে মুখ-বুক ভাসাইয়া দেন; তখন বস্তুতঃ ব্রহ্মের একপ্রকার মানস-রূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। পিতা, মাতা, সখা প্রভৃতি বস্তু নিরাকার নহে; আর পিতৃত্ব, সখিত্ব, প্রভৃতিও সাকার পিতা, মাতা, বা সখা, প্রভৃতিকে ছাড়িয়া কোথাও প্রকাশিত হয় না। যার রূপ হইতে যখন আমরা মাতৃত্ব পদার্থকে পৃথক্ করিয়া ভাবি, তখন একটা কল্পিত বস্তুর সৃষ্টি করি। আবার এই যে বিশিষ্ট মাতা বা পিতা বা সখা, ইঁহাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানাদির অতিরিক্ত ও অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া যখন বিশ্ব-মাতা বা বিশ্ব-পিতা বা বিশ্ব-সখার কথা ভাবিতে থাকি, তখনও মানস-কল্পনার সৃষ্টি করি। সুতরাং এক সগুণ সমাধিতে যে ব্রহ্ম স্বরূপ-উপাসনা হয়, তাহা ছাড়া—যখন, যে ভাবেই, আমরা ব্রহ্মোপাসনা করিতে চেষ্টা করি না কেন, কিছুতেই এই মানস-কল্পনার হাত এড়াইতে পারি না। তবে আমরা যাহাকে সচরাচর নিরাকার উপাসনা বলি, তাহাতে এই মানস-কল্পনা হাল্কা, বিষয়চারী হয়; তাহাতে ভাব ঘন হয়ে ফোটে, আকার গড়িতে পারে না। এই মানস-কল্পনাই আর একটু বস্তুতন্ত্র, আর একটু সগুণ ও সাকার হইলেই প্রতিমারূপে গড়িয়া উঠে। অনুধিক কালের নিরাকারোপাসনার অন্যতম প্রধান আচার্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এইটি বুঝিয়াছিলেন। তাই বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—সাধক দেখিলেন প্রাণের মধ্যে মাকে, তাকিলেন ভাবনেত্রে—"মা"! "মা"! দাঁড়াইয়াছিল কুমার তাঁর নিকটে, সে গড়িল অমনি প্রতিমা।

ইহাই বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজার ভিতরকার ইতিহাস। এইজন্যই বাঙ্গালী যে সকল প্রতিমার পূজা করে, তাহাকে দেবতার সম্পদ্‌পাসনা বলা যায় না, প্রতীকোপাসনাও বলা যায় না। ইহা একটা স্বতন্ত্র বস্তু। ইহা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্বাবস্থার কথা নয়, পরের কথা। ইহা ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন নহে;

ব্রহ্মজ্ঞানের সন্ধান। জ্ঞানের দ্বারা অথবা অজ্ঞানের দ্বারা ইহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই; তবের দ্বারা, রসের দ্বারা, ভক্তির দ্বারা এই সকল গড়িয়া উঠিয়াছে।

অজ্ঞানী, অভক্তের হাতে পড়িয়া এমকল প্রতিমা-পূজার অনেক দুর্গতি হইয়াছে ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। শিবপুজনের অধিকারে যে বস্তুর প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, কেবল অলিঙ্গ নহে, কিন্তু অপ্রবুদ্ধ অজ্ঞ লোকের হাতে পড়িয়া তার অনেক প্রকারের কদর্থনাও হইয়াছে, ইহা সত্য। এই জন্যই এগুলি ভক্তি-সাধনের সহায় না হইয়া অনেক স্থানে অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই এগুলি ইন্দ্রজালের মতন হইয়াছে এবং লোকের বুদ্ধিকে প্রাবল্যে করিয়া রাখিয়াছে। এ সকল স্বীকার করিতে হয়। এই দিক দিয়া এমকল প্রতিমা-পূজার প্রতিবাদ করা, এগুলিকে বর্জন করা, ধর্মের বিকাশে প্রয়োজন হইয়াছে। এই জন্যই এগুলিকে একবার বর্জন না করিলে, সংস্কারের কুজ্ঝটিকা কাটিতে পারে না। আর সংস্কার কাটাইয়া না উঠিতে পারিলে, সত্যের ও রসের সাক্ষাৎকার-লাভও অসম্ভব। কুত্রিম, কল্পিত বৈজ্ঞানিক-ব্যাখ্যা দ্বারা অনধিকারীর জন্য এগুলিকে এযুগে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা কেবল নিষ্ফল নহে, কিন্তু অত্যন্ত অনিষ্টকরও হইবেই হইবে। এখন এমকলের দিক দিয়া এমকলের বিচার-আলোচনা করা আবশ্যক। আর তাহা করিতে যাইয়াই দেখি যে এমকল প্রতিমা পূজার যে ব্যাখ্যা কিছু দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম, তাহা সত্য নহে। এ প্রতিমা-পূজা জ্ঞানসাধনের সহায় নহে, ভক্তির সৃষ্টি ও ভক্ত সাধনের অবলম্বন।

ভক্তির পথ রসের পথ। সুতরাং রস-কলা মাত্রেই ভক্তি-সাধনের অঙ্গ। বোধহয় বাংলার ভক্তিসাধক বহুদিন হইতেই এই রসের পথ ধরিয়া চলিয়াছেন। এইজন্য বাংলার প্রায় ভক্তিগ্রন্থ ও ভক্তিসাধন "সাহিত্য-দর্পণ", "কাব্য-প্রকাশ" প্রভৃতি রস-শাস্ত্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের "উজ্জ্বল নীলমণি" একই সাথে রসগ্রন্থ এবং ভক্তিগ্রন্থ দুই। আর "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ এই রসতত্ত্বেরই সাধনাদি প্রচার করিয়াছেন। এ পথ সাক্ষের পথ নয়, ইহা সত্য। আগাগোড়া শক্তি-উপাসনা এই রসতত্ত্বের উপরে গড়ে নাই, ইহা ঠিক। কিন্তু বাংলার শক্তি-উপাসকেরা যে ভক্তিসাধন করিয়াছেন, পরোক্ষভাবে তাহার উপরে এই ভক্তিগ্রন্থের ও ভক্তিসাধনের প্রভাব যে খুবই পড়িয়াছে, ইহাও স্বীকার করা যায় না। আর এই জন্যই বাঙালীর প্রতিমা-পূজার মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই, যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় বলিয়া জানি না।

বাঙালী যে প্রতিমার পূজা করে, তাহাকে কোনমতে পরিত্যাগ করে, এই জন্যই, প্রতীকোপাসনা বলিতে পারা যায় না, সম্পূর্ণরূপেও বলিতে পারা যায় না। প্রতিমা প্রতীক নহে। শালগ্রাম প্রভৃতি শালগ্রামে নারায়ণ-বুদ্ধি স্থাপন করিয়া তাহাতে দেবতাজ্ঞান বা ব্রহ্মবুদ্ধি করে না, শিলাজ্ঞানই করে। শালগ্রামে শিলাজ্ঞানই বস্তুতঃ, বেদব্যাসবুদ্ধি করিয়া, "অন্তর দুষ্টঃ পরমেশ্বরায়" এই জন্য শালগ্রাম-পূজা প্রতীকোপাসনা। দুর্গোৎসবের প্রতীক ঘটে। সে প্রতীক ঘটপত্রিকা। ঘটপত্রিকায় স্থাপন তার প্রমাণ। দুর্গাবিগ্রহস্থলে বিল্বশাখা এই ঘটপত্রিকার নয়। এই

শ্রীফলরূপ "অম্বিকায়াং সদা প্রিয়ঃ"। এই শ্রীফল-শাখাতে দুর্গার অধিষ্ঠান কল্পিত হইয়া, তাহা দুর্গার প্রতীকরূপে পূজিত হয়। এই নবপত্রিকা-পূজা দুর্গার প্রতীকোপাসনা। কিন্তু দুর্গা-প্রতিমা প্রতীক নহে, সম্পদও নহে; তাহা রূপক মাত্র। দুর্গা বিশ্বমাতা, "জগতাং ধাত্রী"; ত্রিজগতের ধাত্রী, বিশাল বিশ্বের জননীরূপেই দুর্গার ধ্যান হয়।

অষ্টাভিঃ শক্তিভিস্তাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্।
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্॥

এ ধ্যান ত সকলেই করিতে পারে। এভাবে যে সৃষ্টির পরমতত্ত্বকে না দেখিল, সে ত কিছুই দেখিল উপনিষদের নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানও ত এই বস্তুকে বা তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। "যেন জাতানি জীবন্তি" —বলিয়া ভৃগুবারুণি সংবাদে এই "জগতাং ধাত্রী"-কেই ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আর এই তত্ত্ববস্তু সকলে শক্তির দ্বারাই ত সৃষ্টি প্রসব, রক্ষা ও প্রত্যাহার বা সংহার করিয়া থাকেন। শক্তি ও শক্তিমান, গুণ ও গুণী একই সত্তা ও একই সত্য, দুই নহে; ইহা স্বীকার করিলেও, গুণকে এবং শক্তিকে আমরা গুণী ও শক্তিমান হইতে পৃথক্ করিয়াও কল্পনা করিয়া থাকি। এরূপ কল্পনার দ্বারা শক্তিকে আমরা ভাল করিয়া ধরিতে পারি, শক্তিমানকেও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। এই জন্য ধ্যানের ভূমিতে, রসের রাজ্যে, আমরা সর্ব্বদাই গুণীকে গুণভূষিত, ও শক্তিমানকে শক্তিপরিবেষ্টিত বলিয়া ভাবিয়া থাকি। এই দুর্গা-ধ্যান এই মামুলী ভাবনাকেই ব্যক্ত করিতেছে। 'অষ্টাভি শক্তিভিঃ'র দ্বারা এখানে অনিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ যোগশক্তি বা যোগসিদ্ধিকে নির্দ্দেশ করিতেছে। এই সকল যোগশক্তি ভগবদৈশ্বর্য্যের মধ্যে পরিগণিত। এই অষ্টশক্তি আছে বলিয়াই পরমতত্ত্ব একই সঙ্গে "অণোরণীয়ান্" এবং "মহতোমহীয়ান্" —অণু হইতেও অণু এবং মহৎ অপেক্ষাও মহৎ। এই জন্যই ত তিনি—"আসীন দূরং ব্রজতি"— উপবিষ্ট থাকিয়াও দূরে গমন করেন; "শয়ানো যাতি সর্ব্বত্র"—শয়ান থাকিয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন। এই শক্তিপ্রভাবেই ত তিনি "সর্ব্বস্য ঈশানং"—সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের প্রভু। অতএব যাঁরা উপনিষদের নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁরাও এই 'জগতাং ধাত্রী'র ধ্যান করিতে পারেন। তাহাতে তাঁহাদের নিরাকার সিদ্ধান্ত নষ্ট হয় না। আর এই যে জগতাং ধাত্রী, তাঁর রসমূর্ত্তিই ত দুর্গাপ্রতিমারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুর্গার প্রতিমা দেখিবা মাত্র তাঁহাতে মাতৃ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইনি যে নারী ও মাতা, ইহা ধ্যানযোগে ভাবিয়া চিন্তিয়া মনের মধ্যে আনিতে হয় না। নবপত্রিকায় নারী-বুদ্ধি ধ্যানযোগে আনিতে হয়। কিন্তু প্রতিমা প্রত্যক্ষমাত্র এ জ্ঞান জাগিয়া উঠে। দুর্গামূর্ত্তি যে প্রত্যক্ষ নারীমূর্ত্তি। এ মূর্ত্তি যে প্রত্যক্ষ মাতৃমূর্ত্তি। দশভুজা হইলেও, এ ছবি মায়ের, আর কাহারও নহে। নারীরূপ মাতৃরূপ। বিশ্ব মাতৃরূপও নারীরূপ। আমাদের নিজের মাকে দিয়াই ত আমরা বিশ্বমাতা বা বিশ্বজননী বা 'জগতাং ধাত্রী'কে জানিতে ও ধরিতে পারি। আর এই দুর্গা-প্রতিমাতে মায়ের সকল লক্ষণ ফুটিয়াছে। শিল্প যে দুর্গার মূর্ত্তি গড়েন, তাহাতে দুর্গার ধ্যান-মূর্ত্তিটিকেই তিনি ফুটাইয়া তোলেন। আর এই ধ্যানের যে দেহ কল্পিত হইয়াছে তাহা মাতৃদেহ, পরিপূর্ণ, নিত্যশক্তিশালী মাতৃ-দেহ।

জটাজুট সমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্॥
সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাম্।
মৃণালায়তসংস্পর্শ-দশবাহু-সমান্বিতাম্॥

এ ত মাতৃরূপ। জটাজটসমাযুক্তা মা আমার সন্ন্যাসিনী নহেন, কিন্তু স্নেহ-আকুলা অক্লান্ত-সেবা-পরায়ণা। ঐ জটাজুট পৃষ্ঠে আলু-থালু হইয়া পড়ে নাই, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখর, মাতার চূড়ায় অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে জড়িত—এ যে আমার মা। রন্ধনশালে প্রতিদিন প্রভাতে বাঙ্গালী যে মার ঐ রূপ দেখিয়াছে। আমার মা যে ত্রিনয়নী—সন্তানের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ভাবনায় সর্ব্বজ্ঞা ও সর্ব্বদর্শিনী। মার মুখ যে বড় মিষ্ট, অমৃতের আধার—অমন স্নিগ্ধসুন্দর মুখ জগতে আর কোথায়? আর মা পীনোন্নতপয়োধরা, ইহাই ত মাতৃত্বের প্রস্ফুট রূপ, নিত্যসিদ্ধ লক্ষণ। আমাকে স্তনদান করিতে করিতে সুধাবেশে যখন তাঁর ওষ্ঠদ্বয় ভিন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাঁর কুন্দনিন্দিত দন্তগুলিতে কি রূপই না ফোটে! আর তাঁর বাহু যে আমার অঙ্গে মৃণালবৎ সংস্পর্শ দান করে, তারই কি আবার কথা? দুর্গা-প্রতিমাতে এই ধ্যানমূর্ত্তিটিই ফুটিয়াছে। এই মূর্ত্তি মাতৃমূর্ত্তি। দুর্গাকে দেখিয়া মাতৃভাব আপনি জাগিয়া উঠে।

এই জন্যই এ প্রতিমাকে প্রতীক বলিতে পারি না। ইহা সম্পদও নহে। ইহা রূপক। বাঙ্গালীর প্রতিমাপূজা নিম্ন অধিকারীর প্রতীকোপাসনা নহে। মধ্যম অধিকারীর সম্পদুপাসনাও নহে। ইহা ভক্তের রূপকোপাসনা। ভাবুকের আপনার ইষ্টদেবতার রসমূর্ত্তির পূজা।

আর এই জন্যই আমাদের পূর্ব্বসংস্কার এবং সিদ্ধান্ত বদলাইয়া গেলেও, এই মহাপূজার সময় প্রাণটা অমন করিয়া উঠে। চারিদিকে যখন পূজার কাঁশর ঘণ্টা বাজিয়া উঠে, তখন সমগ্র সাধক সমাজের সঙ্গে এক হইয়া, হাত তুলিয়া, ঊর্দ্ধনেত্রে,—মা! মা! বলিয়া চীৎকার করিতে ইচ্ছা হয়।

[স্বর্গত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের এই প্রবন্ধ পুস্তকাকারে এখনও প্রকাশিত হয় নাই। একচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে "নারায়ণে" ১৩২২ সালে ইহা ছাপা হইয়াছিল।

পূজার অর্ঘ্য—ভক্তি না উত্তেজনা

"যথার্থ ভক্তির উপর পূজার ভার না দিয়া লোকারণ্যের উপর পূজার ভার দিলে দেব পূজার ব্যাঘাত ঘটে। বারোয়ারী দেবতার যত ধুম, গৃহদেবতা—ইষ্টদেবতার তত ধুম নহে। কিন্তু বারোয়ারির দেবতা কি মুখ্যতঃ একটা অবাবদ্ধ উত্তেজনার উপলক্ষ্য মাত্র নহে? ইহাতে ভক্তির চর্চ্চা না হইয়া ভক্তির অবমাননা হয় না কি?"

—রবীন্দ্রনাথ

আমার চোখে দেখা—সোভিয়েট দেশ

ডাঃ কাইফুকুমার পাল

হেলসিঙ্কিতে বিশ্ব শান্তি সম্মেলনের পর সোভিয়েট শান্তি কমিটির তরফ থেকে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল সোভিয়েট দেশে যাওয়ার। তাই আমরা সকলেই উৎসাহিত হয়ে ছিলুম, আর প্রায় কল্পিলুম সে দেশে কোন কোন স্থানে যাওয়া হবে। মস্কোর পরই আমার কাছে লোভনীয় ছিল লেনিনগ্রাডের প্যাভলভ-গবেষণাগার তাসখন্দ স্টালিনগ্রাড এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত এশিয়ান কোন অঞ্চলে। এমন সময়ে সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে আগত সোভিয়েট বিজ্ঞান-অ্যাকাডেমীর প্রেসিডেন্ট সের্গিয়ানোভ অধ্যাপক সাহা ও আমাকে বিশেষ নিমন্ত্রণ জানালেন, ১লা জুলাই হ'তে মস্কোতে পরমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞান-অ্যাকাডেমীর যে বিশেষ অধিবেশন হ'বে তাতে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেওয়ার জন্য। অধ্যাপক সাহা ও আমি দুজনেই সানন্দে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম এবং ২৯শে জুন অপরাহ্নে প্রায় তিনটের সময় আমেরিকার অ্যাকাডেমিশিয়ান আর্থার-জুয়ারম্যান ও শ্রীমতী ম্যাডাম নবিকোভা সহ একটি বিশেষ প্লেনে হেলসিঙ্কি বিমানবন্দর হ'তে মস্কো অভিমুখে রওয়ানা হলুম। আমাদের সঙ্গী ও সঙ্গিনী দুজনেই বেশ ভাল ইংরেজী বলতে পারেন, সুতরাং আকাশে উড়তে উড়তে আমাদের নানাবিষয়ে আলোচনা হতে লাগলো। আলোচনা প্রসঙ্গে বার-দুই আমি অত্যন্ত মৃদু 'রাশিয়ার' উল্লেখ করাতে আর্থারজুয়ারম্যান আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বল্লেন "ভাই, আমাদের সমস্ত দেশটাই 'রাশিয়া' নয়, ঐটা একটি অঞ্চলমাত্র, জারের আমলে তা রাশিয়া-সাম্রাজ্য ছিল বটে, কিন্তু আজ তা' সোভিয়েট-দেশ বলেই পরিচিত। সুতরাং আমাদের দেশের কথা বলতে হলে 'রাশিয়া' না বলে সোভিয়েট দেশই বলবেন, তা না হলে অনেকেই বিরক্ত হতে পারে। আমি দুঃখ প্রকাশ করে শুধু "আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ, কথাটি আমি মনে রাখবো।" ম্যাডাম নবিকোভা কিন্তু ততক্ষণে তাঁর ৮।৯ বছরের ছেলেটি সম্বন্ধে গল্প করতে আরম্ভ করেছেন—সে মাকে কী রকম ভালবাসে, এতদিন বাইরে থাকাতে সে কী ভাবে ক্ষুণ্ণ ও মনমরা হয়ে আছে, সে কি কি খেতে ভালবাসে, তার জন্য কি কি নিয়ে যাচ্ছেন, এমনি মাতৃসুলভ ছোটখাটো কত যত্নের কথা!

ক্যারোলিনা উপকূল ও ফিন্‌ল্যাণ্ড উপসাগর পার হয়ে ঘণ্টা দুই পরে আমাদের প্লেন এসে পৌঁছিল লেনিনগ্রাডের উপর। ঠিক এক বছর আগে অধ্যাপক সাহা সোভিয়েট সরকারের আমন্ত্রণে লেনিনগ্রাডে এসেছিলেন। তাই নীচের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছিলেন "ঐ মানমন্দির, ঐ পদার্থ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঐ হারমিটেজ মিউজিয়ম, ঐ জারের গ্রীষ্মাবাস, এমনি কত কিছু। ততক্ষণে রুশ-সাম্রাজ্যের প্রাক্তন রাজধানীর উপর ঘুরে ঘুরে আমাদের প্লেন নামছে, এবং অধ্যাপক সাহার দেখানো সব কিছু ক্রমাগত আকারে বড় হয়ে বারবার আমাদের চোখের সামনে মিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে বুঝলুম যে আমাদের বিমানপোতটি এরোড্রোমের মাটি স্পর্শ করেছে।

বিমান থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গোল-গাল মোটা-সোটা দুটি ফিন্‌ফিনে ফুলানো মেয়ে এসে আর্থারজুয়ারম্যানের গলা জড়িয়ে তাকে চুমো খেলো। একটির বয়স বছর পনর-ষোল এবং আর একটির সতেরো-আঠারো; পরিপূর্ণ নিটোল স্বাস্থ্য, আপেলের মত টুকটুকে লাল ফুলো গাল দুটির! আর্থারজুয়ারম্যান আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন' এ দুটী আমার মেয়ে, লেনিনগ্রাডে থেকে পড়াশুনা করে।" বাপকে দেখে মেয়েদের কী আনন্দ, দুজনে তার দু'হাত জড়িয়ে খুসীতে যেন ফেটে পড়ছে। আমরা পাঁচজন একই টেবিলে বসে এরোড্রোমের খাবার

ঘরে উঁচু। চা-পর্ব শেষ করা'লে। মস্কিকাভা ও তাদের বাপের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে আলাপ করা'লে। বেশ সপ্রতিভ দুটি মেয়ে, বিদেশীর সঙ্গে কথা বলতে একটুও সংকোচ কিংবা জড়তার ভাব ছিল না।

চা-পর্ব শেষ করে আবার আমরা গিয়ে প্লেনে উঠলুম। মেয়ে দুটি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাপকে জড়িয়ে ও চুমো খেয়ে বিদায় নিল। এরোড্রোমের রান্-ওয়ের উপর ছুটতে ছুটতে প্লেন সোঁ করে তির্যকভাবে বিমানপথে উঠলো। উর্ধ্বগামী প্লেন হতে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলুম ছোট্ট পুতুলের মত দুটি মেয়ের হাতে দু'খানি রুমাল তখনো ঈষৎ আন্দোলিত হচ্ছে।

অপরাহ্ণ প্রায় আটটায়,—অপরাহ্ণ বলছি কেন না, তখনো পশ্চিমের আকাশে সূর্যকে বেশ দেখা যাচ্ছে, আমাদের বিমানরথ এসে নামলো, মস্কো এরোড্রোমে। তবে কি সত্যি সত্যি মস্কোতে এলুম? বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না, কেন না দু'দুবার চেষ্টা করেও আগে বিফল মনোরথ হয়েছি। কথায় বলে "বার বার তিনবার," দুবার নিষ্ফল প্রয়াসের পর তৃতীয় বারে কৃতকার্য হওয়ার আনন্দে যখন মনখানি পূর্ণ, তখন অজ্ঞমনস্কভাবশতঃ লক্ষ্যই করিনি যে নীচে একটি ছোটখাটো জনতা আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে। আর্মাস্ট্রঙ্গিয়ান আমাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রতীক্ষমান বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর সহ-সেক্রেটারী ও অন্যান্য অ্যাকাডেমিশিয়ানদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাদের—আর প্রত্যেকের হাত হতে একটি করে ফুলের তোড়া পরিবর্তন করলে আমাদের হাতে। তাদের সাদর সম্বর্ধনার আতিশয্যে এতক্ষণ এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম যে আমাদের পূর্ব পরিচিত মিঃ লুকিন ও মাদাম ম্যাসেভিচকে আমরা লক্ষ্যই করিনি। হঠাৎ সেদিকে নজর পড়াতে অধ্যাপক সাহা হাসিমুখে হাত বাড়িয়েএগিয়ে গেলেন মাদাম ম্যাসোভিচের দিকে এবং আমিও একহাতে কোন রকমে বিরাট ফুলের বোঝা ঝাঁকড়ে ধরে, লুকিনের সঙ্গে দ্বিতীয়বার করমর্দনের জন্য অগ্রসর হলাম।

এরোড্রোম হতে একখানি বিরাট গাড়ী করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল মস্কোর সর্বাপেক্ষা আধুনিক সোভেটস্কায়া হোটেলে; একই গাড়ীতে সামনে ড্রাইভারের পাশে বসে সহ-সেক্রেটারী ও লুকিন এবং পেছনের সিটে অধ্যাপক সাহা ও আমার মাঝখানে বসে ম্যাদাম ম্যাসেভিচ। আমরা পৃথক্ পৃথক্ কামরায় থাকবো না যুগ্ম কামরায় দুজনে একসঙ্গে থাকবো জানতে চাইলে, অধ্যাপক সাহাই তার জবাব দিলেন "দুজনে একই কামরায় থাকবো।" আর তাই বলে আমার দিকে ফিরে বাংলাতে বল্লেন, এক যাত্রায় পৃথক্ ফল করে লাভ কি? একই উদ্দেশ্যে একই পথে এক সাথে এসেছি, হেলসিঙ্কিতেও একই ঘরে ছিলুম, সুতরাং আপনাকে মস্কোতেও পৃথক্ হতে দেবো না, বুড়ো হ'চ্ছ কখন কী হয়, সুতরাং আর কিছু না হোক Medical advice, gratis, ত পাওয়া যাবে।" অধ্যাপক সাহার নিকট সান্নিধ্যে থাকা, সেতো পরম সৌভাগ্য! সুতরাং এ প্রস্তাবে যে আমার সানন্দ-সম্মতি ছিল, তা' বলাই বাহুল্য।

যে কামরাটি (তাকে ঘর না বলে হল-কামরাই বলা উচিত) আমাদের বাসের জন্য নির্দিষ্ট হ'ল তার এক পাশে সাত-আট হাত ব্যবধানে সুদৃশ্য চাকচিক্যে ঢাকা উঁচু শ্রীএর গদী মোড়া সুদৃশ্য খাটের উপর দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা, বড় বড় চৌকো বালিশ দুটি বিছানার প্রায় এক চতুর্থাংশ জুড়ে। দুখানি খাটের পাশেই দুটি ছোট টেবিল এবং তার উপরে বেড সুইচ, টেবিল ল্যাম্প, অ্যাশট্রে, জলের ফ্লাস্ক, গেলাস প্রভৃতি। হলঘরের মাঝামাঝিতে একখানি প্রকাণ্ড নীলরঙের পুরু মখমলের পর্দা, ইচ্ছেমত তাকে দুপাশে গুটিয়ে কিংবা টেনে জুড়ে দিয়ে শোবারঘরে অংশকে পৃথক্ করা যায়। তার এদিকে ড্রয়িং-রুম ও তার আনুষাঙ্গিক সোফা, টেবিল, চেয়ার, লেখার টেবিল, রেডিও, টেলিভিশন যন্ত্র, টেলিফোন প্রভৃতি। টেবিলের উপর প্রকাণ্ড চীনে মাটির ফুলদানি আর তার মধ্যে রকমারি তাজা ফুল। হল কামরায় প্রবেশের দরজা পার হয়েই বন্ধুরুম, তাতে কাপড়চোপড় রাখার আলমারি ও জুতো রাখার পৃথক্ ব্যবস্থা। তারই বাঁদিকে বেশ বড় বাথরুমে, ঠাণ্ডা জল, গরম জল, বেসিন, বাথটাব, কমোড প্রভৃতির ব্যবস্থা। লণ্ডম, প্যারিস, বার্লিন প্রভৃতি শহরে

অনেক বড় বড় হোটেলে বাস করেছি, কিন্তু এরকম বিনয়িতা ও আদরের বন্দোবস্ত খুব কম স্থানেই আছে।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে জিনিস-পত্তর গুছোতে আরম্ভ করেছি এমন সময় টেলিফোন এল যে 'ডিনার' প্রস্তুত নীচে খেতে যেতে হবে। তিনতলা হতে লিফ্‌টে নেমে ওয়েটারের সঙ্গে এক বিরাট খাওয়ার ঘরে পৌছান গেল। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত থাকাতে ইচ্ছে ছিল যে আধ ঘণ্টার মধ্যেই খাওয়া শেষ করে এসে বিছানায় শুয়ে পড়বো কেন না তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা! প্রথম পদ সুপ খেয়ে বসে আছি ত আছিই, সামনে খালি প্লেট নিয়ে! ভুলে গেল নাকি? অধ্যাপক সাহাকে সন্দেহের কথা চুপি চুপি বললে, তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ চাপা হাসি হেসে বল্লেন, "wait and see" অগত্যা তা' না ক'রে আর উপায়ই বা কি? এদিকে ঘড়ীর কাঁটা এগিয়ে চলেছে, এগারোটা বেজে গেল এবং ধৈর্যের প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে একজন মাথা কামানো পরিবেশক এক প্লেটে ইঁড়িয়ে নিয়ে দ্বিতীয় পদ, মাংস আর তার সঙ্গে তরকারি দিয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে দ্বিতীয় পদও যথাস্থানে সদ্গতি লাভ করল—তারপর আমার সেই ধৈর্যের পরীক্ষা। এমনি করে, রাত বারোটার পর মধ্যেতে প্রথম ডিনারের দুর্ভোগ শেষ করে, প্রায় অর্ধনিদ্রিত ভাবেই ঘরে এসে ক্লান্তদেহকে বিছানায় প্রলম্বিত করে দিলুম, বিছানার চাকচিক্যে টেনে তোলবার মত ক্ষমতাও যেন আর নেই। বাথরুম হতে ফিরে এসে দেখি অধ্যাপক সাহা একপাশের দুতো না খুলেই ঘুমিয়ে পড়েছেন, আর সে পাটি খাটের একপাশে ঝুলছে।

আমাদের কনফারেন্স আরম্ভ হবে, ১লা তারিখ সুতরাং পরদিন অর্থাৎ ৩১শে জুলাই পুরো দিনটি আমাদের হাতে ছিল। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই আমাদের জন্য নির্দিষ্ট একখানি মোটর গাড়ী নীচে দাঁড়িয়ে, আর আমাদের দোভাষী ও পথ প্রদর্শক লুকিন'ও ছায়ার মতই আমাদের পেছনে পেছনে ফিরছে। আমাদের প্রাথমিক তিনটি কাজ ছিল (১) ভারতীয় দূতাবাসে গিয়ে আমাদের বৈদেশিক দূত মিঃ মেননের সঙ্গে সৌজন্যমূলক দেখা করা এবং তখনকার কর্মচারী শ্রীযুক্ত বসুর জন্য কলিকাতা হতে সত্যিসত্যিই হাতে করে ব'য়ে নিয়ে যাওয়া মিষ্টি-মোয়া (অর্থাৎ রসগোল্লার টিনটি) যথাস্থানে পৌছে দেওয়া, (২) আফগানিস্থানের দূতাবাসে গিয়ে কাবুলের পথে যেতে ফিরে আসার জন্য 'ভিসা' নেওয়া এবং (৩) অধ্যাপক সাহার চিলে হয়ে যাওয়া কৃত্রিম দাঁতকে ঠিক করে নেওয়া। প্রাতরাশের পরই বেলা সাড়ে ন'টায় আমরা বওয়ানা হলুম এবং প্রথমেই গিয়ে হাজির হলুম আফগানিস্থানের দূতাবাসে। দরজার ঘণ্টার বোতাম টেপার প্রায় বার মিনিট পরে একটি লোক এসে সুবৃহৎ কপাটি খুলে দিয়ে উপরদামী কার্পেটে মোড়া সিড়িটি দেখিয়ে দিলে। প্রকাণ্ড বাড়ীটি; বড় বড় থাম, হলঘর আর বারান্দা পার হয়ে আমরা অতি-প্রাচীন কালের ধরণে সজ্জিত একটি ঘরে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে পৌছলুম। কেউ কোথাও নেই, যেন ঘুমন্ত রাজপুরী। লুকিন বল্লে যে জারের আমলে এটি নাকি কোন এক লর্ডের আবাস ভবন ছিল। বসতে বলারও লোক নেই, তাই আমরা নিজেরাই খাতির যত্ন করে নিজেদের বসালুম, অর্থাৎ মস্ত বড় আরামদায়ক সোফায় বসে পদধ্বনির প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে টিক্‌টিক্ শব্দে বাঁ দিক হতে ডানদিকে ঘড়ীর কাঁটার স্থান পরিবর্তন ও তার সঙ্গে পেণ্ডুলমের দোলন দেখতে লাগলুম। আমরা একে অন্যের মুখের দিকে তাকাই, হাসি আর ভাবি এ কোথায় এলুম। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট যখন গত হয়ে গেল তখন আমি লুকিনকে বললুম "দেখ, মনে হচ্ছে এ বাড়ীতে মনুষ্যজন কেউ নেই ঠিক জায়গায় নিয়ে এসেছ ত? লুকিন হেসে বল্লে "সামনে ত ট্যাব্‌লেটে লেখা আছে তাই, তবে যদি..... বিরক্ত হয়ে আমি টেবিলের উপর জোরে আঙুল দিয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করতে লাগলুম, আর লুকিন থর্‌থর্ করে কাশতে লাগলো। কিন্তু কারুর পরিবেদনা। অধ্যাপক সাহার মুখে দারুণ বিরক্তির চিহ্ন। এরকম শব্দ করেও কোন ফল হ'ল না দেখে আমি লুকিনকে বললুম "যা হ'ক কর লুকিন, এ নির্জন পুরীতে বসে থেকে লাভ কি?" তখন লুকিন বেরিয়ে গিয়ে প্রায় দশ মিনিট পরে একটী তরুণীকে মহিলাকে নিয়ে এল। অতি প্রসন্ন চিত্তে

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি চাই আমাদের। ভিসার কথা বলতে তিনি বললেন "তা এরা তো এখনো ঘুমুচ্ছে, বেলা বারোটা নাগাদ উঠবে, তবে মুখ হাত ধুয়ে খাবে দাবে, সুতরাং তখনো আড়াইটে তিনটে আসতে হবে।" শুনেই ত আমাদের চক্ষু চড়কগাছ—বলে কি! বারোটায় ঘুম হতে উঠবে, এ যে দেখছি আমাদের ভারতীয় রাজা, মহারাজা কিংবা বনেদী জমীদারদেরও হার মানিয়ে দেয়। মহিলাটী বললেন, "আপনাদের পাসপোর্ট আর চারখানি করে ফটো রেখে যান, বিকেল বেলা এসে নিয়ে যাবেন?" আমি পকেট হতে পাসপোর্ট আর চার খানি ফটো বের করে তাঁর হাতে দিলুম, কিন্তু অধ্যাপক সাহা পাসপোর্টের প্যাকেট খুলে দেখেন যে সঙ্গে দুখানির বেশী ফটো নেই!" ঐ দুখানি সহ পাসপোর্ট মহিলার হাতে দিয়ে তিনি হেসে বলেন "আর তো ফটো নেই ঐ দুখানি দিয়েই চালিয়ে নেবেন? "ভদ্রমহিলা মাথা নেড়ে বলেন, "না তা হয় না," তাই অধ্যাপক সাহাও বলতে থাকেন "ঐ দুখানিই যেমেই বা হোক করে নেবেন।" তাঁর এরকম মাছের হর করতে দেখে আমি আর সুকিন দুজনেই হেসে খুন! "আচ্ছা তাহলে তখনো ফটো তুলিয়ে আর দু'কপি ফটো নিয়ে আসবো" শুনে অধ্যাপক সাহা সুকিনকে বলেন "কাজ একটি বাড়লো, অর্থাৎ ফটো তোলা।" সুকিন হেসে বলে "তথাস্তু," আমরা বিদায় নিয়ে একদোর দিয়ে বেরিয়ে আসছি আর মহিলাটীও আর একদোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, এমনি সময় হঠাৎ অধ্যাপক সাহা ফিরে গিয়ে একরকম চিলের মত ছোঁ মেরে পাসপোর্ট-দুখানি নিজ হাতে টেনে নিয়ে বলেন "তখনো এসেই দিয়ে যাচ্ছি।" অধ্যাপক সাহার কাণ্ড দেখে আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকাতে তিনি একটু হেসে বলেন "ডাঃ পাল, বিদেশ-বিভূঁয়ে পাসপোর্টই একমাত্র সম্বল, তাকে এভাবে এ ঘুমন্ত পুরীতে ফেলে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।" তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল, কেননা সেদিন বিকেলে আর তখানে আমরা যেতে পারিনি; আর আমাদের যাত্রাপথও বদলে যাওয়ায় আফগানিস্থানের 'ভিসার' কোন প্রয়োজনও আমাদের হয়নি শুধু বাস্থান থেকে আমার চারখানি ফটোই 'মাঠে' মরা আফগান অ্যাম্বাসীর ঘুমন্তপুরীতে মারা গেল!

আফগানিস্থানের দূতাবাস দেখে প্রাচ্যদেশীয় দূতাবাস সম্বন্ধে আমাদের মনে খানিকটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তাই আমাদের দূতাবাসের পথে যেতে আমি চুপিচুপি অধ্যাপক সাহাকে শুধাম "আমাদেরটাও কী এরকমই?" তিনি হেসে বলেন—বিশেষ ভাল হবে বলেও মনে হয় না। চলুন দেখাই যাক্। আমাদের সুখের বিষয় যে সেখানে পৌঁছে কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চলছে দেখতে পেলুম। মিঃ সেনদের সঙ্গে কিন্তু দেখা হ'ল না, সুতরাং তাঁর নিম্নবর্তী মিঃ কাউলের সঙ্গে দেখা করে জানতে পারলুম যে মিঃ সেনদের কয়েক দিনের জন্য লেনিনগ্রাডে গেছেন। তিনিই কথায় কথায় আমাদের বলেন যে মস্কোতে ঐ সম্মেলনে দুজন বিজ্ঞানী ভারতবর্ষ থেকে যোগ দেবেন, একজন ডক্টর নস্কর এবং আর একজন কোন ক্যান্সার হাসপাতালের ডিরেক্টর। অনেক ভেবে চিন্তেও আমরা দুজনেই কেউই ডক্টর নস্করটীকে ত' বুঝতে পারলুম না, তবে অন্য প্রতিনিধি হয় বোম্বাইর ডক্টর খানোলকর না হয় কলিকাতার ডক্টর সুবোধ মিত্র এরূপ ধারণা হ'ল। কবে তাঁরা পৌঁছাচ্ছেন জানতে চাইলে, তিনি সঠিক কিছুই বলতে পারেন না, বলেন এখনো কোন 'ক্যাবল' পাওয়া যায় নি।"

তৎপর শ্রী মেননের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে মিষ্টি-বোঝাটী সঁপে দিয়ে ভারমুক্ত হলুম। মস্কোতে রসগোল্লা পেয়ে তিনি তাজ্জব খুসী! তখনই নিজের কোয়ার্টারে ছুটে গিয়ে আমাদের জন্যে আমাদের দেশের মতই দুধ চিনি দিয়ে চা (মস্কোর প্রথামত লেমু-চা নয়) তৈরী করিয়ে নিয়ে এলেন এবং আমাকে এত কষ্ট করে সাতসমুদ্দুর তেরো নদী পারে ঐ টিনটি কষ্ট করে বয়ে নিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ জানলেন। আমরাও বিদায় নিলুম এবং আমাদের অ্যাম্বাসীর ঠিকানায় প্রাপ্ত চিঠিপত্রগুলি নিয়ে আবার গাড়ীতে উঠলুম।

এবার হস্তচিকিৎসকের চেম্বারে। চিকিৎসকটি কিন্তু

মহিলা এবং তাঁর সহকারীগণও মহিলা। চেম্বারে অনেক পুরুষ ও মহিলা অপেক্ষা করছেন কিন্তু ডেলিগেট শুনেই বেরিয়ে এসে আমাদের করমর্দন করে, তৎক্ষণাৎ অধ্যাপক সাহাকে ঘরে নিয়ে চেয়ারে বসিয়ে অতি যত্ন সহকারে পরীক্ষা ক'রে বল্লেন "বেশী কিছু নয় ঠিক হয়ে যাবে, পরশুদিন এসে নিয়ে যাবেন।" লুকিনের মুখে আমি একজন ডাক্তার শুনে অপেক্ষারত রোগীদের রেখেই আমাকে ঘুরিয়ে সব দেখালেন। দেখলুম শুধু দাঁত তোলা ও পরিষ্কার করাই নয়; সেখানে দাঁতের জন্য অস্ত্রোপচার এবং দাঁত তৈরীরও বন্দোবস্ত আছে। দন্ত চিকিৎসা এমনকি কৃত্রিম দাঁতের জন্যও কাউকে কিছুই দিতে হয় না, সকলেই বিনামূল্যে চিকিৎসা ও প্রয়োজন মত কৃত্রিম দাঁত লাগানোর সুযোগ পায়।

হোটেলে ফিরে এসে দুঘণ্টা ধরে আমি মধ্যাহ্ন ভোজন করে গেলুম আর দন্তহীন অধ্যাপক সাহা ঘরে বসেই সুপ, আর পরিজসহ দুধ দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা' সেরে নিয়ে বিছানায় দেহকে এলিয়ে দিলেন।

অপরাহ্নটি কতকটা বিশ্রামের অবস্থায় কাটানো গেল। অধ্যাপক সাহা ক্লান্তি বোধ করছিলেন তাই সন্ধ্যার আর তিনি বের হলেন না। অগত্যা একাই আমি লুকিন সহ বেরিয়ে পড়লুম—গন্তব্যস্থল অনির্দ্দিষ্ট।

মোটরে করে আমরা এসে পৌঁছলুম লেনিনগ্রাড রেল-ষ্টেশনে। মস্কোতে অনেকগুলি রেল ষ্টেশন আছে, তাহাতে লাইনগুলি লেনিনগ্রাড, কিয়েভ, মোলেন্সক, মিনস্ক প্রভৃতি শহরগুলির দিকে গিয়েছে এবং তাদেরই নামানুসারে ষ্টেশনগুলির নামকরণ হয়েছে। আবার ঐ সকল রেলষ্টেশনগুলি "মেট্রো" বা ভূগর্ভস্থিত ইলেকট্রিক রেলওয়ে দ্বারা যুক্ত। মোটর গাড়ীকে অযথা দাঁড় না করিয়ে তাকে হোটেলে ফেরৎ পাঠিয়ে লুকিন আমাকে নিয়ে এলেন, রেলওয়ে ষ্টেশনের পাশে 'মেট্রো' লেনিনগ্রাড ষ্টেশনে। "এস্‌ক্যালেটার" বা চলন্ত সিঁড়ী দিয়ে নেমে যখন ভূগর্ভস্থ ষ্টেশনটিতে দাঁড়ালুম, তখন আমার মনে হ'ল উৎসব-মুখর কোন বড়লোকের বিরাট প্রাসাদে এসে পৌঁছেছি। মার্বেল পাথরের ছক্‌-কাটা মেঝে, উপরে সুদৃশ্য ঝিলানের ছাদ, ঝাড়-লণ্ঠন, কারুকার্য খচিত বিরাট স্তম্ভের সারি, পাথরে খোদাই উঁচু ভাস্কর্যের নিদর্শন দেওয়ালে, মাঝে মাঝে মর্ম্মর মূর্ত্তি, ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় ঝলমল যেন কোন ইন্দ্রপুরী। ট্রেন হুস হুস করে এসে থামছে, একদল লোক অতি শৃঙ্খলার সঙ্গে তার মধ্যে ঢুকছে, আর একদল তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে আসছে, হৈ চৈ নেই, কেবল পায়ের শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ আদৌ নেই! আবার যথা সময়ে ট্রেন গন্তব্যস্থলে চলে গেল এবং সম্মুখের লাইন ছুটি খালি পড়ে রইল। লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন প্রভৃতি নগরীতেও ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে দেখেছি এবং ব্যবহার করেছি—কিন্তু তাদের মধ্যে ঢুকলে মনে হত যেন শীতকালে সাপ কি ব্যাঙ যেমন গর্ত্তে ঢুকে থাকে তেমনি, অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ও নিরানন্দতার পরিবেশ। মেট্রো যে কত সুন্দর হতে পারে, তা প্রথম বুঝতে পারলুম মস্কোতে তা' দেখে। কিন্তু আমার সন্দেহ হ'ল যে এ আমাদের কলিকাতার চৌরঙ্গী নয় ত—যে দর্শক আসবে তাকে তা' দেখে বলতেই হবে কোলকাতা কত সুন্দর! আমি সন্দিগ্ধচিত্তে লুকিনকে জিজ্ঞেস করলুম "সবগুলি ষ্টেশনই কি একরকম সুন্দর?" তখন হঠাৎ আরেকটি ট্রেন এসে পড়াতে আমার হাত ধরে লুকিন একরকম টেনেই আমাকে পুরলে তার মধ্যে। প্রায় পাঁচমিনিটের পরে যখন আর একটা ষ্টেশনে এসে ট্রেন থামলে, তখন বল্লে "নামুন ডক্টর!" অবাক হয়ে দেখলুম সেই একই দৃশ্য, একই সাজ-সজ্জা, একই উজ্জ্বল পরিবেশ। তার মধ্যে কোথাও লেনিন, ষ্টালিন প্রভৃতির মর্ম্মর মূর্ত্তি, কোথাও রুশ বিপ্লবের নানা দৃশ্য, কোথাও বিপ্লব শেষে জনগণের বিজয় যাত্রা। এমনি করে আমরা এদিকে-সেদিকে আট-নয়টি ষ্টেশন হতে ষ্টেশনান্তরে ঘুরে বেড়ালুম এবং দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে ওগুলি ঐভাবেই তৈরী হয়েছে, নেহাৎ লোক দেখানো সাজানো কিছু নয়। এভাবে কয়েক ঘণ্টা বেড়িয়ে রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টার সময় আমরা

হোটেলে ফিরে এলুম।

পরদিন থেকে সম্মেলনের আরম্ভ। লৈনডোকের জন্য নীচে নেমে দেখি একুশটি দেশের সম্মানিত প্রতিনিধিদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা ভোজন কক্ষে সাড়ম্বরে ভোজের ব্যবস্থা। ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ফিন্‌ল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, নরওয়ে, সুইডেন ও ইতালী এবং প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে চীন, ব্রহ্মদেশ, জাপান, কোরিয়া মঙ্গোলিয়া, ইরান, ইস্রাইল ও মিশরের প্রতিনিধিগণ সকলেই পৌঁছে গেছেন, বাকী শুধু ইন্দোনেশিয়ার ডক্টর শিবাশেষো এবং ভারতবর্ষের ডক্টর খাদ্যোলকর ও অধ্যাপক জগদীশ শঙ্কর। যথা নিয়মে সাড়ে ন'টায় খেতে বসে পৌনে বারটায় 'সামবেষী' ভোজের পালা শেষ করে ওঠা গেল। লুকিন বিদায় নিতে এসে বল্লে "ডক্টর পাল এবার ঘুমোতে যান।" আমি বল্লুম "লুকিন ক্লান্ত না হলে, এস একটু বেড়িয়ে আসি, গাড়ীতে করে নয়, পায়ে হেঁটে।" লুকিন বিস্ফারিত চোখে বল্লে "এত রাত্রিতে?" আমি বল্লুম, হাঁ আমি মস্কোর নৈশ সৌন্দর্য্য দেখতে চাই।" একটু হেসে লুকিন বল্লে মস্কোতে নৈশ ক্লাব বা এমি আমোদ প্রমোদের কিছু নেই। আর থিয়েটার বায়স্কোপও বারোটার সব শেষ হয়ে গেছে যায়। আমি বল্লাম "কিন্তু মস্কোর রাস্তা'ত শেষ হয় না, তাতেই পায়চারি করব কিছুক্ষণ।"

লুকিন ও আমাতে বেরিয়ে পড়লুম। থিয়েটার সিনেমা বা কিছু আমোদ প্রমোদ শেষ করে ফিরবার জনতার ভীড়, মনে হল যেন যে যার গৃহে ফিরছে। প্রায় পনের মিনিট হেঁটে আমরা যখন সুপ্রসিদ্ধ রেড স্কোয়ারে এসে পৌঁছলুম, তখন বারটা বাজতে ঠিক দুমিনিট দেরী। অদূরে চির নিদ্রায় শায়িত লেনিন ও স্ট্যালিনের অন্তিম শয়ন সৌধ। লুকিন বল্লে "দাঁড়ান ডাক্তার, এবার ঠিক বারোটার সময় গার্ড বদল হবে। শুনেই আমরা কালো বাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে গেলুম। ঢং ঢং করে বারোটা বাজলে, আর সঙ্গে সঙ্গে পরিদর্শনকারী ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পিঠে বন্দুক ও হাতে খাড়া তলোয়ার নিয়ে দুজন গার্ড মার্চ করে গিয়ে আগের গার্ডের সম্মুখে দাঁড়ালে, এবং সামরিক কায়দায় একে অন্যকে অভিবাদন করে গার্ডেরা যখন স্থান পরিবর্তন করলে তখন বিদায়ী গার্ডেরা আবার ক্যাপ্টেনের পেছনে পেছনে মার্চ করে ডিউটি শেষ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঠিক দুপুর রাত্রিতে এক বিরাট জনতা মন্ত্রমুগ্ধ চিত্রার্পিতবৎ ঐ গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানটি দেখলে কারো মুখে শব্দ নাই —শুধু ক্যাপ্টেনের হুকুম আর তার পূর্বে ও পরে মার্চ করার সময়ে বুটের খট্‌খট্ শব্দ ছাড়া! এমন সময় হঠাৎ একটি তরুণ ও একটি তরুণী এগিয়ে এসে লুকিনের সঙ্গে করমর্দন করলো! লুকিন তাদের বন্ধু ও বন্ধুর বাগ্‌দত্তা বলে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে! ভালই হল ছিলুম দুই হলুম চার। চার জনে নানা প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে মস্কো নদীর পারে পারে চলতে আরম্ভ করলুম।

অত রাত্রিতে মস্কো নদীর পাড় প্রায় জনবিরল হলেও চলে। ভারতবর্ষ ও সোভিয়েট দেশের আচার ব্যবহারের সামঞ্জস্য ও পার্থক্যই ছিল আমাদের আলোচনার বিষয়। একদিকে মস্কো নদী অপরদিকে কতকগুলি বাড়ী ছিল। হঠাৎ লুকিনের বন্ধু বললে "তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি ঐ বাড়ী হতে এখুনি আসছি।" তথাকথিত সভ্য ব্যবহার ছেড়ে বল্লুম "আপনার সঙ্গে ঐ বাড়ী পর্যন্ত আমি গেলে কিছু অন্যায় হবে কি?" আমার দুজন নবী ও সঙ্গিনী ত' অবাক্, আমিই কৈফিয়ৎ দিলেম জবাব দিলুম "কোন আপত্তি না থাকলে, যে কোন গৃহের স্বাভাবিক জীবন যাত্রার আগ্রহেই আমি যেতে চাইছি।" বন্ধুটি সজোরে হেসে আমাকে হাতে ধরে টেনে বল্লেন "না কোন আপত্তি নেই, তোমরাও এস।" গৃহের দোতলায় একটি বাতি জ্বলছিল; আগে দরজায় তুবার করাঘাত করার সঙ্গে সঙ্গেই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আর একটি তরুণী বল্লে 'কে?' পরিচয় পেয়ে তৎক্ষণাৎ সে নেমে এসে দরজা খুলে দিয়ে আমাদের একটি সুসজ্জিত কক্ষে বসালে, তার মধ্যে তিনখানি

ঘটে বিদায় ও একপাশে কয়েকখানা সোফা ও চেয়ার অর্থাৎ সংযুক্ত লম্বন কক্ষ ও তুমিং রুম। মেয়েটির মা ও বাবা দুজনে ড্রেসিং গাউন পরা অবস্থায় আমাকে 'স্বাগত ভারতীয় বন্ধু ছেলে' অভ্যর্থনা জানালেন। আমি নিজের দুঃসাহসিকতায় নিজের কাছেই লজ্জা বোধ করছিলুম, তাই দুঃখনের মাঝখানে আমার অসত্য ক্ষমা প্রার্থনা জানালুম। সেই গভীর রাত্রিতে যাদের নির্দেশে, আমাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তরুণী নার্সটা অনিমন্ত্রিত বিদেশী অতিথিকে লেপ্‌চা না খাইয়ে আসতে দেয় নি।

১লা জুলাই সকাল বেলা দশটায় মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রিশতলা গগনচুম্বী প্রাসাদের সকলের নীচের তলার হলঘরে আমাদের সম্মেলন আরম্ভ হল। প্রথমেই অ্যাকাডেমীর প্রেসিডেন্ট সমবেত প্রতিনিধিদের স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। আর বিশেষতঃ চীন ও ভারতীয় প্রতিনিধিদের চীনের অধ্যাপক ওয়ার্ড, ভারতের পক্ষে অধ্যাপক সাহা এবং অন্য সকলের পক্ষে সুইডেনের প্রতিনিধি বক্তব্য জানালেন। তারপর অ্যাকাডেমীর সদস্যরা ভিনোগ্রাদোভ, ফ্রুমো ও এরেনহাউট্‌ বক্তৃতা করলেন, এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে তারা পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান সব কিছুই বিশদ বিবরণ দিলেন। সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়েই মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা ছিল, আমরা আড়াই হাজার লোকে অপরাহ্ণ অধিবেশনে যোগ দিলুম। চায়ের জন্য একঘণ্টা বিরতির পর আরম্ভ হবে ভ্যারাইটি শো—নানা অঞ্চলের জন সঙ্গীত ও নৃত্য এবং প্রসিদ্ধ ব্যালে নৃত্যের সামান্য একটু নমুনা মাত্র। রাত্রি প্রায় দশটায় তা' শেষ হ'ল।

২রা জুলাই সম্মেলন কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, যেমন পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জৈব বিজ্ঞান প্রভৃতি শাখায়। আমি শেষোক্ত শাখায় যোগ দিতে গেলুম, চিকিৎসা বিদ্যার ফ্যাকাল্টি ভবনে। সেদিন মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির সময়ে ঐ ফ্যাকাল্টির ডীন প্যাভলিচিফের সঙ্গে প্রাচ্যদেশীয় কয়েকজন প্রতিনিধি আমরা অর্থাৎ ভারত, চীন, মঙ্গোলিয়ার ভিন জন, ইন্দোনেশিয়ার শিষ্যদেবী ও মঙ্গোলিয়ার প্রতিনিধির মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি আমাদের খুব সাদরে অভ্যর্থনা করলেন এবং ভোজের পর আমাদের একত্রে ফটো নেওয়া হল। পরদিন প্রাভদা'য় সে ছবিখানি বের হয়েছিল। তাঁর কক্ষেই পরিচয় হল একজন মহিলা বিজ্ঞানী, অ্যাকাডেমীর সদস্যা লীনা স্টার্লের সঙ্গে। আমাদের অপর দুজন সরকারী ভারতীয় প্রতিনিধি খানোলকর ও জগদীশ শঙ্কর এবং বিশেষ আমন্ত্রণে মেডিক্যাল কোঅপারেশন সোসাইটি ও অধ্যাপক কোপাধ্যায় হেলসিঙ্কি হতে মস্কো এসে অধিবেশনে যোগ দিলেন। ঐ সভাকক্ষের বাইরে একটি ছোট্ট দোকান ছিল। ইন্দোনেশিয়ার শিষ্যাদেবীকে মস্কোর ছবি কিনতে দেখে আমিও কুড়ি রুবল দিয়ে এক প্যাকেট ছবি কিনে ফেলুম এক শ রুবলের একখানা নোট—ফেরৎ পেলুম এক তাড়া নোট। গুনে দেখবার প্রয়োজন আছে বলে ভাবিনি, তাই পকেটে ফেলে হোটেলে ফিরে এসে, পকেট হতে মনিব্যাগে তা পুরে রাখতে গিয়ে দেখি ২৫ রুবল কম আছে। জানি না দোকানী মহিলার তা বিদেশীকে দেখে ইচ্ছাকৃত কিংবা আকস্মিক ভুল। যাক্‌ মনকে প্রবোধ দেওয়া গেল, লুকিনের হাতে সাময়িক হাত খরচের জন্য আড়াইশ রুবল পাওয়া গিয়েছিল; যারা দিয়েছিল তাদের হাতেই ফিরে গেল!

রাত্রিতে হোটেল মেট্রোপোলে প্রতিনিধিদের জন্য মস্কোর বহু গণ্যমান্য অতিথিদের সমাবেশ হ'ল বিরাট ভোজ। আমার মনে পড়ে গেল ১৯৪৭ ইংরেজীতে প্যারিসে বিশ্ব মেডিক্যাল সম্মেলনের প্রতিনিধিদের আপ্যায়নের ভোজের কথা। অভ্যর্থনা জাঁকজমক সমস্তই রাজকীয় আড়ম্বরে প্রায় চারঘণ্টা ধরে চলো। একটী কোর্স শেষ হয়, আর ভড্‌কা এবং জর্জিয়ার মদপূর্ণ গেলাসে টুং টাং শব্দ আর বক্তৃতা। প্রথমেই প্রেসিডেন্ট টোস্ট্‌ প্রস্তাব করলেন। তারপর চলো একের পর এক একজন করে প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধিদের বক্তৃতা মাতৃভাষায় আর তার অনুবাদ। ভারতীয় প্রতিনিধিদের পক্ষে জবাব দিলেন 'স্টালিন প্রাইজ' প্রাপ্ত মেজর জেনারেল

দেখে। কিন্তু আমরা অবাক হয়ে গেলুম যখন তিনি হিন্দিতে না বলে ইংরেজীতে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। ভোজ শেষে বেরিয়ে আসার সময়ে আমি অনুযোগের স্বরে বললাম "মেজর জেনারেল, আপনি কেন হিন্দীতে বলেন না? ইংরেজীতে বলাটা ভাল হয়নি!" তিনি মুখ কাচুমাচু করে বললেন যে তিনি ভাল হিন্দিতে বলতে পারেন না। আমি দৃঢ় স্বরে বললাম "তবে আমাদিতেই বলা উচিত ছিল।" তিনি বললেন "সে কি হয়?" আমি বললাম "এরপর যদি কখনও বলতে হয়, তাহলে আমি বাংলাতেই বলবো, দেখবেন।"

৩রা জুলাই রবিবার। সেদিন সকালে মস্কো হতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে প্রশস্ত বিমান ক্ষেত্রে ছিল সোভিয়েট ইউনিয়নের সাংবৎসরিক বিমান-মহড়া। ভারতবর্ষ হতেও এয়ার মার্শাল মুখার্জী ও অন্যান্য অফিসারেরা সেজন্য নিমন্ত্রিত হয়ে মস্কোতে আগেরদিন পৌঁছে আমাদের হোটেলেই ছিলেন। অধ্যাপক সান্যাল ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য একটু জ্বর হওয়াতে যেতে পারেন নি। আমরা কয়েকজন, নরওয়ের লুণ্ডবি, লেনিনগ্রাদের ব্রিচ, বোম্বাইয়ের কোশাখী ও আমি একটি গাড়ীতে এবং এমনি অনেকগুলি গাড়ীতে ডেলিগেটরা বিভক্ত হয়ে রওনা হলুম বিমানক্ষেত্রের দিকে। যেতে যেতে দেখলুম সমস্ত মস্কোই শুধু নয়, গোটা রুশদেশটাই যেন রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। পায়ে হেঁটে আর যতরকম যান আছে, তাতে কাঁঠাল বোম্বাই নৌকোর মত লোক চলেছে ছুটে বিমানের মহড়া দেখতে। কিন্তু আমাদের দেশের মত উচ্ছৃঙ্খল জনতা নয়, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত। মাঝে মাঝে চার রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্রাফিক পুলিশ হাত দেখিয়ে জনতার গতি নিয়ন্ত্রণ করছে। যখন চলতে চলতে যান-গুলি পুলিশের নির্দেশে থেমে দাঁড়াচ্ছে, তখন দু'মাইল লম্বা লাইন আপনি তৈরী হয়ে যাচ্ছে। এমনি ভাবে অনেক সময় লাগছিল বলে, লুকিন এগিয়ে গিয়ে ট্রাফিক পুলিশকে কী বলে। "ডেলিগাট" এই শব্দটি শোনা মাত্র শুদ্ধ ও নিশ্চল লাইনের মাঝ হতে আমাদের গাড়ী লাইন ভেঙে পাশ কেটে পুলিশের নির্দেশে বেরিয়ে গেল—অন্য সবাই পড়ে রইল পশ্চাতে। আমাদের পৌঁছতে একটু দেরীই হয়ে গিয়েছিল। দূর হতেই দেখতে পেলুম C. C. C. P (S. S. S. R) আকাশের গায়ে এরোপ্লেনে বড় বড় লেখা, উড়ে চলেছে। আমরা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম নানারকম বিমানের কসরৎ। ছোট বিমান, কমেট বিমান, বোমারু বিমান, সুপারসোনিক বিমান, হেলি-কোপ্টার—সব কিছু কতরকম কসরৎ দেখালে। সুপার-সোনিকগুলি আকাশে মিলিয়ে যাওয়ার পর শব্দ শোনা গেল, হেলিকোপ্টারগুলি ঠিক যেন আমাদের মাথায় নেমে ঘাস্টা মারে আর কি? হঠাৎ তাকিয়ে দেখি অসংখ্য বিমান হতে এক সঙ্গে প্রায় দু'হাজার বিমান সৈন্য নানারকমের রঙ-বেরঙের প্যারাসুট সাহায্যে নামিয়ে নামলো! সমস্ত আকাশ রামধনুর সবকটি রঙের সমাবেশ এবং অপূর্ব শ্রী ধারণ করলো। ধীরে তারা সকলে উড়ন্ত পরীর মত আকাশে উড়তে উড়তে এসে নামলো মাটিতে, একটিও আঘাত পেলে না, ধরিও প্রতিবিমানের জন্য লাল ক্রশ চিহ্নিত গাড়ীর মধ্যে ডাক্তারেরা চারদিকেই মজুত ছিলেন। তারা মাটিতে নেমে মুহূর্ত মাত্র দেরী না করে প্যারাসুটকে গুটিয়ে নিয়ে, পিঠে বোঝার মত বেঁধে মার্চ করে চলে গেল। সেই দৃশ্য চিরকাল আমাদের স্মৃতিপটে জাগরূক থাকবে। মস্কোর বিমান ক্ষেত্রে সেদিন যে জনসমাবেশ দেখেছি—শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত, তেমনটি আর কোথাও দেখিনি। বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভের অভ্যর্থনায় কলকাতায়ও বিরাট জনসমাবেশ হয়েছিল—প্রায়ই একই রকম কিন্তু দুই জনসমাবেশের মধ্যে তফাৎ কত! শৃঙ্খলা ও নিয়মের ব্যতিক্রমই বোধকরি যা ভারতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য!

যুগান্তরের চাঁদন

পরিতোষ ঘোষ

একটা নতুন যুগ চালু হ'ল ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট তারিখে নিদারুণ বিভীষিকার বীভৎসতায়। সেদিনের সরকারী ঘোষণায় আমেরিকার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সারা পৃথিবীকে জানালেন যে বিপক্ষ জাপানের হিরোশিমা নগরে আমেরিকার আকাশবাহিনী প্রলয়ংকর শক্তি নিক্ষেপ করেছে এ-জাবত-অকল্পনীয় পরমাণু-বোমার সাহায্যে, যার বিস্ফোরক শক্তি বিশ হাজার টন টি. এন. টির চাইতেও বেশী। এক ত্রাসসঞ্চারকার কালো ছায়ায় এই অশান্ত যুগের পদসঞ্চার সূচিত হল সমস্ত পৃথিবীর মনে।

পরদিন 'সেন্ট লুই পোষ্ট ডেসপ্যাচ'-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হ'ল—"হয় পৃথিবীর মানুষ এই নতুন শক্তিকে শান্তির প্রয়োজনে ব্যবহার করবে, অথবা একথাই বুঝে নিতে হবে যে বিজ্ঞান মর্ত্যবাসী সমস্ত শুভবুদ্ধি জীবকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করে পৃথিবীর ধ্বংসাবশেষকে শিশাচদের হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

১৯৪৬ সালের ১৪ই জুন রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরমাণবিক কমিশনের সম্মুখে তাঁর প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে আমেরিকার প্রতিনিধি মিঃ বার্নার্ড বারুক এই বলে আরম্ভ করলেন: "আমাদের জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে বেছে নিতে হবে।"

কী সে যুদ্ধ যা চলবার ক্ষমতা পেতে না পেতেই সারা পৃথিবীর মনে ছুঁড়ে দিয়েছে এই দুঃসহ প্রশ্ন: কীসের শোষক হ'বে সে? নতুন যুগবাহন, নতুন মর্যাদায় উজ্জ্বলতর জীবনের, না বিভীষিকার গ্লানিতে আজন্ম সর্বাত্মক মৃত্যুর?

এ-প্রশ্নের জবাব খুঁজতে, এ-যুগের অন্ত-পরিচয় জানতে, আমাদের পিছু হাঁটতে হবে তার আঁতুড় ঘরে।

উনিশ শতকের একেবারে শেষাশেষি। ১৮৯৮ এর পর থেকে। প্যারির দূর অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিজিক্স এণ্ড কেমিস্ট্রি। বন্ধুরা কখনো এলে দেখতে পান নড়বড়ে এক কাঠের ধালাদে পরম আদা কাপড়ে আপাদ মস্তক ঢেকে (জায়গাটার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার হাত থেকে যা দেহ রেহাই সেই ভয়ে নিবারক-আবরণ হিসাবে) এক মেধা-দীপ্ত পুরুষ আর ল্যাবোরেটোরির ওভারঅল-এ সারা গা ঢেকে এক শ্রীমতী। দুজনে ব্যস্ত, ভীষণ ব্যস্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থের ঠিকানা খুঁজতে।

পিয়ারে কুরী আর তাঁর স্ত্রী মেরি স্ক্লোডোউস্কা কুরী। সে এক আশ্চর্য দম্পতি।

পিয়ারে কুরী (১৮৫৯-১৯০৬) প্যারীর একজন চিকিৎসক ডাঃ কুরীর দ্বিতীয় পুত্র। ফটিন মাফিক সাধারণ পড়াশোনায় পিয়ারের বুদ্ধি বা মেজাজ তেমন খেলতো না অথবা এমন সব বিষয়ে যেগুলির ব্যবহারিক মূল্য তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়। কিন্তু গণিতে অসাধারণ তাঁর বুৎপত্তি। আর গণিতকে তিনি দেখতেন পদার্থবিদ্যার অন্দর মহলে উঠবার সিঁড়ি হিসাবে। সব চাইতে বড়ো কথা যা তিনি বুঝতেন না, তাকে প্রকাশ্যে স্বীকার করবার সরল সাহস ছিল তাঁর।

গভীর সখ্যতায় আবদ্ধ দু'ভাই। জ্যাকোয়েস আর পিয়ারে। কাজের লোক জ্যাকোয়েস। দক্ষ চওড়া। জীবনের উন্মাদনায় ভরপুর। পিয়ারে ভাবুক আর আদর্শ-বাদী। আর সব আদর্শবাদীর মতো তিনিও কখনো কখনো সংশয়ে মুসড়ে পড়েন। জীবনের মধুর ও স্বাভাবিক দাবীগুলি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার কোনো মানে নেই বলে সেগুলিকে যদি চিরার জীবনের পথে সহজভাবে মোড় ঘোরানো যায় তবেই জীবন, একজন আদর্শসন্ধানীর জীবন, সুখকর হয়ে উঠতে পারে এই অনুভবের অন্তর্দৃষ্টি ছিল তাঁর।

বাস্তবকে আদর্শায়িত করেই শুধু আদর্শকে বাস্তব করা সম্ভব। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অনুরক্তি সত্ত্বেও বাস্তবের সৌন্দর্যের, বিশেষ করে সঙ্গীত ও বস্তু প্রকৃতির, প্রতি তাঁর মনে ছিল অতি সুকোমল স্পর্শানুভূতি।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে পিয়ারে ফিজিক্স-এর লাইসেন্সিয়েট পাশ করেন এবং ১৯ বছর বয়সে সরবোন-এ বিজ্ঞান বিভাগে ডেমঁার সহকারী হন। জ্যাকোয়েসও এ-সময়ে সরবোন-এ ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন ক্রাইভেল-এর অধীনে, জৈবরসায়ন বিভাগে। যা হোক, দু'ভাই এক সঙ্গেই কাজ করে যেতে লাগলেন এবং পরবর্তী চার বছরে পিয়েজো-ইলেকট্রিসিটিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রিসার্চ-এর কাজ করলেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্যারীতে স্কুল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিজিক্স অ্যাণ্ড কেমিস্ট্রি সবে সুরু হচ্ছে। পিয়ার সেখানে গুটসেন বার্জারের অধীনে ল্যাবোরেটোরির কর্তা হয়ে গেলেন সরবোন ছেড়ে। দু' বছর পরে পল ল'াঞ্জেভঁ। ছাত্র হয়ে এখানে এলেন। তাঁর লেখা থেকেই পিয়ারের এ-বয়সের কথা আমরা জানতে পারি। ছাত্রদের চাইতে পিয়ারে বয়সে ছিলেন কিছু বড়ো। প্রথম থেকেই সাথী, বন্ধু ও শিক্ষক হিসাবে তিনি তাদের মন জয় করে নিলেন সমভাবে তাঁর অগাধ জ্ঞান ও নির্ভেজাল সহৃদয়তা বিলিয়ে। ল'াঞ্জেভঁ। যখন স্কুলে প্রথম এলেন ল্যাবোরেটোরির দশ বছরের অভিজ্ঞতায় পিয়ারে যন্ত্রপাতির উপরে এমন দখল এবং সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছেন যে নিতান্ত আনাড়িরাও সহজে অনেক কিছু বুঝতে পারবে। তাঁর সঙ্গে কাজ করা ছিল ছাত্রদের পরম আনন্দের বিষয়, কারণ তারা অনুভব করতো যে তিনিও তাদের সঙ্গে কাজ করছেন। কুরীর সম্বন্ধে ল্যাঞ্জেভঁার এ-সময়ের মধুরতম স্মৃতি : ব্ল্যাক-বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে পিয়ারে তাঁর ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলছেন আর তাঁর তীক্ষ্ণ সংক্রামক কৌতূহল এবং বিপুল জ্ঞানের সাহায্যে তাদের মনে ফলপ্রসূ চিন্তা-ধারার সূত্রপাত করছেন।

এমনিভাবে তেরো বছর তিনি শান্ত সুখে তাঁর কাজ, তাঁর ছাত্র, তাঁর সংসারকে নিয়ে মগ্ন রইলেন। তখনও পর্যন্ত তিনি ডক্টরেট পাননি বলে তাঁর বাবা কখনো কখনো অস্বস্তি বোধ করতেন। কিন্তু পিয়ারের সেই একই জবাব, তাড়াহুড়োর দরকার নেই। নিজের অবস্থার অতৃপ্তি নেই তাঁর। কাজের বা অবস্থার কোনো পরিবর্তনে খুব ভয় ছিল তাঁর, পাছে তার জন্যে তাঁর গবেষণার সময়ে ঘাটতি পড়ে।

পার্থিব অর্থে তাঁর কোনো উচ্চাশা ছিল না। কিন্তু সত্তার গভীরে এক কামনার দীপ জ্বলতো তাঁর, একদিন আসবে সেই মেয়ে—কাজের সঙ্গিনী হবে সে, হবে হৃদয়েরও রাণী। অলস স্বপ্ন ভেবে এই চিন্তাকে জোর করে সরিয়ে রাখতেন তিনি। কিন্তু তবু এই স্বপ্নই সত্য হ'ল একদিন। সরবোনের ল্যাবোরেটোরিতে কর্মরতা এক দীপ্তিময়ী পোলিশ তরুণীর ভেতরে তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর প্রকৃতির সমস্ত স্বপ্ন আর আকাঙ্খার মূর্তিমতীকে।

মেরি স্ক্লোডোউস্কা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর ওয়ারশতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন সেই শহরের এক জিমনাসিয়ামের বিজ্ঞান শিক্ষক। তাঁর মা অল্প বয়সে মারা যান, একদল বাচ্চা ছেলে মেয়ে রেখে। ডাঃ স্ক্লোডোউস্কির বিজ্ঞানের প্রতি ছিল আন্তরিক অনুরাগ এবং বিশেষ করে পদার্থবিদ্যার শিক্ষায় ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রদর্শনের উপরে তিনি জোর দিতেন। এ-নিয়ে তাঁর সেকেলে উপরওলার সঙ্গে অনবরত বিরোধ বাধতো। সে ভদ্রলোকের মতে পদার্থবিদ্যার এক্সপেরিমেণ্ট ছেলে-খেলার সামিল। তার ফলে ল্যাবোরেটোরির যন্ত্রপাতি কেনবার জন্যে নিতান্ত সামান্য টাকা দেওয়া হত এবং ডাঃ স্ক্লোডোউস্কিকে অনেক দরকারী যন্ত্রপাতি কেনবার জন্যে গাঁটের কড়ি খরচ করতে হত। ফলে, সম্ভবতঃ বোতলগুলি যথাযথ ধুয়ে মুছে রাখবার ও জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখবার জন্যে একজন লোকের মাইনে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠতো না। কাজেই যখন তাঁর বাচ্চা মেয়ে মেরি মস্ত একটা অ্যাপ্রন জড়িয়ে অনেক তোবালে কাঁধে করে মাতৃ-সুলভ দক্ষ ভঙ্গীতে তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখবার জন্যে ল্যাবরেটোরিতে আসতে শুরু করল তিনি তাকে স্বাগতঃই জানালেন। গোড়ায় অবশ্য তিনি ভেবেছিলেন যে এটা তার পুতুল খেলার মতই ছেলেমানুষি; কিন্তু কিছুকালের

মনে তিনি দেখে খুশি হলেন যে ল্যাবোরেটোরির মধ্যে যে সব কাজকারবার চলে মেয়েটার সে বিষয়ে সত্যিকার আগ্রহ আছে। আর এই আবিষ্কারের মুহূর্ত থেকেই মেরি ম্যালোনি যে বড় হয়ে ভুলে যেতে শুরু করল তিনি তাঁকে নিয়মিত পড়াতেন।

মেরি যখন ফিজনাসিয়ামে যেতে শুরু করলেন, তখনও তিনি তাঁর বাবাকে সাহায্য করবার অভ্যাস বজায় রাখলেন এবং বাসে হবার সঙ্গে সঙ্গে পরদিনের কাজের জন্য যন্ত্রপাতি আগের দিনের সন্ধেবেলা সাজিয়ে রাখতে পারতেন। সন্ধেবেলা মেরি তাঁর বাবার কাছে নিতেন বিজ্ঞানের পাঠ আর দিনের বেলা ফিজনাসিয়ামে চলতো তাঁর সাধারণ লেখাপড়া।

ল্যাবোরেটোরির ভেতরে অখণ্ড শান্তি আর মনোযোগ কিন্তু বাইরে তখন উৎপীড়ন, আর অসন্তোষের দিকিদিকি আগুন। পোলিশ সংস্কৃতির ওপর কেন্দ্র ওয়ারশ। আর রাশিয়ার ভারতন্ত্রের নীতি ছিল যে-ভাবেই হোক তাকে দাবিয়ে রাখা। পোলিশ ভাষা পড়ানো চলবে না, জাতীয় নৃত্য করা চলবে না, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া চলবে

আর এই অত্যাচারের ফলে প্রত্যেক পোল-এর মনে জ্বলে উঠলো দেশপ্রেমের দুর্বার আগুন। স্কুলের ছাত্রদের ডেস্কের উপরে খোলা থাকতো একখানা রাশিয়ান ভাষার বই আর ডেস্কের নীচে একখানা পোলিশ ভাষার বই। যে কেউ ছিল বিপ্লবী, যে কোন সময়ে সাইবেরিয়ার নির্বাসনের স্বাদ পেতে প্রস্তুত এই পবিত্র কর্তব্যের নামে। মেরির বাবা, তাঁর ছাত্রেরা তাঁর বন্ধুরা, মেরি নিজেও, মনের দীপ জ্বালালেন এই আগুনের শিখায়।

এবং পুলিশেরও তা জানতে বাকী রইল না। ফলে মেরি দুষ্কৃতর পরিবেশে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ওয়ারশ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করলেন। প্রথমে তিনি ঠিক করলেন যে ক্রাকাউ যাবেন। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ রসায়ন-বিদ্যার ছাত্রী হিসাবে তাঁকে ভর্তি করে নেবার অনুরোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পাদক নাকি তাঁকে জানিয়েছিলেন যে এ-ধরণের শিক্ষা তাঁর জন্যে নয়। রান্নার ক্লাসে তাঁকে ভর্তি করে নেওয়া যেতে পারে। কথাটা কতদূর সত্য জানা নেই। তবে মেরি ক্রাকাউতে না গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে এলেন প্যারীতে।

বয়স তখন তাঁর কুড়ির ঘরের নীচের দিকে। সম্বল নেই, চেনাশোনাও সামান্য। অনাহারকে জয় করতে হয়েছে শুধু তাঁর মেধা আর সাহস। শহরের পূব কিনারায় চার তলার এক পেছন দিককার ঘরে থাকেন তিনি। নিজের প্রয়োজনীয় সব কিছু নিজেকেই উপরে ঘয়ে নিয়ে যেতে হয়। খাদ্য: পাঁউরুটি আর দুধ, এতদিনের প্রিয় ঘাসে ও পানীয়ের স্বাদ প্রায় ভুলেই গেলেন। দৈনিক খরচা সাকুল্যে দশ সেন্ট। আর তা কামাই করতে হয় ছাত্র পড়িয়ে আর শেষ দিকে সরবোন-এ চুল্লী ঠাণ্ডিয়ে আর বোতল ধোলাই করে।

এই সব মেহনতী কাজের মধ্যে দিয়েও তাঁর জ্ঞান সরবোন-এর দুজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। গ্যাব্রিয়েল লিপম্যান, পদার্থবিদ্যা বিভাগের বড় কর্তা, আর বিখ্যাত গণিতজ্ঞ জাঁরি পোয়াঁকারে। তাঁরা তাঁর সম্বন্ধে সব কথা জেনে, তাঁর বাবার সঙ্গে লিপম্যান পত্রালাপ করার ফলে মেরিকে দেওয়া হল পিয়ারে কুরীর হাতে, যে পিয়ারে ছিলেন লিপম্যানের স্নেহ সম্ভাবনাময় ছাত্রদের অন্যতম।

চওড়া কাঁধ, কিন্তু লাবণ্যময়ী। ঢেউ খেলানো এক রাশ পেছনে ওল্টানো চুলের নীচে চওড়া কপালের কিনারায় অনবদ্য একজোড়া ভ্রূ। তা'র নীচে থেকে একজোড়া নীলাভ ধূসর চোখ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। সে সময়কার মেরি স্লোভোস্কা, পোলদের মতো উঁচু চোয়ালের হাড়, দৃঢ় মুখভঙ্গী কিন্তু সেই মুখখানিতে আর সুরেলা গলায় কী যেন ছিল, ছিল সৌজন্যের আবেশ আর শক্তিময়তা। আর সেগুলিকে ভালোবেসে ফেললেন পিয়ারে। পোলিশ মেয়েদের মতো তাঁর ভেতরে ঘটেছিল জ্ঞানস্পৃহা আর সৌন্দর্যপ্রীতির সংমিশ্রণ। ব্যাপক সংস্কৃতির লম্বুধারে তাঁর আচরণ ছিল সরল ও স্বাভাবিক।

পিয়ারে কুরীর প্রকৃতি ছিল কতক বিষয়ে মেরির প্রকৃতির অনুরূপ, কতক বিষয়ে তা'র পরিপূরক। দুজা

ফ্যাকাশে চেহারা। একটু কুঁজো। অবাধ্য চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে কপালে। অত্যন্ত সরল মুখভাব। হাসিতে যেন ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সুন্দর দাঁতের মনোরম মাধুর্য। একটু খেয়ালী, হঠকারিতার ঝোঁক আছে যেন। শিশুসুলভ আনন্দে মশগুল মজি। মজির দিক থেকে ওঁরা স্বতন্ত্র, স্বচ্ছ চিন্তা আর গভীর অনুভবের দিক থেকে এবং সহজ সুখ আর সৌন্দর্যের প্রতি ভালোবাসায় ওঁরা এক।

দুজনই গরীব। নিজের কাজকে ভালবাসেন দুজনেই। এ-দুটোর কোনটাকেই পরস্পরের সঙ্গে বিবাহিত হ'বার পথে বাধা হিসেবে মনে করলেন না ওঁরা। ইলেক্ট্রো-মীটার আর কনডেন্সার নিয়ে পিয়ারে তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়ে যাবেন আর মেরি তাঁর সহকারী হবেন আর ডিগ্রী পরীক্ষার জন্যে কাজ করবেন। ফলে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে শুরু হ'ল তাঁদের যুগ্ম-জীবন। পিয়ারের বয়স ৩৫ বছর তখন আর মেরির ২৭। শুরু থেকেই সহ-যোগিতার জীবন তাঁদের। শুধু ল্যাবোরেটরিতেই নয়, বাড়ীতেও। তাঁদের অতি সাধারণ গৃহস্থালীতে আগন্তুকরা দেখতে পেতেন যে পিয়ারে ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন আর মেরি করছেন রান্না। এই ব্যবস্থার ফলে মেরির পক্ষে তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হ'ল এবং তিন বছরের মধ্যেই তিনি পদার্থবিদ্যা ও গণিতে লাইসেন্সিয়েট চমৎকার ভাবে পাশ করলেন। তাঁরা প্রথমে যেখানে থাকতেন সে জায়গাটা অনেক দূরে বলে ল্যাবোরেটোরির কাছাকাছি নতুন এলেন এবং দুজনে কাজ করতে লাগলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁদের প্রথম সন্তান আইরীনের জন্ম হয়। তা'র কিছুদিন বাদে বাচ্চাটা যা'তে বেশী আলোহাওয়া পায় সেজন্যে এবং পিয়ারের যাবার জন্যেও, কিছুকাল আগে বিপত্নীক হয়েছিলেন তিনি, স্নান সংকুলান করবার জন্যে মঁতসুরি পার্কের কাছে কুলেভার্দ কেল্যারম্যানের এক বাড়ীতে আবার নতুন এলেন তাঁরা।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে একটি কাঁপা টিউবের ভেতরে নিম্ন-চাপের হাওয়ার মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে তা'র গর্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়েছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম ক্রুক্স্ 'ক্যাথোড রশ্মি' আবিষ্কার করেন। এর বেশ কিছুকাল পরে স্যার জোসেফ থমসন ও আরো অনেকে দেখান যে এই রশ্মিগুলি ঋণাত্মক তড়িৎকণা বা ইলেক্ট্রণের সমষ্টি। আর প্রত্যেকটা ইলেক্ট্রণের ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর এক সহস্রাংশেরও অনেক কম, তা'র ১৮০০ ভাগের একভাগ। শুধু মাত্র এই তথ্য গুলিতেই ডাল্টনের পারমাণবিক তত্ত্বে বিশ্বাসীদের প্রচুর চিন্তা এবং আলোচনার খোরাক জুটলো। উপরন্তু ক্যুরীদের বিয়ের বছর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে রন্টগেন আবিষ্কার করলেন এক্স-রে। ফলে সকলের দৃষ্টি আরও আকৃষ্ট হ'ল এ-দিকে। কোন পদার্থের উপরে ক্যাথোড রশ্মি আঘাত করলে এই এক্স রশ্মি উৎপন্ন হয়। মাংস বা অনচ্ছ পদার্থের ভেতর দিয়ে যাবার ক্ষমতা আছে তার। আলো নিবারক কাগজ ভেদ করে ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপরে দাগ ফেলে।

এই আবিষ্কারগুলির ফলে য়ুরোপ ও আমেরিকার নানা ল্যাবোরেটোরিতে ইলেক্ট্রনের এবং সব রকমের বিকিরণের ধর্ম নিয়ে গবেষণা শুধু হ'ল। কিন্তু ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ক্যুরীদের সহকর্মী বেকেরেল হঠাৎ পা দিয়ে ফেললেন এক অভাবনীয় আবিষ্কারের জগতে। স্বতঃ তেজস্ক্রিয়তা। কতকগুলি প্রতিপ্রভ জিনিসের স্বভাব নিয়ে পরীক্ষা চালানোর সময়ে, এই সব জিনিসের মধ্যে কয়েকটি ছিল য়ুরেনিয়াম ঘটিত লবণ, তিনি দেখলেন যে এই য়ুরেনিয়াম ঘটিতদের মধ্যে থেকে প্রতিপ্রভা ছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে এক্স-র অনুরূপ আরেক ধরণের বিকীরণ যা' অনচ্ছ পদার্থের আবরণ ভেদ করে ফটো-গ্রাফিক প্লেটে দাগ ফেলতে পারে। এর সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারও করলেন যে এই রশ্মিগুলির চার পাশের হাওয়া তাড়িতগুণ সম্পন্ন হয়ে যায়।

বেকেরেলের কাজের অনুসরণ করে এবং এই সব বিকীরণের উপস্থিতি নির্ধারণে তাঁর পদ্ধতি ব্যবহার করে মাদাম ক্যুরী সমস্ত জানা মৌলিক পদার্থ আর তাদের যৌগিক সম্পর্কে বিস্তারিত অনুসন্ধান শুরু করলেন,

তাদের কোনটার মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার লক্ষণ পাওয়া যায় কিনা দেখবার জন্য। জানা মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে কেবল মাত্র থোরিয়ামেই য়ুরেনিয়ামের এই রশ্মি-বিকিরণ ক্ষমতার সামান্য লক্ষণ দেখা গেল।

বিভিন্ন পদার্থের তেজস্ক্রিয়তার তুলনা করবার প্রক্রিয়াও বেকেরেল আবিষ্কার করেছিলেন। সেই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে এক টুকরো পিচব্লেণ্ড (য়ুরেনিয়ামের সব চাইতে সহজলভ্য খনিজ-মূল) পরীক্ষা করবার সময়ে মাদাম ক্যুরী বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে এই টুকরোর মধ্যে যে পরিমাণ য়ুরেনিয়াম আছে তার দরুণ সম্ভবপর তেজস্ক্রিয়তার চারগুণ তেজস্ক্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে সেই টুকরোটিতে। এর অর্থ একমাত্র এই হতে পারে যে পিচব্লেণ্ডের ভেতরে একটা অজানা তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ রয়েছে।

পিয়ারে কুরী তখন তাঁর নিজের গবেষণার কাজে মগ্ন। কিন্তু এই নতুন মৌলিক পদার্থটি আবিষ্কার করবার জন্যে তিনি তাঁর নিজের কাজ ছেড়ে মেরির সঙ্গে যোগ দিলেন। স্থির করে তাঁরা দেখলেন যে এই নতুন পদার্থটি পিচব্লেণ্ডে খুব সামান্য পরিমাণেই থাকা সম্ভব। কাজেই প্রচুর পরিমাণে পিচব্লেণ্ড নিয়ে কাজ করতে পারলেই শুধু তাঁদের আশা পূর্ণ হওয়া সম্ভব। এ-পথে বিরাট বাধা তাঁদের সামান্য উপার্জন। প্রয়োজনীয় পরিমাণ পিচব্লেণ্ড কেনবার মতো টাকা কোথায় তাঁদের? তাঁদের এই প্রাথমিক অসুবিধা অবশ্য কেটে গেল যথা সময়ে অস্ট্রিয়া সরকারের করুণায়। বোহেমিয়ায় অস্ট্রিয়া সরকারের য়ুরেনিয়াম খনি ছিল। ঠিক দরকারের সময় তাঁরা য়ুরেনিয়াম বের করে নেওয়া হয়েছে এমন একটন পিচব্লেণ্ড ক্যুরীদের উপহার দিলেন। ক্যুরীদের কাজ শুরু হল। যেন প্রকাণ্ড একটা খড়ের গাদার ভেতরে একটা ছোট্ট সূঁচ খুঁজে পাবার চেষ্টা।

প্রথমে একটা ক্যাম্টরিতে ক্র্যাকশনাল ক্রষ্টালিজেশনের সাহায্যে কাজটাকে খানিকটা এগিয়ে নেওয়া হল। পরের অধ্যায় ল্যাবোরেটোরিতে। গুটসেন বার্জারের কৃপায় ইওাক্সিয়াল স্কুলে কাজের সুবিধা পেলেন তাঁরা। এই সেই নড়বড়ে কাঠের দালান আর ক্যুরীরা।

স্বাভাবিক ভাবেই অত্যন্ত ধীর গতিতে এগিয়ে চললো কাজ। কিন্তু কালক্রমে তেজস্ক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া গেল বেরিয়াম আর বিসমাথের পৃথকীকৃত যৌগিক গুলিতে। অনেক চেষ্টার পরে একটা শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় পদার্থ পৃথক করা সম্ভব হল বিসমাথ থেকে। মাদাম তার নাম দিলেন পোলোনিয়াম, তাঁর জন্মভূমির স্মরণে। বেরিয়ামের যৌগিকে তেজস্ক্রিয় সত্তাটি দেখা গেল তেজস্ক্রিয়তার দিক থেকে পোলোনিয়ামের চাইতেও ঢের শক্তিশালী এবং তাকে পৃথক করা আরো শক্ত। এই নতুন মৌলিকটির নাম রেডিয়াম দিলেন মাদাম এবং চূড়ান্ত ক্লেশকর প্রচেষ্টার শেষ পর্যন্ত রেডিয়ামের একটা লবণকেও পৃথক করতে সমর্থ হলেন।

এ-কাজ চলেছিল ১৮৯৮ থেকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। শুধু দারুণ কঠিন কাজই নয়, কালে ক্রমে দেখা গেল বিপজ্জনক কাজও। তেজস্ক্রিয় পদার্থের মধ্যে থেকে শক্তির অবিরত প্রবাহ বিরাট বস্তুপিণ্ডের মধ্যে দিয়ে চললে কোনো ক্ষতি হয় না কিন্তু ছোট্ট এক টুকরো রেডিয়াম এক জায়গায় ঘনীভূত হলে তা ভীষণ বিপদের, সম্ভবতঃ কল্যাণেরও, কারণ হতে পারে মানুষের পক্ষে। তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলিকে নিরাপদে রাখবার ও ব্যবহার করবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার আগে এ-নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের নানা যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। মাদাম ক্যুরীর স্বামী স্বাস্থ্য-হানির কোনো প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু পিয়ারেকে বেশ কিছুটা কষ্ট সইতে হয়েছে। তাঁর হাতদুটি বিশ্রীভাবে কুঁকড়ে গিয়েছিল রেডিয়াম টিউবের সংস্পর্শে। সম্ভবতঃ তাঁদের কাজের বিপদ বুঝতে পারবার সঙ্গে সঙ্গে আসল ঝুঁকিটা তিনিই নিজের ঘাড়ে টেনে নিয়েছিলেন জোর করে।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মাদাম ক্যুরী তাঁর পরীক্ষার ফলগুলিকে ডক্টরেটের থীসিস হিসেবে পেশ করলেন প্যারির ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্সের কাছে। আর এই থীসিস প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাতারাতি খ্যাতিহীনতার অন্ধকার থেকে এলে

দাঁড়ালেন গৌরবের আলোকমঞ্চে। তবু সেই সহজ জীবন। নির্মোহ সুন্দর। ফটোগ্রাফার আর রিপোর্টারদের সঙ্গে সাক্ষাতে অস্বীকার। সেই চিরকালের সরল দুটি ভালো-বাসার হৃদয়।

সে বছরেই লর্ড কেলভিনের নিমন্ত্রণে ওঁরা এলেন লণ্ডনে। সেখানে রয়্যাল ইন্‌স্টিট্যুশনের সম্মুখে পিয়ারে দিলেন ভাষণ। তুমুল অভ্যর্থনা। রয়্যাল সোসাইটির পক্ষ থেকে তাঁদের যুগ্মভাবে দেওয়া হল ডেভি-পদক। সে বছরের নোবেল পুরস্কারও ভাগ করে দেওয়া হল তাঁদের দুজন ও বেকেরেলের মধ্যে।

ক্যুরীদের মুখচোরা স্বভাব, হোমরা চোমরাদের সঙ্গে সহজ মহরমে ওঁদের অনাসক্তি আর পিয়ারের নিজের প্রতিপক্ষের গুণগান করবার উদার অভ্যাস এতকাল তাঁর প্রতিভার যোগ্য পদপ্রাপ্তির বাধা ছিল। কিন্তু ১৯০৪-এবিশেষ করে তাঁরই জন্য সরবোন-এ একটা বিভাগের সৃষ্টি করা হল এবং মেরি তাঁর অধীনে ল্যাবোরেটোরির ভার পেলেন।

এই প্রথমবারের মতো তাঁদের সব প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী হল তাঁদের আয়। মনে হল শান্ত সুন্দর, আরো কার্যকরী এক জীবন যেন ছড়িয়ে রয়েছে সম্মুখে। আরেকটা বাচ্চা মেয়ে, ঈভ জন্মেছে ইতিমধ্যে। কাজে আর সংসারের খুটিনাটিতে কী সুখে ভরা তাঁদের সময় আর ভাবনার অবকাশ।

১৯০৬-এর গোড়ার দিকে একদিন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজ খেতে বেরোলেন পিয়ারে। লাঁজেভ ছিলেই সেই দলে। লক্ষ্য করলেন তিনি তাঁর প্রিয় শিক্ষক যেন কী আনন্দে উজ্জ্বল জীবনের উন্মাদনায় উদ্দীপিত। এমনটি আর কোনদিন দেখেননি তাঁকে। সরবোন-এ তাঁর পড়ানোর একমাত্র কাজ থেকে মুক্তি পেয়েছেন তিনি। এবারে নিজেকে পুরোপুরি ছেড়ে দেবেন গবেষণার কাজে। আশাভরা মন, ভবিষ্যতের নানা পরিকল্পনায় সুখে ভরা, বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন তিনি। কিন্তু বাড়ীতে আর পৌঁছানো হল না। জনবহুল একটা রাস্তা পার হবার সময়ে মালবোঝাই এক গাড়ীর ধাক্কায় ছিটকে পড়লেন। দু'চোখের দৃষ্টি থেকে চেতনার দীপ্তি সেবারের মতো নিভে যাবার আগে কে জানে কাকে খুঁজেছিলেন পিয়ারে। নিদারুণ যন্ত্রণায় কাঁটায় বিঁধে হয়তো এই পৃথিবীর চেহারা ভেসে উঠেছিল তাঁর নিভন্ত দৃষ্টিতে একখানি ভালোবাসার মাধুরীতে জড়ানো প্রিয়সুন্দর মুখ হয়ে। কবরীতে তখন হয়তো নতুন ছন্দ বাঁধছেন মেরি। ছুটির দিনের অবসরের বিকেলে তাঁর প্রিয়তম, তাঁর হৃদয়ের অনন্ত সঙ্গী, ফিরে আসছেন ঘরে।

যুলেভার্ড কেলারম্যানের বাড়ীতে সব হাসি যেন নিভে গিয়েছে। শুধু মাঝে মাঝে দুটি শিশুর কলকণ্ঠে রণিত হয়ে ওঠে জীবনের আনন্দধ্বনি। আইরীন আর ঈভ। তাদের মুখ চেয়েই শেষ পর্যন্ত জীবনের রাশ আবার হাতে তুলে নিলেন মেরী। ফিরে গেলেন সরবোন-এ। তাঁর প্রিয়তমের বিষণ্ণ মধুর স্মৃতিতে ভরা সেই ল্যাবোরেটোরিতে। কিছুকাল বাদে পিয়ারের জায়গায় ক্যুরী-অধ্যাপকের পদ দেওয়া হল তাঁকে: চলল গবেষণার কাজ। এবারে দুজনের যোতনা তার। এক মিলুক সত্যানুসন্ধান। আর শুধু এভাবেই তো তাঁর প্রিয়তমের, তাঁর প্রাণের প্রিয় মানুষটির স্মৃতির শ্রেষ্ঠ পূজা করতে পারেন তিনি। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে রেডিয়ামকে পৃথক করলেন তিনি। তার পরমাণবিক ভরও নির্ণয় করলেন। আর সে বছরেই তাঁর তেজস্ক্রিয়া সম্বন্ধে সে-তাবত সব চাইতে প্রামাণ্য গ্রন্থ Traite de Radio activite প্রকাশিত হল। ১৯১১-য় তিনি এবং শুধুমাত্র তিনিই, দ্বিতীয় বার নোবেল পুরস্কার পাবার অনন্য সম্মান পেলেন। এ-প্রসঙ্গে একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সে বছরেই ফ্রেঞ্চ ইন্‌স্টিট্যুট তাঁকে অ্যাকাডেমিশিয়ান হিসেবে তাদের তালিকাভুক্ত করার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিল, কোনো নারীকে এ-পদে নেওয়া চলবেনা এই চালু প্রথার অজুহাতে।

ক্যুরীরা পিচব্লেণ্ডের ভেতরে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অনুসন্ধান শুরু করবার পর থেকে পদার্থ-বিজ্ঞানে একটা সম্পূর্ণ নতুন শাখার উদ্ভব হয়েছে। তাঁরা ও তাঁদের বন্ধুরা যখন ল্যাবে কাজ করছেন, সে সময়ে ইংলণ্ডে স্যার আর্নেস্ট রাদারফোর্ড, ফ্রেডরিক সডি আর স্যার উইলিয়াম র‍্যামজে

এবং আমেরিকার রাদারফোর্ড তাঁদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইলেকট্রনের আবিষ্কারের ফলে এই ধারণার সৃষ্টি হল যে পরমাণুদের পরিবর্তে সম্ভবতঃ তারাই ক্ষুদ্রতম প্রাকৃতিক কণা এবং তাদের সংযোগের ফলে বস্তুর উৎপত্তি সম্ভবপর হতে পারে। রেডিয়াম সম্পর্কে গবেষণা এ-বিষয়ে প্রত্যক্ষ আলোকপাত করল। কারণ দেখা গেল যে ইলেকট্রন বা এবং ধনবিদ্যুৎ সম্পন্ন কণিকারা β ছুটোই তেজস্ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়েছে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে রাদারফোর্ড ও সডি এই তত্ত্ব উপস্থাপিত করলেন যে তেজস্ক্রিয়ার শক্তি আসে পরমাণুগুলির ভাঙন থেকে এবং এ-যাবত এই তত্ত্ব প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। রাদারফোর্ডের কতকগুলি কাজকে অনুসরণ করে, যার ফলে দেখা যায় যে আলফা কণারা অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়ার ধনবিদ্যুৎ সম্পন্ন কণিকারা হিলিয়াম হতে পারে, র‍্যামজে এবং সডি প্রমাণ করলেন যে রেডিয়ামের বিকীরণের ফলে যে সব পদার্থ পাওয়া যায় হিলিয়াম তাদের অন্যতম। শেষ পর্যন্ত, অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও কঠিন কতকগুলি পরীক্ষার সাহায্যে রাদারফোর্ড প্রমাণ করলেন যে আলফা কণা প্রকৃতপক্ষে তড়িৎ-সম্পন্ন হিলিয়াম পরমাণু।

কিন্তু তেজস্ক্রিয়া ব্যাপারটা কী? এ প্রশ্নের জবাব জানতে হ'লে গবেষণার জগতে আমাদের আরো কয়েক পা এগিয়ে আসতে হবে।

নানা পরীক্ষার ভেতর দিয়ে ক্রমে জানা গিয়েছে যে পরমাণুর মোটামুটি দু'টি ভাগ আছে: কেন্দ্রক আর ইলেকট্রন মণ্ডল। এই কেন্দ্রকই পরমাণুর ভরের কারণ। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রকের ভরই পরমাণুর ভর। কেন্দ্রকের আয়তন ইলেকট্রনমণ্ডলের তুলনায় অনেক ছোট। এই কেন্দ্রক দু'রকমের কণা দিয়ে ঠাসাঠাসি ভর্তি। ধনবিদ্যুৎ-কণা প্রোটন আর প্রোটনের সমভর সম্পন্ন আরেক জাতীয় বিদ্যুৎবিহীনকণা নিউট্রন। কেন্দ্রকে যতগুলি প্রোটন থাকবে, বাইরের এলাকায় থাকবে ঠিক ততগুলো ঋণ-বিদ্যুৎসম্পন্ন ইলেকট্রন। কেন্দ্রকের প্রোটন সংখ্যা হ'ল কোনো পদার্থের পরমাণবিক সংখ্যা। ফলে কেন্দ্রকে নিউট্রনের সংখ্যার তারতম্যের ফলে একই পরমাণবিক সংখ্যার কিন্তু বিভিন্ন পরমাণবিক ভরের একাধিক মৌলিক পদার্থ থাকা সম্ভব। এমন সব মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এদের বলা হয় সমযর পদার্থ। তার কারণ পরমাণবিক সংখ্যা এক হবার ফলে মেণ্ডলিয়েফের তালিকায় একই ঘরে তা'দের স্থান হ'বে। তেমনি বিভিন্ন পরমাণবিক সংখ্যার একই পরমাণবিক ভর সম্পন্ন একাধিক মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভব। এরা বিভিন্ন ঘরের। কিন্তু পরমাণবিক ভর এক হওয়ার ফলে এদের বলা হয় সমভর।

বাইরের ইলেকট্রন মণ্ডলের ইলেকট্রন লেন-দেনের ফলে রাসায়নিক সংযোগ ঘটে তা' জানা গিয়েছে। কিন্তু তেজস্ক্রিয়ার বেলায় বাইরের কোনো উত্তেজনার ব্যতিরেকেই তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রক আপনা থেকেই ভেঙে চলেছে এবং প্রোটনগুলি অবিরাম ছিটকে পড়ছে বাইরে। প্রোটনগুলি বাইরে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ইলেকট্রন-মণ্ডলের সমসংখ্যক ইলেকট্রন বন্ধন মুক্ত হয়ে বাইরে ছিটকে পড়ছে। এরাই আলফা রশ্মি ও বিটা রশ্মি। যেহেতু পরমাণবিক সংখ্যার উপরে নির্ভর করে মৌলিক পদার্থের মৌলিকত্ব, তাই কেন্দ্রকের প্রোটন ও ইলেকট্রন মণ্ডলের ইলেকট্রন সংখ্যা কমে যাওয়ায় পদার্থটির পরমাণবিক সংখ্যা বদলে গিয়ে ঘটেছে তার রূপান্তর এবং একটি মৌলিক পদার্থ রূপান্তরিত হয়ে পড়ছে অন্য একটি মৌলিক পদার্থে। ঠিক কী কারণে পদার্থের এই স্বতঃ রূপান্তর ঘটেছে তা'র সঠিক জবাব বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত দিতে না পারলেও পদার্থের জগতে স্বতঃরূপান্তরের ঘটনা আবিষ্কার করবার সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের এক পুরানো প্রশ্ন নতুন করে নাড়া দিল বিজ্ঞানীর মনকে: পদার্থের কৃত্রিম রূপান্তর কি সম্ভব? কী সে পরশপাথর যা'র ছোঁয়ায় লোহাকে রূপান্তরিত করা যাবে সোনায়? আর এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে আমরা সামনে এসে দাঁড়িয়েছি পরমাণু-বোমার—আতঙ্ক আর বিস্ময়ে দিশাহারা।

পরমাণুর গঠনতত্ত্ব জানবার ফলে আমরা জেনেছি যে কোনো পদার্থের পরমাণুর বিদ্যুৎকণার সংখ্যা কোনোভাবে বদলে দিতে পারলেই তা' রূপান্তরিত হয়ে যাবে অন্য

পদার্থের পরমাণুতে। রাটিনামের কেন্দ্রে যদি একটি প্রোটনকণা ছুঁড়ে দেওয়া যায় কিংবা পারদের কেন্দ্র থেকে যদি একটি প্রোটনকণা কেড়ে নেওয়া যায় তবে তারা রূপান্তরিত হবে সোনায়।

এই সূত্রানুযায়ী কেন্দ্রকে নিঃসৃষ্ট প্রোটন কিংবা নিউট্রন ছুঁড়ে মেরে কেন্দ্রকের বিদ্যুৎকণার সংখ্যা বদলে দেবার ব্যবস্থার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে পরমাণু বোমা। অবশ্য নিউট্রনকেই এ কাজে ব্যবহার করা হয়। সেই জটিল প্রক্রিয়ার আলোচনা বহু হয়েছে, বর্তমান প্রবন্ধে সে প্রসঙ্গের পুনরালোচনা শুধু বাহুল্য।

বোতলের ছিপি খুলে তো দৈত্যকে মুক্তি দিয়েছি আমরা, সৃষ্টির আদিকাল থেকে পরমাণুর বোতলে আটক ছিল যে প্রচণ্ড শক্তির দৈত্য। কিন্তু তাকে ফিরে বোতলে পুরবার কায়দাটা আমাদের জানা নেই। তাই তার করাল অবয়বের সম্মুখে বিহ্বল হতাশায় দাঁড়িয়ে আমরা ভাবছি কী দেবে ও আমাদের—সফলতায় ভরা নতুন যাদুময় এক পূর্ণ জীবনের স্বাদ, না মৃত্যুর বিভীষিকা!

তা' যাই হোক, পদসঞ্চার সুরু হয়েছে এক নতুন যুগের। সংশয়সংকুল আমাদের হৃদয়ে বাজছে তার পদধ্বনি। কে এই চরম্ব বীরভদ্র!

এই অশান্ত নবজাতকের জনক পিয়ারে ও জননী মেরি কী কখনো কল্পনাও করেছিলেন এর এমন দুঃসম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ!

কে জানে!

মাদাম কুরীর জীবন কথা

মাদাম কুরীর জীবনে এমন সব অ
পৌরাণিক কাহিনী পড়ছি।

একজন নারী তিনি; এক নির্যাতিত দেশের মেয়ে; দারিদ্র্যের মধ্যে জন্ম; দেখতে সুন্দর। ভিতরের এক প্রেরণার আকর্ষণে তিনি তাঁর জন্মভূমি পোলাণ্ড পরিত্যাগ করে প্যারি-তে আসেন; দারিদ্র্যের সঙ্গে একক সংগ্রামে বৎসরের পর বৎসর কাটে। একজনের সঙ্গে তাঁর এখানে সাক্ষাৎ ও বন্ধুতা হয়, তাঁরও প্রকৃতি মেরীর অনুরূপ। মেরী তাঁকে বিবাহ করেন; তাঁদের বিবাহিত জীবনের আনন্দের তুলনা হয় না। তিনি ও কুরী অদ্ভুত নিষ্ঠার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দীর্ঘদিন ব্যাপৃত থেকে এক নূতন বিচিত্র পদার্থের সন্ধান পেলেন,—তাই হ'ল রেডিয়াম। এই আবিষ্কারে বিজ্ঞানের নতুন দিক খুলে গেল; নতুন দৃষ্টি মানুষ পেল; আর সঙ্গে সঙ্গে পেল এক কঠিন রোগ থেকে মানুষকে বাঁচাবার উপায়।

উভয়ের যুক্ত জীবন যখন প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির উচ্চ শিখরে—দেশে দেশে তাঁদের কাজকে এগিয়ে দেবার জন্য সাহায্য যখন অভাবনীয় পরিমাণে আসতে আরম্ভ করেছে—তখন হঠাৎ তীব্রতম দুঃখের ঘন কালো ছায়া মেরীর জীবনকে চিরদিনের জন্য আবৃত করল। মেরীর প্রিয়তম পতি ও জীবন-সঙ্গী এক দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। মেরীর জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হ'ল। দুঃখই এখন থেকে তাঁর সাথী হল, আর সঙ্গে রইল তার শ্রান্ত শরীরের ক্রমবর্দ্ধমান অসুস্থতা। কিন্তু তিনি পতির সঙ্গে যুক্ত থেকে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন, নিজেকে তা থেকে সরিয়ে নিলেন না—পতির পরিত্যক্ত কাজ আরও নিবিড় করে একক ও অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে করে যেতে লাগলেন। পতির মৃত্যুর পর তাঁর জীবনে চাইবার বা পাবার কিছু রইল না; রহিল খালি জগতের কল্যাণে নিজের জীবনকে নিঃশেষে দেবার।

—ইভা কুরী রচিত মাদাম কুরীর জীবনী থেকে।

আস্বাদ

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

একটা কথার অপেক্ষা শুধু.....

জানালার চোখ রেখে অনন্ত চুপ করে বসে আছে। বাইরের গাছের পাতাগুলো স্থির, নিশ্চীব। মরুভূমির মতো আকাশ বৈশাখের। রাস্তার ধারে ছোটলা বাড়ীর গায়ে লেগেছে রাহীনতার ধূসর অবসাদ। বৃষ্টি হয় না কতদিন অনন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

তার দুচোখ আবার : ফিরে আসে ঘরের ভিতরে ডাক্তারের দেওয়ালগুলো যতো বেশি সাদা, পরিচ্ছন্ন। হাসপাতাল আর বাড়ীতে তফাৎ কি? ওটা কিসের গন্ধ! ক্লোরিন। গাঢ় নিশ্বাস নিলে অনন্ত গন্ধটা দুবার অনুভব করেছে। ডিস্‌ইন্‌ফ্যাকটেন্ট। মনে মনে অনন্ত হাসে। ডাক্তারেরা চব্বিশ ঘন্টা কী ভয়ানক সতর্ক থাকে। ওটা কি? অদ্ভুত টেবিলটার দিকে তাকিয়ে থেকে অনন্ত ভেবে কিছু কিনারা করতে পারলে না, কী কাজে আসে। পাশের কাচের আলমীরায় সব যন্ত্রপাতি; ছুরি-কাঁচি। এমন চকচক করে। ভয় হয় তাকাতে। বাবালো দুঃস্বপ্নের মতো ওরা অনন্তর মুখের দিকে হা করে চেয়ে আছে যেন। কেউ এলে এখনি ওরা চোখ মেলে তাকায়, কান খাড়া ক'রে থাকে। আশ্চর্য ক্যান্সার, যা কার্বঙ্কল, উটবার কি আলসার? এই নিয়ে ওদের কারবার—ভেবে করে অনন্ত চক্ষু ফিরিয়ে নেয়।

মেরুদাঁড়া টান করে এবার সে সোজা হয়ে বসলো। ঘড়ীর কাঁটায় তিনটা পঁয়তাল্লিশ। এতক্ষণ অস্থির হয়ে উঠবার কথাই যে। যা বলবার বলে ফেল ডাক্তার, যা তোমার খুশী। পেপার ওয়েটটার উপর অনন্তর দীর্ঘ অঙ্গুলিগুলো দু'বার পাচতারী করলে, একবার হাত বাড়িয়ে অকারণ করলে কলিং-বেলটা, শক্ত পালিশ ডাক্তারের কঠিন প্রশস্ত লালটের মতো অনেকটা। অনন্ত চমকে উঠল। ডাক্তারের কপালে দুই ভুরুর মাঝামাঝি চুলের মত সূক্ষ্ম রেখা পড়েছে না। অনন্তর বুক দুরদুর করে। রেখা মিলিয়ে যায়, নিশ্চিন্ত হ'য়ে অনন্ত রুমাল দিয়ে মুখ মোছে। না, ভাবছিলো সে মানুষের মাথা। কতোখানি উত্তপ্ত উদ্বারিত হ'লে একটা লোকের কপাল এত চওড়া, কল্পি এমন মোটা, মজবুত হয়। জন্ম থেকেই মানুষ ওটা নিয়ে আসে পৃথিবীতে, মাথা কেউ সরুতে পারে না। অনন্ত বিশ্বাস করে না। ডাক্তারের হাতের ভেলো দিয়ে রক্ত ফেটে পড়ে যেন। অনন্তর ঈর্ষা হয়?

'আপনাকে আর বসে থাকতে হবে না'।

পিয়ারীলাল হঠাৎ গম্ভীর গলায় কথা বললেন।

চোক গিললে।

'স্যুটেড?'

'কাল একজামিন করা হয়েছে।'

'হয়ে গেছে?' দুই দুর্বল হাতের আঙুলগুলি ভয় রেখে অনন্ত করুণ ক'রে তাকাল।

'ডাক্তার সরকার—'

'ইয়েস হি ইজ রাইট' মুখ আধা নেড়ে তার পিয়ারী লাল উঠে দাড়ায়; উনি ঠিক বলেছেন।'

গলাটা শুকিয়ে সাদা হ'য়ে যায় কেন?

ডাক্তার বিপরীত দিকের জানালায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

তবে আর এখানে সে বসে কেন? উঠে ধীরে ধীরে দরজা পার হ'য়ে অনন্ত বারান্দায় আসে। রাস্তায় পরম পিচের দিকে চেয়ে কি একবার ভাবলো, এবং পরক্ষণেই আবার ফিরে এলো ভিতরে।

'তাহলে এখন আমাকে কি করতে হবে, ডার!'

আজই কোলকাতা ছেড়ে যাও, তাল খেতে হবে।' চাউনিতের দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে ডাক্তার সাহেব পাইচারী করেন। গম্ভীর।

'মা হ'লে ?' অনন্ত ফ্যাল ফ্যালালো।

'ঘরে যাবে, কোন ভ' নাই'।

ডাক্তারের জানালার আকাশটা ছিল অনন্ত আগুনের কুণ্ড, রাস্তার মেঘে অনন্তর মনে হয় এমন চমৎকার ঠাণ্ডা নীল আকাশ জীবনে এই সে প্রথম দেখছে। এই প্রথম তার চোখে পড়ল পার্কের ঘাসে দেখবার পাতার অফুরন্ত স্নিগ্ধ সুষমা। সূর্য কখন চলে পড়েছে; ঘাসের বুকে এখন লম্বা, দীর্ঘ লম্ব ছায়া। বেণী দুলিয়ে ছোট্ট মেয়ে দোল খায়, জোৎস্নার গুঁড়োর মতো ওর ভাঙাচুরা এলোমেলো হাসি। অনন্ত দাঁড়িয়ে দেখে। ঘণ্টা দিয়ে ট্রাম চলেছে, অনন্ত কান পেতে শোনে। দোকানের মাথায় পিতলের ফলক-আঁটা প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন, অনন্তর ভালো লাগলো, ভালোবাসে সে সব কিছু। অনন্তর ভালো লাগছিলো এই ভেবে আজ থেকে সে নিশ্চিন্ত। এই নিশ্চিন্ততার জন্যই না হেঁটে হেঁটে তার পায়ের তলা ক্ষয়ে গেছে, বুক জ্বলে গেল। কোলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যাও। কোলকাতা ছেড়ে দিলেই এ অসুখ সারে নাকি ? একথা হলফ করে তুমিও বলতে পার না, শিয়ালীদাস। মাঝখান থেকে অনন্ত দুদিনের খাতিরে চাকরিটা খোয়াক। লাভ নেই, লাভ নেই। জীবনের চূড়ান্ত মামাংসা তোমরা করে দিলে ডাক্তার। কয় যখন একবার বুকে বাসা বাঁধে ওকে তাড়ান যায় না। মিছি মিছি ওর সঙ্গে যুদ্ধ করে অনন্ত নিজেকে আর ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। কেবল টাকার শ্রাদ্ধ। ডাক্তার আর ওষুধের খরচ জুগিয়ে এরি মধ্যে তার সোনার আংটী বাঁধা পড়েছে। কি দরকার। বরঞ্চ এতদিন যাও ছিল সংশয়, সন্দেহ আজ তা একেবারে দূর হ'ল। মৃত্যু স্থির লক্ষ্যের ভিতর এসে গেছে, আর ভাবনা নেই। অনন্ত সুখী, অনন্ত বেঁচে গেলো। সবাই বাঁচে। জীবনের এই অনিশ্চিত শেষের জন্যেই তো যত দুর্ভাবনা, যত জাগা আতঙ্ক। কখন আসে, কখন যা জানি পরভাস অজন্তে ওরা ওষুধ থেকে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে এসে তোমার টুঁটি টিপে ধরে। তোমরা কাদ পেতে থাক ; জ্যোতিষী ডেকে হাত দেখাও ; বীমা কোম্পানীর এজেন্ট সরকার এসে ঘুরে যায়, তুমি বলতেই পার না কিসে বছর কি পড়িল বছর। ইমারৎ গড়া শেষ হবার আগে একজন বিদায় নেয়, আবার ইমারৎ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, স্বপ্নে স্বপ্ন বুকে নিয়ে আরেকজন কাঁদে, মৃত্যু নেই। পরিহাস ছাড়া আর কি ! বিশ্বাসঘাতক যে, কি তুমি করতে পার তার সঙ্গে ? কেউ পারে না

অনন্ত প্রস্তুত। ইস্পাতের দীপ্তিওয়ালা ভারি চাকা গড়িয়ে আসছে, আসুক। যুদ্ধ শেষে দিয়েছে সে। অনিশ্চিত অন্ধকার সামনে নিয়ে দিনের পর দিন দুর্ভাবনার ক্লান্তি ভোগ করার চেয়ে নিশ্চিত এই পরিণতির ভিতর শেষ হ'য়ে যাওয়া অনেক ভালো ; তা যত সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ হোক।

অনন্তর বুক হাল্কা হ'য়ে যায়। এতদিন যদি ছিল জীবন কাটার কাঁটায় কাঁপনা, কেবল নিয়ম আর নিয়ম, আজ তার প্রয়োজন নেই। অনন্ত হাত ও দাঁতের অনন্ত চোখ বুজে ফেলতে পারে। ছ'মাস যার জীবনের মেয়াদ তার কেউ জবাবদিহি চাইতে আসবে না।

সেইটেই তো পরম লাভ।

অনন্ত সুখী, বেঁচে গেলো সে, অনন্ত মুক্ত। রাস্তার কুকুর ছানাটা অত নোংরা না হলে ওটাকে কোলে তুলে নিয়ে সে আদর করতো। অনন্তর চোখে জল আসে।

পকেটে টুন করে শব্দ হয়, সিন্দুর মাখা ক'টা টাকা। লক্ষ্মীর কৌটা থেকে বিনু নিজের হাতে তুলে দিয়েছে, ওষুধ কিনে এনো।

পাগল, অনন্ত আর অপব্যয় করবে না। তার চেয়ে ওটা দিয়ে তোমার একখানা সাড়ী ঘরে, বিনু।

কথার শেষে অনন্ত সেদিন তাই এমন ভাবে হাসল।

বিনু উত্তেজনায় কাঁপছিলো।

'সত্যি বলেছে ওকথা ?' বিশ্বাস করতে পারে না সে।—'এই আমার হাতের শাঁখা ছুঁয়ে বল !

কক্ষশ্বাসে ছুটে এসে বিনু হাত বাড়িয়ে দিলে। 'তুমি পাগল হ'য়ে গেলে না কি ?'

'ঠ্যাঃ গো' পাগল হয়েই আছি যে।' বিনুর মাথার চুল এলো-মেলো, আঁচলটা মাটিতে লুটোয়।

'তখন থেকে এমনি বসে আছ ?

'বসে না থেকে কী আমি করি বল ?—কেবল অনন্ত কখন ফিরে আসবে সেই প্রতীক্ষা। ঘরে নেমেছে অন্ধকার বিনুর খেয়াল আছে ?

'আর ভয় নেই।'

'খুব বড় ডাক্তার ?'

'তার শিয়ালীলালের নাম শোন নি ?'

অনন্ত গায়ের জামা খুলে ফেললে, কোলকাতার সেরা ডাক্তার, কথার দাম আছে।'

'বললে বুঝি ও কিছু না ?'

'কিছু না, কিছু না! নিছক সন্দেহ নিয়ে মরছি।'

অনন্ত হাত বাড়িয়ে আলো জেলে দিলে।

'কেবল সন্দেহ, না ?' বিনুর দু'চোখ জ্যোৎস্নার মত অপরূপ হয়ে উঠে : তাহ'লে ভোরের স্বপ্ন সফল হয়।

'তাই নাকি ?' অনন্তর গলায় স্বর স্বাভাবিক।

'বললাম তো'। বহুদিন পর বিনু দাঁড়াবার মত শক্ত মাটি পায়, নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। 'তখন থেকে বলছি ভাল একজন কাউকে দেখাও, ওগুলো কি ডাক্তার, জানে কিছু ?" কেবল কাঁকি দিয়ে টাকা রোজগারের ফিকির, ধোঁকা লাগিয়ে জ্যান্ত মানুষ মেরে ফেলে।' অনন্ত বললে হেসে। 'না তো কি।' কতোদিন পর বিনু আজ চোখ তুলে তাকাতে পারল চারিদিকে। দেওয়ালের কোণায় মাকড়সা জাল বুনেছে, রোয়াকে জমেছে ধুলো। ক'টা মাস ওর চোখে ঘুম নেই। সংসার গেছে তলিয়ে।

শেষ পর্যন্ত অনন্ত গায়ের পেন্টীটাও খুলে ফেললে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে জানালার ধারে গিয়ে বসলো। যেন আজ আর ঠাণ্ডা লাগাবার ভয় নেই। কাল বিকেলেও অনন্ত গলায় মাফলার জড়িয়ে রেখেছিলো। 'আজ রাতে আমি ভাত খাব গলা বড় করে বললে সে। 'না তো রুটি খাবে নাকি ?' ওদিক থেকে বিনুর লঘু হাসি ভেসে আসে, ভেসে আসে ওর গলায় গুনগুনানি জিনিষপত্তর গুছোনোর শব্দ, টুকটাক। আর ভয় কি। স্বামী দশজনের মত সুস্থ মানুষ। জানালার বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অনন্ত শুদ্ধ হ'য়ে যায়। এই ভাল। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে যে কয়দিন আছে সে কদিন ওর চোখে হাসি ফুটে থাক। তারপর,—তারপর আছেই তো সারা জীবন কান্না। মিষ্টুর মিনতি ওর সিঁথির দিকে তর্জনী বাড়িয়ে দিয়েছে।

অনন্তর একটা কথায় দুর্ভাবনার কালো মেঘ কেটে গেলো, এমনি।

আশ্চর্য, এক সন্ধ্যার ভিতর ঘরের চেহারাই বদলে যায়। এমন সুন্দর করে বিনু কবে টেবিল সাজিয়েছে ? দেওয়ালের আয়নাগুলো ঝকঝকে। মেঝের এক ফোটা ধুলো নেই, বিছানা জুড়ে ধবধবে সাদা চাদর ; বালিশে উঠেছে নতুন অড়।

'জানালায় ছটো পর্দা না হলে মানায় না যাই বল।'

'মনে করে দিও, কাল বাজারে যাবে তো।'

'আর সস্তায় যদি ছোট একটা টিপয় পাও ?'

'দেখব—'

'বললে তো তোমার আবার মনে থাকলে হয়' গ্রীবা বাঁকিয়ে বিনু অদ্ভুত করে তাকায়। 'মনে থাকবে।' অনন্ত হাসে। তোমায় এতকাল মনে ছিল নাকি ? ভাবলো সে। 'কমলদির স্বামী সংসারের কত কাজ করে দেয় ?"

'ঘটনা বাটে, কাঁথা সেলাই করে দেয় ? 'নাও রাখ, এ ছাড়া সংসারে আর কাজ নেই বুঝি ?' ভুরু কুঁচকে বিনু নিজের ময়লা কাপড় চোপড় টেনে মাথায়। 'মেঘর-টাকে কাল পাঠিয়ে দিও। বর্ষায় শেওলা ধরবে কেন ?' বিনু পাকা গৃহিণী। 'আচ্ছা বাবা সুস্থির।' অনন্ত মনে মনে হাসলো। 'আর বাড়ীওয়ালার দেখা পাওনা নাকি, ছাদের ওদিকটায় জল পড়ে, খেয়াল রাখ ?'

এরি মধ্যে সংসারের খুঁটিনাটি বিনুর চোখে ধরা পড়েছে, অস্থির হয়ে উঠলো।

'হবে, সব ঠিক হ'য়ে যাবে ভেবোনা' আস্তে আস্তে

অনন্ত বললে, 'কত বড় দুশ্চিন্তা এ'দিন মাথার উপর ছিল।'

বিন্নু এবার চুপ করে থাকে। মেঝের বসে মহনা জামা কাপড়গুলোর একটা পুঁটুলী করে রাখলো। জেরালে ওর ছায়া পড়েছে। অনন্ত একদৃষ্টে কতোক্ষণ চেয়ে থাকে। জীবনের ছন্দ খুঁজে পেয়েছে নারী। বিন্নু আবার নিজের মধ্যে ফিরে এলো। ওর স্বামী, ওর সংসার, স্বপ্ন আর সোহাগ। অনন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তাদের ঘর তবু ভেঙে পড়ে কেন?

'তোমার পরনের শার্টটা খোপায় দিয়ে দেব।'

'বেশতো।'

'এবার মাইনে পেয়ে ছুটো পাতলা জামা করে নাও। কি যে স্বভাব!' বিন্নুর গলায় শাসনের সুর: 'বোম-ভোলা আর কাকে বলে। কোনটা শীতে, কোনটা গরমে গায়ে দিতে হয় চিন্তা নেই। কথার শেষে কোমল হাসির ঢেউ সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। বিন্নু আজ নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না।

অনন্ত নিরুত্তর।

তারপর এক ফাঁকে বিন্নু গা ধুয়ে আসে, আয়নায় দাঁড়িয়ে চুল আচড়ায়।

কপালে আজ সে টিপ পড়েছে, পরনে ফিকে সবুজ শাড়ী। পায়ে আলতা দেওয়া বাকী শুধু। 'তোমায় চেনা যায় না বিন্নু।'

'নতুন মানুষ হয়ে গেছি?'

'তাই!' অনন্ত এসে পিছনে দাঁড়ায়।

'আজ আমাদের নতুন দিন।' বিন্নু বললে গুন্‌গুন্ করে, যেন অনেকটা আপন মনেই।

ওর মনে নতুন রঙ লেগেছে। অনন্ত বোঝে। তাই খেতে বসে আবার সোহাগী শাসন।

'না খেয়ে খেয়েই তো শরীর এমন খারাপ হয়েছে।'

'কেবল মনের খুঁত খুঁত।' অনন্ত বললে।

'আমি বুঝি না? পেটভরে খাও দিকিনি।'

অসুস্থ শরীরে অনন্ত দু'মুঠ ভাত বেশিই খায়। 'কচি আমের টক করলে পারতে।'

'কেন, তোমার না রোজ রাতে জ্বর হয় শুনি?' বিন্নু হাসল, এক বাটি লাউ খেয়ে শুয়ে থাকলে। কী যে সন্দেহ!' বিচ্ছুরিত হাসি ওর ঠোঁটে নয় শুধু, সর্বাঙ্গে মুখর হোয়ে উঠে। রান্নাঘরের জানালাটা আজ বিন্নু খুলে দিয়েছে, হাওয়া লেগে ওর শাড়ীর আঁচল কাঁপে। অনন্ত দেখে বিহ্বল হয়ে।

অনিয়ম করার ভিতর একটা নেশা আছেই তো। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে এ যেন মৃত্যুকেই তার ভেংচি কাটা। অনন্ত আজ যদি সারারাত জেগে কাটায়? শ্রীষ্মের ভারা ছিটানো অনির্বচনীয় নীল অন্ধকার আকাশ, এমন রাতে চোখে ঘুম আসে না। 'চলো বারান্দায় গিয়ে বসি।'

'চলো' চমৎকার ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

শরীরের সমস্ত ক্লান্তি অনন্ত ভোর করে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। অনেকদিন পর পান খেয়ে বিন্নুর ঠোঁট আজ টুকটুকে লাল। অনন্ত চোখ ফিরিয়ে নিলে। ইচ্ছে এই মুহূর্তে সে মরে যেতে পারতো।

আলো নিভিয়ে দিয়ে ওরা বাইরে এসে দাঁড়ালো। কমলদি আর তার স্বামী রোজ রাতে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যায়।'

'তুমি যাবে?'

'চল না' বিন্নু উৎসুক।

'না থাক, আরেকদিন' অনন্ত বললে কি ভেবে। বাড়ির পাশে পড়ো জমিটায় জমাট অন্ধকার গাছের পাতার অস্পষ্ট, অস্পষ্ট সরসর শব্দ উঠে আসে শুধু। রাত্রি সেখানে কানে কানে কথা কয়।

বারান্দার রেলিং ধরে দুজনে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো, এমনি: কোন কথার বলার প্রয়োজন ছিল না যেন, অথবা কি জানি বলতে এসে অন্ধকার সব হারিয়ে গেছে। না, অনন্ত ভাবছিল মৃত্যুর কথা। আর, বিন্নুর মনে এসেছিল জীবনের জোয়ার।

তোমায় এনে ভুল করেছি,—অনন্তর মুখ করুণ, নিঃসঙ্গ হাহাকার। তোমায় পাশে দাঁড়িয়ে আমি কত সুখী, রাত্রির আকাশের দিকে চেয়ে বিন্নু গান গায় বুঝি। দূরে কোন বাড়ীতে হঠাৎ সিতারো বেজে ওঠে, আকাশের

কোথা একটা তারা খসে পড়লো, বিনুর চুড়ির টুন করে শব্দ হয়, দুজনে আমার তারা ফিরে পেল।'

'বল, আর তুমি মন খারাপ করবে না?'

'না, সুস্থ মানুষ কখনো মন খারাপ করে কিনু?' অনন্তর মুখে কথাটা একটুও আটকায় না।

'তোমার মুখ শুকনো দেখলে আমার এমন ভয় করতো!'

'আর করবে না।' অনন্তর গলা ভারি। কারো জীবনের উপর এই নির্মল নির্ভরতা কেন! বিনুর হাতের উপর হাত রাখল সে।

'তোমার ঘুম পেয়েছে?'

'না' অনন্ত হাই তুলল। আজের ক্লান্তি ঢাকতে গিয়ে শেষে একভাবে হাসলো: কোনদিকে মাধবী ফুটেছে না, ভারি সুন্দর গন্ধ?

'ভারি সুন্দর, না?' বিনু চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। 'দাঁড়াও আমি নিয়ে আসছি।'

'কোথায় যাবে?' অনন্ত অবাক।

'নীচে পাঁচিলের ধারে।'

এই অন্ধকারে! অনন্ত শিউরে উঠলো। 'ভাঙা ইটের স্তূপ, কাঁটা জঙ্গল।

'কিসের ভয় তুমি?' বারান্দার প্রান্ত থেকে বিনু উত্তর দিলে। ফুল সে আনবেই।

'এই রাতে না গেলে নয় বিনু?' অনন্ত চীৎকার করে ডাকে, যদি সাপে কামড়ায়?'

'ঈশ্বর অত নিষ্ঠুর নয়, সাপ আমাকে কিছু করবে না।' অন্ধকারের ওপার থেকে বিনুর হাসি শোনা যায়।

ওর আজ কি হয়েছে যেন। এত অকুতোভয় প্রাণ এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলো।

অনন্তর বুকের ব্যাথাটা এবার ঘাড়ে টের পায়। স্নায়ুগুলো ঝিম্ ঝিম্ করে। গাছের পাতার সন্সন্ শব্দ, অনন্ত কান খাড়া করে রাখে। ঈশ্বর অত নিষ্ঠুর নয়? পিয়ানোর শব্দটা আমার থেমে গেছে কখন?

গাছ উজার করে' বিনু ফুল নিয়ে এলো।

'অত ফুল দিয়ে কি হবে?'

'কি আবার হবে, আলোটা জ্বালো।'

টেবিলের ওপর বিনু স্তূপ করে' রাখলো মাধবীগুচ্ছ।

'আমার কি মনে হয় জান?'

'তুমি, কি?' বিনু ঠোঁট টিপে হাসে।

'আজ বাসর রাত।' অতি দুঃখের মধ্যেই অনন্ত কথাটা বললে।

'কার?'

'তোমার, আমার,' শব্দ করে হাসতে গিয়ে অনন্তর দুর্বল ফুস্ফুস্ ছিঁড়ে যায়।

'ঠাট্টা রাখো'—বিনু গম্ভীর। নোখের মাথায় একটা ফুলের পাপড়ি কুটী কুটী করে' ছিঁড়ে ফেললে।

পরে অনন্তর মুখের দিকে চেয়ে: 'তাই কিনা কমলদি বলে, তুই বুড়ি হ'য়ে গেছিস, বিনু।'

'বলে নাকি?'

'বলবে না? আমি চুল বাঁধিনা তেল দিইনে।'

বিনুর দু'চোখে অতল অভিমান।

অনন্ত রইলো চুপ করে। দীর্ঘদিনের অযত্ন, অবহেলা, পুঞ্জিত ঔদাস্য। বিনু তাই একদিনে মুছে দিতে চেয়েছে। বেচারা জানেনা—

'রাগ করলে বিনু?'

'পাগল', বিনু হাসল!—'বাসর-রাত ছাড়া জীবনে আর কিছু আসতে নেই বুঝি?'

আসে, আসে না কি? অনন্ত মনে মনে কথাগুলি আওড়ায়। এসেছে তোমার কমলাদির জীবনে, হয়তো আসবে আরো অনেকের জীবনেই। তোমার জন্যে আছে শুধু কান্না, রাশি রাশি মেঘ। মুখ ফিরিয়ে অনন্ত সাদা দেওয়ালের ওপর মুখ চোখ রাখে। বুকে অনন্ত যন্ত্রণা।

'একটা কথা বলব তোমাকে।'

অনন্ত ফিরে তাকাল।—'কি?'

'এ্যাদ্দিন সাহস পাইনি বলব।'

'আজ বল।'

স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে বিনু, তাকানো যায় না।

চুল থেকে নোখ পর্যন্ত স্বপ্ন হ'য়ে গেছে।

কী বলতে চায় ওর চোখ ?

'চুপ করে রইলে কেন ?'

'বলছি' বিন্নুর কান লাল হয়ে ওঠে।

'আলো নিভিয়ে দিই ?'

'দাও' অনন্ত ক্লান্ত।—'ক'টা বাজলো ?'

'জানিনা,' রাত কটা বাজে সে খেয়াল ওর আছে নাকি। আলো নিভিয়ে বিন্নু ঘর অন্ধকার করে দিলে। তারপর স্বপ্নের ছায়ার মতো অনন্তর পাশে ছুটে এলো।

একটুকরো কথা। অনন্তর কানের কাছে মুখ নিয়েই বলা হ'য়ে যায়।

কথার শেষে একরাশ টাটকা যুঁইয়ের মতো বিন্নু অন্ধকারে হাসি ছিটিয়ে দিলে।

হাটুর ভিতর মাথা গুঁজে অনন্ত চুপ।

পাখির ডেকে যায়। জানালায় দাঁড়িয়ে বিন্নু গুন্‌গুন্ গান গাইছে। চোখে ঘুম নেই।

অনন্তকে বাঁচতে হবে যে করে' হোক্,—মরবার অধিকার কই ?

আবার শাশ্বত দিবালোক। অনন্ত রাস্তায়।

ভাবছিলো, কোলকাতায় থেকে চিকিৎসা করানো যায় না ? স্যার গিরীন্দলাল ছাড়া আরো তো ডাক্তার আছে পরামর্শ নেবার ?

ট্রামে উঠবার সময় অনন্ত পিছনে ফিরে তাকায়।

তাকাবার কি আছে ? সেই পুরনো বাড়ীর স্যাঁতসেঁতে গন্ধ, নোনাধরা দেয়াল। তারি মাঝখানে বসে বিন্নু আহ্লাদে থৈ থৈ করছে। মা হবার দুর্বহ আনন্দে নারী এমন নিশ্চাহারা হ'য়ে যায় !

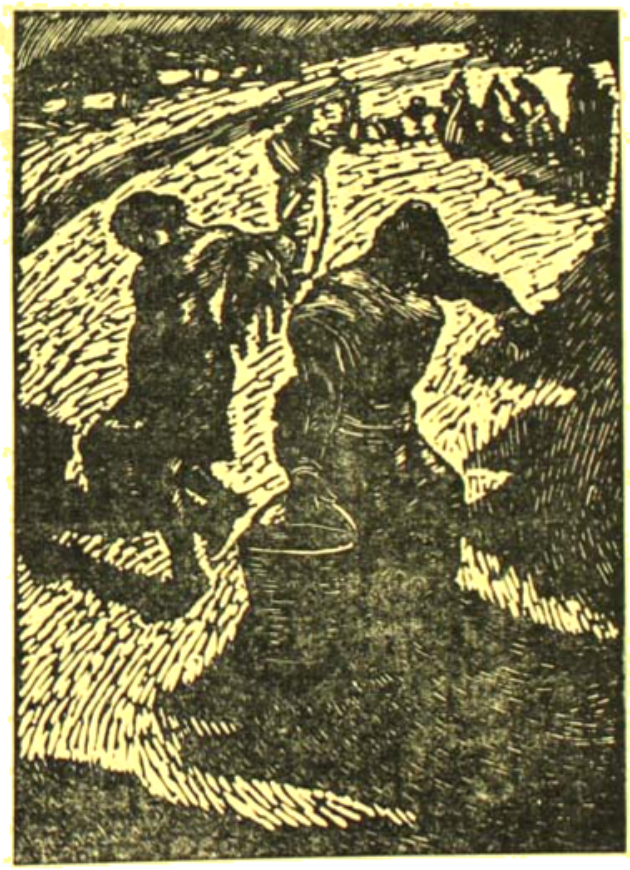

কাঠ খোদাই —সনৎ কর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

• গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

২৯শে জুলাই, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতিথি। পঁয়ষট্টি বছর আগে (১৮৯১) ঐ দিনে বাংলার এই পুরুষসিংহ ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার পরলোকগমনের অব্যবহিত পরে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন, এখানে আমরা প্রবন্ধটি হিসাবে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বিদ্যাসাগরের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষা সম্পর্কে বাঙালির কর্তব্য আজো অসমাপ্ত রহিয়াছে—স্যর গুরুদাসের এই মন্তব্যের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত। শুধু বিদ্যাসাগর কেন, রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এই উক্তি প্রযোজ্য। বিজ্ঞানবুদ্ধি ও মানবিকতার ভিত্তিতে জাগতিক জীবনকে শ্রীমণ্ডিত করিবার চেষ্টা করেন রামমোহন, আধুনিক জ্ঞানের আলোকে নবযুগের উদ্বোধন করেন বিদ্যাসাগর—এই দুই মহাপুরুষের দীর্ঘবন্ধ সাধনার সুন্দরতম সমন্বয় ও চরমতম বিকাশ রবীন্দ্রনাথ। বাংলার তো বটেই, আধুনিক ভারতেরও প্রকৃত স্রষ্টা এই তিনজনই। দুঃখের বিষয়, ভারতের এই তিনজন শ্রেষ্ঠ সন্তানের যোগ্য স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার আজো উদাসীন; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তো এই বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ ইঁহারাই তো বাঙালির চিরন্তন গর্ব ও গৌরবের পাত্র।

—ইতি অনুবাদক।]

আজ দুই বৎসর হইল বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে দেশব্যাপী গভীর শোক প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু এই দুই বৎসরে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। বিদ্যাসাগরের প্রতি আমাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার অভাব ইহার কারণ নহে; ইহার কারণ আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দারিদ্র্য—সমাজে ইহাদের সংখ্যাই বেশী। আরো একটি কারণ পাশ্চাত্ত্য জাতির মতো ঘটা করিয়া শোকপ্রকাশ করিবার রীতি আমাদের মধ্যে নাই; আমরা প্রস্তরমূর্তি বা পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতির খুব মূল্য দিই না—মূল্য দিই না এই কারণে যে এই দুইটি জিনিসই অত্যন্ত দামী এবং ঐগুলি বহু টাকা খরচ করিয়া বিদেশ হইতে করাইয়া আনিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষার প্রতি আমরা উদাসীন থাকিব কেন?

দরিদ্র বাঙালি দরিদ্রভাবেও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে। দরিদ্র ছাত্রদের জন্য বিনা পয়সায় থাকিবার একটি বোর্ডিং হাউস কিংবা বিনা পয়সায় পড়িবার জন্য একটি ভ্রাম্যমান পুস্তকাগার করিতে পারি। অথবা বঙ্গের সেই অবিস্মরণীয় শিক্ষাগুরু এবং পরোপকারী মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষার জন্য উত্তর কি মধ্য কলিকাতায় একটি সুন্দর স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করিতে পারি। বিদ্যাসাগর স্মৃতি সমিতি এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করিতেছেন জানিয়া আশান্বিত হইলাম, কিন্তু এই সমিতির চেষ্টা কতখানি সফল হইবে তাহা বলা কঠিন। তবে ছাত্র সম্প্রদায় যে বিদ্যাসাগরকে বিস্মৃত হয় নাই, ইহাই আশার কথা, আনন্দের কথা। বিদ্যাসাগর এই কলিকাতা সহরের ছাত্রদের জন্য কি করিয়া গিয়াছেন তাহার পরিচয়

নিষ্প্রয়োজন। ছাত্রগণ যে তাঁহাকে সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিয়া থাকে, ইহা জানিয়া স্বর্গে থাকিয়াও বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই আনন্দবোধ করিবেন। আজিকার এই স্মরণ কাজ তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম।

বাঙালির জন্যই বিদ্যাসাগর তাঁর সমগ্র জীবন ও কর্ম নিবেদন করিয়াছিলেন, জীবনব্যাপী ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, সমগ্র বাঙালি আজ যাঁহার সেই কর্ম ও ত্যাগের অর্জিত সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়াছে, এই স্মরণ উৎসবের ভিতর দিয়া তাঁহাকে আমরা যোগ্য সমাদর ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিব। কিন্তু বিদ্যাসাগরের স্মৃতির প্রতি কেবল শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিলেই কর্তব্য সমাপ্ত হইবে না; তাঁহাকে শুধু বাংলার নব জাগরণের ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় পুরুষ বলিয়া ভাবিলেই চলিবে না। মহাপুরুষের মর্যাদার স্বীকৃতি যদি বিদ্যাসাগরকে দিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার সেই আজীবনের সংগ্রামের গুরুত্বকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিতে হইবে। আজ তাঁহার চিন্তাধারাকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রযুক্ত করিতে হইবে। মহাপুরুষেরা তাঁহাদের জ্ঞানের, তাঁহাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার যে উত্তরাধিকার রাখিয়া যান, সে সবের স্থান নিছক ঐতিহাসিক গুরুত্ববোধের অনেক উর্ধ্বে। বিদ্যাসাগর, যিনি সর্ব বাংলার একমাত্র বরেণ্য পুরুষ ছিলেন, তাঁহার সম্পর্কে এই কথাটি অত্যন্ত সত্য।

সংস্কার ও সংকীর্ণতামুক্ত সজীব মনুষ্যত্ব—ইহাই বিদ্যাসাগরের উত্তরাধিকার। এই মহৎ লক্ষ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবার জন্যই তাঁহার সমগ্র জীবন উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। সকল দিক দিয়াই বিদ্যাসাগর তাঁহার সমসাময়িক নেতাদের অনেককেই বহুদূর অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী কাজের লোক এবং বাস্তববাদী দেশপ্রেমিক। স্বদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁহার বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনের কথা ভাবিয়াছিলেন এবং প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তিনি তাঁহার চিন্তাকে কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। আজ আমরা তাহার সুফল ভোগ করিতেছি।

বিদ্যাসাগরের বিরাট জীবন হইতে বাঙালি অনেক কিছু শিক্ষা করিতে পারে। এইখানে আমি শুধু একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। কি অবস্থায় তিনি ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই কথাই বলিব। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল এবং তিনি বহু যত্নেই ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্কুলে ইহা শিক্ষা করেন নাই, কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় ইহা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং তখন সেখানে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না বলিলেই চলে। একদা তিনি এক ভদ্রলোকের সংস্পর্শে আসিলেন। ইংরাজীতে তিনি তখনকার খ্যাতনামা পণ্ডিত এবং পরবর্তীকালে তিনি এই শহরের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায়ই বলিতেন যে দুর্গাচরণবাবুর মুখে পাশ্চাত্য সাহিত্যের উন্নত ও গভীর চিন্তার কথা শুনিয়া ঐ ভাষার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং উহা আয়ত্ত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তখন দরিদ্র যুবকমাত্র এবং তখনকার দিনে ইংরাজী শিক্ষা করা খুব সহজ ছিল না। দুর্গাচরণবাবুকে তিনি অনুরোধ করিলেন তাঁহাকে ইংরাজী শিখাইবার জন্য। প্রতিদিন দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া বিদ্যাসাগর দুর্গাচরণবাবুর বাসায় যাইতেন এবং অশেষ যত্ন ও অধ্যবসায়ের ফলে ঐ ভাষা

এমন ভাবেই শিক্ষা করিলেন যে ঐ ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ আহরণ করিয়া তিনি নিজের মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধশালী করিলেন। বিদ্যাসাগরের সেই শিক্ষক, আমার বন্ধু, দুর্গাচরণবাবু আজিকার এই স্মৃতিসভায় সভাপতিরূপে উপস্থিত ইহা আমাদের পক্ষে কম গৌরব ও আনন্দের বিষয় নহে। আমার তরুণ ছাত্রবন্ধুদের নিকট আমি তবু এই কথাই বলিব—বিদ্যাসাগরের জীবন হইতে তোমরা আর কিছু শিক্ষা করিতে না পার, অন্ততঃ এই জ্ঞানার্জন স্পৃহাটুকু শিক্ষা করিও। আর একটি কথা বলিব। বর্তমান কালের সমগ্র অবস্থার পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে বিদ্যাসাগর মহাত্মা রামমোহন রায় ভিন্ন তুলনায় অপর কাহারও অপেক্ষা কম ছিলেন না।

—১৩০১ সনে মেট্রোপলিটান কলেজে বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। অনুবাদক—যদি বাগচি

বাংলার বাউলদের সাধন

মন্দিরে যাহাদের প্রবেশ নাই, শাস্ত্রে যাহাদের অধিকার নাই, যাগযজ্ঞে ব্রতে যাহাদের স্থান নাই তাহাদের একমাত্র বস্তু আছে আপন অন্তরাত্মা, আপন জীবন ও আপন কায়া। তাহাদের পক্ষে সহজ হইল আপন জীবনে বিশ্বজীবন, আপন আত্মায় বিশ্বাত্মা ও আপন কায়ায় বিশ্বকায়া সমরস করিয়া দেখা। প্রেম ও জ্ঞান সব-কিছু এই সমরসে সমন্বিত করিয়া ইহারা দেখিতে চায়। নানা ভেদবিভেদের কূট বিচারের মধ্যে ইহারা যাইতে নারাজ।

কাজেই ব্রত তীর্থ শাস্ত্রবিচারাদি ছাড়িয়া ইহারা চেষ্টা করে এই কায়াতে সমগ্র বিশ্বকে অনুভব করিতে ও সমগ্র বিশ্বে এই কায়াকে অনুভব করিতে। নিজেকে যদি বিশ্বপ্রমাণ বিস্তৃত না করি তবে এই জীবনে পরমাত্মা-বিশ্বাত্মাকে আবাহন করিতে পারা যায় না। কারণ তিনি অসীম অপার বিভু, ক্ষুদ্র এই কায়াতে তাঁহাকে আসিতে হইলে তাঁকে সংকীর্ণ করিয়া দুঃখ দেওয়া হয়। এই ব্রহ্মসংকোচের দুঃখ দূর করিতে নিজেকে ও সর্ব বিশ্বকে একরস করিতে হয়। ইহাই তাঁহাদের প্রধান যোগ। ব্রহ্মকে পাইতে হইলে নিজেকে ব্রহ্মধামের মত উদার কর।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন—বিশ্বভারতী পত্রিকা।

শেষ

বিমল দত্ত

বনলক্ষ্মী রেলিংএ ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বারান্দায় আলো নেই। তাই সে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

ক'দিন থেকে রোজই তো সে প্রহরের পর প্রহর দাঁড়িয়ে থাকে। আশেপাশের বাড়ির দেয়ার ফাঁকে একফালি আকাশ। তারই দিকে শূন্য চোখে চেয়ে থাকে।

সেদিন আকাশে কোনো তারা ছিল না। মেঘ উঠেছিল। রাত অনেক। নিঝুম আঁধারে ঘর দালান নিয়ে অনাদি দাঁড়িয়ে আছে। সাড়া শুধু এই কোণে রেলিংএ ভর দেওয়া বনলক্ষ্মীর চোখের জল মোছা আঁচলে।

বিশেষ করে সেদিন সন্ধ্যে থেকেই ছবিগুলো তার মনে আসছিল। সাজানো, একের পর এক। যেন রাত্তিরের দিকে গড়িয়ে পড়া সন্ধ্যেটুকুর মধ্যেই তাকে সব কথা মনে করে নিতে হবে। সব ছবি আর একবার দেখে নিতে হবে। আর যেন সে সময় পাবে না। যেন সে তার এতোদিনের সাধ সাধনার থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে একবার পিছন ফিরে দেখে নিচ্ছে। অন্ধ আকাশের দিকে চোখ তুলে বনলক্ষ্মী যেন বুঝে নিতে চাইছিল এর পর যখন তারা ফুটবে, জোৎস্না ঝরবে তখন বনলক্ষ্মী কোন চোখে সেদিকে চাইবে।

চারিদিক থমথম্ করছিল। ঝড় উঠবে না কি? বনলক্ষ্মী একবার এদিক ওদিক তাকালো। মনে করতে করতেই ঠমকা হাওয়া এসে গায়ে মুখে লাগলো। ঘোর কেটে চমকে উঠেছিল বনলক্ষ্মী। জোর হাওয়ায় কবাট-গুলো দুম্‌দাম্ করে পড়ছিল। ঘরে ঢুকে আলো জেলে দিল। তাড়াতাড়ি ছুটো জানলাই বন্ধ করে দিল। দরজাটাও। পালঙের মশারী হাওয়ায় দুলে দুলে উঠছিল। তার একপাশ বিছানার তলা থেকে বেরিয়ে এসেছে। সেটা ভালো করে গুঁজে দিতে দিতে মশারীর কাছে মুখ নিয়ে বনলক্ষ্মী দাঁড়িয়ে রইল। দেখলো, শচীন অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে কান্নায় বনলক্ষ্মীর বুক ভরে উঠেছিল। মশারী তুলে নিজের কায়দায় এসে বসেছিল। মনে মনে বলেছিল, থাক্, তুমি ঘুমোও তোমার এতো জেনে কি হবে? সব বোঝাপড়া আমিই করে নেবো। তোমায় যেন কখনো জানতে না হয়

অন্যমনস্কে কখন সে শচীনের বাঁ হাতখানা তুলে নিয়েছিল। শচীনের চোখের পাতা ছুটো উঠলো। পাশ ফিরলো সে। ঘুম জড়ানো স্বরে করলো লক্ষ্মী, জেগে আছো নাকি?

আরও গভীর অন্ধকার পাতাল থেকে উত্তর ভেসে

ওঠে উঠোনে। তাই ভাবলো দিচ্ছেলাম। শচীনের গলার স্বরও দুঃখের আবেগে ভিজে গেল, 'তুই আমাকে ক্ষমা কর।' এখনও নামেনি বলে তেমনি বসে থাকে বনলক্ষ্মী। শচীন আস্তে আস্তে হাত ধরে, 'ওঠ, আমাকে বাঁচা যাবে না বিষ্টি থামাতে। কই, দাদা কই?'

চাইলো খাটটা শচীনের বালিশের পাশেই ছিল। বনলক্ষ্মী চুলে নিয়ে বাতাস করতে করতেই বললে, 'ঘুমাও আমি বসছি।'

'আহা আমার হও না।' শচীন হাত ধরে—' তুমিও শুয়ে পড়ো আমি বাতাস করি।' 'খাওয়া এখনও সেরেই বললে বনলক্ষ্মী 'মিটিয়ে আসছি।' কথা শেষ করে একবার শচীনের মুখের দিকে সে চাইলো চেয়ে খানিক বসে রইল। শচীনের দুষ্টুমীর নিষ্পাপ শিশুর মত চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে ওর মনে পড়লো, একদিন ওর চোখের তারাতেই সে নিজের ছবি দেখতে পেয়েছিল।

শচীনের হাতের পাখা ঘরের চাতে হাতে ক্রমে থেমে বাইরে ঝড়ের শব্দ। তারই মধ্যে একবার কান রেখে অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে বনলক্ষ্মী নিজের ভাবনার ছেঁড়া তার আবার বুনতে লাগলো। এতোক্ষণের ভাবনার রেশটা টেনে রেখে নিজেকে বোঝাতে চাইলো, এখনও কিছু সময় আছে। এখনও সে এতোদিনের সেই বনলক্ষ্মী। এই শ্রাবণে মাত্র ছ' বছর পূর্ণ হবে! অথচ যেন কতো যুগ কেটে গেছে!.....ঘরের বাতি আলো ঝলমল করছে ঘরে চেনা আর চেনা মুখের ভীড়! বনলক্ষ্মীর সব সখীরা সেখানে ছিল। কে যেন প্রথম তুললো কথাটা মনে পড়ে না বনলক্ষ্মীর। সবাই মিলে যা তৈ চৈ করছিল। শুধু বিয়ের রাত্রির লজ্জা ভয় সে গিয়েছিল। বোধ হয় বীণাই বলেছিল শচীনকে, 'আলাপ করতে এলাম!' 'অমন গোমড়া মুখ করে বসে আছেন কেন?' শচীন চোরের মত ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিল, 'ওকে একটা সোডার আনিয়ে দিন!' সবাই কলরব করে ওঠে, 'ও আলাপ নয়! গল্প করুন।' ছেলেমানুষের মত শচীন লজ্জায় মুখ নীচু করে উত্তর 'গল্প আমার আসে না। বাবাটা বড় ছোট কাটা! আসে কি না বুঝতে পারবেন! আমাদের ওসব দিয়ে তাঁকি দিতে পারেন! আরেকজনের কাছে কিন্তু ওসব চলবে না! সবাই তখন খিল খিল করে হাসছিল কিন্তু শচীনের গলা অন্যরকম সে শুধু বলেছিল, 'চলতে হবে যে।'

বীণা কম মেয়ে নয়। বলে ওঠে, 'পালেই তো রয়েছে নিজেই জিজ্ঞেস করে দেখুন না।'

বনলক্ষ্মী আপত্তিও করে নি। অসাবধানে শচীনের দিকে তাকিয়ে কথা শুনছিল।

প্রথম ভয়, শচীনের পুরোচোখের চোওয়ার দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক ঘাড় নেড়ে ফেলেছিল। তারপর লজ্জায় রাঙা হয়ে মুখ নিচু করে নিয়েছিল। বেশ মনে আছে, মনে মনে বলেছিল বনলক্ষ্মী এতেই হবে। এই আমার যথেষ্ট।'

তারপর থেকে শচীনকে কতবার বলেছে, নিজেকেও বুঝিয়েছে, ওই একই কথা। এই আমার যথেষ্ট।

বনলক্ষ্মীর যখন বিয়ে হয় শচীন তখন কোর্টে ক্লার্কের চাকরি করে। জমিতে ধান, পুকুরে মাছ। তার ওপর শ্বশুর-শাশুড়ি বেঁচে। তার চার বছর পরে দেশ ভাগ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে কর্তারা গেছেন। দেশছেড়ে কলকাতায় ছত্রিশ পরিবারের ঝাপ্টাকে ওরা এসে আছে।

Sadhana MRITASANJIBANI
SADHANA AUSADHALAYA ★ DACCA
Elixir of Life

শচীনের বাজনা নিয়ে এতোকাল কারো মাথা ব্যথা ছিল না। বরং এখানে সেখানে ভাঁক কোরতো। কলকাতায় এসে আবহাওয়া বদলে গেল। সবাইের মুখে কেবল, চাকরি খোঁজো। রোজগার করো। বাজনা নিয়ে গা এলিয়ে বসে থাকলে কি চলে?

'চাকরি খুঁজুক। সুস্থ মানুষ, রোজগার করবে বই কি? কিন্তু তার জন্যে সব খোয়াবে কেন?' বনলক্ষ্মী ভাবতো। নিজে সে যথাসাধ্য করতো। নিজের ছেলে-মেয়ে নেই। ভাসুর দেওরের ছেলেমেয়েদের, আর সংসারের যা কিছু কাজ গায়ে পড়ে সে করে নিতো, তবু একদিন কথা উঠলো।

শচীনের সেতারের সঙ্গে একটি রিফিউজী ছেলে তবলা সঙ্গত কোরতো। একদিন সে এসে তবলা কোলে নিয়ে বসে আছে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। শচীন তখনও ফেরেনি। সম্প্রতি দু একদিন এমনধারা দেরী হয়েছে শচীনের। ভাবতে বসা হয়ে ওঠেনি। বনলক্ষ্মী কয়েকবার উঁকি দিয়ে দেখে গেল। একবার এসে দেখলো যে, তবলা নামিয়ে রেখে ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়েছে। হেঁসেলের হাত ছাঁচলে মুহূর্তে মুহূর্তেই সে ঘরে ঢুকলো। বল্লে, 'আর একটু বোসো, ভাই। এখুনি নিশ্চয়ই এসে পড়বেন। দেরী হবে যখন বলে যান্ নি·····'

বনলক্ষ্মীর কথায় ছেলেটী বসতে যাচ্ছিল। এমন সময় শচীন ফিরে এলো।

'এতো দেরী যে?' জিজ্ঞেস করলো বনলক্ষ্মী, আর শচীনকে উত্তর দেবার সময়মাত্র না দিয়ে হেসে বলেছিল, এদিকে তবলা কোলে নিয়ে বসে বসে তোমার সাকরেদের হাত যে নিশপিশ করছে।'

বনলক্ষ্মী এতোক্ষণ নজর করেনি। গলার অবসাদ শুনে চোখে পড়লো। শচীনকে এক শ্রান্তি ছেয়ে রয়েছে। সে বলছিল, 'একটা জরুরী ওকালতি জানা ক্লার্ক নেবে। তারই তদ্বিরে এক সাহেবের বাড়ি গিয়েছিলাম।'

রিফিউজী ছেলেটি সাগ্রহে জানতে চাইলো, 'কি বল্লে, ওস্তা?'

'না, হবে না। ওদের বেয়ারার লোক ঠিক করা আছে।' কথা বলতে বলতে শচীন তক্তোপোষের একধারে বসে পড়েছিল।

কি কথা হচ্ছিল, যেন বনলক্ষ্মীর কানেই যায়নি। নিজের পুরোনো সুরের ঝেঁর টেনে বল্ল, 'না হবে নাই হ'ল! নাও, এখন উঠে হাতমুখ ধুয়ে এসো। এতো দেরী করলে! কতক্ষণই বা আজ বাজাবে?

না, আজ আর বাজাবো না' বলে শচীন হেঁসেলে ঠেস দিয়ে বসলো।

বনলক্ষ্মী ভুরু কুঁচকে ঘুরে দাঁড়ালো,

নিরুত্তর চুপ করে বসে থাকে

বনলক্ষ্মী ওর দিকে এগিয়ে যায়। বলে 'শোনো, আমি বলে দিচ্ছি, দিনের বেলায় তুমি যত ইচ্ছে উমেদারীতে ঘুরে যাও, সন্ধেবেলায় বাজনা কামাই করে এসব চলবে না, কিন্তু।'

স্নেহের সে ধমকে শচীন জবাব দেয় নি। মাথা নিচু করে বসে ছিল। বনলক্ষ্মী স্পষ্ট দেখেছিল ক্লান্ত মুখেও ক্ষণেকের জন্যে একটা সুখের গর্ব্ব চমকে উঠেছিল। বনলক্ষ্মী তখনও চোঁকাঠে পেরোয় নি। ওর ছোট দেওর পাশের ঘর থেকে এসে ঢুকলো। চাচের পার্টিশান দেওয়া পাশের ঘরে সে বাচ্চাদের নিয়ে পড়াতে বসেছিল। তেতো গলার ধমক শুনে বনলক্ষ্মী দাঁড়ালো—।

'আমিও বলে দিচ্ছি, বৌদি, সব জিনিষের

SARIBADISALSA
SADHANA AUSADHALAYA·DACCA
a blood Purifying Tonic

আছে আর ভাকাবী করার বয়স বা সময় এটা নয়। সবাই যখন মুখে রক্ত তুলে...,

পুরোনো তর্ক। দূর থেকে ছুঁড়ে দেওয়া বাঁকা কথা কয়েকবার বনলক্ষ্মী শুনেছে। মুখের ওপর শুনে আর ধৈর্য্য রইল না। শুধু, দাঁতে ঠোঁট চেপে অপমানের ঢোক কতকটা সামলে নিল। মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে বললে, 'বেশ তো, তোমাদের এতো অসুবিধে আর আপত্তি যখন, একটা অন্য ব্যবস্থা করলেই হবে

অন্য ব্যবস্থা যে কি, তখনও ভাবে নি বনলক্ষ্মী। কিন্তু ভেবে নিতে দেরী হয় নি। প্রথমে শচীন ভয় পেয়েছিল। আপত্তি করেছিল কিছু মানে নি বনলক্ষ্মী।

সেতারের জন্যে সংসারে অবকাশটুকু বাঁচাবার পণ ওর; তাইই জন্যে, গয়না বেচে আর স্বল্প পুঁজি ভেঙে সংসার চালাবার ভাসাতে অন্য ঘর ভাড়া নিয়ে সংসার পেতেছিল বনলক্ষ্মী অসমুখ আশা আর কল্পনায় দুর্যোগ সয়েছে আশা করছিল ইতিমধ্যে কিছু একটা সুরাহা করতে পারবে শচীন টানাটানিতে এক একদিন বনলক্ষ্মীর মাথার ঠিক থাকতো না। আতঙ্ক হ'তো

এমন সময় ভাগ্যক্রমে চক্রবর্তী মশাই কলকাতায় এলেন

এক সপ্তাহ সংসারে তবলা বাঁয়া থেকে কাশী থেকে এসেছেন শচীন ওঁর শুরুভাই এসে দেখা করলেন। শচীনের অবস্থা দেখে কোনো আপত্তি শুনলেন না।

তিন দিন বাদে নিজের সঙ্গে নিয়ে কাশী রওনা

তেমন আপত্তি করে নি: তবে বাঁধো বাঁধো যেন অভ্যর্থনাও দিয়েছিল। যত জড়ো বড়ই কাঙালপনা। মনে হয়েছিল বনলক্ষ্মীর, হবে, মুখে বলতে পারে নি।

কলকাতার পাট চুকিয়ে ওরা কাশীর দিকে রওনা হ'ল: ট্রেনেই একসময়ে বনলক্ষ্মীর দিকে দেখিয়ে শচীন চক্রবর্তীকে বলেছিল: 'আমার ভালভাতা জীবনটার সঙ্গে লক্ষ্মী এতোদিন সঙ্গত করছে। পেরে উঠছিল না। হাঁপিয়ে উঠছিল। তোকে ও অন্তত হাজারবার বন্ধুবরে দেবে।'

লজ্জায় আর সুখে রাঙা হয়ে উঠেছিল বনলক্ষ্মীর মুখ। সত্যিই সেদিন সে হাজারবার বন্ধুবরে দিয়েছিল চক্রবর্তীকে। প্রথমে কিছুদিন দিয়েছিল।

তারপর কতবার নিজেকে মনে মনে বলেছে, না এলেই ভালো হ'তো। চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা না হ'লেই হয়তো ভালো হ'তো।

বাইরে ঝড়ের গো গো বেড়ে গেছে আর বার বার বাজের আওয়াজ হচ্ছে। বনলক্ষ্মী বিছানায় উঠে বসলো। এখান থেকে তো আর সমস্ত কড়া নাড়ার শব্দ সে শুনতে পাবে না। নিচের ঘরেই ওকে গিয়ে বসতে হবে।

ওই কড়ানাড়ার শব্দ শুনতে যদি না হতো যদি রেহাই পেতে পারতো। প্রতিদিন এই মৃত্যুর পরোয়ানা শোনার জন্যে হাত পেতে বসে থাকতে আর সে পারে না। মৃত্যুর চেয়েও কুশ্রী। কতদিন আর সইতে হবে এই যন্ত্রণা?

কতক্ষণ বসে রইবে, কিছুই মনে থাকবে না বনলক্ষ্মীর। পাথর হয়ে সে বসে থাকবে। ইতিমধ্যে কতবার ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করবে। কোনোমতেই ঘুম আসবে না। দরজায় কান সজাগ হয়ে থাকবে। এক সময়ে কড়াটা নড়ে উঠবে, ঠক্-ঠক্-ঠক্। সে শব্দে বুক কেঁপে উঠবে। পায়ে পায়ে এসে রুদ্ধশ্বাসে দোরের আগল নামিয়ে দেবে।

তারপর দোর খুলে বনলক্ষ্মী পাশে সরে দাঁড়াবে। বাইরের জামাকাপড় শুদ্ধু চক্রবর্তী কোনোমতে বিছানার একপাশে এসে উলে পড়ে যাবে। সদরের দরজা বন্ধ করে দিতে দিতে বনলক্ষ্মী সহস্রবার নিজেকে ধিক্কার দেবে। ইচ্ছে করবে, ওকে ঠিকমত ভাতে বলে। কিন্তু সাহস হবে না। বাইরে থেকে চক্রবর্তীর ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিজের ঘরে উঠে যাবে। প্রতিরাতে এমনি বুক ছাইকরা জ্বালা মুখ বুজে নিজে বইবে, আর, আর একজনকে তিলে তিলে জ্বলতে দেখবে। মুখ ফুটে বলতে পারবে না। সব চেয়ে বড়ো যন্ত্রণা এই যে, বনলক্ষ্মী জানে যে শুধু তারই জন্যে চক্রবর্তী নিজেকে নিঃশব্দে নষ্ট করছে।

বনলক্ষ্মী জানে, সজ্ঞানে কখনো চক্রবর্তী ওর দিকে চোখ তুলে চাইতে পারবে না। কিন্তু অসুস্থ অবস্থায়? যখন চক্রবর্তী আর নিজের ওপর কোন জোর খাটে না? তেমন দুঃসময়ে?

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে আগের রাতের কথা মনে করে শিউরে উঠেছিল বনলক্ষ্মী। আরও অনেক রাতে চক্রবর্তী বাড়ি ফিরেছিল। দোর খুলে দিতেই কোনোমতে চৌকাঠ ডিঙিয়ে এসে মেঝেতে ওলটপালট খেয়ে পড়ে গেল। হাতে ভর দিয়ে পালঙ্কের দিকে এগোবার চেষ্টা করলো। পারলো না। মেঝেতেই শুয়ে রইল।

বনলক্ষ্মী চোখ মেলে আর সইতে পারলো না। ও কি আর মানুষ আছে? কার কাছে সঙ্কোচ করবে? ওকে তুলে ধরতে যায় বনলক্ষ্মী। ভাঙা গলার কড়ানো স্বরে অনেক কথা বোঝা যায় না। বলে, তুমি যাও লক্ষ্মী, তুমি যাও—আমায় ছুঁয়ো না।' বনলক্ষ্মী প্রলাপে কান দেয় না।

বনলক্ষ্মীর দুচোখের জল চিবুক বেয়ে গড়ায়।

মাতাল চক্রবর্তী হঠাৎ ওর মুখটাকে দুহাতের অঞ্জলীতে তুলে নেয়। অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে বনলক্ষ্মীর। কাণ্ডজ্ঞান হারানো চক্রবর্তী আবার বলে, 'আমার জন্যে কাঁদছো? ছিঃ কেঁদো না। ও দুখে কি কান্না মানায়?' ছেলেমানুষের মতো আবদার করে—'হাসো, একটু হাসো। দেখি...

হিমঠাণ্ডা কাঁপা আঙুলগুলো বনলক্ষ্মীর লাল ঠোঁটের জ্বালা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

বিষ নাগের চোখের টানে এগিয়ে যাওয়া মতো নিথিল বলেছিল ও

পর মুহূর্তের খেয়ালে যদি আবার চক্রবর্তি তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতো, যদি না বলতো 'তুমি যাও লক্ষ্মী, আমায় ছুঁয়ো তাহলে হয়তো সে অমনি বসে থাকতো।

সেই থেকে যখনি মনে পড়ে যায়, কোন পাতালের ঘরকান্না সে সাঁড়িয়েছিল। বনলক্ষ্মীর বুক বাঁশপাতার মত কাঁপে।

নিচের তলায় নেমে সদরে বৃষ্টিও নেমেছে। মেঝো জাওয়া সেরে করতে চক্রবর্তীর ঘরে ঢুকে দেখলো জানালাটা খোলা বন্ধ করতে সে ভুলে গিয়েছিল ঘরটা জলে জাওয়াতে চচপচ করছে জানালা বন্ধ করে সে তার পোষের ওপর বসলো। এই ঘরে যেদিন প্রথম

ASOKARISTA
Best Remedy for Female Complaints
SADHANA AUSADHALAYA • DACCA

এমনি এক অগোছালো

চলেছিল পরেপাটি করে।

আজও সে এই ঘর সাজাবে না সাজিয়ে পারবে না। পারতো, যদি কখনো চক্রবর্তীকে একটা চরিত্রহীন লম্পট মনে করা সম্ভব হ'তো। তাহলে কতো সোজা হ'তো সব। নিমেষে অন্তর্হিত করতে পারতো। কিন্তু কিছুতেই তেমন মনে করতে পারে না বনলক্ষ্মী। বরং উনি একজন শান্ত সাধক একথা বনলক্ষ্মী মনে প্রাণে জানে। এখানে আসার পর থেকে কতদিন তো তাই মুগ্ধ ছন্দে চেয়ে চেয়ে সে দেখেছে। হয় বাজনা, নয় বই, এই নিয়েই দিনরাত আছে চক্রবর্তী মশায়। কেমন করে ক্রমে ক্রমে সারা সংসারটার ভার বনলক্ষ্মীর হাতে এসে পড়লো।

প্রথমদিকের কথা। চক্রবর্তী মশায় হয়তো শচীনের সঙ্গে বাজাতে বসেছেন। সকাল গড়িয়ে দুপুর পার হয় হয়। বনলক্ষ্মীর তাড়াতে গিয়ে দুজনে একসময়ে স্নানাহার সারলেন। এসে একটা বই মুখে নিয়ে বসলেন। বিকেলে চা জলখাবারের পর আবার পর্যন্ত

বাজনা আর সেই সংক্রান্ত আলোচনা। প্রায়ই এসে দরজার কবাট ধরে বনলক্ষ্মী দাঁড়িয়ে থাকতো।

কখনো ঘরে এসেও বসতো। দাড়ি দিতে ভয় পাছে গুরুর ঘোর কেটে যায়।

মুদি, ধোবা বা গোয়ালা এলে চক্রবর্তী মশায় নিশ্চিন্তে মাথা নেড়ে ছোরের দিকে দেখিয়ে দিতেন—'ওকে বলো।' বনলক্ষ্মীই হিসেব রাখতো, হিসেব মেটাতো। কি আশ্চর্য স্বপ্নের মত কেটে গেছে ক'টা বছর।

সুধীজন সমাজে চক্রবর্তীর মারফৎ শচীনের সন্ধান প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়েছে তখন। সন্ধ্যের আসরে অতিথি সভাগতের ভীড় বেড়ে গেছে। সম্প্রতি গুরুর বনলক্ষ্মীর মনে তোলায় এনে দিতো। স্বাবক দলের আলোচনার সুরটুকু কিছু বোঝার চেষ্টা কোরতো। বুঝতো না। তবু মনে হতো, এই ওর যথেষ্ট।

একরাতে হয়তো তোলায় হাত ভরে আছে। কয়েকটা বাড়ির পরে ওদিকটা ফাঁকা। বনলক্ষ্মী আলসের পাশে দাঁড়িয়ে ওদিকে চেয়ে আছে। জানে, ওখান দিয়েই বয়ে গেছে গঙ্গা। এমন সময়ে নদী কি অনেক আছড়ায়। হাওয়ার সাড়া পাওয়া ঢিমন ছোট ঢেউ; তাদের বুকে চাঁদের ছায়া। ছাতের কোনে বনলক্ষ্মী একা দাঁড়িয়ে। কানে আসে, নিচের তলায় গুরুর স্রোত নিজের বুকে চমকের আলো তুলিয়ে বয়ে চলেছে। সেই স্রোতে নিজেকে ও ভাসিয়ে দেয় অযুত অচেনা সুখে বুক ভরে যায়।

একদিন কোথা থেকে বিষ বাস এসে লাগলো বনলক্ষ্মীর সব সুখ ক্রমে শুখিয়ে হলুদ হয়ে গেল।

গত বছর শচীনের বসন্ত হ'ল। অনেকদিন বাজনা-গুলো ধুলো কুড়োতো শুধু। বিছানার পাশে চক্রবর্তী মশায় সব সময় বসে থাকতো। শচীনকে নিয়ে বনলক্ষ্মীও দিনরাত কেটে যেতো। শচীন তখন থেকে শিশুর চেয়েও অসহায়। ব্যাধিতে দুই চোখের দৃষ্টি নিয়ে গেছে। অন্ধত্বের শুধু দুই অবলম্বন। চক্রবর্তী আর বনলক্ষ্মী।

সংসারের ভার নেওয়ার পর থেকে বনলক্ষ্মী বামুন ঠাকুর বিদায় করেছিল। আবার রাধুনী রাখা হ'ল। বনলক্ষ্মী আপত্তি কোরলো না।

একদিন হোটেলার ঘরে রাধুনীটা বনলক্ষ্মীর হাতে একটা প্যাকেট এনে দিল। বনলক্ষ্মী খুলে দেখে দুটো শাড়ী আর ট্রাউজের কিছু কাপড়। প্রায় সঙ্গে

সঙ্গেই চক্রবর্তী মশায় ওপরে এলো। বনলক্ষ্মী অনুযোগ করলে, 'এসব আমার কি ?'

চক্রবর্তী শচীনের বিছানার একপাশে বাঁয়া তবলা নিয়ে বসতেই বললে, 'নিজের সাড়ীর দিকে একবার চাও, তাহ'লেই বুঝতে পারবে!' বনলক্ষ্মী সত্যিই নিজের পরিচ্ছন্নতার দিকে চোখ বুলিয়ে লজ্জা পেল। রং ওঠা আর জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। অনেকদিন নিজের দিকে তাকায় নি। কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো। কয়েক মিনিট মাথা তুলতে পারলো না।

এর পানে যাঁর নজর রেখবার কথা, তাঁর দিকে বনলক্ষ্মী একবার চাইলো। তিনি আলাপে ছুঁয়ে ছুঁয়ে সেতারের সুর বাঁধছিলেন। হাত থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার চক্রবর্তী ?'

অতি সহজ স্বরে চক্রবর্তী উত্তর দেয়, 'ও কিছু না! লক্ষ্মীর দুটো সাড়ী। ওর তো বেরোনো হয় না; তাই আমি.....'

'ওঃ' সন্তুষ্ট মনে হলো

ছিল।

আঁচলে চোখ চেপে দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে চলে এল বনলক্ষ্মী। চক্রবর্তী ছাড়া ওর কান্না আর কেউ দেখল না।

রাতে ছেলেদের পাট চুকিয়ে দোতলায় আসার মুখে জলের গেলাস আর পান চক্রবর্তীর বিছানার পাশে রেখে আসতে গিয়েছিল। হাতের বই নামিয়ে রেখে চক্রবর্তী ওর মুখ চেয়ে বলেছিল 'যদি অন্যায় কিছু করে থাকি, না জেনেই করেছি কিছু মনে কোরো না।'

কান্নাটা আবার বুকের জমাট বাঁধা ছেড়ে ছুটে আসতে চায়। অতি কষ্টে সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে শুধু বললে অন্যায় আমার কিসের ? চক্রবর্তী অসুখের মত

তবুও জানতে চায়, 'তবে তুমি অমন কাঁদলে কেন ?' পরে বাঁধ বেঁধে রাখা যায়, বনলক্ষ্মী বলে ফেলে, আমার নিজেরই কপাল দেখে।

সামান্য সেই দুটো কথা নিস্তব্ধ বাড়ির ছোট ঘরখানায় ফিস্‌ফিস্ করতে থাকে। খোলা বইয়ের পাতার দিকে শূন্য চোখে চেয়ে বসে থাকে চক্রবর্তী মশাই।

সেই রাতেই প্রথম কেঁদেছিল বনলক্ষ্মী। বেলাশেষে ভর দিয়ে অন্ধকারে নিজেকে আড়াল করে অনেকক্ষণের কান্না। সেই থেকে প্রায় প্রতি রাতেই।

পরের রাত থেকে খাওয়া দাওয়ার পর নিজের ঘরে ঢুকে চক্রবর্তী মশাই দেখতে পায় যে জলের গেলাসটা আগে থেকেই ঢাকা দিয়ে যথাস্থানে রাখা। পানের বেকাবও

পরের দিন থেকে চক্রবর্তী কয়েক ঘণ্টা আগেই উঠে পড়ে। রুক্ষ মলিন মুখ আর অভুক্ত খাবারের থালার দিকে বনলক্ষ্মী আড়াল থেকে চেয়ে থাকতো। কিছু বলতে সাহস হ'তো না। শুধু ভাবতো কোথাও চলে যাওয়া যায় না ? অমন সুন্দর জীবনে শনির মত ছায়া ফেলেছি, সে তো আমিই !

এমন সময় এক বিকেলে ওরা যখাতীতি বসেছে। দুজনের জলখাবার নিয়ে বনলক্ষ্মী ঘরে এলো।

শচীনের পাশে বসে তার হাতে খাবারের প্লেট তুলে দিচ্ছিল। এমন সময় বিনা ভূমিকায় চক্রবর্তী হঠাৎ বললে, 'একটা বাসা ঠিক করেছি শচীন গার্ডেন মোডের ওই কলোনিতে বাড়িটা। আমাদের বাজারের কোনো অসুবিধে হবে না।

শচীন অবাক হয়ে যায়, 'কার জন্যে ?'

বিস্ফারিত কলঙ্ক চোখে তুলে বনলক্ষ্মী চক্রবর্তী মশাই দিকে তাকায়। চক্রবর্তী সেদিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়

অনেক ভয় তখনও কাটে বলে
তাদেরই বোধ হয় অত কথা মনে
গেছিল। জেরা করেছিল, তোমার ?
অপরাধে ছেড়ে ?'

' চক্রবর্তী এবার একবার বনলক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে
একথা বলে তারে লক্ষ্মীর নিচের সাদার সাদাদের
দাঁত খাওয়াতে পারে

উত্তর মনে পড়ল ফো করে হেসে উঠেছিল
বলেছিল তা বেশ এটা যখন নেওয়াই হয়ে গেছে
যে সব মিটিয়ে দাওয়া যাক্ষ্মী। আমি বাপু বেশ
বাড়ির জামাই সব হয়ে গেছে
কেও বুঝে নেওয়াতে পারে অভিমানে গুমরে
উঠেছিল বুকের মধ্যে, 'কিছু চেনা হয় নি—' বনলক্ষ্মী
পারেনি সব কথা বলা হয়ে

ঘরে ঢোকামাত্রই সেই করুণ বাতাসের এসে
বিশ্ব মুখ তাকে ভাবছিল চক্রবর্তীর কথা ভাবছিল, তাকে
কি বলা যায় আপনারা হয়তো পারেন, এটুকু পারেন
আপনাদের সাধনা, আর সামান্য একটা
আর হয় না, তবু মনে মনে কথা সাজায়। বেশ
কে সহজ স্বরে চক্রবর্তীর টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে কথাগুলো
নিজের ঠোঁটে বলে। আঁচলটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে
এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল মুখটা আরক্ত হয়ে গেছে
লজ্জায় ঢাকতে গেছে। বুকের ধক্ ধক্ শব্দ
শুনতে বুক চেপে সামলাতে পারছে না। আবার কান্না
ঠক্‌ঠক্ করে বড়ে উঠলো।

কতক্ষণ পরে সে চোখ খুলেছে জানে না চক্রবর্তীর
সর্বাঙ্গে কালি মেখে গেছে। তার সঙ্গে এক ঝলক কে যেন
বাতাসও ঘরে ঢুকলো। বনলক্ষ্মী দোরে আগল দিয়ে
ফিরে দাঁড়ালো।

চক্রবর্তী ততক্ষণে পিছে ছুটে টা ঘরের কোণে খুলে
রেখেছে আজ স্বাভাবিক অবস্থাতেই ফিরেছে তাহলে।
স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো বুক থেকে বনলক্ষ্মী ঘর থেকে
চলে আসছিল।

চক্রবর্তী চোখাচোখি ওর দিকে তাকিয়ে বললে,
যেও না একটু বোসো বনলক্ষ্মীর এক মুহূর্তের
স্বস্তি চাপিয়ে হাজারগুন আশঙ্কার গায়ে কাঁটা দিল।

আলনা থেকে শুখনো কাপড় আর তোয়ালে নিয়ে
বেরিয়ে যেতে যেতে চক্রবর্তি বলে গেল, 'তোমার সঙ্গে
একটা কথা আছে। একটু বোসো।' গলার স্বর সংযত
চোখে মুখেও ভয় পাবার মত কোনো আগুন নেই। তবু
বনলক্ষ্মীর ইচ্ছে হল, ছুটে সে এঘর থেকে পালিয়ে যায়
এই ঘরে যেরা নির্জন ঘরে চক্রবর্তির মুখোমুখি কি করে
বসে থাকবে সে ? তবু নড়তে পারলো না : চক্রবর্তী
এসে পৌঁছানো পর্যন্ত যেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

চক্রবর্তী এসে টেবিলের এক কোণে বসলো : ভিজে
চুলগুলো আঙুলে জড়িয়ে গুছিয়ে নিতে নিতে বনলক্ষ্মীকে
অভয় দিলো, 'ভয় নেই, তুমি অকাতরে বসো। অনেক
কথা আছে।'

চক্রবর্তীকে ভয় না করলেও, বনলক্ষ্মীর নিজেকেই ভয় করতে লাগলো। অন্ধকার মনে একটা উত্তাপ বিদ্যুতের মত চমকে চমকে উঠছিল।

চক্রবর্তী টেবিলের ওপর থেকে একটা বই তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে কিছু সময় কাটালো। তারপর বলে, 'আজ বেরোবার সময় ঠিক করেছিলাম আর কখনো ফিরে আসবো না। তবু ফিরে এলাম। তোমার একটা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলাম। কাল সকালে হাতে পেতে। আমার বালিশের নিচে আছে। এক সময় পড়ে দেখো।'

কথা শুনে বনলক্ষ্মী ভয় পেলো। 'ভেবেছিলো ফিরে আসবে না?' মন্ত্র লাগার মত অবসন্ন হাতে বালিশের নিচে থেকে চিঠিটা নিয়ে তক্তাপোষের এক কোণে নিজেই সে এসে বসলো। খাম খুলে চিঠিটা চোখের সামনে মেলে ধরলো।

'এখুনি পড়বে? আচ্ছা পড়ে নাও।' বলে চক্রবর্তী ওর দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল।

কোনো সম্বোধন নেই। কোনো শেষ নেই। শুধু লেখা আছে: "সন্ধীতকেই এতোদিন চরম মনে করেছিলাম। তোমায় দেখে বুঝেছি, জীবন তার চেয়েও বড়ো। পরে আরও জানলাম, অনেক বড়ো জীবনের শুচিতা।

আমি শচীনের সেতারের সঙ্গে তাল মেলাই। তার জন্যে তোমাদের মিলিত জীবনের সঙ্গতি নষ্ট কোরবো কেন?

সেতারি যদিও বা হয় পতন নয়, জীবন সইবে না।

বাড়িটা তোমাদের জিম্মায় রইল, কোথাও চলে যেও না'।

পড়া শেষ করে বনলক্ষ্মী শূন্য চোখে তখনও কাগজের দিকে চেয়ে ছিল। চক্রবর্তী ওর দিকে তাকিয়ে আছে, সারা শরীরে তাই অনুভব করছিল।

চক্রবর্তী কথা কইলো। কথাগুলো ওর রক্তের ঢেউ তোলপাড় করতে করতে বুকে আছড়ে পড়ছিল। আঘাতগুলোর এমন একটা মধুর শক্তি ছিল যা সব আশঙ্কা পেরিয়েও পরের কথা শোনার আশায় উন্মুখ করে তুলছিল।

'জানো লক্ষ্মী, নিজেকে নিয়ে বেশ গুমর ছিলাম এতোদিন। গান বাজনার ব্যাপারে কম মেয়ের সংস্পর্শে তো আসি নি। মাঝে মাঝে হয়তো তাদের নিয়ে স্বপ্নও দেখেছি, কিন্তু কখনো এমন চঞ্চল হই নি। ঘড়ো বেয়ে ছুটছিল নিজের ওপর। কোনোমতেই ভোলাতে পারি নি। তুমিও স্বাভাবিক থাকতে পারলে না দেখে লজ্জার শেষ রইল না। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। ভাবছিলাম কেন এমন হ'ল। এক সময় মনে হলো, আমার অতৃপ্ত শরীর তবে কি টেনে নামালো। লজ্জা কোরো না..... শোনো...আমার দিকে চাও...' বনলক্ষ্মী চোখ তুলে চাইলো।

'এর জন্যে তোমাদের সুন্দর দুটী জীবনের সঙ্গতি নষ্ট করি কেন' আমার মত লোকের জন্যে নরকের রাস্তা তো খোলাই আছে। ভাবনাতেই যেন আতাল হয়ে গিয়েছিলাম। স্থির করলাম, বেশ, ওই পথেই যাবো। ভালো মানুষির ভড়ং কোরবো না। কিন্তু.....তাও সম্ভব হ'লো না। মাঝরাতে ঘোর কাটতে, মেয়েটার ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে এলাম...'

কান পেতে শুনছিল, তবু যেন সব বোঝে নি বনলক্ষ্মী। সাপের কামড় খেয়ে হঠাৎ চমকে উঠলো। যন্ত্রণায় অস্ফুট শব্দ করে দু'হাতে মুখ ঢাকলো। চক্রবর্তী শুধু একবার চেয়ে দেখার জন্যে থেমেছিল, বলে, 'পালিয়ে এসে ঘড়ের মধ্যে এপথ সেপথ অনেক ঘুরে বেড়িয়েছি। বুঝতে পেরেছি.....না, আমি তো তা চাই নি। তোমারি মুখের ছবি মনে ভাসছিল, সে মেয়েটার তো নয়? তাই আমার ভয় ভেঙে গেল'।

ভয় কাটেনি বনলক্ষ্মীর। সন্ধ্যের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একবার সে ভেবেছিল, সব পারবে সে। কিছুই যাবে না। শুধু এতের যাতনা কে বাঁচিয়ে রাখবে! যা কিছু গ্লানি সে ঐ সেতারের জন্যে.....ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যের অন্ধকারে সে কেঁদে উঠেছিল। নিজেকে গাল দিয়েছিল, পোড়ারমুখী, একি ভাবছিস্ তুই.....? এ তো মন ভোলানো কথা। বিপথে পা রেখেছিস্, সে কি, সেতারের জন্যে, শুধুই সেতারের জন্যে? নিজেকে দেখতে পেয়ে

সেই থেকে আশ্রয়ের অবশ হয়েছিল বনলক্ষ্মী।

চক্রবর্তী টেবিলের ওপর থেকে নেমে এলো। টেবিলের পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালো। অলক্ষ্যে ডান হাতখানা বনলক্ষ্মীর মাথার ওপর রেখে অবিন্যস্ত চুলগুলো গুছিয়ে দিতে লাগ্‌লো।

মিনু হওয়া ওর মুখের দিকে চেয়ে অন্য এক আলো স্বরে জানতে চাইলো, 'তোমার আর ভয় করছে না তো?'

তখন ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল বনলক্ষ্মীর বুক। অন্ধকারে ইঁদুরে বেড়াচ্ছিল একটা রাস্তার ওপর। ঘাড় চুঁইয়ে বাড়িয়ে মাথার ওপর থেকে চক্রবর্তীর হাতখানা নিজের মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে জোর ক'রে মাথা নাড়লো,—'না, ভয় না।'

নতুন এই সম্বোধনে নিজেই সুখে লাজুকে ভরে গেল। চক্রবর্তীর মুখের দিকে হাসিমুখে চাইলো।

চক্রবর্তী স্নিগ্ধ ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। ঠোঁটের কোণে ঈষৎ বাঁকা হাসি নিয়ে বল্লে; নিজেকে ঠকিও না। ভয় কেটে যাওয়ার তো এ লক্ষণ নয়। আমি তো তোমায় 'বোন' বলতে পারবো না। সে তো মিছে। আজকেই আমি একটা নতুন সুর শিখলাম। ভেবেছিলাম, তুমি তার সঙ্গে সঙ্গত করতে পারবে।.....'

কথা থামিয়ে চক্রবর্তী বনলক্ষ্মীর মুঠো থেকে হাতটা ছাড়িয়ে আনতে চাইলো। অন্যমনস্কে তখনও তেমনি রয়েছিল বনলক্ষ্মী।

'কি সে সুর, জানো?' বলে আবার একটু থামলো চক্রবর্তী; নিজেই অতি মৃদুস্বরে মুহূর্তপরে জবাব দিল তার, ...বল্লে, 'অনুরাগের.....'

ওর মুখের দিকে বনলক্ষ্মী অবুঝ চাউনী মেলে রইল। চক্রবর্তীর হাতখানা আরও নিবিড় করে নিজের মুঠোয় নিল। চোখের জলে ভেসে যাওয়া মুখখানা ওই হাতেই মুছে মুছে নিল।

আবার যদি -

ভালোবাসার রোমহর্ষ আবার যদি বোধ করি
কোনো একটি গভীর চুল ও চোখের মেয়েকে নিয়ে
আশ্চর্য অসম্ভব জীবনের ভিতর আবার যদি চলে যাই
কোনো এক ফাল্গুনের বাতাসে
কোনো এক চৈত্রের জ্যোৎস্নায়
তা'হলে কি হবে ?
সেই মেয়েটি কেমন হবে ?
জীবন অনেক আবিষ্কার করেছে
কিন্তু এই আর এক নতুন আবিষ্কার
আমার জন্যে অপেক্ষা করছে
আমাকে যখন সে পাবে, বলবে : তুমি শিশু,
জীবনের কি জান তুমি ?

পৌষ, ১৩৩৮

মহুয়ার দেশে

(সাঁওতাল বিদ্রোহ স্মরণে)

আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

মহুয়ার বনে বনে ডানা ঝাড়ে কী দুরন্ত ঝড়,
পাহাড়ী ঝরণার মতো লাস্যময়ী সাঁওতালি মেয়ে
ডাগর দু'চোখ মেলে নাগরের তূণে ভরে শর !
স্বপ্নের মাতাল কন্যা ছিল জেগে যার পথ চেয়ে
ধনুকে টঙ্কার তু'লে এলো কিরে সেই ভয়ঙ্কর ?
মহুয়ার বনে বনে ডানা ঝাড়ে কী দুরন্ত ঝড় !

কালো ঠোঁটে তীক্ষ্ণ হাসি কালো মেঘে বিদ্যুতের মতো,
কালের ক্লান্তির বুকে যৌবনের পদশব্দ ওঠে—
ধ্যানভগ্ন সন্ন্যাসীর শিবনেত্র জ্বলে শত শত,
মাদলের মত্ত বোলে পাহাড়ে পাথরে ছন্দ ফোটে !
শুকনো পাতার মতো অতি জীর্ণ জড়চেতনার
নৈরাশ্য আকাশে ওড়ে, ঝড়ে যায় দিগন্তে আছাড় !

আজ কোনো কথা নয়, শুধু গান গাইবার দিন,
আজ অন্য ফুল নয়, শুধু রক্তজবার আগুন—
সে আগুন ছুঁয়ে ছুঁয়ে অরণ্যের বাসরে নবীন
ঝড়ার মঞ্জরে নামে উর্বশীর চরণে ফাল্গুন !
নতুন অতিথি আসে, দিকে দিকে তারই আয়োজন,
বনে বনে তারই সুর, মেঘে মেঘে সৃষ্টির গাজন !

আর দিন গোণা নয়, প্রতীক্ষার অসহ্য প্রহর
বাসি মহুয়ার মতো ঝরে গেছে ধৈর্যের দোলায়,
উদ্ধত নাগের ফণা পায়ে পেষে খ্যাপা লখিন্দর,
শোনিত খড়্গের মতো বেহুলার সীমন্ত চমকায় !

মহুয়ার বনে বনে ডানা ঝাড়ে কী দুরন্ত ঝড়,
পাহাড়ী ঝরণার মতো লাস্যময়ী সাঁওতালি মেয়ে
ডাগর দু'চোখ মেলে নাগরের তূণে ভরে শর !
স্বপ্নের মাতাল কন্যা ছিল জেগে যার পথ চেয়ে—
ধনুকে টঙ্কার তুলে এলো কিরে সেই ভয়ঙ্কর ?
মহুয়ার বনে বনে ডানা ঝাড়ে কী দুরন্ত ঝড় !

জন্মদিনে

শ্রীকালিদাস রায়

মম জন্ম গ্রাম,
কপোতাক্ষ তীর সম তোমার প্রকৃতি অভিরাম
অনেক দিয়েছ তুমি তোমারে প্রণাম।
শৈশবের দেহ মোর পুষ্ট হ'লো তব অন্নজলে,
প্রথম দেখালে তুমি কল্প-স্বপ্ন বট তরুতলে।
পরাইলে নেত্রে অঞ্জন,
এ বিশ্ব প্রকৃতি হ'লো মধুময় অপূর্ব মোহন।
পদে পদে জাগাল বিস্ময়,
সৃষ্টি উপাদান হ'ল তব দত্ত স্মৃতির সঞ্চয়।
দিয়েছ মায়ের স্নেহ পিতার আদর
একত্র পালিলে মোর ভাই বোনে ঘুচায়ে অন্তর।
দারিদ্র্য দিয়েছ বটে বিদ্যালয়ে তার
শিক্ষা দীক্ষা হয়েছে আমার।
বিদেশে পাঠালে দিয়ে অফুরন্ত পথের পাথেয়
দীর্ঘ পথে ভিক্ষা যাচি তাই আমি নই আজো হেয়।
তব ঘন প্রান্তরের সঞ্জীবন সুনির্মল বায়ু
দিল দীর্ঘ আয়ু,
তোমার আশিসে মাগো জীবন সার্থক করিলাম
আজি জন্মদিনে তোমা জানাই প্রণাম।
মম জন্ম গ্রাম।

এসপ্লানেড এক্সচেঞ্জ—

স্নেহাঙ্কুর ভট্টাচার্য

এই তো গোধূলি সেই পুরাতন বিহ্বল গোধূলি
ডুবা ঝুকে সারা হলে স্মরণের ব্রত
শেষ গোধূলির সূর্য শুয়ে আছে রক্তমাখা শহীদের মত ;
মনে মনে চাখ আঁকে অদৃশ্য অঙ্গুলি।
বিষণ্ণ তমাল বৃক্ষ, রৌদ্রবিরক্ত মেঘ, দ্রুতগামী ট্রামবাস
সবই অন্ত রহস্যের পার্থিব প্রতীক,—
ছলছল্ চৈতন্যে কাঁপা মলিন অন্যায়।
এমন অজানা দেশে ভিন্নদেশী বিমূঢ় নাবিক
দূরলগ্ন সত্তার সান্নিধ্য থেকে বাহিরে যাবার
পথ খোঁজে, চেনা স্বাদগন্ধের অতলে
বিভ্রান্তি ডোবাতে চায়।
প্রথামত সন্ধ্যার দুয়ারে
কলকাতার ক্লান্ত নটী রঙে মাতে, নিয়নের নীলাম্বরী
জলে।

দীপেনকে চিঠি

জগদীশ মণ্ডল

'কেমন আছ', লিখেছ তুমি,
কি লিখব ভাই।
মনে একটা স্বপ্ন জলছে—
একটা আলো, একটা ভালবাসার ভাবনা :
ভাবছি কেবল ক'টা দিন ধরে ;
জানো, দীপেন, আমার ভালবাসার কথা ভাবতে
বড় ভাল লাগে, কেননা ও ভাবতে
ব্যথা লাগে মনে।
হঠাৎ সেদিন গড়িয়ার মোড়ে
তার সাথে দেখা ;
এগিয়ে গিয়ে বললাম,
'আপনি এখানে যে'
—'কেন আসতে নেই বুঝি'
নিবিড় নিরালোক দু'টি চোখে
ছোট্ট একটু মলিন হাসি
ছড়িয়ে গেল সে।
আমি, কি জানো, দীপেন,
অবাক্ হয়ে ওর দিকে চেয়ে ছিলাম।
কয়েকটা কথা নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে,
তারপর চলে গেল ও ; আমি ছোট ছোট পায়ে—
ছোট ছোট পায়ে বাড়ি ফিরলাম।
মনে একটা স্বপ্ন জলছে ;
একটা আলো, একটা ভালবাসার ভাবনা ;
দু'টি চোখ—
আমি কেমন ক'রে বলব, দীপেন,
কেমন করে বলবো।
আমাদের গাঁয়ের মহনা পাড়ার বাঁশঝোপ দেখেছ
তার পাশ দিয়ে মধুমতী নদী,
ঠিক সন্ধ্যাবেলা, মাত্র সন্ধ্যাটি হয়েছে যখন
দুলোছলো নীলাকাশ ক'টি তারা নিয়ে আমাদের
নদীর বুকের কাছে এসে পড়েছে—
সেই কেঁপে-কেঁপে-ওঠা জলের কথাগুলির মত
এক ঝাঁক তারা-কাঁপা ছায়া পড়া মধুমতীর
নদীর মত
ওর দু'টি চোখ।
যেন কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে,
আকাশে তখনও কালো মেঘ এদিক থেকে
ওদিক ছুটেছে ;
'খোকন মেরেছে বলে' গাল ফুলিয়ে
আমাদের খুকুমনি যেমন করে নালিশ করে ;
বৃষ্টি পড়ছে ছোট ছোট কচি পাতার গা গড়িয়ে
ওর চোখ দু'টি, জানো দীপেন,
ওই জল-গড়িয়ে-পড়া কচি পাতার মতো
একটি ফুল সকাল বেলা ফুটেছিল দিঘিটি
বিকেল হতে-না-হতে সব কটা পাপড়ি ঝরে
গেছে :
শুধু ডাগর বোঁটাটা রিক্ত-নিস্ব—
ওর চোখ দু'টি ওই সব হারিয়ে যাওয়া ব্যথার মত
সব পাপড়ি-ঝরা বেদনার মত।
লিখবো তোমাকে কত
জীবনের সব কথা যে মাত্র দু'টি চোখে থাকতে
পারে
আমার জীবনে এই প্রথম তার অভিজ্ঞতা।
প্রথম অভিজ্ঞতা।

বিংশ শতাব্দী

অরুণচন্দ্র চক্রবর্তী

রজনীর শেষ তারা তখনো আকাশে আছে জেগে
আসেনি আলোর বন্যা, খোলেনি ভোরের সিংহদ্বার।
ঘুমন্ত গাছের পাতা, কাঁপেনি ভোরের হাওয়া লেগে,
তোমার সুষুপ্ত দেহ শিহরি উঠিছে বারম্বার।
আকাশে নক্ষত্র কাঁপে, তুমি কাঁপো পালঙ্ক শয়নে,
আধ-বোজা আঁখি তব নিদ নাই আমার নয়নে।

ভোর হয় আনমনে এক কোণে খুঁজে লই ঠাঁই,
তুমিও তোমার মত ব্যস্ত থাকো তোমার সীমায়।
কানে আসে কাতরোক্তি শুধু হায় নাই আর নাই,
আমার ঘর্মাক্ত দেহ আশা হীন আশার জিমায়।
সূর্যেরে প্রণাম করি তুমি যবে আঁখি তুলি চাও
আলোর তরঙ্গ মাঝে আমারে দেখিতে তুমি পাও।

তাম্রদগ্ধ দ্বি প্রহরে ডাকে দূর-নভে শঙ্খচিল,
অরুণ কিরণচ্ছটা স্বপ্ন আনে তব আঁখি ছায়।
আমি ছুটি ঊর্দ্ধ শ্বাসে ঘৌ-চাকে ছুঁড়েছে বুঝি ঢিল,
বিদগ্ধ দেবতা মোর বিকলাঙ্গ দীর্ণ তমিস্রায়।
ইঙ্গিত বুঝিয়া যায়, হে রক্ষিতা ভাগ্য ঠাকুরাণী,
তোমার অস্তিত্ব আছে বুঝি ঘরে হালে পাই পানি।

তখনও নামেনি সন্ধ্যা গোধূলির ঘনাইছে ছায়া,
আকাশে মেলেনি আঁখি দেবকন্যা নক্ষত্র বালিকা।
তোমার নয়নে সাথি প্রধূমিত দুঃস্বপ্নের মায়া,
কপোলে চিন্তার জাল ম্লানমান সিন্দূরের টিকা।
তোমারে ধরিতে গিয়া ফিরে আসি একান্ত একেলা,
আপন নিভৃত কোনে, তুমি শুধু মনে কর খেলা।

রজনী নামিল ধীরে, জনশূন্য হলো রাজপথ,
আমিও তোমার মত ঠাঁই লই শয্যা প্রান্তে তব।
বিক্ষত যৌবন মোর শূন্য করি আহুর আড়ৎ,
ধীরে তোমা কাছে টানি পান করে ভ্রান্তির আসব।
ক্লান্তি নামে শ্রান্ত দেহে বারাঙ্গনা ধরিত্রীর বুকে।
নক্ষত্র চাহিয়া হাসে তব বাতায়নে সকৌতুকে।

তোমারই জন্যে

কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন আকাশে ছিল পূর্ণিমার চাঁদ
জীবন-নদীতে ছিল জোয়ারের বেগ
প্রতি রোমকূপে ছিল বিজয়ের নেশা
তোমাকে পাবার মত উষ্ণ আবেগ

ক্রমাগত খেলে গেছি ভাগ্যের জুয়া
খেলেছি ও হেরে গেছি প্রত্যেক বাজীতে
জানি না আকর্ষণে কোন চুম্বকের
ভলিয়ে চলেছি কোথা দুরন্ত গতিতে

কোথায় মনের সেই সবুজ বন্দর
কোথায় পালালে তুমি শোভন আকাশ
লোপ পেয়ে গেছে আজ বাঁচবার তৃষা
একটুও পাব না কি মিষ্টি বাতাস

হঠাৎ কে এল-এল এক মেয়ে
জীবন্ত জিজ্ঞাসা এক মূর্ত সমারোহ
যৌবন-মাতন জাগা স্নিগ্ধ দুটি হাত
এ চোখে ঘোটাল সে উলঙ্গ বিদ্রোহ

নির্লজ্জ আকাশে প্রশ্ন করি এই ক'াকে
সলজ্জ সে লগ্নটিতে
মহামূল্য বাণী দিতে
পরিপূর্ণ ভালবেসে ফেলেছি কি তাকে ?

তিনটি কবিতা

এজরা পাউণ্ড

স্যাবেট

এসো, আমরা তাদের করুণা করি, যারা আমাদের
চেয়ে সচ্ছল।

এসো, বন্ধু আমার, আর স্মরণ করো
অর্থশালীদের বয়-বাবুর্চি-বেয়ারা আছে, বন্ধু নেই,
আর আমাদের আছে বন্ধু, নেই বয়-বাবুর্চি-বেয়ারা।
এসো, তাদের করুণা করি, যারা বিবাহিত, যারা
অবিবাহিত।

প্রাগৈতিহাসিক এলো এগিয়ে তার ছোট্টো লঘু পায়ে
যেন জরি-জড়োয়ায় এক ঝলোমল পাতলোভা,
আর আমি আমার সব অভীপ্সার উপান্তে।

নেই এক কণাও আশ্চর্যতরো কিছু জীবনের
এর চেয়ে—এই শান্ত শীতল স্বচ্ছ সমাহিতির কালাংশ
এই সময় যখন আমরা পাশাপাশি হাঁটছি।

মেডিটাশিয়ো

আমি যখন কুকুরদের সব অদ্ভুত আচরণগুলো সযত্নে
বিবেচনা করেছি
এ-সিদ্ধান্তে তখন আমি উপনীত হতে বাধ্য
যে, মানুষ উন্নততর ধরণের প্রাণী।

যখন আমি মানুষের সব অদ্ভুত আচরণগুলো ভেবে
দেখেছি
বন্ধু, আমি স্বীকার করবো, আমি তখন দ্বিধাগ্রস্ত
হয়েছি।

ভেনজোল্

জনগণ কি গ্রহণ করবে এদের ?
(মানে, এই সব সঙ্গীতদের)।
একটি নরম ভীরু মেয়ে যেমন সেই অর্ধমানব থেকে
পালাতে চাইবে হাজার হাত ঘুরে, মর্মান্তিক চীৎকার
করে উঠবে ভয়ে,
এরাও ঠিক তারই মতো তেমি
কোমল অনুঢ়া মেয়ের মতো।

কেউ কি এদের ছুঁয়ে দেখবে সযত্ন অনুবেদনায় ?
এদের অপাপবিদ্ধ সরলতা তো প্রয়োজনা, পরীক্ষার
ওপরে।
তোমাদের কাছে নিবেদন, আমার সুহৃদ সমালোচকের।
একটা ভাবকুল, পাঠকমহল সংগ্রহ করতে লেগে
যেয়ো না।
আমার জন্যে।

আমি তো আমার বিমুক্ত আত্মস্থতার সঙ্গে মিলিত হয়েছি
খরখরের তীক্ষ্ণতার সীমান্তে ;
বিধুর নিগূঢ়তার সব অবকাশ
শুনেছে আমার পদপাতের দুরান্ত প্রতিধ্বনি
শীতল হিম আলোয়,
অন্ধকারে।
কুয়েন্দ্র শুধু অনুদিত।

মহেশবাবু—কেন করবো না ? পঁচিশ বছর বয়স হবার আগেই চাকরিতে ঢুকেছি। সকাল দশটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ; কোন কোন দিন রাত্রি আটটা পর্যন্ত অফিসের ঘরের এক কোনে বসে কলম পিষতে হয়। সকাল নটা হলেই সাত তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে দুটো ভাত পুরে দিয়ে ছুটতে হয়। পৌঁছতে এক মিনিট দেরী হলে বড়বাবু বলেন, লেট হলে মাইনে কাটা যাবে।

—এর মধ্যে পাখি কোথায় !

মহেশবাবু—ওই তো, আমি যখন এক মিনিট দেরী হবার ভয়ে ঠিক নটার সময় ট্রাম ধরার জন্য ছাতা বগলে নিয়ে ছুটতে থাকি, তখন দেখতে পাই, পাঁচ-ছটা চড়ুই ছাদের কার্নিশের উপর বসে চোখ বন্ধ করে মনের সুখে ঝিমোয়। কাজের তাড়া নেই পাখিদের। ওরাই সুখী। পাখিদের চাকরী করতে হয় না।

—কিন্তু আপনি তো দুবছর হলো রিটায়ার করেছেন। বিশ্রাম করবার সুযোগ পাচ্ছেন। কাজের তাড়া আর সকাল নটায় অফিসে ছুটবার পালা তো অনেকদিন হলো চুকিয়ে দিয়েছেন।

মহেশবাবু—তা দিয়েছি।

—তবে আজও কেন এতক্ষণ ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে পাখি দেখছেন ?

মহেশবাবু—দেখছি, পাখিরাই সুখী।

—কেন ?

মহেশবাবু বলেন—পাখিদের মেয়ের বিয়ের জন্য চিন্তা করতে হয় না।

নগর ও গ্রাম

সভ্যতার বিশেষ অবস্থায় নগর আপনিই গ্রামের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করে। দেশের প্রাণ যে নগরে বেশি বিকাশ পায়, তা নয় ; দেশের শক্তি নগরে বেশি সংহত হয়ে ওঠে এই তার গৌরব।

সামাজিকতা হোলো লোকালয়ের প্রাণ। এই সামাজিকতা কখনই নগরে জমাট বাঁধতে পারে না। তার একটা কারণ এই যে, নগর আয়তনে বড়ো হওয়াতে মানুষের সামাজিক সম্বন্ধ সেখানে স্বভাবতই আলগা হয়ে থাকে। আর একটা কারণ এই যে নগরে ব্যবসায় ও অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজন ও সুযোগের অনুরোধে জনসংখ্যা অত্যন্ত মস্ত হয়ে উঠে। সেখানে মূলতঃ মানুষ নিজের আবশ্যককে চায়, পরস্পরকে চায় না। এই জন্যে সহরে ও এক পাড়াতেও যারা থাকে তাদের মধ্যে চেনাশুনো না থাকলেও লজ্জা নেই। জীবনযাত্রার জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে এই বিচ্ছেদ ক্রমেই বেড়ে উঠছে।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি নগরগুলি দেশের শক্তির ক্ষেত্র, গ্রামগুলি প্রাণের ক্ষেত্র। আর্থিক, রাষ্ট্রিক বা জনপ্রভুত্বের শক্তি চর্চ্চার জন্য বিশেষ বিধিব্যবস্থা আবশ্যক। সেই বিধি সামাজিক বিধি নয়—এই বিধানে মানবধর্ম্মের চেয়ে যন্ত্রধর্ম্ম প্রবল। এই যন্ত্রব্যবস্থাকে আয়ত্ত যে করতে পারে সেই শক্তি লাভ করে। এই কারণে নগর প্রধানতঃ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র, এখানে সহযোগিতা বুদ্ধি যথোচিত উৎসাহ পায় না।

—রবীন্দ্রনাথ

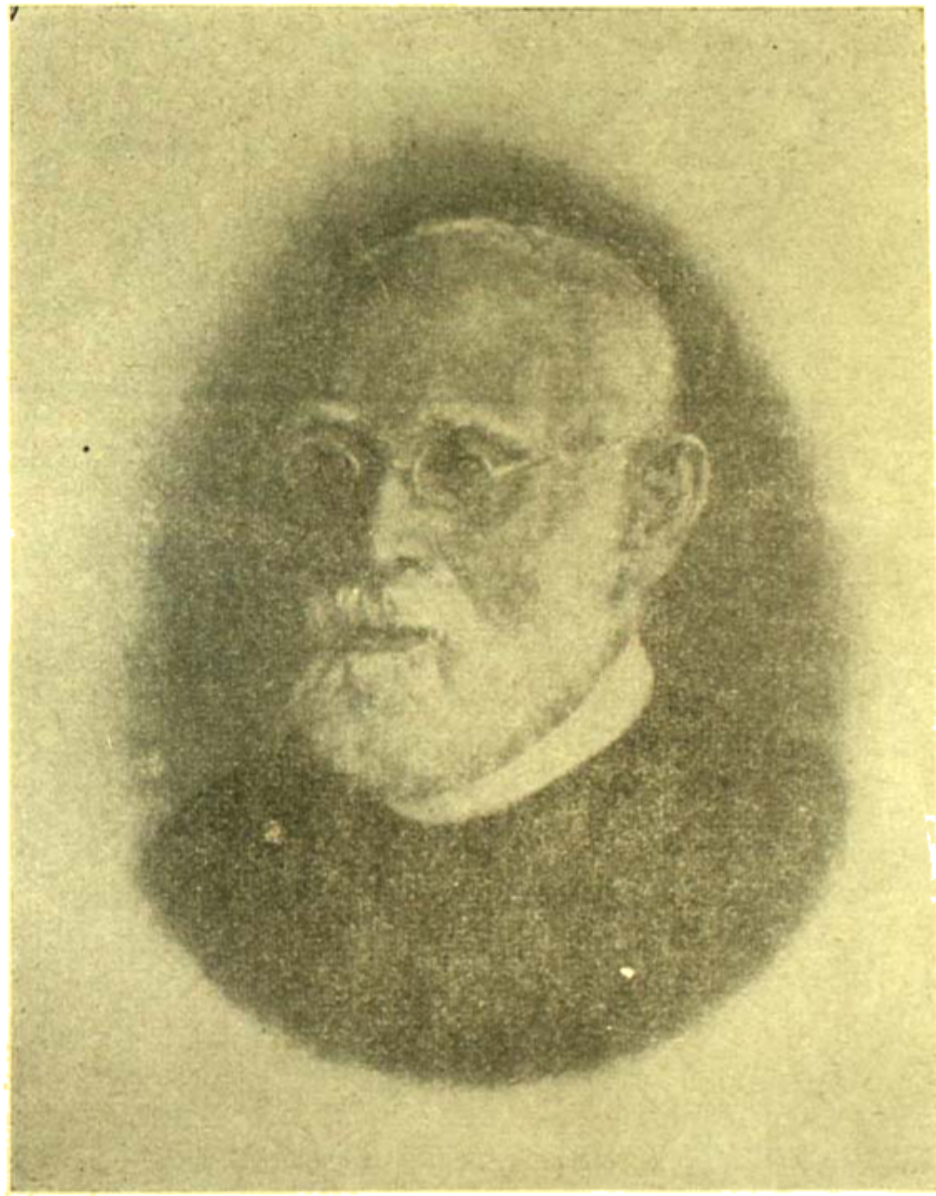

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৪)
প্রধানতঃ ইঁহারই প্রেরণায় ভারত-সভা গঠিত হয়।
সম্পাদক (১৮৮৫-১৯২০); সভাপতি
(১৯২১-১৯২৫—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত)

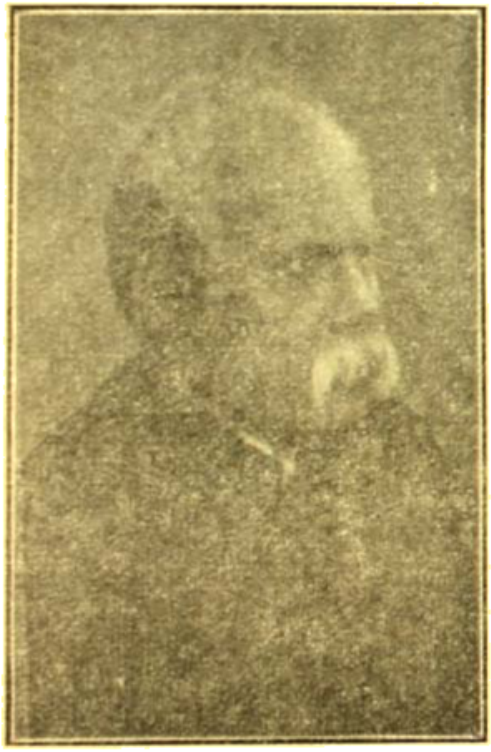

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ; সহকারী সম্পাদক (১৮৮১-১৯২৮)

লালমোহন ঘোষ

(১৮৪৯-১৯০১)

ভারত-সভার পক্ষ থেকে দেশবাসীর প্রতিনিধি হিসাবে

রাজনীতিক আন্দোলনের জন্য বিলাত যান ১৮৭৭ সালে।

শিবনাথ শাস্ত্রী
(১৮৪৭-১৯১৯)
প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য

কৃষ্ণকুমার মিত্র
(১৮৪১-১৯৩৬)
ভারত-সভার-সহিত ঘনিষ্ঠভাবে

রে: কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৮৪৭-১৯০৭)
ভারত-সভার বিবিধ রাষ্ট্র-কর্মের সঙ্গে প্রায়

এ, রসুল
স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ; ৫।৫-সংখ্যার
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ; সহকারী সভাপতি
(১৯১৪, '১৮-'১৯)

আনন্দ মোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬)
ভারত-সভার অন্যতম সংগঠক ও প্রথম সম্পাদক
(১৮৭৬–১৮৮৪); সভাপতি (১৮৯৭-১৯০৬)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১৮)
প্রথম কমিটির অন্যতম সদস্য

ব্লক—ভারত-সভার সৌজন্যে

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান—ভারত-সভা

জানাঞ্জন পাল

ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৬ সালে, ২৬শে জুলাই। সাধারণের জন্য জনসাধারণের নেতাদের দ্বারা এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। বাংলার ভারত-সভা প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫১ সালে; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন প্রধানতঃ জমিদারদেরই সভা। ভারত-সভা সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'এ নেশন ইন্ মেকিং' নামে তাঁর আত্ম-জীবনী গ্রন্থে এই দুই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থার যে পার্থক্য তা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কর্মপন্থায় সাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগাবার কোন চেষ্টা ছিল না। দেশের অভাব অভিযোগ এদেশে বা বিলাতে গভর্ণমেণ্টের নিকট যথাযথভাবে জানালেই তাঁরা নিজেদের রাজনীতিক দায়িত্ব পালিত হ'ল বলে মনে করতেন। দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সাধারণের সঙ্গে এঁদের তেমন যোগ ছিল না, যোগ স্থাপনের কল্পনাও এঁদের ছিল না। সুতরাং একে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান বললেও গণতান্ত্রিক রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান, এ কথা বলা যায় না। ভারত-সভাই এদেশে সর্বপ্রথম এই দাবী করতে পারেন।

প্রায় সমসাময়িককালে বম্বে ও মাদ্রাজেও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপিত হয়। পুণায় সার্বজনিক সভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭০ সালে। ইহা মারাঠিদের প্রতিষ্ঠান। বম্বে নগরে বম্বে প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হয় আনুষ্ঠানিকভাবে ১৮৮৫ সালে, কংগ্রেসের জন্মের সময়ে। এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তেলাঙ্, টায়েবজি ও ফেরোজা। ১৮৫২ সাল থেকে দাদাভাই নৌরজী প্রমুখের চেষ্টায় এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টা হ'তে থাকে। ঐ সালে বম্বে এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৯ সালে বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনের এক শাখা বোম্বাই নগরে স্থাপিত হয়—মূলতঃ দাদাভাই নৌরজীর চেষ্টায়। এই সকল পূর্ব-চেষ্টার ফলেই বম্বে প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েসন জন্মগ্রহণ করে।

মাদ্রাজ মহাজন সভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৪ সালে। এই সকল প্রতিষ্ঠান সাধারণভাবে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান হলেও ভারত-সভার মর্যাদা দাবী করতে পারেনি। ভারত-সভা বাংলার শিক্ষিত সাধারণের প্রথম গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র ছিল না, আদর্শে ও কর্মসূচীতে ইহা সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল। ভারত-সভা তদানীন্তন কালের শ্রেষ্ঠ বাঙালীদের দ্বারা গঠিত হলেও সত্য অর্থে সারা ভারতের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—অন্য প্রতিষ্ঠানগুলি মূলতঃ প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান ছিল।

ভারত সভার প্রতিষ্ঠায় যাঁরা

নামের মোটামুটি তালিকা এই :—

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু (সম্পাদক), শ্যামাচরণ সরকার, মনোমোহন ঘোষ, নবাব মির মহম্মদ আলি, রাজনারায়ণ বসু, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণবিহারী সেন, (সম্পাদক, ইণ্ডিয়ান মিরর), হরমোহন [illegible] (সম্পাদক, 'ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান হেরাল্ড), নবগোপাল মিত্র (সম্পাদক, 'ন্যাশন্যাল পেপার'), নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক, 'ভারত সংস্কারক) ভোলানাথ চন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, যোগেন্দ্র নাথ [illegible], (সম্পাদক, 'অবোধবন্ধু'), অক্ষয় চন্দ্র সরকার (সম্পাদক, 'সাধারণী'). শেষোক্ত ৩'জন প্রথম সহকারী সম্পাদক ছিলেন; আর সভাপতি ছিলেন ৺ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

সুরেন্দ্রনাথের মতে ভারত-সভা প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল :—

দেশের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগ্রত করা ;

(২) ভারতের বিভিন্ন জাতি ও অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ এক—এই বোধের ভিত্তিতে সকলকে এক সূত্রে বাঁধা ;

(৩) হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন ; এবং

আমাদের দেশের জনসাধারণকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া।

এই মহৎ উদ্দেশ্য ও উহার কর্মপদ্ধতিকে কাজে পরিণত করার চেষ্টার ত্রুটী হয়নি। শিবনাথ শাস্ত্রী ভারত-সভার কাজ সম্বন্ধে তাঁর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" গ্রন্থে লিখেছেন :—

"দুইজন প্রতিভাশালী নেতা, সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দ মোহন আসিয়া এই সময়ে (১৮৭৬-৭৬ সালে) বঙ্গের রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। ইঁহারা দুইজনেই ছাত্রদলের মধ্যে কাজ আরম্ভ করিলেন। হাজার হাজার যুবক ইঁহাদের কথা শুনিবার জন্য ছুটিতে লাগিল ; এবং হাজার হাজার হৃদয়ে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ও স্বদেশানুরাগ প্রবল হইয়া উঠিল।

"যুবকদল রাজনীতি ও জাতীয় উন্নতির দিকে মুখ ফিরাইল।

"যখন ছাত্রদল এই সকল আন্দোলনে আন্দোলিত, তখন এক মহৎ কার্যের সূত্রপাত হইল। তাহা ভারত-সভা স্থাপন (১৮৭৬ সাল)। বঙ্গদেশের সাময়িক ইতিবৃত্তে সে একটা স্মরণীয় দিন।

"আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীনে ভারত-সভা একটি মহৎ কাজ করিতে লাগিলেন। কয়েকজন ভ্রমণকারী বক্তা নিযুক্ত করিয়া স্থানে স্থানে সভা করিয়া বক্তৃতা করাইতে লাগিলেন। এই ভ্রমণকারী বক্তাগণ সর্বদা ভারত-সভার দিকে সমাবিষ্ট শ্রেণীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজনীতির চর্চা যে হাতের ছিল না, সেই চর্চাতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন।"

ভারত-সভা প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শাসনের আসল রূপ অনেকটা খুলে যায় কয়েকটি ঘটনায়। এই সময় ভারতীয় সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষা দেবার বয়স ২১ থেকে ১৯ বৎসরে নামিয়ে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য এদেশের মেধাবী ছাত্রেরা যাতে এই পরীক্ষার সুযোগ সহজে না নিতে পারে। ১৮৭১ সালে একসঙ্গে তিনজন বাঙালী এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হ'ন—বিহারীলাল গুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সিভিল সার্ভিসই ইংরেজের স্বার্থে ও প্রধানতঃ ইংরেজ রাজকর্ম-চারীর পরিচালনায় এদেশ শাসন করবে—এই গূঢ় অভিপ্রায় বিফল হয়ে যায় যদি প্রতিভাবান এ দেশীয় যুবকেরা বেশী পরিমাণে এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে এই সকল পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এতে বাধা সৃষ্টি করাই এই নতুন নিয়মের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের ভার নিলেন ভারত-সভা। সুরেন্দ্রনাথ এই প্রথম রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নায়করূপে সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করলেন ; নগরে নগরে জনাকীর্ণ সভায় তাঁর উদ্দীপনাময় বক্তৃতায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব রাজনীতিক চেতনা জেগে উঠল। ভারত-সভা অর্থ সংগ্রহ করে লালমোহন ঘোষকে বিলেত পাঠালেন ভারতের প্রতি এই অবিচারের কথা সেখানকার জনসাধারণের জানাতে। ভারত-সভার চেষ্টা অনেকটা সফল হ'ল—সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার কতকটা অনুরূপ ব্যবস্থা এদেশে করে স্থির হ'ল—এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এ দেশীয়েরা উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হ'তে পারবেন।

১৮৭৮-৭৯ সালে ইংরেজ আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু তার ব্যয়ভার এদেশের উপর চাপান হয়। দেশে যখন নানাকারণে দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া, তখন অসময়ে অযথা ইংলণ্ডের রাণী ভারতেশ্বরী বলে ঘোষিত হ'ল। দেশে যে রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগছিল, বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে তা তীক্ষ্ণ প্রতিবাদের ভাষায় ফুটে উঠে। "অমৃতবাজার পত্রিকা" তখন যশোহরের গ্রাম থেকে বাহির হ'ত বাংলা সাপ্তাহিকরূপে। "সাধারণী" বাহির হ'ত চুঁচুড়া থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্য ও সহকারী অক্ষয়চন্দ্র

সরকারের সম্পাদনায়। কলিকাতার কাছে হরিনাভি থেকে প্রকাশিত হ'ত সেই সময়ের বিখ্যাত সাপ্তাহিক "সোমপ্রকাশ"। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তার সম্পাদক; শিবনাথ শাস্ত্রীর তিনি মাতুল; শাস্ত্রী মহাশয়ের বলিষ্ঠ লেখনীতে তা পুষ্ট। এ ছাড়া ঢাকার "ঢাকাপ্রকাশ", বৈষ্ণবসিংহের "ঢাকমিহির" প্রভৃতির যশ ও প্রভাব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। এই সকল পত্রিকার নির্ভীক সমালোচনায় ইংরেজ ভয় পেল। দেশীয় ভাষার কাগজ-গুলির মুখ বন্ধ করার জন্য তাড়াতাড়ি প্রেস আইন জারী হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের প্রতি জ্বালা যাতে জ্বলে না উঠে, তার জন্য জারী হ'ল অস্ত্র-আইন। অস্ত্র-ব্যবহার সাধারণের জন্য নিষিদ্ধ হ'ল।

ভারত-সভা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করলেন। কলিকাতায় বিরাট সভা হ'ল। অভিজাত শ্রেণীর যারা তাঁরা এ সভা ও আন্দোলন থেকে দূরে রহিলেন। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব সম্পূর্ণভাবে চলে গেল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হাতে। সুরেন্দ্রনাথ তাঁদের নায়ক, আর ভারত-সভা তাঁদের প্রতিষ্ঠান। কয়েক বৎসর পরে বড়লাট রিপণের আমলে (১৮৮২ সালে) অনেকটা ভারত-সভার আন্দোলনের ফলেই দেশীয় ভাষায় লিখিত সংবাদপত্র সম্বন্ধে এই আইন তুলে নেওয়া হ'ল।

ভারত-সভার উদ্দেশ্য কেবল ইংরেজের অন্যায়ের প্রতিবাদ করা ছিল না। দেশকে একতার সূত্রে বাঁধা তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। ১৮৮৩ সালে ভারত-সভার চেষ্টায় প্রথম জাতীয় সম্মেলন কলিকাতায় আহূত হয়। বাংলা ও উত্তর ভারতে ভারত-সভার অনেকগুলি শাখা স্থাপিত হয়েছিল ইতিমধ্যে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে প্রতিনিধিরা এসে মিলিত হলেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে রাষ্ট্রনীতিক চিন্তা, আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি এক সূত্রে গাঁথা। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ও ভারত-সভার চেষ্টায় ১৮৮৫ সালে এই জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় কলিকাতাতেই। ঠিক সেই সময়েই বম্বেতে ভারতের জাতীয় মহাসমিতির জন্ম হয়। কলিকাতার এই দ্বিতীয় সম্মেলন প্রথমবার অপেক্ষাও বেশী সার্থক হয়, মুসলমান নেতারা ও অভিজাত জমীদারশ্রেণীর প্রতিনিধিরাও দেশপ্রেমের আকর্ষণে এতে এসে যোগ দেন। বিভিন্ন অঞ্চলের ত্রিশটিরও বেশী রাষ্ট্রীয় সমিতি এই সম্মেলনে যুক্ত হ'ল। তিনদিন ধরে এই সম্মেলন হয়। যেসব বিষয় এই সম্মেলনে আলোচিত হয় তার উল্লেখ থেকে ভারত-সভার রাষ্ট্রীয় কর্মচেষ্টার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম, আইন-সভাগুলিতে দেশের জনগণের মত যাতে অভিব্যক্ত হয় তার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়, অস্ত্র-আইন রদ করা; তৃতীয়, গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ভার কমান; চতুর্থ, নিরপেক্ষ বিচারের ব্যবস্থার জন্য দেশের শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ পৃথক করা। পঞ্চম প্রস্তাবে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট কর্তৃক একটা সর্বাঙ্গীন অনুসন্ধানের যে প্রস্তাব সে সময়ে হয়েছিল, তাকে সমর্থন করা হয়।

ভারত-সভা জনগণের স্বার্থে শুধু নয় জনগণের সঙ্গে কাজ করতে আরম্ভ করেন। রায়তদের ভোগ দখল সম্বন্ধে নতুন আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সময় ভারত-সভা রায়তদের অধিকার সম্বন্ধে তাঁদের সজাগ করতে চেষ্টা করেন। নদীয়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণার রায়তদের সভা আহ্বান করা হয়। সহস্র সহস্র চাষী এই সকল সভায় যোগদান করেন। মেহেরপুরে (নদীয়া) এক সভায় চার হাজার লোকের উপর চাষী উপস্থিত ছিলেন। এই আন্দোলনে জমীদার ও পুলিসের বিরোধিতা কম ছিল না। ভারত-সভাকে এই সময় কেউ কেউ রায়ত-সভা বলতে আরম্ভ করেন। ভারত-সভার ১৮৭৮-৭৯ সালের বিবরণীতে দেখা যায় যে তাঁরা সাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই দেশের শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য চেষ্টিত হয়েছেন। এঁরা বলেন:—"ভবিষ্যতের সব চাইতে বড় প্রশ্ন সাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা ভারতের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গঠন। একাজ যেমন কঠিন তেমন সময়-সাপেক্ষ। দেশের শিক্ষিত জনসাধারণকে এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ইংলণ্ডের উন্নতমনা লোকদের মধ্যেও এবিষয়ে আন্দোলন করতে হবে।" অবশ্য, ইংরেজের সহযোগিতার আশা এদের সফল হয়নি; স্বেচ্ছায় ইংরেজ তার স্বার্থ ও সুবিধা ছাড়েনি।

পরে আইন-সভার এসেম্বলিরা কিছু আসন পেলেও ক্ষমতা বিশেষ পায়নি। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্ম-জীবনীতে এদের সম্বন্ধে এই উল্লেখ করেছেন :—

"আমরা ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত সভা হতে কেবল চাইনি, তাতে কিছুটা ভারতীয় ছাপ মাত্র এতে পড়ত ; কিন্তু আমরা চেয়েছি এই দেশের শাসন ব্যবস্থাকে ক্রমে আমাদের আয়ত্তে আনতে, যাতে পরিণামে এ সম্পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হয়।"

কংগ্রেসের জন্মের পর সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারত-সভা তার মহাসম্ভাবনার আদর্শ ও কর্মের মধ্যে নিজেদের কর্মচেষ্টাকে মিশিয়ে দেয়। সে কাহিনী সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। তার কথা বেশী এখানে বলবার প্রয়োজন নেই ভারত-সভার বিশিষ্ট লক্ষ্য ও কাজ সম্বন্ধে কেবল সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করা যাইতেছে।

কংগ্রেসের আগে ও কংগ্রেসের জন্মের পরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত-সভা সর্বদা চেষ্টা করেন।

রাষ্ট্রীয় জীবনে হিন্দু ও মুসলমানের পার্থক্য ভারত-সভা কখনও স্বীকার করেননি। ভারত-সভার জন্মের অল্প পরে ১৮৭৮ সালে সুরেন্দ্রনাথ 'ভারতের ঐক্য' বা ইংরেজীতে "Indian Unity" সম্বন্ধে এক বক্তৃতায় বলেন :—

"ভারতবর্ষে বহু জাতির, বহু ভাষার ও বহু ধর্মের লোক বাস করে ; কিন্তু তাদের মধ্যে আন্তরিকতার বন্ধন বা নীতি ও আদর্শের ঐক্য কি অসম্ভব ? আমি মনে করি তা সম্ভব—শুধু তাই নয় চিন্তার নয়—বাস্তব জীবনে। পৃথিবীর ইতিহাসেও এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ভাষা ও ধর্মের পার্থক্য সত্ত্বেও সুইজারল্যাণ্ড ঐক্যবদ্ধ এক দেশ ; বেলজিয়মের এক ও অখণ্ড দেশ ভাষা ও ধর্মের বিভিন্নতা সত্ত্বেও। জার্মানিও তাই জার্মানিদের ধর্ম নিয়ে কম দ্বন্দ্ব নেই। ইতালি একতাবদ্ধ হয়েছে তার বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও।

"প্রতি জাতির জীবনে এমন এক সময় আসে যখন এক বিশিষ্ট আদর্শের প্রেরণা তার সমগ্র জীবনকে অধিকার করে। ভারতের জাতীয় জীবন এখন এক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে। সে আদর্শ রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি।

"দেশের অগ্রগতির এই আদর্শকে আমরা মনপ্রাণ দিয়ে যেন গ্রহণ করে নিতে পারি। আমাদের এই নতুন পতাকার সব চাইতে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা হবে—"ভারতের ঐক্য।"

সুরেন্দ্রনাথের এই মহান্ আদর্শের প্রেরণা ভারত-সভার সর্ব কর্মের মধ্যে চিরদিন যুক্ত নিহিত ছিল।

এ ছাড়া চারটি বিশেষ কাজ ভারত-সভা কংগ্রেসের প্রথম জীবনে করেন।

এক, আসামে চা-বাগানের "কুলীদের" উপর অত্যাচার বন্ধ করা ও তাদের দুর্দশার প্রতীকারের চেষ্টা করা। ১৮৮৬ সালে ভারত-সভার অক্লান্ত-কর্মী ও সহকারী সম্পাদক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী আসামের চা-বাগানের মজুরদের অবস্থা দেখবার জন্য নিজে চা-বাগানগুলিতে যোরেন। প্রত্যক্ষ-দর্শীর যে জ্বালাময় বিবরণ "সঞ্জীবনী" প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হ'তে আরম্ভ করে, তার ফলে চা-কর্মীদের অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়।

দুই. প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি ও সম্মেলন গঠন

বাংলার প্রথম রাষ্ট্রীয় সমিতি বা প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৮৮৮ সালে।

তিন, ১৯০৫-১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ।

চার, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যাতে সম্প্রীতির ভিত্তিতে স্থায়ী ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য আন্দোলন ও চেষ্টা : সব বাঙ্গালীকে এক প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে রাখতে ভারত-সভা যেমন চেষ্টা করেন, তেমনই আসামের সঙ্গে যুক্ত যেন পৃথক বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ গঠনে। এই শেষোক্ত চেষ্টার ফলেই ১৯১১ সালে পৃথক বিহার প্রদেশ গঠিত হবার সুযোগ পায়।

কিন্তু ভারত-সভার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা—সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও প্রাদেশিক সদ্ভাব বাড়ান—ইংরেজের ভেদনীতিতে অনেকটা বিফল হয়ে যায়। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধে দেশ ভাগ হয়ে যায় ; বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগেও অর্থনৈতিক ঐক্যও ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও প্রাদেশিক অসম্প্রীতির ফল যে কত বিষময় হয়, তা এখনকার জীবনে প্রতিদিন প্রমাণিত হচ্ছে।

MACHINERY for

দিয়াশিলাই কুটির-শিল্পের সাহায্যার্থ ভারত সরকার প্রতি গ্রোসে নয় আনা excise rebate দিতেছেন। তার সুযোগ গ্রহণ করে গ্রামে দিয়াশিলাই কারখানা গড়ে তুলুন। বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন।

STANDARD MACHINERY CO.

67B, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA-1

Regd. No. September-October 1956 প্রতি সংখ্যা আট আনা

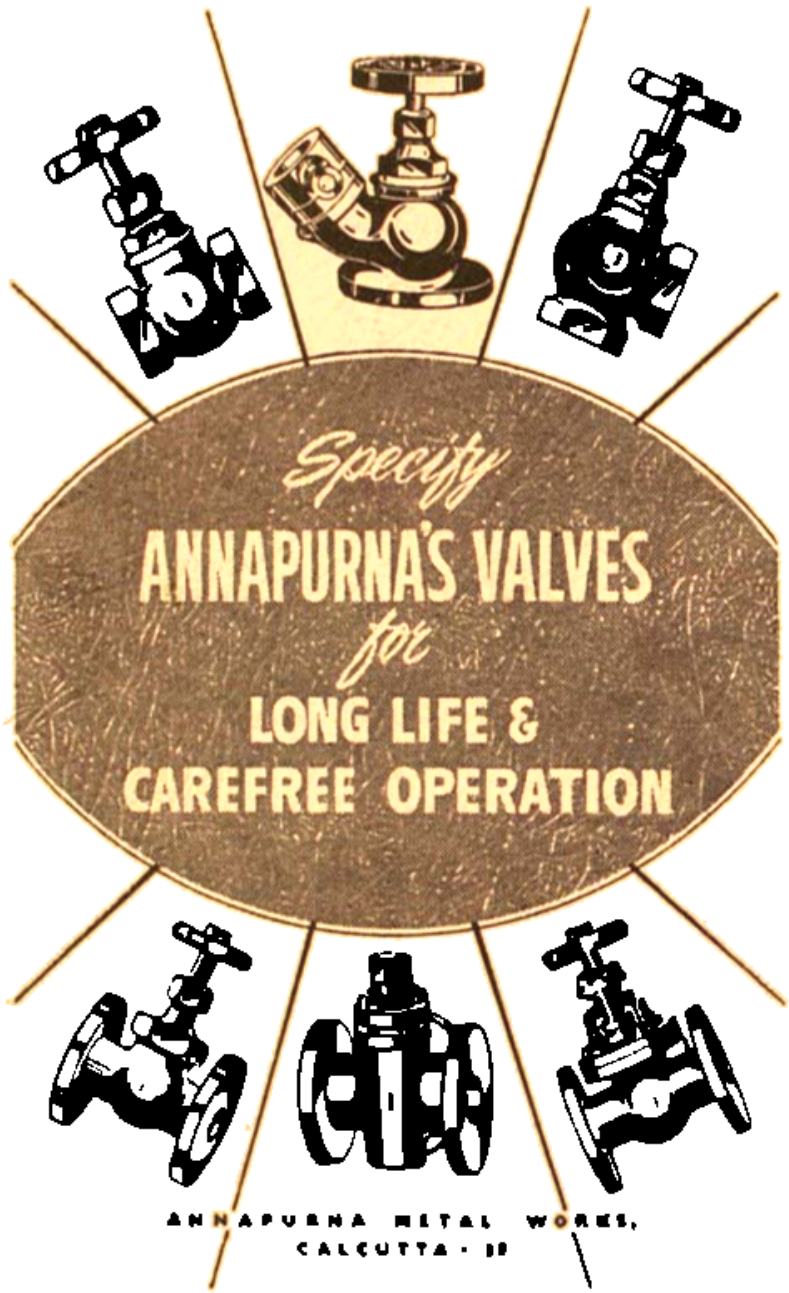

নারায়ণ পাল কর্তৃক ৬১এ, বলরেওপাড়া রোড, কলিকাতা-৬ নিউ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোঃ প্রাইভেট লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও ৮৪ নং মনোহর পাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—জামাতন পাল।

চতুরঙ্গ

এই সংখ্যায় :

- বিপিনচন্দ্র পাল—বৈষ্ণব কবিতার কথা
- আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সংস্থা
- বাংলায় নবজাগরণ—রামমোহনের যুগ
- নারীর সৌন্দর্য
- আলোকচিত্রের ভাষা
- পশ্চিমবঙ্গ ও সন্নিহিত রাজ্যগুলি
- কিশোর ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিচালনার উপকরণ

প্রভৃতি

পঞ্চম সংখ্যা কার্ত্তিক ১৩৬৩

॥ সূচীপত্র ॥

বৈষ্ণব কবিতার কথা—বিপিনচন্দ্র পাল

আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সংস্থা—অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

রামমোহনের যুগ (১৮১৪-১৮৩৩)—জ্ঞানাঞ্জন পাল

নারীর সৌন্দর্য—ডাঃ রবীন্দ্রকুমার পাল

কয়েকখানি চিঠি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল

বৈদিক যুগে নারী—শ্রীমতী মিনু ঘোষ

আলোক চিত্রের ভাষা—পুলিন বিহারী চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গ ও পরিহিত রাজ্যগুলি—অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ও শ্রীমতী মিনু দেবী

বরপ্রয়াগ (গল্প)—অমিয় ভট্ট

গানের গান—জয়দেব রায়

ছোটদের সাহিত্য জগৎ—অশোক সেন

কবিতা—

প্রজাপতী ঘটক—প্রদ্যুম্ন মিত্র

সে—নচিকেতা ভরদ্বাজ

কিশোর ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিচালনার উপকরণ - যুব পরিষদ

॥ পাদপূরণ ॥

বিজ্ঞানে ভারতের দান—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

নবযুগের উৎসব—রবীন্দ্রনাথ

বাংলা ও উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক যোগ—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

॥ পত্রিকা সম্বন্ধে ॥

যুগযাত্রীর বার্ষিক সডাক মূল্য ছ'টাকা। আষাঢ় থেকে বর্ষ সুরু। সব বিষয়ের মৌলিক রচনাই আমরা সাদরে গ্রহণ করব। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে লিখে সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন। অমনোনীত রচনা উপযুক্ত ডাকটিকিট ও ঠিকানা দেওয়া থাকলে যথাসময়ে ফেরৎ দেওয়া হয়। পত্রিকায় সমালোচনার জন্য দু'খানা করে বই সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন। চিঠিপত্র ইত্যাদি সম্পাদকীয় কার্যালয়ে প্রেরিতব্য। নীচে বিজ্ঞাপনের হার দেওয়া হ'ল।

কভার	৪র্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০৲	ভিতরে	পূর্ণ পৃষ্ঠা	৩০৲
ঐ	২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা	৪০৲	ঐ	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৮৲
ঐ	১ম অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	২৫৲	ঐ	সিকি পৃষ্ঠা	১০৲

সম্পাদকীয় কার্য্যালয়

৪১-এ, বলদেওপাড়া রোড,

কলিকাতা-৬

ফোন : বড়বাজার ৩৭৩২

কৃত্তিবাস

প্রথম বর্ষ | কার্ত্তিক ১৩৬৩ | পঞ্চম সংখ্যা

বৈষ্ণব কবিতার কথা

বিপিনচন্দ্র পাল

বৈষ্ণব কবিতার প্রধান গুণ ইহাদের মানুষী ভাব। সাধারণ লোকে, এমন কি বৈষ্ণব সাধকেরা পর্য্যন্ত এই সকল পদাবলীর মধ্যে দেবতার লীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন, ইহা জানি। কিন্তু এই দেবতাও যে মানুষ, একথা পাঠকেরা বিস্মৃত হইলেও, শ্রেষ্ঠতম বৈষ্ণব কবিরা কখনও ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। অথবা যিনি যখনই সেখানে এটি ভুলিয়া গিয়াছেন, তখনই সেইখানে তাঁহার কবিতায় গুরুতর রসভঙ্গ হইয়াছে।

এইজন্য মহাজন পদাবলী পড়িতে বসিয়া, সকলের আগে শ্রীকৃষ্ণ যে এই কথাটি ভুলিয়া যাইতে হইবে। বৃন্দাবনলীলা যে নরলীলা, বৃন্দাবনের সকলেই যে মানুষ—তোমার আমার মতন মানুষ, তোমার আমার মতন সুখদুঃখের অধীন, তোমার আমার মতন মায়ামমতায় আবদ্ধ—ইহা যারা বুঝে না বা বুঝিয়াও ভুলিয়া যায়, অথবা এই নরলীলাকে যারা একটা অতিপ্রাকৃত ঐশ্বরিক ব্যাপার বলিয়া মনে করে, তাদের পক্ষে মহাজন-পদাবলীর নিগূঢ় রস নিঃশেষে আস্বাদন করা আদৌ সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

বৈষ্ণব মহাজনেরা মাধুর্য্যের সাধক। আর বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বারেবারে বলিয়াছেন যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের উন্মেষমাত্র মাধুর্য্য রস একেবারে উবিয়া যায়। ঈশ্বর-ভাবই ঐশ্বর্য্য। শ্রীকৃষ্ণকে যে ঈশ্বর মনে করিবে, সে কৃষ্ণলীলার মাধুর্য্য কদাপি আস্বাদন করিতে পারিবে না। সে একটা ভ্রম কল্পনা করিয়া লইবে। বন্ধ্যা যেমন পুত্রস্নেহ কল্পনা করে, সেইরূপ সে একটা নিতান্ত মনগড়া সম্বন্ধের আশ্রয়ে এই লীলারস আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিবে। এইরূপ কল্পনাবলেও তার পুলকাদ্যা প্রভৃতির সঞ্চার হইতে পারে। কিন্তু এ সকল বিকার শারীরিক, সাত্ত্বিক নহে। খোলে চাঁটি পড়িলেই কাহারও কাহারও পা নাচিয়া উঠে, এক নাচা; আর অন্তরের ভাবোচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া, সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তাহাকে ছড়াইয়া দিয়া, তাহাদের চঞ্চল করিয়া নৃত্যশীল হওয়া অন্য কথা। একটা সাধারণ স্নায়বীয় উত্তেজনা

যায়, আর একটা ভাবের তরঙ্গভঙ্গ। সেইরূপ কেবল কথায়, কেবল ছন্দে, কেবল ঝঙ্কারে, কেবল সুরে, অথবা কেবল একটা অলীক মানস-কল্পনাবলেও পুলকাদি প্রভৃতির উদ্রেক হইতে পারে। ইহার সঙ্গে সত্য রসানুভূতির কোনও সম্বন্ধ নাই। সাধারণ লোকে, এমন কি অনেক গতানুগতিক তিলককণ্ঠিধারী বৈষ্ণব পর্যন্ত, এই ভাবেই মহাজন পদাবলীর রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। আর এই সকল অলীক ভাব-প্রবণ লোকের হাতে পড়িয়াই মধ্যযুগের অমূল্য পদাবলী সকল আপনার যথার্থ প্রাপ্য মর্য্যাদা হারাইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা মানুষই হউন আর ঈশ্বরই হউন, বৈষ্ণবপদকর্ত্তাগণ ইহাদিগকে মানুষরূপেই আঁকিয়াছেন। আর বৈষ্ণব সিদ্ধান্তেও শ্রীকৃষ্ণকে মানুষরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; ইহাই আমাদের বাঙ্গালার বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের বিশেষত্ব। অন্যান্য প্রদেশের বৈষ্ণব-তত্ত্বের কথা বেশী কিছুই জানি না; কিন্তু মহাপ্রভু যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে মানুষরূপেই দেখিতে পাই। বাঙ্গালার বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিতেই যেন কুণ্ঠিত হয়, এমন মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন, কিন্তু অবতারী। তিনি অবতার করেন, তিনিই অবতারী। সৃষ্টি ও স্রষ্টাতে যে পার্থক্য, অবতার ও অবতারীতে সেই পার্থক্য। আর অবতারী বলিয়াই বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা বলেন—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" আর তাঁরা ইহাও বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের যে নররূপের বর্ণনা ভাগবতাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মায়িকও নয়, আকস্মিকও নয়, কিন্তু তাঁর নিত্য-স্বরূপ। এই নিত্য-স্বরূপে ভগবান দ্বিভুজ, "ন কদাচিৎ চতুর্ভুজঃ"। তাঁর চতুর্ভুজ ষড়ভুজাদি রূপই বস্তুতঃ মায়িক, ভক্তের তৃপ্তির জন্য তিনি এসকল অমানুষী ঐশ্বরিক রূপ ধারণ করেন। দ্বিভুজ মুরলীধর রূপই তাঁর স্বরূপ। এই রূপই তাঁর নিত্যরূপ।

আর নররূপই যদি তাঁর নিত্যরূপ হয়, তবে মানব-ধর্ম্মও তাঁর নিত্যধর্ম্ম হইবেই হইবে। রূপে আর গুণে তাঁর মধ্যে ত কোনও বিরোধ বা অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে না; তাহা হইলে তাঁর ভগবত্ত্ব ও পূর্ণত্ব নষ্ট হইয়া যায়। নররূপ যেমন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ রূপ, নরধর্ম্ম এবং মানবপ্রকৃতিও সেইরূপ তাঁর নিত্যসিদ্ধ। রূপে ও গুণে সকল দিক দিয়াই তিনি মানুষ। তবে এই মানুষ অপূর্ণ, তিনি পূর্ণ; এই মানুষ রূপ ও মানুষী প্রকৃতি বিকাশধারাতে ভিলে ভিলে ফুটিতেছে, তাঁর মধ্যে এ সকল নিত্যকাল প্রস্ফুট হইয়াই আছে। আমাদের নররূপ ও নরপ্রকৃতি পরিণামী, তাঁর নররূপ ও নরপ্রকৃতি নিত্যসিদ্ধ। আর আমাদের এই অপূর্ণতাই তাঁর ঐ পূর্ণতার প্রমাণ প্রদান করে। আমরা যে এখানে ভিলে ভিলে ফুটিয়া উঠিতেছি, তাহা হইতেই কোথাও যে আমাদের এই মানবতা নিত্যকাল প্রস্ফুট হইয়া আছে, ইহা বুঝিতে পারি। আমাদের রূপ লালসা ঐ রূপকেই নিয়ত খুঁজিয়া বেড়ায়। আমাদের অন্তরে গুণের প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তাহাও ঐ অনন্ত গুণাধারকে অন্বেষণ করে। এই সকল ইন্দ্রিয়, এই মন, এই বুদ্ধি, এই আত্মা, এই সর্ব্বস্ব আমাদের, সেই নরোত্তম ও পুরুষোত্তমেরই জন্য নিয়ত পিপাসিত হইয়া, তাঁহারই প্রতিষ্ঠা করে। আর বৈষ্ণব মহাজন-পদাবলীর সত্য রস আস্বাদন করিতে হইলে, শ্রীকৃষ্ণকে এই নরোত্তম ও পুরুষোত্তম রূপেই দেখিতে হইবে।

নর আর নরোত্তম, পুরুষ আর পুরুষোত্তম, সজাতীয়, সমানধর্ম্মী বস্তু। এই নরের মধ্যেই ঐ

নরোত্তম, এই পুরুষের ভিতরেই ঐ পুরুষোত্তম রহিয়াছেন। আবার ঐ নরোত্তমের মধ্যেই এই নর, ঐ পুরুষোত্তমের ভিতরেই এই পুরুষ রহিয়াছে। এইজন্য নর নরোত্তমকে চেনে বুঝে, অন্ত করিয়া ভালবাসে। যে যা নয়, সে তাহা জানে না, জানিতে পারে না; বুঝে না, বুঝিতে পারে না। আমরা মানুষ। যে ঈশ্বরে কোনও মানুষী ভাব ও মানুষী ধর্ম্ম নাই, আমরা তাঁকে কখনওই জানিতে ও ভজনা করিতে পারি না। ভাবের ঐক্য ব্যতীত ভজনা হয় না। ঈশ্বরের ভজনা করিতে হইলে হয় ঈশ্বরকে মানুষ হইয়া নামিয়া আসিতে হয়, না হয় মানুষকে ঈশ্বর হইয়া উঠিয়া যাইতে হয়। খৃষ্টীয় সাধনা ঈশ্বরকে নামাইয়া আনিয়া তবে তাঁর ভজনা সম্ভব করিয়াছে। আমাদের দেশের বৈদান্তিক সাধনা অন্যদিকে মানুষকে ব্রহ্ম করিয়া উপরে তুলিয়া ব্রহ্মেতে যুক্ত করিয়া দিয়াছে। ঈশ্বরকে নামাইয়া আনিয়া মানুষ করিলে তাঁর ঈশ্বরত্ব নষ্ট হয়, মানবত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। ঈশ্বরের এই মানবত্ব সত্য না আরোপিত, এই প্রশ্ন উঠে। ঈশ্বর আর মানুষ যদি পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী হন, অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতে যাহা মানুষ নয়, আর মানুষ বলিতে যাহা ঈশ্বর নয়, যদি ইহাই বুঝি, তাহা হইলে ঈশ্বর কখনও সত্যভাবে মানুষ হইতে পারেন না। আমাদের বৈদান্তিকেরা এইজন্য ঈশ্বরের মানবত্ব-স্বীকারকে মায়িক বলিয়াছেন। খৃষ্টীয়ান ইতিহাসেও এরূপ মায়াবাদী সিদ্ধান্তের উল্লেখ আছে। একদল প্রাচীন খৃষ্টীয়ান যিশুখৃষ্টের নরলীলাকে real নয়, apparent মাত্র বলিয়া মনে করিতেন। আমাদের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রচলিত অবতারবাদের এই স্ববিরোধিতা খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁরা বলেন—ঈশ্বরই মানুষ, নিত্যসিদ্ধ মানুষ, গূঢ়ং পরব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং, পরব্রহ্মের বা পরমতত্ত্বের (বা Ultimate Realityর) নিগূঢ় স্বরূপ মনুষ্যলিঙ্গ বা মনুষ্যাকৃতি বা নররূপ। এই নররূপ তাঁর নিত্যসিদ্ধ রূপ। এইজন্যই তিনি নিজস্ব রূপে নরোত্তম বা পুরুষোত্তম।

কিন্তু আমাদের বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত শ্রীকৃষ্ণকে কেবল নরোত্তম বা পুরুষোত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। তিনি নরোত্তম বা পুরুষোত্তমরূপেই আবার নিখিলরসামৃতমূর্ত্তি, যাবতীয় রসের ও সমুদয় অমৃতের মূর্ত্তি। রসবস্তু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ নয়, আন্তরিক অনুভবের দ্বারাই কেবল ইহাকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। ভালবাসা বস্তুকে কেউ কোনও দিন চক্ষু দিয়া দেখে নাই; কাণ দিয়া তার ধ্বনি বা শব্দ শোনে নাই; রসনার দ্বারা কেহ কখনও এই বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করে নাই; নাসিকা দিয়া ইহার গন্ধও পায় নাই। এ বস্তু অরূপ, অশব্দ, অস্পর্শ, অগন্ধ, তথা অরস। অথচ রূপ রস শব্দ স্পর্শাদির সঙ্গে এই অতীন্দ্রিয় বস্তুর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ভালবাসার রূপ নাই, অথচ রূপের আশ্রয়ে, রূপের প্রেরণা ব্যতিরেকে এবস্তু জন্মে না বা জাগে না, আর জন্মিয়া বা জাগিয়া রূপকে আশ্রয় না করিয়া ইহা আপনাকে প্রকাশও করিতে পারে না। যে ভালবাসে তার মুখে, চক্ষে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সমুদয় দেহের মধ্যে এই ভালবাসা আপনাকে ফুটাইয়া তুলে। মাতালকে যেমন দেখিলেই চেনা যায়, যে প্রেমমদে মাতোয়ারা তাহাকেও সেইরূপ দেখিলেই চেনা যায়। প্রেমক্রোধাদি মনের ভাব হইলেও এসকল ভাব যখন মনে জাগে ও বাড়িয়া উঠে, তখন শরীরে পর্য্যন্ত একটা বিশিষ্ট রূপ প্রকট হয়। এই রূপই এই সকল রসের মূর্ত্তি। এই সকল রসমূর্ত্তি একদিকে অন্তরের রসকেও ঘন করিয়া আমাদের সম্পূর্ণ সম্ভোগের বিষয় করে; অন্যদিকে অন্তরের রসকে যখন এরূপভাবে বাহিরে ফুটাইয়া তুলে, তখন ইহাকে

দেখিয়া আমাদের অন্তরের অচেতন রস সচেতন হয়, সুপ্ত ভাব জাগিয়া উঠে। হাস্যের মূর্তিতে আমরা হাস্যরস আস্বাদন ও সম্ভোগ করি; আবার এই মূর্তি দেখিলেও আমাদের হাসি পায়। প্রেমের মূর্তিতেও এইরূপে প্রেম সম্ভোগ হয় ও প্রেমের উদ্দীপনা হয়। অন্তরের রস যতক্ষণ না এইরূপে আপনার নিজস্ব মূর্তির আশ্রয়ে ফুটিয়া উঠে, ততক্ষণ তাহা আমাদের সম্পূর্ণ সম্ভোগের বিষয়ও হয় না, আর আমাদের সুপ্ত রসকে জাগাইয়া তুলিতেও পারে না। যাঁহার মধ্যে সকল রস মূর্তিমান হইয়া আছে, অর্থাৎ আমাদের অন্তরের যাবতীয় রস যাঁহাকে অন্বেষণ করে, যাঁহাকে দেখিয়া বা যাঁহার আভাস পাইয়া সমুদয় সুপ্ত রস জাগিয়া, নাচিয়া, উথলিয়া পড়ে,—তাঁহাকেই নিখিলরসমূর্তি বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণই এই নিখিলরসামৃত-মূর্তি; আমাদের বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ইহাই বলে।

এই নিখিলরসামৃতমূর্তির সঙ্গে একদিকে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ও অপরদিকে আমাদের অতীন্দ্রিয়ানুভূতির অতি নিগূঢ় অতি ঘনিষ্ঠ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমাদের ইন্দ্রিয়সকল ঐ মূর্তির প্রত্যক্ষ লাভের জন্য নিত্য পিপাসিত; আবার নিতান্ত ইন্দ্রিয়রাজ্যে এবস্তুর সন্ধান পর্য্যন্ত ভাল করিয়া পাওয়া যায় না। এবস্তু যেন অতীন্দ্রিয় জগৎ হইতে, আত্মার অন্তরাকাশ হইতে বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে আমাদের ইন্দ্রিয়সকলের সমক্ষে চমকিয়া উঠে। চোখ এই বস্তুর লোভেই রূপে রূপে পিপাসু ভ্রমরের মতন চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। যার মুখখানি মিষ্টি লাগে, একবার দেখিলে আর বার দেখিতে ইচ্ছা হয়, চোখ ভাবে তারই মধ্যে বুঝি এই রূপ আছে। কিন্তু ইহার সাড়া পাইয়া হায়রাণ হয় মাত্র, ইহাকে ধরিতে পারে না। সকল ইন্দ্রিয়েরই এই দশা ও এই কথা। এরা সকলেই কি যেন চায় অথচ পায় না, কি যেন ধরে ধরে কিন্তু ধরিতে পারে না। এই পাগল-করা, এই মনভুলান, এই প্রাণমাতান বস্তুকেই মহাজনেরা শ্রীকৃষ্ণ রূপে ভজনা করিয়াছেন। এইটি যে না জানে বা না বুঝে, এই কথাটি যে আপনার ভিতরকার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা দিয়া ধরিতে না পারে, তার পক্ষে আমাদের বৈষ্ণব মহাজনদিগের পীযুষ-পদাবলী পড়া বা শোনা নিতান্তই বিড়ম্বনা মাত্র।

যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও লীলার কথা মহাজন-পদাবলীতে পড়িয়া অমন আনন্দ পাই, সে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর না মানুষ, এ প্রশ্ন আমাকে করিও না। এসকল প্রশ্ন তুলিলেই আমার প্রাণের সকল রস উবিয়া যায়, সকল আনন্দ নিভিয়া যায়। তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবিতে আমার বুক শুকাইয়া যায়। তবে আমার প্রাণের মর্ম্মের, আমার প্রকৃতির এ জলন্ত পিপাসা মিটাইবে কে? আমি যে চাই রূপ—ঈশ্বর অরূপ, আমি চাই রস, ঈশ্বর অরস, আমি চাই গন্ধ—ঈশ্বর অগন্ধ; আমি চাই আমার এই দুরন্ত ইন্দ্রিয়সকলকে শান্ত করিতে; এসকল আনন্দের দ্বারকে একেবারে বন্ধ করিতে চাই না, বন্ধ করিতে পারিও না; পারিলে আমার আমিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইত। আর অশব্দ অরস অগন্ধ অস্পর্শ ঈশ্বরকে দিয়া আমার এই সকল শব্দস্পর্শরূপরসপিপাসু ইন্দ্রিয়কুল তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। অন্যদিকে কেবল মানুষকে দিয়াও আমার জীবন সার্থক হয় না। এই মানুষের মধ্যেই মানুষকে ছাড়াইয়া একটা কি যেন আছে, তারই টানে আমাকে অমন পাগল করিয়া তুলে। এই জন্য বালো সখাকে জড়াইয়া ধরিয়া প্রাণ জুড়াইত কিন্তু জুড়াইত না, কে যেন আড়াল হইতে আমাদের দু'জনাকে আমাদের

বাহিরে ও উপরে টানিয়া লইয়া যাইত। এইজন্যই ত যৌবনে সতীকে বুকে চাপিয়া আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে পিপাসাও বাড়িয়া যাইত, যত নিকটে পাইতাম ততই যেন আরও দূরে পড়িতাম, যত প্রাণ ভরিয়া উঠিত, ততই আরও ক্ষুধা বাড়িয়া যাইত, দেহ মন গলিয়া যতই পরস্পরের মধ্যে মিলিয়া যাইত, ততই আরও গলিবার আরও মিলিবার সাধ প্রবল হইয়া উঠিত। মানুষকে ছাড়িয়াও আমাদের চলে না, মানুষকে লইয়াও চলে না। আমাদের প্রাণ চায় এমন কাহাকেও যাঁর মধ্যে ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় মিশিয়া গিয়াছে, যাঁর মধ্যে বাস্তবই কল্পনা ও কল্পনাই বাস্তব হইয়াছে; যাঁকে দেখিয়া যাহা দেখা যায় না তার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি; যাঁকে ছুঁইয়া যাঁকে ছোঁয়া যায় না, তাঁরই অঙ্গসঙ্গ পাইতে পারি; যাঁর রসে মাখামাখি হইয়া, কোনও রস যাঁহার রসকে ব্যক্ত করিতে পারে না, তাঁর অঙ্গে গলিয়া লাগিয়া থাকিতে পারি। আমার প্রাণ তোমার স্বর্গের ঈশ্বরকে চায় না। আমার প্রাণ তোমার মর্ত্ত্যের উপচয়-অপচয়শীল, রোগশোকজরামৃত্যুর অধীন মানুষকে লইয়াও চিরদিন ঘর করিতে পারে না। আমার প্রাণ চায় তাহাকে যে মানুষ বটে, কিন্তু যার রোগ নাই, শোক নাই, দুঃখ নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, যে নিত্য-সবল, নিত্য-সুস্থ, নিত্য-সুখী, নিত্য-রসময়, নিত্যানন্দময়, যে চিরকিশোর, চিরসুন্দর, যে আমার সকল আদর্শকে আয়ত্ত করিয়াছে, সকল চাওয়ার নিবৃত্তি করিতে পারে, যে আমার দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি আত্মা, আমার মানবতার সমগ্রতাকে পরিপূর্ণ ও সার্থক করিতে পারে। মহাজনপদকর্ত্তাগণ যে শ্রীকৃষ্ণকে আঁকিয়াছেন, তিনি এই বস্তু। জগতের আর কোনও কবি-সমাজ, আর কোনও কাব্য, কোনও সঙ্গীত, কোনও চিত্র বা কোনও ভাস্কর্য্যে অমন বস্তুটি আজ পর্য্যন্ত দিয়াছে বলিয়া জানি না। সকল দেশের সকল কবিই আংশিকভাবে এই চিরসুন্দরকেই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা সত্য। বৈষ্ণব মহাজনেরাও আংশিক-ভাবেই ইঁহাকে ব্যক্ত করিয়াছেন, মানি। এ বস্তুর নিঃশেষ অভিব্যক্তি সম্ভবে না। কিন্তু বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাগণ এই অপূর্ণতার মধ্যেই যতটা পরিমাণে এই পুরুষোত্তমের পরিপূর্ণ মূর্ত্তির আভাস দিতে পরিয়াছেন, আর কেহ তাহা পারিয়াছেন কি না, সন্দেহ। না পারারই কথা। কারণ আর কেউ ত এই জগতে, বিশ্বের চরম তত্ত্বকে অমন নিঃসঙ্কোচে আদর্শ মানবাকৃতি এবং পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ মানবপ্রকৃতি সম্পন্ন বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহস পান নাই।

—সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই তিনটি রসকে আশ্রয় করিয়াই যাবতীয় মহাজন-পদাবলী ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সখ্যাদি সম্বন্ধে আর সখ্যাদি রসে বিস্তর প্রভেদ আছে। সংসারে এ সকল সম্বন্ধ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এই রস অতি দুর্লভ বস্তু। রসবস্তুর দুইটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে,—প্রথম এ বস্তু তরল, দ্বিতীয় এ বস্তু আনন্দময়। তরল বলিয়া এ বস্তু সর্ব্বত্র সঞ্চার হইতে পারে, সকলকে আচ্ছন্ন, সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে। আর আনন্দময় বলিয়া এ বস্তু যাহাতেই সঞ্চারিত হয়, তাহাকে সুখময় ও উৎফুল্ল করিয়া তুলে। সর্ব্বসঞ্চারশীলতা ও সর্ব্বানন্দদান রসের মুখ্য ধর্ম্ম। সখায় সখায় সম্বন্ধ সংসারে বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সকল সখ্য সম্বন্ধেতেই যে সখ্য-রস ফোটে, এমন বলিতে পারি না। এই সকল সম্বন্ধ সুখকর, ইহাও সত্য। কিন্তু এই সুখ সর্ব্বত্র সখাগণের দেহমনপ্রাণ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে না ও তাহাদিগকে ছাপাইয়া উঠে না। এই জন্যই এসকলকে সখ্য রস বলিতে পারি

না। সখ্য-সম্বন্ধে যখন রস ফুটিতে আরম্ভ করে, তখন সখার জীবনটা সখ্যময় হইয়া যায়। সখার পঞ্চেন্দ্রিয় তখন সখাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। সখার মন তখন অবিরাম সখারই ধ্যান করে। সখার সুখদুঃখ তখন সখাকে আসিয়া আচ্ছন্ন করে। তখন তাহাদের দুই দেহে একই প্রাণ যেন স্পন্দিত হয়। তখন জাগ্রত ও সুষুপ্ত উভয় অবস্থাতে, নিকটে ও দূরে সকল স্থানে, ইহারা একে অন্যের মধ্যে বাস করে। এই রস যখন প্রগাঢ় হইয়া ইহাদের দেহকে ইন্দ্রিয়কে স্নায়ুমণ্ডলকে মনকে ভাবনাকে, এক কথায় ইহাদের পরস্পরের সমগ্রতাকে গ্রাস করিয়া বসে, তখন ইহারা চক্ষুসাক্ষাৎকার ব্যতীতও পরস্পরের রূপ দেখে, ত্বাতিসাক্ষাৎকার ছাড়াও পরস্পরের শব্দ শোনে, বহিরিন্দ্রিয়-সাক্ষাৎকার ব্যতিরেকে আপনাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা একে অন্যকে গ্রহণ করে ও একে অন্যের সঙ্গ লাভ করে। এই অবস্থা লাভ হইলে, সখ্যরস সখ্যরতিতে পরিণত হয়। ইহাই রসের চরম পরিণতি। আর এই পরিণত অবস্থা লাভ হইলেই সখ্য রসেতে, স্বেদকম্পপুলকাশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিকী বিকার প্রকাশিত হইয়া থাকে। তখন দেহে এবং আত্মাতে, ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ে, শরীর ও অশরীরীতে মেশামেশি ও মাখামাখি হইয়া যায়। আত্মা তখন দেহধর্ম্ম ও দেহ তখন আত্মার ধর্ম্ম লাভ করে। আত্মা তখন দেহেতে নামিয়া, দেহেতে ছড়াইয়া পড়ে আর দেহ তখন আত্মাতে উঠিয়া, আত্মাতে লুপ্ত হইয়া যায়। এ যে অপূর্ব্ব অবস্থা, বাক্যে ইহার বর্ণনা হয় না। যে ভাগ্যবলে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও এ অবস্থার আভাসের আস্বাদন পাইয়াছে, সে ঠারে-ঠোরেই তাহা যে কি, ইহা একটু আধটু বুঝিতে পারে। অন্যের নিকটে ইহা হেঁয়ালি মাত্র।

শৈশব-যৌবনের প্রদোষালোকে দাঁড়াইয়া যে সখ্য আস্বাদন করিয়াছিলাম, তাহা ত কেবল একটা মানস বস্তু নয়। সখা ত কেবল আত্মা ছিলেন না। তাঁর শরীর ছিল, তাঁর রূপ ছিল। তাঁর শব্দ-স্পর্শরূপরসে আমাদিগকে আকুল করিয়াছিল। তারই জন্য ত, ঐ রসের লোভে

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।

সে ত আমাদের কেউ ছিল না। সোদর ছিল না, অথচ প্রাণের দোসর হইয়াছিল। কুটুম্ব ছিল না, কিন্তু সকল কুটুম্ব অপেক্ষা বড় হইয়াছিল। তার মাকে মা ডাকিলে প্রাণ নাচিয়া উঠিত। তার বোনকে বোন বলিতে জীবন মধুময় হইত। কোনও সম্বন্ধ ছিল না বলিয়াই সকল সম্বন্ধে তাহাকে বাঁধিবার জন্য অস্থির হইতাম। সো নহে রমণ, হাম নহি রমণী—অথচ সকল ইন্দ্রিয় তাকে পাইবার জন্য আকুল ও পাইয়া বিভোর হইয়া থাকিত। জাগিয়া তারই কথা ভাবিতাম; ঘুমাইয়া তারই স্বপ্ন দেখিতাম। সে যে আমাদের কি ছিল, তাহা তখনও বুঝি নাই, এখনও বলিতে পারি না।

অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণং সৌখ্যৈ দুঃখাম্যোপহতি।
তত্ত্বস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ॥

—কোনও কিছু না করিয়াও কেবল কাছে থাকিয়াই সে যে আমাদের সকল দুঃখের উপশম করিত, সে যে আমাদের কি বস্তু ছিল, তাহা কেমন করিয়া বলিব? যে এই অপূর্ব্ব বস্তুকে কেবল একটা নিরাকার অশরীরী আধ্যাত্মিক ভাব বলে, সে মিথ্যা কহে। যে ইহাকে কেবল একটা রক্তমাংসের

স্নায়বীয় উত্তেজনা বলে, সে আরও বেশী মিথ্যা কহে। এই রসকে যে সকল প্রকারের শরীরধর্ম্মশূন্য ও ইন্দ্রিয়-সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত বলে, সে ইহা যে কি তাহা জানে না, তার ভাগ্যে এ বস্তুর আস্বাদন লাভ হয় নাই; অথবা জানিয়া শুনিয়া সত্যকথা ভাবিতে বা বলিতে তার সাহস হয় না। যে এই রসকে কেবল ইন্দ্রিয়বিকার বলিয়াই জানিয়াছে, সে'ও ইহার প্রকৃত আস্বাদন পায় নাই। অতীন্দ্রিয় হইয়াও এই রস ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় ও আচ্ছন্ন করিয়াই আপনাকে ফুটাইয়া তুলে। ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে জন্মিয়াও ইহা নিয়তই অতীন্দ্রিয় রাজ্যে যাইয়া লীলা করে। একথা যে বোঝে, যে জানে, যে বলে, সে'ই এই রসবস্তু যে কি তার সত্য সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে।

এই রস ইন্দ্রিয়-সহায়ে বস্তুর অনুভব হইতেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু রস আর অনুভব বা feeling বাস্তবিক এক বস্তু নহে। অনু অর্থ পশ্চাৎ এবং ভব অর্থ জন্ম—পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাহা জন্মে তাহাই অনুভব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুসাক্ষাৎকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাহা জন্মে তাহাই অনুভব। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুসাক্ষাৎকারকে ইংরাজিতে perception কহে। এই perception-এর পশ্চাৎ পশ্চাৎ'ই feeling-এর উৎপত্তি হয়। এই feeling বা অনুভব অতি মামুলী বস্তু। সকল মানুষেরই এই অনুভব হয়। পশুপক্ষীদেরও হয়। কীটপতঙ্গেরই যে হয় না, এমন কথা বলা যায় না। এ বস্তু রস নহে। তবে রসবস্তু অনুভব বা feeling হইতে ভিন্ন হইলেও এই অনুভবকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়, অন্য কোনও প্রকারে হয় না। রস মাত্রেই অনুভবের অধীন, অনুভব-তন্ত্র। আর অনুভব মাত্রেই বস্তু-সাক্ষাৎকারে উৎপন্ন হয়, বস্তুর অধীন, বস্তুতন্ত্র। এই জন্যই রসমাত্রেই বস্তুতন্ত্র। বস্তুর আশ্রয় ব্যতীত রস জন্মে না। তবে অনুভবে আর রসে প্রভেদ এই যে, অনুভব আপনার বিশিষ্ট আশ্রয়টিকে ছাড়িয়া যায় না, ছাড়িয়া বাঁচে না; রস যে অনুভবের আশ্রয়ে জন্মে সর্ব্বদাই সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে ছাড়াইয়া বর্ত্তমান ও অতীত আরও বহুবিধ অনুভবকে জাগাইয়া তুলে। চক্ষু রূপই কেবল দেখে, শব্দও শোনে না, স্পর্শও পায় না, গন্ধও গ্রহণ করে না, আস্বাদনও করে না। আর রূপ কেবল চক্ষুকেই জাগায়, শ্রুতি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু চক্ষু রূপ দেখিবা মাত্র তাহার পশ্চাতে যে অনুভব জন্মে, তাহা যখনই রসে পরিণত হয়, তখন এই রূপের সংস্পর্শে চক্ষুর সঙ্গে সঙ্গে সকল ইন্দ্রিয় চঞ্চল ও পিপাসিত হইয়া উঠে। কেবল অনুভব রূপ মাত্র দেখে। তার বর্ণ ও গঠন কি ইহারই জ্ঞানলাভ করে। কিন্তু এই অনুভব যখন রসে পরিণত হয়, তখন এই রূপই "অপরূপ" হইয়া উঠে। তখন তাহা কেবল চক্ষুগ্রাহ্য রূপ থাকে না, মনোগ্রাহ্য, ধ্যানগ্রাহ্য, সমাধিগম্য "স্বপন-স্বরূপ" হইয়া উঠে।

তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দুরসঞে লোচন মন দুহুঁ ধাব।
পরশন লাগি জনু অন্তর জীবন রহ কিবে যাব॥

রূপ ত সকলেই দেখে, রূপের অনুভব যার দুই চক্ষু আছে তারই ত হয়, কিন্তু রূপ দেখিয়া প্রমাদে পড়ে কে? যে পড়ে, বুঝিতে হইবে তার রস জাগিয়াছে।

কানু হেরব ছিল মনে বড় সাধ। তদবধি অবোধী মুগধ হাম নারী।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ॥ কি কহি কি বলি কিছু বুঝই না পারি॥

সাঙন ঘন সম ঝরু দুনয়ান। কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা।
অবিরত ধক্ ধক্ করয়ে পরাণ॥ রভসে আপন ভাউ পরহাতে দেলা॥
না জানি কি করু মোহন চোর।
হেরইত প্রাণ হরি লই গেও মোর॥

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকাও শ্যাম-দরশন পাইয়া কহিলেন :—

সই, কিবা সে শ্যামের রূপ
নয়ান জুড়ায় চেঞা।
হেন মনে লয়, যদি লোকভয় নয়,
কোলে করি থেয়ে থেঞা॥

সাক্ষাৎদর্শনে যেমন একৈকেন্দ্রিয়স্পর্শে সর্বেন্দ্রিয় পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, নাম শুনিয়াও তাহাই হয়।

নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো।
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো।
যুবতী ধরম কৈছে রয়।

একে বলে রস। এযে কেবল অনুভব বা feeling নহে, ইহাও কি আবার বলিতে হয়, না বুঝাইতে হয়। তবে অনুভব বা feeling হইতেই এই রসের বা romanceএর জন্ম হয়, ইহাও অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে চলিবে না। অনুভব বীজ, রস এই বীজেরই গাছ। অনুভব বা feeling'এর সঙ্গে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ নিত্য, অপরিহার্য। এই জন্য ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের আশ্রয় ব্যতীত কোনও সত্য রস জন্মিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে, অনুভবের অনুগমন করিয়া রসবস্তু জন্মে, ইহা যেমন সত্য ; সেইরূপ এই রস জন্মিয়া কেবল নিজেই যে ইন্দ্রিয়কে ছাড়াইয়া যায় তাহা নহে, ইন্দ্রিয়গ্রামকেও আপনার সঙ্গে সঙ্গে অতীন্দ্রিয়ের ভূমিতে টানিয়া তুলিয়া লয়, ইহাও সেইরূপই সত্য। রস-রাজ্যের একদিকে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি, এবং অন্যদিকে আত্ম-বস্তু ও অতীন্দ্রিয় সাক্ষাৎকার। আর রসবস্তু এই দুই রাজ্যের মধ্যে আনন্দের সেতু হইয়া আছে।

আমাদের বৈষ্ণব মহাজনেরা এই সত্যটা অতি দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের পীযূষ-পদাবলীতে প্রত্যক্ষে ও অপ্রত্যক্ষে, শরীর ও অশরীরীতে, দেহ ও আত্মাতে অমন অদ্ভুত মেশামেশি দেখিতে পাই। তারই জন্য এসকল অমৃত-পদাবলী পড়িতে পড়িতে বা শুনিতে শুনিতে, দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা সকলে মিলিয়া এক পরমানন্দের হাট খুলিয়া বসে।

[স্বর্গত বিপিনচন্দ্র পালের এই প্রবন্ধ একচল্লিশ বৎসর আগে—ফাল্গুন, ১৩২২ সালে "নারায়ণ" পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। ইহা এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই]

আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সংস্থা

অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ ধর, এম এ

কথিত আছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্তঃকালে জার্মান ডুবুরি জাহাজগুলির উৎপাতে বিব্রান্ত এবং ভীত হয়ে ব্রিটিশ সরকার লর্ড বাল্ফোর্ডকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, "আপনার পরমাণু-বিভাজনের গবেষণা আপাততঃ মুলতুবী রাখুন ; সব যায় ; ঐ সর্বনেশে জাহাজগুলির আক্রমণের সময়মত সংকেত দিতে পারে, এমন কোনো যন্ত্রের আশু আবিষ্কার করুন।" লর্ড রাদারফোর্ড কিন্তু এ প্রস্তাবে সম্মত হননি ; এবং তাঁর পারমাণবিক গবেষণা সম্বন্ধে তিনি নাকি তাঁদের বলেছিলেন, "যুদ্ধের চেয়েও এ গুরুত্বপূর্ণ।" পারমাণবিক শক্তির উপর প্রভুত্ব লাভ করে মানুষ কত অসম্ভাব্য, কল্পনাতীত কার্য্য সম্পাদন করবে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে কত এগিয়ে যাবে, পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করবে, এইরূপ নানাবিধ রঙীন কল্পনায় বৈজ্ঞানিকের মন তখন বিভোর ছিল। কঠোর পরিশ্রম করে, নিজের দেহ পলে পলে ক্ষয় করে, লর্ড রাদারফোর্ড তাঁর সাধনায় নিযুক্ত থাকলেন, এবং অবশেষে মৃত্যুমুক্ত হলেন। কিন্তু এর মূল্য ফল কি হল ?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই জার্মানীতে চেষ্টা চলল পারমাণবিক বিস্ফোরণজাত শক্তিকে বিশ্বধ্বংসী ব্রহ্মাস্ত্রে পরিণত করতে। এই সংবাদ পেয়েই ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় চলল অনুরূপ চেষ্টা। কি করে কি হল তা বর্ণনা করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক ; এর পরিণতি হল, মার্কিণ সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত একটি নারকীয় কাণ্ডে,—পারমাণবিক বোমার প্রচণ্ড আঘাতে—শত সহস্র নিরীহ নরনারী ও শিশুর আর্তনাদের মধ্যে যুদ্ধক্লিষ্ট পরাজয়োন্মুখ জাপানের দুটি সমৃদ্ধনগরীর ধ্বংসপ্রাপ্তিতে। বিশ্ব স্তম্ভিত হল ; এর আরও কত কি পরিণাম হতে পারে এ ভাবনায় আকুল হয়ে নানা দেশ থেকে আমেরিকার কাছে আবেদন এল—"পারমাণবিক অস্ত্রের নির্মাণ নিষিদ্ধ হোক ; মানুষ প্রাকৃতিক যে মহাশক্তিকে আয়ত্ত করতে পেরেছে, বিশ্বের উন্নতির কাজে তার ব্যবহার হোক ; সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা হোক।" তার পর শুরু হল, এই শুভ উদ্দেশ্য কার্য্যকরী করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের পালা এবং তারপর চলল এগুলি নিয়ে বাদানুবাদ। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই সময়েই শুরু হয়েছিল—নানাবিধ কারণে—রুশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে মন কষাকষি এবং রেষারেষি, যার নাম দেওয়া হয়েছে "শীতল যুদ্ধ"। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়ে পারমাণবিক শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রনের কোনো পরিকল্পনাই বেশী দূর অগ্রসর হতে পারল

এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে চলল ; ইতিমধ্যে, রুশিয়া পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ করে ফেলল ; "শীতল যুদ্ধ" পাকাপোক্তিভাবে চলতে লাগল। সমস্যা জটিলতর হল।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বিশ্বের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় পটপরিবর্তন ঘটল। মার্শাল স্তালিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন প্রধান মন্ত্রী জর্জি ম্যালেনকভ যুদ্ধের বিভীষিকা চিরতরে বিদূরিত করবার এবং জগতে সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্তরিকতাপূর্ণ আবেদন জানালেন। ইতিমধ্যে, আমেরিকার রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ব্যাপারে পরাজয়ের ফলে "প্রজাতন্ত্রীয়" (Democratic) দলের বিংশবর্ষব্যাপী শাসনের অবসান হল। এবং 'গণতন্ত্রীয়" (Republican) প্রার্থী জেনারেল আইসেনহাওয়ার নির্বাচিত ও রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হলেন। নব নিযুক্ত রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করলেন, "রুশিয়ার সহিত বিবাদের মূলীভূত এমন একটিও কারণ নাই যা শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসিত না হতে পারে।" এই সঙ্গে, নানা দেশের প্রধান পুরুষেরা, যথা ইংলণ্ডের স্যর উইনস্টন্ চার্চিল, ভারতবর্ষের শ্রীজওহরলাল নেহেরু, পশ্চিম জার্মাণীর ডাঃ কনরাড এডেনোয়ার বলতে লাগলেন,

কোনো সুদূর ভবিষ্যতে নয়, এখনি, আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা সম্পূর্ণভাবে সম্ভবপর। উনবিংশতি শতাব্দীর শেষের দিকে, ইউরোপে যেমন একটা কাজচলা ধরণের শান্তি স্থাপিত হয়েছিল, অন্ততঃ সেরূপ শান্তি-স্থাপন অবশ্যই সম্ভবপর এবং এঁরা বললেন তা এখনি প্রতিষ্ঠিত করা হোক। মনে পড়ে, নবনিযুক্ত মার্কিণ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফস্টার ডালেস সাহেব—যিনি নির্বাচন যুদ্ধের সময়ে রুশিয়া বিদ্বেষী অনেক পরম কথা বলেছিলেন এবং পূর্ব্ব ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে রুশিয়ার কবল থেকে উদ্ধার করবার ব্যবস্থা করবেন বলে দেশবাসীর নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—তিনিও এখন সুর বদলিয়ে ফেললেন। এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বললেন—"কি জানি, হয়তো রুশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি আক্রমণাত্মক নয়; অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় রুশিয়াকেও নিজের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। তাকে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত করা আমাদের সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য।"

১৯৫৩ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে একটি নাটকীয় ব্যাপার ঘটে গেল। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের সভানেত্রীত্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের একটি অধিবেশন আরম্ভ হচ্ছিল। এমন সময় একটু অপ্রত্যাশিত-ভাবে রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার সেখানে উপস্থিত হলেন, এবং ঐ পরিষদের সদস্যদের সম্মুখে একটি দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। ঐ ভাষণ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, তথা পৃথিবীর সকলের, কাছে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। তিনি যা বললেন তা এমন কিছু ঘোরালো বা জটিল ছিল না; পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারের উপরে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের প্রতিষ্ঠাকল্পে এতদিন ধরে যে সকল পরিকল্পনা পেশ করা হচ্ছিল, এটি তাদের কারুর পুনরুক্তি নয়; নূতন করে আরও একটা বাদানুবাদ আবার শুরু হতে পারে, এটা অন্ততঃ আপাতদৃষ্টিতে তেমন ধরণেরও কিছু নয়। সরল কথায়, তিনি প্রস্তাব করলেন, একটা আন্তর্জাতীয় পারমাণবিক প্রতিষ্ঠান (International Atomic Agency) স্থাপিত করা হোক; সকলের বোধগম্য ভাষায়, এটা হবে একধরণের ব্যাংক, একটা আমানতী ধরণেরও কিছু নয়। সরল কথায়, তিনি প্রস্তাব করলেন, একটা আন্তর্জাতীয় পারমাণবিক প্রতিষ্ঠান (International Atomic Agency) স্থাপিত করা হোক; সকলের বোধগম্য ভাষায়, এটা হবে একধরণের ব্যাংক, একটা আমানতী কারবার। এর মূলধন হবে, বিভাজনযোগ্য পারমাণবিক উপকরণসমূহ (fissionable materials); তা যোগাবে পারমাণবিক বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলি। এই সরবরাহ কার্য্যের উদ্দেশ্য হবে, বিভাজন যোগ্য পারমাণবিক উপকরণগুলির, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কাজে ব্যয়িত না হয়ে শান্তিপ্রদ কাজে, যথা কৃষি, ভেষজ বিজ্ঞান ইত্যাদিতে গবেষণা, এবং বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলির সবচেয়ে যা বেশী প্রয়োজন—তাড়িত শক্তি,—তার উৎপাদনে ব্যবহৃত হওয়া।

পরিষদের উপস্থিত সকল সদস্যের এমন কি রুশ-প্রতিনিধিগণেরও উচ্চ করতালিধ্বনিতে এই শুভ প্রস্তাব অভিনন্দিত হল। বিশেষ করে উল্লসিত হলেন অনুন্নত দেশগুলির প্রতিনিধিরা। পারমাণবিক বিজ্ঞান দুরূহ শাস্ত্র; এর চর্চ্চা করতে হলে চাই-উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী, ব্যয়সাধ্য গবেষণাগার, যন্ত্রপাতি। তারপর পারমাণবিক চুল্লী নির্ম্মাণ বা পারমাণবিক শক্তিমূলক তড়িদাগার স্থাপন, সকলই বহু ক্লেশ—বহু অর্থ—বহু সময়সাপেক্ষ। অনুন্নত জাতিগুলি নিজদের সামর্থ্যে ও চেষ্টায় অদূর ভবিষ্যতে এ সকল বিষয়ে সাফল্য লাভ করবে এরূপ কল্পনাও হাস্যকর। এখন, পৃথিবীর উন্নত জাতিগুলি, যারা এতদিন অনুন্নতদের উপর প্রভুত্ব করেই এসেছে, তাদেরকে নিজদের শোষণ-যন্ত্রের উপাদান মাত্র বলেই মনে করেছে—তারা যদি, (যে উদ্দেশ্য নিয়েই হোক)—একবার তাদের সঙ্গে হাত মিলাতে চায়, তাদের উন্নয়নে সাহায্য করে, তবে পৃথিবীর রং বদলিয়ে যায়। তাদের সাহায্যে যদি তারা আণবিক শক্তিকে আয়ত্ত করতে পারে, তবে বিশেষ করে তাড়িত শক্তি—যা শিল্পোন্নতির মূলীভূত উপকরণ, তা তারা আশাতীতরূপ অল্প মূল্যে এবং অফুরন্তভাবে পেতে পারে। এতে অসম্ভবও সম্ভব হবে।

আবেগময়ী ভাষায় এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সুরে মার্কিণ রাষ্ট্রপতি তাঁর প্রস্তাব পৃথিবীর কাছে উত্থাপন করেছিলেন, নিছক জনকল্যাণ এবং বিশ্বশান্তির নামেই তিনি তাঁর আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু, তবুও, একজন রাজনৈতিক, একটি রাষ্ট্রের প্রধান, পৃথিবীর বিদ্যমান দুটি শক্তিসংঘের

একটির নেতা, তিনি। তাঁর মুখ থেকে যে প্রস্তাব এসেছে, তার মধ্যে রাজনৈতিক চাল, এবং বিশেষ করে তাঁর নিজের দেশের বা তাঁর আশ্রয়ী শক্তিসংঘের স্বার্থ কতদূর জড়িত আছে বা থাকতে পারে, রাজনৈতিক মহলগুলিতে এ নিয়ে চিন্তা ও আলোচনা শুরু হল। রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবের নানারূপ ভাষ্য, এবং টীকা তথা টীকাটীকা নানাদেশে প্রস্তুত হল। সত্য কথা বলতে গেলে—এতে বিস্মিত হবার কিছুই ছিল না। দুটি লোকক্ষয়কর বিশ্বযুদ্ধের পরেও, এবং আরও একটি বিশ্বযুদ্ধের প্রায় সম্মুখীন হয়েও, জগতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তো এই ভাবেই পৌঁছেছিল। এ অবস্থায় যদি কেউ প্রীতি ও মৈত্রীর কথা না বলে স্বার্থের কথাই বলত তবে তা সহজে বোধগম্য হত, কারণ স্বার্থই এ জগতে একমাত্র নির্ভরযোগ্য মানদণ্ডরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। বস্তুতঃ রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবের একটা কড়া ব্যাখ্যাই চলল।

শুরুই বোঝা গেল, তাঁর নিজের দেশেও এবং শাসনতান্ত্রিক ব্যাপার যাঁরা তাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ তাঁরাও তাঁর এই প্রস্তাবটি ঠিক আদর্শবাদের দিক দিয়ে গ্রহণ করেন নি। ইংরাজেরা স্পষ্টই বলাবলি করতে লাগলেন—"মার্কিণ ভ্রাতারা এতদিন তাঁদের আবিষ্কৃত পারমাণবিক বিজ্ঞানের রহস্যগুলি তাদের নিজস্ব সম্পত্তি মনে করে জগতের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন; এখন দেখছেন ইংলণ্ড, কানাডা প্রভৃতি দেশগুলিও এ সকল তথ্য নিজেরা আবিষ্কার করে নিয়েছে; হয়তো তারা এ সব বিষয়ে তাঁদেরকে ছাড়িয়েও অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। ভ্রাতাদের এ সাদর আহ্বান শুধু পরের গোপন কথাগুলি জেনে নেবার কৌশল মাত্র।" রাষ্ট্রপতির যে উদ্দেশ্যই থাকুক, বাস্তবপক্ষে তাঁর সহকর্মীদের এরূপ অভিসন্ধি যে ছিল না, মার্কিণ রাজনৈতিক মহলে এমন কথা বড় কেউ হলফ করে বলতে আজও প্রস্তুত নন। সেনেট সভায় রাষ্ট্রপতির নিজের দলীয় নেতারাও তাঁর এ প্রস্তাব সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনার গুঞ্জনধ্বনি তুললেন। মার্কিণ সরকারের আদর্শবাদীর মুখোস, অনতিকালের মধ্যেই একেবারে খুলে পড়ে গেল এবং স্বমূর্তিতে প্রকট হলেন ডালেস্ সাহেব স্বয়ং। রাষ্ট্রপতির ভাষণের কিছুদিন পরেই (১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী তারিখে) নিউইয়র্কে প্রদত্ত একটি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আমেরিকার পররাষ্ট্র ও সামরিক নীতি সম্বন্ধে তিনি এমন কতকগুলি কথা দৃঢ়তার সঙ্গে জগৎকে এবং বিশেষ করে কম্যুনিষ্ট শক্তি সংঘকে শোনালেন, যার মধ্যে রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত সেই আদর্শবাদের কোনও গন্ধ ছিল না।

সে যাহাই হোক, রুশ সরকার কিভাবে প্রস্তাবটি গ্রহণ করবেন এইটুকু জানবার জন্যই সকলে উৎগ্রীব হয়ে থাকলেন। কারণ, পারমাণবিক শক্তিতে রুশিয়ার স্থান আমেরিকার ঠিক নীচেই, এবং রুশিয়ার সহযোগিতা ব্যতীত বিশ্বকল্যাণের উদ্দেশ্যমূলক কোনো প্রতিষ্ঠানেরই সাফল্যের বিশেষ আশা থাকে না। আমেরিকার কতকগুলি প্রভাবশালী রাজনৈতিক মহলে অবশ্য এরকম কথা জোর গলায় প্রচারিত হতে থাকল "রুশিয়া সহযোগিতা করেন ভাল, না করেন, তাতেই বা কি এসে যায়। একটা ব্যাংক স্থাপনের ব্যাপার তো? এর জন্য আর চাই কি? একটু কিছু মূলধন, একটা যাহোক বাড়ী, জনকয়েক কর্মী। আমরা নিজেরাই, নিজেদের কল্পনামতই, এর স্থাপনা করতে পারব।" এরূপ সমালোচনা হয়তো সোড়ার দিকে অনেকে রাষ্ট্রপতির আদর্শবাদের অনুকূলে উচ্চারিত তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মীদের নির্ভরযোগ্য আশ্বাস বাণী বলে মেনে নিয়েছিলেন। প্রথম হতেই এর অন্তরালে কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল কিনা, নিঃসংশয়ে তা বলা যায় না; কিন্তু কার্যতঃ, ব্যাপারটি এইভাবেই গড়াল। রুশ সরকার রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবের আলোচনা করতে সম্মত হলেন। বহু সম্মেলন আহূত হল, দীর্ঘ ৭।৮ মাস ধরে দুই দেশের মধ্যে সরকারীভাবে পত্র ব্যবহার চলল। এবং শেষে পরিণতি সেই একই হল, তাঁদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত যখন যা কিছু আলোচনা হয়েছে সে সকলের পরিণতি যা হয়েছে, অর্থাৎ বিরাট ব্যর্থতা এবং তারপরে এর দায়িত্ব নিয়ে পরস্পরের প্রতি অভিযোগ এবং দোষারোপ।

রুশ সরকারের নিকট থেকে শেষ চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই, ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে, তাঁর

"ঐতিহাসিক ঘিনস" উদ্বোধনী বক্তৃতায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার জানালেন, "কতিপয় জাতির" সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র এবার রুশিয়ার অপেক্ষায় আর বসে না থেকে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলতে অগ্রসর হবেন। কয়েকদিন পরেই, যখন "কতিপয়" উপাধিসূচিত জাতিগুলির নাম প্রকাশিত হল, তখন দেখা গেল তাঁরা সংখ্যায় সাতটি, যথা,—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা, পর্তুগাল ও স্পেন—এবং তাঁরা সেই কয়টি জাতি যাঁরা মার্কিন সরকারের মতে পারমাণবিক বিজ্ঞানে উন্নত বা এতদ্‌বিষয়ক কাঁচামালের অধিকারী। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তাঁরা হচ্ছেন পারমাণবিক "যোগাত্মক" দেশ সমূহ (Haves)। মার্কিন সরকার কেন মাত্র এঁদেরকে নিজেদের দলে রাখলেন এবং পারমাণবিক "বিয়োগাত্মক" দেশগুলিকে (Have-nots) কেন ছেঁটে ফেললেন, তা বলা কঠিন, হয়তো তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, এই প্রতিষ্ঠানটিকে সম্পূর্ণভাবে তাঁদের করতলগত করে রাখা। সে যাই হোক, এ থেকে কয়েক সপ্তাহ পরে, যখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সুরু হল, তখন ডালেস সাহেব উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংবিধান বিষয়ক একটি প্রস্তাব এই পরিষদের সমীপে পেশ করলেন। এর স্বাক্ষরকারী হলেন সাতটি দেশ, অর্থাৎ আমেরিকা এবং উপরের "কতিপয়" উপাধিযুক্ত ছয়টি দেশ, যথা পর্তুগাল ছাড়া আর ছয় জন।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রণীত খসড়া সংবিধানের (Draft Statute) মর্ম উপলব্ধি করে এবং সকলের অজ্ঞাতসারে স্বল্পকয়েকদিনের মধ্যে নিজেই এক সংবিধান প্রস্তুত করে ফেলে যে কর্মতৎপরতা তিনি দেখালেন, তার এবম্বিধ পরিচয়ে পরিষদের সদস্যরা স্তম্ভিত হলেন। দেখা গেল, রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবটিকে উলটেপালটে তাকে এমন রূপ তিনি দিয়েছেন, আর তাকে চেনাই দুষ্কর। ডালেস পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানটির শাসকমণ্ডলীতে থাকবেন ১৬ জন সদস্য, এতে "যোগাত্মক"দের থাকবে বিপুল সংখ্যাধিক্য। যথা ১০ জন হবেন তাঁদেরই মধ্য হতে, বাকী ৬ জন হবেন "বিয়োগাত্মক"দের প্রতিনিধি। (যোগাত্মক দেশগুলি সংখ্যায় কম—আবার সবস্ত তাঁদেরই বেশী থাকবে, বিয়োগাত্মক দেশগুলি সংখ্যায় অনেক বেশী, প্রায় ৭৪ জন —ভারতবর্ষও এদের মধ্যেই গণ্য—তবু তারা শাসক-মণ্ডলীতে পাবেন কমসংখ্যক আসন)। তাছাড়া, এই প্রতি-ষ্ঠানটিতে বিভাজনযোগ্য পারমাণবিক উপকরণ আমানত করা হবে না। সাক্ষাৎভাবে এ থেকে কিছু ধার দেওয়া হবে না। মূলধন এক জায়গায় জমা থেকে, অংশীদারদের নিজের ঘরেই (অর্থাৎ, এক্ষেত্রে, যে দেশ একজন অংশীদার তার নিজের সরকারের কাছেই) থাকবে। অধোমর্ণ দেশ তার যা চাই তার জন্য আবেদন করবে, এই প্রতিষ্ঠানের সমীপে। প্রতিষ্ঠানের কর্তারা কোনও অংশীদারকে অনুরোধ করবেন সরাসরি উক্ত অধমর্ণকে প্রার্থিত উপকরণ যোগাতে। মোট কথা প্রতিষ্ঠানটি হবে ব্যাংক নয়, একটি দালালীর ব্যাপার। সুইডেনের প্রতিনিধি খোলাখুলি ভাবেই এই আপত্তি জানালেন। অপর একজন বললেন, এ তো দালালীর ব্যাপারও নয়, ডাকঘরের চিঠির বাক্স।

অনুন্নত দেশগুলি যে রঙীন স্বপ্ন দেখছিলেন রূঢ়ভাবে তা ভেঙ্গে দেওয়া হল। চেঁচামেচিও বেশ হল। ইকুয়েডরের প্রতিনিধি বললেন, "পাত চাটতে আমাদের না ডাকলেই ভাল হত।" ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা বহুকাল পরে ভাই ভাই হলেন। দুজনে সুর মিলিয়ে "পারমাণবিক সাম্রাজ্যবাদ" নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। শেষ পর্যন্ত, কিন্তু ডালেস সাহেবেরই মেজাজ করে জয় হল। তাঁর প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হল, শুধু একটু লেজুড় মাত্র জুড়ে দেওয়া হল; খসড়া সংবিধানটি পাকাপাকিভাবে প্রণীত হবার পূর্বে বিরুদ্ধ সমালোচনাগুলিও বিবেচিত হবে, আভাবে এরূপ একটা কথা বলা হল।

ঐ খসড়া প্রস্তাবটির অঙ্গীকৃত অন্য একটি প্রস্তাব ছিল যার জন্য পরিষদের সদস্যরা ওর দোষত্রুটিগুলি অনেক পরিমাণে উপেক্ষা করতে রাজী হয়েছিলেন। সেটি হচ্ছে, পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ কাজে নিয়োগ বিষয়ে অচিরে একটি বিশ্ব বৈজ্ঞানিক সম্মেলন আহ্বান করা

হবে, এরূপ প্রতিশ্রুতি। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর তারিখের ঐতিহাসিক ভাষণে মার্কিন রাষ্ট্রপতি প্রথম এরূপ একটি ইংগিত করেছিলেন। শীতল যুদ্ধের তখন রাজনৈতিক আবহাওয়া এমনই এবং এতদূর প্রতিকূল ছিল যে এই সম্মেলন আহূত হওয়া একরকম অসম্ভব ব্যাপার বলেই মনে করা হত। সাধারণ পরিষদে এই প্রস্তাবটি এবার সোৎসাহে এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। ১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাসে ৮ই তারিখে জেনেভাতে এই সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বসল, এবং ১৫ দিন ধরে এর কাজ চলল। ভারতীয় বিশিষ্ট পারমাণবিক বৈজ্ঞানিক ডাঃ হোমি জে, ভাভা এই সম্মেলনের পুরোধা ছিলেন। পারমাণবিক শক্তি বিষয়ক যে সকল তথ্য এতদিন অতিশয় গোপনীয় রহস্য বলে বিবেচিত ছিল, এই সম্মেলনে তাদের উপরে বহু প্রবন্ধ পাঠ, ভাষণ, আলোচনা ইত্যাদি চলল। পারমাণবিক যন্ত্রপাতি যথা, সক্রিয় পারমাণবিক চুল্লী এখানে প্রদর্শনীর মধ্যে স্থান পেল। এই সম্মেলনের বিপুল সাফল্যে পৃথিবীময় এমন একটা সাড়া পড়ে গেল, যে মনে হল, আন্তর্জাতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হবে।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর তারিখে মার্কিণ সরকার, রুশিয়া ও অন্য তিনটি দেশ, যথা ভারতবর্ষ, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ব্রাজিল, এই চারটি দেশকে অনুরোধ জানালেন, উপরে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের সংবিধান পাকাপাকিভাবে প্রণয়ন করার জন্য আটটি দেশের প্রতিনিধিরা ওয়াশিংটন শহরে শীঘ্রই যে সম্মেলন বসবে, তাতে তাঁদের নিজদের প্রতিনিধি পাঠাতে। বর্তমান বৎসরের এপ্রিল মাসে মোট বারোটি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এই উপসমিতি ওয়াশিংটনে তাঁদের প্রণীত সংবিধান সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করলেন এই সঙ্গে স্থির হল সেপ্টেম্বর মাসে ৮১টি দেশের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনের শেষ আলোচনা এবং অনুমোদনের জন্য তা পেশ করা হবে। এই প্রবন্ধটি যে সময়ে লেখা হচ্ছে, সেই সময়ে নিউইয়র্ক শহরে ঐ বৈঠক বসেছে। মোট ৮১টি দেশের প্রতিনিধি সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণ পেয়ে এতে যোগদান করেছেন। আমন্ত্রণ করা হয়নি চীনদেশকে এবং একারণে অনুপস্থিত তার প্রতিনিধি সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনেই রুশ প্রতিনিধি গুরেবিন সাহেব, ভারত প্রতিনিধি ডাঃ হোমি জে, ভাভা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। জনসংখ্যার বিপুলত্বে, সংস্কৃতিতে, রাজনৈতিক গুরুত্বে জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ চীন; তাকে বাদ দিয়ে এ প্রায় শিরহীন যজ্ঞ; ডালেস সাহেবের মতই সব টিকবে, এমন আশঙ্কা নাই, রুশিয়া এ সম্মেলনে আছেন।

কয়েকটি ব্যাপার, যা নিয়ে ঝগড়া বাধবার সম্ভাবনা ছিল, তাদের সমাধান আগে হয়েই, অর্থাৎ এপ্রিল মাসে যে বৈঠক বসেছিল তাতেই, হয়ে আছে। স্থির হয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যাবলী সম্বন্ধে সরকারীভাবে বিবরণ পাঠানো হবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে; "যথোপযুক্ত সময়ে" (এর অর্থ যাই হোক) নিরাপত্তা পরিষদের কাছে বিবরণ পাঠানো যেতে পারে। মনে রাখা প্রয়োজন, নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের প্রত্যেকেরই অধিকার আছে সংখ্যাধিক্যে যা কিছু প্রস্তাবই পাশ হোক না কেন তাকে একেই বাতিল করে দিতে। আমেরিকা চায় না এই প্রতিষ্ঠানটির উপর নিরাপত্তা পরিষদের কোনও কর্তৃত্ব থাকে; কারণ, রুশিয়া তার বাতিল করা বিষয়ক অধিকার বহুবার ব্যবহার করে মার্কিণের অনেক প্রস্তাব বানচাল করে দিয়েছেন। অতএব, প্রতিষ্ঠানটির পদ সম্বন্ধে এই যে সমাধান গৃহীত হয়েছে তা এই দুটি দেশের এবং সম্পর্কীয় বিরুদ্ধ মত দুটির ব্যাপারে একটা মধ্যমপন্থা স্থানীয়। তাঁরা যে দুজনেই এতে স্বীকৃত হয়েছেন, তাতে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হবার পথ সুগম হয়েছে। তবে, ঐ "যথোপযুক্ত সময়" কথাটির অর্থ নিয়ে ভবিষ্যতে আবার সম্ভব ঝগড়া বাধতে পারে।

প্রতিষ্ঠানটি দালালী ব্যাপারই হবে। তবে উত্তমর্ণ অধমর্ণকে সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্য বিভাজনযোগ্য পারমাণবিক উপকরণ দিতে পারলেও, এ জিনিষ প্রতিষ্ঠানের গুদামে জমা রাখাও হবে। এ জিনিষ খুব বেশী পরিমাণে মজুত

করা হবে না ; হঠাৎ যদি একটা যুদ্ধ বেধে যায় তবে কোনও যুদ্ধরত দেশ এদের হস্তগত করে যাতে সমরনির্মাণের ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা করে না উঠতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে এরূপ ব্যবস্থা। যাঁরা এ জিনিস দান নেবেন, তাঁরা একে আখিরে কাজে ব্যবহার না করে যুদ্ধোপকরণ নির্মাণের কাজে যাতে ব্যবহার না করেন তা নিশ্চিতরূপে জানতে পারবার জন্য প্রতিষ্ঠানের অধিকার থাকবে সর্বত্র পরিদর্শক পাঠাতে, তাঁরা হবেন অবাধগতি। এ আশঙ্কা যাতে সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হতে পারে তা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। এ সম্বন্ধে খসড়া সংবিধানে কতকগুলি উপায় সূচিত হয়েছে তা সম্ভবতঃ খুবই কঠোর (এ বিষয়ে যথেষ্ট বিবৃতি এখনো পাওয়া যায়নি) ভারত প্রতিনিধি তাঁর ভাষণে এই উপায়গুলি সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন ; কিছুদিন পূর্বে নিখিল ভারত রেডিয়োর দিল্লী কেন্দ্র হতে তিনি যে এতৎসম্পর্কে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন, "আজকাল হাঙ্গারি রাশিয়া টার্কি ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, প্রভৃতি এই জাতীয় জিনিস নিয়ে যেখে সেখে কারবার চলছে। এ সকল জিনিস যুদ্ধাস্ত্রনির্মাণের কাজের জন্যই কেনাবেচা হচ্ছে। এ অবস্থায় শুধু আন্তর্জাতীয় পারমাণবিক প্রতিষ্ঠানের মারফতে যে জিনিসগুলির লেনদেন হবে, তা নিয়ে কড়াকড়ি করতে যাওয়া শুধু অশোভন নয়, অন্যায়।" ঠিক কথা ; কিন্তু এই দুইটি কারবারের মধ্যে যেন একটু পার্থক্য আছে। দৈনিক যে কারবার চলছে তা আমেরিকার মুদির মতো ; এ তার একরূপ একচেটিয়া কারবার, আমেরিকা যাদের এই মাল বিক্রী করছেন, তারা তার নিজের যাহাই করা খরিদ্দার—একরকম তাঁবেদার মাত্র। আমেরিকা ভয় করছেন, প্রতিষ্ঠানের মারফতে যে কারবার হবে তা তার সম্পূর্ণ অধিকারের মধ্যে থাকবে না। মোট কথা, সেই গোড়ার ব্যাপার, আমেরিকা চান প্রতিষ্ঠানটিকে সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তাধীনে রাখতে। তাই ঐ কড়াকড়ির ব্যবস্থা।

সে সব যাই হোক, এরূপ আশা করা সঙ্গত, এ জাতীয় সকল দফারই আপোষে মীমাংসা হবে ; সংবিধানটি গৃহীত হবে ; প্রতিষ্ঠানটি এবার স্থাপিত হবে। আঠারোটি দেশ, বিশেষ করে পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন পাঁচটি দেশ, এই সংবিধান চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করলে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হবে। সকলে আশা করছেন, আগামী বৎসরের জুন মাস নাগাদ এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হবে। পৃথিবীর সকল দেশ, বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলি,—পারমাণবিক শক্তি যাদের অবশ্য প্রয়োজনীয়, তারা যদি এ হতে বাস্তবিকই যা চায় তাই পায়, তবে পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্তর আসবে। তা হবে কি ? কে জানে ?

[এই প্রবন্ধ লিখিত হ'বার পর ২৩শে অক্টোবর তারিখে নিউইয়র্কে ৮২টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সংস্থা গঠন সম্বন্ধে ২৩টি ধারা সম্বলিত এক বিধি গৃহীত হয়েছে। এই বিধি যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স ও কানাডার মধ্যে অন্ততঃ ৩টি রাষ্ট্রের দ্বারা অনুমোদিত হইলেই কার্যে পরিণত হতে পারবে। সমস্ত রাষ্ট্রের অনুমোদন-স্বাক্ষরের জন্য তিন মাস সময় দেওয়া হয়েছে।]

বিজ্ঞানে ভারতের দান :

ভারতবর্ষ যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বাধীন আসন লাভ করবে জগদীশচন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্বে তা একরূপ কল্পনার অতীত ছিল—আধুনিক বিজ্ঞানের দীপালিতে ভারতবাসী তিনিই প্রথম 'ভারতের দীপশিখা উৎসর্গ' করতে পেরেছিলেন। তারপর দীপ থেকে দীপমালা আলোকিত হয়ে চলল জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্রধারার সাধনায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন—একই বছর এই কয়টি ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ ক'রে নিজ নিজ বিষয়ে মৌলিক গবেষণায় রত হলেন, আর তাঁদের আবিষ্ক্রিয়া ভারতকে জগৎসভায় এক উন্নীত আসন দান করল।

আর কোনদিন দেখা যায় নি।

—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

রামমোহনের যুগ (১৮১৪—১৮৩৩)

জ্ঞানাঞ্জন পাল

[বাংলায় নবজাগরণ সম্বন্ধে ইংরেজীতে একখানি খুব ছোট বই বাহির হইয়াছিল ১৯৪৬ সালে। বইখানি এখন আর প্রায় পাওয়া যায় না। রচয়িতার নাম অমিত সেন। পুস্তিকাটির ইংরেজীতে নাম Notes on the Bengal Renaissance; অমিত সেন লেখকের আসল নাম নয়, আসল নামে তিনি একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক। বইখানি খুব ছোট হলেও বাংলার নবজাগৃতির প্রকৃতি ও গতির এক স্পষ্ট রেখাঙ্কন এতে পাওয়া যায়। এই বইকে অনুসরণ করে বাংলার নবজাগরণের একটা মোটামুটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে আমরা চেষ্টা করলাম। এই প্রবন্ধে ১৮১৪-১৮৩৩ খৃ রামমোহনের যুগের নানাদিকের কর্মের সূচনার কথা সংক্ষেপে বলা হ'ল।]

বাংলার নবজাগরণকে সাধারণভাবে পাঁচটি বড় ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ (১৮১৪-১৮৩৩) রামমোহনের যুগ। এই যুগের প্রধান নায়ক রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩); এই যুগেই পড়ে রামমোহনের সহকর্মীগণের কথা; রামমোহনের বিরোধী রক্ষণশীল দলের কর্ম এবং চেষ্টা; ডিরোজিও-র প্রেরণা ও শিক্ষায় নতুন চিন্তা ও আদর্শের উন্মেষ।

দ্বিতীয় ভাগ (১৮৩৩-১৮৫৭)—ডিরোজিও-র শিক্ষায় ও আদর্শে গঠিত নবা যুবকদলের অভ্যুদয়; মধ্যপন্থী ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকগণ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১); ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন গঠন ও রাষ্ট্রীয় কর্মের সূচনা; সিপাহী যুদ্ধ (১৮৫৭)।

তৃতীয় ভাগ (১৮৫৭-১৮৮৫)—সিপাহী যুদ্ধের পরে; জ্ঞানার্জনের স্পৃহা ও সাহিত্য সৃষ্টি; মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র; বঙ্কিমচন্দ্র ও 'বঙ্গদর্শন'; ধর্ম ও সমাজ সংস্কার এবং হিন্দু পুনরুত্থান; সুরেন্দ্রনাথ ও জাতীয়তা বোধের উন্মেষ।

চতুর্থ ভাগ (১৮৮৫-১৯০৫)—জাতীয় সম্মেলন ও জাতীয় মহাসমিতি গঠন; সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে নতুন শক্তির বিকাশ; 'স্বদেশীর' আদর্শ ও নতুন স্বাদেশিক কর্মচেষ্টা।

পঞ্চম ভাগ (১৯০৫-১৯১৯)—বঙ্গভঙ্গ; রাষ্ট্রকর্মে চরম মতবাদ ও সন্ত্রাসবাদ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধ; রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টি; দর্শনে ও বিজ্ঞানে বাংলার দান; শিল্পে নতুন দৃষ্টি।

১৮১৪-১৯১৯—বাংলায় নবজাগরণের এই শত বর্ষের কথা অতি সংক্ষেপে ও ইঙ্গিতে এই পুস্তিকায় বলা হয়েছে।

রামমোহনের যুগ (১৮১৪-১৮৩৩)—রামমোহন কলিকাতায় বাস করতে আরম্ভ করেন ১৮১৪ সালে; ইংলণ্ডে ১৮৩৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৮১৪-১৮৩৩ সালকে সুতরাং রামমোহনের যুগ বলা যেতে পারে।

রামমোহনকে সব থেকে পীড়া দিয়েছিল এদেশের চারিদিকের নিশ্চেষ্টতা ও প্রাণহীনতা। কি

রামমোহন রায়

জন্ম ১৭৭২ মৃত্যু ১৮৩৩

অন্ধকারের গর্ভের মধ্যেই না আমরা পড়ে গিয়েছিলাম ; এই মৃতপ্রায় জাতির জীবনে প্রাণ-সঞ্চার করার ব্রত তিনি গ্রহণ করলেন। কাজটা যেমন কঠিন, তেমন ব্যাপক।

ইংরেজের আগমনে বাহিরের জগতের সঙ্গে বাংলার ও ভারতের এক নতুন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। য়ুরোপীয় খৃষ্টীয় সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে ভারতের প্রাচীন হিন্দু সাধনা ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে। ভারতের সাধনাও এক বিরাট বস্তু। বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতির দান এতে এসে মিশেছে ; কেবল তাই নয়, ইস্‌লামীয় সভ্যতার সঙ্গে এর সংস্পর্শ হয়েছে, সংঘাত হয়েছে, উভয়ে দিয়েছে ও নিয়েছে। রামমোহন দেখ্‌লেন, এক নতুন সমন্বয়ের পথেই ভারতের সাধনা নবজীবন লাভ করতে পারে। তিনি সেই সমন্বয়ের পথ তৈরী করতে ব্যাপৃত হলেন। সংস্কৃত শাস্ত্র-সাহিত্যে অনুপ্রবেশের তাঁর সুযোগ হয়েছিল যখন তিনি কাশীতে সংস্কৃত পড়েন। পাটনায় তিনি ফার্সী ও আরবি পড়েন ও মুসলমান ধর্মমত ও সাধনার সঙ্গে পরিচিত হন। ভারতের বহুস্থান ভ্রমণ করায় বৌদ্ধ ও জৈন সিদ্ধান্ত অধিগত করার তাঁর সুযোগ হয়। তিনি ইংরেজীও শেখেন—একটু বেশী বয়সে—ও খৃষ্টীয় য়ুরোপীয় সাধনার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। এইভাবে বিভিন্ন ধর্মমত, সিদ্ধান্ত ও আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় তিনি এদেশে ও এ যুগে নতুন সমন্বয়ের সাধক ও প্রবর্তক হ'তে পেরেছিলেন।

ধর্ম-সমন্বয়

রামমোহন নিছক ভাব-বিলাসী ছিলেন না। দেশের নবজীবন লাভের পথ হিসাবেই তিনি এই সমন্বয়কে গ্রহণ করেছিলেন। ১৮১৫ সালে কলিকাতায় তিনি কয়েকজন বন্ধুদের নিয়ে আত্মীয়-সভা স্থাপন করেন। আলাপ-আলোচনায় তাঁদের মনে উদার শিক্ষার আলো প্রবেশ করল ; তাঁরা ইংরেজের সংস্পর্শে এসেছেন, ইংরেজের সম্পর্কে নতুন ধন অর্জনের সুযোগ পেতে আরম্ভ করে। রামমোহনের সাহস তাঁদের ছিল না। কিন্তু তাঁরা রামমোহনের অনুরাগী বা অনুবর্তী হলেন।

রামমোহন প্রচার আরম্ভ করলেন। একেশ্বরবাদে তাঁর মন যৌবনেই ঝুঁকেছিল—যখন তিনি পাটনায়—ফার্সীতে তিনি এক পুস্তিকাও রচনা করেছিলেন এ বিষয়ে। বেদান্তের আলোচনায় তাঁর এই মত আরও দৃঢ় হয়। বাংলায় তিনি বেদান্তের এক অনুবাদ প্রকাশ করলেন ; আর পাঁচখানি প্রধান উপনিষদেরও অনুবাদ করলেন। উদ্দেশ্য, হিন্দুরা দেখুন, প্রচলিত মত ও আচারের সঙ্গে প্রাচীন শাস্ত্র ও সিদ্ধান্তের কত বড় পার্থক্য দাঁড়িয়ে গেছে। প্রাচীন ব্রহ্মবাদ বা বেদান্ত বহু দেববাদের সমর্থন করে না, এক ঈশ্বরের উপাসনার কথাই বলে।

হিন্দুদের প্রচলিত ধর্ম ও আচারের সংস্কারের কথা যেমন তিনি বল্‌লেন, প্রচলিত খৃষ্টীয় মতবাদের সংস্কারের জন্যও তেমন বল্‌লেন। ১৮২০ সালে প্রকাশিত হ'ল তাঁর পুস্তিকা 'Precepts of Jesus' ; এতে তিনি যীশু খৃষ্টের নৈতিক আদর্শই জগতের বরণীয়, তথাকথিত অলৌকিক কাহিনীর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অযৌক্তিক বিবিধ মতবাদ নয়—এ কথা বলেন। ১৮২০-২৩ সালের মধ্যে তিনি 'Appeals to the Christian Public' নামে তিনখানি পুস্তিকা রচনা করে খৃষ্টিয় মতবাদকে বন্ধ-সংস্কার থেকে মুক্ত হ'বার জন্য বলেন।

খৃষ্টিয়ান পাদ্রীরা রাজার দেশের লোক ; তাঁদের ধর্ম রাজার ধর্ম ; দম্ভ তাঁদের অনেক বেশী। তাঁরা রামমোহনকে কেবল অগ্রাহ্য নয়, নানাভাবে তাঁর কাজে বাধা দিতে আরম্ভ করলেন। রামমোহন ১৮২২-২৩ সালে প্রকাশ করলেন তাঁর পত্রিকা—বাংলায় নাম 'ব্রাহ্মণ সেবধি', ইংরেজীতে 'Brahminical Magazine' এই পত্রিকায় তিনি এই দম্ভের প্রতিবাদ করলেন ; সত্যের সন্ধানে, তিনি বল্লেন, বিজেতা বিজিত নেই, সত্য ধনীর প্রাসাদে কেবল থাকে না, দরিদ্রের কুটীরেও থাকে। এদেশের লোককে বিদ্রূপ করা বা হেয় করা পাদ্রীদের সাজে না। সভ্যতা বা সাধনার উৎকর্ষের দাবী রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা সত্ত্বেও ভারতের যায়নি। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতায় অনেক সময় সভ্যতার উৎকর্ষই সূচিত হয়। সভ্যতার যে কোমলতা আনে দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে সেই কোমলতাই অনেক সময় সুযোগ দেয়।

বিভিন্ন ধর্মের সংস্কারের জন্য রামমোহনের সংগ্রাম তাঁর একদিকের কাজ মাত্র। একে আমাদের ভাষায় 'নেতির' পথ বলে। কিন্তু এই সংস্কারের আসল উদ্দেশ্য এদেরকে একসূত্রে গাঁথা। তিনি সে চেষ্টা করেন। সমন্বয়ের জন্য সংস্কার প্রয়োজন। ১৮২৩ সালে ইংরেজীতে 'Humble Suggestions' নামে পুস্তিকাতে তিনি বলেন, বিভিন্ন মতবাদ সত্ত্বেও এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ধর্মাবলম্বীরা পরস্পরের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই যুক্ত। ১৮২৫ সালে "Different Modes of Worship" পুস্তিকায় তিনি পরমত সহিষ্ণুতার কথা বলেন।

এর কিছু পরে ১৮২৮ সালে "ব্রহ্মসভা" প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বিভিন্ন মতবাদ সত্ত্বেও জগতের এক নিয়ন্তা বা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী সব উপাসকদের মধ্যে যে মূলগত ঐক্য, তাই হ'ল 'ব্রহ্মসভা' প্রতিষ্ঠার প্রাণ। ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হ'ল সম্মিলিত ভজনালয়ের ভিত্তি। এই ভজনালয়ের গঠন-তন্ত্রে রামমোহনের ধর্ম-সমন্বয়ের আদর্শ বাস্তব রূপ পেল। এই সমন্বয়ের উদার ভিত্তি আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। রামমোহনের আদর্শেই বাংলায় ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের পরবর্তী আন্দোলন গড়ে উঠতে চেষ্টা করে।

সমাজ-সংস্কার

রামমোহন কেবল দার্শনিক পণ্ডিত বা ধর্মসংস্কারক মাত্র ছিলেন না। দেশের নৈতিক বোধ ও সামাজিক চেতনা জাগানোর কাজেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। আমাদের দেশে সহমরণ ছিল স্ত্রীর সতীত্বের চরম নিদর্শন। বুদ্ধির মূঢ়তায় এর নৃশংসতা আমাদের বিচলিত করত না। পরলোকে সদ্‌গতির নামে সমাজ একে সোৎসাহে প্রশ্রয় দিত। ১৮১৫—১৮২৮ সালের মধ্যে এইরকম আট হাজার সহমরণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে হিসাব পাওয়া যায়। সৎ শাস্ত্রে, বলা বাহুল্য, এর সমর্থন নেই, থাকতে পারে না। শুধু রামমোহন নয়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও এর সমর্থন করেন নি। কিন্তু শাস্ত্রের অজ্ঞতায় কুসংস্কারের প্রভাব কমে না। অসাধারণ পৌরুষ ও অনমনীয় দৃঢ়তার সহিত সংগ্রাম ছাড়া একে দূর করা সম্ভব ছিল না। ১৮১৮-১৮২৯—এগার বৎসর রামমোহন এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। শেষোক্ত বছরে বেন্টিঙ্কের আদেশে এই প্রথা রদ হয়। গোঁড়া হিন্দুদের চেষ্টায় আবার যাতে ইহা

প্রবর্তিত না হতে পারে তার জন্য রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে তিনশত স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদন প্রস্তুত করিয়ে বিলাতের পার্লামেন্টে পাঠিয়ে দেন।

শিক্ষায় নতুন ধারা

শিক্ষায় নতুন ধারা প্রবর্তিত না হ'লে সমাজে বা সাধারণের জীবনে উন্নততর আদর্শ স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পাবে না। নতুন শিক্ষার প্রবর্তনে রামমোহনের উৎসাহ ও চেষ্টার অন্ত ছিল না। এই নতুন শিক্ষার প্রেরণায় ১৮১৭ সালে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। রামমোহন এর অন্যতম উৎসাহদাতা ছিলেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু সমাজপতিরা ইংরেজের সংস্পর্শে নতুন ধনী হ'তে আরম্ভ করেছেন। ইংরেজী শিক্ষার সাংসারিক প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উপলব্ধি করেছেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনে তাঁরাও এগিয়ে এলেন—কিন্তু রামমোহন থাকলে যোগ দেবেন না, বললেন। রামমোহন হিন্দু কলেজের কমিটি থেকে সরে দাঁড়ালেন। তিনি এক নতুন ধরণের শিক্ষালয় নিজে স্থাপন করলেন; তাতে জ্যোতিষ ও শিল্প-শিক্ষার সঙ্গে পড়ান হ'ত ভল্‌টেয়ার ও ইউক্লিড। ১৮২৫ সালে তিনি এক বেদান্ত কলেজও প্রতিষ্ঠা করেন, তাতেও প্রাচীন ভারতের তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে পশ্চিমের নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

রামমোহনের শিক্ষার আদর্শ কতটা বিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিক ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে চিঠি থেকে। আমাদের দেশে প্রচলিত জীর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ জানালেন। ১৮৩৫ সালে বেন্টিঙ্ক ও মেকলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন দেশে করেন; কিন্তু রামমোহনের আদর্শ তাঁরা সম্পূর্ণ নিতে পেরেছিলেন, বলা যায় না। এ দেশের সাধনা সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান ছিল খুব অল্প, মর্যাদা বোধ ছিল তার চাইতেও কম। এদেশের সভ্যতা নিকৃষ্ট, য়ুরোপীয় সভ্যতা উৎকৃষ্ট—এই যুক্তিতে তাঁরা ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করলেন। রামমোহন চেয়েছিলেন এদেশের সনাতন সাধনায় যা শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মেশাতে। ইংরেজী শিক্ষার অন্ধ অনুকরণ তিনি চাননি।

বাংলার গদ্য-সাহিত্য

রামমোহন বাংলা গদ্য সাহিত্যেরও একজন স্রষ্টা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের বাংলা শেখাবার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের সৃষ্টি হয়; প্রসিদ্ধ কেরী সাহেবের উপর এর ভার ন্যস্ত হয়। সংস্কৃতজ্ঞ কয়েকজন বাঙ্গালী পণ্ডিত তাঁর সহকারী হ'ন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। বাংলা গদ্যের তিনিও একজন স্রষ্টা। কেরীর নেতৃত্বে বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান রচিত হয়। বাংলা অক্ষর খোদাই করে বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠায়ও কেরীই অগ্রণী। ১৮১৮ সালে বাংলার প্রথম সাপ্তাহিক পত্র "সমাচার দর্পণ" কেরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। কেরী প্রমুখের এসব দান কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্বীকার করেও একথা বলা যায় যে রামমোহনের প্রতিভা এবং তাঁর দেশের সনাতন সাধনার সঙ্গে

আধুনিক আদর্শের যুগপৎ পরিচয় বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টিকালে যে শক্তি-সঞ্চার করে তা অন্যদের দ্বারা সম্ভব হয়নি। বাংলা গদ্য অনেকটা রামমোহনের ধারাকে অবলম্বন করেই বিচিত্ররূপে গত শত বর্ষে বিকশিত হয়েছে।

রামমোহনের চেষ্টা অন্য বিবিধ ক্ষেত্রেও নিয়োজিত হয়। সর্বতোমুখী এরূপ চেষ্টা ছাড়া মৃতকল্প জাতি নতুন প্রাণ লাভ করে না। ১৮২৭ সালে তিনি "বজ্রসূচীর" বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে জাতিভেদের অনিষ্টকারিতার দিকে দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দেশ যদি নানা জাতে বহুধা বিভক্ত হয়, তা'হলে আর জাতি গড়তে পারবে না। জাতীয় ভাবের আকর্ষণে যে প্রকৃত স্বদেশপ্রেম জন্মে তাও জাগতে পারবে না। ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার জাতি-গঠন ও সাংসারিক অভ্যুদয়ের জন্যও প্রয়োজন। বহুসংখ্যক মানুষ পঙ্গু হয়ে থাকলে রাষ্ট্রে বা অর্থনৈতিক জীবনে উন্নতির সম্ভাবনা থাকে না। ১৮২৮ সালে এক পত্রে তিনি এসকল কথা বোঝাতে চেষ্টা করেন।

রাষ্ট্রীয় কর্ম-চেষ্টা

রামমোহনের রাষ্ট্রীয় কর্মচেষ্টাও কম ছিল না। স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ ভারতের ছবি রামমোহনের চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠেছে। তাঁর আশা ছিল, ইংরেজের সাহায্যে এদেশ অন্যদের মত উন্নত হবে অদূর ভবিষ্যতে; তখন ইংরেজের নেতৃত্ব আর প্রয়োজন হবে না। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ভার গ্রহণ করবেন। দেশ তখন স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ হবে। এরূপ কথা তিনি ১৮২৩ সালে ইংরেজ ও অন্য বন্ধুদের নিকট বলেন। ইংরেজ সহজে এদেশ ছেড়ে যায় নি সত্য; কিন্তু দেশের স্বাধীনতা দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টাতেই যে লাভ হয়েছে, এ কথা অনস্বীকার্য। আর এর সূচনা করেন রামমোহন।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

১৮২৩ সালে দেশের সংবাদপত্রদের উপর এক নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। এর বিরুদ্ধে রামমোহন ও তাঁর অনুকর্মীরা তীব্র প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করেন। এই প্রতিবাদ যেমন সুযুক্তিতে তেমন তেজে পূর্ণ; ইহা মিলটনের Areopagatica-কে স্মরণ করিয়ে দেয়। ফার্সী ভাষায় তাঁর পত্রিকা "মিরাৎ-উল্-আখবর"-এর প্রকাশ রামমোহন এর প্রতিবাদে বন্ধ করে দেন।

রামমোহন ১৮২১ সালে বাংলা সাপ্তাহিক পত্র "সংবাদ কৌমুদীর" প্রকাশ আরম্ভ করেন। তাঁর ফার্সী সাপ্তাহিকের কথা আগেই বলেছি। এই সকল সাময়িক পত্রের সাহায্যে তিনি দেশপ্রীতি জাগাতে চেষ্টা করেন ও দেশের সর্ববিধ উন্নতির জন্য জনমত গঠন করতে থাকেন। তাঁর "কৌমুদীতে" যে সব বিষয় আলোচিত হ'ত তাতে তাঁর দৃষ্টি দেশ সম্বন্ধে কত সজাগ ছিল বুঝতে পারা যায়। কলিকাতার রাস্তায় ইংরেজের বেপরোয়া গাড়ী চালানোতে পথচারীর কি অসুবিধা হয়, এদেশের ধান বিদেশে রপ্তানি করা কেন অন্যায়, উৎসবাদিতে অযথা অর্থব্যয় করা ধনীদের কেন অনুচিত—এসব বিষয় পত্রিকায় আলোচিত হ'ত। বিদেশের কথাও থাকত। চীনের সমস্যা, গ্রীসের সংগ্রাম, জমিদারদের অমিতব্যয় ও গ্রামে না থাকায়

এবং অত্যাচারে আয়র্লণ্ডের অধিবাসীদের দুঃখ—এসবের কথাও থাকত। সংবাদ-পত্র পরিচালনে তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গী এমনই আধুনিক ছিল।

রামমোহন নারীর অধিকার সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। ১৮২২ সালে এক পত্রে তিনি বিধবা ও অবিবাহিতা কন্যার স্বামী বা পিতার সম্পত্তিতে অধিকার ন্যায়ানুমোদিত, এ কথা প্রমাণ করেন। পুরুষের বহু বিবাহের তিনি বিরোধী ছিলেন।

এদেশের উপর যে সব অবিচার হচ্ছিল, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে নতুন সনদ দেওয়ার সময় (১৮৩৩ সালে) তা যাতে দূর হয়, তার জন্য তিনি চেষ্টা করেন। কোম্পানি রাজত্ব করে এবং ব্যবসাও করে। এতে দেশের শিল্প-বাণিজ্য দেশের স্বার্থে ও এদেশীয়দের দ্বারা আর ভাল ভাবে পরিচালিত হ'তে পারছিল না—সম্পূর্ণ নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিল। তিনি এ ব্যবস্থার পরিবর্তন দাবী করেন। জনির উপর অন্যায় কর ধার্য করায় তিনি প্রতিবাদ করেন ১৮৩০ সালে। ১৮২৭ সালের জুরী আইনের বৈষম্যের বিরুদ্ধেও তিনি দণ্ডায়মান হ'ন।

সমুদ্র-লঙ্ঘন তখন হিন্দুর সংস্কারে নিষিদ্ধ ছিল। ১৮৩১ সালে রামমোহন আত্মীয়-পরিজন সঙ্গে বিলাত যান। সেখানে অন্য কাজের মধ্যে খাজনা ইত্যাদি স্থায়ী ভাবে নির্দ্ধারিত হয়ে রায়তের অবস্থা যাতে ভাল হয় তার চেষ্টা করেন। ইংরেজের শাসনে যে সব সংস্কার তিনি আশু প্রয়োজন মনে করেন, তার মধ্যে ছিল, ভারতীয়দের উচ্চপদে নিয়োগ, বিচারের ভার জেলার কর্তা বা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের হাতে না রাখা এবং জুরির সাহায্যে ভারতীয়দেরও বিচারের ব্যবস্থা করা।

আন্তর্জাতিক বোধ

রামমোহনের দেশাত্মবোধ যেমন সজাগ ছিল, আন্তর্জাতিক বোধও তেমন জাগ্রত ছিল। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তাঁর অনুরাগ যৌবনেই দেখা গিয়েছিল। রংপুরে ডিগ্‌বির অধীনে কাজ করার সময়েই য়ুরোপীয় রাজনীতির সঙ্গে তিনি নিজের চেষ্টায় পরিচিত হ'ন। ১৮২১ সালে নেপ্‌ল্‌সে বিপ্লব জয়যুক্ত না হওয়ায় তিনি অত্যন্ত দুঃখবোধ করেছিলেন—সংবাদ পেয়ে অন্য কোন সাধারণ অনুষ্ঠানে সেদিন তিনি যোগ দেননি। ১৮২৩ সালে স্পেনীয় আমেরিকায় গণতন্ত্র জয়ী হওয়ায় তিনি বড় ভোজ দিয়েছিলেন কলিকাতায়। স্পেনীয় ভাষায় লেখা নতুন সংবিধানের একখানি বই তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। ১৮৩০ সাল জুলাই মাসের ফ্রান্সের বিপ্লবের খবরে তিনি এমনই অভিভূত হয়েছিলেন যে এছাড়া অন্য কথা তাঁর মুখে ক'দিন আর শোনা যায়নি। ইংলণ্ডের পথে কেপটাউনে ফরাসী বিপ্লবের তিন-রঙা পতাকা উড়ান জাহাজ দেখে তিনি নেমে সেই পতাকাকে সম্মান দেখান, এমনই ছিল তাঁর স্বাধীনতা-প্রীতি—সে স্বাধীনতা অন্য দেশের হলেও। অতি অল্পকাল কেপটাউনে অবস্থান করা সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অর্থভাণ্ডারে তিনি কিছু অর্থ সাহায্য করেন।

ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে ১৮৩২ সালে নতুন সংস্কার বিধির আলোচনা চল্‌ছিল। ইংলণ্ডের শ্রমিকদের ও জনগণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ এই সংস্কার বিধিবদ্ধ হওয়ার উপর অনেকটা নির্ভর করছিল। এই সংস্কার

আইনে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনায় রামমোহন উৎসাহিত হয়ে উঠেন। ম্যাঞ্চেস্টারের শ্রমিকদের সোৎসাহে বলে পাঠান—'সংস্কার চাই-ই চাই'। সংস্কার-বিধি নিয়ে ইংলণ্ডের দ্বন্দ্বকে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম, এই আখ্যায় ভূষিত করেন। এই সংস্কার যদি পার্লামেণ্ট গ্রহণ না করে, তা'হলে ইংলণ্ডের সঙ্গে তিনি স্বেচ্ছায় আর কোন সম্পর্ক রাখবেন না, এমন অভিমতও ব্যক্ত করেন।

ধর্মে ধর্মে যেমন তিনি ভারতবর্ষে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন, তেমন ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতিকে প্রীতির বন্ধনেও তিনি বাঁধতে চেয়েছিলেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অবাধ যাতায়াতের ব্যবস্থার জন্য তিনি উৎসুক ছিলেন। ইংলণ্ড ও ফরাসীর মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হ'লে তার মীমাংসার ভার উভয়ের সম্মতিতে প্রতিষ্ঠিত এক সম্মিলিত কংগ্রেসের উপরই ন্যস্ত হ'তে পারে—এ অভিমত তিনি ব্যক্ত করেন। আন্তর্জাতিক মেলা মেলাতেই জাতীয় জীবন সজীব থাকে, তিনি মনে করতেন।

রামমোহনের দেশপ্রেম ছিল যেমন গভীর, দৃষ্টি ছিল তেমন উদার এবং মনীষা ছিল সেইরূপই অনন্যসাধারণ। ভারতের নবজাগরণের তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে প্রথম ও প্রধান নায়ক।

রামমোহনের অনুবর্তীগণ

রামমোহন এই নব জাগরণের প্রধান নেতা হ'লেও সম্পূর্ণ একক ছিলেন বা তিনি এই যুগের একটা নিঃসঙ্গ বিস্ময় সৃষ্টি, একথা বলা যায় না। রংপুরেও তাঁকে ঘিরে এক ছোট দল তৈরী হয়। কয়েকজন সহকর্মীদের নিয়ে ১৮১৫ সালে তাঁর আত্মীয়-সভা ও ১৮২৮ সালে ব্রহ্ম-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব সহযোগীরা তখনকার দিনের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁর বিবিধ কর্মচেষ্টা যে সে সময়ের উপযোগী ছিল, এতে এ প্রমাণ হয়।

রামমোহনের এদেশীয় সহযোগীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি—ইংরেজের সহযোগে এঁরা তখন বড় ধনী হয়েছেন। আর ছিলেন চন্দ্রশেখর দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখ—এঁরা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের।

এছাড়া আর একজন তাঁর সহযোগী ছিলেন—তাঁকে বিদেশী বললে ভুল বলা হবে। বৈশিষ্ট্যে তাঁর তুলনা মেলে কম। তিনি ছিলেন ডেভিড হেয়ার। ১৭৭৫ সালে তাঁর জন্ম হয়। এদেশে তিনি আসেন ১৮০০ সালে ঘড়ির ব্যবসায়ী হিসাবে। বৃত্তিতে এই ব্যবসায়ী হলেন সহজাত ধর্মে শিক্ষাব্রতী। এদেশে আধুনিক উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে তাঁর উৎসাহ ও চেষ্টার শেষ ছিল না। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অগ্রণীদের অন্যতম। ১৮৪২ সালে কলিকাতায় এদেশের ছাত্রদের এই অকৃত্রিম বন্ধু কলেরায় মারা যান।

বিরোধী দল

রামমোহনের বিরোধীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতি। এঁরা দু'জনে ছিলেন হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। রামমোহনের মত গতানুগতিক হিন্দু ধর্ম ও সামাজিক প্রথাকে তাঁরা বর্জন করতে না চাইলেও সব বিষয়ে তাঁরা সংস্কার-বিরোধী ছিলেন না। দেশে নতুন শিক্ষা-প্রসারে এঁদের দান কম নয়। রাধাকান্ত দেব সতীদাহ প্রথার পক্ষে অভিমত দিলেও, পূর্বেই বলেছি, পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সতীদাহের বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন।

নতুন চেতনার উন্মেষ

রামমোহনের জীবনকালের মধ্যেই ভারতের নবজাগরণে এক নতুন শক্তির উন্মেষের সম্ভাবনা দেখা দেয়। জাতীয় জাগরণের স্বাভাবিক গতিতে এরকমই হয়। এংলো-ইণ্ডিয়ান ডিরোজিওকে কেন্দ্র করে এই নতুন প্রেরণা নবা-শিক্ষিত যুবকদের হৃদয়-মন অধিকার করে বসে। এর মাদকতায় এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি হয় নবজাগরণের এই প্রারম্ভের মুখে। ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতার বাণী ডিরোজিও-র চিন্তা ও আদর্শকে অভিভূত করে। তাঁর শিক্ষার প্রভাবে ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ তরঙ্গ তোলে আমাদের এগিয়ে-আসা যুবকদের মনে। পুরাতন সমাজের ও ধর্মের সব বন্ধনকে এঁরা ভাঙ্গতে আরম্ভ করেন। ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক ছিলেন। সাধারণ শিক্ষক যা করেন না বা করতে পারেন না এমন এক আকর্ষণে তিনি তাঁর ছাত্রদের আকৃষ্ট করেন ; তাঁর বাড়ী যেন তাদেরই বাড়ী। সব বিষয়ের অকুণ্ঠ আলোচনা হয় তাদের তাঁর সঙ্গে। সব বিষয় জানবার ও বোঝবার চেষ্টা হয় যুক্তির সাহায্যে ; পূর্বের সংস্কার যুক্তিতে না টিকলে অবলীলাক্রমে তাকে বর্জন করা হয়। এতে স্বভাবতঃই জীর্ণ হিন্দু সমাজে বড় ওলট-পালটের ভয় হয়। হিন্দু সমাজপতিরা ছিলেন হিন্দু কলেজের কর্তা ; তাঁরা ভীত হয়ে রামকমল সেনের নেতৃত্বে ১৮৩১ সালে ডিরোজিওকে স্কুল থেকে অপসৃত করেন। সেই বৎসরেই ডিরোজিও কলেরায় মারা যান।

ডিরোজিও-র ছাত্রদের 'ইয়ং বেঙ্গল' বলা হ'ত। ১৮৩১ সালেই তাঁদের দু'খানা কাগজ বাহির হ'তে থাকে,—ইংরেজীতে 'Enquirer' ও বাংলায় "জ্ঞানান্বেষণ"। নাম থেকেই বোঝা যায় এঁরা কিছু না বুঝে মেনে নিতে রাজী ছিলেন না—জিজ্ঞাসার দ্বারা, যুক্তির দ্বারা তাঁরা সব কিছু পরখ করে মানতে চান। সংস্কারকে বর্জন করলে পুরাতন সমাজকে বর্জন করা সোজা হয়ে যায়। ১৮৩২ সালে এঁদের দু'জন প্রধান—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র ঘোষ খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করেন। এই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে দেশ কি করে এগিয়ে চলল, তার কাহিনী পরের অধ্যায়ের মধ্যে পড়ে।

১৮৩৩ সালে ব্রিস্টলে রামমোহনের মৃত্যুতে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় বা যুগ—যাকে রামমোহনের যুগ আমরা সত্য ভাবে বলতে পারি—তার পরিসমাপ্তি হয়।

নবযুগের উৎসব :

রামমোহন রায়ের আগমনের পর থেকে আমাদের দেশের চিন্তা বাক্য ও কর্ম, সম্পূর্ণ না জেনেও, একটি চিরন্তনের অভিমুখে চলেছে।.....

আমরা অনুভব করছি, সমাজের সঙ্গে সমাজ, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞান, ধর্মের সঙ্গে ধর্ম, পরমতীর্থে এক সাগর-সংগমে, পুণ্যস্নান করতে পারে, তারই রহস্য আমরা আবিষ্কার করব।

—রবীন্দ্রনাথ

নারীর সৌন্দর্য

ডাঃ রবীন্দ্রকুমার পাল

দেহের সৌন্দর্য বলিতে আমরা কী বুঝি? দেহের রূপ বা সৌন্দর্যের কোন সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। এক কথায়, সুগঠিত, সামঞ্জস্যপূর্ণ, সুস্থ ও কমনীয় ভাবপূর্ণ দেহ যাহার, তাহাকেই সুন্দরী বলা যায়। কিন্তু সৌন্দর্যের মাপকাঠি আবার সবত্র এক নয়; দেশ, কাল, পাত্র ও সমাজ ভেদে সৌন্দর্য বিচারের অনেক তারতম্য হয়। আবার রূপ কখনও চিরস্থায়ী নয়; সাধারণতঃ ইহা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু যত্ন ও চেষ্টায় অনেকস্থলেই ইহাকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়।

ইংরেজী ভাষায় একটি কথা আছে, "Beauty is skin deep" অর্থাৎ দেহের চামড়াই হইল সৌন্দর্যের স্থান। কথাটি খুবই সত্য। দেহের সব কিছুই যদি ভাল হয় (অর্থাৎ সুগঠিত ও বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্যপূর্ণ দেহ এবং নিটোল স্বাস্থ্য থাকে) তাহা সত্ত্বেও দেহের ত্বক্ যদি রুক্ষ ও কর্কশ হয় কিংবা তাহাতে স্বাভাবিক লালিত্যের অভাব থাকে, তাহা হইলে কখনই দেহে সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিতে পারে না। একই ভাবে চামড়ার উপর যদি পোড়া ঘা কিংবা কাটার দাগ থাকে, কিংবা অতিরিক্ত মেদবাহুল্য-বশতঃ তাহাতে অস্বাভাবিক ভাবে ভাঁজ পড়ে কিংবা স্বাভাবিক চর্বির অভাবে তাহা কুঁচকাইয়া যায়, তাহা হইলেও সৌন্দর্যের আর লেশমাত্র থাকে না। শরীরের যে সকল বিভিন্ন অংশ বাহিরে থাকে যেমন মুখ, হাত, পা প্রভৃতি এবং কাপড়ে ঢাকা থাকে যে সকল অংশ, তাহাতেও চামড়ার উপর দেখা যায় যে লোমকূপগুলি, তাহা দিয়ে সর্বদাই ঘামের সঙ্গে বাহির হয় চামড়ার নীচেকার স্নেহ-গ্রন্থির পাশাপাশি অবস্থিত অপর আর এক প্রকারের গ্রন্থি হইতে তেলের মত কলেস্টেরোল জাতীয় উপাদান 'সিবাম', আর তাহাতেই চামড়ার উপর ফুটিয়া উঠে স্বাভাবিক মসৃণতা ও কমনীয়তা। এই অতি স্বাভাবিক ক্রিয়ার ফলেই ক্রীম, স্নো, পাউডার, জলের সংস্পর্শে না আসিলেও দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ত্বকের মাধ্যমে ফুটিয়া উঠে।

আবার একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলেন, "ত্বক, চর্বি, মাংস ও রক্তকে পৃথক করিয়া নারী দেহে যদি কোন সৌন্দর্য অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহাকে ভালবাসিও।" কথাটি নিছক উপদেশ নহে, ইহা সত্য এবং সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ত্বকের পরেই দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্যের জন্য আবশ্যক তার নীচেকার পরিমিত চর্বি, যাহার অভাবে দেহের নানাস্থানে হাড়গুলি অতি বিসদৃশ ভাবে প্রকট হইয়া উঠে এবং দেহের সৌন্দর্যকে ব্যাহত করে। উপযুক্ত পরিমাণে চর্বির অভাবে অতি প্রকট কণ্ঠা, চোয়ালের হাড়, হুম্বু, বগ, বুকের পঞ্জর কিংবা গাঁট বাহির করা আঙুলগুলি কখনই সৌন্দর্যের প্রতীক বলিয়া বিবেচিত হয় না। আবার অঙ্গভাবে অতিরিক্ত চর্বি সঞ্চয়ের ফলে ভুঁড়ি আত্মপ্রকাশ করে, ঘাড়ের উপর ঘাড়ের মত কুঁদ, গোদল কুৎকুৎ চোখ, চিবির মত কপোল প্রভৃতি দেখা দেয়, তাহা হইলেও এমন সুন্দর যে মানুষের দেহ তাহাও কুৎসিৎ হইয়া যায়। সুতরাং ত্বক্ নিম্নবর্তী পরিমিত চর্বিও দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক।

চর্বির নীচেই থাকে মাংস পেশীগুলি। উপযুক্ত চালনা ও ব্যায়ামের ফলেই তাহারা হয় সুগঠিত ও কার্যক্ষম। সুগঠিত পেশীগুলিও দেহের সৌন্দর্যের পক্ষে আবশ্যক, কেননা তাহাতে দেহের এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের সামঞ্জস্য রক্ষার সাহায্য হয়। কিন্তু ঐগুলি অসংগঠিত কিংবা শিথিল হইলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও অক্ষম ও শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়ে—তাহাতে দেহ কখনই আর সুন্দর থাকিতে পারে না। কী পুরুষ, কী মেয়ে সকলের পক্ষেই দেহ সুগঠিত না হইলে কখনই তাহা সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হয় না।

দেহকে সুস্থ রাখিতে হইলে কিংবা দেহের সৌন্দর্যের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে রক্ত চলাচলের প্রয়োজনও বড় কম নহে। যদি কোন কারণে দেহ রক্তশূন্য ও ফ্যাকাসে হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐরূপ দেহ কখনই সুন্দর বলিয়া বোধ হয় না। আবার মেয়েদের মুখে হর্ষ, পুলক কিংবা ব্রীড়াহেতু সাময়িকভাবে অধিকতর রক্ত সঞ্চালনের ফলে যে অপূর্ব লালিমা ও সুষমা ফুটিয়া উঠে, তাহাতে তাহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য আরও বহু গুণে বাড়িয়া যায়।

অস্থি, মাংস, চর্বি ও রক্তকে দেহ হইতে পৃথক করিলেও দেহের সৌন্দর্যের সব কিছুকেই যে সরাইয়া নেওয়া হইল, ইহা ঠিক নহে. কারণ কাঠামো ও দেহকাণ্ডের অস্থিগুলির দ্বারা গঠিত যে দেহের কাঠামো, ঐ হাড়গুলির প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের আনুপাতিক সামঞ্জস্যও দেহের সৌন্দর্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক। দেহের অনুপাতে মাথা যদি খুব বড় বা ছোট হয়, খর্বকায় দেহে হাত-পা গুলি যদি অতিশয় দীর্ঘ কিংবা দীর্ঘকায় দেহে ঐগুলি যদি অস্বাভাবিক ভাবে খাটো হয়, কিংবা কবোটিসহ দেহকাণ্ডের উপরকার অংশ নীচেকার অংশের সম-দীর্ঘ না হয়ে দীর্ঘতর বা হ্রস্বতর হয় তাহা হইলেও দেহের বিভিন্ন অংশের আনুপাতিক সামঞ্জস্যের অভাবে দেহ কিছুতেই সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হয় না।

তারপর আসে মুখ, দাঁত, নাক, ঠোঁট, চোখ, ভুরু, বুক, আঙুল, কোমর, উরু প্রভৃতির গড়ন। কালিদাসের মেঘদূতে আছে, "চকিত হরিণী-প্রেক্ষণা", রবীন্দ্রনাথের কবিতায় "কালো হরিণ চোখ", চলতি বাংলায় পটলচেরা চোখ। কালো চোখের আদর সর্বত্র। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের নীলোৎপল নেত্র বা কমললোচন প্রশংসিত হইলেও আমাদের দেশে মেমসাহেবদের মত নীল চোখ মার্জার নয়নের পর্যায়ে পড়ে। বড় বড় চোখের পল্লব, বিলোল কটাক্ষ ও কামদেবের ধনুর মত ভুরু (১) সৌন্দর্যের অঙ্গ বলিয়া পরিচিত।

উন্নত নাসিকা অনেকের কাছে সৌন্দর্যের অংশবিশেষ, তাই "খগরাজ পাখ লাজ নাসিকা অতুল"; কিন্তু মেয়েদের বেলায় "তিলফুল জিনি নাসা" এবং "চাঁপ-বরনী" মেয়ের বিপরীত ভাবে "খাঁদোনাকী বৌ"।

মুখমণ্ডল সম্বন্ধে চাঁদের মত মুখ (২), এটি মুখ যে একখানি পান দিয়ে ঢাকা যায়, মুখপদ্ম, এমনি সব তুলনা হয় তার সৌন্দর্য সম্বন্ধে। ঠোঁটগুলি যেন পদ্মের পাপড়ির মত, মুক্তোর মত দাঁত (৩) কিংবা দন্ত-কৌমুদী, এমনি তুলনা হয় যথাক্রমে সুন্দর ঠোঁট ও দাঁতের 'হাসিতে মুক্তো ঝরে', হাসতে গেলে গালে টোল খায় কিংবা সেখানে কোথাও ছোট্ট একটি তিল মুখের সৌন্দর্যকে অনেকটা বাড়াইয়া তোলে। একইভাবে মরালগ্রীবা, পাকা তালিমের মত পয়োধর (৪) মৃণালভুজ, চম্পকাঙ্গুলি, ঘনকৃষ্ণ কেশদাম বা মেঘবরণ চুল, সাপের মত বেণী (৫) মুখের উপর অবিন্যস্ত দু'একগাছি চূর্ণ কুন্তল, ক্ষীণ কটি(৬) গুরু নিতম্ব (৭) হাতীর শুঁড় কিংবা কলাগাছের মত উরু (৮), এই সকলই নারীদেহের সৌন্দর্যের অংশ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে এইরূপ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে একত্র জুড়িয়া যদি

(১) ভুরু দেখি ভুলধনু বহু হেলাইয়া,
লুকায়ে লুকায় রাজার মাঝে অনঙ্গ রহিয়া।
—(অন্নদা মঙ্গল), ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

(২) কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা,
পদনখে পড়ি আছে তার কতগুলা।—(বিদ্যাসুন্দর) ঐ

(৩) কি কাজ সিন্দুরে মাজি মুকুতার হার,
ভুলায় তর্কের পাতি, দন্তপাতি তার।— ঐ

(৪) কুচ হইতে কত উচ্চ মেরুচূড়া ধরে,
শিহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে। ঐ

(৫) বিনাবিনি বিনোদিয়া বেণীর শোভায়,
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়। (বিদ্যাসুন্দর)

(৬) কত শত ডমরু কেশরী বিদ্যমান,
হর গৌরী কর-পদে আছয়ে প্রমাণ।
কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায়,
দেখুক সে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায়॥

(৭) মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া—

(৮) করিকর রামরম্ভা দেখি তার উরু
সুবলনি শিখিবারে মানিলেক গুরু।

একটি ভুবনমোহিনী সুন্দরী নারী সৃষ্টির প্রয়াস করা হয় তাহা হইলে সবাই কি সে ধরণের মেয়ে সুন্দরী বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে? আপাতদৃষ্টিতে সেইরূপ সম্ভাবনা স্বতঃসিদ্ধ মনে হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে যেমন আদর্শ ও বাস্তবের আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকিয়া যায়, এইক্ষেত্রেও সেইরূপ আশঙ্কা অমূলক নহে। কেন না, এমনও দেখা যায় যে মুখ, নাক, চোখ, ভুরু, ঠোঁট, হাত, কান, চুল প্রভৃতি বিভিন্ন দেহাংশকে পৃথক পৃথক বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে নিখুঁত মনে হইলেও একত্র দৃষ্টিতে সামগ্রিক রূপটিতে কোথায় যেন খুঁত থাকিয়া যায় এবং সব কিছু যোগ্যতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হইলেও, কিছুতেই তাহা অপরূপ সৌন্দর্যের পর্যায়ে পড়ে না; অথচ কোন কোন স্থলে ঐরূপ মাপকাঠিতে দেহের কোন কোন অংশ দোষে না টিকিলেও হঠাৎ দেখিলে সামগ্রিক সৌন্দর্য অপরূপ বলিয়া প্রতিভাত হয়। এইজন্যই একটা বাঁধা-ধরা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সৌন্দর্যের ঠিক ঠিক সংজ্ঞা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। যে সৌন্দর্য দেখিয়া বিচার করে, অনেক সময়ে তাহার মানসিক অবস্থা ও বিচার-বুদ্ধির উপরই সৌন্দর্যের উঁচু-নীচু স্থান-নির্ধারণ বহুলাংশে নির্ভর করে। তাই একজনের চোখে যে পরমা সুন্দরী অপরের চোখে সে "মন্দ নয়", কিংবা "এমন আর কি?" এইজন্যই মাতৃক্রোড়ে শায়িত সন্তানের চোখে নিজের জননীই অনিন্দ্য সুন্দরী। একই ভাবে,

"সন্তান যতপি হয় অসিত বরণ
তথাপি মায়ের কাছে কবিত কাঞ্চন।" এবং

একই বর্ণবিশিষ্ট পরের মেয়ে যখন "কালো" তখন নিজের মেয়ে হয় "উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা"।

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ভগবানদত্ত স্বাভাবিক সৌন্দর্যের অধিকারী। তাহার সুগঠিত দেহ, উন্নত বিরাট বক্ষ, শালপ্রাংশু মহাভুজ, আকর্ষণীয় শুষ্ক প্রভৃতি অতি স্বাভাবিকভাবেই এক রকম অনায়াসে এবং বিনা খরচেই পুরুষের দেহকে রূপসজ্জায় সাজাইয়া তোলে। কিন্তু প্রকৃতি মেয়েদের বেলায় অত্যন্ত কৃপণ, তাই দেহের সৌন্দর্যকে বাড়াইবার জন্য তাহাদের নানারকম কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতে হয়। দামী দামী শাড়ী, ব্লাউজ, হীরা, চুনী ও সোনার গহনা; 'অলকে কুসুমশুচ্ছ', সযত্নে কেশ রচনা, মুখে স্নো, ক্রীম, পাউডার, গালে রুজ, ঠোঁটে লিপষ্টিক, অঙ্গুলিতে কিউটেক্স হইতে আরম্ভ করিয়া মেহেদী পাতার রস আর লম্বা লম্বা নখ, পায়ে আলতা, শিথিল স্তনকে কৃত্রিম উপায়ে দৃঢ়তা দেওয়ার জন্য টাইটব্রেষ্ট, সামনে ঝুলেপড়া পেটকে স্বাভাবিক দেখানোর জন্য করসেট, এমনি কত কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতে হয়। আবার ভিন্ন ভিন্ন দেশে আরও নানা কৃত্রিমতা সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়—যেমন আমাদের দেশে নাকে ও কানে গহনা পরার বেওয়াজ আগে ছিল এবং এখনও আছে কিন্তু কোন কোন দেশের আদিম অধিবাসিনীদের মধ্যে নাক ও কানের ছিদ্র যত বড় হয়, ততই তাহা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে বলিয়া ধারণা আছে। এমন কি ঠোঁটেও বড় ছিদ্র করিয়া গহনা পরিবার রীতি কোন কোন আদিম অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায়। হাতে ও মুখে উল্কির সাহায্যে সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়াসও অনেকস্থলে দেখা যায়। চীনদেশে এককালে জন্ম হইতেই মেয়েদের পা'কে ছোট রাখার জন্য লোহার জুতা পরাইয়া দেওয়া হইত, কারণ তৎকালে ঐ রকম অতি ছোট পা-ই সৌন্দর্যের অংশ বলিয়া বিবেচিত হইত। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোন কোন দেশে গহনার সাহায্যে গলাকে জিরাফের মত লম্বা করিয়া সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। পাশ্চাত্য দেশে স্বাভাবিক ভুরুকে কামাইয়া তাহার স্থানে প্রত্যহ ভুরু আঁকিয়া সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়াস দেখা যায়। আমাদের দেশে মাথার চুলে নানা রকমের বেণী রচনার দ্বারা যেমন সৌন্দর্য-বৃদ্ধির প্রথা আছে, আবার তেমনি কোন কোন মহাদেশের আদিম অধিবাসিনীরা কাষ্ঠাদ্রির উপরকার চুলেরও তেমনি সবর বিন্যাসের দ্বারা দেহের সৌন্দর্য বাড়াইবার চেষ্টা করে। সুতরাং পৃথিবীর অতি সুসভ্য জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া নগ্নদেহ অসভ্য যাহারা, তাহাদের মধ্যেও প্রাকৃতিক কার্পণ্যহেতু স্বাভাবিক সৌন্দর্যের অভাবকে মোচন বা পরিপূরণ করার জন্য নানা কৃত্রিম উপায়ের উদ্ভাবন ও অনুশীলন অল্প-বিস্তর দেখা যায়।

মানুষের যৌবন এমন একটি সময়, যখন বসন্ত ঋতুতে যেমন লতা-পাতা নব কিশলয়ে নূতন সাজে সাজিয়া দেখা দেয়, ঠিক তেমনি মানুষের শরীরেও অতি স্বাভাবিক ভাবেই একটি সৌন্দর্যের জোয়ার আসে। মেয়েদের পক্ষে তাহা আসে, পূর্ণিমায় গঙ্গাবক্ষে হঠাৎ যেমন জোয়ার আসে ঠিক তেমনি এবং তাহা ঐরকমই অনেকটা ক্ষণস্থায়ী। মা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে জোয়ার থাকে অব্যাহত কয়েকটি বৎসর, কিন্তু দুর্ভাগ্যের সঙ্কট মুহূর্তে মেয়েদের অবস্থা হয় অনেকটা ঝড়ের মুখে পড়া কাকেরই মত। কিন্তু অনাগত বিধাতা কিংবা প্রত্যুৎপন্নমতি যাহারা তাহারা ইচ্ছা করিলে যথা সময়ে সতর্কতার ফলে স্বাভাবিক সৌন্দর্যের অনেকটাই রক্ষা করিতে পারেন।

স্বাভাবিক দেহবৃদ্ধির জন্য শিশুকালে যে রকম ভাল প্রোটীন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লোহা প্রভৃতি, এবং ভাইটামিন এ, সি, ডি, বি-কমপ্লেক্স প্রভৃতি আবশ্যক, কৈশোরে এবং যৌবনের প্রথমও একইভাবে ঐ সকল খাদ্য, প্রচুর আলো, ও মুক্ত বায়ু এবং পরিমিত ব্যায়াম আবশ্যক। ক্যালসিয়ামের অভাবে যেমন সম্যক্ দেহবৃদ্ধি হয় না, এবং খাদ্যে ভাইটামিন 'ডি' কিংবা গায়েও সূর্যের বেগুনেতর রশ্মির অভাবে শিশুকালে যে রকম রিকেট্স্ রোগ হইয়া দেহের সৌন্দর্য ব্যাহত হয়, কৈশোরের প্রান্তে যৌবনের প্রারম্ভে কোন কারণে ঐগুলির অভাব ঘটিলে অস্থিবিকৃতি বা অস্টিয়োম্যালেশিয়া (Osteomalacia) রোগে শ্রোণিচক্র স্বল্পপরিসর হওয়াতে নারী দেহের সৌন্দর্য হানির কারণ হয় এবং সন্তান-প্রসব কালে প্রাণান্ত পর্যন্ত ঘটিতে পারে। সুতরাং দুধ, ডিম প্রভৃতি ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস্ সমন্বিত পুষ্টিকর খাদ্য, আম, পেঁপে, টমেটো, কমলালেবু, গাজর প্রভৃতি ভাইটামিন 'এ' ও সোডিনপূর্ণ ফলমূল, ঘি, মাখন প্রভৃতি ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি'-পূর্ণ জান্তব স্নেহ এবং ভোর বেলায় কিছুক্ষণের জন্য রৌদ্র সেবনও স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের জন্য আবশ্যক। আর প্রতিদিন দেহের যে পরিমাণ ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী তাহার পরিপূরণের জন্য, গর্ভাবস্থায় সন্তানের বৃদ্ধিহেতু গর্ভিণীর দেহের ক্ষয় নিবারণের জন্য এবং স্তন্যদান কালে নিজের দেহরক্ষা ও সন্তানের জন্য উপযুক্ত খাদ্যের প্রস্তুতির জন্যও প্রাণিজ প্রোটীন এবং ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস সমন্বিত প্রাণিজ খাদ্য এবং লোহাপূর্ণ শাক পাতা প্রভৃতিও অত্যাবশ্যক। সুতরাং গুণে ও পরিমাণে উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে কিছুতেই যেমন স্বাস্থ্য ভাল থাকে না, তেমনি স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার ফলে দেহের সৌন্দর্যও একেবারেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। সেইজন্যই গরীবের অভাব অনটনের সংসারে মা-ষষ্ঠীর অকৃপণ 'দয়ার' ফলে গৃহিণীর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের পাত্রটুকু অচিরে নিঃশেষিত হইয়া, তাহার পোড়াকাঠের মত অস্থি-চর্মসার দেহ কেবল সন্তান-উৎপাদন এবং গৃহকর্মে যুগপাক খাওয়ার যন্ত্রমাত্রে পর্যবসিত হয়। এই কারণেই সাধারণ বাঙালীর মেয়ে কুড়ি বছরেই বুড়ী।

দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য রক্ষার জন্য মেয়েদের সকল অবস্থাতেই এমন কি গর্ভাবস্থাতেও কিছু না কিছু ব্যায়াম করা আবশ্যক। স্বাভাবিক অবস্থায় পাড়াগাঁয়ে সন্তরণপর হইলে কিছুক্ষণের জন্য পুকুরে বা দীঘিতে সাঁতার কাটা মেয়েদের পক্ষে ভাল ব্যায়াম। জল, পুকুর বা দীঘি হইতে কলসী জলে পূর্ণ করিয়া কাঁখে বহিয়া আনা, ধান বা চাউল ঝাড়া বা কাড়া, ধাঁতা পেষা, ঢেঁকিভানা, কুটনো কাটা, বাটনা বাটা, এই সকল গৃহস্থালির স্বাভাবিক কাজ-কর্মগুলি মেয়েদের পক্ষে খুবই ভাল ব্যায়াম। কিন্তু শহরে এগুলির অনেক কিছুরই সুযোগ বা সুবিধা নাই, সেইজন্য প্রতিদিন ভোর বেলায় কিছুক্ষণের জন্য মুক্তবায়ুতে ভ্রমণ ও প্রয়োজন ও সুযোগমত সংসারের কাজেকর্মে কিছু কিছু পরিশ্রম করা ভাল। যাহাদের নিজেকে গৃহস্থালির কাজকর্ম করিতে হয় না বা দেখাশোনার প্রয়োজন নাই, তাহাদের পক্ষে প্রাতর্ভ্রমণ, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলার সাহায্যে কিছু না কিছু ব্যায়াম করা ভাল। উপযুক্ত ও পরিমিত ব্যায়ামে দেহের পেশীগুলি সুগঠিত হয় এবং উপযুক্ত রক্তসঞ্চালনের ফলে দেহের সৌষ্ঠব অটুট থাকে। তাহা ছাড়া ভোর বেলায় বেড়ানো এবং কুটনো কাটা, বাটনা বাটা প্রভৃতি গৃহস্থালির টুকিটাকি কাজের মাধ্যমে অল্পস্বল্প ব্যায়ামের ফলে গর্ভাবস্থায় মেয়েদের পেটের পেশীগুলির দৃঢ় হওয়াতে প্রসবক্রিয়া

সহজ হয় এবং প্রসবের পরে সেই শিথিল অবস্থায় সম্মুখে ঝুলিয়া পড়ে না বলিয়া দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য রক্ষার অনেকটা সাহায্য হয়।

সকল সময়ে এবং বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায় প্রত্যহ অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে কিছু না কিছু শাকসব্জী খাওয়া ভাল, কারণ তাহাতে একদিকে যেমন কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, আবার তেমনি ঐগুলিতে রক্তকারক লৌহ থাকাতে শরীরে রক্ত বৃদ্ধির ও স্বাভাবিক লালিমা রক্ষার সাহায্য হয়।

সহজ কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা সৌন্দর্য রক্ষার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। মেয়েরা প্রায়ই অঙ্গ কাজে ব্যাপৃত থাকার কালে, কাজটুকু একেবারে সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পায়খানার বেগ ধারণ করেন। অনেক সময়েই সেই কারণে কিংবা অনবরতঃ কিংবা বারবার কড়া চা পানের ফলে অতিরিক্ত পরিমাণে ট্যানিন গ্রহণেও কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে, ফলে মুখের চামড়াতে মেচেতা কিংবা চোখের নীচে বা গালে কালো কালো বিশ্রী দাগ পড়ে ও তাহাতে স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট হয়। সুতরাং মেয়েদের পক্ষে (পুরুষের পক্ষেও) কোন অবস্থাতেই কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মাইতে দেওয়া উচিত নহে। আর যদি বা দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা ঘটে, তাহা হইলেও অবিলম্বে তাহার প্রতিকার আবশ্যক। একইভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ, নিদ্রা ও বিশ্রাম, শীতল জলে স্নান প্রভৃতিও সৌন্দর্য রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য।

কেশ মেয়েদের সৌন্দর্যের একটি বিশেষ অঙ্গ। সুতরাং সর্বদাই চুলের জন্য প্রচুর যত্ন নেওয়া উচিত। স্নানের পর চুলকে খুব ভাল করিয়া শুখাইয়া শুখনো চুলকে আঁচড়াইয়া, বিনুনি বা খোপা করিয়া বাঁধিয়া রাখা উচিত। ভাল নারিকেল তেল, আমলা তেল, ক্যাষ্টর অয়েল প্রভৃতি ছাড়া বিজ্ঞাপনের জন্যরঞ্জিত নিম্নশ্রেণীর যে কোন তেল মাখা উচিত নহে। আর তেল মাখিতে হইলে কিছুক্ষণ ধরিয়া চুলের গোড়ায় বেশ ভাল করিয়া ঘসিয়া ঘসিয়াই তেল মাখা উচিত। যে তেল সর্বদা মাথায় মাখা হয়, তাহাকে বারবার অকারণে পরিবর্তন করা উচিত নয়, কারণ অনেকস্থলে শুধু ঐ কারণেই চুল উঠিতে আরম্ভ করে। কখনই আর্দ্র চুলকে বাঁধা উচিত নয় কারণ তাহাতে চুলের গোড়া নষ্ট হয় ও সময়ে সময়ে অন্যান্য মাথা ধরে। মাঝে মাঝে স্নান্পু করিয়া চুলকে পরিষ্কার করিয়া নেওয়া উচিত তা না হইলে চুলে আঠা হইয়া কিংবা ময়লা পড়িয়া মাথায় চুলকানি কিংবা অন্যান্য চর্মরোগ কিংবা উকুন প্রভৃতিও জন্মাইতে পারে। চুলের যথাযথ যত্ন না নিলে অনেক সময়ে জট ধরিয়া কিংবা চুলের গোড়ায় ময়লামাস প্রভৃতি জন্মিয়া মেয়েদের দেহের সৌন্দর্যের বিশেষ অঙ্গ ঘন কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশপাশকে একেবারে সমূলে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। মেয়েদের মাথার দীর্ঘ চুলই প্রকৃতিদত্ত দেহসজ্জার সর্বোত্তম ঘন নীলমণি, যাহাকে একটু চেষ্টা করিলেই বহুদিন সযত্নে রক্ষা করা যায়, সুতরাং সর্বতোভাবে তাহাকে রক্ষা করা কর্তব্য।

আমাদের দেশে ফর্সা রঙের আদর খুবই, তা না হইলে সুন্দরী হয় না। কনে দেখার সময়ে "মুখে আলতার রঙ" না হইলে আমাদের পছন্দ হয় না। কিন্তু ইউরোপে শ্বেতকায় জাতিগুলির মধ্যে কিছুটা তামাটে রঙই পছন্দসই, সেইজন্য তাঁহারা বহুক্ষণ সমুদ্র-সৈকতে খালিগায়ে পড়িয়া থাকেন, সাদা রঙকে সূর্যের তাপে খানিকটা ঝলসাইয়া নেওয়ার জন্য। আর আমাদের মেয়েরা নানা কৃত্রিম উপায়ে স্নো, ক্রীম, পাউডার প্রভৃতির সাহায্যে দেহের চামড়াকে ফ্যাকাশে করার চেষ্টা করেন অক্লান্তভাবে। শীতকালে শরীরের চামড়া ফাটে, সেইজন্য অল্প-স্বল্প কোল্ড ক্রীম মাখা ভাল (অভাবে জলের সঙ্গে গ্লিসারিন মিলাইয়া মাখিলেও চলে), কিন্তু প্রসাধনের জন্য যখন-তখন ভ্যানিশিং ক্রীম, স্নো প্রভৃতি মহার্ঘ উপাদানের সাহায্যে সৌন্দর্য-বৃদ্ধি বা তাহাকে রক্ষার চেষ্টা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়, কেন না ক্রমাগত ঐগুলি ব্যবহারের ফলে লোমকূপগুলির মুখ বন্ধ হইয়া যায় এবং তাহাতে স্বাস্থ্যের পক্ষে অপরিহার্য স্বেদনির্গমন ও ঐ সঙ্গে ত্বকের সৌন্দর্যের জন্য অত্যাবশ্যক সিরাসের বহিষ্কারও ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয় বলিয়া যথাক্রমে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্যও ব্যাহত হয়। চামড়াকে মসৃণ ও কমনীয় রাখার জন্য আগে আমাদের দেশে সর-ময়দা, মসুর দাল-বাটা প্রভৃতি মাখার

প্রথা ছিল। ঐগুলি মাখিয়া কয়েক ঘণ্টা পরে স্নানের সময়ে ভাল করিয়া ঘুইয়া ফেলিলে লোমকূপগুলি পরিষ্কার থাকে এবং ফলে ঘাম কিংবা সিবাম স্বাভাবিক ভাবেই বাহির হওয়াতে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য অব্যাহত থাকে। বিদেশী বহুমূল্য প্রসাধন সামগ্রী, স্নো-ক্রীম প্রভৃতির পরিবর্তে আমাদের এই সকল দেশী উপাদানগুলি অনেক বেশী উপকারী ও তাহাতে খরচও অত্যন্ত কম।

অলক্তক বা আলতার সাহায্যে পায়ের প্রসাধন আমাদের দেশের বহু প্রাচীন প্রথা। ভাল আলতা পায়ে লাগাইলে সৌন্দর্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপকারও হয়, কেন না তাহাতে বিশেষতঃ শীতকালে পা ফাটে কম। বিছানা-পত্রে যাহাতে দাগ না লাগে, তাহার জন্য শয়নের আগে পা ধুইয়া ফেলা উচিত।

হাতে কিউটেক্স-রঞ্জিত লম্বা লম্বা নখ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও দৃষ্টিকটু প্রসাধন। ঠোঁটে গাঢ় রক্তবর্ণ লিপ্‌স্টিকের রঙ এবং একই রঙের ছুঁচলো লম্বা নখ, তাহার সাহায্যে সদ্য কাহারও হৃৎপিণ্ডকে বিদীর্ণ করিয়া তাহার তাজা রক্তপান-কারিণী কোন বিশেষ রাক্ষসীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয় নাকি? এরূপ নারীমূর্তি লক্ষ্যেই সম্ভ কবি তুলসীদাস বোধ হয় বলিয়াছেন,

"দিনকো মোহিনী, রাতকো ঘাঘিনী, পলক পলক লহ চোষে"

সত্য সত্যই ঐ রকম অস্বাভাবিক 'ঠোঁটের সিঁদুর'-এর বউ ও ঘাঘিনীর মত রক্তাক্ত নখ বিশিষ্টা নারীর প্রতি আকর্ষণের চেয়ে মনে আতঙ্কের ভাবই বেশী জাগে! স্বাস্থ্যহীন ফ্যাকাশে গালে ঘতই স্নো বা পাউডারের উপর রুজ কিংবা রক্তশূন্য পাণ্ডুর ঠোঁটে চুম্বন-সত্ত্বেও অব্যাহত রঙ লিপ্‌স্টিক (kiss-proof lip-stick) লাগানো হউক না কেন, কিছুতেই ঐরূপ কৃত্রিম রঙ গালের ও ঠোঁটের স্বাভাবিক লালিমার তুল্য হইতে পারে না। সুতরাং পয়সা খরচ করিয়া অস্বাভাবিক কৃত্রিম উপায়ে ঐগুলির দ্বারা দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়াস অতি হাস্যকর ভাবে ব্যর্থতা ও বিড়ম্বনায় পর্যবসিত হইতে বাধ্য। মনে রাখা উচিত যে স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম যাহা তাহাই দেহের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য ও সম্পদ।

পোষাকের শালীনতাও সৌন্দর্য বৃদ্ধির আর একটি অঙ্গ। ভারতীয় পদ্ধতিতে পরিহিতা শাড়ী সমস্ত দেহ-লতাকে অতি মনোরম ভাবে বেষ্টন করিয়া এমন একটি অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত শালীনতা দান করে যে আজকাল পৃথিবীর সর্বত্রই ভারতীয় শাড়ী মেয়েদের শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদরূপে আদৃত। কিন্তু মেম সাহেবদের নাচের পোষাকের অনুকরণে সমস্ত পিঠ ও হাত খোলা এবং অতি সামান্য অংশ ছাড়া সমগ্র বুক খোলা ব্লাউজ শাড়ীর সঙ্গে অতি বেমানান। পাশ্চাত্য মেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল, দেহের পেশীগুলি সুগঠিত এবং গায়ের রঙও ফর্সা সুতরাং কোন সময় বিশেষে উৎসবাদিতে (যেমন নাচের মজলিসে) অনাবরণ দেহাংশগুলি তাহাদের দেহ সৌষ্ঠবের খুব অন্তরায় না হইলেও শালীনতাসঙ্গত নহে কিন্তু শালীনতার অভাব আমাদের চোখে হাতাহীন ব্লাউজের ভিতর দিয়া বাহিরে প্রকাশিত কালো কালো ছিনে পড়া হাত সহ বগলের চুল, প্রায় শিথিল স্তনাগ্রভাগ পর্যন্ত খোলা অস্থিচর্ম-সার বুক কিংবা রাজপুতানীর অনুকরণে কাঁচুলির নীচে ভুঁড়ি কিংবা সম্মুখে ঝুলে পড়া পেট অত্যন্ত অশোভন ও দৃষ্টিকটু। মাথায় চুলের বাহার থাকিলে সৌন্দর্যের অংশ রূপে তাহা দেখানো যাইতে পারে কিন্তু তাহার অভাবে শুধু ফ্যাশানের জন্য মাথায় ঘোমটা না দেওয়া কখনই সৌন্দর্যের অঙ্গ নহে।

প্রথম যৌবনে মেয়েদের পক্ষে বুকের গড়ন ঠিক রাখার জন্য কাঁচুলি, টাইট-ব্রেষ্ট প্রভৃতি ব্লাউজের নীচে সর্বদা ব্যবহার করা উচিত; কিন্তু গর্ভাবস্থায় শেষের দিকে এবং সন্তানকে স্তন্যদানকালে স্তন-গ্রন্থিটিকে কখনই এইরূপ দৃঢ়ভাবে চাপিয়া রাখা উচিত নহে, কারণ তাহাতে রক্ত-চলাচলের ব্যাঘাত হয়। পেটের গড়নকে ঠিক রাখার জন্য সাধারণতঃ গর্ভাবস্থায় করসেট বা এমনি কিছু ব্যবহার করা উচিত নহে (শুধু ডাক্তারের নির্দেশেই কোন কোন সময়ে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে)। কিন্তু প্রসবের পর হইতে কিছুকাল পর্যন্ত পেটে টাইট বাইণ্ডার ব্যবহার করা অবশ্যই কর্তব্য। তাহা না করিলে পেটটি সামনে ঝুলিয়া পড়ার আশঙ্কা থাকে এবং তাহাতে দেহের সৌন্দর্যের অনেকটা লাঘব হয়। একটি সন্তান প্রসবের

পর কেবল গর্ভাবস্থা ও মাসিক ঋতুর সময় ছাড়া অন্য সকল সময়ে হলপেটে করলেই কিংবা বাইগার ব্যবহার করা উচিত, কারণ তাহাতে ঐ দেহাংশের গড়ন যেমন ভাল থাকে আবার তেমনি পেটের পেশীগুলি দৃঢ় থাকাতে পরবর্তী প্রসবকালে অনেকটা সাহায্যও হয়।

অনেক আধুনিকা সন্তান-সম্ভাবনা কিংবা সন্তানকে স্তন্যদানের ভাবনায় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন, কেন না তাঁহাদের ধারণা যে ইহাতে তাঁহাদের দেহের 'মুখ্রী' ও সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহার মত ভুল ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না; মেয়েদের পক্ষে সন্তান-ধারণ ও পালন দুইই অতি স্বাভাবিক এবং কর্তব্য কাজ। একটু সতর্কতার সহিত স্বাস্থ্যের বিধি ও নিষেধগুলি মানিয়া চলিলে মাতৃত্ব কিংবা ধাত্রীর দেহের সৌন্দর্যকে নষ্ট ত করেই না বরং এক অপূর্ব স্বর্গীয় সুষমায় পরিপূর্ণ ও সার্থক করিয়া তোলে।

বাংলা ও উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক যোগ

বাংলা ও উড়িষ্যা, দুই দেশ পাশাপাশি : ওড়িয়া সাহিত্য আমাদের প্রতিবেশী সাহিত্য। তাহার সম্বন্ধে আমরা জানিতে চাহিব, ইহা তো সাধারণ কৌতূহলের কথা। এককালে বাংলা ও উড়িষ্যার যোগ খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল; সে যোগ এখনও আছে রাজনৈতিক চেষ্টায় সে যোগ বিচ্ছিন্ন করা যায় না, কারণ তাহা সংস্কৃতির যোগ। ব্যক্তির জীবনে নাড়ির যে টান, জাতীয় জীবনে সংস্কৃতির টান তাহার অনুরূপ; বাহিরের আগন্তুক কারণে সে টান অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা সম্ভব নহে।

উড়িষ্যা আজ বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র; তাহার নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় কালক্রমে তাহার সংস্কৃতিকে আরও বিশিষ্ট, আরও স্বতন্ত্র করিয়া তুলিবে। প্রতিবেশীর প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া নিজের বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিবার যে সাধনা, উড়িষ্যা আজ সেই সাধনায় ব্রতী। ভারতে বিভিন্ন রাষ্ট্র আত্মস্থ হউক, তাহাদের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকুক, তাহাতে পরস্পরের পক্ষে মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হইবে না, বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য পরস্পরকে বরং আরও ভালো করিয়া জানিতে হইবে।

সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সামান্য নহে। হৃদয়ের অনুভূতিকে সাহিত্য বহন করিয়া আনে, রাখিয়া দেয় দূর-দূরান্তের ভবিষ্যবংশীয়দের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ রূপে; তাহা অন্তরের যোগকে দৃঢ় করে, শিথিল করে না ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে ঐক্যসূত্র আছে, তাহা আছে আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যের মধ্যে ছড়াইয়া। বৈশিষ্ট্যের প্রাচুর্য সত্ত্বেও ভারতের ঐক্যের ও অখণ্ডতার এত বড় প্রমাণ আর কিছু আছে কি না সন্দেহ।

"ওড়িয়া সাহিত্য"—প্রিয়রঞ্জন সেন—বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ হইতে।

কয়েকখানি চিঠি

স্বর্গত বিপিনচন্দ্র পালকে লিখিত

ওঁ

Santi-Niketan
Bengal, India

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতেছেন সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অনুমোদন করি।

আমার ডান হাতের আঙুলে গুরুতর আঘাত লাগাতে কিছুকালের জন্য তাহা অকর্ম্মণ্য। লেখা দুঃসাধ্য। এই গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা ভরতপুরে নিমন্ত্রণ। প্রতিশ্রুত আছি—সেখানে যাইতে হইবে—আপনাদের সভায় সশরীরে উপস্থিত থাকা সম্ভবপর নহে—শুভ কামনা রহিল। ইতি ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৩৩

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই চিঠিখানি রাজনীতিক কোন অনুষ্ঠান সম্পর্কে, মনে হয়, লিখিত।

রাঁচি, শান্তিধাম
৩রা ডিসেম্বর, ১৯২২

সবিনয় নিবেদন,

"বঙ্গবাণী"তে আপনার লিখিত নবযুগের কথা আমি ঔৎসুক্যের সহিত পড়িয়া থাকি। মাসিক প্রবন্ধগুলি বড়ই মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী। গত মাসের "বঙ্গবাণী"তে হিন্দু মেলায় আমার সম্বন্ধে যে ঘটনার কথা লিখিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত আমার "জীবন-স্মৃতি" গ্রন্থে আসল বৃত্তান্তটা অবগত হইতে পারিবেন। আমার "জীবন-স্মৃতি"র একখণ্ড আপনাকে উপহার পাঠাইলাম। ইহা হইতে আরও কিছু নূতন তথ্য হয়ত জানিতে পারিবেন। গ্রন্থের ১৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আরও অন্যান্য অংশের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য পেন্‌সিলের দাগ দিয়া দিলাম। সমস্ত গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আপনার কিরূপ লাগিল লিখিলে বাধিত হইব।

বশম্বদ
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

"বঙ্গবাণী"তে লিখিত "নবযুগের কথা" পুস্তকাকারে "নবযুগের বাংলা" নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বর্গত বিপিনচন্দ্র পালের লেখা

ওঁ

বুধবার, ১৭-৪-২৯, কাঁথি

মা বৌমা[১],

আমি ভেবেছিলাম এখানে কয়দিন বিশ্রাম করিব, বিধাতার তা ইচ্ছা নয়। অমৃতবাবুর[২] জন্মতিথি উৎসবে যাওয়া কর্ত্তব্য। তাই ঠাকুরের ইচ্ছা হইলে শুক্রবার প্রত্যূষে বা বৃহস্পতিবার শেষ রাত্রে রওয়ানা হইয়া মাদ্রাজ মেলে ১১টায় হাওড়া পৌঁছিব, কল্পনা করিতেছি। আশা করি তোমরা দয়াময়ের কৃপায় ভাল আছ ও খোকা[৩] স্টেশনে আসিতে পারিবে। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ লইবে। দয়াময় তোমাদের রক্ষা করুন।

তোমার বাবা
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

মধ্যম বধূমাতা
স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু
মধ্যম পুত্র

ওঁ

বারগণ্ডা, গিরিডি
অক্টোবর. ৭, ১৯২৭

কল্যাণীয়াসু,

গগনের[১] নামে একখানা reply post card আজ এখানে আসিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যে ভগবৎকৃপায় গগন একটু একটু সারিয়া উঠিতেছেন। দয়াময় তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়া তুলুন, তাঁহার চরণে এই প্রার্থনা করি।

মণি[২] আমার এখানে আসিবে, একথা আবার এতটা সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিতে হয় কেন? তোমার বাবার পরিবারের সঙ্গে বহুদিনের যে আত্মীয়তা তাহাতে তোমার ছেলে সর্ব্বদাই আমার এখানে নিঃসঙ্কোচে আসিতে পারে। ইহার উপরে ভগবানের কৃপায় এই বাড়ী তাহার আপনার ভগিনীর[৩] বাড়ী। সেজন্যও তার এখানে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তুমি নিঃসঙ্কোচে পত্রপাঠমাত্র তাহাকে পাঠাইয়া দিবে। রবিবার সকালে বা সন্ধ্যায় তাহার প্রতীক্ষা করিব। শনিবারের রাত্রের গাড়ীতে যদি না আসে চিঠি লিখিও, কোন্ গাড়ীতে আসিবে।

আর একটা কথা, তাহার বিছানার সঙ্গে মশারি দিতে ভুলিও না।

শুভাকাঙ্খী
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সাধক স্বর্গত কালিনাথ দত্তের কনিষ্ঠ কন্যাকে লেখা।

স্বর্গীয় গগনচন্দ্র হোম; ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।
কালিনাথ দত্ত মহাশয়ের দৌহিত্র
বিপিনচন্দ্রের মধ্যম বধূমাতা

বৈদিক যুগে নারী

শ্রীমতী মিনু ঘা

আর্য্যদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল, তাহা লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। তবে ইহা সত্য যে, তাহারা সর্ব্বশেষে ইরাণ হইতে ক্রমে পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া ভারতভূমিতে প্রবেশ করে। উহারা পাঞ্জাবের পঞ্চ নদের তীরে বসবাস করে। ইহার আনুমানিক সময় খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দের কিছু পরে। অর্থাৎ উহা হইল আজ হইতে প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। প্রাচীন ভারতের লিখিত ইতিহাস বড় একটা পাওয়া যায় না। ইহাই প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত সংগ্রহের প্রধান অসুবিধা। বৈদিক সাহিত্য (খৃঃ পূঃ ১৫০০—২০০ অব্দ) হইতে আমরা তৎকালীন সামাজিক জীবনের অবস্থা কিছুটা জানিতে পারি।

বৈদিক যুগে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। ঐ সময় গৃহ-পরিবেশ সুগঠিত হইয়াছিল। পিতা ছিলেন গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্তা এবং আদর্শ-স্বরূপ। সংসারে গৃহ-কর্ত্রীর স্থান বেশ উচ্চ ছিল। ঋক্‌বেদে (খৃঃ পূঃ ১৫০০—১০০০ অব্দ) স্ত্রীকে গৃহের অলঙ্কার স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ বিবরণ হইতে সমাজে নারী কতটা বরণীয় ছিলেন বুঝা যায়! স্ত্রী স্বামী ও সন্তানের পরিচর্য্যা, গৃহ-স্থালী কার্য্য, অতিথি-সেবা, ও অন্যান্য সাংসারিক কার্য্য করিতেন। যজ্ঞানুষ্ঠানে স্বামীর সহিত তিনি অংশ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারের উপর পরিবারের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করিত।

ঋক্, অথর্ব্ব ও অন্যান্য বেদে সন্তান লাভের জন্য বিবাহিতা নারীর প্রায়শঃ প্রার্থনা হইতে বুঝা যায় যে, সন্তান লাভই তাঁহার মুখ্য কামনা। এস্থলে বলা প্রয়োজন যে, পুত্র-সন্তান লাভেচ্ছাই মুখ্য ছিল। পুত্রহীনতা বা 'অবিরতা' দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করা হইত। পুত্র-সন্তানের দ্বারা বংশ-রক্ষা, বা বংশ-বৃদ্ধি ও শ্রাদ্ধাদি-কার্য্য ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ কার্য্য সাধিত হইত। তৎকালে বর্ত্তমান যুগ অপেক্ষা ঐ সমস্ত কার্য্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইত। অপর পক্ষে বর্ত্তমানের ন্যায় তৎকালে কন্যা-সন্তানের জন্মলাভ আনন্দদায়ক ছিল না। কারণ, উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা এবং পাত্র উপযুক্ত না হইলে কন্যার ভরণপোষণ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে কন্যার পিতাকে সারা জীবন চিন্তান্বিত থাকিতে হইত। ইহা সত্য যে, ভূমিলে কন্যার লালন-পালন পুত্রের মত সযত্নে করা হইত। বৈদিক যুগে কন্যা-সন্তানকে মারিয়া ফেলিবার রীতি যে প্রচলিত ছিল—এইরূপ ধারণা সঙ্গত নহে। কেননা উহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। পিতৃ-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় পুত্র-লাভেচ্ছা স্বাভাবিক।

কন্যা সম্বন্ধে অবশ্য বলিবার আছে যে, কন্যাকে সমাজের যোগ্যা করিবার জন্য মাতা পিতা সচেষ্ট থাকিতেন। ঋক্ বেদের যুগে আমরা নারী-ঋষির উল্লেখ পাই। তৎকালে বৈদিক মন্ত্র যে সমস্ত নারী রচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে লোপামুদ্রা, মমতা, অপলা ও বিশ্ববরা হইলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ। ঐ যুগে দেখি নারী কখন বা স্বামীর সহিত যুদ্ধ-যাত্রা করিতেছেন—যেমন রাজা "খেল"এর স্ত্রী বিশ্বপলা স্বামীর সহিত যুদ্ধ-যাত্রা করেন, তিনি সেই যুদ্ধে একটি পা হারান; কখন বা তস্করের অনুসন্ধানে স্বামীর অনুগামিনী হইতেছেন—যেমন ঋষি মুদ্গলের স্ত্রী "মুদ্গলানী" ঐ বিষয়ে স্বামীকে সাহায্য করেন; কখন বা যাজ্ঞবী সমভিব্যাহারে পাহাড়ে বেড়াইতেছেন; আবার কখন বা মেলায় অর্থাৎ "সমন"এ আনন্দ কৌতুক করিতেছেন কিংবা নৃত্য-গীতি মনোরঞ্জন করিতেছেন। এই সমস্ত কার্য্যকলাপ হইতে অনুমান করা যায় যে, সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে নারী গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিতা ছিলেন।

বৈদিক যুগের আলোচনায় বুঝা যায় যে, ঋক্ বেদের যুগে নারী বর্ত্তমান যুগ অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। তথাপি গমনাগমনে কিছুটা বাধা-নিষেধ ছিল। সেই যুগে যথাযথ পুরুষ সঙ্গে লইয়া নারী মাত্রেই গমনাগমন করিতেন। ইহা ছাড়া ওড়নার ব্যবহার প্রচলন ছিল। স্বামী বা বয়স্কাদের সহিত তাঁহারা সভা-সমিতিতে যাইতেন; স্বামীর সহিত যজ্ঞ কার্য্যে যোগদান করিতেন।

নারীর নৈতিক আদর্শের মান বেশ উচ্চ ছিল। নিজ বা নিকট আত্মীয় ব্যতীত অপর কোন গৃহস্থের বাড়ীতে রাত্রিযাপন গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত। অনেকস্থলে ব্যভিচারিণীকে হত্যা করা হইত। ইহা সত্য যে, সমাজ একেবারে নির্ম্মল ছিল না। ঐ যুগে অবৈধ প্রণয় ও তজ্জাত সন্তানের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। উহাতে নারী ও পুরুষের মেলামেশা যে কতটা সহজ ছিল, তাহা কিছু উপলব্ধি করা যায়।

ঋক্ বেদের যুগে পিতৃ-সম্পত্তির অধিকারিণী নারী হইতেন না। ঋক্ বেদের (৩, ৩১, ২) পংক্তিতে কন্যাকে পিতৃ-সম্পত্তির অংশ না দিবার নির্দ্দেশ আছে। এমন কি স্ত্রী ধনের উপর স্বামীর অধিকার অনেক বেশী ছিল। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে মহাভারতের যুগে (খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দে) স্ত্রী-ধনের উপর নারীর অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইহা সত্য যে, বিধবা নারী স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইতেন।

স্বামীই স্ত্রীর পূর্ণ-অভিভাবক ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীই স্বামী-গৃহে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। সামাজিক ব্যাপারেও নারী পুরুষের সহিত সমান অধিকার ভোগ করিতেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, বৈদিক যুগে নারীর স্থান সর্ব্ব বিষয়ে বেশ উচ্চ ও সম্মানের ছিল।

ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিষয়ে এবং যজ্ঞ-কার্য্যে স্ত্রী স্বামীর সাহচার্য্য করিতেন। বৈদিক যুগে সাধারণতঃ এক বিবাহ প্রচলিত ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষতঃ রাজন্যবর্গের মধ্যে পুরুষের বহু বিবাহের উল্লেখ আছে। একের অধিক স্ত্রী থাকিলে, প্রথমা স্ত্রীই ধর্ম্ম কার্য্যে সহধর্ম্মিণী হইতেন। ব্রাহ্মণ্য যজ্ঞকার্য্যে যোগদানের জন্য স্ত্রীকে 'পত্নী' এবং দাম্পত্য জীবনে 'জায়া' আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য যুগ (খৃঃ পূঃ ৮০০—৫০০ অব্দ) হইতে নারীদের যজ্ঞে অধিকার ক্রমে সঙ্কুচিত হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে (ব্রাহ্মণ্য যুগের শেষ দিকে লিখিত) দেখা যায় যে, পূর্ব্ব-কালে কোন কোন পূজা পার্ব্বণ স্ত্রী (জায়া) নিজেই সম্পন্ন করিতেন, পরবর্ত্তীকালে ঐ সমস্ত পূজা সম্পাদনে পুরোহিতের প্রয়োজন হইয়াছে। অবশ্য ইহার কারণ হইতে পারে, পূজার অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বৃদ্ধি। ইহা সত্য যে, ঐ সময় হইতে নারী-অবনতি সূচিত হয়। সংহিতা (খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দে) হইতেও উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মৈত্রেয়ানী সংহিতায় তিনটি পাপ—সুরা, পাশা ও নারীকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। নারীকে অবিশ্বাসিনী এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তৈত্তিরিয়া সংহিতায় ৬ষ্ট পুরুষ অপেক্ষা নারী নিকৃষ্টতর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে মৈত্রেয়ানী সংহিতায় নারীর সভায় গমন ও রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ বিধি-নিষিদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণ্য যুগে নানা নিয়মাবলী হইতে নারী-অবনতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেই সময় হইতে স্থির হয় যে, সাধ্বী নারী স্বামীর পরে আহার করিবে এবং গৃহস্থালী কর্ম্মে স্বামীর অনুগামিনী থাকিবে। উপনিষদে নারী-গুরুর উল্লেখ আছে। অবশ্য উহা স্বল্প অবর্ত্তমানে বিধেয় ছিল।

প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য হইতে বুঝা যায় যে, তৎকালে অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ও কন্যার বিবাহ প্রচলিত ছিল না। অপর দিকে অবিবাহিতা বয়স্কা কন্যার বহু উল্লেখ রহিয়াছে। 'ঘোষা' অবিবাহিতা অবস্থায় পিতৃগৃহে সারা জীবন কাটাইয়া দেন। গৃহ্য সূত্রের মন্ত্র হইতে বুঝা যে, বিবাহকালে পুত্র ও কন্যা যৌবন প্রাপ্ত হইতেন। কেননা মন্ত্রগুলি বালিকা বধূ বা বালক বরের উদ্দেশ্যে লিখিত নহে। ঐগুলি পূর্ণ-যৌবনা স্ত্রী ও যুবক স্বামীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সূত্র যুগ (খৃঃ পূঃ ৫০০—২০০ অব্দ) হইতে নিয়মিত ভাবে বালিকা বিবাহ প্রথম দেখা যায়। বৈদিক যুগে অনূঢ়া বয়স্কা কন্যা ও নারী-স্বাধীনতার সমাজে নৈতিক আদর্শ বোধ হয় ক্ষুণ্ণ হয়। উহার ফলে সূত্র যুগে নারী-

অধিকার সঙ্কুচিত হয়। সেই সময় হইতে স্বামী-নির্ব্বাচনে অধিকার হইতে নারী বঞ্চিতা হন সেই সঙ্গে অল্প বয়সে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হয় এবং বিবাহ-যোগ্যা কন্যাকে বিবাহ বিষয়ে মতামত দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। নারীর বিবাহের বয়স সম্পর্কে গভিল বলেন—"নগ্নীকাতু শ্রেষ্ঠা"—(গভিল গৃহ্য সূত্র, ৩, ৪, ৪)। তিনি বালিকা বিবাহের নির্দ্দেশ দেন: ঐ বিষয়ে গৌতমও এক মত। মনুর ও তাঁহার পরবর্ত্তী স্মৃতি গ্রন্থে ঐ একরূপ নির্দ্দেশ আছে।

বৈদিক বিবাহে কখনও বিচ্ছেদ হইতে পারে না। পুরুষ বহু বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু নারী বহু স্বামী গ্রহণ করিতে পারে না। অন্যথা হইলে, প্রথাটি বৈদিক প্রথা হইবে না। ঋক্ বেদের যুগে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল না। তাই বলিয়া কোনরূপ ব্যতিক্রম ছিল না, একথা বলা চলে না: অপুত্রক বিধবা সম্বন্ধে এক পুত্র লাভের জন্য ইচ্ছা করিলে দেবরের (দেহ) সহিত সহবাস করিবার নির্দ্দেশ আছে (ঋক্—১০, ৭০, ১০, ১৮, ৭, ৪)। ঐ প্রথাকে 'নিয়োগ' বলা হইত ঐ সম্পর্ক অল্পকাল স্থায়ী হইত। উহাকে ব্যভিচার বলিয়া মনে করা হইত না। অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ঐ প্রথার প্রচলন ছিল না। ঐরূপ সম্বন্ধকে বিধবা-বিবাহ বলা চলে না। ঋক্ বেদে ঐরূপ সম্বন্ধের রীতি নীতি সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। ঐরূপ ক্ষেত্রে জাত-সন্তান মৃত স্বামীর বৈধ সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইত। অথর্ব্ব বেদে একটি পংক্তিতে উল্লেখ আছে যে, একটি বিশেষ অনুষ্ঠান (অজ পক্ষোদন) করিলে স্ত্রী ও তাহার দ্বিতীয় স্বামী পর জীবনে মিলিত হইবে। কেহ কেহ মনে করেন যে, ঐরূপ ক্ষেত্রে প্রথম স্বামী জীবিত, তবে অক্ষম বা জাতিচ্যুত বলিয়া ঐ ব্যবস্থার নির্দ্দেশ ছিল। ইহা হইতে মনে হয় এক স্বামী বর্ত্তমান দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ প্রচলন ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব নয়। পরবর্ত্তী ধর্ম্মসূত্র যেমন বশিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র, বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র ক্রমে বিধবা-বিবাহ অনুমোদন করেন। ইহার আরও পরে বিধবা-বিবাহ প্রথা একেবারেই অনুমোদন করা হইত না। মনু সংহিতায় বিবাহের বিধিতে বিধবা বিবাহের কোন উল্লেখ নাই (৯, ৬৫, ৬৬)। ইহা সত্য যে বাক্-দত্তা কন্যার ভাবী স্বামীর মৃত্যুতে মৃত-স্বামীর ভ্রাতা উহাকে বিবাহ করিতে পারিত। পরাশর ঐ প্রথা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ ব্যবস্থা অনুমোদন করেন।

উপরি লিখিত বিবাহের ব্যতিক্রম প্রথা অর্থাৎ দেবরের সহিত সহবাস-প্রথা ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া যাওয়ায় এবং বাল্য-বিবাহ প্রথা প্রচলনে বালিকা বিধবাদের পুনর্বিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য বিধবা-বিবাহ প্রথা-হিসাবে বৈদিক যুগে কোন দিন প্রচলিত ছিল না।

ঋক্ বেদের যুগে সতী-প্রথা প্রচলিত ছিল না। অবশ্য অথর্ব্ব বেদের (১৮, ৩) এক পংক্তিতে উহার অভাব আছে। মনে হয় আর্য্যদের আদিম সভ্যতার যুগে ঐ বর্ব্বর প্রথা প্রচলিত ছিল। পরবর্ত্তী কালে উহার লোপ হয়। এই যুগের প্রারম্ভে বোধ হয় উহা পুনর্প্রচলন হয়। একথা বলা চলে যে, ঐ প্রথা তৎকালে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; উহা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে স্থান পায় নাই। যাহা হউক প্রথাটি যে বর্ব্বরতার পূর্ণ, উহাতে সন্দেহ নাই।

উপসংহারে বলা চলে যে, সর্ব্ব যুগেই নারী পুরুষকে পূর্ণরূপে বিকশিত হইবার জন্য সাহচর্য্য করিয়াছে। নারীর সহ গুণ, ত্যাগ, ও সেবা মানব জাতিকে পূর্ণরূপ দিয়াছে। ধর্ম্মপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রী পুত্র ও স্বামীর জন্য কি-না করিয়াছেন? সমাজের কড়াশাসনে নারীর গণ্ডী সঙ্কীর্ণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু সমাজ গঠনে তাহার দান কোন অংশে হীন নহে। তাই আজিও সর্ব্ব-সমাজেই নারীর স্থান উচ্চে রহিয়াছে। কখন বা করুণাময়ী মাতৃরূপে, কখন বা জীবনের সহধর্ম্মিণী হিসাবে এবং কখন বা স্নেহামৃতা কন্যারূপে সে যুগ যুগ ধরিয়া নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। সেবাই তাহার ধর্ম্ম এবং জীবনের ব্রত।

নারীর জীবনের এ আদর্শ বৈদিক যুগেও এমে পরিস্ফুট হইয়াছিল।

আলোক-চিত্রের ভাষা

পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতেই মানুষের মনে একটা অজানা তীব্র আর্তি অনুভূত হয়েছিল তার দেখা রূপমাধুরী ও উপলব্ধ সত্যের বাস্তব রূপায়ণে। ফলে পাথরের বুক কেটেছে, গুহার অভ্যন্তরে প্রাচীর গাত্রে আঁচড় টেনেছে; গাছের গুঁড়িতে শাণিত অস্ত্রের দাগ পড়েছে। তাতে তার রষ্টীন মনের স্বপ্ন বাস্তবের রেখার মধ্যে ধরা পড়তে বাধা হয়েছে। কালের ধাবমান স্রোতের মধ্যে উজান ঠেলে তারা আজও বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। কলা সমালোচকের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তারা আখ্যা পেয়েছে সুকুমার কলার আদিম সার্থক প্রচেষ্টা বলে। অধুনা মানবজাতির ভাষার সৃষ্টি রহস্যও লুকিয়ে আছে সে সব অজ্ঞাত, নাম গোত্রহীন শিল্পীদের সাধনার মধ্যে। তা থেকেই মানুষ শেখে তার ভাষার হরফ।

পরিবর্ত্তনশীল জগৎ। সেদিনের আদমের সন্তান আজ আইনষ্টাইনের সন্তানে পরিণত হয়েছে। প্রকাশ-মাধ্যমে, আংগিকে পরিবর্ত্তনের ঢেউ লেগেছে। বিষয় বস্তু ঠিকই আছে। বাল্মীকি যাতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা কালিদাসকেও বাদ দেয়নি—আর বাদ দেয়না আজকের উদীয়মান তরুণ কবিকেও। শুধু প্রকাশের রকমফের। কে কতখানি সার্থক তার বিচারভার তাদের দর্শক-শ্রোতা-পাঠকের। এমনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেই একদিন ষোড়শ শতাব্দীতে আলোকচিত্রের জন্ম হয়েছিল।

বিভিন্ন মাধ্যমের যেমন পৃথক পৃথক ভাষা আছে—তেমনি আলোকচিত্রেরও একটা নিজস্ব ভাষা আছে। আজকের আলোকচিত্র গল্প বলে। লেখক কথার জাল বুনে গল্প ফেঁদে বসেন। আলোকচিত্রীও তার আলোক-চিত্র দিয়ে গল্প শোনাতে চায়। অতীতে ভাবতেও বিস্ময় জাগতো আলোকচিত্র আবার কী গল্প শোনাবে। কিন্তু এখন অতি কঠোর সমালোচকও আলোকচিত্রের গল্প বলার ক্ষমতা অম্লান বদনে স্বীকার করবেন। তবে হ্যাঁ, এর ভাষার সংগে সাধারণের পরিচয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে। আলোকচিত্রের গল্প বলা সার্থক হবে না যদি তা সাধারণের কাছে বোধগম্য না হয়। আজকের পৃথিবীতে এই বিষয়ে আলোক চিত্রীসমাজ বেশ সচেতন হয়ে পড়েছেন। বিভিন্ন প্রদর্শনীর মারফত ও সাময়িক কাগজ পত্রে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

প্রতিটি আলোকচিত্রের কিছু না কিছু বলার থাকে। সে বক্তব্য হচ্ছে তার আলোকচিত্রীর। লেখক তার গল্পের বক্তব্য দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, ড্যাস দিয়ে পংক্তির পর পংক্তি সাজিয়ে ঘাত প্রতিঘাত সৃষ্টি করে ধীরে ধীরে পাঠক মনে অনুপ্রবেশ করাতে চেষ্টা করেন। আলোকচিত্রীর ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম নেই। কম্পোজিশন, আলোক পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ, ক্যামেরার যথার্থ দৃষ্টিকোনের সুযোগের সদ্ব্যবহার, প্রপস্ বা ভারসাম্য প্রভৃতির দ্বারা তাঁর একান্তই নিজস্ব ভাষায় গল্প সৃষ্টি করে। এতে নেই কোন ধরাবাঁধা পথ বা নিয়মকানুনের বেড়াজাল, তবে আলোকচিত্রীকে অনেকাংশের জন্য নির্ভর করতে হয় যান্ত্রিক পদ্ধতির উপর। কিন্তু সৃষ্টা নয়। ওরা সব স্রষ্টার ইচ্ছার বাহন মাত্র। তাঁর বেশী নয়। অথবা ঘাত-প্রতিঘাত; অক্ষম বিন্যাস পদ্ধতি কিংবা অবাঞ্ছিত বিষয় বস্তুর অনুপ্রবেশের জন্য গল্পকারের সমস্ত চেষ্টাই পণ্ডশ্রম হয়। আলোকচিত্রীর ক্ষেত্রেও তার বক্তব্য রসোত্তীর্ণভাবে রূপায়ণে প্রতিবন্ধক হয়ে পড়ে ক্যামেরা দৃষ্টিকোণের অপপ্রয়োগ, অপ্রয়োজনীয় আলোক-সংপাত এবং বিন্যাস পদ্ধতি, কম্পোজিশন। এদের মধ্যে একটির আধিক্য অথবা অভাব কিংবা দুর্বল প্রয়োগ এক বালতী দুধ নষ্ট করার জন্যে এক ফোঁটা গো-চনার মতই যথেষ্ট।

মূল-বিন্যাস (Basic composition) :

একখানা আলোক চিত্র—যে কোন বিষয় বস্তুরই হোক্ না কেন—যত দুর্বলই হোক্ না কেন তার রূপায়ণ—তথাপি তাতে একটা ভাব প্রকাশ পাবেই। দর্শকের মনে একটা অনুভূতির আবেগ সৃষ্টি করিবে। সকল আলোকচিত্রে অথবা অবান্তর বিষয়-বস্তুর উপস্থিতি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। তাতে আলোকচিত্রের মূল সুর নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য প্রথমেই ঠিক করে নিতে হবে—মূল বক্তব্য প্রকাশে কতটুকুই বা রাখার প্রয়োজন আছে আলোকচিত্রের মূল 'নেগেটিভে'। সুনির্দিষ্ট সরল রেখা টেনে অবাঞ্ছিত পদার্থ-গুলো ক্যামেরার দৃষ্টিপথের বাইরে ফেলে দিতে হবে—'সাটার' টিপবার পূর্বেই। এই প্রসংগে একজন অভিজ্ঞ আলোকচিত্রীর উক্তি প্রণিধানযোগ্য—..."One should finish his picture before he takes." অনেক সময় দেখা যায় আপাতঃ মধুর ও মনোরম দৃশ্যাবলীকে মূল সুরের গুরুত্ব বজায় রাখতে গিয়ে বাদ দিতে হয়। সে প্রলোভনকে পরিহার করাই শ্রেয়ঃ। এখানে আরেকটা কথা বলা প্রয়োজন। কম্পোজিশন্ বা বিন্যাস-পদ্ধতি বিশেষ কোন ধরাবাঁধা নিয়মে চলে না—তা আরোপ করা হলে অনেক সময়ই তার সৃজনী-মাধুরী থাকে না। সার্থক আলোকচিত্র সম্বন্ধে বিদেশী একজন খ্যাতনামা আলোক-চিত্রশিল্পী বলেছেন—"It entirely depends upon the man behind the camera"। এটা অতি সত্য কথা। আলোকচিত্রের রসোত্তীর্ণ গুণ নির্ভর করে তার স্রষ্টার উপর।

চিত্রের সমালোচনায় অনেক সময় বলতে শোনা যায় যে বিন্যাস বা 'কম্পোজিসন্'-এ প্রয়োজন এমন দু'টি চোখের বাদের জানা আছে process of exaggeration এবং elimination. অনুভূত অনবয়ব কোন চিন্তার রূপদান করতে হলে আলোকচিত্রের বস্তু বিশেষের অতিরঞ্জন করতে হয়, আবার রসসৃষ্টিতে যা অন্তরায় তাকে ছেঁটে ফেলতে হয়। এরজন্য মাঝে মাঝে ক্যামেরা-দৃষ্টিকোণেরও পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে :

দৃষ্টিকোণ—(Camera angle) :

অনেক সময় বিখ্যাত সংবাদ আলোকচিত্রীরা দৃষ্টিকোণ বা camera angle-এর উপর জোর দিয়ে থাকেন। একই বস্তুর আলোকচিত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের ব্যবহারে বিভিন্ন ভাবের সৃষ্টি হয়ে থাকে—গল্পের মোড় দেয় ঘুরিয়ে। কর্তৃবাচ্য ও ভাববাচ্যের ক্রিয়াপদের মত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাদের কাজে লাগানো যেতে পারে। ধরা যাক্, একজন লোক ছুটে আসছে, ভূমিতল থেকে ক্যামেরা রেখে মুখ উঁচু করে যদি ছবি তোলা যায়—ছুটে আসা লোকটাকে তার দৈর্ঘ্যের তুলনায় আরও দীর্ঘ মনে হবে। পেছনে ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা, ছাড়িয়ে তার মাথা ও কাঁধ উপরে উঠে যাবে। অনেকটা কাত হয়ে পড়বে। দর্শকের মনে সহজেই গতি-বেগ সম্বন্ধে একটা অনুভূতি প্রতীত হবে—যা একই তল থেকে নিলে পরে হয়তো হোত না। সাধারণতঃ সাঁতারের ছবি, দৌড়ান, খেলাধুলার আলোকচিত্রে এই সকল অপ্রচলিত দৃষ্টিকোণের ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।

আবার 'ক্লোজ-আপে' ব্যক্তি-বিশেষে দৃষ্টি-কোণের পরিবর্তন ঘটে। পৃথিবীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তিদের আলোকচিত্র অনুধাবন করলে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে এই সত্য ধরা পড়ে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ক্লোজ-আপে দেখা গেছে চোখের সমতল থেকে ছবি তোলা হলে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে—যেমন অন্য দৃষ্টিকোণের ব্যবহারে তা হয় না। আবার মুসোলিনী, হিটলারের বেলায় চোখের সমতলের নীচ থেকে (low angle) তোলা হয়ে থাকে। তাতে দেখা গিয়েছে অতি অদ্ভুতভাবে তাঁদের স্ব স্ব ক্লোজ-আপে সাম্রাজ্যবাদ শক্তির অনবয়ব মূর্তি ধরা পড়ে। শিশুদের বেলাও এই একই দৃষ্টি-কোণের ব্যবহারে তাদের শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্য আরও সুন্দর-ভাবে প্রতিভাত হয়। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে ব্যাক-গ্রাউণ্ড বা পিছনকার দৃশ্যাবলীর প্রতিও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাড় পেছনে রেখে কোন লোকের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হলে দেখা যায় তার ব্যক্তিত্ব অনেকখানিই ঢাকা পড়ে যায় গাছের সুসংবদ্ধ পাতায়। আকাশ অথবা ঘর-বাড়ী তার চেয়ে ভাল, তারা সহজ ও সাবলীলভাবে

আলোকচিত্রে উপস্থিত হয়ে মনের ভাব প্রকাশে সহায়তা করে।

প্রপস্ বা ভারসাম্য বজায় রাখার সাথী :

আলোকচিত্রে এদের উপস্থিতি সময় বিশেষে অপরিহার্য। প্রপস্ যে কোন জিনিষই হতে পারে। মাটীর কলসী, বিয়ের কনের জন্যে প্রয়োজন সোনার মুকুট, আবার খুনীর খেলায় দরকার লৌহদণ্ডের। যান-বাহনের নিয়ম না মেনে একটা গাড়ী ভীষণ একটা দুর্ঘটনায় পড়েছে। সেই ভাংগা গাড়ীর আলোকচিত্রে যদি একজন পুলিশকে রাখা যায় তাতে আলোকচিত্রের ভাষা আরও সহজে বোধগম্য হবে আলোকচিত্রের সার্থকতাও এখানেই।

এই ধরণের প্রপস্ যে কোন জিনিষই হতে পারে। এক টুকরো খড়, খেলনা, গাছের ডাল, জানালার গরাদ। চার্চিলের চুরুটও এই ধরণের প্রপস্। আমাদের দেশের রাজনীতিক নেতাদেরও 'ক্লোজ-আপে' কতগুলি বিশেষ বস্তুর সংযোগে তাঁহাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। রাজাজীর কালো চশমা ও ছড়ি, পণ্ডিতজীর গালে হাত এবং খদ্দরের টুপি এবং বাপুজীর বাঁশের ছড়ি। এত গেল বিখ্যাত ব্যক্তিদের কথা। শিশুদের ক্লোজ-আপে অনেক সময় খেলনার উপস্থিতিতে তাদের শিশু-সুলভ চারিত্রিক কোমলতা ও সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হয় তাদের আলোক-চিত্রে।

ভংগী বা Pose :

সার্থক আলোকচিত্রের চাহিদা প্রত্যেক দেশেই দিন দিন বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে কাগজের সম্পাদকেরা 'ফীচার্স' আলোকচিত্রের উপর খুব বেশী আজকাল জোর দিয়ে থাকেন। তাতে গতিবেগ কতখানি আছে তাও তাঁদের চোখ এড়াতে পারে না। তাই আজকে সংবাদ আলোক-চিত্রেও (News Photography) আলোকচিত্রীকে এমনভাবে ছবি তুলতে হয় যাতে সুন্দর ও সার্থকভাবে গতি সম্বন্ধে অনুভূতি সৃষ্টি করে। সেজন্য তাকে অত্যন্ত তৎপর হতে হয়। পক্ষান্তরে উপরোক্ত বিষয়গুলোর অপপ্রয়োগ ও দুর্বল প্রয়োগে আলোকচিত্রে আড়ষ্টতা এসে যায়, সজীবতা যায় হারিয়ে। মনকে নাড়া দেওয়ার ক্ষমতা বিলোপ পায়।

আলোক-চিত্রীর কাজ আরম্ভ হয় তার 'মডেলকে' নিয়ে। মডেল যে কেহ এবং যে কোন বস্তুই হতে পারে। এমন কি বিশ্ব-প্রকৃতিও বাদ যায় না। আলোক-চিত্রীর ক্যামেরার দৃষ্টিপথে থেকে যে তাকে সৃষ্টিতে সাহায্য করবে সেই তার মডেল।

এই সকল মডেলদের যথাযথ সংস্থাপন ও তাদের 'মুডের' উপর আলোকচিত্রের সুফলতা নির্ভর করে। অনেক সময় দেখা যায় যে ধরণের পোজ বা ভংগী কোন একটি নির্দ্দিষ্ট ভাব প্রকাশে দরকার মডেলের ধৈর্যচ্যুতিতে তা নষ্ট হয়ে যায়। তার জন্য দায়ী আলোকচিত্রী। তাকে আরও তৎপর হতে হবে সেই সব ক্ষেত্রে। সেইরূপ অবস্থায় আলোকচিত্র গ্রহণ করাও উচিত হবে না। তাতে শুধু পরিশ্রমই পণ্ড হবে না সংগে সংগে আর্থিক ক্ষতিও হতে পারে। ফলে অধিকাংশ আলোকচিত্রই অন্যান্য সকল গুণ থাকা সত্ত্বেও একমাত্র মডেলের ভংগীর দোষে 'stiff' বা আড়ষ্ট হওয়ার জন্যে আলোকচিত্র রসোত্তীর্ণ হতে পারে না। সাধারণতঃ আলোকচিত্রী যদি অত্যন্ত ধীর হয়, অথবা যথাসময়ে shutter টিপতে না পারে তা হলেই ছবির প্রাণময় অভিব্যক্তি—যা আলোকচিত্রীর একান্ত কাম্য তা নষ্ট হতে বাধ্য। বহুক্ষণ ধরে ক্যামেরার সম্মুখে বসে বসে মডেলের ক্লান্তি বোধ হওয়া অথবা বিরক্তি আসাও খুব স্বাভাবিক। তখন সে হারিয়ে ফেলে স্বতঃস্ফূর্ত সজীবতা মুখের অভিব্যক্তিতে। তখন সমস্ত ছাপিয়ে একটা করুণ আকুতিও প্রতিভাত হবে। তাই করা তাড়াতাড়ি তুলে ফেলুন'; এর পরে আলোকচিত্র হয় বটে তবে তাতে থাকে না কমনীয়তা ও চাওয়া-অভিব্যক্তি। এই সকল ক্ষেত্রে একটা নিয়ম অনুসরণে আমি বেশ সুফল পেয়েছি। মডেলের নির্দ্দিষ্ট আসনের পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত আলোক সংপাত ও বিন্যাস পূর্বেই ঠিক করে তারপর মডেলকে বসালে এই দোষমুক্ত হতে পারে এই ধরণের আলোকচিত্র।

আলোক-সংপাত বা Lighting :

আলোকচিত্রে একটা বিশিষ্ট ও অপরিহার্য ভূমিকা

ওপ্রে আলোকের। চিত্রকর ক্যানভাসের গায়ে, কাগজের উপর তার দেখা সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে বিভিন্ন রঙের সাহায্যে তুলির আঁচড়ে। আলোকচিত্রীও তার দেখা ও উপলব্ধ বস্তুকে রূপ দেয় আলোক সংপাত নিয়ন্ত্রণে। আলোকচিত্রকে সেজন্য বলা হয়ে থাকে painting with light ; নাটকীয় মুহূর্ত, যাত প্রতিঘাত সৃষ্টিতে আলোক সংপাত নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিষয়বস্তু ভেদে আলোক সম্পাতের তারতম্য ঘটে। একজন খুনীর আলোকচিত্রে তার কৃত অপরাধ চিত্রে রূপ দিতে হলে তাতে অতীব 'কনট্রাষ্ট' ও 'হার্স' আলোক সম্পাত প্রয়োজন। সাদা-কালো পরিপ্রেক্ষিতে আলোকচিত্র সার্থক হবে সেখানে। পক্ষান্তরে কোন সুন্দর ও শান্তির ভাব প্রকাশে প্রয়োজন ছায়াহীন আলোকপাত। বিষের কনে, শিশুদের ক্ষেত্রে, মিলাত্মক বিষয়বস্তুতে যত কম ছায়াপাত হবে ততই আলোকচিত্রের মাধুর্য বাড়বে। বিয়োগান্ত নাটকের মত রসসৃষ্টিতে আলোকচিত্রে অনেক সময় গভীর ছায়াপাত প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে কখনও আলো-আঁধারের contrast থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। তবে এই বিষয়েও কোন ধরাবাঁধা নিয়মকানুন নেই। আলোকচিত্রীর উপরই ইহা নির্ভরশীল।

অনেক আলোকচিত্রীরই যথেষ্ট আলোক-সংপাতের সরঞ্জাম থাকে না, অবশ্য ষ্টুডিও ছাড়া ফলে অনেক সময় কম আলোক-সংপাতের সরঞ্জাম নিয়ে কাজ করতে হয়। সেখানে প্রধানতঃ একটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে আলোক সংপাত অথবা 'হার্স' কিম্বা contrast না হয়ে পড়ে।

সূর্যকে সামনে রেখে ছবি তুলতে গিয়ে অনেক সময় প্রতিফলক ব্যবহার অথবা flash এর সাহায্য নিলে অত্যন্ত সুফল পাওয়া যায়। তাতে ক্ষেত্রবিশেষে রোমাঞ্চকর অনুভূতির সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। চরিত্র চিত্রণে অনেক সময় 'সফট', 'ফ্ল্যাট' অথবা 'হার্স' আলোক সংপাত একান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এই প্রবন্ধের যবনিকা টানবার পূর্বে একটা কথা বলা প্রয়োজন—আলোকচিত্রী বর্ত্তমানে রঙীন ও ত্রিমাত্রিক আলোকচিত্র তোলার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তার সর্বাংশীন সফলতা তার সৃষ্ট আলোকচিত্রের ভাষাকে আরও সুষ্ঠু ও সুন্দর করবে অদূর ভবিষ্যতে সেদিন আলোকচিত্রও একটা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে গল্প বলার আসরে।

সদ্য প্রকাশিত

মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের

রাষ্ট্রনীতি

রাষ্ট্রনীতির মূল কথা সহজ ভাষায় ও সরলভাবে বিভিন্ন প্রবন্ধে ধৃত।

রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে এই ছোট সংকলন গ্রন্থে সকলেই

শিক্ষা ও প্রেরণা লাভ করিবেন।

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

পশ্চিম বঙ্গ ও সন্নিহিত রাজ্যগুলি

অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ও শ্রীমতী মিনু দেবী

পশ্চিম বঙ্গের সন্নিহিত রাজ্য বলিতে আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা নামক 'ক' শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলিকে বুঝায়। এতদ্ব্যতীত সিকিম, ভূটান, ত্রিপুরা ও মণিপুর নামক ছোট ছোট রাজ্যগুলিও পশ্চিম বঙ্গের সন্নিহিত রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত। ঐ সমস্ত সন্নিহিত রাজ্য-সমেত পশ্চিমবঙ্গ এক বৃহৎ অঞ্চল। ঐ অঞ্চলের আয়তন ও লোকসংখ্যা কত, উহাই নিম্নে লিখিত হইল।

সন্নিহিত রাজ্যগুলি সমেত পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্যগুলি	আয়তন (হাজার বর্গ মাঃ)	লোকসংখ্যা (লক্ষ জন)	লোকসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ মাইলে)
পশ্চিমবঙ্গ		২৪৮·৬	
আসাম		৯০·৪	
বিহার		৪০২·৩	
উড়িষ্যা		১৯৫·৫	
সিকিম	২·৭	১·৪	
ভূটান	১৮·০	—	
মণিপুর	৮·৪	৫·৮	
ত্রিপুরা	৪·০	৬·৪	১৫৮

ভারতের এই বৃহৎ পূর্ব্বাঞ্চলে (পূর্ব্ব পাকিস্তান সমেত) মিলিত হইয়াছিল প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগে নানা নরগোষ্ঠি। ঐ সমস্ত নরগোষ্ঠিদের মধ্যে অন্যতম ছিল—আর্য্য, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলিয়। "বহু মানব-জাতির মিলনভূমি বলেই মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে, বাঙালীরা এত সচেতন"—বলেছেন শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল। প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগে ভারতের এই পূর্ব্ব অঞ্চলটিতে যে আদিম অধিবাসীরা বাস করিতেন, তাঁহারা আর্য্য ছিলেন না। তাঁহাদের আচার-ব্যবহার অভ্যাস-অনুষ্ঠান, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য স্বতন্ত্র ছিল। একটা সভ্যতাও তাঁদের নিশ্চয়ই ছিল। ঐ সভ্যতা ও মনোভাব কতকটা যে আর্য্য-বিরোধী বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ ছিল, উহার প্রমাণ আজও পাওয়া যায়, উহাদের দৈনিক জীবনের নানা কার্য্য-কলাপে। তবে বিভিন্ন রক্তমিশ্রণে সঙ্কর জাতি পেয়েছে আদিম জাতির শিল্পকুশলতা ও ভাব-প্রবণতা এবং আর্য্যের তীক্ষ্ণ অথচ সূক্ষ্ম চিন্তা-শক্তি। বৈদিকযুগেও এই অঞ্চলের অধিবাসীদের কৃষি ছিল প্রধান পেশা। উহারা ভারতে ধানের চাষ, জলসেচ এবং পর্ব্বত-গাত্রে চাষাবাদ প্রভৃতি বিশেষ কৃষি পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করে। পঞ্চায়েৎ শাসন ও গ্রাম-উন্নয়ন পদ্ধতি দেশে প্রথম এনেছিলেন ঐ আদিম অধিবাসীরা। ইহা ছাড়া পাথর, তাম্র, ও লোহার ব্যবহার তাঁরা জানতেন। যতদূর জানা যায়, ভারতের ঐ বিতাড়িত আদিম অধিবাসীরা নূতন কৃষ্টির গোড়াপত্তন করে।

আর্য্য যাকি উহাদের নিকট শিখেছিল—লৌকিক আচার-ব্যবহার, মন্ত্র-তন্ত্র, এবং সিন্দুর ও হলুদের ব্যবহার। আর্য্যকরণের ফলে, উহাদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষা-দীক্ষায় পারদর্শী ছিলেন, তাঁরা সমাজের উচ্চ-স্তরে উন্নীত হ'য়েছিলেন, আর সাধারণ লোকেরা অনুচ্চ শ্রেণীতে রয়ে যায়। এই অঞ্চলে আর্য্যদের নিপীড়িত বহু নরগোষ্ঠি দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে অনেকটা প্রজাতন্ত্রমূলক গ্রাম্য-সমাজ তৎকালে গড়িয়া তুলিয়াছিল। মোগল যুগেও নানা ঝড় এই অঞ্চলের উপর দিয়া বহিয়া যায়। বাংলা নিজ বৈশিষ্ট্য দিয়া এই অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। ইংরাজ আমলে এই পূর্ব্বাঞ্চল নানা অংশে বিভক্ত ছিল। উত্তর বঙ্গে গৌড়, পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে ছিল সমতট, হরিকেল ও বংগাল, পশ্চিম বঙ্গে ছিল গৌড়ের কিয়দংশ, রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত ঐ বৃহৎ অঞ্চলে কোনো একটি ভাষা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল না। তবে ভাষাভাষীর মধ্যে সমতা ছিল। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'বিশাল বাংলা'য় লেখেন—

"দক্ষিণ-পশ্চিমে ছোটনাগপুরের লোহিত বস্তুর উপত্যকা ও তালীবন-বেষ্টিত সাগরকূলের বালেশ্বর, উত্তর-পশ্চিমে হিমালয়ের সানুদেশে ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া, পূর্ব্বদিকে আসামের সুরমা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের বিপুল বারিধারা-প্লাবিত সমতল উদ্যান ও স্নিগ্ধ বনানী বাংলার সীমানা। বাংলার ইহাই প্রাকৃতিক পূর্ণাবয়ব।"

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মীরজুমলার শাসনাধীনে যে বাংলা ছিল, তার মানচিত্র আঁকেন ভ্যান্ ডেন ব্রুক্। সেই সময় নদীগুলি ছিল বাংলার প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক পরিসীমা। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে বাংলার পরিসীমার যে সমস্ত সহর ছিল উহাদের মধ্যে অন্যতম হইল—মালদহ, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার, বক্রেশ্বর, পলাশী, নদীয়া, সাতগাঁ, হুগলি, মেদিনীপুর, কলিকাতা, তমলুক, বালেশ্বর, বাকলা, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম, ঢাকা, সোণারগাঁ, শ্রীহট্ট ও বারিতলা।

১৭৩০ খৃষ্টাব্দে আইজ্যাক টিরিয়ান বাংলার মানচিত্র আঁকেন। ঐ সময় বাংলার নবাব ছিলেন সুজাউদ্দীন। মোগল সাম্রাজ্যের শেষদিকে সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে ঐ মানচিত্র আঁকা হয়। উত্তর-পশ্চিমে পাটনা-মুঙ্গের, পশ্চিমে জৌনপুর, দক্ষিণ-পশ্চিমে কটক-বালেশ্বর, দক্ষিণে মেদিনীপুর-হুগলী-চট্টগ্রাম, পূর্ব্বদিকে শ্রীহট্ট-আসাম এবং উত্তরে দার্জিলিং-জলপাইগুড়ির পার্ব্বত্য পাদদেশ।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এই বৃহৎ অঞ্চলটি দুই প্রদেশে বিভক্ত হয়—বাংলা ও পূর্ব্ববঙ্গ-আসাম। সমগ্র অঞ্চলটি বিহার, উড়িষ্যা, সমগ্র বঙ্গদেশ ও আসাম লইয়া গঠিত। উহার মধ্যে বিহার-ছোটনাগপুর-উড়িষ্যা-পশ্চিমবঙ্গ লইয়া নূতন বাংলা গঠিত হয় এবং দ্বিতীয় প্রদেশটির মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম থাকে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের তীব্র রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গ পুনরায় যুক্ত হয়ে যায়। ঐ সময় কয়েকটি বাংলাভাষী অঞ্চল সন্নিহিত বিহার ও আসাম প্রদেশের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়। এক্ষণে রাজনৈতিক পরিসীমা কতটা বাস্তব উহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পূর্ব্ববঙ্গ সমেত পশ্চিমবঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম রাজ্যগুলি লইয়া যে বৃহত্তর অঞ্চল, উহার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বেশ স্পষ্ট। অঞ্চলটির উত্তর ও পূর্ব্বদিক জটিল পর্ব্বতদ্বারা বেষ্টিত। হিমালয় ও আসামের পর্ব্বত এক জাতীয় এবং উহাদের শিলাস্তর অনেকটা একরূপ। উভয়ের গাত্র উচ্চতানুযায়ী নানা জাতীয় বৃক্ষে আবৃত। বৃক্ষগুলির মধ্যে চিরহরিৎ হইতে আরম্ভ করিয়া শালীয় বৃক্ষ নামক সর্ব্বজাতীয় বৃক্ষ রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে অনেকগুলি শক্ত দারুময়, আবার অপরগুলি নরম দারুময়যুক্ত। ইহা ছাড়া বাঁশ, বেত এবং ওষধি বৃক্ষের ইয়ত্তা নাই। ফলবৃক্ষের সংখ্যা কম নহে। ঐ সমস্ত বনানী সম্পদে এ অঞ্চল পরিপূর্ণ। কিন্তু ঐ সম্পদ যথাযথ ভাবে ব্যবহৃত হয় না। বরং অধিকাংশই নষ্ট হয়। বর্ত্তমানে বৈদেশিক সকল রাষ্ট্রেই বনভূমি সযত্নে রক্ষিত হয় এবং বনজ সম্পদে রাষ্ট্রের বহু আয় হয়। ঐ বৃহত্তর অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিমে ছোটনাগপুরের মালভূমি ও দাক্ষিণাত্যের অনুস্তৃত পর্ব্বতমালা। ঐ মালভূমি ও পর্ব্বতমালা খনিজ-সম্পদে পুষ্ট। শ্রমশিল্প স্থাপনে ও আর্থিক উন্নতিতে খনিজ-সম্পদের দান অপরিসীম। ঐ বৃহত্তর অঞ্চলের পরিসীমায় অবস্থিত এই দুই বিশেষ অঞ্চলের মাঝে বা পাশে নদীবিধৌত পলল মাটির দ্বারা গঠিত সমভূমি, সমভূমির সাধারণ ঢাল দক্ষিণ দিকে। আসামে ব্রহ্মপুত্র অধিত্যকার সাধারণ ঢাল পশ্চিম দিকে। উড়িষ্যার উপকূল অঞ্চল পূর্ব্ব দিকে ঢালু। গঙ্গা ব-দ্বীপ নদী পলল দ্বারা গঠিত। উহা উদ্ভিদ্ খাদ্য-প্রাণে পুষ্ট। ব-দ্বীপ অঞ্চলে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে প্রসারিত রহিয়াছে সুন্দরবন। সুন্দরী, কেওড়া, পুনুর, নারিকেল, হোগলা ইত্যাদি বৃক্ষাবৃত গহন সুন্দরবন সরীসৃপ, ও হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ। তথাপি মানব ঐ বনভূমিতে জীবিকার্জ্জন করে। নিভীক অধিবাসী স্থানে স্থানে চাষ করে, কোথাও বা মাছ ধরে, কোথাও বা কাঠ কাটে, কোথাও বা মধু, লাক্ষা ইত্যাদি সামগ্রী সংগ্রহ করে। বৃহত্তর অঞ্চলের পরিসীমায় স্বতন্ত্র ভৌগোলিক পরিস্থিতির মাঝে ভিন্ন ভাষাভাষীর অধিবাসীদের কার্য্যকলাপ অনেকটা একরূপ। জীবিকার্জ্জনের

বস্ত্রবাস, গৃহ-নির্মাণ, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, যন্ত্রাদি ব্যবহার, এমন কি বিবাহ-পদ্ধতির মধ্যে বেশ একটা মিল আছে। প্রাচীন কৃষ্টি ও ঐতিহ্য বিভিন্ন রাজনৈতিক চাপে অনেকটা লোপ পাইলেও, বিলুপ্ত হয় নাই। পরস্পরিক সহানুভূতি ও সাহচর্য্য অদ্ভুত ও প্রণিধানযোগ্য। তবে অন্তরায় কোথায়? ঐ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। বিহারের গাঙ্গেয় সমভূমি হইতে ব-দ্বীপ অঞ্চল বা ব্রহ্মপুত্রের নদী-উপত্যকা হইতে উড়িষ্যার নদী-অববাহিকার ও তটভূমিতে অধিবাসীদের প্রধান পেশা চাষবাস। চাষবাসের পদ্ধতি অনেকটা একরূপ। স্থানীয় ভৌগোলিক অবস্থানুযায়ী সামান্য পার্থক্য থাকিতে পারে। কিন্তু মোটামুটি ভাবে দেখিলে ধান্যই প্রধান শস্য। অধিবাসীদের সকলেরই ভাতই প্রধান খাদ্য। অঞ্চলের অবস্থান ও অধিবাসীর ধর্ম্ম অনুযায়ী অনেকেই মাছ-ভাত খাইতে ভালবাসে। সামান্য কৃষ্টি এই অঞ্চলের অধিবাসীরা জলবায়ু ও আর্থিক পরিস্থিতি অনুযায়ী অন্য দেশের তুলনায় কিছুটা অলস বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে। মাঠে লাঙ্গল দিয়া চাষবাস করে, আবার অবসর সময়ে কুটীর-শিল্পে যোগ দেয়। ইংরাজ-আমলে কুটীর শিল্পের উপর কুঠারাঘাত করিল প্রমশিল্প-জাত সামগ্রী। উহা ছিল রাজনীতি, বিদেশীর স্বার্থে প্রণোদিত।

এই অঞ্চলের অধিবাসীরা কোনদিনই পরমুখাপেক্ষী ছিল না। ইংরাজ-আমলে উহাদের আর্থিক অবস্থা হীন হইয়া পড়ে। পূর্ব্বাঞ্চলে উহাদের জীবনধারণের মান অন্য দেশের তুলনায় কম থাকিতে পারে। উহাতে জাতীয় স্বচ্ছলতা বা স্বাধীনতা বুঝা যায় না। জাতির বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্টি কি কেবল আর্থিক মানের উপর নির্ভর করে? আধুনিক ধরণে অধিবাসীরা চাষ করিত না সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া কি উহারা অনাহারে বা অর্দ্ধভুক্ত থাকিত? বর্ত্তমানে জীবনধারণের মান পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হইয়াছে। তাই বলিয়া আর্থিক স্বচ্ছলতা কি আছে? আজও প্রতিদিন প্রত্যেক ভারতবাসী ৩০০০ ক্যালোরী পরিমিত খাদ্য পায় না। সে যে খাদ্য খায় উহার ক্যালোরীর মান মাত্র ২২০০। সুতরাং গরমিল কোথায়?

সন্নিহিত রাজ্য সমেত পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-শস্য

রাজ্য	আবাদী জমি (লক্ষ একর)	মাথাপিছু আবাদী জমি (একর)	মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন (হাজার টন)
পশ্চিমবঙ্গ	১১৯	·৪	৩৮৪৩
আসাম	৫০	·৫৫	১৭৫১
বিহার	১৯৮		৪৮২৬
উড়িষ্যা	১৩৮		২০৮২
মণিপুর	২		৯৮
ত্রিপুরা	৫		১২৬
সিকিম	—		—
ভূটান	—	—	

খাদ্য-শস্যের চাহিদা পশ্চিমবঙ্গে অতিরিক্ত। পশ্চিমবঙ্গ ঘাটতি দেশ। বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে খাদ্য-শস্য অতিরিক্ত থাকে। ঐ সমস্ত খাদ্য-শস্যের কিছুটা পশ্চিমবঙ্গে প্রেরিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সমেত এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে ইক্ষু, তামাক, চা ও পাট অধিক উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া ঐ সমস্ত রাজ্যে কিছু তুলা উৎপন্ন হয়।

সমগ্র অঞ্চলটির বৈশিষ্ট্য এই যে, মনুষ্য-হিতকর কার্য্যাদির উন্নয়ন কোন এক সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সম্ভব নয়। জলসেচ পরিকল্পনায় দামোদর নদী পরিকল্পনা উচ্চ-স্থান অধিকার করে। ঐ নদী পরিকল্পনায় বিহার রাজ্যের ও পশ্চিমবঙ্গের অনেকটা উপকৃত হইবে। আবার ময়ূর পরিকল্পনায় বিহারের সাঁওতাল পরগণা এবং পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম জিলা উন্নত হইবে। অপরদিকে জাপানী প্রথায় চাষ সমগ্র অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

খনিজ সম্পদ ও শিল্প-কারখানাগুলি এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, রাজনৈতিক সীমারেখার প্রভাব উহাদের উপর যৎসামান্য। দক্ষিণ বিহারে ও উড়িষ্যায় কয়লা, খনিজ লৌহ, খনিজ তাম্র, খনিজ এলুমিনিয়াম ইত্যাদি সম্পদ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্দ্ধমান বিভাগের পশ্চিমাংশে এবং দার্জ্জিলিং জিলায় খনিজ

সামগ্রী উত্তোলিত হয়। আসাম রাজ্যে খনিজ তৈল, চুনাপাথর, নিগনাইট কয়লা, বর্ত্তমানে খনিত হয়। সর্ব্ব ক্ষেত্রেই বন্দর, পরিবহন, জলবায়ু, শ্রমিক প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সুবিধা বুঝিয়া শ্রমশিল্প গড়িয়া উঠে। বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে হুগলী পর্য্যন্তে, আসানসোল অঞ্চলে, খড়্গপুরে এবং দার্জ্জিলিঙে শ্রমশিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। বিহার রাজ্যে খনি ও কৃষি অঞ্চলে শিল্প কারখানা গড়িয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমানে উড়িষ্যা রাজ্যে স্থানে স্থানে শ্রমশিল্প স্থাপিত হইতেছে। আসাম রাজ্যে কাঁচামালের সন্নিধানে কতকগুলি শ্রমশিল্প স্থাপন আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া রাজনৈতিক সীমা কি ঐ সমস্ত রাজ্যের অর্থনৈতিক জীবনকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও পৃথক করিতে পারে? আজও সন্নিহিত রাজ্যগুলি হইতে ভিন্ন ভাষাভাষী শ্রমিক একত্র শ্রমশিল্প কারখানায় পাশাপাশি অর্থোপার্জ্জন করে। কলিকাতা বন্দর ঐ সমস্ত রাজ্যের সামগ্রী আমদানি-প্রদান করে। কলিকাতা ও হুগলী পর্য্যন্তের শিল্পাঞ্চলে কৃষিজ, খনিজ, বনজ ও কুটীর শিল্পজাত সর্ব্বপ্রকার সামগ্রী সত্বর বিক্রয়-বাজার পায়। পরিবহনে ঐ বৃহৎ পূর্ব্বাঞ্চলটি এক-সূত্রে আবদ্ধ। দৈব-বিপর্যয়ে, শিক্ষা-দীক্ষায় ও বৈদেশিক সীমান্ত সমস্যায় পশ্চিমবঙ্গ ও সন্নিহিত রাজ্যগুলি সর্ব্বসময় এক। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে পৃথক পৃথক রাজ্য অপেক্ষা সঙ্ঘবদ্ধ অঞ্চল বা গণ্ডী বিশেষ ফলদায়ক। উহাতে আর্থিক ও রাজনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি সত্বর সম্ভব। বৃহত্তর গণ্ডীগুলির মধ্যে বিভিন্ন ভাষাভাষীর রাজ্যগুলি পরিসীমার উপর অধিক দৃষ্টি না রাখিয়া, মনুষ্য-হিতকর কার্য্যে যদি পরস্পর ব্রতী হয়, তাহা হইলে প্রাকৃতিক সম্পদ উদ্ধার ও পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষি, জলসেচ, খননকার্য্য, শিল্প-কারখানা, পরিবহন ও সামাজিক উন্নয়ন একজোটে সম্ভব হইবে। উহাতে অঞ্চল বা গণ্ডীর অধিবাসীরা সমাজতন্ত্রবাদী সমাজে সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিবে। সকলেই সমাজের বা গণ্ডীর উন্নয়নে ব্রতী হইবে। সন্নিহিত রাজ্যগুলি সমেত পশ্চিমবঙ্গ যে বৃহৎ অঞ্চলে পরিণত হইবে, উহাতে ভৌগোলিক সামঞ্জস্য যেমন আছে, তেমন কৃষি ও জলসেচ, খনি ও শিল্প-কারখানা, পরিবহন ও বাজার প্রভৃতি বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয় আরও দৃঢ়তর হইবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলে সামাজিক জীবন সুখময় হইবে। আঞ্চলিক কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য ভারতকে নূতন প্রেরণা দিবে। ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের উন্নয়ন পরিকল্পনা রাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্যগুলিকে অঞ্চল বা গণ্ডী গঠনে সহায়তা করিবে। দেশবাসী ও কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে সচেষ্ট হইলে উহা অচিরে কার্য্যকরী হইতে পারে।

"বাংলাদেশে এমন এক কৃষ্টি এসে দেখা দিয়েছে যার দৃষ্টি স্বভাবতই ভবিষ্যতের দিকে এবং বিশ্বমানবের দিকে।.... গণতান্ত্রিক ভাব বাংলা দেশে অনেক গভীর এবং ব্যাপক।" —বলেছেন "ভবিষ্যতের বাঙালী"তে ওয়াহেদ আলি।

অঞ্চলটিতে খাদ্যশস্যের জমির আয়তন (গড়)

(হাজার একর)

রাজ্য	চাউল	গম	যব	জোয়ার	বাজরা	ভুট্টা	ছোলা	মোট
আসাম	৪০০৮	৩	—	—	—	৪৪	—	৪০৫৬
বিহার	৯৬০৬	১১৬০	১১১৬	৭৬	৭৪	১১১২	১১৬৪	১৫০৪৮
উড়িষ্যা	৫৩৮৭	৬	১	৩২	৬	২৩	১৬৩	৫৬২৩
পশ্চিমবঙ্গ	৯৪৫৬	৮০	৪৭	২	২	৮৯	২০২	৯৯১১
ত্রিপুরা	৩২৩	—	—	—	—	—	—	৩২৩
মণিপুর	—	—	—	—	—	—	—	—
সিকিম	—	—	—	—	—	—	—	—
ভূটান	—	—	—	—	—		—	—

(মণিপুর, সিকিম ও ভূটান রাজ্যগুলির সংখ্যা-তথ্য পাওয়া যায় নাই।)

অঞ্চলটিতে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন (গড়)

(হাজার টন)

	যব	জোয়ার	বাজরা	ভুট্টা	ছোলা	মোট খাদ্য-শস্য
	—	—	—	১৩	—	১৭৫১
	১২৮	২	২	৪১২	৩০৪	৪৮২৬
	—	১০	১	১১		২০৮২
	১৮	২	১	৪১		৩৮৫৩
	—	—	—	—		১২৬
—	—	—	—	—	—	২৮
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

(মণিপুর, সিকিম ও ভূটান রাজ্যগুলির সমস্ত সংখ্যা-তথ্য পাওয়া যায় নাই।)

অঞ্চলটিতে প্রধান প্রধান ভোগ্য-শস্যের উৎপাদন (গড়)

(হাজার)

	ইক্ষু (গুড়ের টন)	চা (পাউণ্ড)	তুলা (৩৯২ পাউণ্ড বেল)	পাট (৪০০ পাউণ্ড বেল)	
আসাম	৭০	৩১৪,৩৪৭	১১	৭১৭	
বিহার	২৭৫	১,১৭৩	২	৭২৩	
উড়িষ্যা	৫০০	৪৫,৫১২	৩	১৬৭	
পশ্চিমবঙ্গ	৮৯	১৬৬,১৩৬	•	১৪৫২	
ত্রিপুরা	৬	—	৭	২৬	
মণিপুর	—	—	—	—	—
সিকিম	—	—	—	—	—
ভূটান	—	—	—	—	—

(• ৫০০-এর কম)

(মণিপুর, সিকিম ও ভূটান রাজ্যগুলির সংখ্যা-তথ্য পাওয়া যায় নাই।)

অঞ্চলটিতে রেজিষ্ট্রীকৃত শ্রমশিল্প ও প্রাত্যহিক শ্রমিক (১৯৪৯)

	আসাম		বিহার		উড়িষ্যা		পশ্চিমবঙ্গ		ভারতের মোট	
	শিল্পের সংখ্যা	শ্রমিক	শিল্পের সংখ্যা	শ্রমিক	শিল্পের সংখ্যা	শ্রমিক	শিল্পের সংখ্যা	শ্রমিক	শিল্পের সংখ্যা	শ্রমিক
বয়ন শিল্প	২	৩৫	২০	৮৬৪১	৭	৮১৮	১৯৭	৩৩৮৭০০	২১৯৯	১০৪৫১৯০
ইঞ্জিনিয়ারিং	৩৪	১৭৮১	১১০	১৩১৬৪	১০	২৭৮	৬৩৫	২২৮১২	২৯৯৯	২১৩২২১
খনিজ ও ধাতু	৪	১৫২১	১০৫	৫২৭৪৩	৩	১১৯	৫৯	১৯০৪৪	৭২৬	১০৮৫০৫
খাদ্য-সামগ্রী	৬৯৫	৫১০৮৭	২০৩	৩৮২৭২	১৭৮	৭৪১৪	৯৬০	৪৯৭৯৩	৫৮৭৭	৩৪৪৮২৭
রসায়ন ও ঔষধ	১০	১৮৩২	১৩০	২০৫৪	১০	৫১৮	১৭৫	২৩১৬৪	১৯২৯	১১২৮৫১
কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্র	১০	২৬৭	২৫	২১৬৬	১২	১৫০৮	১৮৬	১২৪২১	১৪৫০	৬৮৪৬১
রবার							২১	১০২১২	৮৮	১৩২৫৪
মোট	৭৩৬	৫৬৮২৩	৬৫০	১২৩৮৫০	২২০	১০৬৫৫	১৮৬৮	৪৬৩১২৬	১৫০৪১	১৯১৩২৭৯

গল্প

মুক্তিস্নান

অগেন দত্ত

অপর্ণা!

রাত প্রায় তিনটে। সমস্ত সৌরজগৎ সুষুপ্তির ঘোরে মগ্ন। জেগে আছি শুধু আমি, ঘুরে-ফিরে তোর কথাটা মনে আসছে, তাই কাগজ কলম নিয়ে বস্‌লাম। ক'দিন ধরেই ভাবছি লিখব একখানা চিঠি, কিন্তু কাকে লিখব ঠিক করতে পারছিলাম না। তুই হয়তো বলবি ললিতা, মালতী, পারুল ওরা কি করল। ওদের সঙ্গেও তোর ভাব ছিল। সেকথা আমিও জানি, তবু আজ মনে হচ্ছে ওদের সঙ্গে আলাপের যোগ থাকলেও হৃদ্যতা ছিল না তিল মাত্র। তাছাড়া চিঠি ওরা পড়াবে অন্যকে দিয়ে। যাকে জানাতে চাইবো তার আগেই জানবে অন্যলোক, হাসবে—বান্ধবী মহলে রং ফলিয়ে বলে বেড়াবে, হাসাহাসি কানা-কানি—এসবে সরগরম করে তুলবে। আমার দুঃসময়কে করবে বিদ্রূপ! তুই নিশ্চয় চমকে উঠছিস্ দুঃসময় শব্দটি পড়ে, না ভাই, চমকাবার মতো এমন কিছু নেই। মা আছেন আগের মতো, চোখে ঠুলি বাঁধা গরুর মতো অসঙ্গল সংসারের ঘানি টেনে বেড়াচ্ছেন আজও। বাবার জীবনেও নতুন কিছু পরিবর্তন আসেনি, সেই প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টারী, অনশনে, অর্দ্ধাশনে চলে যাচ্ছে দিন, কোথাও ব্যতিক্রম নেই এতটুকু। ব্যতিক্রম শুধু আমার মনে। কোনদিন বয়সের খোঁজ রাখিনি, প্রয়োজনও বোধ করিনি। আজ এই শুদ্ধ নিশীথের অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে হিসেব করছিলাম, মাকে জিজ্ঞেস করলে কিম্বা ঠিকুজি বের করলে ঠিক মিলে যাবে, বড়জোর দু'চার দিন এদিক-ওদিক হতে পারে। আমার হিসেবে পুরোপুরি আঠাশ, কাল থেকে শুরু হবে উনত্রিশ। তোরও বোধ হয় ঐ রকম হবে। তোর মার কাছেই শুনেছিলাম তুই আমার তিন দিনের ছোট, শুনেছিলাম তোর বিয়ের আগের দিন, তা প্রায় এগার বছর আগে, তোর বিয়ে হয়েছে ঐ রকমই তো হবে, নয় কি? তোর প্রথম ছেলের বয়েস যদি ন'বছর হয় তাহলে আমার হিসেবই ঠিক। যাই হোক্ আগের কথায় আসা যাক্। বলছিলাম হঠাৎই এল আমার মনে একটা পরিবর্ত্তন। শুধু মনে নয় জীবনেও, বুদ্ধি এবং যৌবন উন্মেষের পর থেকে যে পথ ধরে চলে আসছিলাম সে পথ ধরে চলতে পারলে হয়তো এ পরিবর্ত্তন আসতো না, কিন্তু তাতো হয় না, হোলও না। তোর মনে আছে কি ললিতাদির কথা? চাটুজ্জোদের বাড়ীর ললিতাদি। আমাদের চেয়ে বছর তিন চারেকের বড় হবে বড়জোর। ওর যখন বিয়ে হল তখন আমাদের সেকেণ্ড ক্লাশ।

ফিরের মাস খানেক পরেই বেড়াতে এসেছিল বাপের বাড়ী, আমরা গেলাম দেখা করতে। স্মৃতির পাতা ওল্টালেই তোর নিশ্চয় মনে পড়বে সে দিনটি, আমার মনে তো উজ্জ্বল হয়ে আছে সে সব দিন। ওকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলাম, এটা ওটা জানার আগ্রহে—অনাবশ্যক খবর সংগ্রহের উৎসাহে, ওর লোকটি কেমন, কতটুকু ভালবাসে ওকে—আদর সোহাগের পরিমাণ কতখানি, একদিনে কখন কি বলেছে, কখন কি করেছে সব না জানতে পারা পর্য্যন্ত মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। এবার নিশ্চয় মনে পড়েছে তোর। ললিতা প্রথম প্রথম কিছু বলতে না চাইলেও শেষ পর্য্যন্ত বলেছিল। বলেছিল ঠিক বলা যায় না, বলতে বাধা করেছিলাম। হঠাৎ থেমে করে

ঐ এক ওর নামে হুখন আর চুপ করে থাকতে পারলে না, লজ্জার আবেশে ঘনালো, বাঁধ ভাঙলো সঙ্কোচের। লেখাপড়া তো জানে না, পড়াবে কাকে দিয়ে? শেষ পর্যন্ত মুখ খুলতে হল আমার কাছে। আমি ডাকলাম তোকে, তিনজনে বসলাম আমাদের বাড়ী, পশ্চিমের ঘরটায় জোর দিয়ে। খাম ছিঁড়লাম—পড়লাম, মাঝে মাঝে হাসলাম তিনজনে, মুখ লাল করে, দাঁতে ঠোঁট চেপে। তুই বলেছিলি: বেশ লেখেন তো ভদ্রলোক···

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম সে সময়, তুই আমার কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিলি: কিরে মল্লিকা হল না কেমন লাগলো চিঠির ভাষা?

মুচ হেসেছিলাম আমি, তোর চোখে চোখ রেখে। তারপর চিঠিখানা ললিতাদির হাতে দিতে দিতে বলেছিলাম: বেশ·····

আমাদের দুজনের চোখ ঘুরেছিল, ললিতাদির মুখে, তার মুখ তখন রক্তের ছোপ। স্বামীর প্রশংসায় চোখের তারাতে অস্বাভাবিক দীপ্তি। হেসে বলেছিল: লোকটাও বেশ, কোনদিন পরিচয় হলে দেখবি, যেমন লেখায়-পড়ায় তেমন কথায়-বার্তায়।

কিছুক্ষণ কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরেই আবার মুখ খুলেছিল ললিতাদি। আমার দিকে খানিকটা সরে এসে হাঁটুর উপর একখানা হাত রেখে অনেকটা অনুনয়ের সুরে বলেছিল: উত্তরটা লিখে দে না ভাই মল্লিকা।

ফিক্ করে হেসেছিলাম ললিতাদির মুখের দিকে তাকিয়ে। আস্তে আস্তে বলেছিলাম: তুমি কি বলছ ললিতাদি। এ চিঠির উত্তর আমি কি লিখব? এতো শুধু তোমাদের দু'জনের কথা।

ললিতাদি হাসি থামিয়েছিল। গম্ভীর মুখে বলেছিল: তোর নাম দিয়ে তো লেখা হবে না চিঠি, লেখা হবে আমার নামে, অর্থাৎ হাতের লেখাটা হবে তোর কথাগুলো হবে আমার।

আমি ইতস্ততঃ করছিলাম, কারণটা খুব অবহেলার নয়। এর আগে যে চিঠি লিখিনি তা নয়, লিখেছি বেশ কয়েকখানা। তবে সে চিঠি আর এ চিঠিতে তফাৎ আছে। সে চিঠি ছিল সংসারের কথায় ভরা—অভাব অনটনের কিরিস্তি। সে চিঠির কথা সকলের কাছে বলে বেড়ানো যায়, সকলকে পড়ে শোনানো যায়। এ চিঠি নিতান্ত ব্যক্তিগত। যাকে উদ্দেশ করে লেখা সে ছাড়া অন্য কেউ পড়বে ভাবলেও বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে। চোখ-মুখ রাঙা হয়ে ওঠে লজ্জায়। মাথা নীচু হয়ে আসে, আমার বিধা দেখে তুই মুখ খুলেছিলিস, ললিতাদিকে সমর্থন করে বলেছিলিস: হাঁ ভাই ঐ পারবে এ চিঠির জবাব লিখতে। ক্লাশে সব চেয়ে ভাল বাংলা ঐ-তো লেখে।

আমি বাধা দিয়ে বলেছিলাম: ক্লাশে ভাল বাংলা লেখা আর অপর একজন পুরুষ মানুষকে চিঠি লেখা দুটো এক কথা নয় অপর্ণা··· ····

আমার হেসেছিলিস তুই, দাঁতে-ঠোঁট চেপে, মুখ টিপে টিপে। তারপর আমার গালটা টিপে দিয়ে বলেছিলি: পর পুরুষকে লিখতে লিখতে নিজের পুরুষকে লেখার হাত আসবে মল্লিকা।

আমি ধাক্কা দিয়েছিলাম তোর গায়ে। কপট ক্রোধ, বিরক্তির ভাণ করে বলেছিলাম: যাঃ!

ললিতাদি বলেছিল: যাঃ কেন, অপর্ণা ঠিক কথাই বলেছে। তোরই তো লাভ, হাত পাকবে····

সেদিন আর তর্ক করিনি মনে আছে, ললিতাদি কাগজ কলম এনে দিয়েছিল। নতুন প্যাড, বিয়েতে পাওয়া, কলমটা অবশ্যি ওর দাদারই ছিল। যাই হোক্, অনেক ভেবে-চিন্তে, অনেক কাটাকুটি শেষে জবাব তৈরী করেছিলাম। আগাগোড়া পড়ে দেখেছিলিস তুই, পড়তে পড়তে তোর মুখের রং পাল্টেছিল আমার মনে আছে আজও। আবিরের ছোপ লেগেছিল, তোর মুখে, ভেতরের চাপা এক আনন্দের।

পড়া শেষ করে আমার হাতে চিঠিখানা দিতে দিতে বলেছিলি: চমৎকার হয়েছে মল্লিকা, সত্যি বলছি, চিঠি পড়তে পড়তে আমার গা-ও শির শির করে উঠেছে। আমার মনও হয়েছে চঞ্চল। খাসা হাত তোর, ভালবাসার চিঠি একখানা লিখেছিস্ বটে···

এ সার্টিফিকেট তোর বলে অবজ্ঞার হাসি হেসেছিলাম আমি, কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলাম ললিতাদির ঘরের সার্টিফিকেট। সেটা আজও অক্ষয় হয়ে আছে আমার মনের মণিকোঠায়। পরের চিঠিতে ললিতাদিকে তিনি লিখেছিলেন: তোমার চিঠিখানা কে লিখেছে জানাবে কি? এমন কলমও আছে তোমাদের গ্রামে? তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাবে।

তিন চার পৃষ্ঠার চিঠির মধ্যে আমার জন্যে এ'কটা লাইন। বাকী সব সেদিনের চিঠির উত্তর। ললিতাদির কাছে পড়তে পড়তে ভুলে গিয়েছিলাম ললিতাদির কথা। মনে হয়েছিল আমাকেই বুঝি লিখেছে চিঠিখানা। উত্তরও লিখেছিলাম খুব যত্ন নিয়ে। মনের মত করে। অনেক ভেবে, অনেক চিন্তা করে। তার উত্তরও এসেছিল খুব তাড়াতাড়ি। প্রথমেই লিখেছিলেন: "তোমার এমন বান্ধবী আছে জেনে তোমার মর্য্যাদা অনেক বেড়ে গেল আমার কাছে। হাতের লেখা, ভাষার লালিত্য, মনের কথা প্রকাশের ক্ষমতা এমনটি আর দেখিনি আমি। যদি কিছু মনে না কর তোমার এ বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিও।" এ রকম সব কথায়, এ রকম সব প্রশংসায়, এ রকম সব স্তুতিতে ভরা ছিল লাইনের পর লাইন। চিঠিময় আমার গুণগান। আমার ছলে নিশ্চয় জলে পুড়ে মরতাম ঈর্ষায়। কিন্তু ললিতাদি ছিল আলাদা জাতের। সত্যি সত্যি একদিন ওর ঘরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ডাকতে এল। আমি তো অবাক। প্রথম আপত্তি করলাম। অচেনা মুখ, অজানা স্বভাব সর্বোপরী পুরুষ মানুষ।

কিন্তু ললিতাদি শুনবে কেন আমার আপত্তি। জোর করেই নিয়ে গেল আমাকে। শাড়ীর আঁচল ধরে টানতে টানতে।

ওর মা দেখে বললেন: লজ্জার কি আছে মল্লিকা, তোমাই তো যাচ্ছ কাছে···

ওর পিসিমা বললেন: ও কি। কোথায় ছুটে যাবি—ঠাট্টা ইয়ার্কি করবি। তা নয় লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিস।

ওদের ঘরে ঢুকলাম। শাড়ীর আঁচল তখনও ললিতাদির হাতে। চৌকাট পার হতেই চোখ দুটো আপনা থেকে সামনে চলে গেল। খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসেছেন ভদ্রলোক। আমাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। খাট থেকে নীচে নাবলেন। অভ্যর্থনায় মুখর হয়ে উঠলেন: আসুন—আসুন—আপনার—

কি বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। আপাদমস্তক দেখে নিয়ে। বুঝতে পেরেছিলাম তিনি আমার এ রূপ আশা করেন নি। হতাশ হয়েছেন—নিরাশ হয়েছেন আকস্মিক ভাবে। কল্পনার অঞ্জন শলাকা দিয়ে ললিতাদির বান্ধবীকে যেমনটি এঁকে-ছিলেন তার মনের পটে তার সঙ্গে সামনের মেয়েটির বৈসাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে হয়তো বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। ললিতাদি পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন: এই হল আমার বন্ধু মল্লিকা, যার লেখা পড়ে তুমি পাগল হয়েছ···

ভদ্রলোক সামলে নিলেন নিজেকে। মুখে আবার হাসি দেখা গেল। স্বাভাবিক হলেন তিনি। কাটিয়ে উঠলেন বিস্ময়ের ঘোর। হাত জোড় করে স্মিত হাসির সঙ্গে বললেন: নমস্কার···

প্রতি নমস্কার আমি সারতে গেলাম পায়ের ধুলো নিয়ে। বাধা দিলেন। আমার হাত ধরে ফেলে বললেন: একি করছেন, এ সবের যুগ এখনও আছে নাকি? একটু পরে ছেড়ে দিলেন আমার হাত। নীচের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন: আপনার বান্ধবীর কথাই ঠিক। আপনার লেখা পড়ে আমি পাগলই হয়েছি। ভগবান গুণের ভাগটা আপনাকে একটু বেশীই দিয়েছেন।

সেদিন তাঁর বাকী কথা অনুমান করতে না পারলেও আজ পারি। সেদিন ঐ কথার মধ্যে কি ইঙ্গিত তিনি করেছিলেন তা আজ আমার কাছে পরিষ্কার। পরে ললিতাদির কাছে শুনেছিলাম ওর স্বামী নাকি বলেছেন, আমার রূপের অভাব থাকলেও গুণের অভাব নেই। আর সে গুণের অধিকারী যদি কোন শিক্ষিত ছেলে হয় তাহলে তিনি খুশি হবেন।

সেই ললিতাদি—বুঝলি অপর্ণা, সেই ললিতাদি আমার নামে বদ রটিয়েছিল। ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল আমার গুণের কাহিনী। মেয়ে মহলে জল্পনা কল্পনা হত আমাকে নিয়ে। আমার চিঠি লেখা নিয়ে। তোদের দান যে কম ছিল আমার এ নামের পেছনে সে কথা আমি বলছি না। বেশি ছিল ললিতাদির। সেজন্যে তার কথাটার জোর দিয়ে বলছি। রাগ করিস নি যেন।

সেই যে ললিতাদির ঘরের কাছে হাতে খড়ি পড়লো সে কলম আর থামলো না। একটানা চললো দশ এগার বছর। ললিতাদির পরে কল্যাণীর বিয়ে হল—তার পর হল অর্চনার। দু'জনেরই চিঠি লিখতাম আমি। বাপের বাড়ী এলেই ওদের চিঠি লেখা ভার আমার উপরে। সে চিঠির পাতাও ভরা ওদের কথায়, ওদের আবেগে, উচ্ছ্বাসে। ওদের মনের রঙে-রেখায়। কলমটা ছিল শুধু আমার।

অপর দিক থেকে উত্তর যখন আসতো তখনকার কথা মনে হলে আজ আমার হাসি পায়। অথচ সেদিন কি দামই না দিয়েছি ওদের মন্তব্যের। কেউ লিখেছে হাতের লেখাটা চমৎকার। মুক্তোর মতো, ছাপা হরফের মত। কেউ বলেছে বলার ঢংটা ভাল। কারও কাছে মিষ্টি হাত মধুর ভাষা। শুধু প্রশংসা, শুধু স্তুতি……সেদিন ভাল লাগতো এসব। আজ মনে হয় আত্মপ্রবঞ্চনা। তোর চিঠিও কম লিখেছি। তুই তো মাঝে মাঝে বলতিস, আমার ভয় হয় মল্লিকা, কোনদিন লোকটা ছুটে আসে তোর কাছে। কিম্বা গোপনে চিঠি লিখে বসে……

আমি জবাব দিয়েছি। হেসে হেসে—বুকের উপরে, মিথ্যে ভয়ে কাঁপছিস অপর্ণা। আমার যা নেই তা আছে তোর মধ্যে। এমন চন্দ্রমল্লিকা ফেলে শুধু মল্লিকার কাছে আসছেনা তোর লোকটি। অত বোকা সে নয়—

তুই হেসেছিস। আমার কথা শুনে। আগের মত মিটিমিটি। আমার চোখে চোখ রেখে বলেছিস: বলা যায় না ভাই। পুরুষ মানুষ কখন কি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে বলা দায়। কথায় তো আছে ওরা ভ্রমরের জাত……

আমিও হেসেছি। সমতা রেখে। কথা বাড়াইনি। কথা বাড়াবার মত মন আমার ছিল না তখন। বুকের ভেতরে ছুরপিণ্ড দুরু-দুরু, দৃষ্টিতে ফাল্গুনের রং। তোর স্বামী না হউক, একজন নিশ্চয় আসবে। তোর স্বামীর মত শিক্ষিত না হতে পারে। ভাল চাকরি না করতে পারে। কিন্তু সেও পুরুষ। যার কাছে আত্মসমর্পণে সুখ আছে, স্বস্তি আছে। মনে আছে তোর বিয়ের দিন কয় পরে এই চিঠি লেখা নিয়ে আমাদের ঘরে কথা উঠেছিল। উঠবেনা কেন? আমার বয়েসী যারা ছিল তারা সবাই চলে গেছে স্বামীর ঘর করতে। এমন কি ছোটরাও যেতে শুরু করেছে। অথচ মার মাথার বোঝা নাবছে না। একদিন রেগে মা বলেছিলেন: পরের চিঠি নিয়ে তোর অত মাথা ব্যথা কেন? ঘরের কাজকর্মের বেলায় ঐ উৎসাহ থাকে কোথায়?

ঠাকুরমা ছিলেন তখন। তিনি মাকে শান্ত করেছিলেন, আমার হয়ে বলেছিলেন: লিখতে দাও বৌমা, সোমত্ত মেয়ে, কি নিয়ে থাকবে! পাড়া পড়শীর চিঠি লিখে যদি আনন্দ পায় বাধা দিও না।

সেদিন চুপ করে গিয়েছিলেন মা। তাই বলে বরাবর যে চুপ করেছিলেন তা নয়। মাঝে মাঝে রাগারাগি করেছেন, ঘরের কাজে অবহেলা দেখলে, দেরী করে ঘরে ফিরলে, তবে সে রাগের সীমা ছিল। সীমা ছিলনা শুধু আমার চিঠির, সারাদিন চিঠি লিখেছি। আর রাতে ঘুম হয়নি আমার। ভেবেছি আমার জীবনে যে লোকটি আসবে সে কেমন? যদি ভাল লেখা পড়া জানা লোক হয় তাহলে তো কথাই নেই। নিশ্চয় ভালবাসতে পারবে আমাকে। রূপের অভাব থাকলেও গুণের মর্য্যাদা সে নিশ্চয়ই দেবে। যে গুণের প্রশংসা করেছে তোর বর, ললিতাদির স্বামী, পাড়ার মেয়েমহল।

আশায় আশায় থাকতাম। কবে আসবে সে দিন? মাঝে মাঝে আশার দীর্ঘ-শিখা একটু জোর আলো ছড়িয়েছে। মাঝে মাঝে নিবু নিবু—টিম-টিম করে জ্বলেছে। মনে আছে তোর বিয়ের মাস তিন পরেই এক ভদ্রলোক দেখতে এলেন। এক গ্রোসরুল চুপুর। শীতল পাটি পেতে দেওয়া হল পাশের ঘরে। বন্ধু নিয়ে বসলেন ভদ্রলোক। অন্য ঘরে আমার শরীর মাজা ঘষা শুরু হল। সাবান মেখে

মুখ-হাত ধুয়ে এলাম। রাণু বৌদি গামছা দিয়ে জল তুলে দিলেন। পাউডারের পাফ বুলোলেন, বুলোলেন নয়—ঘষলেন আলতার শিশি খালি করলেন খানিকটা। লিপষ্টিক লাগালেন ঠোঁটে—কাজল রেখা টানলেন চোখে, শাড়ী পরালেন, পরালেন ব্লাউজ। অন্য ঘরে এলাম। দুরু দুরু বুক—আশা জল জল চোখ, স্বপ্নমাখা ভবিষ্যৎ।

একটু নড়েচড়ে বসলেন ভদ্রলোক। খানিকটা সামনে এগুলেন তাঁর বন্ধু। বসলাম ওদের সামনে, মাথা নীচু করে। পায়ের পাতা অবধি শাড়ীতে ঢেকে। প্রশ্ন এল জবাব দিলাম, স্পষ্ট গলায়—নির্ভুল উচ্চারণে। আলো জ্বললো মার চোখে, স্বপ্ন ভাসলো বাবার মুখে। সন্তুষ্ট হলেন রাণু বৌদি: সন্তুষ্ট ওরাও হয়েছিল। যারা সামনে বসিয়ে প্রশ্নের প্রশ্ন করেছিল, বাড়ী গিয়ে সে কথা জানিয়েছিল একখানা চিঠি লিখে। আমাদের আচারে, ব্যবহারে চালচলনে খুবই খুশী হয়েছে। কিন্তু বিয়েটা হবেনা, কারণ মাত্র একটা। আমার রং কালো।

বাবার মুখের রং পাল্টালো। মার চোখে ছায়া ভাসলো। রাণু বৌদি নিজের বাড়ী গেলেন। আমি ঘরের কোণে বসে কাটালাম একটা বিকেল। বাড়ীময় মন খারাপের এক ঝলক হাওয়া। এর পরেও চললো আমার পরীক্ষা। বছর দুয়েকের মধ্যে বার তেরজন এল। কেউ দেখল চুল, কেউ দেখল দাঁত, কেউ দেখল হাতের লেখা—কেউ সেলাইয়ের কাজ। যে যেটা চেয়েছে সেটা পেয়েছে। শুধু পায়নি রূপ অর্থাৎ রং। এ তাদেরই মুখের স্বীকৃতি। আচ্ছা তুই বল অর্চনা আমার রং যে ফর্সা নয় সেটা কি আমার দোষ? যারা বিয়ে করতে এল তারা না হয় সেটা বুঝলো না কিন্তু মা গর্ভধারিণী মাও যেদিন অবুঝের মত সে খোঁটা দিলেন সেদিন আমার কি করা উচিত বলে দিবি কি? আমি মানি আমার রূপ নেই। তাই তো গরীবের ঘরে জন্মেও সামান্য লেখাপড়া শিখেছি। তুই হয়তো বলবি সেকেণ্ড ক্লাশ অবধি বিদ্যে। সে কি আবার একটা লেখাপড়া, তা নয়। এ কথা জানি বলেই স্কুল ছাড়বার পরও লেখাপড়া ছাড়িনি। রাতের পর রাত জেগে বাংলা সাহিত্যের প্রায় সমস্ত পঠনযোগ্য বই শেষ করেছি। শিখেছি বসে বিসে সেলাইয়ের কাজ, তোর তো কিছু অজানা নয়। নতুন কথাও নয় তোর কাছে এসব। তোরা তো প্রশংসা করেছিস আমার লেখার, আমার কাজের।

কিন্তু সেদিকে তো কেউ তাকালে না। তাকালে না বললে মিথ্যে বলা হবে। তাকিয়েছে। তবে সে তাকানো মুখ্য নয়। সেগুলো গৌণ-আনুসাঙ্গিক। শীতের দিনে সার্ট-সোয়েটারের উপর গরম কোটের মত। আসল হচ্ছে রূপ-রং-এর বাহার।

একের পর এক তেরজন পাশ কেটে গেল। এক কারণ—এক কথা। এমন কি চিঠির ভাষাটাও এক। এর পরে দু'একজন রাজি অবশ্যি হয়েছে। সেও বড় একটা টাকার বিনিময়ে। কিন্তু সে সম্মতি বাবার কোথায়?

তবু থামলো না আমার পরীক্ষা। আরও চললো। বছরে দু'একজন করে। কুড়ির কোটা যেদিন পার হল সেদিন মা বাবার কাছে মুখ খুললাম। বললাম: তোমরা যাই কর না কেন আমি আর কারও কাছে পরীক্ষায় বসছি না। আমার রং এর কথা জেনে শুনে যদি কেউ বিয়ে করতে রাজি হয় তা হলে অবশ্যি অন্য কথা। এর পরে কেউ দেখতে আসবে বললেই বাধা দিয়েছি, ঝগড়া করেছি, শেষ পর্যন্ত বিরত হলেন মা। হাত গুটোলেন বাবা। এ ভাবে কাটলো বছর কয়। আবার আর এক ধক্কা চেষ্টা চালালেন বাবা। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। জুটলো না কোন ছেলে। হতাশায় মুষড়ে পড়লেন বাবা। আশা ছেড়ে দিলেন মা। দিন গড়িয়ে চললো আগের মত। পাড়ার চিঠি লিখে—এ বাড়ী সে বাড়ী ঘুরে ফিরে। একে ওকে সেলাই শিখিয়ে। কখনও আসে কল্পনা, কখনও কল্যাণী, অর্চনা। তাদের সঙ্গে হেসে, গল্পে গুজবে।

সেদিন দেখি ললিতাদি এসে হাজির। একথা ওকথা হল, আমার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলে। হা-হুতাশ করলে। জীবনটা নাকি নষ্ট হয়ে গেল আমার। এর আগেও অনেকে করেছে। আজকের ধ্বনি যেন আলাদা, আবেদন নতুন। বুক কাঁপলো—টনটন করলো, মন আনচান

করলে। কাপড়ে চোখের পাতা। বিকেলের দিকে ওর একখানা চিঠি লিখে ঘরে ফিরেছি। সারা দুপুর ওদের বাড়ী কাটিয়ে। সন্ধ্যা হয় হয়। মা দরজার সামনে ছিলেন আমার পথ চেয়ে।

জিজ্ঞেস করলেন: কোথায় গিয়েছিলি মল্লিকা?

বললাম: ললিতাদির একখানা চিঠি লিখে দিয়ে

খোড়ানুখী ঘরের কাজকর্ম ফেলে বাইরে বাইরে····

ছুটে এসে আমার চুলের গোছা ধরলেন। টান দিলেন ঝুটো ঝিনটে প্রাণপণ শক্তিতে। পট পট আওয়াজ উঠলো চুলের গোড়ায়। কোন রকমে নিজেকে মুক্ত করে বললাম: এ রকম করছ কেন মা? জানতো লেখাপড়া জানে না ললিতাদি····তাই তাঁর চিঠিটা লিখে দিয়ে এলাম···· ক্রোধে কাঁপতে লাগলেন মা দাঁতে দাঁত চেপে। রক্তবরা চোখে বললেন: চিঠি লিখতে যাস না রূপ দেখাতে? ঐ তো রূপের ছিরি। দেখে বিশ বিশটা ছেলে পালিয়ে গেল। চিঠি লিখবিতো তোর এই কপাল!

কোন জবাব দিইনি, কিই বা ছিল জবাব দেওয়ার। একে একে সব কাজ সারলাম। বাসা করে সকলকে খাওয়ানো, থালা বাটি ধুয়ে আনা কিছুই বাদ গেল না। একটা কাজ শুধু বাকী রইলো, সেটা নিজের খাওয়া। খেতে মন সায় দিলে না। কোন্ দুপুরে খেয়েছি তবু আজ কেন জানি না পেটে ক্ষিধে নেই। এ ঘটনার পর মাকেও কাঁদতে দেখলাম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। শুয়ে পড়েছি চোখে ঘুম নেই। ঘুরে ফিরে মার কথাটা মনে পড়ছে। মাথার ভেতরে তোলপাড়····মনের পাথারের ঝড়। ওঁর কথাই ঠিক। আমার এ রূপ দেখেই ওঁদের খোঁজ খবর করে নিয়ে আসা বিশ বিশটি ছেলে পালিয়েছে। এতদিন সান্ত্বনা দিলেন মা, আজ তিনি অশান্ত। সে ঘটনার পর চার পাঁচদিন গত হয়ে গেছে। আজও মা হেসে কথা বলেন নি আমার সঙ্গে। বাবা তো আগের মতই খিট্-খিটে—আগের মতই উদ্‌ভ্রান্ত। চাকরীর পেছনে, পয়সা উপায়ের সন্ধানে। এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত বলে দিবি ভাই। তুই আমাকে জানিস—বুঝবি সব। তাই তোকে সব লিখলাম। নিঃসঙ্কোচে, অকপটে একটা উপায় বাতলে দিবি—এ আশায় রইলাম।

মল্লিকা

গাজন গান

ভবদেব রায়

রাঢ়দেশের ধর্মঠাকুরের পূজা পূর্বে বৌদ্ধদের অনুষ্ঠান ছিল, যুগের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া তাহা এখন 'বুড়ো শিবের গাজনে' পরিণত হইয়াছে। পূর্বে ধর্মঠাকুরের পূজারী ছিলেন ডোম বা বাগ্দীরা, ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে এখন তথাকথিত উচ্চ বর্ণের হিন্দুরাই গাজনের বুড়ো শিবের পূজা করেন।

বৌদ্ধধর্মের প্রভাব শিবের বা ধর্ম ঠাকুরের পূজার মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে রহিয়া গিয়াছে। গাজনের ভক্তদের ঐ সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচার ব্যবহার অনুসরণ করিতে হয়, নৈষ্ঠিক নির্যাতন তাহাদের উপজীব্য অঙ্গীভূত। বৌদ্ধ ধর্মে জাত-বিচার, অস্পৃশ্যতা নাই—ধর্মপূজার মধ্যেও জাত্যাভিমান বা ভেদাভেদ নাই। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও তথাকথিত নীচজাতের ভক্তদের একত্র আহারাদির কোন বাধা নাই।

পরবর্তীকালে চর্যার যুগে গুরুবাদই প্রাধান্য লাভ করে—তাহার পর হইতে বাঙলা দেশের গানে গুরুবন্দনা চিরা-

চরিত প্রথার দাঁড়াইয়া যায়। নদীয়ার গাজন উৎসবের এই প্রকার একটি গুরুবন্দনা গান উদ্ধৃত করা হইল :—

প্রণাম গুরুদেব, অখিল ভুবনে সেব্য
গুরু চতুর্ভুজ দিংহে অপরূপ।
যাহার চরণ ধরি, এ ভব সংসার তরি
গুরু হন ব্রহ্মার স্বরূপ॥
(আহা) অন্ধের লোচন গুরু ভক্ত যাহা কল্পতরু
ভক্তজনার প্রতি গুরুর দয়া।
শিবের সেবক নন্দী, শিবের চরণ বন্দি
আর বন্দি মা মহামায়া॥
গুরু গোসাঁই কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া,
ও রাঙ্গা চরণ বিনে গতি নাই।
অন্তিমকালে যমদূতে লয়ে যায়,
সেবক বলিয়া প্রভু রেখ রাঙ্গা পায়॥

গাজন গানের বৈচিত্র্য সঞ্চারের জন্ত নানা আখ্যায়িকার সন্নিবেশ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, লাউসেনের ধর্ম পূজা, শিবের নৌকা-বিহার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের গল্প রামায়ণে আছে—গাজন গানে তাহার ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ পাওয়া যায়—

ব্রহ্মার কৌমণ্ডলে আছেন গঙ্গা নারায়ণী রূপ হয়ে।
ধ্যান করিলেন মুনিগণ শিব দিলেন তা কয়ে॥
ধ্যান করিয়া দেখিলেন যত মুনিগণে।
সূর্যবংশে জন্মিবে ভগীরথ গঙ্গা আনিবে সেইজনে॥
ব্রহ্মার আদেশে করিয়া গমন আইলেন শিবের পাশ।
শিবের নিকটে করিলেন স্তব বৎসর হাজার দশ॥
তুমি হরিহর সকলের সার, তোমা বিনা আর কে।
তুমি না সহিলে সকলি মজিবে বাসুকি হইবে সেষ॥
আসন করিয়া শিব যোড় করি দুই হাত।
শিবের মস্তকে চালিলেন গঙ্গা মূর্চ্ছিত হলেন ভোলানাথ॥

গাজনের ব্রত গ্রহণের সময়ে ভক্তরা তামার অঙ্গুরীযুক্ত একটি শৈতা গলায় পরে, তাহার নাম উত্তরী। এই সময়ে জলশুদ্ধি, কারশুদ্ধি, উত্তরীশুদ্ধি, অঙ্গুরীশুদ্ধি প্রভৃতি কয়েকটি আনুষ্ঠানিক গান গাওয়া হয় ; যেমন—

মন করি ধুতি মোরা পবন করি কাছা।
সেই কাছা পরে পূজি সন্ন্যাস দেবতা॥
সেই কাছা পরে করি শিবের স্মরণ।
যত কিছু পাপ মোদের হবে ততক্ষণ॥
কহেন তো সদ্‌গুরু মহেশের বরে।
উত্তরী শুদ্ধ করেন শ্রীভোলা মহেশ্বরে॥

লাউসেন ছিলেন ধর্মমঙ্গলের বীর, ধর্ম ঠাকুরের বরপুত্র। গাজনের পাট নির্মাণের গানে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে—

ভারত ভুবনে এলেন দেবপঞ্চানন।
লাউসেনের বাড়ী ঠাকুর দিলেন দরশন॥
দরশন দিলেন ঠাকুর লাউসেনের বাড়ী।
বসিতে দিলেন রাজা কুশাসন খানি॥
পাদ্য অর্ঘ দিয়ে রাজা কহে স্তব বাণী।
কি কারণে আগমন আজ্ঞা হোক্ শুনি॥
শিব বলেন স্নান করেন উপোস খেয়াতি।
সিংহাসন আনি দেহ পূজার অনুমতি॥

লাউসেন প্রাচীন বাঙলার বীরের আদর্শ। ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্ত তাঁহার আত্মত্যাগ ও বীরত্ব দেশের সাহিত্যে অক্ষয় গৌরব অর্জন করিয়াছিল।

রংপুর জেলার যোগী সম্প্রদায়ের কৃষকদের মধ্যে শিবের গাজন গান একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

নাথ যোগীদের সাধন ভজনের রীতি-নীতির সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের শৈব ভক্তদের সাধন-ভজনের বেশ মিল আছে। অনুমান করা হয়, তাহারা ঐ সম্প্রদায়েরই উত্তর পুরুষ। এই অঞ্চলের গাজন গান থেকে দুর্গার শাঁখা পরার সাধের একটি গান উদ্ধৃত করা হইল—

আমার জাতের কথা শিব তুই কলুভাঙ্গিয়া।
তোমার জাতের কথা কইলে লাগিবে ঝগড়া॥
ভাসুর আইসে শ্বশুর আইসে রণ পরতন তাকে।
চাতে শাঙ্খা নাই স্থান গোসাই নঙ্গা পাছু তাতে॥
শাঙ্খা কিনিয়া আও হে মদন মুরলী।
দশ হাতে দশখুট শাঙ্খা কানে মদন করি॥

শাস্ত না পাইলে তবে যাব বাপের বাড়ি।
বাপের বাড়ি যাব দুর্গা, ভাইয়ের বাড়ি যাব।
কাউনি কাটিয়া তবে দুই ছেইলাক পালিব॥

উত্তর বঙ্গের গাজন গান ও পূর্ববঙ্গের নীলের গান সমশ্রেণীর। এই প্রকার শাঁখা পরানোর গান, শিব-দুর্গার বিবাহ, নারদের ঘটকালি প্রভৃতি নীলের গানেরও বিষয়বস্তু।

ভক্ত পূজার সময় ভক্তরা নানা প্রকার দৈহিক নির্যাতন স্বেচ্ছায় পরিগ্রহ করে। কুমীরের পূজা, জলন্ত অঙ্গারের উপর নৃত্য, কাঁটা বা ছুরির উপর ঝাঁপ দেওয়া, বাণফোঁড়া, শ্মশানে বারাণো ও হাজরা বা ভূতের পূজা প্রভৃতি এই সূত্রে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রত্যেক পল্লীগ্রামে নিজস্ব গ্রাম্য দেবতা আছেন। প্রাচীন আমল হইতে এইভাবে তাঁহারা গ্রামপ্রান্তের বৃক্ষে কিংবা অন্য কোন নির্দিষ্ট স্থলে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কোথাও তাঁহার নাম বনদুর্গা, কোথাও বা বুড়ো শিব।

বটগাছের পূজাও প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। কবি গোবর্দ্ধন আচার্যের একটি শ্লোকে আছে—

অয়ি কুগ্রাম বটদ্রুম বৈশ্রবণো বসতু বা লক্ষ্মীঃ।
পামর কুঠারপাতাৎ কাসংসির সৈব তে রক্ষাঃ॥

এ ছাড়া নানা প্রকার ব্রতকথা বা কেতন পূজারও প্রচলন ছিল এবং এখন অনেক জায়গায় আছে তবে তাহার দ্রুত পরিবর্তন ও রূপান্তর হচ্ছে।

ছোটদের সাহিত্য জগৎ

অশোক সেন

ছোটদের সব ব্যাপারের মত সাহিত্য-প্রীতির পথ বড়দেরই কাটতে হবে। ছোটদের জন্য বাংলা ভাষায় কি উপকরণ আমরা দিতে পেরেছি গত একশো বছরে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গেলে দেখা যাবে বড়দের সাহিত্য জগতের ছাঁচে এবং ছকে ছোটদের সাহিত্য জগৎ গড়া হয়েছে। তাদের জন্য সাহিত্য-সেবক সমাজ কোথাও বিশেষ আয়োজন করেননি, প্রয়োজনের অনুপাতে। সমগ্র সমাজও করেনি।

বই, দৈনিক পত্রিকার ও মাসিক পত্রিকায় ছোটদের বিভাগ এবং ছোটদের জন্য মাসিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা এই তিনটি মাধ্যমে ছোটদের জন্য সাহিত্য পরিবেশিত হয়েছে। বড়দের জন্য ধর্ম, পুরাণ, ইতিহাস, ছোটদের জন্য রূপকথা, পুরাণ, ধর্মকাহিনী, ঐতিহাসিক গল্প এবং উপকথার ব্যবস্থা। বড়দের জন্য বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও কারিগরী বই, ছোটদের জন্য 'জানবার কথা', 'কাজ খেয়াল খেলা', 'কাঠের কাজ' ইত্যাদির মধ্যে প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছে। গল্প, উপন্যাস, নাটক কোথাও ছোটদের জন্য লেখা, কোথাও অনুবাদ। কোথাও সংক্ষেপিত কিশোর সংস্করণে আত্মপ্রকাশ করেছে। ছোটদের জন্য বিশেষ করে কবিতা ছড়ার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায় প্রভৃতির পরীক্ষা প্রয়োগের ধারা আজ কিছুটা পুষ্ট লাভ করেছে। অনুবাদ সাহিত্যেও এ বিষয়েও সার্থকতা আসছে। তবু সমগ্রভাবে বলা চলে সাহিত্যের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে ছোটদের জন্য যে রচিত বই সাহিত্যিক মূল্যবোধে এবং লেখকের গভীর দায়িত্ববোধে বড়দের লেখা বইয়ের মানকে অতিক্রম করেছে।

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে ছোটদের সাহিত্যের বিশেষত্বের একটি বড় ক্ষেত্র রহস্যময় অভিযানের কাহিনীর বেলায় 'সবুজ বনে দুরন্ত ঝড়', 'ভবঘুরের গল্পের ঝুলি' 'অন্ধরকল্পি বন' এ রকম কয়েকটি মৌলিক রচনা ছাড়া

প্রায় এই জাতীয় কিশোর সাহিত্য দেশের ভাবধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া বিদেশী কিশোর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর বা বড়দের উপন্যাসের স্বীকৃতিহীন অনুবাদ। ওহেনরির 'আইল্যাণ্ড অফ ডাঃ মোরোর' এমন স্বীকৃতিহীন অনুবাদ বাংলা ভাষায় অনেকগুলি আছে। কিশোর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের গবেষণার তার পরিচয় "গ্রন্থ পরিচিতি সংকলন সমিতি" সংকলন করেছেন।

অনুবাদ বা স্বীকৃতিহীন অনুবাদের মৌসুমী বায়ুতে যে বর্ষণ বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এসেছে তার প্রচণ্ড অনুর্বরার দিক হল সংখ্যায় যেন বই প্রকাশ করার লক্ষ্যকে মেনে নেওয়া। অথচ "লালন ফকিরের ভিটে" নামে অপূর্ব গ্রন্থ বার হবার পর কিশোরপ্রিয় লোককথা ও উপকথা সৃষ্টি হল না। অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী'র সূত্র ধরে ইতিহাসের কাহিনী ছোটদের জন্য পরিবেশন করতে কেই বা এগিয়ে এলেন ? হেমেন্দ্র রায়ের 'পঞ্চনদের তীরে' যা মান রেখেছে। 'কিং-কং' এর মত সার্থক অনুবাদগ্রন্থ কোন লেখককে উৎসাহিত করেনি প্রাণ, ইতিহাস ও প্রকৃতির ইতিহাসের উপকরণ ছোটদের জন্য সংকলিত করে সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি করতে। 'সাগরিকা'র পরে গভীর সমুদ্রের বিচিত্র রহস্যকে আশ্রয় করে কোন মৌলিক কাহিনী রচিত হল না।

মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে কি নতুনতর সৃষ্টি আমরা দিতে পেরেছি ? বোধ হয় না। 'রক্ত চোষার দিগ্বিজয়', 'পয়লার আত্মকথা', 'লাল-কালো', 'যূথপতি'র পরে এই ক্ষেত্রে আসেনি নতুন ছোটদের বই। বিষয়বস্তু এবং প্রকাশ ভঙ্গীর অভিনবত্ব যেন কোন প্রভাবই ফেলেনি ছোটদের সাহিত্য জগতে। বিস্ময়ের বিষয়, 'পোষুর চিঠি', 'রাণুর প্রথম ভাগ' প্রভৃতির সূচনা ছোটদের জন্য সা হত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সার্থক উত্তরাধিকার এনে দিল না। 'বোর্ডিং ইস্কুল', 'ফার্স্ট বয়', 'লাস্ট বয়' পাঠকদের আনন্দ দিল ; কিন্তু নতুন লেখক তৈরী করল না। কিশোর সাহিত্য জগতে নতুন ক্ষেত্র যে প্রবর্তিত হয়নি তা নয় ; সৃষ্ট ক্ষেত্রেও অনুশীলন হয়নি। 'পথের পাচালী'র মত বইয়েরও কানাকড়ি স্বীকৃতি কিশোর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য কোন লেখক দেননি। বিভূতিভূষণকে নিজেই "আম-আঁটির ভেপু" রচনা করতে হয়েছে। তারাশংকরকেই করতে হয়েছে 'সন্ধীপন পাঠশালার' কিশোর সংস্করণ। তবে মনোরঞ্জন ঘোষের 'পরিবর্তন' এবং স্বপন দাসের 'এক আকাশ তারা' আমরা পেয়েছি ; পেয়েছি আশা গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পাখীর পালক'। কিন্তু এ পাওয়া কতটুকু ?

এই দুর্গতির জন্য নিঃসন্দেহে দায়ী আমরা প্রাপ্তবয়স্ক পাঠক সমাজ। অভিভাবক ও শিক্ষক তো আমরাই। বড়দের একটি বই নিয়ে যে সমালোচনা, আলোচনার যে আলোড়ন আমরা পত্র-পত্রিকার অধিবেশনে বৈঠকে করে থাকি ছোটদের সমগ্র গ্রন্থ জগৎ আমাদের মধ্যে তার শতাংশও আলোড়ন সৃষ্টি করেনি।

দ্বিতীয় দায়িত্ব গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয়ের। ইংলণ্ডের মত ন্যাশনাল বুক লীগ, আমেরিকার মত স্কুল লাইব্রেরী এসোসিয়েশান, এবং রাশিয়ার মত অভিভাবক-শিক্ষক সংঘ স্থাপন তো আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে করিনি। ঘরোয়াভাবেও এ প্রশ্ন তুলিনি আমরা। তাই রাষ্ট্রনৈতিক পুস্তকের প্রদর্শনী, শিল্প দ্রব্যের এবং পুতুল প্রদর্শনী করতে যে তৎপরতা আমাদের আছে তেমন তৎপরতা দূরে থাক "ছোটদের বইয়ের মেলা"র উদ্যোগও ১৩৬২ সালের আগে হয়নি।

দায়িত্বশীলদের ঔদাসীন্যে ছোটদের মনে কি প্রতিক্রিয়া এনেছে সে বিচার করার দায়িত্ব আমাদের সবার। তবে এই ঔদাসীন্যকে লক্ষ্য করে প্রথম মহাযুদ্ধের আগে এলো ছোটদের মাসিক পত্রিকা সন্দেশ (১৩২০) শুকতারা মৌচাক (১৩২৬)। তারপর পালা করে অঞ্জলি (১৩২৭), শিশুসাথী (১৩২৯), খোকাখুকু (১৩৩০), আলপনা (১৩৩৩) এলো এক ১৩৩৩ সনেই যাদুঘর, বেণু, রাজভোগ, রামধনু, পাততাড়ি দেখা দিয়েছে। তারপর মাসি পয়লা ও চিত্রা (১৩৩৫), ছাত্র সখা (১৩৩৮), নব আলোক (১৩৩৭), সাথী, অঙ্কুর (১৩৩৮), মোহন বেণু (১৩৪১), ধ্রুব (১৩৪৩) প্রভৃতি ছোটদের মাসিক পত্রিকা এসেছে বাংলা দেশে। ভাবধারা একটি গড়ে উঠলো এমন ভাবে কিছু সাহিত্য-সেবীর মনে। সমগ্র বাংলা দেশের তুলনায় এই উদ্যোগ

অনেক কম এবং পত্রিকাগুলি সমগ্র কিশোর সমাজের কাছে পৌঁছতে পারেনি। সমগ্র লেখক ও সাহিত্য সাধক সমাজও এই পত্রিকাগুলিকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার জন্য এবং তার বাহিরভাবে ছোটদের গড়ে তোলার কাজে নিজেদের নিযুক্ত করার গুরু দায়িত্বের অংশীদার হতে চাননি।

বোধ করি তাই ১৩৪০ থেকে ১৩৪৯ এই ছটি বৎসরে একক ভাবে আলাদা আলাদা উদ্যোগ চালালেন কয়েকজন সাহিত্য-সাধক, যারা ছোটদের জন্য একযোগে কাজ করলে তাঁদের আদর্শবাদ বলিষ্ঠ সংহতি লাভ করতে পারতো। নীচের বিবরণীটি পাঠ করলে এ ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১৩৪০—কিশোর

সম্পাদক : কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

—রংমশাল

সম্পাদক : প্রমেন্দ্র মিত্র, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সতীকান্ত গুহ, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১৩৪৬—কৈশোরিকা

সম্পাদক : শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়

—ছেলেখেলা

সম্পাদক : সুহৃদকুমার চট্টোপাধ্যায়

—জলছবি

সম্পাদক : প্রভাতকিরণ বসু

—কৈশোরক

সম্পাদক : যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

১৩৪৭—ভাইবোন

সম্পাদক : প্রভাতকিরণ বসু

– পাঠশালা

সম্পাদক : নরেন্দ্র দেব, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

—আলো

সম্পাদক : রমাপ্রসাদ মিত্র ও কুবলয়রঞ্জন দাস

১৩৪৮—ছেলেবেলা

সম্পাদক : বাণী দেবী ও মিনতি ঘোষ

—নব ভারতী

সম্পাদক : অনিল ঘোষ ও জগদীশচন্দ্র ঘোষ

১৩৪৯—রূপকথা

সম্পাদক : রবিরঞ্জন মিত্র মজুমদার

—শিখা

সম্পাদক : বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

১৩৪৮—কিশোর বাংলা

সম্পাদক : অরূপ

—অঙ্কুর

১৩৪৯—আমার কাগজ

সম্পাদক : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

ধাঁধা, খেলাধুলা, হাতের কাজ, ছড়া, কবিতা—শিশু কিশোরদের পক্ষে এক 'আষ্টেবাণী'র মত নিবেদিত হয়েছে। ছোটরা হাতে লেখা পারিবারিক পত্রিকা, ঘরোয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, চড়ুই ভাতি, যাদুঘর, বটানিক গার্ডেন, চিড়িয়াখানা সফর, আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা প্রভৃতি পাঠ্যাতিরিক্ত কাজে প্রেরণা পেয়েছে এইসব পত্রপত্রিকার কাছ থেকে। বড়রা নিজেরা আয়োজন করে, স্বাভাবিক ভাবে যা কিশোরদের সামনে পরিবারগতভাবে, বিদ্যালয়ের মাধ্যমে এবং আঞ্চলিক কার্যক্রমের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারতেন তা চলে গেল কিশোর ধরণী ও কিশোর সংগঠকদের হাতে যাদের পক্ষে কিশোরদের দেখা শুনা সম্ভব ছিল না।

এই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুখোমুখি হল দেশ। দেশে-বিদেশে অর্থনৈতিক কাঠামো সামাজিক কাঠামোকে দারুণভাবে নাড়া দিলে। জগন্নাথ কলেজের আদর্শবাদী বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক যোগেন্দ্র গুপ্ত, মাসপয়লার সার্থক পরিচালক ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য্য, অখিল নিয়োগী, বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র ক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য শিশু কিশোরদের জন্য ক্লান্তিহীন ভাবে যে চেষ্টা করছিলেন তার যন্ত্র বিজ্ঞানের উপকরণ ছিল মাসশেষে প্রকাশিত একটি ৩০/৪০ পৃষ্ঠার

পত্রিকা—ছোট ছাপোখানা—কয়েকজন পরিচিত লেখকের স্নেহশীল সহায়তা এবং নিজেদের বাড়ীর একটি ঘর।

যুদ্ধের সময়। রোজ সংবাদপত্র নতুন নতুন ঘটনা ও পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় এনে দেয়। এমন পরিবেশে পুরোদস্তুর দপ্তর স্থাপন করে দৈনিক পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশে ছোটদের জন্য "সাহিত্য সংস্কৃতি বিভাগ" প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত ৺সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ও তাঁর সহকর্মীরা নেওয়াতে এক বিশেষ প্রভাব সমগ্র দেশের কিশোর সমাজের ওপর পড়লো। ছোটদের এই বিভাগ—"আনন্দ মেলা" এক সাংগঠনিক বন্ধনও এনে দিল ১৯৪০ সালের শেষ দিকে।

একথা মেনে নেওয়াই ভালো যে অভিনবত্বে সাংগঠনিক উন্নত ব্যবস্থাপনায় কিশোর সংগঠনের যে গতি এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে সম্ভবপর হল তাকে পরিপূরণ করার নেতৃত্ব অভিভাবক ও শিক্ষকরা দিতে পারেন নি। তার ফলে সাহিত্য পাঠের, সাহিত্য সৃষ্টির, বাড়ীতে বড়দের নিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞান বিচারের যে চেষ্টা শিক্ষাবিদ কিশোর সাহিত্যপত্র পরিচালকরা করছিলেন সেই ধারাটি সাংগঠনিক ব্যাপ্তিতে এবং সংঘ গঠনের মাধ্যমে রূপান্তর লাভ করলো। এতে কিশোর কিশোরীর ব্যক্তিত্ব এবং অবসর যাপন দৈনন্দিন কার্যসূচীর সার্থকতা লাভ করল ও বহুমুখী কর্মকাণ্ডের পরিচয় পেল। কিন্তু সবকাজেই সাহিত্য ও গ্রন্থের স্পর্শ আর কিশোর কিশোরীর জীবনে ঠাঁই পেলনা। যোগেন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদিত শিশু-ভারতী পড়ে যে কিশোর কিশোরী পরবর্তী বইয়ের অপেক্ষা করত সে আনন্দমেলার সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়ে বিশেষতঃ আনন্দহীন জ্ঞান চর্চার আবহাওয়া যুক্ত সাংস্কৃতিক কর্মসূচী সম্বলিত সংঘে সংযুক্ত হতে গিয়ে কিছুটা পরশ্রীকাতর এবং বেশ কিছুটা বহির্মুখী হয়ে পড়ল। ফলেতো সাংস্কৃতিক কর্মসূচী আনুষ্ঠানিক সাংস্কৃতিক কার্যকাণ্ডে পরিবর্তিত হল।

স্বভাবতই যুদ্ধের আগে কিশোর সাহিত্য যে সমারোহ এনেছিল, প্রবণতা ও জ্ঞানপর্যায় অনুযায়ী ক্ষেত্র নির্বাচনের সুযোগ দিয়েছিল, নতুন সাংগঠনিক সম্ভাবনা সে সুযোগকে নাকচ করে দিল অনেকাংশে। রেওয়াজ এবং রীতি এখানে অনেক বেশী প্রাধান্য বিস্তার করতে পারল। যে কোন কিশোর কিশোরী তার আগের যুগের ছেলেমেয়েদের তুলনায় শুধু বই-ই কম পড়ে না, বই সম্বন্ধে আলোচনাও কম করে। বিশেষতঃ গান, নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যুক্ত হবার সুযোগ পেয়ে পাঠস্পৃহা তার অনেক কমেছে এবং সেই স্পৃহার মধ্য দিয়ে মানুষের বিস্তীর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় কিশোর সমাজকে আগের তুলনায় অনেক কম আকর্ষণ করে। সাহিত্যের সার্থকতা সম্ভবত এখানেই সবচেয়ে বেশী হবার কথা।

কিন্তু শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক এবং সাংগঠনিক নিপুণতা কৈশোরের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা নয়। তাই পড়ার, বলার, গাওয়ার, দেখার, সাহিত্য উপকরণের রীতিরূপ অর্থাৎ ছোট গল্প, কবিতা, গান, ছড়া ও ছবির সঙ্গে সঙ্গে ভাববার উপকরণ অর্থাৎ মহৎ মূল্য বিশিষ্ট গল্প, উপন্যাস, অভিযান ও সাধনার কাহিনী এবং সাহিত্যের নানা দিকের গ্রন্থগুলি কিশোরদের জন্য পরিবেশন করতে হবে। কেমন করে? সে তো সকলেরই গভীর ধ্যানের ও অনুশীলনের বিষয়।

একমাত্রী ছন্দ

প্রভুল্লা মিত্র

তোমার চলার সখি লঘু এক অরণ্যের মতো
শাল তমালের ছায়াকৌত্ত বিজন বিলাসে
একটি একান্ত পাখি ছায়াকার মঞ্জায় নিরত
বসন্তের অসংগত উচ্চহাস দার্ঢ্যিক পলাশে।
আমি সেই লঘুবনে একমাত্র প্রজ্ঞামানী বট
চঞ্চলাঞ্চল ভাবে অহর্নিশি নিষ্কাম মননে
বাহির সমুদ্র বায়ু রুদ্র ঝড়ে ডেকেছি সমানে
অন্তর জগতে খালি দৃঢ়মান শূন্যতা প্রকট।

একথা বলিনা কভু বসন্তেরও অগম্য সে বন
আসেই আসবে জেনো সে অবাধ্য, তবু দেখ ফের
সমস্ত দক্ষিণ হাওয়া কি করে যে শীতার্ত কখন
আবেগের শতদলে সংকোচিত কীট চিন্তা ঢের।

আমার জাদুর তাই বুদ্ধ চোখে মোহিনীকে ডেকে
হঠাৎ চুচোখ ঢাকে মিথুনমত্ত নাগিনীকে দেখে॥

৫৫

নচিকেতা ভরদ্বাজ

রাতের সিঁড়ি বেয়ে সেই যে চলে গেল
আর সে ফিরল না। তবু সে জোছনার
মদির মোমে গাঁথা
অবাক কলকাতা
এখনো মনে পড়ে। ধানার বারুদঘরে...
সোনালী মুখখানি কাচের জানালায়
অগাধ ক্রেমে আঁকা। ঘাসের খাতিরে
কখন ডুবে গেল রাতের প্রলয়ের পারাবারে।
হারিয়ে গেল সব—কখন ঘুচে গেল
হাওয়ার হাহাকারে॥

যাত্রীভরা সেই বাসের আলোটিরে
রক্তে মাখা হেন দীর্ঘ-জনমের।
এখনো দেখি তারে—এখনো বাড়িচাড়ি
বোবা এ সন্ধ্যার নিষ্ঠুর তীরে তীরে॥

আমার দিনরাত-মধুর-বরসাত সিটি থাকিন
আহা কি রিমঝিম্—আমার মধুমাস
দুরন্ত মেঘে ঢাকা। অঘোর এ আকাশ
শুধুরে মরে আহা। কেবল মাথা কোটে:
স্মৃতির জানালায় তবু সে মুখখানি
সোনালী অবয়ব নিখুঁত হ'য়ে ওঠে
এখনো কেন জানি·· নিবিড় হ'য়ে ফোটে।

"এবার চলি তবে!" ঠোঁটের পল্লবে
সেই যে গান গান কথার কবিতাটি
আমার মনে পড়ে।

বাঁচার ঘিরে নীল অতল আলোছায়া মনের সরোবরে
একটি টলোমলো করুণ পদ্মের হাসিটি ফুটে ওঠে।

কিশোর ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিচালনার উপকরণ

কিশোরদের হাতে গল্পের ও সাহিত্যের এবং সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার যেমন (১) ইতিহাস (২) ভূগোল (৩) জ্ঞান-বিজ্ঞান (৪) সাধারণ জ্ঞান (৫) ব্যবহারিক শিল্প (৬) হাতের কাজ ও (৭) ধর্ম সম্পর্কিত বই দেওয়ার কথা অভিভাবক, শিক্ষক এবং কিশোর গ্রন্থাগার পরিচালকগণ আলাদা আলাদা ভাবে ভাবছেন। কিন্তু ওঁদের পক্ষে সমস্ত জানা সম্ভব নয় কোন্ বিষয়ে কি কি বই আছে বা নূতন প্রকাশিত হচ্ছে। নামগুলি হয়ত সংবাদপত্রের পুস্তক সমালোচনা বিভাগে (আনন্দবাজার, যুগান্তর, স্বাধীনতা), ছোটদের মাসিক পত্রিকার ভিতরে (শিশু সাথী, মৌচাক, রামধনু) প্রকাশকদের নিজেদের পুস্তক তালিকা কিংবা বিবরণীগুলিতে (টুকরো কথা, সাহিত্যের খবর, কালিকলম) বা বিভিন্ন দৈনিক, সাময়িক ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে দেখতে পাওয়া যেতে পারে। যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা আছে তা দেখবার সুযোগসুবিধা স্থান বাংলা দেশে কোথাও নেই। যদি বা থাকত তবুও কাহারও পক্ষে এতগুলি পত্র, পত্রিকা, বিজ্ঞপ্তি, বিবরণী প্রভৃতি একসঙ্গে দেখা সম্ভব নয় এই দুঃসাধ্য কাজ যদি কেহ হাতেও নেন তাহলে যে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন তাহা হল এই :—পুস্তকের নাম, সংস্করণ, মূল্য, পাতা, প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা, প্রকাশ তারিখ, ছবির সংখ্যা, লেখক বা সম্পাদকের নাম এবং কোন বিষয়ের বই ইত্যাদি।

এই প্রাথমিক গ্রন্থ পরিচিতিও উৎসাহী শিক্ষক, অভিভাবক, শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার পরিচালকদের নজরে আনার সুবিধা আছে কি? এইখানেই "গ্রন্থ-পরিচিতি সঙ্কলন সমিতির" প্রয়োজন।

["গ্রন্থ পরিচিতি সঙ্কলন সমিতি" বিষয়ানুযায়ী একটি সংকলন ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্য শ্রীহরিপ্রসাদ সেনগুপ্তের পরিচালনাধীনে প্রস্তুত করেছেন। একাজে শ্রীসুশীলা সেনগুপ্ত, শ্রীহরিপদ রায়, শ্রীত্রিদিব নাথ গুপ্ত, শ্রীঅশোক দত্ত, শ্রীসুশীলকুমার হালদার, শ্রীমতি মেনকা গুপ্ত, শ্রীমতি বিনু গুপ্ত এবং শ্রীমতি মিনতি সেন, সমিতির কার্যকরী সভাপতি শ্রীগিরিন চক্রবর্তীর উপদেশ অনুযায়ী সহায়তা করেছেন।]

গ্রন্থ পরিচিতি

বিজ্ঞান

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর সবচেয়ে সুবিধা হল সব দেশেই মানুষ নূতন কি পেয়েছে, তার ইতিহাসটা এইভাবে জানা যায়। ছাপাখানার শুরু হ'য়েছে জার্মানীতে। রেল-গাড়ীর শুরু হয়েছে ইংল্যাণ্ডে। "বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার" বইটাতে এসব লেখা হয়েছে। ১০-১২ বছরের ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারবে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পাঁচটিকে জয় করার জন্য মানুষ অনেক চেষ্টা করেছে। তাই শব্দ পৌঁছে দিচ্ছে রেডিও, তার, টেলিফোন। তাদের

বিজ্ঞান

শিশু ভারতী—(১২ খণ্ড) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
বিজ্ঞানের বিস্ময়—দিনেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
যান্ত্রিক আবিষ্কার—মহেন্দ্র চন্দ্র রায়
জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা কথা—সুবোধ চন্দ্র
বিজ্ঞানের মায়াপুরী— ঐ
জানবার কথা—(১০ খণ্ড) দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
বিশ্বের বিস্ময়—বিজন বিহারী ভট্টাচার্য
বিজ্ঞান জগৎ—প্রভাত কুমার গোস্বামী
জ্ঞানের আলো—অরুণ চন্দ্র দেব

বহন করে নিয়ে যায় । চলছে ফটোতে
আর ছায়াতে

ডাক-নাম ফুদে শয়তান—ভালো নাম হল কীর্তিপু. নামে অবশ্যি কিছু আসে যায় না। আসল কথা হ'ল ফুদে শয়তানের বেঁচে থাকতে গেলে ওদের সঙ্গে লড়াই করা দরকার। আর তারই জন্য দরকার ওদের কীর্তি-কলাপ জানা। সেই সব কীর্তি-কলাপের মজাদার গল্পগুলি আছে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত "ফুদে শয়তানের রাজত্ব" বইটিতে। বইটার দাম ১০ থেকে ১৪ বৎসরের ছেলে-মেয়েদের উপযোগী।

ঘড়ির কথা কোন দেশে, কবে কোন উপায়ে সময়ের হিসাব, অর্থাৎ ঘড়ি ধরে চলার নিয়ম চালু হয়েছে। "ঘড়ি রহস্য" বইটিতে তা বলা হয়েছে। ১০।১২ বছরের ছেলে-মেয়েরা পড়লে অনেক নূতন জিনিষ জানতে পারবে।

কবে কোন্ কালে মানুষ আকাশে উড়বার কথা ভেবেছিল। যারা ভেবেছিল তাদের তো সবাই পাগল খেয়ালী এই সব বলেছে। আজ "নীল আকাশের অভিযাত্রী" মানুষ তো সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। মেরু অঞ্চলে, পাহাড়ের বুকে, মরুভূমিতে কোথায় না?

জীবনী

দেড় বছর হবার আগেই রাজা রামমোহন তিব্বত রওনা হ'য়ে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন সবাই দালাইলামাকে ভগবান বলে মানে। রামমোহন বলে বসলেন, "আমি বিশ্বাস করি না।" এই বিশ্বাস করি না বলার জন্য তাঁকে দল বেঁধে কাটতে এসেছিল, সেখানের দালাইলামার ভক্তরা। "আমাদের রামমোহন" পড়ে এমন সব দুঃসাহসের কথা জানতে পারা যায়, যার একটাও করতে পারলে ১০।১২ বছরের ছেলেরা যাদের জন্য বইটা লেখা হয়েছে তাদের মাথায় তুলে দেশ নাচবে।

জীবনী পড়ার একটা মানে আছে, তা'হ'ল নিজের এবং সাধনার মানুষ কি করে বড় হয়েছে, জানা। সাহিত্যে,

প্রাথমিক পরিচিতি

উদ্ভিদের অনুসন্ধান—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
পৃথিবীর ও-পিঠ—যামিনীকান্ত সোম
অতীতের পৃথিবী—খগেন্দ্রনাথ মিত্র
চাঁদের পাহাড়—বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়
বিমানের আত্মকথা—অরুণ চন্দ্র দেব
করে দেখ—গোপাল ভট্টাচার্য্য
বিজ্ঞানের চিঠি—রঞ্জিত রায় ও ভোম্বলদার
নীল আকাশের অভিযাত্রী—দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত
ছোটদের জ্ঞানের আলো—কৃষ্ণপ্রসাদ চাটার্জী
পশু-পক্ষী—যোগীন্দ্র নাথ সরকার
ফুদে শয়তানের রাজত্ব—
সুন্দর বনের জঙ্গলে—সুরেন্দ্রলাল সরকার
ছোট হলেও ছোট নয়—দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত
কুমায়ুনের বাঘ—করবেট ৩৲
জানোয়ারদের যুদ্ধ যাত্রা—ইন্দুভূষণ রায় ১৲
চিত্রগ্রীব—মনগোপাল মুখোপাধ্যায় ১৷৹
যূথপতি— ঐ ১৷৹
অব্যক্ত—জগদীশ বসু ৩৷৹
মধুর কষ্টি বন—সুকুমার দে সরকার ২৲
সাগরিকা—(২ খণ্ড) রমেশচন্দ্র দাস (প্রতি খণ্ড) ১৷৹
কচা বাজল গিরিন চক্রবর্ত্তী

জীবনী

(১০।১২ বছরের উপযোগী)
আমাদের রামমোহন—গিরিন চক্রবর্ত্তী
সুভাষচন্দ্র—নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সমুদ্রজয়ী কলম্বাস—নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
ছেলে বেলা—রবীন্দ্রনাথ
শিবাজী মহারাজ—ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
(১০।১২ বছরের উপযোগী)
বিজ্ঞানে—
ছোটদের নিউটন—ঋষি দাস
এডিসন— ঐ
আইনষ্টাইন—ঐ

গ্রন্থ পরিচিতি

জীবনী

বিজ্ঞানে, দেশপ্রেমে এবং জীবনের নানান দিকে বড় হবার সুযোগ এই সব বড় মানুষেরা কারুর কাছ থেকে চেয়ে পান নি। তাঁদের সত্য বোধ এবং সেই বোধকে অবিচলিত ভাবে ধরে রাখার চেষ্টায় কোন বিরাম ছিল না। কোন ছুটি ছিল না। জীবনী পড়ার সত্যকার সার্থকতা মহাজীবনকে প্রণাম করতে শেখা। আমাদের শাস্ত্রে একটা কথা আছে—পথ একজন কাটে, তারপর সেই পথ বেয়ে চলে লক্ষ কোটী মানুষ।

কতকগুলি জীবনী সব কিশোর কিশোরী পড়ুক এটা আমাদের ভাল বলে মনে হয়। সেইজন্য বিষয় বিভাগ করে একটি ন্যূনতম জীবনীর পাঠক্রম সংকলন করা প্রয়োজন।

অন্যান্য

প্রাথমিক স্তর থেকে উন্নত স্তরে ওঠার জন্য কিশোর পাঠকদের ছটি বিষয় ভাবতে হবে—একই বিষয়ের জীবনী এবং বড় মানুষদের জীবন যত পথে বড় হতে পেরেছে তার সাধারণ স্তর থেকে বিশেষ স্তরে যাবার পরিচয়। এরকমের জীবনী লিখতে গেলে বড় মানুষদের সঙ্গে তাঁহার যুগের এবং দেশের সম্পর্ক বুঝতে হয় শুধুমাত্র কর্ম ক্ষেত্র সম্বন্ধে জানলে চলে না। কিশোর কিশোরীদের হাতে দেবার মত এ ধরণের বাংলা বই এখনও খুব বেশী প্রকাশিত হয় নি।

ভ্রমণ

আমাদের পাশের দেশ ব্রহ্মদেশ স্বাধীন হয়েছে সবার আগে। তাদের দেশে সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন বাঙ্গালী রামনাথ বিশ্বাস। "ব্রহ্মদেশে ছয় মাস" বইটিতে তারই কথা লেখা আছে। ব্রহ্মদেশের নানাদিক দেখার সুযোগ ঘুরে বেড়িয়ে তিনি পেয়েছেন। আমাদের ছেলেমেয়েদের ঘুরে বেড়ান শিখতে হবে। রামমোহন থেকে শুরু করে নেতাজী পর্য্যন্ত কে না ঘুরে বেড়িয়েছেন?

এমন আর একখানি বই আছে "ছয়য় দক্ষিণ আফ্রিকা" তার নাম। ১২ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত। দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন প্রান্তে লেখক রামনাথ বিশ্বাস ভ্রমণ করেছেন। তাঁর সেই বিচিত্র কাহিনী পড়তে ভালই

প্রাথমিক পরিচিতি

ছোটদের মাইকেল—ঋষি দাস
বৈজ্ঞানিক জগদীশ—অনিলচন্দ্র ঘোষ
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র— ঐ

সাহিত্যে

ছোটদের শরৎচন্দ্র—সুশীল ঘোষ
ছোটদের কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস—যতীন্দ্র ঘর
(১২।১৪ বছরের উপযোগী)

দেশপ্রেমে

দেশবন্ধু—নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ
মহারাজা নন্দকুমার—চন্দ্রকান্ত দত্তরায়বর্মণ

অন্যান্য

ছেলেবেলার গল্প—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সে যুগের বাঙ্গালী—ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলার ছেলে ঐ
মনীষীদের জীবনস্মৃতি ঐ
মহাত্মা গান্ধী—রবীন্দ্রনাথ
এব্রাহাম লিঙ্কন—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ
(১৪।১৬ বছরের উপযোগী)
মহাপুরুষ আশুতোষ—যোগেশচন্দ্র
আঙন নদীর তীরে—সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

ভ্রমণ

ব্রহ্মদেশে ছয়মাস—রামনাথ বিশ্বাস
ছয়য় দক্ষিণ আফ্রিকা—রামনাথ বিশ্বাস
এ রকমের আরও কয়েকটি বই
বিশ্বকথা সিরিজ—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
ভারতপথের যাত্রী—প্রবোধকুমার সান্যাল
আমার বাংলা—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ
বিমানে ভূপ্রদক্ষিণ—বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত
অজানা দেশের যাত্রী—দুর্গামোহন মুখার্জী
রুশিয়ার রূপান্তর—ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়
দেশে দেশে মোর ঘর আছে—অখিল নিয়োগী
সোভিয়েৎ দেশ—সুধীন্দ্রনাথ রাহা

যুগ পরিচিতি

ভ্রমণ

লাগবে।

শুধু বিদেশের নয়, বাংলাদেশে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের কথা জানতে গেলে ভ্রমণকাহিনী ও বিভিন্ন জাতির কাহিনী কিশোর কিশোরীদের উপযোগী করে লেখার চেষ্টা শুরু হয়েছে।

দুঃখের কথা এ চেষ্টায় সাহিত্যিকদের বেশী খেয়াল নেই ফুল, ফল, গাছ পালা, পাথর, মাটি, নদী, মন্দির, কৃষ্টি-সৌধ, কত কি আছে আমাদের দেশে। বিজ্ঞানের, বাণিজ্যের কত পরীক্ষা দেশের প্রান্তে প্রান্তে চলছে! এ সবের পরিচয় ছেলে-মেয়েদের পাবার উপায় আজো প্রধানতঃ পড়ার বই আর সাধারণ জ্ঞানের বই বড় বড় লেখকরা ওঁদের দেশ পরিচয়ের কথা এবারে ছোটদের জন্য লিখবেন না কি ছোটরাই তাদের শিক্ষা-মূলক ভ্রমণের কথা পাঠাবে ছাপাবার জন্য?

যারা ঘুরে বেড়ান তাঁদের অভিজ্ঞতা অঞ্চলের তীব্র ইচ্ছা দুর্গম অঞ্চলে কথার জঙ্গলে টিলায় পাহাড়ে, যে অপরিচিত জীবন আছে তার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটিয়েছে, বাংলার কিশোর কিশোরীদের তার সন্ধান কে দেবে?

ইতিহাস

"স্বাধীনতার তিনটী যুদ্ধে", নানা সাহেব, লক্ষ্মীবাঈ, বা মনু এঁরা ছোটবেলায় দুঃসাহস দেখিয়েছেন। আর গোটা দেশ তাঁদের মাথায় নিয়ে নেচেছে। দেশকে স্বাধীন করার জন্য কত ছেলে ও মেয়ের যৌবনেই প্রাণ দিতে হয়েছে। তার সব কথা আজ যারা স্বাধীন হয়ে কাউকে মানে না, তাদের জানানোর জন্য বইটিতে লেখা আছে।

পুরাণ

শুধু স্বাধীনতা এর মানুষকে মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার যুদ্ধও ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

ইতিহাসের আগের যুগের কিম্বা ইতিহাসে যথাযথ স্থান দেওয়া হয় নি এমন কাহিনীও ছোটদের সাধ্যমত দিতে হবে।

প্রাথমিক পরিচিতি

কথাসী দেশ—সুধীন্দ্রনাথ রাহা
জার্মাণী দেশ—সুধীন্দ্রনাথ রাহা
ইউরোপের চিঠি—অন্নদাশঙ্কর রায়
আদিবাসীদের বিচিত্র কথা—নলিনীকুমার ভদ্র
আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী—নলিনীকুমার ভদ্র
উপজাতির কথা—দীনেন্দ্রনাথ বসু ও প্রবোধ ভৌমিক
আমাদের আদিবাসী—প্রমোদ দাশ ও
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়
কাশ্মীরের কথা—সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
হিমালয়ের হিমতীর্থে—কার্ত্তিক দাশগুপ্ত
আবিষ্কার যাত্রী—মহেন্দ্র চন্দ্র রায়
চিত্রে ও গল্পে জলপাইগুড়ি—সুধীন্দ্র চন্দ্র মুখার্জী
বিশ্ব পরিচয়—দেব সাহিত্য কুটীর
আনন্দ অভিযানে নারী—প্রভাত কুমার গোস্বামী

ইতিহাসে

(১০/১০ বছরের উপযুক্ত)

রাজর্ষি অশোক—প্রমথনাথ সেন
রাজ কাহিনী—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২।০
পঞ্চনদের তীর—হেমেন্দ্রকুমার রায় ১।০
পার্ব্বত্য মূষিক—প্রভাতকুমার গোস্বামী ১৲
এ নহে কাহিনী—যামিনীকান্ত সোম ১৸০
সিপাহী যুদ্ধের গল্প—দুর্গামোহন মুখার্জী ২।
মরণ বিজয়ী কিশোর ভারত—হরিপদ চক্রবর্ত্তী ও
ধীরেন্দ্রলাল ভৌমিক
স্বাধীনতার তিনটী যুদ্ধে—বিজয়রত্ন মজুমদার

পুরাণ

রঘুবংশ—প্রতিনাথ চক্রবর্ত্তী
উপনিষদের গল্প—সুবোধচন্দ্র মজুমদার
হিতোপদেশের গল্প—রাজশেখর বসু
ছোটদের আতক—তারাপদ রাহা
অন্নদা মঙ্গল—অনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী
পুরাণের গল্প—বিমল কর

গ্রন্থ পরিচিতি

এ্যাডভেঞ্চার

এ্যাডভেঞ্চারের বাংলা মানে দুঃসাহসিক অভিযান। নূতন কিছু জানার, নূতন অভিজ্ঞতার মধ্যে ভয়হীন হতে দেখাই হল এই অভিযানের উদ্দেশ্য। ইংরাজী বইয়ের ভাব অনুসরণে অলৌকিক পরিস্থিতি ও অদ্ভুত চরিত্র-আলোচনার প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়া কিছু কিছু বইয়ে হয়েছে। সেইগুলিকে এ্যাডভেঞ্চার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে বটে কিন্তু তা পড়ার ফলে বাংলা দেশের কিশোর-কিশোরীরা যারা এ ধরণের বই পড়ে তাদের মধ্যে ঠিক কতটুকু সাহসিকতা জন্ম নিয়েছে তা ভেবে দেখার বিষয়।

বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং দেশ-বিদেশের অজানা পরিবেশ সম্বন্ধে জানার সুযোগ খুব কম বই থেকে পাওয়া গেছে। সেগুলির বিশেষ পরিচিতি সংকলন করা প্রয়োজন। যে পরিস্থিতি কিশোর-কিশোরীরা অন্য উপায়ে অনুভব করতে পারে না এই ধরণের বইয়ের মোটামুটি তিনটি ধারা আছে—দেশে বা বিদেশে ইচ্ছাকৃত ভাবে বিপজ্জনক পরিস্থিতিকে বরণ করার কাহিনী; নিজের অজ্ঞাতে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বিরূপ অবস্থায় পড়েও নিজের মনের জোর বিচার-বুদ্ধি বজায় রাখা এবং পরিস্থিতিকে চিরস্থায়ী বলে না মনে করা।

দশ বছর বয়সে সবাই ডানপিটে হতে চায়। দীপু তাই হতে চেয়েছিল। কিন্তু সত্যিকারের ডান-পিটে শুধুমাত্র হৈ-হুল্লোড় করে পাড়ায় ও বাড়ীর লোকের মনে চিন্তা ঢুকিয়ে ঘুরে বেড়ায় না। তার ডান-পিটে মনোভাবের পিছনে একটা নূতন কিছু জানার এবং নূতন কিছু করার ইচ্ছাটাই কাজ করে। "ডান-পিটে দীপু" পড়ে এই ভাবটি পাওয়া যাবে না তবে ১০ বৎসরের ছেলে-মেয়েদের পড়তে ভাল লাগতে পারে। সত্যিকারের নূতন কিছু করার আশা অবশ্য সবাই করে না। যারা করে তারা ছেলেদের মনে সব কিছুই দেয়। মুখে নয় কাজে।

প্রাথমিক পরিচিতি

এ্যাডভেঞ্চার

ডানপিটে দীপু—শ্রীশৈলেন ভট্ট

(৮।১০ বছরের উপযোগী)

অসম্ভবের দেশে—হেমেন্দ্র কুমার রায়	১৪০
বালুচরের বিভীষিকা— ঐ	১৭
মাথন চোরে—আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭
পুরস্কার প্রতিযোগিতা—সুধাংশু দাশগুপ্ত	
ড্রাগনের নিঃশ্বাস—হেমেন্দ্র মিত্র	
দুর্গমের বিভীষিকা—প্রভাস ঘোষ	
বামনের দেশ—সুবোধচন্দ্র মজুমদার	
দৈত্যপুরী — ঐ	

(১০।১২ বছরের উপযোগী)

কাক্কা বুলুকে—বরদা কুমার পাল	
বাঘে মানুষে—প্রভাংশু গুপ্ত	
যখের ধন—হেমেন্দ্র কুমার রায়	
রবিন হুড়—তারাপদ রাহা	
রাক্ষুসে আক্রিকা—জ্যোতিশ্চন্দ্র চক্রবর্তী	
কিংকঙ—হেমেন্দ্র কুমার রায়	
রাক্ষুসে দ্বীপ— ঐ	
রক্তবাদল ঘরে— ঐ	

(১২।১৪ বছরের উপযোগী)

ঘূর্ণি পাকে—অখিল নিয়োগী	
অজানার উজানে— ঐ	
ভেম্বেল সর্দ্দার—খগেন মিত্র	
আবিসিনিয়ার ফ্রন্টে—ধীরেন্দ্রলাল ধর	
তাতারের বন্দী—খগেন্দ্র মিত্র	
রঘু সর্দ্দার—শৈলবালা ঘোষ জায়া	
দৌলৎ খানা—যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
সুন্দর বনের শিকারী—চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী	
কামানের মুখে নানকিং—ধীরেন ধর	
লাল কুঠী—সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়	
ঝিলে জঙ্গলে—খগেন মিত্র	

IN THE PRESS

Atomic Weapons In World Politics

By Prof. SAILENDRA NATH DHAR

Author of 'Europe Between Two World Wars, 1918-1939'.

An objective study of International Relations since the close of the Second World War and the influence on them and on problems of security of nuclear weapons in all their currents and under-currents together with a comprehensive account of the history of the peaceful utilization of atomic energy, with special reference to India's role, and efforts to curb the war-like uses of the atom by plans for disarmament etc. Most up-to-date and highly documented, the book provides both the specialist and the layman all that they need know on atomic developments in the world right up to the date of publication.

Approximate publication date 30th November, 1956

ভাল ছাপার জন্য

নিউ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড

সব রকমের ব্লক আমরা

প্রস্তুত করিয়া থাকি

ব্লকম্যান

হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-১২

MACHINERY for

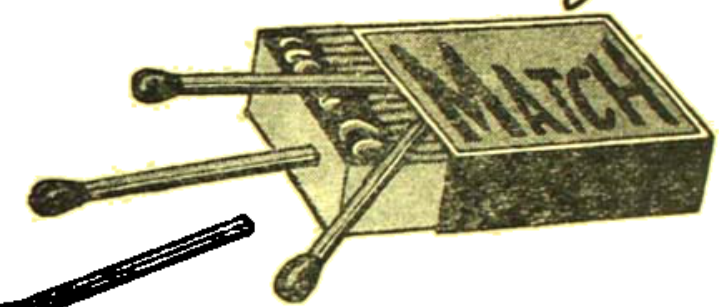

দিয়াশিলাই কুটির-শিল্পের সাহায্যার্থ ভারত সরকার প্রতি গ্রোসে নয় আনা excise rebate দিতেছেন তার সুযোগ গ্রহণ করে গ্রামে দিয়াশিলাই কারখানা গড়ে তুলুন। বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন।

STANDARD MACHINERY CO.

67B, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA-1

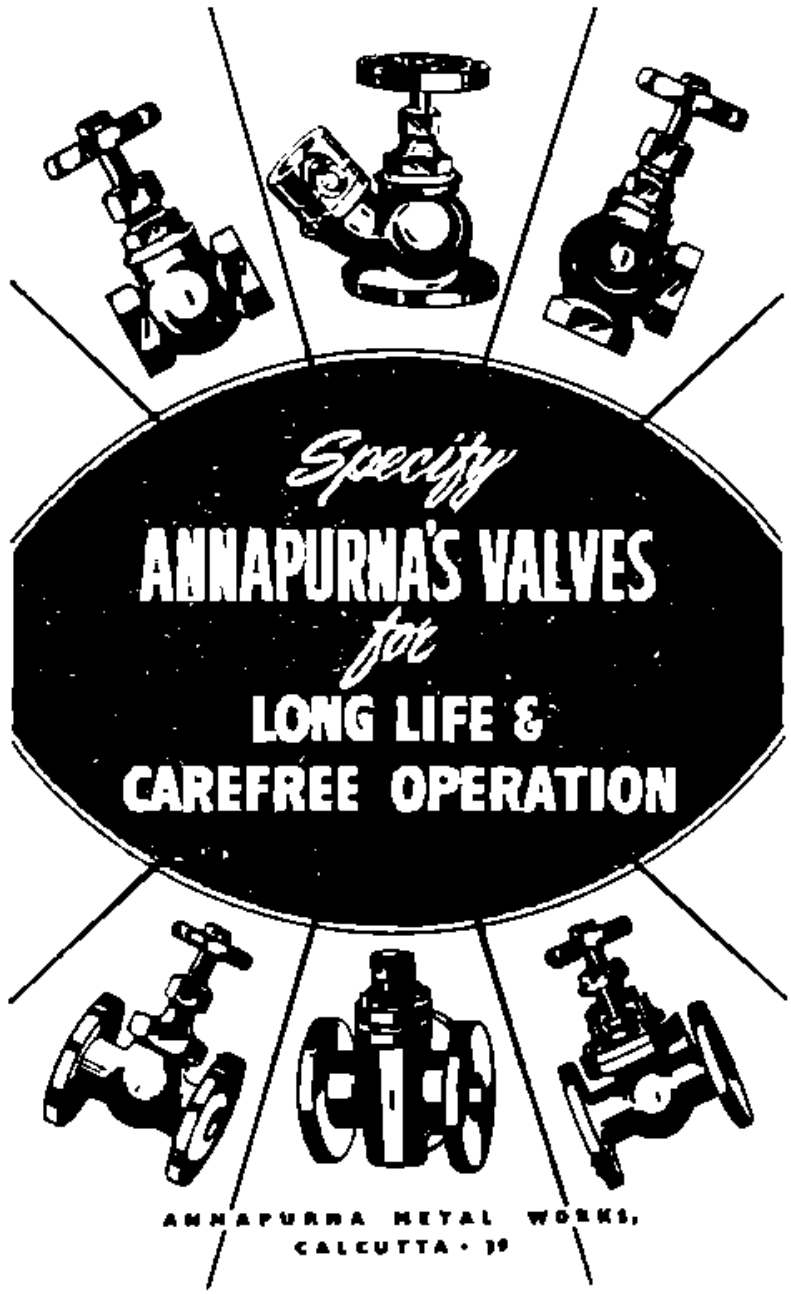

নারায়ণ পাল কর্তৃক ৪১এ, বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা-৬ নিউ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোঃ প্রাইভেট লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও ৬১ নং মনোহর দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক জ্ঞানাঞ্জন পাল।

চতুরঙ্গ

এই সংখ্যায় :

- বিপিনচন্দ্র পাল—ধর্ম ও আর্ট
- অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার জীবন সাধনা
- আমার চোখে দেখা সোভিয়েট দেশ
- ল্যাপ্লনেস : আইস্‌ল্যাণ্ডীয় সাহিত্য
- ভারতে খাদ্য শস্য
- গল্প
- কবিতা
- সংকলন
- কিশোর ও বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার—
  বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান

প্রভৃতি

ষষ্ঠ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৬৩

॥ সূচীপত্র ॥

ধর্ম ও আর্ট—বিপিনচন্দ্র পাল
অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার জীবন সাধনা—হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত
আমার চোখে দেখা সোভিয়েট দেশ—ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
ল্যাঙ্গুয়েজ ; আইস্‌ল্যাণ্ডীয় সাহিত্য—আনন্দ দাশগুপ্ত
ভারতে খাদ্য-শস্য—অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
গল্প—
প্রত্যাবর্তন—আশীষকুসুম ঘোষ
সম্রাট অশোকের অনুশাসন—অরুণচন্দ্র চক্রবর্তী
ছোট বৌ—শিশির রায়
কবিতা—
শুধু কান্না—ফেদেরিকো গারথিয়া লরকা—অনুবাদ : সরিৎ তোকদার
উপহার—অর্দ্ধেন্দু বিশ্বাস
বিশ-শতক—অনিলবরণ ভট্টাচার্য
সহর—গোপালকৃষ্ণ ভাস্কর
নক্ষত্র বিদায়ের পর—সুবোধকুমার গুপ্ত
আয়ুর্বেদের শল্য-চিকিৎসার উৎকর্ষ ও অবনতির ধারা—কবিরাজ রমেশ দাশগুপ্ত
সংকলন—
বাংলা ভাষা ও বিহার—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শিশু-সঙ্গীত—সুরপতি নন্দী
রহস্য উপন্যাস—
শেঠজীর রত্নমুকুট—বিপিনবিহারী রায় ও কানাই রায়
কিশোর ও বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার পরিচালনার উপকরণ—বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান

॥ পাদপূরণ ॥

বাংলার সাধনা—রবীন্দ্রনাথ
বিফলতার মর্যাদা—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু
জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা—রাজনারায়ণ বসু
ওড়িয়া সাহিত্য—প্রিয়রঞ্জন সেন

॥ পত্রিকা সম্বন্ধে ॥

যুগযাত্রীর বার্ষিক সডাক মূল্য ছ'টাকা। আষাঢ় থেকে বর্ষ সুরু। সব বিষয়ের মৌলিক রচনাই আমরা সাদরে গ্রহণ করব। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে লিখে সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন। অমনোনীত রচনা উপযুক্ত ডাকটিকিট ও ঠিকানা দেওয়া থাকলে যথাসময়ে ফেরৎ দেওয়া হয়। পত্রিকার সমালোচনার জন্য দু'খানা করে বই সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন। চিঠিপত্র ইত্যাদি সম্পাদকীয় কার্য্যালয়ে প্রেরিতব্য। নীচে বিজ্ঞাপনের হার দেওয়া হ'ল।

কভার	৪র্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০৲	ভিতরে	পূর্ণ পৃষ্ঠা	৩০৲
ঐ	২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা	৪০৲	ঐ	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৬৲
ঐ	১ম অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	২৫৲	ঐ	সিকি পৃষ্ঠা	১০৲

সম্পাদকীয় কার্য্যালয়
৪১-এ, বলদেওপাড়া রোড,
কলিকাতা-৬
ফোন : ৩৫-৩১০২

প্রথম বর্ষ | অগ্রহায়ণ ১৩৬৩ | ষষ্ঠ সংখ্যা

ধর্ম্ম ও আর্ট

সজীব আর্টের ভিত্তি সহজ মানব-প্রকৃতি

সজীব সাহিত্য মাত্রেই গতানুগতিক ধর্ম্ম ও নীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া, সহজ মানবপ্রকৃতির উপরে আপনাকে গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রাচীনের পাপ লোকে ভুলিয়া যায়; নতুবা যে রামায়ণ-মহাভারতের উপরে আমাদের আধুনিক সনাতন-আদর্শের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে, তাহার মধ্যেই কি এই গতানুগতিক ধর্ম্মের ঐকান্তিক আনুগত্য দেখিতে পাই? মহর্ষি বেদব্যাসের জন্মে কোন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদা প্রচারিত হইয়াছে? মহাবীর কর্ণের জন্মকাহিনীই বা কোন্ সনাতনী নীতির প্রচার করিয়াছে? অথচ কুন্তীর নাম না লইয়া প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিলে সে দিনটা ভাল যায় না। অতিপ্রাকৃতের আবরণ দিয়া এগুলিকে যতই ঢাকিয়া রাখিতে চাই না কেন, সমুদায় শ্রুতি-স্মৃতি-রচিত ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারকে অতিক্রম করিয়া, এই সকল পৌরাণিকী কাহিনীর ভিতর হইতে সার্ব্বজনীন ও সহজ মানবধর্ম্মটিই ফুটিয়া বাহির হয়।

এই সহজ বস্তুটি আমরা হারাইয়াছি। পুঞ্জীকৃত শাস্ত্রবিধির চাপে পড়িয়া আমাদের সহজ মানবপ্রকৃতিটি পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। পরাশরে বা কুন্তীতে ইহা হয় নাই। এই জন্যই তাঁহাদের দ্বারাতে অধর্ম্ম হয় নাই, আমাদের তাহাতে পাপ স্পর্শ করিতে পারে। পরাশরের যে অধিকার ছিল, আমাদের তাহা নাই। তাঁহার বৃহত্তর মনুষ্যত্বের ওজনে আমাদের ক্ষুদ্রতর জীবনের ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার হয় না। এসকল কথা বুঝা যায়। এসকল কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। তাঁহাদের জীবন সহজ, স্বাভাবিক ছিল। আমরা শত কৃত্রিমতার জালে আমাদের জীবনকে জড়াইয়াছি। এই কৃত্রিমতাও বিনা প্রয়োজনে সৃষ্ট হয় নাই। জীবের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন আত্মরক্ষার প্রেরণা বলবতী হইয়া উঠে, তখন সে

ঐ অবস্থার সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্য সাধন করিতে যাইয়া, বহুবিধ ছলাকলার আশ্রয় গ্রহণ করে। এইরূপেই জীবের ক্রমবিকাশ-ধারায়, তার জীবনের জটিলতা ও এই জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে তার কৃত্রিমতাও বাড়িয়া যায়। সমাজ-জীবনেও ইহা ঘটিয়া থাকে। সমাজ আত্মরক্ষার জন্য বহুবিধ কৃত্রিমতার সৃষ্টি করিতে বাধ্য হয়। সভ্য সমাজের বহুবিধ রীতিনীতি, আচার-বিচার, বিধি-নিষেধ এই ভাবেই, এই প্রয়োজনেই গড়িয়া উঠিয়াছে। সমাজ-জীবনে প্রচুর কৃত্রিমতা আছে। এসকল কৃত্রিমতা সমাজ-বিকাশেরই অঙ্গ। এসকল বিধি-বন্ধন যতই কৃত্রিম হউক না কেন, তাদের কোনও প্রয়োজন বা উপকারিতা নাই, এমন কথা কে বলিবে? কিন্তু জীবের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যাহা গড়িয়া উঠে, সেই বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহা আপনি—আপনার প্রয়োজন সাধন করিয়া ক্রমে ঝরিয়াও পড়ে। না পড়িলে নূতন জীবনের নূতন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। এককালে যাহা গতির সহায় ছিল, তাহাই ক্রমে গতির ও উন্নতির অন্তরায় হইয়া উঠে। এই জন্যই এসকল কৃত্রিম বিধিবন্ধনের হাতে চিরদিনের জন্য জীবনের নিয়তি বা সমাজের গতির ভার অর্পণ করা যায় না।

এইরূপ কৃত্রিমতার দ্বারা সত্য ধর্ম্মও গড়ে না, সজীব আর্টও ফুটিয়া উঠে না। এই কৃত্রিমতার হাত হইতে ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মসাধনকে রক্ষা করিবার জন্যই যুগে যুগে যুগধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। এই জন্যই যুগে যুগে সেই যুগের যুগসাহিত্য পুরাতনের বিধি-নিষেধকে অগ্রাহ্য করিয়া, সহজ মানবপ্রকৃতি ও অকৃত্রিম মানব-প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া, নূতন নূতন রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়া, সমাজ-বিকাশের গতিবেগে নূতন শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকে। আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই সামাজিক বিধি-নিষেধও ছিল, বহুবিধ আচার-বিচারও ছিল, এসকলের আশ্রয়ে একটা বৈধ-ধর্ম্মও গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হিন্দু যাহাকে সনাতন ধর্ম্মরূপে বরণ করিয়াছিল, এসকল বিধি-নিষেধের উপরে একান্তভাবে তাহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

লৌকিক ধর্ম্ম ও সনাতন ধর্ম্ম

এসকল বিধিনিষেধ নিম্ন অধিকারীর জন্য বিহিত ছিল। জীবকে তার সত্যকার স্বভাবের উপরে প্রতিষ্ঠিত করাই এসকল শাসনসংযমের মুখ্য লক্ষ্য ছিল। আপনার স্বভাবকে যতক্ষণ মানুষ সত্যভাবে পরিপূর্ণরূপে না পাইয়াছে, ততক্ষণ তার সত্য ধর্ম্ম হয় না; হিন্দু সাধনা ইহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল। লৌকিক ধর্ম্ম এই সত্য-ধর্ম্মের পূর্ব্বব্রত সাধন-রূপেই গৃহীত হইয়াছিল। এই লৌকিক ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার ধর্ম্মজীবনের গোড়ার কথা, শেষের কথা নহে। বালিকারা যেমন পুতুল দিয়া আপনার কল্পিত সংসার পাতিয়া খেলা করে, অথচ এই খেলার ভিতর দিয়াই পরজীবনের সত্যকার সংসার-ধর্ম্ম সাধন করিবার সঙ্কেত ও অভ্যাস শিক্ষা করে; এই লৌকিক, বেদ-স্মৃতি-সদাচার-সম্মত ধর্ম্মের সাধন করিয়াও হিন্দু সেইরূপ তার নিত্য সনাতন-ধর্ম্মের বাহিরের সঙ্কেত লাভ করে। লৌকিক ধর্ম্ম তন্ত্রমন্ত্রের ধর্ম্ম, বেদ-স্মৃতির ধর্ম্ম। কিন্তু হিন্দুর সত্য ধর্ম্মবস্তু তন্ত্রেও ছিল না, মন্ত্রেও ছিল না; বেদেও ছিল না, পুরাণেও ছিল না; সে ধর্ম্ম ছিল সহজ, সতেজ, সরল মানবপ্রকৃতির মূলে।

বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্ত মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।

—ইহাই সনাতন-ধর্ম্মের কথা। ইহাকেই গীতায় স্ব-ধর্ম্ম বলিয়াছেন। এই ধর্ম্মকে পাইয়াই শ্রুতি নিজ হাতে আপনার সকল প্রামাণ্য-মর্য্যাদায় তিলাঞ্জলি দিয়া, ষড়ঙ্গ ঋগ্বেদাদিকে অপরা বিদ্যা এবং যাহার দ্বারা অক্ষরপুরুষকে পাওয়া যায়, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বা পরাবিদ্যা বলিয়াছেন। এই অক্ষর পুরুষ শ্রুতি-স্মৃতিতে, ক্রিয়া-কলাপে, আচারে-বিচারে নাই। আছেন কেবল জীবের প্রকৃতির মধ্যে। এই গুহাহিত, গহ্বরেষ্ঠ, পুরাণ পুরুষকে জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব হইয়া, আপনার আত্মার মধ্যেই কেবল দেখিতে পাওয়া যায়। এই সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব জন্য বস্তু নহে, যাগযজ্ঞাদি কোন ক্রিয়ার দ্বারা ইহাকে উৎপাদন করা যায় না। কোন সংযম-সাধনের দ্বারাও এবস্তুর সৃষ্টি হয় না। এই ধর্ম্মবস্তু নিত্যসিদ্ধ। অগ্নির দাহিকাশক্তি যেমন নিত্যসিদ্ধ—যেখানে আগুন আপনার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেইখানেই এই দাহিকাশক্তি বিদ্যমান থাকে; জলের তারল্য ও শৈত্য যেমন নিত্যসিদ্ধ; বায়ুর গতি যেমন নিত্যসিদ্ধ, জীবের ধর্ম্মও সেইরূপই নিত্যসিদ্ধ। মহাভারতে এই ধর্ম্মকেই জীবের একমাত্র সুহৃৎ বলিয়াছেন—নিধনেও ইহা জীবের অনুগমন করে। এই ধর্ম্মই সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ। এই স্ব-ধর্ম্মে জীবের মৃত্যুও শ্রেয়; কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ। সকল শ্রুতি-স্মৃতি যাঁহাকে ধর্ম্মাবহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি সকল জীবের প্রকৃতির মূলে, ঐ প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত হইয়া, তার নিয়তি ও গতি রূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এইজন্য জীবের প্রকৃতির মধ্যেই সকল শাস্ত্রের চাবি রহিয়াছে। ঐ প্রকৃতির অভিধানের দ্বারাই সকল শাস্ত্রসাহিত্যের অর্থ করিতে হয়। এইজন্য হিন্দু যতই শাস্ত্র-অনুগত হউক না কেন, মানুষ সর্ব্বদাই যে শাস্ত্র অপেক্ষা বড় হইয়া আছে একথা কখনও ভুলে নাই। শাস্ত্র অপেক্ষা গুরু বড়। আর গুরু-শাস্ত্র অপেক্ষা স্বানুভূতি হীন নহে। স্বানুভূতির সঙ্গে যতক্ষণ না মিলিয়াছে, ততক্ষণ শাস্ত্রোপদেশ বা গুরুবাক্য কিছুই প্রামাণ্য হয় না।

প্রকৃতির প্রতিকূলে বৈরাগ্যাদি অভ্যাস

ধর্ম্মের তত্ত্ব জীবের প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আছে বলিয়াই, হিন্দু সাধুসন্তেরা জীবের পাপ দেখিয়া কারুণ্যে গলিয়া যান বটে, কিন্তু পাপ দেখিয়া ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়েন না। এইজন্য হিন্দুধর্ম্ম কোনও দিন নরকের আগুন জ্বালাইয়া বিধর্ম্মীকে বা অধর্ম্মীকে পুড়াইয়া মারে নাই। শিশু হাঁটিতে যাইয়া পদে পদে পড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া, অভিজ্ঞ পিতামাতা যেমন ভীত হন না; এইরূপে পড়িতে পড়িতেই ক্রমে সে দাঁড়াইতে শিখিবে, হাঁটিতে পারিবে, ইহা জানিয়া, তাঁরা স্থির ও নিশ্চিন্ত হইয়া রহেন; আত্মদর্শী মহাজনেরা জীবের পাপাচরণে সেইরূপ স্থির ও নিশ্চিন্ত রহেন। এই পথেই, বহুবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া, জীব ক্রমে সজ্ঞানে আপনার শুদ্ধসত্ত্ব প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়, ইহা জানিয়া তাঁহারা কদাপি জীবের এই প্রকৃতিকে অযথা নিগ্রহ করেন না।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি, নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি?

তাঁহারা সর্ববিধ পাপ ও অহিতাচারকে উদার চক্ষে দর্শন করেন। বরঞ্চ ভিতরে, প্রকৃতির মধ্যে, যার পিপাসা আছে, বাহিরে তার সংযম-সাধনকে মিথ্যাচার বলিয়া বর্জ্জন করিতেই বলেন। এমন কি প্রকৃতির প্রতিকূলে বৈরাগ্যাদি অভ্যাসকে তাঁহারা অধর্ম্ম বলিয়াই নিন্দা করিয়াছেন। এরূপ কৃচ্ছ্র সাধনে অল্প লোকে কেবল নিজেরাই থাকা ক্লেশ পায় যে তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের শরীরাভ্যন্তরস্থ পরম পুরুষকে পর্য্যন্ত ক্লিষ্ট করিয়া থাকে বলিয়া, এ সকলের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এই সত্য সনাতন-ধর্ম্মের হাতে জীবনের সকল কর্ম্মের শাসনভার স্বচ্ছন্দেই ছাড়িয়া দিতে পারা যায়। কারণ রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প, সাহিত্য,—বিশাল ও জটিল মানব-জীবনের সকল বিভাগের সকল ধর্ম্ম ও সকল কর্ম্মকে পূর্ণ করিয়াই, এই বিশ্বজনীন সনাতন-ধর্ম্ম আপনার সিদ্ধিলাভ করে। রাষ্ট্রকর্ম্মাদি এই ধর্ম্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ। অঙ্গের পূর্ণতা সাধন করিয়াই, অঙ্গী সর্ব্বথা আপনার সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে। প্রত্যেক অঙ্গকে আপনার অধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বাধীন করিয়াই, অঙ্গী যুগপৎ তাহাদিগকেও সার্থক করে, আপনিও তাহাদের সাহায্যে সার্থকতালাভ করে। অঙ্গকে পঙ্গু করিলে, অঙ্গী আপনি পঙ্গু হয়। অঙ্গকে পুষ্ট করিলে, অঙ্গী আপনি পুষ্টিলাভ করে। এই সনাতন ধর্ম্মও সেইরূপ জীবনের বিভিন্ন বিভাগকে আপন আপন অধিকারে স্বাধীন ও স্বরাট করিয়া, আপনি আপনাকে পূর্ণ ও সার্থক করে। সমগ্র মানবপ্রকৃতিকে পূর্ণ করাই এই ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য। আর্টও মানবপ্রকৃতিকেই সার্থক করিয়া আপনার সার্থকতালাভ করে। এই ধর্ম্ম আর্ট অপেক্ষা বড়। আর্ট জীবনের একাংশকে মাত্র পূর্ণ করে, এই ধর্ম্ম সমগ্র জীবনকে পূর্ণ করে। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের পরস্পরের বিরোধ ঘটিলে, এই ধর্ম্মই কেবল তার মীমাংসা করিতে পারে। লৌকিক ধর্ম্মের সঙ্গে আর্টের বিবাদ বাধিলে, এই সনাতন ধর্ম্মকেই সালিশী করিয়া এই বিবাদ মিটাইয়া দিতে হয়। এই ধর্ম্ম আর্ট অপেক্ষা বড়, লোকে যাহাকে সচরাচর ধর্ম্ম বলে, তাহা অপেক্ষাও বড়। এই ধর্ম্মের হাতে আর্টের শাসন-সংরক্ষণের ভার অর্পণ করিতে কেহ আপত্তি করিবে না।

লৌকিক ধর্ম্ম এবং সাহিত্য ও আর্ট

লৌকিক ধর্ম্মের বা নীতির সঙ্গে সময়ে সময়ে সাহিত্যের ও আর্টের বিরোধ ঘটিতে পারে; কিন্তু এই সনাতন ধর্ম্মের সঙ্গে তার কখন বিরোধ সম্ভবে না। কারণ যে মানব-প্রকৃতিকে এই ধর্ম্ম সার্থক ও পূর্ণ করে, সেই মানব-প্রকৃতির অন্তঃপ্রয়োজনেই সাহিত্যের এবং আর্টেরও সৃষ্টি হয়। যেখানে সাহিত্য এই প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, যেখানেই ইহা বর্ত্তমান অনুভূতিকে উপেক্ষা করিয়া কেবল পুরাতন শ্রুতিস্মৃতিকে আশ্রয় করিতে চাহে, সেইখানেই ইহা কৃত্রিম, অলীক, অসার, বস্তুতন্ত্রতাহীন ও শূন্যগর্ভ শব্দাড়ম্বরপূর্ণ হইয়া উঠে।

আমাদের আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যেই ইহার বহুল প্রমাণ পড়িয়া আছে। প্রতি বৎসর বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র হইতে রাশি রাশি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের "ব্যাখ্যান", ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও উপদেশাদি, পরমহংস রামকৃষ্ণের

"কথামৃত" এবং আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণের "ব্রহ্মপূজা", "যোগ-সাধন", "আত্মজীবন-চরিত", "আষাবতীর উপাখ্যান" এবং "বক্তৃতা ও উপদেশ"—ছাড়া সত্য ও জীবন্ত ধর্ম্ম-কথা আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে আছে কি না সন্দেহ। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণের মধ্যে এক বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্ম্মতত্ত্ব"ই বোধ হয়, সমগ্র মানবপ্রকৃতির উপরে ধর্ম্মের আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির ধর্ম্মকথা প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে ফুটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্ম্মতত্ত্বও" এক প্রকারের অনুভূতি-প্রসূত। তবে সাধকের অনুভূতি ও মনীষীর অনুভূতির মধ্যে তারতম্য আছে, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মজীবনের অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা হইতে সাধকের অনুভূতি উৎপন্ন হয়। ঐ অভিজ্ঞতার বহির্লক্ষণের আশ্রয়ে, বৈজ্ঞানিক কল্পনাবলে মনীষীর অনুভূতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইংরাজীতে সাধকের অনুভূতি religious experienceএর ফল, আর মনীষীর অনুভূতিকে scientific imaginationএর ফল বলিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্যে এই প্রভেদ আছে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির ধর্ম্মকথা আর বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব, এই প্রভেদ সত্ত্বেও, তাঁহাদের নিজস্ব বস্তু। এই জন্যই এ সকল গ্রন্থে শব্দ সত্যকে, ভাষা ভাবকে, কল্পনা বস্তুকে ছাড়াইয়া যায় নাই। এ সকল পুস্তকে শ্রুতিস্মৃতির প্রামাণ্য লেখকদিগের নিদারুণ দৈন্যকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করে নাই। এসকলে অপূর্ণতা থাকিতে পারে, কিন্তু অসত্য নাই।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য

আধুনিক বাঙ্গলা কাব্যেও যেখানেই কবিকল্পনা প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরে গড়িয়াছে, সেইখানেই যুগপৎ সত্য ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে, সেখানে শব্দ অর্থের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। শব্দ ও অর্থ মিলিয়া সত্য জীবন্ত রসমূর্ত্তি সকল গড়িয়া তুলিয়াছে। আর যেখানে কবিকল্পনা শ্রুতিস্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া অপ্রত্যক্ষের সন্ধানে গিয়াছে, সেইখানেই শব্দ অর্থকে, ভাষা ভাবকে, ঝঙ্কার রসকে অভিভূত করিয়া, একটা অলীক সৃষ্টি রচনা করিয়াছে। মাইকেলের "মেঘনাদবধে" একটা সত্য অনুভূতির প্রমাণ পাই। উপাখ্যানভাগ মাত্র কবি রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এই উপাখ্যানকে অবলম্বন করিয়া তিনি যেসকল চিত্র ও রস ফুটাইয়াছেন, তাহা তাঁর নিজের, রামায়ণের নহে। এই মহাকাব্যে শব্দের ঝঙ্কারে কবিকল্পনার সত্যকে আচ্ছন্ন করে নাই। কিন্তু "মেঘনাদবধে" যে বস্তুতন্ত্রতা আছে, "ব্রজাঙ্গনায়" তাহা নাই। এই জন্য "ব্রজাঙ্গনা" শব্দের লালিত্য ও ছন্দের মাধুর্য্য দিয়া অনুভূতির দৈন্যকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। হেমচন্দ্রের "কবিতাবলী"তে এবং নবীনচন্দ্রের "অবকাশরঞ্জিনী"তে কোনও গভীর বা জটিল রস না ফুটিলেও, যতটুকু রস আছে, তাহা সত্য ও বস্তুতন্ত্র, কবিগণের প্রত্যক্ষ অনুভূতিলব্ধ। এইজন্য এই দুইখানি গীতি-কাব্যে শব্দে ও অর্থে, সত্যে ও কল্পনাতে একটা সামঞ্জস্য রহিয়াছে। রঙ্গলালের "পদ্মিনীর উপাখ্যানে" এবং নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধে"ও একটা সত্য সজীব সতেজ রস ফুটিয়াছে। আধুনিক কালের শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী সে সময়ে মর্ম্মে মর্ম্মে যে বেদনা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, রাষ্ট্রীয় জীবনে যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তার প্রাণের ভিতরে স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহারই প্রেরণায় রঙ্গলালের "পদ্মিনীর উপাখ্যান" এবং নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" রচিত হয়। এই দুইখানি কাব্যের মধ্যে একটা সতেজ অনুভূতি বিদ্যমান ছিল। এইজন্য ইহাদের ভাষা ও ভাবের, শব্দ ও অর্থের মধ্যে একটা সঙ্গতি রহিয়াছে, কোথাও

বিশেষ সত্যাভাস বা রসাভাস নাই। কিন্তু নবীনচন্দ্রের "কুরুক্ষেত্র" ও "রৈবতক" একটা সাময়িক, কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ামুখে রচিত হয়। মূলে রাষ্ট্রীয় জীবনের হীনতা-বোধই এই প্রতিক্রিয়াতে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল। ইংরাজের স্পর্দ্ধা বাঙ্গালীর আত্মসম্মান-বোধে পদে পদে আঘাত করিতেছিল। য়ুরোপের সভ্যতাভিমান বাঙ্গালীর জাত্যাভিমানকে চাগাইয়া তুলিতেছিল। য়ুরোপের প্রতিপক্ষে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া, বাঙ্গালী তখন পুরাতনের স্মৃতির দ্বারা বর্তমানের দুর্গতিকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। মূলতঃ এই ভাবেই পঁচিশ ত্রিশ বৎসর আগেকার যথাকথিত হিন্দু পুনরুত্থানের সূচনা হয়। ইহাতে তখনও নবীনে-প্রাচীনে সমন্বয়-সাধনের প্রয়াস জাগে নাই। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই তখন এই সমন্বয়ের প্রয়োজন অনুভব করিয়া তার চেষ্টা করিতেছিলেন। অপরে একটা কৃত্রিম ও কল্পিত "সনাতনীর" প্রতিষ্ঠা করিয়া, বর্তমানের সহজ ও অনিবার্য বিকাশ-গতির একান্ত প্রতিরোধ করিবারই চেষ্টা করিতেছিলেন। এই কৃত্রিম ও কল্পিত "সনাতনীর" প্রেরণাতেই নবীনচন্দ্রের "কুরুক্ষেত্র" ও "রৈবতকের" জন্ম হয়। এই জন্যই এ দু'খানি কাব্য তেমন উৎকর্ষ লাভ করে নাই। কৃত্রিম কল্পিত ধর্ম্মের চাপে পড়িয়া আর্ট পঙ্গু হইয়াছে। এই জন্য নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন, উভয়ই অমন অলীক হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রাচীনের প্রতিকৃতিও ফুটে নাই, নূতনের অনুভূতিও জাগে নাই। ইহারা কোনও গভীর রস বা সার্ব্বজনীন আদর্শ ফুটাইয়া সাহিত্যে অক্ষুণ্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে উপন্যাসের অভাব নাই। বৎসর বৎসর বোধ হয় শতাধিক ছোটবড় উপন্যাস বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র হইতে নির্গত হইতেছে। কিন্তু বিগত চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের বাঙ্গালা উপন্যাসের মধ্যে, এক বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ছাড়া, "স্বর্ণলতা" ব্যতীত আর একখানিও স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। আর বর্তমানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আশ্রয়েই, অসাধারণ কবিকল্পনা-প্রসূত না হইয়াও, "স্বর্ণলতা" অমন অনন্যসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। অন্যদিকে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ", "দেবীচৌধুরাণী" ও "সীতারামের" আর গুণাগুণ যাহাই থাকুক না কেন, রসের বিচারে, কাব্যের হিসাবে, ইহারা লেখকের আলোকসামান্য প্রতিভার গৌরব রক্ষা করে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা

কিন্তু এই অপূর্ণতা সত্ত্বেও, "আনন্দমঠে", "দেবীচৌধুরাণীতে" কিম্বা "সীতারামে" যে ধর্ম্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা কিয়ৎপরিমাণে প্রাচীনের প্রতিধ্বনি হইলেও, কোনও দিকেই নিতান্ত কৃত্রিম নহে। এই গ্রন্থ তিনখানিতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গীতা-ধর্ম্মেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গীতাভাষ্য মায়াবাদী বৈদান্তিকের বা ভাববাদী বৈষ্ণবের গীতাব্যাখ্যার প্রতিধ্বনি নহে। গীতাকেই কেবল তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, গীতা-ধর্ম্মের প্রাচীন ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। ফলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র গীতোপদেশকে অবলম্বন করিয়া বর্তমান য়ুরোপীয় সাধনার অনুশীলন-ধর্ম্মই প্রচার করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ভারতের গতানু-

গতিক সনাতনীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চান নাই, আধুনিক য়ুরোপের অন্ধ অনুকরণও করিতে যান নাই। কিন্তু আধুনিক সাধনার শ্রেষ্ঠতম ভাব ও আদর্শের সঙ্গে, ভারতের প্রাচীন সাধনার নিগূঢ়তম প্রেরণার সঙ্গতি ও সমন্বয় সাধন করিয়া, আমাদের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখিয়া বর্ত্তমান হিন্দুসাধনা ও হিন্দু চরিত্রকে বিশ্ব-সাধনার ও বিশ্ব-মানবের অঙ্গীভূত করিবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁর "কৃষ্ণচরিত্রে", "গীতাভাষ্যে" এবং "আনন্দমঠ", "দেবীচৌধুরাণী" ও "সীতারাম" এই তিনখানি উপন্যাসে তিনি এই সমন্বয়সূত্রেরই ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন। এইজন্য তাঁর নিষ্কাম-কর্ম্ম প্রাচীনেরা গীতোক্ত নিষ্কাম-কর্ম্মকে যেভাবে বুঝিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই নিষ্কাম কর্ম্ম ইউরোপের নিরীশ্বর হিতবাদ বা হিউম্যানিটি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ইহাকে ভগবদ্ভক্তি-প্রেরিত লোক-সেবা বা লোকশ্রেয় বলা যাইতে পারে। এই সমন্বয় করিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগের নিকটে যে শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন, তিনি কেবল পুরাতন পৌরাণিকী কিম্বদন্তীর অবতার নহেন; কিন্তু আধুনিক আকাঙ্ক্ষার সুপারম্যান্ (superman) বা নরোত্তম। ঊনবিংশ খৃষ্টশতাব্দীর উদার মতবাদ "Ecco Homo" বলিয়া যে খৃষ্টাবতারকে দেখাইতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সেই উদার মতবাদের আশ্রয়েই আমাদিগের নিকটে কৃষ্ণাবতারকে উপস্থিত করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র এই প্রেরণা প্রাপ্ত হন নাই। "অবকাশরঞ্জিনী"তে ও "পলাশীর যুদ্ধে" তিনি আপনার প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। "কুরুক্ষেত্রে" ও "রৈবতকে" পরধর্ম্মের অনুধাবন করিয়াছেন। এইজন্য তাঁর শ্রীকৃষ্ণ পৌরাণিকী অবতারও নহেন, আধুনিক সুপারম্যানও নহেন, কিন্তু হিন্দু অবতারের শঙ্খচক্র-গদাপদ্ম-রঞ্জিত য়ুরোপের প্রিন্স বিস্‌মার্ক বা কাডিন্যাল রিশেলু মাত্র।

প্রাচীনে ও আধুনিকে বিরোধ

আমাদের বহুতর আধুনিক সৃষ্টিই এইরূপ কৃত্রিম, কল্পিত, না-হিন্দু-না-য়ুরোপীয় হইয়াছে। কেবল সাহিত্যে বা আর্টে নয়, জীবনের প্রায় সকল বিভাগেই, এই প্রাচীনের প্রেতাত্মা আমাদের উপরে চাপিয়া, আমাদিগকে পথ-হারা করিয়া তুলিতেছে। প্রাচীনের প্রত্যক্ষ অনুভূতিলাভ যদি আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত, তাহা হইলে এই গতানুগতিকতায় অন্ততা অনর্থ করিতে পারিত না। আমরা এখন যাহাকে প্রাচীন বলি, আমাদের পিতৃপিতামহেরা তাহাকেই একান্তভাবে অবলম্বন করিয়া চলিতেন। সেই প্রাচীন তাঁহাদের নিকটে সত্য ছিল। সেই প্রাচীনের সঙ্গে তাঁহাদের একটা সত্য ও সহজ প্রাণগত যোগ ছিল। এই সহজ-যোগ ও প্রাণগত সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই তাঁরা নিঃসঙ্কোচে প্রাচীনকে নিজেদের মনোমত করিয়া লইতে পারিতেন। তাঁহারা জাত মানিতেন, একটা পুরাগত সামাজিক ব্যবস্থা বলিয়া জাতিধর্ম্ম-বিচারকে তাঁহারা বিনা প্রশ্নে ও বিনা বিচারে মানিয়া চলিতেন। মানুষ যেমন কেহ লম্বা হয়, কেহ বা খাট হয়; কেহ গৌর হয়, কেহ বা শ্যামবর্ণ বা কাল হয়; ব্রাহ্মণ শূদ্রাদিও সেইরূপ একটা স্বাভাবিক জন্মগতভেদ, এই ভাবেই তাঁহারা জাতিভেদকে দেখিতেন। এইজন্য ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ বলিয়া একটা বিশেষ অভিমান ছিল না, শূদ্রের শূদ্র বলিয়া একটা বিশেষ ক্ষোভও হইত না। তাঁহারা জাত মানিতেন বলিয়াই, তাঁহাদের মধ্যে সমাজদ্রোহী জাত্যভিমান ছিল না। আমরা জাত মানি না বলিয়াই,

আমাদের জাতের অভিমানটা বেজায় বাড়িয়া উঠিতেছে। এইরূপে আমাদের জীবনের প্রত্যেক বিভাগে একটা সাংঘাতিক কৃত্রিমতা প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের ধর্ম্ম গতানুগতিক, আচার মৌখিক, নীতি অস্বাভাবিক, কর্ম্ম কাপট্যাশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। স্বভাব বস্তুকে আমরা হারাইয়াছি। এই কৃত্রিম, কল্পিত, অস্বাভাবিকতাকেই ধর্ম্মের সিংহাসনে বসাইতেছি। ধর্ম্মের নামে এই কৃত্রিমতা ও কল্পনার হাতে সাহিত্যের বা আর্টের শাসনভার অর্পণ করা যায় কি ?

[১৩৩২ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার "নারায়ণ" মাসিক পত্রে 'ধর্ম্ম ও আর্ট' নিয়া এক আলোচনার সূত্রে বিপিনচন্দ্র পাল এই প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধের প্রথম অংশ এখানে পুনর্মুদ্রিত হইল।]

বাংলার সাধনা

—রবীন্দ্রনাথ

"নদীর পলিমাটিতে তৈরি এই বাংলাদেশ। এখানে ভূমি উর্বর। বীজমাত্রই এখানে সজীব সফল হয়ে ওঠে। তাই এখানে প্রাণধর্ম্মের একটি বিশেষ দাবি আছে। পলিমাটির দেশ বলেই এখানকার ভূমি কঠিন নয়। তাই পুরাতন মন্দির প্রাসাদ প্রভৃতির গুরুভার এখানে সয় না। সেই সব গুরুভার এখানে ধীরে ধীরে তলিয়ে যায়। বাংলাদেশে তাই তীর্থ প্রভৃতি বেশি নেই। পুরাতনের ঐশ্বর্য তার খুবই কম। তাকে দুর্ভাগ্য বলব কি সৌভাগ্য বলব!"

"বাংলাদেশ বিধাতার আশীর্বাদে পুরাতনের ভার হতে মুক্ত। তবে জীবনসাধনার দায় বিধাতা তাকে বেশি করেই দিয়েছেন। তার দেশ যে পলিমাটির উর্বরভূমি। প্রাণ এখানে ব্যর্থ হতে পারবে না। পুরাতনের মৃত পাষাণভার এখানে না সইলেও জীবনের দাবিদাওয়া এখানে পুরোপুরি সফল হবে।"

"বাংলাদেশের এই উদার বিস্তৃতির ফল দেখা যাবে তার সর্বক্ষেত্রে। তার শিল্পে সংগীতে সাহিত্যে সাধনায়। সুরে ও বাণীতে অপূর্ব শিবশক্তির মিলন চিরদিনই বাংলা গানে যেমনটি দেখা যায়, তেমনটি ভারতে আর কোথাও ঘটেছে বলে শুনি নি। কীর্তনে বা বাউল গানে ভাবের মন্দিরে এখানে যে অপূর্ব পূজাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে তাতে নানা ফুল মিলিয়ে অপরূপ অর্ঘ্যরচনা করা হয়েছে। ভাবের রূপটি ফুটিয়ে তোলবার জন্য বাংলাদেশের সাধকেরা প্রয়োজনমত নানা সুর ও তালকে অপরূপভাবে সংগত করেছেন। প্রেমভক্তির যে প্রসাদ বাংলার রসমন্দির হতে পরিবেশন করা হয়েছে তার আর তুলনা নেই। কত ফুলের মধু আহরণ করে এখানকার উপাসকেরা এই অসাধ্য সাধন করেছেন।"

[বাংলার সাধনা—ক্ষিতিমোহন সেন—হইতেউদ্ধৃত]

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার জীবন সাধনা

হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত

(উপক্রমণিকা)

১৮৯৩ সালের ৬ই অক্টোবর। বিশ্বজোড়া খ্যাতিমান, বিজ্ঞান-সাধক, লেখক, দেশনেতা, শিক্ষাবিদ, সংগঠক মেঘনাদ সাহার জন্ম হয় ঢাকা জিলার শেওড়াতলী গ্রামে। তাঁর নামে ডাক টিকেট হয়নি, স্মৃতি ফলক, এমনকি মর্মর মূর্তিও স্থাপন করা হয়নি। কোন রাজপথ তাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়নি। তবু সমগ্র দেশ এবং বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে বিশ্ববাসীর মনে তাঁর ৩৪ বৎসর বয়সে আবিষ্কৃত সত্য ও সাময়িক প্রতিভা চিরকালের জন্য ঠাঁই পেয়ে গেছে।

সদাই কর্মব্যস্ত মেঘনাদ—তাঁর কর্মপ্রিয়তার উৎস পেয়েছিলেন তাঁর মার কাছে। তাঁর মা ভুবনেশ্বরী দেবী মানুষটি ছিলেন অপূর্ব গঠনমূলক দৃষ্টিসম্পন্ন। যে সংসারে কোনদিন স্বাচ্ছল্য দেখা দেয়নি সেখানে অমানুষিক পরিশ্রম দিয়ে আর সংসার গড়ে তোলার মন দিয়ে সব সময় অভাবকে তিনি ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন।

আর মেঘনাদের জন্মভূমি। শেওড়াতলী গ্রাম। বাসিন্দারা সবাই হয় ছোটখাট ব্যবসা, না হলে ক্ষেত মজুরী করতেন। কিছু আধিয়ারও ছিল। চারিদিকে এমনি সব কাজ কারবার; ছোট কিন্তু ব্যস্ত। দেখে দেখে মেঘনাদের অল্প বয়সেই কাজকে সহজভাবে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। মেঘনাদের বাবারও নিজের একটা মুদিখানা ছিল। তাঁর বাবা জগন্নাথ সাহাও ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী।

জীবনের শিক্ষা মেঘনাদকে এক অসামান্য শক্তির সন্ধান দিয়েছিল।

ছোটবেলা তাঁকে একবার দোকান দেখাশোনার ভার দেওয়া হয়েছিল। সেটাই তো স্বাভাবিক। গরীবের ছেলে, কাজ করতে হবে। কিন্তু মেঘনাদ সুবিধা করে উঠতে পারেন নি।

কিছুদিন বাদে সিমুলিয়া বিদ্যালয়ে পড়ার সময় থাকা খাওয়া জুটেছে শ্রীঅনন্ত কুমার দাস মশাইর বাড়ীতে। তা না হলে তাঁর পড়া বন্ধ হয়ে যেত।

.....চাকুরী চাই। কিছুতেই জোটেনা। অথচ নিজের খরচ। ছোট ভাইকেও রাখতে হয়েছে সঙ্গে। ছাত্র পড়ানোর কাজ জুটলো। কাজ বলে কাজ! সকাল এবং সন্ধ্যা দুবেলা। মেঘনাদকে দুবেলা পাড়ি দিতে হত শ্যামবাজার আর ল্যান্সডাউন রোড। বাসের ভাড়া পোষায় না। সুতরাং সাইকেল জোগাড় করে দুবেলা কাজ সারতে হয়েছে। তখন তিনি গণিতে এম. এস. সি পাশ করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

কাজ জুটলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেবার জন্য আশুতোষ তাঁকে ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে যোগ দিতে অনুরোধ করলেন। আশুতোষের কথায় যোগ দিলেন দুজনে। বিভাগীয় প্রধান ডাঃ গণেশ প্রসাদের সঙ্গে নিত্য বিরোধ ঘটতে লাগল। নতুনের সঙ্গে পুরাতনের চিরকালের বিরোধ।

আশুতোষ অনুমতি দিলেন পদার্থবিদ্যা বিভাগে যোগ দেবার। পদার্থবিদ্যা নিজেদেরই বি. এস সি পর্যন্ত পড়া ছিল। তাও সাধারণ ভাবে। অনার্স ছিল গণিতে।

মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথ নিজেদের পদার্থ-বিদ্যায় শিক্ষিত করে নিতে বসলেন। নিজেদের শিক্ষা নিজেরাই নিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানী হেরে গেছে। ইংরাজ আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের সে দেখতে পারে না। বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে জাতিবৈর দেখা দিয়েছে। ইংরাজ, মার্কিণ প্রার্থীরা গবেষণার সুযোগ পায় না সে দেশে।

অধ্যাপক নেরনষ্ট বহু প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। ইংলণ্ড থেকে আরও একটি আবেদন পত্র এলো

অধ্যাপকের কাছে। প্রার্থী মেঘনাদ সাহা, ভারতবর্ষের ছাত্র। মেরদণ্ড ফিরিয়ে দিলেন না। যুগের যাত্রা শুরু হয়েছে। বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে মেঘনাদ ভারতবর্ষের যুগযাত্রী। মেঘনাদ ছাত্র হিসাবে গৃহীত হলেন।

কাজ শুরু হয়েছে। বেশ ভালো লাগছে কাজের ধারা। এমন সময় ভারতবর্ষ থেকে তার বার্তা এলো। দেশে ফিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খয়রা অধ্যাপক হতে পারবে? স্যার আশুতোষ তার পাঠিয়েছেন।

কাজ ছেড়ে চলে আসতে হল। এমনিভাবে বিচিত্র-রূপে জীবনে আর জীবিকার বিরোধ দেখা দেয়। কিন্তু তার ফল ভাল হয়নি।

স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তিত করেছেন। নতুন অধ্যাপকদের কাজই হল এই রূপান্তরের সাধনা সিদ্ধ করা।

সিদ্ধির পথে বাধা অনেক।

প্রথম বাধা পুরাতন-পন্থী শিক্ষকরা। তাঁরা জ্ঞানের নতুন ধারাকে পুরাণো চিন্তার সঙ্গে তুলনা করে দেখতে নারাজ। গ্রহণ করা তো কল্পনার বাইরে।

এ বাধার অভিজ্ঞতা পূর্বেই হয়েছে। তাই আশুতোষ মেঘনাদকে ডেকেছেন।

কিন্তু তার পরের বাধা। বাঙলা সরকার। কিছুতেই তাঁরা মঞ্জুরী টাকা দেবেন না। শিক্ষকদের বেতনও আশুতোষকে কষ্টেসৃষ্টে জোগাড় করতে হয়।

এক বছরেও মেঘনাদ তাঁর গবেষণার জন্য চলনসই ব্যবস্থা এবং একজন সহকারী পেলেন না।

এমনিভাবে "জীবিকা"—সাধনাহীন চাকরী বজায় রাখা মেঘনাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়লো। এর আগে কোদাইকানাল জ্যোতির্বিজ্ঞান মন্দিরের প্রধান স্যার গিলবার্ট ওয়াকার তাঁকে সহকারী পরিচালক হিসাবে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সে আমন্ত্রণ নিতে তিনি রাজী ছিলেন না।

ডাক দিয়েছিল তাঁকে বিজ্ঞান আর দেশ গঠনের সাধনা। তাঁর নিজের ভাষায় "এই আহ্বান কালের আহ্বান। ভারতের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে একথা স্পষ্ট যে দেশ তার ইতিহাসের এক সংকট কালের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। সুপ্রাচীন এবং বিচিত্র ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতির ও সভ্যতার বনিয়াদে নতুন কাল নতুন সম্ভাবনার সূত্রপাত করিতেছে।"

পৌরসভা বনাম বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানীর বিরোধ দেখা দিল। এই বিরোধ কিছুদিন আগে অক্সফোর্ডে এমনি রূপ নিয়েছিল। সেখানে বিজ্ঞানীরা যেমন ভাবে প্রতিরোধ করেছিলেন তেমনি ভাবে এগিয়ে এসে মেঘনাদ ঘোষণা করলেন: "সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার লাভ যাতে শিল্পপতিদের অর্থ বৃদ্ধি না করে বিদ্যুৎ শিল্পের উন্নয়ন ও দেশবাসীর কল্যাণে লাগে তার জন্য উদ্যোগ করতে হবে" আমাদের।

শ্রাবন এসে জলময় করে দেশ। প্রকৃতির কাজে মানুষ বাধা দিচ্ছেন। কেন? মেঘনাদ আহ্বান দিলেন নদী বিজ্ঞান গবেষণার। তার পরিণতি দামোদর উপত্যকা সংস্থা।

এক লিপির প্রশ্ন উঠেছে। ভাষার ইতিহাস মন্থন করতে বসে গেলেন মেঘনাদ। প্রশ্ন উঠেছে মহাভারতের সত্যতা নিয়ে। সাহিত্যের অধ্যাপকের আধা-বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নাকচ করে দিলেন মেঘনাদ।

আবার নিজেও কত প্রশ্ন তুললেন। ন্যাশনাল একাডেমী গঠন, ন্যাশনাল ইনষ্টিট্যুট অফ সায়েন্স গঠন। বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা "কিভাবে গ্রাম এবং শহরের যোগাযোগ রাখতে পারে" তার প্রশ্ন।

রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানালেন ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশনে। শিল্পায়ন মানে কি? শিল্প কিভাবে মানুষের দুঃখ দূর করতে পারে, অন্যান্য দেশে—সুইডেনে, সোভিয়েৎ দেশে, কিভাবে করেছে তা বুঝে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করার পথ নির্দেশের প্রশ্ন উঠলো। প্রশ্ন উঠলো স্বাধীনতার পর দেশের মূলগত সংহতি কিভাবে রক্ষিত হবে।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র প্রশ্ন মেনে নিলেন।

বিজ্ঞান সাধনা আর—শিল্পায়ন। জ্ঞান আর কর্ম।

"ভারতবর্ষকে যদি দারিদ্র্য, অজ্ঞান অন্ধকার এবং

ব্যাধির ব্যাপক দমনের সমাধান করিতে হয়, তবে শিল্পায়নই তার পথ।"

"বিজ্ঞানের অসঙ্কুচ সাধনের শক্তির সদ্ব্যবহার বা অপচয় আমাদের মন স্থির করার উপরে নির্ভর করে। আমাদের পথ ব্যাপক শিল্পায়নের পথ।"

একটা নির্খুত ছবি আঁকার ইচ্ছাও তাঁর ছিল।

১৯৩৮ সালে, শিল্পায়নের জন্য তাঁর আঁকা সেই কর্মসূচী। মূল: শক্তি—'মানব কল্যাণের জন্য শক্তির ব্যবহার।' জ্বালানী, ধাতু যন্ত্র, ছোটখাট যন্ত্র, মাপবার যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক, যানবাহন, যোগাযোগ।

মূল শিল্পগুলির পুষ্টির জন্য:

শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা, শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা, ব্যাপকভাবে শিল্পায়ন সম্বন্ধে প্রচার।

সারা জীবনে বার বার তিনি সত্য সন্ধান করেছেন জনতার জীবনে। কোয়েটার ভূমিকম্প হল। মেঘনাদ ভূমিকম্প সম্বন্ধে তথ্য, এবিষয়ে ভারতে আগে কি হয়েছে; খৃষ্টজন্মের ১৩২ বৎসর পরে চীন দেশে চোকো এবিষয়ে যে যন্ত্র আবিষ্কার করেন তার বিবরণী দিয়ে, শেষ পর্যন্ত এই বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য গবেষণা চালানোর পথ নির্দেশ দিলেন।

লোকে যাদুঘরে এসে মজা দেখে। পুরাতাত্ত্বিক সম্পদ সংগ্রহ দেখে ভাবে বিদ্বান লোকদের ঝক্ত বাতিক হয়। খালি পাথর ভাঙা, মূর্তি, টুকিটাকি কুড়িয়ে জড়ো করা যা।

অধ্যাপক সাহা সোজাসুজি বললেন: বৌথ চিন্তা, সামগ্রিক বুদ্ধি নিয়ে পুরাতত্ত্বকে বিচার করতে হবে। কোন্ যুগে কোন্ জাতি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কোন্ উপকরণ দিয়ে তার অগ্রগতি? গোটা মানব সমাজের এই ইতিহাস, বিজ্ঞানের ইতিহাস যাদুঘরের নাম না জানা উপাদানে লুকিয়ে আছে। তাকে জানতে হবে।

১৯৩৮ সালের এই চিন্তার অনুরণন ১৯৫৬ সালেও বেজেছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের যাদুঘর পুনর্বিন্যাস সম্বন্ধে মেঘনাদ সাহা লিখলেন: এই সংগ্রহশালার পুনর্বিন্যাস করার সময় দেশের পরিবর্তন লক্ষ্য রাখতে হবে। ইংরাজরা তাঁদের বিজয়ের চিহ্ন দিয়ে ভরে রাখতে চেয়েছিলেন এই সংগ্রহশালা। আজ ইংরাজ যুগ এবং ইংরাজ উত্তর যুগে ভারতবর্ষের আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার উপকরণ দিয়ে একে সাজাতে হবে। চিত্র দিতে হবে রামমোহন প্রমুখের, সুরেন্দ্রনাথের, তিলকের, অরবিন্দের, গোখলের, বিপিনচন্দ্র পালের, রানাডের, আশুতোষের, রবীন্দ্রনাথের ও অন্যান্যদের যাঁরা পরাজয় ঘটিয়েছেন ইংরাজের।

ছেলেবেলায় প্রসন্ন কুমার চক্রবর্তীর কাছে অঙ্কের নিয়মকানুন শিখেছিলেন। পড়েছিলেন অ্যাগ্নেস ক্লার্কের জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনপ্রিয় বই। চাকায় ব্যাপটিষ্ট মিশনে বাইবেল পাঠ নিয়েছিলেন। যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের প্রবর্তিত সারা বাংলা প্রতিযোগিতায়; প্রবন্ধ লিখে প্রথম হয়েছিলেন। প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্তর কাছে কিশোরী ভূবিলি বিদ্যালয়ে পড়ার সময় নভোমণ্ডলের রহস্যের সন্ধানের আনন্দের পাঠ নিয়েছিলেন।

বড় হয়ে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য বই প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করেছেন। বিজ্ঞানের ইতিহাস * লিখতে উৎসাহিত করেছেন।

নিজের জীবনী লেখার সময় ছিল না। যুব পরিষদ † অনুরোধ জানালেন অনুমতি চেয়ে। অনুমতি দিলেন। জানালেন জনপ্রিয় ভাবে লেখার জন্য উপকরণ তিনি দেবেন।

উপকরণ ছড়ানো আছে: বই এ, তাঁর লেখায়, ভাষণে, সংবাদপত্রে। আছে তাঁর ছাত্র ও সহকর্মীদের মনে।• আছে তার জীবনী গ্রন্থে ‡।

এসব সংযোজনের উদ্দেশ্য যাঁদের ভালো লাগে তাঁদের সহায়তা বর্তমান সূত্র সন্ধান কর্মীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।

তাঁর জন্মদিনে এই নিবেদন মূলগত শিক্ষা কর্মীদের—ডাঃ মেঘনাদ সাহার জীবন সাধনা সাধারণ মানুষের জন্য সংকলিত হোক।

---

* রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত "বিজ্ঞানের ইতিহাস"—সমর সেন (১৯৫৫)॥

† যুব পরিষদ, শিক্ষা, কল্যাণ ও সূত্র সন্ধান বিষয়ক সংস্থা॥

• ডাঃ সাহার ছাত্র জীবন—এন, আর, সেন।
জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডাঃ সাহা—এস, কে, ব্যানার্জী।
শিক্ষক ডাঃ সাহা—বি, এন, শ্রীবাস্তব।
বিজ্ঞান লেখক ডাঃ সাহা—অমিয় কুমার ঘোষ।
সংগঠক অধ্যাপক সাহা—সমরেন্দ্রনাথ সেন।

‡ ডাঃ সাহার জীবন সাধনা—যুব পরিষদ।
Prof M. N. Saha, his life, work and philosophy—Ed. S. N. Sen
‡ মেঘনাদ সাহা—শঙ্কর লিমিটেড্।

৬ই অক্টোবর ১৯৫৯ তারিখে সংকলিত ও পঠিত॥

আমার চোখে দেখা—রোডিয়েট দেশ

ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

(২)

৩রা জুলাই রবিবার অপরাহ্নে প্রায় সাড়ে তিনটায় গুরু মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিছানায় দেহখানিকে এলিয়ে দিয়ে অধ্যাপক সাহার সঙ্গে সেদিন সকালবেলার বিমানের মহড়া সম্বন্ধে গল্প করতে করতে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুম ভাঙলো দরজায় লুকিনের পরিচিত টোকার শব্দে। মস্কোর সায়েন্স ক্লাবে তেজস্ক্রিয়তা-নির্ণায়ক ও পরিমাপক নানা যন্ত্রপাতি দেখতে যেতে হবে। সুসজ্জিত নানা আসবাবপত্র ও বিলাসিতার নানা উপকরণে সজ্জিত সায়েন্স ক্লাবের বাড়ীটি, আগে নাকি জারের আমলে কোন বিশিষ্ট অভিজাত ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ী ছিল। আমরা প্রায় পাঁচটায় সেখানে পৌঁছুলুম এবং প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে ভূগর্ভে তেজস্ক্রিয় ধাতুর আকরের সন্ধান হতে আরম্ভ করে মানুষের শরীরে তেজস্ক্রিয় উপাদানের উপস্থিতি নির্ণায়ক নানাপ্রকারের যন্ত্রাদি পর পর দেখে গেলুম। এভাবে দিনের কার্যসূচী শেষ করে সন্ধ্যা সাতটায় আমরা গেলুম লেভিয়ানেভ অপেরায়। সাড়ে চার ঘণ্টা ছিলুম সেখানে, কিন্তু নাচে, গানে, দৃশ্যপটের সজ্জায় এমনি তন্ময় হয়েছিলুম যে মনে হল যেন মাত্র একটি ঘণ্টা সেখানে ছিলুম। রাত্রিতে পৌনে বারোটায় হোটেলে ফিরে এসে প্রায় একটায় ভোজন পর্ব শেষ করে এসে দেখি অধ্যাপক সাহা দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। সারাদিন স্নান করার সুযোগ হয়নি, তাই ঐ নীরব নিশুতি রাতের প্রশস্ত সময়ে স্নান করে খুব আরাম পাওয়া গেল; তার পরেই "শয়নে পদ্মনাভঃ"...।

৪ঠা তারিখ প্রাতরাশের পর নিজেদের কামরায় ফিরে এসে দেখি অধ্যাপক সাহা ঘরেই তা' শেষ করে বেরোবার জন্য কাপড়-চোপড় পরছেন। আমি বারণ করলুম যে কাল যখন একটু জ্বর হয়েছে তখন আর বেরিয়ে কাজ নেই, এমনি সময় লুকিন এসে হাজির। আমার কথা শুনে সেও সায় দিলে এবং তৎক্ষণাৎ টেলিফোনে ডাক্তারকে খবর দিলে এবং তা শেষ করে এসে বল্লে যে ডাক্তার দুপুরবেলা অবিশ্যি আসবে। অধ্যাপক সাহা কিন্তু নাছোড়, একবার যখন বেরোবেন বলেছেন, তখন যাবেনই। অগত্যা নীচে নেমে এসে আমরা দুভাগে ভাগ হয়ে গেলুম, অধ্যাপক সাহা লুকিনকে নিয়ে গেলেন পদার্থ বিজ্ঞান শাখার অধিবেশনে, আর আমি চীন দেশীয় মহিলা ডেলিগেট সুং ও ইন্টারপ্রিটার নাজেস্দা ভুরাচিনা সহ গেলুম মেডিক্যাল অ্যাকাডেমীর ভবনে জৈববিদ্যা-শাখার অধিবেশনে।

জৈববিদ্যা শাখার অধিবেশন সেদিন একটু তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে গিয়েছিলো, তাই দুপুরে প্রায় একটায় হোটেলে ফিরে এসে দেখি এক জন মহিলা ডাক্তার আমাদেরই কামরার সংলগ্ন অপেক্ষা কামরায় বসে আছেন। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি দরজায় এসে টোকা দিয়ে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে ঢুকে পড়লেন কামরায়। রুশ ভাষায় তিনি যা বল্লেন তাতে বার দুই ভক্‌তিয়োর শাখা শুনে এবং হাতে স্টেথোস্কোপ দেখেই আমি বুঝতে পারলুম যে তিনি অসুস্থ অধ্যাপক সাহাকে দেখতে এসেছেন। আমি হাত বাড়িয়ে হাসিমুখে তাঁর করমর্দন করে ইঙ্গিতে তাঁকে বসতে অনুরোধ জানিয়ে আসন দেখিয়ে দিলুম। তিনিও নির্দেশ মত, হাতের ব্যাগ প্রভৃতি টেবিলে রেখে হাত দিয়ে আমাকে অদূরবর্তী শয্যা দেখিয়ে শুয়ে পড়তে অনুরোধ জানালেন। মহাবিপদ, ঘরে কোন দোভাষী নেই, তিনি আমাকে অধ্যাপক সাহা বলে ভুল করছেন, আর যতই আমি ডান হাতে নিজের বুককে দেখিয়ে, নেতিবাচক হাত নেড়ে জানাচ্ছি যে রোগী আমি নই, ততই তিনি মধুর হেসে বারবার অঙ্গুলী সংকেতে বিছানা দেখিয়ে, কানে স্টেথোসকোপ লাগিয়ে, নীচের অংশ নিজের বুকের উপর বসিয়ে দেখাচ্ছেন যে বুক পরীক্ষা

করা দরকার! নেতিবাচক মাথা নেড়ে, বার চারেক "নিয়েৎ," বলেও যখন কোন ফল হল না, তখন আমি আমার ব্যাগ খুলে বের করলুম আমার স্টেথোস্কোপ আর ভিজিটিং কার্ড, তাতে রুশ হরফেও কালিতে নাম লেখা ছিল। তখন মহিলা নিজের ভুল বুঝতে পারেন, আর খিল্ খিল্ করে, সে কী হাসি! আবার হাত বাড়িয়ে অতি দ্রুততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে আমার করমর্দন করতে লাগলেন, যাকে বিশেষ অর্থছাড়া অন্য অর্থে সত্যি সত্যি পাণিপীড়ন বলাই ঠিক হ'ত। আর তখনো একইভাবে হাসির ঢেউ উঠ্‌ছে, আর তাই আমার মাঝেও সংক্রামিত হয়ে আমাকেও সে হাসিতে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করে তুললে। আমরা পাশাপাশি দুখানি চেয়ারে বসে পড়লুম এবং হাসির জোয়ার যখন একটু মন্দীভূত হ'ল, তখন আমাদের দুজনের মাঝে আরম্ভ হল আলাপ পরিচয়! সে এক অদ্ভুত ভাষা! মাথা নেড়ে, হাত ও মুখের নানা ভঙ্গিমায় একেবারে মানুষের প্রথম ভাষের অভিব্যক্তি! কাশীরাম দাস যদি সেখানে উপস্থিত থাকতেন তাহলে তার কল্পনার, অর্থাৎ—

সীতা নাড়ে মুখ, বানরে নাড়ে মাথা,
কেবা বুঝিবে বল, নর-বানরের কথা!

বাস্তবরূপ প্রত্যক্ষ করতে পারতেন। আকারে ইঙ্গিতে নানাকথা বলে যখন আমি একটি চিঠির কাগজে রুশ হরফগুলি লিখে বুঝিয়ে দিলুম যে আমি ঐ ভাষা শিখতে চেষ্টা করছি, তখন তিনি তাঁর ব্যাগ খুলে ছোট ছেলেদের জন্য 'লেনিনের জীবনী' একখানি আমাকে উপহার দিলেন, সযত্নে লিখে "বন্ধু ডক্টর পালকে দিলুম, পনোমারোভা।" দূর দূরান্তরে অবস্থিত দুটি বৃহৎ দেশের দুজন ডাক্তার, জাতি, বেশ, ভাষা কিছুই এক নয়; তবু দুজনে সদ্যঃ বন্ধুত্বের ভাবাবেশে মসগুল, এমনি সময়ে কামরায় প্রবেশ করলেন চিরপরিচিত কক্ষোটারখানি গলায় জড়ানো অধ্যাপক সাহা! আমাকেই উঠে পরিচয় করিয়ে দিতেই হ'ল "ইনিই আপনার পেশেন্ট ডক্টর সাহা" আর "উনি, ডক্টর পনোমারোভা, আপনাকে দেখতে এসেছেন।" অধ্যাপক সাহা যদিও হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন তবুও তিনি অভ্যাগতাকে দেখে যে খুশী হন নি, তা স্পষ্টই বুঝতে পারলুম তার মুখ চোখের ভাব দেখে। ডাক্তারের নির্দেশে তাঁকে শুতে হ'ল নিজের বিছানায়, সার্ট ও গেঞ্জিকে গলার কাছে উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে। তারপর কয়েক মিনিট ধরে চললো বুকে আর পিঠে ঠোকাঠুকি, আর হাঁটুগুট দো অবস্থায় পেটে টেপাটিপি—সঙ্গে সঙ্গে বুকে ও পিঠের নানা জায়গায় স্টেথোস্কোপ বসিয়ে পরীক্ষা! দু এক জায়গায় বুকের শব্দ শুনতে শুনতে যন্ত্রটি নিজের কান হতে খুলে আমার কানে পরিয়ে আমাকেও সক্রিয় ভূমিকা নিতে বাধ্য করলেন সদ্যঃ বান্ধবী পনোমারোভা। তারপর ব্যাগ হতে কয়েকটি বড়ি বের করে প্রতি চার ঘন্টা অন্তর একটি করে খাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বিদায় নিলেন তিনি; আমাকে বড় সিঁড়ী পর্যন্ত গিয়ে তাঁকে এগিয়ে দিতে হ'ল সৌজন্যের খাতিরে! ঘরে ফিরে এসে শুনলুম অধ্যাপক সাহা বিড়বিড় করে বলছেন একেবারে প্রমীলার দেশ আর কি? কাল একজন, আজ আবার আর একজন মেয়ে ডাক্তার!" আগের দিন যে আর একজন মেয়ে ডাক্তার তাঁকে দেখতে এসেছিল, তা' জানতুম না—তাই তাঁর বিরক্তি অপনোদনের জন্য রহস্য করে বললুম মজা কি, দেশে গিয়ে বলতে পারবেন যে আপনাকে দেখতে অনেকগুলি লেডি ডাক্তার এসেছিল।" ওয়েটার তাঁর মধ্যাহ্ন ভোজনের খাদ্য ও সরঞ্জাম ঘরে নিয়ে এসেছিল; তাই হাসতে হাসতে তিনি খেতে বসলেন, আর আমি অন্যান্য ডেলিগেটদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য নীচের খাবার 'হল'-এ নেমে গেলুম।

বিকেলে অধ্যাপক সাহার সঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞান শাখার অধিবেশনে যোগ দিলুম। তিনি সেখানেই ইতালীর দেশ-ত্যাগী বিখ্যাত বিজ্ঞানী পন্টিকার্ভোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অধিবেশনের পরে সেখানেই চা পান করে অন্যান্য ডেলিগেটদের সঙ্গে "স্টেরোকিনে" চলচ্চিত্র দেখতে গেলুম এবং রাত্রি সাড়ে দশটায় হোটেলে ফিরে এলুম। নৈশ ভোজনের টেবিলে চীনদেশী ডেলিগেটে অধ্যাপক চ্যাউ্ ওয়াউ্ একখানি দৈনিক সংবাদপত্র আমার হাতে

দিয়ে, বৈদেশিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপমন্ত্রী অনিল চ
বেড়ায়ে ভারতীয় সাংস্কৃতিক সংযোগকারী দল কিভাবে
চীনদেশে বিপুল সম্বর্ধনা পেয়েছেন তাই অনুবাদ করে
শোনালেন ও তাদের ছবিও দেখালেন।

৫ই জুলাই, সম্মেলনের অধিবেশনের শেষ দিন।
ডাক্তার খানোলকর, শিবাসেবী ও কুমারী সুই-এর
একসঙ্গে দু'বেলাই জৈববিজ্ঞান শাখার অধিবেশনে যোগ
দেওয়া গেল। ঐ দিন সন্ধ্যা ছটায় মস্কোর বিখ্যাত
"বলশোই" থিয়েটার গৃহে "সোয়ান লেক" নামক বিখ্যাত
ব্যালে নৃত্য দেখতে গেলুম। আগে ঐ প্রেক্ষাগৃহের শুধু
নামই শুনেছিলুম। সম্মুখে অনেকগুলি ফোয়ারা সহ
একটি প্রকাণ্ড পার্ক, আর তারই একপাশে প্রশস্ত রাজপথ
পার হয়ে প্রসিদ্ধ "বলশোই" থিয়েটার-ভবন বড় বড়
থামযুক্ত; বাহির হতে দেখতে অনেকটা আমাদের
কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সিনেট হাউস'-এর মত গড়ন।
ভিতরে না ঢোকা পর্যন্ত তা যে এত বিরাট এবং জাঁক-
জমকপূর্ণ তা বোঝবার উপায় নেই। কয়েক শতাব্দী
পূর্বে তার নির্মাণ হয়েছিল জার-সাম্রাজ্যের বর্ধিষ্ণু অবস্থায়।
আজকাল চক্র আবর্তনে সে জারও নেই, সে অযোধ্যাও
নেই, অর্থাৎ জারও নেই আর জার সাম্রাজ্যও অতীতের
গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে গেছে; কিন্তু যে গুটি একটি ছিটে
ফোঁটা এখনো টিকে আছে, অতীতের সাক্ষীরূপে, তাদেই
অনেকটা ধারণা হয় যে তার জাঁকজমক ও বাহ্যাড়ম্বর
কতটা ছিল! এই "বলশোই" থিয়েটারই তারই একটি
জাজ্বল্যমান প্রমাণ। কী তার কারুকার্য, কী তার রূপসজ্জা,
কী তার দেওয়াল-ছাদের সৌন্দর্য, কী তার ঝাড়-লণ্ঠনের
বাহার! তার সুপ্রশস্ত মনোরম হলের চারদিকে থাকে
থাকে বহু উঁচু পর্যন্ত দর্শকের বসবার আসন, একসঙ্গে
হাজার-দশ লোকে বসে দেখার মত স্থান! যে কয়দিন
সেখানে ব্যালে নৃত্য দেখতে গেছি, কখনোও শূন্য কোন
আসন নজরে পড়েনি, সর্বদাই প্রাসাদকল্প ভবনটি কয়েক
হাজার দর্শকের সমাবেশে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে,
দেখতে পেয়েছি! ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছটায় অতি
মনোরম ঐক্যতানের সঙ্গে সঙ্গে যখন সামনের লাল
যবনিকা সরে গেল, তখন যেন কোন যাদুকরের যাদুদণ্ডের
প্রভাবে চোখের উপর এক স্বপ্নীয় পরীর রাজ্য ফুটে
উঠলো। প্রশস্ত হ্রদে জল থৈ থৈ করছে, আর তারই
ইষৎ ঢেউ খেলানো নীল জলে ভেসে বেড়াচ্ছে কয়েকশ'
রাজহাঁস; তার মধ্যে দুষ্ট যাদুকরের প্রভাবে রাজকন্যা
শ্বেতহংসী এবং যাদুকরের কন্যা কৃষ্ণহংসী। এক শুভদিনে
শুভক্ষণে এল রাজপুত্র শিকারের আশায়, তারপর তাকে
ঘিরে আরম্ভ হল দুই হংসীর প্রেমের যুদ্ধ! কয়েকশ'
তন্বী ও তরুণী ও প্রায় সমসংখ্যক সুদর্শন তরুণের কী
অপূর্ব সে দৃশ্য ব্যালে নৃত্য। কী অপূর্ব দৃশ্যপট, আলো-
আঁধারের খেলা, আর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি! যতক্ষণ
নাচ চলতে থাকে, স্থান, কাল, পাত্র সব ভুলে যেতে হয়,
আর যখন সাময়িক বিরামের পর্দা নেমে আসে চোখের
সামনে মনে হয় "দূর ছাই, এটা না পড়লেই ছিল ভাল।"
এমনি করে রাত বারোটায় যখন নৃত্য শেষ হ'ল এবং
শেষ যবনিকা পড়লো, তখন দশহাজার লোকের করতালি-
ধ্বনির সম্বর্ধনায় নৃত্যশিল্পীদের বার বার এসে পাদ-
প্রদীপের কাছে দাঁড়িয়ে সবিনয়ে অভিবাদন করে মুগ্ধ
অগণিত দর্শকের প্রশংসার জয়মাল্য মাথায় তুলে নিতে
হয়েছিল! আমার মনে হচ্ছিল ধন্য ঐ শিল্পীবৃন্দ, আর
আমরা, যারা প্রায় একটানা পাঁচঘণ্টা অনাবিল আনন্দ
উপভোগ করেছি, তারাও ধন্য!

৬ই তারিখ একটু বেলা করেই প্রাতরাশ শেষ করে
আমরা বেরিয়ে পড়লুম মস্কো হইতে দক্ষিণ-পূর্বে প্রায়
১১০ কিলোমিটার দূরবর্তী আনবিক-শক্তি গবেষণা কেন্দ্রের
পথে, পর পর খান-দশ মোটর গাড়ীতে। ক্রমে মস্কোর
উপকণ্ঠে শিল্প কেন্দ্রগুলি ছাড়িয়ে আমরা গিয়ে পড়লুম
নীচ-বাঁধানো খোলা মাঠের উপর দূরবিসর্পী পথে।
কোথাও বা সমবায় পদ্ধতিতে চাষের খামার, কোথাও
বা আলুর চাষ, কোথাও বা ছোটখাটো দু'একখানি
পাড়া গাঁ। মস্কোর নিকটবর্তী গাঁ গুলি উন্নত ধরণের,
ঘরবাড়ীগুলি পাকা এবং দেখতে সুন্দর, কিন্তু মস্কো হতে
যতই দূরে যাচ্ছি, ততই যেন রাজধানীর বিলাস ঐশ্বর্য্যের
ছাপ কমে আসছে, আর তার পরিবর্তে দৈন্য ও দারিদ্র্যের

ছাপ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠছে চোখের উপর! ছেলেমেয়েরা অনেক স্থলেই খালি পায়ে যৎকিঞ্চিৎ কাপড়-জামা গায়ে চলাফেরা করছে! আমাদের দেশেই মতই খড়ের ঘর এবং জল কাদাও যে দেখা যাচ্ছে না রাস্তার পাশে এমন নয়। কিন্তু রাস্তার দুপাশে প্রায় প্রতি ফার্লং দূরে দূরে আমাদের দেশের সিনেমা ঘরের সামনে যেমন বড় বড় বিজ্ঞাপন থাকে, তেমনি কোন না কোন গঠনমূলক বিষয়ে লোককে অবহিত করার জন্য বিরাট বিরাট পোষ্টার। কোথাও "আরও বেশী খাদ্যের ফসল ফলাও", কোথাও পুষ্টির জন্য এসকল খাদ্য খাও", কোথাও "শিশুরা জাতির সম্পদ", কোথাও "প্রসূতির স্বাস্থ্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখ," "দেশরক্ষার জন্য সৈন্যবিভাগে যোগ দাও," "সতর্কভাবে গাড়ী চালাও।" এমনি বড় বড় ছবি, আর তার সঙ্গে উপদেশ কিংবা সতর্ক বাণী।

ক্রমে পাকা রাস্তা ছেড়ে মাঠের উপর ধুলো, কাদা মাখা মেটে রাস্তায় পড়লুম, ঠিক যেন আমাদের দেশের পাড়া গাঁয়ের পথ। এমনি করে আমরা প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টায় এসে পৌঁছলুম আনবিক শক্তিকেন্দ্রের দ্বারদেশে। বড় ফটকে প্রহরারত সান্ত্রীর সামরিক কায়দায় অভিবাদন গ্রহণ করে আমরা গিয়ে যখন দোতলা আসল বাড়ীর কাছে গিয়ে পৌঁছলুম, তখন সেখানে আমাদের গ্রুপ ফটো নেওয়া হ'ল। সেপ্টেম্বর মাসের "সোভিয়েট ইউনিয়ন" পত্রিকায় ঐ গবেষণা কেন্দ্রের বিভিন্ন অংশের ছবিসহ ঐ ফটোখানিও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বাইর হতে দেখে প্রথমে আমরা হতাশ হলেও, বাইর হতে যতটুকু দেখা যায়, তার চেয়ে প্রায় দশগুণ বেশী অংশ মাটির নীচে অবস্থিত দেখে তার বিরাটত্ব সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করতে পেরেছিলুম। আমাদের মনে হচ্ছিল, এই কি লৌহ যবনিকার দেশ!

সেখানে যা কিছু দ্রষ্টব্য দেখিয়ে এবং আমাদের নানা প্রশ্নের যতদূর সম্ভব জবাব দিয়ে ওখানকার কর্তৃপক্ষ আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছিলেন নিঃসন্দেহ। কিন্তু কয়েকটি প্রশ্নের জবাব আমরা পাইনি; যেমন "এ স্থানটির নাম কি?" যখন জবাব পাওয়া গেল যে কোন নাম নেই, তখন অধ্যাপক সাহা বল্লেন 'তবে আমরাই নামকরণ করছি, অ্যাটম গ্রাড।" অ্যাটম বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সাহা কয়েকটি খুটিনাটি প্রশ্ন করাতে ওঁকে ক্রাসিন জবাব দিলেন "যন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা খুবই কম, কেবল ইঞ্জিনীয়াররাই তার সঠিক জবাব দিতে পারেন।" হয়ত বা তিনি ঠিকই জবাব দিয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছিল যে আসল জবাবটি ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেলেন তিনি।

তারপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল গবেষণাগার-সংলগ্ন ভোজনালয়ে; সেখানে ছিল বিরাট মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা! তার আগে আমাদের ভিজিটার্স বুক অভিমত লিখে নাম সই করতে বলা হ'ল। শেষ পৃষ্ঠা খুলতেই দেখা গেল ইংরেজীতে পরিচিত হস্তাক্ষরে অ্যাটম গবেষণা কেন্দ্র দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে, মাত্র কয়েক'দিন আগে সই করে গেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু। তারই নীচে চিঠিতে মুক্তোর মত হরফে অধ্যাপক সাহা "অ্যাটম গ্রাডকা পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র দেখকে বহুৎ হি খুশী হুয়া" লিখে রাষ্ট্র ভাষায় নাম সই করলেন "মেঘনাদ সাহা।" অগত্যা আমি আর কি করি? অতি কষ্টে প্রায় বিস্মৃতির গর্ভ হতে দেবনাগরী হরফ জ্ঞানকে কোনরকমে কলমের মুখে টেনে এনে আমিও তার নীচে নিজের নাম সই করে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষার মান রক্ষা করলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও। তারপর প্রায় পাঁচটা অবধি মধ্যাহ্ন ভোজ চালিয়ে, তাঁদের সৌজন্য ও আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা মস্কোর পথে বিদায় নিলুম। আমাদের গাড়ীতেই ছিলেন জাপানের ডেলিগেট ফুজিয়াকো, আকণ্ঠ ভড্‌কার প্লাবনে মসগুল হয়ে তার অবস্থা তখন কলহান্ত চপল বালকের মত; স্পষ্টই বুঝা গেল যে তিনি তখন এক অপার্থিব রঙীন নেশায় মশগুল! রাত্রিতে প্রায় নটায় হোটেলে ফিরে, একটু মুখ হাত-পা ধুয়ে ইরান, ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার ডেলিগেটএর ও একজন রাশিয়ান ভদ্রলোক সহ হাঁটতে বেরিয়ে পড়লুম মস্কোর রাস্তায়। খানিকটা পায়ে হেঁটে, খানিকটা ট্রিউব রেলওয়েতে চড়ে

গোর্কি স্কোয়ার, রিভোলিউশন, স্কোয়ার প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর মেট্রো স্টেশনে ঘুরে ঘুরে, অবশেষে লেনিনগ্রাড স্টেশনে এসে ট্যাক্সি করে ফিরে এলুম নিজেদের আস্তানায় রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায়। তারপর দীর্ঘসূত্রী নৈশভোজন ও স্নানান্তে ক্লান্ত দেহ শয্যায় প্রসারণ! তৎক্ষণে অধ্যাপক সাহা এক ঘুম শেষ করে শয্যার পাশ ফিরে জিজ্ঞেস করছেন "রাত কটা হ'ল।" সত্যি কথা বলতে হলে বলতে হ'ত "দুটো বাজে," কিন্তু তাঁকে আমার চক্ষু চিন্তার হাত হতে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য বললুম "না বেশী রাত হয়নি।"

৭ই জুলাই মাত্র ঘণ্টা-চার ঘুমিয়ে ভোরেই উঠে পড়তে হল, মুখ হাত ধুয়ে প্রাতরাশের জন্য। কারণ সেদিন যেতে হবে আরো দূরে অর্থাৎ মস্কো হতে প্রায় ১২০ কিলোমিটার উত্তরে মিউক্লিয়ার গবেষণা ইনষ্টিটিউট দেখতে! ঐ দিনের পথও অনেকটা আগের দিনের মতই, কিন্তু ভালবসতি বিরল। আটটায় রওয়ানা হয়ে প্রায় দশটায় গিয়ে পৌঁছলুম প্রসিদ্ধ মস্কো ভলগা ক্যানেলের নিকটে। আগে ভলগা নদীর সঙ্গে মস্কো নদীর কোন সংযোগ ছিল না, কয়েক বছর আগে খাল কেটে দুটি নদীকে চলাচলের সুবিধের জন্য একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। পাথরে বাঁধানো ক্যানেলের দুপাশের দৃশ্য ভারী সুন্দর। আমরা পথে গাড়ীকে দাঁড় করিয়ে, লাফিয়ে একটি নালা পার হয়ে, আগাছা ও বড় বড় ঘাসকে পায়ে দলিত করে গিয়ে পৌঁছলুম ক্যানেলের পাড়ে। সেদিন সঙ্গিনী ছিলেন Volks এর ডিরেক্ট্রেরোভানিয়া পেট্রোভস্কায়া আইনেলকি। ডেলিগেটদের সুবিধে-অসুবিধের দিকে তার সর্বদাই প্রখর দৃষ্টি, কিভাবে কাকে সাহায্য করবেন, কিসে কার স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করবেন, তারই জন্য সর্বদা সচেষ্ট! জঙ্গলের মধ্যে লাল লাল ছোট "স্ট্রবেরী" দেখতে পেয়ে কয়েকটি তুলে তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করলুম যে ওগুলি খাওয়া যায় কিনা, তখন পরিহাসের সুরে "খেয়ে দেখুন না" বলাতে আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে, আমার হাত হতে একসঙ্গে গুটি-কয় টেনে নিয়ে মুখে ফেলে বললেন "বিষাক্ত যদি হয় তবে ক্রুশ্চেভের মত আমিই আগে মরি, আপনি রোমিওর মত আমার অনুগমন করুন।" আমিও হাসতে হাসতে "তবে তাই হোক, একযাত্রায় আর পৃথক্ ফল কেন" বলে হাতে যে ক'টি বাকী ছিল, দিলুম একসঙ্গে মুখে পুরে। মিষ্টি মিষ্টি অথচ টক্ টক্, মন্দ লাগলো না খেতে। তাই দেখে অন্যান্য ডেলিগেটরাও অনেকে ঐগুলি মুখে পুরে চেখে দেখতে আরম্ভ করলেন।

আবার গাড়ীতে চড়ে প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় আমরা গিয়ে পৌঁছলুম ভলগা নদীতে, যেখান হতে ক্যানেলটি আরম্ভ হয়েছে। তারই দুপাশে সুউচ্চ বেদীর উপর অতিকায় দুটি পাথরের মূর্তি, একদিকে সোভিয়েটের প্রতিষ্ঠাতা লেনিন এবং অপরদিকে মহান্ ডিক্টেটার স্ট্যালিনের। আমরা কিছুক্ষণ ঐ বেদীর নীচে বাঁধানো সুপ্রশস্ত ঘাটে বসে, প্রাকৃতিক শোভা দেখে আবার রওয়ানা হয়ে প্রায় সাড়ে বারোটার সময়ে এসে পৌঁছলুম তরুছায়া সমাচ্ছন্ন, অনেকটা লোক চক্ষুর আড়ালে অবস্থিত, আমাদের সেদিনকার গন্তব্য স্থল, ইনষ্টিটিউটে। ইতালীয় বিজ্ঞানী পন্টিকার্ভো ও অন্যান্য গবেষকগণ অতি যত্ন সহকারে আমাদের পৃথিবীর ছ'মিটার ব্যাস-বিশিষ্ট সকলের চেয়ে বড় সাইক্লোট্রোন ও পারমাণবিক গবেষণার অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও ব্যবহার প্রভৃতি দেখালেন। সেদিন ঐ ইনষ্টিটিউটের ভোজন গৃহেই আমাদের রাজসিকভাবে মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করা হল। জৈব বিজ্ঞানীদের তরফ হতে টোষ্ট প্রস্তাবের ভার পড়লো আমার উপরে। হঠাৎ আমার খেয়াল হ'ল যে ডেলিগেটদের মধ্যে কেউ ত তার মাতৃভাষা ছাড়া অন্যভাষায় বক্তৃতা করছেন না, তবে আমিই বা কেন বাংলায় না বলে ইংরেজীতে বলবো? লুকিন আমার পাশেই ছিল, তাকে বললুম তুমি ত কোলকাতায় ছিলে, আমাদের ডাল-ভাতও অধ্যাপক মহলানবিশের ওখানে খেয়ে এসেছ। আজ তোমাকে বাংলার দোভাষীর কাজ করতে হবে।" লুকিন ত হতভম্ব, আমতা আমতা করে বললে "কিন্তু আমি ত বাংলার তর্জমা করতে পারবো না!" "আলবৎ পারবে" বলে ইংরেজীতে কয়েক লাইন একটি কাগজে

লিখে, তার হাতে দিয়ে বললুম "আমি বাংলাই বলব, তুমি এই দেখে রুশ ভাষায় তর্জমা করে দিও!" আমার যখন পালা এল, তখন বাংলায় বক্তৃতা আরম্ভ করতেই আমার তিনজন স্বদেশবাসী, অর্থাৎ অধ্যাপক সাহা, ডাক্তার খানোলকর ও জগদীশ শঙ্কর ত একেবারে হতভম্ব! আমি পারমাণবিক শক্তি-সম্মেলনে উপস্থিত পুরুষ বিজ্ঞানীদের স্ত্রী ও মহিলা বিজ্ঞানীদের স্বামীর স্বাস্থ্য কামনা করে টোস্ট্ প্রস্তাব করলে, লুকিন অবলীলা-ক্রমে হাতের স্লিপ দেখে তাকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করে দিলে দেখে সকলে, আর বিশেষতঃ অন্যান্য সোভাষীরা অবাক্ হয়ে গেল। "লুকিন আবার বাংলাও জানে নাকি?" অধ্যাপক সাহা পর্যন্ত ফিস্ ফিস্ করে বাংলাতে প্রশ্ন করে বসলেন। আমি হাসিমুখে বললুম, "কোলকাতায় বাঙালীর বাড়ীতে ছিল, জানে বৈকি?"

সেদিন প্রায় পাঁচটায় মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে পারস্পরিক ধন্যবাদের পালা শেষ করে আবার আমরা মস্কোর পথ ধরলুম। পথে খানিকক্ষণ গাড়ী দাঁড় করিয়ে "মস্কো সাগর" দেখে আসা গেল! এটি একটি কৃত্রিম হ্রদ কিন্তু সাগরেরই মত দিক্‌হীন, অন্তহীন এবং সময়ে সময়ে সমুদ্র সৈকতে যেমন তরঙ্গমালা বার বার এসে আছড়ে পড়ে, এর মধ্যেও নাকি সেরকম উদ্দামতাও কখনো কখনো দেখা যায়, সেজন্যই এর নামকরণ হয়েছে "মস্কো সাগর।" রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটায় হোটেলে ফিরে এসে গরম জলে কিছুক্ষণ ধরে খুব আরাম করে স্নান করা গেল। শরীরে যেন ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল, তাই যথানিয়মে আহার-পর্ব শেষ করে, একেবারে ক্লান্ত দেহকে শয্যায় এলিয়ে দেওয়া গেল, আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসী সবাই এসে একসঙ্গে চোখের উপর চেপে বসলেন। (ক্রমশঃ)

বিফলতার মর্য্যাদা　　**—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু**

"প্রথমে যাঁহারা কোনও নূতন প্রথা প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা পদে পদে বাধা পাইয়াছেন। কোন চেষ্টাই একেবারে বিফল হয় না। আজ যাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে হয়, দুদিন পরে তাহা হইতেই মহৎ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাঁহারা ভীরু তাঁহারাই ব্যর্থ সাধনা ও মৃত্যুভয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। আমাদের এই বাহুই বিশ্বকর্মার আয়ুধ। সৃজন করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান।....সত্যের সম্যক প্রতিষ্ঠা প্রতিকূলতার সাহায্যেই হয়, আনুকূল্যের প্রশ্রয়ে সত্যের দুর্বলতা ঘটে। যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফল নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন।....আরাধ্যা দেবীর প্রকৃত পূজার উপকরণ ভক্তের বাহুবলে, অন্তরের শক্তিতে এবং হৃদয়ের ভক্তিতে। মানুষের প্রকৃত পরীক্ষা একদিনে হয় না, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাকে আশা-নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইতে হয়। আমার জীবনে যদি কোনও সফলতা দেখিয়া থাকেন তবে জানিবেন তাহা সর্বদা নিজেকে আঘাত করিয়া জাগ্রত রাখিবার ফলে, নিষ্ফলতার স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঘোরতর নিরাশার মধ্যেও আমি পরাভব স্বীকার করি নাই। আমি অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষে কেবলমাত্র বিশ্বাসের বলেই চিরজীবন চলিয়াছি। হইতে পারে না বলিয়া কোনদিন পরাঙ্মুখ হই নাই।"

ল্যাক্সনেস ; আইস্‌ল্যাণ্ডীয় সাহিত্য

আনন্দ দাশগুপ্ত

কোনো দেশের বিশিষ্ট লেখকের সাহিত্যকর্মের পরিপূর্ণ স্বাদ গ্রহণ ও উপলব্ধি করতে হ'লে, সেই দেশের ঐতিহ্য, সেই দেশের সাহিত্যের ধারা ও সেই দেশের অধিবাসীদের বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। ল্যাক্সনেস তাঁর উপন্যাসে সেইসব নরনারীর কথা বলেছেন যাঁরা বিশেষ করে আইস্‌ল্যাণ্ডের মৃত্তিকার রস গ্রহণ করে সেই দেশের আবহমানকাল প্রবাহিত রীতি, নীতি ও ঐতিহ্যের ভিতর পুষ্ট হয়েছেন। সুতরাং ল্যাক্সনেসের জীবন ও তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে কিছু বলবার পূর্বে আইস্‌ল্যাণ্ডীয় সাহিত্য এবং সেই দেশের নরনারীর (বিশেষ করে কৃষক-মেষপালকদের) জীবনযাত্রা সম্বন্ধে দু'একটা কথা বললে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আইসল্যাণ্ডীয় সাহিত্যে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত একটি বিশেষ ভাবধারা অব্যাহত রয়েছে। এড্‌ডা ও সাগা আইস্‌ল্যাণ্ডের প্রধান সাহিত্য। এড্‌ডা কাব্য লিখিত হয়েছিল ৮০০ থেকে ১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আর সাগা রচিত হয়েছে ১৩ শতকে। আইস্‌ল্যাণ্ডে খৃষ্টধর্ম প্রচারিত হয়েছিল ১০০০ খৃষ্টাব্দে। খৃষ্টধর্ম প্রচারিত হবার পূর্বে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে লিখিত ও সেই সব সামন্ত যাঁরা ৮৭০ খৃষ্টাব্দের পরে আইস্‌ল্যাণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন তাঁদের বীরত্ব কাহিনী, এড্‌ডা কাব্যের বিষয়বস্তু। স্ক্যাণ্ডেনেভীয় যে সব ভাইকিং আইস্‌ল্যাণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, তাঁরাও কিছু কিছু পুরোণো যা সংগ্রহ করে এনেছিলেন, তাও এড্‌ডার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পরবর্তীকালের এড্‌ডা কাব্য সামন্তদের দ্বারা রচিত। সাগা লিখিত হয় বীরের জীবন কাহিনী নিয়ে। সাগা এপিকধর্মী। সাগা ঐতিহাসিক ঘটনা, পৌরাণিক কাহিনী, সামন্তদের বংশ পরম্পরার কাহিনী এবং পরের যুগে রোমান্টিক কল্পিত কাহিনী নিয়েও রচিত হয়েছে। প্রথমযুগে যে সব স্ক্যাণ্ডেনেভীয় সামন্ত আইস্‌ল্যাণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, তাঁদের গৌরবময় জীবন কাহিনী অবলম্বনে অনেক সাগা রচিত হয়েছে। যে নর্সভাষা ব্যবহার করা হ'ত প্রথমযুগে উপনিবেশ স্থাপন করবার সময়, সেই ভাষার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই আজও আইস্‌ল্যাণ্ডের ১,৩০,০০০ ও উত্তর আমেরিকার ক্ষুদ্র সংখ্যক বাসিন্দার কথ্য ও লিখিত ভাষা সেই প্রায়-অবিকৃত নর্সভাষা—ইস্‌লেন্‌স্‌কা। সেই দেশের সাধারণ ব্যক্তি আধুনিকযুগে লিখিত খবরের কাগজের মতই অনায়াসে এড্‌ডা ও সাগা পাঠ করেন। সাগা ও এড্‌ডায়-বর্ণিত পূর্বপুরুষদের শৌর্য ও বীর্যের কাহিনী আইস্‌ল্যাণ্ডবাসীর যে রকম গৌরব ও প্রচার বস্তু ছিল, এখনও তাই আছে। বহু বৎসরের খৃষ্টধর্মের শিক্ষা ও ফরাসী ও রোমান্টিক সাহিত্য সেই মনোভাবকে পরিবর্তিত অথবা পরাজিত করতে সমর্থ হয়নি। ১৮৩০ এবং তার পরবর্তী কয়েক বৎসর আইসল্যাণ্ডীয় সাহিত্যক্ষেত্রে যে রোমান্টিক আন্দোলন উপস্থিত হয়, তার ফলশ্রুতি হিসেবে এড্‌ডা ও সাগা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা পুনরুদ্দীপ্ত হয়। এই আন্দোলনের দুইটি উদ্দেশ্য ছিল : প্রথমতঃ আইসল্যাণ্ডীয় সাহিত্যের স্বর্ণযুগের প্রতি অনুরাগ আকর্ষণ ও দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন ও ক্রমে ক্রমে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন। এই দুইটি ভাবাবেগ এখনও আইসল্যাণ্ডীয় সাহিত্যের প্রেরণা যোগাচ্ছে, যদিও ১৯১৮ সনে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আন্দোলনের প্রয়োজন আর নেই।

আইসল্যাণ্ডের আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে হ্যাগালিন, গুণ্ণ্বুড্‌সন্‌ ও ল্যাক্সনেসের নামই বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। এই তিনজন লেখক একই সময়-পুরুষের আশ্রয়ে লালিত হলেও হৃদয়ঙ্গম ও রসাস্বাদ করবার শক্তিতে অনেকখানি পৃথক। প্রথম দুইজন লেখক উপন্যাস রচনার নূতন কোনো ধারা প্রবর্তন করেন নি—পুরাতন পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন। হ্যাগালিন জাহাজের মাল্লা ও মৎস্যজীবীদের নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন। গুণ্ডড্‌সন্ নরওয়েজীয় ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি আখ্যান-বহুল রোমান্টিক উপন্যাস লিখতে সিদ্ধ হস্ত। এঁদের মধ্যে ল্যাগ্রনেসই সবচেয়ে প্রতিভাশালী লেখক। তাঁর উপন্যাস সাগার মতই এপিকধর্মী। কিন্তু বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীতে সাগা থেকে অনেকখানি পৃথক। আইসল্যাণ্ডীয় লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম আধুনিক—অর্থাৎ এ যুগের বিশেষ কতকগুলো লক্ষণযুক্ত—উপন্যাস রচনা করেছেন। উপন্যাস রচনায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁর একমাত্র বৈশিষ্ট নয়, তাঁর হাতে ইসলেনস্‌কা ভাষা অত্যন্ত সম্পদশালী হয়ে উঠেছে।

হালডোরের জন্ম হয় ১৯০২ সালে রেক্‌জাভিকের নিকটবর্তী তাঁর পিতার আবাসভূমি ল্যাগ্রনেসে। তাঁর পিতা সম্পন্ন মেষপালক। বাল্যকালে তিনি ল্যাগ্রনেসেই কাটিয়েছেন। ল্যাগ্রনেস শব্দটীর অর্থ স্নামন-উপদ্বীপ। লেখক হিসেবে তিনি 'ল্যাগ্রনেস' এই ছদ্মনামেই পরিচিত। বাল্যকালেই আইসল্যাণ্ডীয় এড্‌ডা ও সাগার সঙ্গে পরিচয় হয় পিতার আবৃত্তি শুনে। ল্যাগ্রনেসের লাইব্রেরীতে ৪০টী গ্রন্থ ছিল—তার মধ্যে অধিকাংশই এপিক। এই সমস্ত গ্রন্থই তিনি বাল্যকালে পাঠ করেছিলেন। ভবিষ্যতে সুরশিল্পী হবেন, এই সময়ে তাঁর এইরূপ বাসনা হয়েছিল। পিতার নিকট ভায়োলিনের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। পিয়ানো বাজানোর পাঠ গ্রহণ করেছিলেন রেক্‌জাভিকে অধ্যয়নকালে। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে হালডোর কবিতা রচনা করতেন—পিতার লাইব্রেরীতে যেসব কাব্য পাঠ করেছিলেন তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে। লাটিন স্কুলে অধ্যয়নকালে রোমান্টিক গল্প রচনা করতেন। তাঁর এই প্রথম-জাতক সব রচনা অত্যন্ত সঙ্গোপনে রাখতেন, কাউকেও জানতে দিতেন না তাঁর এই সাহিত্য সাধনা। যখন তাঁর বয়স ১৭ বৎসর, তখন তাঁর প্রথম গল্প 'The Child of Nature' প্রকাশিত হয়। বিদ্যবিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি নানা দেশ পর্যটন করেন। ডেনমার্কে অবস্থানকালে কোপেনহেগেনের একটি পত্রিকার জন্য গল্প রচনা করতেন। এর পর আইসল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করে কিছুদিন স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করেছিলেন। তিনি একাধারে কথাসাহিত্যিক, কবি ও নাটকার। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ত্রিশেরও অধিক। এছাড়া তাঁর লিখিত অনেক প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা নানা পত্র পত্রিকার ছড়িয়ে আছে। এ যুগের আইসল্যাণ্ডীয় লেখকদের মধ্যে তিনিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এবিষয়ে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পূর্বেও কখন কোনো মতভেদ ছিল না। রেক্‌জাভিকের সেইসব প্রগতিশীল যুবক যাঁরা সম্ভাবনাময় যুদ্ধোত্তর যুগে কৃষি-প্রধান সভ্যতা ও কৃষ্টি থেকে ভিন্ন অন্য এক উন্নততর জীবন ও কৃষ্টিলাভের স্বপ্ন দেখেন ও তদনুরূপ সাধনা করেন, ল্যাগ্রনেসকে তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করা চলে। রোমান্টিক লেখকদের উচ্ছ্বাসময় লেখার বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম অভিযান করেন। তিনি যে আত্মজীবনী লিখেছেন তাতে সাগা সাহিত্য ও মনস্তত্ত্বমূলক কথা-সাহিত্য, সাহিত্যের এই দুই বিভিন্ন স্রোতের সামঞ্জস্যপূর্ণ অপূর্ব সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর রচনায়ই আইসল্যাণ্ডীয় সাহিত্য ও আইসল্যাণ্ডীয় ভাষার আশু পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। সেই সূচনাকে আপনার অসামান্য প্রতিভা দিয়ে আশ্চর্যভাবে সার্থকতায় পরিণত করতে সমর্থ হয়েছেন ল্যাগ্রনেস। ১৯২৭ সাল থেকে—ল্যাগ্রনেসের বয়স যখন ২৫—তাঁকে কেন্দ্র করে আইসল্যাণ্ডীয় সাহিত্যে নানা আন্দোলন সুরু হয়। তাঁর প্রত্যেকটি পুস্তক প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই নানারকম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়—অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনা, তুমুল তর্কবিতর্ক ইত্যাদি। রিভিউয়ল সাহিত্যিকদের অভিযোগ যে তিনি ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের প্রকাশ-ভঙ্গী ও দৃষ্টিভঙ্গী আমদানি করে আবহমান কাল থেকে প্রচলিত ইসলেনস্‌কা ভাষা ও সাহিত্যকে দূষিত করেছেন।

আইসল্যাণ্ডীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে যে রোমান্টিক আন্দোলন

এসেছিল. ল্যাক্সনেস প্রথম জীবনে তার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কিন্তু তার পরে অন্তর্দর্শনে নিমগ্ন হয়ে ধর্ম ও দর্শনতত্ত্ব অনুসন্ধানে অভিনিবিষ্ট হন। যৌবনে এই অন্তর্দর্শনের তাগিদে ল্যাক্সনেস বহুদেশ পর্যটন করেছেন। জার্মানীতে গিয়েছিলেন একসপ্রেসনিজম্ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার জন্য। নিজের অশান্ত হৃদয়কে ধ্যানমগ্ন করবার জন্য লাক্সেমবার্গের এক ক্যাথলিক মঠে কাটিয়েছিলেন কিছুদিন। সুরবিয়ালিজম্ তত্ত্বে দীক্ষালাভ করবার জন্য ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত ছিলেন ফরাসী দেশে। ১৯২৭ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত কম্যুনিজমের মূল নীতি সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ-এর জন্য কানাডা ও কালিফোর্ণিয়াতে ছিলেন। সোভিয়েট দেশেও গিয়েছেন অনেকবার। তিনি বহুভাষাবিদ্ ও বিশ্বসাহিত্যের এমন কোনো অধ্যায় নেই যার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় নেই। তাঁর পুস্তক কখনও লিখিত হয়েছে আইসল্যাণ্ডে কখনও অন্য অন্য দেশে যেখানে তিনি সাময়িকভাবে বাস করেছেন। ক্যাথলিক মঠে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তা লিপিবদ্ধ করেছেন 'Under the Holy Mountain (১৯২৪) ও 'The Great Weaver of the Kashmir' এই দুইটি উপন্যাসে। সিসিলিতে অবস্থানকালে শেষোক্ত উপন্যাসটি রচনা করেছেন। এই উপন্যাসটি আইসল্যাণ্ডীয় কথাসাহিত্যে এক নবযুগের প্রবর্তন করে। এই গ্রন্থের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীই যে শুধু পূর্ব-লিখিত আইসল্যাণ্ডীয় কথাসাহিত্য থেকে পৃথক তা নয়, আখ্যানকে শিল্পে রূপায়িত করতে হ'লে যে সংবেদনশীল, সাবলীল ও শক্তিশালী ভাষার প্রয়োজন, তেমনতর ইসলেনস্কা ভাষা গঠিত হয়ে উঠেছে এই প্রতিভাশালী শিল্পীর হাতে। উপন্যাসটি আত্মজীবনীমূলক। এই সময়ে তাঁর অশান্ত হৃদয়ে যে সংগ্রাম চলছিল, এই উপন্যাসে তা প্রতিফলিত হয়েছে।

তিনি আইসল্যাণ্ডের সমুদ্র উপকূলস্থ বিভিন্ন ধীবর পল্লীতে এবং আইসল্যাণ্ডের পার্বত্য প্রদেশে দীর্ঘকাল পর্যটন করে দরিদ্র ধীবর ও মেষপালকদের জীবন যাত্রার সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। তাঁর পরবর্তীকালের উপন্যাসে—'Independent People' ইত্যাদিতে এর পরিচয় পাওয়া যায়। কানাডায় অবস্থানকালে আইসল্যাণ্ডের যে সব অধিবাসীরা মেনিটোবায় এসে বসতি করেছেন, তাঁদের ক্লেশকর জীবনযাত্রার সম্বন্ধে একটি গল্প লিখেছিলেন। গল্পটি উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং ল্যাক্সনেসকে কানাডা থেকে নির্বাসিত করবার জন্য আন্দোলন হয়। কালিফোর্ণিয়ায় আপ্টন সিনক্লেয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। আল্‌থিং'র সহস্রবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে ১৯৩০ সনে ল্যাক্সনেস আইসল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই বৎসর প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধ পুস্তকে (The Book of the People) নিজের মতবাদ প্রচার করেন। ঐ একই বৎসর আধুনিক লিরিক কাব্য সম্বলিত একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় (The Poems)। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বৈশিষ্টপূর্ণ শিল্পকর্ম তাঁর বহু-প্রচারিত তিনটি উপন্যাসে গ্রথিত হয়েছে। প্রথমটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩১, দ্বিতীয়টি ১৯৩২ সনে। এই দুইটি পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ করা হয়েছে 'Salka Valka'তে (১৯৩৬)। অনুবাদক উপন্যাসের অধিকারিণী অন্তর্বলশালিনী নায়িকার নামানুসারে এই গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে। একটি ক্ষুদ্র গ্রামের মৎস্য জীবীদের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। 'Independent People' এই পর্যায়ের ইংরাজীতে অনূদিত দ্বিতীয় গ্রন্থ। দরিদ্র মেষপালকের কাহিনী বিবৃত হয়েছে এই গ্রন্থে। তৃতীয় গ্রন্থ 'Light of the World', জনগণের কবির কাহিনী। চিত্র অঙ্কিত হয়েছে বিস্তৃত পটভূমিকার সাহায্যে। আইসল্যাণ্ডের গত সহস্র বৎসরের দুঃখ, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার ইতিহাস একটি চরিত্রের ভিতর দিয়ে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। দরিদ্র কিন্তু অক্লান্ত কর্মনিরতা ধীবর কন্যা ও স্বাধীন মেষপালক, তাদের স্ব স্ব শ্রেণীর যারা প্রতীক, যাদের শুধু বেঁচে থাকবার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে, দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে আজীবন সংগ্রামে নিযুক্ত থাকতে হয়, এই সব উপন্যাসে তাদের চরিত্র বিরাট মাহাত্ম্যপূর্ণ ও মাধুর্যময় রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। তৃতীয় উপন্যাসের কবি অন্যের কৃত অপরাধের ফলভোগী, এই নিষ্ঠুর জগতে আপনার ন্যায্য অধিকার লাভে অসমর্থ। তার চরিত্রও আপনার

মহিমায় ভাস্বর। কবি সেই সব নিবেদিত আত্মার প্রতীক যারা এই ধূলিময় পৃথিবীতে বারম্বার দেখা দেন বিশ্বের সৌন্দর্যের বার্তা বহন করে।

ল্যাক্সনেসের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস 'Independent People'এর মূল ঘটনাগুলি নিম্নে প্রদত্ত হল :— বিওরতার দীর্ঘ ১৮ বৎসর বেইলিফ জনের অধীনে মজুরের কাজ করে বন্ধকী-খত দিয়ে একখণ্ড ভূমি অধিকার করতে সমর্থ হ'ল। তৃণকুটীর সম্বলিত জমিটির নাম ছিল 'উইস্টারহাউস'। মজুরের থেকে স্বাধীন জোতদারের মর্য্যাদা লাভ করে, বিওরতার তাঁর সম্পত্তির নূতন নামকরণ করল 'সামারহাউস'। এই অনুর্ব্বর ভূমিখণ্ড শুধু মেষচারণ হিসেবেই ব্যবহারযোগ্য। যে কুটীরটি ছিল তাতে নীচে পশুশালা আর তার উপরে একটি মাত্র কক্ষ। ঘরের দেওয়াল ঘাসের মূলবিশিষ্ট মৃত্তিকার চাপড়া দিয়ে তৈরী আর টিনের ছাদও ঘাসদ্বারা আচ্ছাদিত। বিওরতার গৃহসংস্কার করে নিল। হতে পারে তাঁর গৃহ দরিদ্রের কুটীর, তাঁর জমি অনুর্ব্বর কিন্তু বিওরতার আজ স্বাধীন ভূস্বামী। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল আর কারও অধীনে জনমজুর সে কদাপি হবে না। মেষপালন করেই স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করবে। বেইলিফের ২৬ বৎসর বয়স্কা শারীরিক শক্তিসম্পন্না পরিচারিকার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে তাকে নিজ কুটীরে নিয়ে আসল। মেয়েটির একটি চোখ ঈষৎ টেরা। অন্যদেশের মত আইসল্যাণ্ডের কৃষক-মেষপালকদের মধ্যে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত আছে। ঐ পরগণার লোকরা বিশ্বাস করত যে সামারহাউস একজন ডাইনীদ্বারা অভিশপ্ত। ওখানে যারা বাস করবে, কখনই তাদের মঙ্গল হতে পারে না। তবে ডাইনীর গোরস্থানের পাশ দিয়ে হেঁটে আসবার সময় তার উদ্দেশ্যে যদি একটি পাথর ছুড়ে আসা যায়, তবে অমঙ্গল নাও হতে পারে। সুতরাং সামারহাউসে আসবার পূর্বে রোজা ও বিওরতার যখন সেই পথ দিয়ে আসছিল, তখন রোজা তাঁর পূর্ব-সংস্কার অনুযায়ী ডাইনীর উদ্দেশ্যে পাথর ছুড়তে চাইল। কিন্তু বিওরতার প্রস্তর নিক্ষেপ করতে দিতে অসম্মত হ'ল কারণ তাতে ডাইনীকে অবথা সম্মান প্রদর্শন করা হয়। সে স্বাধীন ভূস্বামী, সে কাউকে পরোয়া করে না। কিন্তু গৃহের মঙ্গলের জন্য সামাজিক বিধি অনুসারে কার্য করতে বাধ্যপ্রাপ্ত হয়ে রোজার চিত্ত বিষণ্ণ হ'ল। ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় কাতর হ'ল। বিওরতার ভেবেছিল রোজা অধীন অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে আনন্দিতা হবে। কিন্তু রোজা বিওরতারের এক কক্ষ-বিশিষ্ট কুটীর দেখে কোনো উৎসাহ অথবা আনন্দ প্রকাশ করল না। রোজার অনুৎসাহ দেখে বিওরতারের আশাভঙ্গ হ'ল তার স্ত্রী কি স্বাধীনতার মর্যাদা উপলব্ধি করতে অসমর্থ এই কথা চিন্তা করে। আশাভঙ্গের অন্য কারণও ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই রোজার ব্যবহারে বুঝতে পারল যে রোজা অকলঙ্ক নয়। কে রোজাকে কলঙ্কিত করেছে, তাও সহজেই ধারণা করে নিতে পারল।

এক তীক্ষ্ণ শীতের দিনে বিওরতার তার একটি হারানো মেষশাবকের সন্ধান করতে করতে গৃহ থেকে বহুদূরে চলে গেল। একটি বল্গা হরিণের পশ্চাদ্ধাবন করে পার্ব্বত্য নদীর অপর তীরে উপস্থিত হ'ল। বল্গা হরিণকে ধরা সম্ভব হ'ল না। তুষারপাত সুরু হ'ল দিবারাত্র প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে তিন চারদিন পরে যখন সে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করল, তখন দেখল একটি কন্যা প্রসব করে তার স্ত্রী মৃত। কন্যাটি কিন্তু জীবিত। বিওরতারের কুকুরটি তার উষ্ণ দেহের স্পর্শ দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মেয়েটির পিতা সে নিজে নয়, অন্য ব্যক্তি, একথা অগ্রাহ্য করে কন্যালাভের গর্ব্বে মেয়েটির নামকরণ করল, 'আস্তা সোলিলজা'। পাদ্রী গুড্‌মুণ্ডারকে যখন রোজাকে সমাধিস্থ করবার সময় মৃতার আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করবার জন্য বিওরতার অনুরোধ করতে গিয়েছিল, তখনই তিনি তার দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাব করেন। স্থির হয় ৪০ বৎসর বয়স্কা ফিনাকে বিওরতার বিবাহ করবে এবং স্ত্রীর বৃদ্ধামাতার ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। ফিনার বয়স চল্লিশ হ'লেও, তার দেহের বাঁধ বেশ শক্ত, সে বেশ কর্মনিপুণা।

কয়েক বৎসর পরের কথা। আস্তা ছাড়াও বিওর-

তাদের তিনটি পুত্রসন্তান হয়েছে—হেল্‌গী, গরেভুর ও নোনী। সেই একই কক্ষে বিওরতারের সাতটি প্রাণী বাস করে। রন্ধনের ব্যবস্থাও ঐ এক কক্ষে। সুতরাং কক্ষটি অত্যন্ত অপরিষ্কার, শয্যাদ্রব্য ছিন্ন ও অপরিচ্ছন্ন—তা ছাড়া শয্যা ছারপোকার ডিপো। কিন্তু এতদিনে বিওরতার জলমুক্ত হয়েছে। জমির পূর্ণ স্বত্ব লাভ করেছে।

আইসল্যাণ্ডের দক্ষিণদিকের এক অধিবাসী বিওরতারের অনুমতি নিয়ে তার জমিতে তাঁবু ফেলে কিছুদিন এসে বাস করে। সামারহাউসে এসে একদিন আস্তা সেলিল-ডাকে শিকার করা কয়েকটা পাখী ও মাছ উপহার দিয়ে যায়। প্রতিদান হিসেবে আস্তা ও নোনী একদিন তার তাবুতে গিয়ে তাকে শুভ দিয়ে আসে। সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে তাদের আলাপ হয়। আস্তার কুমারী হৃদয়ে প্রথম প্রেম অঙ্কুরিত হয়। আস্তা জানালা দিয়ে রোজই লক্ষ্য করে সন্ধ্যার পর ভদ্রলোকটি তাঁবু ছেড়ে কোথায় চলে যান। কিছুদিন পরে বেইলিফ কন্যা যখন হঠাৎ একদিন আইসল্যাণ্ড ছেড়ে চলে যায়, তখন ঐ প্রাত্যহিক বৈশ অভিযানের অর্থ সুস্পষ্ট হয়।

বহু সন্তান প্রসব করে এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যের অভাবে ফিনার শরীর ভেঙ্গে যায় ও কিছুদিন পরে তার মৃত্যু হয়। ফিনার মৃত্যুর পর প্রায় সমস্ত গৃহকর্মই আস্তাকে করতে হয়। বিওরতার ও আস্তার মধ্যে প্রীতির বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। তাকে স্কুলে পাঠাতে অসম্মত হলেও আইস্‌-ল্যাণ্ডীয় কাব্যগাথা আবৃত্তি করে শিখিয়ে দেয়। এখানে বলা হয়তো প্রয়োজন, বিওরতার নিজেও কবি, মুখে মুখে কাব্য রচনা করে।

বৎসরের মধ্যে একবার বিওরতার সহরে যেত চিনি, গুট, কফি ইত্যাদি ক্রয় করতে। এবার সে আস্তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেল। তাকে আইসল্যাণ্ডীয় কাব্যপুস্তক কিনে দিল। রাত্রি যাপন করার জন্য একটি সাধারণ হোটেলে আশ্রয় নিল। যে উৎসাহ যে আনন্দ নিয়ে সহরে যাত্রা করেছিল সমস্তদিন সহরবাসের পর সে উৎসাহ, সে আনন্দ নিঃশেষিত হয়েছে। সহর-বাসীরা এই গ্রাম্যকন্যার জীর্ণ পোষাক দেখে হাস্য সম্বরণ করতে পারে নি। হোটেলের মেষপালকেরা তাদের ক্ষুধিত হিংস্র চক্ষু দিয়ে তাকে নিরন্তর পীড়িত করেছে। অতিরিক্ত মদ্যপানে প্রায় মাতাল হয়ে নাসিকা গর্জন করে তারা ঘুমোচ্ছে। সেই বর্ষার রাত্রিতেই বিওরতার ও আস্তা সহর ছেড়ে গৃহাভিমুখে চলে।

এর পর নানা রকম দুর্ঘটনা হয়। রহস্যজনক ভাবে বিওরতারের অনেক ভেড়ার মৃত্যু হয়। পাড়াপড়শীদের মতে এ সেই ডাইনীর কীর্তি। কিন্তু বিওরতার ডাইনীর শক্তিকে বিশ্বাস করে না। সুতরাং আইসল্যাণ্ডবাসীরা অশুভমোচনের জন্য যে সব অনুষ্ঠান করে তাতে যোগ দিতে সে অরাজী। যারা এই অনুষ্ঠান করবার জন্য তার গৃহে সমবেত হয়েছিল, তাদের সে চলে যেতে বলে। এই রাত্রিতেই হেল্‌গী গৃহ ছেড়ে চলে যায়, অনেক অনুসন্ধান করেও তাকে আর পাওয়া যায় না।

বিওরতারের ভেড়ার সংখ্যা এত কমে যায় যে সে কাজের সন্ধানে সহরে যেতে বাধ্য হয়। সন্তানদের শিক্ষার বিষয়ে তার কর্তব্য স্মরণ করে সে শীতকালে সহর থেকে একজন শিক্ষককে তার গৃহে প্রেরণ করে। অনেক ছবির বই, অনেক কবিতার বই ও দেশবিদেশের ইতিহাসের কাহিনী নিয়ে শিক্ষকটি একদিন ঘোড়ায় চড়ে সামারহাউসে উপস্থিত হয়ে আস্তা, গরেভুর ও নোনীকে চমৎকৃত করে দেয়। কিছুদিন পরে তার জ্বর হয়ে সে অসুস্থ, এখানে ওষুধ পাওয়া যায়না তাকে সহরে ফিরে যেতে হবে। অসুস্থতার ভান করে আস্তার করুণালাভ করে। ওষুধের নাম করে সহর থেকে মদ আনিয়ে এক গভীর রাত্রিতে পান করে এবং আস্তাকে তার শয্যার পাশে ডেকে নিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে। শীতের শেষে যখন বিওরতার সহর থেকে ফিরে আসল, দেখল আস্তা সন্তান-সম্ভবা। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সে আস্তাকে গৃহ থেকে বহিষ্কৃত করে দেয়। আস্তার হৃদয় তখন রোমান্টিক স্বপ্নে পূর্ণ। বিনা প্রতিবাদে সে গৃহ থেকে চলে গেল এই আশায় যে সে প্রিয়ের সন্ধানে চলেছে, প্রিয়ের সঙ্গে তার মিলন হবে। শিক্ষক-বর্ণিত তার আধুনিক বাড়ীর সন্ধানে সহর পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে আবিষ্কার করল যে শিক্ষকটি একটি ভণ্ড—

কুটীরে বাস করে. সে অনেকদিন থেকে বিবাহিত, বহু সন্তানের জনক ও তার স্ত্রী পুনর্বার অন্তঃসত্ত্বা।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে বোনী আমেরিকায় তার পিতৃব্যের নিকট চলে যায়। শুধু বিওরতারের দুইটি ছেলে ও তার বাপড়ী রইল সামারহাউসে। যুদ্ধের সময় ভেড়ার দামের অনেকগুণ বৃদ্ধি হয় ও বিওরতারের কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়। তার সম্পত্তিও বৃদ্ধিলাভ করে—পশুশালায় তখন দুটি গরু ও তিনটি ঘোড়া। এই সময়ে বেইলিফের পুত্র ইজোলফারের উদ্যোগে একটি সমবায়-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ইজোলফার সর্বত্র প্রচার করে যে ব্যবসায়ীদের লোহনীতিকে সংযত করবার জন্য এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই যৌথ প্রতিষ্ঠানের যা লাভ হবে, তা এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত সভ্যেরই প্রাপ্য হবে। বিওরতার বহুদিন পর্যন্ত এই আন্দোলনে যোগ দিতে অস্বীকার করে।

বোনী গরেথুরকে আমেরিকায় যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে দু'শ ডলারের একটা চেক পাঠিয়ে দিল। গরেথুর শক্ত সমর্থ যুবক, মেষপালকের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে, সুতরাং বিওরতার তাকে ছেড়ে দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করল। কিন্তু পিতার মত অগ্রাহ্য করে গরেথুর আমেরিকায় যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। গরেথুরের নিজস্ব কয়েকটি ভেড়া ছিল। সে স্থির করল আমেরিকায় যাবার পূর্বে আস্তা সালিলফকে ভেড়াকয়টি দিয়ে যাবে। তার পিতা তার এই সংকল্পের কথা শুনে আস্তাকে জানাতে বলে যে বিওরতার যে নূতন গৃহ নির্মাণ করবে, তাতে আস্তার জন্যও একটি সুন্দর কক্ষ নির্দিষ্ট থাকবে, আস্তা যদি ইচ্ছা করে অনায়াসে এখনই সামারহাউসে চলে আসতে পারে। আস্তার উদ্দেশ্যে রচিত তিনটি কবিতাও তাকে দিয়ে কণ্ঠস্থ করিয়ে আস্তার কাছে আবৃত্তি করবার নির্দেশ দিল। গরেথুর তার সবচেয়ে দামী পোষাকে সজ্জিত হয়ে সহরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। পিতার প্রস্তাব ও কবিতার কথা জানালে আস্তা বলে বিওরতার যে রকম স্বাধীনতাকামী, তার রক্তেও সেই স্বাধীনতার বীজ সংক্রামিত হয়েছে। সে দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যে আছে সত্য, কিন্তু স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে অসমর্থ। ইজোলফারও এক দিন তার কাছে এসেছিল। এসে স্বীকার করে গেছে যে আস্তা তারই কন্যা। তাকে অনেক অর্থ দেবার প্রস্তাব করে। কিন্তু স্বাধীনতাময়ের উপাসিকা আস্তা সেই প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করেছে। একই কারণে ভেড়া গ্রহণ করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়।

তখনকার দিনে আইস্‌ল্যাণ্ডের সহরবাসীরা আমেরিকা-গামী যুবকদের অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করত। আস্তার সঙ্গে আলাপ করে গরেথুর যখন তার বাসস্থানে ফিরে আসছিল, ইজোলফারের মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হ'ল। ইজোলফারের সুন্দরী যুবতী মেয়ে বেচে তার সঙ্গে আলাপ করল। তরুণীকে পত্নীরূপে লাভ করতে পারবে এই আশা করে গরেথুর আমেরিকায় যাবার সংকল্প পরিত্যাগ করে সামারহাউসে ফিরে গেল।

যুদ্ধের হিড়িকে ভেড়ার মূল্য স্ফীতির জন্য বিওরতার কিঞ্চিৎ অর্থশালী হয়েছিল। এখন সে নূতন গৃহনির্মাণের সংকল্প করেছিল। যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গেই ভেড়ার মূল্য হ্রাস হ'ল, বিদেশে ভেড়ার চাহিদা রইল না। তবুও বিওরতার তার সংকল্প পরিত্যাগ করল না। টিন ও কাঠ কিনতে গিয়ে সমবায় প্রতিষ্ঠানের কাছে মোটা অঙ্কের ঋণে আবদ্ধ হ'ল। দেওয়াল ও ছাদ সম্পূর্ণ হ'ল, কিন্তু অর্থের অভাবে ছয়ার ও জানালার পাল্লা তৈরী হ'ল না। বাড়ী সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই সমবায় ব্যাঙ্ক তার বাড়ী ও জমি অধিকার করে নিল। তখন বিওরতারের বাপড়ীর পরিত্যক্ত জমি ও ভগ্নকুটীর ছাড়া সমস্ত পরিবারের আশ্রয় নেবার জন্য কোনো স্থান রইল না। গৃহের সামান্য আসবাব, রন্ধনপাত্র, ঘোড়া, ভেড়া, বৃদ্ধা বাপড়ী এদের সরিয়ে নেবার পূর্বে সহর থেকে কিছু খড় ও চূর্ণ-মংস সংগ্রহ করতে হবে। এইজন্য বিওরতার ও গরেথুর দুজনেই সহরে এল ঘোড়া-টানা মালবাহী গাড়ী নিয়ে। রাত্রিতে গাড়ী চলতে পারবে না, সুতরাং রাত্রিটা সহরেই কাটাতে হবে। পিতাপুত্রের আশ্রয়ের কোনো স্থান নেই। শীতের রাত্রি রাস্তার পাশে কাটাতে হবে। এমন সময় একজন বন্ধুবিদ্বেষী মতবাদী ধর্মঘটকারী মজুরের সঙ্গে দেখা

হ'ল। এখন ইজোলকার উন্নতির শিখরদেশে। সমবায় প্রতিষ্ঠান থেকে পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছিল। এখন সে দেশের গভর্নর। সদস্য হবার সময় ভোটারদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সে ডক তৈরীর ব্যবস্থা করবে। সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে ডক তৈরী হচ্ছিল কিন্তু মজুরদের পারিশ্রমিক যা নির্দিষ্ট হয়েছিল, তাতে তাদের ত্রিবেলা পেটভরে খাবার সংস্থানও হয় না। তাদের বশীভূত করবার জন্য শহরে সৈন্য আনয়ন করছে। বোধ হয় কাল প্রভাত থেকেই পুলিশ ও সৈন্যদের সঙ্গে মজুরদের সংঘর্ষ হবে। অনেক মজুরকে হয়তো প্রাণ দিতে হবে। ধর্মঘটকারী মজুরটি একটি ধনী বৃদ্ধা রমণীর জানালার সার্সি ভেঙে রুটী চুরি করে নিয়ে এল। বিওরতারকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে যার প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য জমানো আছে, একান্ত প্রয়োজনে তার খাদ্যের অংশ গ্রহণ করলে কোনো অপরাধ হয় না। কিন্তু স্বাধীন মেষপালক এযুক্তিকে মেনে নিতে পারল না। যে স্বাধীন সে নিজের পরিশ্রম দ্বারা অর্জিত খাদ্য ও বস্ত্রই শুধু গ্রহণ করে। আইসল্যাণ্ডের স্বাধীন মেষপালকদের অন্তরের এই বাণী সে উচ্চারণ করল। মজুরটি রুটি পানের জন্য বিওরতার ও গয়েডুরকে তাদের আস্তানায় নিয়ে গেল। সেখানেই রাত্রিযাপন করল। প্রভাতে শয্যা থেকে উঠে সে স্থান পরিত্যাগ করল। একবার মনে করল গয়েডুরকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। কিন্তু নিদ্রিত গয়েডুরের সবল সমর্থ দেহ দেখে ও ভবিষ্যতের সংঘর্ষে সাহায্য করবার ক্ষমতার কথা স্মরণ করে ও যোগকার ধর্মঘটকারীদের সংগ্রামের সঙ্গে কথঞ্চিৎ সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে তাকে ধর্মঘটকারীদের সাহায্য করবার জন্য রেখে গেল।

সহরের যে অংশে আস্তা বাস করত, বিওরতারের তা জানা ছিল। পথ চিনে চিনে সহরের সেই অংশে গিয়ে দেখ্‌ল, পথের ধারে একটি মেয়ে মাটী নিয়ে খেল্‌ছে। তার মুখে আস্তার মুখের আদল আছে। আস্তার মতই তারও একটি চোখ ঈষৎ টেরা। মেয়েটির জীর্ণ দেহ ও নোংরা কাপড় দেখে ও মেয়েটির বারম্বার কাশির আওয়াজ পেয়ে বিওরতারের বুঝতে দেরী হ'ল না যে আস্তাকে কি দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। মেয়েটির হাত ধরে আস্তার গৃহে এসে পৌঁছাল। আস্তাকে জানাল যে তাদের নিয়ে যাবার জন্য সে এসেছে। আস্তা রুগ্না। শয্যার উপর শুয়েছিল। বিওরতারের কথা শুনে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। শয্যা ত্যাগ করে দু'হাতে বিওরতারকে জড়িয়ে ধরল। বারম্বার উচ্চারণ করল, 'তুমি আমাকে নিতে এসেছ?'

তারপর তারা হেটে চলল্ উত্তর আইস্‌ল্যাণ্ডের সেই কুটীরের উদ্দেশ্যে। কিছুদূর গিয়েই আস্তার অসহ্য কাশির দমক আসল। সে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল, মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। বিওরতার আস্তা সোলিলজাকে কোলে তুলে নিল। বহুদিন পরে আবার বিওরতারের বিশাল বক্ষে আশ্রয় পেয়ে, সেই পরম নির্ভরতলে মস্তক স্থাপন করে আস্তার ম্লান মুখে নির্মলহাস্যে উজ্জ্বল হ'ল। সবুজ ঘাস আর সবুজ ঘাসের উপর রক্ত রেখাকে পশ্চাতে ফেলে স্বাধীন মেষপালকের এই দলটি সম্মুখে অগ্রসর হ'ল।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ল্যাক্সনেসের হাতে ইস্‌লেনস্‌কা ভাষা অত্যন্ত সম্পদশালী হয়ে উঠেছে। এই ভাষার সাহায্যে এ যুগের তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা ও ঘাতপ্রতিঘাতময় জীবনের বিভিন্ন ভাবাবেগ এবং মানবমনের সূক্ষ্ম সব অনুভূতি অনায়াসে সুস্পষ্ট করতে সমর্থ হয়েছেন। হাস্যরস পরিবেশন করতে গিয়ে তাঁর ভাষা হয়েছে উজ্জ্বল, কৃষকবধূ অথবা অবলা পশুর বেদনা বর্ণনা করতে গিয়ে ভাষার মধ্যে এসেছে কোমলতার নরম স্পর্শ। কুমারী-কন্যার হৃদয়ের প্রথম প্রেমজাগরণের বৃত্তান্ত লিখ্‌তে গিয়ে ভাষায় এসেছে কাব্যরস। তেমনি ভাষায় কখনও এসেছে স্থূলতা, ভাষা কখনও হয়েছে কল্পনাভ্রষ্টা। তাঁর পুস্তক যাঁরা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করেছেন, তাঁরা একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে তাঁর রচনাশৈলী তাঁর এমন নিজস্ব বস্তু যে বিভিন্ন অনুভূতির প্রকাশে শব্দচয়নে যে নৈপুণ্য তিনি দেখিয়েছেন, বর্ণের যে তারতম্য তিনি ব্যবহার করেছেন, ভাষান্তরিত করবার সময় সে সব সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়নি। আইস্‌ল্যাণ্ডে এ যুগের তরুণ সাহিত্যিকদের প্রায় সকলেই তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। শুধু তরুণ সাহিত্যিকরাই নন, কাম্বান ও হ্যাগালিনের মত প্রবীণ কথাসাহিত্যিকও তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে নূতন ষ্টাইল নিয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষা করছেন।

ভারতে খাদ্য-শস্য

অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

ভারতে খাদ্য-শস্য বলিতে প্রধানতঃ চাউল ও গম এই দুই শস্যকে বুঝায়। ইহা ছাড়া ভারত জোয়ার, বাজরা, রাগী, ভুট্টা, যব, ছোলা ও দাল জাতীয় শস্য উৎপন্ন করে। ঐ সমস্তই খাদ্য-শস্যের অন্তর্গত। এই সমস্ত খাদ্য-শস্যের চাহিদা কম নহে। তবে চাউল ও গম এই দুই খাদ্য-শস্যের চাহিদার তুলনায় পূর্বোক্ত শস্যগুলির চাহিদা যৎসামান্য। যাহা হউক, বর্তমান পরিস্থিতিতে সকল প্রকার খাদ্য-শস্যের চাহিদাই বেশ উচ্চ।

বিশেষজ্ঞের মতে প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্কের প্রতিদিন ৩০০০ ক্যালোরী পরিমাণ তাপ-উৎপাদনক্ষম খাদ্য-শস্য খাওয়া উচিত। বর্তমানে একজন প্রাপ্ত-বয়স্ক ভারতবাসী যে পরিমাণ খাদ্য প্রতিদিন খায়, উহাতে মাত্র ১২০০ ক্যালোরী তাপ উৎপন্ন হয়। ঐ পরিমাণ খাদ্য শরীরকে যথাযথভাবে পুষ্ট রাখে না। এই কারণে সাধারণ ভারতবাসীর স্বাস্থ্য তত সুস্থ ও বলিষ্ঠ নহে। মনে রাখিতে হইবে যে, স্বাস্থ্যই সম্পদ্। স্বাস্থ্যবান মানব কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সর্বত্রই জাতির সম্পদ। জাতির আর্থিক ও নৈতিক সর্ববিষয়ে উন্নতি করিতে হইলে, উহাকে স্বাস্থ্যবান করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে উপযুক্ত আহার মানব মাত্রেরই পাওয়া উচিত। আহার্য বস্তুর মধ্যে খাদ্য-শস্য যোগান সরকারের করণীয় বিষয়। এই বিষয়ে প্রত্যেক দেশবাসীর কর্তব্যও কম নহে। এক্ষণে দেখা যাক্, ভারত কিভাবে খাদ্য-শস্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইতে পারে।

১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে ৬৪০ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হয়। উহার মধ্যে প্রায় ২৫৫ লক্ষ টন চাউল এবং ৭৫ লক্ষ টন গম ভারত উৎপন্ন করে। ঐ সময় ১০ লক্ষ টন গম আমদানী করা হয়। সুতরাং খাদ্য-হিসাবে ভারতবাসী ৬৫০ লক্ষ টন খাদ্য পায়। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় ১১০ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি-উন্নতির ব্যবস্থা হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করা হয় যে, ১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে ৭৫০ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হইবে। এই অনুমানে বুঝা যায় যে, আগামী পাঁচ বৎসরে ভারত প্রায় ১০০ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য অধিক উৎপন্ন করিবে। ঐ ১০০ লক্ষ টন অধিক খাদ্য-শস্য কিভাবে উৎপাদিত হইবে, উহা নিম্নে লিখিত তালিকা হইতে বেশ বুঝা যায়:

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনানুযায়ী অধিক খাদ্য-শস্য

প্রথা	অতিরিক্ত খাদ্য-শস্য (লক্ষ টন)
বৃহৎ জলসেচ দ্বারা	২৭
সাধারণ জলসেচ দ্বারা	
জমির সার দ্বারা	
উচ্চ-ফলনের বীজ ব্যবহারে	
জমি উন্নয়ন প্রথায়	৮
উন্নত কৃষি প্রথায়	১৫
	১০০

ভারতে সেচ-জমির পরিমাণ ৪৮০ লক্ষ একর। দ্বিতীয় পরিকল্পনানুযায়ী ১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে ৭৮০ লক্ষ একর জমি সেচিত হইবে। পরিকল্পিত বিভিন্ন বৃহৎ জলসেচ প্রথায় আগামী পাঁচ বৎসরে ১১০ লক্ষ একর অধিক জমি সেচিত হইবে এবং প্রায় ৯০ লক্ষ একর অধিক জমিতে সাধারণ জলসেচ প্রথায় জল যোগান হইবে। বৃহৎ জলসেচ প্রথা বলিতে বড় ডেম বাঁধিয়া নদী-পরিকল্পনাগুলিকে বুঝাইতেছে। সাধারণ জলসেচ

প্রথার নলকূপ দ্বারা জলসেচ ও সামান্য নদী পরিবহন-গুলিকে বুঝায়। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩৫০টী নলকূপ খনিত হইবে। নলকূপ খনন প্রায় সমস্ত রাজ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই ও পাঞ্জাব রাজ্যগুলিতে অধিক সংখ্যক নলকূপ খনন করা হইবে। বিশ্বাস যে, ১৯৬০-৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পরিকল্পিত নলকূপগুলি কার্য্যকরী হইবে, এবং ঐগুলি ৯২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করিবে। এইভাবে জলসেচ জমির আয়তন বাড়াইতে পারিলে সর্ব্বপ্রকার ফসলের মোট উৎপাদন নিশ্চয়ই বাড়িবে। ফসল বলিতে খাদ্য-শস্য ও অন্যান্য ফসলকে বুঝায়। প্রজাতন্ত্রের নানা রাজ্যে পয়ঃপ্রণালী উন্নয়ন করিয়া জমি কৃষি-উপযুক্ত করা হইতেছে। উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং কেরালা নামক রাজ্যগুলিতে এইভাবে বেশ উন্নতি হইয়াছে।

দেশে কৃষিজমির মোট আয়তন সীমাবদ্ধ। লোক সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। মাথা পিছু কৃষি জমির আয়তন মাত্র ·৬ একর। ঐ পরিমাণ জমিতে কি হইবে? একজন প্রাপ্ত বয়স্কের উপযুক্ত বাৎসরিক খাদ্য-শস্য উৎপাদন করিতে কমপক্ষে ২·১ একর জমির প্রয়োজন। সুতরাং ভারতে কৃষি-জমির উপর চাপ অত্যন্ত অধিক। খাদ্য-শস্যের বা কৃষি-সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে অভিনব কৃষি-প্রথা প্রচলন করা যেমন প্রয়োজন, তেমন জমির আয়তন বাড়াইতে যথাসম্ভব চেষ্টা আবশ্যক, দেখা গিয়াছে যে, সারা ভারতে এখন কতকগুলি জলাভূমি রহিয়াছে, যেগুলির জল নিষ্কাশন করিতে পারিলে, ঐ জমিতে কৃষিকার্য্য অনায়াসেই চলিতে পারে। অনুমান করা হয় যে, ১৯৬০-৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১৪ লক্ষ একর আয়তন বিশিষ্ট জলাভূমি কৃষি-উপযুক্ত হইতে পারে। ইহা ছাড়া জমি-উন্নয়ন পরিকল্পনায় আধুনিক কৃষি-যন্ত্র ব্যবহার করিয়া দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে ২০ লক্ষ একর পতিত জমিতে চাষ করা যাইবে, এস্থলে বলা প্রয়োজন যে, এইভাবে জমি কৃষি-উপযুক্ত করিতে যে সমস্ত আধুনিক কৃষি-যন্ত্রের প্রয়োজন, ভারতে উহাদের সংখ্যা বর্ত্তমানে নগণ্য বলা চলে। ইহা ছাড়া যন্ত্রশিল্পীর অভাব। সুতরাং এইভাবে কৃষি-জমি উন্নয়ন করা কষ্টকর ও সময়-সাপেক্ষ। এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর প্রতিষ্ঠানটি অচিরে ২৬ হাজার একর জঙ্গল ও পতিত জমি উদ্ধার করিবে এবং ১৪৯ হাজার একর পতিত চাষবাসের ব্যবস্থা করিবে। যাহা হউক, কৃষি-উন্নয়নে আধুনিক সর্ব্বপ্রকার প্রথা চালু থাকিলে, দেশ কৃষিজ-সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে, এইরূপ আশা করা যায়।

যে সমস্ত জমিতে বর্ত্তমানে চাষ হইতেছে উহাদের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে, জমিতে সার দেওয়া প্রয়োজন, কথা হইতেছে, কি সার দেওয়া হইবে? কৃষি-জমির মাটি কি প্রকারের এবং উহাতে কোন্ কোন্ ফসল উৎপন্ন করা যাইবে বা হইবে—উভয় বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ভারতে জমির রাসায়নিক পরীক্ষা এখনও সম্যকরূপে হয় নাই, একথা বলা চলে। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে কৃষি-জমির মৃত্তিকা সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, সেটা অনেকটা উপর-উপর। এতদবস্থায় মাটিতে উদ্ভিদের কোন খাদ্য-প্রাণের অভাব স্থির করা সম্ভব নহে। সুতরাং রাসায়নিক সার ব্যবহার করা অনির্দিষ্ট। বর্ত্তমানে ভারতে রাসায়নিক সার উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কৃষক যাহাতে নায্য-মূল্যে সার খরিদ করিতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন। উহাতে কি হইবে? সার ব্যবহার বিষয়ে যে জ্ঞানের ও নিপুণতার প্রয়োজন, উহার অভাব রহিয়াছে। প্রথমতঃ ভারতীয় কৃষক বিদ্যা-শিক্ষা পায় নাই। পৃথিবীর অন্যত্র কি ভাবে কৃষি-উন্নতি হইয়াছে, সেই বিষয়ে সে অজ্ঞ। ইহা ছাড়া কৃষক যাহাতে আধুনিক প্রথায় কৃষি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, সেই বিষয়ে দেশে কোনরূপ ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। সুতরাং বর্ত্তমানে যে সমস্ত রাজ্যে জমির সার ব্যবহার বেশ প্রগতিশীল বলিয়া মনে হইতেছে, উহার ভিত্তি বিজ্ঞান-সম্মত প্রথার উপর নহে। অতঃপর জমিতে কেবলমাত্র সার দিলেই চলিবে না। জমির উৎপাদন-ক্ষমতার একটা সীমা আছে। ঐ সীমায় পৌঁছিলে ফসলের উৎপাদন ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে পারে। এই কারণে সর্ব্বদেশেই ঐ উৎপাদন-ক্ষমতার

দিকে সতর্ক দৃষ্টি থাকে। আমাদের দেশ ঐ বিষয়ে কতটা সতর্ক সেই বিষয়ে নানা প্রশ্ন উঠিতে পারে।

ফসল-উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে উচ্চ-আদরের বীজ ব্যবহারের জন্য নানা দেশে বিশেষ বিশেষ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ সমস্ত গবেষণাগারে বিশেষজ্ঞ ও কৃষক উভয়ের সমবেত চেষ্টায় নানা ধরণের বীজ উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে। এই বিষয়ে জাপান, সোভিয়েট গণতন্ত্র ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বেশ অগ্রণী। আমাদের দেশেও এই বিষয়ে কিছুটা চেষ্টা হইতেছে। গম, পাট ও অন্যান্য কয়েকটি ফসল বিষয়ে কয়েক প্রকার বীজ ভারত উৎপাদন করিয়াছে। কিন্তু ভারতে প্রয়োজন অনেক পরিমাণ বীজের। সারা দেশে প্রয়োজন মত উচ্চ-আদরের বীজ যোগান দিতে আমাদের গবেষণাগারগুলি পারগ নহে। অনেক সময় বিদেশ হইতে উচ্চ-আদরের বীজ আমদানী করা হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক দেশে স্বকীয় একটা রীতি ও পরিবেশ রহিয়াছে। সেই পরিবেশ মত বীজ বপন বা রোপণ করিলে, আশু ফল পাওয়া যায়। নতুবা নানা অন্তরায় হইতে পারে। বর্ত্তমানে প্রত্যেক রাজ্যে উচ্চ-আদরের কয়েক প্রকার বীজ বণ্টনের ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন। কিন্তু ঐরূপ বণ্টন-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা যেমন প্রয়োজন, তেমন বীজের পরিমাণ আরও অধিক হওয়া আবশ্যক।

ইহা সত্য যে, বিশেষ প্রকার চাষবাসে ভারতে ফসলের মোট উৎপাদন অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেক সময় ঐরূপ চাষ সামান্য জমিতে পরীক্ষামূলক অবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু সন্তোষের বিষয় এই যে, একর-প্রতি ফসল উৎপাদনের হার ঐ প্রকার কৃষি-কার্য্য আশানুরূপ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, জাপানী প্রথায় চাষ করিয়া কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, হায়দ্রাবাদ, ও উত্তর প্রদেশ নামক রাজ্যগুলিতে যারপর নাই ফল পাওয়া গিয়াছে। ভারতে একর-পিছু ফসলের উৎপাদন অতি-সামান্য। ভারতে প্রতি একর জমিতে ২০০ পাউণ্ড ধান জন্মে। প্রতি একর জমিতে মাত্র ৬০০ পাউণ্ড গম উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর অন্যত্র এমন কি সেই সমস্ত দেশে যেখানে চাষের সমস্ত প্রকার সুবিধা নাই, সেখানেও প্রতি একর জমিতে কমপক্ষে ১৪০০—১৮০০ পাউণ্ড ধান এবং ১২০০ পাউণ্ড গম উৎপন্ন হয়। জাপানী প্রথায় চাষ করায়, জমি কম হইলেও, যতটা জমিতে চাষ করা হইয়াছে, সেই অনুপাতে ফসলের উৎপাদন অনেকটা আশাপ্রদ। জাপানী-প্রথার বিশেষত্ব এই যে, জমিটি বিশেষভাবে লাঙ্গল দেওয়ার পর, সঙ্গত প্রয়োজন মত সার দেওয়া হয়। পরে যথাসময়ে সারি দিয়া এবং সম পরিমাণ ফাঁক রাখিয়া উচ্চ-আদরের বীজ বপন বা চারাগাছ রোপণ করা হয়। লক্ষ্য রাখা হয় যাহাতে আগাছা ঐ ক্ষেতে না জন্মে। পরে প্রয়োজন মত গাছগুলি শস্য-সমেত যাহাতে দাঁড়াইয়া থাকে, সেইরূপ ব্যবস্থা করা হয়। প্রথাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, স্থির হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৬০ লক্ষ একর জমিতে জাপানী-প্রথায় ফসল উৎপাদন করা হইবে। বর্ত্তমানে এই প্রথায় নিয়োজিত জমির আয়তন মাত্র ১৫ লক্ষ একর। ইহা ছাড়া বোম্বাই, মধ্য-প্রদেশ এবং উত্তর-প্রদেশ নামক রাজ্যগুলিতে শুষ্ক অঞ্চলে বিশেষ শুষ্ক-কৃষি প্রথা এবং পর্ব্বতগাত্রে বা বিভিন্ন উচ্চতায় ধাপে ধাপে চাষ-প্রথা নিয়োগ করা হইতেছে। উহাতে মনে হয়, ঐ সমস্ত অঞ্চলে কালে অধিক ফসল পাওয়া যাইবে। মোট কথা, ভারতে কৃষি-উন্নয়নের একটা সাড়া পড়িয়াছে।

যতদূর জানা গিয়াছে যে, স্বাধীন ভারতে চাষের জমির পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইলেও, ফসল-উৎপাদনের পরিমাণ যে বৃদ্ধি পাইয়াছে উহা সংখ্যা-তথ্য হইতে বুঝা যায়। অপর দিকে লোক-সংখ্যা নানা কারণে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যিক চুক্তি চালু রাখিতে এবং সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব বজায় রাখিতে খাদ্য-শস্যের আদান-প্রদান হয়, এই সমস্ত কারণে চাহিদা অত্যধিক বলিয়া উৎপাদিত অধিক ফসল বা খাদ্য-শস্য অনুপাতে কম এবং উহার মূল্য বেশ উচ্চ। দায়িত্বশীল সরকার দেশবাসীর আহার-বিহারের ভার স্বহস্তে লন। ভারত সরকার একদিকে নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া যেমন ফসল-উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন, অপরদিকে

হইতে কলকগুলি বিশেষতঃ খাদ্য-দ্রব্য যাহাতে তাহা মূল্যে বাজারে সুলভ হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ইহার জন্য সমবায়-প্রথা প্রচলন আবশ্যক। ঐরূপ প্রথায় কৃষক অপহৃত হয় না এবং উহাদের শ্রম পুরস্কৃত হয়। ইহা ছাড়া সমবেত ভাবে কার্য করার ফলে শ্রমের অপচয় হয় না, রুচি ও বিলাসিতা অনুযায়ী লোকেরা কর্মে নিয়োজিত হয় এবং অবসর সময়ে গৌণ উপায়ে অর্থাগমের চেষ্টা করে। সুতরাং দেশে সমবায়-প্রথা চালু করিয়া খাদ্য-সামগ্রী ন্যায্য-মূল্যে বিক্রয়ের জন্য যৌথ-প্রতিষ্ঠান গঠন করা আবশ্যক। ইহাতে কৃষক অংশীদার থাকিবে।

উপসংহারে বলা হয় যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে পৃথিবীর সর্বত্র অর্থনৈতিক উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা হইতেছে। প্রত্যেক উন্নত দেশবাসীর আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি-সাধন। স্বাধীন ভারতেও সেইরূপ আদর্শ দেখা যায়। নিঃস্বার্থ দেশ-প্রেম ও কর্তব্যপরায়ণতা দেশের উন্নয়ন আনিবে আহারে-বিহারে, যুক্তিতর্কে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে এবং চিন্তাধারায় ভারত স্বাধীন হইবে। ভারতের স্বাস্থ্যবান ও উদার শিল্পী ভারতকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করিবে। তাহার কর্ম-প্রচেষ্টা, উদ্যোগ এবং গবেষণা ঘরে-বাহিরে বিকশিত হইবে। ভারতের পল্লীপ্রণালী, নগরগুলী, শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্র, খনিজ-সম্পদ, শ্রমশিল্প ও বাণিজ্য দেশবাসীর মনে আশা জাগাইবে এবং প্রতি-বেশীর মনে শ্রদ্ধা প্রেরণা দিবে। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতের নরনারী কৃষি ও শ্রমশিল্প একতালে উন্নয়ন করিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে অহিংসা ও সেবাধর্মের প্রচার করিবে। হিংসা, দ্বেষ ও ক্রোধ বর্জন করিয়া মাতৃ-বন্দনা ও মাতৃ-সেবায় নিজেকে নিয়োগ করিয়া মানবমাত্রেই "ভাই-ভাই" এই মন্ত্র সারা বিশ্বে ছড়াইয়া দিবে। আজ বাক্-বিতণ্ডা ও শ্রেণীগত ভাব ছাড়িয়া আমরা সকলেই ভাবিব আমরা সকলেই ভারতবাসী। ভারত-মাতা আমাদের সকলের মা। আমাদের সকলের সমবেত চেষ্টায় মা আমাদের পূর্ণাঙ্গী হইবেন। স্নেহময়ী মা আমাদের সকলের দুঃখ ঘুচাইবেন।

জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা

এই সভার কার্যবিবরণ হইতে 'প্রসপেক্টাস্ অফ এ সোসাইটি ফর দি প্রোমোশন অফ ন্যাশনাল কীর্তি এণ্ড দি এডুকেটেড নেটিভস্ অফ বেঙ্গল' রচিত হয়। হাইকোর্টের জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে, যদি উক্ত সভা সংস্থাপিত হয় তাহা হইলে তিনি তাহার সভাপতি হইবেন। ঐ পুস্তিকা হইতে বান্ধবের নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার ভাব পান। তিনি ঐ মেলা ও তৎপরে জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন। জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার সভ্যেরা "গুড নাইট" না বলিয়া "সুরজনী" বলিতেন। ১লা জানুয়ারী দিবসে পরস্পর অভিনন্দন না করিয়া ১লা বৈশাখে করিতেন; আর ইংরাজী বাঙ্গলা না মিশাইয়া কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গলাতে কহিতে চেষ্টা করিতেন। যে একটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিত তাহার এক পয়সা করিয়া জরিমানা হইত। মেদিনীপুরের কোন বিখ্যাত উকীল এইরূপ কড়াকড়ি দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে আপনি ক্রমে ভয়ঙ্কর পদার্থ হইয়া উঠিতেছেন। ইহার পর লোকে আপনার নিকট ঘেঁসিবে না। আমা দ্বারা মেদিনীপুরে বহু সভা স্থাপিত হওয়াতে ও সভা আহ্বানকারী লোকেরা ক্রমিক মেদিনীপুরের লোকের মধ্যে ঘোরাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে এক সভানিবারিণী সভা সংস্থাপন করা কর্তব্য।

—স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত হইতে।

গল্প

প্রত্যাবর্ত্তন

আশীষ কুসুম ঘোষ

ছেলেমেয়েরা এবং তাঁর নিজের প্রবল অমত সত্ত্বেও কেন যে ভূপতিবাবু অনেক চেষ্টা করে বেছে বেছে অত পাড়াগাঁ এই জায়গাটায় বদলী হলেন অমলাদেবীর কাছে তা রহস্যময়। এই জায়গাটায় এখনও ইলেক্‌ট্রিকের আলো এসে পৌঁছায় নি; নাগরিকতার আধুনিক সুযোগ-সুবিধার অধিকাংশই এখানে এখনও অপরিচিত। প্রথম দিনেই অমলাদেবী স্বামীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন, "যাগো, কি বিচ্ছিরি জায়গা! এখানে আবার মানুষে থাকে?" কিন্তু স্বামীকে দেখে অমলাদেবী একেবারে আশ্চর্য হয়ে যান। এযেন আগের মানুষই নন তিনি। একটু সময় পেলেই নিজের পদমর্যাদা ভুলে তিনি গাঁয়ের ভিতরে বনে জঙ্গলে একা একা ঘুরে বেড়ান; এমন কি বেশবাসও অনেক সময় পদমর্যাদা অনুযায়ী ঠিক থাকে না।

ছুটির দিন। অফিস কাছারী বন্ধ। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ভূপতিবাবু একা একাই বেরিয়ে পড়ছেন। গায়ে ক'দিনের পরা আধময়লা একটা ধুতি আর হাফসার্ট। অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে নিজেকে বেশ ক্লান্তই মনে হয় ভূপতিবাবুর। চারপাশে মুখ ঘুরিয়ে ইতস্ততঃ দেখতে লাগলেন কাছাকাছি কোথাও বসা যায় কি না। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল দূরে মাঠের কোণের বেলগাছটার ওপর। চোখদুটো তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটু জোর কদমেই তিনি বেলগাছটার দিকে এগিয়ে গেলেন। গাছতলায় পৌঁছে ভূপতিবাবুর মুখ থেকে আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল, "এই সেই বেলগাছ?" তাঁর মুখের ওপর দিয়ে তৃপ্তির হাসি খেলে গেল। গাছটা অনেক শুকিয়ে গেছে। আগের মতন আর তেমন ডালপালা নেই। ভূপতিবাবু ছেলেবেলার মতন আবার আরাম করে পা ছিঁড়িয়ে বেল-গাছটার তলায় বসে পড়লেন।

কতদিন বাদে আবার এই গাছতলায় বসলেন! ভূপতিবাবু মনে মনে হিসেব করতে লাগলেন। পঁয়ত্রিশ বছর? হ্যাঁ, ঠিক পঁয়ত্রিশ বছর বাদে ভূপতিবাবু আবার এই গাছতলায় বসলেন। নিজের মনে মনেই ভূপতিবাবু আবার বলেন, "আচ্ছা তখনকার আর কেউ এসে এখানে বসে? গোপাল, প্রণব, রহমান, ন্যাড়া, পটলা, পাকল— না আর কারুর নাম ভূপতিবাবুর মনে পড়ে না। আরও অনেকেরই মুখ তাঁর স্মৃতির সরসী-নীরে একে একে ভেসে উঠতে লাগল। কিন্তু স্মৃতির গহনজলে ডুব দিয়েও আর কারও নাম ভূপতিবাবু মনে আনতে পারলেন না। দুপুরে নির্জন মাঠে বেলগাছ তলায় বসে জীবনের প্রদোষ-লগ্নে বিচারক ভূপতি মজুমদার স্মৃতির গহনজলে ধীরে ধীরে তলিয়ে গেলেন। আশ্চর্য! ভূপতিবাবু যেন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পেলেন বছর দশেকের একটি ছেলের হাত ধরে চোখ মুছতে মুছতে একটি মেয়ে এই গাছটার পাশ দিয়ে, ঐ মাঠটা ডিঙিয়ে আস্তে আস্তে গ্রামে গিয়ে ঢুকল। "কে ও?" ঐ তো নিজ পিতৃহীন ভূপতির হাত ধরে মা চোখ মুছতে মুছতে ভায়ের বাড়ায় উঠলেন। ভূপতির বাপ ছিলেন জমিদারী সেরেস্তার তলার দিককার কর্মচারী। ওলাউঠার মড়ক লাগলে ভূপতির বাপ যখন কয়েক ঘণ্টার রোগ ভোগ করার পর ইহধাম থেকে বিদায় নিলেন তখন নিঃসম্বল ভূপতির মা, ছেলের হাত ধরে ভায়ের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া আর উপায় রইল না। মামা তখন এই গ্রামের স্কুলে মাষ্টারী করেন। কষ্টের সংসার। মামী মুখে অভ্যর্থনা জানালেন, "এস, এস" বলে, কিন্তু মুখটা তাঁর গম্ভীর হয়ে উঠল। মামা ভূপতিকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন আর দুদিনেই ভূপতি পাড়ার ও স্কুলের ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা দল গড়ে

হল। উঃ, সে সব কি দিনই গেছে! আর কোনও ফল পাকবার উপায় ছিল না। আর আচার চুরি? এই বৃদ্ধ বয়সেও ভূপতিবাবুর রসনা বেশ সরস হয়ে উঠল। আচার চুরির কথা মনে হতেই ভূপতিবাবুর চোখের সামনে ভেসে উঠল আর একখানা শুটুখীভরা মুখ। মুখটোপের পাকল ধবধবে রঙ, গোলগাল মুখখানা। রোদের তাত লেগে লালচে হয়ে উঠেছে। মাথাভরা কোঁকড়ান চুল ঘাড় বেয়ে পিঠ পর্যন্ত নেমেছে। দলের ইন্টেলিজেন্ট সার্ভিসের পাতা হল পাকল। কার খিড়কীর বাগানে কি ফল পেকেছে, কার বাড়ীতে কবে কোথায় আচার তকতে দেওয়া হবে এ বিষয়ে পাকলের খবর একেবারে পাকা। আচ্ছা পাকল এখন কোথায় আছে? বুড়ো হয়ে পাকলকে দেখতে এখন কেমন হয়েছে? পাকলের এখনকার চেহারাটা কী রকম হতে পারে ভূপতিবাবু মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করলেন কিন্তু শেষপর্যন্ত ওর এখনকার চেহারাটা কী রকম হতে পারে কিছুতেই কল্পনা করে উঠতে পারলেন না। ভূপতিবাবুর এ গ্রাম ছাড়ার কিছুদিন আগেই পাকলের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে আর কোনও খবরই ভূপতিবাবু জানেন না। প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার পর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি সেই যে গ্রাম ছেড়েছিলেন তারপর আবার এই প্রথম এ গ্রামে এলেন। স্কুলে পড়ার শেষ ধাপে পৌঁছবার অনেক আগেই মা গত হয়েছিলেন। ভূপতির প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার কিছুদিন বাদে মামা হঠাৎ একদিন রাত্রে সর্পাঘাতে মারা গেলেন। মামা মারা যাবার পর মামী ছেলে মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী গিয়ে উঠলেন। আর সেই থেকেই ভূপতির সংগে এ গ্রামের সম্পর্ক গেল উঠে।

ছেলেমেয়ে পড়িয়ে কলেজ জীবনের শেষে কয়েক বছর ওকালতি করার পর অনেক চেষ্টাচরিত্তির করে ভূপতিবাবু ব্যাঙ্কের চাকরী জোগাড় করেন। তারপর থেকেই ভূপতিবাবুর জীবনে দেখা দিয়েছে উন্নতির একটানা গতি। এইবার তাঁর বিশ্রাম নেবার পালা। কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে এসেও এই গ্রামের মাঝে ফেলে-আসা কৈশোরের হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলো ভূপতিবাবু কোনদিন ভুলতে পারেন নি। থেকে থেকে এই গ্রামখানা যেন ওর মনকে হাতছানি দিত। অনেকদিন থেকে এখানে আসতে চেয়েছেন ভূপতিবাবু কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার্যগতিকে তা আর হয়ে ওঠেনি। এবার যখন দেখলেন চাকরী থেকে অবসর নেবার আর মাত্র কয়েক বছর বাকী আছে, ভূপতিবাবু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেললেন যেমন করে হোক তাঁকে এই ভাগগাছটার বদলী হতে হবে। এখানকার নানান অসুবিধা উল্লেখ করে স্ত্রী ছেলেমেয়ে অনেক আপত্তি করেছিলেন কিন্তু কিশোরীর ভীরুপ্রেমের মত এই ভাগগাছটার প্রতি তাঁর মনের কোণের গোপন ভালবাসা স্ত্রী বা ছেলেমেয়ে কারুর কাছেই তিনি প্রকাশ করতে পারেন নি।

আজ প্রায় দু-সপ্তাহ হল তিনি এখানে এসেছেন কিন্তু পুরাণ দিনের কিছুই তিনি আর খুঁজে পান না। তাঁর চোখে সবই যেন কেমন নূতন ঠেকে। আগেকার দিনের সেইসব বন-জোপ-ঝাড়-জঙ্গলের অধিকাংশই পরিষ্কার হয়ে গেছে। ভূপতিবাবুর কিন্তু মনে হয় সে দিনের সেইসব জোপ-জঙ্গলই যেন অনেক ভাল ছিল। পুরাণো অনেক ভিটের চিহ্নমাত্র ভূপতিবাবু খুঁজে পেলেন না। আবার দেখলেন আশেপাশে কত নূতন নূতন বাড়ী উঠেছে। ভূপতিবাবুর কেমন যেন বিস্ময় লাগে, কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে পুরান চেনা মুখও দেখতে না পেয়ে; চারিদিকেই কেবল নূতন মুখের ভীড়। পুরান আমলের কারুকেই যে একেবারে দেখতে পেলেন না ভূপতিবাবু তা নয়, কিন্তু দু'একজন যাদের দেখতে পেলেন মনে হল তাঁদের না দেখলেই যেন ছিল ভাল। গোপালের বাড়ী গিয়েছিলেন তিনি। সেই বিরাট আটচালা একেবারে ভেঙেচুরে পড়ে আছে, দেখে মনে হয় না এখানে কোন মানুষ বাস করতে পারে। আগে যেখানে রান্নাঘর ছিল সেইখানেই শুধু একটা চাল কোনমতে টিকে আছে। দেখলে মনে হয় একটু জোরে বাতাস দিলে সেখানাও এবার মাটীর সংগে মিশে যাবে। ভূপতিবাবু ভাবলেন—ফিরেই যাই, এখানে কি আবার কোন মানুষ থাকে। আবার ভাবলেন, এতদূর যখন এলাম তখন একবার ডেকে যাই। পড় পড়

সেই চালাটার কাছে গিয়ে ভূপতিবাবু গোপালের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ধরে ডাকবার পর পাঁশুটে কংকালের মতন এক বুড়ী বেরিয়ে এল। একটু ঠাহর করে ভূপতিবাবু বুঝতে পারলেন এ হোল গোপালের মা। ছানিপড়া চোখকে যতটা সম্ভব প্রসারিত করে বুড়ী শুধালো, "তুমি কেডা বাবা?" গোপালরে ত আর কেউ ডাকে না—সেত অনেকদিন মরে গেছে। যেমে কেবল আমারেই ভুলছে। ভূপতিবাবু বুড়ীকে নিজের পরিচয় দিলেন। বুড়ী বল্ল, অঃ তুমি বুঝি আমার গোপালের বন্ধু, তারপরই বুড়ী আবার গোপালের নাম ধরে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল। কাঁদতে কাঁদতে বুড়ি কত কথাই বল্ল, তার কিছু ভূপতিবাবুর কানে গেল আর অধিকাংশই গেল না। বুড়ী বল্ল, একটা নাতি ছিল সেও সহরের কলে চাকরী করে। ঠাকুরমাকে এক পয়সাও দেয় না। বুড়ী বার বার নাতিকে অভিসম্পাত করতে লাগল। ভূপতিবাবু যখন চলে আসছেন, বুড়ী ছানিপড়া চোখকে আরও বিস্ফারিত করে হাত পেতে বল্ল, "বাবা আট গণ্ডা পয়সা দেবা—আফিম কিনুম।"

প্রণবের খবর নিয়েছিলেন ভূপতিবাবু। প্রণব এখানে নেই, বর্দ্ধমানে স্কুল মাষ্টারী করে সে। এখানকার বাড়ীতে তার এক বিধবা বোন কয়েকটা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে থাকে। আগে বছরে একবার করে প্রণব দেশে আসত। গত কয়েক বছর তাও আসেনি।

অনেক কষ্ট করে রহমানের খবর পেলেন ভূপতিবাবু। ওর পৈতৃক ভিটে আর নেই, বড় ভাই ফাঁকি দিয়ে নিয়ে নিয়েছে। রহমান এখন উঠেছে ওর দূরসম্পর্কীয় এক বোনের গোয়াল ঘরে। আগে মাদ্রাসায় পড়াত রহমান কিন্তু হাঁপানীর জন্য চাকড়ী ছেড়ে দিতে হয়েছে। স্ত্রী এবং মেয়েটা এক রকম না খেতে পেয়েই মারা গেছে। আর পনের বছরের ছেলেটা যে কোথায় চলে গেছে তার কোন সন্ধানই করতে পারেনি রহমান। ভূপতিবাবুকে দেখে প্রথমে চিনতে পারেনি রহমান। ভূপতিবাবু নিজের পরিচয় দিতেই উত্তেজনায় রহমান ছেঁড়া বিছানার উপর উঠে বসল। এই উত্তেজনার জন্যই বোধ হয় কিছু কথা বলার আগেই রহমান হাঁপাতে শুরু করল। ভূপতিবাবুর মনে হোল হাঁপাতে হাঁপাতে বুঝি ওর চোখ দুটো ঠিকরে পড়বে। হাঁপানী একটু কমলে ভূপতিবাবুর হাত দুটো ধরে রহমান মিনতি করে বল্ল, "তোমার সংগে সিভিল সার্জেনের নিশ্চয় খুব খাতির আছে, সিভিল সার্জেনকে একবার বলে দাও না আমাকে দেখতে। আমার নিজের ত পয়সা দিয়ে দেখাবার ক্ষমতা নেই। রহমানের বিশ্বাস সিভিল সার্জেন একবার দেখলেই ও ভাল হয়ে উঠবে। ওর চোখে মুখে কৃপাপ্রার্থীর দীন অসহায় ভাব। দীর্ঘদিন ধরে মনে মনে যা কল্পনা করে রেখেছিলেন তার সংগে কিছুই মেলাতে পারছেন না ভূপতিবাবু। কোথায় যেন সুর কেটে গেছে, নিজেকে কোথাও যেন খাপ খাওয়াতে পারছেন না। পুরান দিনের যার সংগেই দেখা হয় কেউ বা ভয়ে কেউ বা সম্ভ্রমে সরে দাঁড়ান, আবার কেউ হাত পেতে কৃপা প্রার্থনা করে। চোখে মুখে তাদের কৃপাপ্রার্থীর দীনতার ছাপ স্পষ্ট কিন্তু আরও আশ্চর্য হওয়া বাকী ছিল ভূপতিবাবুর। সেদিন ঘুরতে ঘুরতে পটলার বাড়ী গিয়ে উঠেছিলেন ভূপতিবাবু। এখানকার কোর্টেই ওকালতি করে পটলা। পসারও বেশ জমিয়ে নিয়েছে। ভূপতিবাবুকে দেখে, আসুন আসুন, বলে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা জানাল পটলা। ভূপতিবাবুর সংগে স্ত্রীর আলাপ করিয়ে দিতে দিতে পটলা বল্ল, "ইনি হলেন এখানকার হাকিম, এবার বদলী হয়ে এসেছেন। ছোটবেলায় আমরা একই স্কুলে পড়তাম হেঁ হেঁ—" খোসামোদ করার ভংগীতে পটলা হাসতে লাগল। ভূপতিবাবু মনে মনে রীতিমত সংকুচিত হয়ে উঠলেন। পটলার ব্যবহারটা ঠিক আর পাঁচজন উকীলের মতন। কোর্টের বাইরে হাকিমকে খোসামোদ করে, আদের অভ্যর্থনা জানিয়ে খাতির জমাতে চায়, এতে নাকি ভাল প্রসার জমে। উকীলদের এই ধরণের ব্যবহারের সংগে ভূপতিবাবু খুবই পরিচিত। ভূপতিবাবুর চোখের সামনে ভেসে উঠল আর এক দিনের ছবি—এই পটলাই একদিন মা মারা যাবার পর তাঁর ন্যাড়া মাথার চাটি মেরে মেরে প্রায় পাগল করে তুলেছিল আজকের পটলার দিকে চেয়ে ভূপতিবাবু মনে মনে

ভাবলেন এর আদর যত্নের হাত থেকে কখন রেহাই পাওয়া যাবে।

চপুর গড়িয়ে কখন যে বিকেল হয়ে গেছে স্মৃতির রোমন্থন করতে করতে ভূপতিবাবুর তা খেয়াল ছিল না। পাখীদের কিচির মিচির শব্দে মুখ তুলে ওপর দিকে চাইতে দেখলেন চপুরের কড়া রোদ ম্লান হয়ে এসেছে আর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী কর্মব্যস্ত দিনের শেষে চারপাশের গাছগুলোতে আশ্রয় নিচ্ছে। ভূপতিবাবু গাছতলা থেকে উঠে পড়লেন মাঠটা পার হয়ে বাড়ী যাবার সহজ সোজা পথ না ধরে একটু ঘুরপথ ধরে হাঁটতে লাগলেন। চলতে চলতে চৌধুরীদের বাগানের সামনে আসতেই তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন, অস্তাচলগামী সূর্যের রক্তিমচ্ছটা দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে কেমন একটা আবেশের সৃষ্টি করেছে। স্বপ্নালু দৃষ্টিতে ভূপতিবাবু চৌধুরীদের বাগানের গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন। উঃ! কি দৌরাত্ম্যই না ওরা এখানে করতেন ছোটবেলায়। এই বাগানটাই তখন ছিল ওদের ছেড়ু কোয়ার্টার।

"ভূপতি না"?

ভূপতি চমকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন তামাটে রঙ, দীর্ঘদেহ এক বৃদ্ধা তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমটা ভূপতিবাবু চিনতে পারলেন না, কিন্তু বৃদ্ধার চোখে চোখ পড়তেই বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—"পারুল! আমি তো প্রথমটায় তোমাকে চিনতে পারিনি, উঃ কি রোগা হয়ে গেছ তুমি। তোমার বরই বা এত মরলা হোল কি করে?" পারুল হেসে উত্তর দিল, "তুমি কিন্তু খুব মোটা হয়েছ—আর ফরসাও হয়েছ খুব।" ভূপতিবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। বহুক্ষণ ধরে দু-জনের মধ্যে পুরান দিনের অনেক কথা আলোচনা হোল। পারুলের স্বামী অনেক দিন হোল মারা গেছে। একটা মেয়ে ছিল; অনেক খুঁজে-পেতে ভাল ঘরেই তার বিয়ে দিয়েছিল পারুল, কিন্তু সে মেয়েও কিছুদিনের মধ্যে একটি ছেলে রেখে মারা গেছে। জামাই আবার বিয়ে করেছে, নাতিকে পারুল নিজের কাছে এনে রেখেছে। পারুল এখন এখানেই থাকে। ভাই নেই বলে বাপের সামান্য কিছু জমিজমা পেয়েছে, তার ওপর নির্ভর করে নাতিকে নিয়ে ও কোন রকমে দিন কাটাচ্ছে। পারুল বল্ল,—"নাতিটা ভীষণ দুষ্টু হয়েছে: বছর দশেক বয়েস হতে চল্ল, পড়াশুনাতে মন নেই। পাড়ার ছেলেদের সংগে খালি হৈ হৈ করে, বেড়াবে আর এর ওর বাগানের ফল চুরি করবে।" ভূপতিবাবু টিপ্পনি কাটলেন, "নাতি দিদিমার স্বভাব পেয়েছে আর কি?" দুজনে হাসতে লাগলেন, নাতিকে খুঁজতে বেরিয়েছে পারুল। চৌধুরীদের বাগানের পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে নাতির নাম ধরে ডাকতে লাগল পারুল। বাগানের নতুন মালিক গেটে দারোয়ান বসিয়েছে। বাইরের কারও বাগানে ঢোকা নিষেধ, কিন্তু এত সত্ত্বেও পাড়ার অনেক ছেলে পাঁচিল ডিঙিয়ে ফল-পাকুড় প্রায়ই চুরি করে। পারুলের ডাকের কোন সাড়া মিলল না, পারুল এবার ভূপতির দিকে ফিরে বল্ল, "ভূপতি মনে আছে, আম চুরি করতে গিয়ে তুমি একবার ধরা পড়েছিলে", ভূপতিবাবু হেসে বললেন, "খুব মনে আছে।"

ঐ বাগানটায় তখন একটা মুর্শিদাবাদী আমগাছ ছিল। চৌধুরীদের মেজকর্ত্তার এই গাছটার আম ছিল অত্যন্ত প্রিয়, তিনি নাকি মুর্শিদাবাদের কোন নবাবের বাড়ীর বাগানের গাছের কলম থেকে এটা পুঁতেছিলেন। ভূপতি, জ্যাড়া, পটলাদের এই গাছটার ওপর দৌরাত্ম্য ছিল সবচেয়ে বেশী। একদিন সন্ধ্যাবেলা ওরা যখন গাছে উঠে ফল পাড়ছে মেজকর্ত্তা ভূপতিকে একেবারে হাতে-নাতে ধরে ফেললেন। জ্যাড়া, পটলা পালাল। মেজকর্ত্তা ভূপতিকে ধরে হিঁচড়তে হিঁচড়তে বৈঠকখানা ঘরের দিকে নিয়ে চললেন। জ্যাড়া, পটলা একেবারে পালিয়েছিল, পারুল কিন্তু একেবারে পালায়নি; একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পারুল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, সাপ! সাপ! মেজকর্ত্তা ভূপতির হাত ছেড়ে এক লাফে দশ হাত দূরে সরে গেলেন আর ভূপতিও এক দৌড়ে বাগানের সীমানা পার হয়ে গেল। উঃ! তখন কি ছুটুই ছিল পারুল পারুল বল্ল, "আমার ওখানে একদিন এস না ভূপতি।" তারপর আবার বল্ল,—"সামনের রবিবার আমার ওখানে ভাত খেও।" ভূপতিবাবু সানন্দে পারুলের

নেমন্তন্ন গ্রহণ করলেন। ভূপতিবাবু যখন বাড়ী ফিরলেন তখন ওঁর দেহের রক্তে রক্তে একটা খুসির ঢেউয়ের বয়ে যাচ্ছে। পুরানো দিনের চারান সুর ওঁর মনের মধ্যে আবার গুন্‌গুনিয়ে উঠল।

শনিবার ভূপতিবাবু এজলাসে বসতেই আম চুরির অপরাধে ধৃত একটি বালককে আসামীর কাঠগড়ায় হাজির করা হোল। শ্যামলবর্ণের, ছেলেটির বয়স বছর দশেক হবে। মুখটা ভারি কচি। ভূপতিবাবুর মনে হোল ছেলেটির মুখের আদলটা যেন বড় চেনা চেনা। ভূপতিবাবুকে নিজের ভাবনা থামিয়ে দিতে হোল—উকিল সওয়াল শুরু করেছে। উকিল তারস্বরে চেঁচিয়ে বল, হুজুর, এই ছেলেটি দেখতে ছোট বটে কিন্তু আসলে এ শয়তানের একটি ছোট সংস্করণ। এই খুদে শয়তান নিজে তো লেখাপড়া করে না, উপরন্তু পাড়ার আরও পাঁচটা ভদ্র সন্তান এর সংস্পর্শে এসে উৎসন্নে যাচ্ছে। উকিল দম নিয়ে আবার শুরু করল, চৌধুরীদের বাগান বলে এখানে একটি বিখ্যাত বাগান আছে। এই বাগানের বর্ত্তমান মালিক "মল্লিক পরিবার" এই খুদে শয়তানটির জন্য বাগানের কোন ফল বিশেষ করে বুলিদাবাদী বলে বিখ্যাত একটি আম গাছের ফল ভোগ করতে পারছেন না। উকিল হুজুরের কাছে আইন অনুযায়ী আসামীকে দণ্ড দেবার প্রার্থনা জানিয়ে বক্তৃতা শেষ করল। ভূপতিবাবু আসামী পক্ষের উকিলকে আহ্বান করলে আসামীর দিদিমা উঠে জানাল তিনি গরীব মানুষ, উকিল দেবার সামর্থ্য নেই, হুজুরের ওপর তিনি নির্ভর করবেন।

এক সপ্তাহের জন্য আসামীকে সংশোধনাগারে পাঠাবার জন্য রায় দিয়ে শহরে ভাল নয় বলে বিচারক ভূপতি মজুমদার এজলাস ছেড়ে উঠে পড়লেন। ভূপতিবাবুর মনে হোল পাকলের চোখ দুটো বুঝি হাসিতে ফেটে পড়ছে। ভূপতিবাবু বাড়ীতে এসে স্ত্রীকে বললেন, শুনছি তৈরী হয়ে নাও! পরের গাড়ীতে এখান থেকে চলে যেতে হবে, আমি ছুটির দরখাস্ত করে এসেছি।

সম্রাট অশোকের অনুশাসন

অরুণচন্দ্র চক্রবর্তী

ছোট বড়ো নয়টা প্রাণীর মধ্যবিত্ত পরিবার—কাল রাত্রি থেকে উপবাসে আছে। সকাল সাড়ে আটটা হবে। গায়ে জামা পরতে পরতে গৃহস্বামী রবি ভাবছে····লেট না হয়ে যাই, একেই তো গত মাসে অসুস্থ হয়ে ছুটীতে থাকায় আজো ছুটী মঞ্জুর হয়নি····তারপর বিল হবে····তারপর····!

পিছনে এসে রবির মা মহামায়া দাঁড়ালেন·····হ্যারে খেকিস কিন্তু, অফিসের ক্যান্টিন্ থেকে যাই হোক্ কিছু খেয়ে নিস্····আর

···কি মা? মৃদু কণ্ঠে রবি বলে।

···'রেশন কার্ড' না কি আজ দেবে বলছিলি····

মহামায়ার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রবির বড় মেয়ে প্রতিমা বলে উঠলো····আনতে কিন্তু ভুলোনা বাবা···· তোমার যা ভুলো মন।

বড় মেয়ের কথায় ম্লান হেসে রবি মহামায়ার মুখের দিকে চাইলো। মহামায়ার চোখে ভরা জল।

····যাই মা' বলে রবি তাড়াতাড়ি অফিসে বেরিয়ে

পরের দিকে

ও বুঝে···অসুস্থ ছেলে ওষুধ না খেয়ে বাসি মুখে গেল···মাগো···ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরুল

ঘরের শ্রী অপরাজিতা···চোখে মুখে বিরক্তি ও পরাজয়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে···উনুনে ছোট ছেলের জন্য রুটি চাপাতে চাপাতে মেজ মেয়ে শ্যামলীকে ইসারায় ডাক দিল তারপর নিচস্বরে বল্‌লো···'যা তো, কাল রাত্তিরে বলছিল অফিসে যাবার পয়সা নেই···এই দুই আনার পয়সা ছেড়ে দিয়ে আয়'·· মেজ মেয়ে দু'আনার পয়সা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

স্বামীর চলে যাওয়া পথের দিকে অতি সজল চোখ দুটী মেলে জানালার গরাদ ধরে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে অপরাজিতা ভাবছে তার স্বামীর কথা···দুঃখ সহ্য করার এত অপরাজেয় ক্ষমতা তাকে কে দিলো ?

অফিসে পৌঁছিতেই বড়বাবু বলে উঠলেন···'আপনি কি 'এ্যাটেন্ডেন্স' খাতায় সই করাটাও ভুলে গেছেন রবিবাবু।'

মৃদু হেসে রবি মাথা নীচু করে জবাব দিলো·· যাতা আর পেলাম কই স্যার।

সকাল সকাল আসতে হয় কড়া মেজাজে উত্তর দিলেন বড়বাবু।

তৎক্ষণ রবি তার টেবিলের সামনে গিয়ে বসেছে।

টিফিনের পর মার কথা মনে পড়তেই রবি ছুটলো অফিসারের ঘরে রেশন কার্ড আনতে। কার্ডের কথা বলতেই, অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন····

'—আপনার ফ্যামিলী মেম্বার ক'জন'

—আজ্ঞে স্যার বিধবা মা, ছোট বোন, স্ত্রী আর ছেলে-মেয়ে পাঁচজন, এই সমেত নয় জন। মাথা চুলকোতে চুলকোতে রবি উত্তর দিল।

...আপনার মা আর ভগ্নি আপনার ফ্যামিলী মেম্বার নন, তাঁরা রেশন পাবেন না ' ঝড়ের মত উত্তর এলো।

কেন ? চোখ দুটো কেন বেরিয়ে এলো রবির।

কোন উত্তর এলো না—এলো রেশন কার্ডখানা সই হতে।

বাড়ী ফিরতেই রবির মুখের দিকে চেয়ে অনুযোগের সুরে মহামায়া বল্লেন···নিশ্চয়, তুই আজো খাস্‌নি···বা-ইচ্ছে তাই কর বাবা! তারপর ধীরে ধীরে কাছে এসে নিচস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন···রেশন কার্ড এনেছিস তো? মাধব খাই খাই করে কাঁদছে····

জুতার টোপ্‌লাটা নামাতে নামাতে রবি বল্‌লো—হ্যাঁ মা এনেছি···কিন্তু তোমার আর ছন্দার রেশন গবর্ণমেণ্ট দেবেন না·····তোমরা আমার ফ্যামিলীর অর্থাৎ পরিবারের বাইরে মা·· বলতে বলতে রবির গলা ভারী হয়ে এলো

বলিস কিরে ? অবাক্ বিস্ময়ে মহামায়া রবি কে জিজ্ঞাসা করলেন !

হ্যাঁ মা সত্যি·· বলে রবি রেশন কার্ডখানা মার হাতে তুলে দিলো।

মহামায়ার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো ছেলের কথা শুনে। এও কি সম্ভব মা সন্তানের কেউ নয়! শাশুড়ীর হাত থেকে কার্ডখানা নিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে অপরাজিতা বল্‌লো···কাল তুমি তোমার অফিসারকে কার্ডখানা ফিরিয়ে দিয়ে বলো····তোমাকে গবর্ণমেণ্ট পেলো কোথা থেকে···· আর····তোমার ঐ গবর্ণমেণ্ট, যে এতো বড় কথা বলতে সাহস পেল····সে-ই বা এলো কোত্থেকে ? সেকি তুই ফুঁড়ে উঠেছে ? বলতে বলতে রবির হাতে তুলে দিল।

মহামায়ার চোখ ভর্ত্তি জল। তিনি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মহামায়ার চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে রবি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বল্‌লো...ছিঃ কি বল্‌ছো তুমি···ও কথা বলতে নেই, সেদিন কাগজে দেখলাম —সম্রাট অশোকের অনুশাসন অনুযায়ী ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করা হয়েছে।

অশোকের অনুশাসন...না চণ্ড অশোকের অনুশাসন বলতে পারো' বিদ্রুপের সুরে বলতে বলতে অপরাজিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

পাশের বাড়ী থেকে গ্রামোফোনের গানের শব্দ ভেসে আসছিল···

...এ দুনিয়ার ভাই সবই হয়...সবই হয়

স- -ব সত্যি.....

····ভগবান হারিয়েছে সেতি...

কর্ম-ক্লান্ত রবি ধপ্ করে চৌকির উপর বসে পড়লো।

ছোট বৌ

নিশির রায়

বেলা গড়িয়েছে কখন! সারা দুপুরটাই বুঝি আজ নিষ্ফল গেলো। সুপুরী আর তালের বাদার পেরিয়ে শিরশিরে পাতলা ছায়ায় থেমে পড়ে গোপীনাথ। মাথা থেকে কাপড়ের বোচ্‌কাটা ঝড়াপাতার গাদার ওপর রেখেশুনে রাখে। নতুন কাপড়ে ময়লা লেগে গেলে খদ্দের মেলা ভার হয়ে উঠ্‌বে শেষে। একেই তো যা বাজার যাচ্ছে! কোমরের ট্যাঁক থেকে একটা মোড়িনী বিড়ি আর দেশলাই নিয়ে আগুন ধরায় তাতে। বিড়িও ফুরিয়ে গেছে—আর মাত্র গোটা তিন সম্বল সেই পরশুদিনের এক 'পেক্' (প্যাকেট)। যা মনস্তাপ—গলায় ছ্যাক্ লাগে। ধক্ ধক্ করে ওঠে আলজিবের তলাটা মোক্ষ হয় না এতটুক্—। খালি পয়সা দেওয়া শালাদের নেমকহারামের দল খালি পয়সাই নিতে জানে, সে-ওজনে মাল দিতে জানে না। ব্যাটাদের অমন বরাবরের ছেরাদ্দ হলে কি হয়ে থাকে কার! আঁষপোড়া বিড়িটা মুখ থেকে সযত্নে ঝড়াপাতার গাদায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে সরোষে এক হাঁচকা দিয়ে বোচ্‌কাটা তুলে নেয় গোপীনাথ। বসতি বাড়ী এখনো বেশ দূরে। এ অঞ্চলে খদ্দের পাওয়া দায়। পায় ফ্রতত্তা এনে ফেলে সে মুহূর্তেকে।

রোজ রোজ এদিকে আসার সময় হয় না। প্রয়োজনও থাকে না তেমন। গাঁয়ের কিষাণ-পল্লীগুলো ওর বাঁধা খদ্দের। সপ্তাহে একবার গেলেও খদ্দের জুটে যায় পাড়ায়। কিন্তু ইদানিং গোপীনাথের কাপড়ের চাহিদা হয়েছে সেরখা বাড়ীতে। কত ভালো ভালো রকমারি কাপড় আনে সে সহর থেকে। সে সব কি ঐ কালি-ঝুলিডোবা কিষাণ বৌদের মানায়, না তার কদর বোঝে ওরা! মিত্তির পাড়া আর চৌধুরী পাড়ার মাঝের বাগান পথে পা চালায় গোপীনাথ—"এই যে কা-প-ড়—কা-প-ড়, বাহারি ঢাকাই শাড়ী—মানে-না—মানা—মনভুলানো—বেনারসী কাপড় চাই—কাপড় এই যে কাপড়—"।

অভিজাত বসতি। দ্বিপ্রাহরিক নিস্তব্ধতা এখনও। অনেক দূর ডেকে যেতে হয় তাকে —

—এই—এই কাপড়ওলা—এই এদো এদিকে। পেছন দিক থেকে কে যেন মিহি গলায় ডাকে। কাপড়ের বোচকা তার কাঁধ থেকে ঝা-ঝাঁয়ে বগলে নিয়ে ঘুরে স্বর অনুসরণ করে আবার ডাক পেয়—এই যে কাপড়—কাপড় চাই

—এই যে এই উঠোনে এসো

এবার?

—সব রকমই আছে মা ভাল খুব বাহারি এবার। মন ভুলানো—মানে-না-মানা—পাশের বাড়ী—। কাপড়ের গাঁঠ খুলতে খুলতে একঝাঁক কপালের স্বেদবিন্দুগুলো মুছে নেয় বাঁ হাতে।

—দেখুন মা যা পছন্দ আসে—। খদ্দের এরি মধ্যে বেশ ছোট খাট ভীড় করে তুলেছে কাপড়ওয়ালাকে ঘিরে। বাবুদের অনুপস্থিতিতে কর্তামাদের পছন্দসই কেনাকাটার এই তো প্রকৃষ্ট সময়। পুরুষের সাথে কি আর কেনা-কাটায় আরাম আছে না স্বস্তি আছে। আর দু'পাঁচটা দেখাশুনা দরদস্তুরকরা এঁদের বাড়ীতে যেমন ফুরিয়ে দোকানে কি আর তত্তটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমবেত খদ্দের মণ্ডলীর মধ্যে অধিকাংশ কাপড় বন্টিত হয়ে যায়। অবশ্য বিক্রীত নয়। শেষে তিনটি শাড়ী পছন্দসই হ'ল বলে এক কর্ত্রীমা বললেন—ওসব তেমন পছন্দ নয়, তুমি এইটে ঠিক করে বলো—'

—ওই তো যা বললাম মা,

বিবেচনা—

—আমার এটা? আর এক মহিলা সোৎসাহে।

—ওই একই হাল আপনার এখন বলে-কয়ে আমাদের ঘরে দুই-একটা লোক আসে—আপনাদেরও যাতে চলা না হয়—

বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যা গড়ায়। সরকার পাড়ায় বেরুতে হয়েছিল তাই। সরকার বাবুরা এ এলাকার জমীদার। সেরেস্টা ঘরবাড়ী—লোকলস্কর ঘর ঘর করে বাড়ী দিনে-রাতে। বাবুদের প্রসন্নতাকে কর্তামাদের নিয়ে বেড়াতে আসেন যিনি বাস্তা ধরে যেতে যেতে দেখা হয়ে যায় কর্তামা অমনি ডেকে বলে গোপীনাথ—এই যে কাপড়— কর্তামারা ছেলে পাঠায় অক্ষয়ের মেয়েছেলে দিয়ে—সেই ভিতর বাড়ীতে ডেকে নিয়ে যায়। কতো কাপড় কেনে, আবার বলে দেয়, সামনের হাট আরো কতুন দেখে কাপড় নিয়ে এসো সহর থেকে—আর সবার আগে আমাদের এখানে চলে এসো কিন্তু। তাই এ অঞ্চলে কাপড় নিয়ে এলেই কিসের মোহ ওকে টেনে যায় ওদিকে; কর্তামাদের এখানে পয়লা যেতে হবে—বলে দিয়েছে। ব্যবসায়ী তারা যতোখানি অব্যবসায়ী তাড়া চেয়ে বেশী। ভদ্রলোক যদি হতে হয় তবে ঐ-রকম; না হয় তো রাস্তার পাশে থাকতে হয়—যেখানে পড়ে হাবুডুবু খাওয়ার কোন মানেই হয় না। লাভি-লস্করে বড়লোক টাকাওলা তো দুনিয়ার পথে-ঘাটে। কিন্তু এমন সুখ্যাতি কি তাদের সবার! এমন মি-মেমাকী তাদের ক'জনের বাড়ীর কর্তীমারা! অমন পরাণঢালা কলাই বা কয় কার সাথে ক'জন। নিজের কাঁচা মনে কাঁচা ভাবনা নিয়ে পথ চলে গোপীনাথ। কর্তীমারা এতজন—তবু কেমন সুন্দর—যাদু-মায়েদের ছায়া মাড়ায় না কেউ। সরকার বাড়ীর ঐশ্বর্য্য আর স্বচ্ছলের মাকড়সা গোপীনাথের সরল মনে মোহের জাল বুনতে পারে কাজে-অকাজে। ওর একঘরে ছোট মন ভিন্ন অজানা পরিবেশের ভাবনাতে উদাস হয়ে উঠে। তাই দু বেলা-বেলা হলেও এদুখো না হয়ে ফিরতে পারে না ও —ওর নিরালা ভালা ঘরে।

সরকার বাড়ীতে তার আর একটি পরিচয় আছে—সেটা পুরুষানুক্রমিক। তার পূর্ব্ব পুরুষের দুই পুরুষ এ বাড়ীর ভাতে জলে মানুষ; গায়ে-গতরে অনুচর জীবন কাটিয়ে গেছে পরম আনুগত্যে। গোপীনাথের ঠাকুর্দা ব্রজনাথ ছিল একটু অন্য রকমের। বাবু-পিতামোর অনুশাসনের ছেদ পড়ার সে-ই। বাবারা একঘেয়ে জীবন নাকি তার কাছে ছিল অসহ্য। গোপীনাথের বাবা ছিলেন সীতানাথ—কবি মানুষ। গাঁয়ে গাঁয়ে কবিগানে মেতে বেড়াতেন। বড় বড় রাজ-রাজড়ার মজলিসে তার ছিল অবাধ গতি। সারাটি জীবনে এপ্রান্তি-সেপ্রান্তি করে ঘুরেছেন দেশে-বিদেশে। তিনি গাইতেন—

হারে, চার কোণায় চার বাঁশের খুঁটি
চার কোণায় চার বেড়ার আটি
তারেই যদি বলিস তবে ঘরবাড়ী
হারে, তার কোণায় তোর মনকে বাঁধিস
সেই সঙ্গে তোর মনকে ভুলিস
ক্ষুদ্র মনে সাধ হয় তোর
ক্ষুদ্র করে হাসা-কাঁদা—

এখন গোপীনাথও গাইতে পারে। তার সে সব গান আর ছড়া এখনো পথে-ঘাটে শোনা যায়। তারই রক্ত গোপীনাথের গায়। শুভ্র-শ্যামল কান্তি দেহ তারও। আর কণ্ঠও তার বাপেরই মতন মধুক্ষরা। ছেড়ে যাওয়ার নেশা তারও রক্তে মাঝে চাড়িয়ে ওঠে সময়-বেসময়ে। গ্রামের বাঁকে আঁধার-রাতা পথের আল বেয়ে চলতে চলতে যাবার গানেরই এক কলি গেয়ে ওঠে—

ও দয়াল্, দয়াল্ রে,
পাওয়ার মত পাওয়া যদি
কণামাত্র হয়
এই নিরজনে না-পাওয়ার আর
কিসের তিরাশ্ রয়—
দয়াল্ রে—এ—এ—এ—এ—

সরকার বাড়ী যেন গোপীনাথকে পেয়ে বসেছে। পরিচিত সেই আভিজাত্যের জৌলুস-লাগা ছোট্ট আভ্যন্তরীণ পরিবেশটি। যেখানে সরকার বাড়ীর স্ত্রী-মেয়েদের কেনা-কাটা—বড়া বৌ, মেজ বৌ, ছোট বৌ যেখানে তার খরিদ্দার। ছোট বৌ! সমস্ত সহর হন্যে হয়ে খোঁজে কতদূর ভালো তার জিনিষ হতে পারে সরকার বাড়ীর

অন্তঃপুরের ব্যাপারে। আগের মতনে কুলোয় না সহরের মহাজন তার উপর অসন্তুষ্ট নয়।

—গোলে কিন্তু তুমুরে দে মাল নাও না গোপীনা বলে মহাজন।

—হ্যাঁ, তাই নাও মহাজন, তবে একটা কথা কিছু লিখতে হবে যেন কষ্ট করে। এই সামনের কিস্তিতে পারবার করব। অর্থাৎ কিছু বাকী খাতায় লিখতে হবে গোপীনাথের গলায় সুরোপ বন্ধের আবদার।

কেরার পথে ভাবে পড়লাই সরকার বাড়ী যেতে হবে। গোলাপী ঝাড়াটা ছোট বৌকে যা মানায় অন্যকে তা নয়। এক তথ্যী শুভ্রশ্রী যৌবনদীপ্ত নারীমূর্তি ভেসে ওঠে ওর কল্পচোখে। হ্যাঁ, সরকার বাড়ীর ছোট বৌ! প্রথম বিয়ে হয়ে স্বামীর বাড়ী আসা ছোট-বৌ-এর লজ্জানম্র ফুটফুটে মুখখানি মনে পড়ে ওর! সেইদিনই কেন যেন ওরও কাপড় নিয়ে যাবার টান পড়েছিল সরকার বাড়ীতে। ছোট-বৌ সহরের মেয়ে—চাল-চলনে কথায়-বার্তায় কেমন যেন অবাধ আড়ম্বর। কেমন যেন কাছে টানার মন্ত্র ওর ভোমরা-চোখে। রঙীন চেলীপড়া ছোট-বৌ গোপীনাথকে বলেছিলো,—

—তোমার এতো সুন্দর স্বাস্থ্য—ঘুরে বেড়াও কেন অমন করে? লজ্জায় অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল গোপীনাথ সেদিন। মাথা ভেঙ্গে পড়েছিল তার। এমন কথা তো কেউ বলে নি তাকে কোনদিন! কত তো গ্রাম-গঞ্জ ঘুরে বেড়িয়েছে মাসের পর মাস! মুখ নীচু করে বলেছিল ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায়—

—আমরা দুখ্পু মানুষ, আর কি করার আছে মুদের—বলেই ভেবেছিল এ কি বললো সে! না জানি কি ভাবলো ছোট বৌ। অনেক হেসেছিল ছোট বৌ গোপীনাথের কথা শুনে। কি মিষ্টি হাসি—চাঁদী রূপোর চেউ খেলানো—কেমন যেন নেশার ভাব আসে তাতে। এ কি হোল তার। সে তো এতো বোকা নয়! বোকা!

—সহরে চলে গেলে তো পারো। সেখানে এমনিই লেখা পড়া শেখা হয়ে যায়—কতো কি জানা যায়—ছোট বৌ তাকে বলেছিলো।

তারপর অনেক আলাপ করেছে ছোট বৌ গোপীনাথের সংগে সরকার বাড়ীর আভ্যন্তরীণ খোলাখে—দ্বিপ্রাহরিক নিস্তব্ধতায়। বাঙ্গা বৌ, মেজ বৌ সবাই থাকতো, কিন্তু ছোট বৌ এর মতো অন্তরঙ্গতা নেই কেন ওদের গলায় আর আচরণে! গোপীনাথ ভাবে বোধ হয় পূর্বপুরুষগত পরিচয়ের সূত্রে। সে পরিচয় দাসত্বের পরিচয়। দাসের ঘরে দাস—আবার কি।

—গোপীনাথ, এই ঠাঁঠা দুপুরে এখানে খেয়ে দেয়ে বিকেলে রোদ পড়লে ছোটবৌ বলে।

—না কর্তী, জীবনই তো যাদের রোদ্দুরে খাটার। আগুনে জলে খাটার তরে। উহে আর কি। আমি পা বাড়াই। আকাশ বাঁকা লক্ষ্য করে ছোটবৌ বলেছে, বিক্রী আর কি করবে—সবই তো প্রায় এখানে হোল—

গোপীনাথ খুঁজে পেতো ছোটবৌ-এর ঠোঁটের পরশ পাওয়া পেলব কথাগুলোর শিথিলতায়—তার অনেক স্বপ্নের রাজকন্যার দিশারী ইংগিত। তার কাজল চোখের রক্তাভ-মেদুরতা গোপীনাথের মনে কিসের কোন কল্প পতঙ্গের ডানাটানি জাগিয়ে দিয়ে যেতো যেন। শিরায় শিরায় সঞ্চিল গতিতে কিসের জোয়ার বয়ে যেতো ঈশান হয়ে—ছোটবৌ-এর অনাবৃত উজ্জ্বলতায়। বুকের ভিতর পাখি ডেকে মরতো কোন নিঃসঙ্গতার আকুলি-বিকুলি— আর ছোটবৌ—ছোটবৌ কি বুঝবে ওসব। ছোটবৌ প্রশ্ন করে—

—তোমার তো এগিয়ে পেছিয়ে নেই কেউ—ঘরের কোণ অন্ধকার। সন্ধ্যায় নিজে জিরে বাতি না দিলে, আর এক জোড়া হাত নেই—তবে এত আঁটুনি-বাঁধুনি কেন তোমার? একথার জবাব দিতে পারে নি সেদিন। পরে নিজের অজ্ঞাতে এর প্রশ্নের জবাব মনের মাঝে অলক্ষ্য-অন্তরালভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠে হারিয়ে গেছে কতোবার—সে খবর কে রাখে! ছোটবৌ, সেই সরকার বাড়ীর ছোটবৌ—গোপীনাথের ছোটকর্তী

বেলা পড়ে এসেছে—হেলে পড়েছে পশ্চিমের গায়। সারা দুপুর সহর ছেড়ে গ্রামের পথে পথে হেঁটে এগিয়েছে

গোপীনাথ রাস্তায় একবারেও চাঁচেকি দে—ও.ড—এই যে কাপড়—। হকারের তার অভাব কি সবার কাছে কাপড়-কাপড় বলে হাকতেও কেমন যেন তার বাধে আজকাল। এবার পুজোতে সব সরকার বাড়ীতেই লাগবে এটিও বাইরের ভক্ত নয় আর যে রামগরুড় পাড়টি আনতে দেরী হোল এতো—কিন্তির টাকা কিছু টান পড়ে গেলো—সেটি ছোটবৌ ছাড়া আর কেউ পড়বে—এ সব ভাবনার বাইরে। এ 'গেরামে' দ্বিতীয় নেই কেউ—

ছেলের কপালে কাল
চাইতে কপালে হাল
দুটো শুভে রাজযোটে
সুখ্যাতি কর হাজারে

—এ তার বারবার কথা

—এই যে গুপীদা এইযেতো বলি এ কদিন ছেলে কোথায়? বাইরের দাওয়ায় সরকার বাড়ীর চা মোহনের সাথে দেখা হয়ে যায়।

—থাকবে আর কোথায়। গেছিলাম একটুন্ শহরে এই মালপত্তর আনতে—। কপালে হাতের চেঁটা তুলে বাহাদুরের আঙুলে কেঁচে নিয়ে বলে.—

—তা কত্তামারা খুব রাগস্থ হয়েচেন্ আমার পর কেমন, রাগটা? নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয় গোপীনাথের। লজ্জা-দুঃখে কুঁকড়ে ওঠে ভিতরটা। উৎসুক হয়ে বাড়ীর পথে পা বাড়ায় সে। পাছে আরো দেরীতে আরো বেশী অপরাধ হয়ে যায়।

—আরে যাও কোথায়? রাধুদা পেছন ডাকে।

কত্তিমাদের চক্কি যে কাপড় আনছ, দেখিয়ে আমি যাও—বড় সরেস কাপড় এবার- কি বলব বড় সরেস—পরলা নম্বরের—

রাধুদা এগিয়ে গোপীনাথের কথায় বাধা দিয়ে বলে,—নাও। কত্তামারা যে কালের দিন আগে (পরশুদিন) কল্‌কেত. গেলেন। বড়কত্তিমার অসুখ বড় সিখানে পুরন অসুখ কি ঘটে কওয়া যায় না। ভিন্ন ই কয় মাস নাগাদ কত্তামারা উখানেই থাকবে হুঁ, তুমি বুঝি জান না।

গোপীনাথের মুখে কি অদ্ভুত নিস্পৃহতার অভিব্যক্তি ফুটে উঠে। আর বুকটা কেমন যেন নিষ্ফল, নিরর্থক অভিমানে কুঁকড়ে ওঠে।— —ছোটবৌ, জমিদার গৃহিনী, সামান্য কেরানী এক গোপীনাথের 'ছোট কত্তামা' কলকাতায় চলে গেছে; হয়তো আসবে আবার, বা আসবেই না কোনদিন। কিন্তু কে জানে এর জন্য গোপীনাথের এ অবোল-অজানা বুক টনটন্ বেদনা কেন!

শুধু কান্না

ফেদেরিকো গারসিয়া লরকা

আমি জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছি
কারণ কান্নার শব্দ সইতে পারি না।
কিন্তু দূরের দেয়ালের পার হতে
কিছু নয় শুধু কান্নার শব্দ শোনা যায়।

দেবদূত, তারা ক'জন মাত্র গান গাছে,
কুকুর, কয়েকটা মাত্র শব্দ করে
আমার হাতে হাজারটা বেহালা বাঁধা আছে।

কিন্তু কান্না,
একটা দুর্দমনীয় কুকুরের মতো,
করুণ এক দেবদূতের আর্তনাদে,
নিষ্ঠুর ছড় টানা বেহালার স্পন্দনে
বাতাসকে উন্মুখ করে।

কান্না, আর কিছু নয়
শুধু কান্নার শব্দ শোনা যায়।

অনুবাদ : সরিৎ চোকদার

উপহার

অরুণেন্দু বিশ্বাস

রজনীগন্ধা নয়—
যন্ত্রাহত হৃৎপিণ্ড থেকে
দিতে পারি এক পেয়ালা
টক্ টকে লাল রক্ত

নরম ফুলের আঘাত
মূর্চ্ছা ডাকে না আর।

এই জগতের তীব্র অম্লপাতে
আমার রক্তে লেগেছে আগুন,
আর সেই আগুনে
পুড়ে মরছি পলে পলে

এই রক্ত মিশাও
তোমার উজ্জ্বল রক্তের সাথে।

বিশ-শতক

অনিলবরণ ভট্টাচার্য

বিশ-শতকের মধ্যাহ্নে আজ
কাঁচুমাচু মুখে বসেছিলাম
হৃতভম্ব আমার ভাবনার দেহলীতে।
ভাবছিলুম বোধহয়
কি করে এত ভালোবাসলুম
এই বিশ-শতককে ?

এই তো পৃথিবী—
শ্বেত-সভ্যতার বুটের ঠোক্করে ঠোক্করে
গড়িয়ে চলেছে
রক্ত ঝরিয়ে।
এইতো মানুষ—
বুক ভরা সাহারার হাহাকার নিয়ে
ধুকছে—ছুটছে—
এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে
মুখে-রক্ত-ওঠা তাড়নায়
এক মুঠো মৌসুমীর প্রত্যাশায়।
বিশ-শতকের যৌবন
ধানের শীষের মতো ডগ্‌মগিয়ে ওঠে না:
সূর্য-স্বপন-দেখা শিশিরের মুকুট পড়ে।
অকুরান এলোমেলো খাপ্পামির
অকারণ কলরোল জাগে না
তার ধমনি-ধারার উপকূলে।

তার চেতনার নেপথ্যে
কখন হৃদ্গত বাসনা মুহূর্ত
উঁকি দিয়ে গেছে একবার,
হৃদ্গত বাতায়ন পারনি খোলা,
হৃদ্গত প্রাণের শুকনো ডালে তার
জেগেছিল ক্ষণিকের নবুজ শিহর,
কোনো লাজুক মেয়ের ভীরু চাহনি
হৃদয়ে রেখে গেছে
এক টুকরো না-বলা সংলাপ
সেই চোখ, সেই উত্তাপ
সেই না-বলা কথার অফুরন্ত
দিয়ে গেছে তার পোড়া অবসরকে
ভেঙে দীর্ঘশ্বাসে ভারাক্রান্ত করে।

নিষিক্ত স্বপ্নের রোমন্থন
প্রত্যাশার লেগুনে কয়েকটি বুদ্‌বুদ্ তুলে
পড়ে থিতিয়ে।
মরা প্রাণের পচা তলানির নীচে
মুখ গুঁজে খোঁজে হয়ত সে
আঁস্তাকুড়ের আনন্দ ;
আত্ম-অপচয়ের পিছল ইশারার কাছে
ধরা দেয় সে সহজেই।

বিশ-শতকের ফ্যাকাসে যৌবনের
চোখের তলায় দুঃস্বপ্নের কালী।
কণ্ঠা-বার-করা-দেহে তার অবশেষে
প্রৌঢ়ত্ব এসে হামাগুড়ি দিয়ে।
তার কুঞ্চিত ললাটের
অসংখ্য বলীর ভাঁজে
কিল্‌বিল্ করছে অগণিত প্রশ্ন—
জীবনের-জীবিকার ব্যর্থতার-বেদনার
অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা !
নানা মুদ্রিলের আবর্তে
নাকানি-চুবানি খেয়ে নাজেহাল
বেচারী বিশ-শতক !

তবু এই শেষ নয়,
শব নয়।
আমি যেন শুনতে পাচ্ছি
জরা-জীর্ণ বিশ-শতকের দুয়ারে
দলিত-দামাল কচি পায়ের দাপাদাপি,
নিশ্চুপ শ্মশানের পোড়া মাটিতে
মর্মরিত সবুজের পদসঞ্চার।
আমি যেন দেখছি—
এক নতুন দিগন্ত
আকাশে মেলে ধরেছে তার
সোনালী কলাপ।
যুদ্ধ-হিংসাংসার জঠর থেকে
ছিনিয়ে এনেছে সে
একফালি নিটোল অবকাশ,—
যেখানে মানুষ পেয়েছে
একখানি বৃষ্টি-ধোয়া আকাশ,
যেখানে নুঠো নুঠো রূপোলী স্বপন
আপন খুশীতে ভেসে বেড়ায়
শরত-মেঘের ডানায় ডানায়
গা এলিয়ে।
তাইতো ভালোবাসি—
বুকে জড়িয়ে ধরি
লাঞ্ছিত বিড়ম্বিত
এই বিশ-শতক-কে
সুন্দরের সাধনায় সমুদ্যত
তার ঋজুতাকে।

সহর

গোপালকৃষ্ণ ভাস্কর

এ সহর কথা কয় অনেক সময়
কখনও প্রখর সূর্যে কখনও বা ঘুমন্ত নিশীথে
অনেক নিঃশব্দ কথা জমা হয় মনের তলায়,
কিছু শুনি—কিছু তার ভেঙে পড়ে আকুল সঙ্গীতে
অভাব ছড়ান চারিদিকে। তবু কথা অনেক কথার!
পাতার আড়াল দিয়ে আলো ঝরে—যে আলো ঝরার
ইতিহাস গাঁথা হয় মুহূর্তের বিস্মরণ দিয়ে: তবু তার
প্রাণের স্পন্দন শুনি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাষার
জালের আড়ালে। এ সহর কথা কয় বিভিন্ন ভাষায়
কিছু বুঝি—কিছু তার রূপ নেয় 'আলো' ছায়া
যেখানে সঙ্গীতে—
রৌদ্রের দহনে আর শব্দহারা ঘুমন্ত নিশীথে
এ সহর নীরবে তাকায়॥

নক্ষত্র বিদায়ের পর

সুবোধকুমার গুপ্ত

এখন নৈঋত কোণে তারার মরণ—
সহসা উদ্বেল করে।
ভুলে গেছি তাকে তার প্রিয় পরিজন
ভেবে যে দিয়েছে নীল যন্ত্রণার হেমপাত্রে অমৃত ভাণ্ডার
নিয়ত নিবিড় প্রাণে। কবে মনে নেই, সাগর ঝিনুকে তার—
'অরুন্ধতী' নামখানি উজ্জ্বল অক্ষরে পড়ে' কঠিন দু'চোখ
ফিরিয়ে নেবার পর বিপন্ন ফাগুনে কত পুড়েছি যাহোক!
পাবো তাকে ফের
যে ছিল সন্ধ্যার তারা—যে ছিল ভোরের?

আয়ুর্ব্বেদের শল্য-চিকিৎসার উৎকর্ষ ও অবনতির ধারা

ভূপেশ দাশগুপ্ত

পশ্চিমের যান্ত্রিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষ আজ আমাদের মস্তিষ্কে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, তাহার বাহিরে আমরা আর কোন কিছুকেই বৈজ্ঞানিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। এই ধারণা বিশেষ করিয়া দেখা যায়, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা ছাড়া আর যাহা কিছু চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে, তাহা যেন অবৈজ্ঞানিক এইরূপ একটি ধারণা আমাদের পাইয়া বসিয়াছে। বিশেষ করিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য শল্য চিকিৎসার চমকপ্রদ উৎকর্ষ দেখিয়া আমরা ভাবিতেও ভুলিয়া গিয়াছি যে, একদা আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে যান্ত্রিক শল্য চিকিৎসা রীতিমত বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল। য়ুরোপে যেমন বহুশত বর্ষ ধরিয়া ধর্ম্মের প্রভাবে বিজ্ঞান বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই, আমাদের ও দুর্ভাগ্য, প্রাচীন ভারতেও সেইরকম, ধর্ম্ম ও আনুষঙ্গিক কারণে এই শল্য বিজ্ঞানের ধারা ব্যাহত হয়।

ভগবান বুদ্ধের সময়েও আমরা দেখিতে পাই শল্য চিকিৎসার প্রভূত প্রচলন ছিল ও তাহা যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। প্রথম যুগে বৌদ্ধ শ্রমণগণ চিকিৎসাকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সেইজন্য তখন ইহার প্রসার যথেষ্ট হইয়াছিল।

আয়ুর্ব্বেদে শল্যপ্রধান চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তক কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি। পরবর্ত্তিকালে ঔপধেনব, পৌষ্কলাবত, বৈতরণ, সুশ্রুত প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যবর্গ নিজ নিজ নামে শল্যতন্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। বর্ত্তমান কালে কেবল সুশ্রুত সংহিতাই পঠন পাঠনে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই শল্যতন্ত্র আবার দুইভাগে বিভক্ত যথা—সাধারণ শল্য চিকিৎসা ও প্রসূতিতন্ত্র। সাধারণ শল্যচিকিৎসা—অর্থাৎ শস্ত্রসাধ্য সাধারণ ব্যাধির নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা বিধি, যন্ত্রশস্ত্র সমূহের লক্ষণ, রক্তমোক্ষণ এবং অগ্নি, ক্ষার, জলৌকা ও শস্ত্রাদি প্রয়োগের নিয়ম শল্যতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

প্রসূতিতন্ত্র—গর্ভের উৎপত্তি, গর্ভিণীচর্য্যা, গর্ভিণীর রোগ চিকিৎসা, গর্ভের রক্ষা বিধান, প্রসব প্রণালী এবং মূঢ়গর্ভ চিকিৎসা প্রভৃতি।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে শল্যতন্ত্রের যে উৎকর্ষের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সত্যই বিস্ময়কর, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর গৌরবের বস্তু। আয়ুর্ব্বেদের শল্যতন্ত্রে প্রমতাগ্র (scalpal) মণ্ডলাগ্র শস্ত্র (sharp curate) প্রভৃতি শস্ত্রাদির সম্বন্ধে যে বিভাগ করা হইয়াছে তাহা যেন সুষ্ঠু, আবার স্বস্তিক (Dressing forceps) সন্দংশ (Dissecting forceps) এষণি যন্ত্রাদির (Director with scoop) বিভাগও তেমনি মনোজ্ঞ।

অস্থিভঙ্গ, সন্ধিবিচ্যুতি, প্রভৃতির চিকিৎসা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদে যে বর্ণনা আছে তাহা আধুনিক শল্য শাস্ত্রের নব্য সিদ্ধান্ত হইতে কোন অংশে অযোগ্য ছিল না। আয়ুর্ব্বেদে উদর-বিদারণ, হস্তপদাদির ছেদন, গর্ভাশয়ের উপর শস্ত্রকর্ম্ম, বস্তি বিদারণ করিয়া অশ্মরী আহরণ বিধি প্রভৃতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। এই চিকিৎসা শাস্ত্র এতদূর উন্নত হইয়াছিল যে সেকালে নৃপতিগণ যুদ্ধ যাত্রায় বৈদ্যগণকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং তাহাদের জন্য পৃথক পৃথক স্কন্ধবার (camp) স্থাপিত হইত। সুশ্রুত সংহিতায় আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শত্রুগণ দ্বারা জলবায়ু দূষিত হইলে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও ছিল।

বিম্বিসার ও তৎপুত্র অজাতশত্রুর রাজত্বকালে গৌতম বুদ্ধ যখন মগধে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার করেন সেই সময় আত্রেয়

শিষ্য জীবক তাঁহার চিকিৎসা প্রণালী দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগে সাহিত্য, কৃষি বাণিজ্য, নৃত্যগীত ও অন্যান্য ললিতকলার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎকর্ষ যে যথেষ্ট সাধিত হইয়াছিল জীবক তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। এস্থলে জীবকের জীবনের কয়েকটি উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়া সে সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। জীবক ছিলেন ভগবান বুদ্ধের একজন প্রিয় উপাসক কেহ বলেন তিনি বিম্বিসারের পুত্র অভয়ের সন্তান (উপপত্নীর গর্ভজাত)। তিনি ভগবান তথাগতের এমন একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন যে দিনে তিনবার তাঁহাকে না দর্শন করিলে তিনি শান্তি লাভ করিতেন না। বেণুবন জীবকের গৃহ হইতে কিছু দূরে অবস্থিত ছিল বলিয়া তথাগতের অবস্থানের জন্য নিজের আম্রকাননে একটি বিহার প্রস্তুত করিয়া দেন। ভগবান বুদ্ধ সময় সময় সেই আম্রকাননে অবস্থান করিতেন। জীবকের বিদ্যা অর্জ্জন সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে জীবক বিদ্যা সমাপন করিয়া যখন আচার্যদেবকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁহার আর কতদিন শিক্ষার প্রয়োজন তখন আচার্যদেব বলিয়াছিলেন চারিদিনের ভিতর এই নগরের চতুর্দ্দিকে দুই যোজনের মধ্যে যত জঙ্গলতা, ফলমূল, মূল কাণ্ড ইত্যাদি দেখিতে পাও সমস্ত পরীক্ষা করিয়া আমায় বলিবে কোনটি ভেষজরূপে ব্যবহার হয় না। জীবক অনুসন্ধানের পর উত্তর করিয়াছিলেন—যে গুল্মলতা ঔষধরূপে ব্যবহার হয় না এমন কোন উদ্ভিদ্ দেখিতে পাইলাম না। তাহা শ্রবণ করিয়া আচার্যদেব বলেন তোমার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি দক্ষিণা গ্রহণ না করিয়া উপরন্তু পাথেয় দিয়া তাঁহাকে স্বদেশে প্রেরণ করেন। স্বদেশ যাত্রার কালে সাকেত নগরে এক মহিলার উর্দ্ধজত্রুগত রোগের চিকিৎসার জন্য আহূত হইলে মহিলা তাহার বয়সের নবীনত্ব দেখিয়া ঈষৎ অনাস্থা প্রকাশ করেন। জীবক তাহাকে একপ্রকার নস্য গ্রহণ করাইয়া রোগ নিরাময় করেন এবং একথাও বলেন যে বিদ্যার নিকট বয়সের নবীনত্ব বা প্রাচীনত্ব নাই। মহিলা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করেন।

এক সময়ে বিম্বিসারও ভগন্দর রোগে যন্ত্রণা পাইতেছিলেন। জীবক একটি প্রলেপ দিয়া তাঁহাকে ব্যাধিমুক্ত করেন। অন্যত্র দেখা যায় জীবক একপ্রকার মণির সাহায্যে রোগস্থানের অভ্যন্তর ভাগ পরীক্ষা করিতেন এবং ঐ মণির সাহায্যে তিনি শিরোগত কৃমির নির্ণয় করিয়া শস্ত্র সাহায্যে শিরঃকপাল অপসারণ পূর্ব্বক কৃমি আহরণ করিয়া পুনরায় প্রতিসন্ধান করিয়া বহু দুরূহ শিরঃপীড়ার উপশম করিতেন।

বিম্বিসার একদা জীবককে রাজগৃহের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির শিরঃপীড়ার চিকিৎসার জন্য আহ্বান করেন। জীবক তীক্ষ্ণধার শস্ত্রদ্বারা করোটি ভেদ করিয়া মস্তক হইতে দুইটি কীট আহরণ করিয়া প্রতিসন্ধান করিয়া প্রলেপ দ্বারা তিন সপ্তাহ কালের মধ্যে তাঁহাকে আরোগ্য করেন।

ধাত্রীবিদ্যায় জীবকের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। রাজগৃহে একটি স্ত্রীলোকের উদর বিপাটন করিয়া, সন্তান নিষ্কাষণ করিয়া তিনি প্রভূত যশ অর্জ্জন করেন। তাহার উপাধিও ছিল কৌমারভৃত্য।

বস্তি বিদারণ প্রভৃতি শস্ত্র চিকিৎসায়ও তাঁহার অসামান্য খ্যাতি ছিল। একদা বারাণসীর এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্রের অন্ত্রের একাংশ গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া তাহার শরীর ক্রমশঃ অস্থিচর্ম্মসার হইয়া যায়। রোগীর পিতা বিম্বিসারকে বলিয়া জীবককে বারাণসী লইয়া যান। জীবক রোগীর বস্তি দেশ বিদীর্ণ করিয়া অন্ত্রটিকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

ভগবান বুদ্ধ যখন কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে আক্রান্ত হন তখন জীবক তিনটী পদ্মের মধ্যে অতি মৃদুবীর্য্য বিরেচক ঔষধ স্থাপন করিয়া ভগবান বুদ্ধকে আঘ্রাণ করিতে দেন এই প্রক্রিয়াতে তথাগত নিরাময় হন।

দেবদত্ত যখন বুদ্ধদেবকে পাষাণ নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিতে যান তখন ঐ পাষাণের একখণ্ড লাগিয়া তাঁহার পদে ক্ষত হয় সেই সময়ও জীবকের চিকিৎসায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন। জীবকের চিকিৎসা নৈপুণ্যের এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়

সে সময় চিকিৎসা বিজ্ঞান কতখানি উচ্চস্তরের ছিল। পরবর্তিকালে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ও তৎপুত্রের মৃত্যুর পরে সম্রাট অশোক সিংহাসন লাভ করেন। কলিঙ্গ যুদ্ধের পরে তিনি উপগুপ্ত নামক বৌদ্ধাচার্য্য কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে আকৃষ্ট হন এবং ধর্ম্মানুরাগী হইয়া উঠেন। তিনি মিশর, গ্রীস ও সিরিয়া প্রভৃতি বহু দূর দেশসমূহে ভ্রমণদিগকে প্রেরণ করেন। সেই সময় পরহিতব্রত ভ্রমণগণ দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যা ঐ সকল দেশে যথেষ্ট প্রচারিত হইয়াছিল। সম্রাট অশোকের অনুশাসনে দেখা যায় তিনি ভারতবর্ষে ও দূর দেশসমূহে মনুষ্য ও পশু উভয়ের চিকিৎসার জন্য ভেষজবৃক্ষের সংগ্রহ ও রোপণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সম্রাট অশোকের তিরোধানের পরবর্ত্তিকালে বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সংঘর্ষের ফলে ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক দিক ক্ষুণ্ণ হইয়া যায় এবং বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের প্রাধান্যই কেবল আকারে দেখা দেয়। ব্রাহ্মণগণ শুচিতা ও অস্পৃশ্যতাকে ধর্ম্মের অঙ্গরূপে গ্রহণ করিতে থাকে এবং বৌদ্ধগণ শস্ত্রপ্রয়োগকে হিংসাধর্ম্মের মধ্যে গণ্য করিয়া ভারতের শল্যশাস্ত্রকে চিরতরে বিলোপ করেন। পরবর্ত্তি সময়ে দেখা যায় ইহা অবনতির এতদূর চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল, যে জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য যখন ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন তখন উহা অচিকিৎস্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এইভাবে শস্ত্রচিকিৎসা ক্রমে অনভ্যাস অবস্থার ক্রমাবনতির পথে আসিয়া প্রায় বিলীয়মান হইয়াছে।

সংকলন

বাংলা ভাষা ও বিহার

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

দশম শতাব্দীর মধ্যেই বাংলাদেশ নিজের একটি শক্তিশালী ভাষা সৃষ্টি করে নিয়েছিল—একথা আজ সবাই স্বীকার করে থাকেন। ফলে একটি বাংলা ভাষাভাষি অঞ্চল বহু প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান; প্রশাসনিক সীমার শাসনে অনেক সময়ে এই দেশের স্বাভাবিক সীমা (ভাষাগত) ব্যাহত হয়েছে, রাজ্য ভেঙেছে গড়েছে—দেশের ভাষাগত ঐক্য কখনও ব্যাহত হয়নি। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর বাংলাভাষার সাথে প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার—ধরা যাক দশম শতাব্দীর ভাষার—যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান। কিন্তু দুটো ভাষাই এক। একটি অপরটির পরিণত রূপ। তাই রাজ্য ভাঙ্গাগড়ার মধ্যেও বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি ভাষার মাধ্যমে একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে।

বিহার এবং আসামের অবস্থা ঠিক বিপরীত। আসাম সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। বিহারের আলোচনাই আগে আরম্ভ করা যাক। এটা প্রমাণ করা খুব কঠিন নয় যে আজ বিহার বলতে আমরা যে দেশটি বুঝে থাকি, তার কোন ভাষাগত ঐক্য নেই, যা আমাদের বাংলা দেশের রয়েছে। খাড়িবালী হিন্দীভাষী অঞ্চল হিসাবে বিহারের দাবী সাম্প্রতিক কালের সৃষ্ট একটি মনোরম ধাপ্পা।

প্রথমে বিহারের ভাষাগুলিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় দেখা যাক। বিহারের কতখানি অঞ্চল হিন্দীভাষী—এই প্রশ্নে আমরা এখনই অবতীর্ণ হবনা। কিন্তু হিন্দীভাষীদের মোট সংখ্যা লক্ষ্য করে বলা যায়, যে এই প্রদেশের বেশ কিছু অংশ অহিন্দী ভাষী। এই প্রসঙ্গে বিহার ও উড়িষ্যার ১৯৩১ সালের Census Report কী বলে দেখা যাক :—

In most of the Chota Nagpur districts and many of the Feudatory states a great diversity of language is found. The babel of tongues rises most loudly from the eastern half of the Singbhum district (P. 283).

এই রিপোর্টেই আবার অন্যত্র দেখা যায়: ছোটনাগপুরে হাজারে মাত্র ৩০৫ জন লোক হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা বলে। অথবা বলা যায়, হাজারে ৬৯৫ জন অহিন্দীভাষী অর্থাৎ শতকরা ৭০ জন লোক হিন্দীতে কথা বলে না। সংখ্যার হিসেব করলে এই জনসংখ্যার সমষ্টি হয় ২০'৮৬ লক্ষ। এই জনসংখ্যা সমগ্র বিহারের জনসংখ্যার শতকরা ২৩ ভাগ। বিহারের অন্যান্য অঞ্চলে অহিন্দীভাষীদের কথা আর উল্লেখ করলাম না। কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার যে বিহারের এক চতুর্থাংশ লোকের ভাষার এবং হিন্দীর মধ্যে একটি দুস্তর ও অনতিক্রম্য ব্যবধান রয়ে গেছে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে বিহার একভাষী প্রদেশ নয়। সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত ঐক্য বিহারে কোনদিনই গড়ে ওঠেনি। সাঁওতাল, মুণ্ডারী, হো, ভূমিজ প্রভৃতি আদিম অধিবাসীদের বাস এখানে। কোল এবং দ্রাবিড় থেকে উদ্ভূত ওঁড়াও, মাল্টো প্রভৃতি ভাষা এখানে প্রচলিত। স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালী। এসব নানা কারণে প্রদেশটি বহুভাষাভাষী। সত্যি কথা বলতে কী, বিহার একটি ভাষার প্রদেশ নয়; বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণকে এই প্রদেশ একটি শাসনের মধ্যে মাত্র বেঁধে রেখেছে।

আমাদের এই মন্তব্যের পাশাপাশি যদি বলা যায়, বাংলাও একটি ভাষার প্রদেশ নয়, তাহলে ভুল করা হবে। কারণ সমস্ত বাংলা দেশ জুড়ে আমরা সাড়ে ছয় কোটি বাঙ্গালী একই ভাষায় কথা বলে থাকি—যার ব্যাকরণ, শব্দ ভাণ্ডার এবং সাহিত্যসম্পদ স্থানে স্থানে পৃথক হয়ে যায়নি, যদিও জায়গায় জায়গায় dialectএর পার্থক্য দেখা যাবে।

আমাদের প্রথম প্রতিপাদ্য বিষয় হল এই যে বাংলার মত বিহার কোন দিনই একটি ভাষাগত ঐক্য সৃষ্টি করতে পারেনি এবং এই প্রদেশ এখনও একটি বহুভাষাভাষী অঞ্চল। এখানে একটি ভাষাগত বিশৃঙ্খলতা আছে—একথা Census Reportও স্বীকার করেছে; আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হল এই যে, হিন্দীকে বা হিন্দুস্থানীকে কতখানি পরিমাণে বিহারের ভাষা বলা যায়?

১৯৩১ সালের Census Reportএ বলা হয়েছে যে, বিহার এবং উড়িষ্যার শতকরা ৮৫'১ জন লোক হিন্দী ভাষী; শুধুমাত্র বিহারের হিসাবে দেখা যায় যে, উত্তর বিহারে শতকরা ৯৮'৩ জন, দক্ষিণ বিহারে ৯৯'৬ ও ছোটনাগপুরে ৩০'৪ জন হিন্দীভাষী। Census Report এর এই হিসেব থেকে একথা মনে হতে পারে যে অন্ততঃ উত্তর-দক্ষিণ বিহারে প্রচুর পরিমাণে হিন্দীভাষী রয়েছেন এবং স্বাভাবিক কারণেই অন্ততঃ, এই দুটি অঞ্চলের, একটি ভাষাগত ঐক্য রয়েছে। কিন্তু একটু স্থিরভাবে আলোচনা করলে বোঝা যাবে বিহারকে মোটামুটিভাবে হিন্দীভাষী বলা কতখানি ভুল এবং অবৈজ্ঞানিক।

Census Reportএ হিন্দুস্থানী বলতে বলা হয়েছে হিন্দী, উর্দু, পশ্চিমী-হিন্দী ও 'বিহারী' ভাষাকে। ইহার প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যাতত্ত্ব প্রণয়নের কোন চেষ্টাই করা হয়নি (পৃঃ ২৩১)। এটা অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। Census Report যেকথা সরলভাবেই স্বীকার করেছে। সেখানে পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে যে "ভাষার দিক থেকে হিন্দুস্থানী পশ্চিমা হিন্দীর একটি dialect. পশ্চিমা হিন্দী আবার আর্যভারতীয় ভাষা সমূহের মধ্যবর্তী শাখার একটি ভাষা। অর্থাৎ উর্দু হচ্ছে হিন্দুস্থানীর এক প্রকারের dialect, সুতরাং উর্দু ভাষীদের বাদ দিলে বিহার এবং উড়িষ্যার অতি অল্প লোকই আসল হিন্দুস্থানী ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। বেশীর ভাগ লোক যে ভাষায় কথা বলে থাকেন, তা হ'ল বিহারী। বিহারী আবার আর্যভারতীয় ভাষাসমূহের বহিঃ শাখার পূর্বভাগের উপশাখা।" এখন বিহারী তিনটি উপশাখায় বিভক্ত—যথা, মৈথিলী, মাগধি এবং ভোজপুরি।

এদেরও আবার বিভিন্ন রূপ ও উপভাষা রয়েছে। কিন্তু এরকম মূলগত পার্থক্য স্বীকার করেও Census Report ভাষা-সমস্যার বৈজ্ঞানিক আলোচনায় বেশীদূর অগ্রসর হয় নি এবং এর সমাধান ভাষা-বিশেষজ্ঞদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছে।

সুতরাং আমরা এখন এই সমস্যার আলোচনায় অবতীর্ণ হচ্ছি। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রথম করণীয় হ'ল হিন্দীর সাথে ভোজপুরি, মৈথিলী ও মাগধির সম্বন্ধ নির্ণয় করা।

বিহারের তিনটি ভাষা—ভোজপুরি, মৈথিলী ও মাগধির সাথে হিন্দীর কোনও সম্বন্ধই নেই। হিন্দী রোহিলাখণ্ড, মীরাট ও পূর্বপাঞ্জাবের ভাষা। এই ভাষা কোনদিনই বিহারের ভাষা ছিল না। উল্লিখিত তিনটি ভাষার সাথে হিন্দীর মূলগত পার্থক্য। বিহারী হিন্দীরই একটা dialect—একথা আর্যভারতীয় ভাষা সমূহের কোন ছাত্রই স্বীকার করবেন না। প্রকৃতপক্ষে বিহারের উচ্চ শ্রেণীর মানুষ (মৈথিলীদের বাদ দিয়ে) এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় তাদের মাতৃভাষাকে ভুলে গিয়ে দিল্লীর হিন্দী ভাষাকে গ্রহণ করেছে। ইংরেজী স্কুলের মাধ্যমেই এটা ঘটেছে। বোধ হয় দু'পুরুষের বেশী হবেনা।

লক্ষ্য করার বিষয়ে যে ১৯৫১ সালের Census Reportএ মৈথিলীকে বিহারের একটি স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। স্কুলগুলিতে হয়ত হিন্দী শিক্ষা দেওয়া হয় এবং কিছু কিছু শিক্ষিত লোক বিহারের ভাষা সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে হিন্দীকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তবু হিন্দী কোনদিনই বিহারের ভাষা নয়। বিহারের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের জোর করে হিন্দী গলাধঃকরণের যে প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে, তার ফল কি হবে একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে। আমরা জোর করেই বলতে পারি যে বাংলার মত বিহারে ভাষাগত ঐক্য নেই।

বাংলা ভাষার প্রতি পাকিস্থান কেন্দ্রীয় সরকারের অগাধ অবজ্ঞা সত্ত্বেও ঢাকা রেডিওতে যে, ভাষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা হল পশ্চিম বঙ্গের বাংলা ভাষা (অবশ্য তার মধ্যে কিছু উর্দু ঢোকাবার চেষ্টা হচ্ছে) এবং এই বেতার বাণী পশ্চিম বাংলার দূরতম প্রান্তেও শোনা হয়ে থাকে।

কিন্তু বিহারের অবস্থা ঠিক তা নয়। কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হিন্দীর মাধ্যমে যে কৃত্রিম ঐক্য গঠনের প্রবল চেষ্টা হচ্ছে তা মোটেই সাফল্য লাভ করছে না। সত্যি কথা বলতে কি, বিহারের শাসন কর্তারা যে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়েছেন, তা অনেকের কাছে খুব বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে, এবং যারা প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে পারছেন, তারাই নিজ নিজ মাতৃভাষার দাবী প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রবল আন্দোলন করছেন। মিথিলার কথা আমরা জানি। খারিবলী হিন্দীর ব্যাকরণ-জটিলতা মৈথিলী, মাগধি এবং ভোজপুরিদের প্রবল অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ এর বিরুদ্ধে বই লিখেছেন।

হিন্দীর পাশাপাশি ভোজপুরিকে স্থান দেবার জন্য ভোজপুরিরা আন্দোলন করছেন। তাঁরা বলছেন যে আধুনিক হিন্দী বা উর্দু কারুরই মাতৃ ভাষা নয় এবং তাদের মাতৃভাষা ভোজপুরি। তাঁরা জানেন যে রাষ্ট্রভাষা সবাইকেই শিখতে হবে; কিন্তু এই ভাষা ছোট খাটো শিশুদের উপর চাপিয়ে দেবার কোন অর্থ হয় না। তাঁদের মতে শিশুদের তাদের মাতৃভাষা ভোজপুরিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এঁরা তাই নাগরী বর্ণে ভোজপুরী বই লিখছেন। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মত একজন পণ্ডিত ব্যক্তিও ভোজপুরি সাহিত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেছেন।

ঠিক এইভাবে মাগধ ভাষীরাও তাঁদের দাবী উপস্থাপিত করেছেন। বিহার রাজ্য মাগধি পরিষদ পাটনা থেকে মাগধি নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেছেন।

মৈথিলী সম্বন্ধে আমরা কিছু বলতে চাই না। এই ভাষা শক্তিশালী ও প্রাচীন। এরা তাই এদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রবলভাবে চেষ্টা করছেন। এই আন্দোলনের কথা সবাই জানেন, তাই আমরা বিশদ করে এই বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। এমন কী ডাঃ অমরনাথ

খা এবং ডাঃ উমেশ মিশ্রের মত পণ্ডিত ব্যক্তিরাও মৈথিলীকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। তাঁরা সগর্বে জোর গলায় বলছেন, মৈথিলীই তাঁদের মাতৃভাষা, হিন্দী নয়। এখন Census Reportও মৈথিলীকে ভিন্ন ভাষা বলে ধরে নিয়েছে।

আমাদের তাই দ্বিতীয় বক্তব্য হ'ল এই যে আমরা যদি বিভিন্ন উপজাতীয় ভাষার কথা ছেড়েও দিই এবং শুধুমাত্র হিন্দীর কথাই ধরি তাহলেও আমরা দেখতে পাব যে বিহার হিন্দীভাষী প্রদেশ নয়, এবং "আধুনিক কালে গ্রহণ করা" হিন্দী বা হিন্দুস্থানী জনগণের মাতৃভাষা নয়। আসলে বিহারী ভাষাগুলির মধ্যে মূলগত পার্থক্য যত খানি—ঠিক সে রকম পার্থক্য আছে বাংলা ওড়িয়া আর আসামীর মধ্যে। হিন্দীর সাথে বিহারের কোন সম্বন্ধ নেই।

ঊষা—("গ্রন্থ-জগৎ" হইতে উদ্ধৃত)

সংকলন

শিশু-সংগীত

সুরপতি নন্দী

"পারে পড়ি সোনো, ভাই গাইয়ে,
হৈহৈ পাড়াটা ছেড়ে দূর দিয়ে যাইয়ে।
হেথা সা-রে-গা-মা-পা-ধে সুরাসুরে যুদ্ধ
শুদ্ধ কোমলগুলো বেবাক অশুদ্ধ,
অভেদ রাগিণী রাগে ভগিনী ও ভাইয়ে।"

—রবীন্দ্রনাথ

পাড়ায় গান-শেখাবার মহড়া চলেছে। প্রতিবেশীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। কিন্তু গান যখন কোনো ছোট শিশু শিখতে থাকে, এবং সুরকে অতিক্রম করে, তা' ক্রমে বিশুদ্ধ চিৎকারে পরিণত হতে থাকে, তখন করুণার উদ্রেক হয়।

আমাদের দেশে শিশুদের সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। যেটুকু আছে তাও বিজ্ঞানসম্মত নয়। গানের আসরে পাঁচ-সাত বছরের শিশুরা একেবারেই অনাদৃত, অবহেলিত, অপাংক্তেয়।

এই বয়সের শিশুদের জন্য রবীন্দ্রনাথ কিছু গান লিখেছেন। আর লিখেছেন গুরুসদয় দত্ত। কিন্তু এঁদের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ। এই বয়সের অধিকাংশ শিশুরাই কোনো প্রকার ইস্কুলে যায় না। হালে কতিপয় নার্সারি বা কিণ্ডারগারটেন ইস্কুল হয়েছে। সেখানে চার-পাঁচ বছর বয়সের শিশুরা ভর্তি হয়। কিন্তু সেগুলির সংখ্যা সামান্য। ফলে বাড়িতেই তাদের গান শেখার অবসর। সকলের ভাগ্যে এই অবসরে গান শেখার সুযোগ ঘটে না। যে ক'জনের ভাগ্যে তা' জোটে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয় না।

এর কারণ, গান-শেখানোর রীতিনীতিগুলি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। প্রথম শিক্ষার্থীকে কবে গলা সাধানো বা হার্মনিয়াম প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে গান ধরানো হয়। ফলে গানের মধ্যে না থাকে আনন্দ, না থাকে প্রাণ। বহু সময়ে অপটু শিক্ষকের হাতে পড়ে শিশুর গলার মিষ্টত্ব গোড়াতেই নষ্ট হয়ে যায়। অধিকাংশ শিক্ষকরা সি-মার্প ছাড়া অন্য স্কেলে

হার্মনিয়াম বাজাতে পারেন না। ফলে ঐ ছেলেই শিশুদের গান করা শিখতে হয় এবং অবস্থাটা দাঁড়ায় : 'গানের দাপে আকাশ কাঁপে তালের ফাটে ঝিলবুল।'

গান-শেখানোর এই পদ্ধতিকে বলা চলে মুখ্যত ব্যাকরণসম্মত (grammatical) ও আনুষ্ঠানিক (formal)। অবস্থাটা পাল্টানো দরকার।

সকল বয়সের ছেলেমেয়েদের গান শেখানো সম্পর্কে সম্প্রতি এক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার। এঁদের প্রকাশিত 'শিক্ষণ-ব্যবহারিকা'য়, বোধকরি এই সর্বপ্রথম, সকল স্তরের শিশুদের সংগীত শিক্ষার ব্যাপারে সুষ্ঠু, প্রথাবদ্ধ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এঁদের বক্তব্যগুলি অনেকটা ভূমিকা-আকারের। কিন্তু এঁদের সবকটি সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়া চলে না। তা সত্ত্বেও এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করে তাঁরা শিক্ষার এক প্রয়োজনীয় দিক সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সন্দেহ নেই।

'শিক্ষণ-ব্যবহারিকা' গানকে শিশুর উপযোগী করার কথা বলেছেন। কিন্তু প্রচলিত সংগীতশিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁরা মন্তব্য করেননি। সুতরাং আমাদের আগেই বিষয়টির এই দিকটার ওপর আলোকপাত করতে হবে।

আমাদের দেশে শিশুদের গান শেখানোর সমগ্র ব্যাপারটাই হচ্ছে অস্বাভাবিক। হার্মোনিয়ামকে কেন্দ্র করে বদ্ধ ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে গান শেখালে কোনো গানই আনন্দ সঞ্চার করতে পারে না। তাই গান শেখাতে গেলে সর্বাগ্রেই শিশুকে টেনে বার করে আনতে হবে ঘর থেকে। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, বিস্তীর্ণ আকাশের নিচে তাকে ছেড়ে দিতে হবে। তাকে পৌঁছে দিতে হবে আরো বহু শিশুর মাঝে, তার আপন-রাজ্যে। সেখানে গান হবে তার আপন মনের মাধুরী মেশানো স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। তখন গান আর শিশুকে শেখাতে হবে না। আনন্দে উদ্বেল হয়ে শিশু আপনিই গান গেয়ে উঠবে। তাইতো বলি ঘরের সীমানা পার করে শিশুকে যেতে দাও তার কলকোলাহলমুখর বিচিত্র অনুভূতির দেশে যেখানে, "—আজকে আমার প্রাণের মাঝে, ঘাঁই ধপাধপ তব্‌লা বাজে।"

মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে, খেলার চেঙে গান শেখা (play-way) প্রবর্তন করতে হবে এবং তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় প্রাকৃতিক পরিবেশে (in its natural setting)।

অন্যান্য দেশে সমস্ত বিষয়টির আনুপূর্ব সংস্কারসাধন হয়েছে। পশ্চিমের দেশগুলিতে শুধু নার্সারি বা কিণ্ডার-গার্টেন কেন, শিশুর প্রাক্-বিদ্যালয় জীবন সম্পর্কে (pre-school activities) বিধিব্যবস্থা করার কথা বলেছে। এবং নার্সারিগুলি আনন্দময় পরিবেশে শিশুকে লালন-পালন করার ব্যবস্থাই করে থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিলাতের কথা ধরা যাক।

নার্সারিগুলিতে সেখানে ছড়ার গান (nursery rhymes) ও নৃত্যছন্দোময় গান (action songs)-এর প্রচলন। চার পাঁচ জন শিশু যখন গোল হয়ে হাত ধরাধরি করে গান ধরে 'ring a ring of roses', তখন 'হাশ্‌শা হাশ্‌শা অল্ ফল্ ডাউন' বলে সকলে মিলে ধপাস্ করে মাটিতে না পড়ে গেলে গানের অর্ধেক মজাই নষ্ট হয়ে যায়। কিংবা আরো ছড়াধর্মী গান যথা, 'Jingle bell, jingle bell, jingle all the bell', কিংবা 'piece pudding hot, piece pudding cold' প্রভৃতি সবগুলিই খেলার ছলে গাওয়া হয়ে থাকে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশু-সংগীত সম্পর্কে আমাদের কিছু করতে গেলে—সর্বপ্রথম গান-শেখানোর পদ্ধতিটাই চেলে সাজতে হবে।

আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে নার্সারি বা কিণ্ডারগার্টেন ইস্কুলগুলির সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং এ দায়িত্ব তাঁরা বহন করে যাবেন। যাঁরা গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে ছেলেমেয়েদের গান শেখান তাঁরা এ বিষয়ে সতর্ক হবেন কি ?

গান-শেখানো কি প্রকার হবে সে কথা আলোচনা হল, কিন্তু দেখা যাক্ শিশুকে কি গান শেখানো হবে। এ বিষয়ে 'শিক্ষণ-ব্যবহারিকা'য় গানের এক তালিকা দেওয়া হয়েছে। প্রচলিত আরো গান আছে। একটি গান ধরা যাক। গানটি অবশ্য 'শিক্ষণ-ব্যবহারিকা'র অন্তর্গত নয়।

কালো কালো মেঘগুলি ভিড় করে আকাশে
গুরু গুরু গুরু গুরু ডাক ছাড়ে বাতাসে।

পা	মা	গা।	মা	-পা	মা	গা	[	মা	-পা	মা	গা।		পা	দা	
লো	কা	লো	মে	ঘ	গু	লি		ভি	ড়	ক	রে		কা	শে	
র্সা	পা	পা।	দা	দা	পা	পা		পা	-া	দা	দা।		পা	মা	
গু	গু	গু	গু	গু	গু	গু		ডা	ক	ছা	ড়ে		তা	সে	

লক্ষ্য করুন কথার মোটামুটি ছন্দ আছে, ভাষা ও ভাব সরল। কিন্তু কাটাকাটা সুর। মাত্রার পর মাত্রা চলেছে অক্ষরের পর অক্ষর ধরে। কোনো অক্ষরকে টেনে দীর্ঘায়িত করা হয়নি। ফলে, সুর বৈচিত্র্যহীন—একঘেয়ে সুরের কোনো দোলা নেই।

কিন্তু শিশু-সংগীতের প্রাণ হল তার ছন্দের দো এই দোলা মন-মাতানো, প্রাণ-মাতানো। এই দোলার প্রভাব সবচেয়ে বেশী ছড়ায়। একটি ছড়া :

হা ০ ষ্টি। মা টি ম। ষ্টি ম। তা রা
মা ঠে ০। পা ডে ০। ভি ম। তা দে র

লক্ষ্য করুন প্রত্যেক পংক্তিতে আছে ১২টি মাত্রা (গানের হিসাবে) কিন্তু ৯টি অক্ষর। ৯ অক্ষর ১২ মাত্রায় পর্যবসিত হয়ে সৃষ্টি করে বিচিত্র দোলা-র। অনুরূপ :

বি ষ্টি। প ড়ে টা পু র। টু পু র
ন দে র। এ লো বা ০ ০ ন।

গানের হিসাবে মাত্রা ১২টি। কিন্তু কবিতার হিসাবে এর মাত্রা (বর্ণবৃত্তি ছড়ার হিসাবে) ৯টি।

ছড়ার প্রাণ তার দোলা। ছড়াকে টেনে দীর্ঘায়িত করলেই তা গানে দাঁড়ায় না। মূলত গানের মাত্রার হিসাবে ছড়ার ছন্দেরই অনুসারী। কিন্তু সুর-সংযোগে ছড়া আর এক ধাপ উন্নীত হয়। গান ছড়ার চেয়েও বড় জিনিস, আরো ব্যাপক, আরো সামগ্রিক।

ছড়া শিশু-জীবনের এক বিশেষ অংশকে অধিকার করে থাকে। গানের পরিধি বৃহত্তর। কিন্তু শিশু-সংগীত ছড়ার ছন্দ ও আবেদনকে বজায় রেখে এগিয়ে চলে। শিশুর গানে এসে ভিড় করবে শিশুর জীবনের বিচিত্রতর আগ্রহ, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা।

শিশুরা সাজতে ভালবাসে। তারা হয় রিক্‌শাওয়ালা, হয় ধোবানী। আবার হয় চাপুচি কিংবা কেতলি। কোনো কোনো সময়ে হয় না-ফোটা চাঁপার দলের ধীর ভঙ্গী পরেশ। চুপ করে বসে থাকা নয়। বউমণি হয়ে ঘরময় হয়ে সাজা নয়। চাই কর্তাগিন্নী, আলাপন। চাই হুটোপাটি, অঙ্গসঞ্চালন। এর থেকে নাচের উৎপত্তি। শিশু-স্তরে এই খেলার প্রবৃত্তি, আপন মনে ও সবার সঙ্গে মিলে প্রাণবন্ত অভিনয়, নিজেকে প্রকাশ করার আনন্দটিকে রূপ দিতে হবে গানে। সেই গান তার কল্পনা ও ভাবপ্রবণতার উন্মেষ ঘটাবে। তার প্রত্যাশাকে পূর্ণ করবে। সংগঠনমূলক

ভাবরাজ্যে আপ্লুত হওয়ার ঝোঁকগুলিকে চরিতার্থ করবে। এক কথায় গান হবে তার জীবনলীলার সহচরী। সে গানের তালে তালে বেজে উঠবে প্রাণস্পন্দন, তার ছন্দে ছন্দে জেগে উঠবে অপূর্ব নৃত্যভঙ্গিমা। গান হবে অভিনয়-সহকারী, নৃত্য-সহকারী।

এই মাপকাঠিতে দেখতে গেলে শিশু-সংগীতকে কোনো বাঁধাধরা ঋতু-সংগীত, প্রাকৃতিক সংগীত, কর্ম-সংগীত প্রভৃতি বিভাগে আবদ্ধ রাখা যায় না। শিশুর সব সংগীতই হবে কর্ম-সংগীত বা ছন্দোময়, অভিনয়-সহকারী, নৃত্য-সহকারী গান।

আমাদের দেশে এইরূপ শিশু-সংগীতের অভাব সর্বত্র অনুভূত। এ সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলেছে কিছু কিছু।

সম্প্রতি গ্রামোফোন কোম্পানিগুলি প্রচলিত ছড়ার সুর যোজনা করে রেকর্ড করাচ্ছেন। কিন্তু গানগুলি আদৌ শিশুর উপযুক্ত হচ্ছে না। অল্-ইণ্ডিয়া-রেডিও এ বিষয়ে চেষ্টাশীল। তাঁদের প্রচারিত শিশু-মহলে মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর গান গাওয়ানো হয়। সেগুলি সত্যই চমৎকার।

কলকাতার বিভিন্ন নার্সারি স্কুলে আজকাল বেশ কিছু কিছু ভালভাল গান শেখানো হয়। যেমন চাপুচির-গান। এটি অভিনয় সহযোগে গাওয়া হয় বা আবৃত্তি করা হয়। আর একটি গান : লাল বাড়ির ঘুড়ি, নীল বাড়ির ঘুড়ি— সুরের মধ্যে তাল-ফেরতা থাকায় তা' অপূর্ব ছন্দোময় হয়ে ওঠে।

গুরুসদয় দত্তর গানগুলি উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ত' শিশুর উপযোগী অনেক গান লিখেছেন। সেগুলি একত্রে চয়ন করা দরকার। অন্নদাশঙ্করের ছড়া সুর দিলে চমৎকার দাঁড়ায়।

বর্তমান লেখকের স্বরলিপি করা বই "ঘুম-ভাঙার গান"-এর কয়েকটি গান শিশুদের উপযোগী। সম্প্রতি লেক্-পল্লীর মণিমেলা সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল-এর বহু কবিতা সুর দিয়ে সাফল্যের সঙ্গে গাইছেন। তারই একটি গানের স্বরলিপি :—

একুশে আইন :

II সা গা। পা গা -া I সা গা -া। পা গা -া I পা ধা -া। পা ধা -া I
শি ব ঠা কু রে র আ প ন দে শে • আ ই ন কা নু ন্
পা -ধা পা। মা গা -া I গা -া পা। মা পা -া I গা -মা গা। রা সা -া I
স ব্ ব নে শে • কে উ ব দি যা য় নি ছ লে প ড়ে •
সা -া ন্া। ধ্া প্া -া I পা গা। গা সা -া I {গা মা -া। পা ধা -া I
প্যায় • দা এ সে • পা ক ড়ে ধ রে • {কা জি র কা ছে •
ন্া র্সা। ধনা -া ঋা I ঋা ঋা -া। পা ধা -া I ঋা -পা মা। গা -া -া } I
হ য় বি চা র্ এ কু শ্ টা কা • দ ন্ ড ভা • র }
পা -া পা। ধা ধা -া I পা ধা র্সা। র্সা -া -া I পা -া ধা। পা মা পা I
শি ব ঠা কু রে র দে শে • গো • শি ব ঠা কু রে র
মা গা -া। -া -া -া II III
দে শে •

এই রকম আরো গান আছে, যার স্বরলিপি দিয়ে পাতার পর পাতা ভরিয়ে দেওয়া যায়। সেগুলি একত্রে সংগ্রহ করা দরকার। কিন্তু গানগুলিকে যথাযথভাবে শিশুদের জন্য গাওয়ানো নির্ভর করে সংগীত শিক্ষকদের উপর। ওঁদের মনোভাব পরিবর্তিত হওয়া দরকার প্রথমেই। এবং ঠিকমত গান শিখানোর ব্যবস্থা করে দিতে হবে ইস্কুল কর্তৃপক্ষকে। যে-সব শিশুর ইস্কুল যাওয়ার সৌভাগ্য হয় না—তাদের জন্য তাদের পিতামাতাকেই ব্যবস্থা করতে হবে। শিশু বয়সে ঠিকমত গান শেখাতে পারলেই ভবিষ্যতে বড় গাইয়ে বা সমঝদার হওয়া যায়। এবং সেই ব্যবস্থা গোড়া থেকে করতে পারলে উত্তরকালে আর দুঃখ করে বলতে হবে না, রবীন্দ্রনাথের হাসির গানের ভাষায়—

তুচ্ছ সা-রে-গা মা'র আমার গলদ্‌ঘর্ম থামায়,
বুদ্ধি আমার যেমনি হোক কান দুটো নয় মন্দ।
এই বড়ো মোর দুঃখ কানাইয়ের এই বড়ো মোর দুঃখ।

[David Hare Training College—EDUCATION TODAY—Annual Number হইতে উদ্ধৃত]

ওড়িয়া সাহিত্য

—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

প্রথম ওড়িয়া লিপির আবির্ভাব—বা বিবর্তন বলিব?—কোন সময়ে হইয়াছিল, সাহিত্যই বা কবে রচিত হইতে আরম্ভ হইল, কি ছিল তাহার রূপ, এসব প্রশ্ন এখানে ওঠা স্বাভাবিক। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে গিয়া বৌদ্ধ গান ও দোহা খুঁজিয়া বাহির করেন। তাঁহার মতে সেগুলি হাজার বছরের পুরানো বাংলা। কিন্তু তাহার ভাষা, বিশেষ করিয়া শব্দসংগঠন দেখিয়া পূর্বভারতের বিভিন্ন ভাষার পণ্ডিতেরা তাহাকে আপনার আপনার বলিয়া দাবি করিতেছেন। আসাম ও মিথিলার মত উড়িষ্যাতেও দাবি জানানো হইয়াছে যে, ঐ দোহাগুলি বাংলার নহে, অন্য প্রদেশের। পূর্বভারতের সংস্কৃতি একই একরূপ, এবং ভাষার দিক দিয়াও পূর্বভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষায় এত সাদৃশ্য আছে যে, ভাষা বিষয়ে মীমাংসার জন্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের উপর অনেকখানি নির্ভর করিতে হয়। শাসনপদ্ধতি, পদবন্ধ, ঐতিহ্য—এ সকলের কথাও আলোচনা করিতে হইবে বই কি। বাংলার সম্বন্ধে এইটুকু বলা চলে যে, অপভ্রংশ হইতে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় নির্দিষ্ট আকার গ্রহণ করিবার পথে দোহার ভাষা বাংলার দিকেই বেশি ঝুঁকিয়াছে। তবে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, তখনও বাংলা স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে জাগ হয় নাই। দোহা যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কোনও নায়ক যে বাঙালী ছিলেন, ইহা অস্বীকার করা চলে না; কেহ কেহ ওড়িয়া ছিলেন, বা উড়িষ্যা হইতে গিয়াছিলেন, এ কথাও অস্বীকার করা চলে না। লেখক লইয়া আলোচনায় লাভ নাই, ভাষা লইয়াই বিচার চলিতে পারে, এবং ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের ঝোঁক এ পর্যন্ত বাংলার দিকেই দেখা যাইতেছে।

রহস্য উপন্যাস

শেঠজীর রত্নমুকুট

বিপিনবিহারী রায় ও কানাই রায়

(মুখবন্ধ)

বিখ্যাত ডিটেকটিভ অজয় সেনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কি ভাবে হয়েছিল, সেকথা এখন বলবার দরকার নেই, এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে তারপর বহু বছর ধরে আমি তার সঙ্গে এক বাড়ীতে বসবাস করি, এবং তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যকুশলতা দ্বারা কি করে সে বহু জটিল কেসের নিষ্পত্তি করেছিল, তার সঙ্গী ও সহকারীরূপে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। অবশ্য সাধারণে তাকে ডিটেক্‌টিভ বা প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ বললেও সে নিজে ও নামটা পছন্দ করতোনা। বাড়ীর দরজার পাশে কার্ডবোর্ডে ছোট্ট করে লেখা ছিল "অজয় সেন, ইনভেষ্টিগেটার" (investigator) অর্থাৎ তথ্যানুসন্ধায়ী।

যে সব জটিল কেস্ তার কাছে আসতো, সাধারণতই পুলিস বা পুলিশের ডিটেকটিভ্ যে সব কেসে 'হালে পানি' না পেয়ে হতাশ হয়ে যেতো, সেই গুলিই তার কাছে আসতো। কখনো বা যার কেস্ সে নিজেই অজয়ের নাম ও খ্যাতি শুনে তার শরণাপন্ন হতো। সমস্যার সমাধান করবার প্রণালী ছিল তার নিজস্ব। সে বলতো, তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ, আর পর্য্যবেক্ষণে যে সব তথ্য বা সন্ধানসূত্র উদ্ঘাটিত হতো, তার কার্য্য কারণ অনুমান করা, অর্থাৎ কারণ দেখে কার্য্যবোধ, এই ছিল তার অস্ত্র। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমি নিজে তার সঙ্গে ছিলাম এমন বহু কেসের বিবরণী আমার খাতায় নোট্ করা আছে, তাই থেকে কিছু কিছু পাঠককে উপহার দেবার ইচ্ছা আছে, যা দেখে পাঠক অজয়ের এই নিজস্ব প্রণালী সম্বন্ধে বেশ বুঝতে পারবেন। আজ একটি কেসের বিবরণী দিচ্ছি, এটিকে "শেঠজী'র রত্ন মুকুটের কেস" নাম দেওয়া হলো। ইতি—

শ্রীনরেন দত্ত।

[ ]

সেদিন সকালে চা-পানের পর আমি জানালার দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছি, হঠাৎ অজয়কে ডাকলুম—"দেখ, দেখে যাও, অজয়, একটা কিরকম পাগ্‌লাটে লোক এদিকে আসছে। ইস্, ওর আত্মীয় স্বজন এরকম ভাবে একলা ওকে কি করে ছেড়ে দিলে—" অজয় তখন খাওয়ার টেবিলে বসে খাওয়া শেষ করে সিগারেট ধরাচ্ছিল। ধীরে ধীরে উঠে, তার ড্রেসিং গাউনের কোমরের ফিতাটা বাঁধতে বাঁধতে আমার পাশে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালো। রাত্রির প্রথম দিকে খুব জোর বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, রাস্তার ফুটপাথের উপর জল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এখন জল নেমে গেছে বটে, কিন্তু রাস্তা কর্দ্দমাক্ত, ফুটপাথ গুলোও কাদায় অত্যন্ত পিছল হয়ে রয়েছে। সকালে তখনো লোক চলাচল খুব কম। আমাদের বাঁ দিক থেকে একটি মাত্র লোক এদিকে আসছে, তারই অদ্ভুত আচরণ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

ভদ্রলোকের বয়স বোধহয় বছর পঞ্চাশ হবে, বেশ দীর্ঘকায় ভারী চেহারা, মুখ খানাও বেশ বড়, গোল,

একটা সম্ভ্রমের ছাপ আছে। পোষাকও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, লম্বা কালো গলাবন্ধ কোট, ভাল ধুতি, পায়ে মনে হয় দামী জুতো কিন্তু কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে। তাঁর আকৃতি ও পোষাকের সঙ্গে তাঁর আচরণের কোন সামঞ্জস্য নেই। ভদ্রলোক দৌড়ে দৌড়ে আসবার চেষ্টা করছিলেন, মাঝে মাঝে আবার লাফ্ দিয়ে উঠছিলেন, মনে হলো ভারী শরীরে দৌড়ান কখনো অভ্যাস নেই, পা ক্লান্ত হয়ে গেছে, তার ওপর কাদায় পিছল পথ, যেন লাফ্ দিয়ে গতি দ্রুত করবার চেষ্টা করছিলেন। মাঝে মাঝে আবার দুটো হাত কিরকম অদ্ভুত ভঙ্গিতে ওপর দিকে নিচের দিকে ছুড়ছেন, মাথা এদিক ওদিক চালছেন, আর মুখেরও নানারকম বিকৃত ভঙ্গী করছেন।

"ভদ্রলোকের কি হয়েছে ব্যাপার ত বোঝা যাচ্ছে না" আমি বললুম, "আবার ওপর দিকে চেয়ে বাড়ীর নম্বর দেখছেন"!

অজয় বললে, আমার মনে হয় আমার এখানেই আসছেন।

এখানে?

হ্যাঁ, আমার মনে হয় আমার সঙ্গে দেখা করতেই আসছেন, রোগের লক্ষণ দেখে আমি সেই রকমই বুঝছি— ঐ দেখ, বললুম না?

ভদ্রলোক ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদেরই দরজার সামনে থেমে এমন জোরে কড়া নাড়তে ও দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন যে দরজার কপাট ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হলো।

কিছু পরেই তিনি আমাদের বসবার ঘরে উপস্থিত হলেন কিন্তু তাঁর মুখে একটা গভীর দুঃখ ও হতাশার ছাপ দেখে আমাদের মুখের অভ্যর্থনার হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল। তিনি কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলেন না, দাঁড়িয়ে কেমন এক রকম শরীর দোলাতে আর হাত দিয়ে মাথার চুল টানতে লাগলেন, তার পরই হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে দেয়ালে এমন জোরে মাথা ঠুকতে লাগলেন যে অজয় ও আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে টেনে জোর করে ঘরের মাঝখানে এনে একটা আরাম-চেয়ারে বসিয়ে দিলুম। অজয় তাঁর পাশে আর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে, তাঁর হাতে পিঠে মৃদু চাপড়াতে চাপড়াতে তার স্বভাবসিদ্ধ কোমল স্বরে বললে—

আপনি আপনার কাহিনী বলবার জন্যে আমার কাছে এসেছেন, নয়? তাড়াতাড়িতে বড্ড হাঁপিয়ে পড়েছেন, একটু বিশ্রাম করুন, সুস্থ হোন, তারপরে আমায় বলবেন, নিশ্চয়ই আমি শুনবো, আর আপনার যা কিছু সমস্যার উদয় হয়েছে তার সমাধানে আমি যতটুকু সাহায্য করতে পারি তা করবো বই কি!

ভদ্রলোক দুই এক মিনিট চুপকরে বসে রইলেন, বুক তখনও উঠছে নামছে, যেন আবেগ দমন করবার চেষ্টা করছেন। তারপর হাত দিয়ে কপালটা ঘসে, ঠোঁট দুটো চেপে আমাদের দিকে ফিরে বললেন—

আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে পাগল মনে করেছেন?

অজয় বললে, আপনার যে একটা কোন রকম ভয়ানক বিপর্যয় ঘটেছে তা বুঝতে পারছি।

ভগবান জানেন, কি ভয়ানক বিপাকে আমি পড়েছি। সত্যিই আমি যে পাগল হয়ে যাই নি এই আশ্চর্য্য। লোক সমাজে আমার মান নষ্ট হওয়া হয়তো সহ্য হতো। ঘরোয়া বিপদ আপদও সকলের সংসারেই ঘটে, কিন্তু একসঙ্গে দুটোই ঘটা, আর এ রকম ভয়ানক ভাবে, এ যেন আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে। তাছাড়া, এতে আমি একাই ভুগবো তা নয়, এর উপায় যদি না করতে পারি ত দেশের একজন মহামান্য বরেণ্য ব্যক্তিও যে এর দ্বারা মহা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, আর সেটা আমারই জন্যে--

মশাই, আপনি একটু সুস্থির হোন, অজয় বললে, কি ঘটেছে, আপনি কে, সব গোড়া থেকে পরিষ্কার করে আমাকে বলুন।

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—আমার নাম বোধ হয় আপনাদের অজানা হবে না, আমি বিধুভূষণ ঘোষ, রিজেন্ট ব্যাঙ্কের প্রধান অংশীদার ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

নাম সত্যিই আমাদের অজানা নয়। সততা ও ব্যবসায় বুদ্ধির জন্য প্রখ্যাত এ সহরের একজন বিশিষ্ট নাগরিক, কি এমন ব্যাপার ঘটেছে যাতে তাঁকে এই রকম শোচনীয় অবস্থায় ফেলেছে? আমরা কৌতূহলী হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম. ভদ্রলোক আর একবার চেষ্টা করে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বলে যেতে লাগলেন—

আমি বেশ বুঝতে পারছি যে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। থানার ইন্‌স্‌পেক্টার আমাকে উপদেশ দিলেন আপনার সাহায্য গ্রহণ করতে. কারণ পুলিশ ও এখনো পর্য্যন্ত এ ব্যাপারের কোন কিনারা করতে পারেনি, তারাই বললে অভয়বাবুর এ সব বিষয়ে খুব সুনাম আছে. আপনি তাঁর সাহায্য নিন। তাই আমি কালবিলম্ব না করে সোজা ছুটতে ছুটতে সেখান থেকে আপনার এখানে এসেছি। পথে কোন রকম গাড়ী পেলাম না কাজেই হেঁটে আসতে হলো, কিন্তু আমার বেন দেরী সহ্য হচ্ছিল না, তাই দৌড়ে দৌড়ে এসে এত হাঁপিয়ে পড়েছি—বুঝতেই পারছেন বেশী হাঁটা ত অভ্যেস নেই। যাই হোক, এখন একটু সুস্থ হয়েছি. এবার ব্যাপার কি ঘটেছে আপনাকে বলি।

প্রথমেই বলে রাখি, আপনারা নিশ্চয় জানেন যে ব্যাঙ্কের কাজ ভালভাবে চালাতে হলে শুধু জমার টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে গেলেই হয় না, আমানতি টাকাটা নিরাপদ অথচ লাভজনক ভাবে সুদে খাটানো বেশ দরকার। আমরাও সে কারণে টাকা চোটায় অর্থাৎ কর্জ্জ দিয়ে খাটাই, অবশ্য যথেষ্ট ও নিরাপদ বন্ধক বা জামিন নিয়ে তবে কর্জ্জ দিই। গত কয়েক বছরে এ ভাবে আমরা বহু টাকা খাটিয়েছি এবং দেশের গণ্যমান্য বহুলোক তাঁদের সোনারূপার জিনিস, গহনাপত্র বা এমন কি দামী বইএর লাইব্রেরী প্রভৃতি বন্ধক রেখে আবশ্যকমত আমাদের কাছে টাকা ধার নিয়েছেন। কাল সকালে আমি আমার আপিসঘরে বসে আছি, একজন কেরানী একটা স্লিপ্ নিয়ে এলো, এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। নাম দেখে আমি চমকে উঠলাম, কারণ—বাবু, আপনাদের কাছেও বোধ হয় নামটি প্রকাশ করা আমার উচিত হবে না, এইটুকু বললেই হবে যে তিনি একজন সর্ব্বজনবিদিত ব্যক্তি. ধনে, মানে, কুলে দেশের একজন বরেণ্য লোক। আমি আপনাদের কাছে তাঁর নাম শেঠজী বলে উল্লেখ করবো। তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করলেন আমি সসম্ভ্রমে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসালুম। তিনি আসাতে আমি নিজেকে কতটা গৌরবান্বিত মনে করছি এইভাবে কথা বলতে গেলে। তিনি সেটা চাপা দিয়ে একেবারে কাজের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। ভাবটা এই যে একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার যত শীঘ্র চুকিয়ে ফেলা যায় ততই ভাল।

বিধুবাবু, তিনি বললেন, আপনারা টাকা থাকেন?

হ্যাঁ, আমি উত্তর দিলাম. যদি যথেষ্ট ও উপযোগী বন্ধক দেওয়া হয়।

তিনি বললেন, আমার হঠাৎ নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকার অত্যন্ত দরকার হয়ে পড়েছে। অবশ্য কি জানেন. হয়ত আমার বন্ধুবান্ধবের কাছে চাইলে এর দশগুণ টাকা আমি এখনি পেতে পারি, কিন্তু সে রকম বাধ্যবাধকতায় না গিয়ে এটা আমি ব্যবসায়িক পর্য্যায়ে করতে চাই, আর সেইভাবে করাই যুক্তিযুক্ত মনে করি। বুঝতেই পারছেন আমার মত লোকের পক্ষে বন্ধুবান্ধবের দায়গ্রস্থ হয়ে থাকা বা সুবিধা নেওয়াটা ঠিক হবে না—

আমি জিজ্ঞেস করলাম, জানতে পারি কি, টাকাটা— কতদিনের জন্য আপনার চাই?

আজ বুধবার. আগামী সোমবারে একটা মোটা অঙ্কের টাকা আমার পাবার কথা, আপনি যদি টাকাটা আজ আমাকে দেন—এবং আজই আমার চাই, না হলে কাজ হবে না—তা হলে আমি পাঁচদিন পরে অর্থাৎ সোমবারে নিজে এসে ঋণ শোধ দিয়ে যাব, অবশ্য তার সঙ্গে আপনারা যে হারে সুদ নেবেন তাও দিয়ে যাব। কিন্তু প্রধান কথাটা হচ্ছে টাকাটা এখুনি আমার চাই।

আমি বললাম, দেখুন, আমার নিজের তহবিলে যদি অতটা টাকা থাকতো তাহলে আমি অতি আনন্দের সহিত আপনাকে নিজেই দিতাম, তবে কি জানেন, অতটা টাকা

ও আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কাজেই টাকাটা ব্যাঙ্কের তহবিল থেকে দিতে হবে, এমন কি, আপনার মত লোককেও, একটা টাকা ধার দিতে হলে, নিরাপত্তার জন্যে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

নিশ্চয়ই, আমিও তাই চাই, বলে তিনি একটা চামড়ার চৌকো বাক্স, তার পাশে চেয়ারে রাখা ছিল, তুলে ধরে বললেন, আপনি আমাদের বংশের বিখ্যাত রত্ন মুকুটের কথা শুনেছেন নিশ্চয়? দেখুন ত— বলে বাক্সটা আমার সামনে খুলে ধরলেন। অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি পুরু সোণার পাতের ওপর অপূর্ব্ব কারুকার্য্য মণ্ডিত একটি মুকুট। সমস্তটিতে নানা রত্নরাজী বসান, হীরাই বেশী ঝক্‌মক্ করছে, মধ্যমণির ওপরে থেকে যেন তার সৌন্দর্য্য ঠিক্‌রে পড়ছে। সেটি বাক্স সমেত আমার হাতে দিয়ে শেঠজী বললেন—

ওতে ৩৭ খানা রকমারি সাইজের হীরা আছে, তাছাড়া অনেক অন্য পাথর আছে, বোধহয় খুব কম করে দাম ধরলেও, আমি যে টাকাটা ধার চাইছি তার অনেক গুণ বেশী হবে? আমি এইটা আপনার কাছে বন্ধক রেখে যেতে চাই—

আমি রত্ন-মুকুট হাতে নিয়ে একবার সেটির দিকে একবার তাঁর দিকে চাইতে লাগলুম। তিনি বললেন, —অতো দাম হবে কিনা সন্দেহ করছেন? আমি বলে উঠলাম, না না, আমি শুধু ভাবছি—

ভাবছেন যে এটা আপনার কাছে রেখে যাওয়া আমার পক্ষে সমীচীন হচ্ছে কিনা? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি যদি স্থির নিশ্চয় না জানতুম যে ৪।৫ দিনের মধ্যেই টাকাটা দিয়ে ওটা ফেরৎ নিয়ে যেতে পারবো, তাহলে রেখে যেতুম না। তা কি মনে করেন, বন্ধক মনঃপুত হয়েছে?

আমি বললুম, যথেষ্ট।

দেখুন, তিনি বললেন, বিধুবাবু, আমি আপনার সম্বন্ধে জেনে শুনে, আপনাকে কতটা বিশ্বস্ত মনে করি তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিচ্ছি। অবশ্য এটা বলাই বাহুল্য যে আজকের এ ব্যাপার সম্বন্ধে আপনি কাউকে কিছু জানাবেন না, কথাটা যেন কোনরকমেই প্রকাশ না হয়, আর রত্ন মুকুট যতদিন আপনার কাছে থাকবে খুব যত্ন করে সাবধানে রাখবেন। আর কিছুর জন্যে নয়, ওতে যে ৩৭ খানি পরপর মিল করা হীরে আছে, তার একখানিও খোয়া গেলে আজকের বাজারে তার আর খুঁজি পাওয়া দুষ্কর হবে, কাজেই খুব সাবধানে রাখবেন। তবে আপনার হাতে এটা আমি নির্ভয়ে ও নিঃসন্দেহে রেখে যাচ্ছি, আগামী সোমবারে নিজে এসে এটা আমি ফেরৎ নিয়ে যাব।

তিনি চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন দেখে আমি আর কিছু বললুম না, আমার ক্যাসিয়ারকে ডেকে পঞ্চাশ খানা হাজার টাকার নোট দিতে বলে দিলুম। কিন্তু শেঠজী চলে গেলে পর, যখন আমি একলা এই অমূল্য রত্ন মুকুট নিয়ে বসে রইলুম, এই বিরাট দায়িত্ব নিয়ে তখন আমার মনে নানা রকম ভয়ের উদয় হতে লাগলো,— যদি এর কোন ক্ষতি হয়, যদি খোয়া যায়, চুরি যায়, সব দায়িত্ব একা আমার ওপরে, তখন মনে হতে লাগলো এ দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে না নিলেই ভাল করতুম। তবে এখন আর এসব ভেবে কি হবে? ব্যাঙ্কের লোহার সিন্দুকে রত্ন মুকুট বন্ধ করে রেখে, বসে নিজের কাজ করতে লাগলুম।

বিকেলে যখন ওঠবার সময় হলো, মনে হলো মুকুটটি ব্যাঙ্কের সিন্দুকে রেখে যাওয়াও ঠিক নিরাপদ হবে না। ব্যাঙ্কেও ত চুরি ডাকাতি হয়, লোহার সিন্দুক ভেঙেও চুরি হতে পারে, অসম্ভব নয়। ভেবে চিন্তে স্থির করলুম যে রোজ সন্ধ্যায় মুকুট সঙ্গে বাড়ী নিয়ে যাবো, আবার পরদিন সকালে ব্যাঙ্কে নিয়ে আসবো, অর্থাৎ ওটিকে এক মুহূর্ত্ত কাছ ছাড়া করবোনা, সর্ব্বদা আমার চোখের ওপর নিজের হেপাজতে রাখবো, সোমবার পর্য্যন্ত এই রকম করবো। একটা গাড়ী ডাকিয়ে মুকুট সমেত বাক্সটি সঙ্গে নিয়ে বাড়ী গেলাম। আমার বাড়ী সহরের বাইরে, একটু দূরে। বাড়ী গিয়ে, আমার শোবার ঘরের সংলগ্ন ড্রেসিং রুমে বড় আলমারীর দেরাজে মুকুটের বাক্সটি চাবি বন্ধ করে রেখে তবে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। (ক্রমশঃ)

কিশোর ও বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার পরিচালনার উপকরণ

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান

বড়দের মত ছোটদের মধ্যে নানারকমের পাঠক আছে। কেউ আগ্রহশীল নতুন কিছু জানতে চায়—নিজেদের জানার মধ্যের ফাঁকগুলি পূর্ণ করে নেওয়াতে লজ্জা বোধ করে না। কেউ নিস্পৃহ—জানতে আপত্তি নেই, তবে না জানলেও ক্ষতি নেই। এমন পাঠক আছে, যার বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু পড়াশোনাও আছে। মোটের ওপর সেই পাঠকরাই অসংখ্য—যাদের সাধারণ পড়াশোনার স্তর এত নীচু এবং সেই কারণে ভাষাবোধ এমন স্তরে যে শুধু বৈজ্ঞানিক রচনা নয়, যে কোন জটিল চিন্তার বিষয় তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়

কোন বিষয়ে জানবার আগ্রহ হলেই, এমন কি সে আগ্রহ ব্যাপক হলেও, আমরা বিজ্ঞানের চর্চা করবার বলে গণ্য করতে পারি না। ধারাবাহিক ভাবে বিজ্ঞান বুঝতে হলে যুগে যুগে বিজ্ঞান কি ভাবে মানুষকে নতুন নতুন সুখ সুবিধা এনে দিয়েছে তার একটি সমগ্র ইতিহাস জানা দরকার। আমরা জানি প্রাচীন মানুষ আগুন, ধাতু, বীজ বপনকাল, রান্না, বয়ন, কৃষিশিল্প, চাকা, ঘড়ি, বাতি প্রভৃতি আবিষ্কার করেছে। এর কাহিনী বাংলা ভাষায় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় "যুগে যুগে মানুষ" গ্রন্থমালায় রচনা করেছেন। তাঁর "মানুষ তখন কি ছেলেমানুষ", "রেমিও, রেমিও", "হরপ্পা চলো, হারাপ্পা পেরিয়ে"তে কিশোররা কিছু কিছু বিজ্ঞানের খোরাক ত পাবে। কিন্তু ষোলো বছর আগে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর "বিজ্ঞান শিক্ষকের অভিজ্ঞতা" (শিক্ষা, ১৩৪৭, অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৮-১০, পৌষ, পৃঃ ৭-৯ ; ফাল্গুন, পৃঃ ৯-১১ ; চৈত্র, পৃঃ ৭-১০),র যথাযথ ব্যবহার করে বিজ্ঞানের তথা বিশ্বমানুষের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস রচনার সম্ভাবনা এখনও কতদূরে রয়ে গেছে।

তার কারণ দুটো। এক হল মানুষের ইতিহাস আর বিজ্ঞানের ইতিহাস দুটিকে আলাদা ভাবে বিচার করার অভ্যাস। দ্বিতীয়, বিজ্ঞান বস্তুটি কি, বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান কি ভাবে অর্জন করতে হয় তা বুঝবার ব্যাপারে আমাদের দারুণ ঔদাসীন্য

চক্রবৎ ঘুরছে পৃথিবী। লোকে মনে করত ঘুরছে সূর্য। যীশুখৃষ্টের মৃত্যুর পর ৪৭৬ বৎসর পর্যন্ত লেগে গেল মানুষকে পঞ্জিকা আবিষ্কার করতে। ব্যাবিলনের মানুষরা এটি আবিষ্কার করলেন। জলঘড়ি আবিষ্কার করলেন চীন ও মিশরের মানুষরা। বর্ণমালা আবিষ্কার করলেন ব্যাবিলন, মিশর, গ্রীস ও ভারতবর্ষের মানুষরা। পাথরে সেগুলি খোদাই করে বা আঁচড় কেটে লেখা হত। তারপর গাছের ছাল, গাছের পাতার ব্যবহার শুরু হল—মিশরে এলো প্যাপিরাস, ইংলণ্ডে এলো বক (Boch), ভারতবর্ষে ভূর্জপত্র, গ্রামভারতে কলার পাতা। ছোটদের জন্য লেখা 'মুদ্রণ বিশারদ', বইয়ে অশোক ঘোষ এর পরিচয় দেন নি। দেন নি এ সংবাদ যে ৭৪১ খৃষ্টাব্দে যাকে ইতিহাসের হিসাবে আমরা অন্ধকারময় যুগ বলি আরব যেদুইনরা কাগজ তৈরীর পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। খোদাই করা কাঠ যাতে কালি মাখিয়ে ছাপা হত বাইবেল তা হাত থেকে পরে গিয়ে গটেনবার্গের মাথায় (১৪৩০ খৃঃ) বুদ্ধি আসে আলাদা আলাদা কাঠের হরফ গেঁথে ছাপানোর পদ্ধতির। তার কথাও তো পাই না এই বই-এ : 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার' বই-এ পরিচয় দেওয়া হয়েছে, এই আবিষ্কারের।

অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের লেখা "পাটের কথা", "ধানের কথা", গোপাল হালদারের সম্পাদিত "বাংলাদেশ পরিচয়" বই বার হয়ে কিশোরদের দেশের ফসল, নদনদী, বাজার শহর ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয়ের সূচনা হয়েছে।

বাংলা দেশের নিবিড় সামগ্রিক পরিচয় অধ্যাপক ডাঃ শিব প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এর "২৪ পরগণা ও কলিকাতায়" যে সত্যসন্ধানী দৃষ্টিকে আশ্রয় করে পরিবেশিত হবার পথ রচিত হয়েছে সে পথে বিজ্ঞান লেখকদের ছোটদের জন্য বা বিজ্ঞানের সঙ্গে অপরিচয় ঘুচে যায়নি তেমন বড়দের জন্য নতুন বই আসছে না। পাটগাছের ছবি—পাটচাষীর জীবনযাত্রা, জল বৃষ্টি রৌদ্র, পোকা মাকড় থেকে শুরু করে ব্যবসায় নিয়ন্ত্রক সকলের হাতে পড়ে পাট কি ভাবে বাংলা দেশের সম্পদ হয়েও চাষীদের কপাল থেকে দুশ্চিন্তার রেখা ঘুচিয়ে দিতে পারছে না তার পরিচয় "পাটের কথা" বইটিতে নেই।

অথচ এমন পরিচয় না দিলে 'সবজান্তা', 'জেনে রাখা ভাল', 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড', 'শিশু-ভারতীর' মধ্যে যে সব মূল্যবান তথ্য আছে তা সামাজিক চিন্তার সূত্র এনে দেবে না কিশোর পাঠকদের মনে। ইংরাজী ভাষায় ব্রিটিশ কাউন্সিল প্রকাশিত Science Lifts the Veil বা ল্যান্সলট হগবেন রচিত Science and Citizen, বিজ্ঞান শিক্ষকদের জন্য লেখা Science & Everyday Use এবং পদার্থ বিজ্ঞানের ধারাবাহিক পরিচয় পাবার কোষগ্রন্থ বা ইতিহাস গ্রন্থ হিসাবে জেমস্ জিন্সের The Growth of Physical Science এর কাছাকাছি যেতে পারে এমন বই বড়দের জন্যও বাংলা ভাষায় হয় নি, সুতরাং ছোটদের জন্য—রঞ্জিত ও জোয়ারদারের 'বিজ্ঞানের চিঠি' এবং যোগেন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'শিশু-ভারতী'কে ছাপিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা তার সম্যক ব্যবহার শুরু হয়নি বলা চলে।

পদার্থ বিদ্যার সঙ্গে পরিচয় পেতে হলে তাই আমাদের এখানে একটু ওখানে আধটুকু খুঁজতে হবে। "ফটোগ্রাফি", "ডার্করুম" লিখেছেন নীরোদ রায়। সেখানে পাওয়া যাবে আলোক বিজ্ঞানের কথা। তাও সবটা নয়। তবে যেটুকু পাওয়া যাবে সেটুকু অমূল্য। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মণ্ট-গলফাইয়ার্স যেভাবে আবিষ্কার করেছিলেন তার কাহিনী পাওয়া যাবে না; পাইলট হতে চায় এমন কিশোর বিজ্ঞানীর হাতে ধরে দেওয়া যাবে আশুতোষ দাসের 'বিমানের আত্মকথা', দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তের 'নীল আকাশের অভিযাত্রী'। কিন্তু যদি ১৮২০ থেকে ১৮৭৭ এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে চুম্বক আবিষ্কার করার কথা (অরষ্টেড, ১৮২০), রেল ইঞ্জিন (ষ্টিফেনসন, ১৮২৯), ডাইনামো (ফ্যারাডে, ১৮৩১); তারবার্ত্তা (মোর্স, ১৮৩৬), আলোক চিত্র (ডেগর, ১৮৩৯), রং (পার্কিন, ১৮৫৬), জীবাণু (পাস্তুর, ১৮৬০), টেলিফোন (বেল, ১৮৭৬), ফনোগ্রাফ (এডিসন, ১৮৭৭)—এদের খুঁটিনাটি পরিচয়, গল্প, বৈজ্ঞানিক-দের কি ভাবে কাজ চালাতে হয়েছে তার বিবরণী চাওয়া যায়—দেবার মত লেখকের জন্য দেশ জোড়া খোঁজখবর চালাতে হবে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় "ক্ষুদে শয়তানের রাজত্ব" বই-এ জীবাণুর সংবাদ পাওয়া যাবে। "বিদ্যুৎ বিশারদ" বইয়ে দেবীদাস মজুমদার বিদ্যুৎ-এর কথাও বলবেন। কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না এ খবর যে ১৮৬৩ সালে হাতী মারা আইন করে বন্ধ করে দেওয়ায় বিলিয়ার্ড বল কোম্পানীরা বিপদে পড়ে গেল। হাতীর দাঁত পাওয়াই যায় না। ব্যবসা বন্ধ হবার উপক্রম। ভেবে চিন্তে কেলান-কোলাণ্ডর কোম্পানীর কর্ত্তা ৪০,০০০৲ পুরস্কার ঘোষণা করলেন যে পারে নকল বার করতে যে উপাদানে তৈরী বিলিয়ার্ড বল হাতীর দাঁতের বলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না—কোন্‌টা আসল কোন্‌টা নকল। আবিষ্কার হল সেলুলয়েড। করলেন ছাপাখানার কর্মী জন ওয়েসলে হায়াট।

ভারতীয় বিজ্ঞান সভার প্রয়োগারের Atoms in Action (The World of Creative Physics) বইয়ের মাঝার ধুলোর আস্তরণ কালো হয়ে জমাট বাঁধবে; Humour and Humanism in Chemistry-র পাতায় পাতায় অজস্র বিজ্ঞানের গল্প বাংলা ভাষায় প্রকাশ পাবার জন্য দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করবে। বিজ্ঞান সাধকরা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেবেন না দেশের কিশোরদের জন্য বই লিখে; দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত "ছোট হলেও ছোট নয়", দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় "পারা থেকে সোনা" লিখবেন। ছাপা হবে—কিছু বিক্রি হবে—কিন্তু সে বই পড়ে ব্ল্যান-ফোর্ড ষ্ট্রীট এর রেবোর বইয়ের দোকানের মাইকেল

যে না স্বাধীন ভারতবর্ষে।

১৯২৩ সালে অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু চারি খণ্ডে "উদ্ভিদ জ্ঞান" রচনা করেছিলেন। তার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশ করেছেন। বাকী খণ্ডগুলির সন্ধান বড়দের মধ্যে ক'জন রাখেন? ছোটদের চিড়িয়াখানায় নিয়ে গেলে জীবজন্তু সম্বন্ধে কৌতূহল হতে পারে এই ভেবে একখানা ছোট "প্রাণী বিজ্ঞান" লিখেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁর তো পাঁচ শিষ্য বিশ্বজয় করেছেন। আর প্রশিষ্য তো সারা দেশেই। কই সে বইটির কি হল?

১৯৮২ সালে বড় বড় গুণ (multiply) করার কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছিল। তার ফের বয়ে এসেছে ইলিকট্রনিক ব্রেন—আমাদের দেশেই ভারতীয় পরিসংখ্যান মন্দিরে তা নিয়ে গবেষণা এবং প্রয়োগও শুরু হয়েছে। আজো পর্যন্ত সাধারণের জন্য একটি বই তৈরী হয় নি যেমন হয়েছে Giant Brains—Machines that think; Faster than Thought বইয়ে। গবেষণা মন্দিরের বৈজ্ঞানিকরা গণনযন্ত্র ব্যবহার করে প্রাথমিক গণিত ভুলতে চললেন, দপ্তরে করণিকরা যোগ-বিয়োগও যন্ত্রেই করছেন; কিন্তু ভারতীয় বিজ্ঞান সভার গ্রন্থাগারের ইংরাজী বই দুটির ওপর নির্ভর করে লেখা লিখিয়ে নেই। ভারতীয় পরিসংখ্যান মন্দিরে বোধহয় বইগুলি নেইও।

এত বড় প্রতিষ্ঠান বসু বিজ্ঞান মন্দির। কিন্তু প্রকৃতি-বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য একটি বাংলা বইও সেখান থেকে এলো না। 'জ্ঞানবিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা এবং 'করে দেখ' বই অবশ্য প্রয়াত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য সেখানে থেকেই রচনা করে সাধারণ ও কিশোরদের বিজ্ঞান পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কিছু হাতে কলমে করে দেখার পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু দেশজোড়া বিজ্ঞান ক্লাব যেখানে প্রয়োজন সেখানে আজও পর্যন্ত Hand-book for Science Clubs রচনার অনুবাদ বা মৌলিকভাবে বাঙালী কিশোর কিশোরীদের প্রয়োজন বুঝে প্রকৃতি বীক্ষণ, রসায়নের পরীক্ষা, যাদুঘরের শিক্ষা প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাদের প্রথম পদক্ষেপের সহায়-গ্রন্থ রচনায় আগ্রহ কোথায় দেখা যাচ্ছে?

তাই হাতের গোড়ায় থাকে অভিজিৎ-এর "অ্যাটম বোমা", কামিনী কুমার দের "সহজ লক্ষ্য ও চেনা" "নীল আকাশের কোলে", দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর "অণুপরমাণু আর পদার্থের কথা" "বুড়ো পৃথিবীর কথা" "বাজ পড়া ফাঁদ" "শোন বলি মনের কথা" বিজয় ভিক্ষুর "কি ও কেন" "বিচিত্র এই সৃষ্টি" "অদ্ভুত কথা" "কারীগরের বাহাদুরী" "ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড" "প্রাণের স্রোত" সবুজ কি অবুঝ" "প্রাণী জগৎ" "বিজলীর দীপ্তি" অশোক মিত্রের "বেতারের গল্প" গিরিন চক্রবর্তীর "কটা বাজল", লতিকা মুখোপাধ্যায়-এর "প্রাত্যহিক বিজ্ঞান" সুধীরচন্দ্র সরকারের "সাধারণ জ্ঞান" ও "পশ্চিম বাংলা", সুবোধচন্দ্র মজুমদারের "বিজ্ঞানের মায়াজাল" "জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাকথা", সুশীলচন্দ্র রায় চৌধুরীর "বিজ্ঞানের খবর"।

শিক্ষক, অভিভাবক এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় তাঁরা ছোটদের হাতে বিজ্ঞানের বই তুলে দেবার যে অসুবিধাগুলি অনুভব করছেন তা পত্রিকাদি মারফত আলোচনা করলে বিজ্ঞানকে ছোটদের কাছে প্রিয় করার কাজে অনেকটা সহায়তা হতে পারে।

[বর্তমান সূত্রসন্ধান প্রবন্ধটি ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্য শ্রীহরিপ্রসাদ সেনগুপ্তের পরিচালনায় কিশোর ও বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও শিক্ষণ শ্রেণীর সহযোগীরা সঙ্কলন করেছেন।]

MACHINERY for

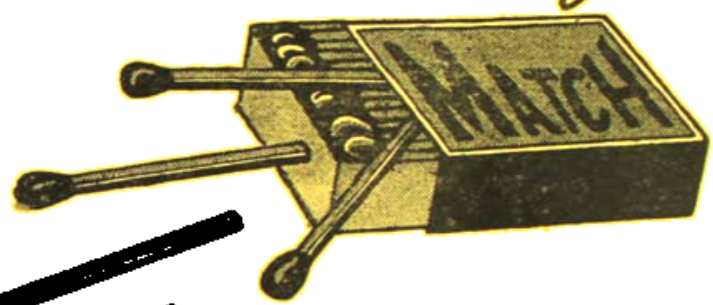

দিয়াশিলাই কুটির-শিল্পের সাহায্যার্থে ভারতীয় সরকার প্রতি গ্রোসে নয় আনা excise rebate দিয়েছেন। তার সুযোগ গ্রহণ করে গ্রামে দিয়াশিলাই কারখানা গড়ে তুলুন। বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন।

STANDARD MACHINERY CO.

67B, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA-1

Regd. No. C-3932 November-December 1956 প্রতি সংখ্যা আট আনা

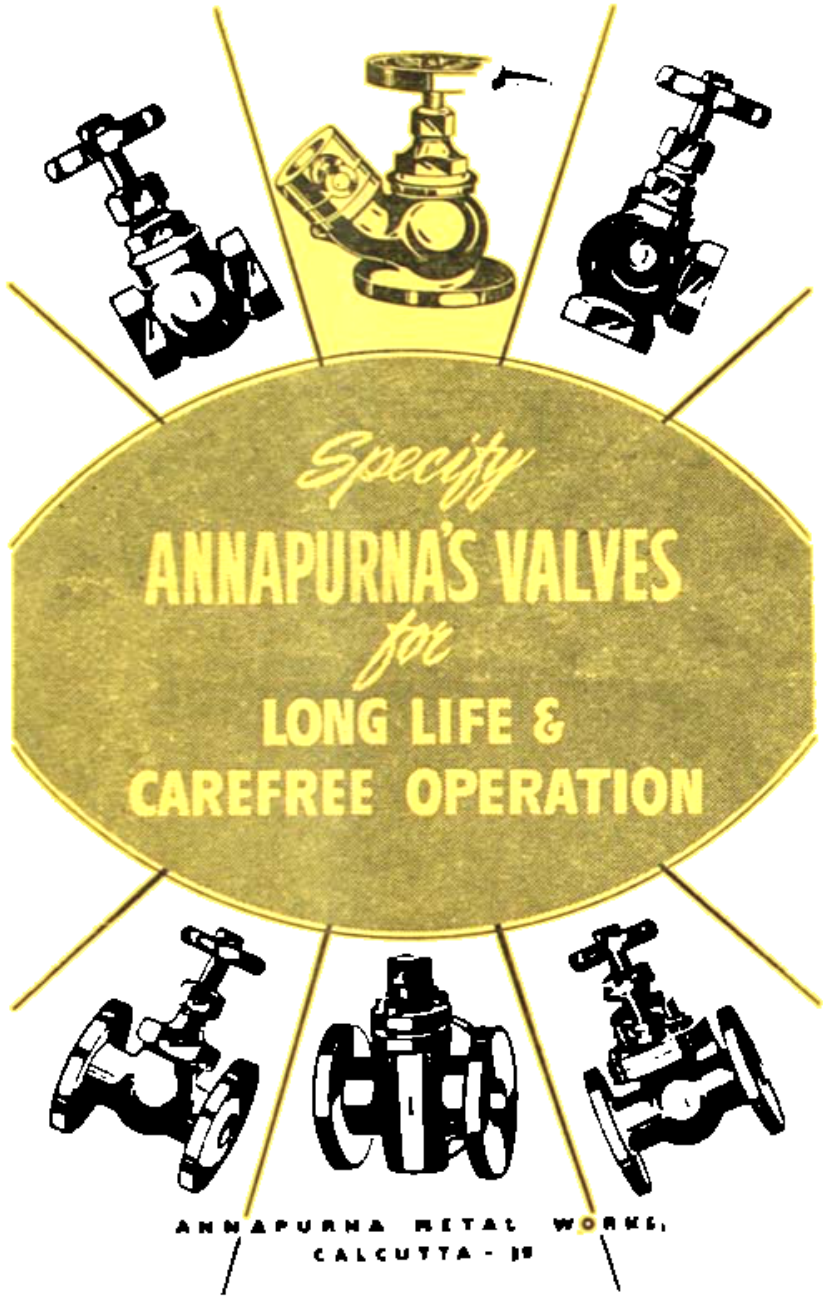

নারায়ণ পাল কর্তৃক ৬১এ, বলরামপাড়া রোড, কলিকাতা-৬ নিউ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোঃ প্রাইভেট লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও ৮৭ নং মনোহর দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—জ্ঞানাঞ্জন পাল।

পরিচয়

এই সংখ্যায় :

- বিপিনচন্দ্র পাল—ধর্ম ও আর্ট (২)
- লেখকের ডায়েরী—বিমল কর
- অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার জীবন সংগ্রাম
- আমার চোখে দেখা সোভিয়েট দেশ
- গল্প
- কবিতা
- কিশোর মহল
- সমসাময়িক সাহিত্য

প্রচ্ছদ

॥ সূচীপত্র ॥

পৌষ—মাঘ ১৩৬৩

ঘরে ও বাইরে [২]—বিপিনচন্দ্র পাল
লেখকের ডায়েরী থেকে—বিমল কর
ভ্রমণ—
আমার চোখে দেখা সোভিয়েট দেশ [৩]
—ডাঃ কালেন্দ্রকুমার পাল
গল্প—
অরণ্যচারিণী—সমর চট্টোপাধ্যায়
শিথিল শৃঙ্খল—অরুণা চৌধুরী
কবিতা—
আমি তোমাদের—আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন ৩৩১
স্বীকারোক্তি—উৎপলা মুখোপাধ্যায় ৩৩৩
স্মৃতি-গন্ধী—বাসন্তী সেন ৩৩৭
তুমি—সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ৩৩৮
এখনও জেগে আছি—অরুণিমা পাল ৩৩৭
কিশোর জগৎ—
তীর-চত্বর দেশে—মিনতি সেন ও অশোক সেন
রহস্য উপন্যাস—
শেঠজীর রত্নমুকুট—বিপিনবিহারী রায় ও কানাই রায়
গল্প—
একটি কোরাস—শিশির রায়
জীবন সাধনা—
অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার জীবন সাধনা [১]—হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত ৩৪৫
সম-সাময়িক সাহিত্য—
"ইতিহাস" পত্রিকা—জয়শ্রী রায়

॥ পাদপূরণ ॥

ভন-জীবনে বাংলা সাহিত্যের অভাব—নরসুন্দর—মনোজ বসু
জীবন ও সাহিত্য—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পবোধ—সুবোধ ঘোষ
নব জীবনের পথে—কুষ্টোদার কছগুপ্তা

॥ পত্রিকা সম্বন্ধে ॥

যুগযাত্রীর বার্ষিক সডাক মূল্য ছ'টাকা। আষাঢ় থেকে বর্ষ সুরু। সব বিষয়ের মৌলিক রচনাই আমরা সাদরে গ্রহণ করব। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে লিখে সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন। অমনোনীত রচনা উপযুক্ত ডাকটিকিট ও ঠিকানা দেওয়া থাকলে যথাসময়ে ফেরৎ দেওয়া হয়। পত্রিকায় সমালোচনার জন্য দু'খানা করে বই সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন। চিঠিপত্র ইত্যাদি সম্পাদকীয় কার্যালয়ে প্রেরিতব্য। নীচে বিজ্ঞাপনের হার দেওয়া হ'ল।

বাইরে	পূর্ণ পৃষ্ঠা	ভিতরে	পূর্ণ পৃষ্ঠা ৩০৲
ঐ	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	ঐ	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১৬৲
ঐ	সিকি পৃষ্ঠা	ঐ	সিকি পৃষ্ঠা ৯৲

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৬১-এ, বলদেওপাড়া রোড,

প্রথম বর্ষ | পৌষ ১৩৬৩ | সপ্তম সংখ্যা

ধর্ম্ম ও আর্ট

[দুই]

বিপিনচন্দ্র পাল

মানবপ্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই সাহিত্য ও আর্ট সর্ব্বদা আপনার অমর সৃষ্টিপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখে। সহজ মানব-ধর্ম্মের মুক্ত স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়াই সাহিত্য সংসারকে অপূর্ব্ব রসরসে সঞ্জীবিত করে। সমাজের রুদ্ধজলে বদ্ধ হইয়া, কোনও সাহিত্য বা কোনও আর্ট আপনার সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। মহাকবি কালিদাস ও আমাদের মতন সমাজদ্রোহী ছিলেন না। কিন্তু শকুন্তলার অলোক-সামান্য চিত্রটি তিনি কি সনাতন সমাজ-ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া আঁকিয়াছেন, না সহজ ও সার্বজনীন মানব-ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া আঁকিয়াছেন? কালিদাসের সময়ে হিন্দুসমাজে গান্ধর্ব্ব বিবাহ ছিল। গান্ধর্ব্ব-বিবাহ গোপন-বিবাহ। ধর্ম্মের প্রয়োজনে নহে, কামের প্রেরণাতেই, গান্ধর্ব্ব বিবাহের অনুষ্ঠান হয়, শাস্ত্রেই একথা বলে। ধর্ম্মের প্রয়োজনে যে বিবাহের অনুষ্ঠান হয়, প্রজাসৃষ্টি তার লক্ষ্য, সমাজ তার সাক্ষী থাকে। কাম-প্রণোদিত গান্ধর্ব্ব-বিবাহ সমাজের অতি শৈশবের কথা। সমাজের সে অতি-শৈশবে গান্ধর্ব্ব-বিবাহ ও আসুর বিবাহ দুই প্রচলিত ছিল। তখন না ছিল স্মৃতি, না ছিল স্মৃতি ছিল না ছিল আশ্রম; ছিল কেবল সহজ, সতেজ, সরল মানব-প্রকৃতি। তখন বিবাহমাত্রেই হয় গান্ধর্ব্ব না হয় আসুর বিবাহ ছিল। কালিদাসের বহু বহু যুগযুগান্ত পূর্ব্বে সমাজ সে শৈশবাবস্থা ছাড়াইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু মানুষ আপনার প্রকৃতিকে ছাড়ায় নাই। এই প্রকৃতির প্রেরণাতেই দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মিলন হইল। সমাজ এই মিলনের সাক্ষী রহিল না। শকুন্তলাকে দুষ্মন্ত মহর্ষি কণ্বের কন্যা বলিয়াই জানিতেন। কণ্ব ব্রাহ্মণ, তিনি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিগ্রহণ বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিরুদ্ধ। বিবাহকে বৈধ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু মানব-প্রকৃতি ও মানব-হৃদয়

সমাজ-ধর্ম্মের বশ নহে। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার সহজ প্রকৃতি, আপনার অন্তঃপ্রেরণায় এই কল্পিত, কৃত্রিম সমাজধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া, আপনার চরিতার্থতা সাধন করিল। দুষ্মন্ত গোপনে ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বিবাহ করিয়া সমাজদ্রোহী হইলেন। শকুন্তলাকে ক্ষত্রিয় কন্যা করিয়াও, কবি দুষ্মন্তের সমাজদ্রোহীতার প্রতিকার করিতে পারেন নাই। তাহাতে কেবল কণ্বের সমাজ-ধর্ম্ম রক্ষার একটা পথ বাহির করিয়াছেন মাত্র। শকুন্তলা সমাজ-ধর্ম্ম ভুলিয়াই দুষ্মন্তকে গোপনে আত্মদান করিলেন। সমাজ-ধর্ম্ম ভুলিয়াই তিনি আতিথ্যসৎকারও ভুলিয়া গেলেন। এই জন্যই সমাজ-ধর্ম্মের রক্ষক ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসার রূপ ধারণ করিয়া, ইঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন। এই অভিসম্পাতেই দুষ্মন্তের স্মৃতিলোপ, শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান ও উভয়ের বিরহ ঘটাইল। পরিণামে কবি, অপূর্ব্ব কৌশলে, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্রের আশ্রয়ে, মানব-ধর্ম্মের ও সমাজ-ধর্ম্মের এই বিরোধ ভঞ্জন করিলেন। কারণ, সমাজ-স্থিতিরক্ষাই সমাজ-ধর্ম্মের মূল কথা। প্রজোৎপত্তির দ্বারা সমাজ-স্থিতিভঙ্গ নিবারিত হয়। সতেজ, শক্তিমান পুত্রোৎপাদন করিয়াই সকল সমাজদ্রোহী দাম্পত্য-বন্ধন ঐ দ্রোহীতার প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকে। শকুন্তলাতে আদিতে সহজ মানব-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য, মধ্যে সমাজ-ধর্ম্মের প্রভুত্ব, আর পরিণামে ঐ সহজ মানবধর্ম্মের ফলে এবং তাহারই উপরে, সমাজ-ধর্ম্মের ও মানবধর্ম্মের মিলন, সন্ধি ও সামঞ্জস্য দেখি। শকুন্তলা পড়িয়া মনে হয় যে আমাদের মধ্যে যেমন, কালিদাসের সমসাময়িক হিন্দুসমাজেও সেইরূপ, গতানুগতিক সনাতনীর প্রভাব সহজ মানবের সহজ প্রকৃতিগত ধর্ম্মকে চাপিয়া মারিতেছিল। কালিদাস এই আত্মঘাতী সমাজ-ধর্ম্মের হাত হইতে সহজ মানব-প্রকৃতিকে তাহার স্ব-ধর্ম্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়াই, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার সহজ প্রেমের সরল অভিনয়ের সূত্রপাত করিলেন। মানব-ধর্ম্ম সার্থক হইল। পরে সমাজের শাসনদণ্ডের দ্বারা ইহার নির্য্যাতন করিলেন। কিন্তু পরিণামে ঐ সহজ ও স্বাভাবিক মানবধর্ম্মেরই জয় হইল। সমাজ রস বুঝে না, কিন্তু আপনার স্বার্থটি খুবই বুঝে। প্রজোৎপাদনে এই স্বার্থ সাধিত হইল। এইরূপে শ্রেষ্ঠতম ও মুখ্যতম সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে সহজ ও স্বাভাবিক মানবধর্ম্মের মিলন ঘটাইয়া, কালিদাস এই চিরন্তন সমাজ-সমস্যার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করিলেন। সমসাময়িক সনাতন প্রথার একান্ত আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিলে, কালিদাস কোনও দিন এই অপূর্ব্ব রস-চিত্রের সৃষ্টি করিতে পারিতেন না।

ফলতঃ এই রস-বস্তু, অন্তরের বস্তু; আর সচরাচর আমরা যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া থাকি, তাহা একটা বাহিরের বস্তু। কতকগুলি প্রচলিত মত, কতকগুলি অভ্যস্ত ও পুরাগত ক্রিয়াকলাপ, কতকগুলি গতানুগতিক আচার-বিচার লইয়াই এই ধর্ম্ম গঠিত। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীনেরাও এই বেদ-স্মৃতিসদাচারগত ধর্ম্মের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মের সনাতনত্বের দাবী কেবলমাত্র লোকরঞ্জনের নিমিত্তই প্রতিষ্ঠিত হয়, এই কথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই ধর্ম্ম সনাতন নহে, সনাতন হইতে পারে না; কারণ যুগে যুগে এধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া আসিয়াছে। লোকে যাহাকে সদাচার বলে, ইউরোপীয়েরা যাহাকে মর‍্যালিটি (morality) বলেন, আধুনিক বাঙ্গালায় যাহাকে আমরা নীতি বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহাও নিত্য-বস্তু নহে। এক যুগে যাহা সদাচার, অপর যুগে তাহা অনাচার! এক দেশে যাহা মর‍্যালিটি অপর দেশে তাহা দুর্নীতি বলিয়া পরিগণিত হয়!

বৈদিক সমাজে বিধবার "নিয়োগের" বিধান ছিল ; এখন বেদের দোহাই দিয়াও এই সনাতন প্রথার প্রবর্ত্তন বা সমর্থন করা যায় না। মনুর ক্ষেত্রজ সন্তানেরা এখন জারজ বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত এদেশের সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে দাসীপুত্রেরা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন ইহা বিগর্হিত হইয়াছে। অন্যদিকে এমন অনেক বিষয় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, যাহা এখন শনৈঃ শনৈঃ সমাজের শিষ্টজনেরা পর্য্যন্ত অকুণ্ঠভাবে অবলম্বন বা আচরণ করিতেছেন। যাঁহারা শাস্ত্রবিধির দোহাই দিয়া এখনও এসকল অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনের প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর, তাঁহাদের আন্তরিক ধর্ম্মবুদ্ধিও এগুলিকে আর এখন পাপচক্ষে দর্শন করে না। দেশভেদে, কালভেদে, সর্ব্বত্রই লৌকিক ধর্ম্মের ও সামাজিক সদাচার বা সুনীতির এইরূপ পরিবর্ত্তন নিয়তই ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থায়, এই চঞ্চল ধর্ম্মের বা নীতির হস্তে জীবনের অপরাপর বিভাগের নেতৃত্বভার একান্তভাবে অর্পণ করা যায় কি ? এই নীতির দ্বারা রসসৃষ্টির বা আর্টের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিকে চাপিয়া রাখাই কি সঙ্গত হয় ?

ফলতঃ এই রস-স্ফূর্ত্তি বা আর্ট যুগে যুগে লৌকিক ধর্ম্মের ও নীতির বা মনুষ্যত্বের আদর্শের পরিবর্ত্তনে সর্ব্বত্রই বিশেষ সাহায্য করিয়া আসিয়াছে। মানুষের চারিদিকের নৈসর্গিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তার ধর্ম্মের ও নীতির আদর্শের পরিবর্ত্তন ঘটে। যেখানে মানুষ দীর্ঘকাল ধরিয়া একই প্রকারের নৈসর্গিক বাসস্থানের মধ্যে বাস করে, কিম্বা বহুদিন পর্য্যন্ত কোনও ভিন্ন পরিবেশে তাহার পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা না জন্মায়, সেইখানেও কবি-প্রতিভা নিত্যই ঐ সকল পুরাতন দৃশ্য এবং সম্বন্ধের মধ্যেই নব নব রূপ ও রস প্রত্যক্ষ করিয়া, নূতন নূতন রস-সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা করে এবং এই সকল রস-সৃষ্টির সাহায্যে জনসাধারণের অনুভূতি ও কল্পনাকে নিত্য নব নব ভাবে জাগাইয়া, তাহাদের অন্তরে নব নব আদর্শ ফুটাইয়া তোলে। এই সকল ভাব ও আদর্শের প্রেরণায় সমাজের লোকের মতামত ও মতিগতি অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়া, সমাজের ধর্ম্ম ও নীতি নব নব আকার ধারণ করে। দার্শনিকেরা বিচার করিয়া, তার্কিকেরা তর্কযুক্তির দ্বারা, রাজশক্তি আপনার প্রতাপের প্রভাবে ও সমাজপতি এবং পুরোহিতগণ ধর্ম্মভয় জাগাইয়া বা সমাজের শাসনদণ্ড তুলিয়া, যাহা করিতে পারেন না, কবিগণ অলক্ষিতে তাহা সাধন করেন। কবির সৃষ্টি লোককে আনন্দ দান করে। রস-রাজ্যে লোক এই আনন্দই খোঁজে। তাহারা কবিকল্পনা-প্রসূত নব নব রস-মূর্ত্তি সকলকে কেবল অন্তরে অন্তরে সম্ভোগই করে, ইহাদের তত্ত্ববিচারে বা ধর্ম্ম-মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয় না।

রস-সৃষ্টির বা আর্টের সঙ্গে সমসাময়িক ধর্ম্মের বা নীতির কোনও সম্বন্ধ যে থাকে না, তাহা নহে। বরঞ্চ সর্ব্বত্রই এই ধর্ম্মের ও নীতির দ্বারা আর্টের বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও, ধার্ম্মিকেরা আপনাদের আচরিত ধর্ম্মে, অথবা নীতিবাদীরা আপনাদের বিধিনিষেধাদিতে যে বস্তু প্রত্যক্ষ করেন না, কবিপ্রতিভা তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। ধার্ম্মিক যখন মতবাদে আবদ্ধ, কবি তখন তত্ত্বসাক্ষাৎকারে কৃতার্থ হইয়া, এই মতবাদের মধ্যে প্রাণ ও রস সঞ্চার করিয়া, তাহাকে জীবন্ত ও আনন্দময় করিয়া তোলেন। মত বস্তু চঞ্চল, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। মত মাত্রেই স্বল্পবিস্তর অনুমান-প্রতিষ্ঠ। তত্ত্ব বস্তু

প্রত্যক্ষ-প্রতিষ্ঠিত। এই নিত্য তত্ত্ব-বস্তুকেই ঐ চঞ্চল মতবাদ দেশকালের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা ও ব্যবস্থার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। তত্ত্ববস্তু জ্ঞান-বস্তু এবং আনন্দ-বস্তু। তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশে নূতন সত্যের আলোকে পুরাতন ও পুরাগত মিথ্যা-কল্পনা নষ্ট হয়। আর তত্ত্বের আনন্দের প্রেরণায় এই নূতন সত্যকে সমগ্র জীবন দিয়া ধরিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। কবি এই আনন্দময়ী রস-সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা করিয়া, লোকের চিত্তকে প্রথমে মুগ্ধ করেন। এই লোভেই তাহাদের অন্তরে এই রস-সৃষ্টিকে নিজেদের জীবনে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার বাসনা জাগিয়া উঠে। কবির সৃষ্টিতে প্রথমে লোকে কেবল আনন্দই পায়। ইহার মধ্যে কেবল আনন্দই খোঁজে। এই আনন্দ পাইয়াই তাহারা পরিতৃপ্ত হয়। তখন এসকলের আশ্রয়ে অন্য কোনও জিজ্ঞাসার উদয় হয় না। যখন সে জিজ্ঞাসার উদয় হয়, তখন কবির কাজ অনেকটা ফুরাইয়াছে। তখন তাঁর প্রেরিত রস-বস্তু সমাজ-প্রাণের শিরায় শিরায় প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। তখন সমাজ-গতি আপনার অন্তঃপ্রেরণায় এই রসের পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পরিবর্ত্তনের হাওয়া তখন ছুটিয়াছে। নূতন আদর্শের বান তখন ডাকিয়াছে। সেই ডাকে, কার্পণ্যোপহত স্থবির সামাজিকেরা সমাজ-স্থিতি-ভঙ্গ-নিবারণের জন্য "সনাতনীর" নামে রস-সৃষ্টির সহজ স্ফূর্ত্তিকে চাপিয়া রাখিতে উদ্যত হইয়াছেন। এ রস যে তাঁহাদের অজ্ঞাতে ও অলক্ষিতে এতাবৎকাল গোকুলে বাড়িয়া উঠিয়াছে, এ জ্ঞান তাঁহাদের হয় নাই। যখন তাহাকে গলা টিপিয়া মারিতে পারিতেন, তখন তাঁহারা ঘুমাইয়াছিলেন। তখন তাহার কোমল মুখ দেখিয়া ইহারা নিজেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তখন তাহাকে কেবল রূপ-কল্পনা মাত্র বলিয়া সম্ভোগ করিয়াছিলেন। এবস্তু যে মিছরির ছুরী এবোধ তখন ইহাদের জন্মে নাই। এখন সে বাড়িয়া উঠিয়াছে, আপনি আপনার রাজ্য অধিকার করিয়াছে, লোকের মতিগতি ফিরাইয়াছে, এখন ইহার গতিরোধ করে কে? এই নিষ্ফল প্রয়াসে কেবল বিপ্লবের সৃষ্টি করে মাত্র।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হিন্দুর ধর্ম্মে ও হিন্দু সমাজে যেমন সকল ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এমন আর কোনও ধর্ম্মে ও কোনও সমাজে ঘটে নাই। অথচ আমাদের ইতিহাসে কোনও সাংঘাতিক বিপ্লবের কথাও কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উপনিষদ বেদের দেববাদ ও যাগযজ্ঞকে একেবারে উড়াইয়া দিলেন, অথচ যাজ্ঞিক ও ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে একটা মারামারি কাটাকাটি হইল না! হিন্দু প্রাচীন বেদোক্ত ধর্ম্মের মধ্যে দুইটি শাখা গড়িয়া, একটির মধ্যে যাজ্ঞিকদিগের এবং অপরটির মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানীদের স্থান করিয়া দিল। ধর্ম্মের দুই কাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হইল; এক কর্ম্মকাণ্ড, অপর জ্ঞান-কাণ্ড। যাজ্ঞিকেরা যে দেবতার নামে যজ্ঞ করিতে হয়, তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিলেন। ঈশ্বর অসিদ্ধ বলিলেন। ব্রহ্মকে আনলেই আনিলেন না। অথচ তাঁহাদের আর্য্যত্ব বা হিন্দুত্ব, ব্রাহ্মণত্ব বা ঋষিত্ব পর্য্যন্ত কেউ অস্বীকার করিল না। ব্রহ্মজ্ঞানীরা যজ্ঞ ও দেবতা সকলই মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। কেহ কেহ বা সত্য বলিয়া মানিয়াও ইহাদিগকে মুক্তিপথের অন্তরায় বলিয়া বর্জ্জন করিলেন। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণকে জ্ঞান-দৃষ্টিতে ও সত্যের চক্ষে গরু, হাতী, চণ্ডাল এবং কুক্কুরের সমান বলিয়া প্রচার করিলেন। অথচ কেহ ইঁহাদের সঙ্গে মারামারি কাটাকাটি করিল না। সমাজ নিঃশব্দে, অলক্ষিতে

কর্ম্মকাণ্ডীদিগকে বুকে করিয়া ও জ্ঞানকাণ্ডীদিগকে মাথায় করিয়া লইল! আধুনিক ইউরোপে যেমন বিবাহের পূর্ব্বে যুবতীগণ বহুপ্রণয়ী ও প্রণয়িপিপাসুর সঙ্গে বিবিধ প্রকারের প্রীতি ও সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়, প্রাচীন ভারতে, সনাতন বৈদিক যুগেও সেরূপ হইত, শ্রৌতসূত্রের ও গৃহ্যসূত্রের বহুবিধ মন্ত্রে তাহার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। বিবাহ করিয়া নববধূকে ঘরে লইয়া যাইবার সময়, তাহার উপপতিকে বিনাশ করিবার জন্য মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হইত। এখন এসকল মন্ত্রের কোনও সার্থকতা নাই। কিন্তু একদিন যে এগুলির একটা সত্য অর্থ ছিল, তাহার কি আবার কোনও সন্দেহ আছে? তারপর রামায়ণ মহাভারতে কত ঘোরতর সামাজিক পরিবর্ত্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হইলে, অথবা অক্ষুণ্ণ থাকিলে, দ্রোণ ও কৃপ মহারথী হইতে পারিতেন না। সূর্য্যের সার্টিফিকেট লইয়াও কবি-কল্পনা রাধেয়কে ক্ষত্রিয় করিতে পারিত না। মহাভারতে কত ভাঙ্গা-গড়ার প্রমাণ পাই, অথচ কোনও সাংঘাতিক সামাজিক বিপ্লবের স্মৃতিচিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। জীব যেমন আপনার জীবনের প্রয়োজনে, নূতন নূতন অবস্থায় পড়িয়া, আপনাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলে, হিন্দুসমাজ যুগে যুগে তাহা করিয়াছে। জীবের গঠন-বিকাশে কোথায় পুরাতনের শেষ আর কোথায় নূতনের সূচনা, ইহা যেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; হিন্দুর সমাজ-বিকাশেও কবে, কোন্ সূত্রে কোন্ পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে, ইহা নির্ণয় করা অসাধ্য। পরিবর্ত্তন যে ঘটিয়াছে পূর্ব্বাপর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কেবল ইহাই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। হিন্দু চিরদিনই, নিঃশব্দে ও নিঃসঙ্কোচে প্রাচীনকে বদলাইয়া বর্ত্তমানের প্রয়োজন সাধনের উপযোগী করিয়া লইয়াছে।

মহাভারত ও রামায়ণের অতি পুরাতন কথা ছাড়িয়া, এই চারি পাঁচ শত বৎসরকাল মধ্যে আমাদের আপেক্ষাকৃত অধুনাতন বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে যেসকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ভাবেই আমাদের সমাজে রঘুনন্দন কর্ত্তৃক নবাস্মৃতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। রঘুনন্দন প্রাচীন শ্রুতিস্মৃতিকে এমনি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন যে, রঘুনন্দনের পুত্র, পিতৃপ্রবর্ত্তিতানুযায়ী উপনয়ন-সংস্কার লাভ করিলে পরে, রঘুনাথ শিরোমণি নাকি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রত্যভিবাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। এই নবা-স্মৃতির উপরেই আধুনিক বাঙ্গালীর "সনাতনী" প্রতিষ্ঠিত! আমাদের স্থবির সামাজিকগণ যে "সনাতনীর" দোহাই দিয়া মানবের সমাজ, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ কে চাপিয়া রাখিতে চাহেন, তাহার সনাতনত্ব সাড়ে-চারিশত বৎসরের অধিক বয়ক্রমের দাবী করিতে পারে না। আর রঘুনন্দনের পরে, এই চারি-পাঁচশত বৎসরের মধ্যেই বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে কত কত যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে! এই কালের মধ্যে কত ব্রাহ্মণ কত শূদ্র গুরুর নিকটে মন্ত্রদীক্ষা লইয়াছেন। কত তথাকথিত হীনজাতির লোকে কত নূতন নূতন সাধন ও সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া, কত ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদিকে আশ্রয় দিয়াছেন। "লোকের মধ্যে লোকাচার" মানিয়া মানিয়া চলিয়া, কত ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ-শূদ্র সদ্‌গুরুর সমাজে "সদাচার" অবলম্বনে কত অন্যান্য জাতির অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। শ' দুইশ' বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে যেসকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কত অনাচারকে সমাজ নিঃশব্দে ও নিঃসঙ্কোচে হজম করিয়া লইয়াছে, তার সন্ধান করিলে, আমাদের "সনাতনীর" প্রাচীনত্বের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা অসাধ্য হয়।

আপনার পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার ও ব্যবস্থার সঙ্গে সন্ধি ও সঙ্গতি করিবার শক্তি ও নিপুণতাতেই জীবের জীবনী-শক্তির প্রমাণ-পরিচয় পাওয়া যায়। এই শক্তি ও নিপুণতা যার আছে, সেই জীবই জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করে। ইহাতেই সমাজের জীবনী শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের এই শক্তি ও নিপুণতা নাই, তাহা ক্রমশঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীগণ এবং আমেরিকার ইণ্ডিয়ান-সমাজ ইহার অভাবেই লোপ পাইতেছে। এই শক্তি ও নিপুণতা আছে বলিয়াই হিন্দু শত সহস্র বৎসরের অশেষ প্রকারের ঘটনাবিপর্য্যয়ের মধ্যেও আপনার বৈশিষ্ট্যকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। প্রাচীনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া, "সনাতনীকে" প্রাণপণে রক্ষা করিয়াই যে হিন্দু আজও বাঁচিয়া আছে, একথার সাক্ষী হিন্দুর ইতিহাস কোথাও দেয় না। যুগে যুগে হিন্দু আপনাকে যুগ-প্রয়োজন সাধনের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়াই বাঁচিয়া আছে, ইহাই সত্য।

কি করিয়া প্রাচীনকে নূতনের সঙ্গে মিশাইয়া লইতে হয়, ইউরোপ এখনও ভাল করিয়া তার সঙ্কেতটি শিক্ষা করে নাই। এই জন্যই প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন ঘটাইতে যাইয়া, ইউরোপ সর্ব্বদাই বিপ্লব বাধাইয়া তোলে। ইউরোপ দেহটাকে সর্ব্বদাই আত্মা অপেক্ষা বড় বলিয়া ভাবিয়াছে। তার পরকাল পর্য্যন্ত দেহাশ্রিত। দেহাত্মবাদ ভাল করিয়া নষ্ট হয় নাই বলিয়াই, ইউরোপ সমাজ জীবনের ও ধর্ম্ম-জীবনের বাহিরের ঠাট্‌টাকে লইয়া এত মারামারি কাটাকাটি করিয়াছে। পুরাতন ঠাট্‌টা গেলে পরিচিত প্রাণটাও গেল, রক্ষণশীলেরা এই ভয়ে সেই ঠাট্‌টাকে প্রাণপণে বজায় রাখিতে চাহিয়াছেন। নূতন কাঠাম প্রতিষ্ঠিত না হইলে, নূতন ভাব বা আদর্শও কিছুতেই প্রতিষ্ঠালাভ করিবে না, উন্নতিশীলেরা ইহা ভাবিয়া নূতন কাঠামের স্থান করিবার জন্য সকলের আগে পুরাতন ঠাট্‌টাকে নিঃশেষে ভাঙ্গিতে গিয়াছেন। এইরূপেই ইউরোপে ভূয়ঃ ভূয়ঃ বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে। হিন্দু দেহের প্রতি যত লক্ষ্য করিয়াছে, প্রাণের প্রতি ততোধিক লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়াছে। এই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, উপায় ও উপলক্ষকে উপেক্ষা করিতে ভীত হয় নাই। এইজন্য হিন্দুর সমাজে, হিন্দুর ধর্ম্মে, হিন্দুর জীবনে ও হিন্দুর সাধনায়, যুগে যুগে অশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু সাংঘাতিক বিপ্লব প্রায় ঘটে নাই।

যতদিন হিন্দুর দৃষ্টি অন্তর্মুখী ছিল, আত্মতত্ত্বে শ্রদ্ধা ছিল, অদ্বৈত-বুদ্ধি প্রচ্ছন্ন হয় নাই, ততদিন হিন্দুর ধর্ম্ম বা সমাজনীতি তার আর্ট বা রস-সৃষ্টিকে চাপিয়া রাখিতে চাহে নাই। হিন্দু ব্রহ্মচর্য্যেরও মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছে, আবার আপনার সাধনাসৃষ্ট স্বর্গে বা ইন্দ্রলোকে মেনকা, উর্ব্বশী প্রভৃতিকেও স্থান দিয়াছে। তার ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ পর্য্যন্ত সহজ নারীর ধর্ম্ম বা মানব-ধর্ম্মকে নির্ম্মূল বা অতিক্রম করেন নাই। ততদিন হিন্দুর ধর্ম্মে এবং আর্টে কোনও বিরোধ বাধে নাই। ততদিন হিন্দুর ধর্ম্মেও আর্ট ছিল, আর্টেও ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু ধর্ম্মের আর্ট ধর্ম্মকে মানিয়া চলিয়াছে; আর্টের ধর্ম্ম আর্টকেই মানিয়া চলিয়াছে। কেহ কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে যায় নাই। হিন্দু জানিত যে ধর্ম্মের যেমন একটা নিজস্ব ধর্ম্ম আছে, একটা বিশিষ্ট লক্ষ্য আছে, সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য ধর্ম্ম উপযোগী বিধি-নিষেধাদি গড়িয়াছে; এই সকল বিশেষ বিধি-নিষেধ ও সংযমসাধনাদিই সমাজ-ধর্ম্মের ও সাধন-ধর্ম্মের অঙ্গ; সেইরূপ আর্টের বা রস-রাজ্যেরও একটা নিজস্ব ধর্ম্ম আছে, একটা বিশিষ্ট লক্ষ্য আছে; সেই

লক্ষ্য সাধনোপযোগী শাস্ত্রবিধি আর্ট আত্মপ্রয়োজনেই গড়িয়া তোলে। তাহাকে এসকল শাস্ত্রবিধির আনুগত্য অবলম্বন করিয়াই, আপনার সার্থকতালাভ করিতে হয়। এইরূপে জীবনের বিভিন্ন বিভাগের এই স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াই, হিন্দু যুগপৎ সাধন-ধর্ম্মের শুদ্ধতা ও আচার-বিচার এবং সংসার-ধর্ম্মের ভোগবিলাস, নীতির শাসন এবং আর্টের স্বাধীনতা উভয়ই রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। আর্টের সহজ, স্বাভাবিক রস-স্ফূর্ত্তি বা রসবিকাশে আমাদের খৃষ্টীয়-নীতিবাদ-সমাচ্ছন্ন কৃত্রিম ধর্ম্মবুদ্ধি পদে পদে শিহরিয়া উঠে। কিন্তু আমাদের পিতৃপিতামহেরা সংস্কৃত বা বাঙ্গলা কাব্যের রসোদ্গার পাঠে কখনও ভ্রূকুঞ্চিত করিতেন না। এসকলে তাঁহাদের ধর্ম্মে বা নীতিতে আঘাত করিত না। আর যতদিন না আমরা এই য়ুরোপের আমদানী খৃষ্টীয়ান্ নীতিবাদের বাহিরের সভ্যতা-ভব্যতার প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতেছি, ততদিন আমাদের ধর্ম্ম বা নীতি, স্বভাব বা রস-সৃষ্টি, কিছুই সত্যোপেত ও সজীব হইবে না।

[১৩৩২ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার "নারায়ণ" মাসিকপত্রে এক আলোচনা-সূত্রে বিপিনচন্দ্র পালের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম অংশ "যুগযাত্রী"র গত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল ; এই সংখ্যায় শেষ হইল।

জনজীবনে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব—নজরুল　　—মনোজ বসু

নজরুলই বোধ হয় কবিতায় ও গানে বাংলা সাহিত্যে সুস্পষ্টভাবে পৃথিবীর নিষ্পিষ্ট মানুষের নবজাগরণের নতুন প্রেরণা নিয়ে এলেন। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ, নরনারীর সমানাধিকার তাঁর কবিতায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

সমকালীন বাংলা সাহিত্যেও এই ধারা অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত আছে। সাহিত্যের নানা শাখায় বহু শক্তিধর লেখকের আবির্ভাব হয়েছে।...বাংলা দেশ আজ খণ্ডিত, নানা সমস্যায় জর্জ্জর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। অগণিত লোক এসে পড়ে সীমান্ত রাজ্যটি আরও বিষমসঙ্কুল হয়ে উঠেছে। তবু কিন্তু বঙ্গের উভয় খণ্ডেরই জনজীবনে বাংলা অতুল প্রভাব। বাঙালীর কাছে অন্নের মতোই বাংলা সাহিত্যের আবশ্যক। বঙ্গভাষীরা ভারতের মধ্যে ইদানীং সংখ্যায় কম হয়ে পড়েছেন, বাংলা বইয়ের বিক্রি কিন্তু ভারতের কোন ভাষার চেয়ে কম নয়। শুধুমাত্র লেখনী উপজীবিকা অনেক সাহিত্যিকের ; পাঠকেরাই তাঁদের পোষণ করেন। বাংলার দুই-তৃতীয়াংশ ভিন্ন রাষ্ট্র পাকিস্তানে। রাজনৈতিক খড়্গ মাটি আলাদা করে দিয়েছে, কিন্তু মানুষকে পারে নি। উভয় বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির বন্ধনে আজও অভিন্ন। পূর্ব-পাকিস্তানের বড় পুণ্যদিন একুশে ফেব্রুয়ারী। বাংলা ভাষার জন্য একদল ঐ দিনে রক্ত দিলেন ; রক্তের অক্ষরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁদের ভালবাসা লিখে গেলেন। দেশে দেশে মুক্তির জন্য বহু জনে আত্মদান করেছেন। কিন্তু "বাংলা চাই" বলতে বলতে মাতৃভাষার জন্য প্রাণ প্রথম এই পূর্ব-বাংলায় দেখা গেল সমস্ত বাঙালীর তাঁরা প্রণম্য। তাঁদের আত্মদান সার্থক হয়েছে, বাংলা আজ পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা।　　—নয়াদিল্লীতে এশীয় লেখক সম্মেলনে লেখক কর্তৃক পঠিত।

লেখকের ডায়েরী থেকে

বিমল কর

Listen !
I will make a small statue
of a boy to-day.
that will half look at you
and half away.

(Humbert Wolfe)

ধরে নেওয়া যাক এ-মূর্তি শুধু পাথরের মূর্তি নয়, আর 'বয়' বাস্তবিক বালক নয়, মানুষ। আপাতত তা ধরে নিলে কবিতাটির যা ব্যাখ্যা দাঁড়াবে তা'তে দেখব, শিল্প-কর্মের মধ্যে দুটি ভাগ আছে। একটি ভাগ তোমার, কেননা "লুক্ অ্যাট্ ইউ": অন্য ভাগটি তোমার জন্যে নয়। তবে কার জন্যে, কিসের জন্যে? যে-অর্ধেক তোমার জন্যে তার ব্যাখ্যা আগে পরিস্ফুট হওয়া দরকার।

তুমি চিরকালের নও, ক্ষণকালের। অস্তিত্ব যদি আমার না থাকত তবে ক্ষণকাল কথাটা থাকত না। সবই চিরকালের হত। আমরা কথায় কথায় অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত টানতুম না। আমার অস্তিত্ব সময়ের একটি পরিধির মধ্যেই শেষ হয় বলে আমার অতীত এবং বর্তমান আছে, ভবিষ্যতও। যখন বলি একটি ভাগ তোমার জন্যে তখন বুঝতে হবে যে-তুমি এখন রয়েছ তার জন্যে। বর্তমান কালের জন্যে। শিল্পকর্মের যে-অর্ধেক তোমার তার মধ্যে এই বর্তমান রয়েছে। অর্থাৎ এই কাল আছে এ কালের মানুষ আছে, তুমি আছ। একান্ত ভাবেই তোমার রূপের ছবি আছে—সুখে দুঃখে কষ্টে অভাবে আনন্দে অভিযোগে এবং ব্যর্থতায় যে-তুমি অতীত থেকে কিছুটা পৃথক, কোথাও না কোথাও বিশিষ্ট। আমি যদি সৎ শিল্পী হই—আমার কর্তব্য নিশ্চয়ই এমন হবে না, আমি চোখ বন্ধ করে থাকব, কানে কিছুই শুনবো না এবং আমার মনটিকে এ রকম এক ভোল্টে সঞ্চিত রেখে আসব যেখানে বর্তমানের কোনো কোলাহল পৌঁছতে না পারে। এ ব্যাপারটা এমনই সত্য যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও বর্তমান থেকে আমি বিচ্ছিন্ন, বিমুক্ত হতে পারি না। সে-সাধ্য আমার নেই। যদি বলি আমি বিচ্ছিন্ন, আমি বর্তমানের নই তবে এ কথা প্রমাণের দরকার করে না যে হয় আমি মিথ্যুক, নয় মূর্খ অথবা মৃত।

কথাটা তা হলে এই দাঁড়ায়—এ-যুগে সাহিত্য করতে বসে বর্তমানকে আমি বাদ দিতে পারি না। সে সাধ্য আমার নেই। যেমন নেই যে-ঘরে আমি বাস করি তার ভিত, ছাদ, দেওয়ালের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার সাধ্য। বাসগৃহের যেমন ছাদ দেওয়াল মেঝে, শিল্পীর শিল্পগৃহ তেমনি এই জগৎ, তার দেশ, মানুষ, সমাজ। আমরা যারা বাংলা সাহিত্যের চক্করে ঘোরা ফেরা করার চেষ্টা করছি— তারা আলাদা নয়। আমরা কি কিছু কম দেখছি, না কিছুর অভাব আছে? যদিও যুদ্ধ ঘরের মধ্যে বাধে নি তবু আমাদের ঘরে গোলা বারুদের ধোঁয়া ভাল করেই ঢুকছে, তারপর দুর্ভিক্ষ, মহামারী, চোরা-কারবার, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দেশ ভাগ, স্বাধীনতা, গান্ধীজীর মৃত্যু, উদ্বাস্তুর হয়রানি, এক পয়সার লড়াই, এমন কি জাল ওষুধের জাল ফেলা কারবার— এ-সব কি কিছু কম! এটা সম্ভব, সাহিত্যিক হিসেবে এর সব কিছু উপাদান হিসেবে আমি

নিতে না পারি। কিন্তু কিছুই নেব না তা সম্ভব নয়। লিখতে বসলে ভাবতে বসলে এ-সব কথা আসবেই। এরা শুধু শিল্পের প্রাথমিক উপাদান (Raw material) নয়, এই উপাদানের মিশ্রণে আমার শিল্পগৃহ নির্মিত। নয় কি? কাজেই আজকের যা শিল্পকর্ম তা তোমাকে, তোমাদের বাদ দিয়ে কি করে গড়ে উঠতে পারে? ...পারে না। কাজেই এই শিল্পকর্ম...'will half look at you'.

বাকি 'হাফ' বা অন্য অর্ধাংশ কি? আগে বলেছি, যে অর্ধাংশ তোমার জন্যে নয়। অর্থাৎ বর্তমানের জন্য নয়। সে-অর্ধাংশ তবে কার জন্যে? খুব সম্ভব অন্নদাশঙ্কর যাকে বলছেন 'অন্তিম পাঠক' তার জন্য। আমার ধারণা 'অন্তিম পাঠকে'র সরল ব্যাখ্যাটা এই হবে যে—শাশ্বত পাঠক। যেমন রামায়ণ মহাভারতের পাঠক অতীতে ছিল, বর্তমানে আমরা এবং আমাদের পর ভবিষ্যতের পাঠকরা। তবু মতান্তর যদি অন্যতর কিছু মনে করে থাকেন সে অন্তিম পাঠকে আমার বিশ্বাস নেই, আস্থাও নয়।

সাহিত্যকে শুধু বর্তমানের হতে হবে না— চিরকালের হতে হবে। অন্নদাশঙ্কর যখন বলেন, "সাহিত্য তো কেবল জীবনের প্রতিকৃতি নয়, জীবনের সমালোচনাও বটে। মহাভারত যিনি রচনা করেছেন তিনি তখনকার দিনের জীবন দেখিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিত দিয়েছেন জীবন কেমন করে ভাল হত," —তখন আমি মনে করি সৎ শিল্পকর্মের 'half look at you, half away'— এই দুই অংশের কথাই অন্যভাবে বলেছেন। কেন—তাই বলি। জীবনের রূপটা জ্যামিতির উপপাদ্য নয়, অংকের গৃহীত সত্য নয় যে এই সব উপপাদ্য এবং আংকিক সূত্র সর্বকালীন সত্য হবে। আজ যা আছে বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ বছর একশো বছর পরেও যে থাকবে কে বলল? যখন থাকবে না তখন কি হবে! কে পড়বে আমার বই যদি শুধু বর্তমানের কথাতেই আমি নিঃশেষিত হয়ে যাই! তাদের কাছে আমার এই মুহূর্তের উত্তেজনার কিংবা কথকতার কি মূল্য আছে? ছোট খাটো উদাহরণ না নিয়ে বড় উদাহরণই নেওয়া যাক। রামায়ণ মহাভারতের যুগে যে-জীবন সে-জীবন এখন সত্য নয়। অর্থাৎ তার অনেক কিছুই সত্য নয়। সে-সব আর ঘটে না। সে-যুগের আচারব্যবহার সমাজজ্ঞান, রাজনীতি বোধের সঙ্গে আমাদের যুগের আচার আচরণ, সমাজজ্ঞান, রাজনীতি বোধের অনেক কিছুই মেলে না। স্বামী অন্ধ বলে স্ত্রী অন্ধবৎ হয়ে থাকবে, বিচক্ষণ মাতৃআজ্ঞার জন্যে পঞ্চভ্রাতা এক স্ত্রী গ্রহণ করবে,—এ সব প্রতীকী ঘটনার অন্তরালে যে ব্যাখ্যাই থাক— আমাদের কাছে তা অচল। সীতার অগ্নিপরীক্ষা আমাদের কাছে ফোর্থ আর ছি ছি। কাব্যের জন্যে তখন এ-সব করতে হয়েছে এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। জীবনে যে না ছিল তার প্রমাণ কোথায়? বরং জীবনে ছিল তাই কাব্যে স্থান পেয়েছে। প্রাচীন জীবন, প্রাচীন কাব্যের তাতে মহত্ত্ব কি হ্রাস পাবে? না, কদাপি নয়। তাই বলছিলাম রামায়ণ মহাভারতের জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের কতো তো অমিল তবু কি রামায়ণ মহাভারত আমাদের কাছে মূল্যহীন হল? হল না। হল না তার কারণ প্রতিকৃতি শুধু নয়, জীবনও তাতে আঁকা আছে—জীবনও কেমন করে ভাল হত তার ইঙ্গিত আছে। সত্যপরায়ণ রামচন্দ্রই সেখানে বিরাজ করছেন না—অসহায় রাজা, কানপাতলা সাধারণ মানুষ, অবিবেচক, সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষও স্বমহিমে সেখানে আছে। রামচন্দ্র যদি সীতার অগ্নিপরীক্ষা না নিতেন, যদি দুর্মনের জন্যে স্ত্রীকে করতেন তবে কি সরযূর জলে একটি অনুশোচনাক্ষত, ব্যর্থ স্বামীর হাহাকার করে কাঁপিয়ে পড়ত। রামচন্দ্রের এই অসহায়ত্ব বোধ মহৎ-শিল্পের সামগ্রী, কারণ তা জীবন। মানুষের জীবন। অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রকে মানুষ যদি ভুলে যায় তাতে দুঃখ নেই কিন্তু সত্যাশ্রয়ীকে ভোলা কঠিন, অমন মানুষও তুচ্ছ সংস্কারের একটা অন্ধতা থেকে মাথা থেকে নামাতে পারেন নি, জনমতকে উপেক্ষা করায় সাধ্য হয় নি। একবার নয়— দু-দুবার সীতার পরীক্ষা হয়েছে। জনমতের কাছে ব্যক্তি—বিশেষ করে কর্তা ব্যক্তিরা যে কত অসহায় এ তার দৃষ্টান্ত। এর মূল্য আজও আছে। হয়ত ভবিষ্যতেও থাকবে। অথচ রামচন্দ্র কি তাঁর জীবনকে সুখে শান্তিতে সুস্থির করতে পারতেন না? পারতেন যদি প্রকৃত অবিবেচক না

হত, তিনি নিজে সংস্কার বর্জন করতে পারতেন, জনমত উপেক্ষা করার সাহস থাকত। তিনি তা পারেন নি। অযোধ্যার প্রজারাও তখন দেবদুর্লভ মানুষটাকে বারে বারে কাঁদিয়েছে তারাও তো বিবেচক হতে পারত। হতে পারত কিন্তু হয় নি। জীবনকে কি করে সুন্দর করা যেত, লোক কেন মনঃপীড়ন থেকে মানুষ মুক্তি পেতে পারত তার ইঙ্গিত রামায়ণে ছড়ানো আছে। কারুর ভুল, কারুর অধর্ম, কারুর অবিবেচনা মূর্খতা— এই সব ত্রুটি না থাকলেই জীবন সুন্দর হত। কিন্তু তা হয় নি। আজও যে রামায়ণের আকর্ষণ আমাদের মন থেকে নিঃশেষ হয়ে যায় নি তার কারণ যে ত্রুটির জন্যে তখনও আমরা অমৃত স্পর্শ করতে পারলাম না, আজও সেই সব ত্রুটি আছে। হাঁ শুধু ত্রুটিই নয়, সে-সব মহত্বও রয়েছে যা মনুষ্যত্বকে মহিমান্বিত করেছে সেকালে, একালেও করছে। সাহিত্যে বোধ হয় একেই 'পার্মানেন্ট ভ্যালুস' বলে। আগে যে বাকি অর্ধেকের কথা আছে, কবি যাকে বলেছেন half away এ হচ্ছে তাই। আজকের মানুষ এবং সমাজ ছাড়াও অনাগত দিনের সমাজ এবং মানুষ আছে। তারাও আমার পাঠক হবে যদি জীবনে কেমন করে সুন্দর হওয়া যেত তার কথা লিখতে পারি। আমার বিশ্বাস, জীবন জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, সভ্যতা যত এগুচ্ছে তার চলার পথে তত কাঁটা বাধার মতন বিছানো দেখছে—এবং কি করে জীবন সুন্দর হওয়া যায় তার সমস্যা বাড়ছে। বাড়ছে বলেই উপকরণ বাড়ছে, উপাদান বাড়ছে, প্রশ্ন জাগছে। আগে যেখানে শুধু ধর্মকে আশ্রয় করলেই শান্তি ছিল— এখন সেখানে ধর্ম নিয়ে শত প্রশ্ন। তখনকার যুধিষ্ঠির শুধু ধর্মকে আশ্রয় করলেই শান্তি পেতে পারতেন এখনকার যুধিষ্ঠিরকে ধর্মকে আশ্রয় করার আগে কোনটা ধর্ম আর অধর্ম—তাই নিয়েই নাকাল হতে হয়। কারণ এখনকার রঙ্গন রশ্মিতে তথাকথিত ধর্মের অন্তরের চেহারাটা কি ভাবে ধরা পড়বে— কে জানে? স্ত্রীকে পাশা খেলায় বাজি রাখবার আগে এবং পরে ও বনবাস কালে পদে পদে স্ত্রীর স্বাধিকার, তার মনুষ্যত্ব, স্বাতন্ত্র্য এবং নিজের অধিকার স্ত্রীর প্রতি কতোটা—তা নিয়েও ভাবতে হয়।

সোজা কথায় বলতে হয় আমাদের নীতিজ্ঞান বদলাচ্ছে বদলাচ্ছে; নতুন করে মূল্য নিরূপণ চলছে। টলেমির জ্যোতির্বিজ্ঞানের সত্য আজ যেমন বহুলাংশে অচল তেমনি আমাদের পূর্বপুরুষের ন্যায়নীতি সত্য মিথ্যা ধর্মাধর্ম জ্ঞানের অনেকখানি এখন আর খোপে টিকছে না।

জীবন ও সাহিত্য —মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাজ জীবনে কি আছে আর কি নেই, কি এসেছে আর কি আসছে এটা উপলব্ধি করে দীনতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত করে জীবনকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংগ্রামের প্রেরণা জাগবে—সাহিত্যের মাধ্যমে এ সংগ্রাম চালাতে হলে ওই সমাজ জীবনটির সাহিত্যে কি আছে আর কি নেই, কি এসেছে আর কি আসছে সেটাও উপলব্ধি করতেই হবে সাহিত্যিককে।

—নতুন সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত।

আমার চোখে দেখা সোভিয়েট দেশ

ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

(৩)

৮ই জুলাই সকালবেলা প্রাতঃরাশের জন্য টেবিলে বসেই খবর পেলুম যে আগের দিন বিকেলবেলা হেলিসিঙ্কি শান্তি সম্মেলনের অন্যান্য ভারতীয় ডেলিগেটগণ লেনিনগ্রাদ হতে মস্কোতে এসে পৌঁছেছেন এবং মস্কো হোটেলে উঠেছেন। সুতরাং পূর্বাহ্ণ ভোজনপর্ব শেষ করেই অধ্যাপক সাহা ও আমি দোভাষী লুকিনসহ তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য হোটেল মস্কোতে গেলুম। কিন্তু সকালবেলাই তাঁরা প্রায় সকলেই মস্কো শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিতে বেরিয়ে যাওয়াতে, অধ্যাপক সাহা আমাকে সেখানে রেখেই দাঁতের ডাক্তারকে দাঁত দেখাতে লুকিনসহ চলে গেলেন। শান্তি ডেলিগেশনের অন্যতম বর্ধমানের সন্তোষ খাঁ অসুস্থ অবস্থায় নিজের ঘরে শুয়ে আছেন জানতে পেরে, তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করে, তাঁর ওষুধপথ্যাদির ব্যবস্থা করে তাঁর সঙ্গেই বসে গল্প করতে লাগলুম। ঘণ্টা দুই পরে নিখিল ভারত শান্তি সংসদের সেক্রেটারি রমেশচন্দ্র ফিরে এলে তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলুম যে তাঁরা দুদিন সেখানে থাকার পর, আমারই আগেকার পরিকল্পিত প্ল্যান-অনুযায়ী সোভিয়েটের অন্তর্ভুক্ত এশিয়ান রাষ্ট্র উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান প্রভৃতি দেখতে যাবেন এবং সতেরো কি আঠারোই পর্যন্ত মস্কোতে ফিরে এসে ২০শে তারিখে, চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ্ অভিমুখে রওয়ানা হবেন, কেন না আমাদের হেলিসিঙ্কি হতে রওয়ানা হওয়ার পরই তাঁরা ঐ দেশের পক্ষ হতে সাদর নিমন্ত্রণ পেয়েছেন যে অন্ততঃ দশদিন যেন আমরা ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়ার আগে তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করে যাই। একজন অদ্ভুত দক্ষ, কর্মিতকর্মা এবং ভদ্র ব্যক্তি এই রমেশচন্দ্র। দলের সেক্রেটারি হিসেবে তিনি আর তাঁর—শুধু নামেই নয়, প্রতিটি কাজেও সহধর্মিণী নামের সর্বাংশে উপযুক্তা পেরিন, যেন গোটা ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র দিল্লী নগরী। পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ, বিন্ধ্য, হিমাচল-সমন্বিত যে দেশ, তার প্রত্যেকটি রাজ্যের প্রতিনিধিদের বেশ-ভূষা, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, হাব-ভাব, ও ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও প্রত্যেকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে তৎপর এবং সকল সময়েই রমেশচন্দ্রের মুখটি স্মিতহাস্যে উজ্জ্বল। অধ্যাপক সাহা সমগ্র ডেলিগেশনের নাম দিয়েছিলেন 'গজ্জলিকা', কিন্তু তা সত্ত্বেও রাখালরূপী রমেশ চন্দ্রের প্রতি তাঁর আস্থা ও স্নেহ ছিল অপরিসীম।

রমেশচন্দ্রের মুখে শান্তি ডেলিগেশনের ভ্রমণ-সূচী শুনে আমি দোটানায় পড়ে গেলুম, কারণ পরদিন আমাদের আগবিক সম্মেলনের প্রতিনিধিদের লেনিনগ্রাদ রওয়ানা হওয়ার কথা, আর সেখানে আছে আমার বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত তীর্থক্ষেত্র, প্যাভলভ্ গবেষণাগার! আবার এশিয়ান অঞ্চলরাজ্যগুলিও ছিল আমার পরিকল্পিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এখন ফেলি রাখি কি কুল রাখি? তা সত্ত্বেও স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছতে আমার কয়েক মিনিটের বেশী দেরী হয়নি! রমেশচন্দ্র যখন জিজ্ঞেস করেন 'কখন অধ্যাপক সাহা ও আমি তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবো' তখন আমি বলুম, অধ্যাপক সাহা বোধ হয় দু'একদিনের মধ্যেই দেশে রওয়ানা হয়ে পড়বেন, আর আমি তাঁরা যখন আবার মস্কোতে ফিরে আসবেন তখনই লেনিনগ্রাদ হতে প্রত্যাবর্তন ক'রে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবো। রমেশচন্দ্র তখন বললেন যে সে তো পরের কথা, কিন্তু সেদিনই দুপুরে, অর্থাৎ বেলা বারোটায় 'শান্তি' ডেলিগেশনের ডাক্তার প্রতিনিধিরা মস্কোর রেলওয়ে হাসপাতাল দেখতে যাবেন, তাদের দলপতি হিসেবে আমি

সেজন্য সকলে অনুরোধ জানিয়েছেন, সুতরাং সেদিনের মত উপরে ঐ হাসপাতালে এবং বিকেলবেলা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দপ্তরে দলপতিরূপে আমি গেলে তিনি খুশী হবেন। তখন বারোটার আর বেশী দেরী নেই, সুতরাং আমি সম্মত হয়ে অন্যান্য সহ-প্রতিনিধিদের জন্য অপেক্ষায় বসে রইলুম। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রাতঃকালীন পরিভ্রমণমত দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে ফিরে এলেন অন্যান্য ডাক্তার বন্ধুগণ, কলিকাতার নারায়ণ রায়, আকোলার শা, ন গপুরের চৌধুরী, সুরেন্দ্রনগরের মহিলা ডাক্তার মিসেস্ ভিগনে, বোম্বাইর দেশাই ও পৌবাল্লের আচারিয়া ভ্রাতৃদ্বয়। সুতরাং একরকম ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বারোটার সময় আমাদের ছোট দলটি এসে হাজির হল রেলওয়ে হাসপাতালের দ্বারদেশে।

হাসপাতালের ডিরেক্টার অধ্যাপক কাজানস্কি ও তাঁর সহকারী হাসপাতালের ফটকেই আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আমরা প্রকাণ্ড ফোয়ারা ও মর্মরমূর্তি শোভিত উদ্যানটি পার হয়ে গিয়ে হাসপাতালে প্রবেশ করলুম। প্রথমেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হল ডিরেক্টারের বসবার কক্ষসংলগ্ন একটি হলঘরে, দেখে মনে হ'ল সেখানে কোন ক্লাশ বা মিটিং হয় সম্ভবতঃ, এরি কোন স্থান। সেখানে বসে অপেক্ষা করছিলেন হাসপাতালের প্রায় ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশজন ডাক্তার ও প্রায় সমসংখ্যক সিষ্টার ও নার্স। আমরা যেতেই সকলে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন এবং প্রথম সারিতে উপবিষ্ট সকলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর ডিরেক্টার রুশ দেশীয় ভাষায় আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে দলপতি হিসেবে প্রথমে আমার হাতে এবং তৎপরে দলের একমাত্র মহিলা প্রতিনিধিরূপে মিসেস্ ভিগনের হাতে সম্বর্ধনার প্রতীক ফুলের তোড়া তুলে দিলেন, দলের এবং ভারতবর্ষের পক্ষ হতে আমি তাঁদের সাদর অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে ইংরেজীতে ছোট বক্তৃতা দিলাম। আমার দুঃখ হল যে বাংলা অনুবাদে সমর্থ কোন দোভাষী সঙ্গে না থাকাতে আমাকে বাধ্য হয়ে বিদেশী ভাষায় বক্তৃতা করতে হ'ল।

তারপর হাসপাতালের খেতশুভ্র লম্বা অ্যাপ্রোন আর বড় বড় রবারের জুতো পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল বিভিন্ন ওয়ার্ডে এবং সেখান হতে একদলে, রেডিয়ো চিকিৎসা, জৈবিক চিকিৎসা প্রভৃতি বিভাগে। কোন বিশেষ স্থানের কাদা মাটির সাহায্যে চিকিৎসার ব্যবস্থাও আমাদের দেখানো হ'ল। গবেষণারত কয়েকজন ক্যান্ডিডেটের সঙ্গেও আমরা পরিচিত হলুম। এভাবে প্রায় দু'ঘণ্টা হাসপাতালটির বিভিন্ন বিভাগ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে আমরা যখন হাসপাতাল হতে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি, তখন দেখি আমাদের একত্র ফটো নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। বাগানের গোলাকার ফোয়ারার নিম্নস্থ পাকা বেদীর উপর পর পর আমরা একজন ভারতীয় ডাক্তারের পর একজন করে সে দেশীয় ডাক্তার বসলুম। হঠাৎ দেখি আমার বাঁয়ের মহিলা ক্যান্ডিডেট ও ডান পাশের মহিলা ডাক্তারটি দুদিক হতে আমার দুটি হাতকে ছড়িয়ে নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন। সে অবস্থাতেই আমাদের ফটো নেওয়া হ'ল। আমাদের মধ্যে ডাক্তার আচারিয়ার ছোট ভাইটিও উঠে এসে ঐ অবস্থাতেই আমাদের সকলের একটি স্ন্যাপ্ তুলে নিলেন। তারপর অতি দ্রুততার সঙ্গে করমর্দন করে "দাস্ বিদানিয়া" বলে আমরা বিদায় গ্রহণ করলুম। ৩টি ঘণ্টা মাত্র সেদিন সে হাসপাতালে ছিলুম, কিন্তু সেখানকার দ্রুততা ও আতিথেয়তা এখনো স্মৃতিপটে জাগরূক আছে।

হোটেলে ফিরে এসে মধ্যাহ্ন ভোজের পর আমরা আবার একসঙ্গে অপরাহ্ণ প্রায় সাড়ে চারটায় গেলুম স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর দপ্তরে। স্বাস্থ্য-মন্ত্রী সেদিন মস্কো শহরের বাইরে থাকায় সহ-স্বাস্থ্যমন্ত্রী (একজন মহিলা) আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ভিতরে নিয়ে গিয়ে একখানি লম্বা চৌকো টেবিলের চারদিকে বসিয়ে একটি ছোট খাটো বক্তৃতায় সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, আমাদের এবং আমাদের দ্বারা আমাদের দেশের জন-সাধারণকে। তারপর আরম্ভ হ'ল প্রশ্নোত্তরের পালা। দলপতি হিসেবে আমি অনুরোধ জানালুম, সোভিয়েট দেশের স্বাস্থ্য বিভাগ ও তার অধীন হাসপাতালগুলির ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলতে।

অনুরোধ করলে তিনি নিম্নলিখিত বিবরণটি দেন।

"জার সাম্রাজ্যের পতন ও কশ্‌ার অধঃপ্রপাতের পরবর্তী কালে, অর্থাৎ গত কুড়ি বছরের মধ্যে সমস্ত সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আশিটিরও বেশী মেডিক্যাল কলেজ ও ইস্কুল স্থাপিত হয়েছে, সোভিয়েট সরকারের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে। বর্তমানে সমস্ত দেশে প্রায় তিন লক্ষ ডাক্তার এবং নয় লক্ষ নার্স আছেন, অর্থাৎ গড়ে প্রতি সাত'শ লোকের জন্য আছেন একজন ডাক্তার এবং গড়ে ২৩৩ জনের জন্য একজন আছেন একজন করে শুশ্রূষাকারিণী। সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে (১) নাগরিক ও (২) গ্রাম্য এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।"

প্রতি শহরের বনেদী হাসপাতালে ২০০-৩০০টি রোগীর স্থান আছে ; অর্থাৎ প্রতি হাজার লোকের জন্য গড়ে ১১টি করে শয্যা আছে। এসকল হাসপাতালে বয়স্ক লোক ও শিশুদের জন্য চিকিৎসার সকল বিভাগই আছে। শহরের নিকটবর্তী কিংবা শহরতলী অঞ্চলে লোকসংখ্যার অনুপাতে আরো পাঁচছটি ছোট হাসপাতাল থাকে, তাদের বলা হয় 'পলিক্লিনিক'। দেশের যে কোন লোক ঐ সকল হাসপাতালে গিয়ে বিনামূল্যে ওষুধ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে প্রয়োজন মত। যদি রোগীর হাসপাতালে নিজে গিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার মত অবস্থা না হয়, তাহলে খবর দিলে হাসপাতালের ডাক্তার তার বাড়ীতে গিয়েই তাকে দেখে, হয় তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন কিংবা তার নিজের বাড়ীতে থেকেই যাতে সে ওষুধ ও উপযুক্ত সেবাযত্ন পায়, তারও বন্দোবস্ত করে দেন। তাছাড়া প্রতিটি শহরে সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসা ও প্রতিষেধের জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসাকেন্দ্র আছে। একই ভাবে ফ্যাক্টরী-গুলিতেও ঐ একই উদ্দেশ্যে অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। আগে দক্ষিণ অঞ্চলে কোথাও কোথাও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত সুষ্ঠু প্রতিষেধক ব্যবস্থার ফলে এখন আর দেশে ম্যালেরিয়া নেই বল্লেও চলে।

চৌদ্দবছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা শিশু-চিকিৎসার হাসপাতাল আছে। সকল সদ্যোজাত শিশুকেই যক্ষ্মার প্রতিরোধকল্পে বি, সি, জি, টিকা দেওয়া হয় এবং চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক ছ'বছর পর পর বার বার তাদের ঐ টিকা দেওয়া এবং স্কুলোগ্রাম সাহায্যে প্রতিটি শিশুকে প্রতি ছ'মাস অন্তর পরীক্ষার ব্যবস্থার ফলে বর্তমানে শিশুদের যক্ষ্মারোগে মৃত্যু খুবই কম হয় এবং বি, সি, জি, টিকার জন্য মেনিনজাইটিস্ প্রভৃতি কোন কুফলই দেখা যায় না। প্রতি ফ্যাক্টরীতে একটি করে শিশুদের জন্য দেখা শোনার ব্যবস্থাও (Creche) আছে, সেখানে তাদের খাওয়ানো-দাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো ও খেলাধুলো এমন কি কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে। ফ্যাক্টরীতে কার্যরতা জননীগণ তিন বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুকে কাজের সময়ে ঐখানে নিশ্চিন্ত হয়ে রেখে যায় এবং কার্যশেষে গৃহে ফিরে যাওয়ার কালে সঙ্গে নিয়ে যায়। একই ভাবে প্রত্যেক শহরে ও উপকণ্ঠে স্ত্রীরোগের চিকিৎসা ও সন্তান প্রসবের জন্য ৮০-১০০ শয্যা-সমন্বিত অনেকগুলি ছোট ছোট বিশিষ্ট কেন্দ্রও আছে। তা ছাড়া শিশু-মাতৃহীন শিশুদের জন্যও বিশেষ অনাথ-ভবন আছে।

নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য অসংখ্য স্বাস্থ্যনিবাস ও স্যানোটোরিয়া থাকাতে, প্রতি বছর প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোক ঐ সকল স্থানে গিয়ে সরকারী খরচে রুগ্ন ও অক্ষম দেহকে পুনরায় সুস্থ ও কার্যক্ষম করে আবার নিজ নিজ কর্মস্থানে ফিরে আসে।

প্রতিটি গ্রামেও একটি করে বিশেষ চিকিৎসাকেন্দ্র আছে। মেডিক্যাল স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন সহকারী ডাক্তার ও উপযুক্ত সংখ্যক নার্সের সাহায্যে ঐগুলি পরিচালিত হয়। ঐগুলিতে গর্ভবতী ও আসন্ন-প্রসবা প্রসূতিদের উপদেশ দেওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থাও থাকে। প্রতি দশটি গ্রামের জন্য ১৫-২০ শয্যাযুক্ত একটি করে হাসপাতাল থাকে এবং তারা দেড়হাজার হতে সাতহাজার লোকের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দায়ী। আবার প্রতি জেলায় আঠার হতে কুড়ি হাজার লোকের জন্য ৫০-৬০টি শয্যা সমন্বিত একটি বিশিষ্ট সদর হাসপাতাল থাকে। এখানকার তত্ত্বাবধানেই সে জেলার গ্রাম্য হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রগুলি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ সকল চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসার সকল বিভাগে পারদর্শী

বিশেষজ্ঞরা আছেন এবং এক্স-রে, ল্যাবরেটরি, প্রভৃতি রোগনির্ণয়ের সমস্ত ব্যবস্থা এবং আলো, জল, কাদামাটি প্রভৃতির সাহায্যে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে চিকিৎসার ব্যবস্থাও থাকে। ঐ সঙ্গে সংক্রামক ব্যাধি নিবারণ ও তাদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থাও আছে।

প্রতি শহরের এবং জেলার সদর হাসপাতালে বছরে দুবার করে ডাক্তারদের জন্য পুর্ণজ্ঞান লাভের কোর্স (refresher's course)। তাতে ২০-৩০ জন ডাক্তার পালা করে পাঁচ হতে ছ'মাসের জন্য, কয়েক বছর পরে পরে বিশেষজ্ঞদের অধীনে কাজ করে নতুন নতুন জ্ঞান লাভ করে। ঐ সময়ে তারা নিজের মাহিনা ত পায়ই, তারও উপরে ভাতা বাবদ আরো কিছু পায়।

দশ হতে সতের বছর বয়স পর্যন্ত ইস্কুলে শিক্ষা লাভ শেষ করে ছাত্রেরা মেডিক্যাল কলেজ বা ইস্কুলে ভর্তি হয়। কলেজে ছ' বছর পড়ে গ্র্যাজুয়েট হয় এবং তিন বছরমাত্র পড়ে ডিপ্লোমা পায়—মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা 'ফেল্ডশার' রূপে; এর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সম্পর্ক নেই। গ্র্যাজুয়েটরা ক্যান্ডিডেট রূপে তিন বছর কোন হাসপাতালে গবেষণার পর 'থিসিস্' দিয়ে ডক্টরেট পায়। সমস্ত পাশকরা ডিগ্রীধারী ডাক্তারেরা দিনে ৫—৬ ঘণ্টা হাসপাতালে কাজের জন্য ৫০০—৭০০ রুব্‌ল* মাসে বেতন পায়; ফেল্ডশাররা পায় প্রতি মাসে ৮২৬—১০০ রুব্‌ল পর্যন্ত। নার্সদের বেতন প্রতিমাসে ৩২৫—৪০০ রুব্‌ল। পাঁচ বছর কাজ করার পর গ্র্যাজুয়েট ডাক্তারেরা বেতন পায় ৮৩০ এবং দশ বছর পরে ৯০০ রুব্‌ল পর্যন্ত। যাঁরা যক্ষ্মা হাসপাতাল কিংবা প্রসূতি হাসপাতালে কাজ করে, তারা শতকরা ১৫ রুব্‌ল হিসেবে বেশী মাহিনা পায়। রাত্রিতে এবং রবিবারে অতিরিক্ত ডিউটি হিসেবে ডবল বেতনের ব্যবস্থা আছে। কোন উচ্চতর পদে অস্থায়ী ভাবে কাজ করার জন্য মাসে অতিরিক্ত ১০০—৩০০ রুব্‌ল পর্যন্ত পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সকলে বছরে চব্বিশ দিন ক'রে এবং সার্জন ও যক্ষ্মা হাসপাতালের ডাক্তারগণ একমাস করে পুরো বেতনে ছুটি পায় এবং অসুস্থতার জন্য ছুটি নিলে 'সোসিয়েল ইন্‌সিওরেন্স ফান্ড' হ'তে ছুটিকালীন মাহিনা পাওয়া যায়।

যে সকল ডাক্তারেরা উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য গবেষণায় নিযুক্ত, তাদের ক্যান্ডিডেট বলা হয়। ঐ সময়ে তারা মাসে বেতন পায় দু-হাজার চার শ' রুব্‌ল করে। এম্‌. ডি. ডিগ্রী লাভের পর তাদের মাহিনার গ্রেড হয় মাসিক ৩৫০০—৬০০০ রুব্‌ল পর্যন্ত, এবং এদের মধ্যে যাঁরা অধ্যাপকের পদ পান তাদের মাসিক বেতন হয় ৬০০০—৭০০০ রুব্‌ল পর্যন্ত। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যাঁরা হাসপাতালে কাজের সঙ্গে সঙ্গে প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস করে, তাদের মাহিনা একমাত্র হাসপাতালে কর্মরত অঙ্গদের চেয়ে কম হয়।

প্রতি পাঁচবছর যোগ্যতার সঙ্গে কাজের জন্য সরকার হতে "মেডেল" ও বিশেষ সম্মান সূচক চিহ্ন দেওয়া হয় এবং সাধারণতঃ দশ ভাগ বেতন বৃদ্ধি পায়। পুরুষ ডাক্তারেরা পঞ্চান্ন বছর বয়সে এবং মেয়ে ডাক্তারেরা পঞ্চাশ বছরে কিংবা যে কেউ পঁচিশ বছর ক্রমাগত কাজ করার পর মাসিক বেতনের অর্ধেক পেন্সনে অবসর গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু অনেকেই ঐ বয়সে সম্পূর্ণ কার্যক্ষম থাকেন বলে মাসিক দেড় গুণ বেতনে (অর্থাৎ স্বীয় মাসিক মাহিনা সহ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পেন্সন) আরো অনেক বছর কাজ করে যান। হাসপাতালগুলিতে সাধারণতঃ দিনে ছ'ঘণ্টা, অর্থাৎ সকালে ন'টা হতে বিকেল তিনটা পর্যন্ত কাজ হয়। ঐ সময়ের আগে বা পরে যাঁরা ডিউটি করেন তাঁরা তার জন্য অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পান।

মেডিক্যাল কলেজের প্রতিটি ছাত্র সরকার হতে প্রতি মাসে ৩০০ রুব্‌ল করে বৃত্তি পায়। মেধাবী গরীব ছাত্রদের কলেজে কোন বেতন দিতে হয় না, কিন্তু যারা তা দিতে সক্ষম তাদের বছরে দুই কিস্তিতে চার শ' রুব্‌ল তার জন্য দিতে হয়।

আমাদের অতিরিক্ত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্য উপমন্ত্রী বলেন, "অনেকগুলি প্রসূতি হাসপাতালেই বর্তমানে প্যাভলভ পদ্ধতিতে বেদনারহিত প্রসবের ব্যবস্থা হয়েছে—এ নিয়ে আরো নতুন নতুন গবেষণা চলছে।

* এক রুব্‌ল = প্রায় এক টাকা দু'আনা।

প্রভৃতি হাসপাতালে বর্তমানে রোগের সংখ্যা শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ কমে গেছে. কারণ অনেকেই নিজ নিজ গৃহে উপযুক্ত ডাক্তার ও নার্সের সাহায্যে প্রসবের ব্যবস্থা করেন : অবশ্য তার জন্য তাদের কোন খরচ লাগে না।" অন্য প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সংখ্যা নগণ্য।" যৌনব্যাধি সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "সুষ্ঠু প্রতিষেধক ব্যবস্থার ফলে যৌনব্যাধির প্রকোপ খুবই হ্রাস পেয়েছে। শুধু স্বাস্থ্যের জন্যই নয়, অন্য কারণেও লোকে যাতে যৌনব্যাধির সংক্রমণ না ঘটে তার জন্য খুবই সতর্ক থাকে, কারণ একবার তা ধরা পড়লে তাকে বাধ্য হয়ে সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত হাসপাতালে গিয়ে থাকতে হয় এবং আরোগ্য লাভের পরই একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বছরে অনেকবারই তাকে যথাস্থানে গিয়ে বাধ্যতামূলক পরীক্ষাধীন থেকে রোগের পুনরাবর্তন হয়নি, এরূপ ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে তবে স্বাভাবিক কাজে ফিরে যাওয়ার অনুমতি পায়। এ সকল ঝামেলার ভয়েও অনেকে বিবাহেতর ও সমাজ বিগর্হিত যৌন-মিলনকে ভীতির চোখে দেখে। তা ছাড়া জনসাধারণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়াতে যৌনব্যাধি, যক্ষ্মা প্রভৃতিকে নিজের অজ্ঞাতসারে খুব কম লোকেই বাইরে ছড়াতে পারে।"

পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "সোভিয়েটে সরকার কিন্তু এর উপর বিশেষ জোর দেন না, কারণ বুদ্ধিমান লোকেরা নিজেরাই এ সম্বন্ধে কতকটা সজাগ এবং যারা নয় বৃহৎ পরিবারের পোষণ তাদের নিজেদের করতে হয় না, কারণ সে দায়িত্বের অনেকটা সরকারই বহন করেন, এ বিষয়ে তারা নিশ্চিন্ত। তাছাড়া দেশের সর্বত্র যেভাবে শিল্পের প্রসার হচ্ছে তার জন্য আমাদের আরো লোকের দরকার। সুতরাং এত বিরাট দেশে যখন এখনো যথেষ্ট স্থান খালি পড়ে আছে, আর সোভিয়েট দেশে বিজ্ঞান সম্মত চাষ-আবাদের ব্যবস্থার ফলে খাদ্যের অনটনের কোন প্রশ্নই নেই, তখন পরিবার-নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন আমাদের কাছে অবান্তর।"

প্রায় ছ'টার সময় আমাদের বৈঠক শেষ হলে প্রতিনিধিদের তরফ হতে স্বাস্থ্য-বিভাগের উপমন্ত্রীকে তাঁর সৌজন্য ও স্বাগত সম্ভাষণের জন্য আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করলুম। তিনি ও অন্যান্য কর্মচারীরা আমাদের অফিসের দোর পর্যন্ত এগিয়ে গাড়ীতে উঠিয়ে দিলে, আমরা "পাসিবো, দাসে বিদানিয়া" অর্থাৎ "ধন্যবাদ, বিদায়" ব'লে বিদায় নিলুম।

সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের বলশোয় থিয়েটারে ভিক্টোর হিউগোর "নতর্দামের কুব্জ", ব্যালে নৃত্য দেখতে যাওয়ার কথা ছিল। তাই হোটেলে ফিরে এসেই, শান্তি-ডেলিগেশনের নেতা বোম্বাইর অধ্যাপক কোশাম্বি ও দোভাষিণী নাজেস্‌দা মাস্কিমোভা তুরচিনার সঙ্গে গেলুম সেখানে। বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাসের ব্যালে-রূপ অতি চমৎকার লাগলো। দুটী অঙ্কের অন্তর্বর্তী সময়ে থিয়েটার হল হতে বেরিয়ে এসে আমরা খানিকক্ষণ সম্মুখস্থিত পার্কে ফোয়ারাগুলির কাছে বেড়ালুম। পরবর্তী অঙ্ক আরম্ভ হওয়াতে ভীড় ঠেলে তাড়াতাড়ি নিজের আসনে বসে পকেট হতে রুমাল বের করতে গিয়ে দেখি, আমার গোল্ড ক্যাপ পার্কার ৫১, কলমটি যথাস্থানে নেই, অথচ সেদিন সারাদিন তাই দিয়ে লিখেছি। এ পকেট, ও পকেট কত খোঁজাখুঁজি করলুম--কিন্তু এত সখের কলমটি আর পাওয়া গেল না! অথচ কয়েক মিনিট আগেও তা পকেটে ছিল জানি। এক মুহূর্তও ভাবতে পারিনি যে মাস্কোতে এভাবে কলমটি হারাবো। আমাদের দেশ হ'লে পকেটে হাত চেপে রাখতুম ভীড়ের মধ্যে কিন্তু মস্কোতে সে রকম আশঙ্কার কোন কারণ আছে বলেই মনে করিনি। যাক্, নাজেস্‌দা (মানে 'আশা') দুঃখ প্রকাশ করে বল্লে, "কী লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়! কিন্তু তুমি ভেবো না, কলম তুমি পেয়ে যাবে।" কথাটা নেহাৎ স্তোকবাক্য বলেই ধরে নিয়ে আবার ব্যালে নৃত্য দেখতে দেখতে কলমের কথা বেমালুম ভুলে গেলুম। রাত্রিতে প্রায় এগারোটার সময় নাজেস্‌দা, অধ্যাপক কোশাম্বী ও বিখ্যাত ভারতীয় লেখক মুলক রাজ আনন্দ্‌ সহ সোভেটস্কায়া হোটেলে ফিরে এলুম।　　(ক্রমশঃ)

গল্প

অরণ্য-চারিণী

সমর চট্টোপাধ্যায়

খটাস্‌···খট্‌ খট্‌···

রোদ্দুরে ঝলসে উঠছে প্রায় শ'খানেক কুড়ুলের ধারালো ফলা। বেড়শ' সাঁওতালের পাথর-কুঁদে তৈরী কাল হাতগুলো একসঙ্গে উঠছে আর নামছে। ধীরে ধীরে ফরসা হয়ে যাচ্ছে এ ধারের জঙ্গল। কুলি, "কামিনে" প্রায় শ' আড়াই জন খাটছে।

মাইলের পর মাইল ব্যাপী বিস্তৃত সীমাহীন শাল, পিয়াল আর অমলকীর ঘন-সন্নিবিষ্ট জঙ্গল আস্তে আস্তে সাফ্‌ হয়ে আসছে। মাথা তুলে বেরিয়ে পড়ছে ঘরের লাল এবড়ো খেবড়ো কাঁকরে চিপিগুলো।

খটাস্‌·· খটাস্‌···খট্‌···

একটানা কর্কশ প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে মধ্যাহ্নের নীরবতায়। বেড়শ' ইস্পাতের দাঁত থেকে পিছলে পড়ছে সূর্যের আলো। ঘামে ভেজা বলিষ্ঠ শরীরগুলো ঝিক্‌ঝিক্‌ করে উঠছে তপ্ত আলোয়।

কত বড় তুচ্ছ করে এতদিন সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল বিশালাকার বনস্পতির দল। আজ সেখানে লেগেছে লোভের ঝড়। রূপার মোহে রূপকে ভুলে গেছে সভ্যতা। তাই তার নিষ্ঠুর দাঁত ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে শাল পিয়ালের অপূর্ব শ্যামলিমাকে।

শাখাবাহু বাড়িয়ে অবলম্বনের ব্যর্থ প্রয়াসে বার কয়েক করুণ মর্মর আর্তনাদ তুলে ধূলায় লুটিয়ে পড়ছে বনস্পতির উন্নত মাথাগুলো। অতীতের নিরবিচ্ছিন্ন ছায়া সরিয়ে দিয়ে হঠাৎ ঠিকরে পড়ছে তপ্ত রোদ্রের রুপালী ধারা।

গাছ পড়ার প্রচণ্ড নির্ঘোষে ভীত কয়েকটা বুনো পাখী আশ্রয়ের অন্তিম প্রতিবাদ জানিয়ে চকিতে ডানা মেলে দেয় নূতন আশ্রয়ের খোঁজে। সভ্যতার কাছে সরলতা আজ বিড়ম্বিত।

কুড়ুলটা একপাশে নামিয়ে রেখে ঘাম মোছে বিশাই। দৃষ্টিটা হটাৎ যেয়ে আটকে যায় একটু দূরের ছায়া আবৃত একটা স্থানে।

সুহাসী আর বাহাদুর।

ইনস্‌পেক্টর রায় সাহেবের নেপালি দারওয়ান বাহাদুর। বাহাদুর কেবল দারওয়ানই নয়, মধ্যাহ্নে যখন রায়সাহেব দিবা নিদ্রার আমেজ উপভোগ করেন তখন কাজকর্মের তদারক করে বেড়ায় বাহাদুরই। সরু একটা শালের ডাল থেকে পাতাগুলো চেঁছে নিয়ে ছড়ির মত ঘোরাতে ঘোরাতে প্রভু সুলভ ঔদ্ধত্যে কাজ দেখে বাহাদুর। হস্ত সঞ্চালনে পাতলা ডালটা সাপের ফণার মত হিস্‌হিস্‌ গর্জ্জন করতে থাকে। মাঝে মাঝে বেত হয়ে গায়ে দোবল মারলেও প্রতিবাদ করবে এমন মাথা ক'জনার আছে।

সেই বাহাদুর আর কামিন্‌ সুহাসী বসে আছে একেবারে ঘন হয়ে। বিশাইয়ের দুটো চোখ জ্বালা করতে থাকে অকারণেই। সুহাসী পাহাড়ী ঝর্ণার মত হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে চলে পড়ছে বাহাদুরের গায়ে। নেশাজ্বরের মত পিছনে এসে দাঁড়ায় বিশাই।

শুকনো শালপাতা ক্ষীণ প্রতিবাদ জানায় পায়ের নীচে। সেই পদশব্দে ঘুরে তাকায় সুহাসী "কে— ? বিশাই।"

হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গে বিশাইয়ের, আমতা আমতা করে বলে "একটুক জল দেত সুহাসী।" সামনে এগিয়ে আসে সুহাসীর জলভরা মগটার প্রত্যাশায়। সাপের মত গর্জ্জন তুলে বিশাইয়ের পিঠে কাঁপিয়ে পড়ে বাহাদুরের ছড়িটা "কৃত্তা কাঁহাকা। বিল্‌মে এত্তা পানি হ্যায় তব ছিঁয়া কিঁও আয়া ?"

হাসির গমকে বাহাদুরের গায়ে ঢলে পড়ে সুহাসী। গলার হারটা হাসুলিটাও যেন দাঁত বার করে ভেংচি কাটতে থাকে বিশাইকে। ছুটো হাতের শিরায় উপশিরায় একটা অগ্নিময় তরল স্রোত বয়ে যায়। ইচ্ছা হয় দু'হাতে বাহাদুরের ফুলে মাথাটা উপড়ে নেয়ার। কিন্তু কিছুই করে না বিশাই। যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে ফিরে যায়। পিছনে কাঁটার মত বিঁধতে থাকে আড়াইশ কুলি, কামিনের টেপা হাসি। "শালার পাহাড়ীকে দেবো একদিন ডুবিয়ে ময়ানডাঙ্গায় মরা বিলের পাঁকে। দু'একটা বুক্‌কুড়ি তুলে ব্যাস—।" নিজের মনেই বলে ওঠে বিশাই। অজান্তেই কথাটা বেশ জোরেই বলে সে। আশেপাশে অনেকে চমকে ঘুরে তাকায়। ভয়ে ভয়ে দেখে বাহাদুর শুনতে পেয়েছে কি না।

না। বাহাদুরের এদিকে হুঁস নেই। সে তখন সুহাসীকে নিয়েই মত্ত।

রোদ পড়ে গেছে অনেকক্ষণ। সূর্য্যের রুপালি আলোর তাত্‌ ধীরে ধীরে কমে গেছে। হলদেটে ঘোদ্দুরে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে কাঁকরে টিপির রঙ-বাহার। সেই টিপির ফাল ফাল ছোপগুলোর গায়ে হলুদ-রাঙা ছায়া পড়েছে।

কুড়ুলটা কাঁধে ফেলে এগিয়ে চলে বিশাই। সুহাসীর ঘটনাটা পোকার মত কুরে কুরে খাচ্ছে সারা মনটা। ইচ্ছা হয় রাতের আঁধারে দুজনকেই শেষ করে দিয়ে আসতে। তারপর মরা বিলের পাঁক ত রয়েইছে। লাশ দুটো গায়েব করতে কতক্ষণ।

"হেই বিশাই।" সুহাসীর গলা মনে হচ্ছে। পিছন ফিরে চায় বিশাই। সুহাসীই, সর্পিল ভঙ্গীতে টপ্‌কে টপ্‌কে দৌড়ে আসছে উঁচু লাল পাথুরে টিপিগুলি। যেন নাগ-কন্যা, মোহনীয়া রূপ বিষে বিষে ভরা। হন হন করে এগিয়ে চলে বিশাই।

আরো জোরে লাফাতে লাফাতে পাশে এসে দাঁড়ায় সুহাসী "রাগ করেছিস, তা আমার সঙ্গে ক্যানে বলত। পারলি নাইত দায়ের এককোপে দু'খানি করে দিতে।"

এ যেন আর এক সুহাসী। বিশাইয়ের সারা শরীরের রক্ত যেন ধাক্কা মারে পাঁজরের পর্দায় পর্দায়। আঙুলগুলো টানটান হয়ে আরো শক্ত হয়ে বসে কুড়ুলের হাতলটায়। ফিসফিস করে বলে "ই কথা মন থেকে বলছিস্‌ তুই।"

"ক্যানে বিশ্বাস হচ্ছে নাই? মিছি কথার জন্তে উ অনেক গয়না পত্তর দিছে বটে, তাই বলে—, দূর তাই কি হয়। পাহাড়ী জঙ্গলী কুথাকার।" হেঁসে গড়িয়ে পড়ে সুহাসী।

"দেখ, দি তবে আজ রেতের বেলায় কাঁকা করে পাহাড়ীকে।" শক্ত হয়ে ওঠে বিশাইয়ের মুখটা।

"পারবি তুই? তবে আজ রেতের বেলা জেগে থাকিস। খবর দেব ঠিক সময়ে।" সারা শরীর একটা উন্মত্ত আলোড়ন তুলে সুহাসী হারিয়ে যায় জঙ্গলা আঁধারের ছায়ায়।

*

রাত এসেছে....মায়ামধুর রাত।

কালো ঘোমটার আড়ালে গেছে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার কোলাহল। শেষ ডাক ডেকে অনেকক্ষণ কুলায় ফিরে গেছে পক্ষীকুল। ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে ত্রিযামা রাত।

সাঁওতাল পাড়ায় মাদলের শব্দ থেমে গেছে অনেক আগে, সমাপ্ত হয়ে গেছে আনন্দের মত্ততা। নিদ্রার আবেশে নিঝুম প্রকৃতির মাঝে নিঃশব্দে কোমরে ভোজালীটা গুঁজে বার হয়ে আসে বাহাদুর। কপালের গায়ে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু স্বেদ কণা। পকেটে হাতড়ায় আর একবার নোটের তাড়াটা পরখ করে বাহাদুর। একটা অজানিত শিহরণ বয়ে যায় সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ায় বনের এক প্রান্তের পোড়ো জাঙ্গালে কালির মন্দিরটার চত্বরে। কবেকার মন্দির কে জানে! প্রতিটি ইটের গায়ে মহাকালের ছাপ পড়েছে কাল হয়ে। অতীতের সে সমারোহ লুপ্ত হয়ে গেছে। ঐশ্বর্য্যের স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে স্থবির ধ্বংসস্তূপের গায়ে। বাসা বেঁধেছে বাঁদুড়ের দল আর শাখা মেলেছে জানা অজানা বুনো গাছ-গাছালি।

সুহাসী এসে দাঁড়িয়েছিল বাহাদুর আসার আগে থেকেই। বাহাদুর এসে সুসাহসীর হাত ধরে বললে—"চল।"

সুসাহসীর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল কোমরে গোঁজা ভোজালীটার দিকে "তুই একটুক দাঁড়া আমি এখুনি আসছি।"

"কিউ?"

"গয়নাগুলান নিয়ে আসতে ভুলে গেছি। তুই একটুক দাঁড়া, আর ভুজালীটা আমাকে দে একবার, আমি ত এখুনি ঘুরে আসছি ঘর থেকে।" সুহাসী জবাব দেয়।

বাহাদুরের ক্ষুদেক্ষুদে চোখদুটো আরো ছোট হয়ে যায় সন্দেহে। খানিক কি যেন ভেবে নিয়ে ভোজালীটা তুলে দেয় সুহাসীর হাতে।

পাচালের আড়ালের নিঃসীম আঁধারে মিশে যায় সুহাসীর কাল শরীরটা।

• • • •

দুটো মুষ্টিবদ্ধ হাত পিছনে করে পায়চারি করছে বিশাই। শরীরে প্রতিটি অঙ্গের উপর বয়ে যাচ্ছে আগুনের ঝড়। সুহাসী কথা দিয়েছে আসবে বলে। ঘরের এককোণে কেঁপে কেঁপে উঠছে ছোট একটা টেমির ম্লান শিখাটা, আধো আলো আর আধো ছায়ায়।

চারদিক হয়ে উঠেছে বিশাইয়ের পিটে-পড়া শরীরটা। শরীরের রক্তে রক্তে একটা পাশবিক অনুভূতি নেচে নেচে বেড়াচ্ছে।

বাহাদুর!

তার কথা মনে পড়লেই একটা আরণ্যক প্রবৃত্তি কাঁপিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে সমস্ত ইচ্ছা-শক্তিকে ঘিরে। একপাশে রাখা কুড়ুলটার আগাটায় হাত বুলিয়ে দেখে নেয় একবার।

"বিশাই···বিশাই।" সুহাসীর কণ্ঠ শোনা যায় বাইরে থেকে। "এসেছিস?" উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘর হয়ে আসে বিশাই।

"হু। ভাজালে কালির মন্দিরে অপেক্ষা করছে বাহাদুর। এই নে ভুজালীটা, এককোপে ব্যাস—।" চাপাস্বরে বলে ওঠে সুহাসী। কাপড়ের আড়াল থেকে ভোজালীটা তুলে দেয় বিশাইয়ের হাতে।

"ইটা কার?"

"বাহাদুরের।"

"পিছু পিছু আয় সুহাসী।" ভোজালীটা হাতে নিয়ে একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে চায় বিশাই। দুটো চোখ চক্‌চক্ করে ওঠে প্রতিহিংসায়। দৃঢ় মুষ্টিতে ভোজালীটা চেপে ধরে হিংস্র শার্দুলের মত চাপা পদসঞ্চারে এগিয়ে চলে বিশাই।

আর তখন····

পোড়োমন্দিরের একটা স্তূপে হেলান দিয়ে বাহাদুর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল সুহাসীর প্রত্যাবর্তনের। যত দেরী হচ্ছিল তত চিন্তার রেখা ছেয়ে ফেলছিল বাহাদুরের সারা মন। একটা অনিশ্চিত আশংকা আচ্ছন্ন করে ফেলছিল সমস্ত চিন্তাকে। হঠাৎ সেই চিন্তাধারাকে দীর্ণ বিদীর্ণ করে প্রেত কণ্ঠে কোনা থেকে হাহাকার করে উঠল নিশি-জাগা কোন বিহঙ্গ। ইতস্তত নড়ে চড়ে বসে বাহাদুর। শুকনা ঝরাপাতার বুকে অস্পষ্ট একটা গুঞ্জরণ ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে আসছে। সুহাসী ফিরে আসছে বোধ হয়।

"সুহাসী।" ছিটকে এগিয়ে যায় বাহাদুর। কিন্তু পরক্ষণেই ভূত দেখার মত চমকে ওঠে। সামনে দাঁড়িয়ে বিশাই। দৃষ্টিতে মিশে রয়েছে হিংসাংসার আগুন। যেন সেই আগুনের প্রতিফলনে ঝিকিয়ে উঠছে হাতে ধরা ভোজালীর নগ্ন ফলাটা।

পাহাড়ী রক্ত দাপিয়ে ওঠে ক্ষণিকের জন্য। অভ্যাস বসেই নিজের কোমরের দিকে হাত বাড়ায় বাহাদুর। কিন্তু সেখানে শুন্য বিদ্রুপ। পরক্ষণেই ঝিমিয়ে পড়ে সমস্ত শক্তি। ছুটে পালাতে যায়। কিন্তু যাবে কোথায়? বিশাইয়ের প্রতিটি পেশীতে উন্মাদনার ঢেউ। শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে বাহাদুরের গলাটা। হঠাৎ একটা অন্তিম হাহাকারে শিউরে শিউরে ওঠে নিশ্চুপ রাত। কিন্তু লোকালয় অনেকদূরে। একেবারে বনের ওধারে, তার নিদ্রামগ্ন প্রকৃতি।

• • •

সকালে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। রায় সাহেবের নেপালি দারওয়ান, বাহাদুর ক্যাশ-ভেঙ্গে উধাও হয়েছে। খবরটা শুনে সকলের অগোচরে একটা কুটিল হাসি ঠিকরে পড়ে বিশাইয়ের ঠোঁট থেকে।

সে আর সুহাসী ছাড়া আর কেই বা জানে যে বাহাদুরের লাসটা ময়নাডাঙ্গার মরাবিলের পাকের অতলে ধীরে ধীরে তলিয়ে গেছে চিরদিনের জন্য।

গল্প

শিথিল শৃঙ্খল

অরন্ত চৌধুরী

মানুষ না পাথর? অবাক হয়ে ভাবে রেবা। কোন মানুষ যে এতটা নির্বিকার আর নিস্পৃহ হতে পারে এ কথা ও যদি কারো কাছে শুনতো তবে নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দিত, নস্যাৎ করে দিত গাঁজা বলে যদি কোন বইয়ে এ রকম একটা চরিত্রের পরিচয় মিলতো।

আশ্চর্য, সাত চড়েও রা নেই মানুষটার মুখে। অবশ্য চড় সত্যি সত্যিই কোনদিন মেরে দেখেনি রেবা কিন্তু ওর বিশ্বাস সাত কেন সাতশো চড় পড়লেও ওর মুখ দিয়ে রাম-রহিম কিছুই বেরুবে না—বোবার মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকবে আর তারপর দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে সরে যাবে, চোখের সামনে থেকে।

এই তো সেদিনকার কথা। দিনটা কোন এক ছুটির দিন হবে, বোধ করি রবিবারও হতে পারে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলেছে—ঠিক যে সময়টায় রাস্তা দিয়ে বাসনওয়ালা বাসন বাজিয়ে এগিয়ে চলে, শব্দ ভেসে আসে রাস্তায় জল দেওয়ার আর ঠিকে ঝি-টা এসে "বৌমা বৌমা" বলে হাঁক পাড়তে থাকে সেই সময়ে রেবার কেমন যেন মনে হলো যে মাথাটা ধরে আসছে। ওপাশেই শুয়েছিল সেই মানুষটা, রেবা গিয়ে ধাক্কা দিলো, তুলে দিলো ওকে, তারপর আদুরে গলায় বললো, "ওগো শুনছো, ওঠো না, দারুণ মাথা ধরেছে"—

চোখ রগড়ে উঠে পড়লো মানুষটা। ঘুমকাতুরে চোখ-দুটো থেকে ছুটির দিনের সোনালী দুপুরের আবেশ জড়ানো ঘুম তখনও ছাড়ে নি। ততক্ষণে রেবা গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছে। দু'হাতে কপালের রগদুটো টিপে ধরেছে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে এমন ভঙ্গীতে। অস্ফুট একটা শব্দ করে এদিকে ফিরলো রেবা। মানুষটা পাশে এসে বসবে, মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দেবে। এই আশায় একখানাকে বাড়িয়ে সাতখান করলো,—"উঃ, অসহ্য যন্ত্রণা, মাথাটা একেবারে যেন ছিঁড়ে পড়ছে···উঃ বাবা গো, মরে গেলাম—"

কথাগুলো কানে যেতেই মানুষটার চোখ থেকে ঘুম উবে গেল কর্পূরের মতো। উঠে পড়লো, চঞ্চল হলো। এগিয়ে এলো রেবার দিকে।

মনে মনে ভাবলো রেবা—ওষুধ ধরেছে, কিন্তু না, ওষুধ ধরে নি। সামান্য কিছুক্ষণ দাঁড়ালো মানুষটা, পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখলো রেবার দিকে তারপর চটির একটা চটাস চটাস আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যে রকম মানুষ হয়তো জলপটি দেওয়ার জন্যে ওঘরের আলমারী থেকে ওডিকোলোনই আনতে ছুটলো, ভাবলো রেবা।

তারপর! তারপর ষাড়া বিশ মিনিট পরে ঘরে ফিরলো মানুষটা—হাতে ডাক্তারী ব্যাগ, পেছনে ডাক্তার। অগোছালি ভাবে শুয়েছিল রেবা। কোন রকম জানানি না দিয়েই মানুষটা যে এমনই হুট্ করে একজন বাইরের লোককে সঙ্গে করে ঘরে ঢুকতে পারে ও কল্পনাই করেনি। হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে উঠলো রেবা, তারপর যথাসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে বুকের আর হাঁটুর নীচের কাপড়ে টান দিলো, ভদ্রস্থ হওয়ার চেষ্টা করলো। আলাদার দুর্বাসা দৃষ্টি হানলো মানুষটার দিকে। মানুষটা কিন্তু পরম নির্বিকার, ভাবলেশহীন চোখ।

ততক্ষণে ঝিকে ঝি-টাও এসে গেছে। ব্যাপারখানা কি ধরণের উৎসুকা নিয়ে দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর সেই সকলের সামনে রেবার নাকালের একশেষ। দই ভেবে চুনের হাঁড়িতে মুখ দেওয়ার পরের অবস্থা।

ব্যাপার স্যাপার বুঝে ভালো মানুষ ডাক্তারবাবু মুখ টিপে হেসে চলে গেলেন। আর চোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মানদা ঝি-টা পরে মুখে আঁচল চেপে চোখে হাসির ফোয়ারা ছিটিয়ে কলতলার দিকে চলে গেল। সীতার পাতাল প্রবেশের পুরাবৃত্ত কেটে যাওয়ার পর ভিসু-ভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত ঘটতো। কিন্তু ঘটলো না। কি ভেবে চুপ করে গেল রেবা।

এ এমন কিছু নতুন ব্যাপার নয়। ওদের বিয়ে হয়েছে আজ প্রায় বছরখানেক। আর এরই মধ্যে এই রকম তুচ্ছ তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে লোকের কাছে রেবাকে যে কতবার অপদস্থ হতে হয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। কত চেষ্টা করেছে রেবা মানুষটার মধ্যে পৌরুষ জাগিয়ে তুলতে, কিন্তু পারে নি, কিছুই পারে নি। যেমনটি ছিল আগে তেমনিই আছে একচুলও বদলায় নি। এ যেন বছরের পর বছর ধরে একটা ছুড়ি পাথরকে ধার করানোর চেষ্টা, যতবারই ধার করানো যায় ততবারই পড়ে যায়, গড়িয়ে যায়।

আশ্চর্য! মানুষ না পাথর! পুরুষের মধ্যে পৌরুষই যদি না থাকলো সে আবার পুরুষ নাকি? যে পুরুষের মধ্যে বলবীর্য নেই, নেই রাগ, ঝগড়াঝাটি করার ক্ষমতা যে; আবার মানুষ নাকি? মানুষ না ছাই, ওটা একটা পাথর যে রকম ভাবে রাখবে সেই রকম ভাবেই থাকবে।

কত, কতবার রেবা চেষ্টা করেছে মানুষটাকে রাগাতে, মানুষটাকে নাড়া দিতে কিন্তু সকলই বৃথা, সবই নিষ্ফল।

হয়তো বাজার করে ফিরেছে মানুষটা। বাজারের থলি উজাড় করে সবকিছু দেখেছে রেবা, তারপর শেষপর্যন্ত গলা চড়িয়ে ঝগড়া তুলেছে, এ সব কি আনা হয়েছে শুনি? যদি দিন দিন কি বুদ্ধি বাড়ছে না কমছে? পোকা ভরা আলু আর পাকা বেগুনে থলি ভর্তি করে এনেছো?

রাগ তো দূরের কথা কোন কথাই বলবে না মানুষটা। আদৌ প্রতিবাদ করবে না, বলবে না যে আলু বেগুন ছাড়াও সে আরো অনেক কিছু এনেছে। কখনও তর্ক করে বোঝাবার চেষ্টা ক'রবে না যে একটা বেগুন পাকা বা একটা পোকা ধরা আলু যদি ভুলক্রমে এসেই যায় তবে চোখের মাথা খাওয়া হয় না। কিম্বা তরকারি রাঁধবার জন্যে মাথামুণ্ডুরও প্রয়োজন হয় না। শুধু একবার তাকাবে রেবার দিকে, সেই ভাবলেশহীন চোখ তুলে, আর তারপর ছেঁট হয়ে যেটায় সমস্যে অভিযোগ সেটা নিয়ে বেরিয়ে যাবে, বদল করে নিয়ে আসবে। রেবার কিন্তু ধারণা, বদল না ছাই—দোকানীর কাছে গিয়ে বদলের কথা বলবার মত মুখ আছে নাকি মানুষটার? ফেলে আসে, রাস্তায় ফেলে দিয়ে বাজার থেকে আবার নতুন করে কিনে আনে।

যতক্ষণ মানুষটা ছেঁট হয়ে জিনিষগুলো তুলে নেবে ততক্ষণ ধরে রেবার বকবকানি চলতে থাকবে, রোজ রোজ সেই একই জিনিষ, থোড় থড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়। এ সব দিয়ে কি যে পিণ্ডি চটকাবো তা জানিনা। এদিকে খাওয়ার সময় তো খুব গজ গজ করা আছে—

অথচ আশ্চর্য, খাওয়ার সময় কেন, কোন সময়ে কোন কারণেই গজ গজ করে না মানুষটা। করে না কোন দিন। এমন কি অফিসের যদি দেরীও হয়ে যায়, তবুও ঠিক সাতে ন'টার সময় খেতে আসবে—যদি ভাত বাড়া থাকে ভালই অন্যথায় যদি একটু দেরী থাকে তবে অপেক্ষা করবে। তারপর অফিসে গিয়ে বকুনি খাবে। এমন কি যদি কোনদিন ভাত না পায়, না খেয়ে অফিস যেতে হয় তবুও কিছু বলবে না। তাই ওদিক দিয়েও রেবা হার মেনেছে, ভাত না দিয়েও রাগাতে পারে নি মানুষটাকে। রাগ করাটা যেন ওর নীতিবিরুদ্ধ।

এই রকম খুটিনাটি ব্যাপার নিয়ে অনেকবার ঝগড়া বাধাতে চেষ্টা করেছে রেবা কিন্তু পারেনি। তালি কি আর একহাতে বাজে, বাজে না। মানুষটার হিমাচলরূপী ধৈর্য আর ধীরতায় প্রতিহত হয়ে ওর বাণ ওরই কাছে ফিরে এসেছে। হিমালয় টলেনি, নড়েনি একচুলও।

তাই মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ওঠে রেবা। অধৈর্য হয়ে পড়ে। মানুষের সঙ্গেই ঘর করা যায়, ঘর করা যায় নাকি পাথরের সঙ্গে? এর চেয়ে ওর বাবা ওর হাত-পা বেঁধে যদি জলে ফেলে দিতেন তাহলেও বোধ করি ভালোই হতো। মনে হয় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যায় দূরে, অনেক দূরে, অন্য কোনখানে। কিন্তু এক অদৃশ্য শক্তি

যেন ওকে আকর্ষণ করে, মনকে ফিরিয়ে আনে স্বপ্নমাখানো রঙীন কল্পনা থেকে। ফিরিয়ে আনে চার দেওয়ালের বাঁধন দেওয়া এই পুরানো ঘরে। শিশুর মতো যে অবোধ আর অবুঝ তার ওপর বিরক্ত হওয়া যায় না, মমতা জাগে। অল্পেই যে সন্তুষ্ট তার সেই অল্পটুকুকেও ছিনিয়ে নিতে মায়া হয়। বিবেকে বাধে। তাই অনেক কিছুই ভাবতে পারলেও অনেক কিছুই করতে পারে না রেবা।

এর চেয়ে সরোজদা ভালো, অনেক ভালো ছিল। না হয় তার রঙটা একটু কালো আর চোখ দুটো কটা কটা কিন্তু তাতে কি হয়েছে? তবু, তবু সে পুরুষ ছিল। ভালোবাসতে জানতো। অবশ্য ওই মানুষটা যে রেবাকে ভালোবাসেনা এ কথা সে মোটেই বলে না, কিন্তু তবুও সে যেন কি এক ধরণের ভালোবাসা!

ওর বেশ মনে পড়ে সরোজ দা যখন ওকে পড়াতো তখনকার কথা। পড়াতো যতটুকু তার চেয়েও অনেক বেশী হাঁ করে চেয়ে থাকতো, ওর মুখের দিকে। ওর সামান্য হাসিতে নিজেকে কৃতার্থ মনে করতো, ধন্য হতো। সেইখানেই সরোজ দার সঙ্গে ওর ফষ্টিনষ্টির সুরু আর ওর বিয়ের আগের দিন সব শেষ। ঠিক শেষ বলা যায় না, অন্ততঃ সরোজদার দিক থেকে তো বটেই। কারণ ও শেষ পর্যন্ত রেবাকে বলেছে, চলো আমরা চলে যাই—যেখানে অভিভাবকের চোখ রাঙানি নেই; নেই কোন জাত-যেজাত বিচারের মাপকাঠি আর মনের সঙ্কীর্ণতা। সেখানে গিয়ে আমরা ঘর বাঁধবো। তুমি আর আমি শুধু, আমি আর তুমি।

কিন্তু না, রেবা পারে নি। পারে নি ওরকম একটা ঝুঁকি মাথায় তুলে নিতে, পারে নি আজন্ম লালনপালন করেছে যারা তাদের কথার অবাধ্য হতে। তাই সেই খানেই ইতি টেনেছিল রেবা। তবুও সরোজ দা কিন্তু হাল ছাড়ে নি। বিয়ের পর যখন ও বাপের বাড়ীতে গিয়েছিল তখন আবার দেখা হয়েছে। এড়িয়ে যাওয়ার হাজার চেষ্টা করেও সরোজদাকে এড়াতে পারে নি রেবা। একবাড়ী লোকের মাঝেও ফাঁক বুঝে অভিভাবকের চোখ এড়িয়ে দেখা করেছে। জানিয়েছে বিয়ে হয়ে গেলেও রেবাকে সে ভুলতে পারে নি, ভুলতে পারবে না। কোন উত্তর দেয়নি রেবা, একটি কথাও না। মুখ ঘুরিয়ে চলে গেছে আর পাঁচজনের কাছে, ভীড়ের মাঝে।

তারপর আর দেখা হয়নি সরোজদার সঙ্গে। তবে চিঠি এসেছে। চিঠি এসেছে একটি নয়, দুটি। প্রথমটাতে পাগলের প্রলাপোক্তি, অন্ততঃ রেবার তাই মনে হয়েছিল। আর দ্বিতীয়টা বহন করে এনেছিল সুসংবাদ—সরোজদা রাণীগঞ্জের এক কয়লাখনিতে কাজ পেয়েছে। সরাসরি সেই-খান থেকেই চিঠি লিখেছিল। জানিয়েছিল চাকরী পেয়েছে বলে নয়, কোলকাতায় তার মন টিকছে না, অতীতের স্মৃতি তাকে তাড়া করে ফিরছে তাই চাকরীর নামে এ তার পলায়ন। পলায়ন, পাগল হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই। মনে মনে হেসেছিল রেবা, হেসেছিল তাচ্ছিল্যের হাসি। ভেবেছিল, এর পরেও পাগল হতে আর বাকী আছে নাকি।

বিয়ের মাস পাঁচেক পরে প্রথম যেদিন সরোজদা চিঠি এসেছিল সেদিন রেবা মানুষটার সঙ্গে একটু রসিকতা করার লোভ সম্বরণ করতে পারে নি। চিঠিখানা এনে দিয়েছিল ওই মানুষটাই। বাজার থেকে ঘরে ফেরার মুখে দেখা হয়েছিল পিওনের সঙ্গে, পিওন তাই ওর হাতেই দিয়ে দিয়েছিল। সেই চৌকো নীল খাম, সেই পুরুষালী হাতের টানা টানা বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা নাম, ঠিকানা—ঠিক যেমনটি এসেছিল আরো দুচারখানা, বিয়ের আগে।

খামটা দেখেই বুঝতে পেরেছিল রেবা, কার কাছ থেকে এসেছে ও চিঠি। পরম নির্বিকার আর উদাসীন মানুষটার হাত থেকে চিঠিটা নিয়েছিল। হাঁ, সেদিনও মানুষটা ঠিক এই রকমই ছিল। তাইতো পড়া শেষ করে চিঠিটা ড্রয়ারে রেখে এসে মানুষটাকে বলেছিল, কই জিজ্ঞেস তো করলে না চিঠিটা কার কাছ থেকে এসেছে।

—তোমার চিঠি, জিজ্ঞেস করবো কেন? জামাটার বুঝি বোতাম ছিঁড়ে গেছে, হেঁট হয়ে নিবিষ্টমনে সেটা সেলাই করতে করতে মুখ না তুলেই জবাব দিয়েছিল মানুষটা।

—সরোজদা গো, সরোজদার কাছ থেকে এসেছে চিঠি—খোকা ফেরবার জন্যে বলেছিল রেবা।

—কোন আত্মীয় বুঝি? রেবার কথার মধ্যে যে কোন ইঙ্গিত থাকতে পারে তা বুঝতেই পারে নি ওই নির্বিকার মানুষ। তাই সাধারণ ভাবেই জিজ্ঞেস করেছিল।

রেবা কিন্তু আহত হয়েছিল, না গো না, আমার নামের বলার লোভটা কোন রকমে সামলে নিয়েছিল। বলেছিল, আত্মীয় হতে যাবে কেন আমার দাদার বন্ধু, আমাদের মাষ্টার মশায়, তারপর আরো যোগ করেছে, আমাকে খুব ভালোবাসতো কি না। আমার বিয়ের দিন কি কান্নাটাই না কেঁদেছিল!

মুখে সমবেদনার আওয়াজ তুলেছিল মানুষটা, তারপর বলেছিল, আহা বেচারা, তা ভদ্রলোককে মাঝে মধ্যে আমাদের এখানে আসতে বললেই তো পারো। সারাদিন আফিসে থাকি, কথা বলবার তো আর লোক পাওনা তুমি, উনি এলে তবু একটু গল্পগুজব করতে পারো, সময় কাটাতে পারে।

ঠোঁকের মুখে সুন পড়েছিল। আঁচলটা সজোরে কাঁধ ডিঙিয়ে পিঠে ফেলে দিয়ে দুমদাম আওয়াজ তুলে চলে এসেছিল রেবা। চলে এসেছিল রান্নাঘরে। ডাল নাড়া কাঠিটা ডালের হাঁড়িতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, নেড়েছিল। সে বাড়া সামলাতে না পেরে উনুন শুদ্ধ ডালের হাঁড়িটা পড়ো পড়ো হয়েও বেঁচে গিয়েছিল।

সীমা নেই নীলাকাশের। সীমা নেই সাগরের তটে তটে বালুকণার। কিন্তু তবু সীমা আছে অনেক কিছুরই। আছে সীমা, ধৈর্য আর অপেক্ষার, মায়া আর মমতার।

তাই রেবারও একদিন ধৈর্যচ্যুতি হলো, বিস্ফোরণ ঘটলো স্থৈর্যের সীমারেখা পারে। যে চিড় ধরেছিল মনের গহনে সেই বিয়ের প্রথম মাসেই, সে চিড় বাড়তে বাড়তে কবে যে ফাটলে দাঁড়িয়েছিল তা জানতে পারে নি কেউ, রেবাও না। বুঝলো সেদিন, যেদিন ও চিঠি লিখলো সরোজদাকে, পোষ্ট করে এলো নিজের হাতে। আবেদন জানালো মানবিকতার নামে, দাবী জানালো অতীত ভালোবাসার হারিয়ে যাওয়া সূত্র ধরে। জানালো এখানে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বাঁধন না দেওয়া খাঁচার বাঁধনে মরা পাখীর পাশে তার প্রাণ হাঁফিয়ে উঠেছে, বিষিয়ে উঠেছে। ওর ব্যাকুল হৃদয় মুক্ত আকাশের নীচে হাল্কা হাওয়ায় ডানা মেলে উড়তে চায়, ভাসতে চায় সাথীর সাথে, সাথীর পাশে। এখানে থাকলে সে আর বাঁচতে পারবে না, বাঁচবে না।

ঘটনাটা সামান্যই, কিন্তু সামান্য নয় রেবার জীবনে—তাই ও এত আহত হয়েছিল, উত্তেজিত হয়েছিল।

বারোই মাঘ, স্মরণীয় দিন। ওদের বিয়ের দিন। রেবা আগে থাকতেই জানিয়ে রেখেছিল মানুষটাকে—অফিস থেকে ছুটি নিতে। কেন কি বৃত্তান্ত কিছুই বলে নি রেবা—মানুষটাও কিছুই জিজ্ঞেস করে নি। রেবা বলেছে সুতরাং ছুটি নিতে হবে, তাই ছুটি নিয়েছিল ও। তারপর দুজনে একসঙ্গে বাজারে গেছে, নিত্যি-নৈমিত্তিকের ব্যতিক্রম বাজার করেছে। তারপর হোড়শোপচারে মানুষটাকে খাইয়েছে, নিজে খেয়েছে। মানুষটা কিছুই বলেনি, কিছুই জিজ্ঞেস করেনি কেন এ ঘটা, কিসের এ আয়োজন?

তারপর সন্ধ্যের সময় দুজনে বেড়াতে বেড়িয়েছে। বেড়িয়েছে পাশাপাশি। যতদূর চোখ চলে ততদূর এগিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে কখন রাত নেমেছে, কখন রূপোলী চাঁদ আঁচল বিছিয়েছে ধরার বুকে সে ওদের খেয়াল নেই। খেয়াল হয়েছে যখন কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়া ওদের গায়ে পরশের নামে হাড়ে হাড়ে কাঁপুনী ধরিয়েছে। তখন ওরা ফিরে এসেছে বাড়ীতে, পুরোনো পরিবেশে।

তারপর শাল মুড়ি দিয়ে জবুথবু হয়ে কোনরকমে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়েছে, বিছানার আশ্রয় নিয়েছে।

শোয়ার প্রায় মিনিট পনেরো এপাশ ওপাশ করার পর রেবা বলেছে, আজ যে এত ঘটা করে রান্নাবান্না করলাম কৈ কিছু জিজ্ঞেস করলে না তো—

—না মানে—ঠিক কি বলবে ভেবে পায় না মানুষটা।

—আচ্ছা, তোমার কি কিছুই মনে থাকতে নেই? দিন

দিন কি বুড়ো খোকা হচ্ছো? আজ যে আমাদের বিয়ের দিন গো—

—ও! একটি কথাতেই কথা শেষ করেছে মানুষটা। আরো যে কিছু বলা প্রয়োজন বা বলা যেতে পারে তা ওর মনে হয়নি।

কথা বাড়ায়নি রেবা। আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরেছে, ঘুমোবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ঘুম আসেনি। শীত কমেনি। আরো কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা করার পর তাই আবার ও মুখ খুলেছে, কি আশ্চর্য, শীতে কি সারারাত মরবো নাকি? লেপের সবটাই যে একেবারে টেনে নিয়েছো! ভেবেছিল এ কথার পর মানুষটা নিশ্চয়ই একটু সরে আসবে, সরে আসবে ওর দেহের একান্তে। একটু উষ্ণ সান্নিধ্য, দেহের একটু উত্তাপ। আর তারই ছোঁয়ায় চোখের পাতায় ঘুম নামবে, ঘুম নামবে সারা শরীর বেয়ে। হারিয়ে যাবে ও নিবিড় ঘুমের অরণ্যে।

কিন্তু না, তা আর হলো না। ঘুমই হারিয়ে গেল নিবিড় অরণ্যে। কোন উত্তর এলোনা ওপাশের মানুষটার কাছ থেকে—লেপটা শুধু আলগা হলো। ও ভেবেছিল লাটাই ঘোরালেই ঘুড়িটা এগিয়ে আসবে ওর একান্তে, ধরা দেবে হাতের মুঠোয়। কিন্তু তা হলো না—ঘুড়ি কেটে গেল, সুতোটাই শুধু এগিয়ে এলো। সারারাত ঘুমোতে পারলো না ও, সমস্ত লেপটার অধিকার পাওয়ার পরেও ঘুমের পরশ মিললো না চোখের পাতায়। দেহের প্রতিটি রোমে রোমে কি এক জ্বালা, কি এক ছুঁচ ফোটানো অনুভূতি নিয়ে রাত কাটলো।

সেই রাতেই বারুদের স্তূপে আগুন পড়েছিল কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটেনি। বিস্ফোরণ ঘটলো তার পরের দিন। পরের দিন সকাল বেলায়, মানুষটা অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর।

ঘুসুরী এসে হাজির হলো। মানুষটার নাম ঠিকানা লেখা একটা চিরকুট নিয়ে। কি ব্যাপার? বাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। কেন? একটা লেপ নাকি কেটে বড়ো করতে হবে! এতক্ষণে বিস্ফোরণ ঘটলো। ফেটে পড়লো রেবা। যে আগুন জ্বলছিল ধিকি ধিকি করে তাতে পূর্ণাহুতি পড়লো। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলো ঘুসুরীটাকে। আর তারপর বহুদিন পর চিঠি লিখতে বসলো, চিঠি লিখলো সরোজদাকে।

উত্তর এলো যথাসময়ের আগেই। চিঠিতে সরোজদা জানিয়েছে এ রকম একটা ব্যাপার যে ঘটবে তা ওর আগে থাকতেই জানা ছিল। জানা ছিল রেবার প্রতি ওর ভালোবাসা কখনই বিফল হবে না। এই সব জানো ত্যানো, প্রেমের কচ্‌কচানি। তারপর জানিয়েছে ছুটি ওর একেবারেই নেই সুতরাং ও শনিবারে আসছে আর রবিবারে ভোরের ট্রেণেই ওকে ফিরে যেতে হবে, কারণ সোমবারে বক্তৃতা দিতে হবে সুতরাং রেবা যেন রবিবার রাতে ষ্টেশনে চলে আসে। ষ্টেশনেই রাত কাটাতে হবে নইলে ভোরের ট্রেণ ধরা যাবে না। আর ষ্টেশনেই সে থাকবে, অপেক্ষা করবে রেবার জন্যে।

ভালোই হলো। ভালোই হবে ভাবলো রেবা। রবিবারে অফিস নেই, নেই কাজের তাড়া। সুতরাং শনিবার রাতে অঘোর ঘুমে ঘুমোবে মানুষটা সেই ফাঁকে চলে যেতে পারবে ও। অবশ্য দিনে হলেও কোন অসুবিধা হতো না ওর বরঞ্চ একটু সুবিধাই হতো। কিন্তু না, থাক, রাতই ভালো। রাতে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে একটা মাদকতা আছে, আছে রোমান্স। তারপর হাড় ঠক ঠক শীতের রাতে ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে রাত কাটানোটাই কি কম বড়ো কথা? মনে মনে ভেবেছে রেবা।

কিছুতেই কাটতে না চাওয়া দিন দুটোও শেষপর্যন্ত কাটলো। নতুন জীবনের পদধ্বনি বয়ে নিয়ে শনিবার এলো। স্বামী অফিসে চলে যাওয়ার পর আবার সুটকেশটা নিয়ে বসলো রেবা। দু'দিন ধরে গোছগাছ করা সুটকেশে সব জিনিষপত্তর ঠিক আছে কিনা আর একবার খুঁটিয়ে দেখে নিল। সব ঠিকই আছে, কোন কিছুই বাদ পড়েনি আর প্রসাধনের টুকিটাকি জিনিষগুলোও ঠিকই নেওয়া হয়েছে। সুটকেশ বন্ধ করে তালা লাগালো রেবা, দু'তিন-বার টেনে দেখলো ঠিক লাগানো হয়েছে কিনা। তারপর সুটকেশটা বাইরের ঘরে নিয়ে এসে দরজার কোণ ঘেঁষা আলমারীর পাশে রাখলো। দেখে নিলো ব্র্যাকেটে

অলেষ্টারটা ঠিকই আছে, সুটকেশের চাবীটা ওর পকেটে ফেলে দিল। যাওয়ার সময় এঘরে এসে ওটাকে গায়ে দিয়ে নেবে। ব্যাস প্রাথমিক কাজ সব শেষ। আর কিছুই করার নেই, শুধু রাতের অপেক্ষা।

শেষে রাতও এলো, রাত এলো তার মোহজাল বিস্তার করে, মায়া ছড়িয়ে। অন্যদিনের চেয়ে আজ একটু তাড়াতাড়িই খাওয়া দাওয়ার পাট চুকালো রেবা। তারপর যথারীতি ঘরকন্নার কাজ সেরে বিছানায় বুক আশ্রয় নিলো। না, ঘুম নয়—পল পল ধরে প্রতীক্ষা সেই সময়ের, যে সময়ে মানুষটা ঘুমিয়ে পড়বে অঘোর ঘুমে।

শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওর মনে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো অজস্র প্রশ্ন। আনন্দ আর নিরানন্দের চেউয়ের দোলা।

আজ ছুটি পাবে ও, ছুটি পাবে এই এতদিনের বন্দী জীবন থেকে। কিন্তু তবু যেন মনের কোণে কোথায় কি একটা কাঁটা খচখচ করে বাধছিল। চলে যাওয়ার আগে মনটা ক্রমশঃই যেন কি এক প্রকাশ না করতে পারা বিষাদে ভরে উঠছিল, ভরে উঠছিল বিষণ্ণতায়। ভেবেছিল ও চলে যাওয়ার আগে বুঝি বর্ষারম্ভের মেঘদর্শনে ময়ূর যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, মেতে ওঠে উদ্দাম নৃত্যে সেইরকমই খুশীর প্লাবনে ছেয়ে যাবে ওর মন, চলে যেতে পারবে হাসতে হাসতেই সারা দেহমনে খুশীর হিল্লোল তুলে। কিন্তু না, পুরোনোর মায়া, পুরোনোর টান ওর মনকে পীড়িত করে, উতলা করে। যত দোষই থাক মানুষটার, তবু যেন ওর মন পুরোপুরি সাড়া দেয় না। আর, যত দোষই বা কেন, দোষ তো মাত্র একটিই—মানুষটা যেন কি এক ধরণের—ঘরে থেকেও যেন নেই, থাকলেও মনটা যেন কোন্ এক সুদূরে বিচরণ করে ফিরছে যার নাগাল পাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু ভালো কি বাসেনা মানুষটা? নিশ্চয়ই বাসে। ওর প্রতি কি কোন অন্যায়, অবিচার করেছে? কৈ, নাতো সে রকম তো কিছু মনে পড়ে না। বরঞ্চ ও, হ্যাঁ ও-ই মানুষটার প্রতি অনেক অন্যায়, অনেক অবিচার করেছে। তবে? তবে কেন নিরপরাধ মানুষটা শাস্তি পাবে? কেন? কেন ওর সামান্য সুখটুকুকেও ছিনিয়ে নেবে রেবা? কি, কি অধিকার আছে তার? তার নিজের সুখ, আর শান্তিটাই কি বড়ো হলো? আর যে মানুষটা দিনের পর দিন ওর ভালোমন্দ, সুখ সুবিধা দেখে এলো তার কি কোন দামই নেই? চাই বলতেই অভাব যে মিটিয়েছে, মিটিয়েছে সকল চাহিদা তার কি কোন কিছুই চাওয়ার থাকতে পারে না? থাকতে পারে না কোন অধিকার কোন দাবী?

বিবেকের সহস্র প্রশ্ন বিপর্যস্ত করে তোলে রেবাকে, রেবার মনকে। প্রতিটি প্রশ্ন যেন অশরীরি এক একটা রূপ নিয়ে ভেসে বেড়ায় বাতাসে বাতাসে, ঘরের প্রতিটি আনাচে কানাচে। মনে হয় ঘরের প্রতিটি কোণ থেকে কারা যেন ওকে তীব্র স্বরে ভৎর্সনা করছে, ব্যঙ্গ করছে মুখ ভেংচিয়ে। নিজেকে ওর কেমন যেন অসহায় মনে হয়। কোন প্রশ্নেরই সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারে না। মাথাটা ঝিম ঝিম করে ওঠে। কপালের রগদুটো বিদ্রোহের সুরে দপ্ দপ্ করে।

মাথা ঝাড়া দেয় রেবা। না, দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না, ঠিক হবে না মুক্তির যে সুর বাজছে ওর দেহের প্রতিটি রোমে রোমে তাকে অতীতের ধরা কংকালের নীচে আবার চাপা দেওয়া। আর কিছুক্ষণ, কিছুক্ষণ যদিও বিবেকের টুটি টিপে ধরে থাকতে পারে তবে পাবে মুক্তির স্বাদ, খোলা বাতাস, খোলা আকাশ। নিঝুম মেরে পড়ে থাকে ও—বিবেকের যত কিছু জঞ্জাল আর আবর্জনা ঝেড়ে ফেলতে চায়, মুছে ফেলতে চায়।

পাশের ঘরের ঘড়িটা বেজে উঠলো। চঙ্ চঙ্ করে জানালো এগারোটার সঙ্কেত। আস্তে আস্তে পাশ ফিরলো রেবা, অন্ধকারের বুক চিরে সতর্ক সন্ধানী দৃষ্টি ফেললো মানুষটার দিকে। না, কোন সাড়া শব্দ নেই, নেই কোন চেতন প্রাণের ইঙ্গিত। পাশে নিশ্বাসের শব্দেও ঘুম ভেঙ্গে যায় মানুষটার এই ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে আস্তে আস্তে লেপটা সরিয়ে হাতের চুড়ি সামলে উঠে বসলো রেবা। মাঘ মাসের কন্‌কনে শীতের মাঝেও সারা গা দিয়ে যেন ঘাম ঝরছে। খাট থেকে নেমে বিড়াল সতর্কতায় পা বাড়ালো দরজার দিকে। অন্ধকারের মধ্যে মানুষটা নড়ে উঠলো হঠাৎই, গলা থেকে তার উপচে পড়লো স্নেহ-মমতা ভালোবাসা মাখানো স্বর, "বাইরে যাচ্ছো? গায়ে চাদরটা জড়িয়ে যাও, ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।"

আমি তোমাদের

আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

আমার বাঁশির দুঃসহ সুরে তোমরা দীপক রাগ—
তোমরা আমার গানের ব্যাপ্ত মীড়ে মেঘমল্লার,
বাঁশির আগুনে আকাশে জাগাই দুরন্ত বৈশাখ—
গানের আষাঢ়ে বাতাসে নাচাই ফসলের সম্ভার!

অকাল জহ্নু-জানুতে হারিয়ে গঙ্গানদীর বান
জীবনের মরা বালুচরে যারা মুক্তা কুড়িয়ে ভাই
শবরী দিনের মণিহার গেঁথে দেবতাকে দিলে দান,
দেবতার বরে প্রতিদানে পেলে নরকের বুকে ঠাঁই!
তবুও আমার বালিয়াড়ি তীরে ফেরারী পাখির গান
তোমাদেরই কাছে দিয়ে গেল বুঝি স্বপ্ন দেখার ভার,
স্বপ্ন অলীক দেবচক্রেই, দেবতা কঠিন প্রাণ,
দেবদৃষ্টির রোষানলে জ্বলে তোমাদের সংসার!
এই বিষনীল বিদ্রোহী মন আমি ভাই তোমাদের,
আমি তোমাদেরই আস্থ-কাহিনী আসন্ধ্যা-সকালের!

আমার বাঁশির দুঃসহ সুরে তোমরা দীপক রাগ—
তোমরা আমার গানের ব্যাপ্ত মীড়ে মেঘমল্লার,
বাঁশির আগুনে আকাশে জাগাই দুরন্ত বৈশাখ—
গানের আষাঢ়ে বাতাসে নাচাই ফসলের সম্ভার!

অনেক কালের শবাসন ঠেলে এলো এ-কালান্তর,
হলো না তো তবু মুক্ত ভাইরে প্রাণের গঙ্গানদী!
তাইতো বাঁশিতে দীপকরাগের তোমরা অগ্নিঝড়—
ঝড়ো-আগুনের সুতীক্ষ্ণ তীর জাদু ভেদ করে যদি,

হয়তো আবার মেঘমল্লারে তোমাদেরই বর্ষণে
কল্লোল তুলে অকাল জহ্নু-জামুহারা জাহ্নবী
বিদীর্ণ পথে আসবেই নেমে মরুচ্ছায়া অঙ্গনে,
ষড়ঋতু হবে কবিতা সেদিন, সূর্য নবীন কবি।
স্বর্গলোকের অনেক উর্দ্ধে আসন থাকবে পাতা,
দেবতা সেদিন বুঝবে: তোমরা তাদেরই জন্মদাতা।

আমার বাঁশির দুঃসহ সুরে তোমরা দীপক রাগ—
তোমরা আমার গানের ব্যাপ্ত মীড়ে মেঘমল্লার,
বাঁশির আগুনে আকাশে জাগাই দুরন্ত বৈশাখ—
গানের আষাঢ়ে বাতাসে নাচাই ফসলের সম্ভার॥

স্বীকারোক্তি

উৎপলা মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণায়নের সূর্য যখন নিঃশব্দে নেমে আসে
ওদিকের বারান্দায়, খেয়ালে অথবা অকারণে
ওখানেই বসি আমি, এবং আমার চারিপাশে
আরেক পৃথিবী দেখি প্রতিদিন সম্মোহিত মনে!

পরিপূর্ণ সে পৃথিবী, বুকে তার সহজ কুটির;
আঙিনায় খেলা করে ভাইবোন অবোধ উল্লাসে—
ফুল ফোটে, ফল ধরে, শিশিরের মুক্তা ঝরে ঘাসে,
সবুজের নম্রলাজে জীবনের প্রসন্ন আবীর!

সুস্থ, সুখী দম্পতীর মুগ্ধমন নিত্যের বাণীর
বেজে ওঠে; মাঠে ঢালে মাতৃস্নেহ, ফুলে আনে রঙ,
ভুট্টাক্ষেত, কপিস্তূটি, কচি ধান, অনুঝ পালঙ
তাদেরই প্রেমের ছবি। শিশু হাসে সবুজে সোনায়!

আমরা পাইনে কেন আনন্দ এবং এভাবেই
জীবনে সহজ প্রেম? উপকরণের এই ভিড়ে
আমাদের শান্তি নেই জীবনকে দেখে চিরে চিরে;
অথচ এখানে শান্তি, আনন্দের পৃথিবী পাশেই!

স্মৃতি-গন্ধী

বাসন্তি সেন

মনে কর তুমি আছ,
আমি শুধু নেই
তা হলে কী হবে।

তখনো তো রবে
আকাশের এই নীল,
আশ্বিনের উজ্জ্বল প্রভাত,
আর রাত
আশ্চর্য্য নক্ষত্র ভরা।

তখনো আসবে
শ্রাবণের কান্না-গলা
অশ্রু ভেজা সুর
পার হয়ে মেঘের রোদ্দুর
এমনি তোমার মনে।

আর অকারণে
এমনি ফাল্গুন
পলাশের বনে বনে
আনমনে জ্বেলে দেবে
রঙের আগুন।

তা হলে কী হবে
আমি আর থাকবো না,
এত ফুল, এত গান
অফুরান এরা সব রবে।

আমি থাকবো না,
আমার এই কথাগুলো
মরে যাবে,
হাসিটুকু ফলবে না,
চলবে না
ভাবনার সোনালী সুতোয়
সারাদিন জাল-বোনা।

আর যদি
আমার এই কথাগুলো বাঁচে,
মন খানি থাকে
গান হয়ে,
ফুল হয়ে
ফোটে নিরবধি
এখানে কোথাও;

তা হলে কী হবে,
আমি নেই
তবু তারা রবে
হয়তো এখানে,
হয়তো তোমার মনে,
একটি অশ্রুত গান
কান্নার হাওয়ায় যাবে ভেসে,
ফুটবে সেখানে
স্মৃতি-গন্ধী একটি কুসুম।

তুমি

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

তুমিই যেন ভুবন জ্বালো, তুমিই আকাশে
তারার ছাঁদে কবিতা লেখ, তুমিই বাতাসে
ভাসাও তরী উজান স্রোতে, তুমিই জীবনে
বাজাও সুর, মিলাও কথা তুমিই স্বপনে

আমি তা' জানি, তুমি তা' জেনেই
তুমিই দিলে টঙ্কার,
নদীর স্রোতে ভাসল তরী
ঢেউয়ের গুরু ঝঙ্কার
ফেনিল হাতে উঠল বেজে ;
তোমারি চোখ স্থলল
নদীর জলে তারই শিখা
আমারি চোখে কাঁপল ;

তুমি তা জানো, আমি এ জেনেই
দিলাম তরী ভাসিয়ে,
জীবন-স্রোতে ভাসল তরী
প্রাণের গুরু টঙ্কার
আমার বুকে বাজল এবার,
তোমারি মুখ হাসল
জীবন-চোখে তারই মায়া
আমারি চোখে নাচল !

তুমিই তাই ভুবন জ্বালো, তুমিই ভুবনে
কথার ফুলে সাজাও মালা, তুমিই আকাশে
চাঁদের হাসি ছড়িয়ে দাও, তুমিই জানি সে
জাগিয়ে দিলে তোমারি স্মৃতি, আমারি স্মৃতিকে !

তখনও জেগে আছি

অরুণিমা পাল

মায়ামায়া, এ শহরে—
আমি—আদিম অসভ্য এক গুহামানব।
রঙীন, রসাল বিজ্ঞাপনে
সভ্যতার লেবেল-আঁটা মিথ্যার পসরা নিয়ে
ফেরি করা জীবনে বেচা-কিনি দিন-রাত,
রাজপথে পথে।

ট্রামের চাকায় চাকায় সন্ধ্যা ঘনায়
কতুহারা এই প্রাসাদ পুরীতে :
মদের উচ্ছলতায়—
অগণিত অসংবৃতার হাসির প্রলাপ
নেশা ধরায়—রোঁয়া ওঠা
এ নগর-জীবনে।

অবশেষে রাত্রি আসে ভালুকের থাবায়—
দগ্‌দগে ঘায় শান্তির প্রলেপ।

তারপর—
চলমান জনস্রোতে ভাটা পড়ে :
রাত্রি বাড়ে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়।
সৃষ্টির উত্তেজনা ফুটপাতে রোমাঞ্চ জাগায়—
জাতি নেই—শ্রেণী নেই,
গৃহ নেই—আছে শুধু
সামাজিত কংক্রিট-মোড়া এ ফুটপাত,
মানব সভ্যতার সদম্ভ ইংগিত।

কানীন সন্তানের শেষ-নিঃশ্বাসে
হাফ ছেড়ে বাঁচে নিওন-জ্বালা রাত্রি।

ঘুণ-ধরা যৌবন—পালিশে রঙীন
রমণীর রমা দেহে জীবনের উত্তাপ-সন্ধানী পুরুষ,
শকুনী দৃষ্টি নিয়ে তখনও প্রহর গোনে।
হুইস্কি. শ্যাম্পেন—আর
বারবনিতায় শান্তি খোঁজে
নৈশ ক্লাব।

তখনও আমি জেগে আছি—
আদিম অসভ্য এক গুহামানব।

জীব জন্তুর দেশে

[প্রথম পর্ব]

মিনতি সেন ও অশোক সেন

[চিতার একটা জাতের হিন্দি নাম লাগর ; সিংহকেও শের বলা হল। হরিণ জাতের এক জন হল সাঙনাই—আর একজন গাজেলস এন্টিলোপ। তাছাড়া আর দেখা দিয়েছে সাপনাল আর লালসিড়া ; একই হাঁস বাংলা আর হিন্দিতে দুটো নাম। দেওহাস, তিতর তিতালি, হুদনাও এসবই ঝোপ-ঝাড় জঙ্গলের পাখী। মানুষের বেহিসেবী শিকারের ফলে, বন কাটার জন্যও, এই সব জীব-জন্তুগুলি ভারতবর্ষ থেকে শেষ হতে চলেছে। ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব সমীক্ষার প্রধান শ্রীযুক্ত এম, এন, দত্ত মূলগত শিক্ষা সেমিনার চালাবার সময় অন্যতম আহ্বায়করূপে কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, গ্রন্থাগার কর্মী, সংগঠক, সমাজ শিক্ষকদের নিয়ে "প্রকৃতি বীক্ষণ" এর সেমিনার পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর শিক্ষায় এই সত্য আশ্রয়ী কাহিনী রচনা সম্ভব হয়েছে। কিশোর প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের জন্য এটির কাহিনীরূপ দেওয়া হল।]

বাবাকে টুনুর মোটেই পছন্দ নয়। সারাদিনে বাবার দেখাই মেলে না। যদিও বা মেলে কোন দিন সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যায় না বাবা। কুপিও বেড়াতে যায় না টুনুকে নিয়ে। ডোডোও যায় না। কিন্তু ডোডো কোলে তুলে বলে টুনু তোমার নাম কি ?

তারপর খেতেও দেয় কড়াইশুটি ; কিম্বা চিনা বাদাম। কোন কোন দিন বাঙ্গা কলাও এনে দেয়।

আর কুপি ? মাসের প্রথম দিকে বড় ডল তো কুপিই এনে : বিস্কুট একটিন তো প্রত্যেক শনিবার দিন বাবুল, পিন্টু, স্কুলে গেলে টুনুর হাতে কুপিই এনে দেয়।

তাই বাবাকে টুনির মোটেও পছন্দ নয়।

এমনি ভাবে চলছিল। হঠাৎ টুনু মাঝ রাত্তিরে একদিন উঠে বসল। বলল : বাবা কই ? বাবার কাছে যাব।

মা টেনে শোয়ায় ওকে। বলে, পিঠ থাবরে চাপরে, ঘুমো ঘুমো।

টুনু ঘুমোয় না। চুপ করে চেয়ে থাকে। তারপর বড় বড় চোখের কোঁটা গড়িয়ে পড়ে।

মার গলা জড়িয়ে ধরে টুনু। ডুকরে কেঁদে বলে : বাবার কাছে যাব।

বাবাও তখন মাটির গড়ে ঘুমের ঘোরে টুনুর স্বপ্ন দেখছেন। সারাটা দিন কেটেছে গড়ের হাজারটা ঘর ঘুরে দেখতে।

ঘরের পরে ঘর। প্রত্যেক ঘরে অনেকগুলো দরজা। ডান দিকে, বাঁ দিকে, সামনের দিকে, পিছন দিকে—সব দিকে দরজা। যে কোন দরজা খুলে যাওয়া যায় আর এক ঘর। সে ঘরেও এমন সব দিকে দরজা।

টুসুর বাবা টুসুর মতই ঘুরছিলেন সেই সব ঘরে। কোন ঘরে ঢুকতেই দেখেন ফণা বাগানো এক বড় মস্ত সাপ ঝুলে আছে ঘরের কোণার একটা কড়ি জড়িয়ে ঘরে। চট্ করে পিছিয়ে যাবেন—হাতের ধাক্কায় আর একটা দরজার হাতল পেয়ে যান। দরজাটাও খুলে যায় হাতের টানে। পাশে দেখা যায় আর একটা ঘর। টুসুর বাবা সে ঘরে ঢুকে পড়েও বেজায় বিপদে পড়েন। দরজার পাড়ায় পিঠের শির দাঁড়া তুলে দাড়িয়ে আছে সেই টুসুর পড়ার বইয়ের মত ?

এক ছিল ইয়া কেঁদো বাঘ
গায়ে তার কালো কালো দাগ।

দুটো দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে টুসুর বাবা জড়োসড় হবার উপক্রম। তখন ফুরুৎ করে নামলো একটা পাখী। তারপরে আর একটা। তারপর আরও একটা, দুটা, তিনটা। কোনটার গোলাপী মাথা—দেখতে হাঁসের মত। ঠোঁট, মাথা, আর গলা গোলাপী লাল ; চিবুকের ধার দিয়ে গলার নলী পর্যন্ত একটা কালো বাদামী রঙের আচড়। তাতে লাল রঙ যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। চক্‌চকে গা—উপর দিকটা ঘন চকলেট রঙের ; নীচের দিকটা একটু ফিকে। পা আর পায়ের পাতা লাল-কালো মেশানো রঙের।

টুসুর বাবার পাশ দিয়ে সোজা উঠে দাঁড়ালো বাঘটার পিঠে। বাঘটার দিকে টুসুর বাবা একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন। বাবার গঠনটা নজরে পড়ে গেল। বাঘনখ ঢাকার কোন ব্যবস্থা নেই ; পা গুলো বেশ লম্বা। মাথাটা গোলাকার। একটু ছোট। লম্বায় প্রায় চার ফুট। তার পরে লেজ—তাও দু'ফুটের চেয়ে বেশি লম্বা।

গোলাপী হাঁসটাকে দেখে বাঘটা বলে উঠল : ঘরের মধ্যে বলে পার পেয়ে গেলে। তা না হলে দেখিয়ে দিতাম ?

গোলাপী মাথা হাঁস ওর কথাটাকে আমলই দিলে না। তার তখন চোখ পড়েছে তারই সমান যে হাঁসটা ঘরে এসে ঢুকলো তার দিকে।

দেখবার বস্তু আর পেল না ? কেমন অগোছালো চেহারা ; মোটেও চকচকে ঝকঝকে নয়। কালচে বাদামী রঙের আচড়টা নেই।

তবু গোলাপী মাথা হাঁস মিষ্টি করে ডাকলো : সাপনাল ও সাপনাল রাণী। গলার সুরটা যেন বাঙ্গালীর মত নয়। আরো মিঠা সুরে জবাব এলো : ক্যা বোলিস, লাল সিড়া ?

টুসুর বাবা তো হতভম্ব। বাংলায় যে কথা বলছে তার গলা বিহারী ভদ্রলোকের মত। আর হিন্দিতে যে জবাব দিলে তার গলা বাঙ্গালী মহিলার। টুসু বড় হলে যেমন ভাবে কথা কইবে প্রায় তেমন বলে মনে হল টুসুর বাবার।

গোলাপী মাথা হাঁস বল্‌লে : চলো উড়ি। তার সাথী জবাব দিলে : এখনই যাবে।

গোলাপী হাঁস বলে : সেই কোন পাকিস্তান থেকে হিমালয় পার হয়ে, উত্তর প্রদেশে এসে থামলাম। তার পরে আবার ডানায় জোর দিলাম সোজা বিহার, বাঙ্গলা পার হয়ে এসে পৌঁছলাম আসামে। তোমাকে সঙ্গী করে নেওয়ার জন্য। আর তুমি বলছ এখনই যাবে ?

সাথী চুপচাপ একটা ছোট গাছের শাস চিবুচ্ছিল। জবাব দিলে না।

গোলাপী হাঁস বল্লে : জানো, আমি আমার দেশ—বিহারের মাটি একবার ছুঁয়ে পর্যন্ত আসিনি—মার কাছে পৌঁছতে দেরী হয়ে যাবে বলে।

সাপনাল রাণী আর কি করে ? লালসিড়ার সঙ্গে চলল। সামনে ছিল একটা বড় আয়না। লালসিড়া আয়নায় মুখটা দেখে নিল। আয়নায় দেখা মুখটায় হাসি হাসি ভাব। ঝুঁটির পালকের গুচ্ছ যেন হঠাৎ ঘন গোলাপী রঙের হয়ে উঠেছে।

সাপনাল এতক্ষণে বল্লে : তুমি কি সুন্দর !

লালসিড়া হেসে ফেললে। বল্লে : সে তো সাপনালের দেখা মিলেছে বলে।

চিতা বাঘটা রাগে গড় গড় করছিল। এতদূর স্পর্দ্ধা। বেড়াল যেমন করে শিকার ধরে তেমনি করে—ওদের পেছন পেছন হাঁটতে লাগল তাক করে করে। বাইরে খোলা জায়গায় পড়তেই তাড়া করে এল শিকারী কুকুরের মত লালসিড়া আর সাপনালের দিকে। সে কি জোরেই না এলো ! আধ মাইল রাস্তা পার হল বিশ সেকেণ্ডের মধ্যে ; প্রায় ধরে ফেলে গোলাপী হাঁসকে।

লালসিড়া ব্যাপারটা ততক্ষণে টের পেয়েছে। হেসে চিতাকে বললে : লাগর, নেই আমাদের ধরার।

তারপর সাপনালকে ঠেলে আকাশে তুললো। ডানায় জোর লাগাল। ডানায় জোর আছে। আকাশে যখন উঠলো ওদের ওড়া দেখে লাগর তাজ্জব। হিমালয় পার হয়ে যে এসেছে কি !

সেই আকাশ থেকেই সাপনাল কাকে যেন ডেকে বললে : দেও হাঁস দাদা, আমি তো দিল্লী পার হয়ে লাহোর চললাম তোমাদের জামাইর সঙ্গে। তুমি একটু দেখে আমার মাকে খবরটা দিও।

লাগর এসে ততক্ষণে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে দেওহাঁসের সামনে। ইচ্ছা একে সাবাড় করে। কিন্তু লালসিড়া আর সাপনালের ওড়ার বহর দেখে কেমন যেন দিশাহারা হয়ে গেছে-ও।

তাকিয়ে থাকে সাদা ডানা দেওহাঁসের দিকে। লম্বায় লালসিড়ার দু গুণ একটু ভঙলা ভঙলা চেহারা। মাথা আর গলার ওপর দিকটা সাদা। গল নালীর ধারটায় কালো ঝুঁটকি দেওয়া। সারা গায়ে চকচকে কালো রঙের আছে ; বাকী জায়গাটা লালচে বাদামী রঙের।

লাগরের সামনে থাকতে দেওহাঁসের যে বেশী ইচ্ছা তা মনে করা ঠিক হবে না। অনেকক্ষণ একা একা ঘুরে বেড়িয়েছে বন জঙ্গল আর জলাভূমিতে। কালো রঙের ঠোঁটে ঠুকরে খেয়েছে ছোট গাছপালা আর ছোট জীব।

লাগরকে পেছনে ফেলে দেওহাঁস চললো। পিঠ এবং পিছন দিকটা জলপাই রঙের। লেজটা কালো। নীচু দিকটাও ওর কালো।

দেওহাঁসের ইচ্ছা ছিল সাপনাল আরো কিছুদিন আসামে থাকে। কিন্তু তা ত হবার নয়। পাঞ্জাব থেকে আসাম পর্যন্ত হিমালয়ের নীচের দিকের প্রান্তরের সবটাই তো ওদের চড়ে বেড়ানোর জায়গা। এর ভেতর কোথায় কোন জঙ্গলে ওদের মন বসবে কে জানে! একটু লুকিয়ে থাকতেই যেন ওরা চায়। কতদিন বাদে সাপনালের সঙ্গে দেখা হল। তাও তো দেওহাঁস দেখা পেল। অনেকে তো ওর নামই শুনেছে কোনদিন দেখা পায়নি।

ভাবতে ভাবতে দেওহাঁস একটু বেহুঁস মত হয়ে পড়েছিল। ঠিক বেহুঁস নয়, বিভোর। করে ভাবতে ভাবতে পিন্টু সেদিন সাইকেল চাপা পড়েছিল তেমন অনেকটা।

যাই হোক হুঁস হল যখন দেখলো ছোট-খাট্ট তিতর বেচারাদের ওপর লাগর মশাইর নজর পড়েছে।

তিতরদের দেখেই দেওহাঁস চিনতে পেরেছিল। সাপনাল তো এদের গল্প করছিল সেদিন। মুসৌরী না নৈনিতাল কোথায় জানি এদের আস্তানা।

লেজে দশটা পালক। সারা গায়ে ঘন কালচে জলপাই রঙ। ডানা দুটি একটু বেশী বাদামী রঙের। লেজের তলার ঝুঁটি কালো রঙের। তাতে আবার সাদা ডোড়া কাটা রয়েছে।

দেওহাঁস আসামী ভাষায় হাঁক দিলে: 'তিতর, ও, পাহাড়ী তিতর, এফালে আহ।'

পাঁচ-ছটি তিতরের ঝাঁকটি ঘাসের বীজ খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। শীস দেবার মত করে জবাব দিলে: কি ব্যাপার, এত তাড়া কিসের।

দেওহাঁসের মাথায় তো রক্ত চড়ে নেহাৎ সাপনালের পরিচিত তাই কিছু মুখ খারাপ না হলে বলত:

পণ্ডিতে ইঙ্গিতে বোঝে, মূর্খে বোঝে কইলে
ঘোড়াতে গাধাতে বোঝে পিঠে চাবুক পড়লে।

তিতরের মাথা আর গলায় নানা রঙের সমারোহ। মাথার ঝুঁটি ধূসর বাদামী, মাঝে কালো। কালো ডোড়া কাটা দাগ। কপাল আর কয়েকটি উজ্জ্বল সাদা; চিবুক, গলা, মুখের ধারগুলি, চোখের পাতা কালো রঙের। গাল, কানের পাতার নীচু দিকটা সাদা। চোখের সামনে এবং পিছন দিকে একটা সাদা ফুঁটকিও আছে। ঠোঁট, পা এবং পায়ের পাতা লাল।

সৌখীন পাখীগুলোকে দেখে জঙলা সাদা হাঁস দেওহাঁসের রাগও হয়; মায়াও লাগে।

তিতররা ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে লাগরের মতলব। দেওহাঁসকে বলে: প্রণাম নাও, সাপনালের বন্ধু।

ঃ এদিকে এসো।

তারপর উড়তে লাগল।

লাগর ততক্ষণে লম্বা ঘাসের ঝোপ ঝোপ জঙ্গলে এসে দাঁড়িয়েছে।

বেচারা লাগর!

ভিতর আর ভিতর গিন্নী এতক্ষণ ধরে শীস্ দিচ্ছিল আর ঘাসের বীজ খুঁটে খাচ্ছিল। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল গিন্নী ভিতরকে। গায়ের রঙ একেবারে অন্য ধরণের। ঝুঁটিতে কোন রকম ডোরা কাটা দাগ নেই। গলায় আছে ডোরা ডোরা। ঝুঁটির দু-পাশে একটি কালো রেখা, চোখের তলায় কালোর ঝুঁটকি।

লাগর অনেকক্ষণ এদের তাক্ করছিল। বেশ নিশ্চিতই ছিল সে। কেমন মন্থর গতি। ডানা মেলে ওড়ার জন্যই নয়। ওড়ার রকম দেখে বেশ বোঝা গেল তাড়া না খেলে এরা ওড়ার পাত্রই নয়।

কিন্তু বাবার ও বাবা আছে। খোলা প্রান্তরে এসেই তা বোঝা গেল।

চেহারাটা চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। তবু ভুল হচ্ছিল এজন্য যে আফ্রিকার তিনিই যে এখানে শের বাহাদুর তা লাগর ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি।

কেশর আর সারা গায়ের লোম অনেক কম। কিন্তু শেরের সারা গায়ে একটা লোমশ আবরণ। লেজের ঝুঁটিতে, কনুইয়ের গোড়ায় এবং পেটের ওপরে ঘন পুষ্ট লোম। সঙ্গে তার যে ছোট্ট বাচ্চা আছে তার একটার গায়ে বুটি বুটি, বাকী চারটার গায়ে ডোরা কাটা।

লাগরের মনে পড়ে গেল তার কাকা মশাই বলেছিলেন আগে ভারতবর্ষের সারা উত্তর দিকটাতে আর মধ্য ভারতে নর্মদা অঞ্চল পর্যন্ত এদের বসবাস ছিল। এখন নাকি কাথিয়াবার দেশে ঘোর বনে এদের আস্তানা।

লম্বা সাড়ে ন-ফুট চেহারাটা টান করে লাগরকে যখন শের ধমক লাগালে তখন টুসুর বাবার দারুন হাসি পাচ্ছিল। সেই যে বাবলুর স্কুলে কি কবিতাটা বলেছিল দীপংকর:

কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে
ভাই বলে যদি ডাকো দেব গলা টিপে
হেন কালে আকাশেতে উঠিলেন চাঁদ।
কেরোসিন শিখা বলে এসো মোর দাদা।

লাগর টুসুর বাবাকে যে কি বিপদে ফেলেছিল মাটির গড়ে!

তারপর যাকে পেয়েছে সবাইকে চোট পাট। এখন শেরকে দেখে একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে বলে: সিংহ মামা নোমাই মাথা।

শেরের একটা গাম্ভীর্য আছে। প্রণাম পেয়ে আশ্বাস দিয়ে বলে: চাগাও মাথা ভাগনে চিতা।

লাগরটা কম সেয়ানা নয়। মামার সঙ্গে সে কিছুকাল আফ্রিকায় ছিল তার প্রমাণটা দিতে হবে ভেবে বলে বসলে:

আফ্রিকায় সিংহ শুনি, হয় অতিকায়
ভারতভূমে তাদের।

শেরের মেজাজটা বোধ হয় ভালই ছিল। তাই গম্ভীর ভাবে জবাবটা পেলে :

ওহে আমার দেশ হল আফ্রিকা-এশিয়া। মাঝখানে পারস্য, মেসোপটেমিয়া সবই আমার দেশ। এইটে ভাষায় তোমায় দুটো উপদেশ দিচ্ছি। মনে রাখলে কাজে লাগবে।

লাগর আমতা আমতা করে বললে : আজ্ঞে তা তো বটেই। মনে রাখব তো নিশ্চয়। তবে কিনা দেখুন আফ্রিকায় দেখেছি সাড়ে দশ ফুট শের—আপনার চেয়ে এক ফুট লম্বা তাই আমি ওকথাটা বলেছিলাম।

শেরের ছেলে জবাবটা দিলে : লাগর দাদা ও হল অঙ্কের হিসাবে। সাধারণতঃ দুদেশেই ৯ ফুটের চেয়ে আমরা সামান্য বেশী লম্বা।

শের বললে : বাছারা এবার বাড়ী চল।

এর পরে লাগরের বোধ হয় বলার মত কথা থাকতে পারে না।

অনেকক্ষণ কোথাও কোন আওয়াজ নেই। লাগর ফিরে গেছে তার পাথুরে বন্ধুর অঞ্চলে। লাগর আগে অবশ্য একবার ছোট একটা হাঁক দিয়ে বলে গেছে : গাজেলস এন্টিলোপ পেলে আমি ছাড়বোনা।

কাকে বলে গেছে সে জানেনা। হয়তো নিজেকেই বলে গেছে, কারণ শেরের মুখে মুখে এক আধটু হুঙ্কার করলেও মনে মনে বেজায় কাবু হয়েছিল বলেই সে ভিতরদের ছেড়ে দিয়েছিল।

হঠাৎ মিষ্টি সাদামাটা ঝাল্কা সুরে কে বলে উঠলো :

আমি সবুজ বনের তিতির
গাছের মাথায় ফুলের মিছিল।

লাজুক আর চঞ্চল পাখীটিকে ঝোঁপ ঝাড়ের আড়াল থেকে একবার দেখা গেল। চেনা খুব সহজ। ছোট্ট, সোজা, টানা মোটা ঠোঁট। বুকে টানা টানা দাগ। পালকের ওপর দিকটা বাদামী রঙের ; বুকের পিছনে নীচু দিকটা সাদা রঙের। কপাল, কয়োটি, চিবুক গলা, চোখের ছিটে দাগ সাদা বা আবছা ছাই রঙের—তলায় একটা সাদা দাগ।

হুকুক হুকুক। দূরে একটা ডাক উঠলো। তাড়াতাড়ি তিতলি ঝোঁপের ভেতর গিয়ে ঢুকলো।

হুকুক হুকুক বলে যে ডাকটা দূরে শোনা যাচ্ছিল কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল সেই ডাকটা জোরালো হয়ে উঠেছে। ঝোপ ঝাপের এপাশে খোলামেলা সমতল যে জায়গাটি ছিল সেখানে ত্রিশটা পাখী এসে নামলো। নেমে সে কি কলরব। আর দানা খুঁটে, পোকা মাকড় খেটে, মাকড়সা, চেপ্টে সে এক একাকার কাণ্ড।

ওরা নাকি কোথায় চাষ দেখতে গিয়েছিল মানুষদের রাজ্যে। সেখান থেকে গোটা কতক টিকটিকিও ধরে এনেছিল। সেগুলি খেতে নাকি তেমন ভালো লাগেনি। এসব কথাও নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল।

হ্যাক হ্যাক করে দলের সর্দ্দার ধমক দিলে। বললে—দেখো, মেলা গোলমাল করোনা। বাংলা আর আসাম ছাড়া সব দেশে আমাদের বাসা। চাষবাসের ক্ষেত ছাড়া তুমি সমতল জায়গা পাচ্ছ কোথায়। আর মানুষ তো এখন সব জায়গায় চাষ লাগাবে ঠিক করেছে। ওদের খাবার দাবার কম পড়ে গেছে।

সর্দ্দারের ধমকে সবাই চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। তাই জবাব দেবার কথা কারুর মনে এলো না।

এতক্ষণে তিতলি পরিস্কার দেখে নিয়েছে এরা কারা। তিতলির যে দাদা বিহারে আছে আদতা উটা নামে সে বলেছিল এদের বলে তুগদার। কেউ কেউ বলে হুপনা।

এরা জাতটা উঁচু। লম্বায় তিতলির মাত্র চারগুণ বটে কিন্তু চার ফুট লম্বা এই পাখী উটপাখীর জাতের। অন্ততঃ চেহারা দেখে তাই তো মনে হয়।

সাধারণ ঘন ধূসর রঙ। বুকের নীচ দিকে সূক্ষ্ম কালো দাগ। মাথার ঝুঁটিতে কালো আর গলাটা সাদা।

সর্দ্দারের কথাটার জবাব তিতলি দিলে :

চিনি খান যিনি
তার চিনি যোগান চিন্তামণি

সর্দ্দার গিন্নী ছোট খাট্টু। সর্দ্দারের অর্দ্ধাঙ্গিনী ঠিক তার অর্দ্ধেক লম্বা নয়। প্রায় তিন ফুটের তিনি এতক্ষণ ঝোপের পাশে একটু মাটি খুঁড়ে ডিম পাড়ছিলেন। ডিম মোটে একটি পাড়েন কাজটি সেরে কর্ত্তাকে টিপ্পনী কাটলেন :

ওস্তাদ তুগদার, সর্দ্দার হুপনা।
তিতলির কথা শুনে চুপ করে রওনা॥

সর্দ্দার চুপ। মুখে রা নেই।

তাই দেখে তার দলের ত্রিশটি পাখী এক সুরে মাওয়াজ তুললো :

হুকুক। হুকুক।

সর্দ্দারও গলা মেলালো : হুকুক, হুকুক॥

তিতলির কেমন যে লজ্জা করতে লাগল। কর্ত্তাকে বললে : ওগো একবার বলে এসো। যাট হয়েছে।

কর্ত্তা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বললে : দোষ নিওনা সর্দ্দার।

সর্দ্দার আনন্দের হাসি হেসে বললে :

তিতলি আমার মেয়ে
তার কথার দোষ নেই, শোনাও তাকে গিয়ে।

সর্দ্দার গিন্নী সর্দ্দারকে সামলে বললে : সুন্দরে মেয়ে ঠিক করেছে, শোনাও তাকে গিয়ে।

তিতলিকর্ত্তা ঝোপে ফিরলো। সর্দার আর সর্দার গিন্নী তাকিয়ে রইল ছোট তিতলি কর্ত্তার দিকে।

সর্দার বল্লে, গিন্নী জানো ওরা একসঙ্গে দুটো ডিম পাড়ে। আমাদের মত একটা নয়।

গিন্নী বল্লে : আমার তাতে দুঃখ নেই।

কথাটা তিতলি বউর কানে গেল। জবাব দেওয়াটা ভাল নয়। বিশেষ করে গিন্নী ওকে দুবারেই সমর্থন করেছে। তাই একবার সর্দার গিন্নীর পাশ দিয়ে বিনীতভাবে চলে গেল।

সর্দার আর সর্দার গিন্নী তাদের এই নতুন মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। আস্তে আস্তে চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল তিতলী হালকা হলদে রঙের ঠোঁটটি, হলদে সাদায় মেশানো রঙের পা, লাল রঙের পায়ের পাতা।

টুসুর বাবার মনে হল আলতা পরা পায়ে তাঁর টুসু মা বুঝি সেখান দিয়ে হেঁটে গেল।

কথায় বলে শুয়োরের স্বভাব। সান বেনেলের দল এসে যেন লণ্ডভণ্ড করে দিল ঘাসের জঙ্গলটা। রাত্রির আবছা অন্ধকারে দলল বেঁধে কুড়িটি প্রাণী যখন ঢুকছিলো, তিতির গিন্নী বুঝতে পারেনি এরা কারা!

কিন্তু ঘোৎ ঘোৎ করে প্রমাণ করে দিলে যে তারা ক্ষুদে হলেও শুয়ার বটে। লম্বায় ২ ফুট, উঁচুতে ৩ ফুট অনেকটা সাধারণ শুয়োরের বাচ্চার মত গড়ন। পিঠের ওপর দাগটা নেই। কান দুটি ছোট লেজটা খুব ছোট। তিনজোড়া স্তন আছে মেয়েদের।

তিতর গিন্নীর একটু আধটু নেপালী ভাষা জানা ছিল। কর্তাকে তার প্রমাণটি দেবার ইচ্ছা অনেকদিন ধরেই ছিল। সুযোগটা সে নিল। বসে বলল :

কুকুর কো পুচ্ছর
বার বর্ষ ডুঙরোমা রাখেপনি
বাঙ্গো কো বাঙ্গোই হুনছো। ক

সান বেনেলরা বললে : তুমি কে হে বট ?

জবাবটা দিলে লাগর। বলে : যে যেখানে আছে দাঁড়াও। একটু নজর দিয়ে দেখব। তারপর ছেড়ে দেব।

সান বেনেলরা বুদ্ধিটা একটু মোটা। সোজা দৌড় দিলে ওরা পালাতে পারতো।

তা না করে বুদ্ধি জোগাতে গেল লাগরকে। বললে : পেছনেই তো তোমার রসদ আছে। মণিপুর থেকে কাল এসে পৌঁছেছে সাঙনাই।

লাগর জানতোনা যে সাঙনাইর ছাটার সময় মাটি আঁকড়ে ধরার দক্ষতা ভূমিতেও এ ক্ষমতা তার কাজে লাগে।

ক কুকুরের মত
বার বর্ষ নলে রাখিলেও
বাঁকা যেমন তেমন বাঁকাই রবে।
অনেকটা আমাদের "কয়লা যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে"-র মত।

তাই গাঁক গাঁক করতে করতে যখন সাঙনাইর কাছে পৌঁছে যাবে তখন তার বুকের গোল নক্সা কাটা সিঙের খাড়ালে চাঁদ উঠলো। আর সেই আলোয় দেখা নীচে পাঁশুটে রঙের পুষ্টি সিঙগুলো হরিণটির পাশেই বড় একটা গলা রয়েছে—যার পাশ থেকে অনবরত মাটি ভেঙে পড়ছে।

গলাটা ও মস্ত। ওপরে জল—তার নীচে—তিন চার হাত নীচে ওপর থেকে দেখে তাই মনে হয়। কিন্তু সেই মাটির ওপরে কোন জিনিস ফেলে দিলে আস্তে আস্তে নেমে মাটির নীচে মিলিয়ে যায়।

মানুষরা এখানে ধান চাষ করতে এসে নৌকা বেয়ে হাঁড় ভর্তি পাকা ধান থেকে ধান ছিটোয়। ধান গাছ হয়—বড় হয়। সেগুলি কাটে তেমনি নৌকা বেয়ে। দু'একজন মানুষ সেবেয়ালে ভয়ে গলায় পড়েছিল। তাদের কেউ তুলতে পারেনি। মাটির মত কাদার আস্তরণ কখন কিভাবে করে দিয়েছে তা কেউ ধরতে পারেনি। হরিণ হাত পা নাড়া শুরু করে খোঁচাখুঁচি করে গলার নাগাল পাওয়া যায়নি। সবটাই থকথকে কাদা।

লাগর এটাও জা

তাই থামিন সাঙনাইকে তাড়া করে একটা অতি নড়বড়ে জায়গায় সে এসে যখন আর ভাল সামলানো সম্ভব হল না লাগরের। তার দেহটা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ল ওপর থেকে ছেড়ে পড়ার জন্য তিন চার হাত নীচে যখন সে নামল তখন আর তার ওঠা সম্ভব হল না

ওপরে তখন সাঙনাইর সিঙের নক্সার খাড়ালে পূর্ণিমার চাঁদ মিষ্টি করে হেসে উঠেছে।

রহস্য উপন্যাস

শেঠজীর রত্নমুকুট

বিশ্বনবিহারী রায় ও কানাই রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এখানে আমি এই বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক রত্ন-মুকুটের ইতিহাসটুকু বলে রাখি। যদিও বিধুবাবু তাঁর মন্তব্যের রায় প্রকাশ করলেন না, কিন্তু আমাদের বুঝতে বাকি রইলো না। কারণ বিখ্যাত ধনী ও ব্যবসায়ী দিল্লীর শেঠ বংশের রত্ন মুকুটের ইতিহাস ইতিপূর্বেই আমরা শুনে ছিলুম এবং আরো অনেকেই জানেন শেঠজীর এক পূর্ব পুরুষ শেঠ মনোহর লাল, দিল্লীতে মোগল সম্রাটদের রাজত্বকালে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যখন মোগল সম্রাট বাবর করে লাক্ষিপাতো অভিযান করেন, সে সময়ে তিনি সবচেয়ে বেশী বাধা পান বিরাট নগরের রাজা বিক্রম সিংহের কাছে। শেষ পর্যন্ত বহু চেষ্টায় ও প্রচুর সৈন্যক্ষয় করে অবশ্য মোগল সম্রাট জয়ী হয়েছিলেন এবং রাজ্য দখল করেছিলেন। সে তুমুল ও বহুকাল ব্যাপী যুদ্ধে রাজা বিক্রম ও রাজবংশের প্রায় সকলেই নিহত বা বন্দী হয়। তারপর উন্মত্ত সৈন্যেরা বিরাট নগরে লুটপাট শুরু করে, রাজকোষও বাদ যায়নি। ভাগ্যচক্রের অদ্ভুত বিবর্তনে এক সাধারণ সৈনিকের হাতে এই অমূল্য রত্ন মুকুট এসে পড়ে। এর মূল্য সম্বন্ধে তার কিছুই জ্ঞান ছিলো না, দিল্লীতে ফিরে এসে সে এটি এক রত্ন ব্যবসায়ীর কাছে সামান্য দামে বিক্রয় করে। এই রত্ন ব্যবসায়ীর সঙ্গে শেঠ মনোহর লালের পরিচয় ছিল, সেই সূত্রে ব্যবসায়ী এই মুকুট মনোহর লালকে বিক্রয় করে, অবশ্য বেশ মোটা টাকার অঙ্কে, কারণ সে নিজে মুকুটটি বেশীদিন নিজের কাছে রাখতে ভয় পাচ্ছিল। সেই সময় থেকে শেঠজীর বংশে এই মুকুট আছে, এবং কদাচ কখনো এটি বার করা হতো, পরতে গেলে এটি ব্যবহারের জন্য রাখা হয়নি, শুধু একটা মহামূল্য ঐতিহাসিক জিনিষ বলে কখনো কখনো উৎসবাদিতে বার করা হতো। এই হলো রত্ন মুকুটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

(৩)

বিধুবাবু তারপর বলতে লাগলেন, এবারে অজয় বাবু আমার বাড়ীর লোকজনের কথা বলবো, নাহলে পরিস্থিতি ঠিক আপনি বুঝতে পারবেন না। আমার চাকর বাকর লোকজনের কথা আগে বলি। আমার গাড়ী ঘোড়া আছে, তার কোচম্যান সইস বাড়ীর বাইরে আস্তাবল-সংলগ্ন আলাদা ঘরে থাকে, তাদের কথা বাদ দেওয়া যেতে পারে। বাড়ীতে দুটি ঝি রাতদিন থাকে, তারা বহুদিনের পুরানো এবং বিশ্বাসী লোক, তাদের ওপর সন্দেহের কোন কারণ নেই। তবে সম্প্রতি আর একটি ঝি বহাল হয়েছে, একটু বয়স অল্প, সেজন্য শুনি যে বাইরের লোক তার পিছনে একটু ঘুরঘুর করে, কিন্তু মেয়েটা সৎ বলেই আমাদের বিশ্বাস। তার ওপরেও কোন সন্দেহ করবার যুক্তিসঙ্গত কারণ পাই নি। এই গেল লোকজনের কথা। আমার পরিবারের বিষয়ে দু'কথায় বলা চলে, আমি বিপত্নীক এবং আমার একটি মাত্র ছেলে, রবেন ছেলেটি, অজয় বাবু, আপনাকে কি বলবো, আমার গভীর দুঃখ ও হতাশার কারণ হয়েছে। হয়তো সেটা আমারই দোষ। লোকে আমাকে বলে যে আমিই তাকে বেশী আদর দিয়ে নষ্ট করেছি। হয়তো তাই করেছি। যখন আমার স্ত্রী চলে গেলেন, আমার সব স্নেহ ভালবাসা গিয়ে পড়লো ওই ছেলেটির ওপরে। তার মুখের হাসি যাতে কখনো মিলিয়ে না যায় সে বিষয়ে আমি সদাই যত্নবান থাকতুম। সে যখন যা চেয়েছে আমি তখনই তার বাসনা পূর্ণ করেছি।

হয়তো এ রকম না করে আমি যদি আরো কড়া হতুম তাহলে আমাদের উভয়ের পক্ষেই ভাল হতো, কিন্তু আমি ত তার ভালোর জন্যই করেছিলুম, সে বিষয়ে এখন আর ভাবলে কি হবে।

আমার উদ্দেশ্য ছিল তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলে, আমার ব্যাঙ্কেই কাজে বসিয়ে দেবো, যাতে ভবিষ্যতে সে আমার স্থান অধিকার করতে পারে, কিন্তু তার মতিগতি হয়ে গেল অন্যরকম। বরাবরই একটু উদ্দাম, একগুঁয়ে, মানে, সত্যি কথা বলতে কি, টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে তাকে আমি বিশ্বাস করতে পারতুম না। অল্প বয়সেই সে এক ক্লাবে গিয়ে জুটেছে। সেটি আর কিছুই নয়, যত সব বড়লোকের ছেলে মিলে একটি জুয়া-খেলার আড্ডা করেছে। রণেনের স্বভাব ভারি মিষ্টি, লোকের সঙ্গে ব্যবহার, কথাবার্তা খুব চমৎকার। ফলে এমন সব লোক তার বন্ধু বা সঙ্গী হয়েছে যাদের হাতে টাকাও যথেষ্ট, আর খরচে স্বভাবও খুব। এই ক্লাবে তাসের জুয়া খেলে রণেন অনেক টাকা নষ্ট করেছে, রেস্ খেলারও সখ মধ্যে মধ্যে আছে, ফলে বারবার আমাকে ধরেছে টাকার জন্যে। তাকে প্রতি মাসে হাত খরচের একটা টাকা আমি দিই, কিন্তু তাতে কুলোবে কেন, তাতে কি আর রেস্ খেলা, তাসের বাজি চলে, কেবলই আমার কাছে এসে আরো দাও, আরো দাও করে। এটাও অবশ্য মানতে হবে যে আমার বলাতে সে বাস্তবিক অনেকবার এই সঙ্গ ত্যাগ করবার চেষ্টাও করেছে, কিন্তু তার বন্ধু কুমার অতীন্দ্র নারায়ণের প্রভাব তার ওপর এত বেশী, যে বারবার ক্লাব ছাড়বার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাকে আবার ফিরে যেতে হয়েছে।

এই যে আপনাকে কুমার অতীন্দ্র নারায়ণের প্রভাবের কথা বললুম, তাতে আমি আশ্চর্য্য হই নি, কারণ রণেন তাকে অনেকবার আমার বাড়ীতে এনেছে, তার ব্যবহার ও কথাবার্তায় আমরাও মুগ্ধ হয়ে গেছি। বড় এক জমিদার বংশের একমাত্র ছেলে, সহরেই থাকে, আর যত বড়লোক অভিজাত সমাজে তার গতিবিধি। রণেনের চেয়ে বয়সে কিছু বড়, নানা দেশ বিদেশে ঘুরেছে, বিলাত পর্য্যন্ত, বহু রকম লোকের সঙ্গে মিশেছে, কাজেই তার কথাবার্তায় এমন একটা রস আছে, যে শোনে সেই মোহিত হয়ে যায়। ছেলেটি দেখতেও দেব দুর্লভ। বলবো কি, অজয় বাবু, সে কাছ থেকে চলে গেলে পর যখন ঠাণ্ডা মাথায় তার কথা ভাবি, তখন তার কতকগুলো কথাবার্তার ধরণ ও তার চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা ক্রুর ভাব ধরা পড়ে, সে সব ভেবে তখন মনে হয় যে সে বিশ্বাস বা নির্ভর করবার যোগ্য লোক নয়। আমি ত এ কথা ভাবি, আবার আমার মীরা-মাও ঠিক এই কথাই বলে। তার নারীসুলভ একটা সহজাত সংস্কার থেকে বোধ হয় সে মানবচরিত্র আরো গভীর ভাবে বুঝতে পারে।

এতক্ষণ আপনাকে আমার মীরা—মা'র কথা বলিনি, এইবারে বলি। সে হলো আমারই স্বজাতি আমার বাল্যবন্ধু অর্দ্ধেন্দুর একমাত্র কন্যা। এক মোটর দুর্ঘটনায় তার বাপ-মা প্রায় একসঙ্গেই মারা যাওয়ার পর অসহায়া মেয়েটিকে দেখবার কেউ ছিল না, আমি তাকে এনে পালন করি, আর সেই থেকে আমি তাকে নিজের মেয়ের মতই দেখি। সে আমার বাড়ীর আলো, এত সুন্দর, নম্র, মিষ্টি স্বভাব তার, গৃহস্থালীর কাজকর্ম, আমার সংসার বলতে যা কিছুই আছে, সবই সে দেখাশোনা করে, চালায়। অথচ এত লাজুক, সাধুত, কি বলবো। এক কথায় সে আমার ডান হাত, তাকে ছেড়ে আমার কি করে চলবে জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে সে আমার ইচ্ছার বিরোধিতা করেছে, দুবার আমি তার সঙ্গে রণেনের বিবাহ দেবার প্রস্তাব করেছি, কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হয়নি। আমার মনে হয় যদি কেউ রণেনকে সৎপথে টেনে আনতে পারতো সে মীরাই, হয়ত মীরাকে বিবাহ করলে রণেনের জীবনধারার পরিবর্ত্তন হতো, কিন্তু—আর এখন একথা ভেবে—কি হবে, বড্ড দেরী হয়ে গিয়েছে, আর সে ত হবার নয়।

এখন, অজয় বাবু, আপনি শুনলেন আমার পরিবার ও গৃহস্থালীর সব ব্যাপারে, এইবারে আমার দুর্ভাগ্যের কথা বলি।

(৪)

যেদিন শেঠজী তাঁর রত্নমুকুট আমার কাছে রেখে গেলেন, সেই রাত্রে বাড়ী ফিরে আহার শেষের পর, বসবার ঘরে আমি রণেন ও মীরাকে সে ঘটনার কথা বলি। অবশ্য শেঠজীর নাম ধাম গোপন রেখেই বলেছিলাম যখন বলছিলাম সেই সময়ে নতুন ঝিটা কি একটা কাজে সেই ঘরে এলো, আমি অবশ্য চুপ করে গেলাম। পরক্ষণেই সে বেরিয়ে গেলো, কিন্তু দরজাটা বন্ধ ছিল কিনা আমার ঠিক মনে নেই, সেকথা আমি শপথ করে কিছু বলতে পারবো না। রণেন আমার কাহিনী শুনে মুকুটটি দেখবার জন্যে খুব আগ্রহ করলে, আমি কিন্তু দেখাতে রাজী হলুম না।

সেটা কোথায় রেখেছেন, বাবা, জিগেস করলে রণেন।

আমি বললুম, আমার আলমারীর দেরাজে।

বেশ করেছেন, সে বললে, আশা করি আজ রাত্রে আমাদের বাড়ীতে চুরি ডাকাতি ঘটবে না—

সে ত আমি চাবি দিয়ে রেখেছি।

হুঁঃ, সে তাচ্ছিল্যভরে বললে, আপনার আলমারীতে আবার চাবি! যে সে চাবি দিয়ে খোলা যায়, ওই ত ভাঁড়ার ঘরের দেয়াল-আলমারীটার যে চাবি, তা দিয়ে আমিই কতবার আলমারীটা খুলেছি।

বলবো কি, রণেনের কথাবার্ত্তাই ছিল রকম ধরণের, সে জন্য আমি তাতে বিশেষ কান দিলুম না। তারপর আমি যখন শুতে যাবো, রণেন খুব মুখখানা গম্ভীর করে আমার পিছু পিছু আমার শোবার ঘরে এলো। মুখ নিচু করে বললে,

বাবা শ' দুই টাকা আমাকে দিতে পারবেন?

একটু রুখেই আমি উত্তর দিলুম, না, পারবো না। আমি তোমার প্রতি টাকাকড়ি সম্বন্ধে বড় বেশী উদার হয়ে এসেছি, আর নয়।

হ্যাঁ বাবা, সে ত আমি মানছি, আপনি খুব করেছেন, যখনি চেয়েছি তখনি পেয়েছি, কিন্তু এবারটা না দিলে যে বাবা আমি ক্লাবে মুখ দেখাতে পারবো না।

তা মুখ আর দেখিও না সে খুব ভালই হবে, আমি বললুম।

কিন্তু বাবা, ক্লাব যদি ছাড়তেই হয়, অন্ততঃ মান খুইয়ে নয়, আমার দেনাটা শোধ করে তবে ছাড়তে পারি, অপমান সইব কি করে? আপনি অবশ্য যদি নেহাতই না দেন, দেখি তাহলে অপর কি উপায়ে টাকাটা যোগাড় করতে পারি—

আমার তখন খুব রাগ হয়ে গেছে, কেন না এই নিয়ে এ মাসে সে তিনবার টাকা চেয়েছে।

এক পয়সাও তুমি আমার কাছে আর পাবে না, বলে দিচ্ছি—

এর কোন উত্তর না দিয়ে সে মুখ নিচু করে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

তখন আমি একবার আলমারীটা খুলে, মুকুটটা ঠিক আছে দেখে নিয়ে আবার চাবি বন্ধ করে, ভাবলুম একবার বাড়ীর দরজা সব ঠিক বন্ধ আছে কিনা, ঘুরে দেখে আসি। এই ভেবে নিচে নেমে গেলুম। এ কাজ অবশ্য মীরাই করে, তবু ভাবলাম যে বাড়ীতে একটা মহামূল্য বস্তু রয়েছে, নিজেই দেখে আসি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি, দেখি সামনের হল্ ঘরের একটা পাশের জানলায় মীরা দাঁড়িয়ে আছে। আমি এগিয়ে যেতেই, সে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে আমার কাছে এলো। যেন একটু চিন্তিতভাবে বললে,—আচ্ছা কাকাবাবু, আপনি কি নতুন ঝিকে আজ রাতে বাইরে যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন?

না, না, আমি কেন দেবো? ও সব ত মা তোমার কাজ।

সে বললে, আমি দেখলুম এই মাত্র সে বাইরে থেকে এসে পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ী ঢুকলো। মনে হয়, বাগানের ওপাশে যে ছোট গেট আছে সেখানে কারো সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। কিন্তু এটা ত নিরাপদ নয়, বারণ করে দেওয়া উচিত।

আমি বললুম, নিশ্চয়। হয় তুমিই কাল সকালে ওকে বকে দিও, না হয় বলতো আমিই বলে দেবো। সব দেখে এসেছ, মা, সব ঠিকঠাক বন্ধ আছে?

হাঁ, সব ঠিক আছে।

আচ্ছা যা, তাহলে শোওগে যাও, আমিও যাই বলে আমি ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়লুম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লুম।

আপনি বুঝতে পারছেন, অজয়বাবু, যে আমি প্রত্যেক কথাটি, প্রত্যেক ঘটনাটির খুঁটিনাটি সব আপনাকে বলছি তবে আপনি যেখানে আবশ্যক মনে করবেন, যদি কোন কথা আমি বেশ পরিষ্কার করে বলতে না পেরে থাকি, আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন।

না না, বিধুবাবু, অজয় বললে, প্রশ্ন করার কিছু নেই, আপনার বিবৃতি খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কার, আপনি যেমন বলছেন বলে যান, প্রশ্ন পরে হবে।

(৫)

এবারে আমার কাহিনীর এখন স্থানে এসেছি, বলেন বিধুবাবু, যেখানে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় স্পষ্ট ও পরিষ্কার হওয়াই দরকার। আমার নিদ্রা কখনই খুব গভীর হয় না, আর মনের ভাবনা চিন্তাতে সে রাত্রে ভাল করে ঘুমোতেই পারিনি। আন্দাজ রাত দুটোর সময়ে কি একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। আমি পুরো জাগ্রত হবার আগেই শব্দটা থেমে গেছে, কিন্তু আমার মনে ধারণা হলো যেন কোথায়ও একটা জানলা বা দরজা বন্ধ করার শব্দ। একটু চুপ করে কান পেতে শুয়ে রইলাম, তারপরেই পাশের ঘরে স্পষ্ট মৃদু পায়ের শব্দ শুনে হঠাৎ শিউরে উঠলুম, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বিছানা থেকে উঠে পড়ে ড্রেসিং রুমের দরজা ফাঁক করে দেখলুম—

চীৎকার করে উঠলুম, রণেন, হতভাগা তুই কোন্ সাহসে মুকুটে হাত দিয়েছিস্?

সে ঘরে ছোট আলোটা জ্বলছে, যেমন আমি জ্বেলে রেখে গেছলুম, আর দেখি হতভাগা ছেলেটা, শুধু ধুতি আর সেজি পরা, খালি পায়ে, আলোটার ধারে মুকুটটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মনে হলো যেন খুব গায়ের জোর দিয়ে সেটা মোচড়াতে বা বাঁকাতে চেষ্টা করছে। আমার চীৎকারে চমকে উঠলো, তার হাত থেকে মুকুটটা পড়ে গেলো, আর তার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। মুকুটটা তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে দেখি, তার একটা কোণ ভাঙা—

আমি তখন রাগে, ক্ষোভে আত্মহারা হয়ে গেছি, পাজি বদমাস, সর্বনাশ করেছিস, মুকুটটা ভেঙে খান খান করেছিস, আমার জন্মের মত মান গেলো, বল্ টুকরোটা ভেঙে চুরি করে কোথায় রেখেছিস্?

চুরি করেছি? সে বললে।

আমি তখন তার কাঁধটা ধরে খুব জোরে ঝাঁকি দিতে দিতে বললুম, হাঁ, চোর কোথাকার! বল্ টুকরোটা কোথায় রেখেছিস?

সে বললে, না না, তা হতে পারে না, কে বললে?

আমি বললুম, তিনখানা হীরে সমেত কোণটা নেই দেখতে পাচ্ছিস না? চোর মিথ্যাবাদী, স্পষ্ট নিজের চোখে দেখলুম তুই মুচড়ে ভাঙছিস—

তখন সে বললে খুব ত গালাগালি দিচ্ছেন, আর আমি লজ্জা করবো না বলে দিচ্ছি, আপনি যখন এ ভাবে আমাকে অপমান করেছেন আমি আর একটি কথাও বলবো না। সকাল হলে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো, নিজের উপায় নিজে করে নেবো—

তখন আমি রাগে উন্মত্তপ্রায় হয়ে গেছি। হাঁ, চলে যাবে বই কি! আমি পুলিশ ডাকবো, এর তন্ন তন্ন করে খোঁজ নিয়ে তবে ছাড়বো।

সেও তখন এমন রেগে উঠে, আমি ভাবতেই পারিনি যে অতো রাগ তার শরীরে আছে, রেগে সেও চীৎকার করে বললে, বেশ, আমি কোন কথা বলবো না, ডাকো পুলিশকে, তারা যা পারে খুঁজে বের করুক!

এ দিকে আমাদের চেঁচামেচিতে বাড়ীর সকলেই উঠে পড়েছে, প্রথমেই মীরা আমার ঘরে ছুটে এলো, রণেনের মুখ দেখে, আর আমার হাতে মুকুটটা দেখে, বোধ হয় সবই বুঝতে পারলে, সে চীৎকার করে অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলো। তখন তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লুম, একটা ঝিকে ডেকে তার শুশ্রূষা করতে বলে, একজন লোককে থানায় খবর দিতে পাঠিয়ে দিলুম। রণেন এতক্ষণ গোঁ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, আমাকে জিজ্ঞেস করলে যে লোকেই কি

চোর সাব্যস্ত করে পুলিশের হাতে দেওয়া হবে? আমি সংক্ষেপে বললুম, যে এটা আর এখন আমার ঘরোয়া বা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, অন্য লোকের স্বার্থজড়িত রয়েছে, তাকেই আইনতঃ যা হবার তাই হবে।

সে তখন বললে যে আচ্ছা, এখুনি আমাকে গ্রেপ্তার করিয়ে না দিয়ে, একবার অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের জন্য আমাকে ছেড়ে দিন, আমি বলছি এতে আপনার ভালই হবে।

ও, তোমাকে ছেড়ে দেবো, যাতে আমার সরে পড়বার সুবিধে হবে, নয়ত চোরাই মাল লুকিয়েফেলতে পারবে, এই তো? ততক্ষণে কিন্তু আমি যে নিজে কি ভয়ানক বিপাকে পড়েছি, তার হুঁস হলো, আমি রণেনকে খুব কাকুতি মিনতি করে বললুম, যে শুধু আমার নিজের মান ইজ্জতের হানি হবে তা নয়, একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি এতে জড়িত রয়েছেন এর ফলে যে কেলেঙ্কারি ঘটবে, সব রকে হয় যদি সে দোষ স্বীকার করে, আর তিন খানা হীরে সমেত মুকুটের ভাঙা টুকরোটা কোথায় রেখেছে আমাকে বলে দেয়।

দেখ বাপু, তাকে বললুম, তুমি ত হাতে হাতে ধরা পড়েছ, এখন দোষ স্বীকার করলেও অপরাধের গুরুত্ব কমবে না, তবে এখনো যদি চোরাই জিনিস ফেরৎ দাও, বা কোথায় রেখেছ বলে দাও, তাহলে আমি সব অপরাধ ক্ষমা করবো আর যেমন করে পারি ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দেব।

রেখে দাও তোমার ক্ষমা, যারা চাইবে তাদের কোরো, এই কথা সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললে। আমি বুঝতে পারলুম যে ও একবারে কঠোর হয়ে গেছে, আমার কথার আর কোন ফলই হবে না। ইতিমধ্যে পুলিশ এসে পড়েছিল, আমি তখন নিরুপায় হয়ে ইন্‌স্পেকটারকে ডেকে তার হাতে রণেনকে দিয়ে দিলুম। পুলিশ তখন তার দেহ তল্লাসী করে, তার ঘর, জিনিস আসবাবপত্র সব খানাতল্লাসী করতে লাগলো, বাড়ীর মধ্যে সম্ভব অসম্ভব যে কোন জায়গাতে হীরে ক'খানা লুকানো থাকতে পারে সব তন্নতন্ন করে খোঁজ করা হলো, কিন্তু কোন কিছুই সন্ধান পাওয়া গেল না। আমরা বহুই অনুযোগ, অনুরোধ করি, ভয় দেখাই, হতভাগা ছেলেটা কিছুতে আর মুখ খুললো না, আজ সকালে তাকে হাজতে নিয়ে গেছে। আমি প্রথমে থানায় গিয়ে দরবীর কাছ সেরেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি, আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ অজয় বাবু, যে আপনার দক্ষতা, কর্মকুশলতা সব প্রয়োগ করে এ রহস্যজাল আপনি ভেদ করুন। পুলিশ স্পষ্ট আমাকে বলে দিয়েছে যে তারা এ ব্যাপারের কোন কূল কিনারা পাচ্ছে না। খরচ পত্র যা লাগে, অজয়বাবু দেবো, আমি ত সকালেই এক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষনা করে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার কথা ভেবেছিলুম, কিন্তু তাহলেই ত ব্যাপারটা সব জানাজানি হয়ে যাবে, তাই আপনার মত না নিয়ে কিছু করবো না স্থির করেছি। কি যে করি, কোন পথে যাই, হে ভগবান, কি করবো? আমার কি হবে? একরাত্রে আমি মান-ইজ্জৎ, রত্নমুকুট, ছেলে, সব হারালুম, আমি কি করবো?

বলতে বলতে ভদ্রলোক মাথার দুপাশে দুহাত চেপে দিয়ে মাথা দোলাতে লাগলেন, যেন তাঁর ক্ষোভ দুঃখ তখন আর বাক্য দ্বারা প্রকাশের অতীত হয়ে গেছে। অজয় খানিকক্ষণ ভ্রুকুঞ্চিত করে চুপ করে বসে রইলো। তার পরে বললে—

আপনার বাড়ীতে বাহিরের লোকজন, বন্ধুবান্ধবের কি খুব যাওয়া আসা আছে?

মোটেই না, বিধু বাবু উত্তর দিলেন, আমার ব্যাঙ্কের অংশীদার, তাঁর পরিবারবর্গ, আর কখনো কখনো রণেনের দু একজন বন্ধু, এ ছাড়া কেউ আসে না। কুমার অতীন্দ্র নারায়ণ ছেলের বন্ধু হিসাবে দু চার বার এসেছেন, আর কেউ নয়।

আচ্ছা, আপনারা খুব সমাজে যাতায়াত করেন, লোকের বাড়ী-টাড়ী যান?

মোটেই না। মীরা আর আমিও বলতে গেলে বাড়ী থেকে কোথাও বেরোই না। রণেন অবশ্য এখানে ওখানে যায়, আমাদের ত কোথাও যেতে ভালই লাগে না।

এটা ত একটু আশ্চর্য্য, বিধু বাবু! অল্পবয়সী মেয়ে মীরা, সেও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা করে না, বা কারো বাড়ী যাওয়া আসা পছন্দ করে না?

ওর প্রকৃতিটাই খুব শান্ত, চুপচাপ। আর আপনি ওকে অল্প বয়সী বলছেন, ও ত নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়, বয়স ওর ২৪ বছর হয়েছে।

আচ্ছা, এ ব্যাপারটাতে মীরারও মনে খুব ধাক্কা লেগেছে, নয়?

ভয়ানক! আমার চেয়েও যেন এ ব্যাপারটা ওকে বেশী অভিভূত করেছে।

আপনি বা মীরা দুজনেই আপনার পুত্রের অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ?

তাছাড়া আর কি হতে পারে বলুন, যখন আমি নিজের চোখে তার হাতে রত্নমুকুট দেখেছি।

সেইটাই অপরাধের অকাট্য প্রমাণ বলে আমি মনে করতে পারিনা। আচ্ছা, মুকুটটার কোন ভেঙ্গে ছাড়া অপর কোন ক্ষতি হয়েছিল?

হাঁ, সোণার পাতটা কতক মুচড়ে বেঁকে গিয়েছিল।

তাহলে, বিধুবাবু, এমনও হতে পারে যে আপনার ছেলে সেটা নিয়ে মোচড়টা সোজা করবার চেষ্টা করছিল?

আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক অজয় বাবু, আপনি আমার ও আমার ছেলের দিকে খুব টেনে বলছেন বুঝতে পারছি, কিন্তু এ আপনার বৃথা চেষ্টা। ও ঘরে অতরাত্রে এসেছিল কেন? যদি নির্দ্দোষীই হবে তবে সেকথা বললে না কেন?

ঠিক কথা! আর যদি দোষীই হবে তাহলে বানিয়ে একটা মিথ্যা গল্পই বা বললে না কেন? ওর চুপ করে থাকাটা আমার মনে হয় দু রকম অর্থই হতে পারে। যাই হোক, ব্যাপারটার ভেতর অনেক জটিলতা রয়েছে; আচ্ছা, আপনার যে একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল, সেসম্বন্ধে কি অনুমান করছেন, পুলিশ কি বলে?

তারা বলে হয়ত রণেনের শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করার শব্দ, সে যখন তার ঘর থেকে বেরিয়ে আমার ঘরে আসে—

বাঃ, বেশ কথা! একটা লোক চুরির মৎলবে আসছে, সে নিজের ঘরের দরজা দরাম্ করে শব্দ করে বেরিয়ে আসবে, যাতে বাড়ীর লোকে ঘুম ভেঙ্গে যাবে? আর তিনখানা হীরে সমেত যে ভাঙ্গা কোলটা পাওয়া যাচ্ছে না, সে বিষয়ে পুলিশ কি বলে?

তারা ত এখনো বাড়ীর ভেতরে ঘরে ঘরে ফার্ণিচার, আসবাব পত্র ইত্যাদি আড়িপাতি করে খোঁজ করছে?

হাঁ, তারা ত কর্ম্মতৎপরতা খুব দেখাচ্ছে, সমস্ত বাগান, কম্পাউণ্ড তন্নতন্ন করে খোঁজ করে দেখছে।

আচ্ছা, বিধুবাবু, আপনাকে বলি, আপনি কি এখনো বুঝতে পারছেন না, যে ওপর ওপর দেখে আপনি বা পুলিশ যা মনে করছেন, ব্যাপারটা তার চেয়ে অনেক বেশী গভীর ও জটিল? আপনারা খুব সোজা কেস্ বলে মনে করছেন, আমার ধারণা কিন্তু অন্য রকম। আপনি ধরে নিয়েছেন, যে আপনার ছেলে তার শয়নকক্ষ থেকে এসে খুব অসমসাহসিক ভাবে আপনার ড্রেসিং রুমে প্রবেশ করে, আপনার আলমারী খুলেছে। রত্ন মুকুট বের করে নিয়ে পায়ের জোরে তার একটা কোণ ভেঙ্গে নিয়েছে, আবার সেখান থেকে চলে গিয়ে, তিনখানা হীরে সমেত টুকরোটা এমন অদ্ভুত কৌশল করে লুকিয়ে ফেলেছে, যে আপনারা অত করে খুঁজেও তার সন্ধান পাচ্ছেন না। তারপরে সে আবার রত্ন মুকুটটা নিয়ে আপনার ঘরে এসেছে, যেখানে তার ধরা পড়বার খুবই সম্ভাবনা—এই রকম একটা ব্যাপার কি আপনার খুব বিষাদ যোগ্য বলে মনে হচ্ছে?

কিন্তু এ ছাড়া ব্যাপারটা আর কি হতে পারে আমাকে বলুন, অজয় বাবু, কাতরকণ্ঠে বিধুবাবু বললেন, যদি তার দোষ না থাকে, তাহলে সে খুলে বলছে না কেন?

সেইটারই ত সন্ধান বের করা হবে আমাদের কাজ, অজয় উত্তর দিলে, কাজেই, বিধুবাবু, চলুন, এখন আপনার বাড়ীতে যাই, সেখানে গিয়ে স্বচক্ষে সব দেখে শুনে তারপর যা করবার করা যাবে

একটি কোরাস

গীতিকার— শ্রীশিশির রায়

হাজার তারার আলোর পাখী
ডাকলো পলক মুক্তি ডাকি
রাঙলো পরাণ দিগংগনে
অনেক—অনেক—অনেক—

নিকষ কালো আকাশ তারায়
বাতাস পাগল আলোর সাড়ায়
সাবাস্ প্রাণের কানায় কানায়
ঢেউ-এর মাতন ঘুম-ঘে ভাঙায়—
সবুর নয় ক সংসারে আর
বৃথাই হোল দিন যে কাবার
অনেক—অনেক—অনেক ॥

স্বপ্নে ভরাট পৃথ্বী তবু যে
স্বপ্নের নয় সত্যিকার
আমরা ফেরাব নবীন মন্ত্রে
সোনার সেরূপ মৃত্তিকার
বাড়ুক সরল কঠোর কণ্ঠে অংগীকার
স্বপ্ন ভিতর সত্যিকার—

সবুজ মাঠের অবুঝ বুকেই
সহজ প্রাণের দুঃখে-সুখেই
ভাবনা মেলাই তোমার আমার
যাত্রা সুরুর লাগুক জোয়ার—
নতুন করে লক্ষ জীবন
মাংগলিকে আবার এখন
হোক না অভিষেক ॥*

* গীতিকারের অনুমতি নিয়ে যে কোন শিল্পী বা শিল্পীগোষ্ঠী সুর দিয়ে গানটি গাইতে পারেন।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার জীবন সাধনা

হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত

জীবন সাধনা

জীবন সাধনা। ছোট দুটি কথা। সবাই উচ্চারণ করি। সব দেশে, সব কালে কথা দুটি ওঠে। কেউ বলে দেশের জন্য জীবন দিলাম; কেউ প্রিয়জনের জন্য। সাধনা করেছি সারা জীবন বলে কেউ। সমাজ স্বীকারও করে নেয় অনেককে। তবু সব প্রয়াসকে এমন কি সারা জীবন ব্যাপী প্রয়াসকেও জীবন সাধনা বলে গণ্য করি না। চুল চেরা বিচার করতে বসে যাই। মনকে বুঝিয়ে বলি, কেন এই মানুষটির জীবন ভরা সাধনা আর প্রয়াসকে জীবন সাধনা বলা ত যায়। যতই বলি না কেন মন তো ভরে ওঠে না। আবার কোন জীবন সম্বন্ধে যখন জানি, যখন এমন ভাবে উপকরণ যোগাড় করে, প্রমাণ দাখিল করে বলতে হয় না—এই দেখ একজন মহৎ মানুষ। এঁর জীবনব্যাপী যে সাধনা চলেছে তার পুণ্যস্পর্শে মানবতা বড় হয়ে উঠছে। সহস্রলক্ষ মানুষ একযোগে কাজ করে যে রূপান্তর আনতে পারতো—এই একটি মানুষ সেই রূপান্তর ঘটিয়েছেন। লক্ষ মানুষের চিন্তায়, আশায়, আকাঙ্খায়, স্বপ্নের, ধ্যানের সমন্বয় ঘটেছে এই মানুষটির মনে। তাই ইনি যে কাজ করে গেলেন তাতে অযুত মানুষ জীবনে নতুন গভীরতা, জীবন ধারণের নতুন বনিয়াদ, অনুশীলনের নতুন মন্ত্র পেয়ে যাবে। আর সেই অযুত মানুষই হল এই অসাধারণ মানুষটির স্রষ্টা। তিলে তিলে তাঁকে গড়ে তুলেছেন এই মহতী জনসমষ্টি—তাঁর মনে চেউ তুলেছেন। বলেছেন: রূপ দাও, প্রকাশ দাও, মৌনকে ভাষা দাও

এমন ভাবে জনতার প্রাণসত্তা ভাষা পেয়ে ওঠে; একজনের কর্মপ্রেরণার মধ্যে লক্ষ কর্মহীন অথচ কর্মঠ মানুষের কর্মপ্রিয়তা সার্থকতা খোঁজে। জন জীবনের নিস্তরঙ্গ আবরণের আড়ালে যে প্রাণচাঞ্চল্য আর কর্মপ্রবাহ চরিতার্থতার অভাবে শুধু প্রাণ ধারণের, শুধু দিন যাপনের গ্লানিতে পর্যবসিত হয়, তাঁকে ঘিরে তা নতুন প্রতিভাস লাভ করে।

সেই গোমুখী তীর্থে জনগঙ্গার শুরু। তার শেষ মহাসাগরে, সকল মানুষের সার্থকতার তীর্থে।

তার নাম জীবন সাধনা।

[এক]

নব-জীবনের সংকটপথে হে তুমি অগ্রগামী
তোমার যাত্রা সীমা লভিবেনা, কোথাও যাবেনা থামি।

এলোমেলো কয়েকটা কাগজ উড়ছে প্রায় অন্ধকার একটি ঘরের বড় টেবিলে। সকাল সাড়ে ছটায়। রৌদ্র ঝলমল দিনটি!

কয়েকদিন হল তিনি ফিরে এসেছেন। আবার পাড়ি দিতে হবে। মাঝখানে কদিন থাকবেন কলকাতায়। অনেক কিছু ভাবছেন।

টেলিফোন বেজে উঠলো।

....হ্যা, আমি সাহা, বলুন....

....দেখুন, একটা সম্মেলন করা দরকার। বিষয়টা বড় জরুরী। দেশ ভেঙ্গে টুকরো করে দেওয়া হচ্ছে দেশ পুনর্গঠনের নাম করে। কতবার এই সব চলতে দেওয়া যায় বলুন? ১৯০৫, ১৯৪৭—দুবার তো ভুলুম করা হল। আবার ১৯৫৯... ? এত সহ্য হবে না।

....সভা সম্মেলন করে কিছু হবে না। কিছু হয় না এতে। তবে আপনারা যদি মনে করেন দেশের মানুষের কাছে আমাদের মনের কথা স্পষ্ট করে বলে নেওয়া প্রয়োজন তাহলে সভা করতে পারেন।

সভা বসেছে। সেনেট হলে। তিল ধারণের স্থান নেই। দলমত নির্বিশেষে সবাই এসেছেন। প্রধান বক্তার আসতে দেরী হচ্ছে। সেনেট হল থেকেই চোখে পড়ে বড় একটা গাড়ী। কালো রঙের আবরণ। পাশে একটি প্রদীপ আঁকা। ভারতীয় বিজ্ঞান সভার প্রতীক। ১৮৭৬ সালে এই প্রতীককে আশ্রয় করে ভারতীয় বিজ্ঞান সভা গড়েছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার।

প্রদীপের নীচে অন্ধকার। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে হোমিওপ্যাথি নিয়ে গবেষণা করার জন্য প্রকৃতিস্থতা হারিয়েছেন বলে গণ্য করেছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা। ফ্যাকালটি অফ মেডিসিন এবং ফ্যাকালটি অফ সায়েন্সের প্রধান ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দিলেন শিক্ষা-কর্তারা।

ডাঃ সরকার সরে এসেছিলেন। সমাজের তাদের পথ থেকে যেমন করে সরে আসেন, সহজেরা সাধু সন্তরা তেমন ভাবে। দীপের আলোয় সারা কলকাতা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সারা ভারতে যখন কোথাও করে দেখানোর পদ্ধতি বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়ে ওঠেনি, তখন ভারতীয় বিজ্ঞান সভার হাতে কলমে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে দেখানো প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। নিয়মিত বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতামালার ব্যবস্থা হয়েছিল। কাদার লাফন্ট, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, বি. এল. চৌধুরী, অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু, স্যর আশুতোষ মুখার্জী এরা এই বিজ্ঞান আলোচনা সভায় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সহায়ক হয়েছিলেন।

তরুণ বয়সে মেঘনাদ এখানে নিয়মিতই যেতেন। তাঁর চোখের সামনে ডাঃ সরকারের প্রদীপে নতুন আলো সঞ্চার করলেন, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন। সে সালটা ১৯১৭। দীর্ঘ ১১ বছর গবেষণার পরে ১৯২৮ সালে "রমন ফলাফল তত্ত্ব" আবিষ্কার করেছিলেন বিজ্ঞান সভার একটি ঘরে। সঙ্গে ছিলেন আশুতোষ বাবু। রমনের দীর্ঘকালের নাম না জানা সহকারী।

১৯৩০ সালে বিশ্ব বিজ্ঞান সভা নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করলেন রমনকে। রমনও সরে গেলেন ১৯৩৪ সালে। তাঁর নতুন প্রস্তাব নাকচ করে, এমনকি কার্যকরী সভার গঠনও পরিবর্তন করে দিয়ে ভারতীয় বিজ্ঞান সভার নতুন সভাপতি হয়ে এলেন ডাঃ নীলরতন সরকার। সম্পাদক হলেন ডাঃ জ্ঞান মুখার্জী।

১৯৩৬ থেকে ১৯৪২ এ বিজ্ঞান সভায় গবেষণা চালাচ্ছিলেন রমনের সহকারী ডাঃ কে. এস. কৃষ্ণান। তাঁর গবেষণার গুরুত্ব স্বীকার করে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি তাঁকে সম্মানিত সদস্য করে নিয়েছিলেন ১৯৪১ সালে।

পরের বৎসর ডা. নীলরতন সরকার মারা গেলেন। বিজ্ঞান সভার সভাপতি হলেন ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। উপেন্দ্রনাথের প্রিয় বন্ধু ডাঃ সাহা। ১৯৪৭ সালে সম্পাদক হলেন বিজ্ঞান সভার। দশবছর বাদে তাঁকে হতে হল ভারতীয় বিজ্ঞান সভার পরিচালক।

বিজ্ঞান সভার পরিচালক ডাঃ সাহার জীবনে মহেন্দ্রলাল সরকারের জ্বালানো প্রদীপ কত নতুন আলো জ্বাললো। তরুণ বয়স থেকে মাহেন্দ্রক্ষণে। কত নতুন দীপ শলাকা দিলেন তিনি!

সেই প্রতীক সম্বলিত গাড়ীটি দাড়িয়ে আছে সেনেট হলের বিপরীত দিকে। গোলদীঘির পাশের রাস্তা বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট-এর ওপর।

ডাঃ সাহা রয়েছেন সামনের বাড়ীটিতে। বাড়ীটির নাম ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটুট হল। সেখানেও তিল ধারণের ঠাঁই নেই। সে জনতার বয়স দেহের হিসাবে, মনের হিসাবে ত বটেই তরুণ।

সেনেট হলের উদ্যোক্তারা চঞ্চল হয়ে উঠছেন। বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে। যুবকদের সভা সম্বন্ধে অনুচ্চান তো লেগেই আছে। তাকে এত গুরুত্ব দেওয়ার কি হল? অনুচ্চারিত প্রশ্নটি হয়তো পৌছল ইনষ্টিটুট হলে।

তখন ডাঃ সাহা বলছিলেন: দেশের কর্মশক্তিকে কাজে লাগাতে হলে বিশেষতঃ যুব সমাজকে শ্রান্তিহীন ভাবে জাতির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে হলে অফুরন্ত ধারায় কর্মপ্রবাহ রচনা করতে হবে। তার একমাত্র পথ দেশের ব্যাপক শিল্পায়ন।

মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্র-ছাত্রকদের কর্মশক্তির মাধ্যম হিসেবে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট যদি ঘরে বসে খেলা আর গবেষণার কাগজ ওল্টানোর কর্মকেন্দ্র হয়ে ওঠে! বড় জোর মাঝে মাঝে সমাজ শিক্ষার শ্রেণীর ব্যবস্থা করে আর কাছাকাছি গ্রামে গিয়ে বলে সবাই একসঙ্গে মিলে মিশে দেশ গঠন করো। তাতে দেশের যৌবন কাজে পাগল হয়ে ওঠার সুযোগ পায়না।

যৌবনকে অভিষেক করাতে হবে শিল্পায়নের পথে।

এই পথের কথায় ডাঃ সাহা ১৯৩৮ সালে লিখেছিলেন: ভারতবর্ষকে যদি দারিদ্র, অজ্ঞতা, অন্ধকার এবং ব্যাধির ব্যাপক সমাধান করিতে হয়, তবে ব্যাপক শিল্পায়নই তার পথ।

সেনেট হলে এসে ডাঃ সাহা তারই কথা বললেন: দেশকে পুনর্গঠিত করতে হবে তার শিল্পায়নের দিকে দৃষ্টি রেখে, দেশের কল্যাণের দিক চেয়ে। রাষ্ট্রনেতার চিন্তার অস্বচ্ছতার জন্য তাকে ভাঙচুর করতে দেওয়া যায় না।

কি জানি কেন তাঁর চোখের সামনেই ঝুলানো ছিল সেনেট হলের দক্ষিণ দেওয়ালে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিকৃতি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের পরোয়ানা বাতিল হয়ে গেল কি?

সন্ধ্যার অন্ধকারে যাদবপুরের সেই ঘরটিতে এলোমেলো কাগজ পত্রগুলি মৃদু বাতাসে উড়ছে।

কোনটা চিঠি। কোনটা প্রবন্ধ। কোনটা প্রস্তাব।

সামনে সেই মানুষটি।

একটা চিঠিতে লেখা আছে: প্রিয় ব্যানার্জী, তোমার কাছে একটা খবর লিখি। ডাবলিনে গিয়ে মিস উইলিয়ামস্ এর সঙ্গে আলাপ হল। তিনি আর্থার এডিংটনের জীবনী লিখছেন। তাঁকে পাঠিয়ে দিতে চাই এলাহাবাদে এডিংটনকে যে সম্মান ভাষণ আমরা দিয়েছিলাম। আর এলাহাবাদে আমাদের সবাইর এক সঙ্গে তোলা ছবিটি।

এলাহাবাদে এডিংটনের সম্মান সভার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই সম্মান ভাষণ খুঁজছেন মিস উইলিয়ামস্। কেন খুঁজছেন! খুঁজছেন বিজ্ঞান সাধনার ধারাবাহিকতার জন্য। এডিংটন যে চিন্তা সংযোজন করেছেন তবে, প্রাচ্য দেশে তা কি ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপকরণহীন গবেষণা মন্দিরের পূজারীদের!

চিঠিখানা উল্টে গেল।

মন যদি যায় ফিরে? তাহলে কি দেখব?

দেখব, বি. এস. সি পড়ানোর জন্য যন্ত্রপাতি মজুত আছে। এম. এস. সির উপযুক্ত সাজ সরঞ্জাম নেই। গবেষণার জন্য কিছুই নেই। ছোট একটি কারখানা ঘর। এলাহাবাদ শহরে বিদ্যুৎ আছে—কিন্তু কারখানা ঘরটাতে হাতেই চালাতে হয় যন্ত্রগুলি।

পাঠাগার আছে। কয়েকটি অতি পুরানো বই। আর বিলাতী বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্র কয়েকটি।

ডাঃ সাহা গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করে তুলতে চাইলেন। পাঠ ও গবেষণার সহায়ক ব্যবস্থার জন্য অর্থ সাহায্য চাইলেন।

যদি কান পাতি শুনতে পাব: পণ্ডিত কানাইয়ালাল দাতে এসে বলছেন ডাঃ সাহাকে: আপনার এখানের আলমারীর সব বইগুলি পড়া হয়ে গেছে! ডাঃ সাহা বললেন: না, সব বই কেউ পড়তে পারেনা। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ পণ্ডিত কানাইয়ালাল দাতে বললেন: তাহলে বই কেনার জন্য বাড়তি টাকা চাইছেন কেন? পাঠাগারের সব বইগুলি পড়ে শেষ করুন। তারপর নতুন বই চাইবেন।

ব্যবস্থাপকরা তো এই কথা বলছেন। আর রাদারফোর্ড, এডিংটন, এরা কি বলছেন! বলছেন—নতুন চিন্তার জন্য নতুন তথ্য চাই। বলছেন, অনুশীলন করার জন্য নতুন চিন্তাধারা আর পুরাণো চিন্তাধারাকে তুলনামূলক বিচার করতে হবে। নতুন ভাবে পুরানো চিন্তাকে বিচার করতে হবে; নতুন পদ্ধতিতে গবেষণার সাজ সরঞ্জাম সাজাতে হবে। এই পথের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম বিজ্ঞান।

এডিংটনকে, পদার্থ বিদ্যার নতুন যুগের অন্যতম উদ্গাতাকে নতুন ভারতের বিজ্ঞানকর্মী মেঘনাদ সাহা আর তাঁর সহকর্মীরা প্রশস্তি না জানিয়ে পারেন !

প্রশস্তি প্রণতি ঠিক পৌঁছে যায় বিজ্ঞানের মহামন্দিরে !

১৯২৫ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতির মালা এসে পৌঁছয় মেঘনাদের কণ্ঠে।

কবীর লিখতে জানতেন না ; পড়তেও জানতেন না। অথচ তাঁর সামনে চার যুগের সব জ্ঞান তুলে ধরেছিলেন যিনি জ্ঞানকে মানুষের অভিজ্ঞতা, স্বপ্ন, কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তিলে তিলে প্রকাশিত করেন।

মেঘনাদ লিখতে পড়তে জানতেন। পদার্থের অভ্যন্তরে আমাদের দৃষ্টি সীমার পরিধিতে যাকে এখনও আনতে পারা যায়নি সবচেয়ে শক্তিশালী যন্ত্র দিয়েও তার গঠন আচরণ পড়তে জানতেন মেঘনাদ। [illegible] জানতেন এই প্রায় অবাঙ্ মানসগোচর বস্তুসত্তার উৎস কোন সীমাহীন কাল-স্থানের দূরত্বে। কিভাবে আছে, কিরূপে ছিল— কিভাবে প্রকাশিত হবে।

তবু তাঁর হাতে নতুন বই ছুটছে না। নতুন গ্রহপাতি পৌঁছচ্ছে না কর্মকর্তাদের ব্যবস্থাপনায়।

যুগের আলো এসে পৌঁছেছে যার কাছে সে কি স্থির হয়ে থাকতে পারে ?

১৯২৫ সালের বিজ্ঞান সম্মেলনে তাঁরই কথা উচ্চারণ করলেন পদার্থ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডাঃ সাহা :

পদার্থ-বিজ্ঞানের আবিষ্কারের যুগে আমরা বাস করছি। বিজ্ঞানের সার্থকতার নানারূপ গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির কথা বাদ দিলেও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে মানব ইতিহাস এত সমৃদ্ধি আগে কোন দিন পায়নি। ১৮৯৫—১৯২০ এই পঁচিশ বছরে রঞ্জন রশ্মি, তেজস্ক্রিয়তা, পদার্থের গঠনগত তত্ত্ব, বিকীরণের পরিমাপগত তত্ত্ব এবং সবশেষে বলা হলেও যা গুরুত্বে কম নয়, সেই আপেক্ষিক তত্ত্বের সন্ধান আমরা পেয়েছি।

মানুষের চিন্তার রাজ্যে নতুন যুগ সূচিত হয়েছে। যে সূচনা সমগ্র মানবসত্তার ভবিষ্যৎকে চূড়ান্তভাবে, আমূলভাবে রূপান্তরিত করে তুলবে।

তুলেছে।

সাদা হলদে নীলচে নানা রঙের বিচিত্র উপাদান বেরিল বলে পরিচিতি পেয়েছিল গ্রীকদের যুগেই। তাঁরা তার মধ্যে এমারেল্ড (পান্নাকেও) দলভুক্ত শ্রেণিভুক্ত করেছিলেন। বলেছিলেন অমূল্য এই উপাদান।

খৃষ্টজন্মের বহুপূর্বের ভারতে শান-পাত্রে পান্নাখচিত কারুকার্য করার রেওয়াজ ছিল।

মিশর থেকে এই পান্না ভারতে আনানো হত। সে দেশে খৃষ্টজন্মের দুহাজার বৎসর পূর্বেই এর ব্যবহার হয়েছে শোনা যায়।

মহাভারতে পান্নার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হয়তো সেই যুগের খনি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। তাই শুধু বাইরে থেকেই এই মণি পাওয়া যেত এমন ধারণা হয়েছিল।

অন্ধ্র রাজারা নানারকম বেরিলের অলংকার ব্যবহার করেছিলেন ভাস্কর্যপ্রলুপে তারই নিদর্শন পাওয়া গেছে। তাও তো খৃষ্টজন্মের ২২০ বৎসর আগে।

এই উপাদানটি নিয়ে কত কথা হল !

কত ভাবনা হল।

কৌটিল্য বললেন : আকর প্রসব কোষ্ঠ *

আর একটি বইটিতে বলা হল : আট রকমের পান্না আছে। শ্রেষ্ঠ হল "নলিনীদলজলবদতরলম্" স্বচ্ছ মণিটি।

তারপর বেরিলিয়াম ধাতু বলে আবিষ্কার করা হল।

মৌলিক শত উপাদানের তালিকায় বিশিষ্ট স্থান নিয়ে রইল বেরিলিয়াম।

রাজস্থানের গ্রানাইট চত্বরে বেরিলের দেখা মিলেছে। বিহার ও অন্ধ্র দেশের অভ্র খনিতে কাজ করতে গিয়ে বাড়তি উপকরণ হিসাবেও এর দেখা পাওয়া গেছে :

* Mines are the sources of treasury, Kautilya, 321-296 B C.

১৮৯১—১৯২০ সালের আবিষ্কারগুলির আলোক সম্পাতে এই মূল্যবান উপাদান তেজস্ক্রিয়তার শক্তিতে নতুন গুরুত্ব খুঁজে পেল।

তারই কথা লিখছিলেন ডাঃ সাহা : এত বাজু ভারতের বাইরে পাঠানো তাঁর পছন্দ নয়। সোনা ভারত থেকেই তো পরীক্ষা করা যায়। তাছাড়া এই উপাদান নিয়ে পরীক্ষা করতে গেলে যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রয়োজন তার কথাও পরীক্ষার ব্যবস্থাপকরা তো ভাবেন নি। বিজ্ঞান পথিক সাহা তাই তাঁর তরুণ সহকর্মীকে জানাচ্ছিলেন আণবিক গবেষণার ব্যাপারে আরো দায়িত্বশীল হওয়া দরকার।

চিঠিটির ওপর চাপানো আছে একতাড়া কাগজ। প্রবন্ধ, প্রস্তাব, তথা সংকলন আছে এ কাগজে লেখা।

সবগুলির মূল সুর একই :

—আরো দায়িত্বশীল ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

কি রকম ?

যুদ্ধ যে বছর বাধে সেই ১৯৩৯ সালে ১০ লক্ষ টন লোহা তৈরী হচ্ছিল দেশে। যুদ্ধ থামতেই শিল্পপতিরা কমিয়ে আনলো উৎপাদন। ৮ লক্ষ টন লোহা তৈরী হতে লাগল।

সরকার কিন্তু মেনে নিয়েছিলেন ৩০ লক্ষ টন লোহা ইস্পাত দেশের প্রয়োজন। তারই জন্য শিল্প অধিকর্তা চারটি লোহা-ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা করেছিলেনও। প্রত্যেক কেন্দ্র থেকে ৪ লক্ষটন উৎপাদন করার কথা।

সরকারী ঘোষণাপত্র বের হয়েছিল—আমাদের পরিকল্পনাগুলি তৈরী আছে। তিন মাসের মধ্যে সব শিল্পকেন্দ্রে কাজ শুরু হতে থাকবে।

তারপর কি হল ?

কয়েকজন অভিজ্ঞ সরকারী বিশেষজ্ঞ খেটেখুটে পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। কিন্তু পেনেলোপের জালের মত অন্ধকারে কয়েকটি ইঁদুর এসে সেগুলো নষ্ট করে দিল।

১৯৭৯ সালে লোহা-ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করা হলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হতে পারতো। কিন্তু ইঁদুর-কেন্দ্রী শিল্প পরামর্শদাতাদের সঙ্গে পেরে ওঠা গেল না।

এমন সব কথাই যাদবপুরের ঘরে ডাঃ সাহার কাগজ-পত্রের মধ্যে পাওয়া যাবে।

কোনটা তত্ত্ব। যেমন, "প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২০০০ কোটি বরাদ্দ টাকার মধ্যে ৯৪ কোটি টাকা সরকারী উদ্যোগে (পাবলিক সেক্টর) শিল্পায়নের কাজে লাগানো হবে। ২০০ কোটি টাকা আসবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে (প্রাইভেট সেক্টর) শিল্পায়নের জন্য। একে কি পরিকল্পনায় শিল্পায়নের প্রাধান্য বলা চলে ?"

প্রধান তত্ত্ব ছাড়া খুঁটিনাটিও ছিল।

"পশ্চিমবঙ্গে ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্র স্থাপনের পক্ষে কি যুক্তি আছে ? কাঁচামাল কোথায় মিলবে ? পোড়ানোর কয়লা, অক্সাইড কয়লা ? খনিজ লোহা ? চুণাপাথর ? শোধন শালা ? কোথায় আছে এ-সব !

"পোড়ানোর কয়লা আছে ঝরিয়ায়, অক্সাইড কয়লা মিলবে রাণীগঞ্জে ; লোহা আসবে বড়জামদা থেকে। শোধন-শালার কাজ বাংলা ও ঝরিয়ার কয়লা খনিতে চলবে।"

এত খুঁটিনাটি ভাবতে তাঁকে কে বলেছে ? বলেছে ওঁর দেশ।

"দেশের লোকের বর্তমান গড় আয়ু জনপ্রতি বৎসরে ২৩৬৲। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাড়তে শুরু করবে ও ৪৭২৲ গিয়ে দাঁড়াবে পাঁচশ বৎসরের মধ্যে। "ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইকনমিস্ট"এর পাতা খুললে দেখা যায় আজই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রতি গড় আয়ু ৬৯ বছর। ভারতবাসীর গড় আয়ুর ত্রিশগুণ। ব্রিটেনের সাধারণ মানুষ ভারতবর্ষের চেয়ে গড়পড়তা বিশগুণ বেশী আয়ু করে।"

এই অবস্থা বদলাবার জন্যই তিনি গবেষণার কাজে ক্ষতি করে যোগ দিয়েছেন লোক সভায়। সরকারের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও।

পরামর্শদাতা হিসাবে তিনি থাকতে পারতেন। রাজনীতির মধ্যে যাওয়া কি ভাল হল তাঁর মত লোকের !

প্রতিটি সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে সালের একটি ঘটনায়।

"যুদ্ধ লাগার এক বছর আগে। ১৯৩৮ সালে সংযুক্ত প্রদেশে কংগ্রেস সরকার কাজ করছিলেন। শিল্প মন্ত্রী ছিলেন ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু। একটি দেশলাই কারখানা উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি ভাষণ দেন: 'বৃহৎ শিল্পায়নের পথে এই দেশলাই কারখানা স্থাপন বড় রকমের পদক্ষেপ'।

ভাষণ শুনে, বৃহৎ শিল্পায়নের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থা রাখা মুসকিল হয়ে পড়ে। দেশ গঠনের জন্য, কংগ্রেস-কর্মীরা—মন্ত্রী বা মন্ত্রী হবেন এমন কংগ্রেসকর্মীরা রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেলে কোন্ শিল্পায়নের পথে ভারতবর্ষকে বড় করবেন এই প্রশ্ন সমস্ত সত্তাকে আঘাত করল।

আমি স্থির করলাম এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে।"

মাথা থাকলে ঘামাতে হবে। চিন্তাশীলতা থাকলে শুভচিন্তা বার বার এসে উপস্থিত হবে। অশুভ গতি দেখলে দুশ্চিন্তা জাগবে।

কিন্তু তাতে সকলকে প্রসন্ন করা যায় না। ১৯৫১ সালে লোক সভায় ভাষণ দেবার সময় ভারতের স্বাধীন সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজুর শ্লেষ-নির্দেশ তাই শুনতে পাওয়া গেল: ডাঃ সাহা যেন দয়া করে পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণা মন্দিরের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন।

দেবভাষা সংস্কৃত থেকে রামায়ণকে ভাষান্তরিত করলে পরে নরকে যেতে হবে এমন নির্দেশ প্রচলিত ছিল। সাধারণের স্বার্থে রামায়ণকে বাংলা ভাষায় লিখতে গিয়ে কৃত্তিবাস সে নির্দেশ মানতে পারেন নি।

ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজুর নির্দেশ মানতে পারেন নি ডাঃ সাহা। দেশের কল্যাণ সে নির্দেশের চেয়ে বড়। তাঁর নিজের ভাষায়: এই আহ্বান কালের আহ্বান ভারতের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে একথা স্পষ্ট যে দেশ তার ইতিহাসের এক সংকটকালের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। সুপ্রাচীন এক বিচিত্র ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতির ও সভ্যতার বনিয়াদে নতুন কাল নতুন সম্ভাবনার সূত্রপাত করিতেছে।"

"জীবনের রূপ সম্বন্ধে অখণ্ডতার বোধ হলো কবি শিল্পী ও সাধকের সহানুভূতি এবং এই সহানুভূতিই মানুষ জাতির শিল্পে ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেখানে সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট ও সুন্দর আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। সেখানেই আমরা পেয়েছি ক্লাসিক গৌরবে মণ্ডিত সাহিত্য ও শিল্প। ক্লাসিকের রূপ ও ভাব খণ্ডকালের মধ্যে সীমিত নয়। কালোত্তর প্রেরণার শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে আছে কবি বাল্মীকির রামায়ণ এবং ব্যাসদেবের মহাভারত। বিশেষ কোন জাতির জীবনের রীতিনীতি ও ঘটনাকে আশ্রয় করে রচিত হ'লেও বিশ্বের ক্লাসিক সাহিত্যকীর্তিগুলির মধ্যে মানবজীবনের চিরকালীন আনন্দ হর্ষ ও বেদনার ব্যাকুলতা বাঙ্ময় হয়ে রয়েছে। ভোরের সূর্যের মত এই মহাপ্রাণময় কাব্য ও শিল্পরীতিগুলি মানুষের মনের আকাশে নিত্য নতুন আলোকের প্রসন্নতা ছড়ায়।"

—সুবোধ ঘোষ

সাময়িক সাহিত্য

"ইতিহাস" পত্রিকা

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ তাঁদের আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন "যে সকল জাতি ভাগ্যবান তাহারা ইতিহাসের মধ্য দিয়াই স্বরূপ উপলব্ধি করে ও বিভিন্ন দেশকাল হইতে বিচিত্র রসধারা আহরণ করিয়া আপনার সৃষ্টি প্রতিভাকে নিরন্তর সঞ্জীবিত করে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, জাতির সঙ্গে জাতির, সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতার মিলন ও মৈত্রী সাধনা ইতিহাসের মধ্য দিয়াই সম্পন্ন হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে তাহা হয় নাই। .....বড় দুঃখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একদিন বলিয়াছিলেন "হায়! বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই!"...ব্যক্তিগত সংস্কার, জাতিগত স্বার্থ ও ভাবগত আবেগের ঊর্দ্ধে উঠিয়া তথ্যনিষ্ঠার ভিত্তি ও দৈর্ঘ্য লইয়া ইতিহাসের তথ্য অনুসন্ধান করা; নিরপেক্ষ, নির্মোহ ও অখণ্ড দৃষ্টির আলোকে ঐ তথ্য পরীক্ষা করা, মাতৃভাষার মাধ্যমে সেই পরীক্ষিত ও প্রমাণিত তথ্যকে জনসাধারণের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করা—এই তিনটি উদ্দেশ্য লইয়া আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এই পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে।" ইহাই বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ এবং ইহারই মুখপত্র "ইতিহাস" পত্রিকা।

ইতিহাসকে আজ আর বিশ্ববিদ্যা-শিক্ষার একটি শাখা হিসাবে কিছুতেই ধরে রাখা চলে না। চিন্তার জগতে নতুন নতুন বিপ্লব ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টে গিয়েছে যুগে যুগে। বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস আজ সমগ্র দেশ, জাতি ও জনগণের সভ্যতা, সংস্কৃতি আর কৃষ্টির সৃষ্টিধারা অবধাহিকার পথ। যে অবধাহিকার পথ ধরে আমরা তার আদি উৎসের খোঁজ পেতে পারি আবার যে অবধাহিকার গতিপথ দেখে অনুভব করতে পারি নতুন ধারা কোন দিকে প্রবাহিত হবে। কিন্তু এই শেষ নয়—এর থেকেও বড়, বৃহত্তম পরিপ্রেক্ষিতে দেখবার অবকাশ রয়েছে ইতিহাসকে যেকথা বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবী বলেছেন একাধিকবার। সুতরাং এই বিরাট বস্তুকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা ধীরে ধীরে শুধু সত্যের পথ ধরে' সোজা ব্যাপার নয়। বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ তাঁদের একমাত্র মুখপত্র দিয়ে এই মহান্ কাজটি করার কিছুটা প্রয়াস পাচ্ছেন। এদিক দিয়ে তাঁদের দান কতখানি তারও বিচার ভাবীকালের হাতে। স্পষ্টতঃই 'ইতিহাস' পত্রিকা বাংলা দেশে একমাত্র সেই জাতীয় পত্রিকা যা গবেষণার বা বিদ্যাবিস্তার সুবিপুল সীমানার মধ্যে জনসাধারণকে ডেকে না এনেও এবং আনা সম্ভবও নয়—অসাধারণ বিষয়কে সাধারণের করে তুলছে।

'ইতিহাস' পত্রিকার রজতবর্ষ পূর্তি ঘটল ১৩৬৩ সনের শ্রাবণে। এই কয়বছরে এই পত্রিকা বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাস জগতে বিপুল দান করেছে একথা অনস্বীকার্য।

"ইতিহাস" পত্রিকার ষষ্ঠ খণ্ডের তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে। কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ ও তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে এ দুটি সংখ্যায়। এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণের স্থান অন্যত্র রইল, তবু একথা বলা চলে যে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের 'রমেশ চন্দ্র দত্ত' শুধু ঐতিহাসিক গবেষণার দিক দিয়েই নয় উনিশ শতকের এই বিশিষ্ট চিন্তাশীল মনস্বীর জীবনচরিত হিসাবেও অমূল্য এই কারণে যে, যে সব মহান্ জীবন আজকের বাঙ্গালীর কাছে শুধুমাত্র নামে ধামে রেখাঙ্কিত হয়ে রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কন করা। অমলেশ ত্রিপাঠীর প্রবন্ধ চিন্তার উদ্রেক করে কিছু। এ ছাড়া আছে বিখ্যাত ভারতীয় ঐতিহাসিকদের ভাষণের বা প্রবন্ধের অনুবাদ। এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য নিদ্ধারণের দিকটা বাদ দিয়েও একথা বলা চলে যে এর দ্বারা বাংলার অনুবাদ সাহিত্যের কিছু অগ্রসরতা ঘটছে এবং ঘটবে। এ সব ছাড়াও আছে গবেষণামূলক প্রবন্ধ যা ইতিহাসের চিন্তাশীল ছাত্রমাত্রকেই

আকর্ষণ করবে। এই পত্রিকার 'আলোচনা' ও 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগ এক উঁচুদরের 'আলোচনা সাহিত্যের' পথ খুলে দিচ্ছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। চিন্তাশীল প্রবন্ধের এমন সুখপাঠ্য আলোচনা যত হয় ততই মঙ্গল।

ইতিহাস পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় আলোচনায় এসে দেখা যায় যে পূর্ব্বের ঐতিহ্য বজায় রেখে এসংখ্যায়েও কয়েকটি তথ্যপূর্ণ বিদগ্ধ প্রবন্ধের মূল্যবান সমাবেশ ঘটেছে। এর মধ্যে অধ্যাপক শশীভূষণ চৌধুরী মহাশয়ের "সমসাময়িক দৃষ্টিতে সিপাহী বিদ্রোহ" উল্লেখযোগ্য একাধিক কারণে এমন কালোপযোগী, ঘটনাকে এমন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা, ইতিহাসের বাস্তব মূল্য সম্বন্ধে এই সচেতনতা সব ঐতিহাসিক প্রবন্ধে একসঙ্গে প্রায়ই দেখা যায় না। এই প্রবন্ধ আরও বহু নতুন ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বার খুলে দেবে নিঃসন্দেহে। এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধের অধ্যাপকের নব্য প্রকাশিত গ্রন্থ Civil Disturbances in India-র নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

শ্রীজগদীশ নারায়ণ সরকারের 'মুঘল ইতিহাসে গবেষণা' আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যে গবেষণা মোটামুটি ভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে বলে আমরা মনে করি—তার মধ্যেও বহু বিষয় থেকে যায় যার গবেষণার প্রয়োজন এবং কোনও দেশের কোনও যুগের পরিপূর্ণ ইতিহাস পেতে হলে তার সমস্ত দিক্‌কার, জীবনের ও সমাজের সমস্ত সম্ভাব্য দিকের গবেষণার বিশেষ দরকার। আর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতন ইতিহাসের গবেষণাই যে সত্যের চরমকথা নয় তাও মনে করিয়ে দেয় অর্থাৎ গবেষণারও এষণা আছে। এছাড়া আছে দেশবিদেশের বিদ্বৎ-সম্মেলনের আকর্ষণীয় বিবরণী—যেমন ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের লণ্ডনে ঐতিহাসিক সম্মেলন।"

সব কথা বলেও শেষ কথা বলার থেকে যায়। এই বিশেষ পত্রিকাটিকে যদি একমাত্র পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে না রাখতে হয়—যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পেরিয়েও একে দশের মধ্যে ছড়িয়ে ফেলতে হয়—তবে আরও একে জনপ্রিয় করতে হবে। 'জনপ্রিয়' কথাটা এখানে সস্তা অর্থে ব্যবহার করলে ভুল হবে। অর্থাৎ জনগণের কাছে সস্তা আকর্ষণে একে না তুলে ধরে দেশের সাধারণ শিক্ষিত সমাজ যাতে আরও বেশী করে একে গ্রহণ করতে পারে—ইতিহাসকে জনগণের জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে এরই মাধ্যমে। আরও বেশী করে বলা চলে যে, এই পত্রিকায় ইতিহাসের শুষ্ক তত্ত্ব এবং খুঁটিনাটি বিচার দিয়ে একে ভারাক্রান্ত না করে তুলে didactic আর তথ্যকণ্টকাকীর্ণ যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তবেই এর মূল্য উদ্দেশ্য সফল হবে দেশও লাভবান হবে।

—জয়শ্রী রায়

সভ্যতার চরম বিকাশের জন্য যে বিরাট সামাজিক আত্মিষ্ববোধের প্রয়োজন তা শুধুমাত্র এক কল্পনাময় আদর্শ দিয়ে তৈরী নয়—তা সত্যকার হৃদয়ানুভূতি ও জীবনাকাঙ্খা দিয়ে গঠিত—যে জীবনাকাঙ্খা মানুষ হৃদয়ের তন্ত্রে তন্ত্রে অনুভব করে এক জীবন্ত খাঁটী সত্যকার সমাজের বাসিন্দা হয়ে।" —কডওয়েল

MACHINERY for

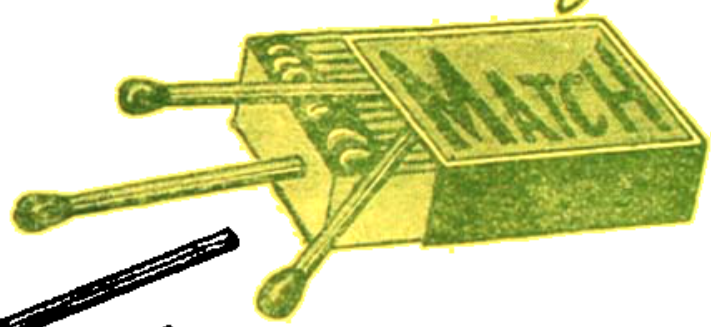

দিয়াশলাই কুটির-শিল্পের সাহায্যার্থে ভারত সরকার প্রতি গ্রোসে নয় আনা excise rebate দিতেছেন। তার সুযোগ গ্রহণ করে গ্রামে দিয়াশলাই কারখানা চালুন বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন।

STANDARD MACHINERY CO.

67B, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA-1

Regd. No. C 3932 January-February 1957 প্রতি সংখ্যা আট আনা

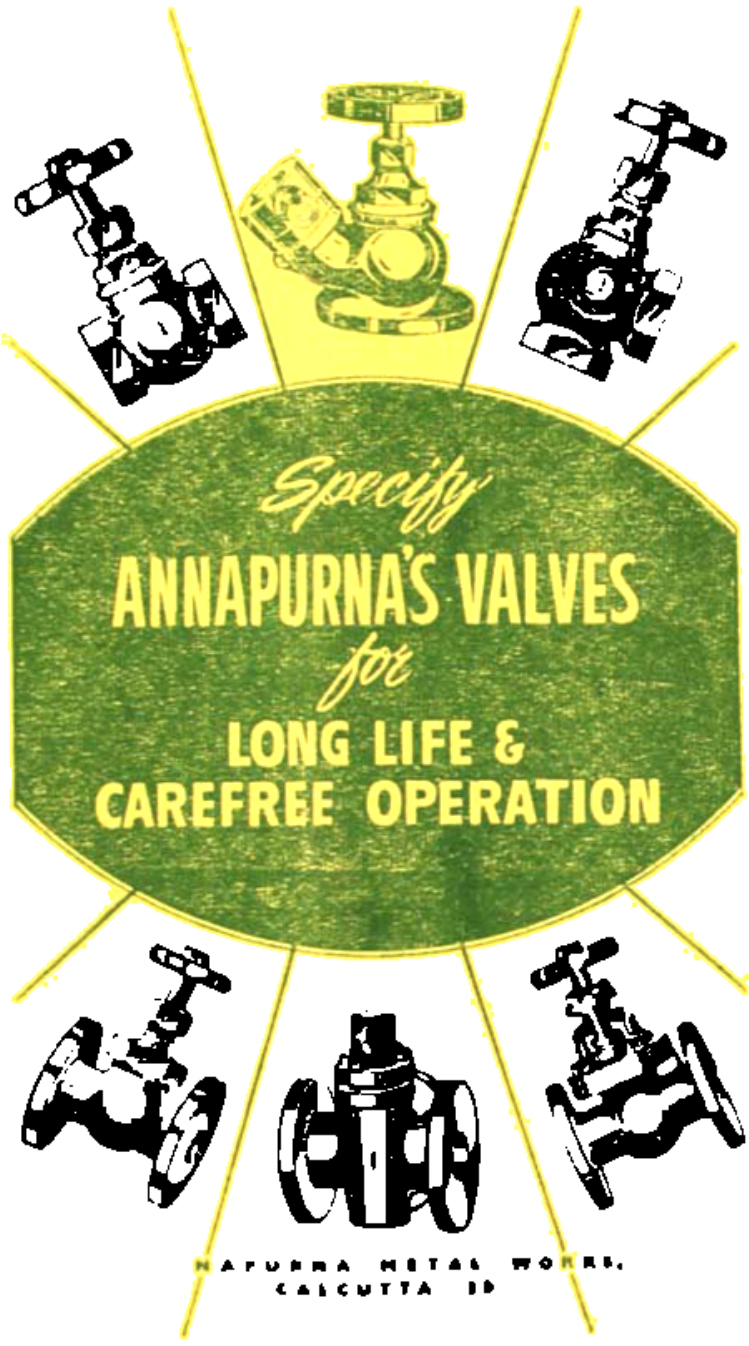

শ্রীরাধাগোপাল পাল কর্তৃক ৬৩।১, বলরাম দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ নিউ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও ৫৮ নং মনোহর দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত

সম্পাদক—জ্ঞানাঞ্জন পাল।

এই সংখ্যায় :

- বিপিনচন্দ্র পাল—কাব্যের লক্ষণ
- কাজী আব্দুল ওদুদ—কাগমারীতে দুই দিন
- অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার জীবন সাধনা
- আমার চোখে দেখা সোভিয়েট দেশ
- গল্প
- কবিতা
- কিশোর জগৎ
- শিশু-কিশোর বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের বিবরণ
- পুস্তক পরিচয়

প্রভৃতি

॥ সূচীপত্র ॥

ফাল্গুন—চৈত্র ১৩৬৩

কাব্যের লক্ষণ—বিপিনচন্দ্র পাল ৩৬৩
কাগমারীতে দুইদিন—কাজী আবদুল ওদুদ ৩৬৯
অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার জীবন সাধনা [২]—হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত ৩৭৩
আমার চোখে দেখা সোভিয়েট দেশ [৪]—ডাঃ কুদরতকুমার পাল ৩৭৭

কবিতা—
ক্রোধ—বিনয় মজুমদার
একটি গোলাপ গাছ—কল্যাণী বসু
কুরুক্ষ—গোপালকৃষ্ণ ভাস্কর
তুমি—গোপালহরি বন্দ্যোপাধ্যায়
পৃথিবীর মানুষকে—সুধীর বসু ঠাকুর
নির্জনতা—সুনীল দাশগুপ্ত

গল্প—
ভয়—ভবানী মুখোপাধ্যায়
চোরালি—আশীষকুসুম ঘোষ
রং-বদল—অরুণ দাশগুপ্ত

কিশোর জগৎ—
বক—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
পানকৌড়ী—সুনীতিকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীকৃষ্ণের বিপদ—অমলেন্দু ভট্টাচার্য

শিশু কিশোর ও বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের উপকরণ
পুস্তক প্রসঙ্গ
সাংস্কৃতিকী

রহস্য উপন্যাস—
শেঠজীর রত্নমুকুট—বিপিনবিহারী রায় ও কানাই রায়

রেডিও-অ্যাক্টিভিটি ও রেডিয়াম—অমরনাথ চক্রবর্তী

॥ পাদপূরণ ॥

শিক্ষার নূতন ধারা—সাহিত্য পরিষদের বক্তব্য ও বিজ্ঞান-পরিষদের নিবেদন
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতৃভক্তি
আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়

॥ পত্রিকা সম্বন্ধে ॥

যুগবাণীর বার্ষিক সডাক মূল্য ছ'টাকা। আষাঢ় থেকে বর্ষ সুরু। সব বিষয়ের মৌলিক রচনাই আমরা সাদরে গ্রহণ করব। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে লিখে সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন। অমনোনীত রচনা উপযুক্ত ডাকটিকিট ও ঠিকানা দেওয়া থাকলে যথাসময়ে ফেরৎ দেওয়া হয়। পত্রিকার সমালোচনার জন্য দু'খানা করে বই সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন। চিঠিপত্র ইত্যাদি সম্পাদকীয় কার্যালয়ে প্রেরিতব্য। নীচে বিজ্ঞাপনের হার দেওয়া হ'ল।

কভার	৪র্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০৲	ভিতরে	পূর্ণ পৃষ্ঠা	৩০৲
ঐ	২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা	৪০৲	ঐ	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৬৲
	১ম অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	২৫৲	ঐ	সিকি পৃষ্ঠা	১০৲

সম্পাদকীয় কার্য্যালয়
৪১-এ, বলদেওপাড়া রোড,

প্রথম বর্ষ | ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৬৩ | অষ্টম সংখ্যা

কাব্যের লক্ষণ

বিপিনচন্দ্র পাল

[এই লেখাটি বিপিনচন্দ্র পালের 'এষা' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে সংকলিত। কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের "এষা"র এই সমালোচনা বাহির হয় ১৩১০ সালের আষাঢ় মাসের "বঙ্গদর্শনে"। এই কাব্যের দীর্ঘ সমালোচনাও তিনি পরে করেন। "এষা" সম্বন্ধে তিনি বলেন :—"আমার মনে হয়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তাঁর এই শোকাত্মক গীতিকাব্যে অক্ষয়বাবু এক অপূর্ব বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন। এমন কি, এই শ্রেণীর কাব্যসৃষ্টির মধ্যে অক্ষয়বাবুর এই "এষা"-খানি বিশ্ব-সাহিত্যেও অতি উচ্চ স্থান পাইতে পারে। ইহাতে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না।" এই সমালোচনার মুখেই তিনি কাব্যের লক্ষণ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। এই প্রবন্ধেরও আমরা নাম দিলাম "কাব্যের লক্ষণ"।—সম্পাদক]

আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলিয়াছেন। রসাত্মকত্ব যে কাব্যের একটা অপরিহার্য লক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে বাক্যে কোন না কোন রস উদ্বেলিয়া না উঠে, তাহা আদৌ কাব্য নহে, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। যাহা মিষ্টি লাগে অর্থাৎ যে বাক্যের ঝঙ্কার আছে, সচরাচর লোকে তাহাকেই রসাত্মক বলিয়া থাকিলেও কিন্তু রস বলিতে কেবল মিষ্টত্ব বোঝায় না। হাস্য অদ্ভুত করুণ রুদ্র প্রভৃতিকে এখানে রস বলা হইয়াছে। এসকল রস যে বাক্যে ফোটে না, তাহা রসাত্মক নয়, তাই কাব্য হইতে পারে না। যে বাক্যে কেবল ঝঙ্কারই তোলে, কাণেই মধু ঢালিয়া দেয়, এবং আপনার স্বরলালিত্যের দ্বারা চিত্তকে নাচাইয়া, ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহা বাক্যহীন সঙ্গীতের তানলয়ের মতন বিবিধ ভাবের দ্যোতক হইলেও প্রকৃত কাব্য হয় না। কাব্য কেবল ধ্বনি নহে, কাব্য বাক্য। বাক্য অর্থযুক্ত শব্দ। সুতরাং কাব্যের রস কেবল ঝঙ্কারে ফুটিলেই চলে না,

সার্থক শব্দেতেও তাহাকে ফুটাইয়া তুলিবে। যে বাক্য আপনার অর্থের দ্বারা হাস্য অদ্ভুত করুণ-ভয়াদি রসকে ফুটাইয়া তোলে, তাহাই কাব্য। কিন্তু কাব্যালোচনায় ইহাই শেষ কথা নহে। রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলিয়া—তাহা না হইলে কাব্য হয় না, আলঙ্কারিকেরা তাহাই নির্দেশ করিয়াছেন। কোন না কোন রসের উদ্রেক যাহাতে না হয়, তাহা কাব্য নহে, কাব্য হইতেই পারে না। কিন্তু কেবল রসবিশেষের উদ্রেক করিতে পারিলেই যে, যে কোন রচনা কাব্যত্বের দাবী করিতে পারে, এমনও নহে। তাহা হইলে কালিদাস-কিংবদন্তীর—

দুগ্ধং পিবতি বিড়ালঃ
চ চৈ তু হি চ চৈ তু হি—

ইহাও কাব্যপদবী প্রাপ্ত হইতে পারিত। ইহাতে রস (যথা দুগ্ধ) আছে, ও চারি চরণও আছে (যথা বিড়ালের); আর পাদপূরণার্থে চ, চৈ, তু, হি প্রভৃতিও আছে। দুগ্ধের রস না হইয়া, হাস্য অদ্ভুতাদি রসের কথা হইলেও কাব্য হয় না। রাম হাসিতেছে, যদু মধু ব্যাদান করিতেছে, কেশব রাগে হাত পা ছুড়িতেছে, গুপ্ত কাঁদিতেছে; এই বাক্যগুলি সকলই রসাত্মক। কিন্তু তাই বলিয়া কি কাব্য হইয়াছে?

এ-জগতের সর্বত্রই এ সকল রস ছড়াইয়া আছে। এমন বিষয় বা বস্তু, অবস্থা বা ব্যবস্থা কিছুই নাই, যার ভিতরে কোন না কোন একটা রস স্বরূপতঃ ফুটিয়া উঠে। কিন্তু তাই বলিয়া এ সকলই যে কাব্যের উপাদান হয়, এমন নহে। হাসিকান্না সংসার ছুড়িয়া আছে; কিন্তু সকল হাসি-কান্নাতেই কাব্য গড়িয়া উঠে না। সুস্বাদ্যি স্থায়ী রসও জনসমাজকে নিয়ত চঞ্চল ও সরস করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এ-সকলের সকলগুলিতেই যে কাব্য সৃষ্টি হয় বা হইতে পারে, তাহা নহে। সন্তানবতী রমণী সংসারে অসংখ্য। সন্তানবাৎসল্যও স্বরূপতঃ সকল মাতার মধ্যেই ফুটিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া সকল মাকে দেখিয়াই গণেশজননীর বা ম্যাডোনার ভিতরে দৈবী প্রতিভাশালী শিল্পী যে অদ্ভুত রস ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তার আস্বাদন পাই না। পথে ঘাটে কত-শতবার কত শত শত রমণীকে আপনার সন্তানের মুখে স্তন দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখা যায়; কিন্তু র‍্যাফেল্ তাঁর ম্যাডোনাতে যে অপূর্ব বাৎসল্য-রসটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, পথে-ঘাটের এই সকল মাতৃমূর্তির ভিতরে তো তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না। ইহার কারণ এই যে, এ-সকল পথে-ঘাটের মাতৃমূর্তিতে বাৎসল্য রসের বিশ্বজনীনত্বটুকু পরিস্ফুট হয় নাই। এসকল রস বিশিষ্ট, বিশ্বজনীন নহে। র‍্যাফেল্ বিশাল বিশ্বের বাৎসল্যকে ছাঁকিয়া আনিয়া, সেই রসে এই অমৃতময়ী জননীমূর্তি রচনা করিয়াছেন। মা-বস্তু রসময়ী, রসাত্মিকা। ম্যাডোনা এই রসের মূর্তি। ম্যাডোনা সকলের মা। বাৎসল্য রস যেমন বিশ্বজনীন, সেই রসের সত্য মূর্তিও সেইরূপই বিশ্বজনীন হওয়া চাই। এই রসের যে মূর্তি, তাহা শ্বেত কৃষ্ণ, হিন্দু ম্লেচ্ছ—সকলেরই প্রকৃত জননী মূর্তি। ম্যাডোনার মাহাত্ম্যই এই যে, ইহা বাৎসল্যের বিশ্ব-মূর্তি। ম্যাডোনা বিশ্বজননী। আর ম্যাডোনার কোলে যে অনিন্দ্যরূপ শিশু প্রভাত-অরুণের আভা অঙ্গে মাখিয়া মাতৃবাহুলীন হইয়া আছে, সেও কোন ব্যক্তিবিশেষের সন্তান নহে, কিন্তু বিশ্বের সন্তান। বিশাল বিশ্বে অগণ্যকোটী জীবের শরীর-মনের ভিতর দিয়া যে বাৎসল্য নিয়ত প্রবাহিত হইয়া, অনন্ত জীবপ্রবাহকে রক্ষা করিতেছে, ম্যাডোনা-সেই নিখিল বিশ্বের মাতৃশক্তিরই প্রতিচ্ছবি। আর তাঁর কোলের এই শিশুটী বিশ্ব-বাৎসল্যের উপজীব্য ও উদ্দীপনা—সন্তানাবস্থায়। এই বিশ্ব সম্বন্ধটীকে বিশদ করিয়াই ম্যাডোনা রসমূর্তি হইয়াছে।

এই বিশ্ব সম্বন্ধটীও কাব্যের একটা অপরিহার্য লক্ষণ। বাক্য একদিকে যেমন রসাত্মক হইবে, অন্যদিকে সে রসটীও আবার বিশ্বজনীন হওয়া আবশ্যক। রসাত্মকতা যেমন, সেইরূপ এই বিশ্বজনীনত্বও কাব্যের বিশেষ লক্ষণ, ইহার একটীকে ছাড়িয়া দিলে, কাব্যের কাব্যত্ব থাকে না। ফলতঃ যে কাব্য কোন না কোন রসের

বিশ্বজনীনত্বকে ফুটাইয়া তোলে না, তাহা যতই কেন প্রতিমধুর বা চিত্তোন্মাদকর হউক না, সে কাব্য শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করা তো দূরের কথা, আদৌ কাব্যত্বেরই দাবী করিতে পারে না। লোককে হাসান, কাঁদান, নাচান, মাতান—এ সকল যে বড় একটা দেশী কথা, তাহা নয়। যাত্রাওয়ালার সং যারা দেয়, তারা সামান্য মুখবিকৃতি করিয়াই বালকের দলকে চাপাইয়া অস্থির করিয়া তোলে। কিন্তু হাস্যরসের অবতারণা করে বলিয়া সেই মুখবিকৃতিকে কেহ কাব্যসৃষ্টি বলিবে না। আর ইহা কাব্যসৃষ্টি নয় এইজন্য যে, হাস্যরসের যে একটা বিশ্বজনীনতা আছে, সে গুণটী এখানে ফুটিয়া উঠে না। সেইরূপ লোককে কাঁদানও সহজ, কিন্তু সেই কান্নার ভিতরে বিশ্বব্যাপী যে ক্রন্দনরোল চিরনিশি প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তার সুর জাগাইয়া তোলা কঠিন। আর যতক্ষণ না সে সুর বাজিয়াছে, ততক্ষণ ক্রন্দনের মধ্যে কারুণ্য জাগে না, আর সে কান্নাতে কাব্যসৃষ্টিও হয় না। দুটা লোককে ধাক্কাধাক্কি করিয়া পরস্পরকে মারিতে দেখিলে দর্শকগণের শরীর মনেও একটা ঘুষোঘুষি করিবার উদ্দীপনা আপনা হইতেই জাগিয়া ওঠে। এই মারামারি ব্যাপারটা যে রসাত্মক ইহাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার ছবি বা বর্ণনাকে কি কেউ কখনও কাব্য বলিবে? বার বৎসর পূর্বে, ব্রিটিশ-বুয়র যুদ্ধের সময় স্তুডিয়ার্ড কিপ্‌লিং এরূপ কবিতা ও গান লিখিয়া ইংরেজ জাতটাকে একেবারে ক্ষ্যাপাইয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু কিপ্‌লিং-এর এ জাতীয় কোন কবিতা সাহিত্যের স্মৃতিমন্দিরে রক্ষিত হইবে কি না, জানি না; এগুলি যে স্থান পাইবে না, ইহা স্থির-নিশ্চিত। ইতিমধ্যেই সে সাময়িক ও সাময়িক উত্তেজনার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কিপ্‌লিংএর সেসকল কবিতাও লোকে ভুলিয়া যাইতেছে। আমাদের নিজেদের ঘরেই তার বিস্তর দৃষ্টান্ত আছে। স্বদেশীর উত্তেজনার ও উদ্দীপনার মুখে ছোট-বড়, নূতন-পুরাতন, কত বাঙালী কবিই তো কত গান রচনা করিয়াছিলেন। সে সময়ে সেগুলি কতই না প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু সে সকলই তো আর কাব্য হয় নাই। এমন কি বাংলার কবীন্দ্র-শিরোমণি রবীন্দ্রনাথও সে সময় যে সকল সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তার কয়টী সঙ্গীতই বা প্রকৃত কাব্যরসের দাবী করিতে পারে? রবীন্দ্রনাথের—

"বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান্!"
"একলা চলো রে।"—

প্রভৃতি অনেক গানে সে সময় দেশের ছেলে-বুড়ো সকলকে ক্ষ্যাপাইয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু কিপ্‌লিংএর প্যাট্রিয়টিক্ গানের মতন রবীন্দ্রনাথের এ-সকল গানেতেও কোনও বিশ্বসুর বাজিয়া উঠে নাই। যে উত্তেজনার জোয়ারের মুখে এগুলি ভাসিয়া আসিয়াছিল, আবার অবসাদের ভাঁটার মুখে আপনি তারা সরিয়া গিয়াছে। এ-গুলি জাতীয় জীবনের বিবর্তনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হইলেও জাতীয় সাহিত্যের স্মৃতিমন্দিরে কখন প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না। আবার এই স্বদেশীর মুখেই এমন ৩।৪টারিটী সঙ্গীত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যাহার ভিতরে বিশ্বসঙ্গীতের সুর বাজিয়াছে, আর সেই জন্য এইগুলি আমাদের জীবনের ও সাহিত্যের চিরন্তন উদ্দীপনারূপে জাগিয়া রহিবে। রবীন্দ্রনাথের "সোণার বাংলা", এইরূপ একটী। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের "আমার দেশ" আর একটি। এই দুইটী সঙ্গীতই প্রকৃত কাব্য। রসাত্মকতা ও বিশ্বজনীনতা এই দুই লক্ষণই এগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। "সোণার বাংলা" ও "আমার দেশ" উভয়েরই দেবতা এই বঙ্গভূমি সত্য। কিন্তু বঙ্গমাতৃকাকে আশ্রয় করিয়া ইঁহাদের কবিপ্রতিভা যে রসমূর্তির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বঙ্গের ভৌগোলিক সীমাতে আবদ্ধ হয় নাই। ফলতঃ রসমাত্রেই বিশিষ্ট আধারেতে ফুটিয়া উঠে। বিশেষ দাসেতে দাস্য, বিশেষ সখাতে সখ্য, বিশেষ পিতা কি মাতাতে বাৎসল্য, নায়ক বা নায়িকা বিশেষেই মধুর রস ফুটিয়া উঠে। এই সকল বিশেষ আধার বর্জিত হইয়া কোন নিরাধার নিরাকার নির্বিশেষ ও সার্বজনীন দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মাধুর্য্য রস জগতে কোথাও নাই। এই

সকল বিশিষ্টের মধ্যেই বিশ্বজনীন রূপমূর্তি প্রকট হয়, তাহাদের বাহিরে হয় না। সুতরাং "সোনার বাংলাদ" কিম্বা "আমার দেশের" অভিধের বঙ্গভূমি বলিয়া ইহাদের মধ্যে দেশভক্তির সার্বজনীন সুরটী বাজিয়া উঠে নাই, বা উঠিতে পারে না, এমন বলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর "বন্দে মাতরম্"—এতে কেবল বাংলার কথাই বলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে মা'র বন্দনা করিয়াছেন, তিনি এই সুফলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্য-শ্যামলা, সপ্তকোটী সন্তানজননী জন্মভূমি। তথাপি এই বিশাল ভারতভূমির যে যেখানে এই গান শুনিয়াছে ও তার অর্থবোধ করিতে পারিয়াছে সেই ইহাকে আপনার দেশমাতার বন্দনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কেহ কেহ সপ্তকোটী কাটিয়া ত্রিংশৎকোটী করিয়াছেন, জানি। কিন্তু এরূপ করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। এই 'বন্দে মাতরম্'—এতে কবি যে সুরটী বাজাইয়াছেন, তাহা কেবল বাংলা দেশমাতার বন্দনাগীতি নহে, কেবল ভারত দেশমাতার বন্দনাগীতিও নহে, তাহা বিশ্বজনীন দেশভক্তির নিত্যসাধ্য ও নিত্যসিদ্ধ সুর। এ সুর যে গ্রামেই গাউক না কেন, সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যেই নিত্যকাল বাজিয়াছে ও বাজিতেছে। ফলতঃ কোনও কাব্যের দেশকালপাত্রাদিতে বিশেষত্ব কদাপি তার বিশ্বাত্মকতঃ বা বিশ্বজনীনতা নষ্ট বা ক্ষুণ্ণ করে না। এই সকল বিশেষত্ব বা বিশিষ্টকে লইয়াই তো এই বিশাল বিশ্বের প্রতিষ্ঠা। এ-সকল বিশিষ্টের সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী। বিশ্ব অঙ্গী, বিশিষ্ট যাহা কিছু তারা এই অঙ্গীর অঙ্গ। অঙ্গীতে অঙ্গসকল প্রতিষ্ঠিত। আবার অঙ্গেতেও অঙ্গী, অঙ্গের কর্মের প্রেরণারূপে, নিগূঢ় ভাবে, নিত্য বিরাজিত। অঙ্গী অঙ্গকে ছাড়িয়া থাকে না, অঙ্গও অঙ্গীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। তবে অঙ্গ কখন কখন মোহবশতঃ আপনাকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবিয়া অঙ্গীকে উপেক্ষা করিতে পারে বটে। আর তখনই অঙ্গেতে অঙ্গীর সুরটী বাজিয়া উঠিতে পারে না। তানপুরার কোনও একটা তার যদি যন্ত্রের অপর তারগুলির সঙ্গে সঙ্গত না বাঁধিয়া আপনি আপনার নিজস্ব ঝঙ্কার তুলিতে আরম্ভ করে, তখন সে যেমন বেসুরা হইয়া পড়ে, সেইরূপ মানুষও যখন বিশ্বসঙ্গীতের অপরাপর তারের সঙ্গে সঙ্গত না করিয়া, কেবল আপনার ক্ষুদ্র বিশিষ্ট বিচ্ছিন্ন সুরটা ভাজিতে থাকে, তখন সেও বিশ্বজনীন জ্ঞান ও রসের ধারা হইতে সরিয়া গিয়া অজ্ঞান ও অরসিক হইয়া পড়িয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দে মাতরং" বলিয়া বঙ্গমাতারই বন্দনা করিয়াছিলেন, সত্য; কিন্তু তাঁর সম্মুখের দেবপ্রতিমা নামরূপের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইলেও যে-সুরে তিনি এই দেবতার ভজনা করিয়াছেন, তাহা বিশ্বের, কোন বিশেষ দেশের বা কালের নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার দেশ" সম্বন্ধেও সেই কথা। এই সঙ্গীতে কবি বাংলার জীবন ইতিহাসটী গাঁথিয়া দিয়া, বাঙ্গালীর নিকটে ইহাকে অদ্ভুত সত্যোপেত, বস্তুতন্ত্র ও শক্তিশালী করিয়াছেন বটে; কিন্তু এগুলি মূল রসের আলম্বন ও উদ্দীপনা মাত্র। সেই রস ফুটিয়াছে

"কিসের দৈন্য, কিসের দুঃখ,
কিসের লজ্জা, কিসের ভয়?"—

এই অপূর্ব ভক্তি, এই অপূর্ব ত্যাগ ও স্পর্ধাতে। আর ফুটিয়াছে শেষ পদে যেখানে কবি দেশমাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,

"দেবী আমার, সাধনা আমার,
স্বর্গ আমার, আমার দেশ!"

এ-ভাব ও ভক্তি কোনও দেশেতে বা কালেতে আবদ্ধ নহে। ইহা স্বদেশপ্রেমিকের সাধারণ ও সার্বজনীন ভাব। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশসঙ্গীত অনেক আছে। তার কোন কোনটাতে যে বিশ্বসঙ্গীতের সুর বাজে নাই, তাহাও নহে। কিন্তু যে তেজ, যে-স্পর্ধা, যে-স্পর্দ্ধা, যে-ভক্তি, যে-নিঃসঙ্কোচ আত্মীয়তা ও নিঃশেষ আত্মদান দ্বিজেন্দ্রলালের এই গানে জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা বাংলা ভাষায় আর কোথাও জাগে নাই। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ সঙ্গীতের মধ্যে "নববর্ষের গান"

"—হে ভারত আজি নবীন বর্ষে,
শুন এ-কবির গান!"

এবং "অয়ি ভুবনমনমোহিনী" এই দুইটীই সর্বোৎকৃষ্ট। এই দুইটীতেই স্বদেশের একটা বিশ্বজনীনতার ভাব রহিয়াছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার দেশ" এই গানে এই সুরটা যতটা শক্তিতে চড়িয়াছে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে ততটা উঠে নাই। আর এই বিশ্বজনীনতার জন্যই দ্বিজেন্দ্রলালের এই সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য।

"এষা"র বিশেষত্ব

যে কারণে বাংলা ভাষার স্বদেশ-সঙ্গীতের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার দেশ" এরূপ অনন্যলভ্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, ঠিক সেই কারণেই, কেবল বাংলার নহে, কিন্তু সম্ভবতঃ সমগ্র সভ্যজগতের আধুনিক সাহিত্যে অক্ষয়-কুমারের এই 'এষা' খানি, শোকসঙ্গীতের মধ্যে একটা অনন্যলভ্য সত্য ও সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ-জগতে বিরহ-বিষাদ বিরল নহে। সৃষ্টির অনাদি আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত জীবন ও মরণ আলোক ও ছায়ার ন্যায় পরস্পরের সঙ্গে নিত্যযুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং—মর্ত্ত্যের ইহা চিরন্তন অভিজ্ঞতা। আর সেই জন্য শোকও মানুষের সাধারণ নিয়তি। যেখানে আলোক সেইখানেই যেমন ছায়া, যেখানে জীবন সেইখানেই যেমন মৃত্যু; সেইরূপ যেখানেই ভালবাসা সেখানেই বিরহ ও শোক। যেখানেই এ-সংসারের দুটী প্রাণীতে কোন প্রেমের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে সেখানেই, বন্ধুরূপের ন্যায়, মৃত্যুর ছায়া ও শোকের নিশ্বাস, তৃতীয় হইয়া তাহাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়ায়। জীবনের মাঝখানেও আমরা মৃত্যুকে ভুলিতে পারি না। মিলনের গভীরতম আনন্দালোকের মাঝখানেও বিরহের কৃষ্ণমেঘ সহসা উড়িয়া বেড়ায়।

"সুমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥

এই বিরহ-ভীতি প্রেমের সার্বজনীন ধর্ম। জননী সন্তান বুকে ধরিয়া যখন এক চক্ষে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন, তখনও আর এক চক্ষু বিরহ আশঙ্কায় শোকজলে ভরিয়া আসে, এবং অমঙ্গল চিহ্ন ভাবিয়া তিনি তখন জোর করিয়া তাহাকে চাপিয়া রাখেন। অন্ধকার রজনীতে পেচকের ধ্বনি শুনিলে কুলকামিনীরা যেমন দূর দূর করিয়া উঠেন, সেইরূপ মানুষ মাত্রেই প্রিয়জন সঙ্গ সুখ মাঝেও এক একবার মৃত্যুর সাড়া পাইয়া, দূর দূর করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতে চাহে। প্রেম যেখানে যত বেশী, শোকভীতিও সেইখানে তত বেশী। জীবনবস্তু যেমন বিশ্বজনীন, মৃত্যু-ব্যাপারও সেইরূপ বিশ্বজনীন। শোকও সেইজন্য একটা বিশ্বজনীন অভিজ্ঞতা। পুত্রশোকাতুরা জননী ভগবান বুদ্ধদেবের নিকটে পুত্রের প্রাণ চাহিতে আসিয়াছিল। তিনি তাহাকে বলেন, "যে বাড়ীতে কখন কেউ মরে নাই, সে বাড়ী হইতে এক মুষ্টি শস্য ভিক্ষা করিয়া লইয়া আইস, তোমার পুত্রকে বাঁচাইয়া দিব"। দেশময় ঘুরিয়া অবোধ রমণী এমন ভিক্ষা কোথাও পাইল না। তখন বুদ্ধদেবের কৃপায় তার বিবেক জাগিয়া উঠিল। শোক কে না পাইয়াছে? মৃত্যুর হাহাকার কার প্রাণে না উঠিয়াছে? এমন কে আছে যে এ সংসারে স্নেহপ্রেমাদির আস্বাদন করিয়াছে, অথচ মৃত্যুর তীব্র বিষাক্ত হুল যার মর্মে বিঁধিয়া যায় নাই? অক্ষয়কুমারের এই গীতিকাব্যের উৎপত্তি শোকে, ইহার বিষয় জীবনমৃত্যুর নিত্য সমস্যা। এ অভিজ্ঞতা বিশ্বজনীন। এ সমস্যা সার্বজনীন। আর সেই জন্যই ইহা কাব্য সৃষ্টির উৎকৃষ্ট উপকরণ।

অনেক লোকে এই সামান্য কথাটা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাহা ভাবে, শোকটা শোকার্তের অন্তরঙ্গ বস্তু, তাহা নিজস্ব জিনিষ। দম্পতির শয়নকক্ষপ্রকোষ্ঠ যেমন অপরের দেখিবার নয়; সে প্রকোষ্ঠের কবাট খুলিয়া দিলে মাধুর্যের মর্যাদা নষ্ট হইয়া যায়; শোক এবং বিরহও সেইরূপ দুনিয়াকে দেখাইবার বা জগতে জাহির করিবার বস্তু নহে, বহিঃপ্রকাশে তার গুরুত্ব ও পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। সত্য ও গভীর শোক আপনার চাপে আপনি প্রাণের ভিতর জমাট বাঁধিয়া উঠে, চোখের ভিতর দিয়া পর্যন্ত গলিয়া বাহির হয় না, মুখে ব্যক্ত হওয়া তো দূরের কথা। শোকের প্রথম প্রকোপে তাহাই হয় বটে, কিন্তু এই জমাট, নীরব, নিরুদ্ধ শোক তখন কেন্দ্রীভূত, ব্যক্তি-বিশেষের অনুপ্রমাণ প্রাণের মধ্যে নিশ্চিষ্ট ও নিবদ্ধ। শোকার্ত তখন আপনি আপনাতেই নিমগ্ন। আপনার মায়ায় আপনি দৃষ্টিহীন। আপনার ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের ভাবে ও ভাবনায় আপনি আচ্ছন্ন। শোকবস্তু যে কেবল তার নিজের নয়, সকলের, জগতের, বিশ্বের—বিধান; এ কথা তখন সে ভুলিয়া গিয়াছে, মনে করাইয়া দিলেও তার বিপরীত অর্থ করিয়া লয়; বলে—"তাতে আমার কি হইল? আরও দশজনের প্রাণ পুড়িয়া ছাই হইয়াছে বলিয়া, সে ছাই যাদুমাটা যে আমার হবে না, বা কমিবে, তার তো কথা নাই!" সহৃদয় স্বজনবর্গ যত তাহাকে নিজের আলোহীন, বায়ুহীন, রুদ্ধহীন, স্পন্দনহীন আধিরের মধ্য হইতে টানিয়া বাহিরে আনিতে চান, ততই সে ফুঁড়ে করিয়া সেই বিবরেই আরও ঢুকিয়া যাইতে চাহে। শোকটা এইরূপে যে আমারই ভাবে, সে কারণে তার বিশ্বজনীনতা উপলব্ধি করিতে পারে না। এই শোক তামসিক। ইহা ভ্রমপ্রমাদাদি প্রসূত। এ-শোক স্নেহসর্বস্ব ও অহং সর্বস্ব। এই স্থূল, জড়, কঠোর বস্তু লইয়া কোমল কাব্য-সৃষ্টি সম্ভব হয় না।

কিন্তু শোকের আর একটা দিকও আছে। শোকের আঘাতে মানুষ যেমন কখন কখন দৃষ্টিহীন হইয়া পড়ে, সেইরূপ কখন কখন দিব্যদৃষ্টিও লাভ করিয়া থাকে। যে-স্নেহ, যে-প্রেম, যে-সেবা জীবনে এক আধারেতে নিবদ্ধ হইয়াছিল, মৃত্যু যখন সে আধার হরণ করিয়া লইয়া যায়, তখন প্রথমে নিরাশ্রয় প্রেম কিছুকাল হাহাকার করে, কিন্তু ক্রমে বিশ্বময় ছড়াইয়াও পড়ে—কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও তো দেখা গিয়াছে। ফলতঃ ইহাই বিশ্ববিধানে শোক ও বিরহের বিধাতৃনির্দিষ্ট নিয়তি। এই নিয়তি লাভ না করিলে, শোক ও বিরহ কদাপি সমাজ সঞ্চালনে সমর্থ হয় না। আর শোক যখন শোকার্তের ক্ষুদ্রজীবনের সঙ্কীর্ণ পরিধিকে ছাড়াইয়া গিয়া বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হয়, তার দুঃখ যখন জগতের দুঃখ, তার বেদনা যখন বিশ্বের বেদনা, তার সমস্যা যখন বিশ্বসমস্যা হইয়া পড়ে, তখনই সে খাঁটি কাব্যের উপযোগী উপাদান হইয়া উঠে। শোকে তখন আমার তোমার এ ভেদাভেদ থাকে না। তখন ইহা বিশ্বে ছড়াইয়া যায়।

শোক যখন এই বিশ্বজনীনত্ব প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা প্রকৃত কাব্যসৃষ্টির উপকরণ হইয়া থাকে। অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁর 'এষা'কে যে শোকের উপরে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা এই বিশ্বজনীনত্ব লাভ করিয়াছে। এই জন্যই তাঁর নিতান্ত নিজের কথা ও ব্যথা যাহা, তাহাও তোমার আমার সকলেরই কথা ও ব্যথা হইয়া পড়িয়াছে। 'এষা'র স্নেহত্বের মূল তত্ত্বটী এই। কবি এখানে সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে একাত্ম হইয়া, সমগ্র মানব প্রাণের সঙ্গে সঙ্গত করিয়া, তবে আপনার শোকগাথা গান করিয়াছেন। তাই তাঁর 'এষা'র মধ্যে প্রত্যেক শোকার্ত পাঠক আপনাকে দেখিতে পাইয়া, এবং আপনার অন্তরের শোকের বা শোকস্মৃতির বিশ্বজনীনত্বটুকু উপলব্ধি করিয়া চকিত, স্তম্ভিত, পুলকিত হইয়া উঠেন।

সাংস্কৃতিক সম্মেলন

কাগমারীতে দুইদিন

কাজী আবদুল ওদুদ

সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার কাগমারী ও সন্তোষগ্রামে যে বিখ্যাত সাংস্কৃতিক সম্মেলন হ'ল তাতে যোগ দেওয়ার সুযোগ আমার ঘটেছিল—সহযাত্রী ছিলেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, মাদাম সোফিয়া ওয়াদিয়া, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারাণী দেবী ও প্রবোধ সান্যাল মহাশয়। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর ছিলেন এই ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা। ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সন্ধ্যায় আমরা ঢাকায় পৌঁছিলাম আর সেখানকার ডেপুটি হাই-কমিশনার মশাইএর স্থানে ঘণ্টা দু'য়েক বিশ্রাম করে' আমরা মোটরে কাগমারীর দিকে রওনা হলাম। একটি নতুন, বড় রাস্তা তৈরী হচ্ছে—সেইটি ধরে' আমরা চল্লাম। রাস্তাটির কয়েকটি জায়গায় পুল তৈরী এখনও শেষ হয়নি; শেষ হলে এটি বেশ একটি ভালো রাস্তাই হবে। আমাদের পথে পড়ল পূর্ববঙ্গের সুবিখ্যাত লোকসেবক রণদা সাহা মহাশয়ের উন্নত ধরণের হাসপাতাল-স্কুলআদি শোভিত নির্মাপুর গ্রাম। আমরা প্রায় দশটায় কাগমারী সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হলাম। পলিত কেশ, পলিত শ্মশ্রু কিন্তু যুবার মত কর্মতৎপর মৌলানা ভাসানী পরম আদরে আমাদের গ্রহণ করলেন।

সন্তোষের জমিদারদের বাড়ীঘর যেখানে সেই আঙিনায় অনেকখানি জায়গায় অনেকগুলি তাঁবু খাটিয়ে অতিথিদের বাসস্থানের আয়োজন করা হয়েছিল। বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থাও করা হয়েছিল 'ডাইনামো' বসিয়ে। সহর থেকে বহুদূরে পল্লী অঞ্চলে বহুদেশ থেকে আসা লোকদের জন্যে বাসস্থান ও আহার্যের যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যে কোন কর্মীই স্বীকার করবেন তা' সুব্যবস্থা। মৌলানা সাহেবের তরুণ অনুবর্তীরা যে এতোখানি কর্মকুশলতার পরিচয় দিতে পেরেছেন এটি একালের পূর্ববঙ্গের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা।

আমাদের কাগমারীতে পৌঁছান'র পূর্বেই আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক অধিবেশন শেষ হয়েছিল। শুনলাম, আওয়ামী লীগের দুইদলের মধ্যে বিরোধ ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল কিন্তু সে সঙ্কট তাঁরা কাটিয়ে উঠেছেন—আওয়ামী লীগের পূর্বানুসৃত নীতিকেই তাঁরা প্রধান নীতি বলে স্বীকার করে নিয়ে। কালধর্মে যে আওয়ামী লীগের লোকদের কিছু নতুন পথে চলবার প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে সে কথাও অবশ্য রাজনৈতিক অধিবেশনে উঠেছিল।

মৌলানা সাহেবের সঙ্গে দু'একটি কথা বলার সুযোগ হলেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কাগমারীতে যে সাংস্কৃতিক সম্মেলন আহ্বান তিনি করেছেন তাতে তাঁর প্রধান করণীয় কি? তাঁর কথায় বুঝলাম—এবং আরও কারো কারো কাছে শুনেছিলাম—কাগমারীতে তিনি একটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করতে চান। তা'তে আধুনিক মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, একটি মাদ্রাসা থাকবে আর কারিগরী শিক্ষার আয়োজনও থাকবে। শুনেছিলাম ডাঃ জাকির হুসেনকে এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনে তিনি পান—এইটি তিনি বিশেষ ভাবে কামনা করেছিলেন কিন্তু অসুস্থতার জন্য ডাঃ জাকির হুসেন এই সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারেন নি। মৌলানা সাহেবের কথায় আরও বুঝলাম এই অঞ্চলে বারোটি গ্রাম নিয়ে একটি পল্লী-পূর্ণ সংগঠন ব্যাপারের পত্তন তিনি করতে চান—যার উদ্দেশ্য পল্লীকে অনেকখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ করা।

বলা বাহুল্য এই পরিকল্পনার বেশিদূর অগ্রসর হতে তিনি পারেন নি। এবং পারেন নি বলে তাঁর যতটা দুঃখ তাঁর বহু কথায়ই প্রকাশ পেল দেখলাম। পাকিস্তানের খাতনামা নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ কোথায় সে সম্বন্ধে তিনি বল্লেন:

আমাকে এঁরা ধরে নিয়েছেন আমি কম্যুনিস্ট। কিন্তু আমি কম্যুনিস্ট নই। হাকুল্লাহ্ (জগতের স্রষ্টা আল্লার প্রতি কর্তব্য) আর হাকুল্-এবাদ (সৃষ্ট জীবের প্রতি কর্তব্য) আমাদের ধর্মে মানুষের কর্তব্যকে এই দুই বড় ভাগে ভাগ করা হয়েছে কিন্তু আমাদের নেতারা হাকুল-এবাদের (সৃষ্ট জীবের প্রতি কর্তব্যের) কথা আগাগোড়া ভুলে রয়েছেন। কিন্তু এমন ভুলে থাকলে কি চলবে?"

চলবে যে না সে সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিলেন, বল্লেন—"একসময়ে কয়েকটি শিক্ষিত যুবক আমার কাছে এসে বলল 'আমরা ডাকাতি করব সেই এরাদা (অনুমতি) আমাদের দিন।' আমি বল্লাম 'কেন'। তারা বল্লে 'কোনও চাকরী আমরা পাই না' আমি তাদের মাষ্টারী করার কথা বল্লাম, তারা বল্লে—'মাষ্টারী করে পেটের ভাত তো ছোটেই না, বরাদ্দ মাইনেও পাওয়া যায় না।

আর একটি ঘটনার কথা বল্লেন—একদিন একটি অল্পবয়স্ক ছোকরা, বোধহয় ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে, আমার সামনে এসে সোজা প্রশ্ন করল, 'আপনিই তো মৌলানা ভাসানী', আমি বল্লাম লোকে তাই বলে। সে বল্লে, রোজ রোজ সভা করে পল্টনের (ঢাকার পল্টন ময়দানের) মাটি ক্ষয় করেন কাদের (কেন)? আমি তাকে একটু শান্ত করবার চেষ্টা করে বললাম 'বাবা, সবতো বুঝি না, যা বুঝি তাই করি, কি করলে ভালো হয় তুমিই সেই বুদ্ধি দাও।' সে বললে 'আপনি কি দেশের ইতিহাসের খবর রাখেন না?' আমি বললাম 'কোন্ ইতিহাসের খবর বলছ?' সে বললে 'কেন, আমাদের দেশের যারা বোমা-পিস্তল দিয়ে অত্যাচারের অত্যাচারের জবাব দিয়েছিল। আজ যারা অত্যাচার করছে, লুঠ করছে তাদেরও সাবাড় আমাদের করতে হবে তারপরে অন্য কথা। যদি পারেন তবে সেই পথে চলুন আর না পারলে মসজিদে গিয়ে আল্লা-আল্লা করুন—অনর্থক সভা করে পল্টনের মাটি ক্ষয় করবেন না।"

গভীর দুঃখে মৌলানা সাহেব বললেন, অভ্যাসে ব্যর্থতায় দেশ চলেছে বিপ্লবের পথে, কে ঠেকাবে তাদের।

পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি ক্রমাগত অবিচার করে চলেছে—এইটিও মৌলানা সাহেবের একটি বড় অভিযোগ। তিনি বলেন—উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিদেশ থেকে যে সব সাহায্য পাওয়া গেছে তার দশভাগের একভাগও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয় হয়নি।

পশ্চিম পাকিস্তান সম্পর্কে মৌলানা সাহেব এইসব উক্তি করেন বহুলোকের সামনে। তাঁর সুবিখ্যাত আসসালামো এলায়কুম উক্তিতে তাঁর এই অভিযোগই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

অসংলগ্ন, শুধু অসংলগ্ন নয় পরস্পরের থেকে বহুদূরে অবস্থিত দুইটি অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত; সেক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা কেমন করে পূর্ব পাকিস্তানের লোকদের প্রতি এতখানি অবিচার করার কথা ভাবতে পারেন, এই প্রশ্ন কয়েকজন শিক্ষিত পাকিস্তানীকে আমি করেছিলাম। তার উত্তরে একজন বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে তিনি বলতে শুনেছেন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে একটি বোঝা, তার ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত। আঞ্চলিক মনোমালিন্য ও অবনিবনা ভারতেও দেখা দিয়েছে। বিস্তৃত ব্যবধানযুক্ত পাকিস্তানের দু-অঞ্চলের মধ্যেও যে দেখা দিবে এও কতকটা অপরিহার্য। ভারত ও পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রের নেতাদের সামনে এই একটা বড় রকমের সমস্যা।

মৌলানা ভাসানীর অভিযোগ ও আবেদন পশ্চিম পাকিস্তানে কতখানি গ্রাহ্য হবে, তা তাঁরাই জানেন ভালো। কিন্তু নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধী ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করতে হবে মৌলানা ভাসানীর দাবীর যাথার্থ। কথায় কথায় বহুলোকের সামনে তিনি বল্লেন তাঁকে সরিয়ে দিতে পারলে পূর্ব পাকিস্তান অনেকখানি নিশ্চিন্ত হতে পারা যায় এমন ধারণাও কারও কারও আছে। দীর্ঘকাল ধরে তিনি দেশের উন্নতির জন্য সংগ্রাম করে চলেছেন কিন্তু সেই সংগ্রামে এপর্যন্ত ব্যর্থতাই মুখ্যভাবে তাঁর লাভ হয়েছে। হয়ত সেই ব্যর্থতাই তাঁর এমন ধারণার মূলে। কিন্তু আমরা দেখছি, পলিতকেশ আর

দূরার মতন কর্মতৎপর মৌলানা ভাসানীর ভিতরে চিরন্তন ইতিহাসের পুনরাভিনয়। শিক্ষায় তিনি একজন প্রাচীন-পন্থী মৌলানা কিন্তু সেই প্রাচীনপন্থার ভেতর থেকে তিনি উদ্ধার করে এনেছেন নতুন-করে মানুষ গড়ার চিরকালের দাবী ও প্রয়োজন। এই গড়নদারের হাতে তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামের সাক্ষী পূর্ববঙ্গ কি রূপ নেবে সেটি একটি পরম কৌতূহলের বিষয় সন্দেহ নেই। বাংলা দেশের পশ্চিমাংশে বহু পণ্ডিত ও আদর্শবাদীর জন্ম হয়েছে। তাঁদের সেই সাধনা আজ পরিম্লান। কিন্তু সাধনা মরে না। অন্ততঃ বাংলার পূর্বাঞ্চলে আমরা একালে একজন হাজ্‌লএব্যাড-তন্ত্রের নির্ভীক ও অক্লান্ত কর্মযোগীকে পেলাম। তাতে দেশ ও দেশের লোকদের সম্বন্ধে নতুন করে আমরা শ্রদ্ধান্বিত হলাম। গীতায় বলা হয়েছে—কল্যাণকৃৎ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। কোরাণেও বলা হয়েছে—আল্লা সদনুষ্ঠানকারী আত্মার পুরস্কার ব্যর্থ হতে দেন না। আমাদের দেশের একালের এই পরমশ্রদ্ধেয় সদনুষ্ঠাতা তাঁর যোগ্য পুরস্কার লাভ করুন, এই প্রার্থনা করি।

(২)

কাগমারীতে ৯ই ও ১০ই ফেব্রুয়ারী যে সাংস্কৃতিক সম্মেলন হয় বিশেষভাবে তাতে যোগদান করার জন্যই আমরা গিয়েছিলাম। দুই দিনই বেলা ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক সম্মেলন হলো; দুপুরে হ'ল লাঠি-চালসড়কির খেলা, রাত্রিতে হ'ল জারি গান ইত্যাদি। সাংস্কৃতিক সম্মেলনে পাঁচ হাজার থেকে আট হাজার লোক উপস্থিত থাকত। সমস্ত সম্মেলনটিতে অসাধারণ লোক-সমাগম হয়েছিল। শুনলাম একদিন একলক্ষেরও বেশী লোককে খাওয়ান হয়েছে। "চাকার সংবাদে" এ প্রকাশিত হয়েছিল, অভ্যাগতদের আপ্যায়নের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল কয়েকশত মণ মাছ ও সব্‌জী এবং বহু খাসী ও মুরগী প্রভৃতি।

সাংস্কৃতিক সম্মেলনে অনেকগুলি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়েছিল, তার বেশির ভাগই পূর্ব পাকিস্তানের সংগঠন সম্পর্কে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধেও কয়েকটি প্রবন্ধ পঠিত হয়েছিল। প্রথমদিন অর্থাৎ এই প্রবন্ধ পাঠের পরে শ্রোতারা আগ্রহ প্রকাশ করলেন হুমায়ুন কবীর সাহেবের কাছ থেকে কিছু শোনবার জন্য। তিনি এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের প্রতি ও পাকিস্তানের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। উপসংহারে তিনি বলেন—জগৎ আজ অত্যন্ত ছোট হয়ে গিয়েছে। প্রতিবেশীর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হও, সকলের শুভকামনা কর। এসব আজ আর উচ্চাদর্শের সুভাষিত কথাই নয়—এসব আজ মানুষের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে অধ্যাপক কবীরের ভাষণে শ্রোতারা আনন্দ প্রকাশ করলেন।

পরদিন অর্থাৎ ১০ই প্রবন্ধাদি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় প্রতিনিধি তাঁদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অনেকগুলি বই কাগমারী শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য উপহার দিলেন। তিনি মৌলানা ভাসানীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন এই কথা স্মরণ করে যে একই সঙ্গে তাঁর ভিতরে যুক্ত হয়েছে সেকালের হৃদয়বান্ অতিথিবৎসল মানুষ আর একালের অক্লান্ত পুনর্গঠনশীল মানুষ।

মৌলানা ভাসানীকে আমিও আমার দু'খানি বই উপহার দিয়েছিলাম আর সভায় আন্তরিক প্রীতি ও ধন্যবাদ নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে দু'টি প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনাও করেছিলাম। তার একটি ডক্টর এনামুল হকের 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য' সম্বন্ধে, অপরটি আমেরিকার সাংস্কৃতিক কর্মী মিঃ গার্থ-এর 'আমেরিকান কালচার' সম্পর্কে ডাঃ এনামুল হকের প্রতিপাদ্য ছিল—মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের উপরে সুফী প্রভাব যে কত বেশি তা এপর্যন্ত স্বীকৃত হয়নি মন্তব্য করেন চণ্ডীদাসের বিখ্যাত উক্তি—

শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই

শেখ্ সাদীর বিখ্যাত ওরিকৎ বহুৎ খেদ্ মতে খাল্‌ক্ নিস্‌ত্‌ ইত্যাদি বাণীর দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর উক্তি সম্বন্ধে বলাম, সুফী সাধনা ও সাহিত্যের প্রভাব বৈষ্ণব সাহিত্য ও সাধনার উপর যে পড়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই কিন্তু একথা ভুললেও চলবে না যে মুসলমানদের বাংলায় আগমনের পূর্বেই জয়দেবের গীত-গোবিন্দ রচিত হয়েছিল আর দাক্ষিণাত্যে ভক্তি-ধর্মও যে বহুশত বছর পূর্বে দেখা দিয়েছিল তা ঐতিহাসিক সত্য। আর....'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই বিখ্যাত উক্তিটির যে ব্যাখ্যা এনামুল হক সাহেব দিয়েছেন তা একালের জনপ্রিয় ব্যাখ্যা। সেকালের রসিকরা মানুষ বলতে যে বিশেষভাবে গুরু বা উৎকর্ষপ্রাপ্ত মানুষ বুঝতেন তা এনামুল হক সাহেবের মতন পণ্ডিত ব্যক্তির না জানবার কথা নয়। মিঃ গার্থ-এর 'আমেরিকান কালচার' সম্বন্ধে লেখাটিতে কথাগুলি বেশ গুছিয়ে বলা হয়েছিল, আমি তাঁর প্রশংসা করলাম। কিন্তু তাঁর যে মুখ্য প্রতিপাদ্য ছিল আমেরিকার সংস্কৃতি ও সাহিত্য বেশ দায়ীত্বশীল ও বিচারশীল হয়ে উঠেছে—সে সম্বন্ধে আমি বলাম—অনেক সংস্কৃতিই কালে কালে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে, সেইসঙ্গে মারাত্মক দুর্বলতারও পরিচয় দিয়েছে। 'ভারত-বর্ষের আর্যরা বলেছিলেন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' আর সেই সঙ্গে বলেছিলেন—'ছুঁসনে।' মুসলমানরা প্রচার করেছিলেন মানুষের ভ্রাতৃত্ব, সেই সঙ্গে ভেদরেখা টেনেছিলেন মুসলমান আর যাদের কাফের বলেছিলেন, তাদের মধ্যে। একালের ইউরোপীয় সংস্কৃতি মানুষের মর্যাদার কথা, বিজ্ঞানের কথা প্রচারিত করেছে সেই সঙ্গে স্পষ্ট ভেদরেখা টেনেছে সাদা কালোর মধ্যে। একালের ইউরোপ ও আমেরিকার সংস্কৃতির ভিতরে এই যে মারাত্মক দুর্বলতা রয়েছে এসম্বন্ধে ইউরোপ ও আমেরিকার লোকেরা যদি পুরোপুরি সচেতন না হ'ন তবে তাঁদের সার্থকতাও পূর্ববর্তীদের চাইতে উঁচুদরের হওয়ার কথা নয়।

* *

কাগমারীতে আনন্দে দুইদিন কাটিয়া আমরা ঢাকার দিকে রওনা হলাম। ১০ তারিখে বিকেলে,—চন্দুরে বৃষ্টি হয়েছিল—পথে বেরিয়ে দেখলাম পথ খারাপ হয়ে গিয়েছে। টাঙ্গাইলের একটি স্কুলে আমাদের দু'চার কথা হলো। সেখান থেকে যখন রওনা হলাম তখন বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল, সোজাসুজি ঢাকায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় বিবেচনা ক'রে আমরা ময়মনসিংহ-এর পথ ধরলাম কিন্তু সে পথেও পড়ল দুটো নদী। যথেষ্ট কষ্টে খেয়ায় পার হয়ে রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় আমরা যখন ময়মনসিংহ টেশনে পৌঁছালাম তখন শুনলাম কয়েক মিনিট আগে ঢাকার গাড়ী চলে গিয়েছে। আমাদের সঙ্গে ছিলেন ঢাকার ভারতীয় হাই-কমিশনার আপিসের দুইজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, তাঁদের কর্মকুশলতার গুণে এত দুর্যোগেও আমাদের তেমন কোন কষ্ট হয়নি বলতে পারা যায়। ১১ই সকাল নয়টায় আমরা ঢাকায় পৌঁছালাম। সেদিন সন্ধ্যায় ভারতীয় হাই কমিশনারের বাড়ীতে যে প্রীতি সম্মেলন হ'ল তা' খুব উপভোগ্য হয়েছিল, বিশেষ ক'রে কবিতা আবৃত্তির ভঙ্গে আমরা ভারতীয় প্রতিনিধিরা প্রায় সবাই পর পর রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতা আবৃত্তি করলাম। পরদিন সকালে দুইজন ভারতীয় প্রতিনিধির পাঁচজনই রওনা হয়ে গেলেন শুধু আমি ১৫ তারিখ পর্যন্ত কাটালাম কন্যার গৃহে। আর শুনলাম কাগমারীর সাংস্কৃতিক অধিবেশন নিয়ে ঢাকার ছাত্রদের মধ্যে যে দলাদলি ও মারামারি হ'ল তার কথা। সৌভাগ্যক্রমে সেই অপ্রীতিকর ব্যাপার চুকে গিয়েছে, মনে হয়। এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির দিনে ভারতীয় প্রতিনিধিদের দিকেও কারা ছোঁড়া হয়েছিল এই বলে যে তাঁরা ভারতের চর। মৌলানা ভাসানীর মত দেশপ্রেমিককে যাঁরা ভুল বোঝেন তাঁরা ভারতীয় শুভেচ্ছাবাহী দলকেও যে ভুল বুঝবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? তবে আমরা আশা করে থাকব এ ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে। ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে মৈত্রী চাই-ই—তাদের অস্তিত্বের জন্যই অকৃত্রিম মৈত্রীর প্রয়োজন —এ ভারত আর পাকিস্তানের জন্য অনস্বীকার্য সত্য। সার্থকতাকে যারা চায় সত্যকে তাদের স্বীকার করতেই হবে।

(অন্নদাশঙ্কর রায় কর্তৃক অনুলিখিত)

---

* "সর্ব মানুষের অথবা তাঁদের সেবা ভিন্ন আর কিছু নয়, জপমালা, আসন ও আলখাল্লার ধর্ম নেই।"

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার জীবন সাধনা

হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত

[দুই]

জন্ম নেয় কত মানুষ। মা-টি মায়ের কোলে তাদের কাছ খেয়াল খেলার পালা শুরু হয়। আবার এক সময় শেষ হয়। কেউ তাদের কথা মনে রাখে। কারুর কথা বাড়িয়ে বলে লোকে। কারুর কথা তেমন ভাবে বলেনা। দেশে দেশে, সেই কালে তার কত নাম ছড়ায়! হয়তো এক দেশেই কালে কালে সম্রদ্ধ স্মরণে জাগে অন্য কোন নাম। এক দেশে কি এক কালে, সব দেশে বা সব কালে যার মাথা ছাপিয়ে ওঠে অন্য মানুষদের, তাকে বলি মহামানুষ।

মহামানুষের কাজের প্রকৃতি ভেদ আছে। নূতন আলো এনে দেন। কেউ পুরাণো তত্ত্বে নতুন কালের ব্যাখ্যা দেন। কেউ চিন্তার অনুশীলন শিক্ষা দেন। কেউ কর্মতৎপরতার প্রবাহ রচনা করেন। বহুদূর পথ তাঁদের অতিক্রম করতে হয়। পথ কাটতে হয়।

যুগযাত্রীদের কত কুটিল জটিল পথ ঘুরে ফিরতে হয়। শুরু করা কত কাজ সেই কালে সেই দেশে স্বীকৃতিও পায় না। তাঁদের কত কঠিন প্রয়াস লঘু চপলতায় জাতি দেশ অমর্যাদার চিহ্নে ম্লান করে দিতে চায়।

একটু যদি বিচার করতে বসি।

যদি যাই বিজ্ঞানের মহাকেন্দ্র জার্মাণীতে?

জার্মাণীর উলম সহর। ১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ একটি ছেলের জন্ম হল। ধর্মে ইহুদী। জাতে জার্মাণ। বাপের নাম হার্মান, মায়ের নাম পলিন। ছেলেটির নাম অ্যালবার্ট।

জার্মাণীর সেরা সহর মিউনিকে হার্মান বওনা দিলেন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে। সেখানে বিদ্যুতের যন্ত্রপাতির ব্যবসা শুরু করলেন। ছোট ব্যবসা। কেনা বেচা চলে। যা আয় হয় তাই ভেঙ্গে, কখনও মূলধন খরচ করে সংসার চালাতে হয়। ১৮৯৪ সালে ব্যবসা উঠিয়ে দিতে হল।

নতুন দেশে গেলে সুবিধা হতে পারে ভেবে ইতালীর মিলান সহরে হার্মান পরিবার রওনা হয়ে গেলেন।

অ্যালবার্টকে রেখে দেওয়া হল মিউনিকে।

ছেলে মানুষ। মন আনচান করে। বাপ-মা ভাই-বোনদের ছেড়ে থাকতে ভাল লাগে না। পরীক্ষায় ইচ্ছা করে খারাপ ফল করলে। তারপর চুটুমি করে দরখাস্ত করলে—তার শরীর টিকছে না। দরখাস্ত মঞ্জুর হয়ে গেল। ইতালীর মিলান সহরে মিলন হল বাপ-মার সঙ্গে অ্যালবার্টের।

অ্যালবার্টের যখন পাঁচ বছর বয়স তাকে তার বাবা একটি দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র দেখিয়েছিলেন। কাঁটাটা ঘুরে ফিরে একটা দিকেই এসে দাঁড়ায়। অ্যালবার্ট অবাক্। হাত দিয়ে নাড়া না দিলেও জিনিষ নড়ে চড়ে। শুধু তাই নয় নড়ে-চড়ে দাঁড়ায় একটা জায়গায়। বুদ্ধিমান ছেলের মত। যত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথাই জিজ্ঞেস করাবে তার ভুল হয় না।

১৯২১ সালে এই অ্যালবার্টকে নোবেল পুরস্কার দিতে হল।

১৯৩৩ সালে জার্মাণীর কর্তা-কর্তা বিধাতা অ্যাডলফ্ হিটলার তাড়িয়ে দিলে অ্যালবার্টকে ঘোষণা করলে তার মাথার দাম—কেউ যদি তাকে জার্মাণীর ত্রি-সীমানার পারে, মেরে এনে দিতে পারে পাবে সেই দাম।

বার্লিন সহরে অ্যালবার্টকে ভালবাসা দিয়ে একটি বাড়ী উপহার দিয়েছিল সহরের বাসিন্দারা। বাড়ী ছেড়ে, দেশ ছেড়ে অ্যালবার্ট চললেন ভিন দেশে।

১৯৩৯ সালের ২রা আগষ্ট আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের কাছে অ্যালবার্টের লেখা

চিঠি গেল : অণু-পরমাণুর ভেতরে শক্তি আছে যা দিয়ে শহর তোলপাড় করে দেওয়া যায়।

১৯৪০ সালের ২রা অক্টোবর আমেরিকা অ্যালবার্টকে তার নতুন দেশ দিল। অ্যালবার্ট হলেন আমেরিকার নাগরিক।

আমেরিকার সবচেয়ে বড় শহর নিউইয়র্কে নদীর ধারের প্রার্থনা মন্দির ভবনে পাথরে খোদাই করা হচ্ছে ছ'শো জন মহামানুষের নাম। কোনটা ধর্মে, কোনটা শিল্পে, কোনটা ইতিহাসে এমন ভাবে আলাদা আলাদা করে রাখা আছে নামের ফলকগুলি।

একটি ফলকে চৌদ্দটি নাম লেখা আছে। ফলকটির ওপর লেখা "বিজ্ঞান"। প্রথম নামটি হল : হিপোক্রেটাস। আদি গুরু। গ্রীক্। শেষ নামটি হল : অ্যালবার্ট। অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন। আমেরিকাবাসী।

আইনষ্টাইন শব্দটা জার্মান। আইন মানে এক, ষ্টাইন মানে পাথর—ইংরাজী ষ্টোনের প্রতিরূপ।

জার্মানীর পাথরে সে নাম লেখা হওতো হয়ে ওঠেনি। আমেরিকার চুনা পাথরের বুকে চিরকালের জন্য ফুটে উঠেছে : অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন।

কালের পৃষ্ঠায় এমনভাবে দেশান্তরের বাধা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বোস্টনের মিল্ক ষ্ট্রিট রাস্তায় একটি ছেলের জন্ম হয়। ছেলেটির বাপ ঠাকুর্দার দেশ ছিল ইংল্যাণ্ডে। নর্থ-হ্যাম্পটনশায়ার অঞ্চলের এষ্টন গ্রামে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁরা নতুন দেশে চলে এসেছিলেন জীবিকা সংস্থানের জন্য।

বাপের ছিল সাবানের চুল্লি। আট বছর বয়সে বালক বেন বিদ্যালয়ে গেল বটে। কিন্তু ছবছর পরে হতে না হতে তাকে ফিরতে হল। শৈশব কাটলো বাপের চুল্লি ঘরে। খুব পছন্দসই ঠেকেনি সেখানের কাজ। তাই কৈশোর কাটতে না কাটতেই ভাই জেমসের ছাপাখানার দিকে বেনের মন ছুটলো। সে যোগ দিল ছাপাখানায়।

ছোটবেলায় বাবা পড়তে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। বেন বই পড়ে। আর বই বন্ধ করে ভাবে। তারপর লেখে যা পড়েছে তার যতটা মনে থাকে।

একদিন তো সে একটা "লেখা" লিখে ফেলল। তারপর তলায় নাম দিলে 'চুপচাপ ভালো'—হাইলেস্স ডু গুড্। লেখাটা লুকিয়ে লুকিয়ে ভাইয়ের ছাপাখানার যে পত্রিকা বার হত তার দরজায় রেখে এল। ভাই তো জানে না কে লেখা দিয়ে গেছে! ছাপিয়ে দিল লেখাটা। এমনি করে চৌদ্দটা লেখা তৈরী হল। সেগুলি ছাপানো হল ভাইয়ের পত্রিকায়।

আস্তে আস্তে কাজের ছেলে হয়ে উঠলো বেন। খুব উদ্যম, খেটেখুটে ব্যবসা দাঁড় করালে। বিয়ে করলে ২৪ বছর বয়সে। সে প্রথম যে বাড়ীতে গিয়ে উঠেছিল সেই বাড়ীর গিন্নীর মেয়েকে বিয়ে করলে। ছ-বছর ধরে গিন্নী দেখেছেন রীড্ গড়ে তুলল খাটিয়ে বেনের সংসারকে। ত্রিশ বছরে ছোট পরিবারের কর্তা আর চালু ব্যবসার পরিচালক হয়ে উঠলো বেন। তখন ১৭০৬ সাল।

বেন এর ব্যবসাদারীই বেন সব কিছু হয়ে ওঠেনি। প্রায়ই সুযোগ সুবিধা মত সে পাঠাগারে যায় বই পড়তে। ফিলাডেলফিয়া সাধারণ পাঠাগার। পিটার কলিনসন পাঠিয়ে দিয়েছিলেন একটা বিদ্যুতের নল। বিদ্যুৎবাহী নলটি দেখে বেনের মাথায় ঢুকলো বিজ্ঞানের ভাবনা। বেন স্থির করলে ব্যবসাকে বড় করে গড়ে তুলে কিছু অর্থসংস্থান করা তার বড় কাজ হবে। সেই অর্থে তাকে বিজ্ঞান নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে।

বেন এর নাম এবার যদি পুরোপুরি বলি! হাজার হাজার পরিশ্রমী বেন ছড়িয়ে আছে সারা আমেরিকার বিস্তীর্ণ এলাকায় ৪৮টি রাষ্ট্রে। সব নাম ছাপিয়ে উঠেছে এই বেনের নাম। মহাকাল মুগ্ধ হয়ে শুনেছে লাখো মানুষের মুখে বেনজামিন ফ্রাংকলীনের নাম।

১৭০৬ সালে বেনজামিনের জন্ম হয় ঐশ্বর্যের দেশে। দরিদ্রের ঘরে। তার ৬৮ বছর পরে ভারতবর্ষে—দারিদ্র্যের দেশে, সুখী পরিবারে জন্ম হয়েছিল রামমোহন রায়ের।

রামমোহনের দেশে তখন আধুনিক বিজ্ঞান পৌঁছয়নি। রামমোহন বললেন : যে সকল কার্যকর জ্ঞান বিজ্ঞান—গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শরীর সংস্থান বিদ্যা চর্চা করে ইয়োরোপীয় জাতিসব পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা

প্রেরণা হতে সমর্থ হয়েছে দেশবাসীর মধ্যেও যেন সেই রকম উদার শিক্ষানীতি প্রবর্তন হয়।

নিজব্যয়ে ১৮২২ সালে কলিকাতার চেতুয়ার দক্ষিণপূর্ব কোনে রামমোহন অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল স্থাপন করলেন। দেশ ভয়ধ্বনি করেনি। ব্যঙ্গনাম দিয়ে ছড়া বেঁধেছিল :

বেটার বাড়ী খানাকুল,　　বেটার গুরাই মেলের কুল
ও তৎ সৎ বলে বেটা বানিয়েছে ইস্কুল।

তার দুবছর আগে!

১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর বীরসিংহ গ্রামে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ইংরেজী স্কুল প্রবেশ বিষয়ে আন্তরিক অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন।

শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর জন্মকালের পরিবেশকে ভঙ্গ করেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র নতুন পাঠ্য তালিকা প্রণয়নের পথ নির্দেশ দিলেন :

বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিতে হবে।

লেখাপড়া আর অংক শেখা মাত্র নয়। ইতিহাস, জীবন চরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতি বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান এবং শরীরতত্ত্ব শিক্ষা প্রয়োজন।

জীবজন্তুর প্রাকৃতিক বিবরণী; বাংলার ইতিহাস (মার্সমেনের গ্রন্থের ভাবানুবাদ), চারুপাঠ (প্রয়োজনীয় এবং চিত্তাকর্ষক বিষয়সমূহ) পাঠ্য হওয়া প্রয়োজন।

চেম্বারের আদর্শ জীবনমালার কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, উইলিয়াম হর্শেল, উইলিয়াম জোন্স, প্রোক্টাস, লিনিয়স, ডুবল, টমাস জেফিন্সের জীবনবৃত্ত পড়তে হবে।

১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগর নদীয়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান জেলাগুলিতে পাঁচটি করে স্কুল স্থাপন করলেন। ১৮৫৭—১৮৫৮ ছ'মাসে পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন।

১৮৪৮ সালে "বাঙ্গালার ইতিহাস" লিখলেন। ১৮৫৬ সালে লিখলেন "বোধোদয়"। ১৮৯২ সালে তাঁর "ভূগোল খগোল বর্ণনম্" প্রকাশিত হল।

১৮৯১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাদের ছেড়ে গিয়েছিলেন। তার চার বছর বাদে ১৮৯৫। সেই সালে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন ছেড়ে গিয়েছিলেন মিউনিক; তার সর্বস্বান্ত বাবার কাছে মিলানে গিয়ে মিলিত হবার জন্য। বিজ্ঞানের সেরা দেশ জার্মানীতে অ্যালবার্টের পড়াশুনার সুবাহা হয়নি।

বুগরেখার এমন ভ্রান্তিমায় ১৮৯৩ সালে ঢাকা জেলার খুব পিছিয়ে পড়া এক গ্রামে জগন্নাথ আর ভবতারিণী একটি ছোট মুদীর দোকান চালিয়ে পরিবারের ক'জনের মুখে কোনমতে দু-মুঠোর সংস্থান করছিলেন। উদ্‌ভ্রান্ত পরিশ্রম আর গঠনমূলক মনোভাব ছিল তাঁদের বাঁচার একমাত্র ভরসা।

শুধু তাঁদের নয়। শেওড়াতলী গ্রামের সব মানুষেরই একই অবস্থা। সব কিছু ছোট। আশাও ছোট। স্বপ্নও ছোট। তেরিশ মাইল দূরের রাজধানী সহর ঢাকার সম্পদ শেওড়াতলীর বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার আঙ্গিকালের সুরে কোন নতুন ব্যঞ্জনা এনে দেয়নি যেন জানতেন নিশ্চিতভাবে :

যে হোক রাজা যে হোক মন্ত্রী
কেউ রবে না এ ভবে

১৮৯৩ সালের ৬ই অক্টোবর নতুন শিশু এলো জগন্নাথের ঘরে। দামাল ছেলে।

ছেলেটির নাম বাবা মা দিলেন—মেঘনাদ, বড় নাম জয়নাথ। বৈষ্ণব পরিবার। মেঘের ওড়ে রাঙ্গের আদর দেখেন তাঁরা। তাই ছেলের নাম মেঘনাদ। ছেলে বড় হবে। বিষয়বুদ্ধি শিখবে। মা বাবার দুঃখ কষ্ট করার শিক্ষাও পাবে, ধর্মকে জীবনের একান্ত আপন বলে মেনে নেবে। জগন্নাথ আর ভবতারিণীর চিন্তা এই ভাবেই দানা বাঁধে।

বড় ছেলে জয়নাথকে ইংরাজী লেখাপড়া

হয়েছিল। তাতে তার চারটি হাত পা খসায় নাই। পরিবারেরও কোন ক্ষুরাতা হয় নি। এই ছেলেকে সাধেকী ধরণে শিক্ষা দেওয়াই জগন্নাথের পক্ষে স্বাভাবিক। তারপর বাড়ীর মুদীখানা দোকান ছেলে দেখাশুনা করবে। সংসারে বাপের পিছনে দাঁড়াবে। হয়তো দোকান একটু বড় করে নেওয়া যাবে।

ঠাঁই ঘরে ছেলে জন্মালে বাবা মা এমন ভাবেই অস্বচ্ছল তার পরিবর্তন কামনা করেন।

সেখানে জ্ঞান, তত্ত্বর স্থান হয় না।

অনুশীলনের, সাধনার কথা নেহাৎ বড়বড় কথা।

ছেলে বড় হয়। দেখে। শোনে। দেখে দারিদ্র্যের সর্বজনীন ছবি। শোনে কর্মফল। বরাত। ভাগ্য। অদৃষ্ট।

শেওড়াতলী গ্রামের পাঠশালায় তার যাতায়াত চলে। তারপর একসময়—সেই পাঠ সাঙ্গ হয়।

বাবা মা-র ক্লান্তিহীন রাত্রিদিনের পরিশ্রম, পাড়া প্রতিবাসী সকলের কপালে দুশ্চিন্তার ভ্রূকুটি। সেই কাজের ধারায় শেওড়াতলী গ্রামে একটি কঠোর পরিশ্রমের মন্ত্র উচ্চারিত হয়:

তুমি যে কাজ করছ
আমার সেই কাজে কি লাগাবে না?
কাজের দিনে আমায় তুমি
আপন হাতে জাগাবে না?

মেঘনাদকে বাবার মুদিখানা দোকানে বসানো হয়। সেখানে সে ফর্দ দেখে জিনিষপত্র ওজন করে। দাম বুঝে নেয়। খরিদ্দারই লক্ষ্মী এই কথা শোনে। কানে শেওড়াতলী গ্রামের চক্রবালের সীমার বাহিরে যাবার শক্তি তার সেই হবেও না হয়তো!

পাঠশালার সুন্দর হাতের লেখাটির প্রশংসা ছিল। মুক্তার মত লেখা। দোকানের খাতায় সেই মুক্তা যেন মানায় না।

বৈদ্য সাহা ঘরের ছেলের এমন হাতের লেখা!

এ ছেলে কি বিদ্যাবুদ্ধি পাবে?

[চলবে]

আমার চোখে দেখা—
নোবেল প্রাইজ

ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

[৪]

পরদিন অর্থাৎ ৯ই জুলাই কাপড়-চোপড় পরে প্রাতরাশের জন্য নীচে ডোজনকক্ষে যেতে তৈরী হচ্ছি, এমনি সময়ে দরজায় তিনটে টোকার শব্দ হ'ল। 'এস' বলে দরজা খুলে দিতেই চোখে পড়লো প্রভাতের মিষ্টি আলোয়ই মত নাজেস্দার হাসিমাখা মুখ ও কানে এল "গুড মর্ণিং"। "মর্ণিং" বলে হাসি মুখে করমর্দন করে বল্লুম "তুমি আমার কষ্ট করে উপরে এলে কেন? আমরা এখুনি নীচে যাচ্ছিলুম।"

নাজেস্দা কোন জবাব না দিয়ে পকেট হতে একটি কাউন্টেন পেনের বাক্স বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিলে, ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে আমি প্রশ্ন করলুম, "ওটা কি নাজেস্দা?"

"তোমার কলম, ডক্টর।"

"না, এটা ত আমার নয়।"

"হাঁ তোমারই, তোমার কলম কাল রাত্রিতে চুরি হয়েছে, আমি রিপোর্ট করাতে অ্যাকাডেমী, যাতে কলমের অভাবে তোমার কষ্ট না হয়, সেজন্য এটা তোমাকে পাঠিয়েছে আমার হাত দিয়ে। হয়ত তোমার কলমের মত এটা তত ভাল নয়, তবু……"

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, গত রাত্রিতে আমার কলম ঐভাবে চুরি যাওয়ায় নাজেস্দা অত্যন্ত অপ্রস্তুত বোধ করেছিল এবং সেজন্যই বলেছিল "কিচ্ছু ভেবো না, কলম তুমি পেয়ে যাবে।" হয়ত বা রাত্রিতে ভাল ক'রে ঘুমই হয়নি, তাই ভোর বেলাতই ছুটে এসেছে, তার পরিবর্তে আর একটি কলম নিয়ে। তখনো আমাকে ইতস্তত: করতে দেখে কলমটি আমার হাতে এক রকম গুঁজে দিয়েই সে অনুনয়ের সুরে বললে "ডক্টর প্লীজ্।" নাজেস্দার বড় বড় চোখের সে অনুনয়ের চাউনি আজো আমার চোখের সামনে ভাসছে! সে অনুরোধ উপরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি, সুতরাং ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করে বল্লুম "অ্যাকাডেমীকে আমার ধন্যবাদ জানিও, আর তুমিও নাও। একে নাজেস্দার কলম বলেই আমি মনে রাখবো।"

মুখে একটু চাপা হাসির ভাব ফুটিয়ে নাজেস্দা বললে "তবু ভাল, অন্ততঃ কলমের জন্যও 'নাজেস্দা' নামটি মনে থাকে।"

সেদিন সকালে ষ্টকহোম ইউনিভার্সিটি হতে বেশ খানিকটা দূরে একটি বাড়ীতে অন্যান্য ডেলিগেটদের সঙ্গে সিনক্রো-ট্রোন যন্ত্র ও তার কাজ দেখতে গেলুম। বাইরে নানা রঙ-বেরঙের ফুলের বাগান ও কতার ভোগ পার হয়ে, তবে গিয়ে ল্যাবরেটরীতে পৌঁছাতে হয়। সেখানকার ডিরেক্টার বিশ্ব-বিখ্যাত বিজ্ঞানী চেয়েনকোড আমাদের সঙ্গে নিয়ে সব কিছু দেখালেন। তারপর আমাদের একটি ঘরে বসিয়ে আরম্ভ হ'ল আলোচনা। প্রথম খানিকটা বুঝতে পারছিলুম বটে, কিন্তু পরে তা ডিঙিয়ে গেল উচ্চ হতে উচ্চতর এবং উচ্চতম গণিতের পর্যায়ে—যেখানে আমার অবস্থা চাণক্য শ্লোকের মতে "তাবচ্চ শোভতে মূর্খো, যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।" অধ্যাপক সাহা, ব্রুগ্লি, ফক্টিন, জুলিয়াকো, ওয়ার্ড, ব্লক প্রভৃতি পদার্থবিদগণ সহ চেয়েনকোড যখন মস্ত ব্লাকবোর্ডের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উচ্চতম গণিতের নানা জটিল সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন, তখন আমার মত কৈবল বিজ্ঞানীদের বসে বসে হাই তোলা ছাড়া আর করণীয় কিছুই ছিল না।

গবেষণাগার হতে বের হয়ে যখন আমরা এসে বাগানে দাঁড়িয়ে ফুলের শোভা দেখছি, তখন সেখানকার মালী

আমাদের প্রত্যেকের কোটের বোতামের ঘরে বসিয়ে দিল একটি একটি করে নানা রঙের গোলাপ ফুল। আমারটি ছিল একেবারে টুকটুকে লাল! ঐ অবস্থায় বাগানে দাঁড়িয়ে আমাদের গ্রুপ ফটো নেওয়া হ'ল। তারপর সেখানকার ডিরেক্টর ও অন্যান্য কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে প্রায় বেলা দেড়টার সময় আমরা এসে পৌঁছলুম হোটেলের দরজায়। সেখানে বন্ধুবর সেটোভ্-স্যাঁ হেসে কবি বা আমাদের প্রতীক্ষাই দাঁড়িয়েছিলেন। হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে হাসিমুখে বলেন, "টকটকে ঐ লাল গোলাপ কোথায় পেলে ডক্টর? কী সুন্দরই তোমায় মানিয়েছে। আমিও কিন্তু ঐ রকম লালকে খুব ভালবাসি।"

তৎক্ষণাৎ তার গাঢ় সবুজ রঙের ওভারকোটের বোতামের ঘর, আমার কোট হতে তুলে নিয়ে ফুলটি বসিয়ে দিয়ে বলুম, "সেজন্যই বোধ হয় বাগানের মালী আমাকে ঐ রঙের ফুলটি দিয়েছে, আপনাকে দিয়ে যাতে আমি আরো বেশী আনন্দ পেতে পারি আর আমার মনে হয় পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের গায়েই ফুলের শোভা ফুটে উঠে অনেক বেশী!"

হাসিমুখে তিনি জবাব দিলেন "সৌন্দর্য উপলব্ধি করার মত চোখ থাকা চাই শুধে তো! তুমি একজন খাঁটি কবি—"

কথা কেড়ে নিয়ে আমি বলুম "তাই ত, রঙের কোনটি খাঁটি আর কোনটি মেকী তা চোখে এড়ায় না।"

বিকেলে চারটায় অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সের সেক্রেটারী তপ্‌চেভের সঙ্গে অধ্যাপক সাহা ও আমার দেখা করার কথা ছিল তাই আমাদের ছায়ার মত সঙ্গী দোভাষী লুকিনকে নিয়ে আমরা দুজনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। সম্মেলনের অধিবেশনের প্রথম দিনেই পারমাণবিক শক্তির বৈছাতিক পদ্ধতিতে রূপান্তরের যে ফিল্মটি দেখানো হয়েছিল, তা আমরা আমাদের দেশে দেখানোর জন্য পেতে পারি কি না, তাই ছিল আমাদের জিজ্ঞাস্য। আর এ বিষয়ে সোভিয়েট বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী পরমাণু হতে শক্তি উৎপাদনে আমাদের কতখানি সাহায্য করতে পারেন, তাও ছিল আমাদের আলোচনার বিষয়।

চায়ের টেবিলে চা খেতে খেতেই দোভাষী লুকিনের মাধ্যমে আমাদের আলাপ আলোচনা চলছিল। তপ্‌চেভ আমাদের প্রতি খুবই সৌজন্য দেখিয়ে বললেন যে ভারতবর্ষকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করতে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা খুবই আগ্রহশীল এবং ভারত সরকার সোভিয়েট সরকারকে অনুরোধ জানালেই আমাদের সঙ্গে বিজ্ঞান-অ্যাকাডেমী সব বন্দোবস্ত করবেন। বিদায় গ্রহণ কালে কথা রইলো যে আমি দেশে রওয়ানা হওয়ার আগে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি জানিয়ে দিবেন, কবে পরশু আমরা ঐ ফিল্মটি পেতে পারি! তপ্‌চেভ অধ্যাপক সাহা ও আমাকে নিজের লিখিত কয়েকখানি বইও উপহার দিলেন বিদায় গ্রহণের প্রাক্‌কালে।

সেখান হতে আমরা গেলুম মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে। অধ্যাপক সাহা অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে সব কিছু দেখছিলেন—এক কক্ষ হতে অন্য কক্ষে যেতে যেতে। এরই মাঝখানে লুকিন আমার অনুরোধ ক্রমে আমাকে নিয়ে চললো বত্রিশ তলা গম্বুজের উপরে। নরওয়ের লুন্ডবিস্ত তা জানতে পেরে আমাদের সাথী হলেন। বো ক'রে লিফ্‌ট উঠে আমাদের নামিয়ে দিলে গগণচুম্বী বত্রিশতলা সৌধের ছাদে। আকাশমার্গে দ্রুতগতি বিমানপোত হতে কানন, কান্তার, শৈল, গিরি, উপত্যকা অনেকবার দেখেছি, অভ্রভেদী গিরি শিখরে ১৬ হাজার ফুট উচ্চে দাঁড়িয়েও চারদিকে প্রকৃতির ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছি, কিন্তু গগণচুম্বী সুউচ্চ সৌধের ছাদে দাঁড়িয়ে অদ্ভুতভাবে নীচেকার মানুষের হাতের রচিত অপূর্ব সৌন্দর্যের—একটি নয়ন মুগ্ধকর রূপ সেদিন প্রত্যক্ষ করলুম নীচেকার রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর, গাছপালা যেন দূরদূরান্তে অবস্থিত এক একখানি নিখুঁৎ চিত্রপট! রাস্তা দিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে একখানার পর একখানা করে মোটর গাড়ী চলছে ঠিক ছোট ছোট পিপড়েরা যেমন করে লাইন-বদ্ধ হয়ে মাটিতে চলাফেরা করে তেমনি এবং পায়ে হেঁটে চলেছে যে সকল লোক, লাল রাস্তার রেখার উপর লাল বিন্দু ছাড়া যেন আর কিছুই নয়। লুন্ডবির সঙ্গে ক্যামেরা

ছিল। ক্লিক্, ক্লিক্, ক্লিক্, অনেকগুলি ছবি নিলেন তিনি। কিন্তু আমার মনের পর্দায় সে অপূর্ব দৃশ্য চিরদিনের জন্য অক্ষয় ও অমর হয়ে গাঁথা হয়ে রইল।

বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফিরবার পথে শান্তি ডেলিগ্যাশনের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম হোটেল ইউরোপায় কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কেবল শ্রীচিন্ময় সেনানবীশ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে দেখা হ'ল না। সেদিন রাত্রিতেই সাড়ে দশটার সময় স্পেশাল ট্রেনে আমাদের লেনিনগ্রাদে রওয়ানা হতে হবে। অধ্যাপক সাহার দু'একদিনের মধ্যেই দেশে ফিরে আসা অত্যাবশ্যক, সুতরাং তিনি মস্কো হতেই দেশে রওয়ানা হবেন।

আবার ঐ রাত্রিতেই সাড়ে ন'টার সময় আমাদের সঙ্গে "সোভিয়েট দেশ" কাগজের রিপোর্টারের দেখা করতে আসার কথা। সুতরাং সে রাত্রিতে স্বাভাবিক গতিই লম্বরী চালে ডিনার পর্বের উপায় ছিল না, অত্যন্ত তাড়া-তাড়িতেই তা সারতে হল, কেন না, লেনিনগ্রাদ যাবার গোছগাছ আছে এবং তার আগে সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শেষ করে যেতে হবে। গোছগাছের বিশেষ কিছুই ছিল না, সবেমাত্র ধন নীলমণি স্যুটকেসটির মধ্যে বস্ত্রালঙ্কার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঢুকিয়ে নেওয়া গেল। সুদূর বিদেশ ভ্রমণের দিনগুলির দিবারাত্রির সঙ্গী অধ্যাপক সাহা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লেন "তাহলে এবার আমাদের ছাড়াছাড়ি হ'ল। কিন্তু আমি যে কবে পাসপোর্ট পাসেজ পাব, তার কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে, অথচ আমার ১৪ই তারিখের আগেই কোলকাতা না পৌছালে নয়।"

স্যুটকেসটি বন্ধ করতে করতে আমি বল্লুম হাঁ, দিন পনরোর জন্য ছাড়াছাড়ি হ'ল বটে, তাই আমার মনটাও কেমন কেমন করছে। যাক্ কোলকাতায় গিয়েই আপনার সঙ্গে দেখা কোর্ব, আর আপনি পৌছেই আমার বাড়ীতে একটা টেলিফোন করে আমায় খবর জানিয়ে দেবেন। আর পাসেজ সম্বন্ধে আপনি ভাববেন না, কারণ মুকিন যখন কথা দিয়েছে, তখন আপনার কোন অসুবিধে হবে না বলেই মনে হয়, কারণ আমার মনে হয় ও 'পার্টির' লোক, সুতরাং ও নিশ্চয়ই সে বন্দোবস্ত করে দিতে পারবে।

এমনি সময়ে দরজায় তিনটি টোকার শব্দ হ'ল এবং "আসুন" বলার সঙ্গে সঙ্গেই 'সোভিয়েট দেশ' এর প্রতিনিধি ঘরে ঢুকলেন, তাতে অধ্যাপক সাহার সঙ্গে বিখ্যাত সোভিয়েট বিজ্ঞানী ক্যাপিৎসা ও মাদাম মাসোভের বড় সাইজের দুখানি ফটো। বন্ধুবাদের সঙ্গে তা নিয়ে অধ্যাপক সাহা তখনই নিজের নাম সই করে একখানা আমাকে দিলেন "স্নেহের উপহার"।

তারপর আমাদের আলাপ আলোচনা হ'ল, সাংবাদিকের সঙ্গে। তার যথাযথ বিবরণ ১৯৫৫ সালের ১লা আগষ্ট তারিখের 'সোভিয়েট দেশ' কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা তিনজন যখন কথাবার্তা বলছি, তখন হোটেলের পোর্টার এসে আমার 'লাগেজ' নিয়ে যেতে চাইলে, আমি আমার স্যুটকেসটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলুম। ফটোখানি আমার হাতেই থেকে গেল। ঠিক দশটার সময় ক্রিং-রিং-ক্রিং-রিং করে টেলিফোন বেজে উঠলো, হাত বাড়িয়ে রিসিভারটি তুলে শুনলুম "হ্যালো, কে ডক্টর পাল, নীচে চলে আসুন, এখুনি যেতে হবে।" অধ্যাপক সাহা প্রশ্ন করলেন "আপনার যাওয়ার বুঝি সময় হল?" "হাঁ" বলে এ ভাবে উঠে যেতে বাধা হওয়ার জন্য সাংবাদিকের কাছে মাপ চেয়ে কমেরন করে এক আসন্ন বিয়োগ ব্যথিত চিত্তে অধ্যাপক সাহাকে ভারতীয় পদ্ধতিতে নমস্কার জানিয়ে তাদের দুজনের কাছে বিদায় নিলুম।

মস্কোর চারদিকে অনেকগুলি রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। ট্রেনগুলির গন্তব্যস্থল হিসেবে তাদের কোনটির নাম লেনিনগ্রাদ ষ্টেশন, কোনটির কিয়েভ ষ্টেশন আবার কোনটির বা সোভেনস্কস ষ্টেশন এমনি আমরা লেনিনগ্রাদ ষ্টেশনে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট স্পেশাল ট্রেনের কামরায় ঢুকে আমরা তার সাজসজ্জা দেখে অবাক্। প্রতিকামরায় দুটি করে পুরু শ্রীং এর গদীর উপর মখমলের চাকনি এবং তার উপর তুষের জেলার মত নরম সাদা বিছানা। মাঝখানে শিয়রের দিকে একটি ছোট টেবিল, তার উপর টেলিফোন যন্ত্র, অ্যাশট্রে, লেখাপড়ার সরঞ্জাম, সুদৃশ্য টেবিল বাতি ও ছোট্ট একটি রেডিয়ো সেট—চালু অবস্থায় তা হতে রাশিয়ান সঙ্গীতের মধুর সুর মৃদুভাবে

ছড়িয়ে পড়তে কামরাটিতে। ট্রেনের কামরায় সে রাত্রির মত আমার সঙ্গী হলেন আর একজন ভারতীয় ডেলিগেট, বোম্বাইর অধ্যাপক ভগবান শঙ্কর। ট্রেনটি চলতে আরম্ভ করলে, বিছানায় শুয়ে পড়ে বাতি নিবিয়ে দেওয়া গেল কিন্তু একেবারে কানের কাছে রেডিয়োটি তখনও মুখর। আমরা দুজনে, এদিক ওদিকে টিপেও যখন তাকে বন্ধ করতে পারলুম না তখন বাধ্য হয়ে পায়ের দিকে দরজার উপর বড় বোতাম টিপে আমাদের তত্ত্বাবধায়ক লোকটিকে ডাকতে হ'ল। ট্রেনের অপর প্রান্ত হতে সমস্ত করিডরটি পার হয়ে বেচারা যখন ছুটে এল, তখন তাকে 'রেডিয়ো' বন্ধ করতে অনুরোধ করলে সে টেবিল বাতিটির নীচেকার ছোট্ট একটি বোতামে টিপে দেওয়ামাত্র মুখর যন্ত্রটি স্তব্ধ হয়ে গেল! আমরাও তাকে ধন্যবাদ দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লুম।

১০ই জুলাই ভোরে প্রায় আটটার সময় তত্ত্বাবধায়ক প্রথমে টেলিফোন করে চা প্রস্তুত, নিয়ে আসবে কি, জানতে চাইলে। আমাদের সম্মতি পেয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে চা ও কেক নিয়ে হাজির হ'ল। পূবের দিক হতে তখন এক ঝলক মিষ্টি রোদ এসে পড়েছে আমাদের কামরায় আর কালো পর্দা সরিয়ে কাচের জানালা দিয়ে উত্তর রুশ দেশের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের চোখে খুবই ভাল লাগছিল। কোথাও খামার, কোথাও কল-কারখানা, কোথাও অরণ্য, কোথাও জনপদ, কোথাও শ্রেণীবদ্ধ বিটপী, কোথাও ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতী, এমনি নানা নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চলেছিলুম। আমাদের ট্রেন কোন স্টেশনেই থামছিল না, কেবল বড় বড় স্টেশনগুলিকে কিছুটা মন্থরগতিতে পার হয়ে যাচ্ছিল মাত্র! সেই সুযোগে দেখতে পেলুম কয়েকটি স্টেশনে নানাস্থানের ট্রেনগাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, আর তার মধ্যে ঠিক আমাদের দেশের গাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীর কামরার মত কামরায় গাদাগাদি করে লোক বসে আছে, ঠিক যেন কাঁঠাল-বোঝাই নৌকা! আমরা সম্মানিত অতিথি, তাই আমাদের জন্য এরকম রাজকীয় (!) বিলাসপূর্ণ ভ্রমণের ব্যবস্থা, আর দেশের সাধারণ লোকের জন্য সেই চিরাচরিত সনাতন ও মামুলী শক্ত কাঠের আসন! মুহূর্তে আমার মনে পড়ে গেল, শুনেছিলুম বটে অধ্যাপক সাহার মুখে "সোভিয়েট দেশে ট্রেনে, প্রথম, দ্বিতীয়, মধ্যম ও তৃতীয় এরকম শ্রেণীবিভাগ না থাকলেও, অন্যভাবে অর্থাৎ ভিন্ন নামে 'travel hard' কিংবা 'travel soft' এর ব্যবস্থা আছে।" তখন কথাগুলির অর্থ ঠিক বুঝতে পারি নি, এবার নিজের চোখে দেখে তাদের নিজ নিজ অর্থ এবং দুয়ের পার্থক্য ঠিক বুঝতে পারলুম।

সকাল বেলার প্রায় সওয়া দশটার সময় আমাদের ট্রেন এসে লেনিনগ্রাদের মস্কো স্টেশনে পৌঁছাল। ওখানকার বিজ্ঞান আকাডেমীর প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য গণ্যমান্য অনেকেই স্টেশনে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে, হাতে বড় বড় ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। তারপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হল, সেখানকার প্রসিদ্ধ 'আস্তোরিয়া' হোটেলে। সেখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই ঠ'ল প্রাতরাশের বন্দোবস্ত, আর জানিয়ে দেওয়া হ'ল তা' শেষ করেই আমাদের যেতে হবে সেখানকার প্রসিদ্ধ মিউজিয়ম 'হার্মিটেজ' দেখতে।

খাওয়া শেষ করেই বেরোবার জন্য তৈরী হ'তে নিজের নির্দিষ্ট কামরায় ঢুকে দেখি, আমার সুটকেসটি সেখানে নেই। হোটেল কর্তৃপক্ষকে টেলিফোন করলে তারা বলেন যে প্রত্যেকের লাগেজ তারা নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন, তবু কেন যে আমারটি নেই বুঝতে পারছেন না, তারা অনুসন্ধান করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই জানাবেন।" শুনে মনে একটু ভাবনা হ'ল, আগে ত কখনো এরকম হয় নি! তবে কি ট্রেনেই তা পড়ে আছে, না কেউ বেমালুম-সরিয়ে নিয়ে গেল! বাথরুমে পরিষ্কার তোয়ালে ও সাবান ছিল, সুতরাং সে অবসরে স্নানপর্ব সেরে নিয়ে, সুটকেসটি এসে পৌঁছালেই দাড়ি কামিয়ে বেশভূষা করার প্রতীক্ষায় বসে রইলুম। এমন সময়ে টেলিফোনে হোটেল-কর্তৃপক্ষ খবর দিলেন যে আমার নামের কোন লাগেজ লেনিনগ্রাদে আসে নি এবং খুব সম্ভবতঃ মস্কোর 'সোভেটস্কায়া' হোটেলের ষ্টোর রুমে ভুলবশতঃ জমা হয়ে রয়েছে।"

কী সর্বনাশ! এই নিদারুণ সংবাদ শুনে মনের যা অবস্থা হ'ল তা ভাষায় বর্ণনা করা চলে না। সামনেই ছিল ড্রেসিং টেবিলের আয়না, তাকিয়ে দেখি মুখখানি খোচা খোচা দাড়িতে ঠিক যেন সদ্যঃ কোটা কদম ফুল হয়ে আছে এবং সার্টের কলারটিও মোটেই ব্যবহার-যোগ্য নয়। কয়েকটি কামরা পরেই ছিল আমাদের হোস্ত্রী ও তত্ত্বাবধায়ক 'এণ্ড্রি'র ঘর। দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকে পড়ে আমি তাকে আমার বিপদের কথা জানালুম। এখন এ অবস্থায় এবং বেশে ভদ্রসমাজে মুখ দেখাই কী করে? শুনে সে দুঃখ প্রকাশ করে বলে "ভাবনা নেই ডক্টর, আপনি আমার সঙ্গে নীচে আসুন, এবং চারতলা হতে আমাকে হোতলায় নিয়ে এসে দিলে সঙ্গে হোটেলের 'বারবার' বা পরমাণিকের হাতে। মোটে দুজন নাপিত আর অপেক্ষারত দুই সারিতে প্রায় জন কুড়ি লোক। ভাবলুম বোধহয় সকালে আর 'মিউজিয়ম' দেখতে যাওয়া হবে না। কিন্তু যে মুহূর্তে একজনের চুল কাটা শেষ হয়ে গেল, অমনি সারির পেছনে থাকা সত্ত্বেও আমাকেই এসে ডেকে নিয়ে বসিয়ে দিলে চেয়ারে। আমি ভুলেই গিয়েছিলুম যে আমি সে দেশের সম্মানিত অতিথি—সুতরাং সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। দাড়ি কামানো আর গোঁফ ছাঁটা—সেত মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার! কিন্তু ততক্ষণ ভাঙ্গা ইংরেজীতে পরমাণিক মুখের ইঞ্চিন চালিয়ে গেল, বন্ধ দিয়ে। ঐরকম চকচকে ঝাঁঝালো ক্ষুরের দিকে মুখ বাড়িয়ে দেওয়ার অভ্যেস না থাকতে ভয়ে ভয়ে আমি বন্ধুর সঙ্গে চুপ করেছিলুম, কী জানি কথা বলতে গিয়ে মুখের পেশীর নড়াচড়াতে ঐ শাণিত ক্ষুর গভীরভাবে কোথাও বসে যায়। যাক্ বন্ধুবাদ জানিয়ে, শেভ্ করে সেখান হতে বেরিয়ে এসে দেখি একটি নতুন কলার নিয়ে এণ্ড্রি দরজায় প্রতীক্ষমান। বন্ধুবাদের সঙ্গে তা নিয়ে নিজের ময়লা কলারটি খুলে দিলুম তার হাতে এবং তখনই তা কাচার বন্দোবস্ত হয়ে গেল হোটেলের ধোবা-খানায়। বলা বাহুল্য সম্মানিত অতিথিদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্তের মতই, নাপিত, ধোবা, কিংবা চিঠিপত্র লেখার জন্য ডাকটিকেটেরও ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিখরচায়ই হয়।

আমার সঙ্গীরা সকলেই কিছুক্ষণ আগেই বেরিয়ে পড়েছেন, শুধু অবস্থার ফেরে ভদ্রস্থ হওয়ার জন্য আমারই ফেরী হওয়াতে আলাদা গাড়ী করে আমাকে পৌঁছে দেওয়া হ'ল ভূতপূর্ব জারের শীতকালীন প্রাসাদে—সেখানে হার্মিটেজ নামক বিখ্যাত মিউজিয়মটি অবস্থিত। প্রায় এক শতাব্দী আগে কোন জার-মহিষী নিজের খেয়াল-খুসীমত প্রাসাদের একটি কক্ষে নিজের সংগ্রহে আহরিত নানা বহুমূল্য বস্তুকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে এই মিউজিয়মটি স্থাপন করেন। তৎকালে শুধু রাজা, মহারাজা ও বিশিষ্ট রাজকীয় অতিথি অভ্যাগতদেরই এর মধ্যে প্রবেশাধিকার ছিল। পরবর্তী জারদের আমলে মিউজিয়মটি বড় হতে থাকলেও তাতে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। রুশ বিপ্লবে জার সাম্রাজ্যের পতনের পরই জনসাধারণের জন্য তা খুলে দেওয়া হয় এবং পরবর্তীকালে আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র প্রাসাদটি জুড়েই মিউজিয়মের নানা দ্রষ্টব্য বস্তু অতি পরিপাটি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে সাজানো হয়েছে। তাতে শুধু রুশদেশের বা ইউরোপের নয় পৃথিবীর প্রায় সকল সুসভ্য দেশেরই সুপ্রাচীন ও বর্তমান যুগের চিত্র, কারুশিল্প, ভাস্কর্য, কুটীর শিল্প, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে দেশের নামানুসারে, সযত্নে রাখা হয়েছে। আর এরকম নানা সাংস্কৃতিক অবদানের সঙ্গে সঙ্গে আছে নানাদেশের অমর সাহিত্যের নিদর্শন ও পৃথিবীর বরেণ্য নেতৃবৃন্দ, শিল্পী, সাহিত্যিক প্রভৃতির প্রতিকৃতি। তা ছাড়া আছে বিখ্যাত রুশ বিপ্লবের ও তার নেতৃবৃন্দের নানা স্মৃতিচিহ্ন। এমনকি জার সাম্রাজ্যের পতনের পর অস্থায়ী বুর্জোয়া কেরেনস্কি-গবর্ণমেণ্টের পতন ঘটেছিল যে কক্ষে, ঐ ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনার স্মারক চিহ্নরূপে ঠিক তখন যেমনটি ছিল, ঠিক সে ভাবেই তাকে সজ্জিত রাখা হয়েছে। এই মিউজিয়মের কয়েকটি লোহার মত সুদৃঢ় দেওয়ালে ঘেরা কক্ষে রাখা হয়েছে বহু প্রাচীন কাল হতে শেষ জারের পতন পর্যন্ত, রুশ সাম্রাজ্যের সম্রাট, মহিষী ও রাজপরিবারের নানা লোকের ব্যবহৃত বহুমূল্য হীরা মণিমুক্তা খচিত মুকুট, নেকলেস, তলোয়ারের খাপ ও বাঁট, ব্রেসলেট, আর্মলেট, নানা অঙ্গারের প্রতীক ও সোনার বাসন-কোসন প্রভৃতি।

দেখলেই মনে হয় একদিন কী ঐশ্বর্য, বিলাস ও আড়ম্বর-পূর্ণ ছিল ঐ অত্যাচারী শাসক সম্রাটদের জীবনযাত্রা। আজ অতীতের নিছক ইতিহাসে সে রাজত্ব নেই, অযোধ্যাও নেই, তে হি নো দিবসা গতাঃ।

যাদুঘরের ভারতীয় বিভাগটি আমাদের কাছে খুবই ভাল লেগেছিল, কারণ সুদূর অতীতে ভারত যখন সভ্যতার শীর্ষদেশে উঠে ছিল, তখন থেকে আরম্ভ করে বর্তমান পর্যন্ত তার সংস্কৃতির অনেক কিছুই সযত্নে আহরণ করে রাখা হয়েছে সেখানে। চারটি মসলিন, হাতীর দাঁতের কারুশিল্প পাখি, বেনারসের জরীর কাজ, সোনা রূপার উপর জিনিসিরি কাজ, কাশ্মিরী শাল ও গালিচে, এমনি কত কিছু খুঁটিনাটি, ছোটখাট, টুকিটাকি আরো সযত্নে রক্ষিত সোভরেট দেশের সে মিউজিয়মে। আর আছে ভারতবর্ষের অতবড় গর্বের বস্তু মহাত্মা গান্ধী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পী অবনীন্দ্র নাথের প্রতিকৃতি।

গ্রীস, ইতালী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্মেনী, ডেন-মার্ক, বেলজিয়ম প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশের নানা সাংস্কৃতিক নিদর্শন, বিশেষতঃ প্রসিদ্ধ চিত্র ও অন্যান্য শিল্পকলাগুলি দেখে দেখে যেন আশা আর মিটে না—তবু তাদের নূতনত্ব বিশেষ কিছুই নেই, কেন না অন্যান্য দেশের মিউজিয়ম-গুলিতেও তেমনি সমাবেশ সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচ্যদেশীয় বিভাগগুলি বিশেষতঃ চীন, জাপান, ইরাণ ও মিশরীয় বিভাগগুলি সত্য সত্যই অপূর্ব! আমার মনে হচ্ছিল, অন্ততঃ একটি সপ্তাহ যদি এই যাদুঘরে কাটানো যায়, তা হলে বোধ হয় তার প্রতি সম্যক্ সুবিচার করা হয়। তা না হলে যেভাবে আমরা তিনঘণ্টায় তা দেখেছি—তা ঠিক আমেরিকানরা যেভাবে দেশ দেখে ঠিক সে ভাবেই! তাকে 'দেখা' বলা উচিত নয়, দেখার ছলে চোখ বুলিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। চালকের চাবুক খেয়ে ঘোড়া যেমন কোনদিকে না তাকিয়ে সামনে ছুটে চলে, আমরাও সেভাবেই যেন ঘড়ীর কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছিলুম এক কক্ষ হতে অন্য কক্ষে! আর তাতেই কি পরিশ্রম কম? কয়েকটি ঘর পার হতেই হাঁটু ধরে যায়, আর কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য বসতে হয়, চত্বরের মাঝে স্থাপিত বিশ্রামের জন্য আসনগুলিতে। এমি আর-টু-তিন এই সঙ্গে পাশাপাশি বসতে গিয়ে আলাপ হ'ল অ্যাকাডেমিশিয়ান নিকিটিনের সঙ্গে। এক-মাথা সাদাচুল, দাড়িগোঁফ কামানো একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছুটছিলেন যাদুঘরের কক্ষ হতে কক্ষান্তরে। আমাদের অনেকেই তা লক্ষ্য করছিলুম। এবার পাশাপাশি বসতে অপরিচয়ের কুণ্ঠা তিনিই দূর করলেন, বল্লেন, "আমাদের কী সৌভাগ্য যে আপনাদের মত সুপ্রাচীন সভ্যদেশ ভারতবর্ষের দুজন বিজ্ঞানীকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি—আমার নাম নিকিটিন, আমি এখানকার ফেকাল্টি বিভাগের অধ্যাপক। আপনি?"

গল্পে আছে যে জাহাজ ডুবির ফলে কোন রকমে সাঁতরে একটি দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিল দুজন ইংরেজ, কিন্তু একে অন্যের পরিচিত নয় ব'লে তারা নাকি অন্য জাহাজের দ্বারা উদ্ধারের দিন পর্যন্ত কেউ কারো সঙ্গে কোন কথা বলে নি। মুহূর্তের মধ্যে আমার আর বুঝতে বাকী রইলো না যে এই ভদ্রলোকটি ইউরোপীয় হলেও সে গোত্রীয় নন, আমাদেরই মত ভারতীয় বা প্রাচ্য দেশীয় মনোভাব-সম্পন্ন! প্রতি কথায় ভারতবর্ষের প্রতি কী অপরিসীম শ্রদ্ধা, মমতা ও জিজ্ঞাসা তাঁর। একই সঙ্গে পাশাপাশি চলতে চলতে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁকে আমি মনে প্রাণে আপনার জন বলে চিনতে পেরেছিলুম।

[ক্রমশঃ]

ক্রোধ

বিজয় মজুমদার

গোঙানীর শব্দ পাবে কানে
কানের অবস্থা যাই হোক।
সাসি দিয়েছি এঁটে তবু
খবরের কাগজের প্রভাতী কলাপে
মনের জানলায় ভাসে নেতাদের স্তোক।
হয়ত মিইয়ে গেছে কান আর চোখ
বাহুজ্ঞান হয়ত বা নেই,
তবুও প্রকট হয় নিজস্ব এ-গোঙানীর মানে।

অমৃত শহর থেকে সমাজতন্ত্রের ঘোঁড়া কেশে
রসাত্মক বাক্যে চিঁহি চিঁহি করে সারা।
বিজ্ঞান নামে ও এক বস্তু আছে, আর
অযথা জটিল নয় মূল ক'টি ধারা।

কাশ্মীর মার্জার গোয়া ট্যাক্স আর ট্যাক্স—
রোগদুষ্ট মার্কিনের বিষাক্ত মিতালী—
প্রাত্যহিক ভাঁড়ামিতে আর কোনো স্বাদ ঘ্রাণ নেই।
দেখ তারকার চোখে কী জটিল কালি!

জীবনে হারিয়ে গেছে সভ্যতার মানে
তবুও ওঠে না জ্বলে নিষ্পাপিষ্ট মানুষের মন!
পবিত্র বিশুদ্ধ ক্রোধে চেতনার তৃতীয় নয়ন
জ্বলুক। ভস্ম যদি না হয়, না হোক।
জ্বলার লগ্নে তবু বজ্রের হৃদয়
দীর্ণ হয়, হওয়া তার স্বাভাবিক নয়।

মহানগরীর মোড়ে একা একা ফিরি
ক্লীব তপস্বীর বলি চেউ হয়ে বিস্তৃত কপালে।
অথচ রিপু না হলে কখনো কি জন্ম পেত কলকাতা শহর?
এখন ঝুলন্ত লোক তরাইয়ের শ্যাম-ডালে ডালে।

একটি গোলাপ গাছ

কল্যাণী বসু

জানলার পাশেই
কচিপাতার শাড়ি হাওয়ায় দুলিয়ে
লজ্জাবতী বালিকার মতোই একটি গাছ
আমাকে দেখছে।
এতদিন পরে—বর্ণের অনুরাগে, আর
পরাগ-প্রণয়ে বিকশিত একটি গোলাপ
বৃন্তের খোঁপায় গুঁজে
গাছটি যেন বলতে চাইছে :

দিনের শেষ আলোয়
আমি তাকে দেখলাম। পাখির ডানায়
এলোমেলো গোধূলি,
আলো-আঁধারের সলজ্জ ছায়ায়
সে তখনো অম্লান!
তার হাসিতেই যেন সূর্য ডোবে—
সন্ধ্যা নামে পশ্চিমে!

তারপর রাত্রি নামে,
গাছটি সরে যায় আমার দৃষ্টি ছাড়িয়ে।
অন্ধকারের গভীর নিভৃতে
মিষ্টি হেসেই
বসন্ত সখার নিবিড় আলিঙ্গনে
সে হয়তো ধরা দিল,
আজ তার বাসর-রজনী!

পাখির গলায়
ভোরের খবর আসে ;

নিত্যের খেয়ালে অথবা অকারণেই
আমি আবার ফিরে আসি জানালার কাছে ;
আমার দৃষ্টির ব্যস্ত সীমায়
আবার সরে আসে গাছটি।
আমি অবাক হয়ে দেখলাম :
আগের দিনের উদ্ভাসিত যৌবন
কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছে সে !
এলোমেলো কচিপাতার শাড়ি,
বৃন্তের খোঁপা থেকে
এদিকে-ওদিকে ঝরে পড়েছে
গোলাপের সমস্ত পাপড়ি,
রাত্রির নিপীড়নের চিহ্ন তার অঙ্গে !
এখন সে ক্লান্ত, অতি ক্লান্ত যেন।

অথচ কী আশ্চর্য—
ক্লান্তির কাজল ছাপিয়ে
লজ্জার মাথা খেয়ে এখনো সে হাসছে
আমার দিকে তাকিয়েই,
বলতে চায় :
সে যেন ধন্য, সে পেয়েছিল বসন্ত সখাকে।

বুদ্‌বুদ্‌

গোপালকৃষ্ণ ভাস্কর

বিলাস চিহ্নিত অংগ, অবাঙময়ী হে পৃথিবী
কি লাবণ্য পরিপ্লুত বৈচিত্র্য সম্ভার—
মনে হয়, ছায়াপটে উদ্ভাসিত কোন এক বিকলাংগ
মোহিনীর বিকলাংগ অংগের বিকার।

মেদহীন ঋজু দেহ, কোটী সূর্য দহনে কঠিন।
বিগত মুহূর্তগুলি, যারা হল একে একে নিঃশ্বাসে অধীন,
বিমুগ্ধ চোখের কোলে ইতিহাস রতি-ক্লিষ্ট অঙ্ক রজনীর
বাহুবন্ধে আজো তারা খোঁজে সেই বিলাসী শরীর।

সোনালী ফসল চাই শব্দ ওঠে
স্বর্ণ শস্য পর্যাপ্ত প্রচুর……
মেঘের পীড়নে হোক
নীলাকাশ বর্ষণ আতুর।
আবর্তের ঋতু চক্র—
এ-পৃথিবী স্নাতা তপস্বিনী,
আবর্তের ঋতু চক্র—
ঋতু স্নানে শস্যবতী কঠিন মেদিনী।

অন্ন চাই শব্দ ওঠে—
দাও অন্ন দেহের ইন্ধন—
দাও ধর্ম, কাম, মোক্ষ—
পূর্ণ তুলে সভ্যতা ব্যসন!
দুই মুঠি পূর্ণ কর রিক্ততায়
শূন্য গর্ভ জ্ঞান অহংকার……
নব রূপে মূর্ত হও বিকলাংগ হে সুন্দরী,
ব্যক্ত কর বিকলাংগ অংগের বিকার॥

তুমি

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার মাঝে সকাল সাঁঝে তোমার তনিমা—
সাগর নীল গানের ঝিলে সুরের তরণী,
বুকের ঢেউয়ে আমায় ছুঁলে কপোল শোনিমা
তুমি আমার আঁখির ঘোরে সোনার হরণী।

আমার আঁখি বনের পাখী,—তোমার শেকলে
বাঁধন দিয়ে, মনের ভয়ে বুকের তরাসে
উজাড় করে হৃদয় ভ'রে তুমিই বুচোলে ;
তুমি আমার জীবন-মায়া রঙীন-পলাশে।

নিশুত রাতে হঠাৎ জেগে স্বপন মেখানো
মদির চোখে তোমার পানে অনেক চেয়েছি,
তোমার বাহু বুকের 'পরে অলস-লুটানো,
আবেগ ভ'রে তোমার ঠোঁটে চুমোয় ভরেছি।

তুমি আমার ফাগুন-বুকে আগুন জ্বালালে,
চাঁদের হাঁরে আলোয় ধুলে মনের আঙিনা,
আকাশ প্রাণে তারার গানে বীণায় শোনালে,
প্রেমের মণি, তোমায় বিনা কাউকে মানিনা।

তুমি আমার জীবন-জুড়ে স্বপন রচেছো
ফুলের ঠোঁটে সোহাগ-ঢেউ আমার বাগানে,
শিশির নীড়ে সোনার দুতি তুমিই দিয়েছো,
আমার মাঝে সকাল-সাঁঝে রয়েছো যেখানে।

কিন্তু আজকে সেই কাতর কণ্ঠ। ঘুরে দাঁড়ালো জয়দেব, অবশ্য তেমন প্রসন্ন মনে নয়।

রাতচরা মেয়েরা পথচলা মানুষকে প্রলুব্ধ করার জন্য যে সব কথা বলে তা অতি সংক্ষিপ্ত, বক্তব্য স্পষ্ট। অতীতে জয়দেবের কানেও এমন অনেক কথা ভেসে এসেছে কিন্তু কোনোদিন সে এমন চমকে দাঁড়ায় নি, কারণ এ ধরণের প্রেমলীলা ওর রুচিতে বাধে। কিন্তু কি আশ্চর্য! এই স্ত্রীলোকটি যেন ফুঁপিয়ে কাঁদছে, এমন কিছু ইঙ্গিত সেই কণ্ঠে নেই, অথচ ভদ্রমহিলাজনোচিত কোমল কণ্ঠস্বর, কোনো প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না, আছে মিনতিভরা আবেদন। জয়দেবের কানে সেই করুণ সুর পৌঁছালো "শুনুন"—বলে কি 'শুনুন'। ঘুরে দাঁড়ালো জয়দেব।

'বলুন', জয়দেব বলে উঠে, কণ্ঠস্বরে এতটুকু কোমলতা নেই। তবু অতিশয় ভদ্র এবং বিনীত ভঙ্গীতে জয়দেব বলল—'বলুন'।

লঘু পদক্ষেপে এগিয়ে এল মেয়েটি, জয়দেবের কাছে এসে দাঁড়ালো, মাথায় ছোট, কৃশ তনু, জয়দেবের বিশাল দীর্ঘ দেহের সামনে যেন শিশু—বয়স কেউই নয়, কমও নয়, আকৃতি মাঝারী ধরণের। পোষাক পরিচ্ছদও সেই রকম। শান্ত, ভব্য, ভদ্র ভঙ্গী, হাতে একটা ছোট ব্যাগও আছে। ভ্যানিটী ব্যাগের চাইতে আকারে কিছু বড়ো—মহিলাটি মৃদু হাসলো জয়দেবের মুখের পানে তাকিয়ে।

জয়দেব বলল 'বলুন'।

মহিলাটি বল্লেন: "অনুরোধ অতি সামান্য। এই রাস্তাটা পার হতে আমার ভয় করে। আপনি যদি দয়া করে বেকবাগানের মোড় পর্য্যন্ত সঙ্গে থাকেন তো ভালো হয়।"

গলার আওয়াজ শান্ত এবং ভদ্রজনোচিত।

সবিনয়ে জয়দেব বলল—'বেশত'। সঙ্গে রইল জয়দেব। কিন্তু মহিলাটি আগের মতই অতি ধীরে ধীরে হাঁটছেন। ফলে জয়দেবের পদক্ষেপও মন্থর করতে হল।

হঠাৎ কি মনে হওয়ায় জয়দেব প্রশ্ন করল—"এতই যদি আপনার ভয়, এই নির্জ্জনে আমার মত অপরিচিতকে আপনার ভয় নেই?

মহিলাটির মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল—

আপনার মুখ অনেক আগেই লক্ষ্য করেছি, কুৎসিৎ রুচির মহিলাদের কাছে আপনি হয়ত বিপজ্জনক, কিন্তু এই স্কাউণ্ডেল রোডে আপনি শক্তিহীন, দুর্বল অন্তত আমার পরিচিতদের মত নয়..."।

অতি আস্তে আস্তে ওরা পথ চলছে, তখনও অনেক পথ বাকী, তবু জয়দেব বলল না একটু তাড়াতাড়ি হাঁটুন। মহিলাটির করুণ অবস্থায় এতক্ষণে তার মনে কিঞ্চিৎ দয়া হয়েছে। নিছক সৌজন্যের খাতিরে সে প্রশ্ন করে—

"আপনার কি কোনো বিপদ ঘটেছে? মানে কেউ বা কারা আপনার পেছু নিয়েছে?"

কোমল গলায় মেয়েটি বলল, "তারা নয়, তবু কেউ একজনকে আমার বড় ভয়।"

জয়দেব যেমন লম্বা মেয়েটি তেমনিই মাথায় ছোট—মনে হচ্ছে যেন চাঁটুর কাছ থেকে কথা ভেসে আসছে। মেয়েটি আবার বল: 'একজনকেই আমার ভয়। তাইত একা রাতের বেলা পথ চলতে ভয় করে অনেক দিনের ঘটনা, তবু আমার সব আগে মনে আছে।

"তাহ'লে নিশ্চয়ই আপনাকে রীতিমত ভয় পাইয়ে দিয়েছিল দেখছি। কৌতূহল না থাকলেও জয়দেব বলে ওঠে।

মহিলাটি নম্রকণ্ঠে বলল—"ঠিক তা নয়, তবে আমার জীবনে সে এক স্মরণীয় ঘটনা। আমার প্রতি রাত্রে অন্ততঃ দশ টাকা পাওয়া দরকার। গোটা ছয়েক টাকা হয়েছিল আরো চার টাকা পাইনি। চাইতে সাহস হয়নি, তবু অনেকে অনুগ্রহ করে দু-একটাকা বেশী দিতেন। সে রাত্রে আমার দশ টাকা চাই। তার পরদিনই ঘর ভাড়া দিতে হবে। কদিন ধরে কেবল দমদম দিয়েছি...."

কোমল গলায় মেয়েটি বলেই চলেছে। তার আত্ম-পরিচয়ও পাওয়া গেল। সব কথা মন দিয়ে শুনছেও না জয়দেব, ভাবছে, এই অঞ্চলে তার দু'এক ঘর আত্মীয় কুটুম্বও আছে, দৈবাৎ এই ভাবে দেখলে কেউ কি আর ভালো ভাববে? প্রায় বেকবাগানের মোড়ে এসে পড়েছে। কণ্ঠস্বর আরো স্তব্ধ হয়ে এল মনে হচ্ছে জয়দেবের।

"ঠিক যেখানটায় আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল, এখানেই তার সঙ্গেও দেখা হয়েছিল, ঐ মোড়টাতেই। লোকটা মোটেই ভদ্র নয়। কিন্তু আমার টাকার প্রয়োজন—আজকের দিনে কার পকেটে টাকা আছে আর কার নেই বলা যায় না। কিন্তু লোকটা কথার জবাবে আমার মুখের পানে তাকিয়ে দেখতেই বুঝলাম আমি ভুল করেছি। তবু অভদ্রতা করার মানে হয় না, তাই তার সঙ্গেই চলতে থাকি। সেদিন ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়েছে, সন্ধ্যার পর বৃষ্টি থেমেছে। পীচটাও বেশ ভাঁকিয়ে পড়েছে, তাই সেই বিষয়েই কিছু কথা হ'ল যদিও ওর মুখের দিকে তাকাইনি তবু বেশ বুঝলাম আমার দিকে আড়চোখে বেশ তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করছেন উনি। বোকামী করেছি, এখন আর উপায় নেই। কিন্তু এখন ভাবতে লাগলাম ও চারটে টাকা না পেলেই ভালো হ'ত, যা কেউ যদি এ সময় এসে পড়ে ত' ভালো হয়,—অত রাতে অবশ্য সেরকম কিছু ঘটা অসম্ভব। এ পথে গাড়ীঘোড়ার দেখা মেলে না। তাই বেশ তাড়াতাড়ি এই বেকবাগানের দিকে এগিয়ে চললাম। লোকটা বোধ হয় বুঝেছিল, তাড়াতাড়ি সে আমার হাতটা চেপে ধরল। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভয়ে ওর মুখের দিকে তাকাইনি। লোকটা বললে—"চুড়ি ছ'গাছা সোনার না মেকী? যাই হোক খুলে দাও, আর টাকাকড়ি কি আছে দাও।"

তারপর একরকম জোর করে চুড়ি দুগাছা খুলে নিল, গলায় ছিল নকল পাথরের হার, সেটা নেয়নি, হাতের ব্যাগটাও ছিনিয়ে নিল। আমি আঁকড়ে ধরেছিলাম। বললাম, কিছু নেই ওতে, আছে শুধু রুমাল।

লোকটা বলল—"টাকাগুলি দাও, আমি তোমাকে একটু নেশার জিনিষ দেব।"

নেশার জিনিষ মানে কোকেন। তখন ওদের খুব চল ছিল। এই বলে লোকটা সত্যি সত্যি নিজের পকেটে হাত দিল।

আমি বললাম—'আমাকে ছেড়ে দাও, নইলে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করবো।" কি ভেবে লোকটা আমাকে ছেড়ে দিল, আর আমিও সোজা ঐ বেকবাগানের মোড়ের দিকে দৌড়ালাম। এমনই জোরে দৌড়েছি যে নিজের নিশ্বাস ছাড়া আর কিছু শুনতে পাইনি। কিন্তু লোকটা সোজা আমার পিছনে এসেছে। ঠিক এইখানে তারপর পিছন থেকে আমার মুখটা চেপে ধরেছে। আর কিছু মনে নেই শুধু মনে আছে পিঠে এক অসহ্য যন্ত্রণা। লোকে কথায় বলে ছুরীর মতো ধার। সেইদিনই বুঝলাম ছুরীর ধার কতো তীক্ষ্ণ। কি জানি আর কিছু মনে নেই, শুধু কোথায় ঘড়ি বাজছিল। একবার মাত্র শুনেছিলাম বাকীটা শুনতে পাই নি। নিশ্চয়ই তখন ছুটে বেরোচ্ছিল। কোনোদিন ভাবিনি মৃত্যু এত সহজ। এত আকস্মিক।

এরপর ভয়দেব চক্রবর্তী ভয়ে ভয়ে মোড়ের দিকে ভালো করে তাকালো। কোথায় মোড় ওদিকে চৌধুরীদের বাড়ীর উঁচু পাঁচিল, এদিকে নির্জন রাজপথ কেউ কোথায়ও নেই। বেকবাগানের মোড়ে পৌঁছুতেই ভয়দেব শুনতে পেল ট্রাম ডিপোর ঘড়িতে ছুটো বাজল

সেই নিস্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে ক্ষণিক প্রতিধ্বনি জাগিয়ে সেই ধ্বনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভয়দেবের কানে লাগল।

সেই থেকে ভয়দেবকে আর কে
পারেনি।

হোলি

আশাপূর্ণা দেবী

ক'বছর এমন এক একটা দুর্বল মুহূর্ত আসে যখন মানুষ শুধু শুধু নিজের খানিকটা ক্ষতি করে বসে। বড় মাথা স্যাটটার দিকে চেয়ে মিঃ দত্ত সেই কথাই ভাবছিলেন। ব্যারিষ্টার চৌধুরীর ওখানে বড় রকমের একটা পার্টি ছিল। শহরের অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেকেই আসবেন। মিসেস্ দত্ত অনেকক্ষণ ধরে মিঃ দত্তের জন্য কোট, প্যান্ট, টাই বাছছিলেন। টেবিলের ওপর স্তূপাকার হয়ে পড়ে রয়েছে বিভিন্ন রঙের ও ছাঁটকাটের কোট প্যান্ট। কিন্তু কোন স্যুটই মিঃ দত্তের আজ আর ঠিক মনের মতন পছন্দ হচ্ছিল না। কোট প্যান্ট ঘাঁটতে ঘাঁটতে ওয়ার্ডরোবের তলা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল ছাপ ছাপ রঙ লাগা এই স্যুটটা। মিসেস্ দত্ত গম্ভীর মুখে মিঃ দত্তের দিকে একবার চাইলেন। আজ ক'বছর ধরে অনেক চেষ্টা করেও মিসেস্ দত্ত স্বামীর কাছ থেকে এই স্যুটটাতে রঙ লাগার কারণ আবিষ্কার করতে পারেন নি। লাল রঙ-লাগা এই স্যুটটার দিকে চেয়ে মিঃ দত্তের চোখে ভেসে উঠল তিন বছর আগেকার বসন্তের একটি সকাল।

দোল পূর্ণিমার সকাল।

জনডাইসন কোম্পানির বড় সাহেব মিঃ মরগ্যানের বাড়ীর দোতালার খোলা বারান্দায় প্রাতঃকালীন চায়ের আসর বসেছে। মিস এণ্ড্ কোম্পনির জুনিয়ার পার্টনার বিশ রঙ্গার্স সস্ত্রীক ও লাট প্রাসাদের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীও এসেছেন। মিঃ দত্তও উপস্থিত আছেন। চায়ের আসরের উপযুক্ত এলোমেলো নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল। হেলিটিটে মলমা কাপড়-পরা ভিখারী জাতীয় কতকগুলি মেয়ে পুরুষ কয়েকটি কাচ্চা-বাচ্চার হাত ধরে সামনের রাস্তা দিয়ে চলে গেল। মিঃ মরগ্যানের দৃষ্টি হঠাৎ সেইদিকে পড়তেই বলে উঠলেন, কি অপরিষ্কার এই লোকগুলো। মিঃ মরগ্যানের কথায় সকলেই রাস্তার দিকে চোখ ফেরালেন। মিঃ রঙ্গার্স বললেন, এদেশের লোক মোটেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে না। আমার হোটেলের সামনে উসকো খুসকো চুলে ময়লা কাপড়-পরা একটা মেয়েকে তারই মত অপরিষ্কার একটা বাচ্চা কোলে ক'রে রোজ ভিক্ষা করতে দেখি। সেদিন তার হাতে একটা টাকা দিয়ে বললাম, এই টাকা দিয়ে সাবান কিনে তুমি ভাল ভাবে স্নান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নিও আর কাপড়টা ডাইং ক্লিনিং-এ কাচিয়ে নেবে। কিন্তু আশ্চর্য তার পরের দিনও দেখি মেয়েটা ঠিক সেই রকম অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন হয়ে ভিক্ষা করছে। মিঃ দত্ত অনেকটা যেন অপরাধ স্বীকার করার মতন ম্লান হয়ে বললেন, সত্যি, আমাদের দেশের লোকের অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতার জন্য আমি খুবই দুঃখিত। মিসেস্রঙ্গার্স এবার হাত মুখ নেড়ে বললেন, হরিষ্বল! এদেশের লোকে যে কি করে শুধু হাত দিয়ে খাবার তুলে তুলে মুখে পোরে আমি ভেবেই পাইনা। মিঃ দত্ত হাতে করে একটা বিস্কুট তুলে খেতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মিসেস্ রঙ্গার্সের কথা শুনে বিস্কুটটা আবার প্লেটে ফেলে কাঁটাচ্ছুঁচে মুখে তুলবেন কিনা হঠাৎ ঠিক করে উঠতে পারলেন না।

চায়ের আসরের কথা আবার অন্যদিকে মোড় ঘুরে গেল। মিঃ দত্ত প্রথমটা একটু মনমরা হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর ছোট্ট একটি রসিকতায় সকলে যখন হো হো করে হেসে উঠল তখন তাঁর মনের মেঘ মুহূর্তের মধ্যে কেটে গেল। মিঃ দত্ত আবার তাঁর হাসি খুশি ভাব ফিরে পেলেন। চায়ের আসর যখন ভাঙল বেলা তখন ১০টা বেজে গেছে। সকলকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে মিঃ দত্ত তাঁর প্রকাণ্ড লিমোসাইনে এসে উঠলেন। গাড়ীতে মিঃ দত্ত চায়ের আসরের কথাই ভাবছিলেন। মিঃ মরগ্যানের

আজকে তাকে মিঃ দত্তের পরিবর্তে শুধু দত্ত বলে সম্বোধন করাটা তিনি লক্ষ্য করেছেন। মিঃ মরগ্যানের এই ফরম্যালিটিহীন আন্তরিকতায় তিনি মনে মনে খুশিই হয়েছেন এই রকম সদাগরী অফিসের বড় সাহেবদের চাকরের আসরের সোপান ধরে ক্রমে লাটপ্রসাদের ভোজনভায় পৌঁছতে পারবেন সেই কথাই ভাবতে ভাবতে মিঃ দত্ত একটু তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু গাড়ীর মন্থর গতি ভঙ্গ হওয়ার জন্যই বোধ হয় মিঃ দত্তের চিন্তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। হিন্দুপাড়ার দোল উৎসবের লালিমা ও কালিমা থেকে গাড়ীকে বাঁচাবার জন্যই বোধ হয় সোফার প্রশস্ত রাজপথ ছেড়ে গাড়ীকে সাহেব পাড়ার অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ পথে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পথের সংকীর্ণতার জন্যই পাড়ার গতি হয়েছে মন্থর। এই পাড়াটা সম্পূর্ণরূপে বিদেশী ও ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ দ্বারা অধ্যুষিত। সেইজন্যই পথ অপেক্ষাকৃত জনহীন ও পাড়া নিস্তব্ধ। গাড়ীর গতি মৃদু হওয়ার জন্যই বোধ হয় মিঃ দত্তের চোখে পড়ল একটি ছোট ছেলে দরজার কাছে বসে কাঁদছে। মিঃ দত্তের মনে কি হল, তিনি হঠাৎ সোফারকে বললেন, "এই রোখো।" মি. দত্ত গাড়ী থেকে নেমে ছেলেটির কাছে এসে দাঁড়ালেন। ছেলেটি বোধ হয় কোন সাহেব বা ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের গৃহ স্বামীর গৃহে অবস্থিত ড্রাইভার বা সেই রকম কোন কর্মচারীর পুত্র। মুখ নীচু করে কাঁদছিল বলে মিঃ দত্তের আগমন ছেলেটি এতক্ষণ বুঝতে পারেনি। মিঃ দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "খোকা কাঁদছ কেন?" ছেলেটি কান্না ভুলে বিস্মিত দৃষ্টিতে মিঃ দত্তের দিকে চেয়ে প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে গেল। মিঃ দত্ত আবার কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "খোকা কাঁদছ কেন?" ছেলেটি এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল। অনেক বোঝানোর পর কান্না বিজড়িতস্বরে ছেলেটি বলল, সকাল থেকে আমি কারও গায়ে রঙ দিতে পারিনি। মাকে সাহেব মেম ও সাহেবী পোষাক পরা লোকের গায়ে রঙ দিতে বারণ করেছে। মামার বাড়ীতে এতক্ষণ শুরু, ছবি ও রঙ খেলছে। ছেলেটি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মিঃ দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা কোথায়? মাকে ব'লে মামার বাড়ী যাও নি কেন? মার কথা মনে পড়ায় ছেলেটি এবার উচ্ছ্বসিত কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ল। মা'ত কতদিন হল হাসপাতালে গিয়েছে আমার জন্য ছোট ভাই আনবে বলে। আমিতো তখন খুব ছোট ছিলাম। বাবা রোজ বলে মাকে নিয়ে আসবে আর নিয়ে আসে না। ছবি বলে মা মরে গেছে। ছেলেটি চোখ রগড়াতে লাগল। বিয়াল্লিশ বছরের মিঃ দত্ত। রগের পাশে চুলের ফাঁকে তাঁকে শাদার উঁকিঝুঁকি দেখা দিয়েছে। হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে ভেসে গেল সাইত্রিশ বছর আগেকার মাতৃহীন একটি বালকের করুণ মুখ। নিমুঁত সাহেবী পোষাক পরা মিঃ দত্তের নিজেকে যেন বড় অসহায় মনে হতে লাগল। তাঁর গলার কাছটাতে কি যেন একটা ঠেলে উঠতে লাগল। অভিজাত সম্প্রদায়ের মিঃ দত্ত। জীবনের প্রতি পদক্ষেপ তাঁর মাপা কিন্তু তিনি সব ভুলে গেলেন। তিনি ছেলেটিকে বললেন, "ওই নিয়ে এস তোমার রঙ, আমার গায়ে দাও ছেলেটি বিস্মিত দৃষ্টি তুলে মিঃ দত্তের দিকে চাইলো। তিনি তাঁর ভুল ভাঙাবার জন্য পুনরায় বললেন, শীগগির তোমার রঙ নিয়ে এস, এক্ষুণি আবার আমাকে যেতে হবে। ছেলেটি এবার ছুটে দরজার পাশ থেকে রঙগোলা ছোট্ট একটি বালতি ও পিচকারি নিয়ে এসে তার কচি হাত দিয়ে দত্তকে রাঙিয়ে দিল। মুহূর্তের ব্যবধান। পর মুহূর্তে মিঃ দত্তের মুখ লজ্জায় কালো হয়ে উঠল। সোফারের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে মিঃ দত্ত যখন মাথা হেঁট করে মটরে এসে উঠলেন তখন ছেলেটির কচি মুখ হাসিতে ভরে গেছে

রং-বদল

অরুণ দাশগুপ্ত

থানার ঠিক উল্টোদিকেই দোকানটা।

দোকানে বসে চোখ তুলে তাকালেই প্রথমে চোখে পড়বে দূরের অশথ গাছটা। গাছের নীচে দিয়েই ট্যারাবাঁকা আঁকা-বাঁকা রেখা মিলিয়ে রেলগুলো। প্রতিদিন সকালেই ছুটো বা একটা আপ বাস্ত শান্টিং ইঞ্জিন দেখা যাবে। তারপরই চোখটা নামতে থাকবে। নেমে আসবে থানার টালিছাওয়া ছাদের কার্নিস ছুঁয়ে ছুঁয়ে। দৃষ্টি বুলোবে বারান্দায় বন্দুক হাতে পাহারারত পুলিশটার দেহে। স্থির, অ্যাটেনশন ভঙ্গী। ওর পেছনেই অফিস ঘরের দরজা, সেখানে এখন নড়াচড়া—একগাদা ফাইল ঘাটা কাজের ব্যস্ততা।

এরপরও আরও নামবে চোখ। থানা পেরিয়ে থানার দেওয়ালে। সেখানে বেশ বড় বড় করে লেখা, 'কাটিহার আদর্শ থানা'। দেওয়ালের নীচ থেকেই শুরু হয়েছে ধুলো মাখা রাস্তাটা—এবড়ো খেবড়ো খোয়া ওঠা। তিনটে মুচীর ছেলে পালিশ সরঞ্জাম নিয়ে তারি একপাশে বসে গেছে সেই সকাল থেকে। থানার ঠিক উল্টোদিকেই ডাক-বাংলো—ডাকবাংলোর গায়ে লাগান এই দোকানটুকু।

রোজই দেখছি পর পর সাজান এই একই ছবি। গাছ, ইঞ্জিন, থানা, পালিশ, রাস্তা। রাস্তা, পালিশ, থানা, ইঞ্জিন, গাছ।

সকাল থেকেই দোকান খুলে বসবার পর অন্তত ঘণ্টা দুয়েক এই দেখি। বা পাশের পানের দোকানের ছোকরাটার সংগে গল্প করি। দু এক খিলি পান বিক্রীর ফাঁকে ফাঁকে ও হয়ত গত রাত্রের সিনেমা দেখার গল্পটাই বলে ফেলে। ওই ওর এক দোষ। প্রত্যেক সিনেমাই ওর দেখা চাই। আর নতুন বই দেখা হয়ে গেলেই তা আমাকে শোনান চাই। যতক্ষণ না ও শোনাতে পারে ততক্ষণ যেন ওর আনন্দটা মোটেই পুরোপুরি উপলব্ধি হয় না। তাই সকালের এই ফাঁক-টুকুতেই ও ওর মনের ফাঁকা পূরণ করে। বড় নরম মন ছেলেটার। কাটীহারের আমেজে এখনও ও পাকাপোক্ত হয়ে ওঠেনি।

ওর দোকানের পরেই এখানকার সেরা সিনেমা হল 'বসন্ত্ টকীজ।' তখনও যেন বসন্ত্ টকীজ ঘোরের ঘুমে ঝিমোতে থাকে। গভীর রাত-জাগার একরাশ অবসাদ বুঝি ওর প্রতি দেওয়ালে।

শহরেও কিন্তু এ সময়টায় তেমন একটা চাঞ্চল্য জাগে না। শুধু কাছারীগামী ব্যস্ত কয়েকটা মানুষকে হয়ত দৌড়ে আসতে দেখা যায়। পুলিস অভিমুখি ন'টার বাসটা ধরে দিতে থাকে আগে থেকেই। ছাড়-ছাড় ভাব। গড়িয়ে গড়িয়ে একটু একটু করে বাসটা বসন্ত্ টকীজের সামনে এসে শেষবারের জন্য দাঁড়ায়।

এইটেই কাটীহারের সেরা রাস্তা। বলতে গেলে একমাত্র। বৃত্তাকারে সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করে শেষটায় এইখানে এসে রাস্তাটা দুভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। একটা গেছে বড়বাজার, অন্যটা ঘুরপাক্ খেয়ে থানার পাশ দিয়ে মঙ্গলবাজার ছাড়িয়ে, লেবেল ক্রসিং পার হয়ে সিধে গেছে কোর্ট পর্যন্ত। সেখান থেকে আবার ফেলা শহর পুলিস।

যাব যাব করেও বাসটা অহেতুক লেট করে। তারপর একসময় ধুলো উড়িয়ে ছেড়ে যায়। তখন মোড়টায় নেমে আসে নিরিবিলি। পানের দোকানটাও শূন্য। ব্যস্ততা থাকে শুধু থানার অফিসঘরে। এইরকম নিস্তব্ধতা চ'লে বেলা দশটা পর্যন্ত। যতক্ষণ না বহিরাগত ফার্ষ্ট ট্রেণ ইন করে কাটীহারে। এখানে প্রথম ট্রেণ আসে মণিহারী থেকে কলকাতার প্যাসেঞ্জার নিয়ে। এই সময়ে

প্রতিদিনই পানের দোকানের ছেলেটা কেমন যেন উদাস হয়ে পড়ে। একদিন এইরকমই এক ট্রেণ ওকে কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছিল।

পৌঁছে দিয়েছিল জীবনের নতুন সড়কে।

দূর থেকেও মণিহারীর ট্রেণটাকে একসময় আসতে দেখা যায়। লেল বেয়ে চাকাগুলোর গড়িয়ে যাওয়ার গুড়গুড় করে একটা যান্ত্রিক শব্দ ওঠে।

শব্দটা মিলিয়ে যেতেই ছেলেটার গলা শুনতে পাই, অরুণ দা ?

—কি ? উত্তর দিলাম।

—এটা লিঙ্ক এক্সপ্রেস না ?

—হ্যাঁ।

—রাইট টাইমে এসেছে আজ—

—কোথায়, আরও পনের মিনিট লেট।

—আচ্ছা, রাতের টাইম বদলেছে নাকি ?

—হঠাৎ গাড়ীর খোঁজ নিচ্ছিস কেন, তোর আজ কি হল ?

অবাক হয়ে প্রশ্ন করি। আমার প্রশ্নে প্রথমটায় ও চুপ করে যায়! তারপর কেমন একটু ভাসা সুরে বলে, না, ভাবছি একবার কলকাতায় যাব, অনেকদিন কোন খোঁজখবর পাই না—

কথা বলতে বলতেই আবার থেমে যায় ও। থামে অকারণেই। চোখ দুটো বুঝি তখন ওর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। ঠিক এমন সময় আসে ওরা। ন'-দশজন জাঁট-সাট মেয়ে। ময়লা জামা কাপড় পরা, প্রত্যেকের মাথায়ই একটা করে ঝুড়ি। দল বেঁধে পানের দোকানটিতেই এসে পড়ে সবকটি। ওর মধ্যেই একজন বলে বাবু, কানিটা আগুন দে। মেয়েটার মুখখানা গোলগাল, টানা টানা সুন্দর চোখ, বঙ্কিম ভ্রু, কপালের পর একরাশ অবিন্যস্ত চুল।

ছেলেটা দেশলাইটা এগিয়ে তুলে ওর হাতে দেয়।

সব কজনই বিড়ি ধরিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে চলে যায়।

ততক্ষণে আরও দু তিনটে ট্রেণ এসে পড়ে। জংশন স্টেশন। ধারে কাছের গ্রাম থেকে দলে দলে লোক আসে। কোর্ট, কাছারী, বাজারে। তখন রাস্তাটায় লোকের মিছিল, ভীড়ে ভীড়। দোকানের কাজ শুরু হয়ে যায়—একের পর এক খদ্দের। বাইরেটায় আর নজর দেওয়ার অবকাশ থাকে না, অবসরও হয় না।

একটা পর্যন্ত পরপর এইভাবে ট্রেণ আসে চারিদিক থেকে। লোকের ভীড় ঠেলে চোখ তুলে হয়ত একটু তাকাই, তারপরই ডুবে যাই খদ্দেরের মাঝে।

—দেব নাকি একজোড়া, হয়ত কাউকে বলি।

—নেহি বাবু, বড়া খাস্তি দাম বলতে হৈ—

—আচ্ছা, কোই বাত নেহি চার আনা কম দেনা।—

ওদিকে আর একজন ভদ্রলোক ছিট-কাপড় দেখছে। তাকে বলি, আপনার ক'গজ ?

—এটা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।

আগের লোকটাকে বেডকভার দিতে দিতেই বলি, বেশ'ত সিল্ক-টুইলটা নিন না—

কেন যেন এইসময়ে এত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও কানডটো হঠাৎ বাইরে চলে যায়। দোকানে কথা বলতে বলতেই শুনতে পাই, বাবু, দো-পয়সার বিড়ি দে—এ সেই মেয়েটির গলা। সকালে যে দলবল নিয়ে কয়লা আনতে গিয়েছিল। এখন ফিরছে ডেরায়।

—নে বিড়ি। ছেলেটা বিড়ি এগিয়ে দেয়।

—একটা কাঠি দে বাবু—

—দু পয়সার বিড়িতে একটা কাঠি ?

হাসে বুঝি চুপ করে মেয়েটি। বলে, দিবি না ?

ছেলেটাও বোধ হয় হেসে ফেলে এবার, নে ভাগ। কত কয়লা পেলি ?

—থোড়া বাবু, আজকাল বহুত মুশকিল—দিতে চায় না—

—সে কি, কুড়োতে দেয় না তোদের ?

—নেহি। ওরা নিজেরাই বেচে দেয় ; বলতো হামরা গরীব কি করব ?

অন্য মেয়েগুলো পরিশ্রমে ভারে ঘুরে পড়ে। মেয়েটার এই গল্প ওদের ভাল লাগে না। বলে ওঠে, এ রাধা জলদি চল্ আভি গপ্ করনেকো টাইম নেহি।

মেয়েটা হয়ত আবার একটু মুচকি হেসে সংগিনীদের বলে, তু লোক চল্ না:—

অন্য মেয়েগুলো বোধ হয় এগিয়ে যায়। টাকা নেওয়ার ফাঁকটুকুতে ওদের কথা আর শোনা হয় না। একটু বাদে শুধু মেয়েটার শেষ কথা কটা কানে আসে; ছোড়, রাত নেহি উঠা বাবু—

এবার ছেলেটা জোরে বলে, এ রাধা শুন—শুন—

—আজ নেহি, ফির কাল মিলুঙ্গী; চলতে চলতে রাধার উত্তর ভেসে আসে। ততক্ষণে আমার দোকানের সামনেটা খালি হয়ে আসে। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পাই রাধার মুচকি হাসিভরা মুখটা চকিতে সিনেমার পাশের গলিতে মিলিয়ে যায়।

কাটীহারে তখন গন্‌গনে দুপুর। আগুনের হল্কা ভরা ধুলো উড়ছে। ডিনটের পর তাই খেয়ে দেয়ে এসে একা বসে বসে ঝিমোই। জানি এ সময়টাতে কোন খদ্দের আসে না। এটা কাটীহারের রেওয়াজ। শহরের বাইরের যারা, তারা সকলেই যে যার ফিরতে শুরু করেছে। ষ্টেশন থেকে একের পর এক গাড়ী ছাড়ছে ছড়মুড়িয়ে; সিংগাবাদ যোগবানি, পার্বতিপুর, শিলিগুড়ি—আজকের মত ওদের পাততাড়ি গুটানো হয়ে গেল। আবার হয়ত কাল আসবে অন্য দল, নতুন লোক।

স্থানীয় লোক বাজারে বেড়োবে সেই সন্ধ্যের পর। সিনেমা শুরু হওয়ার আগে যেই গানগুলোও শেষ হবে ঠিক তখন থেকে বাবুরাও বেড়োবে একে একে। তারপর বাজার জমবে রাত দশটা পর্যন্ত। জমবে সারি সারি জামাকাপড়, পেটোমাক্স। ছোট ছোট দোকানগুলোয় হয়ত কারবাইডের গ্যাস ল্যাম্প। তাই নেহাৎ এই সময়টুকু কাটাবার জন্যই এই ঝিমুনি। গরম রোদ্দুরে একা একা বসে ঢোলা। সামনের রাস্তাটায় এ সময় কেউ নেই। বেবাক ফাঁকা। পানের দোকানের ছেলেটার হাতও খালি বুঝি। তাই হয়ত দোকান ছেড়ে উঠে এসে ও আমার দোকানের সামনে দাঁড়ায়। প্রায়ই এ সময়টা ও গল্প করতে আসে। আজে বাজে ঘুম-তাড়ান গল্প। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটুখানিক কি যেন ভাবে ও তারপরে বলে, অরুণ দা?

ঝিম ভেংগে ওর কথায় সাড়া দি, কি?

—কিছু না। তুমি ঘুমোচ্ছ নাকি?

—না, ঘুম হয় নাকি এই গন্‌গনে গরমে?

—তোমার একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম—

—বেশ'ত বল না, ওর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাই এবার। মাথা নীচু করে থেকেই ও বলে, তোমার কষ্ট লাগবে নাকি?

—কষ্ট? হঠাৎ আবার কেন? সেদিনও ত' তুই জোর করে দিলি।

—তাই ফুরিয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করছিলাম; আমার অনেক জমে গেছে। আজও ও দিয়ে গেল অনেকগুলো। নিষেধ করলাম, তবু শুনল না, ফেলে রেখেই পালিয়েছে।

ও মানে রাধা। সকালের সেই গোলগাল সুন্দর মেয়েটা। চোখ-দুটো যার টানা টানা, ভ্রূ ছোড়া বঙ্কিম।

বেশ কয়েকদিন থেকেই দেখছি ওদের দুটীকে। পানের দোকানের ছেলেটী—হীরু, আর ওই রাধা। মাঝে মাঝে ঝগড়া করছে আবার হাসছে হয়ত এক সংগেই। হীরুকে লক্ষ্য করে এও দেখেছি আজকাল ও একটু কেমন যেন রাধার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। রাধার সম্বন্ধে ওর চোখ দুটোয় কেমন একটা চক্‌চকে কৌতূহল।

রাধার সমবয়সী অন্য মেয়েগুলোও ওদের দুটীকে রোজই দেখে। আর হেসে কুটি কুটি হয়। তাদের সংগে দূর থেকে আমিও দেখি। দেখি একটী বাঙালী ছেলের সংগে একটী অবাঙালী মেয়ের এই ভাবটুকু।

রোজ সকালেই মেয়েগুলো যাওয়ার পথে এখানে বিড়ি ধরাবে। ঠিক তখন, যখন মণিহারী থেকে কলকাতার গাড়ীটা কাটীহারে এরাইভ করে। আর ঐ গাড়ীর বাঁশীর সংগে দুলে ওঠে হীরুর কাঁচা পোড় খাওয়া মনটা। ওর চোখে বুঝি ভেসে ওঠে আর একটা ছায়া ছায়া ছবি। রাণাঘাটের ধুবুলিয়া ক্যাম্প, দেশ ভাগ হবার পর যেখান থেকে এই গাড়ী চেপেই একদিন ও এখানে এসেছে। বাঁশীর শব্দটা থামতে না থামতেই ওরা এসে পড়ে। সব কজনে ঘিরে দাঁড়ায় দোকানটা।

রাধারা এলে হীরু যেন তবু একটা কাজ পায়। চুপচাপ ঝিমিয়ে পড়া মনটায় সাড়া জাগে। ওদের দেখতে দেখতেই ভুলে যায় স্মৃতির ওই ছোট্ট ছবিটুকু। বুকের ফাঁকটায় তখন বুঝি আরেক রংয়ের হাল্কা ছোপ লাগে, শুধু আবছা একপোঁচ তুলি বুলান।

কাটিহারে একাই থাকে হীরু। নিঃসঙ্গ একা। দোকানের পেছনটাতেই নিজেই রান্না করে খায়। চুপচাপ। সবার চোখের আড়ালেই। তবু কেমন করে যেন হঠাৎ একদিন ব্যাপারটা টের পেয়ে যায় রাধা। সামনে ইঞ্জিনগুলো লেবেল ক্রসিংটার কাছে এসেই কয়লা ঝাড়ে। রাধারা তাই রোজই কুড়ি বোঝাই সেই গোড়া কয়লা থেকে বেছে কয়লা কুড়িয়ে আনে তারপর সেগুলো বাজারে বিক্রয় করে। তাই ওর কুড়ান কয়লা থেকেই হীরুর রান্নার ব্যাপারটা আবিষ্কার করার পর রাধা বুঝিয়ে চলে হীরুর ইন্ধন, বিনাদামেই। শুধু ওই দু'একটা বিড়ি বা ফাউ, তার বেশি কিছুই চায় না রাধা।

হীরু হঠাৎ রাধার এই অযাচিত করুণা দেওয়ায় হকচকিয়ে যায়। কিন্তু প্রথম থেকেই কয়লা নিতে নারাজ হয় ও। আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করে, কি করি বলুন'ত রাধাকে নিয়ে? ওরা বড় গরীব, বিনা পয়সায় এভাবে আমার নেওয়া ঠিক নয়।

বলি, দাম দিয়ে দিস। তবেই ত' ঠিক হবে।

সেই ভাল হবে, আমার কথায় হীরু বলে, ওকে যে করেই হোক দাম দিয়ে দেব।

কিন্তু দাম দেওয়া আর হয়ে ওঠে না। মানে রাধা কিছুতেই দাম নেয় না। উপরন্তু পর পর আরও কয়লা দিয়ে যায় সে। একদিন ত এই নিয়ে প্রায় হাতাহাতিই ওদের মধ্যে।

হীরুর মুখে অনেকগুলো কটু কথা শুনে, নিজের সাথীদের কাছে অপদস্থ হয়ে রাধার সে কী বেসামাল অবস্থা। তার ওপর দুপুরের কড়া রোদে পুড়ে ওর মুখখানা তখন টকটকে লাল। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসে বুঝি একরাশ প্রত্যাখানের লজ্জা!

অত ঝগড়ার পর শেষ পর্যন্ত কিন্তু সেদিনও হীরু হার মানে। ঠেলতে পারে না কিছুতেই রাধাকে। চুপচাপ ওর লজ্জাভরা ছলছল চোখ দেখে নিজেকেই গুটিয়ে নেয় শুধু।

এরপর ওদের মধ্যে আবার মিটমাট হয়ে যায়। আগের মতই হাসে আবার দুটীতে। পুশার উড়ো উড়ো হাসি। হেসেই একদিন হীরু জিজ্ঞেস করে রাধাকে, এভাবে রোজ রোজ আমাকে তুই কয়লা দিস্ কেন?

রাধার ছোট্ট একটু জবাব, আচ্ছা লাগে

আবার হাসে। হেসে পালিয়ে যায়।

এই ভালটুকু যেভাবেই হোক শেষ পর্যন্ত হীরুর মনেও লেগে যায় বুঝি। বোধ হয় যাই যাই করা ওর মনটাকে আটকে রাখতে চায়। এইটুকু অনুরাগ দিয়েই ওকে যেন এতদিন আটকে রেখেছে কাটিহার। যাই যাব করেও তাই হীরু থেকে যায় কাটিহারে। রাধার মুখটা ভেবেই বুঝি সরিয়ে ফেলে ওর মন থেকে, আলমলিঙ্গের করুণ বালির ওপারের আরেকটা জগত, যেখানে সবাই বাঙালী, ওর আত্মীয়-স্বজন।

রাধার প্রসঙ্গে হীরুরও আজকাল কি রকম যেন কান গরম হয়। মনে আঁচ লাগে। নরম একটা আলগা তাপ।

রোজ রোজ দেওয়া রাধার কয়লা উদ্বৃত্ত হয় হীরুর। দুচার দিন জমতে জমতে একদিন অনেক জমে যায়। তাই সেই বাড়তি জমা থেকেই প্রয়োজন মত ভাগ দেয় আমাকে। বিব্রত হলেও বারণ করতে পারি না। তবু একদিন হীরুকে বলি, তুই রোজ রোজ এই যে আমায় ভাগ দিচ্ছিস; দেখিস, রাধা যেদিন একথা শুনবে সেদিন আর তোর সংগে কথাই বলবে না।

রক্ত জমে ওঠে হীরুর গালে, কানে। মুখে বলে, তাহলে ত বাঁচি, অন্তত ওর এই দেওয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই। কথা কটা বলেই চুপ করে যায় হীরু।

বসন্ত টকীজের ঘুম ভাংগে একসময়ে। ফার্ষ্ট শো শুরু হতে আর আধঘন্টা। মাইকে গান শুরু হয় তখন থেকেই। খদ্দের কিন্তু তখনও আসে না আসবে আরও

বক

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

এক ঠেঙো এক বক ছিল
কলা-কপ মাছ গিলছিল,
মাছ গিলে বক হাঁস হলো
বললো সবাই এই মলো!

এইমলো যেই বলা—
বাড়লো হাঁসের গলা
জিরাফ হলো নাম
কি ঝিলমিটে রাম!

জিরাফ দেখে দেখে
রাজা উঠলেন কেশে
কাশি বিষম পাপ
রাজা বললেন সাপ।

সাপটা ছোবল মেরে
যেই বলেছে কেরে
জিরাফ হলো সিরাপ
সাপটা কাঁচের কাপ।

সেই কাপটা নিয়ে
সিরাপ চুমুক দিয়ে
সবাই যখন খেলো
বক দেখতে পেলো।

পানকৌড়ী

সুনীতি কুমার মুখোপাধ্যায়

পানকৌড়ি পানকৌড়ী, জলকে দিতে ডুব
তোমার লাগছে মজা খুব?
খুব ভালো লোক তোমার বাপ-মা না?
যতই ডোব, সাঁতার কাটি
করবে না-কো মানা।

যখন তুমি নীল আকাশে ওড়
মনের সুখে দেশ-বিদেশে ঘোর।
আমি যদি পুকুর ধারে আসি,
ঠাকুমা বলে ঠাণ্ডা লেগে
হবে সর্দি-কাশি।

নামলে পরে একটুখানি জলে—
তক্ষুণি মা তাড়াতাড়ি
উঠতে আমায় বলে।
তুমি তো ভাই আমার চেয়ে ছোট
আমায় দেখা চাঁদ ছানাটির মত।

নদীর জলে, খালে—বিলে
এত যে ডুব দাও,
মাঝ-নদীতে সাঁতার কেটে যাও—
ভুগছ কি ভাই সর্দি-কাশি জ্বরে?
আমায় তবে বাড়ীর সবাই
নিষেধ কেন করে?

শ্রীকৃষ্ণের বিপদ

অমলেন্দু ভট্টাচার্য

দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণ। ধনে ধ্যানে জগতে যাঁর তুলনা নেই। প্রজার সুখ দুঃখের দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি। শ্রীকৃষ্ণ সবারেই সংকট সমাধানই বিপদ মুক্ত করে দেন। কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণই একবার কেমন বিপদে পড়েছিলেন—এই কথাই আজ বলব।

প্রজার সুখের জন্য শ্রীকৃষ্ণ একটি অতিথিশালা খুলেছিলেন। প্রতিদিন সেই অতিথিশালায় দেশ বিদেশের বহু অনাহূত-স্বয়াহূত-অনাথ-ফকির-বিপন্ন অন্ন পেত। খুব নাম ছড়িয়ে পড়লো শ্রীকৃষ্ণের। আর তারাই তাঁকে জানে সামান্য সামান্য অহঙ্কারের দানা বাঁধতে লাগলো শ্রীকৃষ্ণের মনে। অবশেষে একদিন তা বিরাট আকার নিল। অহঙ্কার তাঁর খুবই হ'ল। অহান্ত দেবতাদের তিনি আমন্ত্রণ করতে লাগলেন তাঁর অতিথিশালা দেখে যাবার জন্য।

রামভক্ত হনুমান খবর পেলো এই অতিথিশালার। আর জানলেন শ্রীকৃষ্ণের অহঙ্কারের কথা। আর শ্রীকৃষ্ণকে জব্দ করার এক ফন্দী বার করলো সে। সে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ নিয়ে হাজির হ'ল সেই অতিথিশালায়। শ্রীকৃষ্ণের হুকুম ছিল—কেউ যেন ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে না যায় বা অর্দ্ধভোজন করে ফিরে না যায়? আর প্রতিদিন একলক্ষ মণ চাল রান্না হত সেই অতিথিশালায়?

হনুমান আস্তে আস্তে গিয়ে হাজির হ'ল। অতিথিশালার কর্ত্তাকে বললো—ওহে বাপু, আমার বাড়ী অনেক দূর। বিশেষ কাজে এখানে এসেছি আবার এখুনি চলে যাব। আমায় আগে খেতে দাও।

তখনও কেউ খেতে বসে নি। আগেই বৃদ্ধকে খেতে দিল তারা। হনুমান রামের নাম নিয়ে ধীরে ধীরে সেই লক্ষমণ চালের ভাত খেয়ে ফেললো। এদিকে বাইরে শত শত অনাথ ফকির অস্থির। আর খাবার ঘর শূন্য। তখনও কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপী হনুমানের ওঠার লক্ষণ নেই। বললো—ওরে, আর কি আছে নিয়ে এস। পেট তো ভরলো না।

শ্রীকৃষ্ণ তখন রাজধানীতে আছেন। খবর গেলো তাঁর কাছে—কে একজন এসেছে অতিথিশালায়। সে সমস্ত খাবার খেয়ে ফেলেছে। তাতেও তার পেট ভরে নি। সে আরো চায়।

তিনি তাড়াতাড়ি এলেন অতিথিশালায়। বৃদ্ধকে বললেন—দেখুন, আমাদের রান্না তো আর কিছু নেই—

তবে কি আমি না খেয়ে চলে যাব বলছো? আর তোমার অতিথিশালা থেকে? হনুমান বললো।

তবে আপনি অপেক্ষা করুন। আমরা ভাত রেঁধে দিই। আমাদের চাল তো রয়েছে। বললেন শ্রীকৃষ্ণ।

না না, অত অপেক্ষা করার সময় আমার নেই। আমাকে চালগুলোই দাও। আমি তাই খাই। হনুমান বলে।

সে কি হয়—কুণ্ঠিতভাবে শ্রীকৃষ্ণ বললো—শুকনো চালগুলো কি করে খাবেন?

জল তো উঠে চলে যাই। হনুমান ব্যস্ত।

অগত্যা শ্রীকৃষ্ণ শুধু চালই দিলেন হনুমানকে। আর আশ্চর্য! রামনাম ক'রে হনুমান চারদিনের চারলক্ষ মণ চাল শুকনো চিবিয়ে খেয়ে ফেললো।

তখন শ্রীকৃষ্ণ অবাক হয়ে জোড় হাতে বললেন—কে আপনি, আপনার পরিচয় দিন।

(শেষের অংশ ৪১৩ পাতায়)

শিশু কিশোর ও বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের উপকরণ

প্রবণতা বিচারের প্রথম স্তর

শিশুরা সমাজের একটা বিশেষ স্থান নিয়ে থাকে। ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থা, সমাজের আশা আকাঙ্খা শিশুদের ঘিরেই গড়ে ওঠে। সেজন্য সমাজ, সামাজিক রীতি-নীতি, সামাজিক অনুষ্ঠান, শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান, কণ্ঠোগ্রোগ এবং কর্মসূচীগুলির অধিকাংশই শিশু-কিশোরদের নিয়ে কাজ করে থাকে। শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ, তাই তাদের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার জন্য সমাজের সকল-শ্রেণীর লোকেরাই কিছু কিছু কাজ করছেন। যারা নিজ কাজের জটিলতার জন্য সরাসরি শিশু-কিশোরদের জন্য কর্মসূচী নেন না তাঁদের কাজেও শিশু-কিশোরদের কল্যাণ ও বিকাশ সাধিত হতে পারে। পক্ষান্তরে তাঁদের অবহেলার ফলে শিশু-কিশোরদের কল্যাণ ও বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়, এমন কি সেই ঔদাসীন্যের পরিবেশে তারা হীন হয়ে পড়ে।

প্রথমেই ধরি সমাজ। শিশু-কিশোরদের স্বাস্থ্য, চরিত্র, শিক্ষা, আনন্দ কর্মোৎপরতা এবং সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য সমাজ এবং রাষ্ট্র দায়ী। তাই শিশু মনস্তত্ত্ব বিচারের জন্য সমাজ চিন্তিত হয়ে ওঠে। সেই চিন্তার ফল হিসাবে আমরা দেখতে পাই— "শিশু লালনী গ্রন্থমালা", "শিশু মনস্তত্ত্ব", "শিক্ষা আমার শিশুর কাছে" ক্যারোলিন প্র্যাট "শিশু পরিবেশ" ইত্যাদি। যে কোন শিশু কিশোর সংগঠক, শিক্ষক, অভিভাবকদের কাছেও এ ধরণের বইয়ের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। মনস্তত্ত্বের গতি বুঝেই প্রতিদিন মা, ঠাকুরমা, দিদিমা তাঁদের ঘরোয়া জীবনে শিশুদের প্রতি তাঁরা প্রয়োগ করেন গল্প শুনিয়ে, ছড়া শেখে। সেই গল্প যা শিশুমনের কল্পনার বিকাশ সাধে সহায়তা করে, শিশুর মন আনন্দে ভরে ওঠে, ভরে, রোমাঞ্চে শিহরিত হয়ে ওঠে।

'রঙীন দেশের রূপকথা', 'ঠাকুরমার ঝুলি', (দক্ষিণা-রঞ্জন) 'গল্পের আলপনা' 'পুরানো দিনের পুরানো গল্প' (আশাপূর্ণা দেবী), 'পাহাড়িয়া কাহিনী' (নলিনী কুমার ভদ্র), 'ছোটদের বেতাল পঞ্চবিংশতি' (কুলদারঞ্জন রায়), 'কালো পাখী' (শৈল চক্রবর্তী) 'সাত রাজার ধন' (সীতা দেবী, শান্তা দেবী)। এই ধরণের বইগুলিতে আগের যুগের মা, ঠাকুরমাদের শোনানো গল্পের লিপিবদ্ধ কাহিনী পাওয়া যাবে।

কোথায় যে রূপকথার মাঝখানে ইতিহাস ঢুকে পড়েছে কে জানে। হয়তো ইতিহাসের পাতায় উঠেছে এমন রাজার রাজত্বেই অনেক গল্প রূপ পেয়েছে, কিন্তু কোথা থেকে যে তার শুরু হয়েছিল তার হদিস্ নেই। যেমন 'ছোটদের হিতোপদেশ', (তারাপদ রাহা) 'কথা সরিৎ সাগর' (কুলদারঞ্জন রায়) ইত্যাদি।

আর ছড়ার কথা। ছড়া ও পড়া (যোগীন্দ্রনাথ সরকার), জানোয়ারের ছড়া, কুসুম, ইটি-বিটির আসর (সুনির্মল বসু), খাই খাই, আবোল তাবোল (সুকুমার রায়)। এ সব বইএর ছড়া, কবিতা শিশু-কিশোরদের পড়ে শোনানো যায়। যাদের সামনে রেখে দিলে নিজেরাও বসে যাবে পড়তে, মানেও করে নেবে প্রায়গুলির। মানে না বুঝলেও মনে দোলা দেবে। ছড়ার কাজই তো তাই।

এসব ভেবেই যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলন করেছিলেন 'খুকুমণির ছড়া'। আজ বোঝা যায় ইংরাজী ছড়া-চর্চার বই তাঁকে এবং সুকুমার রায়কে কি ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, যার ফলে "খেলার গান", "খেলার সাথী", "হিজিবিজি" প্রভৃতি লিখেছিলেন যোগীন্দ্রনাথ। ছড়া আর কথাকে আশ্রয় করে "সরগরম" (সুনির্মল), "বেতাল ঠাকুরমি" (বিভূতি) প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি "ছবি ছড়ার দেশে" (বিশ্বনাথ দে) সংকলনটি এবং 'হাসির তুবড়ি' (নগেন্দ্রনাথ মিত্র মজুমদার)।

ছড়ার প্রাণাগুর তিনটি উদাহরণ এর বিচিত্র সম্ভাবনার

রচনা করেছে। "কবিতার ঈশপ" (রমেন চৌধুরী), "ছবি ও ছড়ায় ভূগোল" (হাসি দাশগুপ্তা), "ছড়ার ছবি" (রবীন্দ্রনাথ), উপকথা, বিজ্ঞান এবং চিত্রে অনুরাগ আনার কাজে ছড়াকে আশ্রয় করেছে। "ছোটদের কবিতা লেখা" (সুনির্মল বসু) বইটি ছোটদের কবিমন গড়তে সহায়তা করতে পারে। ছড়ার ভঙ্গীতে লেখা "ফটিক" (অপর্ণাপ্রসাদ সেন) ছড়ার প্রাণান্ত সূচিত করছে।

মানুষ সভ্য হয়েছে, গায়ে শক্তির দরকার এখন বিশেষ হয় না। হাতের সাহায্যে মানুষ পূর্ব্বে কাঠ কাটতো, পাথর ভাঙতো, জঙ্গল পরিষ্কার করত, সাঁতার কাটতো। এই সব কায়িক পরিশ্রমের ফলে তারা নিজেদের জীবিকা সংস্থান ও স্বাস্থ্য রক্ষা করতো। এ যুগের মানুষদের জীবনযাত্রা অনেক বদলে গেছে। দেহের স্ফূর্তি, সাবলীলতা ও স্বাস্থ্য পেতে গেলে আজও দৌড়-ঝাঁপ ইত্যাদির অভ্যাস রাখা প্রয়োজন। সেটা আমরা অনেক সময় বুঝিও না।

"আমাদের শরীর ও মন" (কিশোর ভারতীর তৃতীয় গ্রন্থ,), "সহজ ব্যায়াম ও খেলা" (শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য), "কাচ খেয়াল খেলা" (মৌমাছি), "জগৎ জোড়া খেলার মেলা", "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দৌড়ানো" প্রভৃতি বই শিশু কিশোরদের শারীরিক বিকাশের সমস্যা বিচারে সহায়ক হবে।

কত রকমের খেলা আছে তার কি কিছু ইয়ত্তা আছে। ছোটদের খেলবার জন্য অনেক সময় কোন জিনিষ দরকার হয় না। খেলা ছাড়া ছোটরা কিছুই জানে না, তাই ঘরে বন্ধ থাকলেও এই খেলাগুলি তাদের আনন্দ জোগায়:—কবিতার লড়াই, ভূগোলের খেলা, আবৃত্তি, গল্প বলা, ম্যাজিক।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এ সবের ওপর বই বিশেষ নেই। প্রধানতঃ শিশুসাথী, মৌচাক, রামধনু, শুকতারা প্রভৃতি কিশোর মাসিক পত্রিকার পাতায় এবং বর্ত্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে না এমন পত্রিকাগুলিতে (পুরানো সংখ্যাগুলি প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারে গিয়ে) দেখতে পাওয়া যায়। আংশিক তালিকা যুগযাত্রী কার্ত্তিক, পৃঃ ২৩৮-১৪১, "ছোটদের সাহিত্য জগৎ" পর্য্যালোচনা প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে। তা ছাড়া বার্ষিকী ও সংকলন গ্রন্থে এই উপকরণ পাওয়া যাবে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 'ছোটদের ম্যাজিক' (পি, সি সরকার)।

রূপকথার কথা বলতে গিয়ে ইতিহাসের কথা উঠেছিল। "ভারত-তীর্থ" (অন্নদানাথ সিংহ ও জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়), "এ নহে কাহিনী" (যামিনীকান্ত সোম), "এই দেশের মেয়ে" প্রভৃতিতে ইতিহাসের—আমাদের গৌরবের টুকরো কথা বলা হয়েছে যে গৌরব নানাভাবে আমাদের কল্যাণ করতে পারে। "মুখর অতীত" (অশোক গুহ), "ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা" (পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়) দেশ বিদেশের ইতিহাসের ধারা আর ইতিহাস গড়ার কাহিনী ছোটদের জন্য পরিবেশন করেছে।

আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মন গড়ে উঠতে সহায়তা করতে পারে "ভারতের চিন্নাশক্তি" (শ্রীঅরবিন্দ, "হিন্দু ধর্ম পরিচয়" (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ)। গত দুশো বছর ধরেই দেশকে যারা নতুন করে গঠন করতে চাইছিলেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই বিজ্ঞানে বিশ্বাসী এবং ভারতের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার পক্ষপাতী। "গল্পে বিবেকানন্দ" (সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত), "বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালী" (দক্ষিণারঞ্জন বসু ও আনলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), "বরণীয় বাঙ্গালী" (সুধীরকুমার মিত্র), "স্মরণীয় যাঁরা" (বীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য), "গল্পে গান্ধীজী" (সেন ও গুপ্তভায়া), "পূজনীয় যাঁহারা" (নির্মালা দাশগুপ্ত), "জাতির জনক যাঁরা" (প্রতিনাথ চক্রবর্ত্তী), "গল্পে চিত্তরঞ্জন" (লালমোহন সেনগুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত) এইসব বইয়ে তাঁদের চিন্তাধারার কথাই ছোটদের কাছে বলার চেষ্টা হয়েছে।

"স্বরাজ ও সাধনা"র (সুবোধচন্দ্র রায়) নতুন যুগের পরিপ্রেক্ষিত বিচারের তথ্য পরিবেশন করে ছাত্রসমাজ কি ভাবে শিক্ষা ও জাতি গঠনকে মেলাতে পারে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি আরো খুটিনাটি ভাবে আলোচনা করে "স্বাধীনতার দায়িত্ব" (ডাঃ নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত), "আমাদের শিক্ষা ও পল্লী প্রতিষ্ঠা" (মহেন্দ্র নাথ

দত্ত) বই দুটিতে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং পল্লী পুনর্গঠনের সমস্যার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'সমবায়' (রবীন্দ্রনাথ) 'ব্রতচারী সখা' (গুরুসদয় দত্ত) 'অধ্যয়ন ও সাধনা' (প্রফুল্লচন্দ্র রায়) বইগুলি এবিষয়ে কাজে লাগবে।

দেশকে পুনর্গঠন করবে ছাত্ররা। আজ জানবে ভাল করে, ভাববে বিশেষভাবে, প্রশ্ন করবে কিভাবে পুনর্গঠন সম্ভব। তারপরে শিক্ষা শেষ করে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আগামী কালে। তাই প্রশ্ন তোলার মত বই হিসাবে "পশ্চিমবঙ্গের কথা" (প্রফুল্লকুমার প্রামাণিক) "ভারতের কথা" (সুরেন্দ্রমোহন দত্ত, হিমাংশু প্রকাশ রায়), "দেশ বিদেশের খোঁজ খবর" (নিখিল সেন) এসব তাদের হাতে দিতে হবে। খুঁটিনাটি বিষয়গুলির জন্য "চিত্রে ও গল্পে জলপাইগুড়ি" (কৃষ্ণ সরকার ও প্রফুল্ল রঞ্জন মুখোপাধ্যায়); "রাজগির নালন্দা ও পাওয়াপুরী" (অন্নদাচরণ কারকুন)। পূর্ব-অঞ্চলের পরিচয়ের জন্য "আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী", "বিচিত্র মণিপুর" (নালনী কুমার ভদ্র)।

প্রকৃতির সঙ্গেও তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। তাতে করে শুধু মাত্র পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, বা কারিগরী বিষয়ের তত্ত্বগত ধারায় তাদের মধ্যে যাঁরা বিজ্ঞান পাঠে আগ্রহশীল হয়ে উঠবে, তাদের পাঠস্পৃহা সীমাবদ্ধ থাকবে না। বিশাল ভারতের প্রান্তে প্রান্তে যে জীব জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ আছে তার সম্পর্কে দেশের শ্রীবৃদ্ধির কাজে লাগানোর চিন্তা তাদের মনে জাগতে থাকবে। অনায়াসেই তাদের হাতে "সন্ধানী" (প্রভাত সমীর রায়) তুলে দেওয়া যাবে যাতে পদার্থ, রসায়ন বিজ্ঞান ছাড়াও ভূবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জৈব বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদির প্রাথমিক পরিচয় সুখপাঠ্যভাবে দেওয়া হয়েছে। তারপরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্য খুজে নেই, "আকাশ থেকে মহাকাশে" (অরুণ রায়, কালিপদ দাস); পদার্থের ধর্ম বোঝার জন্য "ছোটদের ম্যাজেনেটরী" (মনোজ দাস্তাল); জীবাণুর ক্রিয়া বোঝার জন্য "ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ" বিজ্ঞান বিচিত্রা সিরিজ, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)। এমনকি "সোভিয়েট বিজ্ঞান" (ডাইসন কার্টার) বইটির ছোটদের স্বাধীনতা পরিচ্ছেদটি পড়তে দেওয়া যাবে।

শোনা যায় "ডাক্তার জন্ড ওয়াশিংটন কার্ভার" পড়ে অনেকের কৃষি বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক হয়েছিল। এর জীবনের চিত্ররূপ, আরো সাত জনের সঙ্গে, যাঁদের মধ্যে এডিসন, লিংকনের জীবন ও আছেই, "আমেরিকার আটজন মনীষী"র মধ্যে দেওয়া আছে। তুলনা করতে গেলে বাংলা ভাষায় "এব্রাহাম লিঙ্কন মহান মুক্তিদাতা" বইটির চেয়ে ইংরাজীতে Album of Benjanin Franklin, অনেক তথ্যবহুল। অল্প কথায়, এত সুন্দর পুস্তিকায় এই উৎসাহ জাগানোর চেষ্টা আমাদের দেশে প্রয়োগ করা হলে কিশোরদের উপকার হবে।

"সেরা বইয়ের গল্প" (বীরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, সুধীর রঞ্জন মুখোপাধ্যায়) বইটিতে বঙ্কিমের ৬টি বইয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া হয়েছে: কালিদাস, দীনবন্ধু, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, এবং মাইকেলের বইয়েরও সংক্ষিপ্ত রূপ এতে আছে। সব শুদ্ধ লেগেছে ১৭২ পৃষ্ঠা। "অমর বঙ্কিম" বইয়েও আটটি বঙ্কিম রচনার সাগরসম গাম্ভীর্যের মধ্যে কিশোর মনকে অভিযানে উৎসাহিত করার চেষ্টা হয়েছে।

এই চেষ্টাকে বিস্তার করা প্রয়োজন। "ইউরোপের সেরা সাহিত্যিক" (গজেন মিত্র) ১২০ পৃষ্ঠায় ৩৪ জনের সাহিত্য-ধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

অনেক বিষয়ে বই আছে। অনেক বিষয়ে বইয়ের উপকরণ ছড়িয়ে আছে মাসিক পত্রে, সংবাদপত্রের সাময়িকীতে। সে সব গ্রথিত করার উদ্যোগ কারা নিতে আসছেন কারা?

আর মেয়েদের জন্য বিশেষভাবে রচিত বইগুলির পরিচয় সংকলন করার জন্য কি ব্যবস্থা সম্ভব এই ভাবতে হবে। "সাতাকের গল্প" (শান্তি পাল) বসুর লীলা চট্টোপাধ্যায়ের—সাঁতারের প্রতিভার পূর্ব ইতিহাস। মেয়েদের শিক্ষার সমস্যা নিয়ে বিশেষ চিন্তা করে এমনকি সেই চিন্তার সাংগঠনিক প্রতিরূপের আভাস দিয়ে "বাংলার স্ত্রী শিক্ষা" (শঙ্খালিকা শেঠ) লেখা হয়েছিল।

শিশু ও কিশোরদের বিকাশ ও কল্যাণের জন্য এই ধরণের চেষ্টা আরও ব্যাপক এবং সংঘবদ্ধ রূপ নেওয়া উচিত। এই সম্পর্কে আগ্রহশীল ব্যক্তিরা তাঁদের মতামত আমাদের জানালে সুখী হব।*

* যুব পরিষদ—শিক্ষা, কল্যাণ ও সূত্র-সন্ধান সহায়ক সংস্থা।

পুস্তক প্রসঙ্গ

ফুলডোরে—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত।
প্রকাশক : অটো প্রিন্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস
কলিকাতা—৬। পৃষ্ঠা—১৪৮, মূল্য—২।০

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বারটা ছোটগল্প নিয়ে এই সংকলনের জন্ম হয়েছে। বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে আজ আর বাংলা ভাষায় ছোটগল্প অপাংক্তেয় নয়। সুতরাং ছোটগল্পের নতুন কোন সংকলন বাজারে বের হলেই পাঠক পাঠিকা তথা সাহিত্যিক মহলে একটা আলোড়ন পড়ে যায়—এ জন্যে যে আর একখানা পড়বার মত ভাল বই বুঝি পাওয়া গেল। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে উপরোক্ত সংকলন নিরাশ করেছে।

গল্পগুলিতে নেই কোন বাস্তব জীবনমরণ সমস্যার অবতারণা, নেই আজকের দিনের সমস্যাসংকুল জীবন নাট্যের অভিব্যক্তি ও বহিঃপ্রকাশ অথবা কোন সূক্ষ্ম রসের সুচু নিবেদন। আবার মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক সত্যকেও ব্যক্ত করতে কসুর করেননি গল্পকার অত্যন্ত দুর্বলভাবে। গল্প-বিন্যাস পদ্ধতি অত্যন্ত গতানুগতিক। ভাষার অবস্থাও একই প্রকার।

'অনুভূতি' দিয়ে আরম্ভ। বক্তব্য অতি সামান্য এবং বিজ্ঞান-অসম্মত। বিলাত-ফেরত সুবিমল কৃষিবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করে দেশে ফিরে এসে অত্যন্ত লোভনীয় পদগুলির বাসনা বিসর্জন দিয়ে স্বগ্রামে সস্ত্রীক গিয়ে তার অর্জিত বিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যখন ব্যস্ত তখন একটা অতি তুচ্ছ গ্রাম্য-কুসংস্কারের তাড়নায় আবার তল্পী-তল্পা গুটিয়ে সহরে চলে এল। কেননা: 'ঠান্‌দি বলেন, বাঁদর মারলে বংশ থাকে না:—'।

'অবলম্বন' গল্পে প্রকাশিত মনোভাব অভূতপূর্ব। নিজে ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও নিজের যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ছেলের খাম-খেয়ালীতে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ছেলের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবেন এটা কি করে সম্ভব হয়? আর এ গল্পের জন্য ডাক্তারের কিংবা যক্ষ্মারোগের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? এখানেও লেখক পরোক্ষভাবে বিজ্ঞানের প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন।

কতগুলি গল্পে লেখক নিজস্ব জীবনের এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতের গল্প রচনার প্রয়াস পেয়েছেন এ প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। 'অসাধারণ', 'অন্তরালে', 'গজার ইলিশ', 'ইমারত', 'বিপরীত', 'সংঘাত', প্রভৃতি। এইগুলি খাঁটি ছোট গল্প হতে পারতো যদি না সময় সময় গল্পের খেই হারিয়ে যেত। 'অন্তরালে'—'ভালবাসা অন্ধ' হয়ে গেল যেহেতু মানস-নায়িকার কণ্ঠস্বরে প্রেমে-পড়া লেখক তাঁর নায়িকার রূপহীনতা আবিষ্কার করে তাঁরই বিবাহিত স্ত্রীকে বললেন: 'তোমাকে আমি সত্যই ভালবাসি।' তা হলে বিয়ের পরে এতদিন কি ভালবাসার অভিনয় করেছেন, এতে কি করে এটা প্রতিপন্ন হল 'ভালবাসা অন্ধ'—বুঝা গেল না।

প্রচ্ছদপট মনোরম। ছাপা মোটামুটি ভাল যদিও মাঝে মাঝে ভুল আছে। লেখকের কাছ থেকে ভবিষ্যতে সত্যিকারের রসোত্তীর্ণ গল্প-সংকলন আমরা আশা করি এবং কামনা করি এই সংকলনের সাফল্য ভবিষ্যতের আশায়।

—পুথিচ

বাঙালী জাতি পরিচয়—শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ।
সাহিত্য-সংস্থা, ১৪৩।১ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯।
মূল্য—২।০ আনা।

মাসিক বসুমতী পত্রিকার 'সাহিত্য-সেবক-মজুরী'র লেখক শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর এই বইটীতে বাঙালী জাতি সম্বন্ধে প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক যুগের বহু জ্ঞাতব্য তথ্য পাঠককে উপহার দিয়েছেন। তিনি বহু পরিশ্রম করে বহু গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, বহু সমাজের সঙ্গে মিশে তাঁদের সামাজিক চিত্র যে মনোভাবে অঙ্কিত করেছেন তা বাঙালী সমাজের বিশেষ আকর্ষণীয়।

এই গ্রন্থে তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, সুবর্ণবণিক, গন্ধ-বণিক, তিলি, কর্মকার, মাহিষ্য, কুম্ভকার, নমঃশূদ্র প্রভৃতি ১৮টী জাতির শাখা, উপশাখা, পদবী, গোত্র, শিক্ষা, বৃত্তি, ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় সন্নিবেশিত করে অনুসন্ধিৎসু পাঠকমাত্রকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীনির্মল কুমার বসু মহাশয় ভূমিকায় লিখেছেন—"আকারে বইখানি ছোট হলেও তথ্য সম্ভারে ইহার গুরুত্ব কম নয়। বইখানি বাঙালী পাঠকের নিকট আদর লাভ করবে।" আমাদেরও তাই বিশ্বাস।

প্রত্যেক সমাজের কল্যাণকামী ব্যক্তিগণের এই বইখানি পাঠ করা একান্ত কর্তব্য। —ডঃ দাঃ

অভিসার (পঞ্চমাঙ্ক নাটক)
নাট্যকার : শ্রীজলধর বিশ্বাস।
প্রকাশিকা : শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী ও সর্বমঙ্গলা দেবী
মাতৃমন্দির, বর্ধমান।

এ নাটকের চরিত্রগুলি কেমন যেন নির্জীব ও অপরিণত। কোন চরিত্রই সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত হয় নি—এমনকি নায়ক-নায়িকারও নয়।

নামের সার্থকতা কোথায় বুঝা গেল না। কার এই 'অভিসার',—চণ্ডীপদের 'ঘুনার'? কিসেরই বা অভিসার?

নাটকের বিন্যাসপদ্ধতিও অত্যন্ত সেকেলে। পঞ্চাংশে আত্মগত সংলাপের অযথা দীর্ঘ কলেবর নাটকের ঘনীভূত হওয়ার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। ভাষা জায়গায় জায়গায় ভাল। সংলাপ অত্যন্ত দুর্বল। আশা করা যায় নাট্যকার ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে সচেতন হবেন। ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি ভাল।

—পুবিচ

শিক্ষার নূতন ধারা

"বাংলা দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, লোক বিবরণ প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য, সমস্তই আমাদের বিশেষভাবে অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়। দেশের এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না হইবার কারণ, নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিষ আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।"
সাহিত্য পরিষদের বক্তব্য

"যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দেশের জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন পরিকল্পনাই কার্যকরী হ'তে পারবে না।.....জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের কথা ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে সহজাতরূপেই তাদের মধ্যে বিজ্ঞানের চৈতন্য ও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে।"
বিজ্ঞান-পরিষদের নিবেদন

সংস্কৃতিকী

লোক-মঞ্চ কিশোর বিভাগ

১৯।১এ, পাটোয়ারবাগান লেন, কলিকাতা-৯

গত ১৩ই জানুয়ারী লোক-মঞ্চ কিশোর বিভাগের ২য় প্রতিষ্ঠা উৎসব ১৬নং দাস লেনে বৈকাল ৫ঘটিকায় সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়।

সভায় বহু অভিভাবক এবং সুধীজন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহন করেন ৭৩ বৎসরের বৃদ্ধ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস এবং প্রধান অতিথি হ'য়ে উপস্থিত ছিলেন শ্রীসুবোধ কুমার ঘোষ।

সভাপতির ভাষণে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস বলেন যে, গত বৎসরে তোমাদের প্রতিষ্ঠা দিবসে ব'লেছিলাম, তোমাদের দেয়াল পত্র "অবাক" দেখে অবাক হচ্ছি। আর একদিন অবাক হ'ব, যেদিন "অবাকপত্র" বন্ধ হবে, অবাক আজও হচ্ছি। "অবাক" না দেখে নয় "অবাকে"র প্রদর্শনী দেখে।

ভাই-বোনদের সমবেত সংগীতের পর সভা সুরু হয় এবং বক্তৃতা করেন সহঃ সভাপতি প্রশান্ত মিত্র ও সুকুল চক্রবর্তী এবং প্রদ্যোৎ রায়।

সহঃ সম্পাদিকা কুমারী অজিতা হোম চৌধুরী আয়-ব্যয়ের হিসাব ও গতবৎসরের কার্য্যসূচী পাঠ করেন।

সবশেষে ভাষণ দেন সম্পাদক। তিনি বলেন লোক-মঞ্চের মত বাটী সংসার আবার কিশোর বিভাগ কেন এই বিষয়।

এ ভিন্ন সংগীত পরিবেশন করে কুমারী অরুণা সেনগুপ্তা কুমারী অজিতা হোম চৌধুরী, কুমারী শংকরী মৈত্র, কুমারী আরতী দে সরকার, কুমারী মুনিয়া প্রসাদ, কুমারী পুতুল ও বন্টা ঘোষ, এবং আশা মৈত্র ও নির্মল রায়।

নৃত্য প্রদর্শন করে কুমারী রামা কর, আবৃত্তি করে কুমারী স্বর্ণা দাস।

ভাই-বোনদের সমবেত সংগীত দ্বারা সভা শেষ হয় এবং সকলকে জলখাবারে আপ্যায়িত করা হয়।

রহস্য উপন্যাস

শেঠজীর রত্নমুকুট

বিপিনবিহারী রায় ও কানাই রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৬

অজয় আমাকেও সঙ্গে নিলে, আমরা তিনজনে তখন বিধুবাবুর বাড়ীর দিকে রওনা হলুম। সত্যি বলতে কি, বিধুবাবু যেমন তাঁর ছেলেকেই অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন, ঘটনা পরম্পরা শুনে আমার মনেও সেই ধারনাই দৃঢ় হলো, কিন্তু অজয়ের তীক্ষ্ণবুদ্ধির ওপর আমার এত বিশ্বাস ছিল, তাবলুম সে যখন ঘটনাবলীর সোজা অর্থ গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক, তখন নিশ্চয়ই তার মনে অন্য ধারনা খেলছে। সারা পথ অজয় চুপ করে রইলো, একটি কথাও বললে না, দেখে বেশ বোঝা গেল সে গভীর চিন্তায় মগ্ন। সে যে একটুখানি আশার আলো দেখিয়েছে, তাতেই যেন বিধুবাবু আগের চেয়ে কিছু আশ্বস্ত হয়েছেন বলে মনে হল। এমন কি, তিনি পথে আমার সঙ্গে তাঁর ব্যাঙ্কের কাজ ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে দু'একটা কথাবার্তা বলতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা তাঁর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলুম।

বাড়ীখানি চারচৌকা, বেশ বড় কম্পাউণ্ডের ভেতরে অবস্থিত, সুতরাং সদর রাস্তা থেকে একটু পেছিয়ে আছে। কম্পাউণ্ডের দু'পাশে দুটি লোহার গেট, একটা গাড়ী যাবার পথ এক গেট থেকে আর এক গেট পর্য্যন্ত ঘুরে গেছে। ডানদিকটায় গাছের ঝোপের বেড়ার ভেতর দিয়ে অপর একটি সরু পথ, রাস্তা থেকে বাড়ীর পিছন দিকে রান্না-ঘরের দরজা পর্য্যন্ত চলে গেছে, এটা চাকর বাকর বা দোকানী পসারীর যাবার রাস্তা। বাঁ দিকেও একটা সরু রাস্তা একবারে ঘুরে বাড়ীর পেছনে, যেখানে আলাদা এক সারি ঘর আছে, গাড়ীঘোড়ার আস্তাবল, সইস কোচম্যানের বাসস্থান, সে পর্য্যন্ত চলে গেছে। সে পথটা আবার ওই ঘরগুলোর পেছনে আর একটা সরু-রাস্তাতে মিশেছে সেটা যদিও পাবলিক রাস্তা, কিন্তু ঘুরে গিয়ে সদর রাস্তায় মিশেছে, তবে সেদিকটা খোলা মাঠের মত। কাজেই লোক চলাচল সে রাস্তায় বিশেষ নেই।

আমাদের দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে, অজয় সামনেটা পার হয়ে, সমস্ত বাড়ীটা একবার ঘুরে দেখে নিল। তারপর চাকরদের যাবার সরু-পথ দিয়ে একবারে পেছনে, যেখানে বাগান, আস্তাবল প্রভৃতি আছে সেইদিকে চলে গেল। আমরা তার জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলুম, শেষে দেরী হচ্ছে দেখে বিধুবাবু আমাকে নিয়ে সামনের বড় ঘরে প্রবেশ করে বসলেন। আমরা চুপচাপ বসে আছি এমন সময় একটি যুবতী এসে ঘরে প্রবেশ করলে। উচ্চতায় মাঝারির চেয়ে একটু বেশী, বেশ ফর্সা রং, পাৎলা গড়ন, ভ্রমরকৃষ্ণ চুল ও চোখ, সুন্দরী বলা যায় কিন্তু মুখখানা এত ফ্যাকাসে যে আমার মনে হল এ রকম ফ্যাকাসে মুখ কখনো দেখিনি। চোখও লাল, দেখলেই বোঝা যায় যে কেঁদে লাল হয়েছে। নীরবে সে যখন ঘরে প্রবেশ করলে তাকে দেখে যেন শোকের প্রতিমূর্ত্তি বলে মনে হল। সকালে আমরা বিধুবাবুর যে শোকার্ত্ত মূর্ত্তি দেখেছিলুম, তার চেয়েও যেন এই মেয়েটির বিষাদাচ্ছন্ন মূর্ত্তি আমার মনে গভীর রেখাপাত করলে। এটাও ধারণা হল যে মেয়েটি দৃঢ়চরিত্র এবং আত্মসংযমের ক্ষমতা তার খুব বেশী। আমাকে একেবারে অগ্রাহ্য করে সে সোজা বিধুবাবুর কাছে গিয়ে সস্নেহে তাঁর মাথায় হাত বুলোতে লাগলো।

কাকাবাবু, আপনি রণেনকে ছেড়ে দিতে বলে এসেছেন ত? সে জিজ্ঞেস করলে।

না না, মীরা-মা, ব্যাপারটার শেষ পর্য্যন্ত কিনারা না হলে কি করে তাকে ছেড়ে দেবে ?

কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি রণেন নির্দ্দোষী, আমার মনের অন্তঃস্থল থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারছি রণেন কোন অন্যায় বা ক্ষতি করে নি, সে করতে পারে না, আর তার প্রতি এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্যে আপনাকে পরে অনুতপ্ত হতে হবে—

বেশ ত, মা, সে যদি নির্দ্দোষী ত চুপ করে আছে কেন ? কিছু বলছে না কেন ?

কে জানে ! হয়ত আপনি ওকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন বলে রাগে, অভিমানে ওমনি করছে।

বাঃ, আমি যে স্বচক্ষে তার হাতে রত্ন-মুকুট দেখেছি, তাকে অপরাধী বলবো না ত কি ?

হয়ত সে কুড়িয়ে নিয়ে হাতে করে সেটা দেখছিল, কে বলতে পারে ? আমি বলছি কাকাবাবু, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন, রণেন নির্দ্দোষী। ব্যাপারটা এই খানেই শেষ করে দিন, আর কিছু করবেন না। উঃ, আমাদের রণেন জেলে, এ যে কল্পনাও করতে পারছি না।

মীরা-মা, যতক্ষণ না হারানো হীরে তিনখানা পাওয়া যাবে, ততক্ষণ শেষ করবো কি করে ? আমি কিছুতেই ছাড়বো না, ছাড়তে পারি না। তুমি রণেনকে স্নেহ করো, তাই আমার যে কি সর্ব্বনাশ হলো তা দেখছো না, সেদিকে অন্ধ। চাপা দেবো কি, আমি এক ভদ্রলোককে সহর থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি, ব্যাপারটা তলিয়ে অনুসন্ধান করবার জন্যে, তাঁর নাম অজয়বাবু, একজন বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ্।

তখন মেয়েটি আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলে, এই ভদ্রলোক ?

না, ইনি তাঁর বন্ধু নরেনবাবু, সঙ্গে এসেছেন। তিনি একলা চারিদিকে দেখে শুনে খোঁজখবর করে বেড়াচ্ছেন। ঐ যে আস্তাবলের গলিতে—

আস্তাবলের গলিতে ? মেয়েটি ভ্রূকুঞ্চিত করে বলেন, ওখানে কি পাবেন তিনি ? ওঃ, এই যে, উনি এসে পড়েছেন, নমস্কার, আসুন, আমি খুব আশা করি যে আপনি এ ব্যাপারের সত্য খুঁজে বার করতে পারবেন, মানে রণেন যে নির্দ্দোষী সেটা প্রমাণ করতে পারবেন।

আমিও আপনার সঙ্গে একমত, এবং আমিও আপনারই মত আশা করছি যে সেটা প্রমাণ করতে পারবো, অজয় উত্তর দিলে। আপনি নিশ্চয় শ্রীমতী মীরা দেবী ? আপনাকে আমি দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

হাঁ, নিশ্চয়ই, যদি এই সর্ব্বনেশে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যেতে সাহায্য হয়, নিশ্চয়ই—

আচ্ছা, প্রথম কথা, আপনি নিশ্চে কালরাতে কিছু শব্দটব্দ শুনতে পান নি ?

কিছু না, একবারে কাকাবাবুর চীৎকার শুনে ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়ি ? চেঁচামেচি শুনে তখন আমি ছুটে ওঁর ঘরে গেলুম।

আগের রাত্রে আপনিই ত শুতে যাবার আগে সব জানলা দরজা বন্ধ করেছিলেন, সব জানলা বন্ধ করেছিলেন কি ?

নিশ্চয়ই !

সকালেও দেখলেন সব জানলাই তেমনি বন্ধ রয়েছে ?

হ্যাঁ, সবই ঠিকঠিক বন্ধ ছিল।

আচ্ছা, আপনাদের নতুন ঝিএর একটা ভাবের লোক জুটেছে শুনছিলুম, আপনিই ত কাল রাতে আপনার কাকাবাবুকে বলেছিলেন যে ঝিটা তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে রাতে বেরিয়ে গিয়েছিল ?

হ্যাঁ, ওই ঝিটাই কাল সন্ধ্যায় আমরা যখন সকলে বসে রত্নমুকুটের কথা শুনছিলুম সেই ঘরে এসেছিল, হয়ত কিছু শুনে থাকবে—

ও, বুঝেছি। আপনার ধারণা যে সে রত্নমুকুটের কথা শুনে রাত্রে তার ভাবের লোককে বলতে গিয়েছিল, আর দুজনে মিলে এই চুরির মৎলব করেছিল ?

বিধু বাবু তখন অধীর ভাবে বলে উঠলেন, অজয় বাবু, এ সব ভাসা ভাসা থিয়োরীতে লাভ কি ? আমি ত কতবার আপনাকে বলেছি যে আমি নিজের চোখে রণেনের হাতে রত্নমুকুট দেখেছি—

একটু অপেক্ষা করুন, বিধুবাবু, সে কথা হবে' খন। এই ঝিটার সম্বন্ধে আমি আরো খুঁটিয়ে জানতে চাই। মীরা দেবী, আপনি কাল রাতে দেখেছিলেন যে সে রান্না ঘরের পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করলে, নয়?

হ্যাঁ, আমি সব দরজা জানলা ঠিক বন্ধ আছে কিনা দেখতে গিয়ে দেখি যে কি চুকছে, আর অন্ধকারে তার চেনা লোকটাকেও বাইরে আবছা দেখতে পাই—

সে লোকটাকে আপনি চেনেন নাকি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, লোকটার বাজারে সব্জির দোকান আছে, মাথায় করে মাঝে মাঝে বাড়ীতে বেচ্‌তে আসে—

আচ্ছা, অজয় বললে, লোকটাকে যখন দেখলেন, সে রান্নাঘরের দরজার বাইরে বাঁপাশে, কিম্বা দরজা থেকে খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে ছিল?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

আর লোকটার একটা পা খোঁড়া, কাঠের পা আছে?

মীরার চোখে যেন একটা চকিত, আশঙ্কামিশ্রিত ভাব ফুটে উঠ্‌লো—

আপনি কি যাদুকর নাকি? ও কথা কি করে জানলেন?

বলে হাসি মুখে অজয়ের দিকে তাকালেন, কিন্তু অজয়ের মুখ গম্ভীর, সে বললে—

আমি এবারে একবার ওপরে যেতে চাই। হয়তো আমার বাড়ীর বাইরেটা ঘুরে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আচ্ছা ওপরে যাবার আগে নিচের তলার জানলাগুলো একবার দেখে যাই।

তারপরে অজয় বেশ তৎপরভাবে জানলা থেকে জানলা দেখে বেড়াতে লাগলো, হলঘরের যে বড় জানলাটা থেকে আস্তাবল পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে একটু বেশী-ক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। পকেট থেকে একটা লেন্স, কাঁচ বের করে জানলার আশপাশ, চৌকাঠ প্রভৃতি খুব যত্ন করে দেখতে লাগলো। তারপর বললে, আচ্ছা চলুন, এবারে ওপরে যাই।

বিধুবাবুর ড্রেসিং রুম ছোট একটি কামরা, সাদাসিধে ভাবে সাজানো, একটি আয়না দেওয়া ড্রেসিং টেবিল, একটি আলমারী, চেয়ার ইত্যাদি রয়েছে। অজয় প্রথমেই আলমারীর কাছে গিয়ে তার সা-চাবির দিকে খুব তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাইলে।

এটা কোন্ চাবি দিয়ে খোলা হয়েছিল? জিজ্ঞেস করলে।

ঐ যে, বিধুবাবু উত্তর দিলেন, আমার ছেলে যে চাবিটার কথা বলেছিল, ওঁ'দের ঘরের দেয়াল-আলমারীর চাবি—

চাবিটা এখানে আছে?

হ্যাঁ, এই যে, আলমারীর গায়েই লাগানো ছিল, ড্রেসিং টেবিলের ওপরে রেখেছি।

সেটা নিয়ে অজয় আলমারীটা খুলে ফেললে।

হুঁ, খুলতে কোনরকম আওয়াজ হয় না, কাজেই আলমারী খোলার শব্দে আপনার ঘুম ভেঙ্গে যাবে এরকম আশঙ্কার কারণ ছিল না। এই যে, দেরাজের ভেতর যে কেস্‌টা রয়েছে এতেই বুঝি রত্নমুকুট আছে, দেখা যাক—

বলে কেস্‌টা খুলে অজয় মুকুটটি বের করে ড্রেসিং টেবিলের ওপরে রাখলে। অপূর্ব্ব তার কারুকার্য্য, হীরে আর অন্য নানারকম রত্নরাজীতে ঝক্‌মক্ করছে, আমার জ্ঞানে কখনো অত চমৎকার হীরে দেখিনি। মুকুটের একটা কোন্ ফাটা, যেখান থেকে তিনখানা হীরে সমেত সোণাটুকু ভেঙ্গে নেওয়া হয়েছে।

অজয় বললে, আচ্ছা বিধু বাবু, এদিকের কোন্‌টা ত ভেঙ্গে গিয়েছে, ওদিকের কোণটা ধরে তাকুন ত

বিধু বাবু আঁৎকে বলে উঠে হাত তুলে হটে গেলেন। সর্ব্বনাশ! আমি ভাংতে যাবো কেন?

তাহলে আমি চেষ্টা করে দেখি, বলে অজয় খুব হাতের জোর দিয়ে অপর কোন্‌টার ওপর চাপ দিলে।

একটু সামান্য টল্‌টল্ করছে, বুঝতে পারছি। আমার যথেষ্ট শক্তি আছে, তবুও মনে হচ্ছে খুব প্রানপণ চেষ্টা করে তবে যদি ভাংতে পারি। একটা সাধারণ লোকের পক্ষে এ কাজ অসম্ভব। জানেন বিধু বাবু, এটা যদি আমি এখুনি ভাংতে পারতুম তাহলে পটাস্ করে একটা খুব জোর

আলোতে, পটকা ফাটার মত, হতো। আপনি বলতে চান যে আপনার শয্যা থেকে কয়েক গজ মাত্র দূরে এটা ভাঙ্গা হলো আর আপনি কিছুই জানতে পারলেন না?

কি জানি মশায়, আমি ত জেগে কুলকিনারা পাচ্ছি না, সবই অন্ধকার, রহস্যময় ঠেকছে।

দেখা যাক্, অভয় বললে, হয়তো আমাদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে আলো ফুটতে পারে। আপনি কি বলেন, মীরা দেবী?

আমিও ত কাকাবাবুরই মতো সব প্রহেলিকা মনে করছি।

বিধু বাবু আপনি রণেনকে যখন এ ঘরে দেখেছিলেন, সে খালি পায়ে ছিল, নয়? চটি পায়ে ছিল না?

না: গায়ে শুধু একটা গেঞ্জি, খালি পায়ে ছিল।

বেশ, উত্তম! আমাদের অনুসন্ধানের কাজে আমরা সৌভাগ্যক্রমে অনেকটা এগিয়ে যেতে পেরেছি, এখন যদি এ প্রহেলিকার সমাধান না করতে পারি ত সেটা হবে আমাদের দোষ। আচ্ছা, বিধু বাবু, এখানে যা দেখবার দেখে নিয়েছি। আমি আর একবার বাড়ীর বাইরেটা ঘুরে দেখবো।

আমরা তার সঙ্গে যেতে চাওয়াতে অভয় নিষেধ করলে, বললে অযথা কতকগুলো পায়ের ছাপ বাড়িয়ে গোলমালের সৃষ্টি হবে, সে একলাই যাবে। প্রায় এক ঘণ্টা পরে সে ঘরে ফিরলো, তার জুতায় কাদা মাখামাখি, মুখ ভাবলেশহীন।

আমি যা দেখবার সবই দেখে নিয়েছি বিধু বাবু, এবারে আমি নিজের বাসায় ফিরে গেলেই আপনার কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করতে পারবো।

কিন্তু হীরে তিনখানা, অভয় বাবু, তার কিছু সন্ধান করতে পারবেন?

তা ত এখন বলতে পারছিনা, অভয় উত্তর দিলে।

বিধু বাবু হাতে হাত কচলাতে লাগলেন।

হুঁঃ, সে আর ফিরে পেয়েছি! আর আমার ছেলে? তার সম্বন্ধে কিছু আশা দিতে পারেন?

তার সম্বন্ধে আমার আগের মনোভাব একটুও বদলায় নি, অভয় বললে।

তাহলে, দোহাই আপনার, কাল রাত্রে আমার বাড়ীতে যে রহস্যময় প্রহেলিকার সৃষ্টি হলো, তার সঠিক ব্যাপারটা কি, বলুন না—

আপনি কাল সকালে ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে আমার বাসায় আসবেন, আমার যতদূর সাধ্য আমি ব্যাপারটা আপনার কাছে পরিষ্কার করে দেবার চেষ্টা করবো। আমি যতদূর বুঝেছি, আপনি আমাকে আপনার হয়ে যে কোন কাজ করবার পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছেন—আমি যদি হীরে তিনখানা উদ্ধার করতে পারি তার দরুণ যত টাকা লাগবে আপনি দিতে প্রস্তুত?

কি বলছেন অভয় বাবু, আমার যথাসর্বস্ব দিলেও যদি হীরে উদ্ধার হয় তাতেও আমি প্রস্তুত।

উত্তম। আমি এখন যাচ্ছি, বাকি কাজ আপনি কাল সকালে আমার কাছে আসার আগে সেরে ফেলবো। হয়তো এর মধ্যে আর একবার এবাড়ীতে আসতে পারি, সন্ধ্যার মধ্যে, ঠিক বলতে পারি না, তবে সেজন্য আপনার থাকবার দরকার নেই। এখন আসি, নমস্কার।

ক্রমশঃ

[৪০২-এর পাতা হইতে]

পরিচয় ? দেব ! হনুমান তার গায়ের চাদর সরিয়ে দিল। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন—তার গায়ে লেখা আছে শত শত রামনাম। বুঝলেন সব। বললেন—হনুমান, আমায় রক্ষা কর। আর এমন কিছু নেই যা তোমায় খেতে দিই।

হনুমান বললো—তবে কি অভুক্তাবস্থায় ফিরে যাব দেব ?

তাও তো ! মহা চিন্তায় পড়লেন শ্রীকৃষ্ণ। ভাবলেন আমার অহঙ্কার আজ চূর্ণ হ'ল। কি করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা দেখে দেবতারা লক্ষ্মীদেবীকে পাঠিয়ে দিলেন দ্বারকায়। লক্ষ্মী এসে সামান্য খাদ্য হনুমানকে পরিবেষন করে বললেন—হনুমান, এবার কি পেট ভরলো ?

স্বয়ং লক্ষ্মী যেখানে আহার্য পরিবেষক, সেখানে কার না পেট ভরে ! হনুমান বললো—হ্যাঁ মা, আমি সন্তুষ্ট। তবে প্রভুর একটু অহঙ্কার হয়েছিলো। তাই এসেছিলাম পরীক্ষা করতে।

হনুমান লক্ষ্মী ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে চলে গেল।

শ্রীকৃষ্ণ আর কখনও অতিথিশালা নিয়ে অহঙ্কার করেন নি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতৃভক্তি　　—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন বন্ধুজনের প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন "আমি যখন মায়ের ইচ্ছা পূরণের জন্য বাড়ী যাইবার পথে দামোদরে ঝাঁপ দিয়াছিলাম, তখন কি আর দামোদরের বন্যা-মুখে তাহার সেই খরস্রোতে ঝাঁপ দিতেছি ইহা স্মরণ ছিল ? তখন সেই দামোদরের প্রবল প্রবাহকে মায়ের অশ্রুপ্রবাহ বলিয়া মনে হইয়াছিল, মাতৃপদ ধ্যান করিতে করিতে মাতৃদেবীর অশ্রুপ্রবাহে ঝাঁপ দিয়াছিলাম।"

"বঙ্গদর্শন", ১৩২১-বৈশাখ

রেডিও-অ্যাক্‌টিভিটি ও রেডিয়াম

অমরনাথ চক্রবর্তী

রেডিও অ্যাক্‌টিভিটি নামটি আমাদের অনেকের কাছেই সুপরিচিত। পৃথিবীতে অনেক খনিজ ধাতু আছে যেগুলি হইতে সর্ব্বদা "তেজস্ক্রিয় রশ্মি" বিকীর্ণ হইতেছে। খনিজ ধাতুর এই ধর্ম্মেরই নাম "রেডিও-অ্যাক্‌টিভিটি"; তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকীরণকারী ধাতুগুলিকে বলা হয় "রেডিও-অ্যাক্‌টিভ্‌" পদার্থ।

১৮৯৬ খৃঃ বেক্‌রেল্‌ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রমাণ করেন যে, ইউরেনিয়াম নামক খনিজ-ধাতু আপনা হইতে সর্ব্বদা একপ্রকার রশ্মি বিকীরণ করে। সেই সঙ্গে তিনি আরও আবিষ্কার করেন যে ইউরেনিয়াম হইতে বিকীরিত রশ্মি ফটোগ্রাফিক প্লেটকে, নষ্ট করে। অতঃপর ম্যাদাম কুরী ও পিয়ারে কুরী বহু খনিজ পদার্থের "রেডিও-অ্যাক্‌টিভিটি" সম্বন্ধে গবেষণা করেন। পরিশেষে উভয়ে আবিষ্কার করেন যে এই "রেডিও অ্যাক্‌টিভিটি" এক প্রকার পরমাণু সংক্রান্ত ঘটনা। এই আবিষ্কারের পর তাঁহারা প্রমাণিত করেন যে খনিজ পদার্থগুলির মধ্যে 'পিচ্‌ব্লেণ্ড' ও 'চ্যাল্‌কোলাইট' ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম অপেক্ষা অধিক পরিমাণে 'রেডিও অ্যাক্‌টিভ্‌'। তাঁহারা মনে করেন যে পিচ্‌ব্লেণ্ড এর মধ্যে থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম ছাড়া আরও একটি 'রেডিও অ্যাক্‌টিভ্‌ পদার্থ আছে। ঐ পদার্থটি হইল রেডিয়াম।

১৮৯৯ খৃঃ রাদারফোর্ড ইউরেনিয়াম নামক ধাতু হইতে যে সকল তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে উহাদের লইয়া গবেষণা করেন। তিনি আবিষ্কার করেন যে ইউরেনিয়াম হইতে তিন প্রকার রশ্মি বাহির হইতেছে। উহাদের মধ্যে প্রথমটি পাতলা ধাতব-পাত ভেদ করিতে পারে না, দ্বিতীয়টি পাতলা ধাতব-পাত অনেকটা ভেদ করিতে পারে এবং তৃতীয়টি অতি সহজেই ঐরূপ পাত ভেদ করিতে পারে। তিনি ঐ রশ্মিগুলিকে পৃথকরূপে বুঝাইবার জন্য উহাদের নাম যথাক্রমে, আল্‌ফা (α), বিটা (β) ও গামা (γ) রশ্মি দেন। জানা গিয়াছে যে, প্রত্যেক রেডিও-অ্যাক্‌টিভ্‌ ধাতু হইতে এই সকল রশ্মি বিকীর্ণ হয়। গবেষণামূলক পরীক্ষা হইতে বুঝা যায় যে, α, β ও γ রশ্মির ভেদ শক্তি যথাক্রমে ১ : ১০০ : ১০,০০০। α, β ও γ রশ্মি সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইয়াছে। নিম্নে উহাদের সামান্য বিবরণ দেয়া হইল

আল্‌ফা (α) রশ্মি। এই রশ্মিটি দুইটি ধনাত্মক-তড়িৎ শক্তি সম্পন্ন। যে কোন আবরণ ভেদকারী শক্তি অন্যান্য রশ্মি অপেক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন। ইহা রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি রেডিও-অ্যাক্‌টিভ্‌ ধাতু হইতে ১·৫৫ × ১০৯—২·২৫ × ১০৯ সেন্টিমিটার এই গতিতে বিকীরিত হইতেছে। রাদারফোর্ড বাহির করেন যে ১ গ্রাম রেডিয়াম হইতে প্রতি সেকেণ্ডে ৩·৬ × ১০১০ গুলি α-পদার্থ বাহির হইতেছে। α-পদার্থগুলিকে ধনাত্মক-তড়িৎ যুক্ত হিলিয়াম পরমাণু বলা হয়।

বিটা (β) রশ্মি। এই রশ্মিটি ঋণাত্মক তড়িৎ সম্পন্ন। ইহার ভেদ শক্তি α-রশ্মি অপেক্ষা তীব্রতর। ইহার গতি অতি প্রখর এবং ঐ গতি আলোকের গতির সমান। β-রশ্মিগুলির ওজন গতির সহিত বর্দ্ধিত হয়। সেই সঙ্গে উহাদের স্বকীয় তড়িৎ শক্তি এবং ওজনের যে অনুপাত উহা কমিয়া যায়।

গামা (γ) রশ্মি। এই রশ্মির ভেদশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রখর। কিন্তু ইহাতে কোন প্রকার তড়িৎ-শক্তি নাই। দেখা গিয়াছে যে গামা ও এক্সরে রশ্মি প্রায় সমান। ক্যাথোড রশ্মিকে বাধা দানের ফলে যেমন এক্সরের উৎপত্তি সেইরূপ বোধ হয় β-রশ্মিকে প্রতিবন্ধক দেওয়ায় গামা-রশ্মির উদ্ভব। γ-রশ্মি প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার বেধযুক্ত লৌহ-পাত ভেদ করিয়া যাইতে পারে।

'স্পিনথ্রোস্কোপ' নামক এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি সেঃ কতগুলি α-পদার্থ একটি রেডিও-অ্যাক্টিভ পদার্থ হইতে বাহির হইতেছে উহা গণনা করা যায়। পৃথিবীর সকল স্থানেই α, β ও γ রশ্মি বিরাজমান, এমন কি বায়ু-মণ্ডলেও। ইহা ছাড়া আরও বহু তেজস্ক্রিয় রশ্মি রহিয়াছে যেমন কস্‌মিক রশ্মি।

এই কস্‌মিক রশ্মির প্রভাব ভূপৃষ্ঠের উপর বায়ুমণ্ডলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে উহার প্রভাব ক্রমশঃ হীন হইতে হীনতর। সুতরাং ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই কস্‌মিক রশ্মির উৎপত্তি পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে নহে এবং ইহার মধ্যে অতি প্রখর গতি ও শক্তিসম্পন্ন নানারূপ তেজস্ক্রিয় রশ্মি রহিয়াছে যেমন, ইলেকট্রন, মেসোট্রন, পজিট্রন প্রভৃতি। এই সমস্ত রশ্মির মধ্যে মেসোট্রন, চলিত কথায় ইহাকে মেসোন বলা হয়, রশ্মিটি যে পদার্থ দ্বারা গঠিত সেই পদার্থগুলির যে কোন আবরণ ভেদকারী শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রখর। মেসোন পদার্থগুলি ১ মিটার বেধযুক্ত সীসা জাতীয় সামগ্রী ভেদ করিতে পারে। কস্‌মিক রশ্মির অবস্থিতি লক্ষ্য করিবার জন্য গাইগার কাউন্টার নামক এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

প্রখর শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলির মধ্যে রেডিয়াম অন্যতম শ্রেষ্ঠ। ১৮৯৭-'৯৮ খৃঃ পিয়ারে কুরী ও ম্যাদাম কুরী এই ধাতুটী আবিষ্কার করেন। পিচ্‌ব্লেণ্ডকে ইউরে-নিয়াম নামক অপর এক তেজস্ক্রিয় পদার্থের উৎস বলিয়া পরিগণিত করা হইত। কিন্তু ম্যাদাম কুরী ও পিয়ারে কুরী গবেষণার দ্বারা আবিষ্কার করেন যে, পিচ্‌ব্লেণ্ড হইতে ইউরেনিয়াম পাওয়ার পর যে অবশিষ্ট দ্রব্যটি থাকে উহা হইতেও তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকীরিত হয়। এক টন পিচ্‌ব্লেণ্ডের অবশিষ্ট পদার্থটিকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে বহুপ্রকার যৌগিক পদার্থের উদ্ধার হয়। প্রাথমিক বিশ্লেষণের পর পুনরায় বিশ্লেষণের সময় দেখা যায় যে উহাতে যে অংশটি থিতাইয়া পড়ে উহাও রেডিও-অ্যাক্টিভ্। উহাকে আরও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহাতে এক প্রকার ধাতু রহিয়াছে উহাই ঐ রেডিও-অ্যাক্টিভিটির মূল। উহার নাম দেওয়া হয় 'পোলিনিয়াম'। আরও বিশ্লেষণ করিয়া পাওয়া যায় যে, ঐ রেডিও-অ্যাক্টিভ ধাতুটি 'বোরিয়ামের' সহিত সংশ্লিষ্ট। ঐ নূতন যৌগিক পদার্থটি পৃথকীকরণ করিলে এক নূতন ধাতু পাওয়া গেল, উহা ইউরেনিয়াম অপেক্ষা বহুলক্ষ গুণ রেডিও অ্যাক্টিভ। উহাই "রেডিয়াম"।

এখন আমরা রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। যদি কোন যৌগিক রেডিয়াম পদার্থ নিষ্ক্রাশে জলে দ্রবণ করিয়া রাখা হয় তবে দেখা যায় যে, উহা হইতে এক প্রকার গ্যাস বাহির হয়। ঐ গ্যাসের বহির্গমনের ফলে ঐ রেডিয়াম পদার্থটির রেডিও অ্যাক্টিভিটি কমিয়া যায়। ইহ হতে প্রমাণ হইল যে, ঐ গ্যাসটি নিজেই রেডিও-অ্যাক্টিভ্। ইহা হইতে পারে যে, ঐ গ্যাসই রেডিয়ামের রেডিও-অ্যাক্টিভিটির উৎস। কিন্তু অপর দিকে ঐ মিশ্র রেডিয়াম পদার্থটি কি রেডিও অ্যাক্টিভ্ শূন্য হইয়া গেল? না তাহা নহে। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে রেডিয়ামের মধ্যে পুনরায় ঐ গ্যাসটি উৎপন্ন হইয়াছে এবং ঐ মিশ্র রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। ঐ গ্যাসের নাম 'রেডন' রেডনের পরমাণুর ওজন ২২২ এবং রেডিয়াম পরমাণুর ওজন ২২৬। দেখা গিয়াছে, যে রেডিয়ামের এই যে রেডনে রূপান্তর ইহা একটি α-পদার্থ, পদার্থ ছাড়িয়া দেওয়ার ফলেই হয়।

আমরা আরও জানি একটি α-পদার্থ একটি ধনাত্মক তড়িৎ-যুক্ত হিলিয়াম পরমাণুর সমতুল্য। অতএব ইহা হইতে দেখা যায় যে, রেডিয়াম প্রতি মুহূর্ত্তে দুইটি পদার্থে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, উহারা যথাক্রমে 'রেডন' এবং 'হিলিয়াম'। বিশেষ গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, ঐ রেডন গ্যাসটি পুনরায় α-পদার্থ ছাড়িয়া দিয়া পরবর্ত্তী একটি পদার্থে রূপান্তরিত হয়। সেই পদার্থটিও আবার একটি α বা β রশ্মি ছাড়িয়া পরবর্ত্তী অপর একটি পদার্থে পরিবর্ত্তিত হয় এবং এইভাবে α অথবা β রশ্মি ছাড়িয়া উহাদের রূপান্তর করণের দিকে অগ্রসর হয়। রূপান্তরের শেষ অবস্থা হইল এক প্রকার স্থায়ী পদার্থ।

যৌগিক রেডিয়াম পদার্থের তাপ পরিবেশের তাপ

অপেক্ষা সকল সময়েই অধিকতর। সেইজন্য যৌগিক রেডিয়াম হইতে সর্বদাই তাপ-বিকীরণ হয়। তবে ঐ পদার্থ এবং পরিবেশের তাপভেদ মাত্র ২° সেন্টিগ্রেড্।

কিন্তু এই তাপমাত্রার প্রভেদ নির্ভর করে ঐ যৌগিক পদার্থের আয়তনের এবং উহা যে পরিমাণে তাপ ছাড়িয়া দেয় তাহার উপর। কুরী ও লেবোরেড্ প্রমাণ করেন যে, ১ গ্রাম রেডিয়াম লবণ প্রতি ঘণ্টায় ১০০ ক্যালোরি তাপ বিকীরণ করে।

অধ্যাপক ডিওয়ার ও কুরী এক সাথে গবেষণার ফলে স্থির করেন যে, যদি পরিবেশের তাপমাত্রা তরল অক্সিজেনের তাপমাত্রার সমান থাকে তাহা হইলেও ঐ যৌগিক পদার্থটি হইতে একই পরিমাণে তাপ বিকীরিত হয়।

বর্তমানে বিজ্ঞান-জগতে এই সকল নানাপ্রকার তেজস্ক্রিয় রশ্মির উদ্ভাবনা বিশাল। উহাদের সম্বন্ধে বহু গবেষণা আজও নানাস্থানে হইতেছে। পরলোকগত পৃথিবীবিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী ডাঃ মেঘনাদ সাহা এই সমস্ত অভিনব বস্তুর গবেষণার জন্য কলিকাতা সায়েন্স কলেজে "Institute of Nuclear Physics" প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এই রশ্মি সমূহ মানবের বহু উপকার এবং অপকারও করে। রেডিয়াম হইতে নির্গত রশ্মিগুলির ব্যবহার চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে দেখা যায়। ঐ রশ্মির সাহায্যে ক্যানসার প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ হয়। যাহা হউক, আমরা সকলেই সেই সুদিনের আশা করিয়া থাকিতে পারি যে দিন এই সকল তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলিকে মানবের কল্যাণের কার্যেই ব্যবহার করা হইবে।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়

—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

.....দেখিয়াছিলাম, কিরূপে তিনি জরার আক্রমণ সত্ত্বেও জাগ্রত মন লইয়া জ্ঞানের তপস্যা করিতেছেন। বর্তমান জগতে এইরূপ জ্ঞানচর্চাই তো অগ্ন্যাধান। আহিতাগ্নি যেমন অগ্নি নিরন্তর জ্বালাইয়া রাখেন, তিনিও তেমনই জ্ঞানাগ্নি নিরন্তর জ্বালাইয়া রাখিবেন—চোখে কম দেখিতেন, কানে কম শুনিতেন—নব্বই বৎসরের কাছাকাছি আসিয়া পত্রে লিখিলেন 'জরা আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিতেছে'—তথাপি তাঁহার মন ছিল সম্পূর্ণ সজাগ। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বদিনই, রোগের শেষ আক্রমণের দশঘণ্টা পূর্বেই হয়তো, দৈবক্রমে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করি। গিয়া শুনিলাম কয়েকদিন পূর্বে তাঁহার শরীর বড় অসুস্থ হয়, ডাক্তার আসিয়া দুর্বল হৃৎপিণ্ড বলিয়া বেড়ানো পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তখন খাইতে বসিয়াছিলেন, আমরা বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। খাওয়া হইলে বাহিরে আসিয়া আমাদের বসিতে বলিলেন এবং কেন বাঁকুড়ায় আসিয়াছি তাহাও জানিতে চাহিলেন। যখন শুনিলেন যে হরিজন-ব্যাপারেই আসিয়াছি, তখন বলিলেন, "সমাজে এ ভাব একেবারে instinct-এর মত হয়ে গেছে। সময় লাগবে।"

বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৩

Statement about ownership and other particulars about newspaper YUGAYATRI to be published in the first issue every year after the last day of February.

FORM IV

(See Rule 8)

1	Place of Publication.	84, Monohar Das Street, Calcutta 7.
	Periodicity of its publication.	Monthly.
3.	Printer's Name Nationality Address	Narayan Pal Indian 41A, Baldeopara Road, Calcutta-6
	Publisher's Name Nationality Address	Narayan Pal Indian 41A, Baldeopara Road, Calcutta-6.
	Editor's Name Nationality Address	Jnananjan Pal Indian 41A, Baldeopara Road Calcutta-6.
	Name and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital.	Yugayatri Prakashak Ltd. 41A, Baldeopara Road, Calcutta-6.

I, Narayan Pal, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Narayan Pal

Dated 20. 3. 1957

Signature of Publisher.

Regd. No. C. 3932 March-April 1957 প্রতি সংখ্যা আট আনা

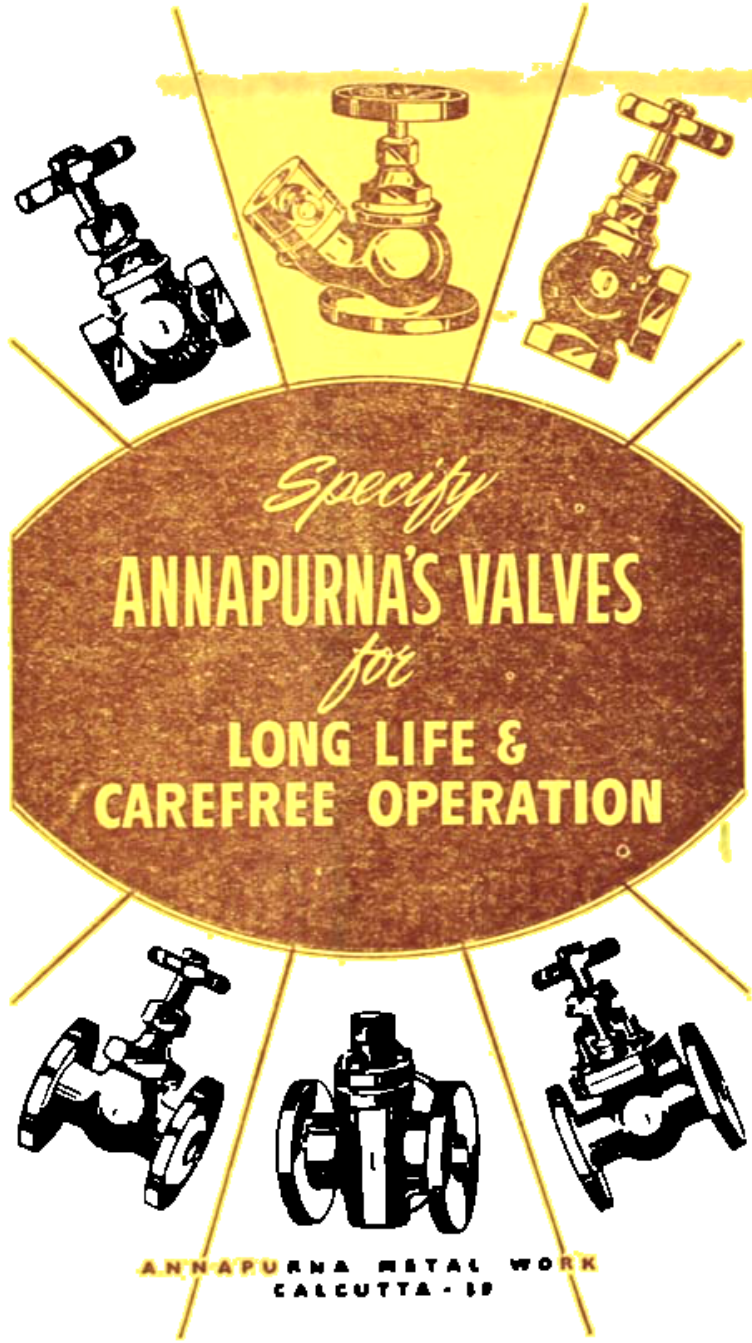

নারায়ণ পাল কর্তৃক ৪১এ, বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা-৬ নিউ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোঃ প্রাইভেট লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও ৮৪ নং মনোহর দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—জ্ঞানাঞ্জন পাল।

॥ সূচীপত্র ॥

সংকলন

অশ্বিনীকুমার দত্ত—বিপিনচন্দ্র পাল

চাষী—অতুলচন্দ্র গুপ্ত

স্মৃতিকথা

স্মৃতিকথা (শরৎচন্দ্র)—যোগেশচন্দ্র মজুমদার

কবিতা

তাঁবু বয়ে—বিষ্ণু দে ৪৩৩

পৃথিবী নিষ্ঠুর যদি—আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন ৪৩৪

ঘুম—হোয়ান র‍্যামন হিমেনেৎ (অনুবাদ : পরমেশ ধর)

শবরী—উৎপলা মুখোপাধ্যায়

বিনিদ্র—বিনয় মজুমদার

দু'টি কবিতা—সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

সেই মুখ—অর্ধেন্দু বিশ্বাস

সে-দিনের 'বনলতা সেন'—অরুণিমা পাল

আমি এক মহাদেশ—সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত

প্রবন্ধ

সাম্প্রতিক বাঙলার নাটক ও রঙ্গমঞ্চ—ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পরীক্ষা ব্যবস্থার পরীক্ষা—সুরপতি নন্দী

প্রাচীন ভারতের লৌহশিল্প—সোমাভান চৌধুরী

কৃষি-সংখ্যা তথ্য অনুযায়ী নবগঠিত রাজ্যসমূহ—পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

বাংলা ছোট গল্পের ধারা—বিনয় সাহা

আধুনিক স্থাপত্যকলা ও ভারতীয় ঐতিহ্য—সন্তোষ বোষ

জীবনী

ডারুইন—পরিতোষ খাঁ

গল্প

মা ও ছেলে—সোমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মোহিনী—অজয় বিশ্বাস

লালজল-নীলজল—অশ্বিন বসু

॥ পাদপূরণ ॥

বিপদে যেন না করি মোরা ভয়—রবীন্দ্রনাথ
মানুষের ধর্ম—রবীন্দ্রনাথ
বাংলা ভাষা ও ভারতের ঐক্য—রবীন্দ্রনাথ
জনসাধারণের শিক্ষা—রবীন্দ্রনাথ
দেশের কাজের মূলতত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথ
ছোটদের বিজ্ঞানের বই—আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়
ভারতবর্ষের আত্মিক সাধনা—রবীন্দ্রনাথ
কবির কথা—রবীন্দ্রনাথ
মুক্তির সাধন—রবীন্দ্রনাথ
সাহিত্য সৃষ্টি—রবীন্দ্রনাথ
ভারতপথিক—রবীন্দ্রনাথ
দয়ার সাগর—রবীন্দ্রনাথ

॥ পত্রিকা সম্বন্ধে ॥

দুবছরের বার্ষিক সভ্যক মূল্য ছটাকা সব বিষয়ে মৌলিক রচনাই আমরা সাদরে গ্রহণ করব। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, প্রবন্ধ, সাংস্কৃতিক আলোচনা, অনুবাদ সাহিত্য ইত্যাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে লিখে সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন। অমনোনীত রচনা উপযুক্ত ডাকটিকিট ও ঠিকানা দেওয়া থাকলে ফেরৎ দেওয়া হয়। পত্রিকায় সমালোচনার জন্য দুখানা করে বই সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন। পত্রিকাসংক্রান্ত সমস্ত রকম চিঠিপত্র সম্পাদকীয় কার্যালয়ে প্রেরিতব্য

সম্পাদকীয় কার্য্যালয়

ফোন : ৩৫-০৭৩১

৬১-এ, বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা-৬

"বন্ধু" বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ছাত্র-ছাত্রীদের একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা

ভারত ও পাকিস্তানে পত্রিকা-প্রকাশনে
রেকর্ড স্থাপন করতে চলেছে
স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা

বন্ধু

বার্ষিক চাঁদা ১৸০ আনা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন।

ঠিকানা : বন্ধু : বারুইপুর, ২৪ পরগণা।

● বন্ধু কিনুন ● বন্ধু পড়ুন ● বন্ধু কেনান ● বন্ধু পড়ান ●

পঁচিশে বৈশাখ

অন্তরে বাহিরে
সেই ভালো-মন্দ
স্পষ্ট-অস্পষ্ট
খ্যাত-অখ্যাত
ব্যর্থ-চরিতার্থের জটিল সংমিশ্রণের মধ্য থেকে
যে আমার মূর্তি
তোমাদের ভক্তির, তোমাদের ভালোবাসায়
তোমাদের ক্ষমায়
আজ প্রতিফলিত—
আজ যার সামনে এনেছ তোমাদের মালা,
তাকেই আমার পঁচিশে বৈশাখের
শেষ বেলাকার পরিচয় ব'লে
নিলেম স্বীকার ক'রে,
আর রেখে গেলেম তোমাদের জন্যে
আমার আশীর্বাদ।
যাবার সময় এই মানসী মূর্তি
রইল তোমাদের চিত্তে,
কালের হাতে রইল ব'লে
করব না অহংকার।

মুখপাত্র

প্রথম বর্ষ | বৈশাখ ১৩৬৪ | নবম সংখ্যা

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

চরিত-চিত্র

অশ্বিনীকুমার দত্ত

বিপিনচন্দ্র পাল

স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হইতে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও স্বাদেশিক কলকোষে একটী নূতন বস্তুর আমদানী হইয়াছে। ইহার নাম নেতা বা নায়ক বা "লীডার"। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একথা আমরা শুনি নাই। কৃষ্ণদাস পাল ভূমিহার সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন না, মুখপাত্র বা প্রতিনিধি ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বা আনন্দমোহন বা কি কালীচরণ ইঁহাদের কেহই সে'কালে নেতা উপাধি লাভ করেন নাই, কিন্তু দেশের নবশিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজে অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। আমার মনে হয় যে, সে সময়ে আমরা যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক অনধীনতার আদর্শ ধরিয়া চলিতেছিলাম, তাহা কোন লোকবিশেষের নেতৃত্বের দাবী সহ্য করিতে পারিত না। সুতরাং নেতার বা নায়কের বা লীডারের সৃষ্টি হইতে পারে নাই। এখন যে বস্তুকে আমরা তখনও ছিল। মনের ভাবে তো আর সংসারে কোনরূপ বস্তু-বিপর্য্যয় ঘটে না। তবে আমরা নেতা নায়ক বা লীডার বলিয়া ডাকিতাম না, ইহাই কেবল সত্য।

আর আজ আমরা এই সকল নাম দান করিতেছি বলিয়াই যে নূতন বস্তু লাভ করিতেছি, যাহা সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কর্ম্মী ও মনীষীগণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখপাত্র এবং প্রতিনিধি তখনও আছেন। আমরা এখন তাঁহাদিগকে প্রতিনিধি বা বলিয়া নেতা বলিতে বেশ কিন্তু বলিয়া আমাদের কথার জোরে তাঁরা নেতা বা নায়ক হইয়া উঠেন, এমনও বলা যায় না। তাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত নায়কত্ব লাভ করা এমন সহজ ব্যাপারও নহে। আমরা লেখাপড়া জানি কিম্বা না জানিলেও জানি বলিয়া আমাদের যে অভিমান জন্মিয়াছে, তাহার দরুণই কেহ আমাদের প্রকৃত নেতা হইতে পারেন না। আমরা করি, যুক্তি করি, পরখ করি, লাভালাভ গণনা করি, তারপরে যাঁর কথা আমাদের মনোমত হয়, তাঁহাকে আমাদের মুখপাত্র বলিয়া গ্রহণ করি। কিন্তু কাহারও কথা আমরা উঠিতে বসিতে পারি না। কাহারও পশ্চাতে আমরা দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে জানি না। কাহারও মানে বা প্রাণ রক্ষার জন্য আমরা আমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব

উৎসর্গ করিতে পারি না। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে ক্বচিৎ ধনের ব্যাপারে সম্ভব হইলেও, সাধারণ রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে ইহা সম্ভবপর নহে। এই জন্যই কেবল ইংরেজি শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের উপরে যাঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে লোকপ্রতিনিধি বলা যায়, কিন্তু লোক-নায়ক বলা যায় না।

বস্তুতঃ আমাদের বর্তমান কর্মিগণের মধ্যে কেবল একজন মাত্র প্রকৃত লোকনায়ক আছেন বলিয়া আমার মনে হয়, তিনি বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত।

অশ্বিনীকুমার শিক্ষিত, কিন্তু কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন; সুবক্তা, কিন্তু দৈবীপ্রতিভাসম্পন্ন বাগ্মী নহেন। সুললিত বাক্য যোজনা করিয়া তিনি বহু লোককে উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু শব্দ ও ভাবের যন্ত্র ছুটাইয়া তাহাদিগকে আত্মহারা করিয়া ক্ষেপাইয়া তুলিতে পারেন না। তিনি সাহিত্যিক,—তাঁর "ভক্তিযোগ" বাংলা ভাষার একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ; কিন্তু যে সাহিত্য-সৃষ্টির দ্বারা সমাজে নূতন আদর্শ ও নূতন উৎসাহ ফুটিয়া উঠে, সে সৃষ্টি-শক্তি তাঁর নাই। তিনি দরিদ্র নহেন, পিতৃদত্ত সম্পত্তির দ্বারা তাঁর সাংসারিক সচ্ছলতা সম্পাদিত হয়; কিন্তু যতটা ধনের অধিকারী হইলে, সেই ধনের শক্তিতে লোকে সমাজপতি হইয়া উঠে, অশ্বিনীকুমারের সে বিভব নাই। অশ্বিনীকুমার বি. এল পাশ করিয়া কিছুদিন ওকালতি করিয়াছেন; সে দিকে মনোনিবেশ করিলে তিনি আধুনিক ব্যবহারজীবিগণের অগ্রণী-দলভুক্ত হইতে পারিতেন না যে, এমনও মনে হয় না। কিন্তু অশ্বিনীকুমার সে দিকে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং বড় উকীল কৌন্সিলী হইয়াও লোকে সমাজে যে প্রতিপত্তি ও প্রভাব লাভ করে, অশ্বিনীকুমার তাহা পান নাই। সরকারী কর্মে কৃতিত্বের দ্বারাও সমাজে এক ধরণের নেতৃত্ব লাভ করা যায়। অশ্বিনীকুমারের পিতা উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন; ইচ্ছা করিলে অশ্বিনীকুমারও সহজেই একটা ডেপুটিগিরি জুটাইতে পারিতেন, আর তাঁর বিদ্যার ও চরিত্রের গুণে রাজকার্যে তিনি যে খুবই কৃতিত্ব এবং উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন, সে বিষয়েও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু অশ্বিনীকুমার এ সকলের কিছুই করেন নাই। যে গুণ থাকিলে, যে ধন-ও-কৃতিত্ব-বলে, সচরাচর আমাদের মধ্যে লোকনেতৃত্ব লাভ হয়, অশ্বিনীকুমার তার কিছুরই দাবী করিতে পারেন না। তথাপি, তাঁর মতন এমন সত্য ও সাচ্চা লোক-নায়ক বাংলার প্রসিদ্ধ কর্মিগণের মধ্যে আর একজনও আছেন বলিয়া জানি না।

ফলতঃ আমার মনে হয় যে, আমাদের চিন্তানায়ক অনেক আছেন, কিন্তু লোক-নায়ক নাই। কেহ বক্তা, কেহ কবি; কেহ মসীজীবি, কেহ বাবহারজীবি; কেহ ধনে, কেহ বা পদে বড়। এই সকল লোকে মিলিয়া দেশের মনের গতি ও কর্মের আদর্শ বদলাইয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন। ইঁহারা না থাকিলে বাংলা আজ যেখানে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেখানে যাইতে পারিত না। ইঁহারা দেশের প্রাণতা বাড়াইয়া দিয়াছেন, লোক-চরিত্রকে উদার ও উন্নত করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা কেহই, যথা অর্থে, লোকনায়ক নহেন। লোকে ইঁহাদের পুস্তক আনন্দ করিয়া পড়ে, ইঁহাদের বক্তৃতা আগ্রহ করিয়া শোনে, ইঁহাদের গুণগানে প্রাণ খুলিয়া করে; ইঁহাদিগকে সভাসমিতিতে উচ্চ আসনে লইয়া গিয়া বসায়, পথে দেখা হইলে সসম্ভ্রমে ইহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দেয়; দেশ-হিতকর অনুষ্ঠানাদিতে ইঁহাদিগকে আদর করিয়া পৌরোহিত্যে বরণ করে। এ সকলই করে; করে না কেবল, সত্যভাবে, ইঁহাদের অনুবর্তন। যতদিন লোকের মনের সঙ্গে ইঁহাদের কথা মিলিয়া যায়, লোকের ভাবের সঙ্গে ইঁহাদের উপদেশ মিশ খায়, লোকে যাহা আপনা হইতে চাহে যতদিন ইঁহারা সে পথে নিজেরা চলিতে ও তাহাদিগকে চালাইতে রাজী থাকেন, ততদিন ইঁহাদিগকে সকলে মাথায় করিয়া রাখে। কিন্তু যতক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেই ইঁহাদিগকে অবলীলাক্রমে, সহাসরিভাবে, ছাড়িয়া আসিতেও দ্বিধা-বোধ করে না। ইঁহাকে প্রকৃত লোক-নায়কত্ব বলে না, বা বলা সঙ্গত নহে।

প্রকৃত লোকনায়ক এদেশে ক্রমে লোপ পাইয়া যাইতেছে। এক সময়ে, হিন্দু ও মুসলমান-সমাজে, যে জাতীয় লোকনায়ক স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা আর আজ দেখিতে পাই না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের আধুনিক শিক্ষাতে আমাদিগকে দেশের লোকের প্রাণ হইতে ক্রমশঃই যেন দূরে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে। প্রথমতঃ আমাদের পিতৃপিতামহেরা যেভাবে আপন আপন গ্রামের সঙ্গে একাত্ম হইয়া বাস করিতেন, আমরা আর তাহা করি না। তাঁরাও সময় সময়, বিষয়-কর্ম্মের খাতিরে গ্রাম ছাড়িয়া দূরদূরান্তে বাস করিতেন বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রেরা গ্রামেই থাকিতেন। যেক্ষেত্রে তাঁহারা পরিবার সঙ্গে লইয়া কর্ম্মস্থলে যাইতেন, সেখানেও গ্রামের সমাজের সঙ্গে তাঁহাদের প্রাণগত, অন্তরঙ্গ যোগ কখনও নষ্ট হইত না। বিদেশে প্রবাসে তাঁরা অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, গ্রামে আসিয়া, আপনার আত্মীয়কুটুম্ব, প্রতিবেশী ও বন্ধুবর্গের মধ্যেই সে অর্থ ব্যয় করিতেন। পরোক্ষভাবে দশে তাঁহাদের অর্থের ভাগী ও ভোগী হইত; সাক্ষাৎভাবে তাহারা তাঁহাদের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠার দ্বারা সময়ে অসময়ে অনেক সাহায্য লাভ করিত। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া-কল্পে, দোলদুর্গোৎসবাদি নৈমিত্তিক পূজাপার্ব্বণে, নিত্য দেবসেবা ও অতিথি সেবার ভিতর দিয়া, গ্রামের লোকের সঙ্গে তাঁহাদের একটা নিকট সম্বন্ধ জমাট হইয়া পড়িয়া উঠিত। আর এই জন্য, তাঁরা যেখানে যাইয়া দাঁড়াইতেন, শত শত লোকে সেখানে যাইয়া তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইত। তাঁরা যে কাজ করিতে যাইতেন, সকলে সে কাজে ব্রত হইত। তাঁরা যে পথ দেখাইতেন, সকলে বিনা ওজরে, বিনা বিচারে, সে পথ ধরিয়া চলিত। তখন দেশে সত্যকার লোক-নেতৃত্ব ছিল। ইহারাই সেকালে প্রকৃত লোক-নায়ক ছিলেন।

আর আজ—'তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ'। সে দিনও নাই—সে সমাজও নাই। লোকে লেখাপড়া শিখিয়া, যারা লেখাপড়া জানে না তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে 'শিক্ষিত' ও 'অশিক্ষিতে'র, 'বিজ্ঞে'র ও 'অজ্ঞে'র মধ্যে এককালে এ সাংঘাতিক ব্যবধান ছিল না। গ্রামের বিদ্যারত্নং ন তর্কসিদ্ধান্ত বা ন্যায়লঙ্কার মহাশয়ের বাড়ীতে আপামর সাধারণ সকলের অবাধ গতিবিধি ছিল। তাঁর চতুষ্পাঠীতে, যখন তিনি শিষ্যমণ্ডলী-বেষ্টিত হইয়া ব্যাকরণ বা স্মৃতি বা ন্যায়ের অধ্যাপনা করাইতেন, তখনও গ্রামের চাষী ও ব্যবসায়ীরা তাঁর কাছে যাইয়া নীরবে বসিয়া থাকিত এবং তাঁর তামাকাদি সাজিয়া, তাঁর সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত হইত। তাদের সঙ্গে তাঁর বিদ্যার ব্যবধান যাই থাকুক না কেন, প্রাণের ব্যবধান বড় বেশি ছিল না। আর এই একপ্রাণতা নিবন্ধন, দেশের আপামর সাধারণে এ সকল উদারচরিত ব্রাহ্মণের শাস্ত্রজ্ঞান লাভ না করিয়াও, তাঁহাদের চরিত্রের প্রভাবে, কথাবার্ত্তার গুণে অনেকটা সুশিক্ষিত হইয়া উঠিত। এ শিক্ষা স্কুল-পাঠশালায় মিলে না। আমরা একটু আধটু লেখাপড়া শিখিয়া, চিন্তায়, ভাবে, আদর্শে, অভ্যাসে, সকল বিষয়ে দেশের লোক হইতে এতটা পৃথক হইয়া পড়িয়াছি যে, তাহাদের কথা আমাদের মিষ্টি লাগে না, আমাদের কথাও তাদের বোধগম্য হয় না। তাদের আমোদপ্রমোদে আমরা গা ঢালিয়া দিতে পারি না; আমাদের উৎসব-ব্যসনাদিতেও তারা আমাদের কাছে ঘেঁষিতে পারে না। আমাদের বাড়ীতে তারা সাহস করিয়া আসে না, আমরাও আমাদের ক্রিয়াকল্পে তাহাদিগকে আদর করিয়া ডাকি না। ইংরেজকে তারা যে ভাবে দেখে, যেরূপ সম্মান করে, আমাদিগকেও প্রায় সেইরূপই করে। আর এই জন্য দেশের লোকে যেমন ইংরেজের শাসন মানিয়া চলে, কিন্তু আপনা হইতে প্রাণের টানে সরকারের অনুবর্ত্তন করে না, আমাদের আন্দোলন-আলোচনাদিতেও এখন দেশের লোকে ঠিক ঐ ভাবেই আসিয়া যোগদান করে;—খাতিরে করে, ভয়ে করে, বড়লোক ভাবিয়া আমাদের "মাস্ মিটিংএ" আসিয়া জনতা যোগদান করে, কিন্তু আপনার জন বলিয়া, অন্তরের টানে, প্রাণের দায়ে আমাদের কাছে তারা আসে না। এ অবস্থায়, প্রকৃত লোক-নায়কত্বের প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব নহে।

তবে অশ্বিনীকুমারের পক্ষে ইহা অনেকটা সম্ভব হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, অশ্বিনীকুমার কখনও

সাধারণ ইংরেজি-নবিশদিগের মত জীবনটা কাটান নাই। তিনি লেখাপড়া শিখিয়া, কর্ম্মের খাতিরে, যশের লোভে বা সখের দায়ে, আপনার দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসেন নাই। বরিশালেই তিনি তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিতে আরম্ভ করেন। বহুদিন পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমারের একবার কলিকাতায় আসিয়া বাস করিবার প্রস্তাব হয়, এরূপ শুনিয়াছি। প্রবীণ সাহিত্যিক, কবিপ্রতিম রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তখন জীবিত ছিলেন। অশ্বিনীকুমার প্রায়ই দেওঘরে যাইয়া বসু মহাশয়ের সহিত মিলিত হইতেন। অশ্বিনীকুমারের কলিকাতায় আসিবার কথা শুনিয়া, রাজনারায়ণ বাবু তাঁহাকে এমন আত্মঘাতী কর্ম্ম করিতে পুনঃপুনঃ নিষেধ করেন। অশ্বিনীকুমার যদি এ নিষেধ না শুনিতেন, আমাদের দশজনের মতন যদি তিনি কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতেন, তাহা হইলে, বাংলার আধুনিক কর্ম্মজীবনের ইতিহাসে তিনি আজ যে স্থান অধিকার বসিয়াছেন, সে স্থান কিছুতেই পাইতেন না, ইহা স্থির নিশ্চয়।

প্রথম যৌবনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া অশ্বিনীকুমার বরিশালে যাইয়া স্বদেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। সে সময়ে লার্ড রিপন্ প্রবর্ত্তিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বা Local Self-government-এর খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। ইংরেজি শিক্ষিত সমাজ, বিশেষতঃ দেশের ব্যবহারজীবিগণ এই স্বায়ত্তশাসনেতেই দেশের ভবিষ্যতের স্বাধীনতার পত্তন হইল ভাবিয়া উৎসাহ সহকারে মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। অশ্বিনীকুমারও সেই পথ ধরিয়াই নিজের সহরের এবং জেলার সেবায় নিযুক্ত হন। এবং ক্রমে ওকালতী পরিত্যাগ করিয়া লোকশিক্ষার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। যতদূর আমার মনে আছে, বোধ হয় তিনি বহুকাল ধরিয়া আপনার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। ক্রমোন্নতি সহকারে অশ্বিনীকুমারের উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি বিদ্যালয় কলেজে পরিণত হয়। এবং অশ্বিনীকুমার একজন মনীষাসম্পন্ন স্বার্থত্যাগী লোকশিক্ষকের খ্যাতিলাভ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে বিশেষ ভাবে আমাদের মধ্যে অল্প বেতন লইয়া উচ্চ ইংরেজি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। আজকাল দেশে এ শ্রেণীর অনেকগুলি বে-সরকারী স্কুল-কলেজ হইয়াছে, কিন্তু এক বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যতীত এই বে-সরকারী স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাতাগণের প্রায় অপর সকলেই, এগুলিকে জীবিকা-উপার্জ্জনের একটা প্রশস্ত উপায় রূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু অশ্বিনীকুমার তাহা করেন নাই। সে প্রয়োজনও তাঁর ছিল না। ফলতঃ আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরে, অশ্বিনীকুমারের মতন আর কেহ এতটা নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশীয়-দিগের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রচার করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন নাই। এইজন্য অশ্বিনীকুমারের স্কুল ও কলেজের পরিচালনাকার্য্যে কোন প্রকারের ব্যবসাদারীর পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অশ্বিনীকুমার লোকশিক্ষার জন্য বহু বৎসর ধরিয়া আপনার সময়, শক্তি এবং অর্থ অকাতরে দান করিয়াছেন, কখনো তাহার এক কপর্দ্দকেরও প্রতিদানের প্রত্যাশা করেন নাই। এইজন্যই বোধহয় তাঁহার শিক্ষার ও চরিত্রের প্রভাব এ দেশের, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের, ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকমণ্ডলীর মধ্যে এতটা পরিমাণে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রধানতঃ অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরাই পূর্ব্ববঙ্গের জেলায় জেলায় সাচ্চা স্বদেশীর পুরোহিত হইয়া বসিয়া আছেন। স্বদেশী যে পূর্ব্ববঙ্গে এতটা শক্তিশালী হইয়াছিল, এবং এখনো হইয়া আছে, তাহার প্রধান কারণ অশ্বিনীকুমারের চরিত্র ও শিক্ষা। স্কুল ও কলেজ খুলিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থাবলী পড়াইয়াই যুবকগণের শিক্ষার কাজ শেষ হইল, অশ্বিনীকুমার কখনো এমনটা মনে করেন নাই। শিষ্যদিগের চরিত্রগঠনের জন্যও তিনি সর্ব্বদা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। চরিত্রগঠনের উপায় কেবল মাত্র উপদেশ নহে, কিন্তু সদনুষ্ঠান। অশ্বিনীকুমার আপনার স্কুল ও কলেজের যুবকমণ্ডলীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিবিধ সদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করেন। চরিত্রগঠনের মূলে পরার্থপরতাসাধন। লোকসেবার ভিতর দিয়া যে ভাবে ও যে পরিমাণে এই পরার্থপরতাসাধন করিতে পারা যায়, আর কোনও উপায়ে তাহা পারা যায় না। অশ্বিনী-কুমারের শিষ্যেরা দল বাঁধিয়া বরিশালের আর্ত্তজনের সেবায় নিযুক্ত হইতেন। বহুদিন হইতেই বরিশালে মাঝে মাঝে

বিসূচিকার নিরতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। অশ্বিনীকুমারের স্কুল এবং কলেজের যুবকেরা সে সব সময়ে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে লোকের ঘরে ঘরে যাইয়া রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছেন। মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষে পল্লীগ্রাম হইতে বহু লোক সর্ব্বদাই বরিশালে যাতায়াত করে। বরিশাল মুসলমানপ্রধান স্থান। সহরের এই সকল অভ্যাগতদিগের মধ্যে মুসলমানদিগের সংখ্যাই বেশী হয়। ইহারা সহরে আসিয়া মোসাফেরখানায় বা হোটেলে আশ্রয় লইয়া থাকে। এই সকল হোটেলের স্বাস্থ্যরক্ষার কোনো ব্যবস্থাই যে নাই, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র; বিশেষতঃ আপনার পরিবার পরিজন হইতে দূরে আসিয়া এরূপ বন্ধুহীন স্থানে বিসূচিকা দ্বারা আক্রান্ত হইলে লোকের কত না দুর্গতি হয়, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরা সর্ব্বদা নিতান্ত আপনার জনের মত এই সকল অসহায় রোগীর সেবা করিয়া আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ সন্তানেরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া ইঁহাদিগের মলমূত্র পরিষ্কার করিয়াছেন। অশ্বিনীকুমার এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ অকাতরে এই সকল বিপন্ন লোকের ঔষধ এবং পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। বরিশালের এই সেবকদল অনেক বন্ধুহীন লোকের মৃতদেহের সৎকার পর্য্যন্ত করিয়াছেন। সহরের বারাঙ্গনাগণ পর্য্যন্ত ইহাদের এই সেবা হইতে কখনো বঞ্চিত হয় নাই। অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরা বিপন্ন রোগীর শুশ্রূষা করিতে যাইয়া কখনো কোনো দিন কোনো প্রকারের জাতিবর্ণের বিচার করেন নাই। আকালে, অন্নকষ্টে, হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে ইঁহারা দেশের এবং বিদেশের সম্পন্ন লোকদিগের নিকট হইতে দ্বারে দ্বারে অর্থ ভিক্ষা করিয়া বিপন্ন জনের ক্ষুধানিবারণের উপায় করিয়া দিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারের লোক-সেবা কেবল যে সহরে আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। বহুদিন হইতে অশ্বিনীকুমারের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কতকটা নিজের শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য, আর কতকটা আপনার বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষেও তিনি আপনার জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নৌকাযোগে ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকেন। এই সকল সফরের সময় দেশের গরীব লোকেরা সর্ব্বদাই নানা বিষয়ে তাঁহার সাহায্য এবং সেবা পাইয়া আসিয়াছেন; অশ্বিনীকুমারের নৌকা কোথাও আসিয়াছে, শুনিলেই সে স্থানের গরীব লোকেরা আপন আপন শরীর-মনের বোঝা লইয়া নিতান্ত আপনার জন ভাবিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। রোগী ঔষধ চায়, দরিদ্র অর্থ চায়, জিজ্ঞাসু উপদেশ চায়, আর যাহার চাহিবার কিছুই নাই, সেও তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়া কেবল মাত্র কৃতার্থ হইবার জন্য তাঁহার কাছে যাইয়া উপস্থিত হয়। সকলের অভাব বা প্রার্থনা যে তিনি সর্ব্বদা পূরণ করিতে পারিয়াছেন, তাহা নহে। ভগবানের নিকটও মানুষ সর্ব্বদা কত কি চায়, কিন্তু যাহা চায় তাহাই যে পায়, এমন নহে; তথাপি ঈপ্সিতলাভ না হইলেও, তাহাদের প্রাণে শান্তিলাভ হইয়া থাকে। অশ্বিনীকুমারের সম্বন্ধেও কতকটা তাই হয়। সকলের প্রার্থনা পূরণ করা তাঁহার সাধ্যাতীত, কোনো মানুষই তাহা পারে না। তবে মিষ্ট কথায়, স্নেহসিক্ত সম্ভাষণে অন্তরের সহানুভূতি ও সমবেদনা দিয়া সকল মানুষই অপর মানুষের প্রাণটা ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারে। অশ্বিনীকুমার এটী সর্ব্বদাই করিয়াছেন। এই জন্য বরিশালের জনসাধারণের সঙ্গে বহুদিন হইতে তাঁহার একটা গভীর প্রাণের যোগ গড়িয়া উঠিয়াছে।

কি সহজ উপায়ে, তিনি লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারেন, আমাদের পক্ষে অনেক সময় তাহা কল্পনা করিয়া উঠাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। একটী সামান্য ঘটনার কথা মনে পড়িল। সে বেশী দিনের কথা নয়; স্বদেশী আন্দোলনের তখন খুব প্রাদুর্ভাব। বরিশালে একটা অতি বিস্তৃত ও স্বল্প-বিস্তর সঙ্গতি-সম্পন্ন নমঃশূদ্র-সমাজ আছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ খৃষ্টীয়ান হইয়া গিয়াছেন; কেহ কেহ লেখাপড়াও শিখিয়াছেন। এই সকল সূত্রে পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রভাবও কিয়ৎপরিমাণে এই নমঃশূদ্র সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। নমঃশূদ্রেরা কোনও বিষয়েই দেশের অপরাপর শূদ্রগণ অপেক্ষা হীন নহেন; অথচ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চতর শ্রেণীর লোকেরা স্বচ্ছন্দে অপর শূদ্রকের জল গ্রহণ করেন; নমঃশূদ্রের জল গ্রহণ করেন না। নমঃশূদ্রেরা এ জন্য আপনাদিগকে অবজ্ঞা অপমানিত

মনে করিয়া এই প্রথার বিরুদ্ধে একটী প্রবল আন্দোলন জাগাইয়া তুলিয়াছেন। স্বদেশীর যুগে নমঃশূদ্রদিগের এই আন্দোলনটা বেশ বাড়িয়াই উঠে। স্বদেশীদলের আত্মবিরোধ বাধাইবার জন্য স্বদেশীর বিরোধিগণ নমঃশূদ্রদিগের এই আন্দোলনে নানা ভাবে ইন্ধন প্রদান করিতে আরম্ভ করে। বরিশালের একজন নিষ্ঠাবান স্বদেশসেবক নমঃশূদ্রকে একদিন কেহ বলেন যে, "বাবুরা ত' 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া ভাই ভাই এক্‌টাই করিয়াছেন, কিন্তু তোমাদিগকে নমশূদ্র বলিয়া ঘৃণা করেন কেন? ভদ্রসমাজে তোমাদের কল চলে না, হুঁকা চলে না, তবুও তোমরা তাদের ভাই; কথাটা মন্দ নয়!" এ কথা শুনিয়া এই ব্যক্তির মনে একটা খটকা বাধিয়া যায়। সে সময়ে অশ্বিনীবাবু সেই অঞ্চলেই উপস্থিত ছিলেন। আপনার সন্দেহ মিটাইবার জন্য এই নমঃশূদ্র স্বদেশসেবক অশ্বিনীকুমারের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে তাঁর পূর্ব্বে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। অশ্বিনীকুমার আপনার নৌকায় নিজের শয্যার উপরে বসিয়া ছিলেন। শয্যার নিকটেই একটা ফরাশ পাতা ছিল। নমঃশূদ্রটী অশ্বিনীকুমারের প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে যাইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন; অশ্বিনীকুমারও অমনি দাঁড়াইয়া অভ্যাগতকে প্রতিনমস্কার করিলেন এবং সেই প্রকোষ্ঠের ভিতরে তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার পরিচয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইয়া সেই ফরাশে বসিলেন। তারপর অশ্বিনীকুমার তাঁহার প্রয়োজন জানিতে চাহিলে নমঃশূদ্রটি বলিলেন—"বাবু, আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা জিজ্ঞাসা করা এখন অনাবশ্যক; আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পাইয়াছি। আপনি যখন আমাকে লইয়া এক বিছানায় বসিয়া কথা কহিয়াছেন তাহাতেই বুঝিয়াছি, 'বন্দে-মাতরম্' সত্য এবং আমরা আপনাদের ভাই।" ঘটনাটি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহাতে কি সহজ, কি সামান্য ও স্বাভাবিক উপায়ে অশ্বিনীকুমার বরিশালে সর্ব্বসাধারণের চিত্তের উপরে আপনার এই অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন ইহা বুঝিতে পারা যায়।

("বঙ্গদর্শন"—বৈশাখ, ১৩২০)

বিপদে যেন না করি মোরা ভয় —রবীন্দ্রনাথ

হে ভয়ঙ্কর, হে প্রলয়ঙ্কর, হে শঙ্কর, হে মহাঙ্কর, হে পিতা, হে বন্ধু, অন্তঃকরণের সমস্ত জাগ্রত শক্তির দ্বারা উদ্যত চেষ্টার দ্বারা অপরাজিত চিত্তের দ্বারা তোমাকে ভয়ে দুঃখে মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিব—কিছুতেই কুণ্ঠিত অভিভূত হইব না এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিতে থাকুক এই আশীর্ব্বাদ কর!.....

তোমার সেই ভীষণ আবির্ভাবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন বলিতে পারি—

আবিরাবীর্ম্মএধি—রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্!

দারিদ্র্য ভিক্ষুক না করিয়া যেন আমাদিগকে দুর্গম পথের পথিক করে, এবং দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আমাদিগকে মৃত্যুর মধ্যে নিমজ্জিত না করিয়া সচেষ্টতর জীবনের দিকে আকর্ষণ করে। দুঃখ আমাদের শক্তির কারণ হোক্, শোক আমাদের মুক্তির কারণ হোক, এবং লোকভয় রাজভয় ও মৃত্যুভয় আমাদের জয়ের কারণ হোক। বিপদের কঠোর পরীক্ষায় আমাদের মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিলে তবেই, হে রুদ্র, তোমার দক্ষিণমুখ আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে; নতুবা অশক্তের প্রতি অনুগ্রহ, অলসের প্রতি প্রশ্রয়, ভীরুর প্রতি দয়া কদাচই তাহা করিবে না—কারণ সেই দয়াই দুর্গতি, সেই দয়াই অবমাননা; এবং হে মহারাজ, সে দয়া তোমার দয়া নহে!

("দুঃখ"—বঙ্গদর্শন—ফাল্গুন, ১৩১৩)

সংকলন

চাষী

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

আমরা যাকে সভ্যতা বলি, তার ভিত্ গোড়া হয়েছে লাঙ্গলের ফলায়। মানুষ যে আদিতে অসভ্য বাযাবর ছিল, তার কারণ স্থিতিশীল সভ্য হয়ে তার প্রাণে বাঁচবার উপায় ছিল না। অন্নের পশু ও পালিত পশুর অন্নের সন্ধানে তাকে দ্বিতীয় ভূখণ্ড পরিক্রম করতে হ'ত। পরিচিত ভূভাগ শস্যশূন্য ও তৃণবিরল হয়ে উঠলে, অজ্ঞাত দেশের দিকে পা বাড়াতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা চল্‌তো না। কৃষির রহস্য আয়ত্ত ক'রে তবেই মানুষ এ ভবঘুরে অস্থিরতার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। চাষের ক্ষেতকে কেন্দ্র ক'রে তারই চারপাশে গ্রাম, নগর, স্বদেশ, স্বরাজ্য গড়ে উঠেছে। এই সব স্থায়ী আবাসে চাষের অন্নের কৃপায় মানুষের মন, শরীরের একান্ত দাসত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে, শিল্প ও সৌন্দর্য্য, ভাব ও জ্ঞানের বিচিত্র সৃষ্টিতে রত হয়েছে। তার কর্মকুশলতা অগ্রসর ধারায় সহস্র পথ কেটে চলেছে। এই সভ্যতার জন্মের সন তারিখ ঠিক জানা নেই। কিন্তু মানুষ যেদিন চাষের ক্ষেতের কারখানায় স্বাবা-পৃথিবী থেকে অন্ন চুঁইয়ে নেবার সজীব কলের সৃষ্টি-কৌশল আবিষ্কার করেছে সেই দিনই এর জন্মদিন

মাটির চাষ সভ্যতাকে বহন করে' এনেছে, কিন্তু সে সভ্যতা চাষীকে বহন করতে পারে নি। চাষী চিরদিনই সভ্যতার ভারবাহী মাত্র হয়ে আছে। সে হচ্ছে সভ্যতার মূল। মাটির নীচে থেকে রস টেনে সে সভ্যতার ফুল ফোটাবে, ফল ধরাবে,—কিন্তু তার বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ সে কখনও জানবে না।

এর কারণ সভ্যতার জন্মকথার সঙ্গেই জড়ান রয়েছে। মানুষের বাযাবর জীবন ছিল সাম্য ও স্বাধীনতার স্বর্গরাজ্য। জমিয়ে জমিয়ে অবাধে বাড়িয়ে তোলা যায়—ধনের এমন আকার ছিল না বলে', ধনী ও নির্ধনের উৎকট প্রভেদ তখন সম্ভব ছিল না। সমাজের এক ভাগ অন্য সকলের পরিশ্রমের ফলের মোটা অংশ ভোগ করবে, এ ব্যবস্থার উপায় ও অবসর অতি সামান্য ছিল, এজন্য সমাজের মধ্যে দাসপ্রথা সহজে গড়ে' উঠ্‌তে পারে নি। বহিঃপ্রকৃতির দাসত্ব সকলকেই এমন নিরবচ্ছিন্ন করতে হ'ত যে, সে দাসের দলের এক ভাগের আর প্রভু হয়ে ওঠার সুযোগ ছিল না। চাষের জ্ঞানের ফলে মানুষ সে স্বর্গরাজ্য থেকে চ্যুত হয়েছে। মাটি যেদিন ধন হয়েছে, ও স্বর্গরাজ্যও সেইদিন মাটি হয়েছে। চাষের ফসলকে জীবনোপায় করার সঙ্গে সেই কৌশল মানুষের করায়ত্ত হয়েছে, যাতে একজন বহুজনকে অনাহারের ভয় দেখিয়ে যাযা করে' খাটিয়ে নিতে পারে। আর তার ফল ক্রমে জমা ক'রে সে ক্ষমতাকে ক্রমে বাড়িয়ে চল্‌তে পারে। যারা বলী ও কৌশলী, এ চেষ্টায় তাদের প্রলোভনও ছিল প্রচুর। যাযাবর জীবনে যারা অভ্যস্ত, চাষের পরিশ্রম তাদের কাছে বিস্বাদ ও অতিমাত্রায় ক্লেশকর। ক্ষুধার তাড়নায় গুরু শ্রম, আর তার শান্তিতে অখণ্ড আলস্য,—এই ছিল যাযাবর জীবনযাত্রার সাধারণ ধারা। এর তুলনায় চাষীর শ্রম কঠোরতায় লঘু, কিন্তু সে শ্রম প্রতিদিনের নিয়মিত পরিশ্রম,—অনভ্যস্তের কাছে যা সব চেয়ে পীড়াকর। সে পরিশ্রম করতে হয় বর্তমানের ক্ষুধার তাড়নায় নয়, ভবিষ্যতের অনাহারের আশঙ্কায়। কারণ সে পরিশ্রমে বর্তমানের ক্ষুধানিবৃত্তির কোনও সম্ভাবনা নেই। কিছুই আশ্চর্য্য নয় যে এই অনভ্যস্ত, চিরফলপ্রসূ, নিয়ত পরিশ্রমের গুরুভার বলবান ও বুদ্ধিমান লোকেরা চিরদিনই দুর্বল ও হীনবুদ্ধিদের কাঁধেই চাপিয়ে এসেছে।

সভ্যতার ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ে এর উদাহরণ ছড়ানো রয়েছে। সভ্য গ্রীসের রাজ্যগুলিতে চাষী ছিল ক্রীতদাস; আর এ ব্যবস্থা ভিন্ন সভ্যতা কি করে' টিঁকে থাকতে পারে, গ্রীক পণ্ডিতেরা তা ভেবে পান নি।

যেখানে সভ্যতা সাম্রাজ্যের পথে পা দিতেই হাতের লাঙল তুলে দিয়েছিল দাসের হাতে। ইউরোপের মধ্যযুগে ও ভারতবর্ষে সেদিন পর্যন্ত চাষী ছিল নামে ও কাজে প্রায়ই ভূমিদাস। ফিউডাল শব্দের চাষের কাজ বৈধেছে, অর্থাৎ আধোরে—যার বেচে অর্থাৎ বিক্রয় অধিকার আছে। শাস্ত্রের কথা শাস্ত্রের পুঁথিতেই লেখা আছে, কিন্তু ভূতের অতীত থেকে চাষের লাঙল ঠেলছে, যে সূত্রকে "প্রজাপতের ইদং সর্বং ব্রাহ্মণস্য স্বয়ংভুবঃ"—স্বয়ম্ভু সৃষ্টিকর্তা দাসের তরেই সৃষ্টি করেছেন।

মোট কথা ধনতন্ত্রের যেমন দুই দিক—ধনসৃষ্টি ও ধনবিভাগ; সভ্যতারও তেমনি দুই দিক—সৃষ্টি ও বিভাগ। শরীর ও মনের যা পুষ্টি ও সম্পদ, তার সৃষ্টির কাজে নানা সভ্যতার মধ্যে বড়-ছোট, ভাল-মন্দ ভেদ আছে; কিন্তু বিভাগের কাজে সব সভ্যতার এক চাল। সভ্যতার সৃষ্টির বড় ও ভোগ অংশ ভাগ হয় অল্প কজনার মধ্যে, যা অবশিষ্ট তাই থাকে বাকী সকলের জন্যে,—যদিও শ্রমের ভাগটা তাদেরই বেশী

যে সভ্যতা নিজেকে আধুনিক বলে গর্ব করে, তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান দাবী এই যে, বিভাগের এই উৎকট বৈষম্য সে ক্রমে কমিয়ে আনছে জ্ঞান ও রসের সৃষ্টিকে অল্প কজনার ভোগে তুলে না রেখে, যার শক্তি আছে তাকেই আয়ত্তের মধ্যে এনে দেবার সে নানা পথ কেটে দিচ্ছে। সৃষ্টির ভোগ যে বস্তুসম্ভার, তাকে ভাগ্যবান ও বুদ্ধিমান এবং দুর্ভাগা ও সাধারণবুদ্ধি লোকের মধ্যে কেবল প্রয়োজনের মাপে বেঁটে দেওয়া সম্ভব না হলেও, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যা প্রয়োজন তা থেকে যাতে কেউ না বঞ্চিত হয়,—সেদিকে তার চেষ্টার বিরাম নেই, এবং সাধারণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শকেও সে ক্রমে উঁচু দিকেই টেনে তুলছে। পূর্বে যা ধনীর বিলাস ছিল, তাকে সে অল্পবিত্তের নিত্য ব্যবহার্য করেছে। তার জন্যে ধনীর বাসনের আয়োজন ও পরিমাণ কমাতে হয় নি, তা বরং বেড়েই চলেছে। তবুও যে এ কাজ সম্ভব হয়েছে, সে হচ্ছে বস্তুসৃষ্টির যে অভিনব কৌশল সে আবিষ্কার করেছে, তারই প্রয়োগে। সেই কৌশলের ফলে স্বল্প-পরিসর স্থানের মধ্যে, অল্প লোকে, অতি সামান্য সময়ে প্রয়োজন ও বিলাসের যে বৃহৎ সামগ্রী-সম্ভার উৎপন্ন করতে পারে, ইতিপূর্বে সমস্ত দেশব্যাপী লোকের বহুদিনের চেষ্টাতেও তা সম্ভব ছিল না। এই কৌশলের নাম 'ইন্‌ডাস্ট্রিয়ালিজ্‌ম্'।

আধুনিক 'ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল' সভ্যতার এই দাবী, তার জন্ম ও লীলাভূমি পশ্চিম ইউরোপে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে সত্য বলেই স্বীকার করতে হবে। সেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে এখনও যতই পার্থক্য থাকুক, ধনিকের তুলনায় শ্রমিকের প্রয়োজন ও বিলাসের উপকরণের যোগান যতই নগণ্য হোক্, এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, পূর্ব পূর্ব যুগের তুলনায় ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল যুগের সভ্যতার ভারবাহীরা অনেক বেশী পরিমাণে সে সভ্যতার ফলভোগী হয়েছে। এ সভ্যতার যারা মাথায় রয়েছে, এ যে তাদের উদারতায় ঘটেছে তা নয়। যারা ধনে ও বুদ্ধিতে প্রবল, তারা নিজেদের লাভের লোভেই ইন্‌ডাস্ট্রিয়ালিজ্‌ম্-এর গোড়াপত্তন করেছে। কিন্তু তার ফলে যে সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে' উঠেছে তাতে ভারবাহীদের বল বাঁধবার সুযোগ ঘটেছে, এবং বলের চাপেই তারা ও-ফল আদায় করেছে। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এর সম্ভাবনা ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। নূতন সৃষ্টিকৌশলে যোগানের পরিমাণ যদি না বেড়ে যেত, তবে ধনিকের ভাণ্ডার খালি না করে শ্রমিকের থালি ভরবার কিছুতেই চলতো না।

কিন্তু 'ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল' দেশগুলিতে দৃষ্টি আবদ্ধ না রেখে গোটা পৃথিবীর দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে, চাষাকে নিয়ে প্রাক্-ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল সভ্যতার যা সমস্যা, ইন্‌ডাস্ট্রিয়ালিজ্‌ম্ তার কোনই সমাধান করতে পারে নি; সমস্যাটিকে এক পা দূরে হটিয়ে রেখেছে মাত্র। পূর্ব যুগের সভ্যতা যে গোলামির ভিত্তে এর মীমাংসার চেষ্টা করতো, ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল সভ্যতা খুব ব্যাপকভাবে সেই গোলামিরই চালাতে চাচ্ছে।

সভ্যতার নিত্য সমস্যা হচ্ছে, জীবনের পুষ্টি ও আনন্দের যা উপকরণ আবিষ্কার হয়েছে, কি করে' তা যথেষ্ট উৎপন্ন করে' সমাজের মধ্যে এমন করে বেঁটে দেওয়া যায়, যাতে প্রয়োজনের পরিমাণ থেকে কেউ বাদ না পড়ে, অথচ উৎপাদনের কাজে বুদ্ধি ও পরিশ্রম নিয়োগের আকর্ষণেরও

অভাব না হয়; আর প্রকৃতি যাদের নূতন সৃষ্টির ক্ষমতা দিয়ে জন্ম দিয়েছে, তাদের সেই শক্তিপ্রয়োগের শিক্ষা, সুযোগ ও অবসরের কি করে' ব্যবস্থা করা যায়। এর একটির উপর নির্ভর করে সভ্যতার স্থিতি, অন্যটির উপর তার বৃদ্ধি। এ পর্য্যন্ত কোনও সভ্যতা এ সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে গুরুতর শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন, সব সভ্যতা তার বোঝা চাপিয়েছে সমাজের একটা অংশের উপর, যাতে বাকী অংশটা ঐ পরিশ্রম থেকে মুক্ত হ'য়ে সভ্যতার ভোগ ও বৃদ্ধির যথেষ্ট উপকরণ ও অবসর পায়। সব সভ্যতার অন্তরেই এই ভয় যে, ঐ পরিশ্রমের ভার সমাজের এক অংশের মাথা থেকে লাঘবের জন্য সকলের উপর ভাগ করে' দিলে, সভ্যতা সমাজের সকলের পক্ষেই বোঝা হয়ে উঠ্‌বে। ওর ভোগের উপাদান কারও ভাগে জুট্‌বে না, ওর বৃদ্ধির সংযোগ ও অবসর কারও ঘট্‌বে না। কাজেই সভ্যতার স্থিতি ও বৃদ্ধির জন্য বলে হোক্, ছলে হোক্, সমাজের একদল লোককে তার ভারবাহী করতেই হবে, এবং খুব সম্ভব সে দল হবে সংখ্যায় সব চেয়ে বড় দল।

ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক সভ্য সমাজে সভ্যতার এই ভারবাহীর দল ছিল চাষী। কারণ কৃষিই ছিল প্রতি সমাজের জীবিকার মূল উৎস। ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজম্ হঠাৎ আবিষ্কার করল যে, কৃষিকে বাদ দিয়ে এক নূতন ধরণের কারখানায় সমাজের বুদ্ধি ও পরিশ্রম নিয়োগ করলে তার ফল ফলে বেশী। কৃষি জীবিকার যে উপকরণ উৎপন্ন করে, সমান পরিশ্রমে এতে তার অনেক গুণ বেশী পাওয়া যায়। পশ্চিম ইউরোপে এই ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লে দেখা গেল যে, এই সমাজব্যবস্থায় সভ্যতার ভারবাহীদেরও অনেক পরিমাণে তার ফলভোগী করা কৃষিসভ্যতার তুলনায় সহজসাধ্য। কারণ এতে যে অল্প সময়ের পরিশ্রমে অনেক বেশী ফল লাভ হয় কেবল তাই নয়, এই ব্যবস্থায় কৃষির জন্য দেশের অধিকাংশ লোককে দেশময় বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে থাকতে হয় না, স্থানে স্থানে এক জায়গায় মধ্যে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে হয়। অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামবাসী না থেকে নগরবাসী হয়। গ্রামীন ছ'ল সভ্যতার বোঝাবাহী বর্ব্বর, আর নাগরিক তার ফলভোক্তা বিদগ্ধজন। শহরের জনবহুল লোকের শিক্ষা, দীক্ষা, স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের জন্য যা' সহজসাধ্য সারা দেশে ছড়ান চাষীর জন্য সে ব্যবস্থা অতি দুঃসাধ্য।

ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজমের এই পরিণতিতে ইউরোপের অনেক সমাজহিতৈষী ভাবুক স্বভাবতই উৎফুল্ল হয়েছেন। তাঁরা বলছেন এখন যদি ধনীর লাভের লোভ ও বিলাসের চাষী কমান যায়, এবং কাউকেও অন্যের পরের পরিশ্রমের ফলভোগ করতে না দিয়ে পরিশ্রমের ভার সকলের মধ্যে ভাগ করা যায়, তবে প্রত্যেক লোকের প্রতিদিন অল্প সময়ের পরিশ্রমেই সমাজের সকলের প্রয়োজন ও অল্পস্বল্প বিলাসের উপযোগী ধন উৎপন্ন হতে পারে। আর সভ্যতার যা শ্রেষ্ঠ ফল, সৃষ্টি-কৌশলীদের তার সৃষ্টির এবং অন্য সকলের তার রসগ্রহণের শিক্ষা, সুযোগ ও অবসরের ব্যবস্থা হয়। সভ্যতার ভারবাহী হতভাগ্যের দল সমাজ থেকে লোপ পায়।

বিনা আগুনে এই অপূপাক কি করে সম্ভব হবে? উত্তর অতি সহজ,—পরের আগুনের উপর পাকপাত্র চাপিয়ে। ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল সমাজ চায় কৃষির পরিশ্রম ও তার আনুষঙ্গিক সমাজব্যবস্থার অসুবিধা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। অথচ ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজমের আদি ও অন্ত চাষীর পরিশ্রমের উপর নির্ভর করছে। তার শিল্পের উপাদানও যোগাচ্ছে কৃষি, শিল্পিদেরও যোগাচ্ছে কৃষি। সুতরাং ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল সমাজ থেকে কৃষির পরিশ্রম দূর করার অর্থ—অন্য সমাজের উপর সেই পরিশ্রম বিগুণ করে, চাপানো, প্রতি সমাজে চাষীর যে সমস্যা ছিল কতকগুলি সমাজ থেকে তা সরিয়ে অন্য কতকগুলি সমাজের ঘাড়ে তা তুলে দেওয়া; পৃথিবীর প্রতি সভ্যদেশের একদল লোককে তার সভ্যতার ভারবাহী না করে', কতকগুলি সভ্যদেশের সভ্যতার ভার অন্য কতকগুলি দেশকে দিয়ে বহন করানো; যে ছল ও বল প্রত্যেক সভ্য সমাজের একভাগ লোক অন্য ভাগের উপর প্রয়োগ করতো, সেই ছল ও বল আন্তর্জাতিক ব্যাপারে নিরপেক্ষ ভাবে মনুষ্যসমাজের একভাগের উপর প্রয়োগ করতে বাধ্য করা।

যাযাবর মানুষের সঙ্গে স্থিতিশীল কৃষিসভ্যতার সংঘর্ষের কাহিনী মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে একটা বড় অধ্যায় জুড়ে রয়েছে। এই সংঘর্ষেই রোমান সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে, গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে, বাগ্‌দাদের মুসলিম সভ্যতার বিলোপ ঘটেছে। ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম্ সেই সংঘর্ষেরই এক সৃষ্টি। চাষের পরিশ্রম অস্বীকার করে' এই চাষীর পরিশ্রমের ফল লুটতে চায়। যে ধনিক ও ধনীরা এতে চালনা করছে, তারাও মুখ্যত যাযাবর। এক দেশ থেকে অন্য দেশে, পৃথিবীর এক ভাগ থেকে অন্য ভাগে প্রয়োজনমত চলে বেড়াতে তাদের কিছুতেই বাধা নেই। এবং এর এক হাতে বিনিময়ের মাটকারা থাকলেও অন্য হাতে যাযাবরের শাণিত অস্ত্র বাহাল রয়েছে।

সভ্যতার যা সমস্যা, ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম্ তার মীমাংসা নয়; কারণ ও ব্যবস্থা মানুষের সমাজকে এক করে' দেখে না এবং দেখতে পারে না। মানুষের এক অংশকে ভারবাহীতে পরিণত না করে', সভ্যতাকে কেমন করে' বাঁচান ও বাড়ান যায় সমস্ত মানবসমাজের পক্ষ থেকে ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌মের এর কোনও উত্তর নেই। মানুষের সভ্যতার চরম সমস্যা হচ্ছে চাষী। যেদিন চাষীকে সভ্যতার ভারবাহীমাত্র না রেখে, ফলভোগী করা সম্ভব হবে, কেবল সেই দিন সভ্যতার সমস্যার যথার্থ মীমাংসা হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে প্রমাণ হবে গ্রীকপণ্ডিতদের কথাই সত্য,—দাসের শ্রম ভিন্ন সভ্যতার চাকা অচল।

"নতুন পত্র"

"মানুষের সত্যরূপ" —রবীন্দ্রনাথ

কোন্‌খানে মানুষের শেষ কথা। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ, বাহ্য প্রকৃতির তথ্য-রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে আত্মার চরম সম্বন্ধে নিয়ে যায়—যা সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ, কল্যাণের সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ তারই মধ্যে। সেখানেই মানুষের সৃষ্টির রাজ্য। সেখানে প্রত্যেক মানুষ আপন অসীম গৌরবলাভ করে, সেখানে প্রত্যেক মানুষের জন্য সমগ্র মানুষের তপস্যা।

সেখানে মহাসাধকেরা সাধন করেছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে, মহাবীরেরা প্রাণ দিয়েছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে, মহাজ্ঞানীরা জ্ঞান এনেছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে। যেখানে একজন ধনী দশজনকে শোষণ করেছে, যেখানে হাজার হাজার মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে হরণ ক'রে একজন শক্তিশালী হচ্ছে, যেখানে বহু লোকের ক্ষুধার অন্ন একজন লোকের ভোগবাহুল্যে পরিণত হচ্ছে, সেখানে মানুষের সত্যরূপ, শান্তিরূপ আপন সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পেল না।

(সৃষ্টি, ১৩৩০)

স্মৃতিকণা

(শরৎচন্দ্র)

যোগেশচন্দ্র মজুমদার

[শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে চল্লিশ বছরেরও পূর্বে ভাগলপুরে যে সাহিত্যিক-গোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল এই প্রবন্ধের লেখক তারই অন্যতম সভ্য ছিলেন। এঁদের হাতে-লেখা পত্রিকা 'ছায়া'র তিনি যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। লেখা বাছাই করার কাজে অল্প বয়সেই এঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখা গিয়েছিল। বর্তমান প্রবন্ধে তিনি শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে তাঁদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ও ঘনিষ্ঠতার যে চিত্র দিয়েছেন তা থেকে তাঁর পরিচয় পাওয়া যাবে। —যু. স.]

কিঞ্চিদধিক চল্লিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গ-সাহিত্য প্রাঙ্গণে শরৎচন্দ্র অপ্রত্যাশিতভাবে আবির্ভূত হইয়া কথা-সাহিত্যিকদিগের মুকুটমণি-রূপে দেবী ভারতীর আসরে যে স্থানটি অধিকার করিয়া বিপুল সমাদর ও খ্যাতি অর্জন করেন সে কথার উল্লেখ বাহুল্য। তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার দ্যুতি আজিও সমভাবে ভাস্বর ও দীপ্তিশীল এবং একথা বোধকরি নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে উহা বহুকাল পর্যন্ত বিদগ্ধজনের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিবে।

শরৎচন্দ্রের তিরোভাবের অব্যবহিত কাল পরেই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া ভাগলপুরে যে সাহিত্য-গোষ্ঠী গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মধ্যে আমি ব্যতীত সকল সভ্যই শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মাসিক পত্রিকা ও অন্যত্র বিবৃত করিয়াছিলেন। আমার নিস্তব্ধতা দেখিয়া বন্ধুবান্ধব অনেকেই এ সম্বন্ধে অনুযোগ করিয়াছিলেন কিন্তু সে সময়ে কয়েকটি অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আমার মনের অবস্থা এরূপ হয় যে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছুই লিখিয়া উঠা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

পরে যদিও এক একবার ইচ্ছা হইয়াছিল যে শরৎচন্দ্রের সহিত সাহিত্যকে উপলক্ষ্য করিয়া কিশোরকালে আমাদের যে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে আমাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টা যে কিরূপ অগ্রগতি লাভ করে, সে সম্বন্ধে কিছু লিখিব—কিন্তু যখন দেখিলাম বন্ধুবান্ধবেরা অনেকেই সে কথা অল্পবিস্তর বিবৃত করিয়াছেন তখন উহা হইতে বিরত ছিলাম। শরৎচন্দ্রের সহিত আমার যে ব্যক্তিগত পরিচয়, পরে যাহা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল, তাহার কথা একান্ত নিজস্ববোধে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্মৃতি ভাণ্ডারে অক্ষয় হইয়া থাকিবে—এই কথাই মনে হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি শরৎচন্দ্রের একজন নিকট আত্মীয় এবং আমারও পরম স্নেহভাজন পাত্র ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট হইতে এমন একটি প্রীতিস্নিগ্ধ আবেদন আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে উহা আমার পক্ষে উপেক্ষা করা কঠিন বোধ হইতেছে। অল্প বয়সে আমার সহিত শরৎচন্দ্রের যে পরিচয় ঘটে, তাহার কথা ও পরে আমাদের মধ্যে ভাগলপুরে যে সাহিত্য-গোষ্ঠী স্থাপিত হয় তাহার বিবরণ জানিবার জন্য তাঁহারা একান্ত আগ্রহশীল। আমি জীবনের শেষ প্রান্ত সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি বলিলেই চলে, দীর্ঘ কালের ব্যবধানে অনেক ঘটনাই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, তবে যাহা কিছু মনে আছে এবং দিনলিপির (যাহা সেই সময় রক্ষা করিতাম) সাহায্যে নিতান্তই সাদাসিধা ভাবে কিছু লিখিবার চেষ্টা করিব। ইহা যদি আমার স্নেহভাজনদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারে তবে তাহা নিতান্ত সুখের বিষয় হইবে।

বহু বৎসরের দিনলিপি-গুলি এখনও আমার নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে। বিশদ করিয়া কিছু লিখিতাম না, দৈনন্দিন প্রধান ঘটনাগুলি সামান্য মন্তব্যের সহিত টুকিয়া

রাখিতাম মাত্র। ১৮৯৮ সালের দিনলিপিতে দেখিতেছি ১৪ই মার্চ (১লা চৈত্র ১৩০৪) শরৎচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম পরিচয় ঘটে এবং তাহা এক অপূর্ব পরিবেশের মধ্যে। যে দিনটির কথা উল্লেখ করিলাম, সেই দিনটি ছিল সোমবার। দুই দিন পূর্বে প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। কয়মাস কঠিন পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ ও উদ্বেগের পর আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছি। সহপাঠিদের মধ্যে ছিলেন শরৎচন্দ্রের দুই মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সতীশচন্দ্র মিত্র (সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার শিশির কুমার মিত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) প্রভৃতি। আমার বয়স তখন সাড়ে পনর। সতীশচন্দ্র, গিরীন্দ্রনাথ ও আমি প্রায় সমবয়সী ছিলাম। সুরেন্দ্রনাথ কিছু বড় ছিলেন। শরৎচন্দ্র আমা অপেক্ষা ঠিক ছয় বৎসরের বড় ছিলেন।

স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে আমার ও সতীশের সহর ছাড়িয়া বাহিরে বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা জাগিত, ছুটীর দিনে বাড়ীতে বসিয়া থাকা আদৌ ভাল লাগিত না। ভাগলপুরের উপকণ্ঠে অথবা কিছু দূরে যে সব দ্রষ্টব্য স্থান ছিল তাহাই আমাদের আকৃষ্ট করিত। চম্পানগর, সাবোর ও কোম্পানির (ট্যানিসিপ্যালিটির) বাগান ও তাহার সন্মুখবর্তী সুবৃহৎ প্রাসাদসদৃশ টিলা-কুঠি (Cleveland House), ইংরাজদের সমাধি-ভূমি, সাহাঙ্গী নামক সুবৃহৎ সরোবর, গুফ্‌ফা প্রভৃতি বেড়াইবার কয়েকটি স্থান ছিল।

এই কোম্পানি বাগানের আকর্ষণ ছিল একটি সুবৃহৎ বৃক্ষ। তাহাকে বনস্পতি বলিলেই হয়, উচ্চতায় বোধ করি একশত ফুটেরও উপর হইবে। ইহার নিম্নতম একটি ক্ষীণ শাখা ধরিয়া সামান্য নাড়া দিলেই বৃক্ষটির নিম্নভাগ হইতে শীর্ষ দেশ পর্য্যন্ত সমগ্র শাখা প্রশাখা ও পত্রগুলি পর্য্যন্ত থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিত। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। যতদূর মনে পড়ে, গাছটিতে ফুল বা ফল কিছুই হইত না। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার এক ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখ করেন যে আবুল ফজল তাঁহার বিরচিত আকবরনামায় কাশ্মীরেও এইরূপ একটি গাছের কথা লিপিবদ্ধ করেন। সারা ভারতবর্ষে ভাগলপুর ভিন্ন অন্যত্র কোথাও এইরূপ বৃক্ষের অস্তিত্ব ছিল না। মনে হয় পারস্য দেশ হইতে ইহা আনীত হইয়া থাকিবে। ইহার নাম ছিল "দল-দল" বা "হল-ডল"। কাশ্মীরের গাছটি এখনও জীবিত আছে কি না জানি না, তবে আমাদের বাল্যস্মৃতি জড়িত এই গাছটি এখন আর জীবিত নাই।

আর একটি আকর্ষণীয় স্থান ছিল বিখ্যাত 'গুফ্‌ফা'। গুফ্‌ফা শব্দটি সম্ভবতঃ বৌদ্ধ "গোম্পা" শব্দের অপভ্রংশ। ইহা ভূগর্ভস্থ গুহা, পর্ব্বতস্থ গুহা হইতে ভিন্ন প্রকারের। ভাগলপুরের উপকণ্ঠে ভাগীরথীতীরে "বাধারী" গ্রামের নিকট ইহা অবস্থিত।

যে দিনটির কথা উল্লেখ করিয়াছি, সতীশ ও আমি স্থির করি যে মাধ্যাহ্নিক আহারের পর উভয়ে গুফ্‌ফা দেখিয়া সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিব। পথে বাহির হইয়া মনে হইল সুরেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথকে সহযাত্রী করিয়া লইলে মন্দ হয় না, তাহাতে অবশ্যই পথশ্রম লাঘব হইবে। তাঁহাদের বাঙালীটোলার বাড়ী গিয়া, তাঁহাদের উভয়কে সহযাত্রী করিয়া লওয়া হইল। পথে আর একজনেরও সন্ধান মিলিল। সুরেন্দ্রনাথ অথবা গিরীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করিলেন যে, খঞ্জরপুরস্থ তাঁহাদের একটি আত্মীয়কে সঙ্গী করিয়া লইলে দিনটি সুন্দর কাটিবে কারণ আত্মীয়টি পরিহাসরসিক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। আত্মীয়টি বয়োজ্যেষ্ঠ জানিয়া সতীশ ও আমি অল্প আপত্তি জানাই কিন্তু পরে তাঁহাদের প্রস্তাবেই সম্মত হই।

সদর রাস্তা ছাড়িয়া খঞ্জরপুরে পল্লীর একটি নাতি প্রশস্ত গলির পথ ধরিলাম এবং অল্প পরেই নিতান্ত সাদা-সিধা একটি ছোট খাপরার বাড়ীর সম্মুখে আসিলাম। বাড়ীটির দাওয়ায় দেখিলাম একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি বসিয়া কি যেন লেখা-পড়ার কাজ করিতেছিলেন। পরে জানিয়াছিলাম তিনিই শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। সঙ্গীদ্বয়ের সহিত তাঁহার কিছু কথার আদান প্রদান হইল, পরে তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে "শরৎ" "শরৎ" বলিয়া ডাক দিলেন এবং অবিলম্বে একজন যুবক বার-প্রান্তে

আসিয়া দাঁড়াইলেন। এইরূপ বয়োজ্যেষ্ঠকে নাম ধরিয়া ডাকিতে সতীশ ও আমি একটু বিস্ময় বোধ করি নাই তাহা নহে, পরে অবশ্য তাঁহাদের সম্পর্ক জানিতে পারিয়াছিলাম।

শরৎচন্দ্রের নিত্যসঙ্গী সাধারণ বেশ-ভূষা, কোনও পারিপাট্য নাই। মুখে হাসিখুসীর ভাব। হঠাৎ আমাদের দেখিয়া তিনি যে বিস্মিত হইয়াছিলেন তাহা বুঝা গেল। মৃদু হাসিয়া তদানীন্তন একজন প্রসিদ্ধ কবির একটি কবিতার চরণ আবৃত্তি করিয়া আমাদের সাদর-আহ্বান জানাইলেন। এইরূপ দলবল লইয়া আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য জানিবার আগ্রহও প্রকাশ করিলেন। আমাদের বক্তব্য শেষ হইলে তিনি বস্ত্রাদি পরিবর্তন না করিয়াই বাড়ীর ভিতর হইতে সামান্য একখানি উড়ানি চাদর লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন উড়ানি চাদর লইয়া বাহির হওয়া প্রথা ছিল। এখন হয়ত উহা আশ্চর্য্য ঠেকিবে।

পথে বাহির হইয়া অল্পক্ষণের ভিতরই শরৎচন্দ্রের প্রখর বুদ্ধি, কথা বলিবার অপরূপ ভঙ্গী এবং সামান্য বিষয় লইয়াও আশ্চর্যরূপ কৌতুক করিবার ক্ষমতার মুহূর্তে মুহূর্তে পরিচয় পাইয়া সতীশচন্দ্র ও আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও একদিনের পরিচয়েই তিনি আমাদের দুই জনের সহিত সমবয়সীর মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এইরূপ অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে এই প্রথম।

এই প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন যুবকটির নিজ অভিজ্ঞতা লব্ধ ও বহুদিন সঞ্চিত নানা কৌতুককর ঘটনার কথা শুনিতে শুনিতে আমরা অগ্রসর হইতেছিলাম। আমাদের হাস্য পরিহাসে পথটি মুখর হইয়া উঠিয়াছিল এবং কোন্ ফাঁকে যে তাহা শেষ হইল বুঝিতে পারি নাই। হঠাৎ দেখিলাম আমরা ভাগীরথীতীরে Water Works ও তাহার সংলগ্ন Reservoirগুলির সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সম্মুখে ভাগীরথীর উদার বিস্তৃতি—সেই নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখিয়া আমাদের প্রাণ যেন জুড়াইয়া গেল।

ভাগলপুরে উত্তরবাহিনী গঙ্গার প্রসার সেই সময় এই স্থানে প্রায় সাত মাইলের মত ছিল। স্বচ্ছ সুবিস্তীর্ণ জলরাশি দিক্‌চক্রবালে মিলিয়াছে। গঙ্গার এইরূপ বিস্তৃতি আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এইস্থান হইতে শীতের সময় হিমালয়ের কয়েকটি তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতচূড়া নয়নগোচর হয়। স্থানীয় লোকেরা তাহাকে মহাদেবের জটার ন্যায় বলিয়া উল্লেখ করে। ইহার অনতিদূরেই আমাদের অভীষ্টস্থান গুপ্তগুহা অবস্থিত।

Water Works দেখা শেষ হইল। এবার আমরা গুহার মুখে আসিয়া পৌঁছিলাম। সম্মুখেই ইট ও পাথর নির্ম্মিত একটি স্বল্পায়তন প্রাচীর, উহার শীর্ষদেশে একটি প্রস্তর ফলকে Sandes নামক এক ইংরাজ রাজকর্মচারীর নাম ও যে বৎসর ওই প্রাচীর স্থাপিত হয় তাহা উৎকীর্ণ ছিল।* মনে হয়, উহা সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেকার ঘটনা।

গুহায় প্রবেশের দুইটি পথ, একটি দক্ষিণে ও অপরটি বামে। কোনটি ধরিয়া অগ্রসর হওয়া সমীচীন হইবে ইহার গবেষণা হইল। বাম দিকের পথটি অপেক্ষাকৃত সহজ, দক্ষিণ দিকের পথটিতে গুহার প্রবেশ দ্বার হইতে কিয়দংশ Spiral সিঁড়ির মত ছিল। এই পথে অত্যন্ত সাবধানে যাওয়া প্রয়োজন, ভার-সাম্য রাখিতে না পারিলে দশ-বারো ফুট নিম্নে পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা।

আমরা সহজ পথটি বাছিয়া লইলাম। অযথা বিপদের মধ্যে যাইয়া কি লাভ। শরৎচন্দ্র এই প্রস্তাবে অনভিমত প্রকাশ করিলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে সাবধানে যাইতে পারিলে ভয়ের কোনও কারণ নাই। আমাদের নিকট মোমবাতি ছিল (Torchএর তখন চলন হয় নাই) তাহা জ্বালান হইল এবং আমরা শরৎচন্দ্রকে অগ্রগামী করিয়া সেই ঘুরান সিঁড়ি পথ ধরিয়া অতি সন্তর্পণে গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। অল্প কিছুক্ষণ পরে সিঁড়ি পথ হইতে সমতল ভূমি পাইলাম। বুঝা গেল গুহার ভিতর দাঁড়াইয়া থাকিবার উপায় নাই। যথেষ্ট হেঁট হইয়া চলিতে হয় ও অল্প পরিশ্রমেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়।

যে সুড়ঙ্গটি ধরিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছিলাম, দেখিলাম উহা শেষ হইয়া একটি গোলাকার কক্ষে

মিশিয়াছে, কক্ষটির ছাদ অপেক্ষাকৃত উঁচু, বেশ দাঁড়াইতে পারা গেল। মোমবাতির ক্ষীণ আলোকে দেখিলাম কক্ষটির বিভিন্ন দিক হইতে নানা সুড়ঙ্গ আসিয়া মিশিয়াছে, অনেকটা গোলক ধাঁধার মত। ইহাদের ভিতর কোনটি সহজগম্য হইবে আমরা এইরূপ আলোচনা করিতেছিলাম ইতিমধ্যে দেখা গেল শরৎচন্দ্র একটি সুড়ঙ্গ ধরিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। সুড়ঙ্গের ভিতর হইতে তিনি আমাদের আহ্বান জানাইলেন। আমরা আর চিন্তা না করিয়াই তাঁহার অনুগমন করিলাম।

ইহার পূর্ব্বেও গুহা দেখিতে গিয়াছি, কিন্তু ওই কক্ষটি পর্য্যন্তই দেখা হইয়াছিল। সাহস করিয়া ইহার বেশী অগ্রসর হইতে পারি নাই। এবার শরৎচন্দ্রকে সঙ্গী পাওয়ায় মনে হইল, হয়ত সমস্ত গুহাটি দেখিয়া যাওয়া সম্ভব হইবে।

অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ ধরিয়া আমরা অগ্রসর হইয়া চলিলাম। মাঝে মাঝে কয়েকটি গোলাকার কক্ষ আসিল, সেগুলি অতিক্রম করিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম সুড়ঙ্গের উচ্চতা ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল; শেষে বুকে হাঁটিয়া অগ্রসর হওয়া ভিন্ন উপায় রহিল না। মনে হইতে লাগিল নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে, বাধ্য হইয়া এক স্থানে আমরা বসিয়া পড়িলাম। গুহাগাত্র ও তলদেশ বেশ আর্দ্র বলিয়া মনে হইল।

হঠাৎ দেখিলাম শরৎচন্দ্র আমাদের মধ্যে নাই। তিনি অদৃশ্য হইয়াছেন। সুড়ঙ্গের সুদূর প্রান্ত হইতে একবার তাঁহার ক্ষীণ আহ্বানধ্বনি কাণে আসিয়া পৌঁছিল, কিন্তু আর অগ্রসর হইতে সাহসে কুলাইল না।

অনেকক্ষণ পরে শরৎচন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন। তিনি অক্ষত দেহে ফিরিয়াছেন দেখিয়া আমরা পরম নিশ্চিন্ত হইলাম। মোমবাতির ক্ষীণ আলোকে দেখিতে পাইলাম তাঁহার পৃষ্ঠ বস্ত্র ও পৃষ্ঠদেশ ঘন কর্দ্দমে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহাতে অনুমান করিতে পারিলাম যে সুড়ঙ্গটি যে স্থানে গঙ্গাগর্ভে গিয়া মিশিয়াছে তিনি সেই পর্য্যন্ত গিয়াই ফিরিয়াছেন। গুহাটি ও তাহার বিভিন্ন পথগুলি যে তাঁহার নখ দর্পণে ছিল ইহা স্পষ্টই অনুমান করিতে পারিলাম।

ফিরিবার পথে শরৎচন্দ্র গুহা সম্পর্কেও কিছু ভীতিপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করিলেন। কখনও কখনও খুনী আসামী ও দুর্বৃত্তেরা উহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিত ও নিরীহ দর্শকদিগকে তাড়না করিতে কুণ্ঠিত হইত না। একবার নাকি একটি ব্যাঘ্রও গুহাতে প্রবেশ করে ও গুহাগাত্রে নখের আঁচড় রাখিয়া যায়। কিশোর বয়সে এই কাহিনীগুলি আমাদের মনে যথেষ্ট আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছিল। হয়তো কাহিনীগুলি পূর্ব্বে শুনিলে সেদিন গুহা দেখাই সম্ভব হইত না। ইহার পরে গুহা দেখিতে গিয়াছি এবং তখন বুঝিয়াছি শরৎচন্দ্র বর্ণিত ঘটনাগুলি অতিরঞ্জিত নহে, উহা তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ।

এবার প্রত্যাবর্ত্তনের পালা।

গুহা ছাড়িয়া বড় রাস্তার দিকে যাওয়া স্থির হইল। ইহা শরৎচন্দ্রের মনঃপূত হইল না। তিনি বলিলেন নিকটে আরও কয়েকটি গুহা আছে সেগুলি দেখিয়া ফিরিলে বিশেষ বিলম্ব হইবে না। এইরূপ কোনও গুহার অস্তিত্বের কথা অপর কাহারও নিকট শুনি নাই, সকলেই যথেষ্ট বিস্ময় বোধ করিলাম। অনতিদূরে গঙ্গার পাড়, আমরা সেইদিকে অগ্রসর হইলাম। অ-সমতল ভূমি চারি ধার ঝোপ ঝাড়ে অকীর্ণ। আমরা একটি বৃহদাকার ঝোপের নিকট পৌঁছিলাম।

শরৎচন্দ্র বলিলেন, উহার অন্তরালে একটি গুহা মুখ আছে; গুহাটি বিশেষ বড় নয় শীঘ্রই ফিরিয়া আসা যাইবে।

বাহির হইতে গুহাটিকে ভগ্ন ও জীর্ণ বোধ হইল। মনে হইল ভিতরে মৌচাক অথবা ভীমরুলের চাক থাকা এবং সর্পের সাক্ষাৎ পাওয়া বিচিত্র নয়। ভিতরে প্রবেশ করিতে আমাদের বিশেষ উৎসাহ বোধ হইল না; কিন্তু আমাদের নিরুৎসাহ শরৎচন্দ্রকে মত পরিবর্ত্তন করাইল না, তিনি গুহায় প্রবেশ করিলেন।

গুহাটি সত্যই বড় ছিল না। অল্প পরেই শরৎচন্দ্র

গুহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার আকৃতিতে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। মাথা, দাড়ি-গোঁফ মাকড়সার জালে ও শুষ্ক পত্রে আচ্ছন্ন, তাঁহাকে চিনিয়া উঠাই কষ্টকর! এই ঋষিসুলভ মূর্ত্তি দেখিয়া হাস্য সংবরণ করা কঠিন। তাঁহার দুই মাতুল এই অদ্ভুত রূপ-সজ্জা লইয়া তাঁহাকে প্রচুর বিদ্রূপ করিলেন।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু এই দুঃসাহসী যুবকটির বাড়ী ফিরিবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। তিনি কাছাকাছি আর একটি দ্রষ্টব্য স্থানের কথা বলিলেন এবং তাহা দেখিয়া বাড়ী ফেরার পথ ধরিবেন এইরূপ আশ্বাস দিলেন। আমাদের আপত্তি বা অসম্মতিতে বিশেষ কোনও ফল হইবে না বুঝিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলাম।

অনতিকাল পরে আমরা গঙ্গাগর্ভে আসিয়া পৌঁছিলাম, সম্মুখেই একটি চড়া, তাহার মধ্য দিয়া খাড়ির মত একটি ছোট খাল বহিয়া গিয়াছে, খালের ধারেই খানিকটা জায়গা জুড়িয়া চোরাবালি। সতীশ ও আমি পূর্ব্বে চোরাবালি দেখি নাই। আমরা উভয়ে এই চোরাবালির উপর লাফ দিয়া চলিতেছিলাম। শরৎচন্দ্র আমাদের সতর্ক করিয়া দিলেন—বলিলেন, যদি একবার পা উহার ভিতর বসিয়া যায়, আর তুলিতে পারা যাইবে না, এমনকি হাতীও চোরাবালিতে পড়িলে তাহাকে পরিত্রাণ করা শক্ত।

খাল পার হইয়া আমরা যে স্থানটিতে উপস্থিত হইলাম তাহা অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। মনে হইল, ইহার চেয়ে গুহার অন্ধকার বহু পরিমাণে সুখকর ছিল। চাহিয়া দেখিলাম ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য নরকঙ্কাল, অর্দ্ধদগ্ধ অস্থি, অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ ও অঙ্গারে স্থানটি সমাকীর্ণ। বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে একটি সুবিস্তীর্ণ শ্মশান ক্ষেত্রের মধ্যভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। ইহার পূর্ব্বে শ্মশান ক্ষেত্র দূর হইতে দেখিয়াছি মাত্র, ইহার মধ্যে প্রবেশ করার প্রয়োজন হয় নাই। চারিদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। সেই অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারের ভিতর নরকঙ্কাল, অস্থি প্রভৃতির সংস্পর্শ বাঁচাইয়া চলিতেছিলাম। বুকের ভিতর যেন আতঙ্ক জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল—সেই দৃশ্য যেন আজিও চোখের উপর ভাসিয়া উঠে। মৃত্যুদেবতার এই ভীষণ ও ভয়াবহ রূপের সহিত আমাদের সহযাত্রীটির আমাদের সেই কিশোর বয়সে পরিচয় স্থাপনা করার আগ্রহের কারণ বুঝিতে পারি নাই।

আমরা বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। মনে হইতে লাগিল এই স্থানে না আসাই ভাল ছিল। সেই নির্জ্জন নদীগর্ভে অন্ধকার তখন গাঢ় হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মনে হইল, আর বিলম্ব করিলে এই শ্মশান-ভূমি পার হওয়া কঠিন হইবে। কিন্তু শরৎচন্দ্রকে কিছুমাত্র চিন্তিত বোধ হইল না। তিনি পরম নিশ্চিন্ত—পরম নির্বিকার!

পরবর্ত্তীকালে 'শ্রীকান্তে' শরৎচন্দ্র শ্মশানের যে ভীষণ মধুর চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা যখন পড়িবার সৌভাগ্য হয় তখন মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারি নাই। উহার উৎস যে কোথায় তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারি।

তখনও শরৎচন্দ্রের দ্রষ্টব্য স্থান দেখার ইচ্ছার পরিসমাপ্তি ঘটে নাই!

শ্মশান-ভূমি পার হইয়া যে স্থানটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম তাহা বনুনিয়া নামক পার্ব্বত্য নদী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল। এই ক্ষীণকায়া নদীটি তখন ভাগলপুর শহরের পাশ দিয়া প্রবাহিত ছিল। শীতের সময় ইহাতে জল থাকিত না, বর্ষায় ইহা বিপুলকায়া হইয়া উঠিত। এই নদীটির তীর ধরিয়া সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে আমরা শরৎচন্দ্রকে অনুসরণ করিতেছিলাম। নদীর উচ্চ পাড়ে, অসমতল ও অপরিচিত পথে অগ্রসর হওয়া বিশেষ কষ্টকর বোধ হইতেছিল। নদীর পাড়ে ইতস্ততঃ ঝাউ গাছের ঝোপ, কোথাও কোথাও তাহা শ্রেণীবদ্ধ। আমরা একটি শ্রেণীবদ্ধ ঝাউ-ঝোপের নিকট উপস্থিত হইলাম।

শরৎচন্দ্র ভারি খুশী। তিনি নানাবিধ বাকালাপ করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় জানিতে পারিলাম এই মনোরম স্থানটিতে তিনি সঙ্গীদের লইয়া আদমপুর

ঘাট হইতে নৌকা ভ্রমণে প্রায়ই আসিয়া থাকেন। মাছ ধরার কথা অবশ্য তখন তাঁহার কাছে শুনি নাই। উত্তরকালে যখন "শ্রীকান্ত" পড়িবার সুযোগ হয় তখন বুঝিতে কষ্ট হয় নাই যে তাঁহার কৈশোরের ও প্রথম যৌবনের লীলাভূমিটি আমাদের দেখাইবার জন্য তিনি সেদিন কত ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

নদী তীর ধরিয়া ফিরিলে শীঘ্র পৌঁছান যাইবে শরৎচন্দ্র এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন। অতএব, অনিচ্ছা সত্ত্বেও নদীতীর ধরিয়াই আমাদের অগ্রসর হইতে হইল। সম্ভবতঃ পথশ্রম লাঘব করিবার জন্যই তিনি তাঁহার দুই মাতুলের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার অনেক কথা উল্লেখ করিয়া কৌতুক সৃষ্টি করিলেন। গিরীন্দ্রনাথের লক্ষ্ণৌ থাকার লেখা একটি গল্পের কথা উত্থাপিত হইল গিরীন্দ্রনাথ গল্পটির কি নাম দিয়াছিলেন এখন স্মরণ নাই, তবে সেই নামটি লইয়াই কৌতুককর মন্তব্য করায় গিরীন্দ্রনাথকে খুব বিব্রত বোধ হইয়াছিল।

তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। আমরা খড়দহ ঘাট ও কয়লাঘাট অতিক্রম করিয়া আদমপুর ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। সতীশচন্দ্রের ও আমার বাড়ী নিকটেই, আমরা নদীতীর ছাড়িয়া বড় রাস্তা ধরিলাম। শরৎচন্দ্র ও তাঁহার দুই মাতুল নদীতীর ধরিয়াই বাঙ্গালীটোলা ঘাটের দিকে অগ্রসর হইলেন। (ক্রমশঃ)

"বাংলা ভাষা ও ভারতের ঐক্য" —রবীন্দ্রনাথ

বাল্যকালে এমন আলোচনাও আমি শুনেছি যে, বাঙালী যে বঙ্গভাষার চর্চায় মন দিয়েছে এতে করে ভারতীয় ঐক্যের অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ, ভাষার শক্তি বাড়তে থাকলে তার দৃঢ় বন্ধনকে শিথিল করা কঠিন হয়। তখনকার দিনে বঙ্গসাহিত্য যদি উৎকর্ষ লাভ না করত তবে আজকে হয়ত তার প্রতি মমতা ছেড়ে দিয়ে আমরা নির্বিকার চিত্তে কোনো একটি সাধারণ ভাষা গ্রহণ করে বসতাম। কিন্তু, ভাষা জিনিষের জীবনধর্ম আছে, তাকে ছাঁচে ঢেলে কলে ফেলে ফরমাশে গড়া যায় না। তার নিয়মকে স্বীকার করে নিয়ে তবেই তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়। তার বিরুদ্ধগামী হ'লে সে বন্ধ্যা হয়।.....

আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা যেমন মাতৃক্রোড়ে জন্মেছি তেমনি মাতৃ-ভাষার ক্রোড়ে আমাদের জন্ম, এই উভয় জননীই আমাদের পক্ষে সত্য ও অপরিহার্য।.....

সুতরাং প্রত্যেক দেশ যখন তার স্বকীয় ভাষাতে পূর্ণতালাভ করবে তখনই অন্য দেশের ভাষার সঙ্গে তার সত্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবে। ভাষার এই সহযোগিতায় প্রত্যেক জাতির সাহিত্য উজ্জ্বলতর হয়ে প্রকাশমান হবার সুযোগ পায়। (সভাপতির অভিভাষণ, ১৩৩০)

তাঁবু বয়ে

বন্ধু দে

দুইদিকে বন, মাঝে ঝিকিমিকি পথ
এঁকে বেঁকে চলে প্রকৃতির তালে তালে।
রাতের আলোয় থেকে থেকে জ্বলে' চোখ,
নেচে লাফ দেয় কচি কচি খরগোস।

নিটোল টিলার পলাশের ঝোপে দেখেছি
হঠাৎ পুলকে বনময়ূরের কপক,
তাঁবুর ছায়ায় নদীর সোনালি সেতারে
মিলিয়েছি তার সুষমা।

চুপি চুপি আসে নদীর কিনারে, জল খায় :
শুনেছি সিদ্ধু মুনির হরিণ আহ্বান।
চিতা চলে গেল লুব্ধ হিংস্র ছন্দে
বন্য প্রাণের কথাকলি বেগ জাগিয়ে।

কোথায় সে-বন, বসতিও কই বসেনি,
শুধু প্রান্তর, শুকনো হাওয়ার হাহাকার।
জঙ্গল সাফ, গ্রাম মরে গেছে, শহরের
পত্তন নেই, ময়ূর মরেছে পণ্যে।

কেন এই দেশে মানুষ মৌন অসহায় ?
কেন নদী গাছ পাহাড় এমন গৌণ ?
সারা দেশময় তাঁবু বয়ে, কতো ঘুরবো ?
পরবাসী কবে নিজ বাসভূমি গড়বে ?

পৃথিবী নিষ্ঠুর যদি

আবুল কাশেম রফিউদ্দীন

ঘুমন্ত শিশুর মুখে চোখের আলেয়া সারারাত
আর বুলিয়ো না ; ওর—ভাঙা খেলনার মতো তোমার ও-হাত
এবার সরিয়ে নাও। ওকে জাগিও না, ও ঘুমাক—
সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে স্বপ্নে ডুবে যাক,
সেখানে হয়তো কিছু আছে
যা' পায় না আমাদের কাছে !

উঠে এসো, বসো অন্ধকারে,
মুক্তামতী গঙ্গার জোয়ারে
বিসর্জন দাও তুমি করুণার প্রতিমা হৃদয় !
নতুবা কেমন ক'রে তুমি হবে প্রভাতে নির্দয়—
যখন শিউলি ঝরবে শিশুর কান্নায়,
পাখির ডানায়
শিশুর ক্ষুধার মতো রক্তবর্ণ আলোর নাচন
সুরু হবে, হাওয়ার মাতন
দিশাহারা
বিলাপের ভগ্নসুরে কাশবনে বাজাবে একতারা !
কি ক'রে সইবে তুমি বঞ্চনার রূপসী এ-দিন
আশার ফানুস যা'র চটুল কটাক্ষে উদাসীন !

এখন কি মধ্যরাত ? এসো তবু ধৈর্যের অতসী
কিছুক্ষণ কাছাকাছি বসি।
এ-রাতে কি লাভ বলো
ছলো ছলো
ঘটায় আকাশে ছুঁড়ে চোখের বিস্ময় !
তারাদের অহল্যা হৃদয়
টলবে না ; বোবা শূন্যে সান্ত্বনা কোথায় !

এখনো ঘুমিয়ে শিশু, পাখির গলায়
ওর সে-কাতর কণ্ঠ প্রতিধ্বনি তোলেনি এখনো,
তাই বলি শোন :
কাছে এসো, তোমার উত্তপ্ত শ্বাস দাও
আমার বুকের তাপ তোমার তুহিন বুকে নাও,
মায়ার মৌচাক
জ্বলে যাক
জ্বলে যাক এ-রাতের অশ্রুমতী নদী !
পৃথিবী নিষ্ঠুর যদি—
কিরাত নন্দিনী জাগো, হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে তার—
তোমার ধনুকে তোলো নির্দয় টঙ্কার !

ঘুম

হোয়ান র‍্যামন হিমেনেৎ

দীর্ঘ স্নিগ্ধ নৃতি সান্ত্বনার। যেন ভোর
অন্তহীন শোকের সাগরে।
আঘ্রাণে পবিত্র তুমি শান্তির বকুল,
ঐশ্বরিক পুরস্কার শোকের প্রহরে।
স্বর্গীয় ফুলের এক দীর্ঘ স্তম্ভের মতন
সৌন্দর্যে আবছা দৈর্ঘ ক্রমেই তোমার,
তুচ্ছ ধূলি ঝেড়ে আমি হয়েছি মহান
যখন ফেরালে মুখ প্রত্যাশে আমার।

তোমার বাহুর ভোর : অপাপবিদ্ধ সে শুচি,
তোমার বুকের স্বচ্ছ নীড়ের আশ্রয়ে
আমি এ বন্দীশালায় কত মুক্ত বুঝি!
বিক্ষত আমার চিত্ত কতখানি কৃতজ্ঞ, বাথায়;
যে-বাথা দিয়েছো তুমি হেসে
চুম্বনের উত্তপ্ত জ্বালায়।

শবরী

উৎপলা মুখোপাধ্যায়

এখনো অর্জুন গাছ কী আশায় ক্লান্তির মিনারে
শরতের শেষ সোনা ফুলের বিবর্ণ প্রতীক্ষায়
ধরে আছে ; দিকে দিকে তালভঙ্গ উর্বশী ছায়ায়
ঊর্ধ্বমুখ তৃণে তৃণে হেমন্তের আসন্ন নূপুর
বাজায় অব্যক্ত ব্যথা ; দিগন্তের অবয়ব জুড়ে
করুণ প্রকৃতি। এই পথধূলি, অরণ্য, আকাশ
তোমারই পরশ চায় ; ক্লান্ত পাখি ব্যর্থ ডানা ঝাড়ে
স্বপ্নহীন শূন্য নীড়ে ! বীথিকার পথ চাওয়া মন
হাওয়ার বেহালা হয়ে মাথা পৌঁড়ে অবুঝের মতো।

সময়ের আয়ু কমে, সূর্যে নামে গৈরিক প্রহর,
তোমার পায়ের শব্দ কান পেতে অন্বেষণ করে
ঘাস ফুল। হে অন্বিষ্ট, অকস্মাৎ এ-মুহূর্তে যদি
ফিরে আসো, তাই এই অর্জুনের অতিক্লান্ত ফুলে
ঝলকিত শেষ সোনা ;

এসেছ কি—আসবে কি ফিরে
মৌমাছির শেষ গানে, ঘটে ঘটে তৃষ্ণার হৃদয়ে
প্রতীক্ষার জ্বালা ধুয়ে হেমন্তের শিশিরে শিশিরে ?

বিনিদ্র

বিনয় মজুমদার

অস্থির সময় কাবু হাতের কব্জিতে।
জীবন হিঁচড়ে চলে কুষ্ঠরোগী ভিখিরির মত।
কবে যে ডাক্তারী শাস্ত্র অব্যর্থ হবে পৃথিবীতে।
ততদিন কবিরাজী মলমটা থাক অন্তত।
শরীর শুকনো গাছ খসে পড়ে ফেটে পচে শীতে,
পরগাছা প্রাণ তবু প্রশাখায় সূর্যস্নানরত।

অস্থির বিনিদ্র রাতে চুপি চুপি ডেকে যায় কাব্যের দালাল।
চৌরঙ্গী পৃথিবী নয়, মগজে যে শহুরে ভেজাল।
বহুদিন ব্যবহৃত পুরাতন পৃথিবী কি এখনো কুমারী ?
ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে আমরা কি এখনোও সাড়া দিতে পারি?

আধুনিক শহরের নোনাধরা দেয়ালের মত
অসাড় বিস্তৃত প্রাণ নানাবিধ পোস্টারবিদ্ধ।
অজস্র বিষয় আছে, কবিতাটা নেই অন্তত।

তবু আমি ধরা পড়ি কবিতার গাঢ় নাগপাশে
যেমন অব্যর্থ ভাবে শিরদাঁড়া বেয়ে নীল ঘুম নেমে আসে।

মনে হয় শহরের টুঁটি ধরে দিই জোর নেড়ে
দখিনা বাতাসে
কোনো নির্ভরযোগ্য প্রতিশ্রুতি নেই
তবুও নারীর কোলে নয় আর নরের বাহুতে
পৃথিবীর চিরন্তন ঘুম প্রবাহিত।

হয়ত সংগ্রামে প্রেম, রাত্রি, ঘুম, নারী সবই থাকে
সবই স্বাভাবিকতায় না হলে কখনো সত্য নয়
তবুও আমার কাছে এই রাত্রি অসত্যের মত মনে হয়,
উত্তেজিত মস্তিষ্কের কোষে চলে ধ্বংসের মহড়া ;
চিতায় শুয়েও যারা স্বপ্নের বাগানে
গাঢ় কেলি করে তারা মানুষ না মড়া ?

রাত গুড়ো করে দিয়ে যায় ভোর চায়ের বাস
স্বেদাক্ত বাতাসে পাই বন্ধোপসাগরের সান্ত্বনার শ্বাস।

দু'টি কবিতা

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

প্রাজ্ঞের প্রতি :
(ফরাসী কবি র‍্যাঁবোর স্মৃতির উদ্দেশ্যে)

ধারণায় প্রাজ্ঞ তুমি, তির্যক কথন
তোমার কথায় দেখি কুটিল দর্শন,
অবিশ্রান্ত শ্লেষ-বৃষ্টি, ভণিতা করুণ
বিদ্যুৎ-চমক বুদ্ধি, যমক দারুণ
তোমার পাণ্ডিত্য-পাত ! তুমি চেয়ে থাকো
সুচতুর ছদ্মবেশ ; ব্যঙ্গ হেসে আঁকো
সকলে সন্ত্রস্ত হয়, আশ্চর্য অনেকে
ধারণায় প্রাজ্ঞ তুমি, তোমাকেই থাকে।

জীবন বিচিত্র বড়, সাধারণ জানা
পাহাড়, অরণ্য, পথ, নদীর মোহানা
রক্তাক্ত যান্ত্রিক সে যে কত দেশ হাটে,
যন্ত্রণায় তার মুখ জলন্ত, তামাটে ;
সে থাকে সংসার পোড়ে, ওড়ে ছাই-ধুলো,
আমি জানি দ্রষ্টা সে-ই ; প্রাজ্ঞকে-ই বলো ॥

লোকে বলে :

লোকে বলে : ভয়ানক সে নাকি মাতাল
ভীষণ রেয়ুড়ে নাকি : থালি খায় গাল
সকলের কাছ থেকে, করে না সে দল
ইদানীং ঘুষ খায় ! তাইত সবল
কেমন ভাঙে না, সোজা হয়ে পথ চলে ;
জুয়া খেলে, ঘাশ, পাশা : আবার এম. এল. এ.
নাকি হতে চেয়েছিল—করেছিল দল
জনসেবা, আন্দোলন ইত্যাদি সকল।

আবার এও জানেন, বিজ্ঞ সুধীজন !
একান্ত গোপনে সভা : কত অভাজন
ইতস্তত ঘোরে ফেরে ; এদিকে কৌতুক
চলে, সভাশেষে আনে কথার যৌতুক,
মস্ত ফাঁকি —সে যে বলে—নেই কোন মিল,
মাতাল, রেয়ুড়ে, হ্যাঃ-হ্যাঃ —অশ্লীল ! অশ্লীল !

সেই মুখ

অর্ধেন্দু বিশ্বাস

ঝির ঝির বাতাসে কেঁপে ওঠা
দিঘির মতন
ছোট্ট সেই মেয়েটির মুখ—
আমার মনের প্রান্তে
বারে বারে জাগুক জাগুক,
দিঘীর জলের তলে পদ্মের মতন।

দিনক্ষণ মনে নেই—
ভোরের সোনালী পথ দিয়ে
সেই মেয়ে এসেছিল
এক মাথা কালো চুল নিয়ে।

দিয়ে গেল এক মুঠো হাসি
কিছু ফুল, কিছু গান, সবুজের রাশি।

দুটি হাত, দু'টি চোখ, আহা ! সেই মুখ
মনের দর্পণে শুধু জাগুক জাগুক ॥

সে-দিনের 'বনলতা সেন'

অরুণিমা পাল

শীতের অপরাহ্ন—
খণ্ডিত কার্জন পার্ক।
মহুয়ার দীর্ঘায়িত ছায়ায় হিসাবের খাতা
ব'সে আছে স্খলিত যৌবনা
'সে-দিনের বনলতা সেন।'

রঙ্-চটা নখে তার পড়েছে অনেক ছাপ
অনেক হৃদয় নখের আঁচড়ে
রক্তাক্ত, বিকৃত, বীভৎস। তারই মাঝে
দু'দণ্ড শান্তি, হয়তো পেয়েছিল কেউ।

কিন্তু আজ—
হিসাব মেলায় শুধু অতীত অর্থের
নির্লজ্জ স্থূলতা—তারই মেদবহুল দেহের মত
কুৎসিত, বিবর্ণ, বিস্বাদ।

আকাশের চিল সেও বেঁধেছে নীড়
মহুয়ার শাখায়। দিনান্তের সংগৃহীত আহার্য
সযত্নে তুলে ধরে নবজাত শাবকের
রাঙা মুখে। কচি মুখের অশান্ত কলরবে
জীবনের মধুর শান্তি নেমে আসে
অবশেষে আকাশের চিলের বুকে।

কুয়াশার গাঢ় আস্তরণে ঘোলাধরা
আসন্ন সন্ধ্যার চোখে—
অগ্নি জিজ্ঞাসা—একখানি ছোট ঘর
দুটি কচি হাতের নরম স্পর্শ পেয়েছে কি
সে-দিনের 'বনলতা সেন' ?

আমি এক মহাদেশ

সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত

তোমার গানের সুরে এ-আকাশ হয় যদি মদির মাতাল,
আমি যেন সে আকাশে মুখ রেখে কান্নাকে হারাই ;
অথবা সূর্যের সোনা মেখে কোন আতপ্ত সকাল
আমাকে রাঙায় যেন। আমি শুধু এইটুকু চাই।

অথবা দিনের শেষে বিশ্বজোড়া আলোর বিহগ
যখন সে টেনে নেবে আদিগন্ত ছড়ানো ডানায়,
তখন নদীর জলে মেশে যদি মাধুরে বেহাগ
আমি তারে ঢেকে দেবো আঁখিজলে, আনন্দে, ব্যথায়।

এত যে আনন্দ আর এত যে বাথার কলগান,
এ শুধু আমার নয়—তুমি আছো তাই প্রতিপলে
তোমার দু'চোখে দেখি আমি এক কী আশ্চর্য প্রাণ!
আমি এক মহাদেশ এ-সৃষ্টির নর্ম কোলাহলে !!

সাম্প্রতিক বাঙ্গলার নাটক ও রঙ্গমঞ্চ

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

আমি বরাবর মনে করি যে, যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ উপাদান আমাদের স্বাধীনতা লাভে সহায়তা করিয়াছে বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চ তাহার মধ্যে অন্যতম। বঙ্গদর্শন, হিন্দুমেলা, সংবাদপত্র, জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি জাতীয় জীবন পুষ্ট করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু রঙ্গমঞ্চের অবদানও নিতান্ত সামান্য নয়।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের "চৈতন্যলীলা"র অভিনয় (১৮৮৬) হইতেই রঙ্গমঞ্চ খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠে। তারপর ষাট বৎসর অতীত হইয়া গেল, এই সময়ের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের জীবদ্দশায় ইতিহাস-মূলক নাটক 'সিরাজদ্দৌলা', 'মিরকাশিম', 'ছত্রপতি শিবাজী' প্রভৃতি, সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'শাস্তি কি শাস্তি,' 'গৃহলক্ষ্মী' প্রভৃতি, ধর্মমূলক নাটক 'জনা' 'শঙ্করাচার্য্য' 'তপোবন' প্রভৃতি রঙ্গ-জগতে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে যে বাংলার রঙ্গমঞ্চকে মহাশিক্ষালয় বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র মহাপ্রস্থান করিলে চারি পাঁচ বৎসর পুরাতন নাড়াচাড়া করিয়া দানীবাবু এবং অমর দত্ত মহাশয় পূর্ব প্রথা বজায় রাখেন। কিন্তু ৩।৪ বৎসর নূতন নূতন কিছু নাটক সৃষ্টি হইলেও রঙ্গমঞ্চ অনেকটা নিম্নস্তরে আসিয়া পড়ে। ইতিমধ্যে অমর দত্ত পরলোক গমন করেন। দানীবাবু অনেকটা একঘেয়ে হইয়া যান।

এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয় আরও অনেক শিক্ষিত অভিনেতা লইয়া রঙ্গমঞ্চে যোগদান করায় উহা আবার সজীব ও সতেজ হইয়া উঠে। পূর্বে অভিনয় জনপ্রিয় হইলেও অভিনেতৃবর্গ নিন্দার হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেন না। তাই গিরিশচন্দ্র আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—

> লোকে কয় অভিনয়, কভু নিন্দনীয় নয়
> নিন্দার কারণ শুধু অভিনেতা জন।

কিন্তু শিশির কুমার লোকের সেই ভ্রান্তধারা বদলাইয়া ফেলেন। সমাজের নিকট গিরিশচন্দ্র 'নটো' গিরিশচন্দ্র বলিয়া পরিচিত হইলে আত্মসম্মান হেতু সমাজের সঙ্গে মিশিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ এবং নিজের কয়েকজন সমাগত অনুরাগী ভক্ত ব্যতীত তিনি অপর কাহারও সঙ্গী হইতে সঙ্কুচিত হইতেন। কিন্তু শিশির কুমার সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছেন। ছাত্রেরা তাঁহার অনুরাগী ছিল, দর্শক তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত, এবং বিশিষ্ট লোকেরাও তাঁহার সঙ্গে সমানে সমানে মিশিতে আনন্দ পাইতেন। অভিনয়ের ধারাও তৎকালীন সাধারণ অভিনেতাদের অপেক্ষা অনেকটা পৃথক ছিল বলিয়া নূতন ধারা মনে করিয়া সাধারণে বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহার সম্প্রদায়ের অভিনয় দেখিতে ছুটিয়া আসিত। 'ষোড়শী', 'নর নারায়ণ', 'নাদির শা', 'শেষ রক্ষা' প্রভৃতি খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল।

দুই তিন বৎসরের মধ্যে দানীবাবুও আবার নূতন তেজে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। এইবার তিনি হইলেন অপরাজেয়। "প্রফুল্ল" নাটকে যোগেশ যেন গিরিশচন্দ্রের সমপর্য্যায়ে আসিয়া উঠিল। 'পথের শেষে'র দুর্গাশংকর, "শ্রীগৌরাঙ্গে"র চাপাল-গোপাল এবং 'পোষ্যপুত্রে'র রুক্মাকান্ত বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অজেয় হইয়া উঠিল। রুক্মাকান্তের অভিনয়কে স্বয়ং নাট্যকার অপরেশচন্দ্র "কাশীর চন্দ্রগ্রহণ" বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। সেই যুগে অপরেশচন্দ্রের অবদানও খুব কম ছিল না।

অতঃপর শিশির কুমারের জনপ্রিয়তাও নানাকারণে

হ্রাস পাইল। 'বিজয়া'র রাসবিহারী এবং 'রীতিমত নাটকে' চিরস্বরের ভূমিকা ছাড়া অন্য নূতন নাটকে তিনি বড় সুবিধা করিতে পারিতেন না। ১৯৪২ হইতে শ্রীরঞ্জন অভিনয় সরবাহ করিতেছে বটে, কিন্তু মুক্ত অভিনেতৃ-সংযোগেই জনসমাগম হইয়া থাকে। তাই সম্প্রতি রঙ্গমঞ্চের শোচনীয় অবস্থা। শিশির কুমার সত্যই বলিয়াছেন—"এদেশের রঙ্গমঞ্চের দীপটি আজ নিষ্প্রভ।" পূর্বে নাটক রচিত হইত লোকশিক্ষার জন্য এখন চমৎকার দৃশ্য দেখাইবার অভিপ্রায়ে।

সম্প্রতি অনেকগুলি বিশিষ্ট অভিনেতারও পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে তিনকড়ি চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফণী রায়, ভূমেন রায়ের মৃত্যুও কম শোকাবহ নহে। প্রখ্যাতনামা অভিনেত্রী প্রভা কি রঙ্গমঞ্চে, কি ছায়া ছবিতে দেশে, বিদেশে অপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন, তিনিও আর ইহলোকে নাই। নায়িকা, জনা প্রভৃতি ভূমিকায় সুশীলাসুন্দরীরও কৃতিত্ব ছিল অনন্যসাধারণ। সেদিনও সিরিশ পরিবদে সরস্বতী ও বিরজার ভূমিকায় তাঁহার স্বাভাবিক অভিনয় নিখুঁত ছিল। ইঁহারা উভয়েই স্বর্গতা। মনোরঞ্জনবাবু ছিলেন শিশির কুমারের সীতার অনন্যসাধারণ মহর্ষি বাল্মিকী। চিরঞ্জীব প্রকৃতিও ছিল অতীব জনপ্রিয় অভিনয়।

তিনকড়িবাবুর এক কণ্ঠই তাহাকে মহাভারতের সূর্য তনয়ের স্থানে সেই যুগসন্ধিকালে রামের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াও "রাখিলেন অক্ষয় কীর্তি মর্তের সমরে।" ফণীবাবুর হাস্যরসাত্মক অভিনয় এবং ভূমেনবাবুর রডা, কার্ডালো, লালী প্রভৃতি সাহেবের ভূমিকায় স্মরণীয় অভিনয়। এই সব অভিনেতা-অভিনেত্রীর পরলোক প্রাপ্তি হওয়ায় সকলেই ব্যথিত হইয়াছেন। তাই অভিনয় এখন অনেকটা নির্জীব। শিশিরবাবুর সমকক্ষ দুই চারিজন ছাড়া বহু রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রঙ্গগৃহের অবস্থা অতীব শোচনীয়। সব দিকেই অন্ধকার, নাটক নাই, অভিনেতার দৈন্য, আসন মলিন, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ কি বিলয় প্রাপ্ত হইবে? কখনও নয়! অসংখ্য এমেচার দলে ভাল নাটকের সন্ধান পাই, আবার অভিনয়ও তৃপ্তিদায়ক হইয়া থাকে। অভিনয়ে জ্ঞানও এরূপ ব্যক্তিদের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে দেখিতে পাই। এইসব সত্ত্ব আজ অনাদৃত। একবার সকল অবৈতনিক সংঘ সম্মিলিত হইয়া স্থায়ী মঞ্চে অভিনয় করিবার সুযোগ না পাইলে কিরূপে দেশের নাট্যকলা সজীব ও উজ্জীবিত রাখিবেন? এই সংকট সময়ে তাহা করা কি সমীচীন নয়? এইরূপে সম্মেলনের প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলে জাতীয় সরকারের সাহায্য হইতে ইহারা বঞ্চিত হইবে না তাহাও আশা করা যায়। এদিকে কর্তৃপক্ষ প্রণিধান করা সঙ্গত কিনা ভাবিবার সময় আসিয়াছে। —(আহ্বান সংস্কৃতি পরিষদের সৌজন্যে)

জনসাধারণের সাহিত্য —রবীন্দ্রনাথ

ভারতবর্ষে এক সময়ে জনসাধারণের মধ্যে একটা ঢেউ উঠিয়াছিল। ঈশ্বরের অধিকার যে কেবল জ্ঞানীদিগেরই নহে, এবং তাঁহাকে পাইতে হইলে যে তন্ত্রমন্ত্র ও বিশেষ বিধির প্রয়োজন করে না, কেবল সরল ভক্তির দ্বারাই আপামর চণ্ডাল সকলেই ভগবানকে লাভ করিতে পারে, এই কথাটা হঠাৎ যেন একটা নূতন আবিষ্কারের মত আসিয়া ভারতের জনসাধারণের দুঃসহ হীনতাভার মোচন করিয়া দিয়াছিল। সেই বৃহৎ আনন্দ দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যখন ভাসিয়া উঠিয়াছিল, তখন যে সাহিত্যের প্রাচুর্ভাব হইয়াছিল, তাহা জনসাধারণের এই নূতন গৌরব লাভের সাহিত্য।

(সাহিত্য-সৃষ্টি—বঙ্গদর্শন, ১৩১৪ আষাঢ়)

পরীক্ষা ব্যবস্থার পরীক্ষা

সুরপতি নন্দী, বি. এ, বি-টি
প্রধান শিক্ষক, সাধারণের বিদ্যালয়, হাওড়া

সবকালে সব দেশেই পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিদ্যালয় বলুন, মহাবিদ্যালয় বলুন কি বিশ্ববিদ্যালয় বলুন; চাকরীস্থল বলুন আর জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্র বলুন পরীক্ষা আমাদের সব সময়ই দিতে হচ্ছে। আর দিতে হবেও। পরীক্ষা না হলে উন্নতির পরিমাপ জানা যাবে কি করে? পরীক্ষা না হলে অর্জিত শিক্ষা যাচাই হবে কি করে? কি-ভাবেই বা জানা যাবে যে কার কতটা যোগ্যতা বা পারদর্শিতা?

পরীক্ষা আছে, থাক। কিন্তু পরীক্ষার মধ্যে গলদ আছে হাজার গণ্ডা। এই সব গলদ থাকার জন্য পরীক্ষাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা প্রহসন। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার নিন্দা না করে পারেন না।

মূলের কথাই ধরা যাক। এক বছরে পঞ্চম শ্রেণীর একটি ছাত্রকে ইংরেজির খান দুই-তিন বই পড়ানো হয়। প্রথমে অক্ষর-জ্ঞান পরিচয়, তারপর বাক্য গঠন, পরে দু' একটি কবিতা গল্প ইত্যাদি, কিছু অনুবাদও শেখানো হয়। উদ্দেশ্য হল: এক বছরে মোটামুটি একটা ভাষা-জ্ঞান অর্জন করানো যাতে নাকি ছাত্রটি ঐ বিদেশী ভাষা দুচার কলম বলতে ও লিখতে পারদর্শী হয়। উদ্দেশ্য যথেষ্ট সন্দেহ নেই। কিন্তু আখেরে কি দাঁড়ায় দেখা যাক। পাতার পর পাতা 'পড়া' মুখস্থ করে ছেলেরা। ইংরাজিতে কতটা লিখতে বা বলতে পারল তার দিকে নজর নেই—ক্লাসে কতটা পড়া দিতে পারল সেটাই আসল বিবেচ্য। তারপর পরীক্ষার সময় আছে 'ইন্সপেক্টেড' দাগানো ও মুখস্থ করা। পরীক্ষার খাতায় ছাত্ররা সেগুলি উগরে দিয়ে আসে। যেমন পড়ানো তেমনি পরীক্ষা। যার কপাল মন্দ—তার জানা প্রশ্ন বেশি পড়ল না, সে উত্তরাতে পারল না। যার কপাল ভাল সে উত্তরে গেল।

কিন্তু, সত্যিই কি উত্তরে গেল? জ্ঞানার্জনের বিস্তৃত রাজ্যে সে কতটা অগ্রসর হল? আর তার কতটুকুই বা পরীক্ষক জানলেন?

ছাপানো প্রশ্নপত্রে আছে—"Is Ram a fat boy?" যারা ঐ জায়গাটা মুখস্থ করে এসেছে—বিনা বাক্যব্যয়ে লিখে দিলে,—"Yes, Ram is a fat boy"। কিন্তু ক্লাসে মোহিত বলে একটি ছেলে আছে। সে ভয়ঙ্কর মোটা। প্রশ্নকর্তা যদি জিগ্যেস করতেন,—"Is Mahim a fat boy?"—ছেলেরা (পঞ্চম শ্রেণীর হলেও) হল থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার করতো: স্যর, ভয়ঙ্কর কঠিন প্রশ্ন হয়েছে, সব আউট থেকে পড়েছে—'গ্রেস' দিতে হবে ঐসব ক্ষেত্রে আমি সাধারণত বলে থাকি, হাঁরে 'গ্রেস' বানান কি রে? 'গ্রেস' বানান আর মানে বলতে পারলে এক দেড় রসগোল্লা খাওয়াব। কে কটা রসগোল্লা খাবে হিসেব করতে করতে ছেলেরা সমস্বরে বলে উঠত 'গ্রেস' মানে নম্বর, নম্বর বাড়ানো। বলা বাহুল্য, পরীক্ষার খাতায় রসগোল্লা দেওয়া ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর থাকত না।

এ ত গেল পঞ্চম শ্রেণীর একটি মাত্র বিষয়ের কথা। তলিয়ে দেখতে গেলে সবারই একই অবস্থা। অন্যান্য বিষয়েও এর ব্যতিক্রম নেই। এমনি আমাদের বিষয়বুদ্ধি। মনে কর "ABC একটি ত্রিভুজ" বললে ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাহরণ রায়ের জ্যামিতি বইয়ের মতো পৃষ্ঠার ছবিটি চোখের সামনে হাজির করে ফেলে। কিন্তু জিগ্যেস করে দেখবেন—"LMF একটি ত্রিভুজ" মনে করা যায় কি না—ছেলেরা ঘাবড়ে যাবে। তাও যদি না যায় তবে একটা মাঠে নিয়ে যান, বলুন তার তিন দিকে পায়ে হাঁটা রাস্তা। ওটাকে একটা ত্রিভুজে পরিণত করার চেষ্টা করুন। ছেলেরা আর আপনার ত্রিভুজ পাশে এগুবে না। একটা গল্প

মনে পড়ে গেল। জনৈক ম্যাট্রিক ফেল ছাত্র বার বার অঙ্কে পাশ না করার জন্য আমিতি করে ফেলেছিল। তবু পরীক্ষায় পাশ করে না। সুযোগ পেলেই পরীক্ষকদের গালাগালি দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেয়। বলে যে পরীক্ষকদের মত ছিদ্রান্বেষী লোক নাকি নেই,—সামান্য ভুলের জন্য ওরা ফেল করিয়ে দেয়। আমি বললাম, সামান্য ভুলের জন্য তো রাজাও হারাতে হয়—তোমার ভুলটা কি? ছাত্র উবাচ: স্যর, জ্যামিতিতে সবই লিখেছিলাম, তবে সামান্য ভুলের জন্য ফটোগ্রাফটা দেওয়া হয়নি।

ছাত্রটি ডায়াগ্রামকে বলে ফটোগ্রাফ! এমনি ধারা কি ইংরেজি, কি বাংলা, কি গণিত, কি ইতিহাস, কি বিজ্ঞান সব বিষয়েই সত্যিকার শিক্ষা আদৌ হচ্ছে না। আর যা হচ্ছে তার সত্যিকার পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে না পরীক্ষার মাধ্যমে। এক কথায় বলা চলে যে পরীক্ষা হচ্ছে এমন একটা ফিল্টার যার মাধ্যমে একটা বিশেষ অবস্থার কতক-গুলো বিশেষ বিশেষ পাঠ্যাংশ ছাকনা করে মুখস্থ করা আর পরীক্ষার হলের বিশেষ পরিস্থিতিতে সেগুলি উগরে দিয়ে আসার পারদর্শিতার যাচাই করা হয়। পরীক্ষার পর সেগুলি কতটা মনে রইল সে কথা তোলা অবান্তর! প্রশ্নপত্রে কিছু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করা যে-আইনী; আন্-ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন করাও নীতিবিরুদ্ধ।

হায়রে পোড়া কপাল, এই আমাদের পরীক্ষা!

কিন্তু এই পরীক্ষার জন্য কত ছোটাছুটি, মারামারি, লাঠালাঠি। যে না পরীক্ষায় পাশ করবে তার মতন হাবা ছেলে আর নেই—কিন্তু যে এক বারে পাশ করলে তার পূর্বপুরুষের বংশগতি পর্যন্ত বিশ্লেষ করে মন্তব্য করা হবে যে পড়াশোনাটা ছেলেটার রক্তে রক্তে আছে।

পরীক্ষাটা যে প্রহসন সেটা হয়ত এতক্ষণে আপনিও মানবেন। কিন্তু এই পরীক্ষার ওপর সব লোকের কি প্রগাঢ় বিশ্বাস, কি অচলা ভক্তি! মাষ্টারমশাইরা ভাবেন —যে ছেলেটা পরীক্ষায় ভাল করে—তার মতন ভাল ছেলে আর দুনিয়ায় নেই। ছেলেটি নিজেও তাই মনে করে। যে ছেলে ফেল করে—তাকে সারাজীবন নিন্দার বোঝা মাথায় করে ফিরতে হয়। আত্মগ্লানিতে সে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। আমি একটি ছেলের কথা জানি। সারা বছর সে কিছুই পড়ে না। শুধু পরীক্ষার আগের দিন রাতে চারটার ঘুম থেকে ওঠে। ঘণ্টা তিন চার ঠেসে কতকগুলো ইম্পর্টেন্ট মুখস্থ করে ফেলে। তিন-চারটে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ঘণ্টাখানেক পরে হল থেকে বেরিয়ে আসে। সে কখনো জীবনে ফেল করেনি: বেশি নম্বরেরও সে প্রত্যাশী নয়। আর তার জন্য এর বেশি পরিশ্রম করতেও সে নারাজ।

সাধাস্ ভাই—পরীক্ষার মতন প্রহসনের যথাযোগ্য উত্তর তুমিই দিয়েছ। তুমিই সত্যিকার বুদ্ধিমান ছেলে। পরবর্তী জীবনে তোমার উন্নতি ঠেকায় কে? এই যে পরীক্ষারূপী ভণ্ড আড়ম্বরকে তুমি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছ—তাতেই তোমার সত্যিকার জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তুমিই জেনেছ, হে ছাত্র, যে, জীবনযুদ্ধে লড়তে গেলে যে জ্ঞানের দরকার তার শতভাগের একভাগও বইয়ের পাতায় লেখা থাকে না।

কিন্তু ঐ ছাত্রকে সত্যিকার বাহবা দেবে কজন? কেউ না। সারা বছর তার অভিভাবক গালাগালি দেবে:— হতভাগা ছেলে, একটু বই নিয়ে বস্ না, একটু লেখাপড়া করনা, বয়স তো হল, এখনও সুবুদ্ধি হল না, ইত্যাদি।

বলছিলাম লটারির কথা। পরীক্ষা পাশ করা-না-করা লটারিতে জেতা-না-জেতার সামিল। এবিষয়ে আরো শুনবেন? পরীক্ষার খাতা দেখেন শিক্ষকরা। ছেলেরা বলে 'খাতা কাটা'। হাঁা, কেমন করে খাতা কাটা হয়? একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই মনুষ্যে নম্বর বসানো হল। সবটা পড়ে দেখার সময় নেই শিক্ষকের। সব ভুল কাটারও সময় নেই। তাছাড়া খাতায় তো ছেলের নাম আছে। নাম দেখলেই চেহারা মনে পড়ে। দাও বসিয়ে নম্বর। ম্যাট্রিকে অবশ্য ছেলেদের চেনা যায় না। কিন্তু এ বিষয়েও দেখা গেছে যে—যে পরীক্ষক আজ একটি ছাত্রকে তিরিশ দিলেন—কিছুদিন পর সেই ছেলের সেই খাতাতেই তিনি সত্তর বসিয়ে দেবেন যদি না আগের নম্বরটা খাতায় টোকা থাকে। এই নিয়ে বিলেতে এবং আমাদের দেশেও অনেক গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে

গেছে। দেখা গেছে যে পরীক্ষায় নম্বর দেওয়ার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। যখন যেমন ইচ্ছে নম্বর দেওয়া হয়। আজকের নম্বরের সঙ্গে কালকের নম্বরের সামঞ্জস্য থাকে না। শুধু তাই নয়। মন ভাল থাকলে নম্বর বাড়ে, মন খারাপ থাকলে নম্বর কমে। প্রথম খাতায় যে নম্বর থাকে—পরের খাতায় সেই মান কমে বা বাড়ে।

তবু এই পরীক্ষার ওপর মানুষের কি বিরাট আস্থা। বছরের পর বছর ধরে চলেছে ঐ পরীক্ষা-যজ্ঞ। আর সেই যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছেন অভিভাবক, ছাত্র, শিক্ষক, সমাজ, রাষ্ট্র। আত্মাহুতি দিচ্ছে কে ?

এই পরীক্ষার সবচেয়ে বড় অভিশাপ হল—সমাজ কর্তৃক এর স্বীকৃতি, সমাজ কর্তৃক এর সমর্থন, সমাজ কর্তৃক এর ওপর মূল্য আরোপণ।

আপনি চান্ বা না চান্—সমাজ দাম দেয় এই পরীক্ষাকে। আপনি যাই বলুন আর যাই করুন—সমাজ বলবে এই পরীক্ষার মাধ্যমেই জানা যায়—কার কতটা গুণাগুণ।

কিন্তু ভেবে দেখুন, কতটুকু জ্ঞানের পরীক্ষা আমরা করি। একজন শিশুর গঠন হয় হাজারো শিক্ষার মধ্যে দিয়ে। ছেলেটি যেমন পড়তে শেখে, লিখতে শেখে—তেমনি সে শেখে কেমন করে পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে হয়। ছেলেটি অল্প বয়সেই জেনে যায় যে কোন্ মাসে, মান কাটা হয়—বছরে কটা মাস। ছেলেটি জানে যে এক ক্রোশ হাঁটতে ক' মিনিট লাগে, কত মিনিটে এক ঘণ্টা, ক' ঘণ্টায় এক দিন, ক' দিনে মাস। ছেলেটি জানে স্টেশনের পথ কোনটা—আর কোনটা তার জীবনের ট্রেনের যেখানে সারা জীবন তাকে যাত্রীর কাজ করতে হবে; কোন্‌টা তার জীবনের ট্রেন—যে ট্রেনের টিকিট না থাকার জন্য তাকে নেমে পড়তে হবে গাড়ি থেকে, আর সে টিকিট কোথায় পাওয়া যায়। এ-সব কথা বইয়ের পাতায় লেখা থাকে না। জীবনের রঙ্গমঞ্চে যে-শিশু বৃদ্ধিলাভ করছে দিনের পর দিন,—বিস্তীর্ণ আকাশের নিচে, মাঠে আর ময়দানে অজস্র সঙ্গীদের সাথে, তার খেলায়, তার আড্ডায়, তার হাস্য-কৌতুকে,—তার অগ্রগতি কোনো পরীক্ষক লক্ষ্য করেন না। লক্ষ্য করেন না মাস্টার মশায় সেই ছেলের অজস্র কৌতূহলী জিজ্ঞাসা—এই দুনিয়া সম্বন্ধে তার বিস্ময় আর বিমূঢ়তা। লাখো লাখো 'কেন' দিয়ে যে শিশু জীবনটাকে ঘিরে রাখে—ঘুমের শিয়রে যার সুখনিদ্রা উপদ্রুত—তার কতটা খোরাক জোগাই আমরা স্কুলে ? আর ক'টা জিজ্ঞাসারই বা জবাব দিই আমরা ?

কিন্তু উত্তর সে পায়—উত্তর সে খুঁজে বের করে। প্রশ্ন আপনি তাকে করেন না। সে আপনাকে প্রশ্ন করে। আপনি তার উত্তর দেন না। তাই স্বাধ্যায়ে তার বুদ্ধিলাভ। আমি আপনি পরীক্ষার খাতা নিয়ে যতই আঁচড় কাটি না কেন।

তাই তো বলি—সত্যিকার পরীক্ষক হতে হলে আগে ছাত্র হতে হবে। ছাত্র হয়ে আগে ছাত্রের প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। আর সেই জবাবগুলোই পরে শিক্ষক হয়ে ছাত্রকে দেখাতে হবে—যার জবাবে সে খোঁজে, যে প্রশ্ন তার মন থেকে উদয় হয়—জীবনের পথে চলতে গিয়ে।

আমরা যা শেখাই আর যা প্রশ্ন করি—তার সঙ্গে জীবনের কোনো যোগ নেই। যা জানা দরকার, যা জানতে ছেলেদের অনুসন্ধিৎসা, যে-সব খবর তারা নিজেরা শেখে—সে সব কথা বইয়ে থাকে না। বইয়ে যে-টা থাকে সেটা ইস্কুলের পড়া। না-পড়লে মাস্টার মশাই ঠেঙাবেন। তাই পড়তে হয়, আর পরীক্ষা দিতে হয়। পাশ করলেই ফুরিয়ে গেল। তারপর যতো তাড়াতাড়ি ভুলে যাবে ততো ভাল।

ঐ সামান্য একটা পরীক্ষা. কিন্তু কতো তার ওজন, কতো তার মান। কতো ছেলে সরস্বতী পুজোর সময়ে ভক্তিভরে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে—কত মেয়ে মন্দিরে গিয়ে মাথা নুইয়ে আসছে। তাদের একান্ত কাতর প্রার্থনা : হে পরীক্ষা-দেবী, এবার পরীক্ষ-তরণীটা কোনোরকমে পার করিয়ে দাও—তা না হলে যে বাবা গায়ের ছাল-চামড়া তুলে নেবে, বন্ধুরা গায়ে থুথু দেবে। মেয়েরা হয়ত বলবে

একে তো মা, অরক্ষণীয়া হয়ে আছি—তায় যদি কেন করি তো মা, দড়ি-কলসি নিয়ে পুকুরে নামা ছাড়া আর উপায় থাকবে না।

জোড়াসাঁকোর কালীবাড়ির সামনে কোনোদিন গেছেন? সেখানেও শুনবেন যে তিন নম্বর বাসীর চোর-নম্বর ঘোড়া ফেটালে ভবল পাঠা মানৎ। তা পরীক্ষাটা তো ঘোড়-দৌড়ের মতন। ছাত্র সেখানে দর্শক—ঘোড়া ভাল দৌড়ানেই কপাল ভাল। তবে ঠিক ঘোড়াটা ধরতে হবে। তার জন্য যেমন তারকেশ্বরে লোকে হত্যা দেয়—ছেলেরাও তেমনি হত্যা দেয়। কত বিনিদ্র রজনী, কত বিরস দিন কেটে যায় মোট বইয়ের বিরস কথাগুলো গলাধঃকরণ ক'রে—স্মৃতির মণিকোঠায় ঘিয়ে রাখতে। আপনি কখনও শীতকালে বাউড়িয়া স্টেশন দিয়ে গেছেন? দেখবেন ছোটো ছোটো ছেলেরা বইয়ের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। আর দেখবেন কিশোরী-যুবতীদের,—গাছের তলায় বসে—ট্রেন আসার আগে যে-টুকু সময় পাওয়া যায় তার মধ্যে—সেহবাহের মতন একবার বইয়ের পাতা উল্টিয়ে নেওয়া। পরীক্ষার সময়ে ছেলে-মেয়েদের নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। রাত জেগে জেগে চোখের কোণে কালি বসে গেছে। শরীর ভেঙে যাচ্ছে—তবু পরোয়া নেই। গাট পেরোতে হবে। নাবার ওপার্ গাট!

আমাদের প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থার এই একটা মস্ত বড়ো অভিশাপ—যে পরীক্ষার্থিগণের স্বাস্থ্যকে তা চুরমার করে দিচ্ছে। দৈহিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য।

এই অভিশাপের বোঝা মাথায় নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। বুঝে আমাদের বিদ্যা-বিতরণের মহাব্রতের কথা। কাকে অষ্টরম্ভা!

অবস্থাটা পালটানো দরকার। আর পালটাতে হলে খোল-নলচে সমেত তাকে বদলাতে হবে। বদলানো মানে আমূল সংস্কার করতে হবে। পরীক্ষা ব্যবস্থাটা যারা বাতিল করে দিতে চান—তারা আবার বাড়াবাড়ি করেন। একেবারে বাতিল না করে রোগ সারাবার উপায়টা বাতলাতে পারলে ভাল। ইংরেজিতে বলা হয় পরীক্ষা-জিনিসটা বর্জন না করে সংস্কার করা উচিত: We should not end, but mend, it.

কি করে সংস্কার করা যায়? উপায় হল—পরীক্ষা জিনিসটা কমানো দরকার আধার বাড়ানো দরকার। একদিক দিয়ে কমাতে হবে আর একদিক দিয়ে বাড়াতে হবে। কমাতে হবে এ জন্য যে এই ধরণের ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক এক একটা পরীক্ষাতে ছেলেদের যে মানসিক ও দৈহিক পীড়া হয়—সে ক্ষতি সহজে পূরণ করা যায় না। আর তাছাড়া আগেই বলা হয়েছে যে কোনো উদ্দেশ্যই সাধন হয় না এইসব পরীক্ষার দ্বারা।

পরীক্ষাকে বাড়াতে হবে দু-দিক দিয়ে। এক নম্বর হল: পরীক্ষার ক্ষেত্রকে আরো ব্যাপ্ত করা দরকার। শুধু পুঁথির পাতা, স্কুলের পড়া নয়,—সব দিক দিয়ে একজন শিশু বা যুবার অগ্রগতিকে পরীক্ষা করতে হবে। বছরের শেষে একবার নয়,—দিনের পর দিন, প্রত্যহ। খেলার মাঠে, বন্ধুদের আড্ডায়, গ্রন্থাগারে, সব বিষয়ে তাকে উৎসাহ দিতে হবে আর তার উন্নতির হিসেব করার জন্য ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষ-পত্র রাখতে হবে। দ্বিতীয় নম্বর উপায়ে পরীক্ষাকে বাড়াতে হবে ঘন ঘন ছোট ছোট পরীক্ষা করে। রোজ রোজ, শ্রেণীতে, মাঠে-ময়দানে, অবিরত, তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে হবে। সে প্রশ্ন তার জানার স্পৃহা বাড়াবে। তার জ্ঞান হবে উদ্বুদ্ধ।

পরীক্ষাটা তখন আর থাকবে না একটি বাৎসরিক বা ষড় রকমের ব্যাপার, দৈনন্দিন জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা-বিশিষ্ট এক বিরাট অনুষ্ঠান। পরীক্ষা তখন একাকার হয়ে যাবে প্রতিদিনের পড়াশোনার সঙ্গে। তখন পড়াশোনা আর পরীক্ষা আলাদা থাকবে না। জীবনের সমস্ত দিকে অগ্রগতি লাভ করা হবে ইস্কুলে যাওয়ার কাজ। সেটাই কাজ আর সেটাই পরীক্ষা।

তেমন পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে গেলে পড়া-

শোনার ব্যবস্থাটাই পালটানো দরকার। সে চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সে আলোচনা বারান্তরে হবে। আপাতত আমরা চেষ্টা করতে পারি ঐ ধরনের বিরাটকায় পরীক্ষার ওপর থেকে জোর কমিয়ে দিয়ে দৈনন্দিন লেখাপড়া, খেলাধূলার উপর জোর বাড়াতে।

যাতে ছেলেদের মন পাওয়া যায়—সেটা তারা ভোলে সেটা গেঁথে থাকে অন্তরে। পরীক্ষার হলে প্রশ্নকর্তার ভাষার কচকচিতে যে ছাত্র ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গোলমাল বাঁধিয়ে বসে—তার মনের ছবি নিয়ে দেখবেন যে, আসল যেটুকু শেখার দরকার সেটা তার ঠিকই মনে আছে। প্রয়োজনের সময়ে সেটাকে সে কাজে লাগাতে পারবে। শিক্ষা লাভ করার পর ভুলে যাওয়ার জন্য সময় দিতে হয়। তারপর যে-টুকু মনে থাকে সেটাই আসল জ্ঞান। সে জ্ঞানের পরীক্ষা করবেন কে?

দেশের কাজের মূল সূত্র

—রবীন্দ্রনাথ

তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ কর। শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহারসামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত কর; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার কর, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত কর! এ কর্মে খ্যাতির আশা করিয়ো না; এমন কি, গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোনো উত্তেজনা নাই, কোনো বিরোধ নাই, কোনো ঘোষণা নাই কেবল ধৈর্য এবং প্রেম এবং নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র পণ যে দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকারের সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।

দেশের সমস্ত কাজই যে লক্ষ্য ধরিয়া চলিবে আমি তাহার মূলতত্ত্ব কয়টি নির্দেশ করিয়াছি মাত্র। সে কয়টি এই:—

প্রথম, বর্তমানকালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে আমাদিগকে বিলুপ্ত হইতেই হইবে। বর্তমানের সেই প্রকৃতিটি—মোট বাঁধা, ব্যূহবদ্ধতা, Organization সমস্ত মহৎগুণ থাকিলেও ব্যূহের নিকট কেবলমাত্র সমূহ আজ কিছুতেই টিঁকিতে পারিবে না। অতএব গ্রামে গ্রামে আমাদের মধ্যে যে বিশ্লিষ্টতা, যে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিয়াছে গ্রামগুলিকে সত্বর ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া তাহা ঠেকাইতে হইবে।

দ্বিতীয়, আমাদের চেতনা জাতীয় কলেবরের সর্বত্র গিয়া পৌঁছিতেছে না। সেইজন্য স্বভাবতই আমাদের সমস্ত চেষ্টা এক জায়গায় পুষ্ট ও অন্য জায়গায় ক্ষীণ হইতেছে। জনসমাজের সহিত শিক্ষিত সমাজের নানাপ্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।

(পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির বক্তৃতা—বঙ্গদর্শন, ১৩১৪ ফাল্গুন)

প্রাচীন ভারতের লৌহ-শিল্প

সোমাভান চৌধুরী

পাশ্চাত্যের জ্ঞানী-গুণীদের, বিশেষ করে প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং মানবজাতিতত্ত্বজ্ঞদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ও ভিত্তিহীন মত বহুদিন প্রচলিত ছিল—তা হচ্ছে, ভারতবর্ষ এমন একটি প্রাচীন সভ্যতার আবাস যা শার্শনিক ও নৈতিক দিকগুলোর উন্নতির মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছিল এ ধরণের ধ্যান-ধারণা এদেশের বিশেষজ্ঞদেরও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু, আজ ঘটনা-প্রবাহ একেবারে ভিন্ন খাতে বইছে। আবাস-লব্ধ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানবিষয়ক নথি-পত্তর নতুন পথের নিশানার ইংগিত করছে। প্রত্নতত্ত্ব ও ভূ-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় উৎসগুলি প্রমাণ করছে যে, বৈচিত্র্যময় এবং প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ এই দেশের প্রাচীন জনগণ জীবনের নৈতিক মূল্যায়নের দিকে ঝুঁকেছিল, কারণ বস্তুজগতের উন্নতির জন্যে তা ছিল প্রয়োজনীয় পরিপূরক। নৈতিক মূল্যবোধের উপর আলাদাভাবে এর বেশী গুরুত্ব তারা দেয়নি।

ইস্পাত (ব্যাপক অর্থে লোহা) হচ্ছে সভ্যতার মেরুদণ্ড তাই কোন জাতির লোহা ও ইস্পাতের সদ্ব্যবহার-ক্ষমতাই হল তার ব্যবহারিক উন্নতির একটা স্থির মানদণ্ড। ভারতবর্ষের বৈদিক যুগের আর্য ঔপনিবেশিকদের লোহার ব্যবহার সম্বন্ধে জানা ছিল। তারা প্রথমতঃ 'কাটবার' অস্ত্রশস্ত্র ও দ্বিতীয়তঃ 'গঠনমূলক' উদ্দেশ্যে লোহার ব্যবহার করত। ইতিহাস পূর্বযুগের অস্ত্রশস্ত্র যেমন—তরবারি, ছোরা, ত্রিশূল, বল্লম, বর্শা, তীর, কোদাল প্রভৃতি যা খননের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে বেরিয়েছে এবং তাদের উপকরণ অনুলিখনের যে পরিচয় আজ পাওয়া গেছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক যুগের শুরু (২৫০০ খৃঃ পূঃ) থেকে মহাকাব্যের যুগ (২০০ খৃঃ পূঃ) পর্যন্ত ভারতবর্ষ প্রধানতঃ ছিল লৌহ উৎপাদনের দেশ। দিল্লী, ধর এবং আবু পাহাড়ের সু-উচ্চ লোহার স্তম্ভগুলি এবং কোণারক, পুরী ও ভুবনেশ্বর মন্দিরগুলির কড়ি-বরগাগুলি জাতির বিজ্ঞান ও ধাতু-বিদ্যার জটিল পদ্ধতির বিস্ময়কর নিদর্শন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক হিন্দু সাহিত্য এবং আয়ুর্বেদীয় সাহিত্য আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃততর করে। এদের থেকেই আমরা জানতে পারি, আদিম ভারতবাসীরা খনিজ আকরিক হতে বিশুদ্ধ ধাতু নিষ্কাষণের জন্যে 'বাতাচালিত' চুল্লী বা 'ব্লাস্ট ফারনেস'-এর ব্যবহার কৌশল জানত। হস্তচালিত হাপরে "বাতাচালনের" অসুবিধার জন্যে খুবই খাঁটি আকরিক ব্যবহার করতে হত। এর একটা প্রত্যক্ষ সুফলও ছিল। কোনরকম বিগলন-সহায়ক খনিজ বা 'ফ্লাক্স্' দরকার হত না। সাধারণতঃ, দু'রকম আকরিকের প্রচলন ছিল—(১) 'হেম্যাটাইট' ও (২) 'পাইরাইটস্'। প্রথমটি 'গৈরিক' নামে পরিচিত ছিল এবং সেই জিনিষেরই একটা উজ্জ্বল লাল রঙের রকমফেরকে বলা হত 'সুবর্ণ গৈরিক'। দ্বিতীয় রকমটিকে বলা হত 'তাপ্য'। এছাড়া, চরক ও সুশ্রুতে দু'রকমের আকরিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা হল—"স্বর্ণ-মাখিক" ও "রোপ্য-মাখিক" অথবা "গোল্ডেন পাইরাইটস্" ও "সিলভার পাইরাইটস্"।

ভারতবর্ষীয় ইস্পাত এশিয়া মাইনর, মিশর ও পূর্ব য়ুরোপের দেশগুলিতে "উজ" নামে অভিহিত ছিল। কথা সম্ভবতঃ এসেছিল কানাড়ী শব্দ "উক্কু" থেকে, যার অর্থ ইস্পাত। 'অর্থশাস্ত্রে'ও ইস্পাতের উল্লেখ আছে। ইস্পাতের সংস্কৃত প্রতিশব্দ হল 'তীক্ষ্ণ'।

কঠিন ইস্পাত ও ইস্পাতের বাটালি যে খৃঃ পূঃ চতুর্থ

শতকেও ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত, তা প্রমাণিত হয়েছে পাথরের সেই সমস্ত স্তম্ভের দ্বারা যেগুলো একটি মাত্র পাথর-খণ্ড থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে। সুশ্রুত আমাদের বলে যে, খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে এদেশে এমন সব সূক্ষ্ম অস্ত্র-চিকিৎসার যন্ত্রপাতি তৈরী হত যাদের সাহায্যে মাথার চুলকে লম্বালম্বি দু'ভাগ করা যেত। গ্র্যানাইট পাথর কেটে নানারকম আকৃতি দেবার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা 'টুলস্' এদেশ থেকে মিশরে চালান যেত। এ তথ্য স্যার জন হিক্স ব্রিটেনে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের মিটিং-এ প্রমাণ করেছিলেন।

আরো অনেক পরে অর্থাৎ মধ্যযুগে ইস্পাত নির্মাণ-কৌশল এত উন্নতিলাভ করেছিল যে, বিখ্যাত 'দামাস্কাস্ ব্লেডের' ইস্পাত এদেশ থেকেই সরবরাহ করা হত। পরবর্তীকালে পারসীকরা—আরো পরে আরবরা ও য়ুরোপীয়েরা এই কৌশল আয়ত্ত করেছিল বা অনুকরণ করেছিল—কিন্তু তেমন সাফল্যলাভ করতে পারে নি। ইতিহাস বলে, পুরুরাজ গ্রীক্ বীর আলেকজাণ্ডারকে তিন পাউণ্ড ওজনের ইস্পাত উপহার দিয়েছিলেন। এখন কথা হল, ইস্পাত যদি য়ুরোপের দেশগুলিতে তৈরী হত, তবে একজন বিশ্বজয়ী রাজার জন্যে তিন পাউণ্ড ইস্পাত একটা উপহারের সামগ্রী হত না।

এটা ঠিক যে, খাদ মিশিয়ে ইস্পাতের কঠিনতা বাড়াবার প্রক্রিয়া প্রাচীন ভারতবাসীদের জানা ছিল না। তাই উত্তপ্ত ধাতুকে জলে বা তেলে ডুবিয়েই কঠিন করা হতো। মোট কথা, একটা বিশেষ প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল আর তা বেশ উন্নত ধরণের ছিল। না হলে, খজুরাহ, মহাবলীপুরম, কোনারক ও তাজমহলের কারুকার্য সম্ভব হত না। কারণ, সাধারণ লোহার কঠিনতা গঠনমূলক পাথরের চেয়ে অনেক কম সুতরাং বিশেষ ধরণের ইস্পাতের প্রচলন ছিল যার কঠিনতা ছিল পাথরের চেয়ে অনেক বেশী।

সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, ইস্পাতে "ক্ষয়-নিরোধক" গুণারোপ সম্বন্ধে সম্যক চর্চা এদেশে খৃষ্টীয় প্রথম শতকেই সুরু হয়েছিল। দিল্লীর লৌহ স্তম্ভ এবং লোহার অন্যান্য নমুনাগুলি কয়েক শতাব্দী ধরে রোদ্দ ও বৃষ্টির মধ্যে থেকেও মরচে ধরে নি। বিশেষজ্ঞরা বলেন, নাম মাত্র ম্যাঙ্গানিজ ও গন্ধক এবং অপেক্ষাকৃত বেশী ফসফরসই ভারতীয় লোহার 'ক্ষয়-নিরোধক' গুণের জন্য দায়ী।

উপসংহারে একটা কথা বলা দরকার। পাঠক যদি এ রচনার ঐতিহাসিক মূল্য খোঁজেন, তবে তিনি হতাশ হবেন। এটা ইতিহাসের একটা ছোট্ট ভূমিকা মাত্র। অভিজ্ঞেরা এগিয়ে আসুন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যগুলির ছেঁড়া পাতার জঞ্জাল (?) থেকে তথ্য উদ্ঘাটিত করুন। তা' থেকে ধাতুবিদেরা দিল্লী-স্তম্ভের লোহার মতো, লোহা তৈরী করবেন। সে লোহা নিউক্লিয়ার-রিয়েক্টর-টেকনিক্যালের যুগেও সমাদৃত হবে।

ছোটদের বিজ্ঞানের বই

—আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়

বালকদিগের জন্য লিখিত অধিকাংশ বিজ্ঞানগ্রন্থে বিজ্ঞান ও তত্ত্বগুলির ক্যামিতির প্রতিজ্ঞার ন্যায় প্রথমতঃ সূত্রস্বরূপ লিখিত হয়। পরে এই সকল সূত্রস্থিত তত্ত্বের প্রমাণস্বরূপ দুই একটি উদাহরণ কিম্বা পরীক্ষা দিয়া তাহা শেষ করা হয়। এই প্রকার প্রণালী প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে.....অনুপযোগী.....।

.....প্রথমতঃ সহজ সহজ উদাহরণ এবং পরীক্ষা দিয়া অল্পে অল্পে সাধারণ নিয়মে উপনীত (হওয়া ভাল।) এই প্রণালীতে শিক্ষার্থীর কৌতূহল ও আগ্রহ উদ্দীপ্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

কৃষি-সংখ্যা তথ্য অনুযায়ী নবগঠিত রাজ্যসমূহ

অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

১লা নভেম্বর ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের রাজ্যগুলির পরিসীমা পুনর্নির্ধারণের ফলে মোট ১৪টি রাজ্য গঠিত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে ১৩টি রাজ্য-সরকার দ্বারা পরিচালিত এবং অবশিষ্ট ১টি কেন্দ্রীয়-সরকার দ্বারা শাসিত। নবগঠিত রাজ্যসমূহের পরিসীমা পুনর্নির্ধারিত হওয়ায়, রাজ্যগুলির ভৌগোলিক ও আর্থিক অবস্থার পার্থক্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। উহাদের মধ্যে কৃষি-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে পার্থক্য কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, উহা সংখ্যা-তথ্যের দ্বারা মোটামুটি ভাবে বুঝান হইল। সংখ্যাতথ্যের আলোচনার পূর্বে রাজ্য এবং রাজ্য-মধ্যস্থিত জিলাগুলির পরিচয় একান্ত প্রয়োজন।

নবগঠিত রাজ্য-সমূহ এবং স্ব-স্ব জিলাসমূহ

রাজ্য	মোট জিলা	রাজ্য-মধ্যস্থিত জিলা-সমূহ
অন্ধ্র-প্রদেশ		আদিলাবাদ, অনন্তপুর, চিত্তুর, কাডাপ্পা, পূর্ব্ব গোদাবরী, গুন্টুর, হায়দ্রাবাদ, করিমনগর, খাম্মাম, কৃষ্ণা, কার্নুল, মাহবুবনগর, মেদাক, নালগোন্ডা, নেলোর, নিজামাবাদ, শ্রীকাকুলাম্, বিশাখাপত্তনম্, ওয়ারাঙ্গাল, পশ্চিম গোদাবরী।
		কাছাড়, দারাঙ্গ, গারো পাহাড়, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, লখিমপুর, মিকিরপাহাড়, নাগাপাহাড়, নওগাঁ, শিবসাগর, সম্মিলিত খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়দ্বয়, সম্মিলিত মিকির-উত্তর কাছাড় পর্ব্বতসমূহ।
		আরা, ভাগলপুর, বাঁকীপুর, চম্পারাণ, সারণ, মজঃফরপুর, দারভাঙ্গা, সহর্সা, পূর্ণিয়া, মুঙ্গের, সাঁওতাল পরগণা, ধানবাদ, হাজারীবাগ, গয়া, পালামৌ, রাঁচী, সিংভূম।
বোম্বাই		আহমেদাবাদ, আহমেদনগর, এ্যাকোলা, অমরাবতী, আমরেলী, অওরঙ্গাবাদ, বনস্কণ্ঠ, বরোদা, ভাণ্ডারা, ভির, বোম্বাই সাবার্বণ, ব্রোচ, বুলদানা, চান্দা, দাংগস্, পূর্ব্ব খান্দেশ, গোহিলওয়াড়, হালার, কায়রা, কোলাবা, কোল্হাপুর, কচ্ছ, মেহসানা, মধ্য সৌরাষ্ট্র, নাগপুর, নান্দেড়, নাসিক, ওসমানাবাদ, পঞ্চমহল, পার্ডানি, পুনা, রত্নগিরি, সবরকণ্ঠ, উত্তর সাতারা, দক্ষিণ সাতারা, সোলাপুর, সোরাথ, সুরাট, থানা, ওয়ার্দ্ধা, পশ্চিম খান্দেশ, ডিউডমন, ডালাওয়াড়।
জম্মু ও কাশ্মীর	৯	অনন্তনাগ, বারামুলা, দোদা, জম্মু, কাঠুয়া, লাডক্, পুঞ্চ (রাজৌরী), শ্রীনগর, উধামপুর।
কেরালা	৯	কোটায়াম, মালাবার, কুইলন, ত্রিচুর, ত্রিভেন্দ্রম্।
মধ্য প্রদেশ	৪০	বালাঘাট, বাস্তার, বেতুল, ভিন্দ্, ভিলসা, বিলাসপুর, ছাতারপুর, ছিন্দ্ওয়ারা, দাতিয়া, ডিওয়াস, ধর, দুর্গ, গার্ড, গুণা, হোশাঙ্গাবাদ, ইন্দোর, জবলপুর, ঝাবুয়া, মান্ডলা, মান্দ্সাউর, মোরেনা, নিমার (১), নিমার (২), পান্না, রায়গড়, রায়পুর, রায়সেন, রাজগড়, রাতলাম, রেওয়া, সাগর, সাওগড়, সেহর, শাহদল, শাজাপুর, শিবপুরি, সিদ্ধি, সারগুজা, টিকামগড়, উজ্জৈন।

মোট জিলা	রাজ্য অধীনস্থ জিলাসমূহ
	চিঙ্গলিপেট, কয়েমবাটোর, কন্যাকুমারী, মাদুরাই, নীলগিরি, উত্তর আর্কট, রামনাথপুরম্, সালেম, দক্ষিণ আর্কট, তাঞ্জোর, তিরুচিরাপালী, তিরুনেলভেলি।
	বাঙ্গালোর, বেলগাঁও, বেলারী, বিদর, বিজাপুর, চিক্‌মাঙ্গালুর, চিতলদ্রুগ, কুর্গ, ধারওয়ার, গুলবার্গা, হাসান, কানাড়া, কোলার, মান্ডা, মহীশূর, রাইচুর, সিমোগা, দক্ষিণ কানাড়া, টুমকুর
	বালাশোর, বৌধ-খুলডাঙ্গী, বোলাঙ্গির, কটক, ধেনকানাল, গঞ্জাম, কালাহান্ডি, কোরাপুট, ময়ূরভঞ্জ, পুরী, সম্বলপুর, সুন্দরগড়।
	আম্বালা, অমৃতসহর, ভাটিণ্ডা, ফিরোজপুর, গুরদাসপুর, গুরগাঁও, হিসার, হোসিয়ারপুর, জলন্ধর, কাঙ্গরা, কপুরতলা, কার্ণাল, লুধিয়ানা, মহিন্দরগড়, পাতিয়ালা, রোহটাক্, সাঙ্গর, সিমলা।
	আজমীর, আলওয়ার, বনসওয়ারা, বারমার, ভরতপুর, ভিলওয়ারা, বিকানীর, বুঁদি, চিতোরগড়, চুরু, গঙ্গানগর, গলশনাগড়, জয়পুর, জয়সলমির, জেলোর, ঝালওয়ার, ঝুনঝুনু, যোধপুর, কোটা, নাগোর, পালি সাওয়াই মাধোপুর, সিকার, সিরোহি, টঙ্ক, উদয়পুর।
উত্তর প্রদেশ ৪১	আগ্রা, আলিগড়, এলাহাবাদ, আলমোড়া, আজমগড়, বাহরাইচ, বালিয়া, বানারস, বাঁদা, বড়বাঙ্কী, বেরেলি, বাস্তি, বিজনৌর, বাঁদাও, বুলন্দসহর, ডেরাদুন, দেউড়িয়া, এটাওয়া, এটা, ফয়জাবাদ, ফারুকাবাদ, ফতেহপুর, গাড়োয়াল, গাজীপুর, গোণ্ডা, গোরক্ষপুর, হামিরপুর, হারদোই, জালাউন, জৌনপুর, ঝান্সি, কানপুর, খেরী, লক্ষ্ণৌ, মেনপুরী, মথুরা, মিরাট, মির্জাপুর, মোরদাবাদ, মজঃফরনগর, নৈনীতাল, পিলিভিত, প্রতাপগড়, রায়বেরেলী, রামপুর, সাহারানপুর, সাহজাহানপুর, সিতাপুর, সুলতানপুর, তেহরী গাড়োয়াল, উনাও।
পশ্চিমবঙ্গ	বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, কুচবিহার, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙ।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শাসিত রাজ্যসমূহ

দিল্লী	
ত্রিপুরা	
মণিপুর	
হিমাচল প্রদেশ ৫	বিলাসপুর, চাম্বা, মাহাসু, মাণ্ডি, সিরমুর।
আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	
লাক্কা, মিনিকয় ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জ	

ভারতের ১৭টি রাজ্যপাল কর্তৃক শাসিত রাজ্যে প্রায় ৩১০টি জিলা বিদ্যমান। অবশিষ্ট কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শাসিত রাজ্যসমূহে কমপক্ষে ১০টি জিলা আছে বলিয়া বিশ্বাস। এই সমস্ত রাজ্যের মধ্যে কয়েকটি এত ছোট যে ছোট ছোট জিলায় বিভক্ত করা হয় নাই।

এই রাজ্যগুলিকে আয়তন, লোকসংখ্যা, কৃষিভূমি ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সংখ্যা-তথ্য-অনুযায়ী সাজাইলে উহাদের ক্রম প্রত্যেক ক্ষেত্রে এক হয় না। ঐ ক্রম হইতে মানবের কর্ম-পদ্ধতি ও আর্থিক অবস্থা অনুমান করা যাইতে পারে, বিয়ে সংখ্যা-তথ্য অনুযায়ী রাজ্যগুলির ক্রম বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাজান হইল।

রাজ্য সমূহ	জিলার সংখ্যা এবং তৎ অনুপাতে ক্রম	ভৌগোলিক আয়তন (হাজার বর্গ মাইল) ও সেই অনুপাতে ক্রম	লোকসংখ্যা (হাজার জন) ও সেই অনুপাতে ক্রম	প্রতি হাজার একরে লোকসংখ্যার জন সংখ্যা ও সেই অনুপাতে ক্রম	চলতি জমির আয়তন (হাজার একর) এবং সেই অনুপাতে ক্রম	আবাদী জমির আয়তন (হাজার একর) ও সেই অনুপাতে ক্রম	প্রধান খাদ্যশস্য জমি (হাজার একর) এবং সেই অনুপাতে ক্রম	প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদন (হাজার টন)	গৃহপালিত পশুর হাজার সংখ্যা (১৯৫০) এবং সেই অনুপাতে ক্রম
বোম্বাই		১২১,৪৭৫ (প্রথম)	৪৮,২৭২ (দ্বিতীয়)	৪০০ (অষ্টম)	৩,৪৩৩ (ষষ্ঠ)	৬৬,০৩২ (প্রথম)	৩৪,৫৭৩ (প্রথম)	৬১০৫ (দ্বিতীয়)	২০২৩১ (তৃতীয়)
মধ্যপ্রদেশ	(তৃতীয়)	১৭৯,৩৮২ (দ্বিতীয়)	২৬,১০১ (সপ্তম)	২০০ (একাদশ)	২০৪৭ (নবম)	৩৭৫৪০ (তৃতীয়)	২৫,৪৯৯ (তৃতীয়)	৪৪৬৬ (তৃতীয়)	২২,৪৬০ (দ্বিতীয়)
রাজস্থান	২৬ (চতুর্থ)	৮৪,৭৬১ (তৃতীয়)	১৫,২৪০ (দশম)	(দ্বাদশ)	২৮৭৬ (সপ্তম)	২৬,৬২০ (পঞ্চম)	১৪,১৮৪ (ষষ্ঠ)	২৫৭৮ (দশম)	১২,১২৭ (পঞ্চম)
উত্তরপ্রদেশ	৫১ (প্রথম)	৭২,৪৯৭ (চতুর্থ)	৬৩,২১৬ (প্রথম)	৯০০ (পঞ্চম)	১২,৪৮৭ (প্রথম)	৪০,৯৫৯ (দ্বিতীয়)	৩২,৩৬৯ (দ্বিতীয়)	৯০১১ (প্রথম)	২২,৯৩৮ (প্রথম)
অন্ধ্র প্রদেশ	২০ (পঞ্চম)	৬৭,৮৩৩ (পঞ্চম)	৩১,২৫৩ (চতুর্থ)	৫০০ (সপ্তম)	৩,৫৮৫ (তৃতীয়)	২৭,২৭১ (চতুর্থ)	১১,৯২৪ (চতুর্থ)	৪৯২৫ (চতুর্থ)	১০,৯৫৮ (সপ্তম)
জম্মু ও কাশ্মীর	২ (ত্রয়োদশ)	৪৯,৩৭৯ (ষষ্ঠ)	৪,৪১০ (চতুর্দশ)	৭০ (সপ্তদশ)	৬৪৯ (চতুর্দশ)	১৬৮১ (চতুর্দশ)	১১৮৪ (চতুর্দশ)	৪০৭ (চতুর্দশ)	১৭৪৭ (চতুর্দশ)
	১২ (দ্বাদশ)	৫৪,৪০৮ (সপ্তম)	৯০৪৪ (ত্রয়োদশ)	১৭০ (ত্রয়োদশ)	১৩৭৪ (দ্বাদশ)	৪০৮১ (দ্বাদশ)	৪২৬৫ (দ্বাদশ)	১৬০৮ (দ্বাদশ)	৫২৪৭ (দ্বাদশ)
মহীশূর	১৯ (ষষ্ঠ)	৭৭,৪২০ (অষ্টম)	১৯,৫০১ (অষ্টম)	৪০০ (অষ্টম)	১৬৩৩ (একাদশ)	২৪,০৭৮ (ষষ্ঠ)	১০৫৮৬ (সপ্তম)	২৮৪১ (নবম)	৮২৯৭ (নবম)
বিহার	১৭ (নবম)	৬২,৩৪৩ (নবম)	৩৮,৩৫৫ (তৃতীয়)	৯০০ (পঞ্চম)	৪১৯৭ (পঞ্চম)	১২২৩২ (সপ্তম)	১৭ ৪৩৩ (পঞ্চম)	৩৯৮৩ (ষষ্ঠ)	১৪৩০১ (চতুর্থ)
উড়িষ্যা	১৩ (একাদশ)	৩৮,৪৮৭ (দশম)	১৪,৬৪৬ (একাদশ)	৩৯০ (নবম)	১৭৩৯ (দশম)	১৪১১৬ (নবম)	১০,০২৪ (দশম)	২২০৮ (একাদশ)	৮০৩৬ (দশম)
মাদ্রাজ	১১ (ষোড়শ)	৩০,১০২ (একাদশ)	২২,৯৮০ (পঞ্চম)	৯৮০ (চতুর্থ)	৫২৩৮ (চতুর্থ)	১৪০৩৪ (দশম)	১০,৬০২ (নবম)	৩৯৩২ (সপ্তম)	৯৮৫৯ (অষ্টম)

	২	৩	৪		৬	৭	৮	৯	১০
	১৮	৩০,৫৫১	১৬,১৩৫		৭৪৭৯	১৬৮৯৪	৯৯৩৭	৩০৬২	৫৯৭৯
	(সপ্তম)	(দ্বাদশ)	(নবম)		(দ্বিতীয়)	(অষ্টম)	(একাদশ)	(অষ্টম)	(একাদশ)
	১৫	২২,৩৬৪	১৬,৬৮১		১৮৫৫	১৩,১৭৭	১০৯১৫	৪৪২১	১১,৫০৭
	(দশম)	(ত্রয়োদশ)	(ষষ্ঠ)		(অষ্টম)	(একাদশ)	(অষ্টম)	(পঞ্চম)	(ষষ্ঠ)
	৫	৯,৩৪৫	১৩,৫১৪			৪৩৩১	১৮৭৯	৭৪৮	২৫৩৬
	(চতুর্দশ)	(চতুর্দশ)	(দ্বাদশ)		(ত্রয়োদশ)	(ত্রয়োদশ)	(ত্রয়োদশ)	(ত্রয়োদশ)	(ত্রয়োদশ)
হিমাচল প্রদেশ	৫	৬৯৮২	১,১০৯		২৩	৬৬৭	৪৮০	২০২	১৭১১
	(চতুর্দশ)	(পঞ্চদশ)	(ষোড়শ)	(চতুর্দশ)	(পঞ্চদশ)	(পঞ্চদশ)	(পঞ্চদশ)	(পঞ্চদশ)	(পঞ্চদশ)
মণিপুর	—	৫৫১৮	৫৭৮		—	২০৩	১৯২		১৪৩
		(ষোড়শ)	(অষ্টাদশ)	(পঞ্চদশ)		(অষ্টাদশ)	(সপ্তদশ)	(সপ্তদশ)	(সপ্তদশ)
		২৫৮০	৬৩২	২৫০		৪৬২	৩২৮		৩১৭
		(সপ্তদশ)	(সপ্তদশ)	(দশম)		(ষোড়শ)	(ষোড়শ)	(ষোড়শ)	(ষোড়শ)
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	—	২০৫৮	৩১	১৫	—	১২	৭		৫
		(অষ্টাদশ)	(ঊনবিংশ)	(অষ্টাদশ)		(ঊনবিংশ)	(ঊনবিংশ)	(ঊনবিংশ)	(ঊনবিংশ)
দিল্লী	—	৩৭৩	১৭৪৪	৪৭০০	৮৮	২২৭		৩৭	১২০
		(ঊনবিংশ)	(পঞ্চদশ)	(প্রথম)	(ষোড়শ)	(সপ্তদশ)	(অষ্টাদশ)	(অষ্টাদশ)	(অষ্টাদশ)
লাক্কা দ্বীপপুঞ্জ	—	২৪৬	২১	৮৬	—	—	—	—	—
		(বিংশ)	(বিংশ)	(ষোড়শ)					

উপরিউক্ত তথ্যগুলি ভারত-সরকারের প্রকাশিত সংখ্যা-তথ্য হইতে সংগৃহীত। এইবার রাজ্যগুলির ক্রমিক স্থান ভৌগোলিক ও মনুষ্য কর্ষণ-পদ্ধতি অনুযায়ী স্থির করা যাক্। আয়তন, লোকসংখ্যা, ছাড়ার পিছু লোকসংখ্যার ঘনত্ব, জলসেচ জমি, কৃষিজমি, ফসল উৎপাদন এবং গৃহপালিত পশুর সংখ্যা সম্বন্ধীয় ব্যাপারে রাজ্যগুলি কিরূপ স্থান অধিকার করে, উহার হিসাব নিম্নে বিভিন্ন স্তম্ভে দেখান হইল। প্রত্যেক স্তম্ভে রাজ্যগুলি স্ব-স্ব অবস্থান অনুযায়ী সাজান হইয়াছে। এইরূপ তথ্য হইতে রাজ্যগুলিতে মনুষ্য-কর্ষণ-পদ্ধতি কি ধরণের উহা কিছুটা অনুমান করা যাইবে।

রাজ্যগুলির অবস্থান

স্থান	ভৌগোলিক আয়তন অনুযায়ী	লোকসংখ্যা অনুযায়ী	প্রতিবর্গমাইলে লোকসংখ্যার ঘনত্ব অনুযায়ী	জলসেচ জমি অনুযায়ী	আবাদী জমি অনুযায়ী	ফসল গাছপালার জমি অনুযায়ী	উৎপাদন অনুযায়ী	গৃহপালিত পশুর সংখ্যা অনুযায়ী
প্রথম	বোম্বাই	উত্তরপ্রদেশ	দিল্লী	উত্তরপ্রদেশ	বোম্বাই	বোম্বাই	উত্তরপ্রদেশ	উত্তরপ্রদেশ
দ্বিতীয়	মধ্যপ্রদেশ	বোম্বাই	কেরালা	পাঞ্জাব	উত্তরপ্রদেশ	উত্তরপ্রদেশ	বোম্বাই	মধ্যপ্রদেশ
তৃতীয়	রাজস্থান	বিহার	পশ্চিমবঙ্গ	অন্ধ্রপ্রদেশ	মধ্যপ্রদেশ	মধ্যপ্রদেশ	মধ্যপ্রদেশ	বোম্বাই
চতুর্থ	উত্তরপ্রদেশ	অন্ধ্রপ্রদেশ	মাদ্রাজ	মাদ্রাজ	অন্ধ্রপ্রদেশ	অন্ধ্রপ্রদেশ	অন্ধ্রপ্রদেশ	বিহার

পঞ্চম	অন্ধ্রপ্রদেশ	মাদ্রাজ	বিহার ও উঃ প্রদেশ	বিহার	রাজস্থান	বিহার	পশ্চিমবঙ্গ	রাজস্থান
ষষ্ঠ	জম্মু ও কাশ্মীর	পঃ বঙ্গ	পাঞ্জাব	বোম্বাই	মহীশূর	রাজস্থান	বিহার	পঃ বঙ্গ
সপ্তম	আসাম	মধ্যপ্রদেশ	অন্ধ্রপ্রদেশ	রাজস্থান	বিহার	মহীশূর	মাদ্রাজ	অন্ধ্রপ্রদেশ
অষ্টম	মহীশূর	মহীশূর	বোম্বাই ও মহীশূর	পঃ বঙ্গ	পাঞ্জাব	পঃ বঙ্গ	পাঞ্জাব	মাদ্রাজ
নবম	বিহার	পাঞ্জাব	উড়িষ্যা	মধ্যপ্রদেশ	উড়িষ্যা	মাদ্রাজ	মহীশূর	মহীশূর
দশম	উড়িষ্যা	রাজস্থান	ত্রিপুরা	উড়িষ্যা	মাদ্রাজ	উড়িষ্যা	রাজস্থান	উড়িষ্যা
একাদশ	মাদ্রাজ	উড়িষ্যা	মধ্যপ্রদেশ	মহীশূর	পঃ বঙ্গ	পাঞ্জাব	উড়িষ্যা	পাঞ্জাব
দ্বাদশ	পাঞ্জাব	কেরালা	রাজস্থান	আসাম	আসাম	আসাম	আসাম	আসাম
ত্রয়োদশ	পশ্চিমবঙ্গ	আসাম	আসাম	কেরালা	কেরালা	কেরালা	কেরালা	কেরালা
চতুর্দশ	কেরালা	জম্মু ও কাশ্মীর	হিমাচল প্রদেশ	জম্মু ও কাশ্মীর	জম্মু ও কাশ্মীর	জম্মু ও কাশ্মীর	জম্মু ও কাশ্মীর	জম্মু ও কাশ্মীর
	হিমাচল প্রদেশ	দিল্লী	মণিপুর	হিমাচল প্রদেশ	হিমাচল প্রদেশ	হিমাচল প্রদেশ	হিমাচল প্রদেশ	হিমাচল প্রদেশ
ষোড়শ	মণিপুর	হিমাচল প্রদেশ	লাক্কা দ্বীপ	দিল্লী	ত্রিপুরা	ত্রিপুরা	ত্রিপুরা	ত্রিপুরা
সপ্তদশ	ত্রিপুরা	ত্রিপুরা	জম্মু ও কাশ্মীর	—	দিল্লী	মণিপুর	মণিপুর	মণিপুর
অষ্টাদশ	আন্দামান ও নিকো	মণিপুর	আন্দামান ও নিকো	—	মণিপুর	দিল্লী	দিল্লী	দিল্লী
ঊনবিংশ	দিল্লী	আন্দামান ও নিকো	—		আন্দামান ও নিকো	আন্দামান ও নিকো	আন্দামান ও নিকো	আন্দামান ও নিকো
			—	—	লাক্কা দ্বীপ	লাক্কা দ্বীপ	লাক্কা দ্বীপ	লাক্কা দ্বীপ

ভৌগলিক আয়তনে বোম্বাই রাজ্যটি সর্ব্বপ্রথম সত্য, কিন্তু লোকসংখ্যায় রাজ্যটির স্থান দ্বিতীয়। প্রতি হাজার একরে লোকসংখ্যার ঘনত্ব হিসাবে রাজ্যটি অষ্টম স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, রাজ্যটি কিছুটা পার্ব্বত্য বলিয়া, লোক-বসতি সর্ব্বত্র ঘন নহে। ইহা ছাড়া চাষবাসের কিছুটা সুবিধাও আছে। বোম্বাই রাজ্যে আবাদী জমি এবং খাদ্য-শস্যে নিয়োজিত জমির আয়তন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। খাদ্য-শস্য উৎপাদনে বোম্বাই রাজ্যটি ভারতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। গৃহ-পালিত পশুর সংখ্যা বোম্বাই রাজ্যে কম নহে। অন্যান্য রাজ্যের সহিত তুলনা করিলে পশু-সংখ্যায় রাজ্যটি ভারতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

ভৌগলিক আয়তনে মধ্যপ্রদেশটি ভারতে দ্বিতীয় স্থানে অধিকার করিয়াছে। বস্তুর এই রাজ্যে মোট লোকসংখ্যা ও উহার ঘনত্ব আয়তনের তুলনায় বেশ কম। ভারতে ঐ দুই বিষয়ে মধ্যপ্রদেশটি সপ্তম ও একাদশ স্থান অধিকার করে। ঐ রাজ্যে চলনসই জমির পরিমাণ স্বল্প হইলেও কৃষিকার্য্যে রাজ্যটির স্থান অনেকটা একরূপ। আবাদী জমি, খাদ্য-শস্যের জমি ও উৎপাদন এই সমস্ত বিষয়ে মধ্যপ্রদেশের স্থান ভারতে তৃতীয়। পশুপালনে ভারতে রাজ্যগুলির মধ্যে মধ্যপ্রদেশ দ্বিতীয় স্থান পাইয়াছে।

উত্তর দেশ রাজস্থান আয়তনে তৃতীয় হইলে কি হইবে, লোকসংখ্যায় দশম, এবং লোকসংখ্যার ঘনত্বে আরও নিম্নে। উহা দ্বাদশ স্থান। উত্তর রাজ্যে চলনসই উন্নয়নে আবাদী জমির পরিমাণ বাড়ায়, রাজ্যটি ঐ বিষয়ে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। আবাদী জমির অধিকাংশে খাদ্য-শস্যের চাষ হওয়ায়, খাদ্য-শস্য উৎপাদনে দশম হইলে, ফসল জমির

আয়তনে রাজ্যের স্থান ষষ্ঠ। ভূমি তত উর্বর নহে বলিয়া, উৎপাদন পরিমাণ মহীশূর, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব নামক রাজ্যগুলি আয়তন অনুযায়ী উহারা ক্রমান্বয়ে অষ্টম হইতে দ্বাদশ স্থান অধিকার করে। লোকসংখ্যা ও অন্যান্য মনুষ্য কর্ম্ম-পদ্ধতি ঐ রাজ্যগুলির স্থান সামান্য পরিবর্ত্তিত হইলেও, সাধারণ মান অনেকটা একরূপ। রাজ্যগুলিতে নানা সম্পদ আছে সত্য। কিন্তু ঐ সকল সম্পদ যথাযথভাবে কার্য্যে নিয়োজিত না হওয়ায় রাজ্যগুলি এখনও কৃষি-প্রধান। যাহা হউক, রাজ্যগুলিতে ভ্রম-শিল্পের এবং খনিজ শিল্পের উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়।

ভৌগোলিক আয়তনে ত্রয়োদশ স্থান অধিকার করে পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটি। কিন্তু লোক সংখ্যায় উহার স্থান ষষ্ঠ এবং লোকসংখ্যা ঘনত্ব হিসাবে রাজ্যটির মান তৃতীয়। আবাদী জমির পরিমাণ স্বল্প। এই কারণে কৃষি-জমির উপর চাপ অত্যন্ত অধিক। খাদ্য-শস্য উৎপাদনে রাজ্যটির স্থান নগণ্য নহে। উহার স্থান ঐ বিষয়ে পঞ্চম। গবাদি পশু লালন-পালনে রাজ্যটি বর্ত্তমানে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

কেরালা রাজ্যটি রাজ্যপালের দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকার করিলেও, লোকসংখ্যায় ও লোকসংখ্যার ঘনত্বে বেশ উচ্চ স্থান অধিকার করে। বিশেষতঃ শেষোক্ত বিষয়ে রাজ্যের স্থান দ্বিতীয়। কেরালা রাজ্যে কৃষি-কার্য্যই প্রধান মনুষ্য-উপজীবিকা।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শাসিত অবশিষ্ট ছয়টি রাজ্যের ভৌগোলিক আয়তন, লোকসংখ্যা ও কৃষি অনেকটা অনুপাতে সমরূপ। রাজ্যগুলি কৃষিপ্রধান উহাতে সন্দেহ নাই। উহাদের মধ্যে অনেকগুলি বনজসম্পদে পুষ্ট।

ভারতের রাজ্যগুলির সংখ্যাতথ্য হইতে পারস্পরিক মান আলোচনা করা হইল। এক্ষণে প্রত্যেকের মোট আবাদী জমির তুলনায় রাজ্যগুলির আবাদী-জমি শতকরা কত এবং তৎসহ উহাদের পারস্পরিক মান কিরূপ উহাই আলোচিত হইল। প্রত্যেক রাজ্যে খাদ্য-শস্যে নিয়োজিত জমি, খাদ্য-শস্যে সামান্য। আবাদী জমির মত পশুপালনে রাজস্থান ভারতে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছে।

উত্তর প্রদেশ ভৌগোলিক আয়তনে চতুর্থ স্থান অধিকার করিলেও লোকসংখ্যায়, ফলসেচ জমিতে, খাদ্য-শস্য উৎপাদনে এবং পশুপালনে ভারতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম। আবাদী জমি এবং খাদ্য-শস্য উৎপাদন জমির হিসাবে উত্তর প্রদেশের স্থান দ্বিতীয়। রাজ্যটি কৃষি-বিষয়ে বিশেষ উন্নত। এই কারণে লোকসংখ্যার ঘনত্বে রাজ্যটি পঞ্চম স্থান পাইয়াছে।

অন্ধ্রপ্রদেশটি আয়তনে উত্তর প্রদেশের ঠিক পরেই অর্থাৎ স্থান পঞ্চম। লোকসংখ্যায় ও ঘনত্বে ক্রমান্বয়ে চতুর্থ এবং সপ্তম। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—ভূপ্রকৃতি বন্ধুর এবং স্থানে স্থানে বসবাসের অযোগ্য। ফলসেচ জমির পরিমাণে রাজ্যটি তৃতীয় স্থান অধিকার করিলেও, কৃষিজমি ও খাদ্য-শস্য উৎপাদনে রাজ্যটির স্থান চতুর্থ। কিন্তু চারণ ভূমির অভাবে সামান্য সংখ্যক গৃহপালিত পশু পালিত হয় বলিয়া রাজ্যটি ভারতের মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করে।

পর্ব্বতসঙ্কুল জম্মু ও কাশ্মীর আয়তনে সামান্য নহে। ভারতে ঐ রাজ্যের স্থান ষষ্ঠ। লোকসংখ্যায় ও মনুষ্যের কর্ম্ম-পদ্ধতিতে উহার স্থান অনেক নিম্নে। বর্ত্তমানে রাজ্যটির স্থান চতুর্দ্দশ, কেবলমাত্র লোকসংখ্যার ঘনত্বে উহার স্থান সপ্তদশ।

পর্ব্বত ও নদী উপত্যকা দ্বারেত পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত আসাম রাজ্যটি আয়তনে সপ্তম হইলেও, লোকসংখ্যায় ত্রয়োদশ এবং কৃষি ও পশুপালনে রাজ্যটি দ্বাদশ স্থান অধিকার করে। বনাকীর্ণ বন্ধুর রাজ্যে কৃষিকার্য্য কেবলমাত্র নদী-পার্শ্বে বিশেষভাবে দেখা যায়। এই কারণে ভারতে রাজ্যটির ভৌগোলিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ হইলেও, মনুষ্য-কর্ম্মপদ্ধতিতে উহার স্থান তত উচ্চ নহে। বনজ সম্পদে রাজ্যটির স্থান উচ্চ। এমন কি খনিজ সম্পদও কম নহে। ঐ দুই বিষয়ে কর্ম্ম-ধারার কিছু উন্নয়ন আবশ্যক।

নিম্নোক্ত মোট জমির শতকরা কত এবং সেই অনুপাতে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন মান কিরূপ, উহাও বিশ্লেষিত হইল। ঐ সমস্ত তথ্য হইতে রাজ্যগুলির কৃষি-অবস্থা অনুমিত হইবে। তথ্যগুলি হইতে চারিটি বিশেষ অঞ্চল নির্ণয়িত হইল। শতকরা ১৫ ভাগের উর্ধ্বে সর্বোচ্চ অঞ্চল; শতকরা ১০ ভাগ হইতে ১৫ ভাগ পর্যন্ত উচ্চ অঞ্চল; শতকরা ৫ ভাগ হইতে ১০ পর্যন্ত মধ্যম অঞ্চল এবং শতকরা ৫ ভাগের কম অঞ্চলগুলিকে সামান্ত অঞ্চল বলা হইল।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র ও কৃষি-অঞ্চল

(ক) আবাদী জমি অনুসারে

অঞ্চল	রাজ্য-সমূহ
সর্বোচ্চ অঞ্চল (শতকরা ১৫ ভাগের উর্ধ্বে)	
উচ্চ অঞ্চল (শতকরা ১০ ভাগ হইতে ১৫ ভাগ পর্যন্ত)	উত্তর প্রদেশ (১৩%) ; মধ্যপ্রদেশ (১২%)
মধ্যম অঞ্চল (শতকরা ৫ ভাগ হইতে ১০ ভাগ পর্যন্ত)	অন্ধ্রপ্রদেশ (৮·৭%) ; রাজস্থান (৮·৭%) ; মহীশূর (৭·৭%) ; বিহার (৬·১%) ; পাঞ্জাব (৫·৪%)
সামান্ত অঞ্চল (শতকরা ৫ ভাগের কম)	উড়িষ্যা (৪·৫%) ; মাদ্রাজ (৪·৫%) ; পশ্চিমবঙ্গ (৪·১%) ; আসাম (২·৬%) ; কেরালা (১·৪%) ; জম্মু ও কাশ্মীর (·৫%) ; হিমাচল প্রদেশ (·২%) ; ত্রিপুরা (·১%) ; দিল্লী (·০১%) ; মনিপুর (·০৬%) এবং আন্দামান-নিকোবর ও লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ (অবশিষ্ট শতকরা ভাগ)

(খ) প্রধান খাদ্য-শস্যে নিয়োজিত জমি অনুসারে

অঞ্চল	রাজ্য-সমূহ
সর্বোচ্চ অঞ্চল (শতকরা ১৫ ভাগের উর্ধ্বে)	বোম্বাই (১৭·১%) এবং উত্তর প্রদেশ (১৫·৬%)
উচ্চ অঞ্চল (শতকরা ১০ ভাগ হইতে ১৫ ভাগ)	মধ্য প্রদেশ (১২·৩%)
মধ্যম অঞ্চল (শতকরা ৫ ভাগ হইতে ১০ ভাগ পর্যন্ত)	অন্ধ্রপ্রদেশ (৮·৬%) ; বিহার (৮·৪%) ; রাজস্থান (৬·১%) ; মহীশূর (৬·৫%) ; মাদ্রাজ (৫·১%) ; পশ্চিমবঙ্গ (৫%) ; উড়িষ্যা (৫%)
সামান্ত অঞ্চল (শতকরা ৫ ভাগের কম)	পাঞ্জাব (৪·৮%) ; আসাম (২%) ; কেরালা (·৯%) ; জম্মু ও কাশ্মীর (·৫%) ; হিমাচল প্রদেশ (·৪%) ; ত্রিপুরা (·২%) ; মনিপুর (·০১%) ; দিল্লী (·০১%) এবং আন্দামান নিকোবর ও লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ (যৎসামান্ত)

(গ) প্রধান প্রধান খাদ্য-শস্যের উৎপাদন অনুসারে

অঞ্চল	রাজ্য-সমূহ
১। সর্বোচ্চ অঞ্চল	
(শতকরা ১৫ ভাগের উর্দ্ধে)	উত্তর প্রদেশ (১৭·৩%)
উচ্চ অঞ্চল	
(শতকরা ১০ ভাগ হইতে ১৫ ভাগ পর্য্যন্ত)	বোম্বাই (১১·৭%) ; এবং মধ্যপ্রদেশ (১০·৪%)
মধ্যম অঞ্চল	
(শতকরা ৫ ভাগ হইতে ১০ ভাগ পর্য্যন্ত)	অন্ধ্রপ্রদেশ (৯·৪%) ; পশ্চিমবঙ্গ (৮·৪%) ; বিহার (৭·৬%) ; মাদ্রাজ (৭·৪%) ; পাঞ্জাব (৭·০%) ; মহীশূর (৫·৪%) ; রাজস্থান (৫·০%)
	উড়িষ্যা (৪·২%) ; আসাম (৩·০%) ; কেরালা (১·৪%) ; জম্মু ও কাশ্মীর (·৮%) ; হিমাচল প্রদেশ (·৪%) ; ত্রিপুরা (·২৫%) ; মণিপুর (·২% দিল্লী (·০৮%) ; এবং আন্দামান নিকোবর ও লাক্কা দ্বীপপুঞ্জ (নগণ্য)

(ঘ) গবাদি পশু অনুসারে

অঞ্চল	রাজ্যসমূহ
১। সর্বোচ্চ অঞ্চল	— — —
(শতকরা ১৫ ভাগের উর্দ্ধে)	
উচ্চ অঞ্চল	উত্তর প্রদেশ (১৮·৪%) ; মধ্যপ্রদেশ (১৪·১%) ; বোম্বাই
(শতকরা ১০ ভাগ হইতে ১৫ ভাগ পর্য্যন্ত)	(১২·৭%)।
মধ্যম অঞ্চল	বিহার (৯·০%) ; রাজস্থান (৭·৬% পশ্চিমবঙ্গ (৭·৩%) ;
(শতকরা ৫ ভাগ হইতে ১০ ভাগ পর্য্যন্ত)	অন্ধ্রপ্রদেশ (৬·৮%) ; মাদ্রাজ (৬·২%) ; মহীশূর (৫·৬%) ; উড়িষ্যা (৫·০%)।
সামান্য অঞ্চল	পাঞ্জাব (৩·৭%) ; আসাম (৩·৩%) ; কেরালা (১·৬%) ; জম্মু
(শতকরা ৫ ভাগের কম)	ও কাশ্মীর (১·১%) ; হিমাচল প্রদেশ (·৭%) ; ত্রিপুরা (·২%) ; মণিপুর (·০৯%) ; দিল্লী (·০৭%) ; আন্দামান নিকোবর এবং লাক্কা দ্বীপপুঞ্জ (নগণ্য)।

উপরি উক্ত শতকরা কৃষিতথ্য হইতে দেখা গেল যে, ভারতে বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ এই সকল রাজ্যগুলি যেমন আয়তনে বেশ বড়, তেমন কৃষিকার্য্যে বেশ উচ্চ স্থান অধিকার করে। পশ্চিমবঙ্গ, এবং মাদ্রাজ রাজ্যদ্বয় আয়তনে সামান্য অঞ্চলভুক্ত হইলে কি হয়, খাদ্য-শস্য উৎপাদনে ঐ দুই রাজ্যের স্থান মধ্যম অঞ্চলভুক্ত। এইবার প্রত্যেক রাজ্যে ভারতের মোট লোকসংখ্যার শতকরা কতজন লোক বাস করে, উহা জানা প্রয়োজন। ভারতের মোট লোকসংখ্যার তুলনায় রাজ্যগুলি শতকরা যত লোক বাস করে, উহা হইতে বিভিন্ন লোকবসতির অঞ্চল

নিম্নে নির্দ্ধারণ করা হইল। অঞ্চলগুলির বণ্টন এইভাবে স্থির হইল : শতকরা ১৫ ভাগের অধিক লোকবসতি অঞ্চলটিকে সর্ব্বোচ্চ লোকবসতি অঞ্চল বলা হইল ; শতকরা ১০ ভাগ হইতে ১৫ ভাগ পর্য্যন্ত লোকবসতি অঞ্চলটির নাম উচ্চ লোকবসতি অঞ্চল ; শতকরা ৫ ভাগ হইতে ১০ ভাগ পর্য্যন্ত লোকবসতি অঞ্চলটিকে মধ্যম লোকবসতি অঞ্চল এবং শতকরা ৫ ভাগের কম সংখ্যক লোকবসতি অঞ্চলটির নাম হইল সামান্য লোকবসতি অঞ্চল।

লোকবসতি অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল

লোকবসতি অঞ্চল	রাজ্যসমূহ
সর্ব্বোচ্চ (শতকরা ১৫ ভাগের অধিক)	উত্তর প্রদেশ (১৭·৫%)
উচ্চ (শতকরা ১০ ভাগ হইতে ১৫ ভাগ পর্য্যন্ত)	বোম্বাই (১৩·৪%) ;
মধ্যম (শতকরা ৫ ভাগ হইতে ১০ ভাগ পর্য্যন্ত)	অন্ধ্রপ্রদেশ (৮·৯%) ; মাদ্রাজ (৮·৩%) ; পশ্চিমবঙ্গ (৭·৭%) ; মধ্যপ্রদেশ (৭·২%) ; মহীশূর (৫·৪%)।
সামান্য (শতকরা ৫ ভাগের কম)	পাঞ্জাব (৪·৫%) ; রাজস্থান (৩·৬%) ; উড়িষ্যা (৪·০%) কেরালা (৩·৭%) ; আসাম (২·৫%) ; জম্মু ও কাশ্মীর (১·২%) : দিল্লী (·৬%) ; হিমাচল প্রদেশ (·৩%) ; ত্রিপুরা (·১৭%) : মণিপুর (·১৫%) ; আন্দামান নিকোবর এবং লাক্কা দ্বীপপুঞ্জ (অবশিষ্ট)

লোকবসতির গতি ও কৃষি-সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ অঞ্চল হইতে অনেকটা বুঝা যায় যে, খাদ্য-শস্যে অতিরিক্ত রাজ্য হিসাবে উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বোম্বাই, আসাম এবং রাজস্থান নামক রাজ্যগুলি অন্যতম শ্রেষ্ঠ। পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ এবং কেরালা নামক রাজ্যগুলিতে খাদ্যশস্যের কিছুটা অনটন আছে। বিহার মহীশূর, হিমাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, মণিপুর এবং জম্মু ও কাশ্মীর নামক রাজ্যগুলি চাহিদামত খাদ্যশস্য উৎপাদন করে। অন্যান্য রাজ্যগুলিতে লোকবসতি স্বল্প। প্রায়ই চাহিদামত বিশেষ বিশেষ খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হয়। প্রত্যেক রাজ্যে খাদ্যশস্যের চাহিদার উপর নির্ভর করিয়া চাষাবাদ করা হয়। প্রত্যেক রাজ্যে স্ব-স্ব আবাদী জমির অধিকাংশই খাদ্য-শস্যে নিয়োজিত হয়। ভারতে খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য নানাপ্রকার শস্য উৎপাদিত হয়। ইহা সত্য যে, প্রায় সমস্ত রাজ্যেই শতকরা ৫০ ভাগের উর্দ্ধ আবাদী জমিতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। খাদ্যশস্য বলিতে চাউল, গম, জোয়ার, বাজরা, যব, ভুট্টা নামক ফসলগুলিকে বুঝায়। উহাদের মধ্যে অন্যতম হইল চাউল, গম, ও মিলেট (জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি)। খাদ্যশস্যের চাহিদার উপর আবাদী জমির ব্যবহার অনেকটা নির্ভর করে।

প্রত্যেক রাজ্যে আবাদী জমির শতকরা কত ভাগ জমিতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, উহার তথ্য নিম্নে দেওয়া হইল।

আবাদী জমির তুলনায় ভারতের রাজ্যগুলিতে খাদ্য-শস্যে নিয়োজিত জমি (শতকরা) অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চল

অঞ্চল	রাজ্য-সমূহ
সর্ব্বোচ্চ অঞ্চল (শতকরা ৭৫ ভাগের অধিক)	মণিপুর (৯৮%) ; বিহার (৯১·৭%) ; পশ্চিমবঙ্গ (৯১·২%) ; ত্রিপুরা (৮৬·১%) ; আসাম (৮৪%) ; উত্তরপ্রদেশ (৮০·০%) ; মাদ্রাজ (৭৫·৭%)।

মধ্যম অঞ্চল (শতকরা ৫০ হইতে ৭৫ ভাগ)	দিল্লী (৭৩·৬%) ; হিমাচল প্রদেশ (৭২%) ; উড়িষ্যা (৭১·৫%) ; জম্মু ও কাশ্মীর (৭০%) ; মধ্যপ্রদেশ (৬৯%) ; অন্ধ্র প্রদেশ (৬৬·৪%) ; রাজস্থান (৬৬·১%) ; পাঞ্জাব (৫৯·০%) ; আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (৫৮·৩%) ; মহীশূর (৫৬·৬%) ; বোম্বাই (৫৩·৯%) ।
সর্ব্বনিম্ন অঞ্চল (শতকরা ৫০ ভাগের কম)	কেরালা (৪১%) ।

(লাক্কা দ্বীপপুঞ্জের সংখ্যাতথ্য পাওয়া যায় নাই)

নদীমাতৃক অঞ্চলে ও পার্ব্বত্য উপত্যকায় চাষাবাদের সুবিধা থাকায় আবাদী জমির অধিকাংশই খাদ্য-শস্য উৎপাদনে নিয়োজিত হয়। বন্ধুর বা ক্ষয়ীভূত বা শ্রমশিথিল উন্নত অঞ্চলে খাদ্য-শস্যে নিয়োজিত জমির পরিমাণ মধ্যম। কেরালা অঞ্চলে আবাদী হবার চাষে অনেকটা জমি নিয়োজিত হয়। ইহা ছাড়া পর্ব্বতসানুতে চা ও কফির চাষ হয়। উপকূলে নারিকেল বৃক্ষের সারি দেখা যায়। স্থানে স্থানে তামাক ও মসলা উৎপন্ন হয়।

ভারত কৃষি-প্রধান দেশ। লোকসংখ্যায় ভারতের স্থান বেশ উচ্চে। আবাদী জমি সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে চাষাবাদ করিয়া চাহিদামত খাদ্য-শস্য ভারতকে উৎপন্ন করিতে হইবে। খাদ্য-শস্য ব্যতীত ভারতে অনেকগুলি বাণিজ্যিক শস্যও উৎপন্ন হয়। সমস্ত প্রকার ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন সমবায়-প্রথায় চাষ। ঐ চাষ অঞ্চলভিত্তিক বণ্টন করা হইলে, উৎপাদন ভালই হইবে। দেশবাসী লাভবান হইবে। ভারতের জমিতে প্রকৃতি নিজেই সার দেন। ইহা ছাড়া প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ সার ব্যবহারে এবং উচ্চস্তরের বীজ বপন করিয়া প্রচুর ফসল উৎপন্ন করা আবশ্যক। এই বিষয়ে সকল ভারতবাসীর কিছু-না-কিছু চেষ্টা করা আবশ্যক। ভারত শস্য-শ্যামল দেশ। সমবেত চেষ্টায় ভারতে অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদন সহজসাধ্য হইবে।

ভারতবর্ষের আত্মিক সাধনা　　—রবীন্দ্রনাথ

"ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সে উত্তর আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে একটিকে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা—বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"

বাংলা ছোট-গল্পের ধারা

বিনয় সাহা

বাংলা ছোট-গল্পের বিষয়বস্তুর মান নির্ণয় করতে গিয়ে সমালোচকেরা মুখবন্ধে বিশেষ একটা কথা ফলাও করে প্রচার করেন। তা হল: পৃথিবীর সাহিত্যের দরবারে বাংলা ছোট-গল্প পংক্তিভোজের দাবী রাখে। কিন্তু উচ্চমান যাই হোক না কেন, সামগ্রিক বিচারে লেখার গড়পরতা হিসেবে একটা লজ্জাকর স্তরেই এসে দাঁড়ায়। অধুনা-প্রকাশিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, শারদীয়া, দেয়ালী, কলেজী ইত্যাদিতে বছরে স্বনামী, বেনামী, লেখকদের যে ছাপার কয়েক ছোটগল্প প্রকাশিত হয় তার কয়টা সুপাঠ্য হয়? কতগুলোই বা ছোট-গল্প আখ্যা লাভের যোগ্যতা রাখে? ছোট-গল্পের নামে তার কার্টুন রচনার ব্যর্থ প্রয়াস বা অপপ্রচেষ্টার নমুনা সর্বত্রই দৃষ্টিকটু ঠেকে। সবচেয়ে অবাক হতে হয় নামকরা লেখকদের ক্ষীয়মান চিন্তাশক্তির দৈন্যে। এদের সৃজনী-প্রতিভার ক্রমবর্ধিষ্ণু বিশেষভাবে ধরা পড়ে যখন রচনার সংখ্যার (কোয়ান্টিটি) সংগে গুণের (কোয়ালিটি) আনুপাতিক সম্পর্ক অন্বেষণ করা যায়। অথচ অনেকেই নিজেদের রচনা-বিশ্লেষের বিচারে রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা সাহিত্যের নিঃসংশয় অগ্রগতির বাহক। যুগান্তরের ইঙ্গিত সূচিত হয় তাদের প্রথম পদার্পণে। পরিতাপের কথা, দানা বাঁধবার আগেই সে ইঙ্গিত মিলিয়ে যায়।

এ দৈন্যের হেতু আছে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের ব্যবসায়ী-সুলভ মনোবৃত্তি এর প্রধানতম কারণ। রূপ-ভারতীর সাধনায় উঁহারের হাহাকারে (?) সৌভাগ্যের কৃপা ভিক্ষা করেন লক্ষ্মীকালো অন্ধকারে। এরপর আছেন প্রতিষ্ঠা-লোভী নবাগতরা, যারা যেন তেন প্রকারে বাজারে (?) ছাড়পত্র চান। এদের সূক্ষ্ম জীবন-বোধের অভাব আছে। সমাজ ও ব্যক্তিচেতনার সংঘাতে উদ্ভূত জীবনের নানাপ্রকার বহির্মুখীন সমস্যা সম্পর্কে এরা অর্থ সচেতন। অন্তরের কথা বাদ দিলেও, ছোট-গল্পের আংগিকের যে ন্যূনতম দাবী সেদিকেও সমপরিমাণে উদাসীন। দেশী-বিদেশী লেখকদের সার্থক প্রেমের গল্পের নির্লজ্জ অনুকরণ একটা রীতিতে দাঁড়িয়ে গেছে। তাই 'এ বয় মীটস এ গার্ল' টাইপ-এর গল্পের ছড়াছড়ি। যেন দেশের সব তরুণ-তরুণী, কলেজপালানো কপোত-কপোতীর দল, ঘোটাঘুটস্, লেক, ময়দান, আউটরাম ঘাট বা জানালার পর্দার আড়ালে পালা দিয়ে প্রেম করতে বসে গেছে। সাময়িক পত্র-পত্রিকার পরিচালক-সমালোচক গোষ্ঠীর স্বার্থ-লোলুপ দৃষ্টিভঙ্গি, ক্ষমতার রেষারেষি অহেতুক দলাদলি ভাল লেখকের প্রতি সুবিচারের পরিপন্থী। সাহিত্যিক সমাজের পুরোভাগে অবস্থিত মহারথীদের যে সমস্ত সমালোচনা-পুস্তক আজ-কাল প্রকাশিত হচ্ছে, তাও একদেশদর্শিতা-দোষে দুষ্ট। তাঁরা ভাল লেখকের উৎকৃষ্ট রচনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন যেমন, সেই লেখকের অধিকাংশ নিকৃষ্ট-গল্পের তিরস্কারে কুণ্ঠা বোধ করেন তেমনি।

ছোট-গল্পের স্বরূপ

লেখক লিখে যান। সে লেখায় তাঁর ব্যক্তিত্ব, জীবন বোধ, মননশীলতা, সমাজ-দর্শন, সর্বোপরি তাঁর অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখতে পাই। সৃজন-ধর্মী শিল্পী মনের তাগিদেই সৃষ্টি করেন। আনন্দের অর্থ্য রচনার নিয়ম-কানুন মেনে চলার অবকাশ তিনি পান না। সমালোচক, পাঠক তার মূল্য-মান যাচাই করেন নির্দিষ্ট মাপ কাঠিতে। কিন্তু তাই বলে সকল রকম সৃষ্টিকে তো আর এক ছাতে ফেলা যাবে না। ছোট-গল্প, কিংবদন্তী, ভ্রমণ-কাহিনী, রূপ-কথা, ক্যাবল্, উপাখ্যান—এদের প্রত্যেকে আপন আপন

বৈশিষ্ট্যে আলাদা জাতের। সে কারণে, সংক্ষিপ্ত পরিসরে সহজবোধ্য করে তোলার জন্য ছোট-গল্পের—বাংলা ছোট-গল্পেরও—একটা সংজ্ঞা দেয়া যেতে পারে, যাতে করে তার আত্মা ও শরীর-সংস্থান জানতে পারা যায়। একাজে মহাহস্তীদের গলা না মেলার বিরাট অসুবিধা সত্ত্বেও বিভিন্ন মতের মধ্যে একটা চলনসই সামঞ্জস্য 'বয়ান না করে উপায় নেই।

বিগত শতকের আমেরিকান লেখক এড্‌গার এলেন পো বলেন, 'যে কাহিনী গল্পে লেখা হবে, পড়তে আধঘণ্টা থেকে এক বা দু'ঘণ্টা সময় লাগবে, তাকে ছোট-গল্প বলা হবে।'

এ সংজ্ঞায় ছোট-গল্পের বহিরঙ্গের একটা মোটাদাগ পরিচয় দেবার প্রয়াস থাকলেও তার আত্মার খবর অজ্ঞাতই থেকে যায়। আমাদের 'বীরবল'ও সমগোত্রীয় সংজ্ঞা একটা দিয়েছিলেন : ছোট-গল্প ছোটও হবে, আবার গল্পও হবে। এও মূলতঃ দৈর্ঘ্যেরই বিচার। আসলকথা, ছোট-গল্পের কাহিনী 'টেল' বা 'র‍্যাবল'এর মত বিস্তৃত হবেনা : উপন্যাসের মত সম্প্রসারিত শাখা-প্রশাখাও থাকবে না তার। লিরিক বা গীতি-কবিতার মত গাঢ় হবে তার আংগিক।

ছোট-গল্পের অন্তর-ধর্মের পরিচয় পেতে হলে অনেকগুলি বিকল্পাল সমালোচকের মন্তব্য বিশ্লেষণ করতে হবে।

(ক) 'শুধু যা গল্প এক আকারে ছোট তাই ছোট গল্প নয়। আবার উপন্যাস ও ছোট-গল্প একবস্তু নয়। ছোট-গল্পে ভাবের ঐক্য আছে ; উপন্যাসে নেই।.....ছোট-গল্পে একটি মাত্র চরিত্র, ঘটনা বা ভাব থাকে, অথবা একটি পরিস্থিতির পটভূমিকায় কতকগুলি ভাবের সমাবেশ ঘটে।'—দি কিলমক্কী অব্‌ দি শর্ট স্টোরী : বি, ম্যাথুজ।

(খ) 'ছোট-গল্পে একটি সমস্যার সংকট রূপ প্রতিফলিত হবে।'—ওয়েবষ্টার ডিক্‌শনারী ও এনসাই-ক্লোপিডিয়া।

(গ) 'কবিতা যেমন হৃদয়ের একটি ভাব বা আবেগ প্রকাশের চেষ্টা করে, ছোট-গল্প সেইরূপ জীবনের একটি ঘটনার বর্ণনার চেষ্টা করে।.....চতুর্দিকব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে 'বুলস্‌ আই' লণ্ঠনের আলোক যেমন একস্থানে পতিত হইয়া সেই স্থানটুকুর সকল খুঁটিনাটি সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে, ছোট-গল্প রচনার কৌশল তেমনি জীবনের একটা ঘটনার উপর পতিত হইয়া তাহাকে সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করে।' —সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

(ঘ) 'দ্রুত বহমান জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লেখক স্বীয় আদর্শের অনুকূল বা প্রতিকূল ভাবসত্যকে অনুভব করবেন। তারই একটা স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি ছোট-গল্পে মূর্ত হবে'।—উপন্যাস।

(ঙ) 'ছোট-গল্প এক টুকরো শিল্প-কলা। তার মূল্য নির্দ্ধারণে একক উদ্দেশ্য ও ভাবের ঐক্যই বিচার্য '—হাড্‌সন্‌।

(চ) 'ছোট-গল্প বিশেষভাবে কোন একটা ব্যক্তি-সত্তারই প্রকাশ। সর্বোপরি এতে পাই লেখকের সংবেদনশীল মনের পরিচয়।'—এস, ও, জাওর্সে।

অতএব, ছোট-গল্পে চলমান জীবনের ঘটনাংশমাত্র লেখকের ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে একক উদ্দেশ্য ও ভাবের মধ্যে পরিস্ফুট হবে। ব্র্যাণ্ডার ম্যাথুজ, উপন্যাস, হাড্‌সন, ওয়েবষ্টার ডিক্‌শনারী মূলতঃ একই কথা পরিবেশন করেছেন। কেবল মাত্র জাওর্সে লেখকের ব্যক্তিত্বের উপর জোর দিয়েছেন। জাওর্সের বক্তব্য যে কতটা অভ্রান্ত তার প্রমাণ আমরা বাংলা সাহিত্যেও পাই। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' ও প্রভাতকুমারের 'আদরিণী' দুটি প্রাণীকে কেন্দ্র করে দুটি গল্প। তথাপি শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব-গুণে 'মহেশ' পল্লীবাংলার নির্যাতিত কৃষক-সমাজের আর্তনাদের প্রতিধ্বনি। অপরদিকে রসিক প্রভাতকুমার সামাজিক ট্রাজেডীর ছাপ আঁকতে গিয়ে 'আদরিণী'কে একটা প্রাণীর উর্ধে তুলতে পারেন নি। ছোট-গল্পের বক্তব্যটি ব্যক্ত হবে ইংগিতধর্মিতায়। সুসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ সত্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণে বলেছেন, 'যখন ব্যক্তি-চেতনার সঙ্গে সমাজ চেতনার সামঞ্জস্য কোন মতে ঘটতে চায় না.....তখন রোমান্টিক কবি নাইটিংগেলের পাখা আশ্রয় করে সৌন্দর্যলোকের দিকে অভিসারে যাত্রা করতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে ছোট-

গল্পের লেখক যেন তীরবিদ্ধ পাখি—মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, তাকে রক্ত-কর্দমের মধ্যে ছট্‌ফট্ করতে হয়।.....কখনও বা মরণের প্রাক্ মুহূর্তে তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে সে সমাজ এবং জীবনের ব্যাধকে অভিসম্পাত জানিয়ে যায়।.....একটা জটিল জিজ্ঞাসা—চারিদিকের ব্যর্থতার প্রতি তার আর্ত অঙ্গুলি নির্দেশ।'

ছোট-গল্প ও উপন্যাস

ছোট-গল্প ও উপন্যাসের প্রভেদ প্রধানতঃ তাদের দৈর্ঘ্য বিচারে নয়। সনেট ও মহাকাব্যে যেরূপ তফাৎ ছোট-গল্প ও উপন্যাসেও ঠিক সেইরূপ। উপন্যাসের বিস্তৃতি ঘটে তার শাখা-পল্লবিত ঘটনার পরিবেশনায়। দৈর্ঘ্য তার আবশ্যক হলেও অপরিহার্য নয়। আবার ছোট-গল্পের প্রসার নির্ধারিত হবে তার প্রয়োজন অনুযায়ী। দৈর্ঘ্য বিশেষ একটা মানদণ্ড হতে পারে না কোন মতেই।

তারপর, ঔপন্যাসিক হলেন জটিল-জীবনের সমাজ দ্রষ্টা—জীবন-রঙ্গের বিভিন্ন দৃশ্য ও উপকাহিনীগুলিকে একটা নির্দিষ্ট সবল প্রত্যয়ের পটভূমিকায় নিয়ে যান কেন্দ্রগত পরিণতির দিকে। সৃষ্টি হয় সার্থক উপন্যাসের। এই মর্মেই শরৎচন্দ্রের 'ছবি', বঙ্কিমচন্দ্রের 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারাণী', 'ইন্দিরা', 'রজনী' প্রভৃতি আয়তনের হ্রস্বতা সত্ত্বেও ছোট-গল্প নয়। এগুলি সংক্ষিপ্ত উপন্যাস বা উপাখ্যান। অন্যদিকে শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি,' 'বিন্দুর ছেলে' প্রভৃতি দীর্ঘ হয়েও সার্থক ছোট-গল্প।

বাংলা ছোট-গল্পের ক্রমবিকাশ

সুখের বিষয় হোক আর দুঃখের বিষয়ই হোক, বর্তমান বাংলা ছোট-গল্পের ধারা যে খাতে বয়ে চলেছে তার উৎস অন্বেষণে আমাদের ধর্ণা দিতে হয় পশ্চিমী সাহিত্যের দরবারে [ফরাসী সাহিত্যের তো বটেই]। তবে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ছোট-গল্পের রচনা-পদ্ধতির প্রচলন না থাকলেও, আখি, সাধি, মঙ্গল, ভাসান ইত্যাদি লোকগাথায় ছোটগল্পের আঙ্গিক সমধর্মিতার ক্ষীণ রেশ একটা খুঁজে পাওয়া যায়। কথা ভাষায় রচিত, সাধারণ-লোক-বোধ্য গাথাগুলিতে চলমান জীবনের খণ্ড খণ্ড ঘটনার প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করা যায়। আবার এদের অধিকাংশেরই সৃষ্টি-রহস্য নিহিত আছে হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, বেতালপঞ্চবিংশতি, কথা-মঞ্জরী, কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি গল্প-লেখা সংস্কৃত গল্প-উপন্যাস-গুলির মধ্যে। সুতরাং বাংলা ছোট-গল্পের উৎস সন্ধানে সংস্কৃত গল্প-উপাখ্যানগুলিকে একেবারে এক পাশে ফেলে রাখা যায় না।

প্রারম্ভিক যুগ [১২৩০—১২৯১ বংগাব্দ]

সংস্কৃত উপাখ্যানগুলির উপর নির্ভর করেই সূচনা-যুগের বাংলা ছোট-গল্পে শিল্প-সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটে। এ যুগের প্রথমভাগে রচিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু-বিলাস' [১২৩০] 'আশ্চর্য-উপাখ্যান' [১২৪১] বাংলা ছোট-গল্পের সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। সে সম্ভাবনা বাস্তবে রূপান্তরিত হয় ১২৮০ বংগাব্দে 'মধুমতীর' আবির্ভাবে। ছোট-গল্পের লক্ষণ-বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও লেখক [শ্রীপু—] কিন্তু 'মধুমতী'কে উপন্যাস আখ্যা দিয়াছিলেন। এর কারণ বাংলা-সাহিত্যে উপন্যাস এবং ছোট-গল্প প্রায় সমবয়সী। সেকারণে, তৎকালীন লেখকেরা দুটির মধ্যে কোন সীমা রেখার যথার্থ অনুভব করেননি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একালের অধিকাংশ সমালোচকরাও বাংলা ছোট-গল্পের উৎস সন্ধানে প্রথমতঃ বীরবল, দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথের পশ্চাতে তাকাবার ক্লেশ স্বীকার এড়িয়ে যান। 'মধুমতী'কে তাঁরা তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হন। সাহিত্যিক অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমরা একমত "মধুমতী" ছোট-গল্প এবং সার্থক ছোট-গল্প। এ গল্পের উদ্দেশ্য একক। এ গল্পের ভাবের ঐক্যও বজায় আছে। কাহিনী কোথাও শাখা-পল্লবিত হয়নি। বিশ্বজনের পরিচিত চলচ্চিত্রায়িত ছোট-গল্প 'স্পেল-বাউণ্ডে'-এর সঙ্গে এর মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনীভাগের সমগোত্রিয়তা লক্ষণীয়।

তবে প্রারম্ভিক যুগে 'মধুমতী' একটি ব্যতিক্রম। এযুগে ঘটনামূলক গল্পে খ্যাতিলাভ করেন স্বর্ণকুমারী দেবী।

['বিদ্রোহ'—১২৯৪, 'গহনা'—১২৯৮, 'একটি মেয়েলি সুকৃত'—১২৯৯], সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি ['প্রভা' ও 'প্রাইভেট টিউটর'—১২৯৯] ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ['চিত্র-কুমারী'—১২৯৬, 'মুক্তি'—১২৯৮, 'বন্ধু'—১২৯৯, 'রোশেনারা'—১২৯৯]।

রবীন্দ্র-প্রভাত-প্রথম যুগ [মোটামুটি ১৩১০ বংগাব্দ পর্যন্ত]

ত্রয়োদশ বংগাব্দের শেষ দশক বাংলা সাহিত্যের 'রেনেসাঁস্' বা নবজাগরণের কাল—'বংগ-দর্শন'-এর জন্ম-কালও এসময়। রবীন্দ্রনাথের উদার অভ্যুদয় অবশ্য বহুপূর্বেই [১২৯১ খৃ] ঘটেছে। তাঁর 'ঘাটের কথা' সম্ভবত দ্বিতীয় বাংলা ছোট-গল্প। মনস্তত্ত্ব ও পারিপার্শ্বিকতার অনুশাসনে উদ্ভূত মানসিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণে পরবর্তী-কালের সমাবসেট মমের ন্যায় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তিনি তাঁর প্রথম গল্প 'ঘাটের-কথায়'। কবিত্বের স্রেট ছোট-গল্প লিখিয়েদের দলে সম্মানের আসন পেলেন। এ গল্পটি ছাড়া তাঁর সমস্ত ছোট-গল্পের রচনা-কাল মোটামুটি ১২৯৮—১৩০৫ বংগাব্দ! তাঁর শ'খানেক ভাল গল্পের মধ্যে বিশ্বশ্রিতের পর্যায়ে পড়ে—'একরাত্রি', 'ছুটি', 'কাবুলি-ওয়ালা', 'মুখের পাষাণ', 'জীবিত ও মৃত', 'দেনা-পাওনা', 'পোষ্ট-মাষ্টার', 'গিন্নী', 'নষ্টনীড়', ও 'ল্যাবরেটরী'।

রবীন্দ্রনাথ এলেন একাই একশো হয়ে। পাঠক সমাজকে কয়েক যুগের রসদ আগাম যোগালেন কয়েক বছরে। সৃষ্টি-উৎসের সব কয়টি ভাণ্ড নিঃশেষে ঢেলে দিলেন। ফলে সাধারণ লেখকেরা রবীন্দ্র-প্রভাবের 'একমুখো গলিতে' দিশেহারা হলেন। সম্মুখে কঠিন-প্রাচীর, পেছনে অন্ধ-অনুকরণের খোলা পথ একটি দুর্লঙ্ঘ্য, অপরটি সহজগম্য। আর সে সোজাপথে পরবর্তী কালের অনেক প্রতিভাধর—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, সরোজনাথ ঘোষ প্রমুখেরা—হারিয়ে গেলেন।

নূতনের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আগ্রহ প্রকট হয়ে উঠল। তার মন কোন একটা মত বা পথের সাথে একাত্ম হয়ে থাকতে পারল না। যুগ এসে সাহিত্যিকের দ্বারে জানাল, যে চিরন্তনকে মেনে নেবে না—তার সবল মন, প্রগতিশীল দৃষ্টিভংগি যুগসমস্যার জটিলতায় অনুভূতি-প্রবণ হয়ে উঠবে। প্রয়োজন দেখা দিল, 'ঘটনামূলক ধারাকে মর্মমুখী ধারায় প্রবাহিত করিয়ে দেবার'। আর সে গতিবৃদ্ধির কৃতী ভগীরথ হিসাবে এগিয়ে এলেন প্রমথ চৌধুরী ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। নূতন পথের পথিকৃৎ প্রমথ-প্রভাত সরল গল্পরচনায় কৃতিত্ব দেখালেন। অভিনন্দিত হলেন উভয়েই। কিন্তু লেখক হিসাবে তাঁরা ভিন্নজাতের। পাঠকসমাজে প্রভাত কুমার জনপ্রিয়তর হলেও, বাংলা ছোট-গল্প সাহিত্য প্রথম চৌধুরীর নিকট অধিকতর ঋণী। তিনি মৌলিক স্রষ্টার শুরু দায়িত্ব মাথায় নিয়ে 'প্রসপার মেরিমী'র গল্পের অনুবাদ 'ফুলদানী' প্রকাশ করে দেখিয়ে দিলেন, 'ফরাসী ছোট-গল্পই ছোট-গল্পের [বাংলা] আদর্শ হওয়া উচিত।' আজ চতুর্দশ বংগাব্দের দ্বারপ্রান্তে এসে পাঠকসমাজ নিশ্চয়ই তাঁর কথার সত্যতা উপলব্ধি করেছেন।

অন্যদিকে প্রভাতকুমার রবীন্দ্র ছায়ায় দাঁড়িয়ে আপন বৈশিষ্ট্যটুকু যাচাই করলেন। তিনি তাঁর গল্প রচনায় সে সংগ্রহ করছেন দৈনন্দিন জীবনের নানা অসংগতির মধ্যে তাই বাংলা কৌতুকের মাঝেও তাঁর লেখায় প্রচ্ছন্ন বেদনার সুর মূর্চ্ছিত হয়। 'অংশহীনা', 'হিমানী', 'দেবী', 'বালাবন্ধু', 'কাশী বাসিনী', 'মাতৃহীনা', 'সতী' তাঁর বিশিষ্ট রচনা। সীমিত রুচির মধ্যে তাঁর যৌন-সমস্যামূলক ছোট-গল্প 'লেডী-ডাক্তার' ও 'সচ্চরিত্র' বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে উজ্জ্বল।

শরৎযুগ [মোটামুটি ১৩৩০ বং পর্যন্ত]

বাংলা ছোট-গল্প সাহিত্যে শরৎচন্দ্রকে যুগপুরুষ আখ্যা দেবার প্রধান হেতু দুটি। প্রথমতঃ তিনিই প্রথম বাস্তব-বাদী বাংলা লেখক। সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে, আমাদের সাহিত্যে 'শোকী'কে দেখতে পাই তাঁর মধ্যে। সংসাহস ও মৌলিকতার ভিত্তিতে সামাজিক বিকৃতির যে চিত্র তিনি অংকিত করেন, তার প্রত্নুৎপন্নতা অভূতপূর্ব। বাংগালী পাঠক তার স্বাদ এর আগে পায়নি।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি প্রমাণ করলেন, ছোট-গল্প লেখকের ব্যক্তি-সত্তার বিশেষ অভিব্যক্তি। তাঁর 'সব্‌জেক্‌টীভ্' দৃষ্টি-ভংগীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'অন্বেষণ' গল্পটি। এসব বাদ দিলেও, তাঁর বাক্‌সংযম ও অনাড়ম্বর বাচন-ভংগী আদর্শ স্থানীয়। কথার কচকচি, টেক্‌নিকের মারপ্যাঁচ তিনি আয়ত্ত করতে গেলেন না—সোজাকথা সোজাভাবে বললেন। এ সূত্রে তাঁর 'মেজদিদি' গল্পের সহজ সূচনার সংগে, চেখভের 'কেরাণি' গল্পের প্রস্তাবনার তুলনা করা যায়।

"অপেরা দেখতে গেছে কেরাণি। সামনের দিকে গেছে। মনটাও বেশ প্রসন্ন...।"

সামান্য কয়েকটি কথায় আমাদের চোখের সামনে একশ্রেণীর মানুষের ছবি ফুটে ওঠে। কেরাণী অপেরায় যাবার পয়সা পাবে কোথায়? সামনের দিকের দামী আসনে বসা তো তার স্বপ্ন। তবু মনের তাগিদে যায় একদিন—সামনের দিকেও বসে।

আবার 'মেজদিদিতে': "কেষ্টার মা মুড়ি-কড়াই ভাজিয়া খাইত।"

মাত্র পাঁচটি কথায় কেষ্টার মার অতীত জীবনের সুস্পষ্ট ধারণা হয় আমাদের। কেষ্টার ভবিষ্যতের ইংগিত প্রকাশ পায় সঙ্গে সঙ্গে।

শরৎচন্দ্র ছোট গল্প খুব বেশী লেখেননি। 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'অভাগীর স্বর্গ', 'মেজদিদি', 'মহেশ', প্রভৃতি গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ

শরৎচন্দ্র-যুগের একটি স্বতন্ত্রধর্মী শিল্পী 'পরশুরামে'। বাংগ-চিত্র অংকনে তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর মধ্যে 'বীরবলে'র সংলাপ-সমৃদ্ধি এবং প্রভাতকুমারের বিষয়-বৈচিত্র্যের সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। 'বিরিঞ্চি বাবা', 'ভুষণ্ডীর মাঠ', 'লম্বকর্ণ', 'কচিসংসদ', 'জাবালী' এবং 'স্বয়ম্বরা' তাকে অমর করে রাখবে। তবু কলাকৌশল বিচারে তাঁর অধিকাংশ রচনাই ছোট-গল্প পর্যায়ের নয়।

শৈলজানন্দ ও জগদীশ গুপ্তকে শরৎচন্দ্র যুগের লেখক হিসাবে ধরা যায়। শৈলজানন্দ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবীণ—রবীন্দ্রনাথের কালেও তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। 'নৌকাডুবি', 'অগ্রণী', 'নারীমেধ', 'ভংগুর', প্রভৃতি গল্প তাঁর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করলেও তাঁর সাহিত্যিক মৃত্যু ঘটেছে চলচ্চিত্রজগতে যোগদানের সংগে সংগে। বরং 'মরবিডিটির বিচারে বাংলা সাহিত্যে জগদীশ গুপ্তের একটা স্থায়ী আসন আছে। তাছাড়া, তাঁর 'রামের টাকা' গল্পটা সমাজ চিত্রের সার্থক রূপায়ণ।

আধুনিক যুগ :

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। যুদ্ধোত্তর বিপর্যয়ের ঢেউ বাংলার জীবন ধারাকে নাড়া দিয়েছে বিশেষভাবে। ক্ষুব্ধতা আর অনিশ্চয়তার মাঝে জীবনকে নূতনভাবে যাচাই করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সমাজ ও গোষ্ঠি পরিচয়ের সমস্ত বাঁধুনি জীবনের নূতন মূল্যবোধে খান খান হয়ে ভেংগে পড়তে শুরু করেছে। ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ব্যক্তিজীবনের নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনি সময়ে 'কল্লোল' গোষ্ঠির আবির্ভাব ঘটল বাংলা সাহিত্যে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মণীশ ঘটক, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধ কুমার সান্যাল প্রভৃতি লেখা দিলেন। 'যৌন সমস্যা, দুঃখবাদ, পরাজিত বুদ্ধিজীবীর মানসিক বিকৃতি [ফ্রাষ্ট্রেশন], বিদ্রোহ, এবং চড়া রোমান্টিসিজম্ দিয়ে তারা বীণার তার বেঁধে দিলেন [নারায়ণ গংগোঃ]।' নব আন্তর্জাতিকতা আদর্শের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচুর সম্ভাবনা দেখা দিল বাংলা ছোট-গল্পে; কিন্তু সফলতা লাভ করলেন দু'একজন। প্রেমেন মিত্র হলেন কল্লোলের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প লেখক। তাঁর 'ভূমিকম্প', 'তেলেনা পোতা আবিষ্কার', 'সাগর সংগমে', 'পুরাম', বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিস্থানীয় ছোট গল্প।

'কল্লোলের' বাইরে থেকে সমসাময়িক কালে যাঁরা ভিন্নপথের সন্ধান দেখাবার চেষ্টা করলেন বনফুল তাঁদের একজন। সবাই স্বীকার করলেন, বাংলা সাহিত্যে এ দৃষ্টিভংগির অভাব ছিল। তবে তা সাধারণ না হয়ে একটু বিশেষ (পার্টিকুলার) হলে তাঁর নিজেরই নূতন পথ দেখাত। আজ সবদিকেই ধুয়া উঠেছে ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, আইনজীবিরা তাঁদের নিজের কথা নিজেরা

লিখুন। তা না হলে অনভিজ্ঞেরা দেখবেন, 'রেলইঞ্জিনটা আগুনে পুড়ে কালো হয়ে গেছে (সুবোধ ঘোষের কোন ছোট গল্প) অথবা ভাষাবিলাসীরা দেখবেন, গ্র্যানিটের স্তরে ফসিলের ছাপ। বনফুল সম্বন্ধে একটা বড়কথা—তিনি একাই বাংলাসাহিত্যের প্রায় সবকটি ছোটতম ছোট গল্পের সৃষ্টি করেছেন। অথচ এক আধ পাতার ছোট-গল্পেও মনের খোরাক থাকে যথেষ্টই।

নগর-জীবনের অর্থ-সন্ধানী মানসিকতা বিশ্লেষণে যখন অধিকাংশ লেখক পরোক্ষভাবে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রকট করে তুলতে ব্যস্ত, তখনও নির্বিকারচিত্তে পল্লীবাংলার ছোট-দুঃখের চিত্রে অনুভূতি প্রবণ হয়ে উঠলেন দুজন লেখক—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কল্লোলোত্তর যুগের লেখকগণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুরু ও শেষ প্রত্যক্ষ করলেন। অভিজ্ঞতা আরও তিক্ত হল। সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেন অনেকেই। অর্থ-নৈতিক পরিবেশের চাপে যে নরক জীবনের সৃষ্টি হল, তার বর্ণনায় প্রাধান্য লাভ করল বেশীর ভাগ ছোট-গল্প।

এ ক্ষুদ্র পরিসর রচনাকে আধুনিক কালের বহু আলোচিত ছোট-গল্পগুলির আলোচনা ও বহুশ্রুত লেখকদের নামের তালিকা দিয়ে স্ফীত-দেহ করা হল না। তাছাড়া সুবোধ ঘোষ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, নারায়ণ গংগোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রতিভাধরের প্রতিভা-বিচারের সময় এখনও আসেনি।

কর্ম্মের অর্ঘ্য　　—রবীন্দ্রনাথ

"আমি ভালবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে-মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। আমি আবাল্য অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে যদাসাধ্য আমার কর্ম্মের অর্ঘ্য, আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি—তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ, সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহঙ্কার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।

আমার যা-কিছু অকিঞ্চিতকর তাকে অতিক্রম করেও যদি আমার চরিত্রের অন্তরতম প্রকৃতি ও সাধনা লেখায় প্রকাশ পেয়ে থাকে, আনন্দ দিয়ে থাকে, তবে তার পরিবর্ত্তে আমি প্রীতি কামনা করি, আর কিছু নয়। একথা যেন জেনে যাই, অকৃত্রিম সৌহার্দ্য পেয়েছি, সেই তাঁদের কাছে যাঁরা আমার সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও জেনেছেন সমস্ত জীবন আমি কি চেয়েছি, কি পেয়েছি, কি দিয়েছি, আমার অপূর্ণ জীবনে অসমাপ্ত সাধনায় কি ইঙ্গিত আছে।

মর্ত্যলোকের শ্রেষ্ঠদান এই প্রীতি আমি পেয়েছি একথা প্রণামের সঙ্গে বলি। পেয়েছি পৃথিবীর অনেক বরণীয়দের হাত থেকে—তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা নয়, আমার হৃদয় নিবেদন করে দিয়ে গেলেম। তাঁদের দক্ষিণ হাতের স্পর্শে বিরাট মানবেরই স্পর্শ লেগেছে আমার ললাটে, আমার যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা তাঁদের গ্রহণের যোগ্য হোক্।"

আধুনিক স্থাপত্যকলা ও ভারতীয় ঐতিহ্য

সন্তোষ ঘোষ

আজ আমরা স্থাপত্যক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক আন্দোলনের দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হয়েছি। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতে এমন কোন স্থাপত্যকলা ছিল না যাকে আমরা 'আধুনিক' বলে অভিহিত করতে পারি। স্বাধীনতার পর গৃহনির্মান সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটছে। আমাদের দেশে এক নতুন স্থাপত্যকলার উদ্ভব হচ্ছে—আমাদের প্রয়োজন উপযোগী কিন্তু বিজ্ঞানীন ভাবস্রোতক। ইতিপূর্বে এই নতুন স্থাপত্যকলা বিভিন্নদেশে নতুন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক আন্দোলনের নেতারা একদিন মুক্তি চেয়েছিলেন—অর্থহীন আকৃতি এবং পরম্পরার প্রভাব থেকে তাঁরা মুক্ত হতে চেয়েছিলেন। তারপর শিল্পবিপ্লবের ফলে সামাজিক অবস্থার যে বিরাট পরিবর্তন হয়েছিলো, সেই পরিবর্তনের রেশ স্থাপত্যের সর্বক্ষেত্রে অনুভব করা গেলো। বৈজ্ঞানিক ধীশক্তির সহায়তায় বস্তুবিজ্ঞানের যে উন্নতি হলো তা নতুন আকৃতি সৃষ্টি করতে বিশেষ সাহায্য করলো। আজকের দিনের মানসধর্ম হচ্ছে সহজীকরণ-বৈশিষ্ট্যে এবং প্রকাশে। সুতরাং প্রয়োজনের বদলে অলংকরন আজ এক মানসিক বিলাসে পরিণত হয়েছে। অলংকরণের সমস্ত মোহ ত্যাগ করে আজকের গৃহের আকৃতি একটা সাধারণ ব্যাপারে এসে দাঁড়িয়েছে। স্থাপত্যগত নকসা যে প্রয়োজনে সৃষ্টি তাই পুরোপুরিভাবে সার্থক করবে। এই হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলকতা বা 'ফাংশানালিজমে'র মূলকথা। এই 'ফাংশানিজম' সকলরকম অলংকরণ এবং অসমরোপযোগী পরম্পরাগত সমস্ত আকৃতি এবং কারুকার্য থেকে দূরে থাকবে। সুতরাং এযুগে নগ্নবস্তুর প্রকাশের দ্বারা বহুলেছে। আধুনিক স্থাপত্যকলা কোন নতুন ফ্যাশন নয়। আজকের সামাজিক প্রয়োজনের জন্যে এর প্রকাশ। বস্তুতান্ত্রিক দিক থেকে আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের দৌলতে আকার, গঠন, রং প্রভৃতির সামঞ্জস্যের ভেতর এর উন্নতি নিহিত।

কিন্তু শুধুমাত্র নগ্নবস্তুর দিয়ে স্থাপত্য কোন যুগকে প্রতিফলিত করে না। শারীরিক অস্তিত্ব এবং বাস্তব প্রয়োজনের দ্বারা যে যুগকে সে প্রকাশ করে ক্রমে সে তারই এক অংশ হয়ে দাঁড়ায়। ভারতবর্ষেও এর প্রমাণ আমরা পাই। ভারতের মত স্থাপত্যের ঐশ্বর্য্য ও মহান্ ঐতিহ্য জগতের খুব কম দেশেই আছে। প্রাচীন ভারতের অসংখ্য মহিমাময় নিদর্শন আজো উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। ভারতীয় শিল্পীর সৃষ্টিমানসের যথাযোগ্য নিদর্শন সেসব। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মোগল যুগের শেষ পর্যায় পর্যন্ত আমাদের সামনে এক বিরাট ইতিহাস উন্মীলিত হয়ে আছে। এর মধ্যে বিভিন্ন শিল্প ও স্থাপত্যকর্মের যেসব নিদর্শন বর্তমান তা বিভিন্নযুগে তদানীন্তন প্রয়োজনের তাগিদে নির্মিত হয়েছিল। চালুক্য ও দ্রাবিড় কিংবা পাঠান ও মোগল স্থাপত্যরীতির মধ্যে যে নীতিগত পার্থক্য তা নিদর্শনের মধ্যেই স্পষ্ট প্রতীয়মান কেননা সেই সমাজ ও যুগের তারা নিদর্শন। সুতরাং তারা একদিন আধুনিক ছিলো, আজ পরম্পরায় নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গতযুগের খ্যাতনামা মার্কিণ স্থপতি একবার মন্তব্য করেছিলেন যে বিভিন্ন দেশের স্থাপত্য স্তম্ভ এবং কড়িবরগার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে কিন্তু ভিন্নরূপ পরিগ্রহণ করেছে বিভিন্ন চিন্তাধারার জন্যে। স্থাপত্য সর্বযুগের মুদ্রাযন্ত্র বিশেষ, যে সমাজে এ নির্মিত সে তারই নীরব সাক্ষী। মানুষের জীবন, চিন্তা এবং কাজকর্মের প্রবাহের মধ্যে যখন মানুষ গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন অনুভব করেছে তখন তারা যা যুক্তিযুক্ত ও দরকারী মনে করেছে তা নির্মাণ করেছে এবং তাদের সেই চিন্তাধারার নিদর্শন রেখে তারা চলে গেছে। তারপর নতুন মানুষ নতুন চিন্তাধারা নিয়ে এসেছে, তার ফলে পরিবর্তিত চিন্তাধারার

সংগে তাল রেখে নতুন গৃহ নির্মিত হয়েছে। নির্মান কার্য্যের এই প্রবাহই হচ্ছে পরম্পরা, এটাই ঐতিহ্য, একেই আমরা বলি ঐতিহাসিক স্থাপত্য।

ভারতে বিদেশী শাসনের কালে একথা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে পশ্চিমের অনুসৃত নীতি দ্বারা এবং কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়মকানুন দ্বারা স্থাপত্যের উন্নতি নিয়ন্ত্রিত হবে। স্বাধীনতার পর এই পটভূমির পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু বর্তমান আন্দোলন পরম্পরা বা জাতীয় শিল্পের বিরোধী সেকথা আমরা বলতে পারি না। আমরা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে চাই না; আমরা চাই উপযোগী, সঠিক ও নিখুঁত জিনিষ—নতুন হোক, পুরাতন হোক যা বাস্তব এবং খাঁটি তারই প্রতি আমাদের লক্ষ্য। সুতরাং জাতীয় পরম্পরা বা পুরাণো যুগের রীতিতে কিছু নির্মাণ করা উচিত হবে না। আধুনিক যুগের এই আবহাওয়ায়, বিদ্যুৎ, মোটর, রেলগাড়ী, এরোপ্লেন বা বস্তুপাতির ভেতর পরম্পরার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না।

আজ মানুষ এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে দিনযাপন করছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী অবস্থা, পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আগমন এবং আরো অনেক সমস্যা বিপদ বাড়িয়ে তুলেছে। এই জটিলতায় মানুষ তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। এবং আধুনিক যুগে পরম্পরার কোন স্থান নেই। অলংকরণ, গ্রীক স্তম্ভ, ভারতীয় ব্রাকেট প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন যুগের স্থাপত্যের উপাদান আজকের স্থাপত্যে অচল। পরম্পরা অনুসারে কোন গৃহ নির্মাণের অর্থ-ব্যয় এবং তার উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রভেদের সৃষ্টি করা এবং এর দ্বারা আমরা অন্তরে কিংবা বাহিরে কোথাও ভারসাম্য অর্জন করতে পারবো না।

কিন্তু পরম্পরার একটা সত্যিকারের মূল্য আছে। জন রাস্কিন একবার বলেছিলেন, সমস্ত মহৎ স্থাপত্য জাতীয় জীবন ও চরিত্রের প্রকাশ।' সুতরাং আমরা স্থাপত্যের ইতিহাস চর্চা করি। যে স্থপতি পরম্পরা সম্বন্ধে অবহিত তিনি নিজস্ব নক্সা প্রস্তুত করতে পারবেন। পরম্পরা বলতে অন্তরভাবে জাতীয় সংস্কৃতির দ্বারা বহন বোঝায় না; পরম্পরা আন্তরভাবে নিকট অতীতের ওপর নির্ভরশীল। সেইজন্য আধুনিক স্থাপত্য আন্দোলনের নেতারা খাঁটি জাতীয় শিল্পের প্রতি দরদ ও ভালোবাসা দেখান।

দুঃখের বিষয়, এই মনোভাব থেকে স্থাপত্য ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী সুলভ মনোবৃত্তি ও কুশ্রীতার আমদানী হয়েছে। কলকাতার কতকগুলি গৃহনির্মিত হয়েছে যার জানালা অলঙ্কার সৌর গবাক্ষের ন্যায়, তার ব্রাকেট গুজরাট থেকে, স্তম্ভ আমেদাবাদ থেকে এবং এছাড়া আরো অনেক কিছু। নকসাবিদ্‌রা তাঁদের যথাসাধ্য চেষ্টার দ্বারা এইসব গৃহে ভারতীয় ভাব আনতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত যে আধুনিক স্থাপত্যকলায় অপ্রয়োজনীয় অংশ বলে কিছু থাকার নয়।

আরো দুঃখের বিষয়, আমাদের কয়েকজন জাতীয় নেতা পরম্পরা সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করেন। পাঞ্জাবের নতুন রাজধানী চণ্ডীগড়ে এক নতুন স্থাপত্যকলার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের এ যুগের মূলসূত্র সম্বন্ধে অবহিতিই চণ্ডীগড় স্থাপত্যের মূলকথা। কিন্তু উড়িষ্যার নতুন রাজধানী ভুবনেশ্বরে আমরা অন্য চিত্রের পরিচয় পাই। ভুবনেশ্বর সম্বন্ধে ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু বলেছিলেন—'স্থপতিরা নতুন ও পুরাতনের মিলনে যত্নবান হয়েছেন। ভারতের মহান অতীতের ধ্বংসাবশেষ থেকে যাঁরা চোখের সামনে প্রাচীন ভারতের পুনরুজ্জীবন দেখতে চান তাঁদের কাছে ভুবনেশ্বরের মাধুর্য্য হবে অপূর্ব।'

বলাই বাহুল্য যে ডাঃ কাটজু সমস্যাটি ঠিক অনুধাবন করতে পারেন নি। আমাদের বর্তমান প্রয়োজন এক নতুন ধরণের সৌন্দর্য্য অভিব্যক্তির সৃষ্টি করেছে। সে সৌন্দর্য্য অভিব্যক্তি এই যন্ত্রযুগের উপযোগী। স্থাপত্যের জীবন্ত নীতি হচ্ছে আধুনিক এবং স্থাপত্যের সমস্ত মহৎ সৃষ্টিই স্থপতিদের নিকট অতীতের কাছে খাঁটি।

জাপান, তুরস্ক বা মেক্সিকোর স্থপতিরা জাতীয় পরম্পরাকে ত্যাগ করেন নি। জাতীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা নতুন উপাদানে এবং নতুন পদ্ধতিতে গৃহনির্মাণ করেছেন। ভারতীয় স্থপতিদের পক্ষে এ এক কঠিন কাজ। আমাদের জনসাধারণ এবং আমাদের জলবায়ুর

উপযোগী এবং আধুনিক উন্নতির ওপর নির্ভর করে কোন পরম্পরা সৃষ্টি অবশ্যই দুরূহ কাজ।

'ফাংশানালিজম'কে সামনে রেখে আমরা এই নতুন রীতি প্রবর্তন করতে পারি। কিন্তু মানসিক আবেগ প্রভৃতিকে বাদ দিলে চলবে না। স্থাপত্যের প্রকাশ শুধুমাত্র উপাদান এবং নির্মাণ পদ্ধতির সমন্বয়ে নয়। তাই যেখানে মানবীয় চিত্তবৃত্তির প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী সেখানে হয়তো ফাংশানালিজম পুরোপুরি স্থান অধিকার করে থাকে না।

ভবিষ্যৎ স্থাপত্যের আকার বা রূপ সম্বন্ধে আমরা কিছু বলতে পারি না। শুধু এটুকু বলতে পারি যে ফাংশানালিজম হবে প্রধান কথা, সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী আকার এবং আয়তনের সমন্বয়। পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে, আধুনিক স্থপতি জাতীয় অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হবেন কিন্তু তাঁর প্রকাশভঙ্গী হবে আধুনিক। এ কাজ একজন বা একদল স্থপতির কাজ নয়। এই নব্য আন্দোলনের পেছনে সমস্ত জাতির সমর্থন দরকার।

একথা সবাই বুঝতে পারলে ভারতবর্ষে আধুনিক স্থাপত্য ক্ষেত্রে পরম্পরা বা ঐতিহ্যের সৃষ্টি সম্ভব। পরিশেষে খ্যাতনামা স্থপতি রিচার্ড নয়েট্রার কথা দিয়ে এ প্রবন্ধের শেষ করি। ভারত পরিভ্রমণ করে তিনি লিখেছিলেন—'ভারত এক প্রাচীন দেশ, স্বাধীন ভারত এক নতুন দেশও বটে। এর নতুন প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করা শুধুমাত্র ইঞ্জিনীয়ারিংএর কাজ নয়। ভারত এখনো নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে—উন্মুক্ত গগনতলে শরীর ও জীবতত্ত্বের মান নিয়ে সে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে। অন্য কোন দেশের সংগে প্রতিযোগিতায় নয় কিংবা যন্ত্রবিজ্ঞানের বাহু দিয়ে নয়। এর ফলে সাধারণ সুখও আসে না। তার উন্নতি হবে অর্থব্যয়ের দিকে নজর রেখে নিজের দেশে সম্পূর্ণভাবে নতুন উপাদানের সহায়তায় সৃষ্টি কর্মের দ্বারা।'

[সম্প্রতি খড়্গপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত স্থাপত্য-ছাত্র সংস্থার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে লেখকের বক্তৃতার সারাংশ।]

মুক্তির সাধনা

—রবীন্দ্রনাথ

....."বন্দীদশা শুধু তো কারাপ্রাচীরের মধ্যে নয়। মানুষের অধিকার সংক্ষেপ করাই তো বন্ধন। সম্মানের খর্বতার মতো কারাগার তো নেই। ভারতবর্ষের সেই সামাজিক কারাগারকে আমরা খণ্ডে খণ্ডে বড়ো করেচি। এই বন্ধীর দেশে আমরা মুক্তি পাবো কি করে? যারা মুক্তি দেয় তারাই তো মুক্ত হয়।

ভারতবর্ষ আজ মুক্তির সাধনায় জেগে উঠল। পণ করলাম চিরদিন বিদেশী শাসনে মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করে রাখার এ ব্যবস্থা আর স্বীকার করব না। বিধাতা ঠিক সেই সময়ে দেখিয়ে দিলেন কোথায় আমাদের পরাভবের অন্ধকার গহ্বরগুলো। আজ ভারতে যাঁরা মুক্তিসাধনার তাপস তাঁদের সাধনা বাধা পেল তাদেরই কাছ থেকে যাদের আমরা অকিঞ্চিৎকর করে রেখেছি। যারা ছোট হয়ে ছিল তারাই আজ বড়োকে করেচে অকৃতার্থ তুচ্ছ বলে যাদের আমরা মেরেচি তারাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মার মারচে।"

ডারুইন

পরিতোষ খাঁ

চার্লস রবার্ট ডারুইন জন্মগ্রহণ করেন ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী। শ্রুসবেরিতে "দি মাউন্ট" নামে বাড়ীতে। বাবা মার দ্বিতীয় পুত্র এবং পঞ্চম সন্তান তিনি। বাবার নাম ডাঃ রবার্ট ওয়ারিং ডারুইন। মা সুসানা। মা'র বাবা জোসিয়া ওয়েজউড, স্ট্যাফোর্ড-শায়ারের বিখ্যাত কুম্ভকার। ঠাকুর্দা ইরাসমাস ডারুইনের খ্যাতি ছিল বৈজ্ঞানিক বস্তুতে অনুরাগের জন্য। তবে নিজেকে বিজ্ঞানী বলে জাহির করবার মনোবৃত্তি ছিল না তাঁর। নিজের স্বভাবগুণে, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি আর সবার উপরে আশেপাশের সব লোকের জীবনের খুঁটিনাটিতে আগ্রহশীল নিঃস্বার্থ পরোপকারস্পৃহার ফলে লোকপ্রিয় ছিলেন তিনি; তাঁর ছেলে চার্লস—পিতা ডাক্তারও। মা সুসানা ছিলেন নম্র মধুর স্বভাবের। সহানুভূতিতে কোমল। চার্লসের আট বছর বয়সে তাঁর মা'র অকালমৃত্যু পরিবারের এক কঠিন ক্ষতি। মা'র কাছ থেকেই সম্ভবতঃ চার্লস তাঁর মিষ্টি স্বভাব পেয়েছিলেন। আর পৈত্রিকসূত্রে পেয়েছিলেন পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গী।

বাচ্চা বয়সে ডারুইন তাঁর বোনদের সাথে যেতেন এক ডে-স্কুলে! ছোট বোন ক্যাথারীন অনায়াসে তাঁকে লেখাপড়ায় ছাড়িয়ে গেল সেখানে। লেখাপড়ায় মন নেই। কাজেই দুষ্টুমির ফন্দী দিয়ে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হ'ত। চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবার জন্য নানারকম মিথ্যে কথা আবিষ্কার করতে হ'ত। এতো অল্প বয়সেও তাঁর আগ্রহ ছিল উদ্ভিদজগতের নানা বৈচিত্র্যের প্রতি। এই আগ্রহের সঙ্গে চাঞ্চল্যসৃষ্টির বাসনা মিশিয়ে বলতেন তাঁর ছোট্ট সঙ্গীদের যে বিশেষ এক এক পরগের রঙীন জল গোড়ায় ঢেলে তিনি নানা রং-এর প্রিমরোজ সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁর নিজেরই ভাষায় এটা "অবশ্য ছিল একটা রাঙ্কুসে রূপকথা", সে চেষ্টা ও' তিনি করেন নি।

সংগ্রহ এবং শ্রেণীবিভাগ করবার আগ্রহ যেন চার্লস-এর সহজাত। আট বছর বয়সেই তাঁর সামুকের খোলা, নানা রকম মুদ্রা, সীলমোহর, ডিম এবং খনিজের একটা সংগ্রহ ছিল এবং নানা রকম গাছপালার নিজের মতো করে নামকরণ করতে ভালোবাসতেন তিনি। তাঁর ভাইবোনদের কিন্তু এ-বাতিক ছিল না। বোনদের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন সহৃদয় হ'বার শিক্ষা। সারাজীবন ধরে কুকুরদের তিনি ভালোবাসতেন। বালাকালে হঠাৎ একবার ক্ষমতাস্পৃহার তাড়নায় একটা কুকুর ছানাকে নির্যাতন করেছিলেন—সারাজীবন এই ঘটনা মনে করে তিনি ক্লেশ পেতেন।

সাড়ে নয় বছর বয়সে শ্রুসবেরির একটি স্কুলে আবাসিক হিসেবে পাঠানো হ'ল তাঁকে। কিন্তু স্কুলটা বাড়ী থেকে মাত্র মাইলখানেক দূরে থাকায় ফাঁক পেলেই বাড়ীতে দৌড়ে আসতেন। ফলে স্কুল-জীবন এবং গৃহ-জীবন দুটোরই সুবিধে তিনি পেলেন। সে-সময়ে, আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে, শ্রুসবেরিতে শিক্ষার ধারা ছিল পুরোপুরি সাহিত্যধর্মী। কাজেই যে-ছেলের ক্ষমতা বিশেষভাবে বিজ্ঞানপন্থী তাঁর যোগ্য শিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে ছিল না। কাজেই তাঁর সম্বন্ধে এই ধারণা হ'ল যে সাধারণ ছেলেদের তুলনায় তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ কম। এমন কি তাঁর বাবা পর্যন্ত, যদিও সাধারণতঃ পিতা হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বেশি ভক্তিবান এবং প্রাজ্ঞ, তাঁকে একবার বলেছিলেন যে গুলি ছোড়া, কুকুর, আর ইঁদুর-ধরা ছাড়া আর কিছুতে তাঁর মন নেই, তাঁর নিজের এবং সমস্ত পরিবারের পক্ষে গ্লানির কারণ হবেন তিনি।

অবশ্য ভবিষ্যতে তাঁর জীবনের এ-সময়টাতেও তাঁর ভাবী পরিণতি সম্পর্কে কতকগুলি আশাজনক লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়: তাঁর রুচি ছিল সবল এবং স্বকীয়। কোনো বিষয়ে আগ্রহবোধ করলে প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে তার অনুসরণ করতেন তিনি এবং যে-কোনো জটিল বিষয় কিংবা বস্তুর মধ্যে সত্যটুকুর কাছে পৌঁছে যেতে তিনি বোধ করতেন। শেক্সপীয়ারের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে তাঁর তীব্র অনুরাগ ছিল এ-সময়ে। আর তার পরেই ভালো লাগতো টমসন, বায়রন ও স্কটের কবিতা। কিন্তু নিসর্গদৃশ্য থেকে যে আনন্দ পেয়েছিলেন ১৮২২ সালে ঘোড়ায় চড়ে স্কটল্যাণ্ডের সীমানায় ঘুরবার সময়ে অনেক অনেক দিন ধরে মনে লেগে ছিল তার। স্কুলজীবনের শেষদিকে তাঁর গুলি ছোঁড়ার আনন্দ আরো বেড়ে উঠলো এবং তার প্রাবল্য বজায় রইল যতদিন না বিজ্ঞানের অনুধাবনে পাখী খোঁজার চাইতে বেশী আকৃষ্ট হয়ে শিকারের আনন্দের চাইতে পর্যবেক্ষণ ও যুক্তিবিচারের আনন্দ তীব্রতর বুঝে তাঁর বন্দুক ত্যাগ করলেন।

বড় ভাই ইরাসমাসের বয়স চার্লস-এর চাইতে প্রায় পাঁচ বছর বেশী ছিল। ছোট ভাই-এর চোখে তিনি একজন কেউকেটা ছিলেন। তাঁরও বিজ্ঞানে অনুরাগ ছিল এবং তিনি চার্লসের স্কুলজীবনের শেষের দিকে বাগানের মেরামতির ঘরে একটা রাসায়নিক ল্যাবোরেটারি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চার্লস মহানন্দে তাঁর দাদার ফাইফরমাস খাটতেন এবং নানারকম গ্যাস ও যৌগিক পদার্থ তৈরীর ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতেন। গভীর আগ্রহে তিনি The Chemical Catechism ('রসায়নের প্রশ্নোত্তর') জাতীয় বই পড়তেন। তাঁর স্কুলের সঙ্গীরা তাঁর এই অসাধারণ বাতিকের খবর পেয়ে তাঁর নাম রাখলো 'গ্যাস', এবং তাঁর হেডমাস্টার, ডাঃ বাটলার, একবার এরকম বাজে বিষয়ে সময় নষ্ট করবার দরুণ তাঁকে সবসমক্ষে ভর্ৎসনা করা জরুরী কাজ মনে করেছিলেন।

এসব উদ্ভট বাতিকের জন্য স্কুলে তাঁর জনপ্রিয়তার হানি হয়নি। কারণ সেগুলি নিতান্ত আন্তরিক ছিল। তিনি ছিলেন একজন স্নেহপ্রবণ বালক। কাজেই তাঁর বন্ধুর সংখ্যাও ছিল অনেক। যদিও সেদিনের পাঠক্রমে নিসর্গচর্চার কোনো স্থান ছিল না তবু চার্লস ছাড়াও আরো অনেক ছেলে একাজের যাদু আবিষ্কার করেছিল এবং নানা রকম খনিজ ও পোকামাকড় সংগ্রহে এবং পাখীদের অভ্যাস পর্যবেক্ষণে তাঁর উৎসাহের সরিক ছিল। স্কুলের এক বন্ধু তাঁকে The Wonders of the World (পৃথিবীর বিস্ময়সমূহ) বইটি ধার দিয়েছিল। এই বইটা তাঁর মনে প্রথমে ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে, বোধ হয় বইটাতে যে-সব উল্লেখযোগ্য বর্ণনা আছে সেগুলির যাথার্থ্য নিরূপণের ইচ্ছাতেই। এ-সব নিয়ে জোর আলোচনা চলতো বন্ধুদের মধ্যে।

স্কুলের পড়ায় চার্লস-এর কোনো উপকার হ'বে না এ-কথা বুঝতে পেরে তাঁর বাবা সুবিবেচকের মতো তাঁকে তাঁর ১৭ বছর বয়স পূর্ণ হবার আগেই এডিনবরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে তখন ইরাসমাস তাঁর চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ প্রায় শেষ করে এনেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এখানকার কাজও চার্লস-এর বুদ্ধিকে তাতে পারল না। আর তাঁর বাবা তাঁর জন্য যথেষ্ট সংস্থান রেখে যাবেন একথা জানার ফলে ডাক্তারি পাশ করবার জন্য বিশেষ চেষ্টাও করলেন না তিনি। এডিনবারায় আসবার আগে তাঁর বাবার দরিদ্রতর রোগীদের তিনি দেখতেন এবং এ-কাজে বেশ তীক্ষ্ণ আগ্রহ বোধ করতেন। কিন্তু, যদিও এখানে হাসপাতালের কাজে তিনি ফাঁকি দিতেন না, এখানকার কয়েকটি ঘটনা দেখে দারুণ মনোকষ্ট পেয়েছিলেন তিনি। দুটো বিশ্রী ধরণের অস্ত্রো-পচারের সময়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং সেগুলি শেষ হ'বার আগেই ছুটে পালিয়ে এসেছিলেন। এগুলির মধ্যে একটা অস্ত্রোপচার হয়েছিল একটা শিশুর উপরে। ক্লোরোফর্ম তখনো আবিষ্কার হয়নি। ইরাসমাস এডিনবারা ছেড়ে আসবার একবছর বাদে নিজের খরচের টাকা চার্লসের হাতে আসতে শুরু হ'ল। ফলে নিজের রুচি অনুযায়ী বন্ধু জোটাতে শুরু করলেন তিনি। এঁদের মধ্যে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের উপরে সম্ভবতঃ সব চাইতে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ডাঃ গ্রাণ্ট। বয়সে

তিনি চার্লসের চাইতে বেশ কিছুটা বড়ো ছিলেন। তাঁর আপাতঃ রুক্ষ এবং লৌকিক আচরণের নীচে লুকিয়ে ছিল প্রচুর পরিমাণে, সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক উৎসাহ। তাঁরা দুজনে নানারকম সামুদ্রিক প্রাণী সংগ্রহ করে তাদের ব্যবচ্ছেদ করে দেখতেন। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অনেক আলোচনা হ'ত তাঁদের। এই রকম এক আলোচনায় একদিন ডাঃ গ্রান্ট লামার্ক এবং তাঁর বিবর্তন সম্পর্কীয় মতবাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। সে-সময়ে এ-আলোচনা ডারউইনের মনে কিন্তু বিশেষ রেখাপাত করেনি। কিন্তু মনে হয় তাঁর অচেতন মনে এই আলোচনার প্রভাব বহুবছর পরে তাঁর Origin of Species-এ ("শ্রেণীর উদ্ভব") তিনি যে মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন তা'র অনুপন্থী করেছিল তাঁর চিন্তাধারাকে।

এডিনবরায় দুবছর কাটানোর পরেই এটা বেশ বোঝা গেল যে ডাক্তারি করা চার্লসের ধাতে সইবে না। কাজেই তাঁর বাবা প্রস্তাব করলেন যে চার্লসের পক্ষে ধর্মযাজক হওয়াটাই উচিত হ'বে এবং সেই মতানুযায়ী তাঁকে কেম্ব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে পাঠানো হল। তা'র মানে তাঁকে আবার ফিরে আসতে হ'ল সেই সাহিত্যধর্মী পাঠক্রমের আওতায়। শিক্ষাগতভাবে বিচার করলে কেম্ব্রিজেও তাঁর সময় এডিনবরা এবং স্কুলের মতোই বাজে খরচ হ'ল। শিকারের নেশায় মেতে তিনি একদল শিকারী বন্ধুর সঙ্গে ছুটলেন এবং মফঃস্বলে ঘোড়া দাবড়িয়ে আর সেই নতুন বন্ধুদের সঙ্গে খানা খেয়ে প্রচুর সময় নষ্ট করতে লাগলেন। বহু বছর পরে তাঁর মনে হয়েছিল যে সময়ের এই অপব্যবহারের জন্য তাঁর অনুতপ্ত হওয়া উচিত। কিন্তু সেই বন্ধুদের প্রীতিকর ও আনন্দ উত্তেজনার সেই মুহূর্তগুলির কথা ভেবে তা' আর তাঁর করা হয়ে ওঠেনি।

অবশ্য কেম্ব্রিজে শুধু এই শিকারী বন্ধুদের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হননি তিনি। তাঁর অন্তরঙ্গদের মধ্যে ছিলেন হুইটলে, পরে একজন সীনিয়র র‍্যাঙ্গলার হয়েছিলেন তিনি; এঁর কাছ থেকে তিনি চিত্রকলার মর্মানুভবের শিক্ষা পেয়েছিলেন—এমন কি কিৎসউইলিয়াম ন্যাসিথামের শ্রেষ্ঠ ছবি বেছে নেবার ক্ষমতা হয়েছিল তাঁর। আরেকজন বন্ধু ছিলেন হার্বার্ট। তিনিও হয়ে ছিলেন একজন উঁচুদরের র‍্যাঙ্গলার। এঁর মাধ্যমে তিনি পেয়েছিলেন সঙ্গীত জগতে প্রবেশাধিকার। আর তার ফলে সঙ্গীতে তাঁর রুচি এতটা প্রবল হয়েছিল যে সঙ্গীতের মূর্ছনা তাঁর শরীরের ভেতর দিয়ে একটা সুখের শিহরণ বইয়ে দিত। উপরন্তু, এ-সময়ে তাঁর সংগ্রহের সেই সহজাত বাতিকও খুব বেড়ে উঠল।

চার্লসের কেম্ব্রিজ-জীবনে সব চাইতে বেশী প্রভাব পড়েছিল অধ্যাপক হেনস্লোর। এঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য তাঁর সমস্ত কর্মজীবনে ফেলেছিল তার ছাপ। বিজ্ঞান অনুরাগী সমস্ত লোকের জন্য একটা আহ্বান অবারিত করে রেখেছিলেন অধ্যাপক হেনস্লো তাঁর নিজের বাড়ীতে। সপ্তাহে একটা দিন অনেকে জড়ো হ'ত সেখানে, চার্লস যেতেন নিয়মিতভাবে, শেষে দুজনের ঘনিষ্ঠতা এতো বেড়ে উঠল যে দুজনে প্রায় প্রতিদিন একসঙ্গে বেড়াতে বেরোতেন এবং দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা করতেন। হেনস্লোর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান ছিল। তাঁর বিচার বুদ্ধি ছিল চমৎকার, সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর এক অনায়াস ক্ষমতা ছিল আর তাঁর প্রকৃতি ছিল সব রকমের ক্ষুদ্রতার উর্ধে। নিঃসন্দেহে এই বন্ধুই চার্লসের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল—প্রথাগত শিক্ষার কাছ থেকে যে-প্রেরণা তিনি পাননি অধ্যাপক তাঁকে দিয়েছিলেন সেই সঞ্জীবনী। নানা ধরণের বই তিনি চার্লসকে পড়তে বলতেন এবং তাঁর সঙ্গে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতেন। হেনস্লো তাঁকে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে পড়াশোনা করতে উৎসাহ দেন এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে চার্লস যখন কেম্ব্রিজ ছেড়ে চলে আসেন তাঁর জন্য নর্থ ওয়েলস অভিযানে অধ্যাপক সেজউইকের সঙ্গী হ'বার একটা আমন্ত্রণ জোগাড় করে দেন।

এই ভ্রমণ থেকে বাড়ী ফিরে এসে চার্লস দেখলেন যে ইতিমধ্যে হেনস্লোর কাছ থেকে আরেকটি চিঠি তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। পেক, চিলি, এবং প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপের তটরেখা জরীপের জন্য এবং

অন্তরঙ্গ নানা ঘটনার মিশে পৃথিবীব্যাপী সমুদ্র-অভিযানে বেরোচ্ছে 'বীগল'। সেই জাহাজে অবৈতনিক প্রকৃতি বিজ্ঞানীর কাজ নেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। চার্লস তো লাফিয়ে উঠলেন। বাবা বাধা দিলেন। কিন্তু বললেন, যে-কোন বুদ্ধিমান লোক তাঁকে একাজ নেবার পরামর্শ দিলে তিনি আপত্তি করবেন না। চার্লসের মামা তাঁর সমর্থন জানালেন চার্লসকে। কাজেই বাবার আপত্তি টিকলো না। কিন্তু পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ালো তাঁর নাক। 'বীগলে'এর পাশলাটে কাপ্তেন ফিৎসরয় বেঁকে বসলো। তার ধারণা : এ-রকম চেহারার নাকওয়ালা কোনো লোক কোনো কাজের না, উদ্যম কিংবা দৃঢ়চিত্ততার লেশমাত্রও থাকতে পারে না এ-সব লোকের। যা হোক, শেষ পর্যন্ত নাকের বেড়াও ডিঙোলেন চার্লস। 'বীগল'-এ প্রকৃতি বিজ্ঞানীর পদে যথারীতি নিয়োগ পেয়ে সমুদ্র অভিযানে বেরোলেন ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে, ফিরলেন ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে। এই পাঁচ বছরে তাঁর কাজের সম্পূর্ণ বিবরণ তিনি দিয়েছেন তাঁর "Journal of Researches during the voyage of the Beagle" বইটিতে। নিঃসন্দেহে এই অভিযান বাস্তবভাবে তাঁর কর্মজীবনে এক নতুন মোড়। সমুদ্র থেকে এবং যে-সব জায়গায় তাঁদের জাহাজ থেমেছিল সেই সমস্ত জায়গা থেকে তিনি নানা রকম প্রাণী সংগ্রহ করলেন, বিশেষ যত্ন নিয়ে প্রত্যেক এলাকার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রাকৃতিক ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলেন এবং প্রতিদিন যা-কিছু তিনি দেখেছেন তার সমস্ত বর্ণনা বিশেষ অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাঁর জার্নালে লিপিবদ্ধ করলেন। পাছে চার্লস শুধুমাত্র একজন শিকারী ভদ্রলোক হিসেবেই জীবন কাটান তাঁর ডাক্তারের এ আশঙ্কার কারণ ছিল। এ কাজ সেই ভয়ের সম্ভাবনা থেকে চার্লসকে বাঁচিয়ে দিল। এর মধ্যে দিয়ে তিনি আয়ত্ত করলেন উদ্যমশীল অধ্যবসায় ও একাগ্র মনোনিবেশের অভ্যাস। ক্রমে শিকারের নেশা স্তিমিত হয়ে এল তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুরাগের চাপে এবং বন্দুকের ভার পড়লো তার চাকরের হাতে। তা ছাড়া জার্নালে যে বিপুল তথ্যের বিস্তৃত পরিবেশন তিনি করেছিলেন তার ফলে একজন প্রখ্যাত প্রকৃতি-বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হল এবং তার চাইতেও বড় কথা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা তাঁর অমূল্য অবদানের উপকরণ তাঁরা জোগালেন তাঁকে।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দেশে ফিরে চার্লস মাস তিনেক কেম্ব্রিজে কাটালেন। তার সংগ্রহগুলি রইলো হেনস্লোর তত্ত্বাবধানে। তারপরে তিনি লণ্ডনের গ্রেট মার্লবরো ষ্ট্রীটে উঠে এলেন। সেখানে থাকলেন ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি পর্যন্ত। এ সময়টাতে তিনি লিখলেন Journal of Travels, Geological Observations, The Zoology of the voyage of the Beagle. প্রভৃতি বইগুলি। সমুদ্রযাত্রার সময়ে তিনি লীয়েলের Principles of Geology-র প্রথম খণ্ড পড়েছিলেন এবং তাঁর আলোচনা পদ্ধতি চার্লসের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। ফিরে এসে লীয়েলের সঙ্গে তিনি দেখা করলেন। তাঁর সংগ্রহগুলি এবং সে সম্পর্কে তাঁর মতামত সম্পর্কে এই অভিজ্ঞতার ভূতাত্ত্বিক বেশ সশ্রদ্ধ আগ্রহ বোধ করছেন দেখে খুব খুশি হলেন তিনি। এই আগ্রহ প্রচুর অনুপ্রেরণা দিল তাঁকে এবং এখন থেকে লীয়েলের বন্ধুত্ব ও পরামর্শ তার ভবিষ্যৎ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করল।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তার মামাতো বোন এমমা ওয়েজউডের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল। ভালোবাসার সুখে ভরা এই দাম্পত্য তাঁদের দুজনের জীবনে ছড়িয়ে দিল আমরণ এক স্নিগ্ধ মাধুর্য। তার স্ত্রীর একান্ত অনুরাগ ও যত্নের ফলেই তার পক্ষে কৃচ্ছ্র স্বাস্থ্য নিয়েও এক কঠোর পরিশ্রমের জীবন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। চার্লসের বয়স তখন ত্রিশ। এর পর থেকেই তিনি প্রায় অকর্মণ্য হয়ে পড়েন। অবশ্য চিরদিনই তিনি রোগাটে আর দুর্বল ছিলেন। প্রথমে তাঁরা লণ্ডনে ১২নং আপার গাওয়ার ষ্ট্রীট এর এক ছোট্ট বাসায় ছিলেন। কিন্তু সামাজিক জীবনের উত্তেজনায় চার্লস বারংবার অসুস্থ হয়ে পড়ছেন দেখে, আর এই উত্তেজনায় তিনি মেতে ওঠেন থেকে, তাঁরা ১৮৪২ খৃঃ মফস্বলে সরে গেলেন। সেখানেই একটা চমৎকার বাড়ীতে তাঁদের প্রণয়মধুর বিবাহিত জীবনের বাকী অংশটা

সুখে কাটল। বাড়ীটা সারে'র ডাউন-এ। এখানে কটিনমাফিক জীবন কাটিয়ে প্রায় প্রতিদিনই নিবিষ্টচিত্তে তাঁর বিজ্ঞান সাধনার জন্য কাজ করবার মতো শারীরিক ভাবে যথেষ্ট পরিমাণ সুস্থ থাকতে পেরেছিলেন চার্লস। ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রাতরাশের আগেই তাঁর বাচ্চা ছেলের তিনি সঙ্গে এক চক্কর ঘুরে আসতেন। ৭-৪০-এ একা একা প্রাতরাশ সারতেন তিনি। তারপরে ৮টা থেকে ৯-৩০ অবধি কাজ করতেন। ৯-৩০এ ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পড়া শেষ করে বৈঠকখানার একটা সোফায় গা এলিয়ে শুয়ে থাকতেন। পারিবারিক চিঠিপত্র এবং কোনো উপন্যাসের অংশ বিশেষ জোরে জোরে পড়ে কেউ তাকে সে সময় শোনাতো। ১০-৩০এ নিজের কাজে ফিরে যেতেন তিনি। প্রায় ১২টা পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে প্রিয় কুকুরটিকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতেন। এটা তাঁর অবশ্য করণীয় শারীরিক অভ্যাস। বৃষ্টির দিন কিংবা শুকনো আবহাওয়া কোনো কিছুতেই এ-অভ্যাসের বদলবদল হত না। বাচ্চারা বাইরে তখন খেলাধুলা করছে। তাদের আমোদের মাঝেও তাঁর মাঝে মাঝেই অংশ গ্রহণের ডাক পড়ত। দুপুরে আহারের পরে সোফায় শুয়ে খবরের কাগজ পড়তেন তিনি। তারপরে নিখুঁত ঘণ্টে প্রত্যেকটা চিঠির জবাব দিতেন—যে-কেউই লিখুক না সেই চিঠি। ৪টে থেকে ৪-৩০ পর্যন্ত আরেক দফা হাঁটতেন, ৪-৩০ থেকে ৫-৩০ পর্যন্ত আবার কিছু কাজ করতেন। অতঃপর সারা বিকেল এবং সন্ধেটা কাটিয়ে দিতেন শুয়ে শুয়ে আর তাঁর স্ত্রী—পরে কোনো ছেলে কিংবা মেয়ে—কিছু পড়ে শোনাতেন তাঁকে। বিশ্রামের সময়ে মাঝে মাঝে সিগারেট খেতেন তিনি, কিন্তু কাজের উৎসাহ বাড়ানোর জন্য নস্যটাকেই বেশী পছন্দ করতেন। কোনো কিছুতেই আগ্রহ জমে উঠলে, বিশেষ করে কোনো ডিক্টেশান দেবার সময়ে এক টিপ নস্য নেবার জন্য হঠাৎ ছুটে পাশের ঘরে যেতেন। যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলতেন বাক্যের শেষাংশটুকু।

চল্লিশটা বছর ধরে এই ছিল চার্লস-এর প্রতিদিনের জীবন। আর এই সব নিয়ম মেনেই তাঁকে কাজ করতে হত। স্নায়বিক উপার্জনের হীনতা থেকে তাকে বাঁচিয়েছিল তার পৈত্রিক সম্পদ। সে কথা তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করতেন। আর তারও চাইতে বড়ো কথা—ভাষায় তার সবটুকু বোঝানো সম্ভব নয়—তাঁর কাজের পথে সব কিছু দৈনন্দিন তুচ্ছতার হাত থেকে তাঁকে সারাজীবন আড়াল করে রেখেছিল অনুরাগ মধুর দুটি কোমল হাতের একনিষ্ঠ সেবা। সে হাত দুটি তাঁর প্রিয়তমার, তাঁর স্ত্রীর।

এ-সময়টাতে অনেকগুলি বই তিনি লিখেছেন। সেগুলি : Coral Reefs (প্রবালশৈল), The Fertilisation of Orchids (অর্কিডের প্রজনন প্রক্রিয়া), The Formation of Vegetable Mould through the Action of Worms (কীটের সাহায্যে ছত্রকজাতীয় উদ্ভিদের সংগঠন)। এগুলি মূল্যবান কাজ হলেও তাঁর শ্রেষ্ঠীর উদ্ভবতত্ত্বের বিকাশে কুড়ি বছর ধরে যে ধৈর্যশীল একনিষ্ঠ গবেষণা তিনি করেছেন তার সাথে অন্য কিছুর তুলনা হয় না। তবে যে তাঁর নিজের দিয়েই তাঁর মনে প্রথম তৈরী হতে সুরু করেছিল সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। 'বীগলের'এর সমুদ্র পরিক্রমার সময়ে কতকগুলি ব্যাপার তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে : ফসিল ও বর্তমান প্রাণীদের মধ্যে সাদৃশ্য, কোন দ্বীপপুঞ্জে উদ্ভিদপ্রকৃতি এবং প্রাণিপ্রকৃতির দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে অতি সামান্য পার্থক্য। এ সম্বন্ধে প্রচলিত কৈফিয়তে তাঁর মন উঠল না। শ্রেণির উদ্ভব সম্পর্কে তাঁর মতবাদের অনুকূল তথ্য সংগ্রহের মানসে তিনি তাঁর নোট বুকের পাতা ওলটালেন ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের পয়লা জুলাই। সে সময়ে তাঁর কথা থেকে জানা যায় যে এ-জিনিস নিয়ে বহুকাল ধরে তিনি ভাবছেন। আরো পনেরো মাস পরে তাঁর মতবাদ দানা বাঁধল।

দীর্ঘকালব্যাপী পর্যবেক্ষণ, কোনো পূর্বকল্পিত ধারণার ফাঁদে ধরা না দেবার জন্য কঠিন সংযমে যাঁদা সতর্ক অনুপ্রেরণা, এবং আবার দীর্ঘকালব্যাপী পর্যবেক্ষণ, যতদিন পর্যন্ত না নিজের মতবাদকে সব সংশয়ের ঊর্ধে প্রতিষ্ঠা তিনি করতে পারছেন যতদিন না তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে এমন নিখুঁত সামঞ্জস্য ঘটে যে পৃথিবীর হাতে তাঁর মতবাদকে নিঃসংশয়ে তুলে দিতে পারেন তিনি।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি তাঁর মতবাদের একটা সংক্ষিপ্তসার লিখলেন, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে একটু বাড়ালেন সেটাকে এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লীয়েল-এর পরামর্শে পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য তাঁর মতবাদ বিস্তারিতভাবে লিখতে সুরু করলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে একাজ সবেমাত্র অর্ধ সমাপ্ত হয়েছে, এমন সময়ে মালয় আর্কিপেলেগো থেকে ছোট্ট একখণ্ড পত্র তিনি পেলেন। লেখক : অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস। বিষয় : ডারুইন তাঁর বইয়ে যে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন, ঠিক সেইটিরই সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ বর্ণনা। অর্থাৎ শ্রেণীর উদ্ভব সম্পর্কে যে স্বকীয় মতবাদ প্রচার করতে চলেছেন ডারুইন সেটি আর শুধু তাঁর একান্ত নিজের নয়, আরেকজনও সেই তত্ত্বই উপস্থাপিত করেছেন। কী করবেন তিনি? বৈজ্ঞানিকের সাধুতা ও ঔদার্যের এ-এক অগ্নিপরীক্ষা। বুড়ি বছরের এই অক্লান্ত গবেষণার কিছুই দাম থাকবে না?

এই পত্র পাবার পরেও যদি অবিচলিত থাকতেন ডারুইন, যদি তাঁর মনে না জাগতো ব্যক্তিগত হতাশাবোধের তীক্ষ্ণ তীব্র যন্ত্রণা—তাহলে অতিমানব বলা যেত তাঁকে। কিন্তু তিনি তো আনন্দ বেদনায় বিচলিত, আশা আকাঙ্খার দোলা লাগা এই পৃথিবীরই মানুষ। তবু এর ফলে কোনো বাধা সৃষ্টি হল না তাঁর কালোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণে। তৎক্ষণাৎ ওয়ালেসের মতবাদ প্রকাশ করা তিনি স্থির করলেন। যাহোক, সৌভাগ্যক্রমে লীয়েল এবং হুকার—অনেক বছর ধরে এঁদের সঙ্গে তাঁর মতবাদ নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন—জিদ ধরলেন যে ডারুইনের পাণ্ডুলিপি থেকে একটা সংক্ষিপ্তসারও ওয়ালেসের পত্রের সঙ্গে এক সঙ্গেই প্রকাশ করতে হবে। নিতান্ত অনিচ্ছাকৃত সম্মতি দিলেন ডারুইন। ফলে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের এগারোই জুলাই লিনীয়েন সোসাইটিতে দুজনের লেখাই পাঠ করা হল। কোনো সাড়াই জাগলো না তার ফলে। কাজেই ডারুইন তাঁর বই শেষ পর্যন্ত লেখা স্থির করলেন। প্রথমে যা ভেবেছিলেন তার চাইতে সংক্ষিপ্ততর করলেন তিনি বইটিকে। অবশ্য উদাহরণ ও যুক্তির সাহায্যে এই নতুন মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করবার মত যথেষ্ট বড় তা'। ডারুইনের আত্মসংযম এবং মত প্রকাশের সুজনসুলভ ভঙ্গী এবারে পেল তার ন্যায্য পুরস্কার। বইটি প্রকাশিত হল ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। Origin of Species (শ্রেণীর উদ্ভব)। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ডারুইনের জীবনে সে নিয়ে এল এক বিস্ময়কর সাফল্যের যুগ।

আর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ফিরে এসে ওয়ালেস দেখলেন যে ইতিমধ্যেই ডারুইন ও তিনি সেখানে রীতিমত খ্যাতিমান। দুজনায় দেখা হল। সুরু হল নানা আলোচনা। সদৃশ মতাবলম্বী এই দুজনার মধ্যে পার্থক্যও ছিল প্রচুর। কিন্তু যে সৌহার্দে জড়িয়ে পড়লেন তাঁরা ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ডারুইনের মৃত্যুদিন পর্যন্ত তার উষ্ণ আবেগ উত্তপ্ত রেখেছিল তাঁদের দুজনার হৃদয়কে।

সাহিত্য সৃষ্টি

—রবীন্দ্রনাথ

যেমন একটা সূতাকে মাঝখানে রাখিয়া মিছরির কণাগুলা দানা বাঁধিয়া উঠে, তেমনি আমাদের মনের মধ্যেও কোনো একটা সূত্র অবলম্বন করিতে পারিলেই অনেকগুলা বিচ্ছিন্নভাব তাহার চারিদিকে দানা বাঁধিয়া একটা আকৃতি লাভ করিতে চেষ্টা করে। অস্ফুটতা হইতে পরিস্ফুটতা, বিচ্ছিন্নতা হইতে সংশ্লিষ্টতার জন্য আমাদের মনের ভিতরে একটা চেষ্টা যেন লাগিয়া আছে।.....

এইরূপ ছড়ানো ভাবের এক হইয়া উঠিবার চেষ্টা মানবসাহিত্যে কয়েক জায়গায় অতি আশ্চর্য্য বিকাশ লাভ করিয়াছে। গ্রীসে হোমারের কাব্য এবং ভারতবর্ষে রামায়ণ-মহাভারত।.....

(বঙ্গদর্শন, আষাঢ়, ১৩১৮)

মা ও ছেলে

সোমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সুরমা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে তরকারি কুটছিল। তাদের পাঁচ বছরের ছেলে সাধন তার সামনে বসে প্রথম ভাগের পড়া তৈরী করছিল।

সাধন বললে—এটা কি মা, বলে দাও না

সুরমা সেদিকে তাকিয়ে দেখে বললে—অ, চ আর ল, অচল

—অ, চ আর ল, অচল। আর এটা ?

—অ, ধ আর ম, অধম

—অ, ধ আর ম, অধম

এমন সময়ে বাইরের দরজায় কড়া নড়ে উঠলো। সুরমা বললে—কে এসেছে দেখ ত বাবা!

—সাধন ছুটে চলে গেল।

একটু পরেই তার সোল্লাস চীৎকার শোনা গেল—

—হাতী এসেছে মা, হাতী এসেছে

তারপরেই সে সুরমাকে হিড়িহিড় করে দিলে—সামনে থেকে সরে যাও মা, হাতী আসছে।

এইদিকে চল হাতী, মা রান্নাঘরে। চল্ চল্, চলাচল্, চল্ চল্ চলাচল্।

সুরমা উঠে দাওয়ার ওপর একটা আসন পেতে দিলে।

সাধনের গলা শোনা গেল—একবার ডাকো না হাতী

গম্ভীর গলায় আওয়াজ হল—প্রাঁও-ও-ও

সাধনের খিল্ খিল্ হাসি!

সাধনকে কাঁধে নিয়ে হাতী এসে সুরমার সামনে দাঁড়ালো, স্মিতমুখে বললে—আশীর্বাদ মা, ভাল আছ ?

সুরমা তাঁকে প্রণাম করে বললে—হ্যাঁ পাঁড়েজী, ভাল আছি। আসুন, বসুন।

পাঁড়েজী ডাকলেন—দাদা

তাঁর কাঁধের ওপর থেকে সাধন উত্তর দিলে—কি হাতী ?

—হাতী তার মার কাছে এসেছে। এবার সে বলবে :

—তুমি বলবে হাতী ?

—হ্যাঁ দাদা

—বলে কি করবে ?

—খাবে

—কি খাবে হাতী ?

—ভাত, ডাল, তরকারি, অম্বল, দই, পায়েস, রসগোল্লা, পান্তুয়া আরো কত কি !

—বাব্বা, অত খাবে ?

—খাবো না ? হাতীর কত বড় পেট দেখছ না ?

সাধন তার কাঁধের ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে তার ভুঁড়িটা একবার দেখে নিলে, তারপর বললে—জল খাবে না হাতী ?

—খাবো বৈ-কি দাদা

—কি করে খাবে ?

—শুঁড় দিয়ে

—কৈ তোমার শুঁড় ? দেখি !

পাঁড়েজী নাক দিয়ে ফোঁ করে একটা আওয়াজ করলেন, বললেন—দেখেছ দাদা ?

সাধন তখন খুব হাসছে।

পাঁড়েজী বললেন—এবারে তুমি খেলা করোগে—কেমন ?

সাধন তাঁর গলা ছেড়ে ঘরে আবদারের সুরে বললে—আগে তুমি আর একবার ডাকো হাতী।

পাঁড়েজী মুখ দিয়ে ভোরে আওয়াজ করলেন—প্রাঁও-ও-ও

সাধন তাঁর কাঁধের ওপর হেসে লুটিয়ে পড়লো।

তিনি হাসতে হাসতে বললেন—হয়েছে দাদা ? এইবার তোমায় নামিয়ে দিই, এসো।

...ধনকে সাবধানে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে তিনি গিয়ে আসনে বসলেন।

সত্যনারায়ণ পাঁড়ে বিহার প্রদেশের লোক। বয়স প্রায় পঞ্চাশ, সুস্থ, সবল, গৌরবর্ণ বিরাট দেহ; মুখে কাঁচায় পাকায় প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফ, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, পরিষ্কার ঝকঝকে ধোঁত, কাঁধে শুভ্র পৈতের গোছা। সুরমার বাড়ীওয়ালাতে তিনি কর্মচারী; এই সহরে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আছেন, মাতৃভাষার মত বাংলা বলেন। সুরমা তার বিয়ের পর থেকেই তাঁকে দেখছে। আজ যেমন তিনি সাধনকে কাঁধে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, একদিন তেমনি সাধনের বাবাকেও কাঁধে নিয়ে বেড়িয়েছেন।

কিছুক্ষণ এ কথা সে কথার পর পাঁড়েজী বললেন—আজ আমি ভাড়ার জন্যে এসেছিলাম মা। তিনমাসের ভাড়া বাকী পড়ে গেছে—আজ সকালেও মালিক টুকেছেন।

সুরমার স্বামী যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সুপ্রিয় সরকার আজ তিনমাস এ বাড়ীতে আসেন নি। একটি সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করে তিনি অন্যত্র আছেন। সুরমা, তার একমাত্র ছেলে সাধন, এরা বেঁচে আছে কিনা সে খবরও তিনি আর নেন না। সুরমার সম্বল কয়েকটি গয়না; তার কিছু কিছু বেচে সে তিনমাস সংসার চালিয়েছে—বাড়ী ভাড়া দিতে পারে নি।

তাকে চিন্তিত মুখে চুপ করে বসে থাকতে দেখে পাঁড়েজী বললেন—তুমি যদি বল মা ত আমি তার কাছে একবার যাই, বল মা, যাব?

—কি হবে তাঁর কাছে গিয়ে পাঁড়েজী?

—কি হবে? পাঁড়েজী গর্জন করে উঠলেন—দেখি সে আমার কথার কি উত্তর দেয়! কেমন করে সে আমাকে ফেরায় আমি দেখতে চাই! কি বলছ মা তুমি! নিজের স্ত্রীকে, নিজের ছেলেকে মানুষ এমন করে ভুলে যেতে পারে? সে এত বড় অমানুষ হয়ে গেল? তুমি একটিবার অনুমতি দাও মা—আমি ঘাড় ধরে তাকে টেনে নিয়ে আসি—দেখি সে টাকা কেমন না দেয়! যাব মা?

সুরমা একবার আগেও রাজী হয়নি, আজো হল না। দুর্জয় অভিমান বুকে চেপে রেখে সে মুখ তুলে শান্তভাবে বললে—না পাঁড়েজী থাক্, কাজ নেই তাঁর কাছে গিয়ে। তিনি যখন আমাদের ভুলে যেতেই চান, তখন ভুলতেই দিন তাঁকে, মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই। আমাদের দিন যেমন করে হোক্ চলে যাবে।

নিঃশ্বাস ফেলে পাঁড়েজী বললেন—তোমার ছেলের যদি পয়সা থাকত মা তাহলে সে দুনিয়ায় কারুর পরোয়া করত না, তার মাকে আর ভাইটিকে নিয়ে আনন্দে দিন কাটিয়ে দিত! কিন্তু, ছেলে যে তোমার বড় গরীব মা! তবু সে যখন বেঁচে আছে তখন তুমি বাড়ী ভাড়ার কথা আর চিন্তা করো না।

সুরমা ব্যস্ত হয়ে বললে—না না পাঁড়েজী, আপনি এখন কিছু খরচ করবেন না।

—কেন মা, আমি কি তোমার ছেলে নই?

—সেইজন্যেই ত মানা করছি পাঁড়েজী। আমার দরকার হলে আপনি ছাড়া আর কার কাছে হাত পাতব বলুন?

—কিন্তু তুমি কোথা থেকে বাড়ী ভাড়া দেবে মা?

—দেখি দাঁড়ান—বলে সুরমা উঠে ঘরে চলে গেল।

খানিক পরে কয়েকটি গয়না হাতে করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পাঁড়েজীর কাছে সেগুলি রেখে দিয়ে বললে—এগুলো বিক্রী করে আপনি বাড়ী ভাড়া শোধ করে দিন পাঁড়েজী।

গয়না দেখে পাঁড়েজী চমকে উঠলেন। হাত গুটিয়ে নিয়ে বললেন—সে কি কথা। ছেলে হয়ে মার গয়না বিক্রী করব? ও কাজ আমি পারব না মা!

—পারবেন না? কিন্তু গয়না বড় না মার ইজ্জৎ বড় পাঁড়েজী?

পাঁড়েজীর মুখে কথা নেই!

—বলুন! বলছেন না যে?

গম্ভীর গলায় পাঁড়েজী বললেন—মার ইজ্জৎ বড় মা! আর সেই ইজ্জৎ রাখা ছেলের সবচেয়ে বড় কর্তব্য—কিন্তু তা মার গয়না বিক্রী করে নয়। আমি উঠলাম। তুমি

নিশ্চিন্ত থাকো মা—বাড়ী ভাড়ার কথা আর ভেবো না।

তিনি উঠে পড়লেন।

গয়না সেইখানেই পড়ে রইল।

পাঁড়েজী চলে যাচ্ছিলেন, সুরমা চোখের জল মুছে একটু ইতস্তত: করে ডাকলে—আর একটা কথা আছে পাঁড়েজী। তিনি ফিরে এলেন—কি কথা মা?

—বলছিলাম যে এত বড় বাড়ী ত আমাদের দরকার নেই—আপনি যদি কম ভাড়ায় একটা ছোটখাটো বাড়ী দেখেন ত সেইখানেই আমরা উঠে যাই।

পাঁড়েজী ভেবে বললেন—তাই দেখব মা।

—আর.....

—আর কি মা?

—কিছু কিছু সেলাই-এর কাজ যদি আমাকে এনে দেন।

পাঁড়েজী সুরমার মুখের দিকে তাকালেন। সুরমা মুখ নীচু করে বললে—রুমাল, টেব্‌ল্-ক্লথ, চাদরে আমি নক্সা তুলতে পারি—তাছাড়া, কাপড় পেলে রুমাল, টেব্‌ল্-ক্লথ্ এসব তৈরী করতেও পারি—

পাঁড়েজীর চোখে জল এসে গেল, তিনি কথা বলতে পারলেন না।

সুরমা বললে—বসেই'ত থাকি—সময় নষ্ট হয় বৈ'ত নয়—এতে যদি দুটো পয়সা আসে ত'মন্দ কি? এনে দেবেন পাঁড়েজী?

গলা পরিষ্কার করে পাঁড়েজী বললেন—তোমার এত বড় ছেলে থাকতে পয়সার ভাবনা তোমাকেই ভাবতে হবে মা?

—হবে বৈ কি পাঁড়েজী। মা হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকাবো না—তা কি হয়? দেশে আপনাকে প্রতি মাসে টাকা পাঠাতে হয়, এখানে আপনার নিজের খরচ আছে—তার ওপরে আবার আমরা হলাম। একা মানুষ আপনি, কতদিক সামলাবেন বলুন ত?

পাঁড়েজী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সুরমা বললে—তা ছাড়া, এতে কষ্ট ত কিছু নেই—শুধু বসে বসে সেলাই করা। এটুকুও করব না আমি? না না পাঁড়েজী, আপনি অমত করবেন না; আজই আমাকে সব এনে দিন। দেবেন ত?

—দোব মা।

পাঁড়েজী ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

বেলা তখন তিনটে।

পাঁড়েজীর হাঁকডাকে সুরমার ঘুম ভেঙে গেল।

—ও দাদা, দরজা খোলো, তোমার হাত্তী এসেছে।

সুরমা গিয়ে দরজা খুলে দিলে।

—আসুন। অত কাগজ কি হবে পাঁড়েজী?

পাঁড়েজীর হাতে কয়েক গজ কাপড়, কিছু রঙীন সুতো, একখানা নক্সার বই আর কাঁধে এক বোঝা পুরোণো খবরের কাগজ।

—ও গুলো আমার জন্যে মা। এ সব তোমার, এই নাও।

—অত কাগজ নিয়ে কি করবেন আপনি?

—ঠোঙা তৈরী করব।

তাঁর কথা শুনে সুরমা অবাক হয়ে গেল।

—ঠোঙা তৈরী করবেন?

—হ্যাঁ মা। কেন মা, পারব না?

সুরমার মুখে কথা যোগালো না। তার বুকের ভেতরটা বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠে চোখ দুটি জলে ভরে গেল।

পাঁড়েজী নিজের মনেই হাসতে হাসতে বললেন—তুমি দেখিয়ে দিলে খুব পারব। কি আর এমন শক্ত কাজ!

—কিন্তু ঠোঙা তৈরী করবার সময় কোথায় আপনার?

—কেন, যখন যেটুকু সময় পাব তখনই করব।

—সারাদিনই ত আপনাকে ঘোরাঘুরি করতে হয়। কখন্ করবেন আপনি?

—দিনে না পারি, রাত্তিরে বিছানায় বসে বসে করব। সে তুমি ভেবো না মা। তুমি ততক্ষণ আমাকে একটু আটা তৈরী করে দাও—আর কি করে ঠোঙা করতে হয় একটু দেখিয়ে দাও।

—আপনি কি এখুনি ঠোঙা তৈরী করবেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ মা, এক্ষুণি। এখন কাজে দেরী করতে নেই

বারোক্ষার ওপর কাগজের গাদা নিয়ে বসে পাড়েজী মহা উৎসাহে চেঁচামেচি সুরু করে দিলেন—ও দাদা, কত ঘুমোবে? উঠে এস, দেখ কি এনেছি। সাধন চোখ মুছতে মুছতে উঠে এল।

—কি এনেছ হাতী?

—এই দেখ, কত কাগজ

—কাগজ, কি হবে হাতী?

—খাব

—খাবে?

—হ্যাঁ

—তুমি কাগজ খাবে কেন হাতী?

—বড় খিদে পেয়েছে যে দাদা

—হাতী বুঝি কাগজ খায়?

—খায় বৈ কি। হাতী সব খায়। কাঁচিটা একবার আনো ত দাদা?

সাধন ছুটে গিয়ে কাঁচি নিয়ে এল। কাঁচি নিয়ে কি করবে হাতী?

—কাগজ কাটব।

—কাগজ কাটবে? খাবে না?

—খাব বৈ কি দাদা

—কখন্ খাবে হাতী?

—আগে ছোট ছোট করে কাটি, তবে ত খাব।

—আমিও খাব হাতী

—তুমিও খাবে? আচ্ছা, আগে তুমি হাতী হও তখন খেও।

—তবে আমি হাতী হব বল না হাতী

—যখন আমার মতন হবে তখন

—তোমার মতন?

—হ্যাঁ দাদা, আমার মতন।

পাড়েজীর বিরাট দেহের সঙ্গে নিজের ছোট্ট দেহটির তুলনা করে মনে মনে ভীষণ দমে গিয়ে সাধন বললে—সে ত অনেক দেরী হাতী।

—না না দাদা, আর বেশী দেরী নেই। তখন কিন্তু আমি তোমার পিঠে চড়ব—কেমন?

সাধন ভয় পেয়ে বললে—ও বাবা, আমার পিঠে যে ভেঙ্গে যাবে হাতী—

পাড়েজী হেসে উঠে বললেন—ভাঙবে না দাদা, ভাঙবে হাতীর পিঠ কি অত সহজে ভাঙে?

সুরমা একটা পুরোনো ঠোঙা খুলে ভাল করে দেখে নিয়ে কয়েকখানা কাগজ কেটে পাড়েজীকে দেখিয়ে দিলে। তারপর আটা নিয়ে এসে পাড়েজীর সঙ্গে ঠোঙা তৈরী করতে বসলো।

মাস তিনেক হল সুরমা পাড়েজীর সাহায্যে একটা ছোট বাড়ীতে উঠে এসেছে। বাড়ীওয়ালা ছগনলালের মাসের পয়লা তারিখেই ভাড়া চাই। কাল সে ভাড়ার জন্যে সুরমার কাছে লোক পাঠিয়েছিল। সুরমার হাতে টাকা ছিল না, তাই সে কাল ভাড়া দিতে পারে নি। পাড়েজীও কাল সারাদিন আসেন নি। আজকাল সন্ধ্যার পর তিনি রামলীলার মন্দিরে রামায়ণ পাঠের একটি কাজ নিয়েছেন। তাতে তার ঘণ্টা দুই সময় যায়। তবু যখনই সময় পান, দিনান্তে অন্ততঃ একবারও এসে তিনি সুরমাদের খোঁজ নিয়ে যান।

কাল তিনি আসেন নি। আজো, সকাল থেকে তাঁর দেখা নেই। বাড়ী ভাড়ার তাগাদা সুরু হয়েছে। সুরমার হাতে টাকা নেই, সুরমা চিন্তিত হয়ে উঠলো।

সারা দুপুর সেলাই-এর কাজ করে বিকেল বেলা বসে বসে সুরমা ঠোঙা তৈরী করছিল। সাধন তার কাছে বসে একটা কাগজের নৌকো নিয়ে খেলা করছিল। এমন সময়ে বাইরের দরজায় কড়া বেজে উঠলো।

পাড়েজী এসেছেন মনে করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সুরমা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলে।

দরজা খুলেই কিন্তু সে একেবারে জড়োসড়ো হয়ে মাথার ঘোমটা টেনে বারান্দায় উঠে থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো।

দেখলে, পাড়েজী নয়, তার বাড়ীওয়ালা ছগনলাল ঢুকছে।

ছগনলাল নিজে কখনো আসে না, ভাড়ার জন্ত তার লোক পাঠায়।

আজ সে নিজেই এসেছে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে ছগনলাল বললে—কাল আমার লোক এসেছিল ভাড়া চাইতে, তাকে আপনি ফিরিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন তিন চার দিন পরে আসতে। কিন্তু তিন-চার দিন দেরী করলে আমার চলবে না, তাই আমি আজ নিজেই ভাড়া চাইতে এসেছি।

সুরমা থামের আড়াল থেকে আস্তে আস্তে বললে—কিন্তু আজ ত আমি ভাড়া দিতে পারব না, আমার হাতে কিছু নেই। আপনি কাল লোক পাঠিয়ে দেবেন, আমি ভাড়া দিয়ে দোব।

ছগনলাল বললে—ও কথা বললে ত চলবে না। কাল আমার লোক ফিরে গেছে, আজ আমাকেও ফেরাতে চান আপনি? তা হবে না; ভাড়া না নিয়ে আমি যাব না।

সুরমা বিব্রত হয়ে বললে—কিন্তু আজ যে আমার হাতে কিছু নেই—আমি কোথা থেকে ভাড়া দোব বলুন? আপনি আর একটা দিন অপেক্ষা করুন।

মাটিতে লাঠি ঠুকে ছগনলাল বললে—আর একটা দিনও আমি অপেক্ষা করতে পারব না—আজই আমার ভাড়া চাই-ই। হাতে কিছু নেই—হাতে কিছু নেই! আপনার হাতে কিছু নেই ও আমি কি করব? হাতে কিছু নেই ত বাড়ী ভাড়া নিয়েছিলেন কেন? ভাড়া দিতে না পারেন ত উঠে যান।

রাগে অপমানে সুরমার মুখ লাল হয়ে উঠলো। অতি কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে সে বললে—আপনি কি আমাকে অপমান করবেন বলে এসেছেন? কি মনে করেছেন আপনি যে আমি ভাড়া না দিয়ে পালিয়ে যাব?

তার আঙুলে তাদের বিয়ের আংটিটি ছিল। অনেক দুঃখেও সে সেটি হাতছাড়া করেনি। এখন রাগের মাথায় সে সেই আংটিটা আঙুল থেকে খুলে নিয়ে ছগনলালের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—এই নিন্ আপনার ভাড়া। চলে যান আপনি এখান থেকে, এক্ষুনি চলে যান।

ছগনলালের ভাড়া চাইতে আসা, সুরমাকে ভাড়ার জন্তে এইভাবে চাপ দেওয়া একটা অজুহাত মাত্র।

আংটিটা তুলে নিয়ে, উল্টে-পাল্টে ভাল করে দেখে সে বললে—এ আংটি নিয়ে আমি কি করব? এর চেয়ে ভাল আংটি আমার অনেক আছে। এ আপনি রেখে দিন্।

বারান্দার একপাশে সেটি রেখে দিয়ে সে আবার বললে—আংটি নিতে ত আমি আসিনি, এসেছিলাম ভাড়া নিতে। তা বেশ, ভাড়া যখন আজ আপনি দিতে পারলেন না, তখন থাক, আমি অন্তদিন এসে নিয়ে যাব।

সে যেতে উদ্যত হল।

সুরমাও মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

দু-পা গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে, সুরমার তৈরী ঠোঙাগুলোর দিকে চেয়ে ছগনলাল বললে—আপনি বুঝি ঠোঙা তৈরী করেন?

সুরমা কোনো উত্তর দিলে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

তার দুঃখে গলে গিয়ে নিজের কপালে করাঘাত করে ছগনলাল বললে—কপাল দেখুন! আপনি কোথায় এক-গা গহনা পরে মস্ত বড় বাড়ীতে বসে থাকতেন কি দিয়ে পা টেপাবেন, তা নয়, এখানে বসে বসে ঠোঙা তৈরী করছেন! এই কি আপনার কাজ, না আপনাকে মানায়? এতে কি পেট ভরে, না গহনা হয়, না জামা-কাপড় হয়? আপনি সময়ে বাড়ী ভাড়া দিতে পারছেন না, যা খান্ তা আমার জানতে বাকী নেই, যা পরেন তাও দেখতেই পাচ্ছি। কেন আপনি এত দুঃখ সইছেন। নিজের শরীরটাকে কেন এভাবে মাটি করছেন। আপনি আমার কথা শুনুন, আপনার বাড়ী হবে, গাড়ী হবে, গা ভরা গহনা হবে, কিছুর অভাব থাকবে না।

লোকটার স্পর্দ্ধা দেখে সুরমা স্তম্ভিত হয়ে গেল, তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোলো না।

ছগনলাল তাকে চুপ করে থাকতে দেখে উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল—পাঁচালাল কোটিপতি লোক! আপনার জন্তে সে হুবেলা আমার কাছে ছুটোছুটি করছে। আজ সকালেও সে এসেছিল, বললে—আমি তাঁর দাস হয়ে থাকব।

সুরমা শিউরে উঠে কানে আঙুল দিলে।

—ঐ যে লোকটা আপনার কাছে আসা-যাওয়া করে, কি আছে ওর? পরের চাকরি করে খায়, ভিখারীরও অধম। ও আপনাকে কি সুখ দেবে? ছাড়ুন ওটাকে। পাঁড়েজীকে আমি খবর দিচ্ছি—সে এক্ষুনি ছুটে এসে আপনাকে মাথায় করে নিয়ে রাখে। আপনি রাণীর মতন থাকবেন আমার কথা শুনুন, ও-সব ঠোঙা-কেতা ফেলে দিন।

হঠাৎ সুরমা ঘামের আড়াল থেকে ঠিক উল্কার মত বেরিয়ে এল। তার মুখের হোমটা সরে গেছে, চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে।

ছগনলাল তার সেই মূর্তি দেখে সভয়ে দু-পা পেছিয়ে গেল

দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে সুরমা অস্বাভাবিক গলায় চীৎকার করে উঠলো—বেরিয়ে যান, শীগ্‌গির বেরিয়ে যান যান, যান, যান বলছি।

ছগনলাল বিষম ঘাবড়ে গিয়ে কি করবে ভেবে ঠিক করবার আগেই সুরমা চক্ষের পলকে নীচু হয়ে তার পায়ের কাছ থেকে আটার পাত্রটা তুলে নিয়ে ছগনলালের দিকে সজোরে ছুঁড়ে মারলে। রাগে তার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে। পাত্রসুদ্ধ আটায় ছগনলালের মুখ, গা, জামাকাপড় সব মাখামাখি হয়ে গেল। মাটির পাত্রটা তার গায়ে লেগে মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

ছগনলালের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—এঃ রাম রাম।

দরজার বাইরে পাঁড়েজীর গলা শোনা গেল—কৈ দাদা, কেমন আছ? তোমার হাতী এসেছে।

বাড়ীর ভেতরে পা দিয়েই পাঁড়েজীর দৃষ্টি সোজা গিয়ে সুরমার মুখের ওপর পড়ল। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সুরমা তখনো ঠিক তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে, তার চোখ দিয়ে অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে।

তারপরেই, উঠোনের একপাশে সর্ব্বাঙ্গে আটা মা ছগনলালের ওপর তাঁর চোখ পড়ল।

অতিমাত্রায় বিস্মিত পাঁড়েজী সুরমাকে জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে মা?

কথা বলতে গিয়ে সুরমার ঠোঁট দুটি থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলো।

ছগনলালের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বললে—ঐ লোকটা বাড়ীর ভেতরে ঢুকে আমাকে অপমান করেছে। বলেছে যে—আর সে বলতে পারলে না, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে ফেললে।

মুহূর্ত্তে পাঁড়েজীর মুখ কঠিন হয়ে উঠল। ছগনলালের দিকে ফিরে তিনি গম্ভীর গলায় বললেন—আমার মাকে অপমান করেছেন শেঠজী?

অবস্থা বুঝিবের মত বুঝে ছগনলাল তখন সরে পড়বার মৎলবে গুটি গুটি দরজার দিকে এগোচ্ছিলো। পাঁড়েজী হেঁকে বললেন—দাঁড়ান, আগে আমার কথার জবাব দিন। দাঁড়িয়ে পড়ে নির্লজ্জভাবে ছগনলাল বললে—অপমান আবার কোথায় করলাম? বাড়ীভাড়া চাইতে এসেছিলাম আমি, তাতে কি অপমান করা হয়?

মুখের কাপড় সরিয়ে ফেলে ছগনলালের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে সুরমা বললে—মিথ্যে কথা। ভাড়া চাইবার ছল করে এসে উনি আমাকে টাকার লোভ দেখাচ্ছিলেন, গয়নার লোভ দেখাচ্ছিলেন, আরো যা যা বলেছেন তা আমি আপনার সামনে বলতে পারি না।

রাগে পাঁড়েজীর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো। তিনি বাঘের মত লাফ দিয়ে গিয়ে বজ্রমুষ্টিতে ছগনলালের ঘাড় চেপে ধরে গর্জ্জন করে উঠলেন—আমার মাকে তুমি অপমান কর তোমার এত সাহস! তোমার জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলব আমি। শয়তান!

ছগনলালের হাত থেকে লাঠিটা খসে মাটিতে পড়ে গেল। সে অসহায়ের মত ঝুলতে ঝুলতে কোনোরকমে হাত জোড় করে কাতর অনুনয়ে বললে—দোহাই বাবা, ছেড়ে দাও আমাকে। আমার অন্যায় হয়ে গেছে। বুঝতে পারি নি।

—অন্যায় হয়ে গেছে! বুঝতে পারি নি!—তাকে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিয়ে পাঁড়েজী বললেন—যাও গিয়ে মা বলে ওর পায়ে ধরে ক্ষমা চাও।

মায়ের সম্মান রাখতে জানো না ? মা নেই তোমার ? যাও শীগ্‌গির, নইলে—

প্রায় তামাশুড়ি দিয়ে রান্নাঘরের কাছে এগিয়ে গিয়ে, সুরমাকে উদ্দেশ করে ছগনলাল বললে—আমার দোষ হয়ে গেছে মা। আমাকে ক্ষমা করুন।

সুরমা ঘোমটা টেনে পায়ের আড়ালে সরে গেল।

পাড়েজী ডাকলেন, এদিকে আসুন শেঠজী, ছগনলাল ঘাড়ে হাত বোলাতে বোলাতে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালো।

পাড়েজী ট্যাঁক থেকে টাকা বার করে তার হাতে দিয়ে বললেন—এই নিন আপনার বাড়ী ভাড়া।

গুণে নিন। ঠিক আছে ?

ভাল করে গুণে দেখে ছগনলাল বললে—হ্যাঁ।

—এইবার যান আপনি আমার মা এ বাড়ীতে থাকতে কোনোদিন আপনি এখানে ঢুকবেন না, বুঝলেন ? ভাড়া আমার কাছে চেয়ে নেবেন—আমি রোজ এখানে আসি। মনে থাকবে ? ছগনলাল ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ—

(ক্রমশঃ)

ভারতপথিক —রবীন্দ্রনাথ

একদা যেদিন বাংলাদেশে প্রগাঢ় অন্ধতা, কৃত্রিমতা, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে রামমোহন রায়ের আগমন হোলো সেদিন এই বিমুখ দেশে তিনি একলা ভারতের নিত্য পরিচয় বহন করে এসেছেন। তাঁর সর্বতোমুখী বুদ্ধি ও সর্বতঃ প্রসারিত হৃদয় সেদিনকার এই বাংলাদেশের অখ্যাত কোণে দাঁড়িয়ে সকল মানুষের জন্যে আসন পেতে দিয়েছিল একথা মুক্ত কণ্ঠে বলবার দিন এসেছে, যে, যে জাতিখণ্ডিত কৃপণ ঘরের রুদ্ধ কোণের জন্যে সে আসন নয়, যে আসনে সর্বজন অবাধে স্থান পেতে পারে সেই উদার আসনই চিরন্তন ভারতবর্ষের স্বরচিত ; লক্ষ লক্ষ আচারবাদী বাধা তাকে সংকুচিত করে ; খণ্ড খণ্ড করে ; সমস্ত পৃথিবীর কাছে স্বদেশকে বিকৃত ক'রে ভারত সভ্যতার প্রতিবাদ করে, তবু তবব একথা সত্য। মানুষের ঐক্যের বার্তা রামমোহন রায় একদিন ভারতের বাণীতেই ঘোষণা করেছিলেন, এবং তাঁর দেশবাসী তাঁকে তিরস্কৃত করেছিল,—তিনি সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন মুসলমানকে, খ্রীষ্টানকে ভারতের সর্বজনকে হিন্দুর এক পংক্তিতে ভারতের মহা অতিথিশালায়।

বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্যকারণে এবারকার সংখ্যায় ডাঃ ক্ষেত্রেশ কুমার পালের "সোভিয়েটে ভ্রমণ" কাহিনী, শ্রীবিপিনবিহারী রায়ের "বৃহৎ উপন্যাস", শ্রীহরিপ্রসাদ সেনগুপ্তের "মেঘনাদ সাহার জীবন-সাধনা" ও "পুস্তক-প্রসঙ্গ" ইত্যাদি প্রকাশ না করতে পারার জন্য বিশেষ দুঃখিত। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হইতে ঐ সকল রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হইবে। আশা করি এই ত্রুটিকে পাঠকবর্গ ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিবেন।

—সম্পাদক

মোহিনী

অজয় বিশ্বাস

শীতের রাত। এখান থেকে আধ মাইল দূরে সহরে বাজারের পথটায় এতক্ষণে সব কোলাহল থেমে গেছে। শুধু ওইখানেই নয়, সমস্ত সহর জুড়ে ক্লান্তি নেমে এসেছে। আশ্চর্য, মাত্র দু'ঘণ্টা আগেও সেখানে কত লোকের আনাগোনা। দু'পাশের সারি সারি দোকানগুলো থেকে নীল, লাল, বেগুনে রকমারি আলোর উজ্জ্বল রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছিলো সামনের পথে পথচারীদের চোখেমুখে। হকারদের হাঁকডাকে, রিক্সার হর্নে, যানবাহনের হুড়ো-হুড়িতে, ক্রেতা-বিক্রেতাদের বচসায় একটা বিশৃঙ্খল ব্যস্ততায় মুখর হয়েছিলো স্থানটা। আর এখন? আবছা অন্ধকারের আস্তরণ পড়েছে সেখানে। দোকানগুলোর কাঁপ বন্ধ। পথে একটাও লোক নাই। রিক্সাওয়ালা রিক্সার গদিতে মাথা ঠেস দিয়ে ঘুমোচ্ছে। শুধু দূরাগত মাইকের গানটা নিশাচরের মত অন্ধকার আকাশের বুকে ডানা মেলে দূর হ'তে দূরে ভেসে চলেছে। আজ বুঝি একটা বিয়ের তারিখ। কুয়াসা ধূসর শীতের রাত নেশার ঘোরে আধ বোজা চোখে ঝিমুচ্ছে। খানিক বাদে দূরের মাইকের গানটা থেমে গেলে এই নেশার ঝিমুনি গাঢ় তন্দ্রায় পরিণতি লাভ করবে।

বাজারের থেকে একটা পথ বেরিয়ে সোজা দক্ষিণে ভদ্রপল্লীর ভিতর দিয়ে এসে এক জায়গায় নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখান থেকে কাঁচা সরু রাস্তাটা ধরে পূর্বদিকে অনেকটা দূর এসে দক্ষিণে ঘুরলে কিছু পরেই একটা খাল পড়ে সামনে। খাল ঠিক নয়, মিউনিসিপ্যালিটির বড় কাঁচা ড্রেন। দু'পাশে ঘন গাছ গাছালির ফাঁক দিয়ে তৃতীয়ার চাঁদের আলো ঝরে পড়ছে খালের জলে। এই খালের উপর বাঁশের সাঁকো পার হয়ে এখানে সহরের এক প্রান্তে এই কুখ্যাত পল্লীর ভেতরে আসতে হয়।

এই খালটা দু'টি জগতের সীমারেখা হয়ে বয়ে চলেছে। ওপারে একটা জগৎ আর এপারে একটা জগৎ, মাঝখানে শুধু একটা খালের ব্যবধান। এই দুই জগতের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই। কেউ কার নিয়মের ধার ধারে না। ওপারের জগৎ যখন নিদ্রার আবেশে বিভোর, তন্দ্রার কোলে গা এলিয়ে দেয়, এপারের জগতে তখন শুরু হয় নানা আয়োজনের, নানা সাজ-সজ্জার, বিলাস সম্ভারের। প্রসাধনরতা কুমারীর উদ্দাম যৌবনাবেগের মত চঞ্চলা এদিকের জগৎ। ওপারে রাত শেষ হয়ে আসে আর এপারে শুরু হয়। আবার যখন দিন আসে তখন ওপারের জগৎ কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে, এপারের জগৎ তখন সারারাতের উচ্ছৃঙ্খল দেহবিলাসের পর রাতজাগা প্রাণীর মত ঝিমোতে থাকে। ভর দুপুরেও হয়ত একটা লোকের মুখ দেখতে পাওয়া যায় না।

খালটা পার হয়ে দক্ষিণে কিছু দূর গেলে দেখা যাবে একটা চওড়া কাঁচা রাস্তা পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি হয়ে আছে। এই পথটার উভয় পাশে সারি সারি খোলার ঘর। মাঝে মাঝে দোকান-পসারও রয়েছে যথেষ্ট। দোকানগুলোর অধিকাংশই দেশী-বিলাতি মদের দোকান। তা'ছাড়া গাঁজা, আফিম, তাড়ি, পচুই প্রভৃতির দোকনও রয়েছে। মাংসের দোকান রয়েছে যথেষ্ট। রাবণের চিতার মত উনুন জ্বলতে থাকে দোকানগুলোতে।

রাত্রি দশটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে দেখতে অঞ্চলটা বেশ সরগরম হয়ে ওঠে। আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পথটা। দূরে ওই বাঁশের সাঁকো পার হয়ে দলে দলে কত লোক আসে সহরের ওই ব্যবসায়কেন্দ্র থেকে, মিল এলাকার বস্তী গুলো থেকে, এমন কী ভদ্রপল্লীগুলো থেকেও। মদের দোকানে ভীড় লেগে যায়। হোটেলগুলোতে তিল ধরণের স্থান থাকে না। গাঁজা, আফিম আর তাড়ির দোকানে কিউ

করে দাঁড়িয়ে থাকে কত হতভাগার দল। তারপরেই শুরু হয় নারকীয় বীভৎসতা। আশ্চর্যের কিছুই নাই এখানে, কেননা এখানে সমাজের কোন অনুশাসন নাই। শহরের ওই সামাজিক পরিবেশে নানা আইন কানুনের রজ্জুতে বাঁধা রুদ্ধশ্বাস মানুষগুলো দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এপারে এই পল্লীর আবহাওয়ায় এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। তাই বেপরোয়া হয়ে ওঠে। মারামারি, খুনোখুনি, হৈ-হল্লা, ঝগড়া-ঝগড়ি চলে সারারাত। ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করে নানাভাবে দেহকে পরিতৃপ্ত করেও এদের আশা মেটে না।

বা-পাশের খোলার ঘরের বাড়িগুলোর মধ্যে একটা লম্বা করগেটের টিনের ছাওয়া পাকা বাড়ী আছে। আভিজাত্যের দিক দিয়ে এর বৈশিষ্ট্য কম নয়। এ অঞ্চলে এ রকম বাড়ী একটাই। সামনের দরজা দিয়ে উঠানে প্রবেশ করলে দেখা যাবে চারিদিকেই শুধু ঘর। একটা চালা বারান্দা ঘরগুলোর সামনে দিয়ে কতকটা বৃত্তের মত ঘুরে এসেছে, প্রত্যেক ঘরের সামনে বারান্দা থেকে সিঁড়ি নেমেছে।

এ বাড়ীর বাড়ীওয়ালী মোক্ষদাসুন্দরীই মেয়েদের সর্ব্ব-প্রধান কর্ত্রী। মাথার চুলগুলো তার পাকা শনের মত। গাল ও গলার চামড়া ঝুলে পড়েছে। কিন্তু মেজাজ সে অনুপাতে কিছুই ভেঙ্গে পড়েনি। স্বভাব বড় খিটখিটে। সব সময়ে দাঁত খিঁচিয়ে থাকে। পরনে একটা গামছা হাঁটুর ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে একটা প্যাঁচ দিয়ে বুকের উপর দিয়ে ঘুরে গিয়েছে। মেয়েরা আড়ালে আড়ালে ডাইনী বলে, সামনে বলে মাসী। মাসী রাগলে আর রক্ষা নাই। বিশেষ করে নতুন যে সমস্ত মেয়ে এ লাইনে আসে মাসী এক সপ্তাহে তাদের এ পথের উপযোগী করে নেয়। একটু বিগড়ালে রক্ষা নাই। ভাত বন্ধ করে দেয়, মারধোর করে। দুই পাটি দাঁত খিঁচিয়ে উঠে বলে, 'মাগীর চঙ দেখ, বলি, আর করবি না তো, তোকে কে বসে বসে খাওয়াবে শুনি? দু'দিন না খেতে দিলে জব্দ হবি। হ্যাঁ বলে দিচ্ছি।' আবার কখনো কখনো গুণ্ডা লাগিয়ে দেয় বশে আনবার জন্য। এ অঞ্চলের গুণ্ডাগুলো বুড়ীর ইঙ্গিতে চলে। মাসীর হুকুমে তারা যে কোন মানুষকে খুন করতে ইতস্ততঃ করে না। মাসীর মুদির ভেতরে ছোরা থাকে সব সময়, শুধু হুকুম একটা হলেই হল।

রাত্রি এগারোটা বাজে। এক নম্বর বাড়ীর সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েরা। এই শীতের রাত। কতক্ষণই বা দাঁড়িয়ে থাকা যায়। কেউ কেউ বেতের মোড়ায় বসে আছে। সবাই পরস্পর গল্পগুজব করছে আর জ্বলজ্বলে সন্ধানী চোখে তাকিয়ে আছে এদিক ওদিক। দেহের ভাণ্ডে সঞ্চিত সুধা বিতরণ করে পুরুষের অতৃপ্ত লালসা নিবৃত্ত করবে, তার বিনিময়ে পাবে টাকা—দেহ জিইয়ে রাখার অবলম্বন। শুধু কয়টা টাকার জন্য এই দুর্ভোগ। রোজ নিয়মিত স্নো পাউডার বুলিয়ে দুই গাল মসৃণ করা, ঠোঁটে লিপষ্টিক দেওয়া, চোখে সুরমা আঁকা, কপালে কাঁচপোকার টিপ বসানো, খোঁপায় বেলফুলের তোড়া গুঁজে রাখা আর গায়ের আচ্ছাদন কিছুটা শিথিল করে সমস্ত দেহটাকে রমণীয় করা এদের কাছে একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে। শুধু এতেই রক্ষা নাই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে বসে কাটিয়ে দিতে হয়—কখন কোন পুরুষের চোখে লাগে কে জানে?

দরজার বাঁধারে বেতের মোড়ায় বসে আছে একটা মেয়ে। বয়স প্রায় ২৬ বৎসর। এক সপ্তাহ হল গোকুল-পুরের সাত নম্বর বাড়ী থেকে তাকে এখানে আনা হয়েছে, যদি মাসীর দাপটে সোজা হয় এই উদ্দেশ্যে। এখানে নতুন সঙ্গীরা নাম দিয়েছে মোহিনী। পাশের ঘরের পুতুল, ছবি, বুঁথি, ময়না এরাই তাকে রোজ সাজিয়ে দেয় খুব যত্ন করে। মাসী অনেক চেষ্টা করেও মোহিনীকে সোজা করতে পারে নি। দু'দিন তার খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, এমন কী প্রহারও করেছিল তবু বশে আসেনি মোহিনী। কেন যে ঐ মেয়ে অমন করে কাঁদে, মাসীর হৃদয়বৃত্তির পক্ষে তা' দুর্বোধ্য। আজ দুপুরে মাসী অনেক শাসিয়েছে মোহিনীকে। বলেছে, যদি সে তার বাধ্য না হয় তা' হলে তার ভাগ্যে চরম শাস্তি আছে। তবু তার কান্নাকে থামাতে পারে নি। এখন মোড়ায় বসে আছে চুপ করে কিন্তু মন তার উন্মনা হয়ে গেছে দূরাগত মাইকের গানটা শুনে। আজ বুঝি বিয়ের তারিখ। কত বেদনার স্মৃতি তোলপাড় করছে তার

নারী হৃদয়ে। বুকের ভিতরটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খান খান হয়ে যাচ্ছে। এদিকে দরজার ডানপাশে ছবি, পুতুল, বুবি, চাঁপা, মহুয়া বেতের মোড়ায় বসে ঘোর গল্প জমিয়েছে। মাঝে মাঝে মোহিনীর দিকে তাকিয়ে হাসির চেউ তুলছে। আর বলছে, 'ওলো সুন্দরী, তুই যেন হলি মেনকা অপ্সরা, তাই বলে কথা বলবিনা আমাদের সঙ্গে আজ নতুন একটা লোকে আসছে তাই অহঙ্কার হয়েছে বুঝি। মোহিনী কথাটা শুনেও হয়ত কোন উত্তর দিলে না। কিম্বা কথাগুলো আদৌ তার কানে যায়নি। এমন সময়ে মাসী এসে দাঁড়ালো তারপর বিড়ালের মত অলঅল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল সে গেল কোথায়? রয়েছে ত এখানে?'

অন্যান্যরা গল্প থামিয়ে বলল, হুঁ।

মাসী বললে, আচ্ছা, দেখিস তোরা, এইভাবে বসে থাকে যেন। আজ মনিবাবু নতুন একটা বাবুকে নিয়ে আসবে। বিগড়ে গেলে থাপ্পড় বসিয়ে দিবি ওর গালে। পুতুলরা একদিকে সরে বসে ভেংচি দিল মাসীকে উদ্দেশ্য করে। মাসী সেটা লক্ষ্য করেনি। মাসী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার হাসির চেউ উঠলো। কিন্তু সে চেউ পৌঁছায়নি মোহিনীর উন্মনা মনের বেলাভূমিতে—নিজের বুকে নিজেই মিলিয়ে গিয়েছে: দূর-দিগন্ত হ'তে ভেসে আসা করুণ সঙ্গীতের মত দশটি বছর আগের দিনগুলির কাহিনী মনের চারিপাশে এসে ভীড় করছে। পড়ার ঘরটায় ঠিক এমন ভাবেই চেয়ারে ঠেস দিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছে মোহিনী। দু'চোখ দিয়ে টপটপ করে অশ্রু গড়াচ্ছে। এমন সময় তার চেয়ারের পেছনে দাদা এসে দাঁড়ালেন। এইমাত্র আপিস থেকে এসেছেন। তার ঘাড়ে হাত দিয়ে সস্নেহে মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'কাঁদছিস কেন খুকি? কী হয়েছে? রেজাল্ট বেরিয়েছে বুঝি? আঁচল দিয়ে চোখ দু'টো মুছে সে উত্তর দিলো, 'হ্যাঁ', দাদা বললেন, কাঁদবার কী আছে? ফেল ত মানুষই করে থাকে। ছিছি কাঁদবার কী আছে? চেষ্টা ত কম করিস নি। হল না কিছু, সে তোর কপাল।'

কপাল খারাপ! হ্যাঁ তার কপালই খারাপ এবং এই টুকুই একমাত্র সান্ত্বনা। তাই ভবিষ্যতের সমস্ত সুখ-স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে কপালের নির্দেশের কাছে নিজেকে সঁপে দিলো। এই দুর্মূল্যের দিনে কেরাণীর চাকুরী করে এত বড় একটা সংসার চালানো যে কী কষ্টকর তা' তার পক্ষে বুঝবার বয়স যথেষ্টই হয়েছে। আর কতকাল সে ভাই-এর গলগ্রহ থাকবে। যদি মা-বাপ থাকতেন তা হ'লে এটুকু দাবী কেন অনেক আবদার তাঁরা সইতেন কিন্তু ভাই, বিশেষ করে পরের মেয়ে বউদির কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত সংসারে যেটুকু দাক্ষিণ্য মেলে তাই মাথা পেতে নেওয়া উচিত। তাই বিয়ের কথা উঠতেই সে 'না' করেনি। নিঃশব্দে বলেছিল শুধু হ্যাঁ'। লেখাপড়া যখন আর হল না তখন নারী আত্মার সনাতন আকাঙ্খা নীড় রচনার সাধ পূর্ণ করতেই বা এত দেরী কেন? নীড় রচনার স্বপ্ন দেখলো মোহিনী। দুই বিহঙ্গ সেই মোহময় নীড়ের আবেষ্টনীর স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রেম গুঞ্জন করছে। স্বর্গীয় মহিমার ছায়া পড়েছে পৃথিবীতে। তারপর একদিন তার কতদিনের চাওয়া, কত সকাল সন্ধ্যায় জানালার ফাঁকে নীলাকাশে চেয়ে থাকা উন্মনা মনের কল্পলোকে অভিষিক্ত স্বামী দেবতা জীবন্ত মূর্ত্তিতে সামনে এসে দাঁড়ালেন।

একটা অপরিচিত পুরুষ। দীর্ঘ গৌরবর্ণ দেহ, মাথার চুল তরঙ্গায়িত। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতা। যার কাছাকাছি হওয়া নারীর একটা চরম পরীক্ষা। প্রণয়িনীর দেহের স্নায়ুতে স্নায়ুতে শিহরণ জাগে সেতারের তারের মত। এমনই একটা পুরুষ তার সিঁথির রেখায় সিঁদুরের প্রলেপ দিয়ে চিরসঙ্গিনী করে নিল। কি আশ্চর্য!

বাগানের দিকে জানালাটা খোলা। জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত রাত্রি। ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। স্বামী তার দুই সবল বাহুর নিবিড় আবেষ্টনীতে তাকে বক্ষ সংলগ্ন করে মৃদু হেসে বললেন, 'আমাকে ভালবাসবে ত?' কথা বলবার শক্তি ছিল না মোহিনীর। কেমন একটা মাদকতাময় আচ্ছন্নতায় অভিভূত হয়েছিল সে। এতদিন শুধু শুনেই এসেছে কিন্তু আজ সে উপলব্ধি করলো। আহা স্বামীর ভালবাসা যে এতো মধুর তাতো সে জানতো না। আজ যা পেয়েছে সে, তার কী তুলনা আছে? স্বামীর বুকে মুখ

লুকিয়ে বলেছিল, 'তুমি আমার দেবতা। আমার ভালবাসা 'ত তোমার জন্যই সঞ্চিত রয়েছে'। তারপর আরো কত স্বপ্নময় মুহূর্ত সব কী মনে পড়ে।

বৃদ্ধ শ্বশুরের চরণধূলি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো মোহিনী। বৃদ্ধ বললেন, 'থাক মা থাক' খুব খুশী হয়েছি আমি। আজ আমার কত আনন্দ! মা লক্ষ্মী এনেছি ঘরে। এখন যে কটাদিন বাঁচি, এই বুড়ো ছেলেটাকে একটু যত্ন করো মা কেমন? আর একটা কথা, মোহিনীর কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন, বুঝলে বৌমা, আমার চার ছেলের মধ্যে তিন ছেলের বিয়ে দিয়েছিলাম শুধু সেজটার বাকী ছিল। সতোন আমার একগুঁয়ে। শেষ পর্যন্ত অনেক খোসা-মোদ করে তার বিয়ে দিয়ে তোমাকে আনতে পেরেছি মা লক্ষ্মী, কিন্তু—'বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। দুটো ঘোলাটে চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠলো। কিছুপরে বললেন, দুঃখের কথা কি যে বলবো বৌমা। ছোট বৌমা আমার মাস ছয়েক আগে চিরদিনের মত বিদায় নিয়ে গেল। সেই থেকে দিনরাত এই বুড়ো ছেলেটার চোখে জল পড়ছে। শুধু কি আমি! ওই ছোট ছেলেটা সেই থেকে যেন কেমন ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছে। বাড়ীতে সব দিন থাকে না। কারো সাথে কথা বলে না, সব সময় ভাবে খুব। মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে যায় ঘিয়েটার পার্টির সঙ্গে। কত খোসামোদ করেছি আর একটা বিয়ে করার জন্য। কোন উত্তর দেয় না। এক কাজ করতে পার বৌমা? তুমি যদি একবার বলে ওকে রাজী করাতে পারো তাহলে ভাল হয়। আমি আর কটা দিন আছি—

বৃদ্ধ শ্বশুর সত্যি সত্যি অল্প ক'টা দিন ছিলেন। মৃত্যু কালে শুধু আক্ষেপ করেছেন ছোট ছেলেটার জন্য। বৃদ্ধের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে মোহিনীর নতুনত্বের আদর কমে এলো। অন্যান্য সকলের আটপৌড়ে জীবনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো সে। শুধু তাই নয়, শ্বশুরের এক চোখো ভাবটাকে যারা মেনে নিতে পারছিলো না, যাদের চোখ টাটিয়ে উঠতো, সেই বড় বৌ আর মেজ বৌ এখন সুযোগ পেয়ে বসলো।

বিকেলে উঠান কাঁট দিচ্ছিল মোহিনী। বড়বৌ আর মেজবৌ রোয়াকে মাদুর পেতে পা ছড়িয়ে বসে পান সাজছিল। মেজবৌ তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'আচ্ছা বড়দি, সেজবৌ ত বেশ কাজ করতে পারে। তবে আর শুধু শুধু মাইনে দিয়ে ঝি রাখা কেন? ঝিটাকে বরং জবাব দিয়ে দাও।' বড় বৌ উত্তর দিলো, 'আমি ও কথাটা ভাবছিলাম। তাই করা হবে কাল থেকে। ঝিটাকে আসতে নিষেধ করে দেবো।'

পরিকল্পনাটা কাজে পরিণত হল। পরদিন দুপুর-বেলায় একরাশ বাসন রান্নাঘর থেকে বের করে নিয়ে মোহিনী পুকুর পাড়ে বসে মাজতে লাগলো। দুইদিন বাদে ধোপার খরচটাও কমে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই সে এবাড়ীর একজন সুদক্ষা ঝিএ পরিণত হল। তার নিটোল স্বাস্থ্য যৌবন হারিয়ে ফেলল ইট চাপা ঘাসের মত। তবু কারো মন পাওয়া যায়? খোঁটা দিয়ে কথা বলতে কেউ ছাড়ে না। সারাদিনের অমানুষিক আবহাওয়া থেকে ক্ষণিকের মুক্তি পায় সে পুকুর ঘাটে বাসন মাজতে বসে। অন্তরের দুঃখ বেদনার সমুদ্র ভাষা পায় বিন্দু বিন্দু অশ্রুতে। পাছে কেউ দেখতে পায়, তাই আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফ্যালে।

স্বামী বিদেশে বেলে চাকুরী করেন। রিলিফে আছেন, কাজে কাজেই কোথাও থাকার স্থিরতা নেই। এখানে দুদিন ওখানে চারদিন এই রকম কাজ। কতদিনে স্থায়ী বাসা পাওয়া যাবে তা বলা যায় না। বাসা হলেই তাকে নিয়ে যাবেন, সেই আশায় দিন গুণতে থাকে মোহিনী। রোজ চিঠির আশায় জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে।

কি একটা ব্যাপার নিয়ে বড়বৌ আর মেজবৌ আজ সকাল থেকে তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। কোনার ব্যাড আর কতক্ষণ সহ্য করে থাকতে পারে। দুঃসহ জ্বালায় আর ক্ষোভে বিদ্রোহী হয়ে মোহিনী ক্ষুব্ধ এক প্রতিবাদ জানিয়ে ছিল, আচ্ছা মেজদি, আমার স্বামী কি আমার খরচ দেন না যে আমি নির্বিবাদে আপনাদের এই অত্যাচার সহ্য করে যাবো?' মুহূর্তে সমস্ত বাড়ীটায় এক অশান্তির কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠলো। এই প্রতিবাদের যে

অভাবিত প্রতিক্রিয়া ঘটবে তা জানা ছিল না। বড়কর্তা গম্ভীরকণ্ঠে কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'আসুক সতোন আমি সব ব্যবস্থা করছি।' শেষে বড়বৌ আর মেজবৌ এর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে রেহাই পেলো মোহিনী। পুকুর ঘাটে এসে কাপড় চোপড়ে সাবান দিচ্ছিল মোহিনী। কিন্তু মন তার বারবার উন্মনা হয়ে যাচ্ছে। যদি আজ স্বামীর কাছ থেকে চিঠি আসে। চোখ ফেটে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আর কতদিন এই দুঃসহ অশান্তির আগুনে তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষ করবে। কোন উত্তর মেলেনা এই অবোধ প্রশ্নের। পৃথিবীটা যেন বোবা হয়ে গেছে। সামনের পুকুরের কালো জলটাও স্থির। যেন ভাষাহীন নিষ্পলক চোখে তারই মত অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

সম্বিত ফিরে পেল মোহিনী। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল দুই হাত দূরে একটা কাতলা মাছ কাঁপাচ্ছে। পাশেই একটা মানুষ স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে আছে। মোহিনী তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মাথার ঘোমটা টেনে নিলো। মানুষটি ধীরে ধীরে বসে পড়লো তারপর বললো, 'বৌঠান'—

কোন কথা বলবার শক্তি ছিলনা মোহিনীর। হঠাৎ যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে। মানুষটি আবার গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'বৌঠান, মাছ ধরে এনেছি। দেখলে না একবার? কত কষ্টে ধরেছি জানো, তুমি কিন্তু রাঁধবে বলে দিচ্ছি, বুঝলে?'

অনেকক্ষণ পরে সে উত্তর দিলো ; আচ্ছা ঠাকুরপো।

শৈলেন মৃদু হাসতে হাসতে মোহিনীর আরো কাছে এগিয়ে এসে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে বললো, আজ হঠাৎ আমাকে দেখে এত লজ্জা হল কেন বৌঠান? ছেলের কাছে মায়ের লজ্জা?

অপলক দৃষ্টিতে মোহিনী তাকিয়ে রইল। নিমেষে বিষণ্ণ হয়ে উঠলো শৈলেনের মুখখানা 'একী বৌঠান, তুমি কাঁদছো যে! কী হয়েছে!

কিছু না ঠাকুরপো।

'না আমায় বলতে হবে, কে তোমায় কী বলেছে।'

'কিছু বলেনি ঠাকুরপো। মনে দুঃখ হয়েছে তাই কাঁদছি।

'আচ্ছা আমি বড়বৌদিকে জিজ্ঞেস করছি, ওরা কী বলেছে তোমাকে। আমি কিন্তু সহ্য করবোনা বৌঠান এই সব অন্যায় অত্যাচার।'

'কে কাকে কি বলেছে যে, তুমি সহ্য করতে পার্চ্ছো না ঠাকুরপো?' হঠাৎ মেজবৌ-এর আবির্ভাব।

শৈলেন জবাব দিলো, 'তোমার সাথে কোন কথা হচ্ছে না।'

মেজবৌ বিদ্রূপ করে বললো, কথা শিখেছো বেশ। মনে রেখো ঠাকুরপো, তোমার যাত্রা থিয়েটারের টাকায় সংসার চলে না। দু'দিন ভাই-এর হোটেলে, দু'দিন পরের হোটেলে দু'দিন যাত্রা থিয়েটারে সং সেজে যার দিন চলে তার সহ্য শক্তি একটু বেশী হওয়া দরকার।'

কথাগুলো নির্দ্বিবাদে হজম করে নিলো শৈলেন। তার মত ছন্নছাড়ার পক্ষে এ ছাড়া উপায় ছিলনা। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে মাসের ক'টা দিন সে বাড়ী থাকে। এ সংসারের সঙ্গে যার সম্বন্ধ এত ক্ষীণ তার পক্ষে কতটুকু দাবী করা সাজে? তবু সে বললো, 'আচ্ছা বৌঠান আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই—

কথা শেষ না হতেই মেজবৌ চেঁচিয়ে উঠলো। এ বাড়ীর কোন সমস্যায় তোমায় মাথা গলাতে হবে না ঠাকুরপো। তোমার যদি ভাল না লাগে তুমি পথ দেখতে পারো। তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কারো মাথা ব্যথা হয়নি।

বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শৈলেন মেজবৌদির দিকে। তারপর সন্তর্পণে মাছটা পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে নীরবে চলে গেল একদিকে।

স্নান নেই, খাওয়া নেই, সারাদিন মানুষটা কোথায় রোদে রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে ছন্নছাড়া দেবরটার জন্য ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে উঠলো মোহিনী। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। তুলসীতলায় প্রদীপ দেখিয়ে শৈলেনের ঘরের কাছে দাঁড়াতেই দেখতে পেল আবছা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে শৈলেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে।

দু'হাতে বেডিং আর ব্যাগ।

'ঠাকুরপো, একটু দাঁড়াও'। ডাকলো মোহিনী।

শৈলেন আচমকা দাঁড়িয়ে মুখ ফিরে তাকালো। মোহিনী বললো, 'এই ভর সন্ধ্যেয় কোথায় যাচ্ছো? পাগল হয়েছ ঠাকুরপো?

'বাধা দিও না বৌঠান, যেতে দাও আমাকে।' বলে একটু এগিয়ে এসে মোহিনীকে প্রণাম করে হন হন করে চলে গেল শৈলেন। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মোহিনী।

একটি মাস অতিক্রান্ত হল। আজ সন্ধ্যায় স্বামীর আসার কথা। তিন চারিদিন আগে চিঠি পেয়েছে স্বামী আসছেন পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে। আনন্দের সীমা পরিসীমা নেই মোহিনীর। নিজের ঘরটাকে সুন্দর করে সাজিয়েছে। শয্যা বিন্যাস করে স্বামীর প্রতীক্ষায় বসে আছে মোহিনী। বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যে হয়ে এল। জানালার পর্দা সরিয়ে বার বার পথের দিকে চেয়ে থাকে কিন্তু কই? কেউ ত আসে না? ক্রমে ক্রমে রাত নয়টা হয়ে এলো। ঘরের দরজা বন্ধ করে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো মোহিনী। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে আচমকা উঠে বসল সে। কে যেন ডাকছে তাকে! কোন পুরুষের কণ্ঠস্বর যেন! তবে কী স্বামী এসেছেন! শয্যা থেকে নেমে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলো। সামনের মানুষটি যেন পাষাণে খোদাই করা একটা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার আপাদমস্তক চেয়ে দেখল মোহিনী। এ যে শৈলেন ঠাকুরপো। কাঁদো কাঁদো স্বরে মোহিনী বললো, 'ঠাকুরপো, আজ তোমার দাদার যে আসার কথা ছিল। এলেন না কেন?'

গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর এল, আসার কথা ঠিকই ছিল বৌঠান। কিন্তু আসা হল না। তোমাকেই যেতে হবে সেখানে।

'আমাকে? তুমি নিয়ে যাবে?

'যাবো বৌঠান। বৈঠকখানায় বড়দাকে বলে এসেছি। তৈরী হয়ে নাও।'

আধঘন্টা পরে তারা যাত্রা করলো। তারপর পুরো তিন ঘন্টার সুদীর্ঘ ট্রেন পথের ক্লান্তি। তবু সমস্ত ক্লান্তি অবসাদকে ছাপিয়ে উঠেছিল তার এতদিনের একটানা দুঃখের ভারে অবনমিত আনন্দের ঢেউ। ট্রেনপথের দু'পাশে সবুজ ধান ক্ষেতের উপর বয়ে যাওয়া মাতাল বাতাসের মত তার হৃদয় যেন অকারণ আনন্দে মেতে উঠেছিল। কিন্তু সে আনন্দের যে পূর্ণচ্ছেদ আছে, সে কী জানতো। ট্রেন থামলো এক অজানা ষ্টেশনে। তারপর সেখান থেকে তাদের যাত্রা চললো হাসপাতালের পথে। চোখের জলে ঝাপসা হয়ে আসে সব কিছু সে সব দিনের কথা মনে পড়লে। সিঁথির সিঁদুর মুছে আর হাতের শাখা ভেঙ্গে ফিরে আসতে হয়েছিল তাকে।

তারপর কত হিসাবেহারা দিন। একটানা কয়েক বছরের মর্মান্তিক বেদনার ইতিহাস সব কী মনে পড়ে। বড় বৌ আর মেজ বৌ-এর নিদারুণ শাসনে অতিষ্ট হয়ে উঠেছে তার জীবন। শৈলেন ঠাকুরপো কোথায় উধাও হয়ে গেল। কেউ তার খোঁজ জানে না। কতদিন সে এ বাড়ীতে আসেনি! হাঁ, একবার এসেছিল মাত্র কয় দিনের জন্য, মনে পড়ছে। কী অদ্ভুত চেহারা হয়েছিল! দেখেও বিশ্বাস হয় না, এ সেই শৈলেন ঠাকুরপো। দারুণ অসুখ হয়েছিল। থর থর করে কাপছে। দাঁতে আর ডাকতে, 'বৌঠান, একটু জল দাও মাথায়, বড্ড জ্বর! একটু জল দাও! আর বাঁচলাম না বৌঠান!' ছোট ভাই-এর মত হতভাগা দেবরটাকে কত সেবা করেছিল সে। বড়বৌ আর মেজ বৌ একবার ফিরেও তাকায় নি বরং অপবাদ দিয়েছে। সে অপবাদ ছড়িয়েছে সারা পাড়াময়। অসুখ কিছুটা সারলে শৈলেন এই অপবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এই নিয়ে অন্য ভাইদের সঙ্গে কলহের সৃষ্টি হল। মেজ ভাই পায়ের খড়ম তুলে আঘাত করেছিল রুগ্ন ছোট ভাইটার মাথায় সে আঘাত পেলে হয়ত শৈলেন ঠাকুরপো ধরাশায়ী হয়ে পড়তো। মোহিনী নিজেই হাত পেতে সে আঘাত প্রতিহত করেছে। গভীর ক্ষত হয়ে হাত দিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরেছে। পাছে ঠাকুরপো দেখতে পায় তাই বিক্ষত হাতখানা আড়াল করে নিয়েছে সে। শৈলেন ঠাকুরপো আর কোন কথা বলেনি। রুগ্ন শরীরে মাতালের মত টলতে টলতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে

গেছে। আর ফিরে আসে নি।

দেখতে দেখতে কয়টি বছর অতিক্রান্ত হল। মোহিনী তার দুঃসহ জীবনের ঘনীভূত অন্ধকারে আশার আলোক রেখা আর দেখতে পেল না। ভেবেছিল ভাইএর কাছে ফিরে যাবে কিন্তু সেখানেও সেই দারিদ্র সেই অশান্তি। তবে তার আর কী করার আছে। শেষে সে পথ পেয়েছিল। শিবমন্দিরে জল চালতে গিয়ে তুলি মি-এর সাথে দেখা হল। সে-ই পথ বাতলে দিলো। বললো, লেখাপড়া যখন শিখেছো বৌমা, নিজে আয় করে খাও। কী দরকার পরের কাঁটা লাথি খাওয়ার। আমি তোমার সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' শেষে অনেক ভেবে চিন্তে এই সিদ্ধান্তই মেনে নিল সে। কেন সে নিজেকে এভাবে তিলে তিলে বিপন্ন করবে? লেখাপড়া কী একেবারেই সে শেখেনি? এক দিন অমাবস্যার অন্ধকারে মোহিনী চুপি চুপি এসে দাঁড়ালো শিবমন্দিরের কাছে বুড়ো বটগাছ তলায়। মি-এর পরামর্শ অনুযায়ী সেখানে এক বৃদ্ধা উপস্থিত ছিল। সেই বৃদ্ধাই তাকে গোকুলপুরের মহিলা সমিতিতে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে তার যা কাজকর্ম নিয়ম-কানুন বুঝিয়ে দিলো। সেদিন কী সে জানতো যে, এই মহিলা সমিতি গোকুলপুরের কুখ্যাত এক পল্লীর ৭ নং বাড়ী। ক্ষোভে, দুঃখে, অনুশোচনায় মোহিনীর হৃদয়টা ছিঁড়ে খান খান হয়ে যাচ্ছিল। শেষে এই পঙ্কিলতার অতল গহ্বরে তার এত দিনের নিষ্পাপ আত্মাকে নিমজ্জিত করবে? এর চেয়ে ত ঢের ভাল ছিল শ্বশুরালয়ে নিত্যকার শাসন শৃঙ্খল আর নিষ্পীড়ন। আশ্চর্য! যাকে সে এত বিশ্বাস করতো সেই ডলিমি তাকে স্বাধীন জীবিকার নামে এই ঘৃণ্য নারকীয় জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে এল মাত্র কয়টি টাকার লোভে। দু'চোখ দিয়ে দরদর ধারে অশ্রু ঝরে পড়ে মোহিনীর। বুকের বেদনা ঠেলে ওঠে অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির তর্বার লাভা স্রোতের মত। তার জীবনের ইতিহাস কেমন করে ভুলবে?

হঠাৎ আচমকা হাসির হল্লোড়ে সম্বিত ফিরে পেল মোহিনী। চবি, পুতুল, ময়না থেকে থেকে পাগলের মত অট্টহাস্যে ভেঙ্গে পড়ছে। বুঝতে পারলো মোহিনী, এই সমস্ত বারাঙ্গনাদের জীবনের ধারার সঙ্গে তার নিজের জীবনের ধারা এক হয়ে প্রবাহিত হতে পাচ্ছে না বলেই আজ তার উপর এই নির্যাতন। সাত নম্বর বাড়ীতে তার শিক্ষা হয়নি তাই উচ্চশিক্ষার জন্য এই কুখ্যাত পতিতালয়ে সে প্রেরিত। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মোহিনী। চোখের জলে ঝাপসা হয়ে আসে সামনের সরাপের দোকানে মাতালদের হুড়োহুড়ি। মেয়েদের সঙ্গে দর কষাকষি করা পাঁচসিকে আড়াই টাকার হতভাগা মক্কেলগুলো। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল দুইজন সুদৃশ্য যুবক দাঁড়িয়ে আছে সামনে। রাস্তার আবছা আলোয় গলার বেলফুলের মালার শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়ছে। গায়ে চুড়িদার পাঞ্জাবী। ফুলের গন্ধ আর সেন্টের গন্ধ এক হয়ে বাতাস আমোদিত। ভদ্রলোকের ছেলে এরা তবু মোহিনীর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি নিজের টুল থেকে উঠে অসহায় শিকারের মত ভীত প্রাণটা বুকে চেপে ত্রস্তপদে ছুটে যায় নিজের ঘরের ভিতরে। তারপর ভেতর থেকে খিল আটকে দেয়। হা-হা ক'রে হেসে ওঠে মনিবাবু, কিন্তু গম্ভীর হয়ে যায় নতুন লোকটি। কিছু পরে নতুন লোকটি বললো, 'পালালো কেন?' মনিবাবু একটু হেসে নিয়ে চাপা গলায় বললো, 'খাবড়ে গেওনা ব্রাদার। নতুন চালান হয়েছে কি না। একেবারে আনকোরা মাল।'

'ওঃ মাই গড। যাক ভালই। আমিও এ ব্যাপারে নতুন।' হো হো করে হেসে নিলো। এদিকে পুতুল, ময়নারা পিটপিটে চোখে তাকাচ্ছে। মনিবাবু ময়নার দিকে তাকিয়ে বললে, আর বসে কেন প্রাণেশ্বরী। চল। আজ তোমার পালা। ময়নার হাত ধরে মনিবাবু বাড়ীর ভিতরে এল। সঙ্গে সঙ্গে নতুন লোকটিও চলল। ময়নার ঘরে চলে গেল মনিবাবু। মোহিনীর ঘরের দরজায় ঘা দিতে লাগলো নতুন লোকটি। কিন্তু কোন সাড়া নাই। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আবার ঘা মারলো। হঠাৎ দরজা খুলে গেল। মোহিনী আস্তে আস্তে খাটের উপর বসে এক দিকে মুখ ফিরিয়ে নিস্পৃহ ভাবে বসে থাকলো। একবার চাইলও না লোকটির দিকে। লোকটি কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকার পর মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে

নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল, বসে রইলে কেন? এসো, এসো সুন্দরী। এমন আহামরি রূপ নিয়ে কোথায় ছিলে এত দিন? আমি যে তোমার প্রেমের ভিখারী। তোমার প্রেমসুধায় অবগাহন করে হৃদয়ের জ্বালা মিটাবো বলেই ত এসেছি এখানে।' দু'টি সর্পিল হাতে ধরবার জন্য এগিয়ে গেল লোকটি। মোহিনী একটু সরে বসলো কিন্তু ফিরে তাকালো না। দু'চোখে অশ্রু টল-টল করতে লাগলো। লোকটি আবার দাঁড়িয়ে গেল। তারপর বললে, 'কত আশা করে এসেছি প্রেম নিবেদন করবো বলে কিন্তু দেবী অমন করে অভিমান করে রইলে যে? এসো, কাছে এসো বলছি।' আবার হাত বাড়ালো লোকটি। আত্মরক্ষার আর উপায় নাই দেখে মোহিনী আসন্ন বিভীষিকার কল্পনা করে থর থর করে তৃণগুচ্ছের মত কাঁপতে লাগলো। ভাবলো, আর্তচীৎকার করে সাহায্য প্রার্থনা করে, কিন্তু কে আসবে? বিদ্রূপের হাসি হাসবে সকলে। বাড়ীওয়ালী মাসী এসে প্রহার শুরু করবে। কাঁদো কাঁদো গলায় সে বললো, 'আমাকে আপনি স্পর্শ করবেন না।' লোকটি বললো, 'কেন সুন্দরী, আমি কী তোমার অযোগ্য? আমাকে তোমার পছন্দ হয় না?'

'সে কথা ত বলিনি আপনাকে।'

'সে হবনা সুন্দরী। তোমাকে যে আমি চাই।'

'ক্ষমা করবেন।'

'ক্ষমা! কিসের ক্ষমা? বড় সতীত্বপনা হচ্ছে দেবী! এত সতীত্ব কোথায় ছিল?' হো হো করে হেসে উঠলো লোকটি। আবার বললো, তিলোত্তমার জাতের আবার সতীত্ব? এসো, এসো। রাগ কোরোনা ছি। আমি কী তোমার পর?' আবার হাত বাড়ালো লোকটি। এবার মোহিনী মানুষটির দিকে মুখ ফিরিয়ে করুণ কণ্ঠে বললো। 'আপনি পুরুষ। শক্তি আপনার আছে, ইচ্ছা করলে সবই পারেন। আপনি আজকের দিনের মত মাপ করতে পারবেন না? আমি খুবই অসুস্থ। আমরা মায়ের জাত। আপনারও ত মা, বোন, স্ত্রী রয়েছেন। তাদের যে চোখে দেখেন, একবারও কী সে চোখে আমাদের দেখতে নেই? আমরা কী কতগুলি প্রাণহীন পণ্য?' কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললে মোহিনী। বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে পাথরে খোদাই করা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল লোকটি। কিছু পরেই পাশের চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়লো। কার কাছে এসেছে সে এই উচ্ছৃঙ্খল দেহলালসার নিবৃত্তির প্রত্যাশায়? মা, বোন, স্ত্রী তারও ছিল। কিন্তু তাদের কথা মনে করিয়ে দিয়ে অনুশোচনার ধূমায়িত আগুনকে আবার কেন জ্বালিয়ে দেওয়া? জীবনের যা কিছু ক্ষতি বা কিছু বেদনা ভুলবার জন্যই ত এখানে আসা। মনে পড়ে নিজের স্ত্রীকে কোনদিন ভালবাসা দিতে পারেনি। কত কেঁদেছে সে। শেষে তার দু'টো হাত অন্তিমকালে তার বুকের উপর রেখে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। সে কথা কী সে কোন দিন ভুলতে পারবে? স্ত্রীর যা প্রাপ্য স্বামীর কাছে সেই প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে অভিমান করে চলে গেল। ভুলতে পারবে সে কোন দিন? সেদিন নিজেকে একটা নিষ্প্রাণ পাথরের মত মনে হয়েছিল তার। ভেবেছিল এ জগতে তার স্থান নেই। যেখানে মানুষ স্নেহের দাবী করে, মমতার দাবী করে, ভালবাসার দাবী করে সে জগতে তার স্থান নেই। যেখানে কোন দাবী-দাওয়া নেই, নেই কোন স্নেহ-ভালবাসা, সুখ-দুঃখের হিসাব নিকাশ, আছে শুধু নেশার উন্মত্ততা, যা মানুষকে সমস্ত সুখ-দুঃখ ও চাওয়া পাওয়ার বেদনা ভুলিয়ে দেয়, সেই অদ্ভুত জগতে নির্ব্বাসিত হওয়াই তার উচিত। শেষে সেই জগতেই এসেছে। কিন্তু আবার কেন সেই প্রেমের সন্ধানে হওয়া? এই পতিতা কী তার স্ত্রীর প্রতি যে পবিত্র ভালবাসা, সেই ভালবাসার দাবী করে। এ কী অর্থের বিনিময়ে অস্ত্রাঘাতের মত উচ্ছৃঙ্খল দেহ-বিলাসের উদগ্র নেশার উন্মত্ততায় তাকে ভোলাতে চায় না?

লোকটি একটা সিগারেট ধরিয়ে বেশ আরামে একটা টান দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললো, 'আচ্ছা মোহিনী, তুমি যদি স্বামীর পবিত্র ভালবাসা পেতে চাও তবে এপথে কেন পা দিয়েছ? আমি ত জানতাম যে, এ পথে যারা আসে তাদের সম্বন্ধ শুধু অর্থের সঙ্গে। হৃদয়ের কোন ঠাঁই নাই এখানে, কাজে কাজেই সুখ-দুঃখ জিনিষটাও নেই।'

'সুখ আছে বৈ কি। কয়জনে সে খোঁজ করে। সকলেই এখানে দুঃখ ভুলবার জন্য আপনার মত স্থবিকের স্মৃতি করে যায়।'

কী একটা ভেবে নিয়ে শেষে লোকটি বললো, 'তাহ'লে তুমি স্বামীর পবিত্র ভালবাসা প্রত্যাশা কর। আমি সে ভালবাসা দিতে প্রস্তুত—।'

'পারবেন না আপনি সেই পবিত্র ভালবাসা দিতে। আপনার কামনা ঘিরে রয়েছে আমার দেহকে।' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ধীর কণ্ঠে বললো মোহিনী।

'পারবো না আমি! যা আমার স্ত্রীকে দিতে পারিনি, তা' তোমাকেও দিতে পারবো না? তুমি একথা বলছো? ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল লোকটি।

'হ্যাঁ, বলছি। আপনি পারবেন না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোকটি আস্তে আস্তে বললো, 'জানো মোহিনী, আমারও প্রেম রয়েছে, ভালবাসা রয়েছে, কিন্তু এখানে তার দাম নেই। প্রেম কেউ চায়না। চায় টাকা। তাই টাকা নিয়ে এসেছি শুধু, প্রেম নিয়ে কোনদিন আসিনি। তোমাকে ভালবাসা দিতে পারলাম না। তাই আমাকে এখন চলে যেতে হচ্ছে।' হঠাৎ লোকটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। মোহিনী তাড়াতাড়ি তার পেছনে পেছনে বারান্দায় এসে ডান হাতখানা চেপে ধরে বললো, 'চলে যাচ্ছেন যে? এখনি যেতে পারবেন না।'

লোকটি আবার এসে আস্তে আস্তে চেয়ারে বসলো। মোহিনী লোকটির পায়ের কাছে বসে ধীর কণ্ঠে বললো, 'আজ সত্যিই আপনাকে আমার কাছে কেমন আশ্চর্য রকমের বলে মনে হচ্ছে।'

'কেন বল দেখি!' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো লোকটি।

'এখানে যা'রা আসে তা'রা কোন অনুনয় বিনয়ের ধার ধারে না, প্রেমের ধারে কাছেও ভেড়েনা। শুধু দৈহিক লালসা চরিতার্থ করে ফিরে যায়। কিন্তু আপনাকে তাদের থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে হচ্ছে।'

আবার লোকটি বিস্মিত হয়ে বললো, 'আমাকে?'

'হ্যাঁ, আপনাকে। আপনার বিবেক এখনো লোপ পায়নি। কেননা আপনি আমার ব্যথা বুঝতে পেরেছেন।'

'ঠিক পেরেছি কি না বলতে পারিনা, কিন্তু তোমার চোখের জল দেখে আমি বিচলিত হয়েছি। তোমার চোখের জলে আমার অতীত দিনের স্মৃতি ভেসে উঠেছে। যে বেদনা ভুলবার জন্য এই জগতে এসেছি সেই বেদনা যদি এখানেও দেখতে পাই তবে আর এখানে থেকে লাভ কী।'

নত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মোহিনী। অনেকক্ষণ উভয়েই চুপচাপ।

লোকটি এক দৃষ্টিতে চেয়েছিল মোহিনীর মুখের দিকে। মোহিনীর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ মোহিনীর বাঁ হাতটা ধরে লোকটি আস্তে আস্তে বললো, 'কাঁদছো কেন মোহিনী?' মোহিনী কোন উত্তর দিলো না। নীরবে রইল। লোকটি আবার বললো, 'একটা কথা বলবো মোহিনী?'

এবার মোহিনী উত্তর দিলো, 'বলুন।'

'তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে! কত দিন আগে!' চিন্তান্বিত কণ্ঠে বলল লোকটি। মোহিনীর কান্নার বেগ আরো জোরে এল। লোকটি বিস্মিত কণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা তুমি এত কাঁদছো কেন?'

আপনাকে দেখে আমার স্বামীর কথা মনে পড়ছে। ঠিক এমনই সুন্দর চেহারা, এমনই গড়ন—'স্বামী! তিনি কি জীবিত!' বিস্ময়ে অভিভূত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো লোকটি।

মোহিনীর চাপা কান্না উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। বললো, 'সে আর নেই। থাকলে কী আজ আমার এই দশা! আজ যদি শৈলেন ঠাকুরপো থাকতো তাহলে—'

হঠাৎ গম্ভীর মেঘের স্তব্ধতায় থমথমে হয়ে উঠলো লোকটার মুখখানা। কৌতূহল মিশ্রিত কণ্ঠে বললো 'আচ্ছা মোহিনী, তোমার দেওর শৈলেনের কী থিয়েটার-এর নেশা ছিল!'

'খুব ছিল, সেই পথেই ত সে চলে গেল।'

হঠাৎ লোকটি উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে নেমে মোহিনীর পা দু'টো চেপে ধরে

আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে বললো, 'বৌঠান!' চিনতে পারলে না এখনো! তুমিই ত অমলা!—চৌধুরী পরিবারের বৌ!.....'

কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো মোহিনী। অমলা! অমলা নেই আর, সে মারা গেছে! আমি এখন বুলটা মোহিনী। কিন্তু তুমি কে! তুমি শৈলেন ঠাকুরপো! শৈলেন—

কান্না রুদ্ধ হয়ে এল তার। শৈলেন মোহিনীর পা দু'টো চেপে ধরে বললো, ক্ষমা করো বৌঠান। আমরাই তোমাকে এখানে এনেছি। আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই বৌঠান। তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার করবই আমি।'

দরজায় দারুণ ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ হল ইতিমধ্যে। মণিবাবু ডাকছে ভেবে সত্যেন দরজা খুলে দিলো। অমনি একজন গুণ্ডা মদের বোতল নিয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলো, পরনে চেক চেক লুঙ্গী। অসম্ভব রকমের মোটা আর অদ্ভুত কালো শরীরটা। ঘরের ভিতরে সোজা প্রবেশ করেই মোহিনীকে জাপটে ধরলো। এক ঝলক রক্ত নেচে উঠলো শৈলেনের মাথায়। ক্ষেপে উঠলো সে। ঘুঁসি বাগিয়ে দড়াম করে মারলো গুণ্ডাটার পিঠে। সেই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, বেরিয়ে যাও শয়তান! বেরিয়ে যাও এখান থেকে। গুণ্ডাটা একহাতে মোহিনীকে ধরে আর এক হাতে মাজার লুঙ্গি থেকে দ্রুত গতিতে ছোরা বের করে মাথার সামনে ঝাঁপিয়ে বললো, 'খবরদার! একেবারে সাবাড় করে দেবো। আমি রহিম সর্দার!'

চীৎকার শুনে বাড়ীওয়ালী বুড়ী তাড়াতাড়ি সামনের মদের দোকান থেকে দু'তিন জন গুণ্ডাকে ডেকে নিয়ে এল ঘটনাস্থলে। সকলে আসল ব্যাপারের কিছু না বুঝে 'মার শালাকো, মার শালাকো' বলে এক যোগে চেঁচিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে দুমদাম কিলঘুঁসি পড়তে লাগলো শৈলেনের সর্ব্বাঙ্গে। অসহ্য যন্ত্রনায় চেঁচিয়ে উঠেছিল শৈলেন। কেউ তাকে সাহায্য করবার নাই। মণিবাবু এতক্ষণে হয়ত মদ খেয়ে পড়াপাড়ি দিচ্ছে মদনার বিছানায়। শেষে বাড়ীওয়ালীর কাছে মাপ চেয়ে শৈলেনকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে হল। এরকম ব্যাপার এখানে প্রায়ই হয়ে থাকে।

একটি সপ্তাহ দুশ্চিন্তার অস্থিরতায় কেটে গেল মোহিনীর। ক্ত নির্যাতন হয়ে গেল তার উপর। তার অন্ধকার জীবনের পটভূমিতে আশার আলোকরেখা ফুটে উঠতে না উঠতেই আবার মিলিয়ে গিয়েছে। শৈলেন ঠাকুরপোর আর আসার পথ নেই। একটা সপ্তাহ সে শুধু কেঁদেছে। সন্ধ্যেবেলা বাইরে বসতে চায়নি। মাসী তাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করেছে। তবু সে মাথা নত করেনি। তিন চারিদিন উপবাসেই কাটিয়ে দিয়েছে। আজও সারা দিন তার উপবাসে কেটেছে।

আজ রাতে ঘরের দরজা বন্ধ করে একা একা বসে কাঁদছিলো। হঠাৎ বাইরের দরজায় ধাক্কাধাক্কি শুরু। দরজা খুলে দিলো মোহিনী। দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা গুণ্ডা। পরনে চেক লুঙ্গী, গায়ে পাঞ্জাবী, গালে চাপ দাঁড়ি। গুণ্ডাটা অনিমেষ লুব্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ মোহিনীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'এ ত আচ্ছা মাল চালান হয়েছে বুড়ী। বহুৎ আচ্ছা। একে আমি ঠিক করে নেবে

বুড়ী বললো, 'আচ্ছা বাবা, মেজাজটা যাতে বহলায় তাই কর।' গুণ্ডাটা মোহিনীর কাছে এসে তার বাঁহাতটা ধরে বললো, 'চল হামার সাথে। কুছ ডর নেই। বিশ্বাসের ত এই হামার হাতে ছোরা আছে। মদের দোকানে একটু নিয়ে যাব বাস।' একটু হেসে বুড়ীর দিকে তাকালো। বুড়ী বললো, 'আচ্ছা বাবা, ওকে নিয়ে একটু ঘুরে এসো।' মদের দোকানে এসে গুণ্ডাটা ফিসফিস করে বললো, 'চিনতে পাচ্ছো না বৌঠান? আমি এসেছি। হোটেলের পেছনের দরজা দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাও। ওদিকে একটু অন্ধকার আছে। ওই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কিছুদূর গেলে খাল পাবে। খালের ধার ধরে পশ্চিমে কিছু দূর গেলে একটা দাঁকো পাওয়া যাবে। তারপরেই ওপারে আমার সাথে দেখা হবে।'

মোহিনী আস্তে আস্তে হোটেলের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে তারা সাঁকো পার হয়ে ওপারে শহরে পথ ধরে দ্রুত পথ চলতে লাগলো।

পরদিন সকালে বাবুপাড়ার শৈলেনের বাসার দরজায় লোকে-লোকারণ্য। রহিম শুণ্ডা আর বাড়ীওয়ালী বুড়ী দরজা খোলা পেয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে মোহিনীকে বারান্দার থেকে হিড়হিড় করে টেনে বের করে রাস্তায় এনেছে। বাড়ীওয়ালী বুড়ী কয়েকটা চড়ও মেরেছে মোহিনীকে। তাই দেখে চায়ের দোকানের বখাটেদের দল হা-হা করে ছুটে এসে 'এ কি হচ্ছে, এ কি হচ্ছে' বলে মারামারি থামাতে যাচ্ছিল—তারপরে যখন শুনলো মেয়েটা 'প্রস' তখন হো হো করে সবাই অট্টহাস্যে ভেঙে পড়লো। ভীড়ের মধ্যে শৈলেন মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল। মনিবাবু বললে, 'ছি ছি ব্রাদার, তোমায় আমি কত ভালবাসি। শেষে এই ভাবে মোহিনীকে নিয়ে কেটে পড়লে? তোমার বিবেচনা থাকা দরকার। সম্পত্তিটা সকলের। এর পরিক কী একটা ছু'টো?'

রহিম ও 'শালা চামার কা বাচ্চা' বলে মস্ত একটা ঘুষি মারতে উদ্যত হল। মনিবাবুই তাকে ঠেকিয়ে রেখে বললো, 'যাক যাক আলী সাহেব, ও আমার ভিয়ার ফ্রেণ্ড, একেবারে শিশু। চল এবার মোহিনীকে নিয়ে।'

কিন্তু আলী সাহেবের পেয়াজ রস-সিক্ত মাথাটা সহজে ঠাণ্ডা হয় না। তাই সাহের সম্বাবহার না হলে মনের ক্ষোভ কী সহজে মেটে? শেষে মনিবাবুই অনেক সাধাসাধি করে তাকে ঠাণ্ডা করলো।

মোহিনীকে নিয়ে তা'রা চলে গেল। পেছনে পেছনে চললো ছেলেদের একটা বিরাট দল। কিছুক্ষণ পরের কথা; শৈলেন ঘরের মধ্যে চেয়ারে বসেছিল চুপ করে। এমন সময় বাড়ীওয়ালা শিবচরণ বাবু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। চৌকাঠের কাছে মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে থাকার পর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আজ বিকেলের মধ্যেই ঘরটা খালি করে দেবেন। ভদ্রলোক-এর বাড়ীতে একজন অসামাজিক লোককে স্থান দেওয়া আমি বিপজ্জনক বলেই মনে করি।' কথা কটি বলে ভদ্রলোক দ্রুত বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

মোহিনীর জীবনের চারটি দুঃসহ দিন কেটে গেল। পঞ্চম দিনে সে শুনতে পেল তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। পুতুল আর মদনা তাকে চুপি চুপি বলেছে রহিম আলী আজ রাতে গোকুলপুরের ৭ নং বাড়ীতে নিয়ে যাবে। কথাটা শুনে শিউরে উঠেছিল মোহিনী। ৭ নং বাড়ীর কথা সে কী সহজে ভুলবে। তিনের পর দিন কী বীভৎস নারকীয় বিভীষিকার মধ্যে জীবন কাটাতে হয়েছে। কী নির্মম অত্যাচার হয়েছে সেখানে। প্রতিবাদ করেছিল, বিনিময়ে পেয়েছে চরম লাঞ্ছনা, আবার সেই নরকপুরীতে?

রাত ঘনিয়ে এসেছে। দূরে সহরের থানায় ঢং ঢং করে এইমাত্র বারোটা বাজলো। পূব আকাশের ললাটের অন্ধকার ঠেলে পঞ্চমীর ভাঙ্গা চাঁদ ধীরে ধীরে ঘোলাটে আলো ছড়িয়ে জেগে উঠছে। উপরে রাঙা আলো অজস্র নক্ষত্রের মতো এই পল্লীর ঘরে ঘরে প্রতি দরজায় অথীর প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকা বারাঙ্গনাদের চোখ জ্বলছে মিটমিট করে, শুধু মোহিনীর দু'চোখ বেয়ে শ্রাবণের ধারা গড়িয়ে পড়ে বুক-খানা ভিজে একাকার করে দিচ্ছে। এমন সময় আবছা অন্ধকারে ভূতের মত কে যেন সামনে এসে দাঁড়ালো। রহিম আলী! হ্যাঁ সেই রহিম আলী শুণ্ডাই এসেছে। বিশ্রী মদের গন্ধ ভুরভুর করছে তার সমস্ত দেহটাকে ঘিরে। দু'টো মস্ত কালো সর্পিল হাত বাড়িয়ে রহিম আলী মোহিনীর হাত চেপে ধরে হো-হো করে হেসে চলে পড়লো; তারপর বলল, 'কেমন, ভবিষ্যৎ আচ্ছা?'

মোহিনী কোন কথা বললো না। রহিম আলী মোহিনীকে হিড হিড় করে টেনে নিয়ে চললো উঠান দিয়ে। তার চলার ভঙ্গী দেখে মনে হয় পানের মাত্রাটা আজ পুরোদমেই হয়েছে। রহিম আলী মোহিনীকে বাইরের দরজার কাছে এনে চিবুকে একটা হাত দিয়ে বললো, হামি তোমার বাদশা আছি মোহিনী বেগম। সাদি করে না নেহি? সঙ্গে সঙ্গে পুতুল মদনারা হো হো করে হেসে উঠলো।

রহিম আলী মোহিনীকে নিয়ে চললো অন্ধকার পথ ধরে। সামনে আরো ঘন অন্ধকার সেখানে কোন পঞ্চমীর চাঁদের আলো ঠিকরে পড়েনি। সেই নীরন্ধ্র অন্ধ-কারাচ্ছন্নতার কথা ভেবে মনে মনে শুমরে কেঁদে উঠলো

মোহিনী। তার অভিশপ্ত জীবনের এই কী চূড়ান্ত পরিণতি।

হঠাৎ আশার আলো ঝিকমিক ক'রে উঠলো মোহিনীর বুকের অন্তস্থান ভাবনার চেউ-এ। খালের জল ম্লান জ্যোৎস্নার আলোয় ঝিলমিলিয়ে উঠেছে। মাতাল রহিম আলীর রিক্সাটা ঢেউটা টলতে টলতে বাঁয়ের সাঁকোর উপর দিয়ে চলেছে। মোহিনী হঠাৎ সমস্ত শরীরে শক্তি সঞ্চারিত ক'রে প্রচণ্ড আঘাতে হানলো মাতালের ঘেঁড়ের উপরে। মুহূর্তে ভাঙ্গা কলাগাছের মত রহিম আলী খালের অগাধ জলে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে মোহিনী খাল পার হয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলো। অন্ধকার পথ! চোখে কিছু দেখা যায়না! তবু সে ছুটে চলেছে শিকারী বাঘের মুখ থেকে ফিরে আসা আরণ্যক পশুর মতো। পিছনে তাকানোর অবকাশ নাই! ওওটা কী আবার পেছনে পেছনে আসছে? না, সে ক্ষমতা তার আর নাই। উন্মাদের মত ছুটে চলেছে মোহিনী। হঠাৎ অশরীরী আত্মার মত কে যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখতে পেল। ধড়াস ধড়াস করে কেঁপে উঠলো তার ভীরু বুকখানা। তার দু'টো হাত কঠিন হাতে চেপে ধরলো প্রেতের মতো মানুষটা। তারপর হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে রাস্তার পাশে রিক্সায় উঠলো। ঘন অন্ধকারে আবছা আবছা দেখা যায় মানুষটার মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গায়ে ছোঁড়া কাটা গেঞ্জী, পরণে লুঙ্গী। চীৎকার করে কেঁদে উঠলো মোহিনী। ওওটা মোহিনীর মুখে হাত চাপা দিয়ে বললো, চুপ রহো।'

তারপর রিক্সা দ্রুত বেগে চললো সহরের দিকে। মোহিনী এতক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। লোকটা তার কান্না রোধ করছিল দু'হাত দিয়ে সজোরে মুখটা চেপে। আরো কিছুক্ষণ চলার পর রিক্সাটা যখন নিরাপদ এলাকায় এলো তখন হঠাৎ লোকটা মোহিনীর কানে ফিসফিস করে বললো, আমি এসেছি বৌঠান,—আমি তোমার শৈলেন ঠাকুরপো! ষ্টেশনের দিকে যাব আমরা। আর ভয় নেই বৌঠান, অনেক দূরে নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে।'

অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মোহিনী লোকটার দিকে। কী আশ্চর্য, ওওটা নয়! শৈলেন ঠাকুরপো! বিশ্বাস করতে পারছে না মোহিনী, এ সত্য না স্বপ্ন! এক দৃষ্টিতে হতভম্বের মত কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর মোহিনী সম্বিত হারার মত শৈলেনের বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে হু হু করে কেঁদে উঠলো।

রিক্সা তখন বাজারের পথ দিয়ে চলেছে।

দয়ার সাগর

—রবীন্দ্রনাথ

"বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত। কারণ, দয়াবৃত্তি আমাদের অশ্রুপাতপ্রবণ বাঙ্গালী-হৃদয়কে যত শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙ্গালীজনসুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায়, তাহা নহে, তাহাতে বাঙ্গালীদুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়া কেবল একটা প্রবৃত্তির ক্ষণিক উত্তেজনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচলকর্তৃত্ব সর্ব্বদা বিরাজ করিত বলিয়াই তাহা এমন মহিমশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্ট লাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহূর্ত্তকালের জন্য কুণ্ঠিত হইত না।"

('চরিত্রপূজা' হইতে)

লালজল-নীলজল

আশীষ বসু

মেট্রোর অডিটোরিয়ামের আবছা আলো আঁধারে যার সঙ্গে প্রায় ধাক্কা খেতে খেতে সামলে নিলাম ভালো করে তাকিয়ে দেখি সে মালতী। আমাদের ক্লাসের মধুমালতী রায়। সরোষ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তাই বলো, তুমি। ইউনিভার্সিটির করিডোরের অত আলোতেই দেখতে পেতে না, তো এখানে সত্যি আলোর কমতি। সীটের পাশে এককোণে রাখা একটা সোফায় বেশ জাঁকিয়ে বসে বলল, তারপর খবর বলো। কি করছ আজকাল? চাকরী নিশ্চয়ই। চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে অফিসে একটা বড়বাবু-টাবু কিছু হয়েছো বোধ হয়। বেশ ভারিক্কী ভারিক্কী লাগছে। বয়স কতো হোল, বিয়ে করেছো? করো নি। সে কি হে! চাকরী পেয়েছো তবু কনে পাওনি! আশ্চর্য ব্যাপার। লাইফটা উপভোগ করে নিচ্ছ? বেশ, বেশ। সত্যি দেখে বেশ খুসী খুসী লাগছে।

সিনেমা থেকে বেরিয়ে মালতীকে বললাম, চলো মালতী কোথাও বসে একটু গল্প-টল্প করা যাক।

গল্পই তো করলাম এতক্ষণ। ছবি আর দেখতে দিলে কোথায়? তুমিই কি ছাই কিছু দেখেছো মন দিয়ে। কিছু অবশ্যই দেখেছো। আর তা হোল মধু মালতী রায়। অত বার বার করে ঘাড় ফিরিয়ে কি দেখছিলে বলো তো? পাশের লোকগুলো যেন চোখ দিয়ে গিলছিলো আমাকে।

দেখছিলাম তোমাকেই সত্যি। দেখছিলাম, তুমি বদলেছো কিনা।

সত্যি! বলো তো কি দেখলে? বদলেছি?

একটুও না।

ছাই দেখেছো।

তবে একটু বদলেছো।

হাসালে অসিত। আমি বললাম আর তুমিও স্বীকার করে বসলে। তুমিই বরং একটুও বদলাও নি অসিত, তেমনি পরনির্ভরশীল। মনে আছে, কফি হাউসে মেয়েরা তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে কেমন খেতো। আর তুমি কি উৎসাহেই না বিল মেটাতে। একটা রাজা-মহারাজার ছেলের মতো। কিন্তু আমার কাছে তুমি ধরা পড়ে গেছিলে একদিন। মনে আছে অসিত।

তুমি মধুমালতী নও, বিষমালতী।

নামটা ভোলনি দেখছি। আমার মুখের বিষটা আছে নষ্ট, বলো, ছিল। বয়স এখন ছাব্বিশ। ম্যাজিক্যাটের কেনবার পয়সা থাকলে আরও চ'চার বছর হয়তো ওগুলো ধরে রাখতে পারতাম। আর বিয়ে, কে আমাকে বিয়ে করবে বলো, তুমি করবে অসিত?

করতেও পারি।

ঠিক বলছো। না কি একটা—।

ধরে নাও, ঠিকই বলছি।

ঠিক বলছো না। তোমার মন বলছে না, আমি বুঝতে পারছি। তুমি বিয়ে করতে পারো না, বিয়ে করার মতো সামর্থ্য নেই তোমার।

কেন আমার চেয়েও অনেক……।

কম টাকা মাইনে পেয়েও অনেকে বিয়ে করে। আমিও স্বীকার করছি তা' করে। কিন্তু তারা মেট্রোর ব্যালকনিতে বসে ছ'টার শোয়ে ইংরাজী ছবি দেখতে আসে না। বিরিয়ানী খায় না বান্ধবীর সঙ্গে বসে। তোমার মন হাজার টাকার, মাইনে দু'শো টাকার। কি করবে বলো?

ওকথা থাক, তারপর কোথায় চাকরী করছো বলো? কত দক্ষিণা?

চাকরী টাইপিষ্টের। সরকারী অফিসে। দক্ষিণা দেড়শত রজত মুদ্রা। টাকাতে আজকাল আবার রূপো থাকে।

ঘরে নি এখনো। ও কথা থাক, কি খাওয়াবে বলছিলে না!

কিছু মনে করো না মালতী।

পাগল, তোমার কথায় কিছু মনে করলে, কবে তোমাকে ভালবেসে ফেলতে পারতাম। কি খাওয়াবে বল?

কি খাবে বল?

সাজাহান তার মমতাজের জন্যে একটা তাজমহল বানিয়েছিল তুমি আমাকে অন্তত বিরিয়ানী খাওয়াতে পারবে না একপ্লেট! মাইনে তো পেয়েছো পরশু, আজ একটু বড়মানষী করে ফেল। চলো 'আমিনিয়া'য়। একদা তো কত কাব্যি করে চিঠি দিতে, আজ আর কাব্য নয়, কঠিন বাস্তব। একপ্লেট বিরিয়ানী। ভালোবাসা থেকে বিরিয়ানী, উন্নতি না অধঃপতন। হাসছো না কেন অসিত। হাসো, হাসো। হেসে নাও। যে ক'দিন বেঁচে আছো হেসে নাও।

তুমি কেন চাকরী নিয়েছো মালতী? আমিনিয়ার পর্দা ঢাকা একটা ছোট কেবিনে বসে নিরিবিলি পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

কি করতে বলো তুমি আমাকে তাহলে?

কেন, বিয়ে? তোমার রূপ আছে, যৌবন আছে—।

না। ও রজতমুদ্রা কথাটা না বলাই ভালো।

বিদায় নেবার আগে মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল মালতী, হে ভবেশ, হে শঙ্কর সবারে দিয়েছো ঘর, আমারে দিয়েছো শুধু পথ। তারপর বন্ধু, এমনি পথে পথে দেখা হবে না আবার মিলবে কোথাও?

কোথায় মিলবো বল? কবে?

সামনের শনিবার, লাইটহাউসের সামনে। ছবি দেখা যাবে একটা। যে কোন ছবি।

তাই হোক। পথ চেয়ে থাকবো, এসো কিন্তু ঠিক।

আমারও সেই কথা। এসো কিন্তু ঠিক।

শনিবারের বেলা একটায় তেরোতলা নতুন সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংটার দশতলায় বসে কাচের জানলাটার ভিতর দিয়ে চাঁদপাল ঘাটের দিকে তাকিয়ে ছিল অসিত। সামনে একটা সুইমিং পুল। নীলজলে সাদা সাদা অনেক দেহ সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। হাসির ফোয়ারা উঠছে।

ফাইলে নোট লিখছিল অসিত। ভারী জরুরী একটা নোট। বাঁকুড়া থেকে এক ওয়াগন কয়লা গেছে মালদায়। মালদার ষ্টেশনে পড়ে ডেমারেজ খাচ্ছে সেটা। জরুরী নোটে তারই তাগাদা দিচ্ছে সে। সরকারী 'বশম্বদ কর্মচারীর মতো। একটু একটু করে বেলা গড়িয়ে দেড়টা, দু'টো, আড়াইটে, তিনটে বেজে গেল। একটার পর একটা কাজ। মাসের শেষ এখন।

ওদিকে মালতীরও কাজের শেষ নেই। ডিরেকটার ডেকেছেন ডিক্টেশন দিতে। টেলিফোন তুলে কথা বলছেন তো বলছেনই। শনিবার, বেলা দু'টো, আড়াইটে বেজে তিনটে।

ওদিকে সুইমিং পুলটার জলের রঙ পালটালো আবার। নীল রঙ থেকে মেঘ-রঙ। আসমানী রঙ থেকে ছাই-ছাই রঙ। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে লাল জল এলো পুলে। নীল-নীল পেনসিলের শেষ প্রান্তটা দাঁতের মধ্যে কামড়ে ধরে সুইমিং পুলটার দিকে তাকিয়ে ছিল অসিত। সুইমিং পুলটার জল আবার কখন পালটাবে ভাবছিল অসিত। জলের রঙটা আবার কি হবে! নীল থেকে ছাই-ছাই রঙ, ছাই-ছাই রঙ থেকে লাল হবে না জলটা। ঘোর লাল, একেবারে রক্তের মতো লাল।

ভাল ছাপার জন্য

নিউ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড

৪১এ, শলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা-৬

ফোন : ৩৫-৩৭৩২

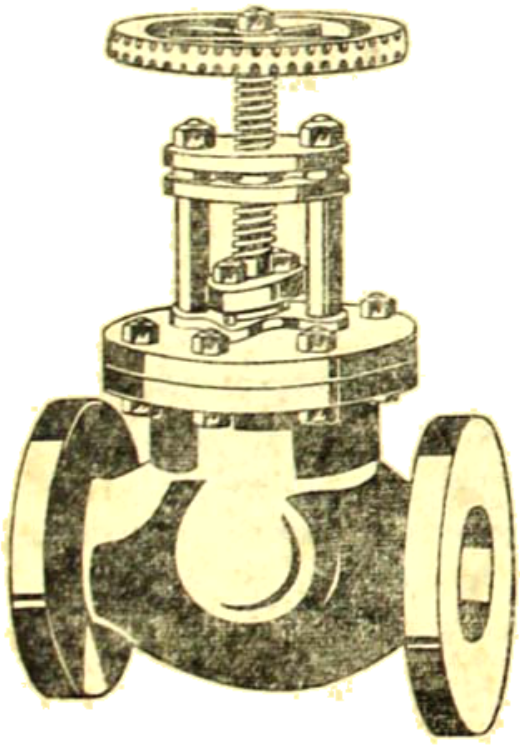

ট্রেড মার্ক "ক্যাটপ্লেন"

সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ও উচ্চ প্রশংসিত

গ্লুইস ভাল্‌ভ ও কক্

হাইড্রলিক, গ্যাস ও অয়েল টেষ্টেড্

জে, এন, পাড়ুই

২০৬, বেলিলিয়স রোড : হাওড়া

টেলিফোন—হাওড়া ১৬৮

॥ সূচীপত্র ॥

চরিত-চিত্র

অশ্বিনীকুমার দত্ত—বিপিনচন্দ্র পাল
(বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০)

আমার চোখে দেখা সোভিয়েট দেশ—ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

ভারতের পাঁচটি তৈলবীজ—অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

স্মৃতিকথা (শরৎচন্দ্র)—যোগেশচন্দ্র মজুমদার

সাহিত্যের বাজারে নূতন যাঁরা—অমলেন্দু মিত্র

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার জীবন-সাধনা—হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত

নওকল প্রতিভার গোড়ার কথা—আজাহার উদ্দিন খান

বিপ্লব যুগের অবিস্মরণীয় কাহিনী—শোভনা নন্দী

গল্প

মা ও ছেলে—সোমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দিদি—শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতা

শার্ল বোদলেয়ার-এর একটি কবিতা

জীবন বীমা

যুগযাত্রী

॥ পাদপূরণ ॥

শিশু শিক্ষা—ভগিনী নিবেদিতা

বিদেশী শাসনে ভারতের অবস্থা—কালীপ্রসন্ন সিংহ

বাঙালীর সমাজ বিন্যাস—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্ম-কথা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিন্দু প্যাট্রিয়ট ও হরিশ মুখোপাধ্যায়—দীনবন্ধু মিত্র

॥ পত্রিকা সম্বন্ধে ॥

যুগযাত্রীর বার্ষিক সডাক মূল্য ছ'টাকা। সব বিষয়ে মৌলিক রচনাই আমরা সাদরে গ্রহণ করব। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, প্রবন্ধ, সাংস্কৃতিক আলোচনা, অনুবাদ সাহিত্য ইত্যাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে লিখে সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন। অমনোনীত রচনা উপযুক্ত ডাকটিকিট ও ঠিকানা দেওয়া থাকলে ফেরৎ দেওয়া হয়। পত্রিকায় সমালোচনার জন্য দু'খানা করে বই সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন। পত্রিকাসংক্রান্ত সমস্ত রকম চিঠিপত্র সম্পাদকীয় কার্যালয়ে প্রেরিতব্য।

সম্পাদকীয় কার্য্যালয়

ফোন : ৩৫-৩৭৩১

৪১-এ, বলরামপাড়া রোড, কলিকাতা-৯

দি মিল ষ্টোরস্ এণ্ড বেলটিং কোং

৪০, নেতাজী সুভাষ রোড,

কলিকাতা-১

ফোন ঃ ২২-৫২৫৮ টেলিগ্রাম ঃ PUMPS

॥ এজেন্সী ॥

এস্. কে. এফ. বল এণ্ড রোলার বেয়ারিংস্

পাওয়ার ট্রান্সমিশন ইকুইপমেণ্ট

UNIVER

যুগযাত্রী

প্রথম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ | দশম সংখ্যা

চরিত-চিত্র

অশ্বিনীকুমার দত্ত

(৭)

ধর্মজীবনের বিকাশ

বিপিনচন্দ্র পাল

সে কালের অধিকাংশ ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মতন প্রথম যৌবনে অশ্বিনীকুমারও ব্রাহ্মসমাজের চিন্তা ও আদর্শের দ্বারা স্বল্পবিস্তর অভিভূত হইয়াছিলেন। এমন কি এক সময়ে তাঁর যৌবন-বন্ধুরা ভাবিয়াছিলেন যে বুঝিবা অশ্বিনীকুমার প্রকাশ্যভাবেই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিবাদ এবং মতের আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াও অশ্বিনীকুমার তাহার সমাজ-দ্রোহিতার সঙ্গে সাথ খুলিয়া যোগদান করেন নাই। এই জন্যই দেশে ফিরিয়া, পিতার আদেশে, খাঁটি হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিয়া, গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। আমি যতদূর জানি মত ও বিশ্বাসে অশ্বিনীকুমার এখনও অনেকটা ব্রাহ্মভাবাপন্নই হইয়া আছেন; কিন্তু এ সত্ত্বেও বোধ হয় এ পর্য্যন্ত প্রচলিত হিন্দুসমাজের নিতান্ত বিরোধী কোন আচার ব্যবহারে লিপ্ত হন নাই। আমার মনে হয় যে, যে উপাদানে দ্রোহি-চরিত্র রচিত হয়, অশ্বিনীকুমারের মধ্যে সে বস্তু কোনও দিনই বেশী ছিল না। থাকিলে তিনি যেমনটী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছেন ও যে কাজটী করিয়াছেন, তাহা করিতে পারিতেন বলিয়া বোধ হয় না।

দ্রোহিতা মাত্রেই প্রবল রাজসিকতার ফল। সমাজ-সংস্কারকেরা সকলেই রাজসিক স্বভাবের লোক। এমন কি, পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যে সকল যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ বা অবতার নব নব যুগধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁদের সকলকেই স্বকার্য্য সাধনের জন্য এই রজোধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই জন্য আমাদের প্রাচীন যুগাবতারেরা সকলে ক্ষত্রিয় ছিলেন। এক পরশুরামকেই ব্রাহ্মণ দেখিতে পাই, কিন্তু পরশুরামও ব্রাহ্মণকুলেই কেবল জন্মিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণাধর্ম্ম পালন করেন নাই; জন্মে ব্রাহ্মণ হইয়াও কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবেই তিনি ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। এই রাজসিকতা হইতেই সর্ব্বপ্রকারের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা আসে। আর সংস্কার, বিদ্রোহ, সকলই এই আত্মপ্রতিষ্ঠার রূপান্তর ও নামান্তর মাত্র। অশ্বিনীকুমারের মধ্যে কোন দিন এই আত্মপ্রতিষ্ঠার বা এই সংগ্রামশীলতার, বা এই প্রবল রাজসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এগুলি থাকিলে তাঁর চরিত্র এমন মোলায়েম, ও তাঁর জীবনব্রত এতটা সফল হইতে পারিত না।

য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যাভিমানী অনধীনতাই ব্রাহ্মসমাজের মূল ভিত্তি। এই দুইটী সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়াই ব্রাহ্ম আচার্য্যগণের প্রকৃতিগত আস্তিকবুদ্ধি বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজকে গড়িয়া তুলিয়াছে। আর এই যুক্তিবাদ ও অনধীনতার আদর্শ উভয়ই ইংরেজি শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল। ইংরেজি শিখিয়া আমরা সকলেই এ গুলির দ্বারা একদিন স্বরূপিত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। অশ্বিনীকুমারও এ প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে, অন্তর্দৃষ্টি জাগিলে, আত্মস্থ হইলে এবং সংসারের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইয়া সকল বিষয়ের চারিত্রিক অনুধাবন করিবার শক্তি জন্মিলে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই প্রথম যৌবনের এই নিরঙ্কুশ অনধীনতা ও যুক্তিবাদের প্রভাব হইতে অল্পবিস্তর মুক্ত করিয়া নিতে থাকে। প্রথম যৌবনে আমরা নিজেদের বিচারবুদ্ধিকেই সত্যাসত্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মের একমাত্র মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। তখন বুঝি নাই যে এ পথে যাইলে বস্তুতঃ সত্যে ও মতে কোনও পার্থক্য থাকে না, আর ধর্ম্মের ও সত্যের কোন স্থায়ীত্ব, সার্ব্বভৌমিক প্রতিষ্ঠাও মিলে না। আমার ক্ষীণবুদ্ধি যদি সত্যাসত্যের একমাত্র কষ্টিপাথর হয়, তবে তোমার বিচারবুদ্ধিই বা তাহা হইবে না কেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যাভিমানী যুক্তিবাদ এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে না। এ পথে য়ুরোপেও ক্রমে একটা মানসিক অরাজকতা জাগিয়া উঠিয়াছে। এ কারণেই সেখানে সমাজবন্ধন ও রাষ্ট্রবন্ধন উভয়ই অত্যন্ত শিথিল হইয়া, আধুনিক সভ্যতা ও সাধনার মূল ভিত্তিকে পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত করিবার উপক্রম করিয়াছে। অশ্বিনীকুমার বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই যুক্তিবাদের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিয়া সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ করেন। আর তখনই তাঁর ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবন উভয়ই এক অভিনব পথ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে।

হিন্দু সাধনায় সদ্‌গুরু

এই সদ্‌গুরু তত্ত্বটী যে কি ইহা আমাদের নব্য শিক্ষিত সমাজ ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই। গতানুগতিক পন্থা অবলম্বনে যাঁরা গুরুকরণ করিয়া এদেশে ধর্ম্মসাধন করেন, তাঁরাও কেবল নিষ্ঠাগুণে কোন কোন স্থলে সাধনপথে বিশেষ অগ্রসর হইলেও, প্রকৃত গুরুতত্ত্ব যে কি ইহা বুঝেন বলিয়া মনে হয় না। গুরুকরণ ও গুরুশক্তিকে তাঁরা একটা অতিলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বলিয়াই মনে করেন, আর গুরুনির্ব্বাচনেও প্রায় কোন প্রকারের বিচার বিবেচনা করেন না। অধিকাংশ লোকে কুলগুরুকেই সদ্‌গুরু বলিয়া মনে করেন, অপর কেহ কেহ বা কুলগুরু ত্যাগ করিয়া কোন সাধুপুরুষের নিকটে দীক্ষা লইয়া, দীক্ষাগুরুকেই সদ্‌গুরু বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুলগুরু বা দীক্ষাগুরু এঁদের দু'এর কেহই সদ্‌গুরু নহেন। কুলগুরুতে আর সদ্‌গুরুতে যে প্রভেদ অনেক, এ কথা আজকাল একটু আধটু ধর্ম্মচর্চ্চা যাঁরা করেন, তাঁরা সকলে স্বরূপিত বুঝিয়া থাকেন। জন্ম-নিবন্ধন যে কেহ অপরের ধর্ম্মপথের সহায় ও নায়ক হইতে পারে না, এই মোটা কথাটা এদিনে আর কাহাকে বুঝাইতে হয় না। শিক্ষিত লোকেরা এখন আর কুলগুরু গ্রহণ করেন না; অধিকাংশ লোকে কোন গুরুই গ্রহণ করেন না, যাঁরা করেন, তাঁরা কোন সাধুসন্তের নিকটে মন্ত্রদীক্ষা লইয়া, ধর্ম্মসাধন করিবার চেষ্টা করেন। দীক্ষাগুরু কুলগুরু অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ হইলেও, কেবল ধর্ম্মসাধনেই তিনি শিষ্যের সহায় হইতে পারেন মাত্র; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অপ্রকট ও অব্যক্ত ভগবদ্বস্তুকে আত্মপ্রভাবে শিষ্যের অন্তরে প্রকট ও ব্যক্ত করিবার অধিকার তাঁরও নাই। দীক্ষাগুরু সাধক বা সিদ্ধপুরুষ পর্য্যন্ত হইতে পারেন; তিনি পথ দেখাইয়া দিতে পারেন, আপনার আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রভাবে শিষ্যের চিত্তকে অধিকার করিয়া, তাঁহার অন্তরে সাধনের ও ভক্তির প্রেরণা পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু সাধ্য-বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারেন না, এটী কেবল সদ্‌গুরুরই কর্ম্ম। আর এই জন্যই সদ্‌গুরুকে লোকে ও শাস্ত্রে ভগবানের বিগ্রহ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। কুলগুরু বা দীক্ষাগুরুর এই অধিকার নাই। এক অর্থে মানুষ মাত্রই মানুষের গুরু; আর কেবল

মানুষই বা বলি কেন, পশু পক্ষীকীটপতঙ্গাদির নিকটও মানুষ কত শিক্ষালাভ করে বলিয়া তাহারাও গুরুপদবাচ্য। আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—জড় জীব সকলেই এক অর্থে ভগবানের প্রকাশও বটে; সকলেই সেই অব্যক্তকে নিয়ত ব্যক্ত করিতেছে। সকলেই তাঁর অবতার। কিন্তু এইরূপ ব্যাপক ও সাধারণ অর্থে সদ্‌গুরুকে ভগবানের বিগ্রহ বলা হয় না। ঈশ্বর নিরাকার ও চৈতন্যস্বরূপ, তিনি আমাদের অন্তরে অন্তর্যামীরূপে রহিয়াছেন। তিনি পরমাত্মা, তিনি সর্ব্বাত্মা, তিনি বিশ্বাত্মা।

কিন্তু জীব তাঁহাকে দেখে কৈ? সকল জ্ঞানকে যিনি উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, জ্ঞান তাঁহাকে ধরিতে পারে না। পারে না এইজন্য যে তিনি জ্ঞানের মূলেই আছেন, জ্ঞানের বিষয়রূপে, জ্ঞেয়রূপে সকলের প্রত্যক্ষ হন না। ভগবান সদ্‌গুরুরূপেই জীবের নিকট প্রত্যক্ষ হ'ন। যিনি অন্তর্যামী, তিনিই সদ্‌গুরু। ভাগবত ভগবানকেই আচার্য্য বলিয়াছেন—আচার্য্যকে মনুষ্যজ্ঞানে কখনও অসূয়া করিবে না। আর বিবিধরূপ ধারণ করিয়া শ্রীভগবান জীবের সর্ব্বপ্রকারের মঙ্গল নিয়ন্ত্রণ করিয়া, তাহার সদ্‌গতি করিয়া থাকেন। ইহার এক অন্তর্যামীরূপ, আর এক মোহান্ত বা সদ্‌গুরুরূপ। কেবল অন্তরবৃত্তি বা আত্মপ্রত্যয় বা সহজজ্ঞান বা ইন্‌টুইশনের দ্বারা আমরা কোন জ্ঞানলাভ বা রসাস্বাদন করি না। অন্তরে যার ছাঁচ আত্মপ্রত্যয়রূপে রহিয়াছে, তার অনুরূপ বস্তু যতক্ষণ না বাহিরে প্রকাশিত হয়, ততক্ষণ সেই অন্তরের আত্মপ্রত্যয় জাগিয়া উঠে না। ভিতরের ঐ ছাঁচে বাহিরের বস্তু পড়িলেই আমাদের জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। অন্তরের ঐ আত্মপ্রত্যয়কে ইংরেজিতে subjective intuition বলে—কেবল intuition ও বলিয়া থাকে। আর বাহিরের বস্তুকে object বলে। ইন্‌টুইশন বা আত্মপ্রত্যয়কে forms of knowledge, আর বাহিরের বিষয়কে contents of knowledge বলে। এই ছাঁচের বা forms'এর সঙ্গে এই contents বা বস্তুর মিলন হইয়াই সর্ব্বপ্রকারের জ্ঞান ফুটিয়া উঠে। আমাদের সদ্‌গুরুতত্ত্ব এই দার্শনিক সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ভিতরে ঈশ্বরের জ্ঞান আত্মপ্রত্যয়রূপে আছে, ইহা সত্য। কিন্তু এ জ্ঞান আমাদের জ্ঞানগোচর নহে। যখন বাহিরে ঈশ্বরের ধর্ম্মসম্পন্ন কোনও বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করি, তখনই কেবল আমাদের ভিতরকার ঐ ঈশ্বরজ্ঞান জাগিয়া উঠে। বাহিরে, সংসারে, পিতাকে দেখিয়াই ভগবানের পিতৃত্ব, এখানে মাতাকে দেখিয়াই তাঁহার মাতৃত্ব, এখানকার সখা-সখীদের সখ্য আস্বাদন করিয়াই তাঁহার সখ্য, এখানকার মাধুর্য্য সম্ভোগ করিয়াই তাঁহার মাধুর্য্যের জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। এ সকল জ্ঞান ভিতরের বস্তু বটে, কিন্তু বাহিরের সংস্পর্শ-লাভ না করিলে এই ভিতরের জ্ঞান জাগে না। এইজন্য "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে", একদিকে যেমন এই কথা অতি সত্য, সেইরূপ অন্যদিকে, যাহা দেখি না ব্রহ্মাণ্ডে তাহা জাগে না ভাণ্ডে, এই কথাও ঠিক ততটাই সত্য। ভাণ্ড সত্যের আধখানা, ব্রহ্মাণ্ড তার অপরার্দ্ধ। এই দুই'এতে সত্য পূর্ণ ও প্রকট হয়। এখন প্রশ্ন এই—ভগবানকে আমরা জানিতে পারি, না জানিতে পারি না। কেবল অন্তর্যামীরূপে তাঁহাকে জানিলে, তাঁর আধখানা মাত্র জানা হয়। ফলতঃ বাহিরে তাঁর যে সকল প্রকাশ হয় ও হইতেছে, সেগুলিকে ছাড়িয়া, তাঁর অন্তর্যামীরূপেরও কোনও সত্য অর্থ প্রতিষ্ঠিত হয় না। অন্তরে আমাদের যে সদসদ্‌জ্ঞান বা ধর্ম্মবুদ্ধিকে তিনি জাগাইয়া দেন, তার সঙ্গে বাহিরের বিষয়-রাজ্যের ও সমাজ-জীবনের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী। আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম আমরা যে সমাজে বাস করি, বা যে সকল বিভিন্ন সমাজের সঙ্গে বিবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হই, তাদেরই আশ্রয়ে ফুটিয়া থাকে।

বাহিরে যার প্রকাশ হয় না, ভিতরে তার জ্ঞান জাগে না, জাগিতে পারে না। ভগবানকে বাহিরে দেখিলে তবে ভিতরে তাঁর সত্য জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয়। এইজন্য ভগবানের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ যে সকল মহাপুরুষের মধ্যে হয়, তাঁহারাই জগতে সকল ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ আশ্রয় হইয়া রহেন। ইহাই অবতারের মূল অর্থ ও মুখ্য প্রয়োজন। ইহাই সদ্‌গুরুতত্ত্বেরও প্রতিষ্ঠা। যাঁহার মধ্যে শিষ্যের অন্তরের আত্মপ্রত্যয়নিহিত ভগবদ্‌ভাব ও ভগবদাদর্শ প্রকট

হইয়া, তাহার ভক্তি ও আত্মগত্যকে একান্তভাবে টানিয়া লয়, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সদ্‌গুরুপদবাচ্য। তাঁহাকে দেখিয়াই শিষ্য ও সাধক আপনার লাভালাভের প্রত্যক্ষলাভ করেন। অবতারেরা যুগে যুগে প্রকাশিত হন, সদ্‌গুরুতে ভগবান নিত্য অবতীর্ণ। এই সদ্‌গুরুতত্ত্বেতেই স্বাধীনতা ও আত্মগত্যের, স্বানুভূতি ও শাস্ত্রের, মত ও সত্যের, আত্মপ্রত্যয় ও বিষয়-প্রত্যক্ষের, সকল সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া থাকে। এখানেই সর্ব্বদন্দ্ব সমন্বয় হয়। অশ্বিনীকুমার প্রথম যৌবনেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যাভিমানী যুক্তিবাদের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিয়া, সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় পাইয়াই ক্রমে স্বাধীনতার সঙ্গে আত্মগত্যের সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন।

অশ্বিনীকুমারের দীক্ষা গ্রহণ

অশ্বিনীকুমার এই উদার ও গভীর গুরুতত্ত্ব বুঝিয়া, পরে গুরুকরণ করিয়াছিলেন, ইহা মনে হয় না। দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে অতি অল্পলোকেই এই তত্ত্বের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। বিশেষতঃ আমরা আজকাল যেরূপ শিক্ষাদীক্ষা পাইয়া থাকি, তাহাতে এই গভীর তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা কিছুতেই সহজ নহে। এই তত্ত্ব গুরুগ্রহণের পরে, গুরুকৃপাতেই কেবল ক্রমে শিষ্যের প্রাণে ফুটিয়া উঠে। একালে অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই সাধু মহাপুরুষবিশেষের উন্নত ও উদার চরিত্রে মুগ্ধ হইয়াই তাঁদের শরণাপন্ন হন। অশ্বিনীকুমারও, বোধ হয়, এই ভাবেই, তাঁর গুরুদেবের চরণে যাইয়া প্রথমে উপস্থিত হন। একদিকে তাঁর সহজ ধর্ম্মপিপাসা মানুষী ব্রাহ্মধর্ম্মের রূপকোপাসনা ও মানস-কল্পিত সাধনভজনে মিটাইতে পারে নাই। অন্যদিকে মানুষী ব্রাহ্ম-সিদ্ধান্তের যুক্তিবাদ সত্যের সম্যক্ প্রামাণ্যও প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। ইহাতে জ্ঞান ও ভাব, দু'এরই কিছুই পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই। আর এই বিবিধ অভাব পরিপূরণের আশাতেই, বোধ হয়, অশ্বিনীকুমার গুরুগ্রহণ করেন। প্রথম যৌবনে, ইংরেজি শিক্ষার ও য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের বা র‍্যাশনিলিজ্‌মের (Rationalism) প্রভাবে যাঁরা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে আসিয়া, পরে গুরুদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁদের প্রায় সকলের ভিতরকার কথাই ইহা। অশ্বিনীকুমারের অন্তর্জীবনের কাহিনী যে অন্যরূপ এরূপ অনুমানের কোন হেতু আছে বলিয়া বোধ হয় না। আর এই পথে আসিয়া গুরুগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অশ্বিনীকুমার একেবারেই যে আমাদের দেশের প্রাচীন গুরুতত্ত্বটী পূর্ণমাত্রায় বুঝিয়াছিলেন, এমন কল্পনা করা কঠিন।

আত্ম-সমর্পণের প্রয়োজন

সদ্‌গুরুতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, গুরুর চরণে একান্ত আত্মসমর্পণ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। যিনি অন্তর্যামী, তিনিই সদ্‌গুরু ; অন্তরে যাঁর প্রেরণা জাগে, বাহিরে তিনিই আপনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া, সেই প্রেরণার প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করেন, এই কথাই আমাদের দেশের পুরাতন গুরুতত্ত্বের মূল কথা। এই কথাটা বুঝিলে, আত্মপ্রত্যয়ের হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়া, আর শ্রীগুরুর হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়া দুই এক হইয়া দাঁড়ায়। ভিতরে যিনি ধর্ম্মাবহ, অন্তরে আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধির ভিতর দিয়া যিনি সর্ব্বদা আমাদিগকে ভালমন্দের উপদেশ দান করেন, তিনিই যদি বাহিরে, চাক্ষুষ "মোহান্ত"-গুরুরূপে প্রকাশিত হন, তখন এই গুরুর আদেশ আর ইংরেজিতে যাঁহাকে কনস্যান্স (conscience) এবং আমাদের আধুনিক বাঙ্গলা ভাষায় যাহাকে বিবেক বলে, এই উভয়ই এক হইয়া যায়। সুতরাং বিবেকবাণী আর গুরুবাক্য সমান মর্য্যাদা ও প্রামাণ্য প্রাপ্ত হয়। প্রকৃত গুরুতত্ত্ব এই কথাই বলে। তবে ভিতরের conscience বা বিবেকবাণী আর বাহিরের গুরুবাক্যের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, কোন্‌টা বলবত্তর হইবে, একথা ওঠে বটে। সদ্‌গুরুতত্ত্ব বলে, এরূপ বিরোধ অসম্ভব। ফলতঃ সদ্‌গুরু কে আর সদ্‌গুরু কে নহেন, এখানেই তার প্রকৃত পরীক্ষা হইয়া থাকে। সদ্‌গুরু স্বয়ং অন্তর্যামী। তিনি শিষ্যের অন্তর জানেন ; কেবল ইহাই নহে, তার অন্তরে

যে সকল প্রেরণা জাগে তারও প্রেরয়িতা তিনি আপনি। শিষ্যের অন্তরে তিনিই জিজ্ঞাসার উদয় করান, আবার বাহিরে মোহান্তরূপে বা আচার্য্যরূপে তিনিই শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করিয়া, সে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তিও আপনিই করিয়া থাকেন। কোন্ পথে, কি ভাবে, শিষ্যের জীবন ফুটিয়া উঠিয়া, ক্রমে সে চরম সাধ্য লাভ করিবে, ইহা তিনি জানেন। জানিয়া সেই পথেই অন্তরের প্রেরণা ও বাহিরের উপদেশাদির দ্বারা তিনি তাহাকে অলক্ষিতে লইয়া যান। এই প্রকৃত গুরুপন্থা ত্রিগুণাতীত। এপথে সংসারের লৌকিক ভালমন্দের বাহ্য বিচার-বিবেচনের প্রয়োগ চলে না। লৌকিক বিচারে যাহা নিতান্ত মন্দ, তার ভিতর দিয়াও নিয়তই ত' মানুষের জীবনে কত অদ্ভুত ভাল ফুটিয়া উঠে। গুরুতত্ত্ব যারা মানেন না, তাঁরাও ত এই কথাটা অস্বীকার করেন না। মানুষ মন্দ করে, পাপ করে, অশেষবিধ অহিতাচারে নিযুক্ত হয়, অথচ ভগবান সেই মন্দের, সেই অহিতের, সেই পাপের ভিতর দিয়াই, অপূর্ব্ব কৌশলে, অযাচিত করুণাভরে, তাহাকে কল্যাণের ও পুণ্যের পথে লইয়া গিয়া দাঁড় করান, একথা সকলেই কহেন। হয় বলিতে হয় যে এ সকল স্থলে ভগবানের বিশেষ বিধান সার্ব্বজনীন কার্য্যকারণসম্বন্ধকে বাতিল করিয়া, পাপীর মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া দেয়, না হয়, ঐ মন্দের মধ্যেই এই ভালর, ঐ পাপের ভিতরেই এই পুণ্যের বীজ লুকাইয়া ছিল, ইহা স্বীকার করিতে হয়। পাপ পাপই প্রসব করে; পুণ্য হইতে পুণ্যই উৎপন্ন হয়। যুক্তি ও নীতি এই কথাই বলে। আর ইহাই যদি এ ক্ষেত্রে শেষ কথা হয়, তাহা হইলে খৃষ্টিয়ানী অনন্ত নরকবাস, কিম্বা বৌদ্ধ কর্ম্মবাদ ভিন্ন, আর কোন কিছুর প্রতিষ্ঠা হয় না। আর নরকবাদ এবং কর্ম্মবাদ, উভয়ই ভাগবতী করুণাকে সঙ্কুচিত ও অসমর্থ করিয়া রাখে। যাঁরা ভগবানের করুণায় বিশ্বাস করেন, তাঁরা মন্দের ভিতর দিয়াই ভাল, অকল্যাণের ভিতর দিয়াই কল্যাণ, পাপের ভিতর দিয়াই পুণ্যের প্রকাশ হয়, এই কথা সর্ব্বদাই মানিয়া লন। আর এই সত্যকে প্রামাণ্য সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেই, আমাদের ভাল-মন্দ সকল প্রেরণাই অন্তর্যামী পুরুষ হইতে আসে, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। ফলতঃ পারমার্থিক দৃষ্টিতে ভাল-মন্দের ভেদাভেদ থাকিতেই পারে না। সে দৃষ্টি সমাকদৃষ্টি। সে ভাব দ্বন্দ্বাতীত। আর সুখদুঃখ যেমন দ্বন্দ্ব, ভালমন্দ, পাপপুণ্য, এগুলিও সেইরূপ দ্বন্দ্ব। সমাকদৃষ্টির নিকটে সুখ আর দুঃখ দুই একই বস্তুর দুই দিক মাত্র, সেইরূপ ভাল এবং মন্দও এক বস্তুর দুইদিক ভিন্ন আর কিছু নহে। আজ যাহা মন্দ, কাল তাহা ভাল হয়। আজ যাহা ভাল কাল তাহা মন্দ হইয়া পড়ে। দেশ, কাল, পাত্রের বিভিন্নতার দ্বারাই এ সকল ভাল-মন্দের বৈষম্য ও বিচার হইয়া থাকে। ফলতঃ যাহাকে conscience বা ধর্ম্মবুদ্ধি বা বিবেকবাণী বলি, তাহাও ত সর্ব্বদা এক কথা কহে না। এই ধর্ম্মবুদ্ধিরও বিকাশ হয়। এই ধর্ম্মবুদ্ধিও আজ এক কথা, কাল অন্য কথা বলে। সুতরাং গুরু আজ যাহাকে যে উপদেশ দান করেন, কাল যদি তাহাকে অন্যতর উপদেশ দেন, অথবা একজনকে যাহা আদেশ করেন, অন্যকে যদি তার বিপরীত আদেশ করেন, তাহাতে তাঁর উপদেশের মর্য্যাদা বা প্রামাণ্য নষ্ট হয় না ও হইতে পারে না। তবে প্রকৃত সদ্‌গুরুর উপদেশের সঙ্গে শিষ্যের অন্তরগত প্রেরণার কখন কোন গুরুতর বিরোধ হয় না ও হইতে পারে না। হয় না এই জন্য যে তিনি ঐ অন্তর দেখিয়াই উপদেশ করেন। যে উপদেশ শিষ্য গ্রহণ করিতে পারিবে না, এমন উপদেশ করিয়া সদ্‌গুরু কদাপি শিষ্যকে বিব্রত ও অপরাধী করেন না। বরং তিনি তার অন্তরে অন্তর্যামীরূপে যে ভাব বা যে আকাঙ্ক্ষা বা যে জিজ্ঞাসা জাগাইয়া দেন, বাহিরে মোহান্তরূপে সেই ভাবের, আকাঙ্ক্ষার বা জিজ্ঞাসার উপযোগী উপদেশ দিয়াই, তাহাকে ধর্ম্মপথে লইয়া চলেন। কিন্তু আমরা মানুষের মধ্যে যে ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না; এইজন্য সদ্‌গুরু দেহধারী মানুষ বলিয়া তিনিই যে আবার অন্তর্যামীও, একথা কিছুতে ধারণা করিতে পারি না। আর এই অক্ষমতা-নিবন্ধনই সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইয়াও, আমরা একান্তভাবে গুরুচরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না। অশ্বিনীকুমারও এটী পারিয়াছেন কিনা জানি না। তাঁর গুরু যে কেবল বাহিরের উপদেষ্টা নন, কিংবা তাঁর গুরুকৃপা যে একটা অলৌকিক উপায়ে ভগবানের শক্তি ও দয়াকে উদ্বুদ্ধ করিয়া

তাঁর কল্যাণ সাধন করে না, অথচ ভগবানই যে ঐ গুরুদেহকে আশ্রয় করিয়া, "চৈত্যগুরু"—অন্তর্যামীরূপে ও বাহ্য স্বরূপে, ভিতরে বাহিরে দুইদিকে তাঁহার জীবনকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন, এ সকল কথা তিনি ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন কি না জানি না। আমাদের কাহারই এ পর্য্যন্ত এ ভাগ্য হয় নাই। আর হয় নাই বলিয়াই আমরা সংসারতরঙ্গে পড়িয়া 'হাবুডুবু' খাইয়া থাকি। অশ্বিনীকুমার এ পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় নীতিবাদকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি খৃষ্টীয়ান্ সাধকের চক্ষেই তাঁর গুরুকে দেখেন, প্রকৃত হিন্দু সাধকের চক্ষে দেখিতে শিখেন নাই। আধুনিক খৃষ্টীয়ানেরা যিশুখৃষ্টকেই গুরুরূপে বরণ করেন। এই গুরু-খৃষ্টবাদ আর আমাদের সদ্‌গুরুতত্ত্ব মূলে একই সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, দু'তে প্রভেদ বিস্তর। কোন হিন্দু আপনার গুরুকে জীবনের আদর্শরূপে বরণ করেন না। খৃষ্টীয়ান সাধকেরা যিশুকে তাঁদের জীবনের আদর্শ বলিয়া নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়া থাকেন। যিশুর অনুসরণ করাই আধুনিক খৃষ্টীয়ান সাধকের মুখ্য চেষ্টা। যিশু-চরিত্রলাভই এই সাধনার চরম সাধ্য।

হিন্দু ও খৃষ্টীয়ান সাধক

কিন্তু হিন্দু সাধক কোন দিন ভগবানকে বা আপনার গুরুকে অনুকরণ করেন না। ভগবানকে তাঁরা ভক্তি করেন, গুরুর উপদেশ তাঁরা পালন করেন, কিন্তু ভগবানকে বা গুরুকে আপনাদের জীবনের আদর্শরূপে কোন দিন কল্পনা করেন না। তাঁরা অধিকারীভেদ মানেন। জীবের অধিকার এক আর ভগবানের অধিকার অন্য। শিষ্যের অধিকার এক আর গুরুর অধিকার অন্য। ভগবান বিশ্বে কতভাবে লীলা করিতেছেন; তিনি সৃষ্টি করেন, রক্ষা করেন, বিনাশ করেন, সকলই করেন। তিনি মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে নির্ম্মম ভাবে নষ্ট করেন। তাঁর শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই পাপী পাপ করে আবার পুণ্যাত্মারা সেই শক্তির প্রেরণাতেই পুণ্যকর্ম্ম করেন। এ সকলই তাঁর দ্বারা হইতেছে। জীবের পক্ষে ভগবচ্চরিত্রলাভ কেবল অসাধ্য যে তাহা নয়, ভগবানের অনুকরণের ইচ্ছামাত্র পাপ। সদ্‌গুরু সম্বন্ধেও ঐ কথা। সদ্‌গুরু ভাগবতী তনু লাভ করিয়া ভগবল্লীলারসে নিমগ্ন হইয়া, কত প্রকারের আপাতবিসদৃশ কথা বলেন ও বিসদৃশ কর্ম্ম করেন। ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যকে তাঁরা বিভিন্ন উপদেশ দেন। একজনকে যাহা বিহিত ও ভাল বলিয়া আচরণ করিতে বলেন, অন্যজনকে তাহা অবিহিত ও মন্দ বলিয়া বর্জ্জন করিতে উপদেশ দেন। এ অবস্থায় শিষ্যের পক্ষে আপনার অধিকারকে উল্লঙ্ঘন না করিয়া, গুরুর অনুসরণ করা অসম্ভব। এরূপ প্রয়াসেও গুরুতর অপরাধ হইয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা এ সকল নিগূঢ় কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। আমাদের নীতিবাদ সকল মানুষকে গুরুচরিত্রলাভ করিতে উপদেশ দেয়। কিন্তু গুরুর অনুকরণ করা নহে, অনুগত হওয়াই শিষ্যের প্রধান ধর্ম্ম। হিন্দু শিষ্য সেজন্য কেবল এই বলিয়া প্রার্থনা করেন—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

ইংরেজি শিখিয়া যে সকল যুক্তি ও সিদ্ধান্তের সাহায্যে আমরা একালে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিমার্জ্জিত করিয়া থাকি, তাহার দ্বারা হিন্দুর এই সদ্‌গুরুতত্ত্বের নিগূঢ় মর্ম্ম ও রহস্য ভেদ করা সহজ নহে। খৃষ্টীয়ান সাধনাতেও এই তত্ত্ব যে একেবারে ফুটিয়া উঠে নাই, তাহা নহে। বিগত খৃষ্টীয় শতাব্দীর য়ুরোপীয় ধর্ম্মবিজ্ঞান কিয়ৎপরিমাণে এই তত্ত্বের উপরেই খৃষ্টীয় সিদ্ধান্তকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান যখন অতিলৌকিক শাস্ত্রের প্রাচীন প্রামাণ্য নষ্ট করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্বকে মানুষের সহজবুদ্ধি বা আত্মপ্রত্যয় বা ইনটুইশনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করিল,

তখন খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মনিকেরা এই আত্মপ্রত্যয়বাদের অপূর্ণতা দেখাইয়া, এই আত্মপ্রত্যয়কে পূর্ণ করিবার জন্যই, যিশুখৃষ্টকে ভগবানের বহিঃপ্রকাশরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। বাহিরে সত্যের প্রকাশ না হইলে ভিতরে তার যে সত্যকাম রহিয়াছে তাহা ফোটে না ও জাগে না, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। ঈশ্বর সম্বন্ধে কেবল একটা আত্মপ্রত্যয় আছে, ইহা মানিলেই ঈশ্বরসত্তার প্রতিষ্ঠা হয় না। এই আত্মপ্রত্যয়কে জাগাইবার জন্য তাহার উপযোগে বহির্বিষয়ের প্রকাশও অত্যাবশ্যক হয়। কেবল মনোগত আস্তিক্যবুদ্ধিতে ভগবৎপ্রতিষ্ঠা হয় না। ভগবানকে বাহিরেও দেখিতে হয়। এই জন্যই তাঁর অবতারের প্রয়োজন। অবতার ব্যতীত সত্য ও প্রত্যক্ষ ঈশ্বর তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। যিশুখৃষ্ট মানুষের ঐশ্বরিক আত্মপ্রত্যয় বা ইনটুইশনের বহির্বিষয়রূপে প্রকট হইয়া, ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই ভাবেই বিগত খৃষ্টীয় শতাব্দীর উদার ও উন্নত য়ুরোপীয় ধর্ম্মবিজ্ঞান আত্মপ্রত্যয়-বাদের সঙ্গে অবতারবাদের সমন্বয় সাধন করিয়া, ধর্ম্মের অতিপ্রাকৃত প্রেরণাকে সংশোধন করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। আর এখানেই এই আধুনিক খৃষ্টতত্ত্ব আমাদের পুরাতন সদ্‌গুরুতত্ত্বের সঙ্গে অনেকটা মিলিয়া গিয়াছে। আধুনিক উন্নত ও উদার খৃষ্টীয় সিদ্ধান্তে যিশুখৃষ্টই সদ্‌গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু যে খৃষ্টীয়ান সিদ্ধান্তের কথা আমরা এদেশে শুনিতে পাই, তাহাতে এ সকল গভীর কথার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। মামুলী খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মে এ তত্ত্ব এখনও ভাল করিয়া আসর করিতে পারে নাই। প্রচলিত য়ুরোপীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেও এই সত্যটা এখন পর্য্যন্ত পরিস্ফুট হয় নাই। সুতরাং আমরা ইংরেজ শিখিয়া ইহার কোন পরিচয় পাই না। আমাদের আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা এখনও খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাভিমানী যুক্তিবাদকে অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছে।

যিশুখৃষ্ট আদর্শ পুরুষ

খৃষ্টীয় সমাজেও এখন অনেক লোকে যিশুখৃষ্টকে কেবল একজন আদর্শপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিছুদিন হইতে এই ভাবটাই য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। খৃষ্টেতে ঐশ্বরিক আত্মসমর্পণ অপেক্ষা, আপনার সাধনবলে খৃষ্টচরিত্রের অনুশীলন ও অনুকরণ করিয়া ঐ উদার ও বিশুদ্ধ চরিত্রবল লাভ এখন খৃষ্টীয় সাধনের সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। খৃষ্টীয়ান সাধু ও সাধকেরা আপনাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে এখন—"যিশু এই অবস্থায় কি করিতেন?" এই প্রশ্নেরই আলোচনা করিয়া থাকেন, আর তিনি যেরূপ করিতেন, যেরূপ চলিতেন, তাহা করিতে ও সেইরূপ চলিতেই চেষ্টা করেন। অশ্বিনীকুমারও, আমার মনে হয়, কতকটা এইরূপভাবেই আপনার গুরুদেবের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আপনার ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁর বিস্তৃত কর্ম্মজীবনে যখনই যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তখনই—এ অবস্থায় তাঁর গুরুদেব কি করিতেন, তিনি এই প্রশ্ন তুলিয়া, তার যথাসাধ্য মীমাংসা করিয়াই, আপনার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে [illegible]ছেন।

কিন্তু হিন্দুর নিকটে ইহা গুণের কথা না হইয়া অত্যন্ত দোষের কথা হয়। হিন্দুর সাধনার একটা অতি মামুলী কথা আছে যে দেবতাদের উপদেশই অনুসরণ করিবে, কদাপি তাঁহাদের কর্ম্মের অনুকরণ করিবে না। আমাদের বিদেশীয় ভাবাপন্ন বিচারবুদ্ধি প্রায়ই এ কথাটাকে উপহাসাস্পদ বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করে। কখন কখন ইহাকে অতিশয় হীন বাক্য বলিয়াও ঘৃণা করিয়া থাকে। ইংরেজি প্রবাদ বাক্যে বলে উপদেশ অপেক্ষা আচরণ শ্রেষ্ঠ। এই হিসাবে দেবতাদের আচরণ যদি ধর্ম্মবিগর্হিত হয়, তবে তাহাদের আদেশের বা উপদেশের কোন মূল্য ও সত্য থাকে না। কিন্তু য়ুরোপীয় সাধনা আমাদের অধিকারীভেদ মানে না। অথচ এই অধিকারীভেদই হিন্দুর সাধনার মুখ্য কথা। আমাদের সকল সাধনভজন, কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, বিধিনিষেধাদি এই অধিকারীভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এইজন্যই দেবতার অধিকারে যা সাজে ও যাহা ধর্ম্ম, সাধারণ মানুষের তাহা সাজে না, সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা অধর্ম্ম। ঈশ্বরকে মানুষের আদর্শ করিলে, সমাজধর্ম্ম ও লোকধর্ম্ম উল্টপাল্ট হইয়া যায়। হিন্দু

একেশ্বরবাদী, অদ্বৈততত্ত্বের উপরে হিন্দুর সকল সিদ্ধান্তের ও সাধনার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক, শাক্ত, শৈব, সকল সিদ্ধান্তই কোন না কোন আকারে এই অদ্বৈততত্ত্বকে মানিয়াছেন। আর মূলতত্ত্ব এক বলিয়া, বিশ্বের বহুধা প্রকাশের ও অভিব্যক্তির মধ্যে আপাতত বিরোধ ও বৈষম্য যাই থাকুক না কেন, মূলে একটা সমন্বয় এবং সামঞ্জস্য আছেই আছে। একান্ত ভাল বা একান্ত মন্দ, একান্ত পাপ বা একান্ত পুণ্য বলিয়া কোন কিছু নাই। এক ক্ষেত্রে যাহা ভাল অন্য ক্ষেত্রে তাহাই মন্দ। এক অবস্থায় ও এক অধিকারে যাহা পাপ, অন্য অধিকারে তাহা পাপ নহে। এ সকল কথা হিন্দু সাধনার গোড়ার কথা ; সুতরাং মানুষের চক্ষে ও মানুষের পক্ষে যাহা পাপ, দেবতার পক্ষে তাহা দোষাবহ হয় না। জগতের সকল কর্মের মূল কর্তা যখন ঈশ্বর, তখন সকল কর্মাকর্মই তাঁহার কৃত। তিনি আদি কারণ, তিনি অনাদি কারণ। তিনি সর্ব্ব-কারণ। কর্মাকর্ম, ধর্মাধর্ম, সকলেরই মূল ও কর্তা তিনি। এ অবস্থায় তিনি জীবের আদর্শ হইতে পারেন কি? ভগবানের অনুকরণ করিতে গেলে মানুষের ধর্মাধর্ম সকলই লোপ পায়। এইজন্য হিন্দু এমন কথা কখনও বলে না। হিন্দু ভগবানকেও যেমন আপনার জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে না, তার গুরুকেও সেইরূপ আদর্শরূপে ভাবে না। গুরুর উপদেশই মাত্র, তাঁর কর্ম অনুকরণীয় নহে। শিষ্যকে তার আপন অধিকার মতন তিনি চালাইয়া লইয়া যান, আর নিজে আপনার অধিকার মতন চলিয়া থাকেন। ভাগবতী তনু লাভ না করিলে কেহ সদ্‌গুরু হইতে পারেন না। আর যাঁরা ভাগবতী তনু লাভ করিয়া সংসারে ভগবানের লীলা-বিগ্রহরূপে বিচরণ করিয়া জীবকে ভগবানের দিকে লইয়া যান, স্বয়ং ভগবানের চরিত্র যেমন প্রাকৃতজনের অনুকরণীয় নহে, তাঁহাদের চরিত্রও সেইরূপ সাধারণের অনুকরণীয় হয় না। পুঁথির দণ্ড-আজ্ঞার মাপকাঠির দ্বারা এ সকল লোকোত্তর মহাপুরুষের চরিত্রের কালি করা যায় না। লৌকিক নীতির বন্ধনে তাঁরা আবদ্ধ নহেন, তাঁরা নিজেরাই এ সকল নীতির প্রতিষ্ঠা করেন। গুরুচরণে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁরা ভিতরে যে প্রেরণা প্রেরণ করেন, তাহার অনুগমন করাই শিষ্যের একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু ইংরেজি শিখিয়া আমাদের পক্ষে এরূপ বশ্যতা স্বীকার করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তারই জন্য আমরা গুরুচরিত্রের অনুকরণ করিতে যাইয়া পদে পদে ভগবদ্ধর্মের অনুসরণ করিয়া থাকি।

আমাদের সকলেরই এই দশা। হিন্দুয়ানী ও খৃষ্টিয়ানীর একটা অদ্ভুত মিশ্রণে আমাদের চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। অশ্বিনীকুমারের মধ্যে এই দুইটী ভাবই পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্যের দিক্ দিয়া তিনি প্রাচ্যকে দেখেন নাই, বা প্রাচ্যের দৃষ্টি দিয়া পাশ্চাত্যকে বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। ফলে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবের বিশিষ্ট প্রভাবই তাঁহার চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যামন্দিরে, বৃহৎবৃত্তের শিক্ষাগুরুরূপে, প্রচারকরূপে, শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের স্বত্বাধিকারের রক্ষীরূপে তাঁহার চরিত্রে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব দেখিতে পাই। অপর পক্ষে, বিশেষতঃ অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে ভগবানের নাম সংকীর্তনে, ভাগবত আবৃত্তিতে, এবং ভক্তিযোগ বা কর্মযোগের ব্যাখ্যানে—তাঁর চরিত্রে প্রাচ্য ভাবই যেন ফুটিয়া উঠে।

আর এই হিন্দুভাব লইয়াই আজ অশ্বিনীকুমার অনন্যলভ্য লোক-নায়কের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র একজন লোক-শিক্ষক এবং আধুনিক অর্থে নায়ক হইলে তাঁহার প্রতিপত্তি ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত। সে হিসাবেও তাঁর ভক্ত সংখ্যা কম নহে। প্রত্যুত, এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, অশিক্ষিত জনমণ্ডলীর চিত্তের উপরে তিনি যে ভক্তির আসন লাভ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাকে এতটা বড় করিয়া তুলিয়াছে।

(বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০)

আমার চোখে দেখা সোভিয়েট দেশ

ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

(৫)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যতক্ষণ আমরা হার্মিটেজের অভ্যন্তরে ছিলুম, অধ্যাপক নিকিটিন একমুহূর্ত্তও আমার কাছ থেকে সরে যান নি। তাঁর প্রতিটি কথায় প্রতিটি ব্যবহারে ভারতবর্ষের প্রতি কী অপরিসীম শ্রদ্ধা! পুরাতন ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, বেদ, উপনিষদ ও দর্শন এবং বর্ত্তমান ভারতবর্ষের গান্ধীজী আর নেহেরুজী—তাঁর মতে পৃথিবীর দুজন শ্রেষ্ঠ মানব, এ সব কিছুই, ভারতবর্ষকে করে তুলেছে তাঁর কাছে অপার্থিব মহিমাময়। সুতরাং ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানবার জন্য তাঁর কী অদম্য জিজ্ঞাসা! আমি যতই শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের কথা জানতে চাই, ততই তিনি সংক্ষেপে নিজেদের কথা সেরে কথার মোড় ঘুরিয়ে আবার ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর কথায় ফিরে আসেন, এমনি আমাদের সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও আগ্রহ তাঁর। হার্মিটেজের অসংখ্য কক্ষ হতে কক্ষান্তরে একরকম ছোড়দৌড় করে যখন বাইরে বেরিয়ে এলুম তখন ঘড়ীতে প্রায় দুটো বাজে। অধ্যাপক নিকিটিনের সঙ্গে নানাবিষয়ে আলোচনা করতে করতে আমি অন্যান্য সঙ্গীদের হতে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিলুম, তাই অধ্যাপক নিকিটিন নিজের গাড়ী করে আমাকে আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে তখনকার মত বিদায় নিলেন।

মধ্যাহ্নভোজ সারতে সারতেই বেলা অপরাহ্নে গড়িয়ে গেল। প্রায় সাড়ে তিনটায় আবার সদলবলে আমরা গিয়ে উঠলুম আমাদের জন্য দরজায় দাঁড়ানো বত্রিশ-সীটার কোচে। এবার কোন নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থল নেই, উদ্দেশ্য ঘুরে ঘুরে রাশিয়ার পুরাতন রাজধানী লেনিনগ্রাডের দ্রষ্টব্য-গুলি দেখা। মনে পড়ে ছেলেবেলা ভূগোলে পড়েছিলুম রুশ সাম্রাজ্যের রাজধানী, সেন্টপিটার্সবার্গ; প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে নাম হল পেট্রোগ্রাড, আবার কয়েক বছর পরে সেনায়ক বলে মহান্ সোভিয়েট নেতা লেনিনের নামে নাম রাখা হল লেনিনগ্রাড। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে যে শহরটি দুটবার নাম বদলালো, এ সেই লেনিনগ্রাড। এক কথায় অধ্যাপক তাই পরিহাসচ্ছলে বিদেশী কোন বন্ধুকে নাকি বলেছিলেন যে তাঁর জন্ম হয়েছিল সেন্ট্ পিটার্সবার্গে, তিনি যৌবনকাল কাটিয়েছেন পেট্রোগ্রাডে এবং প্রৌঢ় বয়সে কাজ করছেন লেনিনগ্রাডে।

বাল্টিক সাগরের উপকূলে প্রসিদ্ধ নেভা নদীর তীরে লেনিনগ্রাড অতি সুন্দর শহর। মস্কোর মত এত বড় নগরী না হলেও, বড় বড় রাস্তা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ঝকঝকে। নেভা নদী হতে অনেকগুলি খাল কেটে সমগ্র সহরটিকে যেন টুকরো টুকরো করে ভাগ করা হয়েছে—আর ঐগুলির উপরকার সুদৃশ্য সেতুগুলি তাদের একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত করেছে। আমাদের হোটেল হতে যাত্রা করে পর পর এরকম কয়েকটি সেতু পার হয়ে আমরা এসে পৌঁছালুম নেভা নদীর পারে। এক পাশে তারের ঐতিহাসিক আবাস ও অন্যান্য বড় বড় প্রাসাদোপম অট্টালিকা ঐগুলি অতিক্রম করে নদীর উপরকার দশম সেতুটি পার হয়ে আমরা গিয়ে পৌঁছলুম ওপারে। প্রথমেই দেখতে পেলুম দুর্গের আকারের একটি প্রকাণ্ড বাড়ী, যেখানে আগে সম্ভ্রান্তজনকে রাজনৈতিক বন্দীদের আটকে রাখা হত। এখন সে বন্দীশালার পরিবর্ত্তে সেখানে আছে একটি মিউজিয়ম। তারই একদিকে একটি প্রকাণ্ড গির্জ্জাঘর, তারমধ্যে আছে সেন্টপিটার ও পলের সমাধিস্থান। একটু এগিয়ে গেলেই নেভার মধ্যেকার ব্যাসিলোভ দ্বীপ।

তারপরই পরপর সাদা, সবুজ, হলদে ও লাল প্রভৃতি নানা রঙের অনেকগুলি বাড়ী ; এদের মধ্যেই প্রসিদ্ধ লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। বিভিন্ন রঙের ভবনগুলিতে বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির অধ্যাপনা হয়। এরই মধ্যে আইন ফ্যাকাল্টিতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট এর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত লেনিন ছিলেন এই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনতিদূরে বিভিন্না নদীর বুকে একদিকে স্থির হয়ে পড়ে আছে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রুশ বিপ্লবের প্রতীক অরোরা নামীয় ক্রুজারখানি। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর এ সুপ্রসিদ্ধ ক্রুজারখানির উপরই সর্বপ্রথমে সমাজবিপ্লবের পতাকা তোলা হয়। তারই স্মারকরূপে এখনো ঐ ক্রুজারখানিকে ঠিক চল্লিশ বছর আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনি রেখে দেওয়া হয়েছে, সেই চির অবিস্মরণীয় ঘটনাটিকে সকলের চোখের উপর তুলে ধরে।

ওপার হতে সেতু পার হয়ে আবার এপারে এলুম এবং বাসটি এসে দাঁড়াল অখারোহণে দণ্ডায়মান জার পিটার দি গ্রেটের দু-উচ্চ প্রস্তরমূর্তির কেীর নীচে। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারিন এ-মূর্তিটি তৈরী করিয়ে এখানে স্থাপন করেন। সেখান হতে আমরা এলুম সেনেট-স্কোয়ারে। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের চৌঠা ডিসেম্বর তৎকালীন জারের স্বৈর-শাসনের বিরুদ্ধে যে প্রথম গণ অভ্যুত্থান হয়, তারই স্মারক-রূপে বর্তমানে এর নতুন নামকরণ হয়েছে "ডিসেম্বর-স্কোয়ার।" এ স্কোয়ারটির একদিকে আছে বর্তমানে নৌবিভাগের অফিস এবং অপর পাশে আছে আইজাক ক্যাথিড্রেল এবং তৎসহ অষ্টাদশ শতাব্দীর সেনেট ও সাইনোড বা পরামর্শ সভা। তারই অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছে অশ্বপৃষ্ঠে জার প্রথম নিকোলাসের মূর্তিটি। ঘোড়াটি লাফ দিয়ে প্রায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পেছনের দুটি পায়ের উপর। অতিকায় জারের মূর্তিসহ ঘোড়ার এত ভারী ওজন কীভাবে, ঘোড়ার শুধু দুটি পায়ের খুরের উপর ন্যস্ত হয়ে আছে, তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এ মূর্তিটি তৎকালীন রুশীয় ভাস্কর্যের ঐৎকর্ষের একটি জাজ্বল্যমান নিদর্শন।

আবার বাসে চড়ে আমরা জারের শীতাবাসের সামনের প্যালেস-স্কোয়ারের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বিরাট প্রাসাদের সুদীর্ঘ স্তম্ভশ্রেণী দেখতে পেলুম। ঐগুলি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত এবং মাটি হতে ছাদ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু এবং প্রাসাদটি লম্বায় প্রায় দুহাজার ফুট। অতঃপর আমরা গিয়ে পৌঁছলুম ১৮১২ খৃষ্টাব্দে জেনারেল কুতো-জোভের নেতৃত্বে নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী জার আলেকজেণ্ডারের বিজয়-তোরণের নিকটে। এর পরে এসে আমরা নামলুম সুপ্রসিদ্ধ কাজানস্কি গীর্জার সম্মুখে। এ গীর্জার মধ্যেই জার দ্বিতীয় আলেকজেণ্ডার আততায়ীর হস্তে নিহত হন এবং এরই অভ্যন্তরে আছে দ্রষ্টব্য কুতুবনোভের সমাধি। তারপর আমরা দেখলুম আকাডেমী অব্ সায়েন্সের মিউজিয়ম দেখতে ; বিজ্ঞানীদের দেখবার এবং জানবার মত অনেক কিছুই আছে সযত্নে রক্ষিত সেখানে। সেখান হতে গেলুম মার্কেট হাউসে, লেনিন গ্রাডের সব চেয়ে বড় গ্রন্থাগার দেখতে, আমাদের কোলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীও তার কাছে লাইব্রেরী আখ্যার যোগ্যই নয়। তারপর অ্যাক্টোভস্কি স্কোয়ারে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নির্মিত সেণ্ট জোসির নাট্য-নিকেতন দেখলুম ; তারপর দেখলুম ম্যাক্সিম গোর্কি নাট্যভবনটি। লেনিনগ্রাডে নাকি বর্তমানে এরকম চৌদ্দটি বড় বড় থিয়েটার গৃহ, ৭৮টি মিউজিয়ম, ১০০টি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং ৪৯টি বড় বড় স্পোর্টস কেন্দ্র আছে।

এরপর স্ট্যালিন ষ্ট্রীট দিয়ে যেতে যেতে আমরা লেনিন গ্রাডের বিখ্যাত টেক্‌নোলোজিক্যাল ইনষ্টিটিউটটি দেখতে পেলুম। তারপর ট্রেড ইউনিয়ন ক্লাব ও একটি জুতোর কারখানায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল। এ পর্যন্ত এসেই হ'ল পুরাতন লেনিনগ্রাডের সীমা শেষ এবং নতুন অংশ নিউমস্কো নামক অংশের আরম্ভ। সম্প্রতি এখানে একটি সুবৃহৎ পার্ক তৈরী হয়েছে এবং ১৯৪৫ ইংরেজীতে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে বিজয়ের স্মারকরূপে এর নামকরণ হয়েছে বিজয়-পার্ক (Park of Victory)। তারপরেই গণ-অভ্যুত্থান পার্ক, তারই এক পার্শ্বে যে গৃহের বারান্দায় দাঁড়িয়ে লেনিন ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেছিলেন, তাই দেখে পরলোকগত সোভিয়েট নেতার

প্রতি সন্ধ্যে মাথা নীচু করে শ্রদ্ধা নিবেদন করলুম। সেখান হতে আবার এসে পড়লুম নেভা নদীর তীরে, যেখান হতে আবার বিপ্লবের স্মারকচিহ্ন অরোরাকে দেখতে পাওয়া যায়।

সে রাত্রিতে লেনিনগ্রাড যাত্রা হতে সুরু করে সেদিন অপরাহ্ণ ৬টা পর্যন্ত একটানা আমরা ট্রেনে, পায়ে হেঁটে বা বাসে, চলেছি ও চলেছিই মাত্র দশমিনিটের জন্যও বিশ্রামের অবসর ছিল না। সুতরাং চলতে চলতে হাত-পা এবং দেখতে দেখতে চোখ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমাদের মধ্যে ডাচ্ প্রতিনিধিরই অবস্থা হয়েছিল সকলের চেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক। আমাদের অনেকেরই যখন চলন্ত বাসে ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে মাথা মাঝে মাঝে আপনি নুয়ে পড়ছিল তখন হঠাৎ কে একজন আবিষ্কার করেন যে ঐ ডাচ্ বন্ধুটী মুখে প্রজ্বালিত সিগারেট নিয়ে নিমীলিত নেত্রে কেমন দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন, সোজা বসে বসে! বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে আমাদের সকলেরই স্বীকার করতে হ'ল যে এরূপ অবস্থানে নিদ্রা প্রকৃই কৃতিত্বের পরিচায়ক। কে একজন, খানিকক্ষণ হাসাহাসির পর, তাকে স্পর্শ করা মাত্র ঘুম ত ভাঙলোই না কিন্তু সিগারেটটি আপনি খসে পড়ে গেল ওঁষ্ঠাধরের পাশ হতে। ভাগ্যিস্ কাপড়ে পড়েনি! কিন্তু তখনো তাঁর নাকডাকা একই তালে ও ছন্দে সমান ভাবেই চলছে।

আমরা অতঃপর ফিনল্যাণ্ড (রেলওয়ে) স্টেশনের পাশ দিয়ে, তার সম্মুখস্থ লেনিনের প্রস্তরমূর্তির সম্মুখে শ্রদ্ধা নিবেদন করে যখন আমাদের অ্যাস্টোরিয়া হোটেলে ফিরে এলুম, তখন প্রায় সাতটা বাজে। মুখহাত ধুয়ে প্রায় ঘণ্টা খানেকের জন্যই নিজের কামরায় চেয়ারে বসে একটু বিশ্রাম করা গেল। রাত্রি আটটায় গেলুম লেনিনগ্রাডের গ্রান্ড অপেরার ব্যালে দেখতে। আরব্যোপন্যাসের কোন গল্প অবলম্বনে রচিত ব্যালের উপাখ্যান দেখতে দেখতে ক্লান্ত চোখে যেন মনে হচ্ছিল, স্থান-কাল-পাত্র সব কিছুরই অতীত হয়ে হঠাৎ আমি গিয়ে পৌঁছেছি মধ্যপ্রাচ্যের কোন এক যাদুপুরীতে। প্রাচ্য পোষাকে, প্রাচ্য দৃশ্যপটে, প্রাচ্য ভাব-ভঙ্গীর ব্যঞ্জনাময় সে ব্যালে নৃত্য অপূর্ব ও অবিস্মরণীয়। রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারোটায় যখন ব্যালে শেষ হয়ে গেল, তখন আমরা ক্লান্তদেহে ফিরলুম হোটেলে। তারপর সেই দৈনন্দিন মামুলী ঘটনা দীর্ঘনৈশভোজ, স্নান ও শয্যাগ্রহণ করে গভীর প্রসুপ্তির কোলে আত্মসমর্পণ। চব্বিশঘণ্টার চেয়েও বেশীকাল অহোরাত্র কীর্তনের পর কয়েকঘণ্টা ঘুমের পর পরদিন ভোরবেলা মনে হ'ল যেন আমার নতুন স্নায়ু ও নতুন উদ্যম ফিরে পেলুম।

১১ই তারিখ প্রাতরাশের পর আমরা নিজেদের পছন্দ ও রুচিঅনুযায়ী ভাগ হয়ে গেলুম বিভিন্ন দলে। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ শারীর বিজ্ঞানীদের অন্যতম ঋষি প্যাভ্‌লোভের স্থান এই লেনিনগ্রাডে। আমাদের দেশে ধর্মকামীরা যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিয়ে নানা তীর্থস্থান যেমন কাশী, বৃন্দাবন বা শ্রীক্ষেত্রে যান, আমিও বহুদিন ধরে সেই তীর্থযাত্রীর নিষ্ঠা নিয়ে প্রতীক্ষা করছিলুম আমাদের কাছে এরূপ তীর্থস্থান প্যাভ্‌লোভ গবেষণা মন্দিরটি দেখবার জন্য। এতদিন পরে আমার সে বাসনা পূর্ণ করা চাই, তাই অন্যান্য জৈব বিজ্ঞানীদের নিয়ে প্রথমেই গেলুম লেনিনগ্রাডোস্থিত প্যাভ্‌লভের ছোট ল্যাবরেটরীতে। এখানে ঘণ্টাখানেক ছিলুম, তারপর অধ্যক্ষ বীকোফ আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন প্যাভ্‌লভের মূল গবেষণাগার কোলটুশিতে, লেনিনগ্রাড হতে প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরে একটি গ্রামে। কয়েক মাইল পথ পাঁচ বাঁধানো পাকা রাস্তা, তাই ছেড়ে আমরা শেষে গিয়ে পড়লুম পাথর আর বালিতে তৈরী মোটে রাস্তায়। তাই গিয়ে শেষ হয়েছে, প্রকাণ্ড একটি দীঘি পার হয়ে তরুছায়ায় ঘেরা প্যাভ্‌লোভের নিজস্ব দোতলা ছোট বাড়ীটিতে। তারই সম্মুখে তাঁর একটি দীর্ঘ প্রস্তরমূর্তি আর তাঁর পায়ের কাছে তাঁর প্রিয় কুকুরটি। মহাভারতের একলব্যেরই মত প্রিয় গুরুর পদে মস্তক নত করলুম, দীর্ঘপথ অতিক্রম করে তীর্থযাত্রী যেমন ঠাকুরের কাছে মাথা নত করে তেমনি নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে। তারপর তাঁর বাসভবনে প্রবেশ করে আমরা দেখতে পেলুম অতি সযত্নে জাতীয় সম্পত্তিরূপে সযত্নে রক্ষিত তাঁর ব্যবহৃত, টেবিল-চেয়ার, দোয়াত-কলম, পোষাক-পরিচ্ছদ, শয্যা, আর তাঁর চিরকালের সহায় সাইকেলটি পর্যন্ত। তিনি

দীর্ঘায়ু ছিলেন ; জার-শাসিত দেশে বিজ্ঞানীর জীবন আরম্ভ করে তিনি সোভিয়েট আমল পর্যন্ত বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধনা করে গেছেন, এত বড় রুশ সাম্রাজ্যের পতন, বিপ্লব ও সোভিয়েটের অভ্যুত্থান—সব কিছু উপেক্ষা ক'রে। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তাঁকে, বাড়ী, গাড়ী, অনেক কিছুই দিতে চাইলেও তিনি সেগুলি প্রত্যাখ্যান করেছেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এবং ছিয়াশি বছর বয়সে মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত ঐ একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য বাহন সাইকেলে চড়েই ঘুরে বেড়িয়েছেন, কোলটুসির সর্বত্র এবং সেখান হতে লেনিনগ্রাডের ল্যাবরেটরীতে এবং আবার ফিরে এসেছেন দিনান্তে নিজের আবাসগৃহে। কী অদ্ভুত একনিষ্ঠ ও অনাড়ম্বর জীবন! রুশদেশে তেমনি ছিলেন আর একজন মনীষী ঋষি টলস্টয়। পরবর্তীকালে ঐ বাসগৃহের চারদিকে একটির পর একটি গবেষণাগারের জন্য গৃহ তৈরী হয়ে আজ তা একটি বিরাট ও শ্রেষ্ঠ গবেষণাগারে পরিণত হয়েছে এবং পৃথিবীর নানাদেশ হতে পুণ্যার্থীর মত বিজ্ঞানীরা আসে এখানে তীর্থযাত্রায়। অধ্যাপক বীকোফ আমাদের সঙ্গে নিয়ে অনেক কিছু দেখালেন, অনেক কিছু আলোচনা হ'ল, কিন্তু ডিনটা যখন বেজে গেল, তখনো মনে হ'ল কিছুই দেখলুম না। সুতরাং পরদিন আবার আসবো ব'লে সেদিনের মত ধন্যবাদের সঙ্গে বিদায় নিলুম।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় অতীত হয়ে গেছলো, এবং আমরা কোলটুসির তীর্থযাত্রী কজনই সে সময়ে অনুপস্থিত ছিলুম। তাই সে অপরাহ্নে নামমাত্র ভোজনপর্বের পরিবর্তে অতি সংক্ষিপ্তভাবে অল্প সময়ের মধ্যেও খাওয়া সেরে নিতে হল, কেননা, তখনই যেতে হবে জারের গ্রীষ্মাবাস পিটারহফ্ দেখতে। আমাদের অন্যান্য সঙ্গীরা আগেই রওয়ানা হয়ে গেছেন, কেবল আমরাই বাকী! আহার শেষ করে লাউঞ্জে গিয়ে দেখি অধ্যাপক নিকিটিন অপেক্ষা করছেন, আমার জন্য এবং বলেন "আপনি আসুন আমার গাড়ীতে—ওঁদের জন্য এখুনি বাস ফিরে আসবে।" তাঁর আতিথেয়তার সাড়া দিতে ইচ্ছা হলেও, শিবাসেবী, কুমারী ঘং প্রভৃতির দিকে তাকিয়ে বলুম "ধন্যবাদ, গাড়ী এলে আমরা একসঙ্গেই যাবো কেননা, আপনার গাড়ীতে ত সকলের স্থান হবে না।" কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাস এসে হাজির হ'ল ; আমরা তাতেই উঠে বসলুম, আর বেচারা অধ্যাপক নিকিটিনের গাড়ী তারই সঙ্গে সঙ্গে পিটার হফের দিকে এগিয়ে চলো। বাস থেকে নামতে না নামতে অধ্যাপক নিকিটিন আবার আমার কাছে ছুটে এলেন, তাঁর এত শ্রদ্ধার দেশ ভারতবর্ষের একজন ব'লে আমার কাছে। যতক্ষণ আমরা পিটার হফে ছিলুম একমুহূর্তের জন্যও তিনি আমার সঙ্গ-ছাড়া হ'লেন।

প্রায় ছোটখাটো একটি শহরের মত স্থান জুড়ে প্রাক্তন রুশসম্রাটদের গ্রীষ্মাবাস, এ পিটার-হফটি। একদিকে ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের দূরবিসর্পী নীলাম্বুরাশি, আর একদিকে কতকটা উঁচু ভূমির উপর জারদের বিলাস-ঐশ্বর্যের লীলানিকেতন স্বর্ণাভ গ্রীষ্মাবাসটি। সামনে কৃত্রিম জলাশয়, তার মাঝে স্বর্ণাভ নানা ধাতু নির্মিত মূর্তি। সবকটির মধ্যেই ফোয়ারার উৎস। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে নাৎসী সৈন্যেরা লেনিনগ্রাডের এ অংশ অধিকার করে, এ প্রাসাদেই তাদের ছাউনী করেছিল, কিন্তু যখন তারা প্রতি-আক্রমণে তা ছেড়ে যেতে বাধ্য হ'ল তখনই একে তোপের মুখে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। তারই ফলে প্রাসাদটির বহু অংশ ধ্বংস হয় এবং মূর্তিগুলিও বহুলাংশে নষ্ট হয়। সে শুধু প্রাসাদটিকে আবার মেরামত করে নেওয়া হচ্ছে এবং এখনো তা শূন্যভাবেই পড়ে আছে। প্রাসাদের চার-দিকে বিরাট বাগান, কোথাও সুবিস্তৃত তরুর শ্রেণী, কোথাও শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজানো মর্মর বা পাথরের মূর্তি, অনেকগুলিই আদিম পুরুষ আদাম ও প্রথম নারী ইভের চুম্বনরত মূর্তি। তা ছাড়া, যেখানে সেখানে ফোয়ারা আর ফোয়ারা, সংখ্যায় নাকি এক হাজারেরও উপর। কোথাও জল ভূবক্ষীর ভিতর হতে আগুনের ফুলঝুরি যে ভাবে উপরে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তেমনি ছড়িয়ে পড়ছে কোথাও বা স্তম্ভের মত জলের স্রোত অনেকটা উপরে উঠে আবার চারদিকে অসংখ্য জলবিন্দু ছড়িয়ে নীচে নেমে আসছে। কোথাও বা গোল ছাতার মত ঘরের চারদিকে যেমন বৃষ্টি পড়ে তেমনি হঠাৎ বৃষ্টির জল যেন ঘরে পড়ছে এমনি

ফোয়ারা। আমরা কয়েকজন গিয়ে ছাতার নীচে বসলুম, আরো ক'জন সেখানে যেতে যেতে হঠাৎ ফোয়ারার স্রোত ঘরে পড়ে তাদের একেবারে ভিজিয়ে দিলে। কোথাও বা মনের উপর বেড়াচ্ছি, এমনি সময় হঠাৎ মাটি হতে অদৃশ্য অসংখ্য ফোয়ারা উঠে আমাদের সকলকে একেবারে ভিজিয়ে দিয়ে গেল। যারা সিক্তস্নান তারা খুসী, আর যারা দেখলো তারা খুসীতে হাত-তালি দিয়ে উঠলো। বলা বাহুল্য আমাদের মধ্যে এমন খুবই কম ছিলেন যারা এভাবে অদৃশ্য ফোয়ারার দৌরাত্ম্যে সেদিন নাজেহাল অর্থাৎ ভিজে বেহালটির অবস্থা লাভ করেন নি। হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ, কী মজা, যেন একপাল শিশু গিয়ে জড় হয়েছে নতুন মজার আশায়।

এককোণে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলাধূলোর স্থান। সেখানে কয়েকটি দোলনা আছে। সঙ্গীসাথীরা সবাই নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার মনের শিশুটির হঠাৎ দোলনায় চড়ার সখ হ'ল, অমনি একটিতে উঠে বসলুম, কিন্তু দোল দেয় কে? কয়েক মিনিট এদিক-ওদিকে তাকাচ্ছিলুম, হঠাৎ কে একজন এসে পেছন হতে ঠেলে দিলে, ফিরে তাকিয়ে দেখি আমাদেরই সঙ্গিনী আর্মান ভাষার ইন্টারপ্রিটার তরুণী তানিয়া। অনেকদিনই এক-সঙ্গে নানাস্থানে যাওয়া আসা করেছি, কিন্তু সে ইংরেজী জানে না, সুতরাং একে অন্যকে জানলেও ভাষার অভাবে কথাবার্তা হয়নি। সে অপরাহ্ণে কিন্তু ভাষার ব্যবধান ঘুচে গেল, কেন না ক্রীড়ার সাথী শিশুদের মধ্যে ভাষার অভাবে খেলার কোন ব্যাঘাত হয় না। আমাদেরও হ'ল তাই, সে প্রথমে আমাকে দোল দিতে লাগলো, আর আমিও "পাসিভো" বলে দোল খেতে লাগলুম। খানিকক্ষণ পরে আমি নেমে এসে তাকে দোলনা ছেড়ে দিয়ে দোল দিতে লাগলুম, আর সেও "পাসিভো" বলে খুসীতে উদ্ভাসিত হয়ে দোল নিতে লাগলো। হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ খুসীকে হাসি কিংবা পরস্পরে খুসীতে ভরপুর চোখের ও ঠোঁটের কোণে 'দে-দোলের' নিঃশব্দ হাসি ও ভাষার অপেক্ষা রাখে না। মন যখন অজানাতে শিশুত্বে ফিরে যায়, তখন নির্বাক ভাষাই হয় মুখর। আমাদেরও সেদিন হয়েছিল তাই। পালা করে দু'জন দু'জনকে দোল দিচ্ছি ও খাচ্ছি, এমনি সময় কোথায় বৃদ্ধা একটি মহিলা এসে তিরস্কারের সুরে কী বলেন, মনে হল যেন বলছেন "তোমরা ত আর কচি খোকা-খুকী নও, তবে কেন দোল খাচ্ছ এখানে, এটা শিশুদের জন্য।" একটু অপ্রস্তুত ভাবে তানিয়া রুশ ভাষায় বলে "বিজ্ঞান-অ্যাকাডেমীর ইতিয়ান ডেলিগ্যাট" কাণে ও কথাগুলি বুঝতে পারলুম। 'ডেলিগ্যাট!' তাতে আবার বিজ্ঞান-অ্যাকাডেমীর, শুনেই যেন সাপের মাথায় লাঠি পড়লো। বৃদ্ধা মহিলাটিই অপ্রস্তুত ভাবে আমাদিগকে হাত বাড়িয়ে মোলায়েম সুরে কিছু বল্লেন। আমিও করমর্দন করতে করতে "পাসিভো" বলে জবাব দিলুম। তৎক্ষণে আবার অন্যান্য সঙ্গীরা সমুদ্রতীরের দিকে যে ছোট মিউজিয়মটি আছে তার উদ্দেশ্যে সেদিকে আসাতে আমরা দু'জনে আবার হাসতে হাসতে করমর্দন ক'রে তাদের দলে ভিড়ে গেলুম।

মিউজিয়মটিতে কিছু কিছু পুরাতন ছবি আছে। তাদের আক্রমণে বেগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আবার তাদের পুনরুদ্ধারের কাজ পুরোদমে চলছে। মিউজিয়মটি দেখে আমরা তার বারান্দায় বসে কফি-টা পান করলুম। তারপর গেলুম অদূরবর্তী ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের তীরে। অপরাহ্ণে একদিকে অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য—আর বিপরীতদিকে গভীর নীলজলে ঝিক্‌মিক করছে তার রক্তিম ও সোনালী আলো, সে এক মহিমাময় দৃশ্য! আর উপসাগরে সাঁতার কাটছে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে, ঠিক যেন নীলসরোবরে রাজহংস-হংসী! কয়েকদিন আগে মস্কোতে বলশোই থিয়েটারে দেখা ব্যালে নৃত্য 'সোয়ান-লেকে'এর কথা মনে পড়ে গেল। কেউবা সাঁতার কাটছে, কেউবা জলে গলা ডুবিয়ে বসে আছে, কেউবা সৈকতে গড়াগড়ি যাচ্ছে স্নানের পোষাকে, কেউবা কাপড় পাল্টে স্নানের শেষে, কেউবা চুল আঁচড়াচ্ছে —আর কোথাও বা স্তূপীকৃতভাবে রেখা-হোয়া পড়ে আছে স্নানার্থীদের পোষাক-আশাক। সেদিন গরমও ছিল খুব, আর বেলায় ঘামও হ'চ্ছিল। আমাদেরও মনে হচ্ছিল কাপড় ছেড়ে সমুদ্রের নীলজলে ঝাঁপিয়ে পড়ি, কেননা একই সঙ্গে মনে পড়ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা—

"যদি গহন কাটিতে চাও এসো নেমে এসো হেথা
গহন-তলে।
নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এসো আজ
ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীলজলে।
সোহাগ তরঙ্গরাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি
উচ্ছ্বসি পড়িবে আসি উরসে গলে।"

কিন্তু মনের বাসনা মনেই চেপে রাখতে হ'ল, কারণ ওদিক থেকে তাড়া আসছে এখুনি হোটেলে ফিরে যেতে হবে, কেননা রাত্রি আটটায় সমাগত বিজ্ঞানী অতিথিদের সম্বর্ধনার জন্য নৈশভোজনে যোগ দিতে হবে।

হোটেলেরই বিরাট ভোজনাগারে অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সের সাড়ম্বর ভোজ। আমরা নিমন্ত্রিত সকলেই উপস্থিত, শুধু জাপানের ডক্টর ফুজিয়াকো ছাড়া; কোথায় যে তিনি উধাও হয়ে গেছেন, কেউ বলতে পারে না। কেউ বলছেন পিটার-হফ থেকে ফিরে এসেছেন, কেউ বলছেন, না। ডিরেক্টার বীকোফই প্রথমে অভ্যাগতদের সম্বর্ধনা জানিয়ে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন, অ্যাকাডেমীর পক্ষ হতে। সেদিন রাত্রিতে দারুণ গরম, প্রায় আমাদের দেশে এপ্রিলের প্রথম ভাগে যেমন হয় তেমনি। আমাদেরই গরমে গলদ্ঘর্ম; আর ঐ দেশের লোকদের ত কথাই নেই। কে একজন গরমে অতিষ্ঠ হয়ে কোটটি খুলে ফেলবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন দাঁড়িয়ে—আর অমনি সকলেরই কোট খুলে চেয়ারের পেছনে ঝুলিয়ে রাখার ব্যস্ততা পড়ে গেল। একটা কোটও কারো গায়ে রইলো না। কোন আনুষ্ঠানিক ভোজনে এরূপ দৃশ্য অচিন্ত্য ও অভাবনীয়। কিন্তু এ ত আর সভ্যতানুগতিকতার গণ্ডীতে আবদ্ধ ইংলণ্ড নয়, যে পান থেকে চুন খসে পড়লে ভদ্রমহিলারা মূর্ছা যাবেন আর ভদ্রলোকেরা একেবারে 'থ' বনে যাবেন! এ যে সোভিয়েট দেশ, সকল কনভেনশনের ঊর্ধ্বে! যে কজন ভদ্রমহিলা ছিলেন টেবিলে, এতগুলি দেশী ও বিদেশী পুরুষের এরকম অসামাজিক ব্যবহারে তাঁরা যে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হয়েছেন, তার কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না, তাদের চোখ কিংবা মুখের ভাব দেখে।

বীকোফের সম্বর্ধনার টোস্টের প্রত্যুত্তরে আরম্ভ হল ভিন্ন ভিন্ন দেশের পক্ষে বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা-সহ প্রতিটোস্ট্। আমার পূর্ববর্তী বক্তা হিসেবে নরওয়ের লুণ্ডবি তাঁর দেশের পক্ষ থেকে মামুলী বন্ধুত্বাদ দিয়ে টোস্ট প্রস্তাব করলেন, অধ্যাপক অ্যাকাডেমিশিয়ান নিকিটিনের স্বাস্থ্য কামনা করে। বলা বাহুল্য ক্রমাগত দু'দিন এক সঙ্গে থেকে তাঁর চরিত্র-মাধুর্যে এবং ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধার জন্য আমারও ইচ্ছা ছিল, ঠিক ঐ ভাবেই টোস্ট প্রস্তাব করার, কিন্তু লুণ্ডবি যেন মন্ত্রবলে আমার মনের কথাটি চেনে নিয়ে যখন ঐভাবে টোস্ট প্রস্তাব করে বসলেন তখন আমি বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গেলুম। তারপরই আমার পালা; আমি আমার মাতৃভাষায় ভারতবর্ষের পক্ষ হতে টোস্ট প্রস্তাব করতে উঠে বললুম, "আপনাদের শীত প্রধান দেশে এই যে অস্বাভাবিক গরম আজ আপনারা অনুভব কচ্ছেন, তা আমরাই ভারতবর্ষ থেকে আপনাদের জন্য ভারতবাসীদের হৃদয়ের উষ্ণতারূপে বহন করে এনেছি—আজকের তাপমাত্রা তারই পরিচিতি। আমি তাই আজ আমাদের আমন্ত্রণ-কারী এদেশীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর এই টোস্ট প্রস্তাব কচ্ছি যে পৃথিবীর সকল দেশের এবং বিশেষতঃ সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের হৃদ্যতা প্রতিদিন গাঢ় হতে গাঢ়তর হোক্!" আমার পাশীয় গ্লাসের সঙ্গে ঠোকাঠুকির হিড়িকের মাঝে হঠাৎ ফুজিয়াকোর হাতের পাত্রও এগিয়ে এ'ল, আর দেখলুম হাসীন্ মেলায় চুর হয়ে জড়িত কণ্ঠে তিনি বলছেন, "যেতে বলেছ, ভাই, আমারও শুভেচ্ছা নাও।" এভাবেই সে রাত্রিতে প্রায় বারোটায় বিশেষ ভোজ পর্বটি শেষ হ'ল।

১২ই জুলাই ভোরবেলা প্রাতরাশের পর গেলুম প্রথমেই লেনিনগ্রাডের বিখ্যাত ক্যান্সার হাসপাতালটি দেখতে। অধ্যাপক ডিরেক্টার স্লানিয়ান আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখালেন। হাসপাতালের বাড়ীটি বহু পুরাতন কিন্তু বর্তমান যুগের সকল রকমের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে সেখানে, যার ফলে রোগ হ'ব হ'ব সময়েই ধরা পড়ে এবং মারাত্মক হওয়ার আগেই উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থার ফলে অনেকগুলোই

আরোগ্য হয়। তারপর আমার গেলুম কোলটুশিতে, আগের দিনের অসমাপ্ত দ্রষ্টব্যগুলি দেখে ও জেনে নিতে। ওখানকার বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে গেলেন আমাকে দ্বিতীয় দিন সেখানে যেতে দেখে এবং বল্লেন যে অনেক বিজ্ঞানী যারা আসেন, তারা একদিন কয়েক ঘণ্টার দর্শন শেষ করে চলে যান, এরকম বার বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে ও জানতে খুবই কম আসেন কেউ। আমি তার উত্তরে হেসে বল্লুম, "আমি ত আমেরিকার দর্শক নই, আমি জিজ্ঞাসু জ্ঞানার্থী একজন শারীর-বিজ্ঞানের ছাত্র, সুতরাং আমার কথা ভিন্ন।" সেদিনও প্রায় সন্ধ্যে পর্যন্ত সেখানে ছিলুম, আর মধ্যাহ্ন ভোজনটা সেরে নিয়েছিলুম সেখানেই, তাঁদের অনুরোধে তাঁদের সঙ্গে অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে।

সন্ধ্যের সময় হোটেলে ফিরবার পথে লেনিনগ্রাডের সদ্য প্রস্তুত কয়েকটি মেট্রো স্টেশান দেখে এলুম। মস্কোর মতই, তেমনি মনোরম ও সুন্দর, কিন্তু সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে ব'লে এখনো বেশীদূর প্রসারিত হয়নি। হোটেলে ফিরে এসে সম্মুখস্থ পার্কটিতে কিছুক্ষণ ঘুরে রাত্রি প্রায় আটটায় নৈশ ভোজ শেষ করে নিতে হল, কেননা রাত্রি সাড়ে দশটার ট্রেণে মস্কো ফিরে যেতে হবে, তাই ভোজন পর্বও সংক্ষিপ্ত হ'ল।

রাত্রি দশটায় মস্কো স্টেশনে এলুম। অ্যাকাডেমীর সভ্য সভ্যারা প্রায় সকলেই বিদায়-সম্ভাষণের জন্য সমাগত। সকলের সঙ্গেই করমর্দনের সঙ্গে আন্তরিকতাময় করমর্দন। ওদিকে ঢং ঢং করে ট্রেণ ছাড়বার ঘণ্টা পড়লো, তখনো আমি অধ্যাপক নিকিটিনের হাতে হাত চেপে দাঁড়িয়ে, কারণ দু'জনেরই মন আসন্ন বিয়োগ ব্যাপারে উদ্বেল। হঠাৎ নিকিটিন হাত ছেড়ে আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন, আর আমি তাঁকে তেমনি আন্তরিকতার সঙ্গে খাঁটি ভারতীয় পদ্ধতিতে জড়িয়ে ধরলুম; একই সঙ্গে দু'জনের মুখে উচ্চারিত হ'ল, "দাস্ বিদানিয়া।"

শিশু শিক্ষা　　—ভগিনী নিবেদিতা

"কিণ্ডার গার্টেন কথাটির অর্থ ছোট ছোট ছেলেদের বাগান। আজ এই সুন্দর কথাটি ভারতের সর্বত্র পরিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে-সভ্য হইতে এই প্রথাটির জন্ম হইয়াছে, তাহার সহিত এদেশের লোকের পরিচয় তত গভীর বা ব্যাপক নহে; কিংবা উহার অন্তর্নিহিত তথ্যটি শিক্ষাব্রতীদের অনেকেই ঠিকমত বুঝিতে পারেন নাই। আদর্শ শিশু-উদ্যান বাড়িতেই রচনা করিতে পারা যায় এবং এই উদ্যানের মালী হইবেন—মা। কিশোর মনের বিকাশ সম্বন্ধে যদি সকল মায়েরা সচেতন হইতে পারেন এবং তাঁহাদের এই পুষ্প-উদ্যানটির পরিপূর্ণ ব্যবহার কি উপায়ে করিতে পারা যায় যদি তাঁহারা জানেন, তাহা হইলে শৈশবে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিদ্যানিকেতন আর কিছু হইতে পারে না। ছেলেকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য মায়ের স্নেহমমতাপূর্ণ পরিবেশ যেমন হিতকর ও কার্যকরী, তেমন আর কিছুই নহে। বিদ্যালয়ের নিয়ম ও শৃঙ্খলার কঠিন নিগড়ে যদি শিশুর মনকে বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে, তাহার মনের বিকাশ স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত হইতে পারে না—শিক্ষকের বিশুষ্ক জ্ঞান তাহার সুকুমার চিত্তকে সরস করিয়া তুলিতে পারে না। এক্ষেত্রে মায়ের কোলে বসিয়া শিক্ষালাভই প্রকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু সেই মা-কে সর্বাগ্রে প্রকৃত শিক্ষক হইতে হইবে, তাহা নহিলে উদ্যান রচনায় তাঁহার উদ্যম সার্থক হইবে না। কিণ্ডার-গার্টেনের আসল কথা হইল—মায়ের থাকিবে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষকের মত প্রখর বোধ আর শিক্ষকের থাকিবে মায়ের মতন স্নেহমমতাপূর্ণ একটি অন্তঃকরণ।　　—('নিবেদিতা নৈবেদ্য'—মণি বাগচি)

ভারতের পাঁচটি তৈলবীজ

অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

ভারতের নানা স্থানে তৈলবীজের চাষ দেখা যায়। তৈলবীজের ব্যবহারও ভারতে কম নহে। ঐ সমস্ত তৈলবীজের মধ্যে পাঁচটি অন্যতম। ঐ পাঁচটি তৈলবীজ বলিতে চীনাবাদাম, রেড়ীবীজ, তিল, সরিষা এবং তিসি তৈলবীজগুলিকে বুঝায়। প্রায় সকল প্রকার তৈলবীজ হইতে তৈল নিষ্পেষিত হয়। পূর্বে ভারত হইতে তৈলবীজ বিদেশে রপ্তানি হইত এবং ভারত উহার পরিবর্তে অধিক মূল্যে ঐ সকল বীজের তৈল আমদানী করিত। শুধু তাহাই নয়, তৈলবীজ হইতে তৈল নিষ্পেষণের পর যে খইল থাকিয়া যায়, উহা আমদানীকারী দেশগুলি ভোগ করিত। ঐ খইল সার হিসাবে অথবা গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে ভারতের নানা স্থানে শিল্প-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে। শিল্প-কারখানাগুলি নানা ধরণের। ঐ সমস্ত শিল্প-কারখানায় নানাপ্রকার সামগ্রী প্রস্তুত হয়। ভারতের নানা স্থানে তৈলবীজ হইতে তৈল-প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল কারখানায় যে সমস্ত তৈল প্রস্তুত হয়, উহাদের মধ্যে কতকগুলি মানুষ খাদ্য-হিসাবে ব্যবহার করে; অপরগুলি নানাবিধ শিল্প-সামগ্রী প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। এমন কতকগুলি আছে, যেগুলি দিয়া দীপ প্রজ্বলিত হয়। রেড়ীর তৈল প্রদীপে এখনও ব্যবহৃত হয়। সংশোধিত রেড়ীর তৈল ঔষধ-হিসাবে এবং কেশ-তৈল-হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া ঐসমস্ত তৈলবীজ হইতে তৈল-নিষ্পেষণের পর, যে খইল পড়িয়া থাকে, উহা কৃষি জমিতে সার-হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। সরিষার খইল গবাদি পশুর খাদ্য। উহাতে দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, ভারতে গবাদি পশুর সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে উহাদের সংখ্যা প্রায় ১৫৯ কোটি ছিল। ইহা সত্য যে, পাশ্চাত্য দেশের মত ভারতে গবাদি পশু বাণিজ্যিক হিসাবে পালিত হয় না। তথাপি গবাদি পশুর আদর আছে। কেননা ভারতবাসী মাত্রেরই শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্যন্ত, দুধ প্রিয় খাদ্য। সমস্যার বিষয় এই যে, দুধের উৎপাদন কম এবং উহার মূল্য এত মহার্ঘ যে, ভারতের সকল অধিবাসীই প্রত্যহ দুধ খায় না। ভারতে চারণভূমির অভাব। খড়, খইল এবং ভুষি ইত্যাদি সামগ্রী গবাদি পশুর খাদ্য। এই সমস্ত সামগ্রী অধিক পরিমাণে খাইতে পাইলে গবাদি পশুর দুধ অধিক হয়। যাহা হউক, তৈলবীজ হইতে যে খইল পাওয়া যায় উহার দ্বারা একদিকে কৃষি-কার্যের এবং অপর দিকে গবাদি পশু পালনের সুবিধা হয়। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক-প্রথায় কৃষিজ তৈল হইতে ভেজিটেবল ঘী প্রস্তুত হয়। উহা আমাদের খাদ্য। সুতরাং তৈলবীজের বাজার নানাদিকে সম্প্রসারিত রহিয়াছে।

ভৌগোলিক অবস্থা অনুযায়ী তৈলবীজের কৃষিজমি ও উহার উৎপাদন বিভিন্ন রাজ্যে পৃথক। একপ্রকার তৈলবীজ পৃথক পৃথক রাজ্যে বিভিন্ন অনুপাতে যেমন উৎপাদিত হয়, তেমন পাঁচ প্রকার তৈলবীজ একই রাজ্যে সমপরিমাণে জন্মায় না। যে সকল ভৌগোলিক অবস্থায় ঐ পাঁচ প্রকার তৈলবীজ সহজেই উৎপন্ন হয়, ঐ সমস্ত অবস্থা সকল রাজ্যে একরূপ নহে। পরিবেশ বিভিন্ন ও আনুষঙ্গিক অবস্থা স্বতন্ত্র বলিয়া, উহাদের চাষাবাদের মধ্যে বেশ একটা প্রভেদ দেখা যায়। বিভিন্ন রাজ্যে কি পরিমাণে জমিতে ঐ পাঁচ প্রকার তৈলবীজের চাষ হয় এবং উহাদের প্রত্যেকের উৎপাদন কতটা, উহার আলোচনা পরে করা হইল। প্রথমে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে ঐ পাঁচ প্রকার তৈলবীজের আবাদী জমি এবং বাৎসরিক উৎপাদন কি পরিমাণ হয়, উহাদের সংখ্যাতথ্য নিম্নে দেওয়া হইল।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে পাঁচটি প্রধান তৈলবীজ (১৯৫৫-৫৬)

তৈলবীজ	জমির পরিমাণ (হাজার একর)	পাঁচ প্রকার তৈলবীজের মোট জমির শতকরা কত	উৎপাদন (হাজার টন)	পাঁচ প্রকার তৈলবীজ উৎপাদনের শতকরা কত
চীনাবাদাম	১২,৫৮৩·৬	৪২·৭		৩৭·৯
রেড়ী বীজ	১,৪৬১·২	৪·৯		২·৩
তিল	৫,৭৩৭·৬	১৯·৪	৪৫৮·২	৮·২
সরিষা	৬,২৬১·৬	২১·৩	৮৩৩·২	১৪·৮
তিসি	৩,৪২৪·৩	১১·৬	৩৭৭·৩	৬·৮
মোট	২৯,৪৬৯·৯	১০০·০	৫,৫২৮·৮	১০০·০

উপরি-উক্ত সংখ্যাতথ্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তৈলবীজের জমিতে চীনাবাদামের চাষ হয়, অপরাপর পাঁচটি তৈলবীজের তুলনায় উহার উৎপাদন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পাঁচ প্রকার বিশেষ তৈল-বীজের মধ্যে চীনাবাদামের পর চাষ এবং উৎপাদনে সরিষা দ্বিতীয়। সরিষার চাষ যে পরিমাণ জমিতে সাধিত হয়, উহা চীনাবাদামের জমির তুলনায় অর্দ্ধেক। উৎপাদনে সরিষা চীনাবাদামের এক-পঞ্চমাংশ। উহার পর তিল ও তিসির জমি ও উৎপাদন ক্রমান্বয়ে স্থান পায়। রেড়ীবীজ উৎপাদনে ভারতের স্থান সামান্য। পাঁচটি প্রধান তৈলবীজের মধ্যে চীনাবাদাম, সরিষা এবং তিল হইতে যে তিন প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, উহা মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া ঐ সমস্ত তৈল হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভেজিটেবল ঘৃত প্রস্তুত হয়। অনেক সময় এই সকল তৈল জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রেড়ীর তৈল অপরিশোধিত অবস্থায় জ্বালানি-হিসাবে এবং পরিশোধিত রেড়ীর তৈল কেশতৈল ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তিসি হইতে যে তৈল পাওয়া যায়, উহার দ্বারা রং প্রস্তুত হয়। যাহা হউক, তৈলবীজ হইতে যে কয় প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, উহাদের বাজার বেশ লাভজনক। ইহা ছাড়া পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উহাদের খইল জমিতে সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পাঁচটি তৈলবীজ (১৯৫৫-৫৬)

(হাজার)

রাজ্যসমূহ বা অঞ্চলগুলি	চীনাবাদাম জমি (একর)	চীনাবাদাম উৎপাদন (টন)	রেড়ীবীজ জমি (একর)	রেড়ীবীজ উৎপাদন (টন)	তিল জমি (একর)	তিল উৎপাদন (টন)	সরিষা জমি (একর)	সরিষা উৎপাদন (টন)
অন্ধ্র	৩০৪০	১০৮৪	৮৮৬	৬২	৩৭৪	৫১		
আসাম	—	—	৪	·৫	১৯	৪		
বিহার	—	—	২৯		৪৪	৫		
বোম্বাই			৩১৪		৭৩৯	৫১		
জম্মু ও কাশ্মীর	—	—	—		—			
কেরালা	৩৭		·৩		৪৭			

রাজ্যসমূহ বা অঞ্চলগুলি	চীনাবাদাম		রেড়ীবীজ		তিল		সরিষা		তিসি	
	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)
মধ্য প্রদেশ	১৪৪	১৬৮	২০	৩	১১০৬	৯৮	৩৩৪	৫৭	১২৯০	১২৪
মাদ্রাজ	১৭৭২	৮১৯	৩৪		৩৭৪	৪৭			০৪	০১
মহীশূর	২০৫১	৫৯৭	১১৭	৯	২২০	১৭			১১৬	৮
উড়িষ্যা	৬১		৫৩	৪	২৫৩				২৬	২০৪
পাঞ্জাব	১৩৪		—	—	৬৫				২৮	২
রাজস্থান	১০৪		৩		৯৮২				১৬৭	২৪
উত্তর প্রদেশ	২৮৩		৫		১১৯৭				৮১৪	
পশ্চিমবঙ্গ	—	—	—		১১				৯০	
দিল্লী			—	—	—	—			—	—
হিমাচল প্রদেশ			—			০২			২	
ত্রিপুরা	—	—	—	—		০৪			—	—

উপরিলিখিত সংখ্যা-তথ্য হইতে বুঝা যায় যে, চীনাবাদামের চাষ আসাম, বিহার, জম্মু ও কাশ্মীর, এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যগুলিতে এবং দিল্লী ও ত্রিপুরা অঞ্চলে হয় না। জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যগুলিতে এবং দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা—কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলগুলিতে রেড়ী বীজের চাষ নাই। জম্মু ও কাশ্মীর এবং দিল্লী ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যগুলিতে তিলের চাষ হয়। এতদ্ব্যতীত সরিষার চাষ প্রায় সমস্ত রাজ্যেই অল্প-বিস্তর দেখা যায়। তিসির চাষ কেরালা, দিল্লী এবং ত্রিপুরা অঞ্চলে হয় না। এস্থলে মনে রাখা উচিত যে, ঐ পাঁচ প্রকার তৈলবীজের চাষ সকল রাজ্যে সম-পরিমাণ জমিতে দেখা যায় না। জমির আয়তন এবং তৈলবীজের উৎপাদন অনুযায়ী তৈলবীজ চাষের রাজ্যগুলি লইয়া তিনটি বিশেষ গণ্ডীতে ভারতকে বিভক্ত করা চলে। ঐ তিনপ্রকার গণ্ডী বলিতে (১) মুখ্য, (২) মধ্যম এবং (৩) সামান্য নামক অঞ্চলগুলিকে বুঝায়। সুতরাং প্রত্যেক বীজের তিনটি তৈলবীজের জমি অঞ্চল এবং অপর তিনটি তৈলবীজের উৎপাদন অঞ্চল।

(৩) চীনাবাদাম

কৃষি জমির গণ্ডী	রাজ্যসমূহ	উৎপাদন-গণ্ডী	রাজ্যসমূহ
মুখ্য (দশলক্ষ একর অপেক্ষা অধিক)	বোম্বাই অন্ধ্র মহীশূর মাদ্রাজ	মুখ্য (দশলক্ষ টনের অধিক)	১। অন্ধ্র ২। বোম্বাই
মধ্যম (এক লক্ষ একর হইতে দশলক্ষ একর)	মধ্যপ্রদেশ উত্তর প্রদেশ পাঞ্জাব রাজস্থান	মধ্যম (একলক্ষ টন হইতে দশলক্ষ টন)	মাদ্রাজ মহীশূর মধ্যপ্রদেশ উত্তর প্রদেশ

(ক) চীনাবাদাম

উড়িষ্যা	১। পাঞ্জাব
কেরালা	২। রাজস্থান
হিমাচল প্রদেশ	৩। উড়িষ্যা
	৪। কেরালা
	৫। হিমাচল প্রদেশ

উপরি-লিখিত গণ্ডীগুলি হইতে অনুমান করা যায় যে, মধ্যম বারিপাত সমেত উর্ব্বর দোআঁশ জমিতে চীনাবাদামের চাষ ভালই হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে উহার উৎপাদন ব্যাহত হয়। মধ্যম বৃষ্টিপাতে এবং সত্বর জল-নিকাশের সুযোগ থাকিলে ইহার চাষ বেশ ভালই হয়। ভারতের দাক্ষিণাত্যের পুরোভাগে ইহার চাষ অধিক জমিতে হয়। জমির আয়তনে এবং বাদামের উৎপাদনে অন্ধ্র এবং বোম্বাই রাজ্যদ্বয়ের স্থান সর্ব্বোচ্চে। ঐ মধ্য অঞ্চল হইতে যতই প্রান্তদেশের সীমারেখার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, উহার চাষ ততই কম দেখা যায়।

(খ) রেড়ীবীজ

কৃষি-জমির গণ্ডী	রাজ্যসমূহ	উৎপাদন-গণ্ডী	রাজ্যসমূহ
মুখ্য	১। অন্ধ্র	মুখ্য	অন্ধ্র
(একলক্ষ একরের অধিক)	২। বোম্বাই	(পঞ্চাশ হাজার টনের অধিক)	
	৩। মহীশূর		
মধ্যম	উড়িষ্যা	মধ্যম	বোম্বাই
(১০ হাজার একর হইতে	মাদ্রাজ	(পাঁচ হাজার টন হইতে	মহীশূর
১লক্ষ একর)	বিহার	পঞ্চাশ হাজার টন)	মাদ্রাজ
	মধ্যপ্রদেশ		বিহার
	উত্তর প্রদেশ	সামান্য	উড়িষ্যা
	আসাম	(৫ হাজার টনের কম)	২। মধ্যপ্রদেশ
	রাজস্থান		৩। উত্তর প্রদেশ
	কেরালা		৪। আসাম
			রাজস্থান
			কেরালা

রেড়ী চাষের জমির আয়তন হিসাবে বোম্বাই, মহীশূর, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশ রাজ্যগুলির স্থান নিতান্ত কম নহে। কিন্তু ঐ সকল রাজ্যে রেড়ী বীজের উৎপাদন ১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে বেশ কম হয়। আকস্মিক আবহাওয়া, স্থানীয় বারিপাতের তারতম্যে উৎপাদন ব্যাহত হয়। ইহা সত্য যে, একর পিছু রেড়ীবীজ উৎপাদন সকল রাজ্যে সমান নহে। জমির উর্ব্বরতা বাড়াইয়া আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে চাষ করিলে, মোট উৎপাদন আশানুরূপ হইবে বলিয়া বিশ্বাস। রেড়ীবীজ এবং চীনা-বাদাম এই দুই তৈলবীজের কৃষিজমি এবং উৎপাদন-গণ্ডী হইতে বুঝা যায় যে, দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণমৃত্তিকা এবং লোহিত-মৃত্তিকা অঞ্চলে ঐ দুই তৈলবীজের চাষের আধিক্য দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যে ঐরূপ মৃত্তিকা প্রাচীনকালীন কঠিন শিলাখণ্ড ক্ষয়ীকরণের ফলে উৎপন্ন হয়।

(গ) তিল

কৃষি-জমির গণ্ডী	রাজ্যসমূহ	উৎপাদন-গণ্ডী	রাজ্যসমূহ
মুখ্য	১। উত্তর প্রদেশ	মুখ্য	মধ্যপ্রদেশ
(দশ লক্ষ একরের অধিক)	২। মধ্যপ্রদেশ	(পঞ্চাশ হাজার টন)	২। রাজস্থান
	৩। রাজস্থান		৩। উত্তর প্রদেশ
	৪। বোম্বাই		৪। বোম্বাই
	৫। অন্ধ্র		৫। অন্ধ্র
মধ্যম	মাদ্রাজ	মধ্যম	মাদ্রাজ
(একলক্ষ একর হইতে	উড়িষ্যা	(দশ হাজার টন হইতে	উড়িষ্যা
পাঁচলক্ষ একর)	৩। মহীশূর	পঞ্চাশ হাজার টন)	৩। মহীশূর
সামান্য	পাঞ্জাব	সামান্য	কেরালা
(একলক্ষ একরের কম)	কেরালা	(দশ হাজার টনের কম)	বিহার
	৩। বিহার		আসাম
	৪। আসাম		পাঞ্জাব
	৫। পশ্চিমবঙ্গ		পশ্চিমবঙ্গ
	৬। ত্রিপুরা		ত্রিপুরা
	৭। হিমাচল প্রদেশ		হিমাচল প্রদেশ

দক্ষিণাত্যের পুরোভাগে অবস্থ অন্ধ্র-সহেত এবং গাঙ্গেয় প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে তিলের চাষ অধিক জমিতে দেখা যায়। প্রজাতন্ত্রের মধ্যাঞ্চল হইতে সীমারেখার দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, উহার চাষ ততই কম হয়। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমার্ধে কতক জমিতে তিল উৎপন্ন হয়। ঐ অংশে লালমাটি এবং মাঝামাঝি বৃষ্টিপাত তিল-চাষের সহায়ক। পশ্চিমবঙ্গে বর্দ্ধমান বিভাগের পশ্চিমাংশ ছোট-নাগপুর মালভূমির পরিক্ষেপ মাত্র। ঐ অঞ্চলের মৃত্তিকা কঠিন স্ফটিক শিলার রূপান্তর।

(ঘ) সরিষা

কৃষি-জমির গণ্ডী	রাজ্যসমূহ	উৎপাদন-গণ্ডী	
মুখ্য	উত্তর প্রদেশ	মুখ্য	
(দশ লক্ষ একরের অধিক)		(দুইলক্ষ টনের অধিক)	
মধ্যম	পাঞ্জাব	মধ্যম	পাঞ্জাব
(একলক্ষ একর হইতে	রাজস্থান	(কুড়ি হাজার টন হইতে	রাজস্থান
দশ লক্ষ একর)	মধ্যপ্রদেশ	দুই লক্ষ টন)	মধ্যপ্রদেশ
	আসাম		আসাম
	পশ্চিমবঙ্গ		পশ্চিমবঙ্গ
	বিহার		বিহার
	উড়িষ্যা		উড়িষ্যা

সামান্ত		বোম্বাই
(একলক্ষ একরের কম)		জম্মু ও কাশ্মীর
	৩।	মহীশূর
	৪।	ত্রিপুরা
	৫।	হিমাচল প্রদেশ
	৬।	অন্ধ্র, মাদ্রাজ, দিল্লী
	৭।	কেরালা

	বোম্বাই
	জম্মু ও কাশ্মীর
	ত্রিপুরা
	মহীশূর
	হিমাচল প্রদেশ
	মাদ্রাজ
	অন্ধ্র, কেরালা, দিল্লী

সরিষার কৃষি-জমিতে ও উৎপাদনে ভারতের মধ্যে উত্তর প্রদেশই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সরিষার চাষে পাঞ্জাবের প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে এবং দাক্ষিণাত্যের পুরোভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জমি নিয়োজিত হয়। ঐ সরিষা অঞ্চলটি উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, এবং মধ্যপ্রদেশ লইয়া গঠিত। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যা—এই চারি রাজ্য লইয়া সরিষা চাষের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ-অঞ্চলটি গঠিত। এই চারি রাজ্য প্রজাতন্ত্রের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। ঐ পূর্ব্বভাগটি ব্রহ্মপুত্র গঙ্গা এবং মহানদী কর্ত্তৃক বিধৌত। সরিষা চাষে ভারতের উত্তরার্ধ অগ্রণী। দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণাংশে এবং উত্তর ভারতের উত্তরাংশে সরিষার চাষ স্বল্প এবং উৎপাদনও যৎসামান্ত।

(৬) তিসি

কৃষি-জমির গণ্ডী	রাজ্যসমূহ	উৎপাদন গণ্ডী
মুখ্য	১। মধ্যপ্রদেশ	মুখ্য
(পাঁচলক্ষ একরের অধিক)	২। উত্তর প্রদেশ	(একলক্ষ টনের অধিক)
	৩। বোম্বাই	
মধ্যম	বিহার	মধ্যম
(একলক্ষ একর হইতে	রাজস্থান	(দুই হাজার হইতে একলক্ষ টন) ২। বিহার
পাঁচলক্ষ একর)	মহীশূর	৩। রাজস্থান
সামান্ত	পশ্চিমবঙ্গ	সামান্ত ১। পশ্চিমবঙ্গ
(একলক্ষ একরের কম)	অন্ধ্র	(দুই হাজার টনের কম) ২। মহীশূর
	পাঞ্জাব	৩। অন্ধ্র
	উড়িষ্যা	৪। উড়িষ্যা
	জম্মু ও কাশ্মীর	৫ পাঞ্জাব,
	আসাম	জম্মু ও কাশ্মীর
	হিমাচল প্রদেশ	আসাম
	মাদ্রাজ	হিমাচল প্রদেশ
		মাদ্রাজ

মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ এবং বোম্বাই রাজ্যত্রয় লইয়া তিসি চাষের শ্রেষ্ঠ অঞ্চলটি গঠিত। দ্বিতীয় অঞ্চলটি বিহার, রাজস্থান এবং মহীশূর রাজ্যত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য মহীশূর রাজ্যে তিসি-উৎপাদন যৎসামান্ত। যাহা হউক, তিসি-চাষে অধিক জমি নিয়োজিত হয়—বিন্ধ্য-কাইমুর নামক পর্ব্বতশ্রেণীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত রাজ্য-

গুলিতে। মোটকথা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের মধ্যাঞ্চলে অর্থাৎ পশ্চিমে বোম্বাই রাজ্য ও উত্তর প্রদেশ হইতে পূর্ব্ব দিকে মধ্যপ্রদেশ ও বিহার রাজ্যের পর্য্যন্ত অধিক জমিতে তিসির চাষ দেখা যায়। ঐ অঞ্চলটি রাজ্যের উপত্যকার পশ্চিমাংশ এবং দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তরাংশ লইয়া গঠিত। ঐ মধ্যাংশ হইতে যতই সীমাঞ্চলে পৌঁছান যায়, তিসির চাষ ততই কম হয়। তিসি চাষ এবং উৎপাদনে আসাম, হিমাচল প্রদেশ এবং মাদ্রাজ রাজ্যগুলি সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকার করে।

উপসংহারে বলা যায় যে, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ এবং বোম্বাই রাজ্যগুলিতে ভারতের পাঁচটি প্রধান তৈলবীজের চাষ অধিক জমিতে পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন দোঁয়াশ পলল এবং কঠিন স্ফটিক শিলা-ক্ষয়ীভূত মৃত্তিকায় উহাদের চাষ অতি সহজে এবং সুচারুরূপে সম্ভব। সাধারণতঃ ঐরূপ মৃত্তিকা অধিক দিন পর্য্যন্ত আর্দ্র থাকে। ঐ রাজ্যগুলিতে বার্ষিক তাপের অন্তর বেশ উচ্চ। বারিপাত স্থানবিশেষে মধ্যম। অনেকস্থলে বারিপাত সামান্য, কিন্তু বাতাস আর্দ্র। ভারতে ঐ মধ্যাঞ্চলে ঐ পাঁচটি তৈলবীজের উৎপাদনও সর্ব্বোচ্চ। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, উচ্চ বারিপাত অঞ্চলে এবং কাদামাটিতে তৈলবীজের চাষ কম হয়। ঐরূপ অঞ্চলে তৈলবীজের উৎপাদন যৎসামান্য। ভারতে তৈলবীজ হইতে তৈল-উৎপাদনের কারখানার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। স্বাধীনতা পাইবার পূর্ব্বে ভারতকে তৈলবীজ রপ্তানি করিতে হইত এবং বিনিময়ে উচ্চমূল্যে ঐ সকল তৈলবীজের তৈল আমদানী করিতে হইত। বর্ত্তমানে প্রায় সকল রাজ্যেই তৈলবীজ হইতে তৈল-নিষ্পেষণের ব্যবস্থা আধুনিক ধরণের হইয়াছে। অতীতে এই শিল্পটি কুটীরশিল্পের অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমানে বিদ্যুৎ-উৎপাদন সম্প্রসারণে, শিল্পটি মধ্যম শ্রমশিল্পে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতে ভারতে রেড়ীর তৈলের ব্যবহার আলানি-হিসাবে রহিয়াছে। বর্ত্তমানে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রেড়ীর তৈল আলানি-হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ আজকাল রেড়ীর তৈল পরিশোধন করিয়া কেশ-তৈল এবং ঔষধ হিসাবে অধিক ব্যবহৃত হয়। তিসির তৈল দিয়া রং প্রস্তুত হয়। সরিষা, তিল এবং চীনাবাদাম হইতে যে তৈল পাওয়া যায়, উহা মানুষের খাদ্য। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক প্রথায় ঐ সমস্ত তৈলবীজের তৈল হইতে ভেজিটেবল ঘৃত অধিক প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া তিল ও চীনাবাদাম দিয়া নানা সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত হয়। তৈলবীজ হইতে যে খইল পাওয়া যায়, ঐগুলি পশুখাদ্য এবং জমির সার হিসাবে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তৈলবীজের বাজার ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে। ঐ পাঁচটি তৈলবীজ ও উহাদের আনুসঙ্গিক সামগ্রীগুলি আভ্যন্তরিক ও বহির্বাজারে সর্ব্বসময় সমাদৃত। বর্ত্তমানে ঐ পাঁচটি তৈলবীজ, উহাদের তৈল এবং খইল ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়। রপ্তানি পণ্যদ্রব্য হিসাবে উহাদের প্রাধান্যলাভ মানে ভারতে বৈদেশিক অর্থাগমের সুযোগলাভ। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এইরূপ পণ্যে দেশের অধিক উন্নতি। ভারতে এই পাঁচটি তৈলবীজের চাষ ও উৎপাদন যেমন বৃদ্ধিলাভ করিতেছে, তেমন ঐগুলি হইতে তৈল প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য শিল্প-কারখানার উন্নয়ন হইতেছে। জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে, ঐরূপ শিল্প-কারখানার প্রসার আরও সহজ হইবে বলিয়া বিশ্বাস। তৈলবীজের কৃষি ও শ্রমশিল্প ভারতে আর্থিক অবস্থা শ্রীসম্পন্ন করিবে।

স্মৃতিকণা

(শরৎচন্দ্র)

যোগেশচন্দ্র মজুমদার

(২)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রথম দিনের পরিচয়েই শরৎচন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, প'রে তাঁহার সঙ্গ-লাভের স্পৃহা বাড়িয়া গেল। মাতুলদের নিকট হইতে তাঁহার তদানীন্তন জীবন সম্বন্ধে জানিতে পারিলাম। তিনি কলেজ ছাড়িয়াছেন, F. A. পরীক্ষা তাঁহার দেওয়া হয় নাই এবং বাড়ীতে বসিয়াই পড়াশোনা করেন। কাজকর্ম্ম জোগাড় করিতে পারেন নাই—সেই কারণে কোন কাজকর্ম্মও করেন না। রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁহার পুত্র কুমার সতীশচন্দ্র আদমপুর ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তথায় তিনি মাঝে মাঝে অভিনয়াদি করিয়া থাকেন। শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ, তিনিও ওই ক্লাবের সভ্য ও একজন প্রকৃষ্ট অভিনেতা।

শরৎচন্দ্রের মাতুলালয়েই তাঁহার সহিত দেখা হইত। মাতুলদিগের নিকট হইতেই জানিতে পারিলাম তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে সাহিত্যচর্চ্চা করেন। তাঁহার গল্প, প্রবন্ধ ও উপন্যাস যে খাতাগুলিতে লেখা ছিল তাহা নিতান্ত অন্তরঙ্গ ব্যতীত কেহ জানিত না বা দেখিতে পাইত না।

একখানি উপন্যাসের নাম ছিল "অভিমান", অপরটি "ভুতুড়ে"। ছোট গল্পগুলি একটি স্বতন্ত্র খাতায় লেখা ছিল। "অভিমান" উপন্যাসটি দেখিতে পাই নাই, বাকী খাতাগুলি সতীশ ও আমার দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত আর একটি উপন্যাসের কথা স্মরণ হইতেছে, উপন্যাসটির নাম যতদূর মনে হইতেছে "কোরেল" ছিল। ইহার পাণ্ডুলিপি আমি দেখি নাই। গিরীন্দ্রনাথ আমাকে বলিয়াছিলেন, Marie Corelliর একটি প্রসিদ্ধ উপন্যাসের ছায়া এই কোরেল উপন্যাসে আসিয়া পড়িয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়িল। একদিন একটি সন্দেশের খাতার মলাটে শরৎচন্দ্রের ইংরাজী নাম দেখিলাম, খাতায় লেখা ছিল St. Clare Loura—সেই যুগে অনেকের ইংরাজী কায়দায় নাম লিখিবার ইচ্ছা দেখা যাইত, যেমন অতুল লিখিল O'Toole, অনিল O'Neil. হরিশ Harris, ডয়াল Doyle, চাটার্জ্জি Chathar ইত্যাদি; ভাবিয়াছিলাম, সম্ভবতঃ শরৎচন্দ্রও ইংরাজী কায়দায় নামের পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন। পরে অবশ্য সে ভুল ভাঙ্গিয়াছিল, উহা শরৎচন্দ্রের ডাক নামের ইংরাজী রূপ।

ইহার কয়েক মাস পরেই একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আমরা মর্ম্মাহত হইয়া পড়ি। মাত্র একদিন রোগ ভোগ করিয়া সহপাঠী সতীশচন্দ্র ৩রশে মার্চ্চ ১৮৯৯ সালে, ষোল বৎসর বয়সে আমাদের ছাড়িয়া যান। সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে আমার বাম পায়ে অস্ত্রোপচার হইয়াছিল—তাহাতে আমাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হয়। কোনও সংবাদ পাই নাই এবং সেই কারণে শেষ সময় উপস্থিত হইতে পারি নাই; আজও এই কথা দুঃখের সহিত স্মরণ ক'রে।

স্কুলের নিম্নশ্রেণী হইতে সতীশচন্দ্রকে সহপাঠীরূপে পাই, সেই সময় তিনিই আমার সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। সেই অল্প বয়সেই তাঁহার মার্জ্জিত রুচি, শান্ত স্বভাব, বিশেষ করিয়া অপূর্ব্ব সাহিত্য-প্রীতি তাঁহার প্রতি আমাকে বিশেষ আকৃষ্ট করে। পরস্পরের বাড়ী কাছা-কাছি থাকায় বন্ধুত্ব গভীর হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। পরস্পরের দেখা-শোনা, যাওয়া—আমার উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য চর্চ্চা। সাহিত্য লইয়া উভয়ের মধ্যে নানা

প্রকার আলোচনা হইত। তাঁহার পরলোক গমনের মাস দুই পূর্বে আমাদের ভিতর "বঙ্গ সাময়িক পত্র" সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছিল, প্রবন্ধাকারে তাহারই একটি খসড়া করিয়া আনিয়াছেন। প্রবন্ধটি দুইজন মিলিয়া সম্পূর্ণ করিয়া "সময়" নামক সাপ্তাহিক পত্রে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। মনে মনে জানিতাম উহা অবিলম্বে বেরুবে আসিবে।

তখন মাত্র চারিটি সাপ্তাহিক পত্রের প্রকাশ ছিল: বঙ্গবাসী, হিতবাদী, সঞ্জীবনী ও সময়। বসুমতীর আবির্ভাব তখনও হয় নাই। দৈনিক বাংলা কাগজের তখন অস্তিত্ব ছিল না। সাপ্তাহিকগুলি বেশ বৃহৎ আকারের হইত। আমাদের সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৯ উত্তরের স্বাক্ষর লইয়া প্রকাশিত হইল। সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় মাত্র একস্থানে একটি শব্দের পরিবর্তন করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি পড়িয়া বন্ধুবান্ধবগণ বিশেষ করিয়া শরৎচন্দ্রের দুই মাতুল কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে প্রবন্ধটি আমরা লিখিয়াছি। শরৎচন্দ্রও সম্ভবতঃ উহা দেখিয়া থাকিবেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল কোনও বয়োজ্যেষ্ঠ সাহিত্যিককে ধরিয়া ওই প্রবন্ধটি লিখাইয়া লইয়া নিজেদের নামে উহা প্রকাশ করিয়াছি। এই ধারণা এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছিল যে পরেও তাহা দূর করিতে পারি নাই।

এই ঘটনার কাছাকাছি সময়ে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তাঁহার খুল্লতাত রামচরণ ঘোষ মহাশয় ভাগলপুরে থাকিতেন, ভাগলপুরে তিনি দেওঘর হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে আসেন। বারীন্দ্রকুমারের নিকট জানিতে পারি যে প্রবিহবল সাহিত্যিক ও দেশপ্রেমিক সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় তাঁহার শিক্ষক ছিলেন। বারীন্দ্রকুমার ও তাঁহার দুই একজন সহপাঠী দেউস্কর মহাশয়ের শিক্ষাগুণে স্বদেশ সেবাব্রত গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ উন্মুখ হন। বারীন্দ্রকুমার তখন হইতেই সাহিত্য চর্চা করিতেন—তাঁহার স্বরচিত কবিতার খাতা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন; কবিতাগুলির অধিকাংশই মাতৃভূমির উদ্দেশে লিখিত। তিনি উচ্চাসভরে কবিতাগুলি পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তাঁহার সহিত আলাপে জানিতে পারি যে তিনি কবিতা ছাড়াও গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতিও রচনা করিয়া থাকেন। তিনি প্রায় এক সপ্তাহ কাল ভাগলপুরে ছিলেন এই সময় প্রায় প্রত্যহই তাঁহার সহিত সাহিত্যালোচনা হইত।

এখানে সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। হস্তলিখিত "ছায়া" নামক মাসিক পত্রিকাখানি যাহাতে শরৎচন্দ্র রচিত নানা প্রবন্ধ ও গল্প সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়া খ্যাতিলাভ করে তাহা সতীশচন্দ্রের স্মৃতির সহিত গ্রথিত। পত্রিকাখানির "ছায়া" নাম দিবার একটু পূর্ব-ইতিহাস আছে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বারীন্দ্রকুমার ভাগলপুর ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই সতীশ ও আমার মধ্যে একটি হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা বাহির করিবার সঙ্কল্প জাগিয়া উঠে। সে সময়ে বাংলাদেশে মাত্র একখানি হস্তলিখিত পত্রিকা ছিল। পত্রিকাখানির নাম ছিল "উৎসাহ"। উহা রাজসাহী হইতে প্রকাশিত হইত, সুরেশচন্দ্র সাহা মহাশয় সম্পাদক ছিলেন। লেখকদের মধ্যে ছিলেন অক্ষয়কুমার মৈত্র, তলধর সেন, কবি রজনীকান্ত সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি প্রবিহবল সাহিত্যিকবৃন্দ। পত্রিকাখানির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ পাঠে জানিতে পারি। উত্তরকালে এই পত্রিকাটি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতাও ইহাতে প্রকাশিত হইত, মনে পড়িতেছে।

সতীশচন্দ্র একখানি খাতা মাসিক পত্রিকা আকারে বাঁধাইয়া তাহার প্রচ্ছদপটে "আলোক" নাম দিয়া আনিয়াছিলেন। সম্পাদকের স্থানে আমাদের যুগ্ম নাম ছিল।

খাতাখানি দেখাইয়া বলিলেন ইহার শূন্য পাতাগুলি ভরাইয়া তুলিতে হইবে। সাহিত্যরসিক বন্ধুবান্ধবদের উৎসাহ পাইলে পত্রিকাখানি স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিবে এইরূপ আশাই সুদৃঢ় ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। "আলোক" আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। এক পক্ষ কালের মধ্যেই সতীশচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। অল্প বয়স হইতেই তাঁহার যেরূপ সাহিত্য প্রতিভা দেখিয়াছিলাম

মনে হয় অল্প সময়েই তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন। তাঁহার পিতা জন্মক্ষণ মিত্র সতীশের বাল্যকালে রচিত কয়েকটি কবিতা মুদ্রিত করিয়া তাঁহার শেষ আশোকচিহ্নসহ বন্ধুবর্গকে দিয়াছিলেন। কবিতাগুলির মধ্যে প্রথম কবিতাটি সনেট—তাহা মানব জীবনের নশ্বরতা লইয়া রচিত। দুই বন্ধুতে কয়দিন পূর্বে ভাগলপুরের উপকণ্ঠে ইংরাজদের সমাধিভূমি দেখিতে গিয়াছিলাম। সতীশচন্দ্র সেই উপলক্ষে কবিতাটি রচনা করেন। তিনি যে কবিতা রচনা করিতে পারেন তাহা পূর্বে জানি নাই। উক্ত সনেটটি পড়িয়া পরে মনে হইয়াছিল শেলী যেমন তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্বে To The Night কবিতাটিতে নিজের বিদায়ক্ষণের আভাস ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সতীশচন্দ্রও হয়ত কোনও ইঙ্গিত পাইয়া অনুরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

সতীশচন্দ্রের অকাল বিয়োগের পর তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য আমরা ব্যস্ত হইয়া পড়ি। গিরীন্দ্রনাথ সতীশচন্দ্রের অভীপ্সিত মাসিক পত্রিকাখানি "ছায়া" নাম দিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করেন। তাঁহার ও আমার যুগ্ম চেষ্টায় "ছায়া" প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৩০৭ সালের ১১ই বৈশাখ। পত্রিকাটি প্রকাশ হইবার পর শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের সাহিত্য সভা পাকাপাকি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ২০শে শ্রাবণ ১৩০৭। এই সভার একটি অধিবেশনে আমার বহু আপত্তি সত্ত্বেও স্থিরীকৃত হয় যে "ছায়া"র সম্পাদনার কার্য্য আমাকেই করিতে হইবে। লেখা বাছাই ও সম্পাদনার অপ্রিয় কার্য্য করিতে মন সদাই বিমুখ হইত—কিন্তু কোন উপায়ও ছিল না। এই সময় হইতেই শরৎচন্দ্রের নিকট হইতে "ক্রিটিক" আখ্যাটি লাভ করি। তাঁহার কয়েকটি গল্প ও প্রবন্ধ "ছায়াতে" প্রকাশিত হয়। তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি; বতদূর মনে পড়ে, একখানি ছোট উপন্যাসও ("আলো-ছায়া"?) প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার বহুদিন আগে রচিত কয়েকটি লেখা এই সময় আমাদের খুবই কাজে লাগিয়াছিল।

অল্পকালের মধ্যেই "ছায়া" ভাগলপুরের সাহিত্যিক মহলে বেশ সাড়া জাগাইয়া তুলে ও সুখ্যাতি অর্জন করিতে সমর্থ হয়। ইহার কিছু পরে কলিকাতা (ভবানীপুর) হইতে সতীর্থ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অনুরূপ একটি পত্রিকা "তরণী" নাম দিয়া বাহির করেন। উভয় পত্রিকার ডাকযোগে আদান প্রদান হইত।

অনুরূপা দেবীর পিতা মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হাতে একবার "ছায়া"র কোনও একটি সংখ্যা পড়ে, তিনি পত্রিকাটির প্রশংসা করিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, একটি কবিতায় "অশ্রুজল" এই বাক্যটি দেখিয়া মন্তব্য করেন—"অশ্রু" কথাটিই যথেষ্ট "অশ্রুজল" কেন?

শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের যে সাহিত্য সভাটি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার অধিবেশনের কোনও নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। কাহারও বাটীতে ইহার অধিবেশন হইবার সুযোগ ছিল না, কারণ অভিভাবক ও গুরুজনদিগের কঠিন মন্তব্য শুনিবার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। বিদ্যালয়ের পরীক্ষার পড়া ছাড়িয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের চর্চ্চা, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনা, সে সময় গুরুতর অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইত! ইংরাজী ভাষাকে তাঁহারা বরং সুনজরে দেখিতেন—বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনার প্রতি তাঁহারা বিমুখ ছিলেন এবং তাহা আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। কেবল অভিভাবক ও গুরুজনদের কথা উল্লেখ করিলে ভুল বলা হইবে, আমাদের অনেক সহপাঠীরাও ইহা লইয়া বিদ্রূপ করিতে ছাড়িতেন না। পথে ঘাটে এইরূপ বন্ধু-বান্ধবদের সহিত দেখা হইলে তাঁহারা স্নেহ মিশ্রিত কণ্ঠে আমাদের "বৈষ্ণব" বলিয়া সম্বোধন করিতেন—আমাদের রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ ব্যঙ্গোক্তি বর্ষিত হইত।

শরৎচন্দ্র যদিও তাঁহার বাল্য-স্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে সাহিত্য-সভা সপ্তাহে একবার করিয়া বসিত আমার যতদূর মনে পড়ে, উহার নির্দিষ্ট কোনও দিন ছিল না বিশেষ বাধা না পড়িলে উহা প্রায় প্রত্যহই ভাগলপুর জিলা স্কুলের পিছনে যে প্রশস্ত ও পরিষ্কার Storm water drainটি ছিল উহার পাড়ে বসিত। উহার নিকটেই

স্কুলের Gymnasium ; আমি প্রত্যহ বৈকালে এই স্থানে ব্যায়াম করিতে যাইতাম। সভা বসিবার যেমন নির্দিষ্ট দিন ছিল না, তেমন নির্দিষ্ট স্থানও ছিল না। কোনও দিন ফুটবল খেলার মাঠে (Wace Field) অথবা তাহারই সংলগ্ন খালাসিদের টাউন হল, তাহার বাগানের একটি কোণে সভা বসিত "শ্রীকান্তের" প্রথমাংশে ফুটবল ম্যাচ ও মারামারির যে বর্ণনা আছে তাহা এই গ্রেয়ন গ্রাউণ্ডেই সংঘটিত হয়। আমার বয়স তখন অল্প—ম্যাচ দেখিতে গিয়াছিলাম, মারামারির পর খেলোয়াড়দের রক্তাক্ত কলেবর দেখিয়া মনে যে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল তাহার ছবি এখনও উজ্জ্বল আছে।

একদিনের অধিবেশনকালে এক ব্যাপার ঘটিল। সেদিন ছিল স্কুলের সুপ্রশস্ত বারান্দার কোণে আমাদের সভা বসিয়াছে, হঠাৎ কাহার বজ্রহুঙ্কারে আমাদের চমক ভাঙ্গিল। পিছনে চাহিয়া দেখি জিমন্যাস্টিক্ মাষ্টার পূর্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রুদ্র মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন। আকৃতিতে তিনি খুল ও খর্ব্ব। যথেষ্ট ব্যায়াম করা সত্ত্বেও তাঁহার বর্তুল উদরটির পরিধি কমিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইত না। তাঁহার বিশাল গুম্ফটিও ছাত্রদের যথেষ্ট ভীতির কারণ ছিল। স্কুলে যে ভাবে তিনি বালকদের তাড়না করিতেন সেই অপরূপ ভাষা ও ভঙ্গীতে তিনি আমাদের অবিলম্বে তাঁহার এলাকা ছাড়িয়া যাইবার নির্দ্দেশ দিলেন। শরৎচন্দ্র খঞ্জরপুরে তাঁহার বাড়ীর সন্নিকটে থাকিতেন। তিনি সুশীল-সুবোধ বালক বলিয়া অবশ্যই খ্যাতি অর্জ্জন করেন নাই ; তাঁহারই সম্মুখে শরৎচন্দ্রকে ধূম্র সেবন করিতে দেখিয়া পূর্ণবাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া থাকা অস্বাভাবিক নহে। শরৎচন্দ্র ব্যাপারটিকে বেশী দূর গড়াইতে দিলেন না, তিনি আমাদের স্থান ত্যাগ করিবার নির্দ্দেশ দিলেন এবং স্কুলের পূর্ব্বদিকে সুবৃহৎ স্যাণ্ডিস কম্পাউণ্ডের (Sandes Compound) একটি নির্জ্জন টিলার উপর সেদিনের সভার কার্য্য শেষ করা হইল।

আর এক দিনের কথা স্মরণ হইতেছে। সে দিন সভা বসিয়াছিল টাউন হলের বাগানের ধারে। সভার কার্য্য শেষ হইলে হঠাৎ কি কারণে জানি না শরৎচন্দ্রের দুই মাতুল—সুরেন্দ্রনাথ ও নিরীন্দ্রনাথ, হয়তো পরিহাস ছিলাবেই শরৎচন্দ্রের নিকট হইতে ধূমায়মান বর্শাচুরুটটি লইয়া পালা করিয়া যথেষ্ট ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে কখনও ধূমপান করিতেন বলিয়া জানিতাম না, তাঁহাদের এই অপ্রত্যাশিত আচরণে বোধ করি দুই-একটি স্নেহপূর্ণ মন্তব্য করিয়া থাকিব। ইহাতে ফল দাঁড়াইল এইরূপ ; দুইজনে মিলিয়া আমাকে জোর করিয়া চুরুট খাওয়াইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমার ব্যায়ামপুষ্ট দেহের উপর বলপ্রয়োগ করা কঠিন, তাঁহারা বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না। এদিকে শরৎচন্দ্র আমার পক্ষ লইয়া তাঁহার মাতুলদের গম্ভীর ভাবে বলিলেন যে জীবনে সংযত থাকিতে চাহে তাহার উপর এইরূপ বলপ্রয়োগ অশিষ্টতার নামান্তর মাত্র।

আমাদের সাহিত্য সভার কথা মনে হইলে এখন গর্ব্ব হয়। এমন মার্জ্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন সভা ভাগলপুরে আর ছিল কিনা সন্দেহ। সভাটি যাহাতে আড্ডার পরিণত না হয় সে দিকে সকলেরই তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। সাহিত্য ব্যতীত, শিক্ষা, সঙ্গীতকলা প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা হইত। সঙ্গীত চর্চ্চা হইত ; সভার সভ্যদের মধ্যে সহপাঠী সুকণ্ঠ সত্যসুন্দর বসু রবীন্দ্রনাথের, রজনীকান্তের, প্রমথ রায়চৌধুরী মহাশয়দের আধুনিকতম গানগুলি গাহিয়া আমাদের পরিতৃপ্ত করিতেন। রবীন্দ্রনাথের "তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা আমার নিভৃত সাধনা" (পরে রবীন্দ্রনাথ এই চরণটি পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন) রজনীকান্তের "তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা", প্রমথনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের "তপসী পল্লীবাসিনী" প্রভৃতি ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ গানগুলি এই সভা উপলক্ষে আমাদের শুনিবার সুযোগ হইত। মনে পড়িতেছে একদিন সভায় সুরেন্দ্রনাথ নিজ হস্তে সুদীর্ঘ যুঁই ফুলের মালা গাঁথিয়া সত্যসুন্দরের কণ্ঠে পরাইয়া দেন। শরৎচন্দ্রের অন্যতম বন্ধু রাজেন্দ্রনাথের অনুজ মনীন্দ্রনাথ মজুমদার একদিন ব্যাগার আড়াল করিয়া তাঁহার প্রিয় বাদ্যযন্ত্র সারেঙ্গীটি লইয়া সভায় আসিলেন। সেদিন পূর্ণিমার রাত্রি, সভাশেষে তিনি সারেঙ্গীতে নানা রাগ-রাগিনীর আলাপ করিয়া শুনাইলেন।

মনীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সমবয়সী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বক্রোক্তিপূর্ণ কথা কাটাকাটি চলিত, তাহা যেমনি সরস তেমনি উপভোগ্য ছিল।

(ক্রমশঃ)

আধুনিক সাহিত্যের বাজারে নতুন যারা

অমলেন্দু মিত্র

বঙ্কিম, শরৎ ও রবীন্দ্রনাথের বিপুল সাহিত্যকীর্তির ভাবগঙ্গার পুণ্য প্রবাহের ফলে এযুগে কেউ বলতে পারবেন না, বাংলা সাহিত্যে কিছুই নেই। অপূর্ব সম্পদশালিনী হয়ে উঠেছে দিন দিন আমাদের মাতৃভাষা। এযুগে যদি কেউ ঐ তিনজন সাহিত্যরথীর এবং আধুনিক কালের শক্তিধর লেখককুলের লেখা নিয়মিত পাঠ ও চর্চা করতে পারেন, তবে তাঁর পক্ষে মোটামুটি রকম লিখতে পারা কিছুই আশ্চর্য নয়। লিখছেনও তাই। প্রচুর লেখা বেরুচ্ছে—নতুন ও পুরাতন লেখকদের। অবশ্য নতুনদের সব লেখা ভাল হলেও ছাপা হয় না কারণ এযুগে লেখার চেয়ে লেখা ছাপানোটাই বাহাদুরীর পরিচায়ক। যার যত বের হয় সেই তত মাতব্বর। ওদের মধ্যে যারা সুযোগ সুবিধা করে নিতে পারছেন বা কিছুমাত্র শক্তির পরিচয় দিতে পারেন তাঁরা বেশ পয়সা উপার্জন করছেন, সাহিত্যকে ব্যবসায়ের কাজে লাগিয়ে। আগে একটা কথা চলতি ছিল; নিজের মধ্যে যদি কোন সারবস্তু থাকে, তা হলে তা একদিন আপনা আপনিই স্বীকৃতি পাবে। কিন্তু আজকের যুগে কথাটা ঠিক বলে মনে হয় না। বহু সাহিত্যসেবী আছেন যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে সনিষ্ঠ অনুশীলনের ফলে বাস্তবিকই ভাল লেখেন কিন্তু পড়ে আছেন একপাশে। কোন আদর নেই, স্বীকৃতি নেই, জনসাধারণে চেনে না।

আদর ও স্বীকৃতি হয় সমালোচনা ও পত্রিকার মাধ্যমে। পত্র-পত্রিকার গুরুত্ব ও প্রচারসংখ্যার উপর নির্ভর করে লেখকের জনপ্রিয়তা। প্রকাশককুলও কয়টি নামজাদা পত্রিকার প্রকাশিত লেখা বই আকারে বের করতে চান। অথচ ওদিকে নামজাদা পত্রিকার দরজা বন্ধ জাঁটুনী দিয়ে বাঁধা। এমন বড় পত্রিকা খুব কমই আছেন, যাঁরা সকলের লেখা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করে থাকেন। সর্বত্রই গোষ্ঠী তৈরী হয়ে যায়। পর্যায়ক্রমে একের পর এক বাঁধা লেখকদের লেখা ছাপা হতে থাকে। নিজেদের কৃতকর্ম ঢাকবার জন্য কালেভদ্রে গোষ্ঠীর বাইরের কাউকে স্থান দেন, যা দেওয়ার চেয়ে না দেওয়াই ভাল। আজকাল বাংলাদেশে প্রায় শ দুয়েকেরও বেশী লেখক রয়েছেন, যাঁরা মোটামুটি ভালই লিখতে পারেন। সকলের মধ্যে অবিস্মরণীয় মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিভা নিশ্চয়ই নেই। বড় প্রতিভা দু'একজনের মধ্যেই থাকে। বাকী সবাই ঘরে ঘরে গড়ে ওঠা সাহিত্যিক। কিন্তু কে তাদের মূল্যায়ন করে! দেশে সমালোচক নেই। এককালে সুরেশ সমাজপতি প্রমুখ সমালোচকরা সাহিত্য সংসারে একাধারে পুরোহিত অন্যধারে শাসনকর্তা স্বরূপ ছিলেন। তাঁরা নতুনদের স্নেহদৃষ্টি দিয়ে গড়ে তুলতেন। আজকাল সমালোচনার রেওয়াজ উঠে গেছে। কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত পুস্তকের পরিচয় ছাপা হয় মাত্র। একমাত্র "কথাসাহিত্য" নতুনদের সমালোচনা করবার চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য সাধু কিন্তু সমালোচকের যোগ্যতার অভাব। সুতরাং গ্রাহ্য নয়। প্রত্যেক পত্রিকায় নিয়মিত সমালোচনার বিভাগ খোলা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বড় বড় পত্রিকারা কয়টি মুষ্টিমেয় লেখকদের নিয়ে মেতে আছেন। শারদীয়া বিজ্ঞাপনে তাকালেই দেখা যাবে সেই সবনী বেরে ছোটয়াও পক্ষীরী নৃত্য সুরু করেছেন। শুধু বড়দের নামের প্রচার চলছে। তাঁরা কি লিখেছেন তা দেখার দরকার নেই—কেবল নামটাই যথেষ্ট। যেন সেই "আমার জীবনই আমার বাণী"। বাংলাদেশে পাঠক সমাজও তেমনি হয়ে গেছেন। লেখক সূচী না পেলে পত্রিকা তাঁরা কিনবেন না বা পড়বেন না তাই ঠকছেনও বেশ। তবে দুঃখের কথা এই যে, ঠকাটা টের পান খুব কম লোকেই।

অন্যত্র প্রতিকূলতার জন্য নতুন লেখকদের অগ্রগমন সহজ নয়। বাংলাদেশে লেখার মত পাপ আর কিছু নেই। কেবল ভাল লিখলেই হবে না, মনের মতন লিখতে হবে এবং প্রচুর লিখতে হবে। কিন্তু লেখবার ক্ষমতা থাকলেও ছাপা হবে কোথায়? জায়গা নেই বড় পত্রিকায়, কেবল জায়গা আছে বিজ্ঞাপনের। না চাইতে লেখা পাঠানো কেন বাপু! আবার ছোট পত্রিকার পাঠক নেই—কিন্তু সমাদর গ্রাহকও করেন না। বড় পত্রিকাগুলিতে সপ্তাহে দেড়শো, দুশো গল্প, গোটা তিনেক প্রবন্ধ, এবং তাছাড়া অনেক কবিতা এসে পৌঁছায়। অত পড়ছে কে; পড়লে মনোনীত হওয়ার সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত। ওদের যত্ন হতে মনোনীত যা হয়ে থাকে, তার পরিমাণও বিপুল। পত্রিকাগুলি যদি লেখা গ্রহণ বন্ধ করে দেন, তবে যা লেখা মনোনীত হয়ে হাতে থাকে, তাতে দশটা বছর মনে হয়, স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারে।

বাংলাদেশে অগণিত পত্র পত্রিকা। স্বল্প কয়েকটি নামকরা পত্রিকা ছাড়া সংস্কৃতিবান ব্যক্তিরা অন্য পত্রিকা পড়েন না। বস্তা বস্তা বিভিন্ন ধরণের লেখা প্রকাশ হয়। কেউ কারও খোঁজ রাখেন না। কোন লেখা ভাল হলে তুলে ধরার ব্যবস্থা এদেশে নেই। সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় এসম্পর্কে উদাসীন। ঠিক উদাসীন বললে ভুল হবে। সেখানেও গোষ্ঠি পোষণের ব্যাপার। বড় বড় পত্রিকা ছোট বা নবজাত পত্রিকাগুলিকে ঘৃণা ও উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। আয়তনার আকাশে ওড়ার সাধ দেখে অবজ্ঞার বাঁকা হাসি ওঁদের ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে। নতুন পত্রিকাও প্রায়ই টেঁকে না।

প্রকৃত ভাল লেখা অনেকেরই কলম দিয়ে বের হচ্ছে আজকাল তা নিজের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান থেকে বলছি। দেখেছি অনেক নতুন সাহিত্যসেবীদের সত্যকার প্রথম শ্রেণীর গল্প পাঠানো হলে বড় পত্রিকায়—তা ছাপা হয় না, সেখানে বিখ্যাত লেখকের অখ্যাত লেখা স্বচ্ছন্দে প্রকাশ হয়ে থাকে। এর প্রতিবিধানে কিছু নেই, জনচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা ছাড়া।

বিভিন্ন মতবাদ, গোষ্ঠি, রাজনৈতিক দলীয় পত্রিকা, যৌন পত্রিকা, সিনেমা পত্রিকা প্রভৃতি নানা জাতীয় কাগজ রয়েছে। এক একজনের এক একরকম চাল-চলন। নতুন লেখকেরা বড় কাগজে ব্যর্থ হয়ে আজে বাজে পত্রিকার শরণাপন্ন হন এবং লেখার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে থাকেন। সিনেমা পত্রিকাগুলির মধ্যে কেউ কেউ নিজদের প্রকাণ্ড সাহিত্যবোদ্ধা মনে করে সাহিত্যে ও সিনেমার ওপাখিঁচুড়ী পরিবেষণ করে যাচ্ছেন। নতুন লেখকরা চটকদার ছবিওয়ালা কাগজের মোহে সেখানে লিখতে সুরু করেন। ফলে ওঁদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যায়।

নতুন লেখকদের হাতে হবে অক্লান্ত কর্মী। এক-সঙ্গে বড় বড় গোটা পনেরো কুড়ি পত্রিকা বেছে নিতে হবে। তারপর দলীয় মনোবৃত্তি বাদ দিয়ে ক্রমাগত লেখা পাঠানোর মহড়া নিতে হবে। থামলে চলবে না। প্রয়োজন হলে বহু পাঠানো যেতে পারে একের পর এক। নিজের লেখবার ক্ষমতা যদি থাকে, আটকায় কে? তবির তল্লাশের পথে না গিয়ে এই পথই গ্রহণ করতে হবে। সেই সঙ্গে লেখা যাতে আপন শক্তির জোরে প্রতিষ্ঠা পায় সেই চেষ্টাও দেখতে হবে। কোনক্রমে একটা কিছু খাড়া করে বড় পত্রিকায় ছাপাবার চেষ্টা নেওয়া ঠিক নয়। কিছুটা দখল এলে পর এ পথে এগিয়ে আসা ভাল। নতুবা সম্পাদক কুলের ধারণা খারাপ হয়ে যেতে পারে। একথা নিশ্চয়ই বলব না সম্পাদকেরা সকলেই নির্মম। কার লেখা কার কাছে ভাল লাগবে এবং নেকনজরে পড়ে যাবে বলা শক্ত। চান্স ও এ্যাক্সিডেন্ট বলে বস্তু আছে। প্রত্যেকেরই জীবনে নানা সুযোগ আসে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর লেগে থাকতে হবে লেখার চেষ্টা এবং লেখা পাঠানোর কর্মে। দেখবেন আপনা আপনিই কত সুযোগ জুটে যাবে। আপনাকে টেনে তুলবেন তিনিই। আমার নাও পেতে পারেন। বহু কষ্ট ও আয়াসসাধ্য ব্যাপার নিজকে পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত করে তোলা। অপমানে, আঘাতে, নিন্দায়, দুর্ব্যবহারে কতবার যেমন পীড়িত হবেন, মন ভেঙে যাবে,

লেখার অভ্যাস পর্যন্ত রাখতে ইচ্ছা হবে না; তেমনি আবার প্রশংসা ও সম্মান পেয়ে কতবার নিজেকে ধন্য মনে হবে। সাহিত্যের পথে যেমন যশ আসে অপ্রত্যাশিতভাবে, তেমনি আসে, বেদনা আসে, তিক্ততা আসে। অপ্রত্যাশিত ও অজ্ঞাত বলেই এর মধ্যে পথ খোঁজার চেষ্টায় একটা রোমান্টিক আমেজ আছে। কিছুকাল লেখবার পর যখন ছাপা সুরু হবে, নিন্দা আসবে, প্রশংসা আসবে, লেখার জন্য অনুরোধ আসবে, ছোট পত্র পত্রিকা হয়ত উপহার আসবে; এই পথেই ক্রমে প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু সাহিত্যের সেবায় একটা আনন্দও আছে। প্রকৃত সাহিত্যসেবীর কাছে সে আনন্দের সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা হয় না। প্রতিষ্ঠা একদিনে হয় না। অনেক সময় লাগে। সাহিত্যের সাধনা এমনি কঠিন; দুঃখ এই যে, এখনকার অবস্থায় ইহা যেন কঠিনতর হয়ে উঠেছে।

বিদেশী শাসনে ভারতের অবস্থা　　—কালীপ্রসন্ন সিংহ

....মুসলমান রাজারা রাজনীতি অনভিজ্ঞ ছিলেন, প্রজাদিগকে কিরূপ পালন করিতে হয় তাহা না জানাতে পালন স্থলে পীড়ন করিতেন, এবং এই দোষেই তাঁহাদিগের রাজ্য নষ্ট হয়। হিন্দু প্রজারা আর সহ্য করিতে না পারিয়া আপনাদিগকে পরিত্রাণ নিমিত্ত ইংরাজদিগকে আহ্বান করিয়া বাঙ্গালারাজ্য অধিকার করিবার সদুপায় করিয়া দিলেন কিন্তু ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টও বিজাতীয় পক্ষপাতশূন্য নহেন। মুসলমানদিগের অধীনে পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে পাওয়া যাইত না বলিয়া কেহ পরিশ্রম করিত না। কিন্তু এক্ষণে বিবেচনা হয় তাহাও ভাল ছিল। এক্ষণে অবাধে বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে সকলের মন উজ্জ্বল হইতেছে কিন্তু কি মনস্তাপ! যে ইংরাজদিগের সমকক্ষবিদ্য হইলেও তাহাদিগের ন্যায় উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। একজন ইংরাজ যে কর্ম্ম করে যদি সেই কর্ম্ম একজন বাঙ্গালী নির্বাহ করেন তাহা হইলেও তাহার বেতন সেই ইংরাজের ন্যায় হইবে না, সমান বেতন পাওয়া দূরে থাকুক অপেক্ষাকৃত পারগ হইলেও সে পদ তাঁহার পাইবার বিষয় কি, ইহাকে কি বিজাতীয় পক্ষপাত বল না। এক্ষণে একবার আকবর বাদশাকে স্মরণ করি, তাঁহার সময়ে যোগ্য ব্যক্তি হইলেই রাজ্যের গুরুতর কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতে পারিত হিন্দু কি মুসলমান তাহার বিচার ছিল না। তাঁহার নিকট বিদ্যাই পূজ্য হইত. যেমন একচন্দ্র গগনমণ্ডলে উদয় হইয়া পৃথিবীর সকল অন্ধকার হরে, সেইরূপ তিনি উদয় হইয়া পূর্ব্বমত মুসলমানদিগের, রাজধর্ম্ম অনভিজ্ঞতা রূপ যে অন্ধকার ছিল, তাহা হরিয়াছিলেন দেখ ব্যবস্থাপক কৌনসলে এক্ষণে প্রজাদিগের কোন হাত না থাকাতে কত অমঙ্গলের সম্ভাবনা কোন আইন প্রচার কালে প্রজাদিগের মত গ্রহণ হয় না ইহাতে তাহারা কোন নিয়ম অকল্যাণকর জ্ঞান করিলেও স্তব্ধ থাকে পরন্তু মুসলমানদিগের প্রতি কোন দোষারোপ করা যাইতে পারে না তাহারা যে কালে রাজা ছিল সে কালে অসভ্যতাই সবল ছিল কিন্তু এইক্ষণে অসভ্যতা দূর হইয়া সভ্যতার সোপান বর্দ্ধিত হইতেছে। আমাদিগের ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট সভ্য বলিয়া লোকবিখ্যাত আছেন অতএব বিজাতীয় পক্ষপাত থাকিতে ঐ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে অবশ্যই লজ্জা পাইবেন।

—বিদ্যোৎ সাহিনী পত্রিকা (১৮৫৫)—সাহিত্য-সাধক চরিতমালা হইতে।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার জীবন-সাধনা

হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত

(তিন)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিষয়বুদ্ধি পায় কি ভাবে? বিষয় যে একেবারেই কিছু নেই। ছোট একটি দোকান। তার উপর নির্ভর করে আছে মস্ত বড় পরিবার। পাঁচ ভাই আর তিন বোন। মুদিখানা দোকানের বেচাকেনার পরে নির্ভর বছরের সব সময় সমান আয় নেই। তাই বাবা মাকে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হয়। আর এই খাটুনিই হল অভাবের ঘরের সব চেয়ে বড় সহায়। শুধু খাটলেই চলে না; ধৈর্য্য আর যোগাড়ে খাটুনির সঙ্গে মেলাতে হয়। পরিবার সুখের মুখ দেখতে না পাক্ ভাত কাপড় জুটে যায়।

ভুবনেশ্বরী দেবীকে তাই পরিবারটি চালিয়ে নেবার জন্য এইভাবে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝতে হয়েছে। দারিদ্র্য এবং সংগ্রাম এদুটি সহচরকে শেওড়াতলী গ্রামের সব বাসিন্দা-দেরই অল্প বিস্তর চিনতে হয়েছে। গ্রামটি বড়। বাসিন্দাদের সবাই ব্যবসায়ী। তবু বাণিজ্যে লক্ষ্মী বসতি নেননি। ব্যবসার মূলধন কম; ক্ষেত্রও সংকুচিত, সীমাবদ্ধ। তাই শেওড়াতলী গ্রামের জীবনে ভাঙ্গা গড়ার খেলা যা কিছু হয়েছে তা ছোট কারবার চেওয়ার, বার-বাদন তেজারতির; সামান্য চাষের আর ভাগচাষের। যারা চাষ করে তাদের প্রায় কারুর জমি নেই। যাদের জমিতে খামার ক্ষেত বলেছে তাদের জমিও নিতান্ত ছোট।

বিদ্যার প্রতি গ্রামবাসীর ভক্তি প্রায় সার্বজনীন। অক্ষর পরিচয়, লেখা এবং হিসাবের জন্য সামান্য অংক এর বাইরে যাবার কথা গ্রামে কখন কেউ ভাবতো না।

তবে কেউ কেউ ভাবতেন। জগন্নাথ সাহা নিজেও উচ্চ শিক্ষা—ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন। বাড়ীর বড় ছেলে জয়নাথকে ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোন সুবিধাই হয়নি। পরি-বারের দরকার বাড়তি আয়ের। ইংরাজী শিখে জয়নাথ বাড়তি আয়ের কোন পথই করতে পারেনি। অনেক আশা নিয়ে ইংরাজী শিক্ষা এসেছিল, জীবন ধারণের ন্যূনতম উপকরণ সহজভাবে পাওয়ার সুযোগ তার মধ্য দিয়ে জগন্নাথের পরিবার পায়নি। সম্ভবতঃ শেওড়াতলীর কোন পরিবারই পায়নি।

সুতরাং পাঠশালায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘনাদকে বাড়ীর মুদিখানা দোকানে বসতে হত। পাঠশালার লেখা পড়ায় তার কৃতিত্ব দেখে শিক্ষক মশাইরা প্রশংসা করতেন। বলতেন, আরও অনেক পড়তে হবে তোকে। বাড়ীতে এসে জগন্নাথ সাহাকে বলতেন সেকথা।

অনেক পড়া মানেই ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া। তার সুবিধা শেওড়াতলী গ্রামে নেই। ঢাকার উত্তরদিকের অধিকাংশ গ্রামেই এ সুবিধা ছিল না। দক্ষিণ দিকে বিক্রমপুরে সুবিধা ছিল; সুযোগও নিয়েছেন অনেকে। তারা বিক্রমপুরে বহু উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনও করেছেন।

উত্তর দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত—ঢাকা থেকে ত্রিশমাইল দূরে শেওড়াতলী পর্য্যন্ত একটিও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না। একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল সিমুলিয়া গ্রামে— শেওড়াতলী থেকে ৭ মাইল দূরে।

জগন্নাথ সাহা মেঘনাদকে ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ দেবার কথা ভাবতেও পারতেন না। জয়নাথের ব্যাপারে ওঁকে তো রীতিমত হতাশ হতে হয়েছিল।

মেঘনাদ দোকানে বসেও দোকান চালাতে পারতো

-না। পাঠশালায় তার হাতের লেখাটির প্রশংসা ছিল। দোকানের ফর্ম লেখা, খাতা লেখা এসবে হাতের লেখার কারুকার্য্যের বিশেষ দাম নেই। বিশেষতঃ দোকান দেখাশুনায় যে অতি বড় আনাড়ী তার হাতের লেখা তার পক্ষে যেন একটা বাড়তি অপদার্থতা।

তবে মেঘনাদ কি করবে?

বাড়ীতে বাবার সাধ্য নেই ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। পাঠশালার শিক্ষকরা বলেন, পড়া চালিয়ে যেতে হবে।

শেওড়াতলীর দিগন্ত রেখা অতিক্রম করে কোথায় কোন পাঠগৃহে মেঘনাদের জ্ঞান স্পৃহার চরিতার্থতা আসবে? কে দেবে তার সন্ধান!

জটিল জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে মানুষের চাহিদা বাড়ে। যোগ্যতা বাড়ে। সীমাবদ্ধতা কমে আসে। শেওড়াতলীতে শিক্ষকরা বলতেন, আরও পড়। কি পড়তে হবে। পড়ে কি হবে তা তারা নিজেরাও ভাল জানতেন না। দোকান দেখা আর পাঠশালার পড়ার টানা পোড়েনে মেঘনাদের নিজেরও সীমিত আশাই ছিল।

হঠাৎ খবর এলো সিমুলিয়ায় তার পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে। বড়দাদা জয়নাথ সেখানে গিয়েছিলেন। ডাঃ অনন্তকুমার দাসের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলে তাকে রাজী করে এসেছেন। মেঘনাদ তাঁর বাড়ীতে থাকবে খাবে আর পড়াশুনা চালিয়ে যাবে।

কৃতজ্ঞ চিত্তে মেঘনাদ পা বাড়ালো শেওড়াতলীর বাইরে।

এমনিভাবে দিগন্ত রেখা বড় হয়। ছোট ছেলের দিগন্ত একেবারেই ছোট। ছোট গ্রামের, ছোট আশা আকাংখার অংশীদারদের জীবনযাত্রাও সহজ, সাধারণ। বড় কিছু চাইতেও ভরসা হয় না।

সিমুলিয়ার আর এক জীবন। শিক্ষকরা, বিশেষ করে প্রসন্ন কুমার চক্রবর্ত্তী ছিলেন সেই জীবনের উদ্গাতা। তাই তারা নানা বিষয়ে ভাষিয়ে তুলছিলেন ছাত্রদের। সবচেয়ে বেশী তুলেছিলেন প্রসন্নকুমার। বইয়ের মধ্যে তত্ত্ব থাকে বাঁধা। প্রায় ছাত্রই তাকে মুখস্ত করে। প্রায় শিক্ষকই মুখস্ত নেন। সিমুলিয়ার শিক্ষকরাও হয়তো তাই করতেন। হয়তো করতেন না। কে জানে?

মেঘনাদের কাছে তাঁদের জ্ঞান কেমন করে জানি জীবন্ত হয়ে উঠল। ব্রোতস্বিনী নদীর ধারা উৎস মুখ থেকে যাত্রার সময় জানেনা কোথায় তার শেষ। কিন্তু সাগর যতই কাছে এগিয়ে আসে প্রাণবন্ত এক বলিষ্ঠ উচ্ছ্বাস নদীর সত্তায় আনে প্রবলতা, প্রায় সীমাহীন বিস্তার। সেই মোহানার কোথায় নদীর শেষ আর কোথায় সাগরের শুরু কেউ জানে না তার সঠিক পরিচয়।

মেঘনাদ সিমুলিয়া থেকে মধ্য ইংরাজী শিক্ষা সমাপ্তির পরীক্ষা দিলেন। ঢাকা জেলায় প্রথম স্থান পেলেন। বৃত্তি পেলেন।

কোন কিছুই কি ব্যক্তির জীবনে, কি জাতির জীবনে অনন্ত নয়। তাই বৃত্তি পেয়ে মেঘনাদকে সিমুলিয়া ছেড়ে আসতে হল। ছেড়ে আসতে হল তার প্রথম আশ্রয়দাতা ডাঃ অনন্ত কুমার দাস মশাইর স্নেহশীল আশ্রয়। সংবাদ পত্র যেখানে পৌঁছয় না, শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন যেখানের দুঃখী মানুষদের সুখ দুঃখের তেমন কোন অদল-বদল ঘটায়না এমন গ্রামের সহজ জীবনযাত্রা ছেড়ে আসতে হল।

ঢাকায় পড়তে এসে মেঘনাদের নূতন পূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে ঝাঁপ দিতে হল। কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র হলেন মেঘনাদ। কত ভাল ভাল ছাত্র সেখানে পড়েন। তারা দেশকে নানান দিকে বড় করার কথা ভাবেন। কেউ জ্ঞানে, কেউ কর্ম্মে, কেউ বিজ্ঞানে কেউবা শিল্পে—নানা ক্ষেত্র আশ্রয় করে নিজের কল্যাণ ও বিকাশ ঘটাবেন। দেশে নতুন

এবং উন্নত জীবন এনে দেবেন। হয়তো সেই উন্নতির ঢেউ গিয়ে পৌঁছবে দূরে সিমুলিয়া গ্রামে। সেখানে গড়ে উঠবে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। সেখান থেকে ঢেউ এসে পৌঁছবে শেওড়াতলী গ্রামে। কীর্তনমুখর গ্রামে সন্ধ্যারাতের সময় দেবতার পায়ে প্রণাম জানাবার সময় গৃহবধূরা প্রার্থনা জানাবেন শুধু, আশাভঙ্গ, বিদীর্ণতা, দারিদ্র্য-র নির্মোক ছেড়ে শ্রীসমৃদ্ধিশালী রূপ নিয়ে জেগে উঠুক তাদের গ্রাম, দক্ষিণাঞ্চলের বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলির মত। সমাজের কতো অসহায় মায়েদের শান্ত মুখশ্রীর স্নিগ্ধতাকে শিশু কিশোরদের মনে হচ্ছে যেন কত দূরের জিনিষ। নতুন জ্ঞান বিজ্ঞান হয়তো মানবিকতার সেই প্রসন্ন প্রকাশকে স্থায়ী করতে, সমাজের সুষ্ঠু ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করতে পারে।

এমন আশার পরিপ্রেক্ষিত ভেঙ্গে গেল। থর থর করে কাঁপতে লাগল সকল বাসনা কামনা প্রার্থনা এক অঘাত আঘাতে। বাংলাদেশকে ভেঙ্গে দুটি আলাদা প্রদেশ গঠন করার ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন ইংরাজ শাসক সম্প্রদায়। স্থির হয়ে গেল ভাষায়, সামাজিকতায়, ব্যবহারে আহারে, আপ্যায়নে, পরিচ্ছদে যে মানবগোষ্ঠী বাঙ্গালী বলে পরিচয় পেয়ে এসেছে তাদের ঐক্যের কোন মূলগত ভিত্তি থাকবেনা।

সমগ্র জাতি প্রতিবাদ জানালো। প্রতিরোধ গড়ে তুললো। বৈজ্ঞানিক এলেন। অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংগঠক, সাহিত্যিক এলেন। এগিয়ে এলেন দেশের সকল স্তরের মানুষ। জাতির পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ বললেন : বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক, হে ভগবান।

বাঙালী এক কণ্ঠে বলে উঠলো : আমরা সরকারের স্থির সিদ্ধান্তকে নাকচ করে দিলাম। বাঙ্গলা ভাগ করা হবে না।

এই আহ্বানে দেশের সকল ছাত্রেরা—কচিকাচার দল তাদের প্রতিবাদ আর নালিশ জানাবার সিদ্ধান্ত নিলে। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রদল তাদের ক্ষোভ জানানোর এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সুযোগ নিল। বাংলার লাট-সাহেব এসেছেন পরিদর্শনে। ছাত্রেরা স্থির করলে বয়কট করা হবে। জানানো হবে সরকারের কাজের পেছনে দেশের মানুষদের সমর্থন নেই।

দল বেঁধে ছেলেরা এল প্রতিবাদ জানাতে। তাদের কণ্ঠে :

ফুলার সাহেব হও উধাও
ঢাকা ছেড়ে চলে যাও।

সেই দলে মেঘনাদ ছিলেন। সঙ্গে তাঁর সহপাঠী নিখিলরঞ্জন। আরও ছোট ছোট ছাত্ররা।

ফুলার সাহেব—বাংলার লাট ব্যামফাইল্ড ফুলার চলে গেলেন। তাঁর সরকারের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে দেশের সাধারণ মানুষের বিবাহীন প্রতিবাদ শুনে গেলেন। যে কোন শাসক গোষ্ঠী এমন পরিস্থিতিকে মানুষের প্রতিরোধকে সম্মান জানাবেন। দেশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য দেশবাসীর আকুলতাকে মর্য্যাদার সঙ্গে বিচার করতেন।

বাংলা সরকারের পক্ষে তাই শোভন হত। বিবেচনার কাজ হত। সরকার অন্যরূপ করাই সমীচীন বোধ করলেন। দলে দলে দেশবাসীর বাংলার ঐক্য বজায় রাখার আগ্রহ প্রকাশ করার জন্য অপরাধী বিবেচিত হলেন। সরকারের চক্ষু রোষ কষায়িত হয়ে উঠল। দেশবাসীর উপর এল দেশজোড়া বন্ধন। বন্দী হতে লাগল তরুণ দল। বন্দে মাতরম বললেই লাঠি খেতে হবে; বলা না থামলে জেলে যেতে হবে। ঘর পুড়ল। সহরে বসল ফৌজ। গ্রামে বসল পিটুনী পুলিশ।

এই পরাভবকে মানুষ মানে নি।

তাদের কণ্ঠে শোনা গেল :

বন্ধন ভয় তুচ্ছ করেছি উচ্চে তুলেছি মাথা
আর কেহ নয়, জেনেছি মোরাই মোদের পরিত্রাতা॥

আর—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে মোদের বাঁধন
ততই টুটবে
ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে মোদের আঁখি
ততই ফুটবে।

সেই নতুন চেতনার উন্মেষে বাঙালী বুঝতে পারলে :

বন্দে মাতরম সুজলাং মাতরম
এক সূত্রে গাঁথা আছে সহস্রটি মন
এক কাজে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন
আসুক সহস্র ঝঞ্ঝা বাধুক প্রলয়
আমরা সহস্র প্রাণ বহিব নির্ভয়
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন
তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন।

এই দেশ-প্রেমের প্রবাহে মুগ্ধ হয়েছিল এই অপরাধে। তাদের সঙ্গে মেঘনাদকেও বিদ্যালয় থেকে তাড়ানো হল। সিমুলিয়ার শিক্ষক মণ্ডলী মেঘনাদকে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়িয়ে ঢাকা জিলায় প্রথম স্থান অধিকার করাতে পেরেছিলেন। মেঘনাদের বৃত্তি পাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল।

বৃত্তি বন্ধ করলেন বিদেশী সরকার। বিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ করে দিলেন; উন্মুখ বিদ্যার্থীর আগ্রহ প্রতিহত করা হল।

কিশোর মেঘনাদ বুঝতে পারলেন দেশপ্রেমের জন্য কি দণ্ড নেমে আসে। বুঝলেন আদর্শের বিরোধ, মতের বিরোধ এসবকে ছাপিয়ে ওঠে স্বার্থের বিরোধ।

মেঘনাদ হঠাৎ দেখতে পেলেন অসংখ্য ছাত্রকে বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে তাদের তরুণ মন

বাঙ্গালীর সমাজ-বিন্যাস

—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালা দেশ আর্য্য-নিবাসে পরিণত হইলেও, উহার আদিম নিবাসীদিগের সংখ্যা কোন কালেও কম ছিল না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারের পর এই আদিম বাঙ্গালীদিগের সহিত আর্য্যদিগের বৈবাহিক আদান প্রদান ঘটিয়াছিল এবং আর্য্য ও অনার্য্য জাতি সকলের সংমিশ্রণে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। এই সংমিশ্রণের পরিচয় তন্ত্র হইতে অনেকটা পাওয়া যায়। কামরূপে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের চেষ্টায় পীতবর্ণ চীনদেশীয় অধিবাসীদিগের সহিত বঙ্গের শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ আর্য্য জাতির সংমিশ্রণ হয়। বিশেষতঃ তন্ত্রানুসারে বঙ্গে শৈব বিবাহের প্রচলন অধিক হওয়াতে কুবচ আদি নানাবর্ণের জাতির সহিত বাঙ্গালীর শোণিত-সম্পর্ক ঘটিয়াছিল। তিব্বত, নেপাল, ভোটান প্রভৃতি দেশের সহিত বঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ শৈব বিবাহ-পদ্ধতির দ্বারাই ঘটিয়াছিল। ইহার উপর বৌদ্ধ ধর্ম্মের একাকারের প্রভাব মগধে ও বঙ্গে পূর্ণাবয়বে প্রকট হইয়াছিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা মগধে ও বঙ্গে দীর্ঘতর কাল বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব প্রকট ছিল। এখন যেমন নেপালে বৌদ্ধ ও হিন্দু সদ্ভাবের ভাবুক হইয়া প্রতিবেশীরূপে বাস করিতেছে, বঙ্গদেশেও বৌদ্ধ ও হিন্দুর মধ্যে সেইরূপ সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাল নরপতিগণের শাসনকাল পর্য্যন্ত এই সদ্ভাব কোনরূপ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বল্লাল সেনের সময় হইতে একটু বিরোধের ভাব অঙ্কুরিত হয়। পাঠানদিগের দ্বারা বাঙ্গালা দেশ পরাজিত হইলে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মাবলম্বীরই এক দশা ঘটে, তখন আবার উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব দেখা দেয়। এই ভাব ও অভাবের ন্যূনাধিক্য হইতেই বাঙ্গালায় জাতিভেদ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

—(বিজয়া—চৈত্র, ১৩১৯)

নজরুল-প্রতিভার গোড়ার কথা

আবুজাফর উদ্দিন খান

রবীন্দ্রনাথ সে যুগে তাঁর সর্বগ্রাসী প্রতিভা নিয়ে সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগে চূড়ান্ত উৎকর্ষবিধান করছিলেন ঠিক সে-সময়েই রবীন্দ্রালোকিত মহাদেশে নজরুলের আকস্মিক অভ্যুদয় এবং বিপুল প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। তবে এর কারণ অস্পষ্ট নয়।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় যখন ইঙ্গবেঙ্গলের প্রভাবে আমাদের দেশের সামন্তশাহী সমাজের ভিত্তি ক্রমশঃ ভাঙতে থাকে সেই আধা-সামন্তশাহী, আধা বুর্জোয়া ঐতিহ্য নিয়ে বাঙলায় আরম্ভ হল নবযুগ, বাংলা-সাহিত্যের নবযুগের আরম্ভও তখন থেকে। বাঙলা সংস্কৃতির সেই নবযুগের প্রতীক হিসেবে সেদিন এসেছিলেন মধুসূদন। তাই তাঁর কাব্য সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী সেদিন বলেছিলেন, "বঙ্গ-সাহিত্যের পাঠকগণ আনন্দের সহিত এক নূতনজগতে প্রবেশ করিলেন।" নজরুলের কাব্য সম্বন্ধেও একথা বলতে পারি। কেননা, নজরুল যখন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাঙলাদেশে এলেন তখন সমগ্র বাঙলায় তথা ভারতবর্ষে এক বিস্ফোরণের দানা বেঁধে উঠেছে সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে; যুদ্ধজীবিদের ওপর সাম্রাজ্যবাদের আক্রোশ, জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র নরনারীর রক্তে রক্তাক্ত রাজপথ, যুদ্ধের ফলে দুনিয়াজোড়া অর্থনৈতিক সঙ্কট, বেকার সমস্যা প্রভৃতির চাপে মধ্যবিত্ত সমাজের তীব্রতর ভাঙন, 'মৃত্যুদুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাক্ত অরুণোদয় আসন্ন।' এই আলো-আঁধারের সন্ধিক্ষণে এলেন নজরুল। তাঁর রচনার অমিত তেজ, উদ্দাম স্বতঃস্ফূর্ততা ও সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য বাঙালীকে নতুন বাণী দিয়ে গেল—সে নতুন বাণী বাঙালী নিজের চিরন্তন বিপ্লবরূপ খুঁজে পেল। এতদিন পর্যন্ত বাংলা-সাহিত্য কেবলমাত্র সুমধুর বংশীধ্বনি এবং বেণু-বীণা নিক্কণেই ছিল ভরপুর। নজরুল আমাদের শুনালেন তূর্যনিনাদ। তাঁর কাব্য পাঠককে অলস আবেশে নিষ্ক্রিয়ভূত করে না; এর তেজস্বিতা তাকে উদ্দীপিত করে, উদ্বোধিত করে তোলে—মনে উৎসাহ জাগায়। তাঁর সাহিত্যের মধ্যে আমরা একটা পৌরুষের স্পর্শ পাই—বাংলা-সাহিত্যে নজরুল পুরুষ প্রাণের দৃষ্টান্ত। স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, সত্যেন দত্তের গানে আর কবিতা বাঙালীকে প্রবুদ্ধ করেছিল। কেন জানি না পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলনে বাঙালী পূর্বের মত ঝাঁপিয়ে পড়েনি, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের কবিতাগুলি আর জনগণের মধ্যে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। প্রয়োজন হল নতুন কবির, যিনি নিষ্পীড়িত দেশবাসীর নাড়ীর সঙ্গে যোগস্থাপন করে নবীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবেন; তখন নজরুলের গান আর কবিতায় পুরুষতা ঝিমিয়ে পড়া জাতিকে নবজীবন দান করে অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করে তোলে। তাই তাঁর সমকালীন সাহিত্যিক গোষ্ঠী হতে তাঁকে একটি পৃথক আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে; একথা বুঝতে না পারলে নজরুলকে বোঝবার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হবে।

আমাদের দেশে প্রাচীন ঋষি বিশ্বদেবতার কাছে তেজ, বীর্য, বল, ওজই শুধু প্রার্থনা করেন নি, প্রার্থনা করেছেন মন্যু অর্থাৎ অন্যায়ের প্রতি ক্রোধও। ঋষি বলেছেন, "ও মন্যবসি মন্যুমিন্দ্র দেহি।"—হে মন্যুস্বরূপ অন্যায়ের প্রতি বিদ্বেষ আমার ভেতর সঞ্চারিত কর। বাস্তবিক অন্যায়কে অন্যায় না বলে তাকে ক্ষমা করা জড়তার লক্ষণ, অপৌরুষতার লক্ষণ। এজন্যেই জোসেফ ম্যাটসিনি বলেছেন, "Whenever you see corruption by your side and do not strive against it, you thereby betray your duty." নজরুল দেখেছেন মানুষের যুক্তিহীন বিচার মূঢ় ধর্মান্ধতা, দেখেছেন বলদৃপ্তের

সীমাহীন স্পর্ধা, জাতিবিশেষের দুর্বার সাম্রাজ্যলিপ্সা ও প্রভুত্বপ্রিয়তা, মানবাত্মার অপমান, নারীত্বের অমর্যাদা, সভ্যতার মুখোশ-পরা ভদ্রবেশী বর্বরতা—তাই তাঁর রুদ্ররোষবহ্নি জগতের পুঞ্জীভূত পাপকে দগ্ধ করে ফেলতে চেয়েছে। এইসব দেখেশুনে তিনি প্রচণ্ড আঘাত হানলেন রক্ষণশীল যুযুধান জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে—সে জাতীয়তাবাদ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁর কাব্যে বিদ্রোহের মূলসুর ধ্বনিত হচ্ছে ঘোষণার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাম্যের বিদ্রোহ ধনীসমাজের বিরুদ্ধে সর্বহারার বিদ্রোহ, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে উৎপীড়িতের বিদ্রোহ, ধ্বংস-মার্গগামী সমাজপতি গুণ্ডাদলের বিরুদ্ধে মানবতার বিদ্রোহ। তিনি বলেছেন, "....যা অন্যায় বলে বুঝেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি,—কাহারো তোষামোদ করি না। প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পৌ ধরি নাই—আর শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য ওকালতীর তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।" (রাজবন্দীর জবানবন্দী) তা' বলে তাঁর সাহিত্য সংগ্রামশীল (তাঁর সংগ্রাম জনসংহতির) হলেও শ্লোগান সর্বস্ব নয়। তাঁর কবিকল্পনায় অস্পষ্ট কুহেলিকা ছিন্ন কিছু নেই—তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধি অনাবৃত, তাঁর কল্পনা-মানস অতি সচেতন। তাই শুধু ভেঙেচুরে লোপাট করে দেওয়াই তাঁর সাহিত্যের প্রধান কথা নয়, তাকে গড়ে তোলার মন্ত্রও তাঁর সাহিত্যে স্বপ্রকাশ। একটি গভীর প্রত্যয়ভূমি আর আদর্শবাদ তাঁর ভাঙার গানের ছত্রে ছত্রে অনুরঞ্জিত। এরই ফলে বাঙলা দেশে তিনি বরেণ্য হয়ে উঠলেন।

নজরুলের কাব্য সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কথা যে তাঁর কাব্য অবজেকটিভ ধর্মীর সঙ্গে সাবজেকটিভ ধর্মীর সংমিশ্রণে রচিত। নজরুলের সমসাময়িক কবিদের কাব্য অত্যন্ত সাবজেকটিভ ধর্মী, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বেশীর ভাগ। যে উচ্চতর ভাবসাধনা ও কল্পকল্পনার সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ এক অভিনব কাব্যলোক প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁরা তাকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মত অত্যুচ্চ ভাবকল্পনার অধিকারী তাঁরা ছিলেন না কাজে কাজেই কৃত্রিম রসাবেশ এবং ভাবালুতাকেই তাঁরা কাব্যের ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দিয়ে কবিধর্ম ও কবিকর্মকে পরম মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ করে তুলেছিলেন। কাব্যের এই ভাবগত এবং রীতিগত কৃত্রিমতাকে নজরুল নিজের সাধনার মধ্য দিয়ে সুতীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আমরা সেদিন "বিদ্রোহী" কবিতার মারফতে সর্বপ্রথম উপলব্ধি করলুম যে রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত সাহিত্যাদর্শই সাহিত্যের একমাত্র আদর্শ নয়, সাহিত্যের অন্য আদর্শও রয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর কথায় বলা যেতে পারে, "....একথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি। ...সত্যেন্দ্রনাথকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথেরই সংলগ্ন কিংবা অন্তর্গত, আর নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের পরে অন্য একজন কবি—ক্ষুদ্রতর নিশ্চয়ই কিন্তু নতুন। ....তিনি দেখিয়ে ছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের পথ ছাড়াও অন্যপথ বাংলা কবিতায় সম্ভব। যে আকাঙ্খা তিনি জাগালেন, তার তৃপ্তির জন্য চঞ্চল জেগে উঠলো চারদিকে : এলেন স্বপন-পসারী'র মোহিতলাল, এলো যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অগভীর কিন্তু তখনকার মতো ব্যবহার যোগ্য বিষমিতা, আর এই সব পরীক্ষার পরেই দেখা দিলো 'কল্লোল' গোষ্ঠীর নতুনতর প্রচেষ্টা, বাংলা সাহিত্যের মোড় ফেরার ঘণ্টা বাজলো।" (রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক) এদিক দিয়ে নজরুলকে যুগপ্রবর্তক বললেও অত্যুক্তি হয় না। বলা বাহুল্য নজরুলের রচনায় সাহিত্যিক বিদ্রোহ যতটা নয়, ততটা তাঁর রচনায় আছে সামাজিক রাজনৈতিক বিদ্রোহের প্রকাশ। এইখানেই মধুসূদনের সঙ্গে নজরুলের তফাৎ ধরা পড়ে। মধুসূদনের বিদ্রোহ প্রধানত সাহিত্যের ভঙ্গী নিয়ে—অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনায়, সেখানে গৌণ হল সামাজিক বিদ্রোহ। আর নজরুলের বিদ্রোহ ছন্দের কারুকার্য বা ভঙ্গী নিয়ে নয়, সামাজিক অন্যায় অবিচার, জীবনের আবর্জনা ইত্যাদিকে সাহিত্যের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করার মধ্যে।

নজরুল আর্টের ব্যাখ্যা করেছেন, "আর্টএর অর্থ

সত্যের প্রকাশ (Execution of truth) এবং সত্যাঘাতেই সুন্দর, সত্য চিরমঙ্গলময়। তাই দেখি সমাজে-রাষ্ট্রে, ধর্মে-কর্মে, আইনে-কানুনে সত্যের অবমাননা যেখানে দেখেছেন, নজরুল রুদ্রের মত সেখানেই সংহারমূর্তি ধারণ করেছেন। গ্যেটে বলতেন, "প্রতিভার কাছে আমাদের প্রথম এবং শেষ দাবী সত্যপ্রীতি।" নজরুল এই দাবী পূরণ করে অগণিত জনতার হৃদয় জয় করেছেন। নজরুল সাহিত্যে কোন দর্শন নেই বলে অনেকেই অনুযোগ করেন কিন্তু নজরুলের এই সত্যপ্রীতিই হোল তাঁর জীবনদর্শন। এই সত্যপ্রকাশের ব্যাকুলতা তাঁর সাহিত্যে নানাভাবে অভিব্যক্ত। কোন বাঁধাধরা আদর্শ, বিশেষ দার্শনিক বা দলীয় রাজনৈতিক বুলিকে কেন্দ্র করে এই জীবনদর্শন রচিত হয়নি—পরানুকরণকে তিনি ঘৃণা করেছেন। "যুগবাণী"তে বলেছেন, "তোমার কি নিজের ব্যক্তিত্ব নাই যে, কে কি করিল আগে দেখিয়া তবে তুমি কিছু কিছু পো ধরিবে? নেতা কে? বিবেকই তো তোমার নেতা, তোমার কর্তব্য জ্ঞানই তো তোমার নেতা।" (গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ) তাই তাঁর জীবনদর্শন কারোর কাছে আত্মসমর্পণ নয়, আত্ম-বিশ্বাসই তাঁর দর্শনের মূলকথা।

প্রকৃত কবি বা শিল্পী হচ্ছেন তিনিই যাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যুগপ্রতিচ্ছবি; তাই টি, এস, এলিয়েটের মতে 'the progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual extinction of personality' এ উক্তি নজরুলের জীবনে সত্য। কেননা যে যুগে তাঁর আবির্ভাব সে-যুগের মানসরূপ তার কাব্যে সাহিত্যে ধরা পড়েছিল—ধরা পড়েছিল বৈপ্লবিক যুগের চিত্তমূল দলিত মথিত প্রতিচ্ছবি। তিনি ছিলেন সে-যুগের প্রধান কবি-কর্মী। তাঁর প্রতিভায় বিস্ময়মুগ্ধ হয়ে কবিকবি রবীন্দ্রনাথকেও সেদিন বলতে হয়েছে, "অকুণ্ঠ বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা তার অনবদ্য ভাব-মূর্তি রয়েছে কাজীর কবিতায় ও গানে। কৃত্রিমতার ছোঁয়াচ, তাকে কোথাও ম্লান করেনি, জীবন ও যৌবনের সকল ধর্মকে কোথাও তো অস্বীকার করেনি। মানুষের স্বভাব ও সহজাত প্রকৃতির অকুণ্ঠ প্রকাশের ভিতর নজরুল ইসলামের কবিতা সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে তার আসন গ্রহণ করেছে।" তাই আবির্ভাব মাত্রই অসামান্য লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তিনি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্মকথা

—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

"আমি ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সংকল্প করি। পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ দুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর। আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটা-জুট-মণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত-দেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃসন্ন্যাস আমার মতবিরুদ্ধ।.....

"আমার মতে তাঁহাকে আনিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ! আকাশ পাতাল প্রভেদ। ফলতঃ আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল। তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে।

—(স্বরচিত জীবন-চরিত)

বিপ্লব যুগের অবিস্মরণীয় কাহিনী

শোভনা নন্দী

ভারতের তথা বাংলার মুক্তি সংগ্রামের বীরদের মরণ মহোৎসবের উল্লাস সেদিন আকাশে বাতাসে প্রাণের আবর্ত তুলেছিল। রক্তপঙ্কেই স্বাধীনতার স্বর্ণ-পদ্ম ফোটে, রক্ত কর্দমের পুণ্য পথেই স্বাধীনতার সোনার রথ নেমে আসে। যাঁরা মহাব্রত গ্রহণ করে থাকেন বিধাতা তাঁদের অগ্নি পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে সেই ব্রতের মহত্বকে উজ্জ্বল করে জগতে প্রকাশ করেন। দেশপ্রেমী সাধকদের সেদিন রাজচক্রের যে অপমান নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল মাতৃভূমির করুণ করস্পর্শে তা বরমাল্যরূপে তাঁদের কণ্ঠ ভূষিত করেছিল। সৈনিকের পবিত্র নিষ্ঠাব্রত নিয়ে স্বাধীনতার মশাল জ্বালিয়ে সেদিন তাঁরা সাংসারিক সকল ভোগ-বিলাস, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম আনন্দ, স্নেহের সকল বন্ধনকে উপেক্ষা করে একা পথে বের হয়েছিলেন, কেউ সঙ্গে এল কি না এল, তা দেখার তখন ফুরসৎ ছিল না। অতীত ভারতের গৌরবময় ইতিহাস সেই আত্মভোলা সাধকদের এক অমোঘ বীর্যে বীর্যবান করে তুলেছিল!

"যার বেন জীবন চলে,
শুধু ভগত যাবে, তোমার কাজে, বন্দে মাতরম বলে।"

এই ছিল তাঁদের মূলমন্ত্র, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও সাধনা। আজ স্বাধীন ভারত 'শহীদ' বলে সেই মরণ বিজয়ী বীরদের স্মৃতি পাদমূলে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁদের মহান ত্যাগের মূল্য দিচ্ছে কিন্তু ভুলতে পারি না কত অবজ্ঞা কত লাঞ্ছনা তাঁদের ওপর দিয়ে গেছে! সে দিনে রাজরোষের ভয়ে নিজ স্বার্থহানির উৎকণ্ঠায় আমরা কত না ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি এই সব পুণ্যাত্মাদেরকে সাধারণ চোর ডাকাতের পর্যায়ে ফেলে কঠোর মন্তব্য করতে দ্বিধা করিনি, এক মুষ্টি কুধার অন্ন, এক রাত্রির একটু আশ্রয় দেবার মত সাহস ছিল না! সে সব কথা ভোলার নয়। আজও মনে হলে চোখের জল রাখতে পারি না।

নূতন করে ভারতের ইতিহাস রচনায় আজ সুধীজন মনোনিবেশ করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় পুণ্যকাহিনী পত্র-পত্রিকা, পুস্তক মারফত বহুল ভাবে প্রচারিত হলেও সে দিনে শতে সহস্রে যে সব কিশোর কিশোরী, তরুণ তরুণী, প্রবীণ প্রবীণা, অশিতিপর বৃদ্ধ বৃদ্ধা স্বাধীনতা বেদীমূলে নীরবে আত্মাহুতি দিয়ে গেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ আজও হয়ত অনেক অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

বাংলার বিপ্লবযুগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ হবার পরম সৌভাগ্য একদিন আমার জীবনে ঘটেছিল। আমি আজ জীবন সায়াহ্নে উপস্থিত, সেদিন যা দু'চোখ ভরে দেখেছিলাম, দু'কান ভরে শুনেছিলাম, সে সব অপূর্ব কাহিনী আমার পরবর্তী কালকে শুনিয়ে যাবার একান্ত ইচ্ছাই আমার এই প্রবন্ধের মূল উৎস। সে দিনের সে সব অবিস্মরণীয় ঘটনাগুলি মনে হলে আজও শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। বিস্ময়ে হৃদয় আপ্লুত হয়, বিধাতার কৃপায় এদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে নিজেকে ধন্য মনে হয়। না জানি কত বড় আদর্শ কত বড় প্রেরণাই এঁদেরকে অমন করে পাগল করে তুলেছিল! জীবন নিয়ে সে কী ছিনিমিনি খেলাই না দেখেছি!

"জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনা হীন"

কবিগুরুর এই দুটী ছত্র যেন তাদের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

আমার একটী ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সে দিনে বৈপ্লবিক

আন্দোলনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সে যুগের বহু ঘটনার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে পড়েছিলাম।

স্বনামধন্য বৈপ্লবিক উল্লাস কর দত্ত আমার ননিহাল আত্মীয়। উল্লাসের মা আমার শ্বশুর মহাশয়ের কনিষ্ঠা সহোদরা। সে আমার ছোট বোনকে বিয়ে করছে অবিশ্যি বহু পরে। হ্যারিসন রোড্ ষোলা মামলার আসামী ৺নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বরদী গুপ্ত, আমার মামাতুত আর অশোক নন্দী আমার নিজের দেওর। ডালহৌসী মামলার বিনয় বাদল, দীনেশের বাদল গুপ্ত আমার ভাসুর পুত্র, নগেন বরদীর বড় দাদার ছেলে। এদের মধ্যে উল্লাস ও বাদলই সক্রীয় ভাবে বৈপ্লবিক কাজে অংশ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু নগেন বরদী বা অশোক এদের কেহই কোনও দলভুক্ত ও ছিলই না এমন কি এ রকম গুপ্ত সমিতি বা তাদের আদর্শ সম্বন্ধে তারা ঘুনাক্ষরেও কিছুই জ্ঞাত ছিল না বিধিচক্রে পড়েই তারা বিনাদোষে জড়িয়ে পড়েছিল সে বড় করুণ কাহিনী!

উল্লাসের সঙ্গে নগেন বরদীর কোনও রক্ত সম্পর্ক না থাকলেও উল্লাসের মামাবাড়ী আর নগেনের মামাবাড়ী এক ছিল, এদের সকলেরই বাল্য ও কৈশোরের অধিকাংশ সময় আমাদের বাড়ীতে কেটেছে। আমার পুণ্যশ্লোক শ্বশুর মহাশয় স্বনামধন্য সাধক ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নাম সে দিনে পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানকে ছেয়ে ফেলেছিল এবং তাঁরই স্নেহ ছায়ার একই শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে এক পরিবারের ছেলের মতই এরা সকলে বড় হয়ে উঠেছিল। নগেনের সঙ্গে উল্লাসের ভাবও ছিল খুব।

উল্লাসের বাবা ৺বিজয়লাল দত্ত সেদিনের Chirencester Scholar বৃত্তিধারী প্রথম দলের অন্যতম একজন। তদানীন্তন ইংরাজ সরকার কয়েকটী উচ্চ শিক্ষিত যুবককে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য উক্ত বৃত্তি দিয়ে বিলাত পাঠান। তখনও দেশে কৃষি বিদ্যালয় বা Agriculture Collegeএর তেমন সুব্যবস্থা হয় নি তাই দেশে ফিরে এসে প্রথম দিকে দিনেশদাই (উল্লাসের বাবা) বেথুন কলেজে অধ্যাপক হন। স্বর্গীয়া কবি কামিনী রায়, বেথুনের প্রাক্তন অধ্যক্ষা কুমুদিনী বসু, লেডী অবলা বসু প্রভৃতি তাঁর ছাত্রী ছিলেন। সেদিনের বিলেত ফেরতদের মত দিনেশদাইও সাহেবী-আনার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন, চাকর বাকর লোক জনের কাছে তাঁরা ছিলেন সাহেব, মেম সাহেব আর ছেলেমেয়েরা বাবা, মিলি বাবা! ছেলেরাও ছিল হাট্ কোট্, টাই বুট পোলিশ পাক্কা সাহেব! দিনেশদাই ছিলেন অত্যন্ত ইংরাজ ভক্ত কিন্তু বিধাতার এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস শেষে এই পরিবারের ছেলেই একদিন দেশের শত্রু বলে ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে জীবন পণ করে বসল।

সে সময়টা ছিল স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। এ সব আন্দোলনের সঙ্গে দিনেশদাই-এর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ত ছিলই না বরং বিরুদ্ধাচারণেই বেশী উৎসুক ছিলেন। দিদিমার (উল্লাসের মার) মনোভাব ছিল কিন্তু একেবারে বিপরীত, স্বামীর মতের বিরুদ্ধে চলা তেমন সম্ভব না হলে ও মনে মনে স্বদেশী আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করতেন, বাড়ী শুদ্ধ সকলে বিলাতী জিনিষ ব্যবহার করলেও নিজে তিনি বঙ্গলক্ষ্মীর মোটা কাপড় পরতেন। দিনেশদাই-এর রাগ বিরক্তি বা উপহাস কিছুই তাঁকে সংকল্পচ্যুত করতে পারেনি, তিনি নিঃশব্দে আপনার বিবেকানুমোদিত পথ অনুসরণ করলেন। উল্লাস কিন্তু এ আন্দোলন থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারে নাই। কোনও বিধিনিষেধ বা উৎপীড়নেই তার মনের গতি রোধ সম্ভব হয়নি। তার মধ্যে যে কী করে এ পরিবর্তন সম্ভব হল বলা শক্ত তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পালের প্রভাবই-এর একমাত্র কারণ। স্বদেশী আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্বে ১৯০৪ সালে আমার বিয়ে হয়, উল্লাসের পরিবারের সঙ্গে পরিচয় অল্পদিনের থাকলেও এসময় থেকে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ে। উল্লাসের সহজ সরল আমুদে স্বভাবের গুণে সে আমার বাবার অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেও বাবাকে যেন ছায়ার মত অনুসরণ করতো যেখানে বাবার বক্তৃতা সেখানেই সে যাবে এর জন্য বাড়ীতে বকুনীও খেতে হয়েছে কম নয়।

তখনও উল্লাস কোন হদ্‌হুক্ত হয়নি একটী আকস্মিক ঘটনায় তার জীবনের মোড় ঘুরে গেল, বয়সও মনে পড়ে ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯০৬ সালের শেষ ভাগে। উল্লাস তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। একদিন একজন ইংরাজ অধ্যাপক—নামটা যতদূর মনে হয় Russel, ক্লাশে পড়ানোর সময় বাঙালী জাতির প্রতি স্নেহাত্মক ও অপমানজনক উক্তি করেন। ছাত্রেরা অধ্যাপকের এই অশোভন ব্যবহারে মনে মনে ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধ করলেও প্রকাশ্য প্রতিবাদে কারও সাহস হ'ল না। উল্লাস কিন্তু জাতির প্রতি এ অপমান নীরবে হজম করতে পারল না, পরের দিন কলেজ যাওয়ার সময় বগলে খাতা-পত্রের সঙ্গে এক পাটী চটী সযত্নে কাগজে মুড়ে নিয়ে গেল এবং টিফিনের সময় প্রকাশ্য দিবালোকে জনাকীর্ণ স্থানে সাহেবের গালে চটী দিয়ে সজোরে মেরে 'বাঙালী জাতির প্রতি অপমানের প্রতিশোধ' বলে সটান কলেজ থেকে বের হয়ে এলো। এর পরিণাম সহজেই অনুমেয় বিশেষ কে দিবে। কর্তৃপক্ষ মহলে হলস্থুল পড়ে গেল—একটা বাঙালী ছেলের এতবড় সাহস! সে দিনে এরকম ব্যাপার ছিল স্বপ্নেরও অতীত, বিশেষ ছাত্র মহলে! কর্তৃপক্ষ সশঙ্কিত হয়ে উঠলেও প্রতিকারের পথ কোথায়। শত শত ছাত্রের সামনে ঘটনা ঘটলেও কার্য-কালে একটী সাক্ষীও পাওয়া গেল না কাজেই তখনকার মত কিল খেয়ে কিল চুরি করতে হল। সে দিন বাড়ী এসে বইগুলি টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে আমায় বলে কলেজের সঙ্গে সব সম্পর্ক আজ থেকেই ইতি! আমি ও অবাক কিন্তু প্রশ্ন করেও কোন উত্তর পেলাম না অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখ! পরের দিন প্রাতে-খবরের কাগজে বড় বড় হরফে সাহেব মারার কাহিনী! চারদিকে খুব হৈ-চৈ পড়ে গেল-অজ্ঞাতনামা কোনও বাঙালী ছাত্রের আত্মমর্যাদা বোধ ও সৎসাহসের প্রশংসায় আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠ্‌লো! উল্লাসই যে এ ঘটনার নায়ক সে কথা আমরা জেনেছিলাম পরে এবং বন্ধু বান্ধব মহলেও এই গোপন তথ্য বেশী দিন লুকান রইলো না। বাস্তবঃ এ-ব্যাপার সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য না হলেও অপরাধীকে ধরার জন্য পোলেজা বিভাগের যে রীতিমত তোলপাড় চলছিল পরের এক ঘটনায় তা প্রতীয়মান হয়ে গেল।

উপরোক্ত ঘটনার অব্যবহিত পরেই আমি দেশের বাড়ী চলে যাই তিনমাস পর ফিরে এসে উল্লাসদের বাড়ীতে এক নবাগতা মহিলাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় পিসিমা উত্তর করলেন, সে কী তুমি চিন্‌তে পারলে না? এ যে আমার ভাগ্নে বউ তোমার পিসি। আমি ত শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লাম! বছর দুই আগে মাত্র পিসিকে দেখেছি তার সঙ্গে এ মেয়েটীর না চেহারা না বয়স কোথাও বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম না। কেমন যেমন খটমট খেয়ে গেলাম তখন কিছু না বলেও এমন এক অস্বস্তিকর অবস্থায় সারাদিন কাটল। মনের মধ্যে এই কথাই তোলপাড় করতে লাগল। শেষে সন্ধ্যার সময় পিসিমার কাছে আমার সন্দেহের কথা গোপনে জানালাম। তিনি বলেন এ তত্ত্ব ও আগেই করেছিল, তুমি আস্‌ছ শুনেই বলেছিল বেশ হয়ে চেহারা যা হয়ে গেছে ভাইঝি আমার চিন্‌লে হয় আমি কিন্তু কোনও মতেই এ কথা মেনে নিতে পারলাম না এই পিসি সম্পর্কে যাবার মামাত বোন, উল্লাসের পিতৃতুত ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়, স্বামীর অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে খৃষ্টান মিশনারী মেয়েদের প্রয়োচনায় তাঁরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। এঁর বিবাহিত জীবনের দুঃখপূর্ণ কাহিনী সকলেই জানতেন। পিসিমা এঁকে আগে দেখেন নি, সেদিন যখন এসে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন যে কদিনের জন্য কলকাতায় এসে শুনলেন—তাঁরা এখানে আছেন তাই দেখা করতে এসেছেন। একথা শুনে পিসিমার মাতৃহৃদয় সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে উঠল আমন্ত্রণ জানাতে মুহূর্ত দেরী হল না। যাক কয়দিন সে এক অদ্ভুত পরি-বেশের মধ্যে দিন কাটতে লাগল। আমার মনের সন্দেহের কথা নিয়ে সবাই আলোচনা করতে লাগলেন কিন্তু কেউই আমার কথা সত্য বলে মেনে নিলেন না বরং উল্টে সেন আমিই বিরক্তি ভাজন হয়ে পড়ছি দিনের পর দিন। এদিকে আমারও জেদ বাড়তে লাগল প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন দিয়ে তাকে জর্জরিত করে তুল্লাম, সে কখনও বাপের নাম

বলতে ভাইয়ের নাম বলে, কখন ভাইয়ের নাম বলতে আমার নাম বলে। আমাকে সেও যেন বেশ একটু ভীতির চোখে দেখতে লাগল। তাতে একটা অস্বাস্তিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হল। পিসিমা পিসেমশাইএর মনে এর পরিচয় সম্পর্কে কোনও সন্দেহ স্থান পেল না, বল্লেন—বহু দুঃখ পেয়ে ওর মাথার ঠিক নেই ইত্যাদি। এদিকে আমার সন্দেহ উত্তরোত্তর দৃঢ় হয়ে উঠল ও শেষ পর্যন্ত আমাকে ভেকে সন্দেহ নিরসনের জন্য যে দিন বিকালে বাসাতে আসার জন্য খবর পাঠান হল সেদিন সন্ধ্যার পর আসার সময় তার খোঁজ আর পাওয়া গেল না। শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পাশেই ছিল কৃষি কলেজ (Agricultural College) পিসেমশাই তখন ছিলেন এখানের অধ্যক্ষ। গঙ্গার ধারে কৃষি কলেজ সংলগ্ন বিরাট বাগান ও কম্পাউণ্ডের মধ্যে ছিল পিসেমশাইএর কোয়ার্টার। বাড়ী শুদ্ধ সকলে মিলে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত তন্নতন্ন করে খোঁজ হল সবই বৃথা সে যেন হাওয়া হয়ে গেল। তখন সবাই যেন আমার এর জন্য দায়ী মনে করেছেন। পিসিমা ছল ছল চোখে বল্লেন মেয়েটার কপাল, হয়ত গঙ্গায় ডুবেই মরলো, পিসেমশাই বল্লেন বড় বউমা বক্তার মেয়ে ত, তাঁর উকীলের জেরার চোটেই মেয়েটা টিকতে পারল না। মেয়েটি যে কোন গুপ্ত অভিসন্ধি নিয়ে এবাড়ীতে ঢুকেছে সে বিষয়ে আমি মনে মনে নিঃসন্দেহ হয়ে গেলাম কিন্তু কি উদ্দেশ্য যে এই মিথ্যা পরিচয়ের পেছনে থাকতে পারে তার কোনও হদিশ পেলাম না—সে এক অদ্ভুত অস্বাস্তিকর পরিবেশ। মুখে স্বীকার না করলেও এক আধটুক সন্দেহ কারও মনে যে বাসা না বাঁধল তা নয়। যা হোক এই ঘটনার দিন তিনেক পর অপরিচিত মেয়েলি হাতের লেখা পিসিমার নামে এক চিঠি এল—নীচে সই হতভাগিনী কন্যা। আমার তথাকথিত পিসিটী যা লিখেছিলেন তা আজও স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।—আমি পুলিশে কাজ করি সত্যিই আমি জ্ঞানদা (পিসির নাম) নই। আমি খৃষ্টান তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণ নগরে মিশনে ছিলাম, তিনি আমায় খুব স্নেহ করতেন তাঁর জীবনের কথা আমায় বলেছিলেন সেই সূত্রে বিপিন পাল ও আপনাদের সম্বন্ধে অনেক সংবাদ আমার জানা ছিল। পুলিশ বিভাগ থেকে যখন আপনাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে আদিষ্ট হলাম তখন জ্ঞানদার পরিচয়ে পরিচিত হবার সুযোগ গ্রহণে দ্বিধা করি নাই কিন্তু হিসাবে আমার ভুল হয়ে গেল আপনার বউমার কাছে ধরা পড়ে গেলাম। তাঁর সন্দেহ সত্ত্বেও আপনাদের কাছ থেকে যে স্নেহ ও সদ্ব্যবহার পেয়েছি তা কল্পনাতীত। এমন দেবতুল্য পরিবারের অনিষ্ট সাধনে নিজেকে নিয়োগ করেছিলাম মনে করতে গ্লানির আমার শেষ নাই—নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মেছে। আজ থেকে এ কাজ ছেড়ে দিলাম। জীবনে আর দেখা হবে না। আশীর্বাদ করবেন অর্থ লোভে এমন পাপে যেন আর লিপ্ত না হই।

আপনাদের অনেক কষ্ট দিলাম, ক্ষমা চাই। আর এক কথা—আপনার মেজ ছেলেটীকে একটু সাবধানে রাখবেন এর অধিক বলার নেই। চিঠি পড়ে সকলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও হতবাক হয়ে গেল। এরকম একটা ব্যাপার ছিল অভূতপূর্ব, আর কখন দেখি নাই, পরে অবশ্য এরকম বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার জীবনে ঘটেছে সময় সুযোগ পেলে পরে বলার ইচ্ছা রইল। পুলিশের হাতে কী পর্যন্ত লাঞ্ছনা ভোগ আমার জীবনে ঘটেছে সে সব একটা যেন গল্পকথা বলে মনে হয়। এতদিনে সকল রহস্যের সমাধান হ'ল পিসেমশাই কতক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন—বড় বউমার সন্দেহই সত্য, আমাদের কি বোকাই বানিয়ে গেল, এ সবই পালুর সাহেব মায়ার বাহাদুরী—পিসিমা কোনও কথা বল্লেন না তবে তাঁর মুখের দিকে তাকালে বুঝতে কষ্ট হ'ল না যে তাঁর বুকের মধ্যে কি ঝড়ই বয়ে যাচ্ছে, মার প্রাণ কি এর পর স্থির থাকতে পারে।

উল্লাসের মাতুল কুলের আভিজাত্য ও বংশগৌরবে যেমন পূর্বঙ্গ খ্যাতি আছে তেমনি ভক্ত ও সাধক কুল বলে আজও তাঁদের পরিচিতি ও অঞ্চলে কম নয়। পশ্চিমবঙ্গের রামপ্রসাদী মালসীর মত পূর্ববঙ্গে রামদুলালী মালসী একদিন বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। এই রামদুলাল নন্দী ছিলেন উল্লাসের প্রমাতামহ, ইনি কালী সাধক ছিলেন। তদানীন্তন স্বাধীন ত্রিপুরা রাজের দেওয়ানের পদে দীর্ঘকাল দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে খুব সুনাম অর্জন

করেন। এঁর রচিত নিম্নলিখিত গানটী আজও পল্লী অঞ্চলের ভিখারী বৈরাগীদের মুখে শোনা যায় :—

চেনেছি চেনেছি তারা
　　তুমি জান ভোজের বাজি
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে
　　তাতে তুমি হও মা রাজি।
যোগে বলে আত্মা তারা
গড্ বলে খ্রিষ্টানী যারা মা
খোদা বলে ডাকে তোমায়
মোগল পাঠান সৈয়দ কাজি
শাক্ত বলে তুমি শক্তি
শিব তুমি শৈবের উক্তি মা
সৌরী বলে সূর্য্য তুমি
বৈরাগী কয় রাধিকাজি।
গাণপত্য বলে গণেশ
ব্রহ্ম বলে তুমি ব্রহ্মেশ মা
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা
ঘর বলে মায়ের মাঝি।
শ্রীরাম দুলালে বলে বাজি নয় এ জেনো ফলে
এক ব্রহ্ম বিনা ভবে মন আমার হয়েছে পাজি।

উল্লাসের মাতামহ আনন্দ নন্দী ও একজন সাধক ছিলেন। তিনি প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেও শেষ দিকে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় মত প্রচার করেন। তাঁর প্রায় হাজার দশেক শিষ্য ছিলেন; তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্তরা তাঁকে আনন্দ স্বামী নামে অভিহিত করেন এবং তিনি এ নামেই আজও পূর্ব্ববঙ্গে নমস্য হয়ে আছেন। তাঁর রচিত বহু গানও আছে। উল্লাসের মামাও একজন কর্ম্মযোগী ও ভগবৎ বিশ্বাসী সাধক। তাঁর নিঃস্বার্থ সেবা, দেশপ্রীতি, অদ্ভুতপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তি ও ভগবানে অটল বিশ্বাস ও নির্ভরতার কথা আজও পূর্ব্ববঙ্গের লোক শ্রদ্ধায় স্মরণ করে। জনসাধারণ দুঃখী, দীন সবাইকার কাছে তিনি ছিলেন দয়াময়। এই একটী নামেই তাঁর চরিত্রের মাধুর্য্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। শ্রীঅরবিন্দ আমার শ্বশুর মহাশয়কে দেখে বলেছিলেন "বাঙ্গলার টলষ্টয় মহেন্দ্রচন্দ্র।" এমনি একটি ভক্ত বংশের দৌহিত্র উল্লাস। ছোটবেলা থেকেই তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মিষ্ট স্বভাবে সে সকলের অত্যন্ত প্রিয়। এমন আত্মভোলা সদা হাস্যময় তরুণী প্রাণ বড় কম দেখেছি। সে ছিল যেন আনন্দের প্রস্রবণ; তার আমুদে স্বভাবে সে ছোট বড় সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় ছিল। মনটা ছিল তার অত্যন্ত কোমল, কারও মলিন মুখ, চোখে জল সে সইতে পারত না, তাই এক এক সময়ে ভেবে অবাক হই এমন কুসুম পেলব হৃদয় যার সে কী করে আবার বজ্রের থেকে কঠিন হয়ে ছিল সেদিন! পৃথিবীর মানুষের কাছে যা কিছু কাম্য সব তুচ্ছ করে মাতৃভূমির উদ্ধারকল্পে আত্মনিবেদন—এ যে কত বড় ত্যাগ তা মনে হলে শ্রদ্ধায় মাথা আপনিই নুয়ে আসে। যেমন তার মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠ, তেমনি ছিল তার হেঁয়ালী ও বাঁশী বাজানতে অপূর্ব দক্ষতা! সে আমাদের বাড়ী গেলে বাড়ীতে উৎসব সুরু হ'ত, বড়রা পালু এসেছে বলে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌তেন। ছোটরা মেজদা এসেছে বলে আনন্দে কোলাহল করে উঠ্‌ত। শ্বশুর মহাশয় এ ভাগ্নেটীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আমার বাবাও উল্লাসকে, বিশেষ ক'রে তার প্রাণখোলা হাসিটুকু বড় ভালবাসতেন। একবার আমরা কিছুদিন বেলতলায় দেশবন্ধুর ভগ্নিপতি আমার পিতৃবন্ধু শরৎচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলাম। প্রতিদিন প্রায় সন্ধ্যার সময় সে ট্রাম থেকে নেমে তার চড়াগলায় গান গাইতে গাইতে আসত পাড়ার লোকেরা সবাই সে গান শোনার জন্য শরৎবাবুর বৈঠকখানায় এসে জড় হতেন, বহু বৃদ্ধারাও আসতেন। প্রায়ই দেশবন্ধুও আসতেন। তিনি উল্লাসের গান যেমন ভালবাসতেন, তেমনি ভালবাসতেন তার Caricature শুনতে।

প্রেসিডেন্সী কলেজের ব্যাপারের পর উল্লাস আর কলেজে গেল না। নিশেষশাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, সে তবু নীরব। মাকে বলে, যারা আমার দেশকে আমার ভাতকে অপমান করে তাদের কাছে পড়বো! আমার অনু-মর্য্যাদাবোধ কি একেবারে গেছে! মাতৃভূমির অপমান তার বুকে যে কত গভীর ও মর্ম্মান্তিক ভাবে আঘাত

করেছে তা বুঝতে মার দেরী হ'ল না। তিনি নীরবে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বাপের চিরদিনের ইচ্ছা ছেলেরা লেখাপড়া শিখে কৃতী হয়ে দশজনের একজন হবে—যা সাংসারিক মানুষের কাম্য····কিন্তু তাঁর সকল আশায় ছাই পড়ল। ছেলের এ সব দিকে দৃকপাতও নেই! পিসেমশাই বাবার শরণাপন্ন হলেন, বল্লেন তোমার কথা শোনে, ওকে একবার বল। বাবা বল্লেন, দেশে না পড়তে চাও বিদেশ যাও। উত্তর করলে—শিক্ষার জন্য বিদেশের শরণাপন্ন ছিঃ! যাক, শেষ পর্যন্ত বাবার মধ্যস্ততায় টেক্সটাইল পড়তে বম্বে যাওয়া স্থির হল—পিসেমশাই সানন্দে প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। ছেলে বম্বে গেল কিন্তু সবই বৃথা! দেশ মাতৃকার আহ্বান যার কাণে একবার এসেছে তাকে কি আর আটকান যায়। অল্প কিছুদিন পরই উল্লাস ফিরে এল, বল্লে এ সব আমার দ্বারা হবে না। বাড়ীতে আবার অশান্তির শেষ নেই। পিসেমশাই বল্লেন বাউণ্ডুলে ছেলেগুলোর সঙ্গে মিশে সাহেব ঠেঙিয়ে মনে করছ দেশ উদ্ধার করবে ইত্যাদি। ভক্ত পিতার সন্তান পিসিমা স্বামীকে বল্লেন—উতলা হয়ো না, দয়াময় যা করেন তা মঙ্গলের, এ বিশ্বাস কেন আমরা হারাব। তিনি ইচ্ছাময় তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কি চলতে পারে! আমাদের উপর এই তাঁর বিধান, এ বিধান মাথা পেতে যে নিতেই হবে। তবে এটুকু বিশ্বাস করি পিতৃপুরুষের আশীর্বাদে মূর্খ হয়ে থাকলেও কুপথে আমাদের ছেলে কখনও যাবে না। স্ত্রীর এই বিশ্বাস ও দৃঢ়তার কাছে পিসেমশায় নতি স্বীকার করলেন।

বম্বে থেকে আসার পরই উল্লাসের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষিত হতে লাগল। সে প্রাণখোলা হাসি নেই হৈ চৈ গান বাজনার ধুম আর নেই, কথা কদাচিৎ বলে, সর্বদা যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। বিয়ের পর থেকে এই দেওরটীই ছিল অপরিচিত স্থানে আমার বন্ধু, পরামর্শ-দাতা, এখন কিন্তু তার কাছে এগুতে সাহস নেই, তাকে দেখলে মনে সম্ভ্রম জাগে। আজীবন প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত পালিত উল্লাস আজ হ'ল সন্ন্যাসী! কোথায় গেল তার সাজপোষাক, বিলাসিতা। এক সন্ধ্যা নিরামিষ আহার, মোটা ধুতিচাদর অঙ্গাবরণ, পায়ে জুতা নেই! এই কৃচ্ছ্র-সাধনের উদ্দেশ্য কি—ধারণা করতে পারতাম না। একদিন শেষ রাত্রে উঠে দেখি ওর ঘরে আলো, জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলাম গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে গীতা পাঠ করছে। সেদিনকার ব্রাহ্ম বাড়ীতে এ ব্যাপার ছিল অভাবনীয়! পিসিমা ও ওকে বল্লাম, রামকৃষ্ণ আশ্রমে যোগ দিয়েছে বলেই সকলের ধারণা হল, শুনে এতদিনে পিসেমশাইর মানসিক উদ্বেগও খানিকটা প্রশমিত হ'ল। ধর্ম সাধনই যে তার মূল লক্ষ্য এতে সাংসারিক মানুষের মনে খানিকটা দুঃখ হলেও তাতে ত ক্ষোভ থাকে না। ক্রমে বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক উঠে গেল, কখনও কখনও অনেক রাত্রে এসে প্রত্যূষে চলে যেত, সে সময় কোনও কোন দিন গভীর রাত্রে প্রাণ মাতান বাঁশীর সুরে ঘুম ভেঙে যেত, বুঝতাম লালু এসেছে কিন্তু ভোরে উঠে কদাচিৎ দেখা পেতাম। তার এই কৃচ্ছ্রসাধনে ক্রমেই শরীর কৃশ হয়ে উঠ্‌লেও স্বাস্থ্য তার ভালই রইল।

ধর্ম সাধনই যে উল্লাসের জীবনের লক্ষ্য এতে ভাবনার কিছু নেই। তার সংসারী মানুষের সঙ্গে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী—এ কথা সকলেই বুঝতে পারলেন। মনে হলে আজও আশ্চর্যবোধ হয় যে এতদিন একত্র থেকেও তার সাধনার মূল লক্ষ্য বা আদর্শ সম্বন্ধে দুনাক্ষরেও একটী কথাও আমাদের জানতে দেয়নি, এমনি ছিল সে দিনের সর্বত্যাগী বিপ্লবীদের মন্ত্রগুপ্তি! ক্রমে বাড়ীর সঙ্গে তার সম্পর্ক একেবারেই মুছে গেল, দিন, সপ্তাহ, মাস পর হয়ে যায় তবু তার দেখা নেই। মুখে কিছু না বল্লেও, মার চোখে মুখে গভীর উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে। তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে অথচ মুখ ফুটত না। পাছে তাঁর মানসিক উদ্বেগ স্বামীর মনকে ব্যাকুল করে তোলে এই ভয়ে তিনি সশঙ্কিত।

সকল কাজের মধ্যে তাঁর মন পড়ে থাকত এই সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী পুত্রের দিকে। অবসর সময়ে পথের দিকে চেয়ে থাকতেন, কতদিন লক্ষ্য করেছি চোখে জল-ধারা। কখনো কখনো গভীর রাত্রে বিছানায় হাতজোড় করে বসে থাকতেন, বুঝতে পারতাম—ছেলের মঙ্গল কামনায়

দেবতাবরণে যার কাছে প্রার্থনা। পিসিমার মানসিক অবস্থা যতই তিনি চেপে রাখুন, আমাদের কাছে লুকান থাকত না। পিতামাতার স্নেহ মমতার বন্ধন ছিন্ন করে সন্তান চলে যাচ্ছে—মার বুকে এ যে কী ব্যথা তা সকলেই জানেন। ইতিমধ্যে আর একটী ঘটনায় সব যেন বিপর্যস্ত অবস্থায় এসে দাঁড়াল।

পিসেমশাইএর কোয়ার্টার্স ছিল প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে কৃষি কলেজের অনতিদূরে ছটী ছোট বাংলোয়। বড়টায় পিসিমা পিসেমশাই ও মেয়েরা আর ছোটটাতে ছেলেরা থাকত। দুটী বাড়ীর মধ্যে মস্ত মস্ত বড় কয়টা গাছ ছিল, জায়গাটা ছিল খুব নিরিবিলি। একদিন উল্লাসের ছোট ভাই সুখলাল ওর অনুপস্থিতিতে ঘর থেকে একটা বলের মত জিনিষ খেলাচ্ছলে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে কী প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ ও ধুঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল! আমরা সব ছুটে এলাম কিন্তু এগোয় কার সাধ্য। ধুঁয়া কমলে দেখি প্রকাণ্ড একটা গাছের গুঁড়িতে নানা সাইজের অজস্র পেরেক লোহার টুকরা ইত্যাদি গেঁথে গেছে। গাছের পাতা চারদিকের ঘাস সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমরা ত ভয়ে আতঙ্কে আড়ষ্ট। আজকের দিনের মত বোমা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকা দূরের কথা সেটা কি তাও জানি না! এটা যে কী ব্যাপার তা সম্যক অর্থবোধ না হলেও মারাত্মক একটা কিছু, তা বুঝতে দেরী হল না! কিন্তু এ জিনিষ এলো কোথা থেকে—এ রহস্য-সমাধান হ'ল সুখলালের কথায়। সে বলে মেহগনি গাছের তলায় কতগুলো কাপড়ের নীচে ছিল; বিধাতার বিশেষ দয়া সেদিন সুখলালের প্রাণ রক্ষা হয়েছিল।

আমার বরাবরই বই পড়ার ঝোঁক ছিল কাদম্বিনী আগে উনি ক'খানা নিহিলিষ্ট নভেল এনে দেন তা থেকে রাশিয়ার সেদিনকার রাজনৈতিক অবস্থা ও গুপ্তসমিতি সম্বন্ধে অনেক কিছু পড়েছিলাম এখন সে সব মনে হল। তবে কি এঁরা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন—বারণ আমাদের ভুল? মনে নানা সন্দেহ জাগল। এদিকে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল প্রচ্ছন্ন বৈপ্লবিক আন্দোলনের কথাও ত ইথারিং কাণে আসত। স্বামীও যে এসব আন্দোলনের প্রতি মনে মনে অনেকটা সহানুভূতিশীল তাঁর কথার আভাসে তাও আমার অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু সেদিনে এসব ব্যাপার নিয়ে খুব অন্তরঙ্গের সঙ্গে ও প্রকাশ্য আলোচনা হত না। এসব ছিল অত্যন্ত গোপনীয় তত্ত্ব। আমার মনের গোপন কোণে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা কম ছিল না, তবু স্বার্থান্ধ মানুষ আমরা, এ পথ যে কুসুমাস্তীর্ণ নয়, পদে পদে বিপদ, তাও অজানা নয়। আপন জন এপথে যাবে এ আকাঙ্খা ত হয় না, তাই উল্লাসের জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠলেও দেশ মাতৃকার সেবায় জীবন পণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে আমাদের চোখে সে যেন দেবতারূপে প্রতিভাত হ'ল! সেদিনের কথা আজও ভুলি নি।

এই একটী দিন দেখলাম পিসিমার অবিচলিত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে গেল। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়ে আবেগ আকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন সবই ভুল, সে যে দেশসেবায়, দলের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে এযে আমার কতবড় গর্বের কথা তা ত বলার নয়, কিন্তু কি বলে তার স্নেহশীল দুর্বলচেতা বাপকে বোঝাব! সেদিন পিসেমশাই বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁর কাছে এ দিনের ব্যাপার সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছিল। উল্লাসের বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কথা তিনি জেনেছিলেন মুরারিপুকুর ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে।

যাঁরা সেদিন সর্বস্ব ত্যাগ করে এক মহান আদর্শ নিয়ে জীবন পথে অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁদের সে সাধনা ব্যর্থ হয়নি, আজ তাঁদের বহু কাম্য স্বাধীনতা তাঁরা লাভ করেছে; তাঁদের কথা শ্রদ্ধায় স্মরণ করে প্রণতি জানাই।

কলিকাতার তদানীন্তন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ড ছিলেন একজন ইংরাজ সিভিলিয়ান। সকল প্রকার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাতে তাঁর ছিল দৃঢ় সংকল্প! সেদিন যে সব জাতীয়তাবাদী পত্র পত্রিকা যুক্তির বাণী প্রচার দ্বারা জনজাগরণ আনতে আত্মনিয়োগ করেছিল, কিংসফোর্ড তাদের কণ্ঠরোধ করতে উঠে পড়ে লাগলেন। সব কিছুর মধ্যেই তিনি Sedition বা রাজদ্রোহের গন্ধ পেতেন। অধিকাংশ পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হ'ল; অনেকে

হতিত হলেন। বন্দেমাতরম পত্রিকার সম্পাদক ব.ল শ্রীঅরবিন্দের নামে অভিযোগ হ'ল ; তাঁকে সরকার পক্ষ সাক্ষী মানলেন। সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় তাঁর ৬ মাসের কারাদণ্ড হয়। সন্ধ্যা পত্রিকা সম্পাদক উপাধ্যায় মহাশয়ই সবচেয়ে চড় করলেন কিংসফোর্ডের আদালতকে ! উপাধ্যায় মহাশয়ের নামে মামলা রুজু হল, তিনি দর্পভরে বলেছিলেন কিংসফোর্ড সরকার তাঁকে কিছুতেই ফেলে নিতে পারবে না। ফেলে যাবার আগে তিনি এই নশ্বর দেহটাকে ছেঁড়া চটী জুতার মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যাবেন। কী আশ্চর্য বিধাতা যেন তাঁর কথা শুনলেন, জামিন থাকাকালীন হার্নিয়া অপারেশন হয়ে তিনি হাসপাতালে মারা যান। কিংসফোর্ডের অত্যাচার চরমে উঠল সেদিন যেদিন বালক সুশীল সেন তারই আদেশে ১৫ ঘা বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। এমন পাশবিক মনোবৃত্তি আর কি সহ্য হয়! বিপ্লবী দল ক্ষিপ্ত হয়ে গেল, গুপ্ত সমিতির বৈঠকে স্থির হল একে যমালয়ে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত করে দিতে হবে। কিংসফোর্ডের ব্যবহারে যে দেশের জনসাধারণ বিষের ভাণ্ডপন্ন হয়ে উঠছে সরকার তা বুঝতে পেরেই তাকে ইডপুরে কলকাতা থেকে মজঃফরপুর স্থানান্তরিত করেন। কিংসফোর্ডের ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। সব কল্পনা জল্পনা গেল ভেস্তে। সে এক অপূর্ব অমৃত কথা ! ভারতের মুক্তিকামী সাধকদের প্রেরণায় প্রাণময় উন্মাদনায় সহস্র সহস্র সন্তান নিজেদের সেদিন বলি দিয়েছিল, ফাঁসির মঞ্চে জীবনের সে জয়গান আজও কানে বাজছে।

"হিন্দু প্যাট্রিয়ট" ও হরিশ মুখোপাধ্যায়

—দীনবন্ধু মিত্র

".....(যখন) সেপাইদিগের অত্যাচারে ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় ইংরাজলোকে রাগান্ধ হইয়া ভারতবর্ষের সমুদয় লোকের প্রাণ সংহার করিবার জন্য চীৎকার-ধ্বনি করিতে লাগিল, তখন কাহার সাধ্য তাহাদের এই অসংগত মতে বিমত করে, তখন তাহাদের মতকে অন্যায় মত বলিলে ফাঁসি হয়, তখন তাহাদের বিরুদ্ধে একটী কথা কহিলে তদ্দণ্ডে কাটিয়া ফেলে। গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং তাহাদের মতকে অন্যায় মত বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার কত চেষ্টা হইয়াছিল। এই ভয়াবহ সময়ে আমাদের হরিশ্চন্দ্র, আমাদের বন্ধু সাহসী হরিশ্চন্দ্র চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এক দিকে তিনি তাঁহার লেখনী দ্বারা স্বদেশের লোকদিগকে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে সাহস দিতে লাগিলেন, আর এদিকে রাগান্ধ ইংরাজদিগের মতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লাগিলেন। এবং যে সদুপায় দ্বারা রাজবিদ্রোহিতা একেবারে নিরাকৃত হইবে.....তাহার প্রস্তাব করিতে লাগিলেন।"

—(হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি-সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা—সাহিত্য সাধক চরিতমালা হইতে)

মা ও ছেলে

সোমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[২]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সুরমার স্বামী সুপ্রিয় সরকার যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। প্রিয় দর্শন, মিষ্টভাষী। বয়স বছর ত্রিশ। ডাক্তারিতে খ্যাতিও ভাল, পসারও ভাল।

সেদিন সকালে তাঁর চেম্বারে বসে তিনি রুগী দেখছিলেন। অনেক রুগী, কিছু দেখা হয়েছে, কিছু তখনো বাকী।

সুনন্দা ঘরে ঢুকলো।

পারিপাট্যহীন সাধারণ বেশ, মাথায় এলোচুল জড়ানো, কিন্তু রূপে ঘর যেন আলো হয়ে উঠলো। অন্য রুগীরা তাড়াতাড়ি দুপাশে সরে গিয়ে তাকে পথ করে দিলে।

সোজা ডাক্তারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটি নমস্কার করে সুনন্দা বললে—আপনাকে আমার সঙ্গে একবার যেতে হবে ডাক্তার বাবু।

ডাক্তার লিখছিলেন। মুখ তুলে তাকালেন। দেখলেন অপূর্ব দুটি চোখ।

বললেন—বসুন। কোথায় যেতে হবে?

সুনন্দা চেয়ারে বসে বললে—কৈলাস বোস্ ষ্ট্রীটে।

—কার অসুখ?

—আমার স্বামীর।

—কি হয়েছে?

—টি বি।

সুনন্দার মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে ডাক্তার তার সিঁথির দিকে তাকালেন।

সিঁদুরের রঙ কিন্তু স্পষ্ট রেখা।

তার বয়স আন্দাজ করলেন ডাক্তার; অতুল স্বাস্থ্য তার।

ডাক্তারের মন বিমর্ষ হয়ে গেল।

এর স্বামীর টি বি?

বললেন—একটু অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে। এঁরা অনেকক্ষণ বসে আছেন। এঁদের দেখে নিয়ে যাব।

কিন্তু আমি যে তাঁকে একলা ফেলে এসেছি—অসহায়ের মত সুনন্দা বললে।

—কেউ নেই তাঁর কাছে?

—না। পাড়ার একটি মেয়েকে এক-আধবার দেখতে বলে এসেছি।

—আচ্ছা, একটু বসুন।

প্রায় আধঘণ্টা পরে রুগী দেখা শেষ করে ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন।

গাড়ীতে যেতে যেতে সুনন্দা এক সময়ে বললে—আপনাকে একটা কথা বলে নিই।

—কি কথা?

—রোগে ভুগে ভুগে আমার স্বামীর মেজাজ বড় রুক্ষ হয়ে গেছে। ভালভাবে কথা বলতে তিনি প্রায় ভুলেই গেছেন। যদিই সে রকম কিছু আপনাকে বলে ফেলেন—আপনি দয়া করে কিছু মনে করবেন না।

ডাক্তার একটু হাসলেন।

গাড়ী এসে একটা গলির সামনে দাঁড়ালো। গলিটা সরু!

সুনন্দা বললে—আমাদের একটু হাঁটতে হবে।

ডাক্তারবাবু। আসুন।

দুজনে গাড়ী থেকে নামলেন।

একটা ভাঙা দরজার সামনে সুনন্দা থামলো।

দরজা ভেজানো ছিল। সে আস্তে আস্তে ভেতরে

ঢুকে ডাকলে—

—আসুন।

এক ফালি সরু বারান্দা—তার শেষপ্রান্তে চট দিয়ে আড়াল করা বোধ হয় বাথরুম। ডানদিকে একটি ছোট ঘর। এত অন্ধকার যে দিনের বেলাতেও ভেতরে দৃষ্টি চলে না।

সুনন্দা সেই ঘরে ঢুকলো।

ডাক্তার শুনতে পেলেন সে বলছে—ডাক্তারবাবু এসেছেন।

ঐ ঘরেই তাহলে রুগী আছে!

ডাক্তার কষ্টে দৃষ্টি চালিয়ে দেখলেন মেঝের ওপর ছিন্ন মলিন শয্যায় একজন জীর্ণ কঙ্কালসার লোক মৃতের মত পড়ে আছে। সে যে মৃত নয় তার একমাত্র প্রমাণ তার চোখ দুটি। সেই চোখে অনন্ত দৃষ্টি নিয়ে সে তাঁরই দিকে চেয়ে আছে!

ঘরের ভেতর থেকে সুনন্দা বললে—এই যে—এই ঘরে ডাক্তারবাবু—

ডাক্তার পা বাড়াবেন এমন সময়ে হঠাৎ যেন এক ঝটকা হাওয়া তাঁর মুখে এসে লেগে তাঁকে পেছনে ঠেলে দিলে।

ঘরের ভেতরের সেই মুমূর্ষু লোকটি ঠিক যেন বাঘের মত কেটে পড়ল।

—ডাক্তার? কে তোমাকে ডাক্তার ডাকতে বলেছিল? আমি এখানে মরছি—আমাকে একলা ফেলে রেখে সেই গুজে ডাক্তার ডাকতে চলে গেলেন! বুঝি না কিছু? তোর ঘরে যাচ্ছি—কেউ নেই যে এক ফোঁটা জল দেয়!

—কেন, বিন্তর মা আসেনি? তাকে ত বলে গিয়েছিলাম!

—সেই ত জল দিয়ে প্রাণ বাঁচালে। তোমার আর কি? আমি মরে গেলেই ত তুমি বাঁচো—

সুনন্দা শান্ত কণ্ঠে বললে

—অত কথা বলো না, কাশি আসবে!

—আসুক কাশি। রক্ত উঠুক। মরতেই ত আমি চাই।

হঠাৎ মন্মথ ডাক্তারের দিকে ফিরে ডাকলে—ডাক্তারবাবু, আসুন, দেখুন আমাকে, বলুন আমি কবে মরব। আমি সুনন্দাকে মুক্তি দিতে চাই। ও আমার জন্যে অনেক করেছে। অনেক সয়েছে। কিন্তু আর না—ও মুক্তি পাক।

ডাক্তার এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে মন্মথর কটুক্তি শুনছিলেন। লজ্জায় ডাক্তার নিজেই মুখ তুলে তাকাতে পারছিলেন না। মনে মনে ভাবছিলেন—কাজ নেই ওকে দেখে। ফিরে যাই।

কিন্তু ফেরা হল না তাঁর।

ঘরের ভেতর থেকে একজোড়া কাতর চোখের মিনতিভরা চাহনি তাঁকে টেনে ঘরে রাখলে। মুখ না তুলেই নিজের মুখের ওপর সে দৃষ্টি অনুভব করছিলেন।

মন্মথর ডাকে ডাক্তারের চমক ভাঙল অবাকও কম হলেন না তার কথা শুনে!

সুর বদলে গেছে।

হিংসে-দ্বেষ ভালবাসা অক্ষম মন্মথর বুকে আলোড়নের তুফান তুলেছে। সেই তুফানের প্রবল ধাক্কায় তার রোগজীর্ণ পাঁজরগুলি ভেঙেই বুঝি যা যায়!

ডাক্তার তার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বসবার জায়গা ছিল না। সুনন্দা নিজের একটি পরিষ্কার শাড়ী পাট করে মেঝের ওপর সযত্নে পেতে দিয়ে বললে—অপরাধ নেবেন না ডাক্তারবাবু, আর কিছু আমাদের নেই। আপনি এর ওপরে বসুন।

ডাক্তার শাড়ীর ওপরে বসে ষ্টেথোস্কোপ বার করলেন।

মন্মথ বললে—সবই ছিল আমাদের ডাক্তারবাবু। আমার এই কাল রোগের পেছনে একে একে সব গেল।

ডাক্তার তার বুক পরীক্ষা সুরু করলেন। মন্মথর মুখে ম্লান হাসি।

—একেবারে ঝাঁজরা হয়ে গেছে। কি আর দেখবেন?

সুনন্দা বললে—এখন কথা বলো না। দেখতে দাও ওঁকে।

বুক দেখা হল।

মন্মথ বললে—আর বোধ হয় আপনি আশা করবেন না।

—আশা শেষ পর্য্যন্ত।

হাসতে লাগলো মন্মথ।

—হাসালেন আপনি ডাক্তারবাবু। কি দেখে আশা করছেন?

সুনন্দাকে দেখিয়ে ডাক্তার বললেন—

—ওঁকে দেখে।

মন্মথর দৃষ্টি সুনন্দার মুখের ওপর গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

আজ যেন তাকে সে নতুন করে দেখলে। স্নেহ-মমতা সেবার প্রতিমূর্ত্তি!

মন্মথর বুকের ভেতরটা বেদনায় টন্‌টন্ করে উঠলো। বললে—ডাক্তারবাবু মরতে আমার দুঃখ নেই। দুঃখ ওর জন্যে। এত বড় পৃথিবীতে সুনন্দার দাঁড়াবার এতটুকু জায়গা নেই। কেউ নেই ওর। তার চোখের কোল দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

ডাক্তার বললেন—সেরে যাবেন আপনি। ভয় নেই।

মন্মথ বললে—ওর কাছে আমি কেবল নিয়েইছি, দিইনি কিছুই। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অক্লান্ত সেবা নিয়েছি। তার বদলে, কারণে অকারণে ওকে অকথা কুকথা বলেছি। জানেন ডাক্তারবাবু, এই কাল ব্যাধি আমাকে অমানুষ করে দিয়েছে—

ডাক্তার পকেট থেকে প্যাড্ আর কলম বা

—ওষুধ লিখে কি হবে ডা ারবাবু?

—কেন,—খাবেন!

—আমার ও সবই চলছে। ওষুধও চলছে; রুটি, মাখন, দুধ, ডিম, মাংসও চলছে। কোথা থেকে আসছে, কি করে আসছে কিছুই জানি না। সুনন্দা কি খায়, দুবেলা খায় কি একবেলা খায় কি উপোষ করে, তা-ও জানি না। আপনি লিখে দিলে ওষুধ ঠিকই আসবে—কিন্তু কি হবে আর? অনেক ত খেলুম।

সুনন্দা বললে—আপনি লিখুন ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার লিখতে লাগলেন।

মন্মথ বললে—ডাক্তারবাবু, দুঃখকষ্ট জানতাম না। সুনন্দাকে দিয়ে করলাম বাবার অমতে। বাবা আমার সে অপরাধ ক্ষমা করলেন না।

ডাক্তার লেখা বন্ধ করে শুনতে লাগলেন।

—অনেক চেষ্টায় একটা চাকরি জুটিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে দিন কাটাতে লাগলাম। দিনান্তে সুনন্দার মুখ দেখে সব কষ্ট ভুলে যাই। তারপর হল এই রোগ। যখন জানতে পারলাম—মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো।

—কতদিন আগে জানতে পেরেছিলেন?

—বছর খানেক আগে। সুনন্দা বললে—তুমি বাবার কাছে যাও। আমাকে ত্যাগ করেছে জানলে তিনি তোমাকে ফিরিয়ে নেবেন। তাঁর কাছে গিয়ে চিকিৎসা করাও; ভাল হয়ে যাবে।

সেই রোগের সুরু—তখনো

হারাই নি ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার মুখ ফিরিয়ে দেখলেন—সুনন্দা কখন নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে গেছে

মন্মথ বলতে লাগলো—গহনা বিক্রী করে সুনন্দা আমাকে সৈনিতাসে নিয়ে গেল। মাস ছয়েক পরে পুঁজি শেষ হলে আমাদের আবার এইখানে ফিরে আসতে হল। সেই থেকেই ত আমি শুয়ে। সুনন্দা যে কি করে সংসার চালায়, আমার চিকিৎসা করায়, আমাকে ওষুধ দেয়, পথ্য দেয়, সে শুধু সে-ই জানে ডাক্তারবাবু।

প্রেস্‌ক্রিপশন্ লেখা শেষ করে ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। দেখলেন, সুনন্দা আবার কখন্ নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে।

ডাক্তার বললেন—ওষুধটা খান্। আমি কাল আবার আসব।

তিনি দরজার দিকে এগোলেন।

তাদের করুণ কাহিনী তখনো তাঁর কানের ভেতরে বাজছে। আর, চোখের সামনে ভাসছে তার চেয়েও মর্ম্মন্তুদ এক দৃশ্য।

মন্মথর বুক পরীক্ষা করে তিনি নিরাশ হয়েছেন।

পেছনে পায়ের শব্দ শুনে ডাক্তার দরজার কাছে

দাঁড়ালেন। ফিরে তাকাতে চাপা গলায় সুনন্দা বললে—ডাক্তারবাবু!

—বলুন

—কেমন দেখলেন?

সুনন্দার চোখ দুটি লাল।

ডাক্তার একটু ইতস্ততঃ করলেন।

—সত্যি কথা শুনতে চান!

—মিথ্যে আশার কাজ নেই—

ডাক্তার তার মুখের দিকে তাকাতে পারলেন না। অন্য দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললেন—

—কোনো আশা নেই। আপনি বুক বাঁধুন।

সুনন্দা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো তারপর নিজের হাতের চুড়ি দুগাছি খুলে ইতস্ততঃ করতে লাগল।

ডাক্তার কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

সেদিন দুপুরে খেতে বসে ডাক্তার সুরমাকে সুনন্দাদের কথা সব বললেন।

—সুনন্দার কথা ভেবে ভারি দুঃখ হয়। কোথায় যে দাঁড়াবে সে!

একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে তিনি চুপ করলেন।

শুনতে শুনতে সুরমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। আঁচলে চোখ মুছে সে বললে—

—তার স্বামীর বাঁচবার কি কোনো আশাই নেই?

—না। একেবারে শেষ অবস্থা। হয়ত এই সপ্তাহেই মারা যাবে।

সুরমা আর কিছু বললে না। সুনন্দার কথা ভেবে তার মন অস্থির হয়ে উঠলো।

পরদিন সকালে চেম্বারের কাজ সেরে ডাক্তার মন্মথকে দেখতে গেলেন।

সুনন্দা ছিল। তাঁকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শাড়ী পেতে বসালে।

মন্মথ বললে—কাল আপনাকে বড় বিরক্ত করেছি ডাক্তারবাবু—কিছু মনে করবেন না। যতক্ষণ ছিলেন শুধু আমাদের দুঃখের কথাই শুনিয়েছি।

—কি হয়েছে তাতে?

ডাক্তার হাসবার চেষ্টা করলেন।

—কাউকে পেলে ইচ্ছে হয় সব কথা বলি।

—কেমন আছেন আজ?

মন্মথর মুখে ক্ষীণ হাসি।

—আছি এই পর্যন্ত। পায়ে পায়ে এগোচ্ছি।

—সে তো আমরা সবাই এগোচ্ছি। কেউ কি পেছোচ্ছে মনে করেন?

পকেট থেকে একটা ওষুধের শিশি বার করে ডাক্তার বললেন—এই ওষুধটা আপনার জন্যে এনেছি। আজ থেকে এটা আপনি খান।

সুনন্দার হাতে ওষুধটা দিয়ে তিনি ঘড়ি দেখে উঠে পড়লেন।

দরজার কাছে এসে তিনি দাঁড়ালেন। সুনন্দা তাঁর পেছনে পেছনে আসছিল, তাকে কি বলতে গিয়ে ডাক্তার থেমে গেলেন।

—কিছু বলবেন?

—হ্যাঁ। বলছিলাম যে যদি কিছু মনে না করেন ত আপনাদের এই বিপদের সময়ে আমি কিছু—

সুনন্দাকে দেবেন বলে আজ তিনি সঙ্গে করে কিছু টাকা নিয়ে এসেছিলেন।

তাঁর কথা শুনে সুনন্দার মুখ গম্ভীর হল।

সে শান্তস্বরে বললে—আপনার বড় দয়া। কিন্তু ও এখন থাক।

ডাক্তার দেখলেন, সুনন্দার হাতে চুড়ি দুগাছি নেই।

—আরো কিছু রাখলে পারতেন—

পরদিন কাজের চাপ পড়ায় সারাদিন ডাক্তার মন্মথকে দেখতে যাবার সময় করে উঠতে পারলেন না। তার পরের দিন সকালে চেম্বারের কাজ সারতে অনেক বেলা হয়ে গেল।

বিকেলের দিকে ডাক্তার মন্মথকে দেখতে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে বেরোলেন।

গাড়ী থেকে নেমে গলিটুকু পার হয়ে তিনি সেই ভাঙা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

দিদি

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মেয়েটি প্রথমে আমার সঙ্গে কথা কইল। আমার কানের কাছে তার ছোট মুখখানি উঁচু করে। ফিস্ ফিস্ করে বল্‌লে, "একটা লজেঞ্চুস্।"

সাদরে তার মাথায় হাত রেখে বল্‌লুম, "তুমিই খাও।"

মাথাটি সরিয়ে নিয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বল্‌লে, "আমার আরও আছে,—বাবা আমাকে লুকিয়ে দাদার চেয়ে দুটো বেশী দিয়েছিল।" তার পর হেসে মাথাটি নেড়ে মুখের উপর একটি হাত চাপা দিয়ে চুপি চুপি বল্‌লে, "দাদা জানেনা—কিছু।"

সোৎসাহে বল্লুম "তাই নাকি?"

হঠাৎ দাদার দিকে নজর পড়তেই হেসে আমার কোলে মুখ লুকোল।

কল্কাতার গুরুতর অসুখের সংবাদ পেয়ে ছুটী নিয়ে বাড়ী যাচ্ছিলুম; মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়েছিল;—তার স্নেহ কোমল মুখখানি কেবলই চোখের উপর ভেসে উঠছিল। পূজোর ছুটীর পর বাড়ী থেকে চলে যাবার দিন, সারাদিন যে একটি বারও আমার কাছ ছাড়া হয়নি, অতটুকু মেয়ে কি করে বুঝতে পেরেছিল, আমি সেদিন চলে যাবো। সমস্তক্ষণ সে যেন আমাকে আগ্‌লে আগ্‌লে রেখেছিল, মুহূর্ত্ত চোখের আড়াল হতে দেয়নি; পাছে তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাই। সন্ধ্যার পর তার মা তাকে খাওয়াতে গেলে সে বায়না ধরে, খাবেনা।—না খেয়ে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে কেঁদে শেষে আমার কোলে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত্রি দশটার গাড়ী,—তখন সে অকাতরে ঘুমিয়ে। যেরোবার সময় তার ঘুমন্ত মুখে আদর করে চুমু খেতে গেলে সে বিরক্ত ভাবে মুখটি কাঁদো কাঁদো করে,—তার ছোট্ট হাতটি দিয়ে আমার মুখ ঠেলে সরিয়ে দিয়ে,—পাশ ফিরে শোয়।

—এই সব ছবিগুলি বার বার চোখের সামনে ভেসে আসছিল।···সে হয়ত এই ভেবেই আমার কোলে নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল, যে তাকে জাগিয়ে আদর না করে অমন ঘুমন্ত ফেলে রেখে আমি চলে যাবোনা। ঘুম থেকে উঠে, আমাকে না দেখে হয়ত কত খোঁজাখুঁজি কান্নাকাটী করেছিল,—হয়ত তার মাকে জিজ্ঞাসা করে ছিল—"বাবা কোথায় গেল, কখন আস্‌বে···" তার মা হয় ত তাকে মিছে ভুলিয়ে বলেছিল, 'এই বাজারে গেছেন মাছ আনতে; তোমার জন্যে বিস্কুট আনতে···'

গাড়ী যখন চলে, যত জোরেই চলুক, কেবলই মনে হয় আরও একটু জোরে চল্লে ত কোন ক্ষতি হয় না; যখন থামে তখন মনে হয়—এতক্ষণ দাঁড়ায় কেন, ছাড়তে যেন চায়না।

একটা ষ্টেশনে গাড়ী বদল করে অন্য গাড়ীতে চড়বার সময় এঁদের সঙ্গে দেখা। অসম্ভব ভিড়, গাড়ীতে তিল ধরণের স্থান ছিল না। এক ভদ্রলোক, রেলের কর্ম্মচারী বলেই মনে হল,—তাঁর রেলওয়ে পরিচ্ছদের প্রতাপে,—একটি মহিলা ও এই দুটি ছেলেমেয়েকে কোন রকমে ঠেলে ঠুলে এই গাড়ীতে ঢুকিয়ে দিয়ে, মহিলাটিকে কোণের দিকে একটু জায়গা করে ঠেসে বসিয়ে—ছেলেমেয়ে দুটিকে এ ফাঁকে ও ফাঁকে গুঁজে দিয়ে নেমে পড়লেন।

আমি আগে থেকে উঠে খানিক জায়গা দখল করে ভাল করে বসেছিলুম। ছেলেটি ওধারের বেঞ্চে, কোন রকমে না বসা না দাঁড়ানো—অবস্থায় ঝুলে রইল। মেয়েটি ভিড়ের চাপে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায় দেখে,—তাকে টেনে নিয়ে নিজের পাশে বসতে দিই। চার পাঁচ বছরের ফুট ফুটে মেয়েটি, এক মাথা কোঁকড়া চুল,

হাসি হাসি মুখটি দেখলেই কেমন মায়া হয়, বুকে টেনে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে।

ভদ্রলোক নেমে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে এদের অবস্থা দেখে নেবার চেষ্টা করে, স্ত্রীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বল্লেন, "ঠিক বসেছ ত ?"

ভদ্রমহিলার হাত-পাটুকু পর্য্যন্ত নড়াবার অবস্থা ছিলনা, মাথা নেড়ে 'হাঁ' কি 'না' কি জানালেন ঠিক বুঝা না গেলেও ভদ্রলোক, আশ্বাস দিয়ে বল্লেন, "কয়েকটী ষ্টেশনের পরেই ভিড় কমে যাবে—সব গঙ্গা-স্নানে যাচ্ছে। নামবার সময় জিনিষ পত্রগুলো ভাল করে দেখে নিও, এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে, কোন্‌টা যে কোথায় রইল, উঃ যা ভিড় !" বলে জানালা দিয়ে মুখ ঢোকাবার চেষ্টা করে চেঁচিয়ে বল্লেন, "বকুল কোথায় গেলি, জায়গা পেয়েছিস্ ?"

বকুল তখনও ঝুলছিল, সেই অবস্থাতেই বল্লে, "ভিড়ে চেপ্‌টে গেছি বাবা, অন্য গাড়ীতে চড়িয়ে দাও।"

"না না আর এখন হবে নারে—একটু কষ্ট করে থাক্—সব গাড়ীতেই এমনি, বলে তিনি মেয়েটিকে এদিক ওদিক খুঁজছেন দেখে বকুল বল্লে, "মুকুলটা বেশ আরামে বসেছে—ঐ যে—"

মুকুল হেসে বাপের দিকে হাত বাড়িয়ে বল্লে, "বাবা এইখানে আমি—"

"বেশ্ বেশ্ বসে থাকো দুষ্টুমি করোনা, "বলে বাইরে থেকে আমার কাছ বরাবর এগিয়ে এসে বল্লেন, "কদ্দূর যাবেন ?"

উত্তর শুনে বল্লেন, "যাক্ বাঁচা গেল,—দয়া করে এদের একটু দেখবেন ; ষ্টেশনে লোক আসবে ফোন্ করে দিয়েছি, শুধু পথটুকুর জন্যেই ভাবনা হচ্ছিল। গঙ্গা যাত্রীর মেলা, বাবা ভিড় বটে ; গাড়ী ছাড়ল, নমস্কার—দেখবেন একটু—"

গাড়ী চলতে লাগল।

একটু পরে দেখি মুকুল আমার গায়ে ঠেস্ দিয়ে ঢুলছে। তার মাথাটা কোলের উপর টেনে নিয়ে বল্লুম, "ঘুমবে ?"

মাথা সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসে ঘাড় নেড়ে সে বল্লে, "উঁহু, ঘুমলে কি চলে ; জিনিষ পত্র চুরি হয়ে যায় যদি ! এইত সেদিন বাবার সুটকেস্ আর জুতো চুরি হয়ে গেল, একটু খানি ঘুমিয়ে পড়েছিল, জানো ?"

"তাইতো !" গম্ভীর ভাবে বল্লুম "কিন্তু আমারও যে বড় ঘুম আসছে।"

বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে সে বল্লে, "না না ঘুমিও না চোখে একটু জল দিয়ে নাও—ঘুম ছেড়ে যাবে।" বলে গালে হাত দিয়ে একটু ভেবে, তারপর হঠাৎ ঘাড় দুলিয়ে বলে উঠল, "তোমার ঘুম পালিয়ে গেছে—দাদার চোখে চলে গেছে," বলে বকুলের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বল্লে, দেখছ ত ?"

বকুলের দিকে চেয়ে দেখি, সত্যই সেই অবস্থায় দিব্যি ঘুমচ্ছে।

আমার কোলের উপর রাখা থলিটার দিকে ঝুঁকে দেখে মুকুল বল্লে, ওতে কি আছে দেখি !"

মেয়েটির জন্যে কিছু ফল নিয়ে যাচ্ছিলুম—ভিড়ের চাপে নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে কোলের উপরই রাখি ;—একটা কমলালেবু বার করে তার হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে বল্লুম, "কিছু ফল্ টল্ আছে, আমার মেয়ের অসুখ করেছে কিনা, তার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি ; তুমি এটি নাও।"

সে হাত বাড়িয়ে সেটি নিতে যাচ্ছিল ; কিন্তু আমার কথা শুনে হাত সরিয়ে নিয়ে বল্লে, "না তবে নোবনা।"

"কেন ?" আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

না এর ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে সে বল্লে, "কমে যায় যদি।"

"না না কমবে কেন, অনেক আছে, তুমি নাও" বলে জোর করে সেটি তার হাতে গুঁজে দিয়ে বল্লুম, "খেয়ে দেখ দেখি মিষ্টি কিনা, মিষ্টি না হলে—খুকী আবার হয়ত খাবেই না।"

লেবুটি কোলের উপর রেখে আমার দিকে ছল-ছল চোখে চেয়ে সে বল্লে, "খুকীর বড্ড অসুখ করেছে বুঝি ? সে কত বড় ?"

তার সেই ছল-ছল চোখে জিজ্ঞাসা করার ধরণ দেখে আমার বুকের মধ্যে কি যেন একটা ঠেলে ঠেলে উঠ্‌তে লাগল,—খুকীর মুখখানি মনে পড়ে চোখ দুটো জলে

উঠল। সাদরে তার পিঠে হাত বুলিয়ে হেসে বল্লুম, "খুব ছোট্ট, তোমার চেয়েও ছোট্টটি।"

একটু চিন্তা করে মুকুল বল্লে, —"তা হলে সে আমায় দিদি বলবে ত?

সোৎসাহে বল্লুম, "বলবে বৈকি,—তা বলবে না?"

—একটু হেসে আমার গায়ে হেলে পড়ে সে বল্লে, —"আহা, অত ছোট মেয়ে—সে কি এখন দিদি বলতে পারে?"

—"তা পারে" হেসে বল্লুম।

আর কোন কথা না বলে সে অন্যমনস্ক হয়ে লেবুটি হাতে নিয়ে নাড়া চাড়া করতে লাগল, —আমিও মনটা হাল্কা করবার চেষ্টায় সিগারেট ধরালুম!

জংসন ষ্টেশনে পৌঁছতে বহু যাত্রী নেমে যাওয়ায় ভিড় একেবারে কমে গেল। আমাদের কামরায়, —বকুল, মুকুল, তাদের মা এবং আর জন দুই তিন লোক ও আমি রইলুম। মুকুল তার মায়ের কাছে সরে গিয়ে হাত মুখ নেড়ে ফিস্ ফিস্ করে নানা গল্প জুড়ে দিল। তাদের কিছু কিছু কথাবার্ত্তা আমার কাণে আসতে লাগল।

মা চাপা স্বরে বল্লেন, "তাঁর কাছে নেবু চেয়েছ ত? তুমি বড় হ্যাংলা হয়েছ মা।"

মায়ের মুখের কাছে হাত নেড়ে মুকুল বল্লে, "আমি চাইনি মা, পলির ভেতর কি আছে সেই জিজ্ঞাসা করলুম, উনি অমনি এটা বের করে জোর করে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, "খেয়ে দেখত মিষ্টি কিনা; তাঁর খুকীর অসুখ করেছে কিনা, তারই জন্যে নিয়ে যাচ্ছেন.—সে আবার মিষ্টি না হলে খায়ই না—"

মা বল্লেন, "আহা মেয়েটির অসুখ করেছে, আর তুমি তার নেবু নিয়ে নিলে?"

"ফিরিয়ে দিই মা?" সাগ্রহে মুকুল মাকে জিজ্ঞাসা করলে!

"থাক্, দিয়েছেন যখন নাও" মা বল্লেন, —মায়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আমাকে উদ্দেশ্য করে মুকুল বল্লে, —এই, —দেখ, খুব মিষ্টি—"

মা তাকে ঠেলে দিয়ে বিরক্তভাবে বল্লেন, "ছিঃ ওকি অসভ্যতা, —ঐ রকম করে লোকের সঙ্গে কথা কয়?" বলে তাকে কাছে টেনে নিয়ে কাণে কাণে কি বল্লেন। মুকুল মাথা নেড়ে 'আচ্ছা' বলে আমার দিকে সরে এসে বল্লে, —"কাকা—"

আমি সাদরে তাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে বল্লুম, "কি মা।"

সে আমার গায়ে ঠেস্ দিয়ে বসে পা দোলাতে দোলাতে বল্লে, —"তোমার খুকীর নাম কি বলো না।"

তার মাথার চুলগুলি নাড়তে নাড়তে বল্লুম, "পারুল।"

মায়ের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই সে পা দোলানো বন্ধ করে সোজা হয়ে বসে বল্লে, "আপনি তাকে খুকী বলেন না পারুল বলে ডাকেন!"

বল্লুম, "খুকী বলেই ডাকি, পারুল বল্লে ত বুঝতে পারে না, —তোমার মত এখনও বড় হয়নি।"

"আমি কিন্তু তাকে পারুল বলেই ডাকব" বলে হাত-তালি দিয়ে মাকে বল্লে, "হ্যা মা, সেই সাত ভাই চম্পা জাগোরে, কেন বোন্ পারুল ডাকো রে—

সেই পারুল বুঝি?" বলে ছুটে গিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে, "মা সেই গল্পটা কাকাকে একবার বলো না।"

মা অবগুণ্ঠনের আড়ালে কি বল্লেন ঠিক বুঝা গেল না।

একটু পরে আবার আমার কাছে সরে বসে মুখটা গম্ভীর করে মুকুল বল্লে, "আচ্ছা, —তুমি খুকীকে মারো ত?"

তার মাথায় হঠাৎ এমন প্রশ্নের উদয় কেন হল ঠিক বুঝতে না পেরে বিস্মিতভাবে বল্লুম, "কেন বলো দিকি?"

সে কিছু বলবার আগেই তার মা তার হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে চাপা ধমক দিয়ে বল্লেন, "আবার 'তুমি তুমি' করা আর যত সব আজে বাজে কথা বলা? বারণ করলুম না! দুষ্টু মেয়ে, বসে থাকো এখানে চুপ্ করে।"

ভয়ে ও লজ্জায় সে যেন এতটুকু হয়ে গেল, মা তাকে টেনে বসাতে গেলে সে মুখ গোঁজ করে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি তার অন্য হাতটি ধরে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বল্লুম —"ছেলে মানুষ, ওদের কি অত আপনি তুমি

জান থাকে !" বকুলকে বললুম, "চলো বকুল আমরা ততক্ষণ একটু বেড়িয়ে আসি, গাড়ী ছাড়তে এখনও অনেক দেরী।"

"যাবো মা ?" মুখ তার করেই বকুল মাকে জিজ্ঞাসা করল।

মা সম্মতি জানালেন এবং মেয়েকে কাছে ডেকে তার চুলগুলি আঙুল দিয়ে ঠিক করে দিয়ে, আঁচল দিয়ে তার মুখখানি বেশ করে মুছিয়ে দিয়ে মৃদু স্বরে বল্লেন, "জুতোটা পরে নাও, আর দুষ্টুমি করো না যেন।"

আমার হাতের আঙুল ধরে সে সঙ্গে সঙ্গে চল্লো। এদিক ওদিক খানিক ঘুরে চায়ের দোকানে এক পট্ চা ও কিছু বিস্কুটের অর্ডার দিয়ে দু এক ছ'ড়া ভাল কলা কিনে গাড়ীর দিকে ফেরা গেল। কয়েক পা চলে পায়ে লাগছে বলে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি তাকে কোলে তুলে নিলুম। কোলে চড়ে বল্লে, "তুমি আমাকে কোলে নিলে আমিও পারুলকে কোলে নেব।"

হেসে বল্লুম, "যে নিজে কোলে চড়ে সে কি আর কাউকে কোলে নিতে পারে ?"

"কেন পারবে না ?" মস্ত ঘাড় নেড়ে সে বল্লে, "আচ্ছা তুমি দেখো।"

একটু পরে হঠাৎ বল্লে, "আচ্ছা তুমি পারুলকে মেরেছিলে বুঝি ?"

এ প্রশ্ন যে আরও একবার করেছিল,—অর্থ ঠিক বুঝি নি, এবং তার মা তখন কথাটা চাপা দিতে চেষ্টা করেন। বিস্মিতভাবে বল্লুম, "কেন বলো দেখি !"

গম্ভীরভাবে সে বল্লে, 'তবে তার অসুখ করলে কেন ?

বললুম, "মারলে বুঝি অসুখ করে ?

তেমনিভাবেই সে বল্লে, "হ্যাঁ,—জানো না ? মা আমাকে একবার খুব মেরেছিল, আমার খুব অসুখ করেছিল। ঠাকুমা বলে, ছোট ছেলেমেয়েদের মারতে নেই বোকতে নেই, মা আমাকে বোকলে ঠাকুমা খুব রাগ করে।

কথাটা নেহাৎ ছেলেমানুষের উক্তি হলেও যেন মন থেকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারলুম না। খুকীকে কখনও তেমন মারধর করেছি বলে মনে ত পড়ে না, তবে বেশী কান্নাকাটি করলে তার মা হয়ত কখনো কখনো চড়টা চাপড়টা দিয়ে থাকতে পারে।

গাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়লে সে বল্লে, নামিয়ে দাও— মা দেখবে রাগ করবে।"

বল্লুম, "রাগ করবেন কেন, পায়ে লাগছিল বলেই না কোলে উঠেছিলে !"

"না না" বলে সে এক রকম জোর করেই নেমে পড়ল। নামবার সময় আমার গলাটা আদর করে জড়িয়ে ধরে কাণের কাছে মুখ এনে বল্লে—"পায়ে লাগবে কেন, আমি ত এমনি কোলে চড়লুম, তোমার কোলে চড়তে ইচ্ছে করছিল যে—" বলে দুষ্টুমিভরা হাসি হাসতে লাগল।

আমি দাঁড়িয়ে পড়ে বল্লুম, "ও দুষ্টু মেয়ে, আমাকে ঠকানো হচ্ছিল,—চলো তোমার মাকে বলে দিচ্ছি।"

ভয়ে তার মুখখানা কাঁদো কাঁদো হয়ে পড়তে দেখে, সস্নেহে চুমু খেয়ে বল্লুম,—"না না বলব না, চলো।

আমাকে জড়িয়ে ধরে সে বল্লে, "সত্যি বলবে না ?"

"না গো না, —শিগগির চলো—গাড়ী ছেড়ে দেবে।" বলে দুজনে দ্রুতপদে গাড়ীর দিকে অগ্রসর হলুম।

ফিরে দেখি, বকুল মুখ-ভার করে জলযোগ করছে। মুকুল কলরব করে মায়ের কাছে গিয়ে কলার ছড়াটা তাঁকে দিয়ে বল্লে—"কি মিষ্টি কলা মা,—দাদাকে দিই ?" বলে দাদার দিকে চেয়ে, তার গোমড়া মুখ দেখে মাকে জিজ্ঞাসা করলে, "দাদার কি হয়েছে মা ?"

আঁচল দিয়ে মেয়ের মুখের ও কপালের ঘাম মুছে দিয়ে মা চাপা স্বরে বল্লেন, "হবে আবার কি, মুখ ভেঙেই ওর পেটে আগুন লাগল—'খেতে দাও' 'খেতে দাও' করে সেই থেকে অতিষ্ঠ করে ফেল্লে। বত বলি মুকুল আসুক—এক সঙ্গে খেও তা কিছুতেই নয় ; একটুতেই ছেলে একেবারে অধৈর্য্য।"

খাওয়া বন্ধ করে বকুল জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল,—বোধ করি বাইরের লোকের সামনে নিন্দা করায় সে লজ্জা বোধ করল।

মা বল্লেন, "আর রাগ করতে হবে না, খেয়ে নাও,

আছি বসবে।" মুকুলকে বল্লেন, "ঐ গেলাসে জল রয়েছে ভাল করে হাত মুখ ধুয়ে নাও খাবার দিচ্ছি।"

একটি কাচের ডিসে খান্ কয়েক লুচি আলু পটল ভাজা ও খাড়ীর তৈরী দুটো মিষ্টি ও কাচের গ্লাসে জল দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন;—মুকুল বল্লে,—"কাকা খেয়ে নিন্ মা বলছে।"

লজ্জিত হয়ে বল্লুম, "কি আশ্চর্য্য! আমিও বকুল মুকুল নাকি, যে এই অসময়ে জল খাবার খেতে হবে!"

"তাতে আর কি হয়েছে," অবগুণ্ঠনের মধ্যে থেকে মৃদুস্বরে বকুলের মা বল্লেন, "মেয়ের অসুখের খবর শুনে ভাল করে খাওয়াদাওয়া হয়ত হয় নি,—ওটুকু খেয়ে নিন।"

আর কোন কথা বলতে পারলুম না। মনে হল, শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় চড়ে এসে, দুই চোখ দিয়ে ফেটে বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছে। মায়ের জাত! মুখ দেখেই হয়ত ধরে ফেলেছেন, এঁদের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না।

বস্তুত সকাল থেকে অর বলে পেটে কিছুই পড়েনি। বেলা ন টায় টেলিগ্রাম পাই বারোটার গাড়ীতে বেরিয়ে পড়ি। খাবার তৈরী পাকতেও মুখে তুলতে পারিনি।

জলযোগ ও চা পান শেষ হতে হতেই—গাড়ী ছাড়ল। সন্ধ্যার অন্ধকারও ক্রমে ঘনিয়ে এলো, গাড়ীর ভিতরে আলো জ্বলে উঠল। বকুল ওদিকের বেঞ্চে লম্বা হল, মুকুল কিছুক্ষণ বক্ বক্ করে মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। মুকুলের মা জানালায় মাথা রেখে বাইরের দিকে মুখ করে বসে রইলেন, আর আমি সিগারেটের পর সিগারেট ধ্বংস করতে লাগলুম।

ঘণ্টা খানেক পরে ওঁরা নামলেন, আমার তারপর আরও ঘণ্টা দুই। ওঁদের গন্তব্য ষ্টেশনের আগের ষ্টেশন থেকেই ভদ্রমহিলা জিনিষপত্র ঠিক ঠাক করে ছেলে-মেয়েদের ডেকে তুলে নামবার আয়োজন সুরু করে দিলেন।

মুকুল উঠে আমার কাছে ঘেঁসে, ঝুঁকে চুপি চুপি আমাকে বল্লে—"কাকা—আমাদের সঙ্গে তুমিও চলো না।"

আমিও কেউ শুনতে না পায় এইভাবে বল্লুম, "অন্য সময় যাবো মা, আজ থাক্।"

আমার জড়িয়ে সে বল্লে, "কেন, আজ গেলে কি হয়?"

বল্লুম, "খুকীর অসুখ যে মা।"

সেই ভাবেই সে বল্লে, "অসুখ ত কি হয়েছে, সেত ভাল হয়ে যাবে, আমি দাদুর কাছ থেকে পাঙ্খলের জন্যে খুব ভাল ওষুধ দিয়ে দোব, তুমি চলো।"

চুপ করে রইলুম। সে তার মাকে গিয়ে ধরল, "মা কাকাকে আমাদের সঙ্গে যেতে বলো না।"

মা ধমক্ দিয়ে বল্লেন, "কি যে পাগলের মত বলো মা,—শুনছো খুকীর অসুখ করেছে, উনি তাকে দেখতে পাচ্ছেন,—দেখছ, তার জন্যে কমলালেবু বেদানা সব নিয়ে যাচ্ছেন। এ সময়ে ওকে আটকে কি দেরী করতে আছে?" এ কথায় কোন সায় না দিয়ে সে মুখ ভার করে বসে রইল দেখে তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বল্লেন,—"—তার চেয়ে তুমি ওঁকে বলো না, —খুকী ভাল হলে,—তাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে আসবেন,—তাহলে বেশ হবে—কেমন?"

মুকুল চোখ ছল্-ছল্ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, কোন কথা বল্লে না।

ষ্টেশন এসে পড়ল,—জিনিষপত্র নিয়ে নেমে পড়ার পর দেখা গেল তাঁদের কোন লোকই আসেনি। শীত-কালের রাত্রি দু-তিন মাইল পথও গরুর গাড়ীতে যেতে হবে। ভদ্রমহিলা ব্যস্তভাবে বকুলকে বল্লেন, "একটু এগিয়ে গিয়ে চাকরটার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডেকে দেখোনা—যদি কোথাও থাকে বা কোথাও ঘুমিয়ে পড়ে থাকে।"

—এদিক-ওদিক অনুসন্ধান করে এবং ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেল,—ওদের বাবুর কোন খবর কোনে আসেনি এবং তাঁর লোকজনও কেউ আসেনি। মুকুলের মায়ের চিন্তাকুল অবস্থা দেখে আমিও মনে মনে ব্যস্ত হয়ে উঠলুম;—তাইত,—এত রাত্রে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও এত জিনিষ পত্র নিয়ে এতদূরের পথ কার ভরসায় যাবেন। সহর নয়, গাড়ী ঘোড়া লোকজনও পাওয়া শক্ত—পল্লীগ্রামের নির্জ্জন পথ! অথচ সারারাত্রি এ ভাবে ষ্টেশনে পড়ে থাকা। শুধু যে একান্ত কষ্টকর হবে তাই নয়,—হয় ত তেমন নিরাপদও নয়।

এদিকে গাড়ী ছাড়বার সময়ও হয়ে এলো ; পরের ট্রেণ চার-পাঁচ ঘণ্টা পরে। সেইটাতেই যাওয়া স্থির করে থলি হাতে নেমে পড়ে বল্লুম, "চলুন, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আমি পরের ট্রেণেই যাবো. এ অবস্থায় আপনাদের ফেলে চলে যেতে আমার মন চাইছে না।"

মুকুল আনন্দে হাততালি দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

তার মা কিন্তু অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে বল্লেন, "আপনার যেদের অসুখ, আর আমাদের জন্যে আপনার এ ভাবে আটকে পড়া।"

বাধা দিয়ে বল্লুম, "আপনি সে জন্যে কিছু ভাববেন না, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই" বলে মুকুলকে বুকে তুলে নিয়ে বল্লম,—

"মুকুলের ডাক্ এড়িয়ে চলে যাই, এ ইচ্ছে হয়ত তাঁর ছিলনা।"

মুকুলের ঠাকুর্দা বাড়ীর সামনের বারান্দায় আরাম চেয়ারে বসে গড়-গড়ার নল মুখের দিয়ে সংবাদপত্র পড়ছিলেন। সামনের খোলা মাঠে গাড়ী এসে দাঁড়াতেই নলটা মুখ থেকে সরিয়ে সোজা হয়ে বসে চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে, চশমার উপর দিয়ে তাকিয়ে কিছু বলবার আগেই বকুল লাফিয়ে নেমে ছুটে গিয়ে তাঁর কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বল্লে, "দাদু আমরা এসেছি।"

তাকে জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধ চেঁচিয়ে উঠলেন, "তোরা? কে কে এলি? কার সঙ্গে এলি? তোর বাপ্ ছুটী পেলো?"

মুকুলও ততক্ষণে নেমে পড়ে—তাঁর কাছে পৌঁছে গেছে ; তাকে অন্য হাত দিয়ে বুকে টেনে নিয়ে চুমু খেয়ে বল্লেন, "মুকুলিরে, তুইও এসেছিস্?"

মুকুল হাত দিয়ে তাঁর মুখটা সরিয়ে—তাঁর দুই গালে দুই হাত রেখে বল্লে, "কাকার সঙ্গে এসেছি।"

"কাকা?" বলে চশমাটা ঠিক করে নিয়ে—বিস্মিত ভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন—মুকুলের মা গিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে মৃদুকণ্ঠে আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে, মুকুলকে বল্লেন, "কাকাকে ডেকে বসতে বলো।"

আমি ধীর পদে সিঁড়ির নীচে এসে পৌঁছেছি মুকুল এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বল্লে, "চলো।"

বৃদ্ধ ততক্ষণে ব্যস্তভাবে উঠবার চেষ্টা করে বল্লেন, "তাই নাকি? তা বেশ ত, আসুন আসুন" বলে দু-হাত বাড়িয়ে আমাকে আহ্বান জানালেন। আমি এগিয়ে গিয়ে—তাঁকে প্রণাম করতে যেতেই "থাক্ থাক্ বাবা, হয়েছে হয়েছে" বলে আমার হাত দুটো ধরে কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন, "নামটি কি বাবা?"

নাম বল্লুম। বকুল একটা চেয়ার এনে দিল। বৃদ্ধ বল্লেন, "আগে বসুন, —তারপর কথাবার্তা হবে।"

বসে বল্লুম, "আমি যখন সম্পর্কে বকুল মুকুলের কাকা হয়েছি—তখন আপনার আর আমাকে 'আপনি' বলা চলে না।"

"ঠিক ত ঠিক ত" বলে হো হো করে হেসে তিনি বল্লেন "তা বেশ ত এত বড় আনন্দের কথা! কোথায় গেলিরে—তোমরা সব গেলে কোথায়? চা টা খাবার টাবার কিছু,—কি আশ্চর্য্য! ও মুকুলি, বোকুলো"—বলে চেঁচামেচি সুরু করলেন।

সবিনয়ে বল্লুম, "ব্যস্ত হবেন না —

উচ্চহাস্য করে বল্লেন, "তাই কি আর হয়! নাও জামা জোড়া খোলো, হাত মুখ ধোও।"

মুকুলের ঠাকুরমা এলেন —পরণে গরদের চওড়া লাল পেড়ে শাড়ী, গলায় আঁচল জড়ানো দেখেই বোঝা গেল পুজো-পাঠ সেরে আসছেন।

মুকুল ছুটে এসে আমাকে দেখিয়ে বল্লে, "ঠাকুমা,— ঐ যে কাকা—"

আমি উঠে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে "বেঁচে থাকো বাবা" বলে ডান হাত দিয়ে আমার চিবুক স্পর্শ করে হাত চুম্বন করে বল্লেন, "বসো।—মুকুলি কি আর আমায় জপ্ করতে দিয়েছে! কেবলই বলে ঠাকুমা চলো না, কাকা যে এখনি চলে যাবে,—দেখবে না? ওর তাড়ায় আমায় পুজো ফেলে উঠে আসতে হ'ল। বাবা, কি গিন্নিই হয়েছিস্ তুই! হলো ত দেখা,—এখন কি করতে হবে বল্।"

মুকুল মায়ের আড়ালে গা ঢাকা দিল। ঠাকুর্দা ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন, বল্‌লেন, "ঠাকুমাকে ত ধরে আন্‌লি,—কাকাকে খাবার টাবার কিছু দিলি? —খুব যাহোক,—তোমরাও যেন কি,—বউমা তুমিত ত'—"

বাধা দিয়ে ঠাকুরমা বল্‌লেন, "তুমি স্থির হয়ে বসো দিকি,—সব ব্যবস্থা হচ্ছে।"

"হচ্ছে হচ্ছে করে ত ঘণ্টাখানেক প্রায় পার হয়ে গেল" বলে তিনি চশ্‌মাটা ঠিক করে নিয়ে কাগজে মন দিলেন।

মুকুলের ঠাকুরমা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "—কদিন অসুখ করেছে,—কি হয়েছে—হ্যাঁ বাবা!"

"কিছুইত জানিনে" আমি বল্‌লুম, "কদিন আগে চিঠি পেয়েছিলুম, শরীর ভাল নেই—কাল একেবারে টেলিগ্রাম এসে উপস্থিত।"

"আহা! ভাল থাক,—সেরে উঠুক" বলে কপালে যুক্ত কর স্পর্শ করে বল্‌লেন, "মা মঙ্গল করুন। মায়ের পূজোর ফুল ও চরণামৃত দোব নিয়ে যাও, মেয়ের মাথায় ছুঁইয়ে—চরণামৃত একটু মুখে ঠেকিয়ে দিও,—তাঁর দয়ায় সব অসুখ ভাল হয়ে যাবে।"

মুকুলের ঠাকুর্দা—অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন; ঠাকুরমা তাঁকে বল্‌লেন, "তুমি একবার গিয়ে দেখে এসোনা।"

"তা যেন ত' কাল-পরশু একদিন যাওয়া যাবে" আমাকে বল্‌লেন, "গিয়ে একটা খবর দিও, প্রয়োজন হলে যাবো বৈ কি।"

ঠাকুরমা বল্‌লেন "খবর আবার কখন দেবে? তুমি কালই একবার যাও।"

"আচ্ছা সে দেখা যাবে,—তোমরা এখন খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করো দিকি,—গাড়ীর সময় হয়ে এলো।"

আহারাদি সমাপন করে যথাসময়ে সো-যানে আরোহণ করা গেল। মায়ের পূজোর ফুল ও চরণামৃত সযত্নে আমার হাতে দিয়ে, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে স্নেহ-ভরা কণ্ঠে মুকুলের ঠাকুরমা বল্‌লেন, "—মা মঙ্গলময়ী মঙ্গল করবেন,—তুমি কিছু ভেবোনা বাবা গিয়ে দেখবে মেয়ে তোমার ভালই আছে।"

মুকুল ঘুমিয়ে পড়েছিল,—তার মা তাকে জাগাবার চেষ্টা করলেন,—উঠল না। অকাতরে ঘুমচ্ছে—তার গায়ে মাথায় হাত দিয়ে আদর করে বল্‌লুম, "ছেড়ে দিন,—কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে আবার কান্নাকাটি করবে।"

মুকুল চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে আমাকে প্রণাম করল!

ঠাকুর্দা তাড়া দিয়ে বল্‌লেন, "আর দেরী নয়, বেরিয়ে পড়ো—নইলে গাড়ী ফেল্ করবে।"

ঘড়ি দেখে জানলুম "যথেষ্ট সময় আছে।"

ঠাকুরমা হেসে বল্‌লেন, "ওঁর সব সময়েই গাড়ী ফেল্ হচ্ছে।"

ষ্টেশনে পৌঁছে—অল্প সময়ের মধ্যেই গাড়ী এসে পড়ল। ফাঁকা গাড়ী, দিব্যি আরামে বসা গেল। আর কি জানি, মনের সেই ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত ভাব যেন বেশ শান্ত হয়ে এলো।

বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, একটা বড় ষ্টেশনে, আলো, হট্টগোল—দৌড়াদৌড়িতে ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। হুড়োহুড়ি চেঁচামেচি—যেন অস্বাভাবিক রকম বেশী,—ব্যাপার দেখে বিশেষ কিছু একটা ঘটেছে বলে মনে হল। চারিদিকে লোকজনের ছড়াছড়ি—পুলিশ,—নানা পোষাক পরিচ্ছদধারী—নানা অফিসার,—ব্যাপার কি!

অনুসন্ধান নিয়ে জেনে একেবারে চক্ষুস্থির!

এর আগের প্যাসেঞ্জারটা—অর্থাৎ যেটায় আমরা আসছিলুম,—এই ষ্টেশনে প্রবেশের মুখে—একটি মালগাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগে:—তার পাঁচটি কামরা একেবারে ভেঙ্গে যায় এবং আরও কয়েকটিও বিশেষ ক্ষতি-গ্রস্থ হয়; ফলে কুড়ি পঁচিশ জন যাত্রী সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়,—এবং শতাধিক আহত হয়। আরও কয়েকজন হাস-পাতাল নিয়ে যাবার পথে এবং জন কয়েক সেখানে গিয়ে মৃত্যু-বরণ করে। হতের সংখ্যা হিসেব উপর এবং আহতের আরও কত দাঁড়িয়েছে—তা বলা শক্ত!

কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! প্ল্যাটফর্ম্মের চারিধারে মৃত্যু বীভৎস আকার নিয়েছে। সেদিকে তাকানো যায় না।

নিজের ঐ অবস্থার কথা কল্পনা করে সর্ব্বাঙ্গ বারবার শিউরে উঠতে লাগল। ঐ গাড়ীতে এলে আমারই যে ঐ অবস্থা হত না, তাই বা কে বলতে পারে!

বাকী রাত্রী সব তখন থেকে এইখানেই পড়ে আছে। চারিদিকে —তাদের ভিড়—জিনিষপত্রের ছড়াছড়ি—ছেলে মেয়েদের কান্নাকাটি—!

এ গাড়ীতে আহত ও অন্ত বহু যাত্রী উঠে পড়ল। রেলওয়ে থেকে আরও কয়েকটা খালি 'বোগি' এটার সঙ্গে জুড়ে দিলে। নানাপ্রকার হট্টগোল—ক্রন্দন-বিলাপ, ও সেই ভীষণ দুর্ঘটনার বিবরণ শুনতে শুনতে বাকী পথটা কাটল।

সারারাত্রি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ট্রেন থেকে নামলুম। কন্যার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে মনের যে উদ্বেগ চঞ্চল অবস্থা নিয়ে ট্রেনে চড়েছিলুম,—দুর্ঘটনার সংসর্গে এসে, তাদের বাড়ী গিয়ে ক ঘণ্টা কাটিয়ে,—সেটা অনেক হাল্কা হয়ে গিয়েছিল; বেশ শান্ত ও নিশ্চিন্ত মন নিয়েই তাদের বাড়ী থেকে যাত্রা করি; কিন্তু পথের মাঝে এই অভাবনীয় বিপর্য্যয়;—মনকে অস্থির করে তুলেছিল! এটা একটা অতিরিক্ত দুর্লক্ষণ বলে মনে হতে লাগল। কি জানি কি অবস্থায় গিয়ে পৌছাব,—একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় ছট্-ফট্ করতে লাগলুম।

গেট্ পার হবার সময় ছোটবাবু বল্লেন, "আপনার বাড়ীর লোক এসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ফিরে যায়। আবার আগে কোন্ করে খবর জানবার চেষ্টাও,—তা অনেক চেষ্টা-চরিত্র করেও কোনই সংবাদ জোগাড় করতে পারা গেল না। খুব আক্সিডেণ্টটা হয়ে গেল. উঃ শুনছি অনেক মরেছে। আপনি ত স্বচক্ষেই সব দেখে এলেন! ঐ গাড়ীতেই ছিলেন নাকি?—ওঃ—ভগবানের অসীম দয়া বলতে হবে।" বলে চোখ বুজে কপালে যুক্ত কর ঠেকালেন।

বল্লুম "নিশ্চয়;—অপার করুনা তাঁর! আসন্ন বিপদের মুখ থেকে তিনি যেন হাত ধরে টেনে নামিয়ে নিয়েছিলেন।" চোখ দু'টো জলে ভরে এলো।

মিনিট দশেকের পথ, শেষ হতে আর চায় না!

অসীম দুর্ভাবনা ও ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় অপেক্ষিত আত্মীয়-স্বজনের মাঝে, আমি যখন অপ্রত্যাশিতরূপে, সম্পূর্ণ সুস্থ ও অক্ষত শরীরে উপস্থিত হলুম, তখন বাড়ীতে যেন একটা উৎসব-আনন্দ লেগে গেল, ট্রেনের 'কলিশনে' যেখানে হতাহতের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়।

মা ত প্রায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেই ফেল্লেন। আমার মাথায় মুখে চুম্বন করে, গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে, তাঁর যেন তৃপ্তি আর হয় না। বাবা ঘন-ঘন পায়চারী ও আধ মিনিট অন্তর নস্য গ্রহণ করতে লাগলেন।

আনন্দ-বিহ্বল অবস্থাটা কমলে মুকী কেমন আছে জিজ্ঞাসা করলুম। মা সজল চক্ষে হাসতে হাসতে বল্লেন, "ওমা তাইত! দিদিমণির কথাটা একেবারে ভুলই হয়ে গেছে—স্যাখো একবার! সে বেশ ভালই আছে বাবা, কাল সন্ধ্যা থেকে জ্বরটা কমতে সুরু করে, ডাক্তার দেখে বলেন ভয়ের আর কোন কারণ নেই—রাত্রি দশটার পর থেকে জ্বর একেবারে ছেড়ে যায়,—তখন থেকে বেশ ঘুমচ্ছে। উঃ কাল আর পরশু দুটো দিন যে কি ভাবে কেটেছে—তা আর বলবার নয়—বাঁচবার কি আর আশা ছিল! আমার হাত ধরে বল্লেন, "চল্ বাবা—তাকে দেখবি চল।"

মুকুলের ঠাকুরমার দেওয়া ফুল ও চরণামৃত মায়ের হাতে দিয়ে,—তাদের সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে সুরু করে, —তাদের বাড়ী যাওয়ার ব্যাপার প্রভৃতি পথের সারা কাহিনী সকলের কাছে বর্ণনা করে আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বল্লুম। "কিন্তু ঈশ্বরের কি অসীম দয়া দেখ মা, আমাকে শুধু হয়ত বাঁচাবার জন্যেই তিনি অমনকরে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিলেন। নইলে, ঐ গাড়ীতে এলে, এই ক'ঘণ্টা দেরী ত হতই; কিন্তু এসে পৌছতুম কিনা ঘোর সন্দেহ!"

মায়ের চোখের জল আর বাধা মানল না। আঁচলে চোখ মুছে—অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বল্লেন। "তুই তাকে চিনতে পারিসনি বাবা, মুকুলের বেশে সাক্ষাৎ বিপদতারিনী মা জগদ্ধাত্রী এসে তোকে হাতে ধরে বিপদ-সাগর পার করে দিলেন,—এ আমি তোকে ঠিক বলছি! দে দে ফুল

চরণামৃত দে—মেয়েটাকে স্পর্শ করিয়ে দিই—" বলে সাগ্রহে সেগুলি আমার হাত থেকে নিয়ে—একান্ত ভক্তি-ভরে বারবার নিজের কপালে ছোঁয়ালেন।

কমলা থলি থেকে ফলগুলি বার করে বল্লে 'ওমা দেখ একটা নেবু কে খানিকটা খেয়ে রেখে দিয়েছে।'

সেটি যে মুকুলের হাতে দেওয়া লেবুটি। সেটি সে সানন্দে নিয়েছিল বটে কিন্তু খুকীর কথা মনে করে এবং তা মায়ের কথা শুনে খেতে পারেনি,—শুধু আমার অনুরোধে দু একটি কোয়া মুখে নিয়ে সেটা যে মিষ্টি সেকথা আমাকে জানিয়ে, কখন গোপনে ও সাবধানে থলির মধ্যে রেখে দিয়েছিল, কেউ জানতেও পারেনি। তার স্নেহ-মাখা কচি মুখখানি মনে করে আমি আজ অশ্রু সম্বরণ করতে পারলুম না।

আসল ব্যাপার শুনে সকলে হেসে উঠলেন।

মা বল্লেন, 'ঐটুকু মেয়ের কত বুদ্ধি দেখ।'

বাবা গম্ভীরভাবে বল্লেন, 'শুধু বুদ্ধিই নয়, কত স্নেহ ও মমতা ভরা তার মনটি এই সামান্য ঘটনায় তা বুঝতে আর বাকী থাকে না। যে দিদি বলে অসুস্থ ছোট বোনটির জিনিষ মুখে দিতে পারলে না। তবু ত খুকীকে চোখেও দেখেনি, কিন্তু তার প্রতি কত স্নেহ, কি অসীম ভালবাসা!'

পরের দিন বিকেলের ট্রেনে মুকুল, তার ঠাকুর্দা ও মা এসে উপস্থিত হলেন। আলাপ-পরিচয়ের পর ঠাকুর্দা বল্লেন, 'সকাল থেকে তাগাদার পর তাগাদা, কখন যাবে দাদু—পারুলকে দেখতে! ওর মায়ের কাছে আমার আসবার কথা শুনেছিল বোধ হয়। ভেবেছিলুম একলাই আসব, তা কি হবার জো আছে! শুধু নিজেই নয় মাকে পর্যন্ত টেনে আনতে হবে!' হাসতে হাসতে আমাকে বল্লেন, 'আজ্ঞা কাকা পাতিয়েছিলে যাহোক্! শুধু কি তাই, এক গাড়ী খেলনা,—সে একবোঝা,—বইতে বইতে আমার প্রাণ যায়! কোথায় গেলি রে;—লজ্জায় লুকিয়েছে বুঝি!' বলে একচোট হেসে উঠলেন।

সকলে মিলে কাকে দেখতে গেলেন।

'কি গো দিদিমনি কেমন আছো' বলে খুকীর কাছে বসে তাকে বেশ ভাল পরীক্ষা করে, ঠাকুর্দা বল্লেন, 'মেয়েত তোমার বেশ ভাল আছে, সেরে গেছে,—জ্বরের তো কিছুই দেখি না। কয়েক দিনেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে।' তার ওষুধপত্রের ব্যবস্থাদি সব খুঁটিয়ে দেখে কিছু কিছু অদল-বদল করে ও নিজের মতামত লিখে দিয়ে বল্লেন, 'যিনি চিকিৎসা করছেন—ওঁর অমত না হলে এগুলো দিতে পারো।'

তার মায়ের হাত ধরে মুকুলও খুকীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।—মুখখানি গম্ভীর বড় বড় টানা টানা চোখ দুটি দিয়ে স্নেহ যেন উথ্‌লে পড়ছে,—একদৃষ্টে খুকীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ঠাকুর্দা তাকে কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন, 'কই আয়; বোনটিকে আদর কর। কি কি এনেছিস্ দে,—মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা ওর কাছে যা। পারুলকে কোলে নোব, আদর করবো, চুমু খাবো, ঘুম পাড়াবো, অমুক দেবো তমুক দেবো,—খুব ত হচ্ছিল, এখন মায়ের কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা ওর কাছে যা।' খুকীর মাকে বল্লেন, 'দাওত বউমা, খুকীকে ওর কোলে দাও,—তোমরা কাজকর্ম করগে যাও,—ও এখানে থাকবে খুকীকে দেখাশোনা করবে।' বলে মুকুলকে খুকীর বিছানার কাছে এগিয়ে দিলেন।

খুকীর মা মুকুলের হাত ধরে তাকে সাদরে কাছে টেনে নিয়ে মৃদুস্বরে বল্লেন, 'এসো—এইখানে বসে খুকীর গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করো' বলে তাকে কাছে বসিয়ে তার ছোট্ট হাতটি নিয়ে খুকীর মাথায় মুখে বুলিয়ে দিলেন।

মুকুল নিজের মুখটি খুকীর মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বল্লে,—'পারুল,—দিদি বলো।'

'—ক্কা--ক্কাঁ-ক্কাঁ।' করে খুকী তার ছোট হাত দিয়ে মুকুলের মুখ ঠেলে সরিয়ে দিয়ে—কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কোলে মুখ লোকাল।

তার মা সস্নেহে তার পিঠ চাপড়ে থামিয়ে বল্লেন,—'ছিঃ কাঁদতে নেই—দিদি যে—'

দিদির মুখ তখন জলভরাক্রান্ত মেঘের মত থম্‌থমিয়ে উঠছে,—চোখের কোণ জলে টলটল করছে।

মুকুলের মা ওঁর অভিমানিনী মেয়ের মনের অবস্থা বুঝে, সঙ্গে আনা ফলের ও খেলনার পোঁটলা দুটি তার হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, '—এগুলো পারুলকে দাও, তবে না দিদি বলবে।'

কাঁদো কাঁদো মুখে মায়ের দিকে চেয়ে 'ও-ত খালি কাঁদে' বলে খেলনা ও ফলগুলি খুকীর কাছে নিয়ে গিয়ে সস্নেহে তার গায়ে হাত দিয়ে সে বলে, 'পারুল—এই দেখ, কত খেলনা এনেছি—কত মিষ্টি মিষ্টি ফল এনেছি—এসো,—এই নাও—'

খুকী তার মাকে জড়িয়ে ধরে আরও কান্না জুড়ে দিল, স্নেহময়ী দিদির দিকে ফিরেও চাইল না। মুকুলের চোখে জলভরে এল। সে খুকীর কাছ থেকে সরে এসে, —মাকে জড়িয়ে ধরে—তাঁর কোলে মুখ গুঁজে দুঁপিয়ে দুপিয়ে কেঁদে উঠল। তাকে কোলে তুলে নিয়ে, আঁচলে চোখ মুছিয়ে বললেন, 'ছি ছি—খুকীর মত তুমিও কাঁদছ! ওর অসুখ করেছে দেখছ না?—ভাল হলে তোমায় দিদি বলবে, অমন করে কাঁদলে কি দিদি বলে?'

আমার মা এগিয়ে এসে তাকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে আদর করে তার মুখে চুমু খেয়ে বললেন, 'এসো ত দিদি আমার কাছে এসো, খুকী ভারী দুষ্টু মেয়ে—কেবল কাঁদে। ও নাইবা তোমায় দিদি বলল, আমি তোমায় দিদি বলব, চলো' বলে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

তারপর যতক্ষণ ছিল, ফাঁক পেয়ে সে দু'চার বার খুকীর ঘরে উঁকি মেরে দেখে এলো বটে, কিন্তু তার কাছে আর গেল না।

বাড়ী থেকে বার হবার পর থেকে ষ্টেশনে গাড়ীছাড়া পর্য্যন্ত সে একবারও আমার কোল থেকে নামে নি। বিশেষ কোন কথাও বলেনি। একবার বললে—'পারুল খেলনাগুলো ফেলে দেবে না ত?'

উত্তরে বললাম, 'পাগল! অমন খেলনা সে পাবে কোথায়? দেখোনা ভাল হয়ে উঠলে সেগুলো খুব যত্ন করে বাক্সে তুলে রেখে দেবে।'

সে জিজ্ঞাসা করলে—'খেলা করবে না?'

'করবে বৈকি,—'আমি বললাম, 'রোজ খেলা করবে আর বলবে দিদি দিয়েছে,—আমাদের কাউকে হাতও দিতে দেবে না।'

তার মুখে হাসি ফুটে উঠল, বললে, 'ফলগুলো খায় ত'—তুমি খেয়ে নিও।'

সম্মতি জানালুম,—এবং খুকীর ঠিক পরেই আমার স্থান ভেবে মনে মনে হাসিও পেল।

গাড়ী ছাড়বার মুখে সে আমার গলা জড়িয়ে কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'কাকা।'

'কি মা।'

সেই ভাবেই সে বললে,—'পারুল ভাল হয়ে উঠলে আমায় দিদি বলবে?'

তার গালটি আমার গালের উপর চেপে ধরে বললাম, 'নিশ্চয় বলবে, তুমি দেখো।'

একটি ছোট নিঃশ্বাস ফেলে সে বললে, 'আমি আর তার ওপর রাগ করব না।'

বাঁশী বাজল, ঠাকুর্দা তাকে টেনে নিয়ে বললেন—'এদিকে এসে বোস্—পড়ে যাবি।'

জানালা দিয়ে বাড়ানো তার মুখটি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার চোখের সামনে চারিদিক ঝাপ্‌সা হয়ে এলো।

শার্ল বোদলেয়ার-এর একটি কবিতা

অনুবাদ— বুদ্ধদেব বসু

দয়িতা, কন্যা, বোন,
আমার স্বপ্ন শোন,
সে-দূর দেশে কি মধুর হতো না সবি,
অবসর, ভালবাসা,
মরণ সর্বনাশা,
অবিকল তোর তনুর প্রতিচ্ছবি!
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে
সজল সূর্য আঁকে
আমাকে ভোলাতে, তোর চাহনির ছায়া,
যখন, অশ্রু মেশা
রহস্যময় নেশা
বিলায় চোখের প্রবঞ্চনার মায়া।

সেথা কিছু নেই, যা নয় আলোয় জ্বলা,
শান্তি, বিলাস, উৎসব, শৃঙ্খলা।
সেই দেশে, তোর ঘরে,
রশ্মি ঠিকরে পড়ে
বহু বৎসরে উজ্জ্বল আসবাবে,
বিরল ফুলের তোড়ায়
পাগল গন্ধ ছড়ায়
ঝাপ্‌সা ধূপের অনুকূল অনুভাবে।
কারু খিলানের কোণে
তলহীন দর্পণে
প্রাচ্য দেশের বৈভব বাঁধে বাসা,
সব ওঠে কথা ব'লে
গোপন হৃদয়-তলে,
বিজনে শোনায় মধুর মাতৃভাষা।

সেথা কিছু নেই যা নয় আলোয় ভরা,
শান্তি, বিলাস, উৎসব সুষমা।

ভাখরে অলস খালে
বাঁধা সুপ্তির জালে
নৌকোর সারি—মেজাজ বাউণ্ডুলে ;
তোর নগণ্য সাধে
মেটাবার আহ্লাদে
নিখিল সাগরে ছোটে ওরা ঢেলে দুলে।
অস্ত-সূর্যগুলি
ছড়ায় বর্ণ ধূলি
বেগনি, সোনালি—খালে, পথে, প্রান্তরে,
সকল নগর রাঙায় ;
টানে দিগন্ত-ডাঙায়
উষ্ণ আভার তন্দ্রার কন্দরে।

সেথা কিছু নেই, যা নয় আলোয় ভরা,
শান্তি, বিলাস, উৎসব সুষমা।

জীবন বীমা

গোপালকৃষ্ণ ভাস্কর

বাঁচার অজানা কাল।
হাতের নাগালে ধরা সময়ের খণ্ডাকৃতি মানুষের রূপ—
দাগ-টানা পথে তার জীবনের যত ঘোরা ফেরা.....
প্রাণের দৃষ্টির চেয়ে বহু বেশি দূর দৃষ্টি জীবন বীমার,
মৃত্যুর শীতল মুঠি—নাগালে পেলোনা কুঁটি তার.....
কেটেছে কুয়াশা-জাল.....জানাজানি হ'য়ে গেল
চিত্রগুপ্ত আর নয় বণিকের সেরা।

তবুও দালাল এক ঘৃণা ছাড়া পেলোনা মর্যাদা;
পরকীয়া প্রেমতীর্থে দেখা আত্মা লুটে নিল রাধা.....

কিছুক্ষণ ভেবে নিতে দাও,
এদিকের কত অংশ গ্রাস করে অন্যদিক হ'য়েছে উধাও!

কে দেবে বিচার করে? চোখে রক্ত, কাণে বাজে বাঁশির চাতুরী
গণিতে গণ্ডা ছোট; কি ক'রে সে ভেঙে দেবে জীবন রহস্য জারিজুরি?
তবুও মূঢ়ের দল হিসেবের দাস হয়ে ঘুরে
কাণে কি শোনে না কেউ—
বেহিসেবী বাঁশি বাজে রজনী উতল করা সুরে!

শ্বাপদ-মানুষ চোখ তীক্ষ্ণ হয়.....
বেড়ে ওঠে রাত
পরকীয়া প্রেম চাই
মূল্য দিয়ে কেনে তাই
বারাংগনা রাধিকার হাত!
দোকানে বিকোয় মালা, তাই কেনে ওরা
মুহূর্ত হিসেব কষা, তাড়াতাড়ি ভরে নেয় হাটে হাটে প্রেমের পসরা।

গলায় দিচ্ছে মালা কার ?
গভীর অথই জল,
নদীতে ভাসাই ফুল
ফুলগুলি ছুঁয়ে আসে জলের ওপার !

থাক্‌না না-বলা সেটা,
তোমাকে আমার ঠিক কি যে মনে হয়.....
দুর্বল টাকার পুঁজি
আঁতি-পাতি তাই খুঁজি
পলে পলে হ্লাদিনীর ঘটে অপচয় !

কখনও না মনে হয়,
তুমি যেন গণিকা আর এক—
সারাটা জীবন যেন একটানা বড়রাত.....
তারি মাঝে তুমি এসে দাঁড়ালে বারেক।
অর্থহীন সংগীতের তুমি যেন ভেঙে যাওয়া তাল—
চিত্রগুপ্ত বাক্যহত.....মৃত্যুতে বেড়েছে টাকা, টাকা জীবনেরও বড়
ঘোষণা করেছে এক বীমার দালাল।

অলিখিত মুহূর্তের ইতিহাসে প্রতিটি মুহূর্ত এসে মুহূর্তের মাঝে মিশে যায়
সাগর মন্থন করে অমৃত-গরল তুলি.....
দেহাতীত বাঁধা পড়ে দেহের সীমায়।

মনে হয়, সেই সে সুদীর্ঘ রাত যেন গলে গেলো !
সে- গলা-রাত্রির-লাভা মন্থনেতে বিক্ষুব্ধ সাগর .....

নির্বাক দালাল আর হতবাক্ চিত্রগুপ্ত
চোখে চোখে চায় পরস্পর ॥

যুগযাত্রী

সুবোধ রায়

যুগযাত্রী-পদধ্বনি শুনিতে যে পাই
তাহার চলার ছন্দে চিত্ত মোর স্পন্দিত সদাই
প্রাণ মোর নন্দিত সদাই ; তাই
পথচলা জীবনের সুরে সুরে সংগীতি মিলাই।
পূর্ব্বাচল পানে চেয়ে চেয়ে
মন উঠে গেয়ে—
আসিছে নূতন দিন
প্রভাত পুষ্পের সম অমলিন,
আনিছে নূতন বার্ত্তা মানুষের লাগি,
একের তপস্যা যেথা অনেকের প্রেমে উঠে জাগি।
আপনারে উৎসর্জন করি'
উষর জীবনে দিকে শ্যামলতা ভরি ;—
নদীর দাক্ষিণ্যে যথা দুই তীর মাঝে
জীবনের কলগান বাজে।

এসো নব যুগযাত্রী, এসো সত্য পথে,
এসো তুমি ক্লান্তিহীন কল্যাণের রথে,
বাধা মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মৃত্যু তুচ্ছ করি,
বাহিয়া চলিও তব জীবনের তরী।
ঐ শোনো আজি
দিকে দিকে উঠে বাজি',
মহাজীবনের জয়গান,—
স্রোতস্বিনী শুনেছে যে সাগর আহ্বান।
সে উদাত্ত কলরোল
চিত্তে তব দিক্ দোল,
কণ্ঠে তব দিক্ বজ্রবাণী,
অসুন্দরে মৃত্যুহানি'
জাগাক্ মর্ম্মের মাঝে সুন্দরের অমৃত পিপাসা
বিদায় গোধূলি চক্ষে জাগে এই স্বপ্নারুন-আশা।

ভাল ছাপার জন্য

নিউ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড

৪১এ, বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা-

ফোন : ৩৫-৩৭৩২

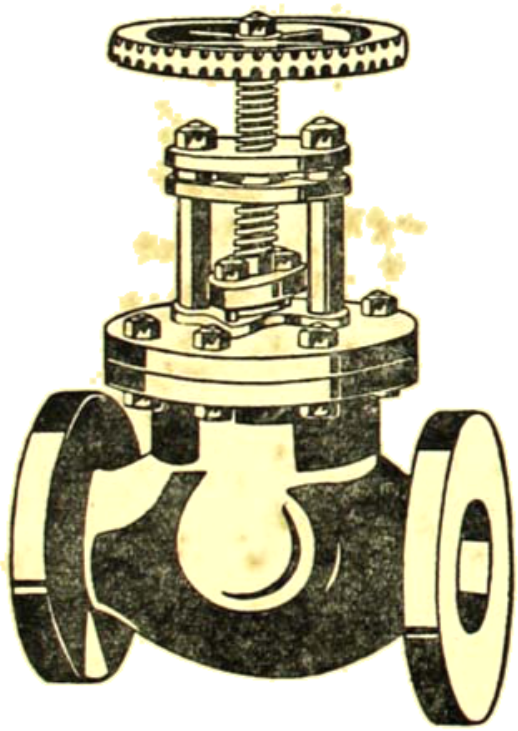

সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ও উচ্চ প্রশংসিত

গ্লুইস ভাল্‌ভ ও কক্‌

হাইড্রলিক, গ্যাস ও অয়েল টেষ্টেড্‌

জে, এন, পাড়ুই

২০৬, বেলিলিয়স রোড : হাওড়া

ট্রেড মার্ক "ফাউণ্টেন" টেলিগ্রাম—'চাক্‌' (Chauk) হাওড়া

॥ সূচীপত্র ॥

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ—বিপিনচন্দ্র পাল (চরিত-চিত্র—পুরাতন প্রবন্ধ হইতে)

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার জীবন সাধনা হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত

ভাষের শাসন—বিমলাপ বন্দ্যোপাধ্যায় (গল্প)

স্মৃতিকণা (শরৎচন্দ্র)—শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার

পোর্ট্রেট্—বিমল দাশ (গল্প)

দু'টি কবিতা—অমলেন্দু ঘোষ (কবিতা)

প্রিয়তম—সুপ্রিয় রায় (কবিতা)

আমাকে ঘিরে—সামসুল হক (কবিতা)

বিপ্লব যুগের অবিস্মরণীয় কাহিনী—শোভন নন্দী

আমার চোখে দেখা সোভিয়েট দেশ—ডাঃ কুদ্রেন্দ্র কুমার পাল

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্কট—গৌরীশঙ্কর রায়চৌধুরী

মানুষ! মানুষ! শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (কবিতা)

মা ও ছেলে—সোমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (গল্প)

চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাচ্য বিদ্যা-ভবন

॥ পদপূরণ ॥

পাঞ্জাবী সাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত—বিশ্বভারতী পত্রিকা

ধর্মরাজ অশোক—প্রবোধ চন্দ্র সেন

রাশিয়া ও সমস্ত মানুষের স্বার্থ—রবীন্দ্রনাথ।

উইলিয়ম কেরী ও বাংলা ভাষা—সজনীকান্ত দাস।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের স্বদেশ-প্রেম—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

॥ পত্রিকা সম্বন্ধে ॥

যুগযাত্রীর বার্ষিক সডাক মূল্য ছ'টাকা। সব বিষয়ে মৌলিক রচনাই আমরা সাদরে গ্রহণ করব। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, প্রবন্ধ, সাংস্কৃতিক আলোচনা অনুবাদ সাহিত্য ইত্যাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে লিখে সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন। অমনোনীত রচনা উপযুক্ত ডাকটিকিট ও ঠিকানা দেওয়া থাকলে ফেরৎ দেওয়া হয়। পত্রিকায় সমালোচনার জন্য দু'খানা করে বই সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন। পত্রিকাসংক্রান্ত সমস্ত রকম চিঠিপত্র সম্পাদকীয় কার্যালয়ে প্রেরিতব্য।

সম্পাদকীয় কার্যালয়

৬১-এ, বলদেওপাড়া রোড, কলি

ধানভাঙ্গা কল, কক্, ভালভ্, হাউসহোল্ড পাম্প,
ষ্টিম পাম্প, ওয়েল পাম্প, তুষের চুল্লী বা
হাসক্ ফারনেস্,ইলেক্‌ট্রিক
মোটর ইত্যাদি

মার্শাল সন্স এণ্ড কোম্পানী
(ইণ্ডিয়া) লিঃ
৩৩।২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

সবরকম আধুনিক ও রুচিসম্পন্ন
পুস্তক ছাপানই আমাদের

ইউনিভার্সাল বুক বাইণ্ডার্স

৩৬-৬

GITA FOR ALL

Sri Monoranjan Roy, M A., B L.

Readers will find it very
useful for mental and
spiritual uplift.

42. Kabir Road, Calcutta-26

প্রবাসী

প্রথম বর্ষ | শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩৬৪ | একাদশ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

চরিত-চিত্র

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

বিপিনচন্দ্র পাল

বাংলার স্বাধীনতার ও স্বদেশ-চর্যার আদর্শ

যে যাহাই বলুন না কেন বাংলার নিকট হইতেই যে ভারতের অপরাপর প্রদেশবাসিগণ বহুল পরিমাণে আধুনিক স্বাধীনতার ও স্বদেশচর্যার উদ্দীপনা লাভ করিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। সমগ্র ভারত যখন নিদ্রিত, কেবল বাংলাই তখন জাগিয়া উঠিয়াছিল। ব্রিটিশ ভারতের অন্য কোন প্রদেশে যখন ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হয় নাই, বাঙ্গালী তখনও এই মুক্তি-মন্ত্র সাধনে নিযুক্ত ছিল। আর এই জন্যই বাংলার স্বাধীনতার আদর্শের পূর্ণতা ও সত্যতা; বাঙ্গালীর স্বদেশিকতার ধর্মপ্রাণতা ও একনিষ্ঠা এবং বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনের শক্তি ও শুদ্ধতা, এ সকল এ পর্যন্ত ভারতের অন্য কোন প্রদেশে দেখা যায় নাই। অন্যান্য প্রদেশের ধর্মসংস্কার-চেষ্টা একদিকে নূতনকেও নিঃসঙ্কোচে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হয় নাই এবং অন্যদিকে পুরাতনের সনাতন প্রাণ-বস্তুকে অবলম্বন করিয়া তাহাকেও সজীব ও সময়োপযোগী করিয়া তুলিতে পারে নাই; কিন্তু নূতনের কুযুক্তি এবং পুরাতনের কুসংস্কারের মধ্যে একটা খিচুড়ি পাকাইবার চেষ্টা করিয়াছে। সমাজ-সংস্কার চেষ্টাতেও অন্যান্য প্রদেশে এইরূপ অসঙ্গতি-দোষ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সমাজ-সংস্কার করিতে যাইয়া বাংলা আপনার বিচার-বুদ্ধির শুদ্ধ শ্রেয়ের পথই ধরিতে চাহিয়াছে, প্রেয়ের পথে চলিবার জন্য ব্যস্ত হয় নাই; কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের সমাজ-সংস্কারের চেষ্টাতে ন্যায়ের প্রেরণা অপেক্ষা সুখের প্রলোভনই বলবত্তর হইয়া আছে। সত্যের আনুগত্য অপেক্ষা সুবিধার অন্বেষণই তাহাতে বেশী। অন্যান্য প্রদেশের রাষ্ট্রীয় চেষ্টার মধ্যেও এখনও পর্য্যন্ত একটা সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু বাংলার রাষ্ট্রীয় আদর্শ চিরদিনই সমগ্র ভারতের মৌলিক একত্বের উপরে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। সেইরূপ ভারতের অন্যান্য

প্রদেশে প্রকৃত স্বাধীনতার আদর্শও ফুটিয়া উঠে নাই, কেবল বাংলা দেশেই তাহা ফুটিয়াছে। আর অন্যান্য প্রদেশের স্বাদেশিকতা এক দিকে ভারতের সনাতন সভ্যতা এবং সাধনার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, অন্য দিকে আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠতম মানব-হিতৈষণা ও বিশ্ব-কল্যাণ-কামনার সঙ্গেও যুক্ত হয় নাই। এই স্বাদেশিকতা কোথাও বা একটা অন্ধ, অযৌক্তিক স্থবির ও গতানুগতিক রক্ষণশীলতার, আর কোথাও বা একটা শ্রেয়-জ্ঞানশূন্য প্রেয়-সন্ধিৎসু বিজাতীয় পরজাতিবিদ্বেষেরই নামান্তর ও রূপান্তর মাত্র হইয়া আছে। অনেক স্থলেই এই স্বাদেশিকতার, সঙ্গে বিশ্ব-কল্যাণ-কামনার যথাযোগ্য সঙ্গতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কেবল বাংলা দেশেই আধুনিক স্বাদেশিকতার বা Nationalismএর সত্য ও পূর্ণ আদর্শ অনেকটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর ইহার কারণ এই যে, ইদানীন্তন কালে বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজ স্বাধীনতার ও স্বাদেশিকতার যে উন্নত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, ভারতের অন্য কোন প্রদেশবাসিগণ এ পর্য্যন্ত সে শিক্ষা লাভ করিবার অবসর পান নাই। বাংলার এই আধুনিক স্বাধীনতার ও স্বাদেশিকতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য নানা দিকে নানা লোক নানা চেষ্টা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এই নূতন সাধনার প্রথম যুগের প্রধান দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু তিনজন—রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ।

রাজা রামমোহনের কর্মচেষ্টা

বাংলার এবং বস্তুতঃ সমগ্র ভারতবর্ষেরই, আধুনিক ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনের প্রথম গুরু রাজা রামমোহন। ইংরেজি শিক্ষায় ইংরেজের শাসনে য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার সংস্পর্শে এদেশে যে অভিনব আদর্শ ফুটিতে আরম্ভ করে, রামমোহনের অলোকসামান্য প্রতিভাই সম্যকরূপে তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, সেই আদর্শকে স্বদেশের পুরাতন সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে মিলাইয়া, কিরূপে তাহার পূর্ণতা সাধন করিতে হইবে, ইহা দেখিয়া গিয়াছে। রাজা রামমোহন কিরূপে সমাজ জীবনের সকল বিভাগে এই নূতন যুগধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তাহার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি আপনার জীবনে ও উপদেশাদিতে যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্বাদেশিকতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে, নানা দিক্ দিয়া, ঋজু কুটিলভাবে, বিগত শত বৎসর ধরিয়া, দেশের শ্রেষ্ঠজনেরা নিজ নিজ শক্তিসাধ্য অনুসারে সেই আদর্শেরই সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। এই শতাব্দব্যাপী সাধনার বলে সেই আদর্শ ক্রমে ক্রমে স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে সত্য; কিন্তু এখনও সম্যকরূপে আয়ত্ত হয় নাই।

কিন্তু রামমোহন সম্পূর্ণ আদর্শ প্রত্যক্ষ এবং প্রকাশিত করিয়াও আপনার কর্ম্মজীবনে বিশেষভাবে তার তত্ত্বাঙ্গ বা theoretic sideই ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন যুগের সঞ্চিত কর্মক্ষয় ও তাহার প্রাণহীন সংস্কার ও অর্থহীন কর্ম্মজঞ্জাল পরিষ্কার করিবার চেষ্টাতেই তাঁহার সমুদয় সময় ও শক্তি নিয়োজিত হয়। রামমোহনের শিক্ষা সমাজজীবনের সকল অঙ্গকেই অধিকার করিয়াছে সত্য। একদিকে যেমন ধর্ম্মের তত্ত্বাঙ্গ ও সাধনাঙ্গ, উভয় অঙ্গকেই তিনি সুশোধিত ও সুসংস্কৃত করিয়া,

প্রাচীন ঋষিপন্থা অবলম্বনেই তাহাকে সত্যোপেত ও সমন্বোপযোগী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেইরূপ অন্যদিকে সমাজ-জীবনেও যে সকল অনাচার পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারও সংস্কার-সাধনে সমধোচিত যত্ন করিতে ত্রুটী করেন নাই। আর দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনেও যাহাতে প্রজাসাধারণের স্বত্ব-স্বাধীনতার সম্প্রসারণ হয়, রাজা রামমোহন সে দিকেও যথাযোগ্য যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মজীবনের এই ব্যাপকতা ও বহুমুখীনতা সত্ত্বেও রামমোহন বিশেষভাবে ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কোন একান্ত ধর্ম্মপ্রাণ সমাজে কোন নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে তাহাকে ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই ফুটাইয়া তুলিতে হয়, নতুবা সে আদর্শ সে সমাজের মর্ম্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই জন্য রাজা রামমোহন নবযুগের সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও তাঁহার কর্ম্মের ঝোঁক যে ধর্ম্মের সংস্কারকার্য্যের উপরেই বেশি পড়িয়াছিল, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

সংস্কার-চেষ্টার মূলমন্ত্র স্বাধীনতা

স্বাধীনতাই রাজা রামমোহনের শিক্ষা ও সাধনার মূলমন্ত্র ছিল। ধর্ম্মের তত্ত্বাঙ্গে ও সাধনাঙ্গে—এই দুই দিকেই রাজা বিশেষভাবে স্বাধীনতার আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু একদিক দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাধনার স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে রাজার আদর্শের যোগ ও মিল থাকিলেও, ইহা সর্ব্বতোভাবেই সেই আদর্শ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও পূর্ণতর ছিল। আর স্বদেশের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে রাজার যে গভীর আধ্যাত্মিক যোগ ছিল, তাহাই তাঁহার স্বাধীনতার আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ। রাজা বৈদান্তিক সাধনের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এইজন্য বৈদান্তিক মুক্তির আদর্শের সঙ্গে রাজা রামমোহনের স্বাধীনতার আদর্শের অতি নিগূঢ় যোগ ছিল। বেদান্ত মার্গ অবলম্বন করিয়া, ইদং-প্রত্যয়বাচক সর্ব্ববিধ অনাত্ম-বস্তুর ঐকান্তিক অধীনতা হইতে অহং-প্রত্যয়বাচক আত্ম-বস্তুকে মুক্ত করাই রাজা রামমোহনের শিক্ষা ও সাধনার মূল মন্ত্র ছিল। তাঁহার ধর্ম্মের শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা সকলই এই আদর্শের অনুগামী ছিল। রাজার বহুমুখী সাধনার প্রত্যেক ও সকল বিভাগের সঙ্গেই একটা অতি গভীর ও ঘনিষ্ঠ যোগ-সম্পর্ক ছিল। আর এই যোগ-সম্বন্ধই রাজার আদর্শকে আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের আদর্শ হইতে বিশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। রাজার দেশ-প্রচলিত কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ তাঁহার এই বৈদান্তিক আদর্শের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু বেদান্ত সিদ্ধান্তের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াও রাজা সম্পূর্ণরূপে শঙ্কর-বেদান্তের মায়াবাদ গ্রহণ করেন নাই, অন্যদিকে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সগুণ ব্রহ্মবাদকেও একান্তভাবে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু শঙ্কর-সিদ্ধান্ত ও রামানুজ-সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া, ভারতের প্রাচীন ঋষিপন্থার সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপের উচ্চতম সামাজিক আদর্শের অপূর্ব্ব সঙ্গতিসাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের ন্যায়, রামমোহন কি তত্ত্ববিচারে কি ধর্ম্মসাধনে একান্তভাবে শাস্ত্রগুরুর

অধিকার ও প্রামাণ্য অগ্রাহ্য করেন নাই। কিয়ৎ-পরিমাণে মার্টিন লুথারের মত রাজা রামমোহনও শাস্ত্রনির্দ্ধারণে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী ব্রাহ্ম আচার্য্যগণের ন্যায় শাস্ত্রের প্রামাণ্য ও অধিকার একেবারে অস্বীকার করেন নাই। অন্যদিকে লুথারের ন্যায় রাজা শাস্ত্রার্থ নির্দ্ধারণে সদ্‌গুরুর প্রয়োজন অগ্রাহ্য করিয়া, কেবলমাত্র স্বানুভূতির উপরেই শাস্ত্রোপদেশের সত্যাসত্য নির্ণয়ের ভারও অর্পণ করেন নাই। এই জন্যই প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টীয় সিদ্ধান্তে শাস্ত্র ও স্বানুভূতির—Scripture এবং Private Judgmentএর মধ্যে যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা হয় নাই, রাজা আপনার সিদ্ধান্তে, শাস্ত্রার্থ বিচারে, সদ্‌গুরুর যথাযোগ্য স্থান ও অধিকার প্রদান করিয়া, অতি সহজেই সেই সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন। আর এইরূপেই রাজা রামমোহন তত্ত্ববিচারে ও ধর্ম্মসাধনে ভারতের প্রাচীন এবং য়ুরোপের আধুনিক সাধনার উচ্চতম আদর্শের মধ্যে একটা অতি সুন্দর সঙ্গতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও লোকশ্রেয়

যেমন তত্ত্ববিচারে ও ধর্ম্মসংস্কারে, সেইরূপ আপনার সামাজিক সিদ্ধান্তেও রাজা রামমোহন প্রাচীন ভারতের ও আধুনিক য়ুরোপের সাধনার মধ্যে একটা অতি সুন্দর সঙ্গতি স্থাপন করিয়াই আমাদিগের বর্ত্তমান যুগ-আদর্শকে সামাজিক জীবন সম্বন্ধেও একই সঙ্গে স্বাদেশিক ও সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। সমাজ-জীবনের শৈশবে জগতের সর্ব্বত্রই সমাজের কর্ম্ম-বিভাগ বংশ-মর্য্যাদার অনুসরণ করিয়া চলে। যে যাহার বংশে জন্ম, সেই বংশের পুরুষানুক্রমিক কর্ম্ম ও অধিকারই সমাজ-জীবনে তার নিজেরও কর্ম্ম ও অধিকার হয়। যখন পিতা বা পিতৃব্য বা তাঁহাদের অভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই প্রত্যেক শিশুর একমাত্র দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু ছিলেন, পরিবারের বাহিরে যখন বালশিক্ষার কোনো বিশেষ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন কোনো ব্যক্তির পক্ষে পৈত্রিক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, ব্যবসান্তর গ্রহণে জীবিকা উপার্জ্জন করা একান্ত অসাধ্য না হইলেও, নিতান্তই দুঃসাধ্য ছিল, সন্দেহ নাই। সে অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের কুলধর্ম্মই সমাজ-দেহে তাহার বিশেষ স্থান ও কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিত। আর সে সময়ে জনগণের কর্ম্ম ও অধিকারভেদ জন্মগত হইলেও প্রকৃতপক্ষে গুণ-কর্ম্ম-বিভাগের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমাজবিজ্ঞানের এই ঐতিহাসিক তত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্ গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

এই সাধারণ সমাজতত্ত্বের উপরেই হিন্দুর বর্ণ-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু হিন্দু এই স্বাভাবিক কর্ম্মবিভাগের সঙ্গে আশ্রম চতুষ্টয়কে যুক্ত করিয়া এই বর্ণভেদের ভিতর দিয়াই যে অভেদ শিক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, জগতের আর কোনো জাতি সমাজ-জীবনের শৈশবে ও কৈশোরে সেরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। সুতরাং এই আশ্রমধর্ম্মই প্রাচীন হিন্দু সাধনার সমাজতত্ত্বের বিশেষত্ব। কিন্তু

কালক্রমে এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও যখন সামাজিক উন্নতি ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহায় না হইয়া তাহার অন্তরায়ই হইয়া উঠিতে লাগিল, যখন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মস্বভাবসুলভ সত্ত্বগুণ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রপ্রকৃতিসুলভ রজোগুণ হারাইয়াও কেবল জন্মের দোহাই দিয়াই ব্রাহ্মণত্বের বা ক্ষত্রিয়ত্বের অধিকার ও মর্য্যাদা দাবী করিতে লাগিলেন, তখন সমাজের ও ব্যক্তির উভয়ের কল্যাণার্থ প্রাচীন কুলধর্ম্মকে অতিক্রম করাই আবশ্যক হইয়া উঠিল। এইজন্যই গীতায় ভগবান্ প্রথমে বর্ণাশ্রমের সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াও শেষে গুহ্যাদপি গুহ্যতম যে ধর্ম্মতত্ত্ব তাহার অভিব্যক্তি করিয়া বলিলেন :—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥

অতএব বর্ণাশ্রমপ্রধান হিন্দুর সমাজতত্ত্বেও সর্ব্বকর্ম্মন্যাসপূর্ব্বক, মহাজনপন্থা অবলম্বন করিয়া, এই বর্ণাশ্রমের অধিকার অতিক্রম করিবারও প্রশস্ত পথ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর ইহাই প্রকৃতপক্ষে হিন্দুর সমাজতত্ত্বের ও সমাজনীতির শেষ শিক্ষা ও শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধান্ত। রাজা এই সিদ্ধান্তের উপরেই আপনার সামাজিক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহার সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার শ্রেষ্ঠতম ও উচ্চতম সামাজিক সিদ্ধান্তের সঙ্গতি সাধন করিয়াছিলেন। কর্ম্মসাধনই সামাজিক জীবনের উপজীব্য। কর্ম্মের ভিতর দিয়া ব্রহ্মকে লাভ করাই সমাজ-জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য লাভের জন্য প্রথমে ঐকান্তিক সমাজানুগত্য, তৎপরে সমাজের এই আনুগত্য স্বীকার করিয়াও ভগবানে সমাজবিধি-নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বপ্রকারের কর্ম্মার্পণ, তার পরে মহাজনপদ আশ্রয় করিয়া এই সমাজানুগত্য বর্জ্জন ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধন,—এই ত্রিপাদেতে হিন্দুর কর্ম্মসিদ্ধান্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মধ্য-যুগের হিন্দুস্থানী নিষ্কাম কর্ম্ম বলিতে ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ ফলভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, লোকসংগ্রহার্থে বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই বুঝিয়া আসিয়াছে। এখনও অনেকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলিতে ইহাই বুঝেন। রামমোহন মধ্যযুগের হিন্দুস্থানীর আশ্রম-বিরহিত সুতরাং ধর্ম্মহীন বর্ণভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মজীবনের সংস্কার সাধনার্থ, প্রাচীন ঋষিপন্থা অবলম্বন করিয়াই লোকাশ্রয়কে একমাত্র প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এইরূপে তিনি প্রাচীন হিন্দু কর্ম্মতত্ত্বকে একদিকে সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র এবং অন্যদিকে সত্যভাবে স্বদেশী ও সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। কি তত্ত্ববিচারে ও ধর্ম্মসাধনে কি সামাজিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় ও সমাজ সংস্কারে, রামমোহন কোনো বিষয়েই আপনাকে স্বদেশের শাস্ত্র ও সাধনা, সংস্কার ও সিদ্ধান্ত হইতে একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন করেন নাই।

কিন্তু এই উন্নত, উদার, একই সঙ্গে স্বদেশী ও সার্ব্বজনীন যুগ-আদর্শ সাধনের যোগ্যতা এবং অধিকার তখনো দেশের লোকের জন্মায় নাই। রাজা আদর্শটীই দেখাইয়া দেন, কিন্তু সেই আদর্শ যেরূপ ক্ষেত্রে সাধন করিয়া আয়ত্ত করা সম্ভব; তখনও সে অনুকূল ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

একদিক দিয়া কেশবচন্দ্র এবং অন্যদিক দিয়া সুরেন্দ্রনাথ এই অনুকূল ক্ষেত্র গঠনের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

কেশবচন্দ্রের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার চেষ্টা

রাজা যে উন্নত ও উদার ভূমিতে যাইয়া দাঁড়াইয়া এই অভিনব যুগ-আদর্শ প্রত্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সমাজের সাধারণ চিন্তা ও ভাবকে সেই ভূমিতে লইয়া যাইতে হইলে, সর্বাগ্রে তাহার সর্ববিধ পূর্ব-সংস্কার নষ্ট করা আবশ্যক ছিল। প্রত্যেক গঠন কার্যের পূর্বেই কতকটা ভাঙ্গা আবশ্যক হয়। রাজাও যে কিছু ভাঙ্গেন নাই এমন নহে। কিন্তু তিনি ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই আবার গড়িয়া তুলিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক যুগ-সন্ধি কালে নূতনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রচলিত ও পুরাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষেরা কেবল এই সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন না। কোথায়, কিরূপে এই সংগ্রামের শান্তি হইবে, কোন্ সূত্র ধরিয়া পুরাতনের ও নূতনের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি সাধন করিতে সম্ভব হইবে, তাঁহাদের সমাক্ দৃষ্টি ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহারা পুরাতনের অপূর্ণতাকে পরিপূর্ণ করিয়া নূতনকে আপনার সফলতার দিকে প্রেরণ করেন এবং নূতনের অভিষেক দিয়া পুরাতনকেও সার্থক করিয়া তুলেন। কিন্তু যাঁহারা এই সকল মহাপুরুষের অনুবর্তী হইয়া সমাজ-ক্ষেত্রকে তাঁহাদের প্রকাশিত যুগ-আদর্শের প্রতিষ্ঠার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে ব্রতী হ'ন, কোথাও তাঁহাদের এই মহাজন-প্রতিভাসুলভ সমাক্ দর্শন থাকে না। থাকিলে তাঁহারা বিশেষ কার্যে ব্রতী হ'ন, সেই কার্যের সফলতার ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়। ফলতঃ প্রাকৃতজনের মধ্যে সমাক্ দর্শন সচরাচর সংস্কার-কার্যের গতি-বেগকে একান্তভাবে কমাইয়া দিয়া তাহাদিগের কর্ম্মোদ্যমকে বহুল পরিমাণে নষ্ট করিয়া ফেলে। এই জন্যই সংস্কারকের পক্ষে কর্ম্মোৎসাহের যতটা প্রয়োজন সমাক্-দৃষ্টির ততটা প্রয়োজন নাই। একদেশদর্শিতা বেগবতী সংস্কার-চেষ্টার জন্য একান্তই আবশ্যক। অতএব রামমোহন যে সমুন্নত যুগ-আদর্শ প্রকাশিত করেন, সেই আদর্শের যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠার উপযোগী করিয়া সমাজক্ষেত্রকে গড়িয়া তুলিবার জন্য কেশবচন্দ্রের প্রথম বয়সের অপেক্ষাকৃত একদেশদর্শিনী সংস্কার-চেষ্টারই একান্ত প্রয়োজন ছিল। পরবর্তীকালে, রাজার শিক্ষার অনুসরণ করিয়া, ক্রমে ক্রমে আমাদের স্বদেশী-সমাজে প্রাচীন ভারতের ও আধুনিক য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতম আদর্শের মধ্যে যে উদার ও উন্নত সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে, তাহারই প্রয়োজনে, কেশবচন্দ্রের দৈবীপ্রতিভা, তাঁর প্রথম বয়সে, স্বল্পবিস্তর একদেশদর্শী ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার-কার্যে ব্রতী হইয়াছিল। কি ব্যক্তি, কি সমাজ, সকলেরই সত্যলাভের জন্য প্রথমে সর্ববিধ পূর্বসংস্কার-বর্জ্জিত হওয়া প্রয়োজন। শাস্ত্রের প্রামাণ্য, সদ্‌গুরুর মর্য্যাদা, সমাজবিধানের ধর্ম্মপ্রাণতা, এ সকলকে স্বল্পবিস্তর অস্বীকার না করিলে, মানসক্ষেত্র কখনো সম্পূর্ণ সংস্কার-বর্জ্জিত ও নির্ম্মল হইতে পারে না। এই সর্বগ্রাসী সন্দেহ ও অসত্যবোধ হইতেই ক্রমে খাঁটি ও সরল বিশ্বাস এবং সত্য আস্তিক্যবুদ্ধির সঞ্চার হয়। "নেতি" "নেতি" বলিয়াই "ইতিতে" পৌঁছিতে হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে

"নেতি" "নেতি" বলিয়া একেবারে পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব শূন্য করিয়াই, পরে ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,—এই মহাসত্যে উপনীত হইতে হয়। কেশবচন্দ্রের সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কার-চেষ্টা রাজার আদর্শের অনুসরণ করিতে যাইয়া, প্রথমে এই "নেতি"র পথ ধরিয়াই চলিয়াছিল। এ পথ সংগ্রামের পথ, সন্ধির পথ নহে। এ পথ শক্তির পথ, সংযমের পথ নহে। ইহা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ, আত্মবিলোপের পথ নহে। এ পথ ইংরেজিতে যাহাকে Independence বা অনধীনতা বলে তার পথ; সত্য-স্বাধীনতার পথ নহে। এ পথে যাইয়া একপ্রকারের ফ্রিডম-এ পৌঁছান যায়, কিন্তু উপনিষদ যাহাকে স্বারাজ্য বলিয়াছেন, সে বস্তু লাভ হয় না। এ পথ Rightsএর পথ, স্বত্বের পথ; Reconciliationএর পথ বা সামঞ্জস্য ও শান্তির পথ নহে। কেশবচন্দ্র প্রথম বয়সে, ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার-ব্রতে ব্রতী হইয়া, এই স্বত্বের পথ ধরিয়াই চলিয়াছিলেন। শাস্ত্রের প্রাচীন অধিকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা; গুরুর প্রাচীন অধিকারের বিরুদ্ধে অসংস্কৃত ও অসিদ্ধ স্বাভিমতের স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা; সমাজের বিধি-নিষেধাদির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবৃত্তির স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা;—ইহাই কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের কর্ম্মচেষ্টার মূল সূত্র ছিল। ধর্ম্মের ও নীতির আবরণের দ্বারা সুসজ্জিত হইলেও কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের সমাজ ও ধর্ম্ম-সংস্কার-প্রয়াস সর্ব্ব বিষয়ে এই ব্যক্তিগত Rights বা স্বত্বকেই জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আর কেশবচন্দ্র ধর্ম্মসাধনে ও সমাজশাসনে যে ব্যক্তিগত অনধীনতার আদর্শকে জাগাইয়া তুলিয়া দেশের নবশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা নূতন শক্তির সঞ্চার করেন, সুরেন্দ্রনাথ সেই আদর্শকেই রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া আপনার অনন্যপ্রতিযোগী ঐতিহাসিক কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র

আধুনিক যুগে কেশবচন্দ্রের পূর্ব্বেই আমাদের দেশে এই ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের সূত্রপাত হইয়াছিল। একদিকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মসংস্কারে, অন্যদিকে ডেভিড্ হেয়ার এবং ডিরোজিওর শিষ্যগণ সমাজ-সংস্কারে অষ্টাদশ-শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাভিমানী অনধীনতার বা Independenceএর আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কেশবচন্দ্রের বিশেষত্ব এই যে তিনি একদিকে আপনার কর্ম্মজীবনে এই দুই সংস্কার-স্রোতকে একীভূত করিয়া, জীবনের সকল বিভাগে এই অনধীনতার আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন এবং অন্যদিকে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ যে ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার-চেষ্টা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিজ নিজ জীবনের বিচ্ছিন্ন কর্ম্মোদ্যমের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছিল, কেশবচন্দ্র সেই সকল বিচ্ছিন্ন শক্তিকেন্দ্রকে একত্র করিয়া, দলবদ্ধ হইয়া, এই সংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন। মহর্ষি প্রাচীন শাস্ত্র ও গুরুর প্রভুত্বই কেবল অস্বীকার করেন, কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মার্থীকে আপনার স্বাভিমত কিম্বা সংজ্ঞানের (Conscience) উপরে একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার

কিছু কোন চেষ্টা করেন নাই। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্রগুরু বর্জ্জন করিয়া, উপাসকগণের ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবন পরিচালনার শাস্ত্র-গুরুর প্রাচীন অধিকার মহর্ষির উপরেই অর্পণ করেন। প্রত্যেক সাধকদিগকে আপন আপন স্বাভিমত ও সংজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই কেশবচন্দ্র প্রথম জীবনে ব্রাহ্মসমাজে এক প্রকারের সাধারণতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হন। ধর্ম্ম সাধনে ব্যক্তিবিশেষের অসঙ্গত প্রভুত্বের প্রতিবাদ করিয়াই কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। আর ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে কেশবচন্দ্র যে কাজ করেন, আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনে সুরেন্দ্রনাথ ঠিক সেই কাজটীই করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথের পূর্বে আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবন

সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবন সূচনার বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই এ দেশের ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্পে অল্পে যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে মূর্ত্তিমন্ত করিয়াই সুরেন্দ্রনাথ আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হন। ব্রিটিশ শাসনের প্রথমাবধি বাংলার এবং বিশেষতঃ কলিকাতা সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকেরা যে-সরকারী ইংরেজ প্রবাসীদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া, সময়ে সময়ে, বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনাপন মতামত ব্যক্ত করিয়া তাহার পরিবর্ত্তন বা সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। সময় সময় রাজপুরুষগণ নিজেরাই উপযাচক হইয়া বিশেষ বিশেষ শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে ইঁহাদিগের অভিপ্রায় জানিতে চাহিতেন। সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্ম-জীবনের বহু পূর্ব্বেই কলিকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, সেকালের বাংলার মনীষীবর্গ সকলেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্-এসোসিয়েশনভুক্ত ছিলেন। সেকালে ইঁহারাই আপনাদের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থাদির আলোচনা করিতেন এবং সময়ে সময়ে দেশের অভাব-অভিযোগের কথা রাজপুরুষদিগের গোচরে আনিতেন। রাজপুরুষেরাও ইঁহাদিগকেই জনমণ্ডলীর স্বাভাবিক অধিনায়ক বা natural leaders বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইঁহাদিগের মতামতের প্রতি যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ সভা জমিদারদেরই সভা ছিল। বাংলার, বিশেষতঃ কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের জমিদারগণের স্বার্থরক্ষার জন্যই এই সভার জন্ম হয়। ইহার সভ্য এবং অধিনায়ক সকলেই জমিদার শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল জমিদার ছিলেন না বটে, কিন্তু জমাদারী স্বত্বস্বার্থের পরিপোষক এবং জমিদার-সমাজের মুখপাত্ররূপেই তিনি দেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান্ সভা জমিদারদিগের সভা হইলেও প্রয়োজনমত আপনাদের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী দেশের সাধারণ প্রজাবর্গের রাষ্ট্রীয় স্বত্ব-স্বার্থসংরক্ষণে একেবারে উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের বিচার আলোচনায় জনসাধারণের ত কথাই নাই, শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের পক্ষেও সাক্ষাৎভাবে যোগদান করিবার অধিকার বা অবসর ছিল না। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ সভার নেতৃবর্গ জমিদারী স্বত্ব-স্বার্থের সঙ্গে মিলাইয়া যতটা সম্ভব দেশের সাধারণ লোকের স্বত্ব-স্বার্থ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু

জনসাধারণের সঙ্গে একযোগে কোনো রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম সাধনের প্রবৃত্তি ও প্রয়াস তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে জাগাইয়া, সংহত লোকমতের দুর্জ্জয় শক্তি প্রয়োগে, রাজপুরুষদিগের স্বেচ্ছাচারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এপর্য্যন্ত কোনো চেষ্টাই হয় নাই। অথচ দেশের শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী সম্প্রদায়ের প্রাণে একটা বলবতী আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল।

আধুনিক স্বদেশাভিমান ও স্বাদেশিকতা

৯. ফলতঃ যে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতরে একটা অসংযত ও অসঙ্গত ব্যক্তিস্বাভিমান জাগিয়া প্রাচীন সমাজের শাসন ও পুরাগত ধর্ম্মের বিশ্বাসকে ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী করিয়া তুলে, তাহাতেই আবার তাঁহাদিগের প্রাণে এক নূতন স্বদেশাভিমানেরও সঞ্চার হয়। আমাদের সে'কালের ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার-চেষ্টা বহুলপরিমাণে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছিল সত্য। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যে এই সকল সংস্কার-চেষ্টার অন্তরালে একটা প্রবল স্বদেশাভিমানও জাগিয়া উঠিতেছিল ইহাও অস্বীকার করা যায় না। য়ুরোপীয় সমাজের তুলনায় আমাদের নিজেদের সমাজ-জীবন অতিশয় হীন, এবং য়ুরোপের যুক্তিবাদের তৌলদণ্ডে আমাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মসাধনা অত্যন্ত ভ্রান্ত ও কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়াই বোধ হইত। আর এই হীনতাবোধ সর্ব্বদাই আমাদিগের স্বদেশাভিমানে অত্যন্ত আঘাত করিত। এই বেদনার উত্তেজনাতেই আমরা তখন একটা দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া আমাদের ধর্ম্মের ও সমাজের সংস্কার-সাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। আমাদের এই সংস্কার-চেষ্টা যদি সর্ব্বতোভাবে খৃষ্টিয়ানী পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিত, তাহা হইলে সেই চেষ্টার ফলে আমাদিগের মধ্যে কোনো প্রকারের সত্য স্বাদেশিকতা ফুটিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু যে ব্যক্তিস্বাভিমান বা Individualism এবং যুক্তিবাদ বা Rationalism আমাদিগকে নিজেদের সমাজের ও ধর্ম্মের অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করিতে প্রণোদিত করে, তাহারই প্রভাবে আমাদিগের পক্ষে খৃষ্ট-ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন এবং য়ুরোপীয় সমাজবিধানের বশ্যতাগ্রহণও একান্তই অসাধ্য করিয়া তুলে। স্বদেশের বেদপুরাণাদিকে মনুষ্য-প্রতিভা-রচিত এবং সাধারণ মানব-বুদ্ধি-সহজ ভ্রম-কল্পনা-প্রসূত বলিয়া, প্রামাণ্য-মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া, খৃষ্টীয়ানের বাইবেলকে ঈশ্বর-প্রণীত ও অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবার আর কোনো পথ রহিল না। শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব উড়াইয়া দিয়া, যীশু খৃষ্টের অবতারত্বে বিশ্বাস করা অসাধ্য হইল। অথচ এইরূপ অবস্থাতেও যখন খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মপ্রচারকেরা হিন্দু-ধর্ম্মের উপরে নিজেদের ধর্ম্মের আত্যন্তিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী সপ্রমাণ করিতে যাইয়া প্রতিবাদী ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাসের সিদ্ধান্ত ও সাধনার হীনতা প্রমাণ করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন তাঁহাদের এই অযথা নিন্দাবাদের ফলেই,—যে স্বদেশের ধর্ম্মকে এককালে আমরা হীন বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলাম, তাহারই সম্বন্ধে ক্রমে আমাদিগের প্রাণে একটা প্রবল শ্রেষ্ঠত্বাভিমান জাগিয়া উঠিল। মানুষ এ জগতে নিজের প্রাণের মধ্যে যে ভাব লইয়া অপর মানুষের নিকটে যায়, তাহার প্রাণেও অলক্ষিতে সেই ভাবেরই সঞ্চার করে। প্রেম এই জন্য প্রেমকে কোটায়। ঘৃণা ঘৃণাকেই বাড়াইয়া দেয়। একের অহঙ্কার-অভিমান, অপরের অহঙ্কার-অভিমানে আঘাত

করিয়াই তাহাকে জাগাইয়া তুলে। মানব-প্রকৃতির এই নিয়মবশে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের অসঙ্গত ধর্ম্মাভিমান আমাদিগের অন্তরে স্বদেশের ধর্ম্মসম্বন্ধেও একটা প্রবল শ্রেষ্ঠত্বাভিমান জাগাইয়া দিল। যাঁহারা একদা স্বদেশের প্রচলিত ধর্ম্মের সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইয়া স্বদেশবাসিগণের নিকটে নিয়তই সেই ধর্ম্মের ভ্রমপ্রমাদের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এখন তাঁহারাই আবার জগতের অপরাপর ধর্ম্মের সঙ্গে তুলনা করিয়া আপনাদের প্রাচীন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে যত্নবান্ হইলেন। এইরূপে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু—ইঁহারা সকলেই একদিকে যেমন প্রচলিত ক্রিয়াবহুল হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারের চেষ্টা করেন, সেইরূপ অন্যদিকে বিদেশীয় প্রতিবাদিগণের সমক্ষে এই ধর্ম্মেরই সনাতন-তত্ত্ব ও চিরন্তন আদর্শের অনন্যসাধারণ শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপন্ন করেন। আপনাদিগের পুরাতন ধর্ম্মের যে শ্রেষ্ঠত্বাভিমান এইভাবে আমাদিগের মধ্যে ক্রমে জাগিয়া উঠে, তাহারই উপরে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের আধুনিক স্বাদেশিকতার বা Nationalismএর মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়।

বহুবিধ মানসিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে নবোদ্ভিত স্বাদেশিকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে ইংরেজি শিক্ষার অনুপ্রাণনে এই নূতন স্বাদেশিকতার উৎপত্তি হয়, সেই শিক্ষারই বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, একদিকে দেশের নবশিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং অন্যদিকে ইংরেজ রাজপুরুষ ও ব্যবসায়িগণের মধ্যে নানাবিষয়ে একটা প্রবল প্রতিযোগিতা জন্মিতে আরম্ভ করে। এই প্রতিযোগিতা নিবন্ধন একদিকে এক অভিনব স্বদেশপ্রীতি এবং অন্যদিকে একটা বিজাতীয় পরজাতিবিদ্বেষও জাগিয়া উঠে। তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া এই নূতন স্বজাতি-বাৎসল্য ও পরজাতি-বিদ্বেষ দুই-ই মুখরিত হইয়া উঠে। এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শনের" প্রতিষ্ঠা করেন। নবশিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে বঙ্গদর্শন স্বদেশের প্রাচীন গৌরবস্মৃতি জাগাইয়া, এই নবজাত স্বদেশ-প্রীতিকে বাড়াইয়া তুলিতে আরম্ভ করে। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র, রঙ্গলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র, মনোমোহন, প্রভৃতির কবিপ্রতিভা নানাদিকে ও নানাভাবে এই স্বদেশাভিমানকে ফুটাইয়া তুলে। হেমচন্দ্রের "ভারতসঙ্গীত"; সত্যেন্দ্রনাথের "গাও ভারতের জয়, হোক ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয়"; গোবিন্দচন্দ্রের "কতকাল পরে, বল ভারতরে" এবং প্রাচীন স্মৃতিবাহিনী "যমুনা লহরী"; মনোমোহনের "দিনের দিন সবে দীন";—এই সময়েই এই সকল জাতীয় সঙ্গীত প্রচারিত হয়। দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" ইহার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। উপেন্দ্রনাথের "শরৎ-সরোজিনী" ও "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নীলদর্পণের মর্ম্মঘাতিনী উদ্দীপনাতে নূতন ইন্ধন সংযোগ করিয়া দেয়। নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ পুনঃ পুনঃ এই সকল নাটকের অভিনয় করিয়া ইহাদিগের শিক্ষা ও উদ্দীপনাকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দেয়। এই সময়েই নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ" প্রকাশিত হইয়া দেশের নবজাত স্বদেশ-প্রীতিকে আধুনিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয়। "ভারত মাতা" প্রভৃতি নূতন গীতি-নাট্য এই অভিনব স্বদেশ-প্রীতিকে এক নূতন দেবভক্তির আকারে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে। এই স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশ-ভক্তির সুরধুনী-স্রোত যখন শিক্ষিত বঙ্গসমাজের

প্রাণকে স্পর্শ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক নূতন চেতনার সঞ্চার করিতে আরম্ভ করে, তখন এই স্বাদেশিকতার তরঙ্গ-মুখে, এই নূতন দেশচর্য্যার পুরোহিতরূপে সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হ'ন। আর দৈবকৃপায় দেশ-কাল-পাত্রের এরূপ শুভ-যোগাযোগ ঘটিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার কর্ম্মজীবন এমন অনন্যসাধারণ সফলতা লাভ করিয়াছে। [আংশিক উদ্ধৃতি]

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার জীবন সাধনা

হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত

নদী বাংলার মাছ। ধান থেকে ভাত। বাঙ্গালী মরে মাছে আর ভাতে।

বাসা বাঁধে বাঙ্গালী।

(৪)

[পূর্বানুবর্তী]

প্রশ্ন ওঠে কিশোর মেঘনাদের মনে :

দেশপ্রেম তার অপরাধ। সে আবার কি? ভালবাসা—দেশকে ভালবাসা অপরাধ!

দেশের কোন রূপকে ভালবাসলে, কি চোখ দিয়ে দেখলে, কোন মন দিয়ে তার সঙ্গে নিজের যোগ খুঁজে পেলে অপরাধী হতে হয়?

আকাশ থেকে নামে বৃষ্টির মেহধারা। কখনও ঝম্ ঝমাঝম্; কখনও ঝির ঝির, কিংবা টিপটিপ করে। পুব থেকে বয়ে যায় মৌসুমী বাতাস বৃষ্টির খবর নিয়ে। সারা দেশ সে খবর পেয়ে যায়। শীত আসে। নৌকার পালে পালে ঘা দেয় উত্তুরে বাতাস। ঘরে বসে জানা যায় বসন্ত এসেছে—তাই দখিণা বাতাসও এলো।

পরিবেশের এই সুষমার পরিচয় জানার নাম দেশদ্রোহ?

বাংলার প্রান্তে প্রান্তে এমন সব প্রশ্ন ওঠে।

বৃষ্টির জলের ধারার শেষ কোথায়? নালায়, পুকুরে বিলে? ছোট বড় নদীতে?

উত্তরের পাহাড় বেয়ে নদীগুলি নেমে এসেছে; ডাইনে বাঁয়ে কত কুটিল পথ বয়ে বয়ে ছুঁয়েছে দেশের দশ দিক।

নদীর ধারে ধারে ধানের কত ক্ষেত। শীতকালের আমন ধান। গরম কালের আউস; ভাদ্র মাসে ফসল ওঠে ব'লে ভাদোই ধান বলে। শুদ্ধ ভাষায় আশুধান। আশু মানে তাড়াতাড়ি এ ধান তাড়াতাড়ির ধান। বসন্ত কালে হয় ব্রীহি ধান। যার ডাকনাম বোরো। জলপাইগুড়ি, আর হুগলী মেদিনীপুরের মাঝামাঝি—মহানন্দা আর শিলাই নদীর ধার দিয়ে বোরো ধানের গোছাগুলি মাথা উঁচু করে ওঠে বছর শেষের মাসে।

কায়েত ঘরে খেয়ালে
খেনে মরে খেয়ালে
জেলে মরে ডাঙ্গাতে
কাঙ্গালী বাঙ্গালী মরে মাছে আর ভাতে।

দেশে বাঁশ হয় ভালরকম ঘরে কাজে তাই বাঁশের খুঁটি। মাটি দিয়ে দেওয়াল। ঘাস, গোলপাতা খড় চাল —সেই মাটির কুঁড়ে ঘরের মাথা আলো করে রাখে।

সেই ঘরে বাড়ীর ছোট ছেলে গান গায়:

বাঁশ বাগানের ওপর দিয়ে চাঁদ উঠেছে ঐ
মাগো আমার শোলোক-বলা কাজলা দিদি কই!

কাজল-দিদি শ্লোক বলত সূর্য ওঠার সময়:

উঠ সূর্য উষর দিয়া—
মালীর ঘরের কোণ ছুঁইয়া।

আর ব্রত করত। তাতে লাগত ঘাস দূর্বা, আমপাতা, বেলপাতা, চাল, কলাই; গামছা, কড়ি আরো কত কি!

দেশের কাছে মানুষ পেয়েছে এমন কত সুষমা। তা দেখেছে চোখ ভরে। লিখেছে তারই গান, এঁকেছে নানা ছবি—ঘরের দেওয়ালে, চালচিত্রে, পটে পুথির সরায়। এমন পরম আনন্দে দেশকে ভালবাসার নাম দেশপ্রেম?

পদার্থ বিদ্যা আর আকাশের তারার কাহিনী এর কোন উত্তর দিতে পারেনা।

মেঘনাদ জেনেছে শিক্ষকদের কাছে আকাশের সব তারাগুলিই গোটা পৃথিবীর হাজার-লক্ষ গুণ বড়। তাদের যে কোন একটায় পৌঁছে যদি পৃথিবীর দিকে তাকানো যায় খুঁজে পাওয়া যাবেনা পৃথিবীর মাঝখানে ভারতবর্ষ দেশটি কোথায়! সেই ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তের গ্রাম-সুন্দর দেশটিকে চেনা একেবারেই সম্ভব হবে না। সেই সুন্দর দেশটির মাঝখানে তাজনের কালো চিহ্ন এঁকে তাকে দুটি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে সেই রেখাটি কিছুতেই আবিষ্কার করা যাবে না।

মেঘনাদ বুঝতে পারে এ রেখাটি একেবারে মনগড়া। এর সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন যোগ নেই; মানবতারও নেই।

কি করে হবে?

সৌরমণ্ডলের ছোট্ট অংশীদার পৃথিবী গ্রহের বাষ্পরূপ ছেড়ে ধীরে ধীরে কঠিন আবরণ খুঁজে পেয়েছিল। তখনকার প্রথম কঠিন পাথর পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই তলিয়ে গেছে সমুদ্রের তলায়।

শুধু ভারতবর্ষে, এই সুপ্রাচীন দেশে আদিকালের প্রস্তর প্রাকারের কিছু অবশেষ রয়ে গেছে। উত্তপ্ত পৃথিবীর অন্তর্নিহিত গ্রানাইট উপকরণ আদি প্রস্তরের নিরম বাঁধনকে ভেঙেচুরে দিয়েছে প্রায় সর্বত্র। তারপর নতুন নিয়ম রচনা করেছে চার কাইট প্রবাহ। তিলে তিলে গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষ।

হয়তো সেই প্রাণ চঞ্চল তবু নিষ্প্রাণ কড় পাথরের স্তর স্তূপ জমতো তার কঠিন আস্তরণ একদিন প্রাণকে জাগতে দেবে। পূর্ব সীমান্তে গড়ে উঠবে একটি শ্যাম স্নিগ্ধ অঞ্চল। উত্তরে যায় চিরহরিৎ গাছের সার—পূর্বে পশ্চিমে ডেসিডুয়াস গাছের জঙ্গল। দক্ষিণে আম কাঁঠাল জল পাকড়ের গাছ গাছালী—

মাঝখানে ফলা আর নাবাল জমির ধারে—কাশ, নল, উলু, হোগলা, বেত—নানান্ ধরণের ঝোপ-ঝাড়।

মেঘনাদ স্থির বুঝলে প্রকৃতির সঙ্গে কল্যাণের সম্পর্ক আছে। প্রকৃতির দান বাড়াতে গেলে মানুষের শ্রী বাড়ে। দেশকে গড়ার জন্য এতে বিজ্ঞান আনা চলে না। এ কথা বলার নাম বিজ্ঞান। একে সিডিশন বলা চলে না।

কিশোরীলাল ডুবিলী স্কুলে তার পাঠ শুরু হয়ে গেল। সেখানে নতুনভাবে বৃত্তি পেলেন।

মেঘনাদের শিক্ষা চলল অব্যাহত ধারায়। প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, গণিতবিদ সতীশচন্দ্র মুখার্জী, সংস্কৃতজ্ঞপণ্ডিত রজনীকান্ত আমিন এবং মথুরামোহন চক্রবর্তীর কাছে শিক্ষা নিতে থাকতে লাগলেন পরম নিষ্ঠায়।

মথুরামোহন পরে দেশের বনৌষধি নিয়ে গবেষণা করে বিখ্যাত হন; স্থাপন করেন শক্তি ঔষধালয়।

প্রবোধচন্দ্র জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত এবং পঞ্জিকার শাস্ত্রবেত্তারূপে অসামান্য স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

এঁদের শিক্ষায় মেঘনাদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারার সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন নিজেকে।

পড়ার বই মুখস্থ করে ভাল ছেলে হওয়া হয়তো খুব কঠিন নয়। কিন্তু যা কিছু বোঝা যায়, জানা যায় তাকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা নিঃসন্দেহে কঠিন। আর কঠিন কাজগুলি মেঘনাদের ভাল লাগে।

ঢাকা ম্যাপটিই মিশন কর্তৃপক্ষ একবার সারা বাংলা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করেছিলেন। প্রতিযোগী ছিল বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ের সব ছাত্ররাই; এমনকি স্নাতক মানের ছাত্রেরাও যোগ দিতে পারতেন। মেঘনাদ সব চেয়ে ভাল প্রবন্ধ লিখলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র মেঘনাদ পেলেন সাফল্যের পুরস্কার—একশো টাকা আর একটি ভারী সুন্দর বাঁধানো বড় বাইবেল।

বাইবেল পড়ানোর শ্রেণীর ব্যবস্থাও মিশন কর্তৃপক্ষ করেছিলেন। মেঘনাদ তাতে যোগ দিয়েছিলেন।

দেশের বুকে তখন নব জাগরণের বিচিত্র কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে।

ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের বিচ্ছিন্ন মানব সমাজের সকল গোষ্ঠীকে মনুষ্যত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা দিয়েছিলেন দেশের এক ছেলে :

একটা নতুন মহাদেশ দিচ্ছি। যদি কাছে পরিণত করতে পারিস তবে জানব তোরা মরদ। গোটাকতক ক্যামেরা, ম্যাপ, গ্লোব, কিছু কেমিক্যালস্ চাই। তারপর গরীব-গুরোব ছুটিয়ে আনা চাই। তাদের জ্যোতিষ ভূগোল প্রভৃতির ছবি দেখাও; কোন দেশে কি হয়, কি হচ্ছে, এ দুনিয়াটা কি, তাদের যাতে চোখ খুলে তাই চেষ্টা কর *।

পরিকল্পনা নাড়া দিয়েছে দেশের বলিষ্ঠ আদর্শবাদকে। মানুষের কাছে পয়সা চেয়ে পয়সা নাও—পয়সার তহবিল সংগ্রহ শুরু হয়েছে। গড়ে উঠেছে কাঁচ শিল্পের কারখানা। কারুর মন গিয়েছে প্রাণ আর নিষ্প্রাণ—জড় আর জীবের ভেদরেখা আবিষ্কার করার দিকে। আবিষ্কার সফল হয়েছে। দেখা গেছে জড় আর জীব দুয়ের প্রকৃতি আর ধর্ম অনেক দিক দিয়ে অভিন্ন। তার সন্ধান পাবার জন্য বিজ্ঞানকে মেলাতে হবে অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে :

আলোকে ভাসন্ত ধূলিকণা
পৃথিবীর অগণিত জীব ও
আকাশে দীপ্যমান অসংখ্য সূর্যের মধ্যে
যাহারা একাকে দেখিতে পায়
সত্য শুধু তাহারাই পায়
আর কেহ নয়। আর কেহ নয়। †

উচ্চারিত হল নব জাগরণের মন্ত্র বাণী :

আমাদের দেশকে বহু পুরাতনী হইতে হইবে। এই পুরাতনের কেহ বা দেশের ভাবকে, কেহ বা কর্মকে অনুবৃত্তি দান করিয়া উত্তরোত্তর পূর্ণ করিয়া তুলিবে। তাহারা দেশের চিত্তকে নানা বস্তুর মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিবে এবং অনাগত কালের মধ্যে বহন করিয়া চলিবে। তাহারা নানা লোকের উদ্যমকে একস্থানে আকর্ষণ করিয়া রাখিবে। তাহারা নানা কালের চেষ্টাকে একত্র বাঁধিয়া দিবে। ‡

কৈশোরের মুগ্ধ শ্রবণ পেতে রইল মেঘনাদ।

---

* পত্র, স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৯৯)
† অগদীশচন্দ্র (১৯০৩)
‡ তিলক (১৯০৭)
• রবীন্দ্রনাথ (১৯০৬-৭)

ভায়ের শাসন

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এতদিন একটা ভীড়ের পুরোভাগে চলতে চলতে বহু বাবুদের দোতলা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে রঘুনাথপুর গ্রামের ঠিক মাঝখানে আশ্চর্য লক্ষ্যে গোলপাতার ঘরের এই বাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ীটার বাইরে কোথাও এতটুকু পলস্তারা পড়ে নি। পূর্বদিকে টানা বারান্দার কোন পরিকল্পনা হয়ত ছিল, কি এক অনিবার্য কারণে হয়ে ওঠেনি। লোহার সাতটা বরগা দেয়াল থেকে তিন হাত বেরিয়ে আছে। বাড়ীটা দেখলে মনে হয় বিত্তের চেয়ে ভদ্রলোকের ইচ্ছা ছিল প্রবল। সেই ইচ্ছা অপূর্ণ রয়ে যায়, উনি মারা যান। আর কেউ তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে কিনা এতদিনেও তার ভরসা পাওয়া যায় না। আস্তে আস্তে বাড়ীটার চার পাশের একটা শ্রীহীন রুক্ষতা ফুটে ওঠে। সামনের মানুষগুলির মুখে যে রকম রুক্ষতা কতকটা সেই রকম।

তাদের অসহিষ্ণু সোরগোল বোধ হয় বাড়ীর মধ্যে গিয়ে পৌঁছল। রমাদাস বেরিয়ে এল। সকলে তাদের দেখে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। যা না, বল গা, অত ভয় কিসের, সাহস উত্তেজকের আরও নানা কথা শোনা গেল কিন্তু এগিয়ে যাবার লোক পাওয়া গেল না। শেষে যদু নিজে কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে গিয়ে রাখালের নামে নালিশ করলে। বাঁ চোখের ভুরু ওপরের চামড়ার হাঁকি খানেক নেই, নাকটা থেঁতলে গেছে, রক্ত চুইয়ে পড়ছে, মুখের এখানে ওখানে কালসিটের দাগ। রমাদাস প্রশ্ন করল, হ্যাঁরে তুই কিছুই করিস নি....

সে উত্তর দেবার আগেই পিছন থেকে কয়েকজন চাপা উত্তেজনার ক্ষোভ প্রকাশ করে বলল, করুক কি নেই করুক। তা বলে এ রকম করে প্রাণ থেকে ফেলে দেবে। যদি চোখটাই যেত!

হুঁ, তোমরা সেখানে ছিলে, যদুকে বারণ করলে না কেন! সত্যি ত আর চুরি করা ওর অন্যায় হয়েছে।

নিজের ভাই যখন এখানে সেখানে চুরি করে, মাছ ধরে, ফুল ছিঁড়ে তখন সেষ হয় না। ওরে চল, থানায় গেলেই হত। আমি তখনই বলেছিলুম যদু লোকদের কাছে কি সুবিচার পাবো! এত কথা কয়েও কারুর নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না বরং তামাসাটা ঠিক জমছে না চোখে মুখে এমন একটা ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাইরে বেরিয়ে বিরক্ত ত হয়েছিলই এর পরে রামদাস গম্ভীর হয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের মত রাগটা তার শরীরে বেশ ভাল ভাবে জমতে লাগল। রমাদাস যদুকে ধমকে উঠল, ঠিক করে বল কি বলেছিস। একটা অশ্লীল গালাগাল উচ্চারণ করে যদু বলল, মা কালীর দিব্যি আর কিছু বলিনি।

দাঁড়া—বলে রমাদাস ভিতরে গিয়ে ঢুকল। অল্প সময় পরে বেরিয়ে এসে যদুর হাতে একখানা ৫'টাকার নোট দিয়ে বলল, যা, হরি ডাক্তারের কাছে গিয়ে আমার নাম করবি। নোটটা নিয়ে কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছতে মুছতে যদু ওখান থেকে চলে এল। রমাদাস লোকগুলির দিকে চেয়ে বলল, তোমরা সাতক্ষীরের না! এই ত সেদিন এ গাঁয়ে বাস করতে এলে, এর মধ্যে এত! একটু থেমে আবার বলল, থানায় যাবে কে যেন বলছিলে! থানাটা না হয় ঘুরেই এস। রমাদাসের প্রখর ব্যক্তিত্বের কাছে অতগুলি লোকের রাগ, লম্ফঝম্ফ শুষ্ক আস্ফালনে পরিণত হল। জোঁকের মুখে নুন পড়লে যে অবস্থা হয় তাদেরও অবস্থা হল কতকটা অমনি। নিষ্ফল আক্রোশে বুকে জ্বালা নিয়ে যে যার কেটে পড়ল। জীর্ণ চটি জুতার শব্দ তুলে রমাদাস বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকল।

তার সাড়া পেয়ে জয়া ঘরে ঢুকে দেখল স্বামী তক্তপোষের ওপরে গুম হয়ে বসে আছে। জগতে এই একটি মাত্র প্রাণীর কাছে রমাদাস পেরে ওঠে না। পান থেকে চুন খসলে যখন সারা বাড়ী মাথায় করে তখন তার ত্রিসীমানায় কাউকে দেখা যায় না। কিন্তু শাশুড়ীতে হলুদের হাত মুছতে মুছতে জয়া যদি একবার সামনে এসে দাঁড়ায় ত রমাদাসের রাগ জল হয়ে যায়। বিব্রত বোধ করে মাথা চুলকতে চুলকতে সেখান থেকে সরে পড়ে। পোষ্যবর্গ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করতে পারে না; বরং জয়াকে উদ্বেগ করে বলে, একেবারে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে। এতদিন স্ত্রীর ভয়ে পারে নি। অন্তরের সংগে বোঝাপড়া করে এ ব্যাপারের একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে ফেলল, রমাদাস বলল, ও হতভাগাকে বাড়ী ঢুকতে দেবো না। যে দিকে খুসী যায় যাক, মরে মরুক।

সে হবেখন, আমার সংগে এসো ত, বলে জয়া রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। কাঁসার রেকাবীতে মুড়ী, নারকোল কুচি, এক ফোঁটা গুড় স্বামীকে খেতে দিয়ে কেটলিতে জল চাপাল। উনুনের দিকে মুখ করে বসে বোধ হয় সে বাউণ্ডুলের কথা ভাবতে লাগল। হরি ডাক্তার সরবে ঘরে ঢুকলেন। বাইরে থেকেই তাঁর কথার তুবড়ী বাজী আরম্ভ হয়েছিল। ঘরের নীরবতার অর্থ করে তাদের আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, ভেবো না বউমা, ভয়টয় যা ছিল আমি কাটিয়ে উঠেচি। চকল হাতে ঘোমটা টেনে দিয়ে ও দিকে মুখ করে জয়া বলল, বসুন ডাক্তারবাবু। সে ছোঁড়ার খবর পেলেন?

কার কথা বলচ বউমা, রাখালের? শুনলুম নয়নকে না কি বলেচে, যা যা দাদা ফাদা ভোট কেয়ার। নয়ন বুঝি বলেছিল সকালের কাণ্ডটা রমাদাসের কানে উঠেচে।

জয়া চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে এ কথাটাই ভাবতে লাগল যে এ পরিবারে হরি ডাক্তার তার চেয়েও পুরনো। শ্বশুরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। শাশুড়ী নিজ হাতে মাছমাংস, পিঠেপায়েস রেঁধে খাওয়াতেন। সকাল সন্ধ্যে চা ছিল বাঁধা। কালে কালে অভাব অনটনে ক্ষীর মাংস উঠে গেলেও চ বেলার চা'টা আজও বাঁধা। সেই রেওয়াজ এখনও চলে আসছে। হরি ডাক্তারের খবর দেবার ধরণে সর্বাঙ্গ রি রি করে জ্বললেও জয়া কথাগুলো কেবল শুনে গেল, একটা কথা পর্যন্ত বললে না।

চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে অতি কষ্টে লজ্জাটা কাটিয়ে রমাদাস বলেই ফেললে, ডাক্তারবাবু, এ বাড়ীতে তার স্থান নেই। চোর ডাকাত যা হয় হোক।

হেঁ হেঁ করে এক প্রস্থ হেঁসে হরি ডাক্তার বললেন, তুমি বাবা বিচক্ষণ ছেলে। অমনি কঠোর না হলে ত হবে না।

কঠোর হবার দরকার নেই ডাক্তারবাবু। আমি তার সংগে কোন সম্পর্কই রাখব না।

আড়চোখে জয়াকে দেখে নিয়ে হরি ডাক্তার আবার বলল, কিন্তু বাবা পাঁচজনে ত কথাটা শুনবে। তারও ত একটা অংশ আছে।

পাঁচজন সাতজনের মুখ চেয়ে চললে আমার হবে না।

মনে মনে কিসের এক ফন্দি এঁটে হরি ডাক্তার বলল, তা ওদের বললেই হবে রাখাল বাড়ীতে না বলেই চলে গেছে। এ পৃথিবীতে মানুষ যত তাদের স্বভাবও তত। হতবুদ্ধি মানুষকে প্রকৃত পথে না নিয়ে গিয়ে অজ্ঞানের পক্ষাবর্তে ঠেলে দেবার লোকের অভাব হয় না। এরা অহরহ নির্বোধ মানুষকে যেমন ঠকায়, সংসারেও তেমনি ভাজন ধরায়।

জয়া জীবনে আগেও এদের প্রশ্রয় দেয় নি আজও মুখ না খুলে থাকতে পারল না। সরাসরি হরি ডাক্তারকে না বলে তার স্বামীকে বলল, ছোট ভাইকে শাসন করার বেশ ফন্দি আঁটা হল ত। এই ভ্রাতৃপ্রেম ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে দেখচি!

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। হরি ডাক্তার উঠে পড়লেন। যেতে যেতে আমতা আমতা করে বলে গেলেন, ডিসপেন্সারীতে ক'জন রুগীকে বসিয়ে এসেচি।

স্ত্রীর শ্লেষটা হজম করে রমাদাস সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, আর ত পেরে উঠি নে। তাহলে কি করব বলো, আমিই কি বাড়ী ছাড়ব?

কোথা থেকে এক ঝলক হাওয়া ঘরে ঢুকে জয়ার মাথার ঘোমটা ফেলে দিয়ে ক'গাছা চুল উড়িয়ে দরজা দিয়ে আবার কোথায় বেরিয়ে গেল। জয়া বলল, ওকে বোর্ডিংএ দাও। আমার এক বন্ধুর বাবা বর্ধমান ইস্কুলে পড়ায়, সংস্কৃতের পণ্ডিত। সেখানে দিলে তিনি নিজেও দেখবেন, স্কুলের মাষ্টারদেরও বলে করে নেবেন।

খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে রামদাস বলল, বলচ ত। অত টাকা জোগাব কি করে! দোকানই উঠে যাবার মত। আর দিন কতক পরে সংসার চালানোই ভাবনা হয়ে দাঁড়াবে।

পাঁচ বছর আগে রাখালকে লেখাপড়ায় একবার ইস্তফা দিতে হত। বাবা মারা গেলে রমাদাস ছোট ভাইকে দোকানদারীতে ঢোকাতে চাইলে সে যাত্রা জয়া সব দিক রক্ষা করেছিল। সেদিনের সেই ছবিটা হঠাৎ সামনে ভেসে উঠল। নেড়া মাথা কিশোর ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরে জয়া বলেছিল, আমার মাথার দিব্যি ভাই, বল তুই স্কুলে যাবি। তখনও নিজের জেদটা বজায় রেখে রাখাল উত্তর দিয়েছিল, আমাকে দোকানে ঢোকাবে বলেছে কেন. আমার মা নেই ত, বাবা নেই ত। আমি পড়ব না। কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপরে সেদিন রাখাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল তার বৌদিদির সাড়ীর একটা অংশ ভিজিয়ে দিয়েছিল।

অজানা জনপদ থেকে এসে কি ভাবে নারী অপরিচিত সংসারের এক কোণে একটা স্থায়ী আসন পেতে নেয়, নিজেকে টুকরো টুকরো করে বহুর মধ্যে বিলিয়ে দেয় তা নারীই বলতে পারে। যার সংগে নারীর কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই অথচ সে সযোবনে মধুর, সম্পর্কে পবিত্র, দেওরদের সেই চির আনন্দের উৎস বৌদিদি একমাত্র বাংলা দেশের ঘরে ঘরেই আছে। ভূগতের আর কোথাও সভ্যতর দেশেও মানুষে মানুষে, নর ও নারীতে এমন মধুর সম্পর্ক দেখা যায় না। অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে স্বামীর কথার জের টেনে জয়া বলল, তোমার যদি একটা থাকত! তারপর কথাটাকে হাল্কা করার জন্যে আরও গোটা কতক কথা মনে এলোও অনুচ্চারিত হয়ে রইল, উৎকর্ণ হয়ে কি একটা শুনে সে বলল, দেখত, বাইরে যেন কিসের গোলমাল মনে হচ্ছে। সে বাঁধর আবার কিছু করল না কি! রমাদাসকে আর বাইরে যেতে হলনা। জয়ার কথা শেষ হতে না হতে মহা সোরগোল তুলে গাঙ্গুলী পাড়ার কজন মহিলা এগার বছরের লক্ষ্মীর হাত ধরে রান্নাঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

একটা প্রবল উদ্বেগ নিয়ে জয়া জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে পিসীমা? তার উত্তরে গাঙ্গুলী বাড়ীর বিধবা পিসিমা যা বলে গেলেন তা মহাভয়ের কথা। এ মহাভয়ের গভীর থেকে যতই উঠছে ততই সে তার পাংশুমুখে রক্ত ফিরে পাচ্ছে। অথচ সে ভয়াবহ অন্ধকারের রূপ কিছুতেই খুলতে পারছে না এমনি এক রকম মুখ করে লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে আছে। তার অপর্যাপ্ত কোঁকড়ান চুল বেয়ে টস টস করে জল পড়ছে। সে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

অহরহ এই এক চিন্তায়, আজকের উপযুপরি নালিশের পর রামদাসের ধৈর্য সীমা ছাড়িয়ে গেল। গাঙ্গুলী পিসীর সবিস্তার ব্যাখ্যা শুনে রক্তের চাপে আক্রান্ত রোগীর মত হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, আজ তাকে মেরেই ফেলব। যাচ্ছি আমি—

জয়া জীবনে এই প্রথম তারই সামনে স্বামীকে ধৈর্যহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠতে শুনল। ব্যাপারটা ভাল বোধ করলনা। সে ছুটে গিয়ে স্বামীর হাত চেপে ধরে বলল, তোমায় যেতে হবেনা। আমার সংগে ওপরে যাবে চলো ত! আমি দেখছি। 'আসচি পিসীমা' বলে একপ্রকার জোর করেই রামদাসকে নিয়ে গিয়ে দোতলায় বসালো। পরে নীচে নেমে এসে নিজের শাড়ীর আঁচল দিয়ে লক্ষ্মীর মাথার ভিজে চুল বেশ করে মুছতে মুছতে বলল, দেখ না, তোর সামনেই আজ সে হতভাগার কি হাল করি। এক্ষুণি খবর পাঠাচ্ছি নয়ন গিয়ে ধরে আনুক।

সে হতভাগা সকাল থেকে বার বার এ পরিবারের শান্তিভঙ্গ করছে তাকে ধরে আনতে নয়নকে পাঠাতে

হল না। এক রাশ শালুক ফুল, পদ্মচাকী, নালের ডাঁটা নিয়ে ধূমকেতুর মত এসে জয়ার সামনে দাঁড়াল। ভীষণ ব্যস্ত ভাবে রাখাল বলল, ধর ধর শিগ্‌গীর ধর, দেখচ না কী রকম পিছলিয়ে যাচ্ছে।

কাউকে ভ্রূক্ষেপ না করে তার বৌদিদিকে ধরবার অবসর না দিয়ে সেই মহামূল্য জিনিষগুলি ধুপ করে ফেলে দিয়ে সে চলে গেল। জয়া ডাকল, এই হতচ্ছাড়া শোন। লক্ষ্মীকে পুকুরে চুবিয়ে ধরেছিলি কেন, বহুকে গাছ থেকে ফেলে দিয়েছিলি কেন, ছুটে গিয়ে তার কান ধরে চড় মারবার জন্য ডানহাত উঁচিয়ে সে আবার বলল, বল বল কেন এত বুদ্ধি হয়েছে। বুড়ো বাঁদর বয়েস হয়নি তোর ?

আচমকা এ ভাবে আক্রান্ত হয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রাখাল দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু সে আর কতটুকু সময়! অনতিবিলম্বে এক ঝটকায় তার বৌদিদির হাত ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলল, বহু খারাপ গাল দিয়েছে কেন, লক্ষ্মী আমার পদ্মচাকী নিয়েছে কেন। আমি বলে কত কষ্ট করে তুলেছিলুম।

তার এই তাচ্ছিল্যে জয়ার সর্বশরীর জ্বলে গেল। সে চেঁচিয়ে উঠল, বহু যদি গাছ থেকে পড়ে মরে যেত, লক্ষ্মী ডুবে যেত, তাহলে যে বাড়ীশুদ্ধ লোকের হাতে হাতকড়া পড়ত। সে দিকে হুস আছে বাঁদর ছেলে।

তার বৌদিদির বাড়ীশুদ্ধ লোক মানে রামদাসের হাতে হাতকড়ার দৃশ্য ভেবে নিয়ে রাখাল উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বলল, তাহলে খুব মজা হত।

কিশোরের এ সৃষ্টিছাড়া আকাঙ্ক্ষা মনের সত্যকার কোন পরিচয় বহন করে আনে কি না তা রাখাল যতটা না বুঝে জয়া তার চেয়ে কম বোঝে না। দাঁড়া তোর বড্ড বাড় হয়েচে, বলে তাদের বিদেয় করে ওপরে আসবে সেটুকু সময় পেল না। জয়া স্বামীর চীৎকার শুনতে পেয়ে পড়ি কি মরি করে দোতলায় উঠে এল।

উত্তরের ঘর থেকে বেরিয়ে, তবে রে শুওর আমার হাতে কড়া পরাতে চাও, আজ তোমাকে মেরেই ফেলব, বলে রমাদাস রাখালের দিকে তেড়ে গেল। ভাইয়ের শাসনের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য রাখাল দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটল।

দুই ঘরের মাঝখানের বারান্দা পুব ধারের পরিকল্পিত বারান্দায় গিয়ে মিলেছে। দেয়ালে একটা দরজা বসানো। জয়া আজ সকালে শাশুড়ীর চিহ্নিত জায়গায় দাঁড়িয়ে সূর্য প্রণাম করেছিল। তেতালার দরজায় খিল আঁটতে ভুলে গিয়ে সকালে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়েছিল। ওগো ওকে কিছু বল না। তোমার পায়ে পড়ি, ওকে কিছু বল না। উন্মাদের মত ছুটে এসেও জয়া স্বামীকে ধরতে পারল না।

রাখাল আমার কাছে এসো, শোন ভাই আর এগিও না, বলে ছুটতে ছুটতে সকালের সেই সূর্য প্রণামের জায়গায় পৌঁছিয়ে দেখল, সে নেই, সব শেষ হয়ে গেছে।

ঘটনার আকস্মিক বেগে স্তব্ধ রমাদাসের মুখের দিকে চেয়ে জয়া চীৎকার করে তার পায়ে আছড়িয়ে পড়ল। তারস্বরে একবার মাত্র ডাকল, রাণু!

তার শিরায় উপশিরায় যেন রক্তস্রোত বন্ধ হয়ে গেছে, স্নায়ু শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। বুদ্ধি কোন কালে ছিল কি না তারও কোন লক্ষণ নেই। পাথরের মত ভাবলেশহীন মুখে রামদাস জয়ার সংজ্ঞাহীন দেহের দিকে তাকিয়ে আছে। সে ভুলেই গেল যে সে মানুষ। সংজ্ঞাহীন মানুষের প্রতি তার একটা কর্তব্য আছে।

স্মৃতিকণা

(শরৎচন্দ্র)

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার

ডিনিপিতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেখিতেছি। তিনটি ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০০। কলেজ হইতে সকাল সকাল ছুটি হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণের (পুঁটু) সহিত সুরেন্দ্রদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। বহির্বাটীর বারান্দার কোণে একটি তক্তাপোষ পাতা ছিল। উহাতে বসিয়া নানা প্রকার গল্পগুজব করিতেছি। এমন সময় বাটীর প্রবেশদ্বারে শরৎচন্দ্রকে দেখা গেল। হাতে একটি বাঁধান খাতা। আমাদের সকলকে একত্রে দেখিয়া তিনি খুশী হইলেন। তিনিও তক্তাপোষে আসিয়া বসিলেন। খাতাটির উপর আমাদের একত্র দৃষ্টি পড়িয়াছে দেখিয়া, আমাদের প্রশ্ন করিবার পূর্বেই তিনি জানাইলেন যে—সেইদিন প্রাতে তিনি তাঁহার "দেবদাস" নামক উপন্যাসটি শেষ করিয়াছেন। তিনি উহা আমাদের পাঠ করিয়া শুনাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমরা মনে মনে এই প্রকারই একটা কিছু চাহিতেছিলাম। তাঁহার কথায় মন পুলকিত হইল।

শরৎচন্দ্র একাদিক্রমে উপন্যাসটি পাঠ করিয়া শেষ করিলেন। পাঠ শেষ হইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। তিনি আমাদের প্রত্যেকের মতামত জানিতে চাহিলেন। বিভূতিভূষণ আমাদের মুখপাত্র ছিলেন। তিনি আমাদের ব্যক্তিগত মতামত জানিয়া, শরৎচন্দ্রকে তাহা জানাইলেন। শরৎচন্দ্র যে আমাদের মতামত শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

দেবদাস লিখিত হইবার ষোল বৎসর পরে উহা ১৩২৩—২৪ সালে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়। মনে হয় 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইবার পূর্বে শরৎচন্দ্র উহার কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া থাকিবেন।

সেদিন সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের ভিতর নানা প্রকার আলাপ-আলোচনা হয়। এবং কথা প্রসঙ্গে সেই দিন জানিতে পারি বৈদেশিক ঔপন্যাসিকদের ভিতর Dickens এর রচনা তাঁহাকে বেশী আকৃষ্ট করে।

আর একদিনের কথা স্মরণ হইতেছে। দিনটি ১৩১৭ সালের ৮ই শ্রাবণ। শরৎচন্দ্র খুব ভাল গান গাহিতে পারিতেন। ওই দিন তাঁহার গান শুনিবার সৌভাগ্য হয়।

বৈকালে বাড়ীর বাহির হইয়াছি। মাত্র শরৎচন্দ্রের দুই মামাতো ও পুঁটুর (বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য) সহিত সাক্ষাৎ হইল। সম্ভবতঃ আমার নিকটই তাঁহারা আসিতেছিলেন। সকলে ভিলা স্কুলের দিকে অগ্রসর হইলাম। চৌরাস্তার উপরেই উকিল দেবতাচরণ বাবুর নবনির্ম্মিত বাটী। নির্ম্মাণকার্য্য তখনও শেষ হয় নাই। ইট, চুণ, বালির স্তূপ ডিঙাইয়া বাড়ীর পিছন দিয়া ভিতরে প্রবেশ করা হইল। ধূলাবালি সরাইয়া একটি প্রশস্ত বারান্দায় আমাদের সভা বসিল। কিন্তু সভার নিয়মিত কার্য্যের প্রতিও কাহার আগ্রহ দেখা গেল না। কেহ একজন শরৎচন্দ্রকে গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নানা আপত্তি সত্ত্বেও অবশেষে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। কিন্তু হারমোনিয়াম কোথা হইতে পাওয়া যায়? তাহাও দেবতাবাবুর বাড়ী হইতে যোগাড় হইয়া গেল। তাঁহাদের পুরাপুরি গৃহপ্রবেশ তখনও হয় নাই। হারমোনিয়ামের সহিত সতরঞ্চি আসিল। এবং অবশেষে তাঁহারা যখন জানিতে পারিলেন যে শরৎচন্দ্র গান গাহিবেন, তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। ইতিপূর্বে তাঁহার গান শুনি নাই। তিনি কী গান গাহিবেন এবং কেমন গাহিবেন, তাহা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইলাম।

তিনি আবেগের সহিত সুকবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় রচিত "গোকুলের মধু ফুরায়ে গেল, আঁধার আজিকে

কুঞ্জবন" গানটি গাহিতে আরম্ভ করিলেন। মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। যতদূর মনে পড়ে, গানটি সকলের এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তাঁহাকে উহা পুনরায় গাহিতে হয়। এই গানটি আমি জানিতাম না, পরে তাঁহার নিকট হইতে উহা লিখিয়া লইয়াছিলাম। বর্ষার এই রমণীয় দিনটির কথা এখনও মনে উজ্জ্বল হইয়া আছে।

মনে হইতেছে ইহার কিছুদিন পরে সুকবি দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় ভাগলপুরে আসেন। উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত "শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা"র জন্য কিছু চাঁদা সংগ্রহ করা। তিনি ভাগলপুরে আসিয়া তাঁহার সতীর্থ প্রসিদ্ধ উকিল চন্দ্রশেখর সরকার মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন। আমাদের পরিবারের সহিত তাঁহার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল বলিয়া, তিনি প্রত্যহই আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। তাঁহার উপস্থিতিতে বাড়ীতে সাহিত্যালোচনার ধূম পড়িয়া যাইত। তাঁহার কবিতাগুলি আমাদের হৃদয় যে-ভাবে জয় করিয়াছিল, তাহা শুনিয়া তিনি পুলকিত হইতেন। আমরা কয় ভ্রাতা ও ভগ্নী সাহিত্য চর্চ্চা করি, আমার অগ্রজ এবং অনুজার লেখা নানা মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়া থাকে—ইহা শুনিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হন।

একদিন "ছায়া"র কথা তাঁহার নিকট উত্থাপন করিলাম। তিনি পত্রিকাখানি দেখিতে চাহিলেন। 'ছায়ার' কয়েক সংখ্যা তাঁহাকে দেওয়া হইল। তিনি মনোযোগ সহকারে কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা পড়িলেন। নিরুপমা দেবীর (সতীর্থ বিভূতিভূষণের অনুজা) একটি কবিতা পড়িয়া তিনি অজস্র প্রশংসা করিলেন। কবির ভবিষ্যত যে খুবই উজ্জ্বল, তাহা মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিলেন এবং 'ছায়া' সম্বন্ধেও আমাদের খুব উৎসাহ দিলেন।

একদিন স্থির হইল যে, সাহিত্য-সভার সভ্যেরা সকলে মিলিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য কবির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। দিন-লিপিতে দেখিতেছি ২৮শে মে, ১৯০৩ সালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া হইয়াছিল।

উকীল চন্দ্রশেখর সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া দেখিলাম আসবাববিহীন নিতান্ত একটি ছোট ঘরে (মুহুরীর ঘরও হইতে পারে) মেজের উপর ফরাসে তিনি বসিয়া আছেন। এই পরিবেশের ভিতর তাঁহাকে দেখিয়া আমরা ক্ষুব্ধ হইলাম। কিন্তু দেখিলাম তিনি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। হাস্যমুখে তিনি আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলাম। মনে পড়িতেছে, সমসাময়িক কবি ও কবিতার কথা লইয়া অনেকক্ষণ আলোচনা হইল। আলোচনা প্রসঙ্গে কবি নবীনচন্দ্রের কথা উঠিল। দেখিলাম দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার উপর বিশেষ প্রসন্ন নহেন। পলাশীর যুদ্ধ হইতে অংশবিশেষ আবৃত্তি করিয়া পরিহাস সহকারে উহার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। আমাদের ভিতর অনেকেই ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়িতেছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে এক কবির প্রতি অন্য কবির এইরূপ মনোভাব শোভন নহে। কথাবার্ত্তায় বুঝিতে পারিলাম, তিনি নিজের কবিতার স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান। ভাবের গভীরতায় তাঁহার "মা" কবিতাটি, বৈচিত্র্য হিসাবে "ডাকমন কাটা মন" ও অন্য কয়েকটি কবিতার কথা আমরা উল্লেখ করিলাম। মনে হইল তিনি পুষ্ট হইয়াছেন। যতদূর মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "সোনার তরী" কাব্যগ্রন্থখানি দেবেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে কবিতা লিখিবার ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। 'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা'র চাঁদা সংগ্রহ করিবার সময় তিনি এক্কা-ঘোড়ার গাড়ী করিয়া বাহির হইতেন। একদিন দ্বিপ্রহরে চাঁদা সংগ্রহের পর আমাদের বাড়ীতে আসিলেন। সেই সময় তাঁহার চাঁদার খাতাখানি দেখিবার সুযোগ হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের নাম দেখিলাম। তিনি ইংরাজীতে স্বীয় নাম সহি করিয়া এক শত টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন। কবির ভাগিনেয়ী সরলা দেবী ও অন্যান্য কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম চোখে পড়িয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথ আমাদের বাড়ী পৌঁছিয়াই আমাকে কাগজ ও দোয়াত কলম আনিতে বলিলেন। দোয়াত

কলম এবং কাগজ আনা হইলে আমাকে বলিলেন—"দেখ আমি কিছু লিখিব না, তোমার হাতের লেখা সুন্দর, আমি মুখে মুখে বলিয়া যাইব, তুমি আমার হইয়া একটি কবিতা টুকিয়া লও। আজ প্রাতে হরেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের (কবি দ্বিজেন্দ্রলালের অগ্রজ) নিকট গিয়াছিলাম। তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী বিরাজমোহিনী দেবী সম্প্রতি পুত্রশোকে কাতর দেখিলাম। তাঁহার প্রকাশিত 'নবপ্রভা' কাগজে বিরাজমোহিনী দেবী পুত্র বিয়োগের যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, উহা পড়িতে দেন। তাঁহাদের বাড়ী হইতে আসিতে আসিতে গাড়ীতে বসিয়াই মুখে মুখে একটি কবিতা রচনা করিয়াছি। উহা বিরাজমোহিনী দেবীকে নিজ হাতে দিয়া আসিব ভাবিতেছি।"

কবিতাটির আরম্ভ এইরূপ ছিল মনে হইতেছে:

কি মন্ত্র শুনালে আজি বিশ্ব বিমোহিনী
অয়ি যাদুকরী কবি, একি শোক গাথা?
এ যে সুধা নির্ঝরিনী—
চন্দন প্রলেপে যেন জুড়াইল ব্যথা!

উত্তরকালে এই কবিতাটি তাঁহার কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

হরেন্দ্রলাল রায় মহাশয় শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজেন্দ্র নাথের (শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ) এক ভগিনীকে বিবাহ করেন। কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ কর্ম্ম হইতে মাঝে মাঝে অবসর পাইলে ভ্রাতার বাড়ীতে আসিয়া উঠিতেন এবং কিছুদিন করিয়া থাকিয়া যাইতেন। সে সময় শহরে সাহিত্যানুরাগী মহলে সাড়া পড়িয়া যাইত। হরেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের গৃহে প্রত্যহ বৈকালে সাহিত্যিক বৈঠক বসিত। এই সভায় নানা প্রকার সাহিত্যালোচনা হইত। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বরচিত হাসির গান গাহিয়া সকলকে তৃপ্তিদান করিতেন। বয়ঃকনিষ্ঠ আমরাও সে-রসে বঞ্চিত হইতাম না। একদিনের কথা মনে পড়িতেছে: হরেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের বাড়ীতে আমরা উপস্থিত। দ্বিজেন্দ্রলালের গান শোনাই উপস্থিতির উদ্দেশ্য। হরেন্দ্রলাল তাঁহাকে গান গাহিবার কথা বলিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল জানিতে চাহিলেন, তাঁহার রচিত বিশেষ কোন কোন গান আমরা শুনিতে ইচ্ছুক। আমরা অভীপ্সিত গানগুলির কথা জানাইলাম। তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী সহকারে হাসির গানগুলি শুনাইলেন।—দীর্ঘদিন গত হইয়াছে। স্মৃতিই এই দীর্ঘ দিনের ব্যবধানকে বর্ত্তমানের সহিত গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে।

'ছায়া' এক বৎসর সম্পাদনার পর আমি অন্য কোনও সভ্যকে উহার ভার লইতে বলিলাম। কিন্তু কেহই ভার লইতে সম্মত নন। সুতরাং বাধ্য হইয়াই নানা বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও আরো এক বৎসর উহার সম্পাদনার কার্য্য আমাকেই করিতে হইল। একমাত্র গিরীন্দ্রনাথ এই সময় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্রমে ক্রমে অন্যান্য সভ্যদের উৎসাহ ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করে এবং পরে উহার প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়।

আমাদের কিশোরকালের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার নিদর্শন হিসাবে দুই বৎসরের 'ছায়া' দুই খণ্ডে ভালভাবে বাঁধাইয়া রাখা হয়। পরে কিন্তু উহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লোপ পায়। কারণটি কতকটা দৈবদুর্ঘটনার মতই। সুরেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ কলিকাতায় পড়িতে গেলেন। একবার কলিকাতা যাইবার সময় দুই খণ্ড ছায়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহাদের কলিকাতায় অবস্থিতিকালে "যমুনা" সম্পাদক মহাশয় কেমন করিয়া জানিতে পারেন যে, 'ছায়া' পত্রিকাটিতে শরৎচন্দ্রের ও ভাগলপুর সাহিত্য-সভার সভ্যদের বহু উল্লেখযোগ্য লেখা আছে। তিনি পড়িবার জন্য দুই খণ্ড 'ছায়া' লইয়া গিয়াছিলেন। দীর্ঘ দিন গত হইলেও যখন উহা ফেরৎ দিবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না, তখন গিরীন্দ্রনাথ একদিন বাধ্য হইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। 'যমুনা' সম্পাদকের অম্লান-বদনে 'ছায়া' ফেরৎ দিবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি জানাইলেন যে, উহার পাতাগুলি ছিঁড়িয়া অধিকাংশ লেখাই যমুনাতে মুদ্রিত হইয়াছে। বিনানুমতিতে এইরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিয়া বলিলেন—ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই, যেহেতু লেখাগুলি প্রায় সবই ত মুদ্রিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট

আত্মপ্রকাশ করিয়াছে! তাঁহার এইরূপ সৌজন্য আমাদের বিমূঢ় করিয়া দেয়। চিরকালের জন্য দুঃখ রহিয়া গিয়াছে যে—যে পত্রিকাখানি শরৎচন্দ্রের সর্ব্বপ্রথম গল্প ও প্রবন্ধ গুলি প্রকাশ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিল তাহার আর কোনও চিহ্ন রহিল না।

এস্থানে শরৎচন্দ্রের একাগ্র চিন্তার একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিব। যেরূপ পরিবেশের মধ্যে তিনি সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত সাহিত্য জগতে দুর্লভ।

তিনি ১৩০৯ সালে একবার কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় তাঁহার মাতুল সুরেন্দ্রনাথের নামে রচনা পাঠাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহা হয়তো অনেকেই জানেন। তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার পর সব সময়ই দেখিয়াছি, তিনি নিজ নামে কিছু প্রকাশ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। কি পরিবেশের ভিতর এই গল্পটি রচিত হয়, তাহা গিরীন্দ্রনাথের নিকট সেই সময় শুনিয়াছিলাম।

সুরেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ তখন বহুবাজারের একটি বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। শরৎচন্দ্র প্রায়ই তাঁহার মাতুলদের বাসায় আসিতেন। এক ছুটীর দ্বিপ্রহরে আহারের পর শরৎচন্দ্র সেই বাসায় আসিলেন। গিরীন্দ্রনাথ একাই বাসায় ছিলেন। দুই জনের ভিতর সাহিত্যালোচনা চলিতে লাগিল। কথাবার্ত্তার মধ্যে স্মরণ হইল যে, কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য গল্প পাঠাইবার সেই দিনটিই শেষ দিন। গিরীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে প্রতিযোগিতার গল্প লিখিবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। গল্প তৈয়ারি হইলে সন্ধ্যার সময় উহা এইচ্. বসু মহাশয়কে দিয়া আসিলেই চলিবে। এই অদ্ভুত আবেদনের উত্তরে শরৎচন্দ্র কী বলিয়াছিলেন, তাহা জানি না। তবে তিনি সম্মত হইয়া বাজার হইতে কাগজ আনাইলেন এবং গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। গল্পটির নাম "মন্দির"। উহা শেষ করিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। সন্ধ্যার সময় শরৎচন্দ্র ও গিরীন্দ্রনাথ কুন্তলীন আপিসে গল্পটি লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সব দোকানেই আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এইচ্. বসু মহাশয়কে গল্পটি দেওয়া হইলে তিনি মন্তব্য করেন যে, শেষ দিনের শেষ মুহূর্ত্তে গল্পটি তাঁহাকে দেওয়া হইল। এই মন্তব্য শুনিয়া শরৎচন্দ্র, আপত্তি থাকিলে উহা ফেরৎ দিবার কথা বলেন। যাহা হউক বসু মহাশয় গল্পটি গ্রহণ করেন। এই গল্পটি শরৎচন্দ্র নিজ নামে প্রকাশ করিতে দেন নাই। তাঁহার মাতুল সুরেন্দ্রনাথের নামে উহা প্রকাশ করিতে দেওয়া হয়। এই ঘটনার পরেই তিনি ব্রহ্মায় চলিয়া যান।

অল্প দিন পরেই তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার গল্পটি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এবং এই সম্বন্ধে ব্রহ্মা হইতে তাঁহার মাতুল গিরীন্দ্রনাথকে যে পত্র লেখেন, তাহাও আমার দেখিবার সৌভাগ্য হয়। পত্রে উল্লেখ ছিল—"এবার ক্রিটিককে জিজ্ঞাসা করিও গল্পটির ভাষা ও বাঁধুনী তাঁহার মনোমত হইয়াছে কিনা।" ছায়া সম্পাদনার সময় সকলের লেখাই সমালোচনা করিতে হইত বলিয়া শরৎচন্দ্রের উল্লিখিত অভিধাটি অর্জ্জন করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল।

সেই সময় অনেক প্রসিদ্ধ লেখক লেখিকা কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য গল্প পাঠাইতেন। শুনিয়া হয়তো আশ্চর্য্য বোধ হইবে যে, প্রথম বৎসরে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র একটি বৈজ্ঞানিক গল্প লিখিয়া প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। গল্পটি অবশ্যই তাঁহার নিজ নামে প্রকাশিত হয় নাই। পরবর্ত্তীকালে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, মণীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায়, হরিহর শেঠ প্রভৃতি পুরস্কার লাভ করেন।

শরৎচন্দ্রের পুরস্কার লাভের পর তাঁহার মাতুল গিরীন্দ্রনাথ দুইবার প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। বর্ত্তমান লেখককে লইয়া সেই সময় ভাগলপুর হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে চারি বৎসরের প্রথম পুরস্কার লাভ করায় ভাগলপুর সার্থকনামা হইয়া উঠিয়াছিল।

গল্পগুলি নির্ব্বাচন করিবার জন্য প্রত্যেক বৎসরে বিভিন্ন পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন। রবীন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়—কয়েক বৎসর গল্পগুলি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক যে বারে গল্পগুলি নির্ব্বাচিত হয়, সে বারে বর্ত্তমানে

প্রবন্ধ লেখকের প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত গল্পটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করে।

শরৎচন্দ্রের আরও একটি ঘটনার কথা স্মরণ হইতেছে। তিনি একদিন ডাকঘরে চিঠি ফেলিতে গিয়া দেখেন আরো একজন ডাকে চিঠি ফেলিতে আসিয়াছেন। তাঁহার অদ্ভুত কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সেই ব্যক্তির অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহার কার্যাবলী লক্ষ্য করিবার জন্য দিবসের অবশিষ্টাংশ তিনি সেই ব্যক্তির অনুসরণ করিয়া সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরেন।

১৯০৩ সালে শরৎচন্দ্র কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মা যাত্রা করেন। সেখানে কিছুকাল থাকিবার পর Accountant-General, Burma অফিসে তিনি একটি কর্মে নিযুক্ত হন। জীবিকা অর্জনের জন্য অনেকেই সেই সময়ে ব্রহ্ম অথবা মোম্বাসা (আফ্রিকা) যাত্রা করিতেন। ব্রহ্মায় শরৎচন্দ্র উক্ত অফিসে প্রায় বার বৎসর কার্য্য করেন। ১৯১৬ সালে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন।

একবার শীতকালে (সম্ভবতঃ ১৯২০ সালে) যখন তিনি মাতুলালয়ে কিছুদিনের জন্য বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসেন, সেই সময় আমিও নিজ কর্মস্থল সিমলা শৈল হইতে ছুটী লইয়া ভাগলপুর আসি। তাঁহার সহিত বহুদিন পরে দেখা হওয়ায় দু'জনেই খুব আনন্দিত হই। তাঁহার ব্রহ্ম প্রবাস সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হয়। কথা প্রসঙ্গে তাঁহার চাকুরী ত্যাগের কথা উঠে। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর পক্ষে ভবিষ্যতের কোনও চিন্তা না-করিয়া হঠাৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ যে খুবই দুঃসাহসিক ব্যাপার, সে কথা উল্লেখ করি। কি উপলক্ষ্য করিয়া তিনি চাকুরী ছাড়িয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে জানিবার কৌতূহল হইয়াছিল। আমার ঔৎসুক্য প্রকাশে তিনি চাকুরী ত্যাগের যে সরস বর্ণনা দিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া পরম কৌতুক বোধ করিয়াছিলাম।

শরৎচন্দ্র বলিলেন যে, তিনি আফিসে প্রবেশ করিয়া কিছুদিনের মধ্যেই কার্য্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিলেন। কিন্তু সুনামের কি ভয়ঙ্কর পরিণাম হইতে পারে, তাহা তিনি গোড়ায় অনুধাবন করিতে পারেন নাই। দেখা গেল, যে-বিভাগে তিনি কার্য্য করিতেন তাহার কঠিন কাজগুলি তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িতে লাগিল। কার্য্যে তাঁহার অবহেলা ছিলনা, বরং যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন। কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিলেন যে, চট্টগ্রাম বন্দর লইয়া একটি "কেস" গড়িয়া উঠে। এই বন্দরটি লইয়া বর্ম্মা ও বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের মধ্যে বহু বৎসর হইতে বড় মন কষাকষি চলিতে ছিল। এমন কি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের রেলওয়ে বোর্ডও এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ছিল। আমি শেষোক্ত আফিসে কার্য্য করিতাম বলিয়া 'আপনাদের রেলওয়ে বোর্ড' বলিয়া ব্যাপারটি উল্লেখ করিলেন। দীর্ঘ দিন ধরিয়া যে জটীলতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে উহার মীমাংসা যে কবে হইবে এরূপ ভবিষ্যত বাণী কেহ করিতে পারিতেন না। এমন কি, যে ব্যক্তি কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে কেসটিতে হাত দিয়াছিলেন। তাহার কার্য্যকাল শেষ হইয়া আফিস হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেও উহার শেষ হইবার কোনও লক্ষণ দেখা দিল না। পরে উহা পঞ্চতন্ত্রে বর্ণিত মস্তকে চক্রধারী ব্যক্তির ন্যায় শরৎচন্দ্রের মস্তকে ভর করিল। তিনি অসীম পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া ব্যাপারটিকে সমাধানের পথে পৌঁছাইয়া দেন। কিন্তু এই কঠিন ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করিয়া তিনি তাঁহার উপরিওয়ালার সন্তুষ্টি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন—এরূপ মনে হইল না। বরং একদিন আফিসে আসিতে সামান্য বিলম্ব হওয়ায় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সুপারিণ্টেনডেণ্ট তাঁহাকে কয়েকটি অনুচিত কথা শুনাইয়া দিলেন। মন্তব্য কিছু রূঢ় হইয়া থাকিবে। শরৎচন্দ্রও তাঁহাকে অনুরূপ মন্তব্যে অভিনন্দিত করিলেন। শেষে কথা ছাড়িয়া ব্যাপারটি হাতাহাতিতে পর্য্যবসিত হইল এবং ফলে দুইজনেরই বক্ষদেশ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। উভয়ে মিলিয়া যখন সেই অবস্থায় একাউণ্টেণ্ট-জেনারেলের কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাদের সেই নাটকীয় বেশ দেখিয়া তিনি কি প্রকার ভীত হইয়াছিলেন—শরৎচন্দ্র তাহার একটি সরস বর্ণনা করিলেন। তিনি যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, বিচার সেইরূপই হইল। তিনি নিজ কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া

পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়া চিরদিনের জন্য দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইলেন। এই সময় তাঁহার শরীরও ভাল যাইতে ছিলনা। সুতরাং তিনি বর্মা ত্যাগ করিলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে (সম্ভবতঃ ১৯২৫ সালে) শরৎচন্দ্র পুনরায় ভাগলপুরে আসিয়াছিলেন। আমিও তখন ছুটী লইয়া সিমলা হইতে আসিয়াছি। প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার সময় তাঁহার মাতুলালয়ে তাঁহার সহিত দেখা হইত। পুরাতন বন্ধুবান্ধব অনেকেই সে-সময় আসিয়া জুটিতেন। একদিন দেখা করিতে গিয়া দেখিলাম, বহির্বাটীর অঙ্গনের কোলে যে বারান্দাটি ছিল তাহারি এক ধারে আলুলায়িত কুন্তলা একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছেন। শরৎচন্দ্রকে খুবই উত্তেজিত দেখিলাম। তিরস্কারের স্বরে তিনি সেই মহিলাটিকে অনেক কথাই বলিতেছেন। সেখানে আর কেহ উপস্থিত ছিলনা। শরৎচন্দ্র যাহা বলিতেছিলেন, তাহার কিছু কিছু আমার কাণে আসিল। যাঁহাকে আমি স্ত্রীলোক বলিয়া ধারণা করিয়াছিলাম, প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন নারী বেশধারী পুরুষ সাধক। মনে হয় তাঁহার পরিধানে একটি গৈরিক শাড়ী ছিল। শুদ্ধ শুভ্র বিবর্জ্জিত ক্ষৌরিত মুখমণ্ডল লক্ষ্য করিলাম। শরৎচন্দ্র পুরুষের নারী বেশে সাধনার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন—এই ঘটনায় তাহা জানিতে পারি।

ইহার পর শরৎচন্দ্রের সহিত আমার আর দেখা হয় নাই। ১৯১৮ সালে তাঁহার মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় যখন কলিকাতায় আসিয়া আমার নিকট উঠেন, তখন তাঁহার সহিত সামতাবেড়ে যাইবার কথা হইয়াছিল। কিন্তু কয়েকটি অনিবার্য্য কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার মাতুলদের নিকট হইতে চিঠিপত্রে তাঁহার সংবাদ জানিতে পারিতাম।

এতক্ষণ যাবৎ অতীতের কথা চিন্তা করিলাম। যখনই অতীতের কথা চিন্তা করিতে যাই, তখনই কিছু পরিমাণে তাহা বর্ত্তমানের সহিত যুক্ত হয় ও বর্ত্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে অতীতকে অন্য আলোকে দেখি। যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছি, তাঁহাকেও বর্ত্তমানের আলোকে দেখিতে পাইলাম—সে এক অপূর্ব্ব দেখা!

পাঞ্জাবী সাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত

পাঞ্জাবী সাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত হয় প্রায় সত্তর বছর পূর্বে। এই নবযুগ আনতে সহায়তা করেছে রাজনৈতিক চেতনা এবং আত্মরক্ষার প্রেরণা। স্বাধীনতার স্বপ্নকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্যে আটপৌরে ভাষায় রচিত সাহিত্যের প্রয়োজন। এর চেয়ে বড় ছিল শিখ জাতির আত্মরক্ষার প্রশ্ন।

নেতারা উপলব্ধি করলেন ধর্ম ও সমাজ সংস্কার দ্বারা শিখ-সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করতে পারলে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা সম্ভব। এর জন্য শিখ-ধর্ম ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করে তুলতে হবে। যে ভাষায় সাধারণ লোক কথা বলে সে ভাষায় শিখ-ধর্মের মর্মবাণী ঘরে ঘরে নতুন করে পৌঁছে দেওয়া চাই।

শিখ-গুরুদের আমল থেকে পাঞ্জাবী সাহিত্যে ব্রজভাষার আধিপত্য চলে আসছিল। এই ভাষার সঙ্গে সাধারণ পাঠকের যোগ না থাকায় পাঞ্জাবী সাহিত্য হয়ে পড়েছিল বদ্ধ জলাশয়ের মত প্রাণহীন। মধ্যপাঞ্জাবের কথাভাষার সঙ্গে প্রয়োজনানুরূপ সংস্কৃত ও ফারসি শব্দ মিশিয়ে নতুন পাঞ্জাবী ভাষায় লিখতে আরম্ভ করলেন ভাই মোহন সিং ও ভাই কাহন সিং। শিখ ধর্ম-শাস্ত্রে এঁদের দুজনেরই ছিল গভীর পাণ্ডিত্য। ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে অসংখ্য পুথিপত্র লিখে এঁরা নতুন পাঞ্জাবী ভাষার প্রচলন করলেন।

পথপ্রদর্শক হলেও এঁরা ভাষায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। কারণ তাঁরা ভাষাশিল্পী ছিলেন না। ভাই বীর সিং (১৮৭২-১৯৫৭) এই নতুন ভাষাকে আপন প্রতিভায় প্রাণবান ও বেগবান করে তুলেছেন।

"বিশ্বভারতী পত্রিকা"

পোট্রেট

বিমল দাশ

.....এইত ৪২/১ নম্বর।

দরজার উপরে আলকাতরা দিয়ে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা নম্বরটা নিজের মনের সঙ্গে বার বার মিলিয়ে দেখছিল চৈতালী। তবুও বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু সব অবিশ্বাসের বাঁধ ভাঙল, যখন এরই একটা খুপরীতে ও অতীনকে আবিষ্কার করল। কোন কল্পনার ছিটেফোঁটা নেই কোথাও। হেলে-পড়া নড়বড়ে খোলার ঘর। নামে ঘর। আসলে গুদাম। তবুও ত ঘর। আলোবাতাসের নামগন্ধ নেই। পাশের ডোবাটা থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ ভেসে আসে। ঘরে পড়ে শুধু ঝুপসি অন্ধকার। আর মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসে অশ্রাব্য-ভাষার কলহ।

বেন্টিঙ্ক রোডের ধারে এই বস্তিটি।

অস্বস্তি লেগেছে এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। তবু আজ-কাল কতকটা সহ্য হ'য়ে গেছে। চৈতালী অনেক বুঝিয়েছে শহরের কোন এক ভদ্র পল্লীতে ঘর নিতে। অভিমান করে কিছুদিন আসাও বন্ধ করেছে। কোন ফল হয় নি। কিন্তু না-এসে পারে নি। এসেছে। গল্প করেছে। ছবির সমালোচনা করেছে। এক-আধ বছর নয়। পাকা পাঁচ পাঁচটি বছর ধরে।

চৈতালী সবে আর্ট কলেজে ঢুকেছে। অতীন তখন ঐ কলেজেরই ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। কলেজের বার্ষিক চিত্র-প্রদর্শনীতেই এদের প্রথম আলাপ। অতীনের একটা ল্যাণ্ডস্কেপ্, ছবির রঙ্ নিয়ে। তখন কি ছাই বুঝেছে এ রঙ একদিন ওর মনেও ধরবে!

কলেজের গণ্ডী পেরিয়েও সে আলাপ স্থির গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। অবশ্য এতে চৈতালীর উদ্যোগই ছিল বেশী পরিমাণে। স্বভাব-লাজুক অতীন ঠিকানা না-দেওয়ার অনেক অজুহাত খুঁজেছে। নিজের দৈন্যের কথা কেইবা জানাতে চায়! কিন্তু কলেজ থেকে ঠিকানা পেতে চৈতালীর খুব একটা বেগ পেতে হয় নি। তারপর একদিন সোজা হাজির হয়েছিল অতীনের বস্তিতে।

ঘরে আসবাবপত্রের বালাই নেই। একপাশে পড়ে আছে নড়বড়ে এক তক্তপোষ। আর একধারে ছবি আঁকার সরঞ্জাম। রঙের কৌট, তুলি, ছেঁড়া কাগজ, ক্যানভাস্ ঘরময় ছড়ান। গোছগাছ কিছু নেই। অতীনের স্বভাবটাই যেন এ রকম। মাঝে মাঝে চৈতালীর হাতের স্পর্শ পেয়ে কিছুটা শ্রী ফিরেছে। ক'দিনের জন্যই বা! দু'দিন পরে যে কে সে-ই।

সেদিন অতীনকে ও বলেছিল: "কি! অজ্ঞাতবাস করবেন ভেবেছিলেন? তা হলে আরো গোড়া থেকেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল।"—বলেই সে কী হাসি। হাসি তো নয় যেন বিদ্যুৎ। খোলার ঘরে বিদ্যুৎ। অতীনের চোখে বিস্ময়। পরিচয়ের দিন থেকেই অতীন দেখেছে, হাসির ঝিলিক ওর চোখে মুখে। ও মেয়ের হাসি যাবে না। বাঁকা ঠোঁটের প্রান্ত ঘেঁষে ওর সে হাসি খেলে যায় কালো চোখের তারায় তারায়। অতীন বলে: "না, না, তা ঠিক নয়। কিন্তু... কিন্তু কোথায় যে আপনাকে বসতে দি।" অতীন বিব্রত বোধ করে। চৈতালী হেসে ওঠে। বলে: "এত জায়গা থাকতে আর জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না। তা ত পাবেনই না জানি।" বলেই একটা কাগজ বিছিয়ে মেঝেতেই বসে পড়ে। দামী সিল্ক শাড়ীটায় ধুলো লাগে। কিন্তু অতীনের কোন প্রতিবাদই কাজে লাগে না। ধুলো ঝাপা পড়ে।

ব্যারিষ্টার পি. রায় চৌধুরীর ছোট মেয়ে চৈতালী। ওর অবাধ প্রতিপত্তি শুধু বাড়ীতে নয়—সর্বত্র। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা—সেটা ওর একপ্রকার আয়ত্ত হ'য়েছিল। আর এখানেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কী করে!

এমনি ভাবেই কোথা দিয়ে পাঁচ বছর কেটে গেছে। কলেজের শিক্ষা চৈতালীর শেষ হ'য়েছে। কিন্তু অতীনের কাছে শিক্ষার যে অনেক কিছুই বাকী। অতীন শিল্পী হিসেবে যে-পরিমাণ স্বীকৃতি পেয়েছে, সে অনুপাতে পয়সা পায় নি কিছুই। এটা এমন নূতন কিছু নয়। এদেশে বলেই নয়। সব দেশেই কিছুটা এই হাল। অতীন অভাবের তাড়নায় মাঝে মাঝে মুষড়ে পড়েছে। ভেবেছে, এবার একটা চাকুরী জুটিয়ে না-নিলেই নয়। সঙ্কল্প করেছে, সব ছেড়ে দেবে। কিন্তু চৈতালীর সামনে সে সঙ্কল্প কোথায় ভেসে গেছে। চৈতালীর উজ্জ্বলতার কাছে কোন কথাই তার টেকে না।

অতীনকে টেনে এনে চুলে বসিয়ে দেয়। আদেশের সুরে বলে: "আমার পোট্রেটটা আগে শেষ করে দাও। তারপর না হয় ছবি আঁকা ছেড়ে দিও।" অতীনকে তুলি হাতে বসতেই হয়। চৈতালীর চোখে চটুলমী ভরা হাসি। বলে: "জান, একটা সুখবর আছে। তোমার সেই ওয়াটারকালারের ছবিটা আমার বান্ধবী আইরিস্ সনাতন মুখার্জির মেয়ে অনামিকা কিনে নিয়েছে।" দশ টাকার এক গোছা নোট এগিয়ে ধরে অতীনের সামনে। অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে অতীন চৈতালীর মুখের পানে। চৈতালী বলে: "নাও ধর।" অতীন তাড়াতাড়ি বলে ওঠে: "তুমি মিথ্যে কথা বলছ।" ছবি বিক্রি হয় নি। ও টাকা তুমি নিজে থেকে দিচ্ছ।"—কণ্ঠে ওর সঙ্কোচ ফুটে ওঠে। চৈতালী সশব্দে হেসে ওঠে। "অদ্ভুত বুদ্ধি তো তোমার। আমি এত টাকা পাব কোথায়? আর পেলেই বা তোমার ছবি কিনতে যাব কেন। এ ত চেয়েই নিতে পারি। নাও নাও ধর।" বলে টাকাটা ওর হাতে গুঁজে দেয়। অতীনের কোন আপত্তিই কোন দিন টেকে নি। আজও টিকল না। আর এতটা অবিশ্বাস করার আছেই বা কি! তাছাড়া টাকার প্রয়োজনে মানুষ যখন দিশেহারা, তখন এত হিসেবনিকেশ করার অবসর কোথায়!

এমনি, কত ভাবেই না চৈতালী ওকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে। অতীন হয়ত তা বুঝতেই পারে নি। বোঝার চেষ্টাও করে নি। প্রথম প্রথম প্রদর্শনীতে একটা ছবিও বিক্রী হয় নি। অতীন হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছে। চৈতালী বুঝিয়েছে—বিশ্বের অন্যতম শিল্পী 'ভিনসেন্ট ভ্যানগগ্' এর কথা মনে করে। জীবিতকালে কোন স্বীকৃতিই পেল না। তবুও আঁকা ছাড়ে নি। অভাব তারও কম ছিল না অতীন চুপ করে শোনে।

অতীন বোঝে, চৈতালীর এত আবেগ ও উৎসাহের উৎস কোথায়! ওর গভীর ভালবাসা হৃদয়-গভীরে শান্ত ও স্নিগ্ধ। এমনিতে যে উচ্ছলতার চেউ, তা নিজেকে ঢাকার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। অতীন মুখেও চুপ করে থাকে। আর ভাবে—চৈতালী আমার ভিতর যে শিল্পী তাকে ভালবাসে, না আমাকে ভালবাসে! আবার নিজেই একটা সমাধানের পথ খুঁজে পায়—আমার ভেতর শিল্পী আর আমি, দুটোর ত কোন আলাদা সত্তা নেই। আমার ভিতরকার শিল্পীকে বাদ দিয়ে যে আমি সে-আমি আর আমি থাকি কী করে! আর আমায় বাদ দিয়ে আমার ভিতরকার যে শিল্পীর অস্তিত্ব, সে ত কল্পলোকের যে-কোন শিল্পী! এ মানসিক দ্বন্দ্ব অনেকবার তাকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সিদ্ধান্তে এসেছে—আমি, সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ আমি-কেই চৈতালী ভালবাসে। কিন্তু পরক্ষণেই এ সিদ্ধান্ত নস্যাৎ হয়ে গেছে। আবার দ্বন্দ্ব। আবার চৈতালীর কাছে অতীনের দ্বিধা এবং সঙ্কোচ। এত কাছে থেকেও নিজেকে সরিয়ে রেখেছে দূরে। ঘিরে রেখেছে কৃতজ্ঞতার বেড়াজালে। কিন্তু চৈতালীর সহজ সাবলীল ব্যবহার আর অকারণ হাসি ও উচ্ছ্বাসের বন্যায় সে বাঁধ কখন ভেঙ্গে গেছে, তার খোঁজ অতীন নিজেই রাখে না।

পেটের অসহ্য ব্যথা নিয়ে শুয়েছিল অতীন। ডাক্তার অনেক দিন আগেই বলেছে ইলিওসিক্যাল টি. বি.। অপারেশন ছাড়া এর হাত থেকে আর রেহাই নেই। অথচ অপারেশনেই অতীনের যত ভয়। অন্ধকার ঘরে শুয়ে মনে মনে হাসছিল অতীন। অর্থ! পথ্যের ব্যবস্থা নেই, তার আবার চিকিৎসা! এমন সময়ে চৈতালী ঘরে ঢুকল শান্ত পায়ে। অন্ধকারের মধ্যেও অতীন কিছুটা আশার আলো দেখে। মনে মনে ঠিক করে নেয়—আজ আর সঙ্কোচ করলে চলবে না। কিছু টাকা চাইতেই হবে।

দু'দিন ধরে পেটে কিছুই পড়ে নি। ও হয়ত কি ভাববে! ভাবুক। ম্লান হেসে চৈতালীর দিকে দৃষ্টি তুলে ধরে। বসন্তের সবুজ পাতার কাঁপন-ধরার উল্লাস যে-চৈতালীর সারা দেহে, সে আজ হঠাৎ এত শান্ত কেন! প্রখর শীতের পাতা-ঝরার বিষণ্ণতা যেন ওর চোখেমুখে। ও মেয়ের হাসি গেল কোথায়? অতীন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে "কি ব্যাপার কোন অসুখ করেনি ত? বাড়ীর খবর সব ভাল?" চৈতালীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। করুণ বিষণ্ণ হাসি। বলে "অসুখ! না অসুখ করেনি। একটা কথা বলতে এসেছিলাম।" বলেই থেমে যায়। মাথা নীচু করে চুপ করে বসে থাকে। ভাবে কি করে ও কথা শুরু করবে? কি ক'রে বলবে? ভাবতেও লজ্জায় আরক্ত হ'য়ে ওঠে। এত লজ্জা ওর ছিল কোথায়? এতদিনের আয়াস লব্ধ সব স্মার্টনেস ওর গেল কোথায়? অতীন অবাক হয়। আগ্রহভরা কণ্ঠে বলে—"বল, চুপ করে রইলে কেন?" চৈতালী বলে: "তুমি ত জান বাবা বিলেতফেরৎ ডাক্তার এস্. কে. সেনের সঙ্গে বিয়ের কথা তুলেছিলেন। আমি এড়িয়ে গেছি। আজ স্পষ্টভাবেই বাবা তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে আমার মতামত জানতে চাইলেন।" অতীন হেসে বলে: "তা বেশত। মন্দ কি। তুমি রাজী হয়েছ ত? তা শুভদিনটা কবে?" চৈতালী এতক্ষণে ওর মুখের দিকে চেয়ে মাথা নীচু করে নেয়—"আমি রাজী হ'লে কি খুব খুসী হতে?" —চৈতালী একটা পেন্সিল দিয়ে আঁচড় কাঁটতে কাঁটতে প্রশ্ন করে। সে আঁচড় যেন অতীনের বুকে লাগে। কিসের একটা জ্বালা ধরে। মুখে হাসি টেনে: বলে "খুসী না হবার কী আছে। মানে····ভালই ত। বড় ডাক্তার। মোটা টাকা আয় করেন····।" চৈতালী ওকে থামিয়ে দেয়। বলে—"টাকা! টাকাটাই দেখলে? হৃদয়টা কি কিছুই নয়? জীবনে কি ওটার কোন মূল্যই নেই?" অতীন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে: "আছে চৈতালী, আছে। কিন্তু দুমুঠো অন্নসংস্থানের জন্য যাদের সমস্ত কালটা ব্যয় হ'য়ে যায় তাদের হৃদয় বৃত্তির অবসর কোথায়? চৈতালী বলে: "টাকার মোহে আমি তা কোন দিনই পারব না। বাড়ীতে স্পষ্ট বলে এসেছি, তোমায় ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারব না।" একটু থেমে ব্যাকুল হ'য়ে অতীনের হাতখানা ধরে আবার বলে: "বাড়ীতে ফিরে যাবার পথ আমার বন্ধ। তুমিও আমায় ফিরিয়ে দেবে না ত?" অসহ্য যন্ত্রণায় অতীনের বুকটা মুষড়ে ওঠে। সেই সঙ্গে পেটের ব্যথাটাও। অতীন ভীত হ'য়ে বলে: "না, না, চৈতালী তা কোন মতেই হ'তে পারে না।" গলাটা ব্যথায় ধরে যায়। চৈতালী আর্ত্ত কণ্ঠে বলে: "বল অতীন, বল। তুমি কি আমায় কোন দিনই ভালবাসতে পার নি?" অতীন শান্ত কণ্ঠে বলে: "বিয়ে করার স্পর্ধা কোন দিনই করি নি।" চৈতালী বলে: "নিজেকে এত ছোট, এত নিঃস্ব ভাব কেন? মানুষের আসল পরিচয় তার প্রতিভায়, অন্য কিছুতে নয়। অতীন ওকে থামিয়ে দেয়—"ওসব কথা থাক চৈতালী" ক্ষণিকের মোহে একটা ভুল ক'রে শেষে জীবন ভোর মাশুল গুনতে হবে। তুমি ফিরে যাও চৈতালী।" গলার ক্ষীণ স্বরটা কেঁপে যায়। অনাহারের দুর্বলতা, না হৃদয়ের! অতীন নিজেকে শক্ত করে নেয়। স্পষ্টভাবেই বলে: "একটা কথা তোমায় বলা হয় নি। কলেজের সহপাঠিনী বীণা বোসের কথা মনে আছে! ওকেই এতদিন ভালবেসেছি। আর বিয়ে ওকেই করব।"—কথাটা কোন মতে শেষ করে অতীন পাশ ফেরে। চৈতালী নিজের কাণকেও বিশ্বাস করতে পারে না। কান্নায় ওর কথা যেন লুটিয়ে পড়ে—"না না, এ হতে পারে না। এতকাল তুমিই ত ওর কত নিন্দে করেছ। ওর কথা শুনলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। প্রফেসর বিশ্বাসের সঙ্গে ওর কেলেঙ্কারীর কথা কে না জানে। না না অতীন, তুমি এমনি ভাবে নিজেকে নিঃস্ব হ'তে দিও না।" বুকের মাঝের এতক্ষণের জমাটবাধা কান্নাকে আর বুঝি ধরে রাখতে পারে না। যে চোখেমুখে বিদ্যুতের ঝিলিক দিত, আজ সেখানে বর্ষার কালো মেঘ দু' চোখ ছাপিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরে পড়ে। অতীন অস্ফুট স্বরে বলে: "তুমি যা দিয়েছ তার বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কী দিতে পারি। তুমি ফিরে যাও চৈতালী। আর কিছুই বলা হয় না। অসহ্য ব্যথায় গলাটা রুদ্ধ হ'য়ে যায়।

চৈতালীর মুখে একসঙ্গে অনেক কথাই এসে পড়ে। কিন্তু কিছুই বলা হয় না। ও যেন বোবা হ'য়ে গেছে। চৈতালী আস্তে আস্তে শান্ত পায়ে বেরিয়ে যায়—ঠিক যেমনি ভাবে ও আজ এসেছিল। ও এগিয়ে যায়। পিছনে যে ওর সমস্ত সত্তাই পড়ে থাকে। তবুও শূন্য দেহটা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। কোন্ পথে কোথায় যেতে হবে, তাও যেন ভুলে গেছে। ভুলে গেছে নিজের অস্তিত্বের কথা।

চৈতালী বেরিয়ে যেতেই অতীনের সব দৃঢ়তা কোথায় হারিয়ে যায়। পৌরুষের বাঁধ ভেঙে কান্নার বন্যা জাগে। ভাবে, ফিরিয়ে নিয়ে আসে চৈতালীকে। সব কথা খুলে বলে। "আমি যে নিঃস্ব। তোমার ঋণ যদি জীবন দিয়েও শোধ করতে পারতাম! কিন্তু জীবনটাও যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে জীর্ণ। অনাহার অত্যাচারেযে রোগ হয়েছে তা ত সারবার নয়। তুমিত জান না, আমি যে তোমায় ছাড়া আর কাউকে কোনদিনই ভালবাসতে পারি নি। আর পারবও না। আর সে ভালবাসা পূর্ণ করতে গিয়ে তোমায় পাবার লোভে তোমার জীবনটা দুর্বিসহ করতে চাই না। তুমি তাতে সুখী কিছুতেই হ'বে না। আজকের ক্ষণিকের বিয়োগব্যথার কান্নাটা যে তোমায় জীবনভোর কাঁদতে হবে। এ আমি সইব কেমন করে? তাতে আমার পাপের বোঝা বাড়বে। সে পাপ ক্ষালনের কোন পথই আর থাকবে না। আমায় ভুল বুঝ না চৈতালী।"—এ কথা ওকে আর বলা হ'ল না। শুধু নিজের হাতে আঁকা চৈতালীর পোর্ট্রেটটা বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় লুটিয়ে পড়ল বিছানায়। মনের উপরিতলে কান্নার অশান্ত ঢেউটা যেমনি অবশেষে মনের গভীরে শান্ত স্নিগ্ধতার মাঝে একটা তৃপ্তি খুঁজে পেল। হয়ত বা আত্মতৃপ্তি।

চৈতালী কোথাও আর সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। দিশেহারার মত চারদিকে ছুটোছুটি ক'রে শেষটায় বাবাকে রাজী করিয়ে প্যারিসে আরো পড়াশুনো করার জন্য সমুদ্র পাড়ি দেয়। অতীন কিছুই জানে না। খবর নিতেও সাহস পায় না।

সাগর পাড়ি দিয়েও চৈতালীর নিস্তার নেই। প্যারীতে আর একজন বাঙালী ছেলে ওরই সঙ্গে পড়ে। এর মধ্যে তার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয় হ'য়েছে। চৈতালীকে তার খুবই ভাল লাগে। কিন্তু চৈতালী তার মধ্যে অতীনকে খুঁজে দেখতে চায়। বাঁচতে ত হ'বে। কিন্তু একজনের মধ্যে আর একজনের সবটা কি আর খুঁজে পাওয়া যায়! হয়ত অতীনের শিল্পীকে তার ভেতর খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ অতীনকে নয়। সে কি কখনো হয়!

আর কোন পথ নেই। অবশেষে অতীন অপারেশন করাতে রাজী হ'য়েছে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। এরই একটা বেডে অতীন জায়গা পেয়েছিল বহু তদ্বির তদারকের পর। পেটে বিরাট অপারেশন। বন্যার বীজাণু ধরা ইন্টেষ্টাইনের কিছু অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। আজ ওকে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। নীরোগ সুস্থ দেহের সার্টিফিকেট। অতীন কেন, ডাক্তাররাও কিছুটা হতাশ হ'য়ে পড়েছিল বৈকি ওর জীবন সম্বন্ধে। এ সাফল্যে আজ তাই অতীনের সঙ্গে ওরাও কত খুশী। অতীন ভাবে: সব চেয়ে বেশী খুসী হবে চৈতালী যখন শুনবে। যখন দেখবে ওরই দরজায় ছুটে গিয়েছি ওকে ফিরিয়ে আনতে: যেমনি ভাবে ও এসেছিল একদিন নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে এক বছর আগে সেদিনকার কথা ভাবতেও কষ্ট হয় কি আঘাতটাই না পেয়েছিল। নিজের মনে অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে অতীন: আমার যে তখন অন্য কোন উপায়ই ছিল না। তখন কি বাঁচার এতটুকুও আশা ছিল। অতীন কল্পনা করে চৈতালীর জলভরা চোখে হাসির ঝিলিক। যেন শরতের এক পশলা বৃষ্টির পর মেঘ-ভাঙা রোদ।

বাড়ী ফিরে সেদিনই বিকেলে চৈতালীর বাড়ী যাবার সময় ঠিক করে নেয় মনে মনে। এতদিনের বন্ধ ঘরটায় পুরু ধুলো জমে গেছে। চৈতালীর পোর্ট্রেটটাও ধুলোয় বিবর্ণ দেখাচ্ছে। সযত্নে অতীন ওটা তুলে নেয়। পরিষ্কার করে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখে। এতক্ষণে ওর নজরে পড়ে। মেঝেয় পড়ে আছে একটা চিঠি। তাড়াতাড়ি তুলে নেয়।

ইস, ওরই চিঠি। এক নজরেই চিনতে পারে। এ ত চৈতালীর হাতের লেখা। আগ্রহভরে খুলে ধরে চিঠিটা—

প্যারী
জানুয়ারী '৫৭

অতীনদা,

অনেক দিন পর তোমায় চিঠি লিখছি। হয়ত তুমি অবাক হবে—কি করে আমি প্যারী এলাম। এখন ও-কথা থাক। হয়ত তুমি শেষ দিনের কথা স্মরণ করে মনে মনে পৌরুষের গর্ব অনুভব করছ। আর সেই সঙ্গে মনটাও ভারী হ'য়ে উঠছে আমার কোন উপদ্রবের আশঙ্কায়। ভয় পেও না। এর কোনটাই সত্য বা চিরস্থায়ী নয়।

আমার পরিচয়ের আগের 'তুমি' আর এই অতি-পরিচিত 'তুমি'র মধ্যে এতটা অমিল হবে, তা কল্পনাও করি নি। তা হলে সেদিন অহেতুক রাগের মনে আঘাত দিয়ে তোমার কথা স্মরণ করে নিজেকে এত ছোট করতাম না হয়তো। যাক্, যা হয়ে গেছে তা বিগত।

তোমার স্মৃতির অতলে এতদিন আমি হারিয়ে গেছি জানি। তাই আজ সাহস করে তোমার কাছে যে পোর্ট্রেটটা আছে চেয়ে নিচ্ছি। কারণ, ভেবে দেখেছি আমার আমিত্ব-টুকুর চিহ্ন হ'য়ে ওটা কেন এখনও তোমার ও বাবার মাঝে মূল্যহীন হয়ে পড়ে থাকবে! তার চেয়ে নিজেই ওটা নিজের কাছে ফিরিয়ে নিতে চাইছি।

হ্যাঁ একটা সুখবর দিতে ভুলে গেছি। নিজের মনের সঙ্গে অনেক দ্বন্দ্ব করেছি—তুমুল যুদ্ধ করেছি। এখন এই সিদ্ধান্তে এসেছি—আমায় বাঁচতে হবে। আমার আমিত্বকে আমি এভাবে আত্মহত্যা করতে দেব না। তুমিও এতে নিশ্চয়ই খুব খুসী হবে। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। ইতি—

—চৈতালী মজুমদার

আঃ, মজুমদার!—চৈতালি.....মজুমদার!

ধর্মরাজ অশোক — শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

গান্ধার থেকে সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ অশোকের কীর্তিতেই ছেয়ে আছে; অশোক ও ভারতবর্ষ এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে আছে যে, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে বোঝাবার উপায় নেই। সমগ্র জম্বুদ্বীপের উপর যাঁর এরকম কালজয়ী প্রভাব, ভারতীয় সাহিত্যে তাঁর ঐতিহ্যের ও উত্তরাধিকারের সন্ধান করতে গেলে বিস্মিত হতে হয়। দেখা যায়, অশোকমহিমা কীর্তনে বৌদ্ধসাহিত্য যেমন অতিমুখরিত ব্রাহ্মণ্যসাহিত্য তেমনি অতিনীরব; এক দিকে বৌদ্ধসমাজ অশোকের বৌদ্ধত্ব তথা তাঁর কীর্তিকে অতিরঞ্জিত করে জনচিত্তে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর, আর অপর দিকে ব্রাহ্মণ্যসমাজ যে-কোনো উপায়ে, প্রধানতঃ নীরবতার দ্বারা, সে প্রয়াসকে প্রতিহত করতে নিত্যসচেষ্ট।

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দুই বিপরীত দিক্ থেকে অশোকচরিত্রের মহিমাকে খর্ব করেছে। একদিকে, সিংহল থেকে মঙ্গোলিয়া এবং তিব্বত থেকে শ্যামদেশ পর্যন্ত সমগ্র বৌদ্ধ জগতে অশোকের মহিমা অতিকৃত হয়ে বহু বিচিত্র ও অপ্রাকৃত কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে। পরবর্তী কালের ভারতীয় কিংবদন্তীতে ও আরব্য উপন্যাসে বিক্রমাদিত্য ও হারুন-অল রসিদের যে স্থান, বৌদ্ধ কিংবদন্তী ও সাহিত্যে ধর্ম শোকেরও সেরূপ অতিমহিমান্বিত স্থান। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ্য সমাজের বৌদ্ধবিদ্বেষ অশোকের মহিমাকে ভারতীয় স্মৃতি থেকে চিরকালের জন্য অবলুপ্ত করবার প্রয়াসে নিরন্তর প্রবৃত্ত ছিল। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'

দু'টি কবিতা

॥ অমলেন্দু ঘোষ ॥

মা'র কাছে ॥

মাগো,—
ইচ্ছে করে শুধু
অকারণে গেয়ে গেয়ে
কেঁদে কেঁদে
বেড়াই ঘুরে।
এছাড়া আমার কিছুতেই
যেন তোমার কাছে
কিছুই বলা হয়না ॥

অবলম্বন ॥

খেলতে খেলতে মা বাপ-মরা ছেলেটা
রবারের ফুটো বলটা হাতে
ঘুমিয়েই পড়েছিল।
কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেই বুঝিবা
জেগে উঠল—
: এবার বলটা শক্ত মুঠিতে নিয়ে
শুয়ে পড়লো।

প্রিয়তম

॥ সুপ্রিয় রায় ॥

শূন্যে ছড়ালে সৃষ্টির কৌতিকা
: শিউলি ছড়ালে কেন অকারণ
তরুছায়াশায়ী নীড়
কেন মরীচিকা রজত শরীর
হরিণ অন্বেষণ
কেন অকারণ মাদক পাবকে
বসন্ত বিদারণ
সহস্রকোটি সমর বিজয়ী
হে মোর ধন্য বীর :
'কৃচ্ছ্রসাধনে স্বাদ আনো
দেহে মন করো ধীর।'
দুবারেই শ্বেত ওষ্ঠচূড়ায় চাঁদের সম্ভাষণ
তোমারে দেখেছি মনের ছায়ায়
ভাস্বর বিস্ময়—
তোমারে চিনেছি অতিপ্রিয় তুমি
নিদ্রার সঞ্চয় :
অতি প্রিয় তুমি, প্রিয় ও মধুর
হে মধুর সঙ্গম
তোমারে পেয়েছি আকাশের নীড়ে
যৌবন মন্থন।

তুমি চলে গেলে নয়নে ঘনাল পার্থের প্রার্থনা
: আমার ছায়ায় ঝরেছে শিশির
মরণ কি আজো দূর,
সঙ্গমসিক্তপ্রাজ্ঞ নিশার
বনান্তরালে পারে
হে রাজপুত্র, তিমিরের রেণু
ঢেকেছে স্বপ্নপুর :
অঙ্গে আমার সপ্তস্বরণ ঈপ্সার সিন্ধুর
শিবিরেতে পুনঃ ঝড়-উড়ে আসা
রাত্রির পরপারে—
মাঠের ধানেতে বেজে বেজে গেছে
পক্ষীরাজের ক্ষুর॥

আমাকে ঘিরে

॥ সামসুল হক ॥

রাত্রি নামে ঘন বন-তুলসীর কোলে।
কা'কে ডাকে : এসো, এইখানে আমাদের সুর,
তোমাদের নাচ হবে। নাচ শেষ হ'লে
নীরবে কাঁদতে পারো, খুলে পায়ের নূপুর।

বৃষ্টি এলো।

চুপ্! ওই শোন, নাচ-গান সুরু হোল।
জানালায় কান পাতো, বুক ভ'রে শুনে নাও।
চোখে জল কেন! বলো, কিসে টলোমলো
তোমার হৃদয়! সুরের বেদনা হ'তে চাও?

একদিন দুই সখী উপরোক্ত কথা
শেষ ক'রে, নাচ-গান-কান্নায় মশ্‌গুল
হ'লে, এক নারী কা'র ডাকে পেয়ে ব্যথা
জানালায় এসেছিল, নিয়ে অশ্রুর বকুল।

ভোর বেলা ঘুম ভাঙে। সোনা ব্যাঙ ঘনে
ডাকে। সারারাত এতো জল—ভিজে কই মাটি?
কলমীলতার ঝাড় পুকুরের কোনে
স্থির দেখে, নতমুখে পুনঃ আলপথে হাঁটি॥

বিপ্লব যুগের অবিস্মরণীয় কাহিনী

দুই

শোভনা নন্দী

সেটা ছিল ১৯০৭ সালের কথা। সেবার আমরা কলকাতায় এসে আমার পিতৃবন্ধু ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের সুকিয়া ষ্ট্রীটে গিয়ে কয়দিন থেকে দেশবন্ধু ও তাঁর পত্নী বাসন্তী দিদির সাদর আহ্বানে তাঁদের রসা রোডের বাড়ীতে বর্ত্তমান চিত্তরঞ্জন সেবাসদন গেলাম। পল্লীগ্রামের খোলা-মেলা বাড়ীতে অভ্যস্ত ছেলেমেয়েরা উত্তর কলকাতা থেকে এ বাড়ীতে এসে নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। সে সব দিনের কথা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে—সে সময় বাসন্তীদিদি ও চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের কাছে যে আন্তরিক স্নেহযত্ন পেয়েছি তার বুঝি তুলনা নেই।

স্বদেশী আন্দোলনের অব্যবহিত পরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (National Council of Education) অধীনে বাঙ্গালার যে কয়েক জায়গায় জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় কুমিল্লা তাদের অন্যতম। উনি এখানকারি হেড্‌মাষ্টার নিযুক্ত হন। এটা ছিল একটা বন্ধের সময়, কথা ছিল কলকাতায় কদিন থেকে আমার এক আত্মীয়ের কাছে কাশী যাব কিন্তু এক অতর্কিত ঘটনায় সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে গেল। তার বিবৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না কারণ পরবর্ত্তী কাহিনীর সঙ্গে তার যোগ আছে।

সেদিন বিকালে উনি সুকিয়া ষ্ট্রীটে যাবেন বলে বের হন কিন্তু রাত্রের আহারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায় তবু তাঁর দেখা নাই। আমি অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলাম। রাত ক্রমে বেড়েই চল্লো তবু ফেরেন না। চিত্তবাবু ও বাসন্তী দিদিরও উদ্বেগের সীমা নেই, বারবার খবর নিচ্ছেন। তারপর রাত প্রায় বারটায় উনি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলেন, চেহারা দেখে ত আমি ভয়ে বিস্ময়ে শুধু চেয়ে রইলাম। সে কী উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, কী গম্ভীর মূর্ত্তি, চুল উস্কো-খুস্কো পাঞ্জাবীর আস্তিন ও হাঁটুর কাছের ধুতি ছেঁড়া! সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে বুঝতে দেরী হ'ল না। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে। উত্তর পেলাম না। কিছু পরে বল্লেন তুমি শুতে যাও, তারপর অন্ধকার ঘরে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত পায়চারী করতে লাগলেন! সেই শান্ত ধীর হাসিখুসী মানুষটাকে কিসে এত বিচলিত করেছে ভেবে কোনও কূলকিনারা পাচ্ছি না। তারপর রাত প্রায় তিনটায় আমায় ডেকে যা বল্লেন তা এই :—এখান থেকে বের হয়ে বাবার বাসা থেকে ভাই নিরঞ্জন ও প্রথম চাঁদপুর বন্দরে লুসিটোনিয়া জাহাজ ডুবিতে মৃত সোদরপ্রতিম ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে সুকিয়া ষ্ট্রীট যান। ফিরতি পথে এসপ্ল্যানেডের ট্রামে যখন উঠ্‌লেন তখন দ্বিতীয় শ্রেণী একদম খালি প্রথম শ্রেণীতে ৩।৪ জন বাঙ্গালী ও একজন সায়েব ছিল। আজকালের মত ভীড় সেদিনে ছিল কল্পনারও অতীত। যাক্ এরা সামনের বেঞ্চে বসলেন ইন্দুর পিছনেই ছিল সায়েব। হঠাৎ কি খেয়াল কে জানে বৃটিশ পুঙ্গবটী তাঁর দুটী পা ইন্দুর দু কাঁধের পাশ দিয়ে তুলে দিল। এই অভদ্রোচিত ব্যবহারে মুহূর্ত্তে ই এঁদের রক্ত মাথায় চড়ে গেল! ইন্দু পা নামাতে বলতে সে উদ্ধতভাবে উত্তর করলো, তোমার অসুবিধা হয় অন্যত্র সরে যাও এ কথা শোনা মাত্র উনি ও ইন্দু উঠে গিয়ে সায়েবের পা বেঞ্চে থেকে নামিয়ে দেওয়ার সঙ্গেই সায়েব ওঁর নাক লক্ষ্য করে ঘুষি মারে। সৌভাগ্যক্রমে তেমন জোরে না লাগলেও তার উত্তর দিতে দেরী হলনা উভয় পক্ষেই ঘুষাঘুষি চল্লো। নেটিভদের গ্রীবা ফাটাতেই এ জাত সেদিনে অভ্যস্ত ছিল, ফিরে মার খাওয়া কি সহ্য (Revolver) বার হয়! সায়েব ক্রোধে অন্ধ হয়ে I will shoot you বলার সঙ্গে সঙ্গেই এক রিভলভার করলো। এই অতর্কিত ব্যাপারে ওঁরা ত মরিয়া হয়ে উঠ্‌লেন। সায়েবকে মাটিতে ফেলে কীল চড় লাথির মধ্যে অস্ত্রটী কেড়ে নিয়ে তাকে বেঞ্চির নীচে ঠেলে দিলেন।

এক আধটুক রক্তপাত যে হয়েছে তা টের পেলেন কিন্তু এ ছাড়া ওঁদের জীবন নিয়ে ফেরার আর কোনও পথ ছিল না। দেখা গেল সাহেব মহাপ্রভু মদে চুর হয়েছেন তাই কাবু করতে বেশী বেগ পেতে হলনা। স্বরূপে থাকলে এ রকম ব্যাপার হতো ও না হয়ত; এ সময়ে ওঁদের খেয়াল হল ট্রাম থেমে আছে আর গাড়ীতে কেউ নেই, সবাই হয়ত প্রাণ ভয়ে পালিয়েছে। তখন ট্রামের আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে ময়দানের মধ্য দিয়ে রওনা হলেন।

সব শুনে আমি যেন খানিক সম্বিত হারিয়ে ফেল্লাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম সেটা কোথায়। বল্লেন, আমার পকেটে, বলে বের করে আনলেন। মানুষ-মারা এ অস্ত্রের কথা শুনেছি, অনেক দূর থেকে পুলিশ অফিসারের কোমরে ঝুলতে দেখেছি কিন্তু এত কাছে থেকে এর আগে এ মারণাস্ত্রটী আর দেখি নাই। কী সর্ব্বনাশই আজ হ'ত! ভেবে হৃদকম্প উপস্থিত হল। তারপর উভয়ের মনের মধ্যে সে কী আলোড়ন! এর পরিণতি কি, দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি সহজে হবে না। সাহেব মারাতেই ত এর পরিসমাপ্তি হয়নি, এটারই বা কি করা যায়, চিত্তবাবুকেও বিপদে ফেলা ইত্যাদি ভাবনার কূল কিনারা নেই, অথচ ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে সুষ্ঠু মীমাংসার কোনও পথ দেখছিনা। বাকী রাতটুকু বিনিদ্র নয়নে শুধু আকাশের দিকে চেয়েই কাটল। সকালে কাগজের খোঁজ করতে গিয়ে মনটা আরও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। সে দিনে আমরা মার খেতেই বেশী অভ্যস্ত ছিলাম। অপমান অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে ভুলেই গিয়েছিলাম। এ রকম ব্যাপার কদাচিৎই ঘটতো। দেখলাম সংবাদপত্র মহলে ভীষণ উত্তেজনা! তিনটী বাঙ্গালী যুবকের দুঃসাহসিকতা—শিরোনামা দিয়ে বড় বড় হরফে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ, কোথাও বা কিছুটা অতিরঞ্জিতও। কারুর লেখায় গোপন সমর্থন, যাহাবার আভাস, আবার কেউ বা যুব-সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে কাঁদুনী গেয়েছেন। মোট কথা হুলস্থুল ব্যাপার! কাগজে দেখলাম সাহেবটী বড় কেউকেটা নয় এক চা বাগানের মালিক।

এর পর চিত্তবাবুকে ব্যাপারটা বলা অপরিহার্য্য বলেই মনে হল। খবর তিনি আগেই পেয়েছিলেন। কে জানত যে এর নায়ক তাঁরই ঘরে। এখন ওঁর মুখে বিস্তারিত সব শুনে অত্যন্ত চিন্তাকুল হয়ে পড়লেন। দেশবন্ধু ছিলেন সেই প্রকৃতির মানুষ যাঁরা পরের বিপদ নিজের ব'লে বুক পেতে নিতে ক্ষণমাত্রও দ্বিধা করেন না। মানুষের যা করা সম্ভব তিনি তা আমাদের জন্য করবেন এ বিশ্বাস ও নির্ভরতা আমাদের ছিল। তাই তাঁকে জানিয়ে এত বিপদেও যেন অনেকটা স্বস্তি পেলাম। কিছুক্ষণ পর চিত্তবাবু আমায় বল্লেন, এ ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর, সহজে যে রেহাই দেবে না সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত। এর মধ্যেই হয়ত পুলিশের তোড়জোড় সুরু হয়েছে। আরোহীদের কেউ হয়ত মুখ চিনেও বা রেখেছে। অসম্ভব ত নয়, অতএব যত শীঘ্র সম্ভব কলকাতা ছাড়া দরকার।

"কালই অন্ধকার থাকতে বাড়ী থেকে রওনা হয়ে চাট্‌গাঁ মেলে কুমিল্লা চলে যাও তোমরা। এ ছাড়া এখন আর ত কিছু করার নেই। Revolver সম্বন্ধে মনে হয় কোনও নির্ভরযোগ্য মেয়ের কাছে যদি সম্প্রতি রেখে দেওয়া যায় তাহলে ভবিষ্যতের ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা উপায় চিন্তা করার সময় পাওয়া যাবে। এ বাড়ীতে রাখা ত নিরাপদ নয়, কেউ যে পিছু নেয়নি তাই বা কে জানে। সাবধানের ত মার নেই।" তখনও রাজনৈতিক আন্দোলনে মেয়েরা প্রকাশ্যভাবে অংশ গ্রহণ করে নাই। বিদেশী শাসকের চোখে তারা তখনও ছিল অশিক্ষিত অবলা অতএব সন্দেহের অতীত।

অনেক ভেবেচিন্তে এই মারণাস্ত্রটী যোন লীলার কাছে রেখে আসাই স্থির করে অতি সাবধানে কাপড়ের তলে লুকিয়ে নিয়ে রওনা হলাম। সে তখন বাবার কাছে, বাড়ীটা ছিল হাজরা পার্কের বিপরীত দিকে, এইটুকু পথই যে কী ভাবে গিয়েছি আজও তা ভুলি নাই। সে কী ভয়! পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, হাত পা ঠাণ্ডা-হিম, বুক ধড় ফড় করছে, মনে হচ্ছে পথচারীরা সবাই বুঝি সন্দেহদৃষ্টিতে আমায় দেখছে! গোপনীয়তা সম্বন্ধে লীলাকে বিশেষ সতর্ক করে বলে এলাম চিত্তবাবু শীঘ্রই একটা ব্যবস্থা

করবেন। লীলা ছিল আমাদের বোনের মধ্যে সবচেয়ে ভীতু, কিন্তু এখন লক্ষ্য করলাম ভয়ের লেশ মাত্রও নেই বরং উল্লসিত। সেদিন যথেষ্ট আশ্চর্য্য বোধ করলেও পরে এর অর্থ বুঝেছিলাম।

উল্লাসদের পরিবারের সঙ্গে আমার পিতৃপরিবারের পরিচয় বহু দিনের। আমার শৈশবে এই উভয় পরিবার এক বাড়ীতে ছিলেন। সে সময় মা ও সোনাপিসির (উল্লাসের মা) মধ্যে যে সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে বহু দিনের ব্যবধানেও তা অক্ষুণ্ণ ছিল; তারপর আমার বিবাহসূত্রে সেই পুরাতন বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার পরিণত হয়। উল্লাসের জীবনে যে বিপ্লব দেখা গিয়াছিল তার মধ্যে যে বাবার প্রভাব অনেকখানি তা আগেই বলেছি। এ বাড়ীর ছোট বড় সবাই উল্লাসের পরম ভক্ত হয়ে উঠেছিল।

লীলা তখন স্কুলের পড়া শেষ করে বোর্ডিং থেকে বাড়ীতে এসেছে। সে ছিল সুকণ্ঠী, উল্লাসের গান ও বাজনার দক্ষতা সহজেই তাকে মুগ্ধ করলো এবং গানের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠ্‌ল পরে তা গভীর প্রেমে পরিণত হয়। উল্লাসের চিন্তাধারা ও জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে লীলার মধ্যেও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা দিল। সুখস্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয় সৌখীন দুর্ব্বলচেতা লীলা উল্লাসের সান্নিধ্যে এসে তেজস্বিনী সাহসিকা নারীতে পরিণত হয়, তারপর এক বিপ্লব এসে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। পরজীবনে কী অসাধারণ ত্যাগ ও আত্ম-বিলুপ্তির পথে এই নিষ্কাম প্রেমকে উল্লাস সার্থক করে তুলেছে সে অপূর্ব্ব প্রেম-কথা বিধাতা সুযোগ দিলে পরে বলার ইচ্ছা রইলো।

যাক্ পরের দিন কুমিল্লা রওনা হলাম। হঠাৎ উনি বল্লেন পাশের কামরায় সেই মহাপ্রভু! দেখলাম মার কিছু কম হয়নি, কপালে ব্যাণ্ডেজ রয়েছে চোখ মুখ ফোলা। একটা বড় ষ্টেশনে ২।৩ বার আমাদের সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি করলো আমি ত ভয়ে অস্থির! শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল ভয় আমার অহেতুকই। রিভলভারটার কি ব্যবস্থা হল জানার জন্য আমাদের উভয়ের মনই বিশেষ উদ্‌গ্রীব, কিন্তু চিঠি দিয়ে ত খবর নেওয়া যায় না। ইতিমধ্যে বাংলা দেশে চারদিক দিয়ে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল। ক্ষুদিরামের ফাঁসি হ'ল, মুরারিপুকুরের বিরাট দল ধরা পড়লো—সারা বাংলা জুড়ে ধর পাকড়। মুরারীপুকুর মামলা আদালতে উঠ্‌ল হাজার Exhibit এলো। সেই সঙ্গে একদিন সেই পিস্তলও প্রদর্শিত ও সাহেব কর্ত্তৃক সনাক্তকৃত হয়। পরে লীলার কাছ থেকে জেনেছিলাম উল্লাস এটা নিয়ে গিয়েছিল। উল্লাস যে লীলাকেও তার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে ছিল তা বুঝতে দেরী হ'ল না।

আশ্চর্য্য যে এই ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গেই বাবার বাসার সামনে দুটী অপরিচিত লোককে সামনে পালা ক্রমে পাহারা করতে দেখা গেল। বাবা এ ব্যাপারটা আগেই শুনেছিলেন এখন এই সন্দেহভাজন লোক দুটীকে দেখে স্বতঃই মনে হ'ল যে নিরঞ্জনের পেছনেই গোয়েন্দা লেগেছে! ইন্দু কিন্তু এই উৎপাতের থেকে রেহাই পেয়েছিল, আর ওর কথা আর কি বলব জীবনের বেশী সময়ই ওর পুলিশ surveilance কেটেছে বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। দুটী করে লোক একটী হিন্দু ও অন্যটী মুসলমান প্রকাশ্য ভাবে ওঁর পেছনে ছিল। ওরা সরকারের বেতনভুক্ত গোয়েন্দা বটে কিন্তু হয়ে গিয়েছিল আমাদের ঘরের লোক। এমন কি মুসলমানটী বাবুর শিকারে উৎসাহ দেখে বেলে হাঁস শিকার করার জন্য নিজের বন্দুকটী এনে দেয়। বাবুর ওপর তার যে কী অগাধ বিশ্বাস ছিল এ তারই প্রমাণ। পরে আমাদেরই এক প্রজা দফাদার মহকুমা সদরে গিয়ে খবর দেওয়াতে বেচারার চাকরী যায়! আমার ছোট ছেলে ও দ্বিতীয় মেয়ে এদের কাছেই মানুষ, কোথাও গেলে মোট ঘাট বইবার জন্য কুলী লাগত না। গোপনে কত সময় সাবধান করে দিত, শত্রু হয়ে এসে মিত্র হয়ে গেল—এরা আমায় মা বলে ডাকত। ওঁর চাকরী থাকরী করা অসম্ভব হয়ে পড়ে শেষে বাধ্য হয়ে একদিন গিয়ে তদানীন্তন Inspector-General of Police, Bengal হ্যাচিনসনের সঙ্গে উনি দেখা পর্য্যন্ত করেছিলেন।

মজঃফরপুরে কিংসফোর্ড হত্যা চেষ্টার ৮।১০ দিন আগে একদিন হঠাৎ উল্লাস আমাদের বাসায় উপস্থিত হ'ল। বহুদিন পর তাকে দেখে খুব উল্লসিত হয়ে উঠ্‌লাম কিন্তু তার কাছে এগুতে যেন ভয় হ'ল। আমাদের মধ্যে যেন সহস্র যোজন ব্যবধান, এমনি একটা ভয়াবহ গাম্ভীর্য্যের বর্ম্ম দিয়ে সে নিজেকে ঘিরে রেখেছে। হাঁ, না ছাড়া কথা নেই; শরীরটা আগের থেকে অনেকটা কৃশ যেন তপশ্চরণ-ক্লিষ্ট তরুণ তাপস মূর্ত্তি! খাওয়া দাওয়া নাই বল্লেই হয়, কতটুকু ঘুমায় বুঝতে পারিনা, রাতদিন দু' হাত পিছনে রেখে পায়চারীর বিরাম নেই। রকম সকম দেখে ভয় হ'ত বুঝি বা পাগল হয়ে যাচ্ছে।

সোনাপিসি তখন আমার কাছে। ছেলের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে থাকেন আর সেই স্বল্পভাষী মানুষটীর বড় বড় দুটী চোখ জলে ভরে আসে!

শুনেছি শিশুকাল থেকে উল্লাসের বড়দা (আমার স্বামী) ছিলেন উল্লাসের আদর্শ। উনিও তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ভ্রাতৃপ্রেম নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। দুজনে এক সঙ্গে হলেই খাওয়া দাওয়া ভুলে গিয়ে অবিরাম গল্প আলোচনা চলতো আর আজ তাঁর সঙ্গেও কথা নেই। উল্লাসের এবারকার এ অস্থিরতা ওঁর মত শান্ত মানুষকেও খুব বিচলিত করলো। আমার অশান্তির শেষ নাই, কাকেই বা কি বলি, উনি একটুতেই বিরক্ত হয়ে ওঠেন, অন্য দিকে সোনাপিসির মুখের দিকে তাকাতে পাচ্ছি না—এমনি বিষাদ-মলিন। আমাদের আনন্দমুখর সংসার যেন শোকাচ্ছন্ন, কী এক অনাগত বিপদাশঙ্কায় সকলে ভীত সন্ত্রস্ত! এই ভাবে দিন কাটছে এমন সময় একদিন কলকাতার ডাক এলো, খবরের কাগজ খুলে দেখি সে কী ভয়াবহ সংবাদ! এ রকম বহু ব্যাপারের সঙ্গে আজ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ পরিচিত কিন্তু সেদিনে এ ঘটনায় সারা দেশ জুড়ে যে আলোড়ন ও আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল সে আজও মনে শিহরণ আনে। শুধু যে প্রকৃত অপরাধীই তার কৃতকর্ম্মের জন্য দণ্ডিত হ'ত তা নয় তার পরিচিত বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন এক কথায় গোষ্ঠির যে যেখানে থাকত বিনা বিচারে তাদের ভাগ্যে কী লাঞ্ছনা উৎপীড়নই না হত! বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হত, চাকুরের চাকুরী যেত, গরীবের অন্নসংস্থানের পথ বন্ধ হ'ত। রাজ্য হারাবার ভয়ে বিদেশী শাসকদল দিশাহারা হয়ে প্রচণ্ড দমননীতি প্রয়োগ করত। কাকে সঙ্গে কথা বলতে ভয় হ'ত—বন্ধুই হয়ত স্পাই। পুলিশের ভয়ে নিতান্ত আপন জনের সম্পর্কও অস্বীকৃত হতে দেখেছি। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীর প্রতি মনে মনে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে ওদের পরিবারের কথা ভেবে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠ্‌লো; তখনও ত জানি না যে আমাদের মাথার ওপরও খড়্গ ঝুলছে। নিম্নকণ্ঠে নানা সমালোচনা চলছে কিন্তু উল্লাস যথাপূর্ব্বম্ তথা পরম্ কোনও কথা নেই, খালি লক্ষ্য করলাম তার সেই পায়চারী দ্রুত হতে দ্রুততর হয়ে উঠেছে! খেতে ডাকলাম উত্তরও দিল না। এ ত নূতন নয় কিন্তু আশ্চর্য্য হলাম যখন সন্ধ্যায় কলকাতার গাড়ীর সময়ের একটু আগে আমায় বল্লে 'বৌঠান চল্লাম' বলেই সদরের দিকে রওনা হল। সোনাপিসি এ কথা শুনে ছুটে গিয়ে বল্লেন, বাবা, বাসি মুখে যাস না, কিছু মুখে দিয়ে যা। মার ডাকে মুহূর্ত্তের জন্য থম্‌কে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়ে চলে গেল! সে দৃষ্টি যেমন গভীর তেমনি করুণ! এতদিনের সন্দেহ আশঙ্কা সব মুহূর্ত্তে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল—উল্লাস যে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট তা বুঝতে বাকী রইলো না কারুর। মার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল চোখে শতধারা বয়ে যেতে লাগল! মনের সে কী অবস্থা বুক হাহাকারে ভরে উঠ্‌ল। সেদিন মনে হয়েছিল এ কী দুর্ব্বুদ্ধি! এ ভাবে কখনও দেশ উদ্ধার হয়! চাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দ্দার! একটা লাঠি রাখার যাদের অধিকার নেই তাদের এ প্রয়াস ত পিঁপড়ের পাখা ওঠার মত "শুধু মরিবার তরে"। প্রবলপরাক্রান্ত শক্তির বিরুদ্ধে ভরসাহীনের কল্পনা যে বাতুলের স্বপ্ন! এ ভুল ভাঙতে দেরী হয়নি। রাজরোষকে তুচ্ছ করে স্বাধীনতার যজ্ঞবেদী-মূলে আত্মাহুতি দেবার সেদিন কী

কাড়াকাড়িই না পড়ে দিয়েছিল! অসাধারণ ত্যাগ ও অপূর্ব্ব সাধনা বলে মুষ্টিমেয় ভারতসন্তান সেদিন যে অসাধ্য সাধন করেছিল সেই তপস্যার ফলেই ভারত আজ শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন!

পরের দিন সকালে সোনাপিসির দিকে যেন তাকাতে পারিনা। সারা রাত যে প্রচণ্ড ঝড় তাঁর ওপর দিয়ে গেছে তাঁর চেহারা দেখলে বুঝতে দেরী হয়না কিন্তু কী অসাধারণ মনের বল! প্রতিদিন আমি রাঁধি সেদিন তিনি রাঁধতে গেলেন। সলজ্জোচে বল্লাম আজ থাক আপনার শরীরটা ভাল নেই, অত্যন্ত করুণ ভাবে হেসে বল্লেন—সে হাসি অশ্রুরই নামান্তর—"দুঃখের বিষান নিতেই ত হবে মা, ভেঙে পড়লে ত চলবে না। কাজই মনের স্থৈর্য্য ফিরিয়ে আনাই একমাত্র পথ। বুক যে আমার বাঁধতেই হবে এখন থেকে। ভাবনা ওঁর জন্য উনি যে একা!" এর পর আর বলার কিছু ছিলনা, বুক ঠেলে কান্না আসতে লাগল! এ ঘটনার ৪।৫ দিন পর আবার খবরের কাগজ মারফত মুরারীপুকুরের বিস্তারিত বিবরণ পড়ে মনের গোপন কোণে যে ক্ষীণ আশাটুকু ছিল তাও নির্ম্মূল হয়ে গেল। ধৃত ব্যক্তিদের তালিকার মধ্যে দেখলাম উল্লাস নামক বিপ্লব প্রচেষ্টার অন্যতম নেতা! মনে হল এরাই বুঝি আনন্দমঠের সন্তান সম্প্রদায়! দুদিন কারও মুখে কথা নেই, উনানে আগুন পড়ে না, শিশুরা কান্না-কাটি ভুলে গেল। কিন্তু এখানে ত পূর্ণচ্ছেদ পড়লো না, আরও যে বিধাতা রেখেছেন, তৃতীয় দিনের কাগজে বের হল। হ্যারিসন রোডে কবিরাজ নগেন গুপ্ত তার নিজের ভাই ধরণী গুপ্ত ও মাসতুত ভাই অশোক নন্দীও ধরা পড়েছে, কবিরাজের ঘরে ভীষণ মারাত্মক বোমা পাওয়া গেছে! উল্লাসের ব্যবহার ও পূর্ব্বাপর কার্য্যকলাপে ওর সম্বন্ধে নানা আশঙ্কা সকলের মনে বাসা বেঁধে ছিল কিন্তু এ সংবাদ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত! ওদের কেউই যে এ রকম ব্যাপারে যুক্ত থাকতে পারে না সে বিষয়ে আমরা ধ্রুব নিশ্চিত! ধরণী ১৪।২০ দিন আগে আর অশোকও মাত্র ৩।৭ দিন হল কলকাতা গেছে, তবে এ কী হল! নানা জনে নানা সান্ত্বনা দিলেন সকলের এক কথা ভুল করে ধরেছে এদের ইত্যাদি। উনি ও তক্ষুণি বাবা মার কাছে দেশের বাড়ীতে চলে গেলেন। সোনাপিসির মন কিন্তু কু-ডাক ডাকলো, বল্লেন বউমা দেখো এর মূলে আছে পালু, তার দোষেই এরা জড়িয়ে পড়েছে, জানি না কি হবে। কত সংগ্রাম করে নগেন সবে মাত্র মাথা তুলেছে। অবনীর মার (নগেনের মা) বাড়ী ভাতে যে ছাই পড়লো! তোমার শাশুড়ীই বা কি করে মনকে বোঝাবেন, এ ছেলেটী যে তাঁর বড় আদরের! চিঠিপত্রে এ সব বিষয়ে কেউ কিছু লিখতে সাহস করেনা, খবরের কাগজের জন্য পথ চেয়ে থাকি। নিত্য নূতন সংবাদে মনে কী বিভীষিকারই সৃষ্টি করতো—ওঃ সে কী দিনই গেছে!

মেশোমশাই (নগেনের বাবা) চিরকাল তার ওপর বিক্রমপুরের পৈত্রিক ভদ্রাসন ইত্যাদি যা কিছু ছিল সবই যায় পদ্মার গর্ভে। বৃহৎ সংসার বহু অভাব অনটনের মধ্যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হত। নগেনেরা চার ভাই, বড় বিশেষ কিছু করতেন না। ছোট ধরণী তরণী শিশুকাল থেকে আমাদের বাড়ী তাদের মাসিমার কাছে থেকে পড়াশোনা করত। নগেন অত্যন্ত চরিত্রবান ও সাধু চরিত্রের ছিল, লেখাপড়া শেখার তেমন সুযোগ তার জীবনে না ঘটলেও অসাধারণ উদ্যম ও কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সে নিজের চেষ্টায় কবিরাজী পাশ করে মাত্র কয় মাস আগে এই দোকানটী খুলেছে। তার সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার ও চিকিৎসা নৈপুণ্যে বেশ পশার জমে উঠেছিল। ভবিষ্যত ছিল খুবই আশাপ্রদ! শাশুড়ী ঠাকরুণদের দুই বোনের মত ভগ্নিপ্রীতি খুব কমই দেখেছি। মাসিমা ছিলেন বড়। শাশুড়ী ঠাকুরাণীর সাদর আমন্ত্রণে মাসিমা বছরের প্রায় ৬ মাস আমাদের বাড়ী থাকতেন।

ধরণী আর আমার দেওর অশোক মাত্র কয় দিন আগে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ধরণীর ডাক্তারী পড়ার আগ্রহ দেখে শ্বশুর মহাশয় তাকে সেদিনের আর, জি, কর স্কুলে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য তাঁর বেয়াই ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসকে অনুরোধ করেন। সুন্দরী বাবুর

পত্রানুযায়ী মাত্র ১৪।১০ দিন নগেনের কাছে থেকে পড়ার জন্য ধরণী কলকাতা এসেছে।

ধরণী ডাক্তারী পড়তে গেল অশোক বলে সে কৃষি করবে। শ্বশুর মহাশয়ের এ বিষয় নিজেরও খুব আগ্রহ ছিল ছেলেকেও উৎসাহিত করতে ত্রুটী হ'ল না। শ্বশুর মহাশয়ের পিতামহ রামদুলাল দেওয়ানের আমল থেকে ত্রিপুরা রাজপরিবারের সঙ্গে আমাদের একটা পারিবারিক সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শ্বশুরমহাশয় নিজেও রাজবাড়ীর চিকিৎসক ছিলেন, তদানীন্তন মহারাজা ও মহারাণী যেমনি তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন তেমনি ছিল তাঁর চিকিৎসার অসাধ বিশ্বাস। একবার মহারাণী কঠিন রোগের থেকে সুস্থ হয়ে উঠে শ্বশুর মহাশয়কে ১০০৲ দামের একখানি শাল উপঢৌকন পাঠান। মহারাজা বাহাদুর অশোকের কৃষি শিক্ষার ইচ্ছা জানতে পেরে কার্য করার জন্য বেশ কিছু জমি দেবেন বলে জানান। উল্লাস কুমিল্লা থাকতেই একদিন সন্ধ্যার গাড়ীতে বাড়ী থেকে সে এল, বয়স ছিল তার ১৫। কখনও মা বাবা ছাড়া কোথাও যায় নাই তাই আমি ঠাট্টা করে বল্লাম একী ব্যাপার? মা তাঁর ছোট্ট ছেলেটীকে একা ছাড়লেন? সলজ্জ হাসিতে মুখখানা ভরে উঠ্‌ল, বল্লে. বারে আমি বুঝি বড় হইনি, জানেন আমি আজ কলকাতা যাচ্ছি, পিসেমশাইএর কাছে কার্ম সম্বন্ধে উপদেশ নিতে। অশোক বড় মাংসপ্রিয় ছিল বিশেষ করে আমার রান্না। সেদিনও মাংস রান্না করছিলাম, বল্লাম আজ আর তোমার যাওয়া হবেনা, কাল যেও। বল্লে তা হয়না বৌঠান, পিসেমশাইকে টেলি করে দিয়েছেন বাবা, আমিও ৭ দিনের রিটার্ণ টিকিটে যাচ্ছি এসে কদিন খুব মাংস খাব। আজ অর্দ্ধ শতাব্দী গত হলেও সেদিনের সে কথা মনে হলেই চোখের জল রোধ করতে পারিনা। সে আর কোনও দিন ফিরে এলোনা। এমনি দুর্ভাগ্য আমার দেখা করার জন্য কুমিল্লা থেকে এসেও হুকুম মেলেনি। তার সঙ্গে আমার আর জীবনে দেখা হয়নি। সে এক মর্ম্মন্তুদ কাহিনী।

হ্যারিসন রোডের দোকান যেদিন মার্চ্চ হয় মাত্র ৫দিন আগের দিন সকালে অশোক নগেনের কাছে এসেছিল। সেদিনে ও সিনেমা ছিলনা। মফঃস্বলের লোক কলকাতা এলেই চিড়িয়াখানা; মরা সোসাইটি (মিউজিয়ম) মনুমেন্ট গঙ্গা বক্ষের বড় বড় অর্ণবপোত ও সায়েবদের দোকান পাট যেমন দেখ্‌ত, শুনতো ইডেন গার্ডেনের ব্যাণ্ড বাজনা, তেমনি দেখত থিয়েটারও। তখনকার দিনে আমাদের অভিভাবকরা থিয়েটারের বিরোধী ছিলেন কাজেই ছেলেদের থিয়েটার দেখা ঘটে উঠ্‌তনা। এবার অশোক ধরণীকে থিয়েটার দেখাবে বলে নগেন প্রতিশ্রুত দেয় সেই সঙ্গে আমার ভাই নিরঞ্জন, সুন্দরী বাবুর ছেলে প্রেমানন্দ ও সুখসাগরকেও নিমন্ত্রণ করে। কথা হল অশোক শিবপুরের কাজ সেরে যেদিন আসবে সেদিনই সবাই থিয়েটারে যাবে। কিন্তু এমনিই বিধিবিড়ম্বনা কদিন শিবপুরেই অশোকের পেট-টা ভাল যাচ্ছিলনা। সকালে নগেনের কাছে এসেই সেটা আমাশায় দাঁড়িয়ে গেল। সেদিনে প্রায় সারারাত ধরে থিয়েটার হ'ত। অসুস্থ শরীরে রাত জাগা চলবে না কাজেই এত তোড়জোড় সব বিফল হল, এত সাধের থিয়েটার দেখা হল না। নিরঞ্জনের তিন বন্ধু সন্ধ্যায় এসে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেল, অশোক নগেনের কাছেই রইলো। রাত্রি প্রভাত হতে না হতেই দরজায় শব্দ হল। এত প্রত্যুষে কোন্ রোগী এল ভেবে নগেন দরজা খুলেই সামনে ভীড় দেখে অবাক, একজন এগিয়ে এসে নাম জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের হুইসিল বেজে উঠ্‌ল আর দেখতে দেখতে দেশী-বিদেশী পুলিশে সার্জ্জেনে ঘর ভর্ত্তি হয়ে গেল! নগেন ত স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে, তখনও ভাবছে কোথাও কিছু গলদ আছে নিশ্চয়। পুলিশ ইন্‌স্পেকটার প্রথমেই উল্লাসের বাক্সগুলো দেখিয়ে বল্লে, ওতে কি আছে দেখাও। নগেন বললো আমার জিনিষ নয় একজন রেখে গেছে, চাবিও নেই। ইংরাজ কর্ম্মচারী হুকুম দিল ভেঙ্গে, ভাঙো। তখনি বাক্সের তালা ভাঙা হল। একটার পেকে একটা বলের মত জিনিষ বের করে বাঙ্গালী ইন্সপেক্টার জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? বেচারী নগেন সাদা মনে উত্তর দিল পাথরখানার

ভলের টাঙ্কের বল। তখন ভয়ে ভদ্রলোক বলে ছাড়ি ভাই, এটা দিয়ে সমস্ত কলকাতা শহর উড়িয়ে দেওয়া যায়। কি বল জান না? নগেন আমায় বলেছিল এ কথা শুনে আমার সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে গেল বুকের মধ্যে চাহাকার করে উঠ্‌ল। উল্লাস যদি ঘুণাক্ষরেও আমায় জানাত বড়বাজারের এঁদো গলিতে ফেলে দিলে কে আমায় ধরে! এ সর্ব্বনাশ সে কেন করলো। এক লহমার জন্য সেদিন আমার মনে উল্লাসের ওপর ক্রোধ ও ভগবানের ওপর প্রচণ্ড অভিমান হয়েছিল। মনে হল এমন সর্ব্বনাশ আমার কেন হল?— কিন্তু সে একটী ক্ষণমাত্র। আলিপুরের জেল ফটক পার হয়ে মনে হয়েছিল এ কোথায় এলাম! কত জন্মের সুকৃতির ফলেই আমার জীবনে এই পরম লগ্নটী সেদিন এসেছিল। কে বলে এ জেল? এ যে পরম তীর্থ! মৃত্যুকে নিয়ে যারা এমন ছিনিমিনি খেলতে পারে তারা দেবতা—মানুষ নয়। এখানে এসে আমি ধন্য হয়েছি। ধরণী এখনও বলে জেলের দিনগুলি "Best part of my life"

অফিসারকে নগেন যে উত্তর দিয়েছিল তার নির্দ্দোষিতা প্রমাণের পক্ষে তাই যথেষ্টই ছিল কিন্তু সে কথা কে শুনবে—প্রায়শ্চিত্ত চাই-ই। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসের সেই বাক্সগুলির সহিত নগেন, ধরণী ও অশোককে হাত কড়া দিয়ে সতর্ক পুলিশ পাহারায় আলিপুর জেলে নিয়ে গেল। অস্ত্র আইনের চার্জ্জে এরা তিন ভাই অভিযুক্ত হল মুরারিপুকুরের অভিযোক্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র (waging war against the king).

উল্লাস বাক্সগুলি রেখে যাবার পরদিন সকালে নগেন দেখে তার দরজার সামনে ফুটপাতে একটা পাগলা আস্তানা গেড়েছে, কখন শোয়, কখন বসে, কখন বেসুরে সুর ভাঁজে কান ঝালাপালা। বকলেও কান দেয় না, নগেন যেন বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লো। পরের দিন একটী সুবেশধারী ভদ্রলোক দোকানে চিকিৎসার অছিলায় এসে প্রায় দু ঘণ্টা ধরে নানা অবান্তর আলোচনায় সময় কাটিয়ে শেষে ৪।৫ টাকার মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি মামুলি ওষুধ কিনে চলে গেলেন। তখন ত স্বপ্নেও ভাবা যায় নি যে এরা দু জনেই নগেনের দোকান পাহারা দিচ্ছে। সার্চ্চের সময় দেখা গেল সেই ভদ্র লোকটাই তাড়াতাড়ি চৌকীর নীচের বাক্সগুলি দেখিয়ে দিলেন, পাগলাও ওদের সঙ্গে এসেছিল।

তারপর যথাসময়ে নগেন ধরণী নিরপরাধ হয়েও সাক্ষী সাবুদের নির্ভেজাল উক্তিতে অপরাধী প্রমাণিত হয়ে সাত বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল। নগেনের বৃদ্ধ পিতামাতা তরুণী স্ত্রীর কী হাহাকার!

সাত বছর দণ্ডভোগের পর নগেন ফিরে এলে তার কাছে সেদিনের জেলের কথা যা শুনেছিলাম এখানে তা লিপিবদ্ধ করি। "প্রথম দিকে জেলের মধ্যে যেন আনন্দের বন্যা বয়ে গেছে। এতগুলি বিভিন্ন স্তরের ও বয়সের মানুষ একত্র হয়েছে কিন্তু তার জন্য কোনও সঙ্কোচ ছিলনা, সবাই যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে কারু ভ্রুক্ষেপও নাই। সব বেপরোয়া। চরম দণ্ডের ভয়কেও যেন বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে বলছে "ও ভয়ে কম্পিত নয় মোদের হৃদয়"। একদিকে হাসি গান হুল্লোড়ের অবধি নেই আবার অন্যদিকে শ্রীঅরবিন্দের গভীর দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় যোগ দেবার সময় সমান শ্রদ্ধাশীল। এই দলে প্রৌঢ়ও যেমন ছিলেন তেমনি ছিল সুকুমারমূর্ত্তি কিশোর ও তরুণ যুবক। এদের নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ততায় কর্ত্তৃপক্ষ অবাক বিস্ময়ে ভাবত কি ধাতু দিয়ে বিধাতা এঁদের তৈরী করেছেন! কিন্তু এভাবে বেশী দিন গেল না, একদিন চারিদিকের বাতাস ভারি হয়ে উঠ্‌ল—সকলের মুখ মেঘাচ্ছন্ন।

"জায়গায় জায়গায় জটলা, তারপর একদিন সকালে হঠাৎ পাগলা ঘণ্টা বেজে উঠল। পিল পিল করে জেলের ভেতর সব সার্জ্জেন্ট পুলিশে ভরে গেল। আমাদের একত্র জড় করে হাত কড়া পরিয়ে ছোট ছোট কুঠরীতে বন্ধ করা হল। ক্রমে সব জানা গেল। দলের নরেন গোঁসাই নিজ জীবন রক্ষার আশ্বাস ও নানা প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে রাজসাক্ষী হয়েছিল। এই বিশ্বাসঘাতকের সাক্ষ্যে দলের সমূহ ক্ষতি নিশ্চিত, দেশমাতৃকার শৃঙ্খল

মুক্তির যে স্বপ্ন তারা দেখছিল তা ব্যর্থ হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। অতএব এ অপচেষ্টার সমূলে ধ্বংসই শ্রেয়—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই কানাই ও সত্যেন নরেনকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিল।

"দেশের জন্য জাতির জন্য এ যে কত বড় ত্যাগ, কত বড় আদর্শ এদের পথ দেখিয়ে দিয়েছিল তা সাধারণ সংসারী মানুষের কল্পনাতীত! শুনেছি প্রাণের মায়ার চেয়ে বড় জিনিষ নাকি দুনিয়ায় আর নেই কিন্তু মাতৃভূমির মুক্তিকামী সাধকদলের কাছে ধন জন জীবন কিছুরই কোন লোভ বা আকাঙ্ক্ষা ছিলনা।

"নরেন গোঁসাই হত্যার পর সব বিচারাধীন আসামী-দেরই কড়া পাহারায় নির্জ্জন কুঠরী (Solitary cell) এ বন্ধ করা হল। কর্তৃপক্ষ ভাবলেন ভয় করবেন, কিন্তু সবই বৃথা। কানাই ও সত্যেনের জন্য প্রথম দিকে সকলেরই মন ভারাক্রান্ত ও বেদনায় মুহ্যমান হলেও আস্তে আস্তে এ ভাব কেটে গেল। পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তা চালাবার জন্য টেলিগ্রাফিক কোডের অনুকরণে নিজেদের কোড তৈরী হল। Cell এর দেয়ালে টরে টক্কা করে কথাবার্ত্তা চলতে লাগল। অধ্যক্ষদের দমন করার জন্য নির্যাতনের মাত্রা যতই বাড়তে লাগল ততই তারা হয়ে উঠ্‌ল দুর্দ্দমনীয়।" এই প্রবন্ধ লেখার সময় ধরণী সেদিনের ঘটনা উল্লেখ করে বলে "পেটের গণ্ডগোলের জন্য সে সময় সে ও কানাই সত্যেনের কয়দিন আগে থেকেই হাঁসপাতালে ছিল। সেদিন সকালে কয়জন মিলে হাঁসপাতালের একটা ঘরে বসে তাস খেলছিল (যদিও এসব খেলনিয়মের বহির্ভূত ছিল কিন্তু নিয়ম ভঙ্গে এরা ছিল ওস্তাদ)। হঠাৎ রিভলভারের আওয়াজে তাস ফেলে সব ছুটলো কী হয়েছে দেখতে, বারান্দায় আসতেই একজন সার্জ্জেন ওকে বাধা দিয়ে বলেছিল Don't go that side, the traitor is rightly served ওদিকে যেওনা—বিশ্বাস-ঘাতকের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে।

নগেনের প্যাশর সেলে থাকত কানাই। ফাঁসির আগের রাতের কথা বলেছিল, "সারাদিনটা আমার যে কী ভাবে কেটেছে, ভোর চলেই আমাদের ফেলে কানাই মহাযাত্রার পথে রওনা হবে—এক মর্ম্মান্তিক ব্যথা ও আর্ত্তনাদে বুক যেন ফেটে যেতে চায়। শেষ দেখার সুযোগটুকু পাছে হারিয়ে যায় সেই ভয়ে দরজার শিকের ওপর মুখ রেখে রাত কাটিয়েছি। বুটের শব্দে সকলের প্রাণে আতঙ্কের সৃষ্টি করে ইংরাজ পাহারাদার প্রহরে প্রহরে দেখে যাচ্ছে দুর্দ্ধর্ষ আসামী ঠিক আছে কিনা। এত উদ্বেগ যার জন্য সে কিন্তু নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে নাসিকা গর্জ্জনে কুঠরী কাঁপিয়ে ঘুমুচ্ছে! প্রত্যুষে সার্জ্জেন দেখে তখনও কানাই ঘুমে অচেতন! এ অভাবনীয় দৃশ্যে তাকেও বুঝি বিচলিত করে তুললো। সে দরজায় একটু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে চলে গেল, ভাবল বুঝি এরা কি মানুষ না দেবতা! খানিকপরে আবার এল কিন্তু এবার চলার ভঙ্গীতে সে ঔদ্ধত্য নেই, পা টিপে টিপে সন্তর্পণে এসে দাঁড়িয়ে গরাদে মাথা ঠোকা দিয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকলো—বাবু, আবার কি ভেবে মাথা হেঁট করে চলে গেল! কিন্তু সেও ত হুকুমের চাকর, আদেশ তাকে পালন করতেই হবে। তৃতীয়বার এসে আবার অত্যন্ত করুন সুরে ডাকল বাবু! কানাই বলে, শুনলাম—What's the matter ? (কি হয়েছে ?) তার নিরুদ্বেগ কণ্ঠস্বরে সার্জ্জেনের কঠিন প্রাণও দুঃখে ভেঙ্গে পড়লো। কম্পিত কণ্ঠে বলে Time is up Babu—সময় হয়ে গেছে। শুনলাম, কানাই যেন খুব অপ্রস্তুত হয়েছে এমনি সুরে বলে Oh I am sorry, one minute please (ওঃ আমি দুঃখিত এক মিনিটে আসছি)। তারপর তালা খোলা হল। হাস্যোদ্ভাসিত মুখে কানাই বের হয়ে এল। আগে পিছে সার্জ্জেনের দল, শৃঙ্খলাবদ্ধ দুটি হাত জোড় করে দু পাশের সেলের সাথী ও বন্ধুদের শেষ নমস্কার জানাতে জানাতে চলে গেল! চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল! ভাবলাম ধন্য আমি, ধন্য আমার দেশ! এ মহান ত্যাগ কি কখনো নিষ্ফলে যেতে পারে! এ হতেই পারেনা। আমার জীবনে সেদিন প্রত্যক্ষ দেবতা দর্শন হল!

আমার চোখে দেখা সোভিয়েট দেশ

ডাঃ সুরেন্দ্রকুমার পাল

(৬)

আবার মস্কো। তেরোই জুলাই সকালে প্রায় দশটার সময় মস্কোর লেনিনগ্রাড স্টেশনে আবার ফিরে এলুম। সঙ্গে কোন লট বাহুরের ঝামেলা নেই, বাড়া হাত-পা মানুষ, কাজে কাজেই যারা আকাডেমীর পক্ষ হতে পুনরাগমন উপলক্ষে আমার সম্ভাষণ জানাতে এসেছিলেন, তাদের সঙ্গে হাসি মুখে 'হাত-নাড়া'র পর্ব শেষ ক'রে স্টেশন হতে বেরিয়ে এসে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট মোটর যানে উঠতে যাচ্ছি এমনি সময়ে একজন পোর্টার ছুটতে ছুটতে এসে আমার হাতে ট্রেনের কামরায় ফেলে আসা প্যাকেটটি তুলে দিয়ে, আমার মুখে "পাসিবো"টি পর্যন্ত শোনবার অপেক্ষা না রেখেই এক রকম ঝটিতিই আবার ফিরে গেল। কী ভুলো মন আমার! বিগত অপরাহ্ণে এত কষ্ট করে আমার ভাইপো-ভাইঝিদের জন্য লেনিনগ্রাডের সব চেয়ে বড় দোকান হতে কেনা বহু মূল্য সোয়েটার ও ফ্রকের কাপড়গুলি এত্নি ভুলে ট্রেনের তাকের উপর রেখে ফেলে এসেছি, তার কথা মনেই ছিল না। কী ভাগ্যিস, ঐ সৎ পোর্টারটি তা লক্ষ্য করেছিল, নচেৎ আক্ষেপের অন্ত থাকতোনা। সে কারণে খুশী হয়েছিলুম ত বটেই, কিন্তু আরো বেশী খুশী হয়ে ছিলুম তার কারণ, কয়েক দিন আগে বলশোয় থিয়েটারে পার্কার কলমটির হারানো ও অক্ষত এক শ' রুবল নোটের বিনিময়ে পঁচিশ রুবল ফেরত পাওয়ার মনে মনে যে দেশীয় লোকের "না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ" এর অভ্যাস সম্বন্ধে যেটুকু সন্দিগ্ধতা মনে ছিল, এ ভাবে একজন সাধারণ পোর্টারের অযাচিতভাবে ট্রেনে ভুল করে ফেলে আসা মূল্যবান কাপড়ের পুটুলিটি "ধন্যবাদ" কথাটি পর্যন্ত শোনবার অপেক্ষা না রেখে, যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দিয়ে ফিরে যাওয়াতে, আমার ভুল ধারণার নিরসন হয়ে গেল। ঐ প্যাকেটটির মধ্যে ছিল প্রায় আশি রুবল দিয়ে কেনা একটি সোয়েটার ও প্রায় এক শ' পনর রুবল দিয়ে কেনা সাত মিটার পরিমিত ফ্রকের জন্য সিল্কের কাপড়, অর্থাৎ এখুনে প্রায় দশ টাকার মত জিনিস।

এবার আমাদের আবাস হ'ল সুপ্রসিদ্ধ রেড্ স্কোয়ারের নিকটবর্তী বিখ্যাত মস্কো হোটেল। আমার ধারণা ছিল হোটেলে ফিরে এসেই লেনিনগ্রাডে অবস্থার ফেরে চার চার দিনের অপরিবর্তিত পোষাক-পরিচ্ছদ বদলে এবং মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ি কামিয়ে আবার 'ভদ্রলোক' হতে পারবো। কিন্তু নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে, মস্কোতে ফেলে যাওয়া সুটকেসটি না পেয়ে, তার জন্য আনচান করতে লাগলুম। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! তৎক্ষণে সকলে প্রাতরাশের জন্য বসে পড়েছেন ডাইনিং হলে, কারণ তাড়াতাড়ি 'ছোটা হাজরি' সেরেই নাকি "ক্রেমলিন" দেখতে যেতে হবে। সুতরাং তাড়াতাড়ি স্নান করে, মুখ, হাত-পা ধুয়ে আবার বাসী কাপড় পরেই গিয়ে খাবার টেবিলে বসতে হ'ল। কিন্তু নিজেকে অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছিল, আর খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে বার বার হাতে লিপ্‌ক চেকে মুখের সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কদম ফুলের অবস্থাকে লোকচক্ষুর আড়াল করবার চেষ্টা করছিলুম। সকলেরই দৃষ্টি বার বার খাদ্য বস্তুর উপর, কিন্তু আমার যেন কেবলই মনে হচ্ছিল যে তাদের সকলেরই দৃষ্টি বুঝি আমার দিকে নিবদ্ধ! হীনমন্যতা সম্বন্ধে আগে কোন সঠিক ধারণা ছিলনা, ঐ একটি বিশেষ দিনে তা মর্মে মর্মে অনুভব করছিলুম।

ক্রেমলিন! লেনিন ও স্ট্যালিনের লীলা নিকেতন, ধনিকের ত্রাস এবং জগতের নিপীড়িত ও ক্লিষ্ট নরনারীর ভরসার স্থল এই ক্রেমলিন। দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর

ঘরে যার নাম শুনে এসেছি আর বিস্ময়াবিষ্ট দর্শক মন্ত্রমুগ্ধের মত যেমন তাকিয়ে থাকে স্টেজের উপরে কুহকী যাদুকরের অপূর্ব যাদুমায়ার দিকে পরমুহূর্তে কী ঘটে তারই প্রত্যাশায়, তেমনি দূর হতে ঔৎসুক্যের সঙ্গে শুনেছি এর কথা এবং মস্কোতে এসে অবধি প্রতিদিন নিকট এবং দূর হতে তাকিয়ে দেখেছি একে বিস্ময় মিশ্রিত শ্রদ্ধার সঙ্গে। তাই সেদিন তার মধ্যে প্রবেশ করে মনে হল যেন এত দিনের প্রতীক্ষার সার্থক পরিসমাপ্তি ঘটলো। প্রায় নয় শ বছরের আগে ১১৬৭ খৃষ্টাব্দে মস্কো নদীর তীরে একটি অনতিউচ্চ পাহাড়ের উপর কাঠের পালিশ দিয়ে ঘেরা যে ছোট্ট বসতির পত্তন হয়, তাই সাড়ে তিন শ' বছর পরে আকারে বহু শত গুণ বৃদ্ধি পেয়ে কাঠের পরিবর্তে পাথরের প্রাচীরের আবেষ্টনীর মধ্যে সু-উচ্চ গির্জা ও সুরম্য নানা অট্টালিকার সমাবেশে রূপান্তরিত হয় বর্তমান ক্রেমলীনে। প্রায় সওয়া একর জমির উপর সওয়া মাইল লম্বা প্রাচীরে বেষ্টিত ক্রেমলীনকে একটি শহর বলেও বাড়িয়ে বলা হয় না।

আমরা প্রথমেই গিয়ে ঢুকলুম আর্ক্‌অ্যাঞ্জেলস্কি গির্জায়। বহুদিনের পুরাতন গির্জা, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্মিত। বোধ হয় তার প্রাচীনত্বকে ঠিক ঠিক দেখাবার জন্য ইচ্ছে করেই প্রয়োজনমত সংস্কারের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই দেওয়ালের অসংখ্য চিত্রাবলী, জীর্ণ দেওয়ালে অনেক স্থলেই আপসা হয়ে এসেছে, কোথাও বা চটা উঠে গেছে, কোথাও বা আবার নোনা ধরার উপক্রম হয়েছে। গীর্জার মধ্যে মস্কোভির রাজাদেরও অনেক জার ও তার পরিবারস্থ লোকের কবর। কারো মৃত্যু স্বাভাবিক, কেউবা নিহত হয়েছেন আততায়ীর হাতে, কে একজন নিজের হাতে হত্যা করেছেন নিজের পুত্রকে। কিন্তু নিয়তির কী পরিহাস, পুত্রহন্তা পিতার এবং নিহত পুত্রের সমাধির মধ্যে ব্যবধান কয়েক হাত পরিমিত স্থানমাত্র! লণ্ডনের ওয়েষ্টমিনস্টার গীর্জারও কবর আছে তবু তাকে নিছক গোরস্থান বলে মনে হয় না, যেহেতু তার মধ্যে দ্রষ্টব্য অনেক কিছু আছে, যার রাজা-রাণীর অভিষেকের স্থান পর্যন্ত। কিন্তু এর অভ্যন্তরে চলতে চলতে আমার মনে হচ্ছিল যে নামে গীর্জা হলেও এটা আসলে জার ও জার-পরিবারের গোরস্থান ছাড়া আর কিছুই নয়। ক্রেমলীনের অভ্যন্তরে জারদের অভিষেক ও মুকুট-ধারণের জন্য উস্‌পেন্‌স্কি গীর্জা বলে আর একটি গীর্জা আছে। তার আভ্যন্তরীণ কারুকার্য ও প্রাচীন রুশীয় পদ্ধতিতে স্থাপত্য সত্যিই দেখবার মত জিনিস। অপর একটি নির্মিত হয় আর্ক্‌অ্যাঞ্জেলস্কি গীর্জারও প্রায় পঁচিশ বছর আগে। তারই মাত্র কয়েক বছর পরে (১৪৮৪-৮৯) খৃষ্টাব্দে নির্মিত ব্লাগোভেস্‌চেন্‌স্কি গীর্জার মধ্যে রুশ দেশের শিল্পীদের নির্মিত বহু প্রাচীন পাথরের মূর্তি-সংগ্রহ দেখবার মত বস্তু।

তারপরই আমরা 'গ্রানোভিটা' প্রাসাদ দেখতে গেলুম। এখানেই সে হলঘর যেখানে রুশদেশের সর্বময় কর্তা জার ও প্রিন্সরা আড়ম্বরের সঙ্গে নানা দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রপ্রতিনিধি ও বৈদেশিক দূতদের সম্বর্ধনা জানাতেন এবং কেম্‌ব্রিজ ল্যাম্বোর প্রভৃতি বিশ্বের বিশেষ সম্মেলনের অধিবেশনও হ'ত। তাছাড়া টেরেমনি প্যালেস্ নামক প্রাসাদের আর একটি হলও এত জাঁকজমকপূর্ণ না হলেও বেশ সুদৃশ্য আর একটি সিংহাসন-হলও রুশীয় জারেরা সময়ে সময়ে ব্যবহার করতেন। গ্রানোভিটা প্রাসাদের নিকটেই বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত গ্রাণ্ড ক্রেমলীন প্যালেসটি অবস্থিত। বর্তমানে এর মধ্যে আছে রুশ দেশের পুরাতন ঐতিহ্য ও ইতিহাসের বহু স্মারক চিহ্ন সম্বলিত বিখ্যাত মিউজিয়ম। তারই মধ্যে আছে একচ্ছত্র সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীদের ব্যবহৃত বহুমূল্য উষ্ণীষ, মুণিমুক্তা, অলঙ্কার, পোষাক-পরিচ্ছদ, তরবারির হাতল ও খাপ, হীরকখচিত সোনার ভোজনপাত্র, অন্যান্য দেশের রাজা-রাজড়ার দেওয়া নানা বহুমূল্য উপহার, ব্যবহৃত শকট আর ঘোড়ার প্রতিমূর্তিসহ তাদেরও আড়ম্বরপূর্ণ বল্গা, জীন প্রভৃতি! একটি বিশেষ স্থানে অতি যত্নে রক্ষিত আছে "মনোমাখ্ ক্যাপ" নামক রুশ সম্রাটদের অভিষেক কালে ধারণের খাঁটি সোনার মুকুটটি! জার, জারিনা, রাজবংশীয় সন্তান-সন্ততি এবং অভিজাত বংশীয় ব্যক্তিদের ব্যবহৃত হীরক

খচিত বাসন-কোসন এবং মণিমুক্তা বসানো উৎসবাদিতে পরিধেয় পোষাক-পরিচ্ছদগুলি দেখে মনে হয়, কী আড়ম্বরপূর্ণ ও অনন্যসাধারণ ছিল তাদের জীবনযাত্রা! এক দিকে তাদের বিলাস ও প্রমোদের স্রোতে ভাসমান জীবনযাত্রা আর অপর দিকে নিপীড়িত, বুভুক্ষু অসংখ্য জনগণের হাহাকার মিশ্রিত চিত্র—যার একমাত্র নিশ্চিত পরিণতি ১৯১৮ সালের সকল বিদ্রোহে ও সামগ্রিক বিপ্লবে জারের সবংশে নিধন, ধনতন্ত্রের লোপ এবং গণ অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে শুধু রুশ দেশেরই নয়, পৃথিবীর নিষ্পেষিত ও উৎপীড়িত কোটি কোটি লোকের নব জীবনের স্ফূর্তি ও জাগরণ। একে নিয়তির পরিহাস না বলে অলঙ্ঘ্য নীতি বলাই সমীচীন! কারণ বিজ্ঞানের একটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম, প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া, একই ভাবে বিপরীত দিকে ঘটবেই—"To every action there is a reaction, equal and opposite." তাছাড়া মিউজিয়মের মধ্যেই রুশীয় প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রের যে সকল নমুনা রক্ষিত আছে, তা দেখে মনে হয় শস্ত্রশিল্পেও প্রাচীন রুশীয়দের উৎকর্ষ বড় কম ছিল না। ক্রেমলীনের অন্তত ১৫০৫—১৫০৮ খৃষ্টাব্দে আইভান দি গ্রেটের নির্মিত ঘন্টাঘরের কাছে যে প্রাচীন কামান স্থাপিত আছে, তার ওজন চল্লিশ টন, দৈর্ঘ্য প্রায় এগার হাত, ব্যাস ৩৬" ইঞ্চি এবং গোলার নির্গম মুখও এক হাতের চেয়ে বেশি। একটি প্রকাণ্ড কামানবাহী শকটের উপর তা বসানো এবং তার সামনে সব চেয়ে বড় আকারের ফুটবলের অপেক্ষাও বড় কয়েকটি গোলা স্থাপিত। এ কামানটি নাকি ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে রুশীয় লৌহশিল্পী এণ্ড্রী চাকোভের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল।

ঘন্টাঘরের সামনেই একটি চৌকো বেদীর উপর মস্কোর বিখ্যাত বৃহদাকার ঢালাই করা লোহার ঘন্টাটি বসানো আছে, দূর হতে তাকে একটি ছোটখাটো মন্দিরের চূড়া বলে ভুল হয়। এর ওজন ছ'শ টন এবং ব্যাস প্রায় বার হাত। এর নির্মাতা আর একজন প্রসিদ্ধ রুশীয় লৌহশিল্পী, তাঁর নাম আইভান মটোরিন। ২৫০ ফুট উঁচু ঘন্টাঘরে যথাস্থানে স্থাপনের জন্য এটিকে তোলার প্রচেষ্টা কালে, পড়ে গিয়ে এর একটি অংশ ভেঙ্গে খসে পড়ে; ঘন্টার গায়ে টুকরোটি খসে পড়ার পর সে স্থানটিকে মন্দিরের মধ্যে খোলা প্রবেশ দ্বারের মত মনে হয়। প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র, ঐ কামান আর ঐ ঘন্টা সবই প্রাচীন রুশীয় শিল্পকলার উৎকর্ষের নিদর্শন। তা ছাড়া ক্রেমলীনের অন্যান্য গীর্জা, প্রাসাদ এবং অন্যান্য অট্টালিকার স্থাপত্য, সোনা, রুপো, হীরা, মণিমুক্তা মাণিক্যের সমাবেশে কারুশিল্প এ সকলই প্রা লে ঐ দেশীয় লোকের বহুমুখী দক্ষতার পরিচায়ক।

ক্রেমলীনের মধ্যে চলতে চলতে কত কথাই মনে পড়ছিল। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত মস্কো ছিল অনাদৃত একটি বৃহৎ নগরী মাত্র। রুশ বিপ্লবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে লেনিন রুশ দেশের রাজধানী পেট্রোগ্রাড হতে মস্কোতে সরিয়ে এনে ক্রেমলীনকেই সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের কেন্দ্ররূপে জগতের সম্মুখে তুলে ধরেন আর এখান হতে তিনি এবং তাঁর পরবর্তী ডিক্টেটার স্ট্যালিন সুদীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা করেন। তারপর সাময়িকভাবে মালেনকোভের প্রধান মন্ত্রীত্বের পর বর্তমানে বুলগানিন প্রধান মন্ত্রীরূপে সোভিয়েট তরণীর কর্ণধার।

আমাদের সৌভাগ্য যে সেদিন হঠাৎ তাঁর সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভাবেই আমাদের দেখা হয়ে গেল, যখন তিনি একটি অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন, চিন্তামগ্ন ভাবে একাকী ধীর পাদবিক্ষেপে। বহুদা বিতরু আমাদের দলের একাংশ কয়েকজনের সঙ্গে সহাস্য মুখে করমর্দন করে তিনি আমাদের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। আমাদের সঙ্গী অ্যাকাডেমীর সহকারী সেক্রেটারি আমাদের পরিচয় দিলেন যে আমরা বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর অতিথি, পরমাণবিক সম্মেলনে যোগদানকারী বিজ্ঞানীগণ। প্রধান মন্ত্রীকে এভাবে একাকী চলাফেরা করতে দেখা আমাদের কল্পনারও অতীত ছিল। সেক্রেটারী, পুলিশ, টিকটিকি, কেউ না কেউ তাঁর পেছনে থাকবেই থাকবে, এই ছিল ধারণা। তাই এ ব্যাপারটুকু সেদিন একটু বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল বৈ কি!

সেদিন ক্রেমলীনের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য

ঘটনা, ইন্দোচীনের বিপ্লবী নেতা, বর্তমানে প্রেসিডেন্ট হো চি মিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। তিনিও সদল বলে সেদিন ক্রেমলীন দেখতে এসে ছিলেন। দু' দল দু' দলের সম্মুখে পড়ে হাসিমুখে করমর্দন করে প্রীতি সম্ভাষণ বিনিময় করা গেল। এতদিন তাঁর নামই শুনে ছিলুম, হয়ত বা কোন সংবাদপত্রে তাঁর ছবিও দেখে থাকবো। কিন্তু সেদিন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে গেল। রোগা পটকা ছোট্ট মানুষটি মুখে ছাওয়ালে দাড়ি, কিন্তু চোখ দুটি দীপ্তিমান, মুখে এক সৌম্য ভাব আর ঠোঁটের কোণে এক ঝলক স্নিগ্ধ হাসি। দেখে কিছুতেই ভাবা যায় না যে শত শত গরিলা যুদ্ধে ফরাসীবাহিনীকে পর্যুদস্তকারী, আমাদের দেশের রাণা প্রতাপের মতই স্বদেশের উদ্ধারে সর্বস্ব পণকারী ইন্দোচীনের ভাগ্যনিয়ন্তা লৌহমানব, ইনিই হো চি মিন। থাক্, সেদিন ক্রেমলীনের মধ্যে তা দেখার বহু দিনের স্বপ্নই শুধু সার্থক হয়নি, তার চেয়েও অধিক সফল মনে হয়েছিল নিজকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে দুইটি রাষ্ট্রের ভাগ্যনিয়ন্তা, দুইজন পৃথিবী খ্যাত লোকনেতার দর্শন পেয়ে। আজও প্রখর সূর্য্যালোকোদ্ভাসিত সে আনন্দোজ্জ্বল সকল দিনটির কথা মনে হলে মন প্রকাণ্ড খুসীতে ভরপুর হয়ে উঠে।

ক্রেমলীন প্রাসাদ হতে বেরিয়ে আসার সময় দর্শকদের পুস্তকে সম্মানিত অতিথিদের নাম সই করতে হ'ল। চেষ্টা করে রাষ্ট্রভাষা দেবনাগরীতেই তা করলুম, ইংরেজীর পরিবর্তে।

প্রায় আড়াইটের সময় মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্ত হোটেলে ফিরে এসে যখন সকলেই ঐ অত্যাবশ্যক কার্যটি সমাধার জন্ত যে যার আসনে বসে পড়েছে, তখন আমি হাত মুখ ধুতে গিয়ে নিজের কামরায় ঢুকে দেখি যে আমার অতি প্রত্যাশিত সুটকেশটি ঘরে বর্তমান। তৎক্ষণাৎ সাবান, বুরুশ আর ক্ষুর বের করে মুখের জঙ্গল পরিষ্কার করা হ'ল এবং বেশভূষা বদলে আবার ভদ্রলোক হয়ে প্রফুল্লমনে গিয়ে খেতে বসলুম। যথোচিত সামবেদী মধ্যাহ্ন ভোজন, সুতরাং এটুকু দেরীতে খেতে বসার জন্ত শুধু উত্তপ্ত তপের আস্বাদন লাভে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া আর কোন অসুবিধে হয়নি।

তারপরই আবার ছুটতে হলো স্বর্গত সোভিয়েট জননায়ক লেনিন ও ষ্টালিনের সমাধি দেখতে। আমাদের হোটেলের অতি নিকটেই সুপ্রসিদ্ধ রেডস্কোয়ারে সমাধি মন্দিরটি অবস্থিত। আগেই কয়েকবার বাহির হতে তা দেখেছি কিন্তু কখনো ভিতরে প্রবেশ করিনি। আমরা হেঁটেই ঐটুকু পথ অতিক্রম করে রেড স্কোয়ারে পৌঁছে দেখি, প্রায় কয়েক হাজার লোক আঁকা-বাঁকা লম্বিল 'কিউ' করে দাঁড়িয়ে আছে, সমাধি মন্দিরে প্রবেশ করে নেতৃদ্বয়ের মৃতদেহের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্ত। তাই মনে মনে প্রমাদ গণলুম এই ভেবে যে লাইনের শেষ প্রান্তে দাঁড়ালে সন্ধ্যের আগে প্রবেশ করা কখনই সম্ভবপর নয়। সে আশঙ্কা প্রকাশ করলে আমাদের পথ-প্রদর্শক বল্লেন "ভাবনার কিছু নেই, এরকম কিউ রোজই ও বেলা হয় সাধারণ লোকদের জন্ত। এ আপনাদের জন্ত নয়, কারণ আপনারা সম্মানিত অতিথি, ডেলিগ্যাট " সুতরাং তাঁর নির্দেশে আঁকা-বাঁকা কিউটিকে ডানদিকে রেখে আমরা এগিয়ে গেলুম সমাধি মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে এবং যথাস্থানে তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার নিদর্শন দুটি সুদৃশ্য লাল পুষ্পমালা (পুষ্পচক্র বলাই ভাল) স্থাপন ক'রে ডেলিগ্যাটের অগ্রাধিকারে কালো পাথরে তৈরী সমাধি মন্দিরে প্রবেশ করলুম। দুইটি কাচের সুদৃশ্য আধারে সোভিয়েট রাষ্ট্রবিপ্লবের হোতা ও নেতা চির নিদ্রায় শায়িত। ওষুধের সাহায্যে নশ্বর দেহকে স্থায়ী করে রাখা হয়েছে লোকচক্ষুর সম্মুখে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলেই তা সম্ভবপর হয়েছে। সাধারণ পরিধেয় পোষাকে লেনিনের এবং মিলিটারি পোষাকে ষ্টালিনের দেহ আবৃত। মৃত হলেও একজনের মুখে সৌম্য শান্তি প্রতিভার দীপ্তি এবং অপরের মুখে কঠোর ও দৃঢ় অনমনীয় ভাব। একজনের মুখের দিকে তাকালে শ্রদ্ধায় এবং অপরের প্রতি হতে যা ভয়েই মাথা আপনি নুয়ে পড়ে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লেনিনের মহাপ্রয়াণ ঘটে, আর ষ্টালিনের মাত্র এক বছর পূর্বে। তাঁর দেহ দুটি

একই ভাবে প্রায় যেন জীবন্ত অবস্থায়ই আছে বলতে হবে, যেন শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে দুজন কমরেড পাশাপাশি শয়ান, এই মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমরা নত মস্তকে দুজন নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে, ঘাট আধারকে প্রদক্ষিণ করে কয়েক মিনিট পরেই বেরিয়ে এলুম সে ইতিহাস প্রসিদ্ধ সমাধি স্থান হতে। তারপরে রেড স্কোয়ারের বিরাট লাল প্রাচীরের পাশ দিয়ে চলতে চলতে রুশ বিপ্লবের অন্যান্য নায়কদের প্রস্তর খণ্ডে পরিচয় নাম ধাম, জন্ম ও মৃত্যু তারিখ সম্বলিত সমাধি স্থানগুলি দেখলুম। মনে পড়ে তার মধ্যে পরলোক গত প্রেসিডেন্ট কালিনিনের সমাধি ছিল।

এর পর অর্থাৎ সারাদিন ঘোড়ার মত ঘড়ির সঙ্গে অবিশ্রান্ত ভাবে ছোটার পর ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের সময় পাওয়া গেল। তারপরই আবার বড়াচূড়া পরে ছুটতে হলো অ্যাকাডেমী অব্ সায়েন্স্ ভবনে, ডেলি-গাটদের জন্য বিদায় সম্বর্ধনার নৈশ ভোজে যোগ দিতে। বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর বৈজ্ঞানিক পরিবেশে আরম্ভ হল সাড়ম্বর নৈশ ভোজ। প্রথমেই সেক্রেটারী জেনারেল, বিজ্ঞানীদের উপযুক্ত সম্বর্ধনায় নিজেদের নানা ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য মার্জনা চাইলেন এবং অগ্রিম নিমন্ত্রণ জানালেন বিজ্ঞানীদের পত্নীদের, এই আশা করে যে ভবিষ্যতে নানা দেশের বিজ্ঞানীরা যখন ডেলিগাটরূপে আসবেন তখন যেন তারা অবশ্যই তাঁদের সহধর্মিনীদের সঙ্গে আনতে না ভুল করেন। তারপর আরম্ভ হ'ল প্রত্যেক দেশের পক্ষ হতে এক একজন প্রতিনিধির ধন্যবাদ-সূচক টোস্টের প্রস্তাব ও জলতরঙ্গ বাজনার টুং-টাং শব্দে অপরদের যথাযথভাবে সেগুলিতে সাড়া দেওয়া। টোস্টের প্রস্তাবগুলি ডেলিগাটসগণ যার যার মাতৃভাষায় করলেও অনুবাদের সাহায্যে সকলেরই বোধগম্য করে দেওয়া হচ্ছিল। স্বাগত সম্ভাষণ ভোজসভায় আমরা তিন জন ভারতীয় উপস্থিত ছিলুম, অধ্যাপক সাহা, স্ট্যালিন শান্তি পুরস্কার প্রাপ্ত জেনারেল সোখে ও আমি। তখন প্রাচীন হিসেবে জেনারেল সোখেই আমাদের দেশের পক্ষে ইংরেজীতে সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন। তাতে অধ্যাপক সাহা ও আমি দু'জনেই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম। তাই এবার যখন বোম্বাইর অধ্যাপক ভগবীশ শঙ্কর ও আমার উপস্থিতিতে আমাকেই ভারতবর্ষের পক্ষে টোস্টের উত্তরে টোস্টের প্রস্তাব করতে হ'ল তখন আমি আমার মাতৃ-ভাষা বাংলাতেই আমার বক্তব্য বললুম অবশ্য আমার বিশ্বস্ত দোভাষী (বর্তমানে বহু ভাষী) লুকিনের সহায়তায়। প্রথমেই আমাদের নিমন্ত্রণ-কর্তা অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সকে তাদের সাদর নিমন্ত্রণ, সম্বর্ধনা, আতিথেয়তা ও সৌজন্যের, আর ভবিষ্যতে অগ্রিম সস্ত্রীক নিমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বলুম "আমরা ভারতবাসী, চিরকাল সমন্বয়ে বিশ্বাসী, তাই আমাদের দেশে আর্য, অনার্য, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হিন্দু, খৃষ্টান, "শকহূণদল পাঠান, মোগল, এক দেহে হ'ল লীন।"

"একেরই অনলে বহ্নিরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, ত্যাগরে তুলিল,
একটি বিরাট হিয়া।"

পৃথিবীর বিজ্ঞানীরাও এখানে নানা দেশ হতে এসেছেন, তাঁদের দেশে নানা ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মতবাদ আছে, তা সত্ত্বেও তারা এক ধর্মী ও একনিষ্ঠ। তাই আমাদের দেশের মহান্ কবির কথায় আমিও বলি,

নানা জাতি, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে হেরি মিলন মহান।

আমাদের মধ্যে সেই অখণ্ড ও চিরস্থায়ী মিলন অর্থাৎ "unity in diversity"র উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে আমি আজ টোস্ট প্রস্তাব করি।

কয়েক মিনিটের জন্য তুমুল করতালি ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে অনেকে নিজের স্থান ছেড়ে গ্লাস হাতে ছুটে এলেন আমার কাছে—হাসি মুখে টোস্টের প্রস্তাবে সাড়া দিতে। আমার পাশেই বসেছিলেন বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীয়ান এঙ্গেলহার্ড্ট। আনন্দোৎফুল্ল মুখে পরমুহূর্তে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করেন "আমার দুজন ভারতীয় বন্ধু, কলিকাতার অধ্যাপক পাল ও বোম্বাইর অধ্যাপক শঙ্করের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে আমি টোস্ট প্রস্তাব করি।" এতক্ষণ আমাদের সকলেই টোস্ট প্রস্তাব করছিলুম

সকলের জন্য সকলের হয়ে। হঠাৎ এপেনহার্ডট তার ব্যতিক্রম করে একেবারে বিশেষ ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি-মূলক টোস্ট্ প্রস্তাব করাতে আমরা দুজনই একেবারে বিস্ময়ে হতচকিত হলেও অপ্রত্যাশিত ভাবে এরকম সম্মানে যে পুলকিত হয়েছিলুম, তা অস্বীকার করতে পারিনা। আবার সকলে এলেন তাঁর টোস্টের প্রত্যুত্তরে সাড়া দিতে আমাদের দিকে। আবার আমার নামের সঙ্গে সকলের নামের আন্তরিক কোলাকুলি ঘটলো: টুং-টাং শব্দে—এ যেন ভারতবর্ষের প্রতি, মস্কোর বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীতে সমবেত তীর্থযাত্রীদের নিবেদন। কৃতজ্ঞচিত্তে প্রীতিপূর্ণভাবে করমর্দন করে রুশ বিজ্ঞানীকে ধন্যবাদ জানালুম তিনি পরদিন অন্য কোন কাজ না থাকলে, ইনস্টিটিউট অব বায়োকেমিষ্ট্রি পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানালে ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করলুম।

রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটায় পরস্পর প্রীতি বিনিময় ও বিদায় সম্ভাষণের পর আমরা বিদায় গ্রহণ করলুম।

রাশিয়া ও সমস্ত মানুষের স্বার্থ

রবীন্দ্রনাথ

"……পশ্চিম মহাদেশ বিজ্ঞানের জাদুবলে দুঃসাধ্য সাধন করে, দেখে মনে মনে ধিক্কার করি। কিন্তু এখানে যে প্রকাণ্ড ব্যাপার চলছে, সেটা দেখে আমি সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছি। শুধু যদি একটা উদ্যম কাণ্ড হত, তাতে তেমন আশ্চর্য হতুম না। কেননা, নাস্তানাবুদ করবার শক্তি এদের যথেষ্ট আছে কিন্তু পাচ্ছি, বহুদূরব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নতুন জগত গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে দেরি সইছে না, কেননা, জগৎ জুড়ে এদের প্রতিকূলতা, সবাই এদের বিরোধী—যত শীঘ্র পারে এদের খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে—হাতে হাতে প্রমাণ করে দিতে হবে, এরা যেটা চাচ্ছে, সেটা ভুল নয়, ফাঁকি নয়। হাজার বছরের বিরুদ্ধে দশ-পনেরো বছরে ভিতরে বলে পণ করেছে। অন্য দেশের তুলনায় এদের অর্থের জোর অতি সামান্য, প্রতিজ্ঞার জোর প্রচণ্ড

"এই যে বিপ্লবটা ঘটল এটা রাশিয়াতে ঘটবে বলেই অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করছিল। অন্যায়ের কত দিন থেকেই চলছে। খাত-অখাত লোক কত কাল থেকেই প্রাণ দিয়েছে, অসহ্য দুঃখ স্বীকার করেছে বিপ্লবের কারণ বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপক হয়ে থাকে, কিন্তু এক-একটা জায়গায় ঘনীভূত হয়ে ওঠে: সমস্ত শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে উঠলেও এক-একটা দুর্বল জায়গায় ফোড়া হয়ে লাল হয়ে ওঠে। যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকার সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।

"একদিন ফরাসী বিদ্রোহ ঘটেছিল অসাম্যের তাড়নায়। সেদিন যেখানকার পীড়িতেরা বুঝেছিল এই অসাম্যের অপমান ও দুঃখ বিশ্বব্যাপী। তাই সেদিনকার বিপ্লবে সাম্য ও সৌভ্রাত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের বাণী স্বদেশের গণ্ডী এপেরিয়ে উঠে ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু টিকল না। এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী। আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করেছে ……"

("রাশিয়ার চিঠি")

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্কট

গৌরীশঙ্কর রায় চৌধুরী

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যে সঙ্কটের কথা এখানে আলোচনা করতে চাই তার মূল কারণ হচ্ছে মানব-সম্পর্কের জটিল সম্বন্ধ : কিন্তু গৌণ কারণ হচ্ছে পরিকল্পনা সম্বন্ধে লোকের ভ্রান্ত ধারণা। সাধারণ লোকে মনে করেন যে পরিকল্পনা একটা কামধেনু বিশেষ যার শরীর থেকে ঝর ঝর করে পড়বে চাকরী, খাবার ইত্যাদি। অন্য দিকে যাঁরা নীতি কারোকরী করেন তাদের ধারণা দেশের লোক তাদের হওয়া উচিৎ এক একটী 'বামনের গরু'—যাতে খয় অথচ দুধ দেবে বেশী—তবেই না দেশের উন্নতি। এক নজরেই বুঝতে পারা যায় যে দুটী দৃষ্টিভঙ্গীই ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত এবং এর জন্য দায়ী হচ্ছে পরিকল্পনার বাস্তবধর্মী সমালোচনার অভাব। অথচ একথা সবাই মেনে নিয়েছেন যে জনসাধারণের আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা পাকা না হলে দেশের ঊর্ধ্বমুখী রাজনৈতিক চেতনাকে শান্ত রাখা অসম্ভব।

পরিকল্পনার উদ্ভব : পরিকল্পনার প্রসঙ্গে আমরা সমাজের সামগ্রিক রূপের কথাই আলোচনা করতে চাই। কেননা অর্থ বিশেষের স্তরে পরিকল্পনা সমাজ ইতিহাসের আফ্রিকাতেও খুঁজে পাওয়া যায় এবং এর পরাকাষ্ঠা দেখা যায় ধনিকতন্ত্রের কাঠামোয়। সমাজের এক অংশের সুবিধা ব্যতীত আর কোন সরাসরি উদ্দেশ্য এই ব্যবস্থার সৃষ্টিতে হয়নি। এই দৃষ্টিভঙ্গী সমাজের একটা পরিবর্তনের মুখে এনেছিল সম্পদবৃদ্ধির এক অভূতপূর্ব প্রতিযোগিতা। কিন্তু শতাব্দী পরিক্রমার শেষেই দেখা গেল যে, সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গে দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান সেই পরিমাণে উন্নত হয় না। বরঞ্চ সহরে একদলের বিত্তবের প্রাচুর্য আর গ্রামে এবং সহরতলীতে কৃষক শ্রমিকের অভাব ও দারিদ্র্য যেন সম্পদবৃদ্ধি কথাটাকে ব্যঙ্গ করতে থাকে। আরও দেখা গেল, ব্যবসায়ীদের মধ্যে বেপরোয়া ও অন্ধভাবনিত প্রতিযোগিতা প্রায়শঃই ডেকে নিয়ে আসে শিল্পের ক্ষতি ও শ্রমিকের বেকারত্ব। ছোট-খাট ব্যবসায়ীদের পক্ষে স্বাধীন ব্যবসা চালান ক্রমশঃই অসম্ভব হয়ে ওঠে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসার ক্ষেত্রে একচেটিয়া ও ট্রাষ্ট দানা বেঁধে ওঠে এবং অনেকক্ষেত্রে দেশের রাজনীতিকেও কলুষিত করে তোলে। ধনিকতন্ত্রের কাঠামোয় ব্যক্তির আর্থিক সমষ্টিকে সমাজের সামগ্রিক রূপ বলে স্বীকার করার যে প্রচেষ্টা চলেছিল তা' ক্রমশঃই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। ধন ও শ্রমের বিরোধটাই যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই সমাজে। ধন ও শ্রমের সহযোগিতাতেই উৎপাদন বৃদ্ধির স্বরূপ ও কিভাবে উৎপাদিত দ্রব্য ধন ও শ্রমের মধ্যে বণ্টন করা যায় তারই আলোচনা নিয়ে গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক শাস্ত্র। কিন্তু কিসের ভিত্তিতে ধন ও শ্রমের এমন পাকাপাকি সহযোগিতা গড়ে তোলা যায় যাতে দেশের সবাইর মঙ্গলসাধন হয় তার কোন সদুত্তর এ যুগের অধিকাংশ পণ্ডিতই আমাদের দিতে পারেন নি।

ধনিকতন্ত্রের কাঠামোয় পরিকল্পনার ধারণাকে দানা বাঁধতে সাহায্য করে যুদ্ধচেষ্টা। একটা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ব্যতীত যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদন শক্তি একজুটি করা অসম্ভব। কিন্তু পরিকল্পনা অপেক্ষাও অধিকতর লক্ষ্যের বিষয় যে যুদ্ধের সময় উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিরোধী স্বার্থগুলি সাময়িকভাবে সন্ধি করে। অধিক শ্রম, মুদ্রাস্ফীতি ও লোকক্ষয় ও আরও অন্যান্য দুর্ভাগ্যকে দেশের লোক মৃত্যুকে এড়ানোর জন্য মেনে নেয়। কেবল যুদ্ধের সময়ই নয়, যুদ্ধোত্তর কালে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে আবার ঢেলে সাজতে ধনিকতন্ত্র

চরম অক্ষমতার প্রমাণ দেয়। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে পৃথিবীজোড়া অর্থনৈতিক সঙ্কটই এর বড় প্রমাণ এবং এই সময় থেকেই ধনিকতন্ত্রের কাঠামোয় কেমন করে পরিকল্পনার নীতি ছুড়ে দেওয়া যায় তার চেষ্টা চলছে। আমেরিকার 'নিউ ডিল' হচ্ছে এর প্রথম নমুনা উপস্থিতি। আমেরিকার চেষ্টা বিফল হয়। যুদ্ধের সময় সমাজের অনেক অধিক সম্পর্ককে জরুরী অবস্থার দোহাই দিয়ে ধামাচাপা দিয়ে রেখে একযোগে কাজ করার যে আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়, শান্তির সময় তা' অটুট থাকে না।

আমেরিকার পরিকল্পনার প্রায় দশ বছর আগে সোভিয়েট রাশিয়ায় সর্বতোমুখী পরিকল্পনা চালু করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিপুল ক্ষতির পরেও রাশিয়ার উৎপাদন শক্তির বিস্ময়কর বৃদ্ধি দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে এরা সম্পদবৃদ্ধির চেষ্টায় কী অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করেছে। যে মূল দর্শনের ওপর এদের পরিকল্পনার ভিত্তি তা' হচ্ছে শ্রমই সব উৎপাদনের প্রধান শক্তি এবং যেহেতু তারা সমস্ত সম্পদের উপর সমাজের অধিকার সাব্যস্ত করে শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিকে অপসারিত করেছে।

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা : মহাযুদ্ধের অবসান, ভারত সরকারের রাজনৈতিক সকল ক্ষমতা প্রাপ্তি, ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগ.....একের পর আর এক ঘটনা চক্রের আবর্তে লাটিমের মতোন ঘুরতে থাকে ভারতের ভাগ্য। দেশের লোকেরা নিজেদের দুর্ভাগ্যকেই পরিহাস করে ওঠে। অবশ্য প্রাণ বাঁচার আশায় পথ খোঁজে। দেশের প্রথম গঠনমূলক দলিল তৈরী হয় ১৯৫১ সালে—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

সমাজের যে পটভূমিকায় আমাদের পরিকল্পনার রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তার মধ্যে যে দুটী জিনিস বিশেষ করে নজরে পড়ে তা' হচ্ছে (১) ডেমোক্রেসি ও (২) সমাজের সামগ্রিক রূপ। প্রথমটীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে 'বহুদল বিশিষ্ট রাজনৈতিক কাঠামো', আর দ্বিতীয়টী জন্ম নিয়েছে সমাজে অর্থনৈতিক প্রগতির সম্পর্কে শ্রেণীদ্বন্দ্বের উপেক্ষায়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে সমাজে জাতি, সম্পত্তি ও আয়ের ভিত্তিতে শ্রেণীবৈষম্য বর্তমান। কিন্তু এই ঐতিহাসিক তথ্য অস্বীকার না করেও ধরে নেওয়া হচ্ছে যে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব।

পরিকল্পনা প্রসঙ্গে প্রথমেই কতকগুলি পরস্পর 'বিরোধী' অবস্থার সম্ভাবনাকে স্বীকার করা হয়েছে। যেমন :

(১) বর্তমানে জীবন যাত্রার মান উন্নত করলে ভবিষ্যতে উৎপাদন-হার কমে যাবে। যদি এ যুগের লোকেরা অধিক পরিমাণে শ্রম করে এবং জীবনযাত্রার মান নীচু রেখে ভবিষ্যতের জন্য বাঁচায় তবেই উন্নতি সম্ভব অর্থাৎ বর্তমান জীবনযাত্রার মান বাড়ানো ও ভবিষ্যতে উৎপাদন বাড়ানো এ দুটোর মধ্যে একটা পছন্দ করে নিতে হবে। দুটো এক সঙ্গে সম্ভব নয়

(২) চাকুরী বাড়ানোর দিকে লক্ষ্য রাখলে এমনও হতে পারে যে অর্থ-আয়ের (money income) সঙ্গে সমতা রেখে উৎপাদন না বাড়তেও পারে অর্থাৎ আমাদের মনে রাখতে হবে দ্রব্য উদ্বৃত্ত হচ্ছে দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো

(৩) বর্তমান আয়-বৈষম্য কমালে দেশের উদ্বৃত্ত প্রয়োজনীয় হারে না বাড়াতেও পারে। অবশ্য পরিকল্পনাবিদরা এটা মেনে নিয়েছেন যে দেশের আয় থেকে প্রয়োজনীয় অংশ পুনরায় বিনিয়োগের জন্য বাচিয়ে রাখার অন্য কোন উপায় থাকলে আয়-বৈষম্য কমানো ও উদ্বৃত্ত বাড়ানো এ দুটী এতো বেশী পরস্পরবিরোধী হবে না

উল্লিখিত প্রথম দুটী সম্ভাবনা থেকে আমরা উপদেশ পাই তা হচ্ছে, বর্তমান যুগের লোকের জীবন-যাত্রার মান উঁচু করা চলবে না : আর চাকুরী ও অর্থ-আয়ের সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্য উৎপাদনও অধিক হারে বৃদ্ধি পাওয়া চাই। এ দুটো নীতিই সমাজের সামগ্রিক রূপকে লক্ষ্য করে বললেও এর বোঝা গিয়ে পড়ে দেশের চাষী ও শ্রমিকদের কাঁধেই। অথচ মন বাঁচানোর ক্ষেত্রে

উচ্চবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক উৎকর্ষ স্বীকার করা হয়েছে। কারণ নিম্নবিত্ত সমাজে আয়ের প্রায় সবটুকুই খরচ হয় বর্তমান জীবন ধারণের প্রয়োজনে।

এই প্রসঙ্গে দেখা যাক্ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী খাতে ব্যয়ের ৮৮০০ কোটী টাকা কোথা থেকে যোগাড় হবার সম্ভাবনা রয়েছে :—নতুন কর ৪৫০ কোটী এর বেশীর ভাগই আসবে দ্রব্যকর থেকে : ঘাটতি বেড়িস ৫০০ কোটী—দেশের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর আয়ের অংশ : প্রভিডেণ্ট ফণ্ড ১৫০ কোটী, রেলওয়ে ১৫০ কোটী —এও দেশের ছোট খাওয়া সম্প্রদায়ের অবদান : মুদ্রা-স্ফীতি ১৮০০ কোটীর চাপ পড়বে সাধারণ লোকের জীবন-যাত্রার উপর : বিদেশ থেকে ধার করার খাতে ৮০০ কোটী টাকার দায়িত্ব পড়বে সরকার তথা জনগণের কাঁধে। বিত্তবান শ্রেণী থেকে করের অংশ বাদেও ১০০ কোটী টাকা আসবে ধার হিসাবে। তাছাড়া চলতি আয়ের খাত থেকে ১৫০ কোটী টাকা আসবে যার অনেকটাই ওঠে দ্রব্যকর থেকে এর সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশের প্রায় অর্দ্ধেক লোক মাসে মাথা পিছু মাত্র ১৩ টাকা জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য খরচ করতে পারে (দ্বিতীয় পরিকল্পনা রিপোর্ট পৃষ্ঠা ৫)।

এই আলোচনার সাহায্যে আমি এইটুকুই বোঝাতে চাই যে পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নতির মূল বোঝাটা বইতে হবে দেশের মেহনতী জনতাকে। অবশ্য এর মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই, কেননা এটা সর্বদেশে সর্বকালের কথা। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গীকে সমাজের একটা সামগ্রিক রূপের মধ্যে আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে। অথচ কার্যক্ষেত্রে এই শ্রেণী-বিরোধ প্রতি পদেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন আমরা জানি জাতীয় আয়ের অন্ততঃ শতকরা ১২-১৫% বাঁচিয়ে উন্নতির জন্য পুনরায় বিনিয়োগ না খাটাইলে আয়বৃদ্ধি অসম্ভব। কিন্তু এ ব্যাপারে :

(ক) দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান উঁচু করলে চলবে না। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে এই সাধ্য মানে রোজকার খাওয়া কমানো। অথচ সহরে ও গ্রামে, ধনী সম্প্রদায়ের বাড়তি খরচ (যেমন নানা বিলাসে অথবা উৎসবে) কমানো আর কৃষাণ মজুরের খাওয়া কমানো এক কথা নয়।

(খ) বিত্তবান শ্রেণীর আয়করের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ার বিরাট বাধা হচ্ছে যে তাতে ব্যবসায়ীদের উৎসাহ কমে যেতে পারে। অথচ দ্রব্যকর ও মুদ্রাস্ফীতি নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রাকেই বেশী আঘাত করে।

(গ) একমাত্র উপায় হচ্ছে কম দ্রব্যবেষ্টনে (real wage) বেশী কাজ করা। একদিকে মেহনতী জনতার শ্রম অন্যদিকে কাজের পরিকল্পনা—জাতীয় আয়বৃদ্ধির এই-ই প্রধান সহায়। কিন্তু জাতীয়করণের ব্যাপারে যেখানে বিত্তবান শ্রেণীকে আমরা সম্পত্তির বাজার মূল্য দিচ্ছি, ব্যক্তিগত আয়ের উচ্চসীমা নির্দ্ধারণে কুণ্ঠিত হচ্ছি, সেখানে কারখানার শ্রমিক, অফিসের কেরাণী ও স্কুলের শিক্ষকদের অল্প বেতন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয় ধর্মঘট।

কাজে কাজেই আমরা মূলধন বিনিয়োগ করার পরও দেখছি বেকার সমস্যা বেড়েই চলেছে। চাকরী বাড়াতে গিয়ে দেখছি দ্রব্য উৎপাদনের হার একরত্তিও বাড়ছে না। দ্রব্য-উৎপাদনের উপর জোর দিতে গিয়ে আবিষ্কার করছি যে অর্থ-আয় (money-income) বিপজ্জনকভাবে বেড়ে চলেছে। তাড়াতাড়ি কর ও সুদের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি কমাতে গিয়ে লক্ষ্য করছি যে-সরকারী খাতে মূলধন বিনিয়োগ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। সামগ্রিক অর্থনীতি ক্ষেত্রে এই বিরোধ ছাড়াও অন্যদিকে আংশিক ক্ষেত্রে মিল বনাম কুটীরশিল্প; সরকারী বনাম বে-সরকারী শিল্প; সহর বনাম গ্রামের বিরোধ যেন ঘোঁট পাকিয়ে উঠছে। আপাতদৃষ্টিতে এই বিরোধগুলি খুবই ভয়ঙ্কর মনে হলেও আসলে এ নিয়ে বেশী মাথা ঘামাচ্ছে সেই সব লোকেরা যাদের কাছে সমাজ-সংসার চেয়ারে বসেই হয়। কিন্তু সত্যিকারের কাজের ক্ষেত্রে

নেখে অর্থনীতিজ্ঞরা স্বীকার করেছেন যে পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করছে দেশের ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়ের মনোভাব পরিবর্তনের উপর ("The success of such planning no doubt depends on the classes in positions of power and privilege respecting the democratic system and appreciating the rapid changes it calls for"—First Five Year Plan Report p 31).

পরিকল্পনা—নীতি ও সঙ্কটের স্বরূপ :—ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আলোচনা প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের জনসাধারণের জীবনে সমাজতন্ত্রের এক রূপ প্রবর্তন করা। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর অমিয়কুমার দাশগুপ্ত মনে করেন যে ভারতের পরিকল্পনাতে আর যাই থাকুক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাল মশলা খুব কমই আছে। তার কারণ ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে কেমব্রিজের অধ্যাপক পিগুর মতানুযায়ী বিশ্লেষণ করলে—অর্থাৎ ধীরে ধীরে ধনিকতন্ত্রের কাঠামো বদলে দেওয়া (to modify it gradually)—অধ্যাপক দাশগুপ্ত আমাদের পরিকল্পনার নীতি ও কাজের সামঞ্জস্য খুঁজে পান নি। সমাজতন্ত্রের যে দুটী নীতির কথা অধ্যাপক দাশগুপ্ত উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে : (১) ব্যক্তিগত মুনাফার বিলোপ ও (২) জাতীয় সম্পত্তিতে দেশের অধিকার। আয়কর সাহায্যে মুনাফা নিয়ন্ত্রণ ও সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত মুনাফা মেনে নেওয়া নীতিগত বিরোধেরই পরিচয় দেয়। সম্পত্তিতে জনসাধারণের অধিকারের ব্যাপারে অধ্যাপক দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন সরকারী সম্পত্তির পরিমাণ অনুপাতে বাড়লেও বে-সরকারী সম্পত্তির পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বেড়ে চলেছে। এখানে আমরা একটু বিশদভাবে হিসাব করলে অধ্যাপক দাশগুপ্তের মত প্রমাণিত হবে প্রথমেই মনে রাখা ভাল আমাদের দেশে সম্পত্তির পরিমাণের খুব একটা সঠিক হিসাব নেই। তবুও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (পৃঃ ৩২) যে হিসাব দেওয়া আছে তাতে সরকার পক্ষে সম্পত্তির মূল্য ১৩৩৬ কোটী টাকা আর বে-সরকারী ক্ষেত্রে ১৬৭২ কোটী টাকা। প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী খাতে ২০০০ কোটী টাকা—বে-সরকারী খাতে ১১০০ কোটী টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়নমূলক খরচ সরকারী খাতে ৬৮০০ কোটী টাকা (আর ১০০০ কোটী খরচ হবে চলতি উন্নয়নমূলক খরচার খাতে) আর বেসরকারী খাতে ২৪০০ কোটী টাকা। একুনে সরকারী সম্পত্তির মূল্য হয় ৯১৩৬ কোটী টাকা আর বে-সরকারী খাতে সম্পত্তির মূল্য ৪৯৭২ কোটী টাকা। দেশের মোট সম্পত্তির (ছোটখাট সম্পত্তি, বসবাসের বাড়ী বাদ দিয়ে—প্রথম পরিকল্পনা রিপোর্ট পৃঃ ৩২) প্রায় ৫৯% সরকারের এবং ৪১% বেসরকারী। ১৯৪৬—৪১ সালের অবস্থা থেকে এই সম্পর্ক অনেক আশাপ্রদ মনে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার হিসাব মত ১৯৬১ সালে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ ১৯৫০ সালে যা ছিল তা' থেকে আড়াই গুণ বৃদ্ধি পাবে। এই সময়ের মধ্যে সরকারী সম্পত্তিও বাড়ছে কিন্তু সম্পত্তির অনুপাত বৃদ্ধি আর সম্পত্তির উপর দেশের অধিকার তারী কী এক কথা।

অধ্যাপক দুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারতের পরিকল্পনা গঠনে যে দুটী দোষের কথা উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে : (১) একটী সুষ্ঠু রাষ্ট্রনীতির অভাব আর (২) কেইনসের অর্থনীতির প্রভাব। ঠিক কি রকম নীতির পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা গঠন করা সম্ভব সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, যদি কয়েকটী নীতির সংমিশ্রণেই আমাদের নীতি গড়ে তুলতে হয় তবে ম্যালথাস ও কেইনস্ অপেক্ষা "রিকার্ডো ও মার্ক্সের নীতির সংমিশ্রণই আমাদের পক্ষে ভাল (If Indian economic thinking is to be a cross-breed at any event, let it be a cross between Ricardo and Marx, rather than one of Malthus and Keynes—Economic Weekly—June 18, 1955 P. 692). তার কারণ, দুর্জটি বাবুর মতে ধনিকতন্ত্রের কাঠামোয় কোনরূপ শ্রমিক বেতন নীতি (Theory of wage) বা মুনাফা নীতি (Theory of profit) গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আর

সংমিশ্রিত আর্থিক কাঠামোয় (mixed economy) এ সব নীতির অত্যন্ত ফাঁকা আলোচনা হয় ('I also suspect that a mixed economy cannot have it either, except in extra-economy terms, like social justice, social welfare, which are beautifully vague'—ibid P. 692).

এখন সংক্ষেপে দেখা যাক্ দুর্জটি বাবু উল্লিখিত অর্থ-নীতিবিদদের মূল বক্তব্যটা কী : টমাস ম্যালথাস ও মেনার্ড কেইনস্ দুজনেই সরাসরি গোটা সমাজকে নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে উৎপাদন কমে যাওয়া এবং এদের মতে লোকের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ কমে যাওয়ার এই সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। কিন্তু লোকের হাতে অর্থ আসবে কি করে! এদিকে ম্যালথাস সাহেব তো শ্রমিকদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের (Subsistence wage) বেশী দেওয়া বিপদ মনে করতেন, কারণ তাতে জনসংখ্যা বেড়ে গিয়ে শ্রমিকদের বেতন কমিয়ে আনবে। কেইনসও কোন পরিস্থিতে বণ্টননীতির ধার দিয়ে যান নি এবং উৎপাদনের উৎস চালু রাখার জন্য তিনি চাকরী বাড়াতে বলেছেন। প্রয়োজন বোধে দেশের সরকার চালু বেতনে (current wage) লোক নিযুক্ত করে যাবার ঠিক রাখবে তবে যাতে ব্যবসায়ীদের উৎসাহ থাকে সেজন্য জিনিসের দামের ওপর চড়িয়ে দিতে হবে। শ্রমিকের অর্থ আয় বজায় রেখে দ্রব্য মূল্য বাড়িয়ে দিলে চাহিদাই বজায় থাকবে। লোকের চাকরী বজায় থাকলে, উৎপাদন চালু থাকলে আয় মুদ্রাস্ফীতিকে বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছতে না দিলেই বণ্টননীতি নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না—এই ছিল কেইনসের মত। অন্য দিকে দেশের উন্নয়নের জন্য যে সঞ্চয়ের প্রয়োজন তাতো সব লোকই কিছু না কিছু করে কারণ মানুষের যা আয় তার সবটা সাধারণত খরচ করে না। আর যদি জাতীয় আয় বাড়াতে হয় তবে সরকার নূতন বিনিয়োগ যার করে শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে বর্ধিত আয়ের সঞ্চয়ের অংশ সেই প্রথম বিনিয়োগকে বাঁচিয়ে রাখবে।

ম্যালথাসের সমসাময়িক ডেভিড রিকার্ডো কিন্তু বণ্টন-নীতির উপর খুব জোর দিয়েছিলেন। এই নীতির আলোচনা প্রসঙ্গেই তিনি সমাজের মধ্যে বিরোধী স্বার্থের সন্ধান পেয়েছিলেন। জমির মালিক সম্প্রদায় হিসাবে যে খাজনা (Rent) পেয়ে থাকেন তাতে যে তার কোন অবদান নেই একথা রিকার্ডো তার বিশ্লেষণে প্রমাণ করেছেন। রিকার্ডোর বিশ্লেষণের পেছনে ছিল যুক্তির স্বচ্ছতা। মার্ক্স তো বণ্টননীতি ও উৎপাদন নীতিকে একে অন্যের পরিপোষক বলে মনে করতেন। তিনি সমাজকে ধনিক ও শ্রমিক এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন এবং তার বিশ্লেষণ অনুযায়ী শ্রমিকদের বেতন ঠিক হয়—যেমন আরও পাঁচটা দ্রব্যের দাম ঠিক হয়—চাহিদা ও সরবরাহের মাধ্যমে। অথচ দ্রব্যের মূল্য ঠিক হয় শ্রমের ভিত্তিতে এবং শ্রমিক তার নিজের প্রয়োজনের বেশী তৈরী করে। এই বাড়তি মূল্য ধনিকের মুনাফায় পরিণত হয়ে সঞ্চয়ের যোগান দেয়। এই সঞ্চিত ধনের পুনর্নিয়োগ শ্রমের সাহায্যে আরও ধনের সৃষ্টি করে—এই ভাবে চলে ধনিকতন্ত্রের কলকব্জা। সমাজের দুটী অংশ ও সব বণ্টনের মধ্যে তাদের সম্পর্কে কেমন করে উৎপাদন ক্ষেত্রকেও নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্লেষণে এই ছিল মার্ক্সের প্রতিপাদ্য বিষয়। মানব সভ্যতার বিরাট ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই বিশ্লেষণ তথ্যের দ্বারা প্রমাণ করেন।

ভারতের অর্থনীতি বিশ্লেষণে যে নীতিগত গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে, দেশের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ দেশের এবং প্রতিবেশী অনেক দেশকে শিল্পের ক্ষেত্রে 'পেছিয়ে পড়া' দেশ বলা হয়। সম্প্রতি আমাদের প্রত্যেকে নিজের দেশের সমস্যার বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়ে একটু আলাদা হতে চান। কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে কয়েকটী এক রকম ঘটনা এই দেশগুলিতে লক্ষ্য করা যায়; চাষীদের হাতে অর্থ এলে তারা শ্রম কমিয়ে দেয়; পুঁজিপতিরা টাকা নিয়ে শেয়ার বাজারে ছুরা খেলে রাতারাতি বড়লোক হতে চেষ্টা করে; মহাবিত্ত শ্রেণী জমি, বাড়ী ইত্যাদিতে টাকা আটকে ফেলে। এর কারণটা কী!

ইউরোপের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে, সেখানে এক কালে ফিউডল লর্ডরা রাজনীতি ও অর্থনীতি দুই-ই সমানভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন। বণিকতন্ত্র মাথা তুলে দাঁড়াল তখন, যখন দেশের মাল বিক্রয় করার জন্য লর্ডদের প্রজাদের ক্রয় ক্ষমতার উপর নির্ভর না করে বিদেশী বাজারের সুযোগ পায়। ক্রমে বিদেশী বাজার শোষণের কাজে ফিউডল লর্ডরা বণিকদের সব রকম আইনের সুবিধা দেয়। বণিকতন্ত্রের ফেঁপে ওঠার মূলে ছিল একটা শক্তিশালী 'নেশন্'। বণিকতন্ত্র থেকে ধনিকতন্ত্রের পথ খুব সুগম ছিল না তবুও বণিকতন্ত্র তার উত্তরাধিকারীর জন্য বিদেশী বাজার, বিদেশ থেকে আনা সম্পদ, প্রচুর কাঁচা মালের উৎস, একটা বিরাট বন্ধনমুক্ত শ্রমিকশ্রেণী ও একটা শক্তিশালী নেশন রেখে যায়। ইউরোপের ধ্বংস ও নিষ্কেদের ঘরোয়া বিভেদে যে দেশ জয়ী হতে পেরেছে সেই বৃটেন ধনিকতন্ত্রের সেরা দেশ বলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত সারা দুনিয়ায় আধিপত্য রেখেছিল। শ্রমিকদল নিজের কথা বলতে চাইলেও এ সময় বলতে পারে নি কারণ তাদের রাজনৈতিক চেতনা ও সংগঠন কিছুই ছিল না বল্লেই হয়। কিন্তু আজ যখন শ্রমিক তার কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন তখন দেখা যাচ্ছে ধনিকতন্ত্রের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি হচ্ছে ধন ও শ্রমের বিরোধের উপর।

উপরের ছকে যদি ভারতের ইতিহাসকে আলোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে ইউরোপীয় ধরণের ফিউডল লর্ডস্ বা নেশন ভারতবর্ষে আগে কোন দিনই ছিল না। দেশের অর্থনীতি কখনই রাজনীতির গুরুত্বকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। অভাব ও দারিদ্র্যকে মহান্ বলে প্রচার করে দেশের ধর্ম চিরকালই জনসাধারণের বাস্তব চেতনাকে নিরুৎসাহ করেছে। বণিকের বাণিজ্য শহর ছেড়ে কোনো দিন গ্রামের জীবনে তরঙ্গ তোলে নি। জমির মালিক অত্যাচার করেছে সত্য, কিন্তু তার ফলে লোকে নতুন পথে আয়ের কথা চিন্তা করে নি। আসল কথা, দেশের জনতার ব্যবহারের জন্য বা বাইরের বাজারে বিক্রীর জন্য বস্তু উৎপাদনের নীতি পুরোপুরিভাবে কখনই গ্রহণ করা হয় নি। এখানে সাম্রাজ্য একবার গড়ে উঠেছে আবার ভেঙ্গে শতখ্র টুকরো হয়ে গিয়েছে কিন্তু বণিকের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজশক্তি খুব কমই তার দণ্ডকে ব্যবহার করেছে। এক কথায় রাজা, সামন্ত ও বণিকের এক জুটি বৃটিশ পূর্ব যুগে মোটেই দেখা যায় নি। বৃটিশ যুগে রাজা বিদেশী বণিক ও বিদেশী—আর সামন্ত! ক্ষমতাহীন পুতুলমাত্র। ক্রমে দেশের ব্যবসায়ীরা নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু এরাও তেমন সুবিধা করতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কি, উৎপাদন ক্ষেত্রে জনতা বাতীত অন্য অংশে যে বিরাট গোলমেলে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য পেছিয়ে পড়া দেশগুলি বোধ হয় আজও সেই ঘূর্ণিতে ঘুরছে।

আজকের আধিক ডেমোক্রেসীর আওতায় এই উপরের দলগুলির কি অবদান, ভবিষ্যত সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় এদের স্থান কোথায় সে বিষয়ে পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞরা নিঃসন্দেহ হয়ে উঠতে পারেন নি। বর্তমানে—এদের মুনাফা কমবাড়তি হচ্ছে কি-না; কী রকম করপ্রথা এদের বাণিজ্য-উৎসাহ ক্ষতি করবে না; কী কী ব্যবসা এদের হাতে থাকা উচিত এই সব সমস্যা নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। অথচ আমরা এও জানি দেশের উৎপাদনে প্রধান শক্তি আমাদের বিশাল জনতা। বর্তমানে কম খেয়ে ভবিষ্যতের জন্য মূলধন বিনিয়োগ—কম বেতনে এবং অধিকশ্রমে উৎপাদন বাড়ানো—এ সবের ক্ষমতা তাদেরই হাতে। ভবিষ্যতের উপর যদি এদের আস্থা ক্ষীণ হয় তবে এরা কিছুকেই পরের দিনের জন্য সঞ্চয় করবে না। কিসে পুঁজিপতিদের উৎসাহ ঠিক থাকে আর কিসে দেশের মেহনতী জনতার ভবিষ্যতের উপর আস্থা বেড়ে যায় এবং সেই নীতি দুটো পরস্পর বিরোধী কি-না সে বিষয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখার সময় এসেছে।

বিশেষজ্ঞরা কি বলেন: যে যুগে আমরা এখন বাস করি সেটাকে বিশেষজ্ঞদের যুগ (the age of experts) বললে ভুল বলা হবে না। কাজেই, আমরা কিছুক্ষণের জন্য ভারতের পরিকল্পনার উপর বিশেষজ্ঞদের মত আলোচনা করব। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গঠন

কালে ভারত সরকার দেশের প্রধানতম বাইশজন অর্থনীতিজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করেন। তাঁদের মতামত প্রবন্ধাকারে প্রকাশ হয়েছে (Papers Relating to the formulation of the Second Five year Plan by Panel of Economists; Government of India. Planning Comnission, 1955' এই বই এ ৪৭টী প্রবন্ধে পরিকল্পনার নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তার মধ্যে তেরটী প্রবন্ধ আছে পরিকল্পনা গঠনে দেশের নানারূপ সংস্থা ও পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতির উপর (Policy of Institutional Implications).

এই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে দু'রকম চিন্তা ধারার খোঁজ পাওয়া যায়। একদল খুঁজে বেড়াচ্ছেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা রূপ আনুপাতিক সম্পর্ক (ratios of economic variables). সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে উৎপাদন ক্ষেত্রের জটিল সম্পর্ককে তাঁরা মূলধন বিনিয়োগ : সঞ্চয় ; চাকুরীর মোট সংখ্যা ; দ্রব্য মূল্যের সাধারণ স্তর : আয়, চাকুরী ও মূলধন বিনিয়োগের গুণক (Income, Employment and Investment multiplier) : মূলধন বিনিয়োগের ত্বরণ (acceleration of Investment) ইত্যাদি মাপে সহজ করে এনেছেন। এসব উপরের সংজ্ঞাগুলির আনুপাতিক সম্পর্কগুলি জানতে পারলেই পরিকল্পনা গঠনের কাজ সহজ হয়ে আসে। অথচ আমরা এও জানি যে এই আনুপাতিক সম্পর্কগুলো বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে একেবারে আলাদা আর এগুলো দেশ পরিবর্তনশীল এবং এগুলোর পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে কেহই স্থিরমত নন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে চীন দেশে কৃষির ক্ষেত্রে প্রায় ৩৫% বেশী উৎপাদন হয়েছে কাজের সংগঠনের উন্নতির জন্য (organisational revolution)। এই সম্পর্কগুলি অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ কাজে দেয়, কিন্তু আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, একটী পরিবর্তনশীল সমাজ কাঠামোর আনুপাতিক সম্পর্কই প্রধান ব্যাপার নয়।

এই কারণেই আর একদল দেশের সমাজজীবনের সঙ্গে পরিকল্পনার যোগাযোগ যাচাই করে দেখছেন। তাঁদের গুণবাচক বিশ্লেষণের (qualitative analysis) যা সারমর্ম তা' হচ্ছে :

(১) কোন কোন ক্ষেত্রে দেশের সামাজিক সংস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন।

(২) সমাজের উপরের স্তরের লোকের খরচের বহর যথেষ্ট কমিয়ে দিয়ে একটা সমতার আবহাওয়া সৃষ্টি অবশ্যকরণীয়।

(৩) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ পরিচালনার ক্ষমতা যে বিশেষ বিশেষ দলের হাতে নিহিত তাদের সহযোগিতা চাই।

(৪) উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্ণক্ষমতা রয়েছে দেশের আবাল-বৃদ্ধের কম পারিশ্রমিকে কাজ করার আগ্রহে।

(৫) গ্রাম ও শহরের মধ্যে রয়েছে এক আর্থিক ও সামাজিক ব্যবধান। যথাশীঘ্র সম্ভব এই ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়া উচিত।

দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরোক্ত দোষগুলির বিলোপ সাধনের জন্য এই বিশেষজ্ঞরা যে নির্দেশ দিয়েছেন তার মর্মার্থ হচ্ছে :

(১) কর-নীতির পরিবর্তন : (ক) অধ্যাপক কালডোর বর্ণিত পাঁচ দফা করের সাহায্যে উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের খরচ কমানো।

(খ) দেশের গ্রাম অংশে (rural sector) নতুন করের প্রবর্তন।

(২) সাধারণ লোকের উপভোগ্য খাদ্যদ্রব্যের (wage goods) উৎপাদন বৃদ্ধি।

(৩) সরকার কর্তৃক দেশের অন্তর্বাণিজ্য চালনা করা।

(৪) পরিকল্পিত উপায়ে নতুন শহরের গোড়াপত্তন করে গ্রাম ও শহরের বিভেদ দূরীকরণ।

(৫) শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিকের অধিকতর সহযোগিতার প্রবর্তন।

এবং দেশের জীবনযাত্রার উপরের নির্দেশ অনুযায়ী হয়ে থাকে তা' হচ্ছে এই সরকারী কর্মচারীদের। বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নের ভার হচ্ছে দেশের আমলাতন্ত্রের উপর। অথচ দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর যদি কোন দলের সবচেয়ে কম পরিবর্তন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ মিঃ এপেলবি তাঁর রিপোর্টে ও আমাদের দেশের 'গোরওয়ালা কমিটি' এ নিয়ে খুব আলোচনা করেছেন।

উইলিয়ম কেরী ও বাংলা ভাষা

—সজনীকান্ত দাস

বাংলা দেশে কেরীর অপর সকল কীর্তিও যদি কোন দিন নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়, বাংলা-সাহিত্য বাঁচিয়া থাকিলে কেরী স্বমহিমায় চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, কারণ তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে ভদ্র ও শিক্ষিত জনের আলোচ্য ভাষার মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। এক দিক হইতে আরবী ও ফারসী এবং অন্য দিক হইতে সংস্কৃতের চাপে বাংলা ভাষার যখন মৃতকল্প অবস্থা, তিনিই তখন আশ্চর্য রকম দূরদৃষ্টি দেখাইয়া এই ভাষার আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই; অন্য প্রাদেশিক বা প্রচলিত ভাষার প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া সংস্কৃতানুসারিণী বাংলাকেই তিনি প্রচলিত ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচার মৌখিক প্রচারমাত্র নয়, তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ ঐতিহ্য ও দীর্ঘ জীবনের সাধনার দ্বারা মুখের উক্তিকে সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন—একটি বৃহৎ জাতির অন্তরের সর্ববিধ ভাব প্রকাশের পক্ষে এবং সাংসারিক ও ব্যাবহারিক সকলবিধ প্রয়োজন সাধনের পক্ষে বাংলা ভাষার মাত্রাই যথেষ্ট; মাতা সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনও ভাষার উপর নির্ভর না করিলেও তাহার চলিতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বৈদেশিক কেরী যাহা বুঝিয়াছিলেন, বাঙালী প্রধানদের তাহা সম্যক্ প্রণিধান করিতে আরও শতাব্দীকাল সময় লাগিয়াছিল। কিন্তু কেরীর সেদিনকার চিন্তা ও ভাবনার ফসল আমরা পাইয়াছি এবং পাইয়া লাভবান হইয়াছি।

কেরীর এই ভাবনার সাক্ষ্যস্বরূপ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাউন্সিলকে লিখিত তাঁহার ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের একটি পত্র আমরা পাইয়াছি। কলেজের আর্থিক অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ, কর্তৃপক্ষ এই অজুহাতে কলেজের বাংলা-বিভাগ উঠাইয়া দিবার আয়োজন করিতেছিলেন; এই ব্যবস্থায় বৃদ্ধ কেরী মর্মে আঘাত পাইয়া লিখিয়াছিলেন—

Convinced as I am that the Bengalee language is superior in point of intrinsic merit to every language spoken in India, and in point of real utility yields to none, I can never persuade myself to advise a step which would place it in a degraded point of view in the College. While therefore a first and second pundit are retained in the Persian and Hindoostanee Departments I must consider them as equally necessary in this.

...It is to be hoped that the present unprecedented and unmerited neglect of the Sanskrit and Bengalee languages will not continue...

18 August 1822.　　W. Carey.

এই গোষ্ঠীপতি উইলিয়ম কেরীই বাংলা-সাহিত্যের চিরস্মরণীয়।

ভবিষ্যতের যেই উত্তরাধিকার আমরা অর্জন করিয়াছি, সুতরাং কেরীকে স্বীকার করার মধ্যে আমাদের পূর্বপুরুষকে স্মরণের পুণ্য আছে।

(সাহিত্য সাধক চরিতমালা)

মানুষ ! মানুষ !

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্পনা উদ্ভ্রান্ত পাখা উড়ে যায় উচ্চ বায়ুস্তরে
পৃথিবীর স্নেহ-বাষ্প যেথায় ওঠে না,
যেথায় সূর্যের আলো চূর্ণ হয়ে শুধু
নীল রঙটুকু তার দিয়েছে ছানিয়া ;
অন্য রঙগুলি সব—রক্ত পীত সবুজের গুঁড়া—
ফেলিয়া দিয়াছে নীচে
জরা-করাঙ্কিত মাটির পৃথিবী ধূলি বুকে।

উত্তুঙ্গ উর্ধ্বতা হতে
দূর-বীক্ষ স্নেন চক্ষু মেলি
দেখি চক্র-দিগন্তের কলঙ্ক-পরিখা।
সাগরের কালো জলে আণবিক বিষাক্ত বুদ্বুদ—
সবুজ শৈবাল ঢাকা মাটির প্রাঙ্গণে
মানুষ-ক্রিমির সাথে মানুষ-ক্রিমির মহারণ।
বুদ্ধিহীন এই যুদ্ধ, হিংসার শাশ্বত অভিযান
নখ-দন্ত শোণিত পঙ্কিল.....

অনাহত দৃষ্টি কল্পনার,
কণ্ঠে তার বর্বর কৌতুক
খলখল হাসে অট্টহাসি—
মানুষ ! মানুষ !
দুর্গন্ধ গলিত-কৃষ্ণ ভণ্ডস্ত মানুষ !
যুগ-যুগান্তর ধরি অযুত পুরুষ-পরম্পরা
তপস্যা করেছে শুধু ক্রূর জিঘাংসার
নিষ্ঠুর লোভের
অভ্রংলিহ উদ্ধত মদের—

আপনার জন্মস্তম্ভ রচিয়াছে আপন কঙ্কালে।
সুদূর ভবিষ্য পানে চাই—
অমৃতের পুত্রদের চিহ্ন দেখা নাই,
আছে শুধু ঊর্ধ্বে নীলাকাশ
আর নিম্নে কঙ্কাল মিনার।

সহসা উন্মীল পাখা কল্পনার খসে পড়ে ডানা
নেমে আসি উল্কার মতন,
নিভে যাওয়া উল্কা-ভগ্ন ধরণীর বুকে ঝরে পড়ে।
ফিরে যাই পূতিগন্ধ নীড়ে,
জীবন সঙ্গিনী সেথা প্রতীক্ষা করিয়া আছে
ক্লান্ত চোখে ক্ষুধার্ত অন্তরে।
বসি গিয়া তার পাশে
শুনাই কাকলি ভরা সুরে—
বল, সখি, ভালবাসো কিনা!

মা ও ছেলে

সোমেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(৩)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কারুর সাড়া নেই।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করে ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

মরণ নেই!

যেখানে তার বিছানা ছিল সেখানে একটি মাটির প্রদীপ মিট্ মিট্ করে জ্বলছে। সেইদিকে মুখ করে, হাঁটু গেড়ে বসে, মাটিতে মাথা রেখে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সুনন্দা। মাথার কালো চুলের রাশি তার মুখখানি ঢেকে মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। প্রদীপের অস্পষ্ট আলোয় তার সেই নীরব নিথর মূর্তি দেখে ডাক্তারের মনে হল যেন তিনি কোনো শিল্পীর আঁকা একটি শোকের ছবি দেখছেন।

আর পা আর উঠলো না তাঁর।

সাড়া দিয়ে সুনন্দার ধ্যানভঙ্গ করতে তাঁর ইচ্ছে হল না। মনে হল, শোকের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করা হবে। অথচ, সুনন্দার শোকে সমবেদনা না জানিয়ে চলে যাওয়াও যায় না!

ডাক্তার কি করবেন ভেবে না পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হঠাৎ সুনন্দা মুখ তুললে।

ডাক্তারকে দেখে ডাকলে—আসুন।

ডাক্তার ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকলেন।

ধবধবে সাদা একটি শাড়ীতে তার নিটোল দেহটি ঢেকেছে। মাথায় ঘোমটা নেই। অজস্র কালো চুল মাথা থেকে পাকে পাকে কাঁধ দুটি বেয়ে নেমে পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। মুখে শোকের উদ্বেলতা নেই। আছে সুগভীর প্রশান্তি।

প্রদীপের স্তিমিত আলোয় দুজনে মুখোমুখি বসে আছেন।

সদ্যশোক সুনন্দাকে অপরূপ মহিমায় মণ্ডিত করেছে। ডাক্তার নির্নিমেষ চোখে তার দিকে চেয়ে রইলেন।

সুনন্দাই আগে কথা কইলে।

—কাল রাত্তিরে সব শেষ হয়ে গেল। সন্ধের সময় কাশতে কাশতে দুবার বমি করলেন। শুধু রক্ত। তারপর কেমন যেন অজ্ঞানের মতন হয়ে গেলেন। আর জ্ঞান হল না। রাত্তির বটায় প্রাণ বেরিয়ে গেল।

—আমার আশা ছিল উনি আরো কদিন বাঁচবেন।

—আরো বাঁচা মানে ত আরো কষ্ট ভোগ করা? না ডাক্তারবাবু, তার চেয়ে এই-ই বোধ হয় ভালো হয়েছে। ওঁর কষ্ট আমি আর দেখতে পারছিলাম না। কোনোদিন কি ভেবেছিলেন এই অবস্থার মধ্যে তাঁর মৃত্যু হবে? ভাল করে চিকিৎসা হল না!

ডাক্তার চুপ করে রইলেন।

সুনন্দা বললে—তিল তিল করে মৃত্যুবরণ করলেন, তবু আমাকে ছেড়ে তাঁর বাবার কাছে ফিরে গেলেন না। বললেন—সুনন্দা, বাঁচি তোমার কাছেই বাঁচব, মরি তোমার কাছেই মরব। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

একটু থেমে সুনন্দা আবার বললে—এইটুকুই আমার সান্ত্বনা ডাক্তারবাবু যে তাঁর জন্যে আমি আমার যথাসাধ্য করেছি।

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সে চুপ করল।

ডাক্তারের মন করুণায় ভরে গেল।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

ডাক্তার উঠি উঠি করেও উঠতে পারছেন না।

সুনন্দাকে একটা কথা না বলতে পারলে তাঁর মনে কিছুতেই স্বস্তি হচ্ছে না!

—একটা কথা বলি?

—বলুন।

—এখানে আর থাকা কি আপনার ঠিক হবে?

—কোথায় যাব বলুন?

—আপনি আমার ওখানে চলুন। আমার স্ত্রী আছেন, আপনার কোনো অসুবিধে হবে না।

সুনন্দা চোখ দুটি ফিরিয়ে ডাক্তারের চোখের ওপর রাখলে।

আমার এখান থেকে এখনি যাওয়া চলে না। তাছাড়া, বাঁচতে হলে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় সবই চাই। তারও যাহোক একটা উপায় করতে হবে।

—আমি কি আপনার কোনো সাহায্যই করতে পারি না?

সুনন্দা চুপ করে রইল। তার কাছ থেকে যে উত্তরটি তিনি পেতে চাইছিলেন, তারই যেন একটা ক্ষণিক চমক তার চোখে দেখতে পেলেন।

সুনন্দা তার পেছনে পেছনে দরজার কাছে এলো।

—আরো ক'টা দিন এখানে থাকতেই হবে।

ডাক্তারের পক্ষে আর বেশিক্ষণ সেখানে থাকা সম্ভব নয়—তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পরলেন।

রাত্তিরে ডাক্তার সুরমাকে মন্মথর মৃত্যুসংবাদ দিলেন।

—কাল যেতে পারিনি। আজ গিয়ে দেখি কাল রাত্তিরেই মারা গেছে।

সুরমা নিশ্বাস বন্ধ করে শুনছিল। বললে—

—সুনন্দা কোথায়?

ঐখানেই আছে।

—একলা?

হ্যাঁ, একেবারে একলা।

শক্ত মেয়ে!

—ঐখানেই থাকবে?

—আর কোথায় যাবে?

একটু ভেবে সুরমা বললে—

—এখানে আনলে না কেন?

—বলেছিলাম। এলো না।

—কি করে চলবে?

—কি জানি। বলছিল চাকরি করবে।

সুরমা আর কিছু বললে না।

সুনন্দা যে কতখানি নিঃসহায় সে মনে মনে অনুভব করে শঙ্কিত হয়ে উঠল।

কৈলাস বোস ষ্ট্রীটের সেই গলি। এই গলিতেই সেই ভাঙা দরপাওয়ালা বাড়ীটা। আজ তিনদিন ধরে ডাক্তার নিজের সঙ্গে সর্বক্ষণ লড়াই করেছেন। তাঁর মন সুনন্দাকে দেখতে চেয়েছে বহুবার। তবু তিনি আসতে পারেন নি।

তাঁর পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে সঙ্কোচ। কিন্তু আজ তিনি বেরিয়ে পড়েছেন। সমস্ত সঙ্কোচ জোর করে সরিয়ে দিয়েছেন।

দ্রুতপদে গলিটুকু পার হয়ে সেই ভাঙা দরজাটার সামনে পৌঁছে ডাক্তার যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। নিজের চোখকে যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না।

দরজা হাট করে খোলা।

ভিতরের সরু বারান্দায় গোটা দশেক বড় বড় বেড়াল লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। তাদের গলা জানলার গরাদের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। দরজার বসে এক শীর্ণকায় বুড়ো তামাক খাচ্ছে আর খক্ খক্ করে কাশছে। ডাক্তারের মনটা কেমন ফাঁকা হ'য়ে গেল, তাহ'লে কি সুনন্দা এখানে নেই?

কাঁপা গলার স্বর টেনে তিনি বুড়োকে জিগ্‌গেস্ করলেন —এখানে একজন ভদ্রমহিলা থাকতেন····

তাঁর কথা শুনে তামাক খাওয়া বন্ধ রেখে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বুড়ো বললে—কি বললেন?

—এখানে একজন ভদ্রমহিলা থাকতেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—ভদ্রমহিলা? এখানে? কেউ নেই।

বুড়ো আবার তামাক খাওয়ায় মন দিলে।

ডাক্তার বলেন—ছিলেন এখানে—আমি দু'দিন আগেও—

বুড়ো চটে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—আরে না না মশাই, আমি বলছি কেউ নেই, ওই বেড়াল আছে দেখুন—

ডাক্তার বিস্তর মাকে খুঁজে বার করলেন। তার কাছে শুনলেন—বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হওয়ায় সুনন্দা দিন দুই আগে উঠে গেছে। কোথায় গেছে বিস্তর মা জানে না।

ডাক্তার বিমর্ষ হয়ে গাড়িতে গিয়ে বসলেন। সুনন্দা গেল কোথায়?

সুনন্দাকে ডাক্তারের পক্ষে ভোলা শক্ত।

ভুলতেও পারলেন না তাকে।

কদিন কেটে গেছে। ডাক্তারের শরীর মন কিছুই যেন ভাল নেই।

অনেক রাত্তিরে সেদিন ডাক্তার বিছানায় জেগেই শুয়েছিলেন।

সুরমা তাঁর মাথায় হাত রাখলে।

ডাক্তার চোখ চাইলেন।

—ঘুমাওনি তুমি?

—না।

—কেন?

—ঘুম আসছেনা।

—তুমিও তো ঘুমাও নি।

—আমার রোজই এমন হচ্ছে।

সুরমা ডাক্তারের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

ডাক্তার চোখ বুজলে।

—একটা কথা বলবে?

ডাক্তার মনে মনে শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন। চোখ না খুলেই বললেন কি কথা?

—কি হয়েছে তোমার ?

—কিছুই তো হয়নি। চোখ খুললেন তিনি।

—কিছুই হয়নি ?

—না

—এই তো তুমি ঘুমাতে পারোনা, খেতে পারোনা, সাধনের দিকেও ফিরে তাকাওনি এ ক'দিন—কচি ছেলে কত মন মরা হয়ে আছে। দেখেছ কি তা ?

সুরমার গলা ভারি হ'য়ে এল। সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—কি হ'য়েছে তোমার বলতেই হবে। আমার কাছে লুকোতে পাবেনা

ডাক্তার বিব্রত হয়ে পড়লেন। বললেন—কাজের চাপ বড় বেড়ে গেছে সুরমা। সামলাতে পারছিনে।

—ছেড়ে দাও কাজ। আগে শরীর না আগে কাজ। চল দিন কতক বাইরে চলে যাই। আগে শরীর ঠিক হোক তার পরে এসে আবার কাজ করবে। কালই যাই চল।

প্রমাদ গণলেন ডাক্তার।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—ভেবে দেখি।

সুরমা বললে—আর ভাবাভাবি নয়। কাল না পার পরশু, তাও না পার সাত দিন পরে চল। কিন্তু যেতেই হবে তোমাকে। তখনকার মত অব্যাহতি পেয়ে ডাক্তার চোখ বুজলেন।

দিন চারেক পরে বেলা এগারটার সময় চেম্বারের কাজ সেরে উঠি উঠি করছেন সামনের দরজা দিয়ে সুনন্দা ঢুকল।

ডাক্তার যেন চমকে উঠলেন।

সুনন্দার চুল উস্কোখুস্কো, মুখ শুকনো, চোখে উদ্বেগ। ডাক্তারের সামনের চেয়ারটায় ধপ্ করে বসে পড়লো সে।

ডাক্তার অভিভূতের মত শুধু বললেন বলুন।

—আমারো বোধহয় টি, বি, হয়েছে ডাক্তার বাবু।

সুনন্দার গলা কেঁপে উঠলো।

—কার ? আপনার ? কে বললে ?

—কেউ বলে নি।

—তবে ?

—আমি নিজেই বুঝতে পারছি। আমার জ্বর হয়, কাশিও হয়.....

—জ্বর আর কাশি হলেই বুঝি টি, বি, হয় ?

—তা জানি না। দয়া করে একবার আমাকে ?

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, টি, বি, আপনার হয় নি।

—না দেখেই বলছেন ?

—আচ্ছা, আসুন ও ঘরে, দেখছি। ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। সুনন্দাও উঠলো।

—আপনি কি কলকাতাতেই আছেন ?

—হ্যাঁ ; কেন বলুন ত ?

—এমনিই জিগেস করছি।

—তবে ও বালাই নেই।

—জানি।

—জানেন ? ডাক্তার ঘাড় নাড়লেন।

—কি করে জানলেন ?

—মিছিমিছি হয়রাণ হয়ে।

—আমি সত্যিই বড় দুঃখিত। বাসাটা হঠাৎ ছেড়ে দিতে হল বলে জানাবার সময় পাই নি।

—ইচ্ছে থাকলে পরেও জানানো যেত।

—তা অবশ্য যেত! কিন্তু সত্যি বলছি আপনাকে, অতটা আমার মনেই হয় নি, তাছাড়া—

—তাছাড়া কি ?

—আমার মত একটা তুচ্ছ মেয়েমানুষকে যে আপনি মনে রাখবেন তা-ই বা কি করে ভাববো বলুন ?

ডাক্তার আর কিছু বললেন না। পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে সুনন্দাকে একটা বড় শোফায় শুইয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে বুঝলেন জ্বর আর কাশি বাইরের রোগ হলেও সুনন্দার আসল রোগ তার মনে। এতদিন ধরে এক দুর্দান্ত যক্ষ্মারোগীর শুশ্রূষা করেছে সে। যতদিন যক্ষ্মা বেঁচে ছিল ততদিন তারই চিন্তায় সুনন্দার মন সর্বদা ভরে থাকত। তার মৃত্যুর পর এখন তার শূন্য মনে আতঙ্ক ঢুকেছে।

তিনি বললেন—এ রকম জ্বর কাশি সকলেরই হয়। এতে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি ওষুধ দিচ্ছি। আপনি তিন চার দিনেই ভাল হয়ে যাবেন।

তাঁরা এ ঘরে এসে বসলেন।

ডাক্তার ওষুধ লিখে সুনন্দার হাতে দিয়ে বললেন—এখন বাসায় ফিরবেন ত?

—হ্যাঁ।

—চলুন আপনাকে পৌঁছে দি।

সুনন্দার নতুন বাসার সামনে ডাক্তারের গাড়ী এসে থামলো।

—নামবেন না একবার?

ডাক্তার ইতস্তত: করতে লাগলেন।

—থাক তবে। আমার বলাই ভুল হয়েছে। আচ্ছা, নমস্কার।

ডাক্তার গাড়ী থেকে নেমে এলেন।

পরের দিন সন্ধ্যায় সুনন্দাকে দেখতে এলেন ডাক্তার।

—কেমন আছেন?

ভাল।

—জ্বর আছে নাকি?

—নেই বোধহয়।

ডাক্তারের দিকে নিজের হাতটি বাড়িয়ে দিলে সুনন্দা।

বিছানার একপাশে বসে সুনন্দার হাতটি নিজের হাতে তুলে নিলেন ডাক্তার। তার নাড়ী দেখলেন।

—বিশ্রামের খুবই দরকার আপনার।

—বিশ্রাম ত নিচ্ছিই।

—আর, একটু দেখাশোনা।

—দেখাশোনা?

সুনন্দার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠলো।

—বাবাকে তাঁর ছেলের মৃত্যুসংবাদ দিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। লিখেছেন—যেদিন সে তোমাকে বিয়ে করেছে সেইদিন থেকেই সে আমার কাছে মৃত! মা অবশ্য কান্নাকাটি করে চিঠি দিয়েছেন; লিখেছেন—ওর কথায় কিছু মনে করো না—তুমি আমাদের কাছে এস। কিন্তু আমারই জন্যে সেখানে তাঁদের ছেলের স্থান হয়নি—এ কথা আমি ভুলি কেমন করে?

ডাক্তার চুপ করে শুনতে লাগলেন।

—দেখাশোনার কথা বলছেন। আমার যে কেউ নেই ডাক্তারবাবু! নিজেও যে কাউকে নিয়ে ভুলে থাকব, তা থেকেও ভগবান আমাকে বঞ্চিত করেছেন!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুনন্দা বললে—

—ওর ডায়েরিতে দেখছিলাম আমার জন্যে ওর ভাবনার শেষ ছিল না। কত কথাই লিখেছেন!

—ডায়েরি লিখতেন বুঝি?

হ্যাঁ; অনেকদিনের অভ্যেস—ইদানিং শুয়ে শুয়েও লিখতেন। বাঁচবেন না সে কথা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে লিখেছেন—

সুনন্দা হঠাৎ থেমে গেল।

—কি লিখেছেন?

—কিন্তু কি হবে সে কথা শুনে?

—যদি শুনতে চাই?

—সব কথা ভাল পড়া যাচ্ছে না, দুর্বল হাতে লেখা—অস্পষ্ট হয়ে গেছে—

—তবু—

—লিখেছেন—এইবারে নিশ্চিন্তে মরতে পারব।

ডাক্তার সোজা হয়ে বসে বললেন—

—ডায়েরিটা একবার দেখাবেন আমাকে? আমি দেখতে চাই।

* * *

দিন এগিয়ে চলে।

আসে, এক বার।

* * *

সেদিন ডান হাতে ভর দিয়ে বিছানায় শুয়ে চাঁদের আলোয় স্নান করছিল সুনন্দা। তার সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাঁখা, চোখে গভীর তৃপ্তি!

সেই দুটি চোখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন ডাক্তার।

—শুনলা।

—বল।

—তোমাকে দেখে আমার কি মনে হয় জানো?

—কি মনে হয়?

—সকালে উঠে যখন তোমার মুখখানি দেখি তখন মনে হয় যেন শরৎকালের ভোরে শিশিরে ঝলমল একটি স্থলপদ্ম ফুটে রয়েছে! তেমনি সরস, তেমনি কোমল, তেমনি সুন্দর! মনে হয়, শুধু চেয়ে থাকি। তারপর, দুপুরে যখন তোমায় দেখি তখন মনে হয় যেন বড় বড় সবুজ পাতার আড়ালে পাপড়িগুলি সব মেলে দিয়ে ফুটে আছে একটি স্বর্ণচাঁপা। দুপুরের রুক্ষতার মাঝে কি তার রূপ! আর, এখন কি মনে হচ্ছে জানো! যেন শ্রাবণের সন্ধ্যায় পূর্ণিমার চাঁদের দিকে মুখ করে উঁচু হয়ে ফুটে আছে একটি রজনীগন্ধা! যেন বলছে আমি আছি, কোটার অপরিসীম আনন্দ নিয়ে আমি ফুটে উঠেছি—

শুনন্দা মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। এইবার ডাক্তারের বুকের ওপর নিজের বাঁ হাতখানি রেখে বললে—

—রাত যে অনেক হল—ঘুমোবে না?

—আজ যদি সারা রাত জেগে থাকতে চাই? যদি দেখতে চাই ঘুমোচ্ছো, যদি দেখতে চাই চাঁদের আলো তোমার ঘুমন্ত মুখে এসে পড়েছে—

সুরমার মন ভাল ছিলনা সেদিন।

রাত্তিরে সে রাঁধবেই না ঠিক করেছিল। কিন্তু নিজে চিঁড়ে মুড়ি খেয়ে কাটালেও সাধনকে দুটি ভাত না রেঁধে দিলেই নয়!

উনুনে আগুন দিয়ে সুরমা ভাত চড়িয়ে দিলে। তার বাড়ীর পাশেই ছগনলালের বাড়ী। মাঝে মাত্র একটি দেওয়ালের ব্যবধান। এদিকে সুরমার রান্নাঘর, উঠোন, জলের কল, ওদিকে ছগনলালের বাইরের ঘর, যাওয়া-আসার জন্যে দেওয়ালে একটি দরজা আছে। এদিকে শেকল, ওদিকে খিল। দরজা বন্ধই থাকে।

সাধনকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে সুরমা রান্নাঘরে এসে বসলো।

খাবার ইচ্ছে সুরমার একটুকুও ছিল না, শুধু রান্না-ঘরের পাট চুকিয়ে ফেলবে বলে সে ভাত বাড়লে।

কিছুক্ষণ থেকেই ছগনলালের বাড়ীর দিক থেকে একটা চাপা ফিস্ ফাস্ শব্দ তার কানে আসছিল।

কারা যেন চুপি চুপি কথা কইছে।

ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে গিয়ে তার মনে হল মাঝের দরজার খিল খুলে কে যেন দরজাটা ওদিক থেকে টানছে!

মুহূর্তে নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে সুরমার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল।

ধূর্ত শয়তান ছগনলালের মনে কি আছে কে জানে!

ঐটুকু দেওয়াল টপকাতে কতক্ষণ?

ভাতের গ্রাস আর মুখে তোলা হল না। বাড়া ভাত পড়ে রইলো। রান্নাঘরে আলো জ্বলতে লাগলো। হাতটা ধুয়ে ফেলে সুরমা শোবার ঘরে এসে ঘুমন্ত সাধনকে বিছানা থেকে নিজের বুকে তুলে নিলে, তারপর, একটা মোটা চাদরে নিজের সর্বাঙ্গ ঢেকে নিঃশব্দে সদর দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

রাত্তিরে ছগনলালের লোক ফিরে এসে তাকে খবর দিলে—সুরমা বাড়ীতে নেই!

লাফিয়ে উঠলো ছগনলাল—অ্যাঁ! কোথায় গেল?

তারা বললে—জানিনা। বাড়ী খালি।

ছগনলাল নিজেই দেখতে ছুটলো।

ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। জিনিষপত্র সব রয়েছে। কেবল—সুরমা নেই, তার ছেলে নেই। সদর দরজা খোলা।

সকালে গঙ্গা স্নান সেরে ফেরবার পথে পাড়েজী সুরমাদের খবর নিতে এলেন।

কড়া নেড়ে সাড়া না পেয়ে তিনি ডাকাডাকি করতে লাগলেন।

—ও দাদা, সকাল হয়েছে, ওঠো। বেড়াতে যাবে না? তোমার হাতী এসেছে, দরজা খুলে দাও।

তবু কারুর সাড়া নেই!

পাড়েজী আশ্চর্য্য হলেন।

সুরমাও এখনো অবধি ঘুমোচ্ছে নাকি ?

ছগনলাল তার বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো।

—রাম, রাম।

—রাম রাম শেঠজী। খবর সব ভালো ত ?

—আপনার মাইয়া কি আপনার ওখানে গেছেন ?

—আমার ওখানে ? পাড়েজী অবাক হলেন।

—আমার ওখানে যাবেন কেন ?

—সকালে উঠে দেখলাম বাড়ী খালি, আপনার মাইয়া নেই। ভাবলাম, রাত্তিরে বোধ হয় আপনার কাছে চলে গেছেন। তাই জিগেস করছিলাম।

তার কথা বলার ধরণ দেখে রাগে পাড়েজীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল, কিন্তু যে গুরুতর সংবাদ তিনি শুনলেন তাতে তাঁর মাথা তখন ঘুরে গেছে, চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে এসেছে।

—আমার মা বাড়ীতে নেই ?

—না।

—আমার দাদা ?

—কেউ নেই।

—দাঁড়ান, আমি দেখব। দরজা কে লাগালে ?

—আমিই লাগাতে বলেছি।

ছগনলালের চাকর দরজা খুলে দিলে। পাড়েজী ভেতরে ঢুকলেন। সঙ্গে ছগনলাল।

শূন্য বাড়ী যেন খাঁ খাঁ করছে, পাড়েজীর চোখ জলে ভরে গেল।

ঘরে বিছানা পাতা রয়েছে। দড়ির আলনায় সুরমার শাড়ী, সাবনের জামা-প্যান্ট ঝুলছে। ঘরের এক কোণে ঠোঙা, ঠোঙা তৈরীর কাগজ, সাবনের কাগজের নৌকোটি, আর এক দিকে সেলাই এর সরঞ্জাম, রান্নাঘরে থালায় বাসি ভাত।

রান্নাঘরের বারান্দায় ধপ্ করে বসে পড়ে ছগনলালের সামনেই পাড়েজী চোখ মুছতে লাগলেন।

হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে উঠে ছগনলালকে চেপে ধরলেন—

—এ নিশ্চয়ই তোমার কাজ ! তোমার সঙ্গে ঝগড়া হল আর তারপরই তারা চলে গেল ? মুখের ভাত ফেলে রেখে চলে গেছে ? তুমিই তাদের কোথাও সরিয়ে রেখেছ। কোথায় রেখেছ বল।

পাড়েজী আচমকা তাকে চেপে ধরায় ছগনলাল ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিতেও তার দেরী হল না। সে বললে আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি আমি কিছুই জানিনা।

—কিছু জানো না ?

—না।

—সত্যি বলছ ?

—হ্যাঁ।

পাড়েজী তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন—এ সব যেমন আছে তেমনি থাক—কোনো জিনিষ নাড়াচাড়া করবে না। আমি থানায় চললাম।

তিনি হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেলেন।

ডাক্তারকে একটা খবর দেওয়া উচিত। যতই হোক—সুরমা তার স্ত্রী। পথ চলতে চলতে পাড়েজী এই চিন্তা করে তিনি ডাক্তারের চেম্বারের দিকে এগোলেন।

ডাক্তার তখনো আসেন নি।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাড়েজী অধীর চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দূর থেকে পাড়েজীকে তাঁর চেম্বারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ডাক্তার প্রমাদ গণলেন। তাঁর অপরাধী মন ভয়ে উৎকণ্ঠায় কাঁটা হয়ে উঠল।

ধীরে ধীরে তাঁর গাড়ী এসে পাড়েজীর সামনে থামলো।

ইসারায় তাঁকে নেমে আসতে বললেন পাড়েজী। গম্ভীর মুখ বর্ষার মেঘের মত থম্ থম্ করছে।

ডাক্তারের বুক দুর্ দুর্ করতে লাগলো।

তুমি যা ব্যবহার করেছ, আমার ছেলে হলে আমি জীবনে তোমার মুখ দেখতাম না। কিন্তু তুমি তার স্বামী তাই আজ আমার তোমার কাছে আসতে হয়েছে।

ডাক্তারের প্রশ্ন করার মতও শক্তি নেই যেন। তিনি মাথা নীচু করে রইলেন।

—যা দুর্দ্দশা তুমি তার করেছ তাতে সে একেবারে চলে

যেলেই বোধ হয় ভাল হত। কপালে আরো দুঃখ আছে তাই সে বেঁচে আছে। কাল যাত্রির সাধনকে নিয়ে সে এক কাপড়ে কোথায় চলে গেছে। একেবারে নিঃসম্বল অবস্থা—হাতে একটি পয়সাও নেই।

তিনি মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছে ফেললেন।

ডাক্তার যাত্রির দিকে চেয়ে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলেন

—তোমাকে সব কথা আমার বলতে ইচ্ছেও করেনা, সে সময়ও আমার নেই। সে তোমার স্ত্রী তাই খবরটা তোমাকে দিতে এলাম। তোমার যা ইচ্ছে হয় করো গে।

পাঁড়েজী চলতে সুরু করলেন।

দূরের আলো যেন ডাক্তারের কাছে অনেক হয়ে উঠল। তিনি ভাবলেন কোথাও কি এতটুকু অন্ধকার নেই যে মুখ লুকোতে পারি?

পথ দিয়ে লোক যাওয়া আসা করছে। ডাক্তারের মনে হচ্ছে তারা সবাই তাঁর মুখের দিকে চেয়ে তাঁকে ধিক্কার দিচ্ছে। তাঁর অ্যাসিষ্টেন্ট এগিয়ে এসে বললে—

—স্যার, ফরীদা—

—হ্যাঁ, তাদের একটু বসাও, আমি আসছি।

ডাক্তার গাড়ীতে বসে স্টার্ট দিলেন।

ঐ চলেছেন পাঁড়েজী।

পাঁড়েজীকে ধরে ফেলে ডাক্তার বললেন—

—তাকে কোথায় খুঁজতে যাচ্ছেন পাঁড়েজী?

—আগে থানায় যাব। তারপর তাকে পথে পথে খুঁজে বেড়াব।

ডাক্তার অস্ফুট গলায় বললেন—গাড়ীতে আসবেন কি আপনি? আমিও সঙ্গে যেতে চাই।

পাঁড়েজী কোনও কথা বলেন না। শুধু একবার ডাক্তারের মুখের দিকে চাইলেন। সে চাউনির ভেতর কোনও বিদ্বেষ নেই, কোনও বিস্ময়ও নেই! ক্ষমার স্নিগ্ধ আলোয় তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

গাড়ীর দরজা খুলে তিনি ডাক্তারের পাশে বসলেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের স্বদেশ-প্রেম — চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

"সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সেবার একটি নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা ছিল। সেই সত্যের অনুরোধে তিনি স্পষ্টবাদী বীর ছিলেন। তাঁহার আদর্শ ছিল বাস্তব ও বিজ্ঞান-সম্মত—সেই আদর্শকে তিনি তাঁহার কবি-হৃদয়ের সুস্থ অনুভূতি দ্বারা ভাবায় ও ছন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।.....

সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রেরণার আর-একটি দৃঢ় সম্বল ছিল—মাতৃভাষার প্রতি অসীম প্রগাঢ় অনুরাগ।.....

স্বদেশের প্রতি তাঁহার অসীম মমতা ছিল। বর্তমানের যাহা কিছু অধর্ম ও অসত্য, যাহা কিছু ভীরুতা ও জড়তা, যাহা কিছু ক্ষুদ্রতা ও মূঢ়তা ছিল, তাহাকেই কঠিন ধিক্কার দিতে ও বিদ্রূপ করিতে গিয়া তাঁহার বাণী বেদনার জ্বালায় বিবাক্ত হইয়া উঠিত। আবার অতীত ও বর্তমানে যাহা কিছু মহান্ ও সুন্দর, ভবিষ্যতে যাহা কিছু মহান্ ও সুন্দর হইবার সম্ভাবনা দেখিতেন, তাহাই তাঁহার মর্ম স্পর্শ করিত, এবং তাহার বন্দনা-গানে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন

কবি সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশের প্রতি দরদ এত প্রবল ও তীক্ষ্ণ ছিল যে, তিনি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীর অন্তরালে, এমন কি, প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা উপলক্ষ্য করিয়াও দেশের অবস্থা দুঃখ দুর্দশা এবং আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলে ছাড়িতেন না এবং এই প্রকার রচনায় তাঁহার একটি বিশেষ অনন্যসাধারণ নিপুণতা ছিল। এইরূপে তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, যাহাদের অন্তরালে কবির হৃদয়-বেদনা অথবা আনন্দ ও আশা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।"

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও বাংলা-সাহিত্য—সাহিত্য-সাধক চরিতমালা)

চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাচ্য বিদ্যা-ভবন

চেকোশ্লোভাকিয়ার দুজন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের নাম বিশেষ করে ভারতবর্ষে সুপরিচিত। এঁদের মধ্যে একজন হলেন আচার্য ভিনসেন্ট লেস্নি। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে এঁর যোগাযোগ চেক-ভারত সাংস্কৃতিক মৈত্রীবন্ধনকে অনেক দিন আগেই দৃঢ় করে তুলেছিল। তাছাড়া, বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে লেখা লেস্নির বইগুলি সারা ইউরোপে সমাদৃত। বাংলা দেশে আমরা লেস্নিকে প্রধানতঃ রবীন্দ্রকাব্যের চেক-অনুবাদক বলে জানি। কিন্তু তিনি সংস্কৃত, পালি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার আরেকজন বিশ্ববিশ্রুত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ হলেন আচার্য বেদ্রিখ্ রজ্নি। হিটাইট লিপির প্রথম পাঠোদ্ধার করে তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। এশিয়া-মাইনর, ভারতবর্ষ ও ক্রীটের সুপ্রাচীন সম্পর্কে তাঁর গবেষণা-অনুশীলনগুলি প্রাচ্যতত্ত্বানুশীলনের ক্ষেত্রে এক অতি বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে। বৈদিক ভারত সম্পর্কে রজ্নির নিবন্ধগুলি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে বিশেষ মূল্যবান হিসাবে স্বীকৃত।

এঁরা দুজনে, এবং আরও কয়েকজন সুবিখ্যাত চেকোশ্লোভাক প্রাচ্যবিজ্ঞানী, প্রাগের প্রাচ্যবিদ্যা-ভবনের সঙ্গে একেবারে গোড়া থেকেই সংশ্লিষ্ট। এই প্রাচ্যবিদ্যা-ভবন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২২ সালে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রতিষ্ঠানের পণ্ডিতদের গবেষণা-অনুশীলনের মারফতে—বিশেষতঃ আচার্য লেস্নি, আচার্য রজ্নি এবং ডক্টর জোসেফ হুরাতি-র প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও অনুবাদ ইত্যাদি প্রকাশিত হতে থাকার ফলে এই প্রাচ্যবিদ্যা-ভবন বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রাচ্যবিদ্যা-ভবনের কর্মী-গবেষকরা স্থির করেন যে এখন থেকে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানো। কোন্ কোন্ বিষয়ে কি কি গবেষণার কাজ চালানো হবে, সে সম্পর্কে পাঁচ বছর ব্যাপী এক একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হতে থাকে। সেই সঙ্গে এই প্রাচ্যবিদ্যা-ভবন চেকোশ্লোভাক বিজ্ঞান-পরিষদের সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয় তার একটি অঙ্গ হিসাবে। তাছাড়া রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়ে এর আর্থিক ভিত্তিও সুদৃঢ় হয়। চলতি পাঁচসালা গবেষণা পরিকল্পনাটিতে প্রধানতঃ জোর দেওয়া হয়েছে বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ও পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলির সাম্প্রতিক ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপরে। বর্তমানে এই প্রাচ্যবিদ্যা-ভবনের পরিচালক হিসাবে আছেন বিখ্যাত চীনতত্ত্ববিদ্ আচার্য ইয়ারোস্লাভ প্রুসেক।

প্রাচ্যবিদ্যা-ভবনের গবেষণার কাজকর্ম চারটি বিভাগে বিভক্ত। পূর্ব-এশিয়া বিভাগের অন্তর্ভুক্ত চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও ভিয়েৎনাম সংক্রান্ত অনুশীলন। দ্বিতীয় বিভাগটির কাজ পুরোপুরি ভারততত্ত্ব সম্পর্কিত। তৃতীয় বিভাগটির কর্মীরা পশ্চিম-এশিয়ার দেশগুলি সম্পর্কে গবেষণা করেন। আরব, তুরস্ক আর ইরান সম্বন্ধে গবেষণার কাজ চতুর্থ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। মিশরতত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষণার কাজের আলাদা একটি নিজস্ব বিভাগ চার্লস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ হিসাবে আছে বলে এই বিষয়টিকে প্রাচ্যবিদ্যা-ভবনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

প্রাচ্যবিদ্যা-ভবনের সমস্ত গবেষণা-অনুশীলনই হয় গ্রন্থাকারে আর না হয় প্রতিষ্ঠানের ৩টি মুখপত্রে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা ৩টির মধ্যে একটি হল "ওরিয়েন্টাল আর্কাইভস্"—যাতে প্রধানতঃ সুপ্রাচীন প্রাচীন সাহিত্য-দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হয়। আর একটি পত্রিকা "নিউ ওরিয়েন্ট"-এ প্রকাশিত হয় প্রধানতঃ আধুনিক ও সাম্প্রতিক নানা বিষয়ের আলোচনা। এই পত্রিকাটি ১৯৪৫ থেকে প্রকাশিত হয়ে

আসছে এবং আচার্য লেস্‌নির উদ্যোগেই পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

ভিন্‌সেন্‌চ্‌ লেস্‌নিই ছাত্রদের বিভিন্ন প্রাচ্য দেশের ভাষা শিক্ষার জন্যে এই প্রাচ্যবিদ্যা-ভবনের শাখা হিসাবে "স্কুল অব ওরিয়েন্টাল ল্যাঙ্গোয়েজেস্‌" প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিভাগে বর্তমান শেখানো হয়—বাংলা, হিন্দি, উর্দু, ফার্সী, তামিল, চীনা, তিব্বতীয়, মঙ্গোলীয় (খাল্‌খা), বর্মী, আর্মেনীয়, সোয়াহিলি, প্রাচীন আরবী, মিশর আরবী, আধুনিক হিব্রু, তুর্কী, ভিয়েৎ-নামী ও ইন্দোনেশিয়ান—এই আঠারোটি প্রাচ্য ভাষা। এই সব ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান আর পাঠ্য পুস্তকও প্রাচ্যবিদ্যা-ভবন থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে এই সব দেশের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের মোটামুটি একটা প্রাথমিক পরিচয় ঘটিয়ে দেবার জন্যে বিভিন্ন নাতিবৃহৎ পুস্তকমালা। প্রাচ্যবিদ্যা-ভবনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য শাখা হল—প্রাচ্য-সংগীত বিভাগ। এখানে শুধু প্রাচ্য-সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা-অনুশীলনই করা হয় না, গানও শেখানো হয়। এখানে একটি ঘরে সমস্ত রকমের প্রাচ্য বাদ্যযন্ত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে এবং এই বিভাগের আধুনিক ও মার্গ প্রাচ্য-সংগীতের গ্রামোফোন-রেকর্ডের সংগ্রহও খুব সমৃদ্ধ। আচার্য লেস্‌নি রবীন্দ্র-সংগীতের ও ভারতীয় লোক-সংগীতের বহু রেকর্ড সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলিও এখানে রাখা আছে।

প্রাচ্য-বিদ্যা ভবনের একটি অনুষ্ঠান।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য—প্রাচ্যবিদ্যা-ভবনের গ্রন্থাগার ও পাণ্ডুলিপি-সংগ্রহ। সাধারণ গ্রন্থাগারটির বইয়ের সংখ্যা হল কুড়ি হাজারেরও বেশি এবং "লু-সুন গ্রন্থাগার" নামে শুধু চীনদেশ ও চীনতত্ত্ব সম্পর্কিত একটি আলাদা গ্রন্থাগার আছে। সেখানকার বইয়ের সংখ্যা হল পঁয়তাল্লিশ হাজারেরও বেশি। এই "লু সুন গ্রন্থাগার"টি বর্তমানে মধ্য-ইউরোপের বৃহত্তম চীনতত্ত্ব সম্পর্কিত লাইব্রেরী। প্রতি বছরে এই দুটি গ্রন্থাগার থেকে আট হাজারের মতো বই বাইরের পাঠক-পাঠিকারা ধার নিয়ে থাকেন।—এর থেকে বোঝা যাবে, প্রাচ্য দেশগুলির শিল্প-সংগীত সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে চেকোস্লোভাক জনসাধারণের আগ্রহ কতো গভীর!

সম্প্রতি কয়েক বছরের মধ্যে আচার্য বেদ্রিখ্‌ হ্রজ্‌নি, আচার্য ভিন্‌সেন্‌চ্‌ লেস্‌নি এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ডক্টর ওস্‌কার্‌ ফ্রিদ্‌-এর মৃত্যুর ফলে এই প্রাচ্যবিদ্যা-ভবনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। বর্তমানে যে সব চেকোস্লোভাক পণ্ডিত এখানে গবেষণা-অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত আছেন তাঁদের মধ্যে মিশরতত্ত্ববিদ আচার্য ক্রাস্টিচেক লেক্‌সা, প্রাচ্যবিদ্যা-ভবনের পরিচালক চীনতত্ত্ববিদ ইয়ারোস্লাভ প্রুসেক, প্রাচ্যভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক ফেলিক্স্‌ তাইএর, ডক্টর পাভেল পুদা, আচার্য জান্‌ বিপ্‌কা প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।*

* ভারতস্থ চেকোস্লোভাকিয়ার বৈদেশিক দূতাবাসের সৌজন্যে।

॥ সূচীপত্র ॥

প্রবন্ধ

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (চরিত-চিত্র)—বিপিনচন্দ্র পাল

(পুরাতন প্রবন্ধ হইতে)

আমার চোখে দেখা সোভিয়েট দেশ—ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল ও বিক্রমপুর—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

গ্রন্থাগার আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ—শ্রীসুধাংশুকুমার ভট্টাচার্য্য

নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীতে বুনিয়াদী পদ্ধতি—শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য

কবিতা

অনুভব—শ্রীমলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

ভুল ডাক—শ্রীবিমল দত্ত

প্রবাহিকা—শ্রীঅমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

ঢেউ—শ্রীস্বদেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬৬১

মিলন—শ্রীগোপালহরি বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৬৩

ছুটি লেনে গোধূলি—শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬৬৪

মায়া সোম (গল্প)—সাত্যকি

কিশোর জগত

চাষের চমৎকথা—হরেন ঘোষ

সবলা—শ্রীঅমলেন্দু ভট্টাচার্য্য

হিমালয় দাদু (কবিতা)—নীরদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

পুস্তক প্রসঙ্গ—

॥ পাদপূরণ ॥

সাম্রাজ্যবাদী ঐক্য—রবীন্দ্রনাথ

বাংলা ভাষা ও ভাষাগত ঐক্য—রবীন্দ্রনাথ

ঐক্য না একাকারত্ব—রবীন্দ্রনাথ

অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাংলা সাহিত্য—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা)

॥ পাত্রিকা সম্বন্ধে ॥

যুগযাত্রীর বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ছ' টাকা। সব বিষয়ে মৌলিক রচনাই আমরা সাদরে গ্রহণ করব। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটরচনা, প্রবন্ধ, সাংস্কৃতিক আলোচনা, অনুবাদ, সাহিত্য ইত্যাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে লিখে সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন। পত্রিকার সমালোচনার জন্য ২'খানা করে বই সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন। পত্রিকাসংক্রান্ত সমস্ত রকম চিঠিপত্র সম্পাদকীয় কার্যালয়ে প্রেরিতব্য।

সম্পাদকীয় কার্য্যালয়

৬১-এ, বলরাম ঘোড়াই রোড, কলিকাতা-৬

Dated 3. 3. 1957

Narayan Pal
Signature of Publisher.

সবরকম আধুনিক ও সুরুচিসম্পন্ন
পুস্তক প্রকাশই আমাদের
একমাত্র লক্ষ্য

ইউনিভার্সাল বুক বাইণ্ডার্স
১২৩, লোয়ার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা-১৬

GITA FOR ALL

Sri Monoranjan Roy, M A., B L.

Readers will find it very useful for mental and spiritual uplift.

মুসলমানী

প্রথম বর্ষ | কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৬৮ | দ্বাদশ সংখ্যা

CAL CEN LIBR UNIVER

চরিত্র চিত্র

(পুরাতন প্রবন্ধ হইতে)

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

বিপিনচন্দ্র পাল

স্বাদেশিকতার আদর্শ

আমাদের বর্তমান স্বাদেশিকতার আদর্শ কতটা পরিমাণে যে আমরা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি, দেশের লোকে যেন সে কথা ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছে। নতুবা এই লোকের স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য কত চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের নামে একটা বাৎসরিক স্মৃতি-সভার আয়োজন পর্যন্ত হয় না কেন ?

উপাধ্যায় সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্তু আমাদের বড় বড় সন্ন্যাসীদের যেমন শিষ্য সেবক থাকে, উপাধ্যায়ের সেরূপ শিষ্য-সেবক কেহ ছিল না। সে আকাঙ্ক্ষাও উপাধ্যায়ের ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁর সন্ন্যাস অন্য ধরণের ছিল। গীতা যাহাকে সর্বকর্মসন্ন্যাস বলিয়াছেন, উপাধ্যায়ের সন্ন্যাস সে জাতীয় ছিল। আপনার বলিতে সংসারে তিনি কিছুই রাখেন নাই। আকৃষ্ম ব্রহ্মচর্য সাধন করিয়া, তিনি এমন একটা অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁর অহং-জ্ঞানটা ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণতার সম্বন্ধ সকলকে একান্তভাবে অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বে ছাইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের আধুনিক কল্পনাকুশলগণের মধ্যে উপাধ্যায়ের মতন আর কেহ এতটা পরিমাণে সর্বভূতে আত্মদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানি না।

সন্ন্যাসের অন্তরালে অনেক সময় একটা বৃজরুগী লুকাইয়া থাকে। উপাধ্যায়ের অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল। কিন্তু তাঁর প্রাণটা অতি বড় হইলেও, কোন মতেই তাঁহাকে প্রচলিত অর্থে "বুজরুগ" বলা যাইত না। অতিলৌকিক কোনও কিছুর দাবী তিনি কখনও করেন নাই। কি নিজে সংসার করেন নাই বলিয়া, সংসারী লোকের প্রতি তাঁহাকে কখনও কটাক্ষপাত করিতেও দেখি নাই।

সন্ন্যাসের সঙ্গে সচরাচর সমাজ-জীবনের একটা বিরোধ জাগিয়া উঠে। সন্ন্যাস লইয়া লোকে প্রায়ই সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যায়। উপাধ্যায় সন্ন্যাসী হইয়াও সংসারত্যাগী হন নাই। ফলতঃ তাঁর মধ্যে চিরদিনই এমন একটা প্রবল ও সজীব সমাজানুগত্যের ভাব দেখিয়াছি, যার সঙ্গে আমাদের মধ্যযুগের হিন্দুস্থানীর সন্ন্যাসের আদর্শের কোনও প্রকারের আন্তরিক সঙ্গতিসাধন কখনও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় নাই। আমাদের সন্ন্যাসীরাও কোন কোন বিষয়ে একান্তভাবেই লৌকিকাচারের বশ্যতা স্বীকার করিয়া চলেন, সত্য। কিন্তু উপাধ্যায়ের সমাজানুগত্যের সঙ্গে ইঁহাদের সমাজানুগত্যের একটা জাতিগত প্রভেদ ছিল বলিয়া মনে হয়। আমাদের প্রাচীন মতের সন্ন্যাসিগণ লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্মাসক্ত জনগণের বুদ্ধিভেদ যাহাতে না জন্মায়, তারই জন্য লৌকিকাচারের অনুবর্ত্তিতা করিয়া চলেন। উপাধ্যায়ের সমাজানুগত্যের অন্তরালে কোনও লোকসংগ্রহেচ্ছা কখনই দেখিতে পাই নাই। তাঁর অকৈতব স্বদেশ-ভক্তির উপরেই এই অদ্ভুত সমাজানুগত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ব্রহ্মবান্ধবের স্বদেশ-প্রেম

আর ইহাই উপাধ্যায়ের স্বাদেশিকতার বিশেষত্ব ছিল। উপাধ্যায় তাঁর নিজের দেশকে ও সমাজকে যে চক্ষে দেখিতেন, আমরা আজি পর্য্যন্ত সে চক্ষু লাভ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমাদের স্বদেশপ্রেম অতি হাল্‌কা বস্তু। আমরা এ পর্য্যন্ত গোটা দেশটাকে ভালবাসিতে শিখি নাই। আমরা দেশটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দেখি। কিয়দংশ বা তার ভাল, আর কিয়দংশ বা তার মন্দ, এরূপ ভাবে স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার ভাল-মন্দের মধ্যে আমরা একটা ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া, যেটুকু আমাদের চক্ষে বা বিচারে ভাল লাগে, তাহাকেই ভালবাসি; আর যেটুকু ভাল লাগে না, তাহাকে ঘৃণা করিয়া, তাহা হইতে নিজেদেরকে যথাসাধ্য দূরে রাখিতে চেষ্টা করি।

কিন্তু প্রকৃত প্রেমের ধর্ম্ম এ নহে। ভাল-মন্দ-জড়িত যে প্রেমের পাত্র প্রেমিকের চিত্তকে আকর্ষণ করে, প্রেমিক তাহাকে গোটাভাবেই দেখে এবং গোটাভাবেই তাহাকে প্রীতি করে। যার এ প্রেম নাই, সে এ ভালমন্দ-মিশ্রিত বস্তুর বা ব্যক্তির ভালকেও ভাল করিয়া বোঝে না, মন্দকেও ভাল করিয়া ধরে

প্রেমকে লোকে অন্ধ বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রেমের মতন এমন চক্ষুষ্মান আর কিছুই নাই। প্রেম অপরের চাইতে কম দেখে না, বেশী দেখে। আর বেশী দেখে বলিয়াই প্রেমপাত্রের মন্দের মধ্যেও যে ভালটুকু লুকাইয়া আছে, সে তাহাকেও দেখে, শুধু মন্দটুকুকে দেখিয়াই তাহা হইতে ফিরিয়া আসে না।

উপাধ্যায় ভারতবর্ষকে এবং ভারতবর্ষের পুরাগত সভ্যতা ও সাধনাকে এইরূপ প্রেমের চক্ষে দেখিতেন বলিয়াই তাঁর নিকটে স্বদেশ-বস্তু যেরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, আমাদের মধ্যে অতি অল্পলোকের নিকটেই সেরূপ করিয়াছে। অনেক সময় এ বিষয়ে উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার গুরুতর মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে চক্ষে স্বদেশকে ও স্বদেশী সমাজকে দেখিতেন, আমি সে চক্ষে ঠিক দেখিতাম না। অথচ উপাধ্যায় যে নিরতিশয় রক্ষণশীল ছিলেন, বা যেটা যেমন আছে, সেটা ঠিক তেমনি

থাকুক, ইহা যে তিনি চাহিতেন, এমন কথাও বলিতে পারি না। তিনি সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। যে সমাজ যুগে যুগে বিবর্তিত হয় না, তাহা মৃত, জড়; তার ভূতগৌরব যাহাই থাকুক না কেন, ভবিষ্যৎ আশা যে কিছুই নাই, আমরা যেমন ইহা বুঝি, উপাধ্যায়ও ঠিক সেইরূপই বুঝিতেন। তাঁহাকে প্রকৃত অর্থে কিছুতেই "রি-অ্যাকসনারী" (Reactionary) বলা সঙ্গত হইতে না। অথচ, অন্তপক্ষে তিনি যে প্রচলিত অর্থে সংস্কারক বা Reformer ছিলেন, তাহাও নহে।

সমাজ-সংস্কারকের অন্তঃপ্রকৃতি

কারণ তিনি স্বদেশকে যে ভাবে যতটা ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন, কোন সংস্কারকের পক্ষে তাহা আদৌ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সংস্কারকের অন্তঃপ্রকৃতিটা যে কি, তাহা নিজের জীবনে, আর যৌবন-কালের চারিপাশের বন্ধুবান্ধবদিগের জীবনে সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সংস্কারক সমাজের দোষভাগের প্রতি যতটা সজাগ থাকেন, তার গুণভাগের প্রতি ততটা সজাগ থাকিতেই পারেন না; থাকিলে তাঁর সংস্কার-বাসনার বেগটা কমিয়া যায়। আর যে প্রতিনিয়ত কেবল কোন ব্যক্তির বা সমাজের হীনতারই আলোচনা করে, এবং এইরূপ আলোচনা করা কর্তব্য কর্ম বলিয়াই ভাবিয়া থাকে তার পক্ষে সে ব্যক্তির বা সে সমাজের প্রতি সত্য ভালবাসা লাভ করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ভালবাসা সুন্দরের সাক্ষাৎকারেই জন্মে, সুন্দরকেই চায়, সুন্দরের সন্ধানেই ফিরে। কুৎসিতের ধ্যানে বা দর্শনে বা চিন্তনে, ভালবাসা জন্মিতেই পারে না, বাঁচিয়া থাকা বা বাড়িয়া ওঠা তো বহু দূরের কথা। অথচ সমাজসংস্কারক প্রায়ই মক্ষিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমাজ-দেহের ক্ষতস্থানগুলির চারদিকেই সর্বদা ভন ভন করিয়া বেড়ান; এরূপ না করিলে তাঁর ব্যবসায় টিকিয়া থাকিতে পারে না। এই কারণে এই জাতীয় সমাজসংস্কারক অনেক সময়ই আত্ম-সম্ভাবিত ও মদান্বিত হইয়া উঠেন। আর এ অবস্থায় ইঁহাদের পক্ষে স্বদেশকে বা স্বদেশের সমাজকে সত্যভাবে বা গভীররূপে ভালবাসা যে অসম্ভব হইয়া উঠে, ইহা আর বিচিত্র কি? উপাধ্যায় প্রথম যৌবনে কিয়ৎপরিমাণে এ জাতীয় সমাজসংস্কারক যে ছিলেন না, এমন বলা কঠিন। কিন্তু ক্রমে তিনি সে ভাবটাকে ছাড়াইয়া উঠেন। বাংলা দেশে তিনি যে অভিনব দেশভক্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁর পরিণত বয়সের দীর্ঘসাধনলব্ধ বস্তু; যৌবনের পরকীয়া প্রীতির মোহের মরীচিকা মাত্র নহে। তাঁরই জন্য এ বস্তু এতটা সচ্চা ও সজীব হইয়াছিল।

উপাধ্যায় স্বদেশের ভালটুকুকে, স্বদেশী সমাজের শ্রেষ্ঠটুকুকে, স্বাদেশিক রীতিনীতির শোভনতা-টুকুকেই ভাল করিয়া ধরিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁর উদার কোমল প্রাণ মজিয়া গিয়াছিল। তাই তিনি অমন করিয়া স্বদেশকে ও স্বদেশী সমাজকে, স্বদেশী সভ্যতা ও স্বদেশী সাধনাকে এতটা পরিমাণে প্রেম দিতে পারিয়াছিলেন। তাঁর চক্ষে আমাদের ভাল আমাদের মন্দকে ছাপাইয়া উঠিত। আমাদের সৌন্দর্য আমাদের কদর্যতাকে ঢাকিয়া ফেলিত। আমাদের অব্যক্ত শক্তি প্রকাশ্য দুর্বলতার মিথ্যকতা প্রমাণ করিত। তিনি আমাদের সিদ্ধিকে উপেক্ষা করিয়া সাধ্যের ধ্যান করিতেন। আমরা কি করিতেছি বা করিয়াছি তার বিচার না করিয়া আমরা কি করিতে পারি তারই সন্ধান করিতেন। আর এই জন্যই

আমাদের ত্রুটি দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কিছুতেই তাঁর প্রেমকে ব্যাহত করিতে পারিত না। এ বিষয়ে তিনি ভারতের সন্ত-সমাজ-সুলভ প্রখর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন।

আমাদের সাধুসন্তেরা মানুষ কি অবস্থায় আছে তাহা তত দেখেন না। সে সত্য বস্তুটী যে কি ইহা জানেন বলিয়া তাহার বর্ত্তমান দুর্গতি বা পাপকলুষ দর্শনে বিন্দু পরিমাণেও বিচলিত হন না। এ দু'দিনের কর্ম্মভোগ দু'দিনে ফুরাইবে। পথের ধূলামাটী চিরদিন গায়ে লাগিয়া থাকিবে না। একদিন না একদিন এগুলি আপনা হইতেই ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এ বিশ্বাস তাঁহাদের আছে বলিয়া কাহারও প্রতি তাঁহাদের প্রেমের বা আস্থার বা শ্রদ্ধার কোনও অল্পতা হয় না। উপাধ্যায়ও সেইরূপ এই ভারতবর্ষ আজি কি ভাবে পড়িয়া আছে, তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিতেন না। ভারতবর্ষ সত্য বস্তুটী কি, ইহাই জানিয়াছিলেন ও ধরিয়াছিলেন বলিয়া তার বর্ত্তমান দুর্গতিতে বা হীনতায় বিন্দু পরিমাণেও তাঁর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত না। এ মোহ যে দুদিনের, এ মায়া যে ক্ষণস্থায়ী, এ দুর্দ্দশা যে শারদ প্রভাতের মেঘাড়ম্বরের ন্যায় আপনা হইতে কালক্রমে কাটিয়া যাইবে;—এ বিশ্বাস উপাধ্যায়ের মধ্যে যেমন দেখিয়াছি, এমন আর কাহারও মধ্যে দেখি নাই। আর উপাধ্যায়ের মধ্যে যে রক্ষণশীলতা দেখা যাইত, তাহা এই অটল বিশ্বাসেরই ফল। স্বদেশের সভ্যতার ও সাধনার, স্বদেশের সমাজ-প্রকৃতির ও লোক-প্রকৃতির উপরে উপাধ্যায়ের যেরূপ আস্থা ছিল, এমন আস্থা আমাদের মধ্যে আর কাহারও ছিল বলিয়া মনে হয় না।

নূতন স্বাদেশিকতা ও পুরাতন দেশ-প্রীতি

এই খানেই আমাদের বর্ত্তমান স্বাদেশিকতার আদর্শ পূর্ব্বযুগের স্বাদেশিকতার আদর্শ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ইংরেজিশিক্ষিত সমাজে যে দেশপ্রীতি জাগিয়া উঠিয়াছিল, তার মধ্যে স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার প্রতি এই গভীর শ্রদ্ধা ও স্বদেশের শক্তিসাধ্যের উপরে এই অবিচলিত আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এ বস্তু আমাদের সে'কালের সমাজ-সংস্কারকদিগের মধ্যেও ছিল না, রাষ্ট্রসংস্কারক দলেও পাওয়া যাইত না। আর এই জন্যই প্রথম যুগের সমাজসংস্কার-প্রয়াস ও রাষ্ট্রীয়-কর্ম্মচেষ্টা, উভয়ই একান্ত বহির্ম্মুখীন ও বিদেশাভিমুখীন ছিল। সুতরাং সে সময়ে আমরা আমাদের সমাজ-জীবন, ধর্ম্মসাধন, কর্ম্মচেষ্টা, রাষ্ট্রীয়-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ,—স্বাদেশিকতার সকল উপকরণগুলিকেই বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার দাঁড়িপাল্লায় তুলিয়া তৌল করিতে যাইতাম।

আর পরের মাপে যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এরূপভাবে আপনাকে ওজন করিতে যাইবে, তার আত্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি কদাপি সম্ভবে না। এই কারণে আমাদের প্রথমযুগের সমাজসংস্কার ও রাষ্ট্রসংস্কার সকলপ্রকারের স্বাদেশিক কর্ম্মচেষ্টাই আমাদিগের মধ্যে একটা গুরুতর আত্মবিস্মৃতি জন্মাইয়া দেয়। এবং এই সাংঘাতিক আত্মবিস্মৃতি হইতে একটা পরমুখাপেক্ষিতার অভ্যাস জন্মিয়া গিয়া আমাদের সর্ব্ববিধ শক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা ও আস্ফালনকেই আমাদের আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা-বৃদ্ধির একটা প্রবল ও নূতন কারণ করিয়া তুলে।

নিষ্ফল আন্দোলন

প্রচলিত সমাজসংস্কার-চেষ্টা এবং রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের এই বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া উপাধ্যায় এই উভয়বিধ কর্ম্ম-চেষ্টারই তীব্র প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করেন। প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সর্ব্ববিষয়ে গভর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া, দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে আত্মস্থ ও পরিপুষ্ট হইবার পথে অন্তরায় স্থাপন করিতেছিল। আবেদন-নিবেদনেই দেশের নবজাগ্রত রাষ্ট্রীয় কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা আপনাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেছিল, জনশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়াও এই সকল রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচেষ্টা সে শক্তিকে সংহত ও কার্যক্ষম করিয়া তুলিতে পারিতেছিল না। বরং প্রজা-সাধারণের নিজের ঘরে ও আত্মচেষ্টাতে কোন স্বাদেশিক কর্ম্মসাধনের ইচ্ছা ও প্রয়াসকে নষ্ট করিয়াই ফেলিতে ছিল। এই জন্য উপাধ্যায় রাষ্ট্রীয় জীবনে আত্মনির্ভর ও আত্মচেষ্টার আদর্শটিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। নিজের কোটে থাকিয়া, গবর্ণমেণ্টের দিকে একান্তভাবে মুখ ফিরাইয়া, শান্ত ও সমাহিত ভাবে আমরা জনশক্তির সংহতিতে সর্ব্ববিধ স্বাদেশিক কার্য্য সাধন করিব,—উপাধ্যায় সর্ব্বদা এই কথাই বলিতেন। গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিরোধ বাধানেই প্রথমাবধি যে তাঁর রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচেষ্টার লক্ষ্য ছিল, এমন কথা বলা যায় না। ক্রমে, ঘটনাচক্রে এরূপ একটা বিরোধের সূত্রপাত হয় সত্য; কিন্তু এই বিরোধকে উপাধ্যায় নিজে ইচ্ছা করিয়া জাগাইয়াছিলেন, এমন কথাও বলা যায় না।

ফলতঃ দেশের তদানীন্তন অবস্থাধীনে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া স্বাদেশিক কর্ম্ম করা নীতিসম্মত না হইলেও চিরদিনই যে জনমণ্ডলীর পক্ষে এরূপ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা আবশ্যক বা বাঞ্ছনীয় বা সম্ভব, উপাধ্যায় এমনটা কখনও ভাবিতেন বলিয়া বোধ হয় না। সে সময়ে দেশ ঘোরতর তামসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে একটা রাজসিক প্রেরণা প্রদান করা অবশ্যক হয়। এই জন্যই উপাধ্যায় জীবনের শেষ দিকে এই স্বাতন্ত্র্য-নীতি অবলম্বন করেন। কিন্তু রাজসিকতা ভারতের সভ্যতা ও সাধনার চিরন্তন বা ঊর্দ্ধতন লক্ষ্য যে নয়, উপাধ্যায় ইহা যেমন জানিতেন, এমন আর কেহ জানিতেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে যে সাত্ত্বিকতা চিরদিনই আমাদের সভ্যতা ও সাধনার চরম লক্ষ্য হইয়া আছে, সেই সাত্ত্বিকতাকে জাগাইতে হইলেই, সে অবস্থায় প্রথমে দেশব্যাপী তামসিকতাকে রাজসিকতার দ্বারা অভিভূত করা আবশ্যক, উপাধ্যায় এ সত্যটাকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রেই এই রাজসিকতাকে জাগাইয়া তোলা সহজ ও সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। তাহাতে ভবিষ্যতের সাত্ত্বিকতার পথও উন্মুক্ত হইবে, অথচ সমাজে কোনও প্রকারের সাংঘাতিক অরাজকতার প্রতিষ্ঠারও বিশেষ আশঙ্কা থাকে না। এই জন্যই উপাধ্যায় রাষ্ট্রীয় জীবনে এই অভিনব স্বাতন্ত্র্যনীতি প্রচার করিয়াছিলেন। দেশের লোকের আত্মচৈতন্যকে জাগাইয়া তোলা, তাহাদের চক্ষুকে নিজের দিকে নিবদ্ধ করা, নিজের হাতে দেশের কাজ দশে মিলিয়া করিলে যে শিক্ষা, যে সংযম, যে শক্তি লাভ হয়, ইহাতে নিজেদের উপরে যে শ্রদ্ধা জন্মে, ও এই শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে যে উৎসাহ, অন্তরে যে আশা, পেশীতে যে বল সঞ্চারিত হয়, তাহা লাভের জন্যই উপাধ্যায় এই নীতি প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন; নতুবা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া বিরোধ বাধানই যে তাঁর অভিপ্রায় ছিল, এমন কথা কিছুতেই বলিতে পারি না।

কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের স্বাদেশিকতার সত্য আদর্শটীকে ধরিতে হইলে, বিশেষভাবে তাঁর সমাজ-নীতির আলোচনা করা আবশ্যক। কারণ এখানেই তাঁর স্বাদেশিকতার নিজস্ব স্বরূপটী ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব মহাশয় স্বদেশবন্ধুকে কতটা যে ভালবাসিতেন, তাঁর ঐকান্তিক সমাজানুগতাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হিন্দু সাধনা পরিহার করিয়া, সাধনান্তর গ্রহণ করিয়াও তিনি এই সমাজানুগতা বর্জ্জন করেন নাই। বরং এই বিদেশীয় ধর্ম্মসাধনকেই আপনার জীবনে সম্পূর্ণরূপে নিজের দেশের সমাজ-বিধানের সঙ্গে মিলাইয়া লইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ উপাধ্যায় মহাশয়ের এই সমাজানুগত্যের অন্তরালে কেবল একটা অর্থহীন ও অযৌক্তিক রক্ষণশীলতাই দেখিতেন। প্রথম বয়সে উপাধ্যায় না কি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। এই জন্য তাঁর পরিণত বয়সের এই সমাজানুগত্যকে কেহ কেহ, বিশেষতঃ তাঁর পূর্ব্বকার ধর্ম্মবন্ধুগণ, পুরাতন কুসংস্কারের দিকে পুনরাবর্ত্তন বা রি-অ্যাক্‌শন (re-action) বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু উপাধ্যায়কে এ জাতীয় রক্ষণশীল কি বলা যাইতে পারে?

"সন্ধ্যা" পরিচালনা

ইহাতেই মনে একটা প্রকৃত শ্রদ্ধার ভাব ছিল, এ কথাটা সকলে জানেন না ও বোঝেন না। "সন্ধ্যা"-পত্রিকার সম্পাদক বলিয়াই বাঙ্গালী সমাজে উপাধ্যায় বিশেষ ভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। আর "সন্ধ্যাতে" প্রায়ই সমাজের, বিশেষতঃ নব্যশিক্ষাভিমানী সম্প্রদায়ের, কোন না কোনো শ্রেষ্ঠজন সম্বন্ধে এরূপ কঠোর তীব্র কখনও কখনও বা গভীর বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত যে এগুলি পড়িয়া অপরিচিত লোকে কোনও প্রকারেই সম্পাদককে এক জন শ্রদ্ধাশীল লোক বলিয়া কল্পনা করিতে পারিত না। কিন্তু উপাধ্যায়কে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন, তাঁহারা তাঁহার কথাবার্ত্তায় কখনও প্রকৃত শ্রদ্ধাশীলতার অভাব দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। পল্লীর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, পল্লীবাসীর কাহাকেও না কাহাকেও তার আবর্জ্জনা-রাশি পরিষ্কার করার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। এ অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্ম যে করিতে যাইবে, তার হাতে ও গায়ে কিছু না কিছু ময়লাও লাগিবেই লাগিবে। কিন্তু দশের হিতের জন্য এ কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া যে সে ব্যক্তি স্বভাবতঃই আবর্জ্জনা ভালবাসে, এমন কথা যেমন বলা সঙ্গত হয় না, সেইরূপ সময়বিশেষে সমাজের নৈতিক বা রাষ্ট্রীয় আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা প্রয়োজন হইলে, সমাজের কোন না কোন পদস্থ জনকেও সর্ব্বসমক্ষে অপদস্থ করা আবশ্যক হইতে পারে। আর সে অবস্থায়, সে অপ্রীতিকর কর্ম্ম যদি কেহ করে, তাহাতে তাহাকে অল্পবিস্তর হীনতাও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া নির্ব্বিকার-চিত্ত সেই দেশসেবককে হীনচরিত্রের লোক বলিয়া মনে করা কখনই সঙ্গত হয় না। উপাধ্যায় সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। "সন্ধ্যা" পত্রিকায় সমাজের কোনও কোনও পদস্থজনকে যখন তখন তীব্রভাবে আক্রমণ করা হইত বলিয়া, সম্পাদকের প্রকৃতিতে যে একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধাশীলতা ছিল না, একেবারে সরাসরিভাবে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না।

ফলতঃ উপাধ্যায় "সন্ধ্যা" পরিচালনা করিতে যাইয়া, আপনার অন্তরকে কতকটা পরিমাণে যে নিষ্পীড়িত করিতেন, বহুদিন কাছে থাকিয়া, এক সঙ্গে কাজকর্ম্ম করিয়া, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এ সকল আক্রমণ যে সর্ব্বদা তিনি নিজে লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহাও নহে। তবে অপর লেখকদিগের প্রবন্ধাদির উপরে তিনি প্রায়ই হস্তক্ষেপ করিতেন না। আর সমাজের "মেকি" নেতৃত্ব ও স্বদেশ-সেবার প্রভাব নষ্ট না হইলে, সত্য ও সজীব স্বাদেশিকতা কখনই ফুটিয়া উঠিবে না, ইহাও তিনি মনে করিতেন। এই জন্য আর কোনও কিছু বিচার না করিয়া উপাধ্যায় এ সকল লেখা পরস্ব করিয়া দিতেন। নতুবা, সত্য সত্যই যে লোকনিন্দায় তাঁর আনন্দ হইত, তাহা নয়। আর এ সকলে তাঁর প্রাণগত শ্রদ্ধাশীলতার অভাবও সূচিত হইত না।

শ্রদ্ধাশীলতা ও রক্ষণশীলতা

প্রকৃতিগত শ্রদ্ধাশীলতা হইতে, সর্ব্বত্রই এক প্রকারের রক্ষণশীলতাও জন্মিয়া থাকে। এই জাতীয় রক্ষণশীলতা উপাধ্যায়ের মধ্যে বেশই ছিল। তারই জন্য প্রাচীনের ও প্রতিষ্ঠিতের উপর আঘাত করিতে উপাধ্যায়ের হাত সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত হইত। এই জন্যই উপাধ্যায় প্রথম বয়সে আপনার কৌলিক ধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়াও, একেবারে উৎকট ধর্ম্ম-সংস্কারক বা সমাজ-সংস্কারক হইয়া উঠেন নাই। ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়া, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ না দিয়া, কেশবচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। কেশবচন্দ্রের নিজের চরিত্রে একটা রক্ষণশীলতা এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে একটা শ্রদ্ধাশীলতা সর্ব্বদাই বিদ্যমান ছিল। এ বস্তু ব্রহ্মসমাজের অপর শাখায় তেতটা পাওয়া যায় নাই। উপাধ্যায়ের প্রকৃতিগত শ্রদ্ধাশীলতা শাস্ত্রগুরুবর্জ্জিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মেতেও বেশ দিন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। এই শ্রদ্ধাশীলতার প্রেরণাতেই, আমার মনে হয়, উপাধ্যায় ব্রহ্মসমাজ ছাড়িয়া প্রথমে প্রোটেস্টাণ্ট খৃষ্টীয় মণ্ডলীর ও শেষে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টীয় সঙ্ঘের আশ্রয় লইয়াছিলেন। আর এই খানেই, তাঁর প্রকৃতিগত শ্রদ্ধাশীলতার ও রক্ষণশীলতার প্রভাবে উপাধ্যায়ের শেষ বয়সের সমাজ-নীতির মূল ভিত্তিটী গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে।

সর্ব্বত্রই ব্যক্তিস্বাভিমানী অনধীনতার আদর্শের সঙ্গে সমাজানুগত্যের একটা নিত্য বিরোধ জাগিয়া রহে। যেখানেই এই অনধীনতার ভাবটা প্রবল হইয়া উঠে, সেই খানেই সমাজানুগত্যটা ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। প্রোটেস্টাণ্ট খৃষ্টীয়ান্ সম্প্রদায়ে এই ব্যক্তিস্বাভিমানী অনধীনতার ভাব খুবই প্রবল। এই জন্য ইহাদের মধ্যে সমাজানুগত্যও ক্রমশঃই কমিয়া গিয়াছে, এখন নাই বলিলেও চলে। অন্যদিকে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টীয় সঙ্ঘে, শাস্ত্র ও গুরু উভয়ের প্রাধান্য-মর্য্যাদা সমভাবে রক্ষিত হইয়া, ধর্ম্মসাধনে ও সমাজ-জীবনে উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিস্বাভিমানী অনধীনতার ভাবকে অনেকটা সংযত করিয়া রাখিয়াছে। এই জন্য এখানে সমাজানুগত্য যে ধর্ম্মের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, এ ভাবটা এ পর্য্যন্ত একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। এই কারণেই, রোমক-সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই উপাধ্যায়ের সমাজানুগত্যের ভাবটাও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে।

অতএব এই সমাজানুগত্যটা ভাল হউক মন্দ হউক, যুক্তিসঙ্গত বা অযৌক্তিক, আর যাহা কিছুই হউক না কেন, ইহার অন্তরালে যে একটা বিরাট ধর্ম্মতত্ত্ব ও সত্য জড়িত ছিল, এ কথাটা অস্বীকার করা যায় না। একটা ঝোঁকের চোটে উপাধ্যায় প্রাচীন সমাজশাসন পরিত্যাগ করেন নাই; বেয়ালের চোটে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাতেও প্রবৃত্ত হন নাই। এই জন্য তাঁহাকে পুনরাবর্ত্তনকারী বা re-actionary বলা যায় না।

ফলতঃ আমাদের সমাজের যাহা যেরূপ আছে, তাহা সেইরূপই থাকিবে বা থাকা বাঞ্ছনীয়, উপাধ্যায়কে কোনও দিন এমন কথা বলিতে শুনি নাই। "বন্দেমাতরম্" পত্র প্রতিষ্ঠার সময়ে এই সম্বন্ধে উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়। নূতন কাগজ সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে কি নীতি অবলম্বন করিবে, ইহাই আমাদের উভয়ের বিচার্য্য বিষয় ছিল। "বন্দেমাতরম্" সর্ব্ব বিষয়ে উদার সংস্কারের সমর্থন করিবে, আমি এই কথা বলি। উপাধ্যায় ঐ বিষয়ে একটু আপত্তি করেন। তাঁর মূল কথাটা আজিও আমার মনের মধ্যে জাগিয়া আছে। তিনি বলেন—"সমাজ-সংস্কারের বিরুদ্ধে আমি নই। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাধীনে সমাজ সংস্কার বলিতেই বিদেশীয় সভ্যতা-সাধনার প্রভাবে, কতকগুলি বৈদেশিক আদর্শের স্বল্পবিস্তর অনুবর্ত্তনই বুঝাইয়া থাকে। এই জাতীয় সমাজ-সংস্কারে আমাদের সমাজের বিশেষত্বটুকু ক্রমে লোপ পাইতেছে, আমরা ফিরিঙ্গীর একটা নকলের নকলের মতন হইয়া উঠিতেছি। এটা আমি চাই না। ইহাতে সমাজের স্বাদেশিকতা নষ্ট হইয়া, সমাজের ও লোকচরিত্রের সাংঘাতিক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে। তারা আগে জাগুক। নিজেরা নিজেদের চিনিয়া লউক। তারপর তারা নিজেরাই নিজেদের প্রকৃতি ও প্রয়োজনানুরূপ নিজেদের সমাজকে গড়িয়া পিটিয়া সুধরাইয়া লইবে।"

এই কথাগুলিতেই উপাধ্যায়ের সমাজনীতির যেমন, তেমনি তাঁর স্বাদেশিকতারও সুন্দর পরিচয় পাই।

আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব

বস্তুতঃ উপাধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন মানব-সমাজকে এক একটা স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট জীবের মতন মনে করিতেন বলিয়া বোধ হয়। Social-organism বা সমাজ-জীব আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানের এই পরিচিত পরিভাষাটী তাঁর মুখে কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কিন্তু তাঁর কথাবার্ত্তায় তিনি যে এই আধুনিক সমাজতত্ত্বটীকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন ইহা খুবই বুঝিয়াছিলাম। আর প্রত্যেক সমাজকে এইরূপ বিশিষ্ট জীবধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মনে করিতেন বলিয়াই সকল সমাজেরই ভাল ও মন্দের মধ্যে যে একটা অতি নিগূঢ় অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে, এ কথাও তিনি বলিতেন। এই জন্যই বিলাতী সমাজের মন্দটাকে ছাড়িয়া শুদ্ধ ভালটীকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে যেরূপ নিতান্ত অসম্ভব, সেইরূপ আমাদের নিজেদের সমাজের ভালটুকুকে নিখুঁতভাবে রক্ষা করিয়া, কেবল তার মন্দটুকুকে একান্তভাবে পরিহার করাও একান্ত অসাধ্য। জীবদেহে যখন প্রাণশক্তি দুর্ব্বল হইয়া

পড়ে, তখনই কেবল তাহার অন্তরস্থ রোগের বীজাণুসকল প্রবল হইয়া অশেষ উৎপাত ও অমঙ্গল ঘটাইতে আরম্ভ করে। প্রাণীর সুস্থ সবল অবস্থায় তারা নির্জীব ও অপকার সাধনে অক্ষম হইয়া পড়িয়া থাকে, এ যেমন সত্য; সমাজের ভালমন্দ সম্বন্ধেও ইহা সেইরূপই সত্য। সমাজের মধ্যে যখন প্রাণশক্তি সতেজ ও সবল থাকে তখন সমাজের রীতি-নীতি এবং শাসনসংস্কারের ভালটুকুই প্রবল হইয়া রহে ও তাহার মন্দটুকু হতবল ও হীনতেজ হইয়া অপকার সাধনে অক্ষম হইয়া যায়। কিন্তু সমাজের প্রাণশক্তি হ্রাস হইতে আরম্ভ করিলেই এ সকল অন্তর্নিহিত উৎপাত ও অমঙ্গলের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া সমাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতে থাকে। সুতরাং সমাজের প্রাণশক্তিকে জাগাইয়া তোলা, সেখানে বল সঞ্চার করা, এ সকলই সমাজসংস্কারসাধনের প্রথম ও মুখ্য কর্ম্ম। এটী করিতে পারিলে, সমাজ একবার সজীব ও আরুঢ় হইয়া উঠিলে, সামাজিক ব্যাধিসকলের বীজাণুগুলি আপনি মরিয়া যাইবে বা মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়া থাকিবে। উপাধ্যায় এই কারণেই সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্ব-প্রযত্নে স্বদেশী সমাজের প্রাণ মধ্যে এই শক্তি সঞ্চার করিবার জন্যই ব্যগ্র ছিলেন; বাহির হইতে উত্তেজক ঔষধ দিয়া, সমাজ-দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় উপদ্রব সকলকে প্রশমিত করিবার জন্য হাতুড়ে চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। এ কথাটা না বুঝিলে, উপাধ্যায় কেন যে শেষ জীবনে সমাজ-সংস্কারের কথা তেমন বেশী বলিতেন না, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা সহজ বা সম্ভব হইবে না।

সাম্রাজ্যবাদী ঐক্য　　**রবীন্দ্রনাথ**

.....ইংলণ্ডে হঠাৎ একটা ইম্পিরিয়ালিজমের ঢেউ উঠিয়াছিল। সুদূরপ্রসারের সমস্ত উপনিবেশগুলিকে এক সাম্রাজ্যতন্ত্রে বাঁধিয়া ফেলিয়া একটা বিরাট কলেবর ধারণ করিবার প্রলোভন ইংলণ্ডের চিত্তে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল।.....সাম্রাজ্যকে এক কেন্দ্রগত করিবার খাতিরে যেখানেই উপনিবেশগুলির স্বাতন্ত্র্যহানি হইবার লেশ মাত্র আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, সেখানেই প্রবল আপত্তি উঠিয়াছে। একান্ত মিলনেই যে সফলতা হইলেই যে মহৎ হওয়া যায়, একথা এখনকার কথা নহে। আসল কথা, পার্থক্য যেখানে সত্য, সেখানে সুবিধার খাতিরে বড়ো দল বাঁধিবার প্রলোভনে তাহাকে চোখ বুজিয়া লোপ করিবার চেষ্টা করিলে সত্য তাহাতে সম্মতি দিতে চায় না।.....

বাংলা ভাষা ও ভাষাগত ঐক্য　　**রবীন্দ্রনাথ**

একজন বিশেষ বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন—বাংলা সাহিত্য যতই উন্নতি লাভ করিতেছে, ততই তাহা আমাদের জাতীয় মিলনের পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে, কারণ এ-সাহিত্য যদি শ্রেষ্ঠতা লাভ করে.....তবে ইহাকে অবলম্বন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বাংলাভাষা মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। এমন অবস্থায় ভারতবর্ষে ভাষার ঐক্য সাধনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বাধা দিবে বাংলাভাষা। অতএব বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলকর নহে।.....

আমার চোখে দেখা সোভিয়েট দেশ

ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

(১)

তেরোই জুলাই লেনিনগ্রাদ হতে মস্কোতে ফিরে আসা অবধি সারাদিন কেটে ছিল এক রকম ঘোড়দৌড় করেই, আর রাত্রিতেও ছিল বিদায় ভোজ। সুতরাং কখন যে বেয়ারা একখানি চিঠি রেখে গেছে ঘরে টেবিলের উপর কাগজ চাপার নিচে তা' নজরেই পড়েনি। চৌদ্দই তারিখ ভোরবেলা প্রাতরাশের জন্য নিচে যাওয়ার ঠিক আগেই নজরে পড়লো সে চিঠিখানা। খুলে দেখি অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার বিদায় সম্ভাষণযুক্ত পত্র। আগের দিনের দারুণ ব্যস্ততায় শুধু তিনি দেশে রওয়ানা হয়ে গেছেন, এটুকুই জানতে পেরেছিলুম; কখন কোনদিন এবং কি ভাবে গেলেন কিছুই বিস্তারিতভাবে জানবার সুযোগ হয়নি। তাই তার পত্রখানা হাতে পেয়ে সদ্য বিয়োগব্যথার বুকের মধ্যে একটু টন্‌টন্ করে উঠলো! কিন্তু বন্ধুর মত অক্ষরে লেখা আন্তরিকতাপূর্ণ পত্রখানি যেন একটা স্নেহের প্রলেপ লাগিয়ে দিয়ে গেল সে ক্ষতের উপর। চিঠিখানি ৯২ নম্বর আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—শিরোনামা যুক্ত কাগজে লেখা, নিচে তার অনুলিপি দিলুম।

Soverkaya Hotel
Moscow.
July, 12/1956

পরম প্রীতিভাজনেষু—

আজ আমি মস্কো ছাড়িতেছি; কাজেই আপনার সাথে দেখা হইল না। লুকিন্ শেষ পর্যন্ত নিজের কথা ঠিক রাখিয়াছে। ও দলের লোক, কাজেই অনেক উচ্চ পদস্থ লোককে ধরিয়া কাজ বাগাতে পারে।

আমার plane যাবে হেলসিন্‌কি—ষ্টকহল্‌ম হয়ে। সমস্ত ঠিক থাকিলে ১৪ই তারিখ কলিকাতা পৌঁছাবার কথা।

লুকিন্‌কে এই চিঠি দিয়া গেলাম। বলিলাম আপনার খোঁজ নিতে। যদি পারেন আর একবার অ্যাকাডেমীর সম্পাদক টপসুইয়েভের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া ফিল্ম ও অন্যান্য কাগজ পত্র নিতে চেষ্টা করিবেন।

আশা করি, আপনি সুস্থ শরীরে শীঘ্রই কলিকাতা ফিরিয়া আসিবেন। ইতি—

শ্রীমেঘনাদ সাহা

শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

Dr. R. K. Pal, Moscow Hotel.

চিঠিখানা বার দু' তিন পড়ে পকেটে নিয়ে নিচে নেমে খাবার হলে অন্যান্য ডেলিগেটদের সঙ্গে প্রাতরাশে যোগ দেওয়া গেল।

প্রাতরাশের পর বিভিন্ন দলের বিভক্ত হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। আগের রাত্রিতে অ্যাকাডেমীর বিদায়-ভোজকালে অ্যাকাডেমীশিয়ান এঙ্গেলহার্ড্‌ট আমাকে পরদিন ইন্‌ষ্টিটিউট অব বায়োকেমিষ্ট্রি দেখতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন; তাই আমি আর জগদীশ শঙ্কর দু'জন গেলুম সেখানে। অধ্যাপক এঙ্গেলহার্ড্‌ট আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন ইন্‌ষ্টিটিউটের ডিরেক্টার অ্যাকাডেমীশিয়ান প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অপেরিনের সঙ্গে। তিনও আমাদের খুব হৃদ্যতার সঙ্গে করমর্দন করে আপ্যায়ন জানিয়ে বসালেন তাঁর ঘরে। আমরা চারজন একটি টেবিলের চারদিকে বসে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলুম। ডিরেক্টার অপেরিন্ দুঃখ প্রকাশ করে বল্লেন যে গ্রীষ্মের ছুটিতে অনেক গবেষক কর্মীই মস্কোর বাইরে চলে গেছেন, সুতরাং ইনষ্টিটিউটের সব কিছু কাজ দেখাতে পারেন না বলে

তিনি দুঃখিত। এমি সময়ে ঘরে টোকা দিয়ে এসে ঢুকলেন আর একজন কর্মী এবং ডিরেক্টার পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি হচ্ছেন ডক্টর বোকুচাভা। আমাদের দেশে ককিয়াতে যে চা জন্মে, তা আপনাদের দেশের দার্জিলিংএর চায়ের মত সুবাসযুক্ত নয়, ইনি চেষ্টা কর্চ্ছেন ককিয়ার চা'কে কিভাবে দার্জিলিং চায়ের মত সুস্বাদু ও সুবাসযুক্ত করা যায় এবং অনেকটা সফলকামও হয়েছেন। তারপর চুপি চুপি বোকুচাভাকে কী বলাতে তিনি মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেলেন। অপেরিন তখনো বলে যাচ্ছেন "আর আপনারা জানেন যে শ্যাম্পেনকে বহু বছর সেলারে ফেলে না রাখলে তার নিজস্ব গুণ খুলতে পারে না, তাই আমরা চেষ্টা কর্চ্ছি কৃত্রিম উপায়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কী ভাবে "প্রসেসিং" ত্বরান্বিত করা যায় এবং আমরা সে বিষয়েও অনেকটা সফলকাম হয়েছি।" এমি সময় দেখা গেল ছোট শিশুকে যে ভাবে বক্ষের সঙ্গে কোলে নিয়ে মা কিংবা নার্স চলাফেরা করেন ঠিক তেমনি বোকুচাভা হাতে কয়েকটি মুখবন্ধ বোতল ও ছোট চায়ের প্যাকেট নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। একটি প্যাকেট হতে কিছু চা হাতে বের করে নিয়ে অপেরিন আমার হাতে দিয়ে বল্লেন "দেখুন এতে বিশেষতঃ আপনি যখন বাংলা দেশ হতে এসেছেন, আপনাদের দার্জিলিংএর চায়ের গন্ধ পান কিনা।' নাকের কাছে তা নিয়ে মাথা নিচু করে গন্ধ শুঁকতে গিয়ে বোমা ফাটার আওয়াজে চমকে উঠে মুখ তুলে চাইতে না চাইতেই সামনে টেবিলের উপর একটি কর্কের ছিপি ঘরের ছাতে ঠোক্কর খেয়ে পড়ে গেল! এক্সেলহার্ড্‌ট রসিকতা করে বল্লেন "ভয় পাবেন না, বন্দুকের গুলি নয়, শ্যাম্পেন বোতলের ছিপি।" হেসে বল্লুম "আপনারা কি, এ দিয়েই গত যুদ্ধে নাৎসীদের কাবু করেছেন?" অপেরিন হাসতে হাসতে বল্লেন "সে আমরা জানিনে কারণ মলোটোভ, ভরোশিলোভ আর ক্রুকোভই বলতে পারবেন ভাল করে, তবে হ্যাঁ এ দিয়েই আমরা বন্ধুদের কাত করি।" ফট্—ফট্—ফট্—মৃদু বোমা ফাটার মত আওয়াজ করে পরপর তিনটি ছিপি ছাতে ঠেকে এদিক ওদিকে ছড়িয়ে পড়লো, আর তাকিয়ে দেখি সদ্যঃ-দোহানো দুধের মত সাদা ফেণা চারটি বোতলের মুখ দিয়ে বেশ জোরের সঙ্গেই উপচে উঠে বোতলের গা বেয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। অপেরিন জিজ্ঞেস কল্লেন "চায়ের গন্ধ কী এ রকম।" আবার শুঁকে বল্লুম "হাঁ আপনি, না বল্লে আমি ভাবতাম যে এ চা আমাদের দেশ হতেই এসেছে।

অপেরিন তৎক্ষণ নিজেই উঠে গিয়ে বোকুচাভার সাহায্যে পরপর ৩' সেট চারটি করে গেলাসে চারটি সদ্য মুখ খোলা বোতল হতে কিছু কিছু করে শ্যাম্পেন ঢেলে আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লেন "এর মধ্যে একটি পঁচিশ বছরের পুরনো—যেমন স্বাভাবিক ভাবে হয় তেমনি, আর বাকী তিনটি ছ মাস, তিন মাস আর ৩ মাসে কৃত্রিম ভাবে প্রসেসিং করা। এবার খেয়ে বলুন কোনটি কি?" 'বলে কি? কী ভেবেছেন অপেরিন আমাদের? শ্যাম্পেন চেখে নাকি বলতে হবে প্রসেসিং ঠিক হয়েছে কিনা! ইচ্ছে হ'ল বলি যে খাইনে, কিন্তু আগের রাত্রিতে ডোজের সময় ভড্‌ক' আর ককিয়ার অতি সুস্বাদু ওয়াইনের টোস্ট্ আস্বাদন করতে দেখেছেন দুজন। সুতরাং যা থাকে কপালে, ধন্যবাদ জানিয়ে পরপর চুমুক দিতে লাগলুম একটির পর একটি গেলাস, আর তার মাঝখানে দম নিতে লাগলুম ভিজ চেটে চেটে। আমার সঙ্গী জগদীশ শঙ্করের অবস্থা আমার চেয়েও কাহিল, এক একবার তালো মানুষটির মত এক একটি গেলাসের ফেনীল তরল পদার্থে মুখ ঠেকান আর মুখ ভেংচান আর কি? আমি বোতলের মুখে উপচে উঠা শ্যাম্পেনের মতই খল খল হাসিকে চাপা দিই পাশের গেলাসটিতে বেশ লম্বা একটি চুমুক দিয়ে—আর প্রতিবর্তী ক্রিয়ারূপ মুখ বিকৃতিকে দমিত করি দারুণ ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে? আবার জিজ্ঞাসু প্রশ্ন, কেমন লাগলো? জগদীশ শঙ্কর নির্বাক ভাবে বোকার হাসি হাসলেন, সুতরাং অনন্যোপায় হয়ে আমাকেই মুখ খুলতে হ'ল" না বিশেষ কিছু তফাৎ দুটোর মধ্যে বুঝতে পাচ্ছিনে তবু—" কথা কেড়ে নিয়ে অপেরিন বল্লেন "ঠিকই বলেছেন, এখনো কিছু বাকী আছে, তবে আশা করি সে বাধাটুকুও আমরা শীগ্‌গিরই

দূর করতে পারবো।" যাদু ভাগ্যিস এ ভাবেই বুঝিল আমাকে হাতে গেল, কেননা 'তবু'র পরে কী বোলব আমিই জানতুম না। মনে মনে ভগবানকে 'ধন্যবাদ দিলুম যে সেহাৎ তাঁর দয়াতেই বোকামিটুকু প্রকাশ পেলো না, আর চাণক্য শ্লোকের একটি পংক্তি সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল "তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্নভাষতে।" কী মূল্যবান এ নীতিবাক্যটি।

অপেরিন অতঃপর আমাদের নিজের গবেষণাকক্ষে নিয়ে গিয়ে কিভাবে তিনি কৃত্রিম উপায়ে প্রোটীনের অত্যাবশ্যক অংশ একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন তাই দেখালেন। এতদিন পরে বিজ্ঞানীদের পক্ষে যা' অসম্ভব ছিল তাই তাহলে সম্ভব হতে চলেছে! মনে মনে নমস্কার জানাই সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের। তারপর তিনি আমাদের সঙ্গে করে কক্ষান্তরে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন মহিলা বিজ্ঞানী বর্ষীয়সী লীনা স্টার্লের সঙ্গে। জগদীশ শঙ্করের সঙ্গে আগে পরিচয় না থাকলেও কয়েকদিন আগে যেদিন মেডিক্যাল ফাকাল্টির ডীন পেত্রভস্কি আমাদের নিয়ে এক সঙ্গে ছবি তোলান, সেদিনই তিনি আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এই সত্তর বছর বয়স্কা মহিলা বিজ্ঞানীর। আমাদের ফটোর জন্য দাঁড়াতে অনুরোধ করে লীনা স্টার্লে উঠতে যাচ্ছিলেন আমাদের কাছে দাঁড়াতে, কিন্তু পেত্রভস্কি কশ ভাষায় কী বলাতে, তিনি আর এগিয়ে আসেন আমি সেজন্য পেত্রভস্কির মহিলাটির প্রতি সৌজন্যের অভাবটুকু খুব ভালো চোখে দেখে নি। আজ আবার তাঁর সঙ্গে তাঁর নিজের গবেষণাগারে দেখা হয়ে যাওয়াতে আমি খুবই খুশী হলুম এবং তিনি আমাদের সঙ্গে গল্প ও আলোচনায় ব্যস্ত হওয়াতে, এক্সেলহার্ড ও অপেরিন তাঁকে আমাদের বায়োফিজিক্স্ বিভাগে নিয়ে যেতে অনুরোধ জানিয়ে অত্যন্ত ভদ্রতার সহিত আমাদের সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিলেন।

কুমারী স্টার্লের বাড়ী ল্যাটভিয়ায়, শিক্ষা প্যারিসে ও সুইজারল্যাণ্ডে; সেখানেই তৈব রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং এ বয়স পর্যন্ত অক্লান্ত ভাবে মস্কোর ইনস্টিটিউট অব বায়োকেমিষ্ট্রিতে অক্লান্তভাবে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি খুব ভাল ইংরেজী বলতে পারেন এবং আমাদের নিজের গবেষণাগার সব কিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। তারপর আমরা যখন তাঁকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিতে যাচ্ছি, তখন বল্লেন "কাল ছুটি আছে, আপনারা যদি আমার পাড়াগাঁর বাড়ীতে এসে সারাদিন আমার সঙ্গে কাটিয়ে যান, তাহলে অত্যন্ত খুশী হ'ব। আশা করি আপনারা অবশ্যই আসবেন।" তাঁর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে আমরা তখনই তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম, অসংখ্য ধন্যবাদের সঙ্গে। তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে আমরা গেলুম ঐ একই বাড়ীতে অল্প অংশে অবস্থিত ইনস্টিটিউট অব বায়োফিজিক্স্-এ। সেখানে অধ্যাপক ক্রাস্ত্ আমাদের দ্রষ্টব্য অনেক কিছু দেখালেন তাঁদের গবেষণাগারে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে ইন্দোনেশিয় ডেলিগ্যাট ডাঃ শিবাসেবী এবং ফিনল্যাণ্ডের অধ্যাপক রুটিল সহ বান্ধবী ডোবেল্টে বোডানিয়া পেট্রোভস্কায়ার তত্ত্বাবধানে জগদীশ শঙ্কর ও আমি গেলুম মস্কোর প্রসিদ্ধ কৃষি প্রদর্শনী দেখতে। আমাদের দেশে যে রকম কয়েক বছর পরপর কৃষি বা শিল্প প্রদর্শনী হয়, এ সে রকম অস্থায়ী প্রদর্শনী নয়। বহু বিস্তৃত আমাদের দেশের ছোট-খাটো শহরের মত একটি জায়গা জুড়ে চিরস্থায়ী প্রদর্শনীরূপে এটি মস্কোর একটি দ্রষ্টব্য স্থান। মস্কো ছেড়ে কয়েক মাইল এগিয়ে যেতে যেতে দূর হতে চোখে পড়ে কাস্তে ও ধানের শিষ হাতে দুটি কৃষক নর-নারীর বিরাট মূর্তি। এত বড় প্রদর্শনীর অনুরূপ বিরাট একটি ফটকের সামনে পৌঁছে আমাদের গাড়ীতে বসিয়েই আমাদের তত্ত্বাবধায়িকা বান্ধবী খিড়কী দোর দিয়ে 'পাস' দেখিয়ে ঢুকলেন গিয়ে ফটকের সন্নিহিত ঘরে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের গাড়ীর ভিতরে যাওয়ার পারমিট ও একটি বছর কুড়ি বয়সের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মেয়েটির নাম "মার্গারেট, সে এ প্রদর্শনীরই একজন গাইড। মেয়েটিও আমাদের গাড়ীতে উঠে বসলো এবং প্রায়

সঙ্গে সঙ্গেই বিরাটকায় গেট খুলে দেওয়াতে আমাদের গাড়ীখানি প্রদর্শনী ক্ষেত্রের রাস্তার ভিতর দিয়েই এগিয়ে চললো। কিন্তু বেশী দূর এ ভাবে গাড়ীতে করে এগোনো গেল না, মার্গারিটার নির্দেশ আমাদের নামতে হ'ল। আমার পাশে চলতে চলতে মার্গারেট পরিষ্কার ইংরেজীতে বল্লে "ডক্টর আপনি ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন?" আমি একটু রহস্য করে বল্লুম "হাঁ, আমার গায়ের রং দেখে তা বুঝতে পাচ্ছে না?" মেয়েটি বল্লে "বাঃ-রে, তা কেন, আমাদের দেশেও তো দক্ষিণের দিকে এ রকম রং আছে।" বান্ধবী পেট্রোভস্কায়া বল্লেন "একেবারে হাতীর দেশের লোক, আমার কিন্তু একটি হাতী পেতে খুব ইচ্ছে করে।

মার্গারেটও ছোট্ট শিশুটির মত ঘাড় বেঁকিয়ে বল্লে "আমারও।" বলে কি এরা শুনেছে যে নেহেরু দেশ বিদেশে হাতী পাঠিয়েছেন, সুতরাং নেহেরুর দেশের লোক পেয়ে আব্দার ধরেছে "হাতী চাই"। আমি হেসে বল্লুম হাতী পাঠাবার মালিক আমাদের প্রধান মন্ত্রী, তাহলেও আমি তোমাদের দুজনের জন্যই নকল হাতী পাঠাব।"

"কী করে আসবে তা?" প্রশ্ন করে মার্গারেট। আমি হেসে বলি "এরোপ্লেনে করে, ঠিক আমরা যে ভাবে এসেছি তেমনি।" দুটি চোখ বিস্ফারিত করে মার্গারেট একই সঙ্গে বিস্ময় ও অবিশ্বাসের ভাব নিয়ে প্রশ্ন করে 'তাই কি (really)?" তারপর মুহূর্তে দেখার আঙুল দিয়ে ডান দিকে ছোট্ট খাটো কো-অপারেটিভ ফার্ম! তা দেখে আমরা এগোতে থাকি একটির পর একটি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বত্রিশটি অঙ্গ রাজ্য আছে, তাদের প্রত্যেকটির নিজস্ব ভাষা ও ঐতিহ্য মণ্ডিত প্যাভিলিয়নে সযত্ন রক্ষিত নানা রকমের কৃষিজাত উপাদানের সম্ভার, খাদ্য শস্য, তরি-তরকারি, ফলমূল, কার্পাস তুলো, রেশম ও তাদের দ্বারা তৈরী কাপড়-চোপড় ও নানা উপাদান দেখে দেখে। প্যাভিলিয়নগুলির কোনটি তাতার দেশীয় গড়নে, কোনটি মধ্যেনেশ ধরণে আবার কোনটি সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণে গড়া। তাদের সাহায্যে চাষবাসের, ধান কাটা, গম কাটা, ঝাড়া, বাছা, মরশুম করা, কৃত্রিম বৃষ্টি ফেলা, এ রকম কত যন্ত্রপাতি দেখলুম। একটি গাছে মিচুরিন পদ্ধতিতে বত্রিশ রকমের আপেল ধরেছে দেখতে পেলুম—অনেক কিছুই দেখলুম, কতক মনে আছে, বেশীর ভাগই নেই। মার্গারেটের কী উৎসাহ, মুখ দিয়ে যেন খৈ ফুটছে। "বাঃ-রে এখনো ত তাতিয়ার প্যাভিলিয়ান দেখেন নি, তাতিয়া স্ট্যালিনের জন্মস্থান ঐ যে সামনেই ইউক্রেনের প্যাভিলিয়ান, ইউক্রেন ইউরোপের শস্য ভাণ্ডার।" তা দেখা হয়ে গেলে বলে "সে কী কথা আপনাদের নিকট প্রতিবেশীর প্যাভিলিয়োন দেখবেন না, যেখানে কাশ্মীরের সঙ্গে রুশিয়ার সীমানা এক হয়ে গেছে?" এমি ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে আমরা এসে বসলুম ঘোড়ার প্রদর্শনীর কাছে ছোট একটি স্টেডিয়ামের মত স্থানে। সামনে দিয়ে একটির পর একটি করে অতি সুদর্শন ও তেজী ঘোড়াকে সহিসেরা প্যারেড করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দর্শকের সকলের সামনের সারিতে পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসে মার্গারেট আর আমি। দারুণ অনুসন্ধিৎসা এ মেয়েটির, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সব কিছু তখনই জেনে নিতে চায়। আমরা সেখানে ঘণ্টা খানেক বসেছিলুম, এরই মধ্যে ভারতবর্ষ থেকে সে এল বাংলা দেশে, বাংলা দেশ থেকে কোলকাতায়, কোলকাতা থেকে এসে একেবারে ঢুকলো আমার বাড়ীতে—"আমার মা-বাবার কথা জেনে বল্লে আমার গ্রাণ্ড-পা নেই কিন্তু গ্রাণ্ডি আছে, আমাকে ভালবাসে কিন্তু বকেও—বলে মেয়েদের এত ঘুরে বেড়ানো ভাল নয় কী বলেন ডাক্তার: আপনার বয়স তিপ্পান্ন বছর? তাহলে ত আপনি আমার বাবার চেয়ে মোটে এক বছরের ছোট।" আমি হেসে বল্লুম "হাঁ, আমি তোমার আঙ্কল্।" আবার অনুরোধ করে "তাহলে আমার আন্টির বয়স কত?" জবাব দিলে বলে "তাহলে আন্টি দেখছি আমার মার বেশ কিছু ছোট। আচ্ছা আপনার কি দশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে?" আমি জবাব দিই "দূর বোকা মেয়ে, তাই কি কেউ করে এখন?" "ঐ দশকে তিন দিয়ে গুণ করলে যত

বয়স হয়, সে বয়সে বিয়ে করেছি।" "বাঃ-রে আমার বাবা যে পঁচিশ বছর বয়সে বিয়ে করেছে, এখন মার বয়স একুশ মার্গারেট বকবক করতে থাকে, আর প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আমাকে।

আমি কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলে বল্লুম "কয়েকদিন আগে লেনিনগ্রাডে গেছলুম, আমার বেশ ভাল লাগলো, কেমন শান্ত, স্থির শহরটি, মস্কোর মত এত হৈ হৈ আর লোকের গিজ্‌গিজ্ নেই সেখানে?"

মুখ গম্ভীর করে ঘাড়নাড়ি দিয়ে মাথা নেড়ে মার্গারেট বল্লে "বিচ্ছিরি কারণ, আমার কিন্তু একটুও ভাল লাগে না" আমি হেসে একটু মজা করার জন্যে বল্লুম "কিন্তু মার্গারেট, তুমি তখন কী করবে, যদি লেনিনগ্রাডের কোন ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়?" সংক্ষেপে সে জবাব দিলে "বার বার মার্গারেট বলে ওই কচ্ছেন কেন, আমার বাবা-মা 'রিচী' বলে আমাকে ডাকে, তাই বলুন আমার ভাল লাগে। আপনি বলেছেন আমার বিয়ে হবে লেনিনগ্রাডের কারো সঙ্গে, কখখনই নয়, লেনিনগ্রাডকে আমি চক্ষে দেখতে পারি নে।" "কেন?" প্রশ্ন করতে যাচ্ছি এমি সময় বান্ধবী বল্লেন "ভগবান ইচ্ছুন, ডিনারের সময় হয়েছে, অতএবও হয়ে এল বলে, আমাদের যেতে হবে এবার।

গাড়ী ততক্ষণ কাছে এসেই দাঁড়িয়েছিল। আমরা গিয়ে তাতে উঠে কতক পথ যাওয়ার পর মার্গারেট যখন আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে নামতে যাচ্ছে, তখন তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বল্লুম "রিচী, তোমার পুরোনাম আর ঠিকানাটা দাও।" সে যেন এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না, এমি ভাবে বল্লে "কেন?" আমি বল্লুম তোমাকে কথা দিয়েছি, যাহোক একটা কিছু পাঠাবো, কিন্তু ঠিকানা না দিলে—" কথা শেষ করবার আগেই মার্গারেট বলে উঠলো "আমি জানি আপনি দেশের বাইরে গিয়েই সে কথা ভুলে যাবেন—কেননা এ অভিজ্ঞতা আমার নূতন নয়। তাই আমার নাম "মার্গারেট" এর বেশী আর দেবার মত আমার কোন ঠিকানা নেই। পর মুহূর্তেই কিছু মনে করবেন না আঙ্কল, আপনাকে আমার ভালবাসা দেবেন বলে মুখে এক ঝলক হাসি ছড়িয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে কয়েক মিনিট আমার হাতের উপর হাত রেখে ছেড়ে দিল। ততক্ষণে আমাদের মোটর এগোতে আরম্ভ করেছে। সে রাত্রিতে আবার বারবার মনে হচ্ছিল, আজ পর্যন্ত অনেক মেয়ে দেখেছি, কিন্তু সে সকল সাধারণ মেয়ের চেয়ে এ যেন সকল রকমেই স্বতন্ত্র। একাধারে সহজ, সরল ও জিজ্ঞাসু, আবার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন • প্রোজ্জ্বল।

রাত্রিতে নৈশ ভোজের সময় দৈনিক টেলিগ্রাফ ওয়াং একখানি দৈনিক খবরের কাগজ আমার হাতে দিয়ে একটি ছবির প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে বল্লেন "ভারতীয় এই সাংস্কৃতিক দলের ছেলেমেয়েরা আমাদের দেশে খুব সম্বর্ধনা পাচ্ছে, তাই বেরিয়েছে এ কাগজে। তাকিয়ে দেখলুম তার মধ্যে কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীঅনিল চন্দের নেতৃত্বাধীন সাংস্কৃতিক দলকে। তারপর সেদিন তারা কি কি দেখেছেন তার বিবরণ দিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা জানতে চাইলে কথা প্রসঙ্গে আমাদের পরদিন নিমন্ত্রণের কথা তাকে বল্লে তিনি বল্লেন "আপনারা ভাগ্যবান।"

পরদিন সকাল বেলা ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ন'টার সময় গাড়ী নিয়ে আমাদের ছাত্রার মতন সহচর সুকিন উপস্থিত। জগদীশ শঙ্কর সহ আমি গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছি এমি সময়ে ওয়াং এক রকম ছুটে এলেন আমাদের কাছে, আর আমাকে চুপি চুপি বল্লেন "আচ্ছা মিস্ সু যদি আপনাদের সঙ্গে মিস্ স্টার্লের বাড়ীতে যান, তাহলে কি খুব অসোজন অভদ্রতা হবে, তাঁর কিন্তু খুব ইচ্ছে আপনাদের সঙ্গে যান, কিন্তু লজ্জায় আপনাদের বলতে পাচ্ছেন না, আমাকে জিজ্ঞেস করতে বললেন।"

আমি হেসে বল্লুম "আসুন না মিস্ সু আমাদের সঙ্গে। আমি মিস্ স্টার্লকে যতটুকু জানি, তাতে মনে হয় যে তিনি খুশীই হবেন।"

• কথা প্রসঙ্গে "Margaret, C o All Union Agricultural Exhibition" এ ঠিকানায় তাকে দুটী পাঠিয়েছি জীবনে এক, দুটীর উত্তর। এতদিন সে আমাকে মাঝে চিঠি লিখে, তাতে তার সম্বন্ধে খবরা আমার আজো বন্ধ রয়েছে।

"তাহলে আমি গিয়ে মিস্ সুকে পাঠিয়ে দিই?" বলে ওরা চলে গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলেন মিস সুকে সঙ্গে করে।" সুতরাং ছিলুম ৩ জন, হলুম তিনজন; আর তিনজনের দোভাষী ও অভিভাবক নেতা সহচর লুকিনকে নিয়ে গাড়ী মস্কোর রাজপথ ছেড়ে প্রথমে সহরতলীর শিল্প এলাকায় এবং তা পার হয়ে একেবারে গিয়ে পড়লো গ্রাম্য পাঁচ বাঁধানো পথে। যতই আমরা সহর থেকে দূরে যাচ্ছি ততই কৃত্রিমতার ঘুমুর ও মুখোস খসে পড়তে লাগলো রুশ দেশের গ্রামের শরীর হতে। কোথাও ধূ ধূ কচ্ছে খোলা মাঠ, কোথাও রাস্তা, দূরে দেখা যাচ্ছে জলের ডোবা, কোথাও দেখা যাচ্ছে গ্রাম্য পরিবেশে কয়েকখানি কুটীর, কোন কোনটি আবার আমাদের দেশের মত খড়ের ছাউনি দেওয়া কিন্তু একটু তফাৎও আছে বৈ কি? জানালা দরজায় গেরস্থের রুচি ও সামর্থ্য মত ঝুলছে পর্দা, আর ভিতর হতে কানে আসছে রেডিয়োর গান! কোথাও মেয়ে পুরুষ ক্ষেতে কাজ কচ্ছে—যথাক্রমে গাউন ও প্যান্ট পরে কিন্তু তা ছাড়া দেখে মনে হয় না যে তারা ইউরোপের চাষী। কোথাও বা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খালি পায়ে কাদা ভেঙে ছুটাছুটি কচ্ছে, ঠিক যেমনটি আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা পাড়াগাঁয়ে করে। তারপর এগোতে এগোতে যখন পাঁচ বাঁধানো পথ হতে ডান দিকে ঘুরে আমরা গ্রাম্য কাঁচা পথে পড়লুম তখন আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি আমাদের দেশেরই কোন গ্রামের পথ দিয়ে মোটরে যাচ্ছি! এত সাদৃশ্য আমাদের দেশের সঙ্গে!

প্রায় ঘণ্টাটার সময় মস্কো হতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে মেলেস্কা গ্রামে পৌঁছানো গেল। ছোট্ট একটি দোতলা বাড়ী। বাড়ীর কম্পাউণ্ডে ঢুকেই প্রথমে গ্যারেজ আর ডান দিকে আউট হাউস। আমাদের গাড়ী এসে দাঁড়ানোর শব্দ পেয়েই গৃহকর্ত্রী হাসিমুখে এসে হাত বাড়িয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। আমি মিস্ সুকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বল্লুম "মিস্ সু অনিমন্ত্রিত ভাবে আসতে ইতস্ততঃ করছিলেন, আমিই জোর করে ধরে নিয়ে এলুম।" মিস্ স্টার্ণ মিস্ সুকে একেবারে জড়িয়ে ধরে গালে চুমো খেয়ে বল্লেন "মেয়ে, তুমিও আমাতে খুবই খুশী হয়েছি।" এ রকম আন্তরিকতাপূর্ণ সদয় ব্যবহারে মিস্ সু'র সকল দ্বিধা ও সঙ্কোচ কেটে যাওয়াতে তিনিও স্বচ্ছন্দে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমাদের একখানি গোল টেবিলের চার দিকে বসিয়ে তিনিও কখানি চেয়ারে বসে ঘণ্টা বাজালে হাতে একটি সাদা ডিসের মধ্যে চমৎকার লাল লাল কতকগুলি স্ট্রবেরী ফলের উপর চৌকো চৌকো চিনির কেলাসে ছড়িয়ে নিয়ে হাজির হল একটি মাঝারি বয়সের পরিচারিকা এবং ছুটি চাঁটু ভেঙে 'ঈ' এর মত করে মাথা নুইয়ে' আমাদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে তা রাখলে টেবিলের মাঝখানে, আর আমাদের প্রত্যেকের সামনে বসিয়ে দিলে ছোট একখানি করে ডিস আর চামচে। কর্ত্রী বল্লেন "এগুলি এপুনি আমার বাগান থেকে তুলে আনা—খান।" যেমন দেখতে তেমনি চমৎকার খেতে গাঢ় পাকা ফলগুলি। মিস্ স্টার্ণও খেলেন আমরাও খেলুম পেট ভরে—আর খেতে খেতে চললো গল্প আর আলোচনা—অ্যাটোমিক এনার্জির শান্তির জন্য প্রয়োগ, নেহেরু-চৌএনলাই, পঞ্চশীল, ভারতবর্ষ—চীন—রাশিয়ার মৈত্রী, পৃথিবীর শান্তি, টলস্টয় গান্ধী, কলম্বিয়ন, চীনের নব জাগরণ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা—এমি কত কিছু! এত বড় বড় কথা হতে আমরা নেমে এলুম ঘরোয়া কথায়—আমাদের প্রত্যেকের পরিবারের কথা—মিস্ স্টার্ণের বাল্য ও ছাত্রী জীবন, অর্থাৎ আমরা এক কথায় হয়ে উঠলুম একে অন্যের অন্তরঙ্গ।

ঘণ্টা দুই পরে তিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর বাগান ও বাড়ীর প্রাঙ্গণ দেখতে। কয়েক বিঘের উপর বাড়ীটি। এক দিকে বাড়ীর লাগোয়া একাডেমীর সেক্রেটারী তল্‌চেভের বাড়ী। বাড়ীর পেছনে বেশ বড় বাগান তাতে শাকসব্জি এবং স্ট্রবেরী, টমেটো, লম্বা প্রভৃতি ফলের গাছ ও লতা; তাদের গায়ে লেগে রয়েছে কাঁচা-পাকা ফলের সম্ভার। বাড়ীর বাঁ পাশে অনেকখানি খানিকটে উঁচু জায়গা—তার মধ্যে লম্বা লম্বা পাইন গাছগুলি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বাগানের

এক কোণে লতাপাতার ঘেরা কুঞ্জের মত, তার মধ্যে আছে গাছের ডালের তৈরী বসবার জন্ত কয়েকখানি চেয়ার ও মাঝখানে একটি টেবিল। সেখানে আমাদের বসিয়ে কর্ত্রী পরিচারিকাকে ডেকে বল্লেন "স্যামোভারে চা তৈরী কর।" হঠাৎ খেয়াল হল স্যামোভারের কথা কত বইতে পড়েছি, কখনো দেখবার সুযোগ হয় নি। তাই বল্লুম "স্যামোভার দেখিনি কখনো, দেখতে চাই।" অমি হুকুম হ'ল বাগানেই স্যামোভার নিয়ে এসে চা তৈরী করতে। চোখ-কানের বিবাদ মিটে গেল, যখন এল: মাঝখানে জল গরমের পাত্রটিও তার চারদিকে জ্যাকেটের মধ্যে কয়লা বা অন্য কোন বস্তুতে আগুন দেওয়ার ব্যবস্থা। পরিচারিকা ও কর্ত্রী দুজনেই তখনো পাইনের চুঁইলো ফল কুড়িয়ে এনে অতি উৎসাহের সঙ্গে জ্যাকেটের মধ্যে পুরে, মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে তাদের আগুন ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, যেন কে আগে আগুন ধরাতে পারে তার জন্ত প্রতিযোগিতা চলছে দু'জনের মধ্যে! লুকিন ও জগদীশ শঙ্কর যখন নিবাক দর্শকরূপে দাঁড়িয়ে দেখছেন, ততক্ষণে মিস সু ও আমি বেড়াতে বেড়াতে কৃত্রিম কুঞ্জের পাশে গিয়ে উপস্থিত! মিস সু হঠাৎ লুকিয়ে পড়লেন; ফ্যাল ফ্যাল করে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছি, হঠাৎ শুনি একটা ঝোপের আড়াল হতে শব্দ হল "কু-উ-কু।" বাঃ-রে, মনে পড়ে গেল ছেলে বেলাকার লুকোচুরি খেলা, খানিকক্ষণ খুঁজতে খুঁজতে ধরে ফেল্লুম মিস সুকে। এযি ইস্কুল পালানো দু'টি ছেলেমেয়ের মত খানিকক্ষণ লুকোচুরি খেলা চল্লো আমাতে আর মিস সুতে। তারপর সকলে মিলে বাগানে বসেই আরাম করে স্যামোভারে প্রস্তুত চা পান করা গেল।

বেলা প্রায় চারটা বাজে, জগদীশ শঙ্কর শঙ্কিত হয়ে চুপি চুপি আমাকে বল্লেন "এই ফল আর চা খেয়েই বিদেয় হবে নাকি।" বেচারা নেমন্তন্ন আছে বলে, প্রাতকালের সময় যখন আমরা ক্ষুরি ভোজন করেছি, তখন শুধু একখানি টোস্ট আর কফি ছাড়া আর কিছুই খান নি। আমার মার উপদেশ, "কোথাও নেমন্তন্ন খেতে গেলে যাবার সময়ে বেশ কিছু খেয়ে নিয়ে যেও, কে জানে কখন, পাত পড়বে," আমি এখনো তাই মেনে চলি। কিন্তু বেচারা জগদীশ শঙ্করের জন্ত দুঃখ হ'ল, হেসে বল্লুম "অপেক্ষা করুন সবুরে মেওয়া ফলে।" সত্যি সত্যিই মেওয়া ফললো প্রায় সওয়া চারটার সময়, কর্ত্রী বল্লেন "মধ্যাহ্ন ভোজন (?) তৈরী খেতে আসুন।" আমরা গিয়ে খেতে বসলুম আর আরম্ভ হ'ল, রসালো চর্চা, কোন দেশের লোকের কী কী রকম দোষ গুণ আছে। শুধু পরের ছিদ্রান্বেষণ নয় তিন তিনটি মিত্র দেশের লোকের আত্মবিশ্লেষণও এবং ফলে হাসি, ঠাট্টা ও মস্করা। সত্যিই সেদিন অপূর্ব তৃপ্তি পেলুম খেয়ে, সে তো আর হোটেলে বিদেশী লোকের জন্ত কৃত্রিম একঘেয়ে রান্না নয়—একেবারে ঘরোয়া আদি ও অকৃত্রিম রুশীয় খাদ্য। আমরা খাচ্ছি, আর পদার আড়ালে দাঁড়িয়ে পরিচারিকা উৎসুক নয়নে দেখছে আমাদের খাওয়া। কী একটা পরিবেশন করতে এসে ফিস্‌ফিস করে কর্ত্রীর কাণে কী বল্লে যেন, তখন তিনি বল্লেন "ও জিজ্ঞেস করছে রান্না খাওয়ার উপযুক্ত হয়েছে কিনা—ওর ভয় হয়ত আপনাদের ভাল খাওয়াই হল না।" আমরা সকলেই একবাক্যে রান্নার প্রশংসা করে সে আহ্লাদে গদগদ ভাবে আবার হাঁটু ভাঙ্গা 'দ' হয়ে বুকের উপর হাত দুটি রেখে মাথা নীচু করে একই সঙ্গে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

এরূপ পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজনের পর এল বিদায়ের পালা! সারাদিন আনন্দে কাটিয়ে বিদায়ের সময় খুবই খারাপ লাগছিল। জগদীশ শঙ্করের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে মিস স্টার্ণ বল্লেন "খুব আনন্দ পেয়েছি আমাকে মনে থাকবে ত?" হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়ই বলে স্বল্পবাক্ শঙ্কর মাথা নাড়িলেন। মিস সুর দু' গালে চুমো খেয়ে মিস স্টার্ণ বল্লেন "চীনে মেয়ে, তোমার রুশীয় অ্যাটিকে মনে থাকবে ত? আর প্রায় কয়েক মিনিট আমার হাতে নিজের হাত রেখে বল্লেন "আপনার মাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা এবং আপনার পত্নীকে আমার ভালবাসা দেবেন, আবার যখন আসবেন তখন অবশ্য দুজনে জোড়ে আসবেন।" সেদিন গোধূলিক্ষণে নিতান্ত আপনার জনের কাছ হতে বিদায়ের কালে যেরূপ ব্যথা মনে বাজে, তাই নিয়ে আমরা মোস্কোভো ছেড়ে আবার মস্কোর পথ ধরলুম।

(ক্রমশঃ)

মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল ও বিক্রমপুর

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

এক

স্বদেশী যুগের কথা।

দেশে থাকি। বিক্রমপুরে নিজ বাসগ্রাম মূলচারে। বক্তৃতা দিই গ্রামে গ্রামে হাটে বাজারে। প্রবল উত্তেজনা। নদীর বুকে নৌকা চলে স্বদেশী গান গাইতে গাইতে। গ্রামে গ্রামে মুখরিত হয় বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সকলে নবীন উদ্দীপনায় উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বসিত। ছোট বড় সকলে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া স্বদেশী প্রচার করি। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় পরিতে অনুরোধ করি। কিন্তু কাপড় বোম্বাই বা আমেদাবাদের মিলের। দেশী, বাংলার কোন মিলের কাপড় নাই। তাঁতের কাপড় ও গুজরাট ও বোম্বাই অঞ্চলের কাপড় কাঁধে করিয়া ফেরি। লোকে তাহাই আদর করিয়া কেনে। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের পুনর্জ্জীবন তখনও ভাল করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। চেষ্টার সূত্রপাত হইতেছে।

বড় বড় সহরে কলিকাতা হইতে নামকরা বক্তারা আসেন। উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দেন। তখন পর্যন্ত দেশে পুলিশি জুলুম নাই। গ্রামে গ্রামে স্বদেশী বক্তৃতা ও গানের প্রতিযোগিতা চলে। এমন দিনে ১৯০৬ সালে আমরা স্থির করিলাম কলিকাতা হইতে বিক্রমপুরে কোন বিশিষ্ট বক্তাকে আনিতে হইবে। একদিন আমরা এক গ্রাম্য সভায় নিকটবর্তী পাঁচ সাত দশ গ্রামের লোকেরা স্থির করিলাম, বিখ্যাত বক্তা মনস্বী বিপিনচন্দ্র পালকে আমরা আনিব। কি ভাবে আনা যায়? কলিকাতা সহরে কে এই দায়িত্ব লইবেন, আমাদের হইয়া পাল মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিতে!

সকলে আমার উপর ভার দিলেন ব্যবস্থা করিতে। আমি আমার মাতুল রেবতী মোহন সেনকে আমাদের অভিপ্রায় জানাইয়া পত্র দিলাম।

উত্তর আসিল। বিপিনচন্দ্র আসিতে পারেন, তবে তাঁহার যাতায়াতের দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া দিতে হইবে এবং তাঁহার খাবার ও অন্যান্য বিষয়ে সুব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা রাজী হইলাম এবং টাকা পাঠাইয়া দিলাম। পত্রে জানাইয়া দিলাম যে তাঁহাকে 'বহর' ষ্টেসন হইতে একখানি ছোট লঞ্চ সহযোগে আমাদের কামারখাড়া গ্রামে (স্বর্ণগ্রামে) তাঁহার থাকিবার স্থানে লইয়া আসিব।

সে সময়ে স্বর্ণগ্রামে শ্রীযুক্ত অমলেন্দু গুপ্ত তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিতেন। অমলেন্দু বাবু তাঁহাদের বাড়ীর দালানে বিপিনচন্দ্রের থাকিবার এবং আহারাদির ব্যবস্থার দায়িত্ব লইলেন। নানা গ্রামের স্বদেশী যুগের উৎসাহী নেতারা চাঁদা সংগ্রহ করিলেন, ভলান্টিয়ার সংগ্রহ হইল এবং গ্রাম্য বাউলের দল এবং গায়ক দল সঙ্গীতানুষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। মহা উৎসাহের সাড়া পড়িয়া গেল।

কামারখাড়া গোঁসাই বাজারের সম্মুখস্থ বিরাট মাঠে বৃহত্তম বক্তৃতামঞ্চ। প্যাণ্ডেলে লোকের বসিবার ব্যবস্থা করা হইল। অন্ততঃ পাঁচ হাজার লোক বসিতে পারে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল। বাড়ী বাড়ী হইতে সতরঞ্চ, তক্তপোষ ও টেবিল, চেয়ার সংগ্রহ করিয়া বক্তৃতামঞ্চের বাঁশ ইত্যাদি পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা মুড়িয়া, দেশের নেতৃবৃন্দের চিত্র দ্বারা সুশোভিত করা হইল। এ দিকের সব সুব্যবস্থা হইলে পর, আমরা রেবতী বাবুকে লিখিলাম, পাল মহাশয় কবে আসিবেন কোন ষ্টীমারে আসিবেন, সব জানাইবার জন্য তার করিতে।

যথা সময়ে তার আসিল। তাঁহার রওয়ানার তারিখ, পৌঁছিবার সময় সব খবর পাইলাম। রেবতী বাবু আসিতে পারিলেন না। আমার মনে পড়ে পাল মহাশয়ের সঙ্গে আরও দুই একজন লোক আসিয়াছিলেন।

সে সময়ে মুন্সীগঞ্জ ও রাজবাড়ীর মধ্যে এক মাত্র ছোট লঞ্চ ,পদ্মার দুইখানি বড় নৌকা বাঁধিয়া তাহাতে রাজবাড়ী ও মুন্সীগঞ্জের মধ্যে যাত্রী লইয়া যাতায়াত করিত। আমাদের অনুরোধে সেদিনের জন্য লঞ্চের মালিক আমাদিগকে লঞ্চখানা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন বিপিন পাল মহাশয়কে আনিবার জন্য।

তখন অপরাহ্ণ বা প্রায় সন্ধ্যাকালে ডাক ষ্টীমার গোয়ালন্দ হইতে বহর ষ্টেশনে ভিড়িত। শীতকাল, প্রায় সন্ধ্যার সময় ভিড়িল। আমরা তাঁহাকে সতর্কভাবে লঞ্চে নামাইয়া আনিলাম। পদ্মার তরঙ্গ-ভঙ্গে ষ্টীমারখানি নাচিতে ছিল। ষ্টীমারের যাত্রীরা উপর হইতে এবং নীচের ডেক হইতে কৌতূহলভরে পাল মহাশয়ের দিকে চাহিতেছিল এবং আমাদিগকে প্রশ্ন করিতেছিলেন—বিপিন পাল মহাশয় কোথায় যাইতেছেন? আমরা সংক্ষেপে উত্তর দিলাম এবং বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে লাগিলাম। ষ্টীমার হইতেও সোল্লাসে যাত্রীরাও এক সঙ্গে করিলেন "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি।

রক্তরাঙা আকাশে সূর্য্য চলিয়া পড়িলেন। সারা আকাশ তিমিরে ধীরে ধীরে দিনমণি ডুবিয়া গেলেন। আমাদের লঞ্চখানি বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে রাজবাড়ীর খাল নদী ও কামারখাড়ার খাল দিয়া যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিল। সে সময়ে খালের পাড়ে পাড়ে গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী মঙ্গল ঘণ্টা বাজিতেছিল। খালের দুই পাড়ে গ্রামের নরনারীরা 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছিলেন।

গৃহস্বামী অমলেন্দু বাবু, হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত প্রাণহরি সেন, শ্রীনাথ সেন, কামিনী কুমার বসু এবং সেকালের গ্রামের নেতারা মাননীয় অতিথিকে পরম সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। পাল মহাশয়কে ঘিরিয়া বৃহৎ দালানের হল ঘরে ফরাস পাতা পরিচ্ছন্ন বিছানায় তাঁহাকে লইয়া বসিলেন। সৌম্য শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির পাল মহাশয় আমাকে বলিলেন, ওহে রেবতী তোমাদের চিঠি দেখিয়ে বললে—আপনাকে যেতেই হবে। তাই এলাম। কেমন আছ তোমরা সব? আমাদের কুশল সংবাদ বলিলাম। রেবতীমোহন সেন ছিলেন আমার মাতুল, সুগায়ক। স্বদেশী যুগে তাঁহার সঙ্গীত ও কীর্ত্তন যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা জানেন তিনি কত বড় কীর্ত্তন গায়ক ছিলেন। রেবতী বাবু ও বিপিন বাবু উভয়েই ছিলেন মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য ও ভক্ত। রেবতী বাবুর মত আমরা বিপিন বাবুকেও মামা বলিতাম। বিপিন বাবুও অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

বৃহৎ কক্ষ ঝাড় ও লণ্ঠনে আলোকিত হইয়াছিল। গ্রাম্য নেতৃবৃন্দের সরলতা, সদাশয়তা ও নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন—পাল মহাশয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের স্বদেশী যুগের কিরূপ প্রভাব চলিতেছে, কার্য্য চলিতেছে, এই আন্দোলনে কি কি উন্নতি হইতেছে জাতীয়তার দিক দিয়া, শ্রমশিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে সেসব কথা বলিতে লাগিলেন উদাত্তকণ্ঠে, মুগ্ধ হইয়া শুনিলাম আমরা।

স্বেচ্ছাসেবকেরা নানা ভাবে তাঁহার সেবা করিতেছিলেন। তিনি কুণ্ঠিত হইতেছিলেন। বার বার বলিতেছিলেন মৃদু কণ্ঠে—'ওরে থাক্ থাক্।

পরদিন কি কি কাজ করা হইবে, বক্তৃতা হইবে, সব বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রাণহরি সেন, অমল বাবু ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পাল মহাশয়ের সহিত স্থির করিতে লাগিলেন।

রাত্রি দশটার সময়ে আমরা তাঁহাকে আহার ও বিশ্রামের অবকাশ দিয়া বাড়ী ফিরিলাম। আমরা বিভিন্ন পল্লী হইতে শুনিতেছিলাম বন্দেমাতরম ধ্বনি। মনে হইতেছিল আমরা স্বাধীন ভারতের অধিবাসী—ইংরাজ যে আমাদের মাথার উপর বসিয়া আছে সেকথা মনেও হয় নাই! অদ্ভুত উত্তেজনা ও আনন্দে আমাদের সকলের অবস্থাই ঐরূপ দাঁড়াইয়াছিল। বাড়ী আসিলে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, বিপিন বাবু কি এসেছেন?

আমি বলিলাম, হাঁ—সে'ত অনেকক্ষণ।

কই আমরা ত লঞ্চের বাঁশীর আওয়াজ শুনতে পাই নি।

বলিলাম—লঞ্চের বাঁশীটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল।

পরদিন অতি ভোরে কাক কোকিল না ডাকিতে আমরা হাজির হইলাম অমলেন্দু বাবুর বাড়ীতে। তখন বিপিন বাবু, অমলেন্দু বাবু ও আরোও দু'চার জন বসিয়া চা সেবন করিতেছিলেন। বিপিন বাবু অমলেন্দু বাবুকে বলিলেন—পাটনার গুরুপ্রসাদ বাবুর ভাইপো আপনি, দ্বারিক বাবুর পুত্র ও করুণার ভাই, আপনি যে পাটনা ছেড়ে গ্রামে আছেন এতে অত্যন্ত আনন্দ হলো। এত মাছ, দুধ, পিঠে কি করে যোগাড় করলেন, বলুন ত!

অমলেন্দু বাবু হাসিয়া বলিলেন বিক্রমপুরে কি মাছের অভাব? পদ্মা, মেঘনা, খাল বিল, এ যে মাছের দেশ। তার পর গ্রামের মেয়েরা পিঠে পরমান্ন তৈরী করেছেন। হাসিয়া বলিলেন, মা লক্ষ্মীরা বুঝি মনে করেছেন, আমি খুব পেটুক। বুড়ো হয়েছি যে একথা বুঝি ভুলে গেছেন।

একটি মেয়ে উত্তর দিলেন—মায়ের কাছে কি ছেলে কখনো বুড়ো হয়। বিপিন বাবু হাসিয়া বলিলেন—তা ঠিক। সপ্রতিভ ব্রাহ্মণ কন্যাটি আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল—তন্বী সুন্দরী। খদ্দর পরিহিতা, সে চরকা কাটিতে ছিল অবিরতধারা। গ্রামে থাকিয়া লেখাপড়া করে। এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কন্যা। পিতার কাছে কিছু কিছু সংস্কৃতও শিখিয়াছিল। বয়স উনিশ-কুড়ি। বিপিন বাবু বলিলেন—এ কি করলে মা আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে?

সে হাসিয়া কহিল, আপনি যে দেবতা।

মৌন হইলেন বিপিনচন্দ্র। নিম্ন স্বরে একটি সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইলেন।

এই মেয়েটির পিতা দরিদ্র হইলেও তাহার রূপ ও গুণের জন্য এবং রূপ গৌরবের হেতু দুই এক বৎসর পরে একজন উচ্চশিক্ষিত যুবকের সহিত তাহার বিবাহ হয় এবং সে দাম্পত্য জীবনে সুখী হইয়াছিল।

নাম কি ছিল তাহা আজ আমার মনে নাই, সম্ভবতঃ তরঙ্গিণী হইবে। আমাদের 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আমরাও বলিতাম তরুদিদি।

তরঙ্গিনী কহিলেন, আজ আমি আপনাকে রান্না করে খাওয়াব। বলুন কি খাবেন।

বল কি মা! খাওয়াবে বেশ!

ঝোল আর কিছু নয় কিন্তু।

আচ্ছা তাই হবে। বলিয়া চলিয়া গেলেন তরঙ্গিনী দিদি! বিপিন বাবু বলিলেন—মেয়েটি ত বেশ।

গ্রাম্য মহিলা সমিতি, বালিকা বিদ্যালয়, সব বিষয়েই অসাধারণ, তবে বড় পরীব এই যা, বাপ মায়ের দুঃখ এমন সুন্দরী মেয়ের যোগ্য পাত্র জোটেনা।

এইবার আমরা বিপিনচন্দ্রকে লইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলাম। ভদ্রলোকদের বাড়ী, গরীব গৃহস্থের বাড়ী, চাষার বাড়ী, মুসলমান পল্লী, হাট-বাজার, ভাঙ্গা মঠ, মন্দির, দীঘি-পুষ্করিণী, গ্রাম্য বিগ্রহ, অমল বাবুদের বাড়ীর হলের দুই পাশের প্রস্তর নির্ম্মিত দুইটি বিষ্ণু মূর্ত্তি, ও পুষ্করিণী সংস্কার করিতে করিতে প্রাপ্ত গোলোক চন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত রজত নির্ম্মিত বিষ্ণু মূর্ত্তি তন্ময় হইয়া দেখিলেন। শুনিলেন আমাদের মুখে বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাসের কথা। তখন আমার ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া নানা মশলা সংগ্রহ করিতেছিলাম। অমল বাবু বলিলেন—যোগেন বাবু বিক্রমপুরের ইতিহাস লিখতে আরম্ভ করেছেন। আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—বেশ! বেশ! ইতিহাসের ভিতর দিয়াই ত আমরা পাই দেশের প্রকৃত পরিচয়।

এইবার একটি বিস্তৃত মাঠে তরুণ ও কিশোরের দল মিলিত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইল। গ্রাম্য যুবক দল ও কিশোরী মেয়েরা মিলিত কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত গাহিলেন। বন্দেমাতরম সঙ্গীত শুনিয়া বিপিন বাবু তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের প্রত্যেকটি অংশের ব্যাখ্যা করিলেন। বুঝাইয়া দিলেন তাহাদের বন্দেমাতরম সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত মাধুর্য্য ও মহত্ত্ব। বিপিনচন্দ্র তাঁহার মধুর তেজঃপূর্ণ ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রীতির অপূর্ব্ব সৃষ্টি আনন্দ মঠের প্রত্যেকটি চরিত্রের গূঢ় অর্থ এমন ভাবে বলিলেন যে বিক্রমপুরের বহু গ্রাম হইতে

আগত ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ শুনিতে লাগিলেন বিস্মিত হইয়া, পাল দিয়া যে সব নৌকায় লোকেরা বাজার করিতে যাইতেছিল, বিভিন্ন গ্রামে যাইতেছিল, তাহারা নৌকা ভিড়াইয়া শুনিতে লাগিল অপূর্ব্ব বক্তৃতা। যুবকদের সেই পঞ্চাশ বৎসর আগে বলিয়াছিলেন, তোমরা যুবক। যুব-শক্তিই হইতেছে ক্রিয়াশক্তি। তোমরা প্রত্যেক কর্ম্মে হইবে সক্রিয়। সংগঠন শক্তি থাকবে তোমাদের মনে, তাহারই প্রভাবে তোমরা সুফলা-সুফলা শস্য শ্যামলা জননীর পায়ে দিবে অঞ্জলি। যে জননী বাণী বিদ্যাদায়িনী যে মাতা শস্যদায়িনী, যিনি দশপ্রহরণধারিণী, সে জননীকে আজ তোমাদের নব জীবনের প্রভাতে স্মরণ কর—বল তোমরা সমবেত কণ্ঠে কল কল নিনাদে, মা তুমি 'ত অবলা নও, তুমি বহুবলধারিণী, তারিণী, দশ প্রহরণধারিণী তাঁকে প্রণাম কর। বলো তোমরা, আমাদের ভারতশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করছি এই সঙ্গীতে। বন্দেমাতরম সঙ্গীত হচ্ছে ভারতশক্তির উদ্বোধক। অনুভব কর তোমরা তরুণ পুরুষ ও নারী এই বিশ্ব প্রকৃতি, তোমাদের এই মাতৃভূমির প্রতিটি ধূলিকণা যে স্বর্ণরেণু। মাথায় তুলে নাও সেই ধূলি। (সঙ্গে সঙ্গে সকলে মাথায় তুলিয়া লইলেন ধূলি)। আজ এই স্বদেশী যুগে তোমাদের কাছে এক নূতন প্রভাতের সূচনা করেছে। তোমরা মনে প্রাণে হবে স্বদেশী। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় দিয়ে করবে অঙ্গের শোভা, চরকা দিয়ে সুতো কেটে প্রস্তুত করবে নিজেদের ধুতি সাড়ী, পরের ভূষণ পরে দিওনা গলায় ফাঁসী। যাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা, অসত্য, তা করবে বর্জ্জন। অন্তরে স্থান দেবে না হিংসা দ্বেষ। হবে না আত্মঘাতী। ঔদ্ধত্য, স্বদেশ-হিতৈষিতা, স্বধর্ম্মপ্রিয়তাকে দিবে অন্তরে স্থান। বাঙ্গলার চিন্তাধারা, বাঙ্গালীর স্বদেশপ্রেম যেন আদর্শ হয়ে থাকে ভারতবর্ষের কাছে—জগতের কাছে। এই ভাবে তিনি বিক্রমপুরের অতীত ঐশ্বর্য্য, চিত্তরঞ্জনের জন্মভূমি, জগদীশচন্দ্রের জন্মভূমি এবং বাঙ্গলার বহু কৃতী সন্তানের মাতৃভূমি বিক্রমপুরবাসীকে বিক্রমশালী হইতে অনুরোধ করিলেন। ঘন ঘন বন্দেমাতরম ধ্বনিতে আকাশ বাতাস হইল প্রতিধ্বনিত।

বক্তৃতা শেষে লাঠিখেলা দেখাইলেন যুবকেরা, ছোরা খেলা দেখাইলেন, মল্লযুদ্ধ করিলেন। বিপিনচন্দ্র ইহা-দিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলে আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইল। তিনি সকলকে আলিঙ্গন করিলেন, হিন্দু মুসলমান সকলকে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে। সে যে কি আনন্দের দিন, স্মরণ করিলে মনে হয় বুঝি স্বপ্ন দেখিলাম।

সেদিনকার তরুণ কিশোর শ্রীমান্ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য তখন স্কুলের ছাত্র। তার উপর দিয়াছিলাম বিপিন বাবুকে প্রভাতিক অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ দেওয়ার ভার। সে অল্প কথায় এমন সুন্দর ভাবে বক্তার গলায় নানা বর্ণের সুরভি ফুল দ্বারা রচিত একটি সুন্দর মালা পরাইয়া বলিয়াছিল, আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিব এ যে হাসির কথা। আমি কিই বা জানি, কিই বা বলিব। আপনাকে আমাদের মধ্যে পাইব সে যে এক দুরাশা। তাহা শুধু সম্ভব হয়েছে যোগেন্দ্র বাবু ও অমলেন্দু বাবু প্রভৃতির আগ্রহে ও যত্নে। আপনার উপদেশ আমরা মেনে নিয়ে এই স্বদেশী যুগে স্বদেশের সেবায় যদি আত্মনিয়োগ করিতে পারি তবে হইব ধন্য। হে গুরু, হে স্বদেশপ্রেমিক তোমাকে আমি প্রণাম করি।

এই মনোরঞ্জন পরবর্ত্তী জীবনে বিখ্যাত অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, সত্য সত্যই জীবনকে উৎসর্গ করিয়া-ছিলেন দেশের সেবায়। কতবার কারাবরণ করিয়া-ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ছিলেন মনোরঞ্জন। বি, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও 'স্বদেশীর' জন্য তাঁহাকে অনেক দুর্ভোগ সহিতে হইয়াছে, তবু তিনি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। মনোরঞ্জন ছিলেন আমাদের পাশের গ্রামবাসী। সে সেই স্বদেশী যুগ হইতে যতদিন জীবিত ছিল আমাকে শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে। রঙ্গালয়েও তাঁহার নাম হইয়াছিল মহর্ষি। 'সীতা' নাটকে বাল্মীকির চরিত্র অভিনয় দ্বারা প্রভূত যশঃ উপার্জ্জন করেন। মনোরঞ্জন সুলেখক ছিলেন। তাঁহার বিরচিত 'চক্রব্যূহ' নাটকখানি বাঙ্গলার কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। বিখ্যাত নাট্যাচার্য এবং রঙ্গালয়ে নব যুগের প্রবর্ত্তক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী মনোরঞ্জনকে

অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। চারিদিকে ব্যর্থতা ও নিরাশার ঝড় যখন তাহার মাথার উপর দিয়া বহিতেছিল তখন শিশির কুমার মনোরঞ্জনকে রঙ্গালয়ে স্থান দেন। গুণীও গুণীর আদর রাখিয়াছিলেন। মনোরঞ্জন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তাঁহার কথা বলিলাম।

অসাধারণ ধৈর্য্যশালী ছিলেন বিপিন বাবু। স্নানের পর আহারের পূর্ব্বে আবার সুন্দর পরিচ্ছদ করাসে আসিয়া বসিলেন। এ সময়ে তাঁহার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ এবং বিক্রমপুরের বহু প্রসিদ্ধ পল্লী হইতে সরকারী কর্ম্মচারী ব্যতীত বহু হিন্দু মুসলমান আসিয়াছিলেন। নানা প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। দুপুরে বিরাট ভোজের আয়োজন চলিল। দূর হইতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই খাওয়া দাওয়া করিয়া আসেন নাই। প্রায় দুই শত তিন শত লোক কলার পাত পাতিয়া বসিয়া গেলেন! পুকুর হইতে মাছ ধরা হইল। পল্লী বধূরা ও মহিলারা সকলে অমলেন্দু বাবুর পাচক ব্রাহ্মণের সহিত আহারাদির ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হইলেন। নির্ব্বিঘ্নে সব মিটিয়া গেল। এ সময়ে অমলেন্দু বাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী যেভাবে এই বৃহৎ ব্যাপারের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও আজ আনন্দ হয়। অমলেন্দু বাবু বহু বৎসর পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সেই স্বদেশী যুগের স্বদেশ হিতৈষণা ও কর্ম্ম প্রবণতা আমাদের স্মৃতিপথে অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া বিক্রমপুরের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দলে দলে লোক আসিয়া বিপিনচন্দ্রকে দেখিবার জন্য সমবেত হইলেন। বাড়ীতে স্থান কোথায়! লোকে লোকারণ্য। বহু লোক খালের পাড়ে বসিয়াছেন, কেহ বাড়ীর স্কুলের মাঠে বসিয়াছেন। সে ছিল এক আনন্দের ও উৎসাহের যুগ।

বেলা দুইটার সময় সভা আরম্ভ হইবে। শীতের বেলা। কাজেই আমরা বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া শ্রীনাথ সেন মহাশয়ের বাড়ীর নিকটস্থ প্রকাণ্ড দীঘির পাড় দিয়া তাঁহাকে সহ প্যাণ্ডালের দিকে চলিলাম। স্বেচ্ছা-সেবকগণ 'বন্দেমাতরম্' লিখিত পতাকা হস্তে আগে আগে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন—তার পশ্চাতে লাঠি ও ছোরা হস্তে তরুণ দল, পল্লী বালিকার দল। নীরবে গম্ভীর ভাবে তেজস্বী বিপিনচন্দ্র চলিলেন বিভিন্ন গ্রামের প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া সভাস্থলে। প্যাণ্ডালে তিল ধারণেরও স্থান ছিল না। চারিদিকের মাঠে, গাছে, এমন একটু স্থান ছিল না, যেখানে না ছিল উৎসুক জনতা।

সে সময়ে বাঙ্গলার সর্ব্বত্র ছিল মনস্বী বিপিনচন্দ্রের নাম। কলিকাতা হইতে বহু নেতৃবৃন্দ পাল মহাশয়ের নামে তার করেছিলেন, আমাদের নামেও তার করেছিলেন। কোথায় গেল সে সব আজ তাহার অনুসন্ধান করা বৃথা!

স্বদেশী যুগের বিখ্যাত গায়ক হরেন্দ্র ঘোষ, মাথায় এক বিরাট পাগড়ী বাঁধিয়া রঙীন কাপড় পড়িয়া দলবল লইয়া আসিয়াছিলেন সভাস্থলে। প্রথমেই 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত করিলেন হরেন, তাহার দলবল লইয়া। ঐরূপ উদাত্ত কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ গীতটি সম্পূর্ণ ভাবে গাইতে বড় একটা এখন আর শোনা যায় না। শুনিয়াছি, স্বদেশী যুগের গায়ক ব্রহ্মের হেমচন্দ্র সেন, হরেন ঘোষ, ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলি প্রভৃতির মুখে, আর শুনিয়াছি স্বর্গতঃ ব্রহ্মের সরলা দেবী চৌধুরাণীর মুখে সম্পূর্ণ বন্দেমাতরম্ গীতটি।

সেদিনকার সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন প্রবীণ স্বদেশ-প্রাণ শ্রীযুক্ত প্রাণহরি সেন। তিনি বহুদিন হইল পরলোকে গিয়াছেন। সেই তরঙ্গিণী দিদি কোথা হইতে আসিয়া মঞ্চে উপবিষ্ট সকলের ললাটে চন্দন-তিলক পরাইয়া দিলেন, পরাইয়া দিলেন ফুলের মালা—বিপিনচন্দ্র তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সমবেত কণ্ঠে উঠিল জয়ধ্বনি।

আমি বিপিনচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া একটি কবিতা পড়িয়া তাঁহাকে স্বাগত অভিনন্দন জানাইলাম। কবিতাটি ছিল দীর্ঘ। সব কথা মনে নাই। যে দু' চারিটি পদ মনে আছে তাহার উল্লেখ করিলাম!

আসিয়াছ তুমি বন্ধু আমাদের দেশে,
বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ মণি এই বিক্রমপুরে!
পদ্মা যার প্রতিটি তরঙ্গে, মেঘনার কলনাদে

হায় কীর্তি দেশে দেশে সতত প্রচারে।
রায়পাড়া পড়ে আছে শ্মশানের মত,
বিস্তৃত দীঘিটি তার মনে এনে দেয়
অতীত ঐশ্বর্যবাণী, প্রতি মৃত্তিকায়,
রাজাদের বহু কীর্তি, কোথায় বহাল,
কোথা গুণ-জ্ঞানীজন, তাঁহারা কোথায়!
সেদিন সে কেদারের বিক্রমে মোগল
ঝঞ্ঝুকে পরাজিত যেমনার বুকে,
দিব না আমার দেশ, দৃঢ় পণ করে
যুঝেছিল, প্রাণ দিয়ে সেদিন সে রবে।
আজি আসিয়াছ বীর, দেশহিতে প্রাণ
হে বীর বিপিন তুমি যাও দেশে দেশে
দেশের কল্যাণ ব্রতে দীক্ষিত জীবন
বঙ্গে মাতরম্ ধ্বনি কণ্ঠে তব জাগে।

আমার আর কিছু মনে নাই। এ কয় পংক্তিও ঠিক হইল কিনা জানি না। শেষ দুটি পংক্তি মনে আছে—

তুমি আসিয়াছ বীর কর আশীর্বাদ,
বিক্রমপুরবাসী যেন দেশের কল্যাণে,
আপনার রক্ত দিয়ে শোধে মাতৃঋণ,
আমার স্বদেশ বলি ভাবে তারে মনে।

তারপর অল্প কথায় বিপিনচন্দ্র যে যথেষ্ট ক্লেশ সহ্য করিয়া আমাদের দেশে আসিয়াছেন সেজন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হইল। সভাপতি মহাশয় বিপিনচন্দ্রকে বলিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

বিপিনচন্দ্র প্রায় দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে 'মাইক' ছিল না। দশ হাজারের উপর সমবেত জনতা, নীরবে তাঁহার ভাষণ শুনিলেন। সে কি ভাষা, সে কি গম্ভীর বাণী, মেঘমন্দ্রের মত সেই ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। পুরুষ ও মহিলারা, বালক-বালিকারা নীরবে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতেছিল সেই বাণী। জীবনে আমরা এমন করিয়া কোনদিন বিপিনচন্দ্রকে বিক্রমপুরে পাই নাই। কত নূতন কথা, কত নূতন সংগঠনমূলক বাণী, কত সংস্কৃত শ্লোক, কত রবীন্দ্রনাথের গানের কলি, বঙ্কিমচন্দ্রের কথা, রামমোহন রায়ের স্বদেশ-প্রেম, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বদেশ-প্রীতি, সমাজ সংস্কার, মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, অরবিন্দের কথা, বিপ্লবের ইতিহাস, বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস—নির্ঝরিণী যেমন উচ্চ পর্বত শিখর হইতে বেগে ঝর ঝর ঝর ঝর শব্দে ঝরিয়া পড়ে, কখনও মৃদু, কখনও ঝড়ের মত শব্দে, তেমনি বিপিনচন্দ্রের উদাত্ত সুগম্ভীর কণ্ঠের ভাষণ, সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ, বিস্মিত, পুলকিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিল। আমরা তাঁহার অনেক বক্তৃতা পরেও শুনিয়াছি কিন্তু সেদিনকার মত অমন প্রাণঢালা বক্তৃতা শুনি নাই।

তাঁর বক্তৃতা শেষে কিছুক্ষণের জন্য সভা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তিনি সন্ধ্যার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া পড়িলেন—তখন বাড়ী বাড়ী দেবালয়ে শঙ্খধ্বনি হইতেছিল, আর সভা মণ্ডপের উপস্থিত জনতা মুহু মুহু করিতেছিলেন বন্দেমাতরম্ ধ্বনি!

তাঁহার বক্তৃতা শেষে যে দু' চারিজন বক্তৃতা করেন, তাঁহাদের ক্ষীণ কণ্ঠ কোথায় মিলাইয়া গেল। সভাপতি মহাশয় এতদূর অভিভূত হইয়াছিলেন যে শুধু বিপিনচন্দ্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন 'আমরা ধন্য হইলাম।'

সঙ্গে সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে গীত আরম্ভ হইল,

বল বল বল সবে, শত বীণা-বেণু রবে
ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।

সেদিনকার সভার কথা 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় পাঠাইয়া দিলাম। সে সময়কার 'সন্ধ্যা' পত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ সেই পত্রিকা দুষ্প্রাপ্য।

যদি বিপিনচন্দ্রের এই বক্তৃতা কেহ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তবে একটি অমূল্য রত্ন সঞ্চিত থাকিবে। জানিনা বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতা-সংগ্রহে তাহা সংগৃহীত হইয়াছে কিনা!

আমাদের একান্ত অনুরোধে বিপিনচন্দ্র পরদিন

অপরাহ্নেও ছিলেন। প্রস্তাবে বিক্রমপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনায় বুঝিয়ে দেন কিভাবে আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে সংগঠনমূলকভাবে স্বদেশী শিল্প গঠন করিতে হইবে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রীতি সম্ভবপর—"আমার যে ভাই তারা সবাই, তোমার রাখাল তোমার চাষী" প্রকৃতভাবে কার্য্যকরী হয়—সেদিকে সচেষ্ট হইতে হইবে। আর একটি মূল্যবান উপদেশ দিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন অনৈক্য দ্বারা আমরা যেন আত্মঘাতী জাতিতে পরিণত না হই। ইংরাজ কৌশলী জাতি, ভেদ-বুদ্ধিতে তাহাদের জোড়া মিলেনা। এই বঙ্গ ভঙ্গের মধ্য দিয়া যে স্বদেশী যুগের আবির্ভাব হইল, তাহার ভিতর এভাবটা কি সুস্পষ্ট দেখতে পাই না! ইংরাজ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ-বুদ্ধি এবং কলহের সৃষ্টি করিয়াছে। কয়জন মুসলমানকে আমরা এই স্বদেশী যুগে একান্ত আপনার করে পেয়েছি, ভেবে দেখুন দেখি! কালে এই বিভেদ হয়ে উঠবে প্রবল। তখন হবে বিবাদ, সে বিবাদের হাত হতে মুক্তির পথ কি? তাহা এক ভীষণ সমস্যা। দিন দিন মুসলমানেরা সংখ্যাধিক্য হয়ে উঠছে, নানা দিক্ দিয়ে আমাদের এখন ভাববার কথা। রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন, ভাষা সমস্যা, সব দিয়েই আমাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে। এইরূপ অনেক কথা বলেন।

অপরাহ্নে তিনটার সময় হইল মেয়েদের এক বিরাট সভা। 'সন্ধ্যার' সে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল পাঁচশো মেয়ের মজলিস বলে।

আমার এ লেখায় সন তারিখ বা কোন কোন বিষয়ের ভুল থাকা স্বাভাবিক, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথায় ভুল-ভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নহে। তবে সে সব সামান্য দুই একটি ত্রুটি থাকিতে পারে—কিন্তু অন্য কোন ভুল নাই একথা বলিতে পারি।

ঐক্য না একাকারত্ব　　**—রবীন্দ্রনাথ**

বঙ্গসাহিত্য যদি উৎকর্ষ লাভ না করতো তবে আজকে হয়তো তার প্রতি মমতা ছেড়ে দিয়ে আমরা নির্বিকার চিত্তে কোনো একটি সাধারণ ভাষা গ্রহণ ক'রে বসতাম। কিন্তু ভালো জিনিষের জীবনধর্ম আছে। তাকে ছাঁচে ঢেলে কলে ফেলে ফরমাসে গড়া যায় না।

ভারতবর্ষে আজকাল ভাবের আদান-প্রদানের ভাষা হয়েছে ইংরেজি ভাষা। অন্য একটি ভাষাকেও ভারতব্যাপী মিলনের বাহন করবার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু এতে ক'রে যথার্থ সমন্বয় হ'তে পারে না; হয়তো একাকারত্ব হ'তে পারে, কিন্তু একত্ব হ'তে পারে না। কারণ এই একাকারত্ব কৃত্রিম ও অগভীর; এ শুধু বাইরের থেকে নড়ি দিয়ে বাঁধা মিলনের প্রয়াস মাত্র।

.....বাহ্য সাম্যকে যারা চায় তারা ভাষা-বৈচিত্র্যের উপর স্টিমরোলার চালিয়ে দিয়ে আপন রাজপথ সমভূম করতে চায়। কিন্তু পাঁচটি বিভিন্ন ফুলকে কুটে দলা পাকালেই তাকে শতদল বলা চলে না।.....

গ্রন্থাগার আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুধাংশু কুমার ভট্টাচার্য্য

জাতীয় শিক্ষামানের উন্নতি সাধন করিতে হইলে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। একটি জাতি কতদূর উন্নত হইয়াছে তাহা জানিতে পারা যায় সেই জাতি জ্ঞানলাভের জন্য কতটা পরিমাণ আগ্রহশীল তাহা হইতে। সুতরাং পাঠাগারকে জাতির ধমনিরূপে গঠন করিবার ভিত্তি স্বরূপ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

অধিকাংশ মানুষই চায় নিজের জ্ঞান বাড়াইতে। এই বৃদ্ধি করাকে একটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে মানুষ হয়ত জীবনের ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি লাভ করিতে পারে কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সামান্য সীমাটুকু কোন কাজেই আসেনা। স্কুল কলেজের শিক্ষা ঐ সামান্য সীমাটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ কিন্তু স্কুলের বাইরে পড়ে রয়েছে যে জগৎ সামান্য কয়েকখানা পাঠ্য পুস্তকের মধ্যেই তাহার সমস্ত কিছু সীমাবদ্ধ থাকেনা; তাই পারিপার্শ্বিকতাকে জানিতে হইলে, বিশ্বকে উপলব্ধি করিতে হইলে চাই বিবিধ প্রকারের গ্রন্থ পাঠ। কিন্তু গ্রন্থ পাঠ করিব বলিলেই ত হইল না তাহার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত স্থান উপযুক্ত পরিবেশ। স্কুল বা কলেজ ঘরের মধ্যে সে পরিবেশের পরিচয় পাওয়া যায়না, সেখানে নিয়ম মাফিক, রুটীন অনুযায়ী শিক্ষা লেনদেনের কাজ চলিয়া থাকে। পাঠ্য পুস্তকের বাইরের কথা, পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য পুস্তক সেখানে নিষিদ্ধ।

মানুষ চায় নিজেকে জানিতে, নিজের পরিবেশকে উপলব্ধি করিতে। কি কিশোর, কি যুবা আর কি বৃদ্ধ প্রত্যেকেই কিছু না কিছু জানিতে চায়। সর্বদেশের সর্বকালের মানুষই এই জ্ঞানের পরিসীমাকে বৃদ্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট। প্রাচীন যুগ হইতে আমাদের দেশেও এই নিজেকে জানা, নিজের পরিবেশকে জানার প্রয়োজনেই সৃষ্ট হইয়াছে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থ।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে মানুষ জ্ঞান সংগ্রহ করিবে কি করিয়া? এ কথার একমাত্র উত্তর হইতেছে যে গ্রন্থ পাঠের সাহায্যে এবং এই গ্রন্থ পাঠ গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই সুসম্পন্ন হইবে। এই কারণেই প্রত্যেক জাতির পক্ষেই গ্রন্থাগারের প্রয়োজন যে অপরিহার্য্য এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। যে জাতির ইতিহাস আছে, কৃষ্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিও আছে কিন্তু জনসাধারণের নিকট পরিচিত করাইবার জন্য গ্রন্থাগার নাই, সে জাতি যে দুর্ভাগা তাহা নিঃসন্দেহে সত্য। পাশ্চাত্য দেশের জাতিগুলির মধ্যে অনেকেরই কৃষ্টি, সংস্কৃতি আর সভ্যতার ইতিহাস এতকাল ধরিয়া ছিল বিস্মৃতির অতল তলে কিন্তু আজ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তাহারা দেশবাসীর নিকটে ঐ সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়াছেন এবং বিশ্বের নানাবিধ জ্ঞান ভাণ্ডার আহরণ করিয়া তাহারা মানবকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ভারতে এরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া হয় নাই; কারণ এখানে গ্রন্থাগার আন্দোলন সেরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। এ প্রসংগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরাধীন দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির দাবী লইয়া যে সমস্ত আন্দোলনগুলি হইয়া গিয়াছে তাহার প্রত্যেকটির সহিতই রবীন্দ্রনাথ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গ্রন্থাগারের ব্যাপক বিস্তার করিয়া দেশের শিক্ষা প্রসারের জন্য যে আন্দোলনের প্রবর্তন হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথ তাহাতেও যোগদান করিয়াছিলেন, সৃষ্টির প্রেরণায়, সমাজের আহ্বানে, সমষ্টির মঙ্গলের প্রয়োজনে।

১৯২৮ খ্রীঃ কলিকাতায় যে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই অধিবেশনে তিনি

একটি অভিভাষণ দেন যাহা পরে 'লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য' নামে প্রকাশিত হয়। আমরা হয়ত অনেকেই জানিনা যে লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য কি? তাই নিয়ম মাফিক ধরা বাঁধা আইনের ভিতর দিয়া পুস্তক লেন-দেন করিয়া আমরা মনে করি যে আমাদের কর্তব্য সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পাঠাগারে গ্রন্থসংখ্যা করিয়া গর্ব করি যে আমাদের পাঠাগারে এত বই আছে, তার মধ্যে এত সংখ্যক বই দুষ্প্রাপ্য, এত সংখ্যক বই বহু আয়াসে সংগৃহীত ইত্যাদি। তাই পাঠক সাধারণের দিকে নজর না দিয়া আমরা কেবলমাত্রই বই সংগ্রহ করিয়া যাই। আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, বই বাড়াইতে হইবে নহিলে গ্রন্থাগার চলিবে না, সরকারের নিকট হইতে গ্রান্ট বা শুভার্থী মহলের নিকট হইতে চাঁদা আদিবেনা। এই সংগ্রহ সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন, ".....একবার যখন সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে তখন সংগ্রহের লক্ষ্য সে ভুলে যায়, তাকে সংখ্যার নেশায় পেয়ে বসে।" বাংলা দেশে একটা চলতি প্রবাদ আছে, 'নিরানব্বুইয়ের ধাক্কা'। কথাটা টাকার বেলাতে যেমন খাটে লাইব্রেরীর ব্যাপারেও তেমনি। একের পর এক যেমন টাকা জমানোর নেশা বাড়ে, বই সংগ্রহের নেশাও তেমনই আমাদের সমস্ত কিছু পারিপার্শ্বিকতাকে ভুলিয়ে দেয়। তাই আমরা সস্তা ধরণের বাজে বই কিনিয়া সংখ্যা বোঝাই করি। তাহা কিছু সংখ্যক পাঠকের চাহিদা মিটাইলেও অধিকাংশেরই আনন্দ দান করিতে পারে না। লেন-দেন না হইয়া সেগুলি চিরকালই তাকে থাকিয়া যায়। সামান্য একটি উপমার সাহায্যে কবি এই দুই শ্রেণীর গ্রন্থের বিষয় বলিয়াছেন,···"আমাদের ভাষায় যতগুলি শব্দ আছে তার দু রকমের আধার··এক অভিধান আর এক সাহিত্য। গণনা করে দেখলে দেখা যাবে যে, বড়ো অভিধানে যতো কথা জমা রয়েছে তার শতের ভাগেরই ব্যবহার কদাচ হয়। অথচ তাদের সকল হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি সজীব, প্রত্যেকটি অপরিহার্য্য। অভিধানের চেয়ে সাহিত্যের মূল্য বেশী এ কথা মানতেই হয়।" লাইব্রেরী তার যে অংশে মুখ্যতঃ জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা।....." সাধারণতঃ পাঠাগারের ব্যাপারেও দেখিতে পাওয়া যায় যে অনেকগুলি পুস্তক এক একটি বিশেষ শ্রেণী ব্যতীত আর কোন পাঠকের কাজে লাগে না। কিন্তু এ শ্রেণীর পুস্তকেরও বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে।

ইহার পরবর্তী প্রশ্ন, পাঠাগারকে সকলের জন্য ব্যবহার যোগ্য করা যায় কি করিয়া? এ প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,....."লাইব্রেরীকে ব্যবহার করতে গেলে লাইব্রেরীর পরিচয় সুস্পষ্ট এবং সর্ব্বাংগ সুন্দর হওয়া চাই। নইলে তার মধ্যে প্রবেশ চলে না। সে এমন একটা শহরের মত হয়ে ওঠে যার বাড়ী-ঘর বিস্তর কিন্তু পথ ঘাট নেই।" অনেকে ভাবেন সকল বহুলতার দ্বারা সাধারণের মনকে আকৃষ্ট করা সহজ। কারণ পাঠাগারের গ্রন্থসম্পদ আকর্ষণ করে জনসাধারণকে, আকুল হইয়া তাহারা ছুটিয়া আসে; কিন্তু এই গ্রন্থ স্তূপের মধ্যে পথে চলার পথ খুঁজিয়া পায় না—দিশাহারা হইয়া অন্ধের মত ঘুরিতে থাকে। ইহাতে পাঠাগার বা পাঠক কাহারও উপকার হয়না এবং উপযুক্ত আলো বাতাসের অভাবে অবরুদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডার ক্রমশই নষ্ট হইতে আরম্ভ করে। সুতরাং পাঠাগারের পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্ব্বাংগ সুন্দর করিয়া তুলিতে হইলে তাহার দায়ের কথাও চিন্তা করা আবশ্যক। সে দায়টি কি? তাহা হইতেছে সম্পদের দায়। কিন্তু অক্লিষ্টভাবে, উদাত্ত কণ্ঠে গ্রন্থ ভাণ্ডারের কথা প্রচার করিবার মধ্যে আহ্বান নেই, পরিচয় নেই আছে কেবল দম্ভ লাইব্রেরীকে এ দম্ভ ত্যাগ করিতে হইবে, আহ্বান করিতে হইবে সকল শ্রেণীর লোককে, উপযুক্ত ভাবে পরিবেশন করিতে হইবে ভোজ্য বস্তুর। কেবল মাত্র ভাণ্ডারের সঞ্চিত মালের কথা ঘোষণা করিলেই চলিবেনা সেই সংগে "মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ"ও আবশ্যক। লাইব্রেরীকে বড় হইতে হইবে প্রকৃতিতে, আকৃতিতে নয়।

এখন প্রশ্ন হইল এই যে লাইব্রেরী কি করিয়া তৈয়ারী করিবে পাঠককে? লাইব্রেরী ত' একটা জড় পদার্থ

যাহার সম্পদের মধ্যে আছে কেবল ঘর-বাড়ী, আসবাব পত্র, পুস্তকের তালিকা আর একটি পরিচালক সমিতি। এদিক হইতে বিচার করিয়া বলিতে পারা যায় যে পাঠক তৈয়ারী কেবল মাত্র লাইব্রেরিয়ানের দ্বারাই সম্ভব। কবি এদিক সম্বন্ধে বলিয়াছেন,"....লাইব্রেরীয়ানগণের কাজটা মস্ত কাজ। শেলফের ওপর গুছিয়ে বই সাজিয়ে হিসেব রাখলেই তার কাজ সারা হ'লোনা। অর্থাৎ সংখ্যা নিয়ে বিভাগ নিয়ে যেটুকু কাজ সেটুকু সবচেয়ে বড় কাজ নয়। লাইব্রেরীয়ানের গ্রন্থবোধ থাকা চাই। কেবল ভাণ্ডারী হলেই চলবেনা।" অধিকাংশ লাইব্রেরীতেই এ-নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। লাইব্রেরীয়ানের গ্রন্থবোধ নাই, অধিকাংশ পুস্তক সম্বন্ধেই তিনি অজ্ঞ, সেজন্য গ্রন্থ তালিকার স্ফীতি সত্ত্বেও লাইব্রেরীর মাধ্যমে সৃষ্ট হয়না পাঠক সমাজ। ইহা অতীব দুঃখের কথা। কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রন্থ তালিকাকে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়না কোন বড় লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ানের পক্ষে, সুতরাং ছোট ছোট লাইব্রেরীর প্রয়োজন যে অপরিহার্য্য এ কথা স্বীকার করিতে হয়। ছোট্ট একটি উপমার সাহায্যে কবি এখানে ব্যক্ত করেছেন তাঁর অন্তর্দর্শনের কথা—"....সেইজন্য আমি মনে করি বড় বড় লাইব্রেরী মুখ্যতঃ ভাণ্ডার; ছোট ছোট লাইব্রেরী ভোজনশালা, তা প্রত্যহ প্রাণের ব্যবহারে, ভোগের ব্যবহারে লাগে। ভাঁড়ারে কি সঞ্চিত আছে তাহা পাঠক জানিতে চায়না, তাহার দৃষ্টি ভোজনশালার দিকেই নিবদ্ধ থাকে, যেখানে উপযুক্ত পরিমাণে দেখা মিলিবে ভোজ্য বস্তুর সহিত।"

ছোট লাইব্রেরী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে তত্ত্বটি তাঁহার অন্তর্ভাবনের মধ্য দিয়া একদা প্রচার করিয়াছিলেন তাহা সাধারণ শ্রেণীর লাইব্রেরীর পক্ষে যথার্থভাবে প্রযোজ্য। লাইব্রেরী ছোট হইবে এ কথার অর্থ যেন কেহ না মনে করেন যে লাইব্রেরীর আয়তন ক্ষুদ্র হইবে এবং তাহাতে থাকিবে মাত্র কিছু সংখ্যক বই। কবি বলিয়াছেন, "....তাতে থাকবে সকল বিভাগের বই কিন্তু একেবারে চোখা চোখা। বিপুলায়তন গণনার বেদীতে নৈবেদ্য জোগাবার কাজে একটি বইও থাকবেনা, প্রত্যেক বই থাকবে নিজের বিশিষ্ট মহিমা নিয়ে। লাইব্রেরীয়ান হবেন যথার্থ সাধক, নির্লোভ, শেলফ্ ভর্তির অহংকার তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। এখানে ভোজের আয়োজন যা থাকবে সমস্তই সাদরে পাঠকদের পাতে দেবার যোগ্য। আর লাইব্রেরীয়ানের থাকবে গুণায় রক্ষকের যোগ্যতা নয়, আতিথ্য পালনের যোগ্যতা।...।" সাধারণতঃ লাইব্রেরীয়ানের ধারণা পুস্তক লেন-দেন আর জমা-খরচের তালিকা প্রস্তুত করিয়াই তাঁহার কাজ শেষ হইয়া গেল। পাঠক লাইব্রেরীতে আসিবে নিজের তাগিদে এবং ভাল মন্দ যা হয় একটা কিছু বই বাছিয়া লইয়া চলিয়া যাইবে। ভাল বই লাইব্রেরীয়ানের গ্রন্থবোধের অভাবে শেলফের মধ্যেই চিরকাল ধরিয়া থাকিয়া যাইবে অনাদৃতভাবে।

কিন্তু এই সমস্ত কাজ লাইব্রেরীয়ানের একার দ্বারা করা সম্ভব নয়। কারণ একজনের পক্ষে সকল শ্রেণীর পুস্তক আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। এজন্য চাই পাঠক মণ্ডলীর সহযোগিতা। লাইব্রেরীয়ানকেই গড়িয়া তুলিতে হইবে এই পাঠকমণ্ডলী। এই পাঠকমণ্ডলী কাহাদের মাধ্যমে গঠিত হইবে? কবি এ সম্বন্ধে একটি সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছিলেন,"....."প্রত্যেক লাইব্রেরীর অন্তরংগ সভারূপে একটি বিশেষ পাঠকমণ্ডলী থাকা চাই। সেই মণ্ডলীই লাইব্রেরীকে প্রাণ দেয়। লাইব্রেরীয়ান যদি এই মণ্ডলীকে তৈরী করে তুলে একে আকৃষ্ট করে রাখতে পারেন তবেই বুঝব তাঁর কৃতিত্ব। এই মণ্ডলীর সংগে তাঁর লাইব্রেরীর মর্মগত সম্বন্ধ স্থাপনের তিনি মধ্যস্থ।....."

এ লাইব্রেরীয়ানের সহিত পাঠকমণ্ডলীর, লাইব্রেরীর সহিত উৎসাহী পাঠকের সম্বন্ধ এইরূপে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে কিন্তু লাইব্রেরীয়ানের কাজ আরও অনেক বেশী। মোটামুটি ভাবে লাইব্রেরীয়ানের প্রধান কাজ হইতেছে দুইটি। প্রথম 'যে কোন বিভাগের ভাল বই আসা মাত্র তার ঘোষণা হওয়া চাই।' এজন্য লাইব্রেরীয়ানকে সৃষ্টি করিতে হইবে যাচাই বিভাগ। উহার কাজ হইবে সাময়িক ও মাসিক পত্রিকাদি হইতে বিশেষ বিশেষ রচনাগুলিকে নির্বাচিত করিয়া তাহার তালিকা প্রস্তুত এবং নূতন ক্রীত পুস্তকাবলীর বিবরণী লিপিবদ্ধ করা।

দ্বিতীয় কাজ হইতেছে প্রতি বৎসর প্রকাশিত পুস্তকাবলীর বিশদ বিবরণ জানিয়া উহার তালিকা লিপিবদ্ধ করা। ইহার সাহায্যেই পাঠযোগ্য ভাল পুস্তকের সমাবেশ করিতে পারা যায়।

নিখিল বঙ্গ লাইব্রেরী পরিষদ যে মাসিক পত্রিকাটি বর্তমানে প্রকাশ করিতেছেন তাহা কবিগুরুর উপদেশ অনুসারে। কিন্তু তবুও মনে হয় বিশেষ বিশেষ বিষয়ের ভাল পুস্তকের বিবরণী ঐ পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত না হইয়া কেবলমাত্র গ্রন্থের সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া।

১৯২৮ খ্রী: হইতে আমরা অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছি। আজ আটাশ বৎসর পরে আমরা সাধারণ লাইব্রেরীগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখি যে আজিও ঐগুলি পুস্তক লেন-দেনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু লাইব্রেরী আন্দোলন আজিও জীবিত রহিয়াছে। প্রতি বৎসরই সমারোহে ইহার সম্মেলন হইয়া থাকে নানা স্থানে। কিন্তু তবুও এত সম্মেলন, এত প্রস্তুতি ও প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যে কোথাও যেন এক ফাঁক রহিয়া গিয়াছে, তাই গ্রন্থাগারগুলি দুরবস্থার অবসান হয় নাই। কিন্তু কোথায় এর ত্রুটি তাহা কেহ দেখিতেছেন না; কাজেই লাইব্রেরীগুলিতে গ্রন্থ স্ফীতি হইতেছে দিনের পর দিন, পাঠকের সংখ্যাও বাড়িতেছে, সরকার হইতেও গ্রান্ট আসিতেছে কোন কোনটিতে কিন্তু লাইব্রেরীর সহিত পাঠকের কোন আত্মীয়তাই সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথের এই অভ্যর্থনা সমিতির অভিভাষণটি ক্ষুদ্র কিন্তু ইহার ভিতর দিয়া আমরা পরিচয় পাই লাইব্রেরী আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির কথা। তাই ঐটি গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষে অপরিহার্য।

অক্ষয় কুমার দত্ত ও বাংলা সাহিত্য

—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(সাহিত্য-সাধক চরিতমালা)

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম যুগে যে দুই জন শিল্পীর সাধনায় বাংলা ভাষা সাহিত্য-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাঁহাদের এক জন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অন্য জন অক্ষয়কুমার দত্ত। ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত, হিন্দী ও ইংরেজী সাহিত্য-পুস্তককে আদর্শ করিয়া যে-কার্য করিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার ইংরেজী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থের আদর্শে ঠিক সেই কার্যই সাধিত করিয়া গিয়াছেন। এক জন রসসাহিত্যমূলক এবং অন্য জন বিজ্ঞান ও যুক্তিমূলক ভাষার সাহায্যে একই কালে মাতৃভাষার সাহিত্য-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। আমরা এই কালে এই দুই জন সাহিত্য-সাধকের এক জনকে স্মরণ করিতে গিয়া অন্য জনকেও স্মরণ করিয়া থাকি। গোড়ার দিকের অন্য সকলের নাম বিস্মৃত হইলেও যত দিন বাংলা ভাষা জীবিত থাকিবে, তত দিন ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারকে স্মরণ রাখিতে হইবে।

বাংলা-গদ্যের পরিপুষ্টিসাধনে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সাহায্যে অক্ষয়কুমার যে বিপুল সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের চিরদিন স্মরণীয়। তিনিই সর্বপ্রথম দর্শন ও বিজ্ঞানকে সাহিত্যের মর্যাদা দান করিয়াছিলেন, রাজা রামমোহন ও বেডারেণ্ড কে. এম. বাঁড়ুজ্জের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভাষাকে সরসতা ও সাবলীলতা দান করিয়া ভবিষ্যৎ শিল্পীদের পথ সুগম করিয়াছিলেন।

নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীতে বুনিয়াদী পদ্ধতি

বিশ্বজকুমার ভট্টাচার্য

বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে কতটা গ্রহণ করা যায়, এই হল এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়।

বুনিয়াদী শিক্ষাকে আমাদের জাতীয় শিক্ষা-নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই বুনিয়াদী শিক্ষা হবে আট বৎসর ব্যাপী শিক্ষা। এর প্রথম পাঁচ বৎসর হল প্রাথমিক স্তর এবং পরের তিন বৎসর হল নিম্ন মাধ্যমিক স্তর।

নানা কারণে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত ধীরে ধীরে হচ্ছে। প্রাথমিক স্তরের বুনিয়াদী শিক্ষাকে বলা হয় নিম্ন বুনিয়াদী এবং নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের বুনিয়াদী শিক্ষাকে বলা হয় উচ্চ বুনিয়াদী। পশ্চিম বঙ্গে এই কয় বৎসরে প্রায় পাঁচেক নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং বোধ হয় গোটা কুড়ি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় হয়েছে। সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত করতে এবং সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও সমস্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীতে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করতে অনেক সময় লাগবে। ততদিন পর্যন্ত এই বিদ্যালয়গুলি যেমন চলছে তেমনই চলবে, এ যদি হয় তাহলে ঠিক হবে না। এই মধ্যবর্তী সময়ে কি প্রাথমিক কি নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীতে, পুরাপুরি বুনিয়াদী পদ্ধতির প্রবর্তন সম্ভব না হলেও, যতটুকু পারা যায় বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ অনুসারে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। সেইজন্য সাধারণ বিদ্যালয়ে বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি কতখানি গ্রহণ করা যেতে পারে তার আলোচনার খুবই প্রয়োজন আছে।

কিন্তু এই আলোচনা করবার পূর্বে বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলতে হয়। গান্ধীজীর ভাষায়, বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে সত্য এবং অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ গঠন। গান্ধীজী অধ্যাত্মবাদী ছিলেন। তাঁর মতে প্রত্যেক মানবাত্মার একটা নিজস্ব মূল্য আছে। নিজের বিশিষ্ট পথে নিজকে চরিতার্থ করাই তার লক্ষ্য। এর জন্য চাই তার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। যে সমাজে প্রত্যেক মানুষের তার নিজস্ব পথে নিজকে সার্থক করবার স্বাধীনতা আছে সেই হল আদর্শ সমাজ। সে সমাজের লক্ষ্য হবে সকলের কল্যাণ—সর্বোদয়। সে সমাজে কোন মানুষ কোন মানুষের অধীন হয়ে থাকবে না, কোন মানুষকে কোন মানুষ তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না। এই সমাজের মানুষকে স্বাবলম্বী হতে হবে। কোন মানুষকে তার অন্ন, বস্ত্র বা আশ্রয়ের জন্য যদি অন্যের উপর নির্ভর করতে হয় তাহলে সে কখনও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না, স্বকীয় পথে আত্মচরিতার্থতার চেষ্টাও তার পক্ষে সম্ভব হয় না।

এই রকম জীবনের জন্য ছেলেকে প্রস্তুত করতে হলে জীবনের ভিতর দিয়েই করতে হবে। সাঁতার দেওয়ার শিক্ষা যেমন সাঁতার দিয়েই লাভ করতে হয়, জীবন যাপনের শিক্ষাও তেমনই জীবন যাপন করেই লাভ করতে হয়। সেইজন্য বুনিয়াদী শিক্ষা হচ্ছে জীবনের ভিতর দিয়ে শিক্ষা। ছেলে বড় হয়ে যে রকম সমাজ গঠন করবে এবং যে রকম সমাজে বাস করবে ঠিক সেই রকম একটি সমাজ শিক্ষার সময়ে বিদ্যালয়ে তার জন্য গঠন করতে হবে। এই বিদ্যালয়-সমাজের দৈনন্দিন জীবন যাপন করতে করতে, এর প্রাত্যহিক কর্তব্য পালন করতে করতে ছেলে ক্রমে ক্রমে বাহিরের বৃহত্তর সমাজের

জীবন যাপনের জন্য, তার কর্তব্য পালনের জন্য তৈয়ারী হবে।

বাহিরে যে সমাজের আমরা কল্পনা করছি সে সমাজে সবাই হবে স্বাধীন, সবাই হবে স্বাবলম্বী। সে সমাজে কেউ কাউকে শোষণ করবে না এবং কেউ কারও দ্বারা শোষিত হবে না। সে সমাজে ধনী-দরিদ্র উচ্চ-নীচের ভেদ থাকবে না। একদল বিনা পরিশ্রমে বসে বসে খাবে এবং আর একদল উদ্বাস্ত পরিশ্রম করেও খেতে পাবে না, এ সে সমাজে হবে না। সেখানে সকলকেই পরিশ্রম করে খেতে হবে। এই পরিশ্রম সে যে দায়ে পড়ে বাধ্য হয়ে করবে তা নয়, এই পরিশ্রম তাকে অপরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে স্বাধীনভাবে স্বাবলম্বী জীবন যাপন করবার সুযোগ দেবে, এই ভেবে আনন্দের সঙ্গে গৌরবের সঙ্গে করবে।

বিদ্যালয়ের সমাজও বাহিরের এই সমাজের অনুরূপ হবে। সেখানেও ছেলের জীবনের একটা বড় অঙ্গ হবে তার শ্রম। এই শ্রমের দ্বারা বিদ্যালয় জীবনের প্রথম থেকেই সে কিছু না কিছু উৎপাদন করবে। সেই উৎপাদনের ভিতর দিয়ে তার অন্তর্নিহিত সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হবে এবং সেও যে সমাজের কল্যাণের কাজে সহায়তা করতে পারছে, এই ভেবে তার আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান দুই-ই বাড়বে। এই ভাবে ছেলে প্রথম থেকেই তার মনুষ্যত্বের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে থাকবে।

সমাজের কল্যাণকর উৎপাদনাত্মক শ্রম জীবনের একটা বড় অঙ্গ হলেও এইটাই জীবনের সব নয়। ছেলেকে একটা বিশিষ্ট পরিবেশের মধ্যে জীবন যাপন করতে হয়। সেই পরিবেশের মধ্যে প্রকৃতিও আছে, আবার মানুষও আছে। প্রকৃতিকে নিয়ে তার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষকে নিয়ে তার সামাজিক পরিবেশ। এই প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ছেলেকে বাস করতে হয়। এই পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে অথবা এই পরিবেশকে নিজের মত করে গড়ে নিয়ে তাকে বাঁচতে হয়। তাই এই পরিবেশের সঙ্গে তার পরিচয়, এও তার জীবনের আর একটা বড় অঙ্গ। আর, এ পরিচয় শুধু জ্ঞানের পরিচয় নয়, এ পরিচয় তার সঙ্গে সঙ্গে ভাবের এবং কর্মেরও পরিচয়। ছেলে কেবল যে তার পরিবেশকে বুদ্ধি দিয়ে জানবে তা নয়; এর ভালকে সে ভালবাসবে, এর মন্দকে সে ঘৃণা করতে শিখবে; এর ভালকে আরও ভাল করে ফুটিয়ে তোলার এবং এর মন্দকে অপসারিত করার জন্য তার সক্রিয় চেষ্টা থাকবে।

বিদ্যালয়-সমাজের পরিচালনার দায়িত্বও ছেলেকেই নিতে হবে। এই দায়িত্ব পালনের ভিতর দিয়ে সে তার ভবিষ্যৎ জীবনে বাহিরের সমাজের দায়িত্ব বহন করতে শিখবে। বিদ্যালয়কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, শৃঙ্খলার সঙ্গে বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ সম্পাদন করা, বিদ্যালয়ে উৎসবাদির অনুষ্ঠান করে বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনকে সুন্দর ও সুখকর করা, এ সবই তাকে করতে হবে।

আর, এই সব কিছুর ভিতর দিয়ে দিনের পর দিন তার শিক্ষা চলতে থাকবে। তার মন তৈয়ারি হবে, তার অভ্যাস গড়ে উঠবে, সে নানা রকম কাজে দক্ষতা অর্জন করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে আমরা সাধারণতঃ শিক্ষা বলতে যা বুঝি তাও আয়ত্ত করবে।

এই হল মোটামুটি বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি। এখন, এর কতখানি আমরা সাধারণ বিদ্যালয়ে গ্রহণ করিতে পারি সেই হচ্ছে প্রশ্ন। হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজগুলিকে মোট পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন—(১) পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধান, (২) স্বাবলম্বন, (৩) উৎপাদনাত্মক শিল্পকর্ম, (৪) সামাজিক কর্তব্য পালন এবং (৫) আনন্দানুষ্ঠান। এই কাজগুলির কোন্‌টা কতটুকু সাধারণ বিদ্যালয়ে করা যেতে পারে সেইটা আলোচনা করে দেখা যাক।

পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধানকে বুনিয়াদী শিক্ষায় খুব বড় করে দেখা হয়। সেইজন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে একে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। দিনের কাজ আরম্ভ করার পূর্বে সকলের আগে এইটি করা হয়। ছেলেদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা এবং বিদ্যালয়ের সামূহিক পরিচ্ছন্নতা

দুই দিকেই লক্ষ্য রাখা হয়। ছেলের শরীর এবং জামা কাপড় পরিষ্কার আছে কি না—ছেলে দাঁত মেজেছে কি না, স্নান করেছে কি না, কাপড় কেচেছে কি না—শিক্ষক পরীক্ষা করে দেখেন এবং কোন বিষয়ে কোন ত্রুটি থাকলে ছেলেকে দিয়েই তা সংশোধন করিয়ে নেন।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় গৃহ ও প্রাঙ্গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ ছেলেরাই করে থাকে। সাধারণ বিদ্যালয়ে এই কাজের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন ভৃত্য রাখা হয়। এই কাজের ভার তার উপরেই থাকে। একটা লোকের পক্ষে সব কাজ সুন্দর করে করা সম্ভব হয় না। অনেক সময়ে আধার যতটুকু করা যায় তাও সে করে না। তার ফলে বিদ্যালয় ও তার পরিবেশ অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। এই অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকতে থাকতে এইটাই ছেলেদের অভ্যাস হয়ে যায়। তাদের এ বিষয়ে রুচিও সৃষ্টি হয় না এবং এর জন্য তারা যে কিছু করতে পারে সে বোধও তাদের জাগে না। শুধু তাই নয়, এ কাজটাকে তারা মনে করে ছোট কাজ। এ কাজ যারা করে তারাও তাদের দৃষ্টিতে ছোট হয়ে থাকে। এর সামাজিক ফলও খারাপ হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছেলেরা নিজের হাতে এই কাজ করে বলে সেখানে এই অসুবিধা হয় না।

ছেলেদের ছোট-খাট অসুখ-বিসুখের প্রতিকার এবং আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রাথমিক প্রতিবিধান, এও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছেলেদের সাহায্যে করবার চেষ্টা করা হয়। তার ফলে সাধারণ অসুখ ও তার চিকিৎসা এবং কেটে যাওয়া, ভেঙে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া প্রভৃতি দুর্ঘটনায় প্রাথমিক সাহায্য সম্বন্ধে তাদের একটা ব্যবহারিক জ্ঞান হয়।

এই সব কাজকে অবলম্বন করে ছেলেকে শারীর-বিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, খাদ্য-বিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছু শেখানো যায় এবং জীবনের বাস্তব ঘটনাকে উপলক্ষ করে শেখানো হয় বলে এই শিক্ষা অনেক বেশি সহজ ও স্বাভাবিক হয়। শুধু বই পড়িয়ে এ জিনিস হতে পারে না।

তা ছাড়া, দিনের পর দিন নিজের হাতে এই কাজ করতে করতে ছেলের মনটা এই ভাবে তৈয়ারি হয় এবং তার অভ্যাসও এই ভাবে গড়ে ওঠে। এ সম্বন্ধে কাজের দক্ষতা তো হয়ই। এই রকম করে তার প্রতিদিনের কাজের ভিতর দিয়ে ছেলে তার জীবনের একটা বড় শিক্ষা লাভ করে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের এই কাজ আমরা সাধারণ বিদ্যালয়ে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারি।

বুনিয়াদী শিক্ষার দ্বিতীয় কাজ হল ছেলেকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়া। এ স্বাবলম্বন কেবলমাত্র আর্থিক স্বাবলম্বন নয়। ছেলে নিজের প্রয়োজনীয় কাজ যথাসম্ভব নিজেই করবে এবং নিজের খাদ্য বস্ত্র ও গৃহোপকরণ যতখানি পারা যায় নিজে করে নিতে চেষ্টা করবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বাগান আছে, ছেলেরা সেখানে কাজ করে। এই বাগানে ফুল-ফল তরিতরকারি চাষ করা হয়, ছেলেরাই করে। একটু চেষ্টা করলে, আর কিছু না হক, ছেলেদের প্রয়োজনীয় তরকারি তারা সেখান থেকে করে নিতে পারে। কলা, পেঁপে, পেয়ারা, কাঁকুড়, গাজর, মূলা প্রভৃতি ফলমূলও করতে পারে। উপরের শ্রেণীতে মৌমাছি পালন এবং হাঁস মুরগী পালন করতে পারে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সুতা কাটা হয়। উচ্চ বুনিয়াদী শ্রেণীতে কাপড় বোনা, জামা সেলাই, রং ধোলাই প্রভৃতি করে। এই ভাবে ছেলের প্রয়োজনীয় জামা কাপড় খানিকটা সে করে নিতে পারে। নিজের জামা কাপড় ছিঁড়ে গেলে মেরামত করা, জামায় বোতাম বসানো, প্রভৃতি ছোট খাট কাজ তো পারেই।

এ ছাড়া আরও অনেক খুঁটনাটি কাজ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছেলেরা করে থাকে। পাপোষ তৈয়ারি, আসন তৈয়ারি, খাতা সেলাই, বই বাঁধানো, দেয়াল পঞ্জিকা তৈয়ারি, নিজেদের আঁক চার্ট ও ছবি দিয়ে ঘর সাজানো, অনেক কিছু ছেলেরা করে। উচ্চ বুনিয়াদী শ্রেণীতে নিজেদের ব্যবহারের সরঞ্জাম মেরামত করা, নিজেদের যন্ত্রপাতিতে শাণ দেওয়া, বাঁট লাগানো, বাড়িতে চুণকাম করা, দরজা জানালায় রঙ দেওয়া, সেল্ফ্, আলমারি প্রভৃতি বার্নিশ করা, এ সবও করে থাকে।

এই সব কাজ করতে তারা নানা রকমের কাজ শেখে, তাদের নিজেদের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস জাগে এবং তার ফলে যে কাজ কখনও করেনি এমন কাজেও হাতে দিতে ভয় পায় না। এই সকলকে উপলক্ষ করে নানা বিষয়ে নানা রকম জ্ঞানও লাভ করে।

এই সব কাজের কিছু কিছু আমরা সাধারণ বিদ্যালয়েও করাতে পারি। সূতা কাটা প্রভৃতি যে সমস্ত কাজের জন্য একটা বিশেষ রকমের দক্ষতার প্রয়োজন তা হয়তো সম্ভব হবে না। কিন্তু এ ছাড়া অন্যান্য কাজ করানো খুব শক্ত নয়।

উৎপাদনাত্মক শিল্পকর্ম বুনিয়াদী শিক্ষার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। ছেলের নিজের প্রয়োজনের জন্য যা যা করা দরকার তা তো সে করবেই। তা ছাড়া, আরও একটা শিল্পকর্ম সে ভাল করে অভ্যাস করবে। এই কাজ থেকে বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী জিনিস তৈয়ারি হবে এবং তা থেকে কিছু আয় হবে। এই আয় বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের কাজে সহায়তা করবে। আট বছর ধরে একটা ছেলে যদি ভাল করে কোন একটা শিল্প শেখে, তাহলে শিক্ষা সমাপ্ত করে প্রয়োজন হলে এরই সাহায্যে যে সে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে তা সহজেই বোঝা যায়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এই শিল্পকর্মকে অবলম্বন করে ছেলেকে তার শিক্ষণীয় বিষয়গুলিও অনেকখানি শেখানো হয়ে থাকে। বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শের দিক থেকেই কি আর পদ্ধতির দিক থেকেই কি এই শিল্পকর্মকে বুনিয়াদী শিক্ষার মেরুদণ্ড বলা যেতে পারে। প্রজেক্ট মেথড্ প্রভৃতি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার এই খানেই একটা মৌলিক তফাত। সাধারণ কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় কাজটা যে কোন রকমের কাজ হতে পারে এবং শিক্ষার দিক থেকে তার মূল্য এই যে সেটা শিক্ষার একটা প্রকৃষ্ট উপায়। বুনিয়াদী শিক্ষায় কাজটা হবে একটা উৎপাদনাত্মক শিল্পকর্ম। তার যে শুধু শিক্ষার উপায় হিসাবেই মূল্য থাকবে তা নয়, তার একটা নিজস্ব মূল্য থাকবে এবং সে মূল্য কেবল পদ্ধতিগত নয়, আদর্শগতও বটে। কাজকে অবলম্বন করে ছেলেকে সহজে স্বাভাবিকভাবে নানা রকম তথ্য পরিবেশন করা যায়। কিন্তু সেইটাই তার বড় কথা নয়। কাজটাকে ভাল করে করতে গিয়ে ছেলের একটা শিক্ষা হয় এবং সে শিক্ষা সর্বাঙ্গীন শিক্ষা। তার মূল্য তথ্যজ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি। তা ছাড়া, বুনিয়াদী শিক্ষায় জীবনের আদর্শ হিসাবেও কাজের একটা বড় মূল্য আছে। কাজই হল আমাদের কল্পিত সমাজের মধ্যবিন্দু।

এর স্থান সাধারণ বিদ্যালয়ে বর্তমানে করা সম্ভব নয়। তবে, মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের যে চেষ্টা এখন দেশে চলছে সেটা সফল হলে তখন তার মধ্যে এর স্থান অনেকখানি হতে পারবে।

বুনিয়াদী শিক্ষায় বিদ্যালয়কে একটা সমাজ হিসাবে গঠন করা হয় এবং সে সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব থাকে ছেলেদের উপরে। সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরই হল প্রধান স্থান। যা কিছু করার তিনিই করেন। ছেলেদের কাজ হল শিক্ষকের আদেশ পালন করা, তাঁর নির্দেশ অনুসারে চলা। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে তা নয়। সেখানে শিক্ষক সমাজের পাঁচজন সভ্যের মধ্যে একজন। তবে তাঁর বয়স বেশি, অভিজ্ঞতাও বেশি। সেই হিসাবে তাঁর দায়িত্বও বেশি। সেইজন্য তিনি হলেন বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে প্রধান পরামর্শদাতা।

বিদ্যালয়ের কাজকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়।

এক একটা বিভাগের ভার থাকে এক একজন সচিবের উপর। মাসে মাসে ছাত্রদের সভা হয়। সেই সভায় বিভিন্ন বিভাগের সচিব নির্বাচন করা হয়। এক মাসের জন্য নির্বাচিত সচিব তাঁর বিভাগের কাজ পরিচালনা করেন। মাসের শেষে ছাত্র সভার কাছে তিনি তাঁর কার্য-বিবরণী দাখিল করেন। তাই নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা হয় এবং তার পরে আবার নূতন মাসের সচিব নির্বাচন হয়। এই ভাবে সমগ্র বিদ্যালয়ের কাজ পরিচালিত হয়। শিক্ষক সব সময়ে উপস্থিত থাকেন, প্রয়োজন হলে সাহায্য করেন, ভুল ত্রুটি হলে সংশোধন করে দেন। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যসূচী তৈয়ারি করা, বিদ্যালয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

আনা-নেওয়া, কারও অসুখ হলে তার শুশ্রূষা বা সাহায্যের ব্যবস্থা করা, কোন অভ্যাগত এলে তাঁর সম্বর্ধনা করা, উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা করা, সব কিছুই এই ভাবে হয়ে থাকে।

বিদ্যালয় সমাজ বাহিরের সমাজের একটা অঙ্গ। কাজেই বাহিরের সমাজ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। বাহিরের সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেই বিদ্যালয়-সমাজকে চলতে হয়। সময় বিশেষে বাহিরের সমাজের সেবার দায়িত্বও বিদ্যালয়-সমাজকে নিতে হয়। গ্রামের রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, অসুখ-বিসুখে লোকের সেবা-শুশ্রূষা করা, গ্রামের উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সেগুলিকে শোভন ও সুন্দর করা, এ সবই ছেলেরা করতে পারে এবং কিছু কিছু করেও থাকে।

এই সব কাজের ভিতর দিয়ে ছেলেদের অনেক শিক্ষা হয়। তারা কাজের দায়িত্ব নিতে শেখে, পাঁচ জন এক সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতে শেখে, এক জন নেতার নির্দেশ মেনে চলতে শেখে। এইভাবে তারা ধীরে ধীরে ভবিষ্যৎ সমাজের যোগ্য নাগরিক হবার শিক্ষা লাভ করে। তাদের অভ্যাস এবং চরিত্র গঠিত হয়। কাজের ক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে নানা বিষয়ে অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞানও লাভ করে।

বুনিয়াদী শিক্ষার এই কাজটিকে আমরা সাধারণ বিদ্যালয়ে পুরাপুরি গ্রহণ করতে পারি। এর জন্য শিক্ষকের কোন বিশেষ রকমের শিক্ষার প্রয়োজন হবে না, প্রয়োজন হবে ধৈর্যের এবং সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টির।

মানুষের জীবনে কাজের প্রয়োজন যেমন আছে আনন্দের প্রয়োজনও তেমনই আছে। সেইজন্য মানুষ খেলাধূলা আমোদ-আহ্লাদ উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এসব বাহিরের জীবনে যেমন আছে, বিদ্যালয়ের জীবনেও তেমনই থাকবে। এইজন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজের সঙ্গে সঙ্গে এই সকলেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঋতু-উৎসব, জাতীয় উৎসব, মহাপুরুষ-স্মরণোৎসব প্রভৃতি নানা রকমের উৎসব যখন যেমন থাকে পালন করা তো হয়ই, মাসে মাসে নিয়মিতভাবে সাহিত্য-সভার অনুষ্ঠান করা হয় এবং সেই উপলক্ষে নাচ-গান আবৃত্তি অভিনয় প্রভৃতির আয়োজন করা হয়ে থাকে। এর ফলে বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবন সরস ও সুন্দর হয়, ছেলেদের মনে সৌন্দর্য এবং সাহিত্যরস-বোধ জাগে এবং এইগুলিকে অবলম্বন করে অনেক বিষয়ে অনেক শিক্ষাও লাভ হয়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের উপরের শ্রেণীতে ছেলেরা হাতে লেখা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা বার করে। এর ভিতর দিয়ে তারা নানাভাবে নিজেদের প্রকাশ করতে শেখে এবং একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করে।

সাধারণ বিদ্যালয়েও এগুলি কিছু পরিমাণে হয়ে থাকে। তবে, সেখানে সেগুলি থাকে বিদ্যালয়ের কার্যসূচীর বাইরে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এগুলিকে বিদ্যালয়ের সাধারণ কর্মসূচীর অঙ্গীভূত করে নেওয়া হয় এবং সেইজন্য এর উপর অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। সাধারণ বিদ্যালয়ের এই রকম করার কোন বাধা নাই।

দেখা যাচ্ছে, একমাত্র উৎপাদনাত্মক শিল্পকর্ম ছাড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের আর সব কাজই আমরা সাধারণ বিদ্যালয়ের নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীতে অল্পবিস্তর করাতে পারি। এখন প্রশ্ন, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জীবন-রীতি সাধারণ বিদ্যালয়ে কতখানি অনুসরণ করা যেতে পারে? পাঠন-রীতির বিষয়ে সাধারণ বিদ্যালয় ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে একটা মূলগত পার্থক্য আছে। সাধারণ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়গুলি আলাদা আলাদা করে পড়ানো হয়, কোনটির সঙ্গে কোনটির যোগ থাকে না। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বিষয়গুলিকে যথাসম্ভব একত্র করে পড়ানোই রীতি। কতকগুলি ক্ষেত্রে তো কয়েকটি বিষয়কে একসঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে একটা নূতন রূপই দেওয়া হয়েছে। যেমন, ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরনীতিকে মিলিয়ে সমাজ-বিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যা, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যাকে মিলিয়ে সাধারণ বিজ্ঞান করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষা অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠ এবং ছেলের কাছে অনেক বেশি সহজ হয়েছে।

সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় পাঠ্য পুস্তককে

অবলম্বন করে; বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় ছেলের জীবনকে অবলম্বন করে তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনা এবং তার কাজকে অবলম্বন করে। যে জিনিসের সম্বন্ধে ছেলের আগ্রহ আছে এবং যার বিষয়ে সে কৌতূহল অনুভব করছে তার সম্বন্ধে তার মনে আপনা আপনি অনেক প্রশ্ন জাগে। সেই প্রশ্নের উত্তরে যখন তাকে কিছু বলা হয় তখন সেই শিক্ষা তার কাছে খুব স্বাভাবিক হয় এবং সে অত্যন্ত সহজে তা গ্রহণ করতে পারে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের এই পঠন রীতি সাধারণ বিদ্যালয়েও কিছু পরিমাণে অনুসরণ করা যেতে পারে। ছেলের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে অবলম্বন করে যা শেখাবার তা সাধারণ বিদ্যালয়েও শেখানো যেতে পারে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের যে সব কাজ আমরা সাধারণ বিদ্যালয়ে গ্রহণ করতে পারব সেগুলিকে অবলম্বন করেও অনেক জিনিস শেখানো যেতে পারবে। একমাত্র শিল্প কর্মকে অবলম্বন করে যা শেখাবার সেইটাই হবে না।

এইখানে একটা প্রশ্ন উঠবে। এই ভাবে পড়িয়ে নিম্ন মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমের কতখানি পড়ানো সম্ভব হবে? সবখানি যে সম্ভব হবে না তা সহজেই বলা যায়। পশ্চিম বঙ্গে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য আলাদা পাঠ্যক্রম এখনও করা হয় নাই। যাতে এখানকার পড়া শেষ করে ছেলেদের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়ার অসুবিধা না হয় সেইজন্য এখানে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে নিম্ন মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমই অনুসরণ করা হয়। সেখানেও সব জিনিসই বুনিয়াদী পদ্ধতিতে পড়ানো সম্ভব হয় না। কতকগুলি বিষয়, যেমন মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা, সাধারণভাবে পড়াতেই হয়। তা ছাড়া অন্য কতকগুলি বিষয়ও, যেমন বীজগণিত, জ্যামিতি ও ইতিহাসের কতকটা অংশ, সাধারণভাবে পড়ানো ছাড়া উপায় থাকে না। সেখানে এমন মোটামুটি এই নিয়ম করা হয়েছে যে কাজ এবং পরিবেশকে অবলম্বন করে যতখানি সম্ভব পড়াবার চেষ্টা করা হবে। যেটা সেভাবে পড়ানো যাবে না সেটা সাধারণ পদ্ধতিতেই পড়ানো হবে। তবে, সাধারণ পদ্ধতিতে যেটা পড়ানো হবে তারও উদ্দেশ্যে ছেলেকে বুঝিয়ে দিয়ে তার সম্বন্ধে তার আগ্রহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে হবে এবং যেটা পড়ানো হল সেটা যাতে সে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণ বিদ্যালয়েও এই নিয়ম অনুসরণ করা চলতে পারে।

অনুভব

আমার সোনালী ধানের মেয়েরা যখন
রোদে চুলগুলি শুকোতে বিছায় আকাশে
শুধু দৃষ্টির কুশল প্রশ্নে তখন
আমাকে আকাশ আরো কাছে টানে সেই অবকাশে
আমিও আবার মেঘের মিছিলে দাঁড়াই।

আমার সোনালী ধানের মেয়েরা সবুজে অধীর,
ভোরারের প্রেমে নব বসন্তে ভ'রেছে দু' তীর।

সে আপন প্রিয় তাকেই এ-হৃদয়ে দু' হাত বাড়াই।

'তবু সখী তা'কে পত্র দিয়েছে,' এই তার প্রেমে
বসুমতী গানে আকাশে উতলা—সে এসেছে জেনে।
ধরো ধরো কাঁপে প্রাণের কোরক দুল সম্ভারে—

সে হবে স্বপ্নঃ সম্ভবা গান, প্রকৃতির দ্বারে,
তাই সে আকাশ আমাকেই ডাকে তখন
আমার সোনালী ধানের মেয়েরা যখন
রোদে চুলগুলি শুকোতে বিছায় আকাশে,
সব ভাবনার ঘোড়াকে ছুটিয়ে বিপুলার পাশে
চকিত চমকে সবুজের প্রাণে হৃদয় নাড়াই,—

কী জানি জানিনা বিপুলাকে পেয়ে নিজেকে হারাই॥

ভুল ডাক

বিমল দত্ত

'কেমন মানুষ তুমি ? এখনো এলে না ?
আমি জেগে বসে আছি'
ও স্বর অচেনা।
কথা শুনে হাত কেঁপে যায়।
সত্যিকথা বলা দায়
অনেক সময়।
তবু, শেষে বলতেই হয়।
আমি এক দোকানীর অধম চাকর
আমার গলার স্বর
প্রত্যাশিত সে জনার মতন শোনালো ?
তবু ভালো !
নিজেকে চিনিয়ে যেই দিয়েছি, অমনি
ওপারে কুণ্ঠিত কণ্ঠ ; সলাজে রমণী
বলে, 'ভুল-ক্ষমা করবেন, আপনাকে নয়
বহুক্ষণ ধরে গেছে ঘর ওঁর ফেরার সময়'।
এ মাকে তো নয়, নিদারুণ এ আঘাত পরে
বসন্তের এই রাত্রে, দোকানের এই বন্ধ ঘরে
ভুল করে পাওয়া, সেই চুরি করে রাখা
আগ্রহের স্বাদ নিই চুপি চুপি। ঘরে পাকা
অসহ্যেরও কেন লাগে। মনে করি
পথে যদি তারে দেখি আকাশে প্রহরি
তাকে বলে দেবো—সে তো নয় আমি
যার লাগি রাত জাগো, যার সঙ্গকামী
সে তো অন্যজন, সে তো অন্যজন।
যদি ভুল চোখে পড়ে শাখা প্রশাখন
তাকে বলে দেবো, যার মুকুটের শোভা হতে চাও বলে
সাধ করে তুমি শেষে কৃষ্ণচূড়া হলে
সে তো আমি নয়।
তবু যদি মনে হয়

আমি সেই, শুনে রাখো
তুমি যাকে ডাকো
আমারি মতন
আরও এক অন্তজনে উত্তরণ
আমি ছাড়া তার।
তবু বার বার
কেঁপে বসে আছি শুনে অধম আমাকে
সাড়া দিতে হয় সব বসন্তের ভুল করা ডাকে।

প্রবাহিকা

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

সহযাত্রিণী

(আদিম স্তব্ধ কে)

পাথর নির্ঝরে ছেঁটে সে-ও এক ব্যাকুলিত প্রাণ
অপার আলোর স্বাদ দেখ তার ইচ্ছায় শিকড়ে :
এবং গভীরে মালা উজ্জ্বলতা : বেগতি উজান
সমস্ত শরীর ছুঁড়ে গোধূলির বিপুল শিহরে।
একদো হাজার যুগ ছেড়ে এসে, নিরবধি কাল -
কতোকাল কে-বা জানে, এমন তীর্থের বুথ চাওয়া।
তবুও অনন্ত স্রোত, বার্ধক্যের সফল সকাল
রক্তের চেতনা দেবে, চারিদিকে মন্ত্র মুগ্ধ হাওয়া।

চুলের দেহের বাসে দেখ সে নিবিড় কাছে থাকে।
নিঃস্ব বাগানে একা। অন্ত মনে কুরুপাখি ডাকে॥

চতুর্দ্দশী

সেদেছো কি ঘর মনে স্নিগ্ধতার গানে।
অন্তরায় অশ্রু দেখ বন্ধ সারা রাত,
অচিন বিদেশে পাখী অভিজ্ঞানে টানে
প্রাণের প্রহর বুঝি স্মৃতির প্রপাত।

একদা পাখীটি ছিলো সোনার খাঁচাতে ;
নন্দিত হাওয়া, সে তার বাথার আকাশ।
প্রাপধিক রৌদ্র যেতো কৃপণ অভাবে,
নির্বাসিত-উজ্জ্বলতা : রুদ্ধ অবকাশ।

পুতুলেরই সংসারে খেলেছে সে একা।
আঙিনায় লতা ওঠে। সঙ্গিনীর ছায়া।
কল্লোলিত পাখা দোলে—নিয়মিত দেখা,
ঘুরে ঘুরে উজ্জীবনে আনে শুধু মায়া।

পুতুল ধরণী হবে আকাঙ্ক্ষার ঘরে,
প্রসর স্বাগত তার পাখা দেহ ভরে॥

ঢেউ

স্বদেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছোট বড় ঢেউ
উঠছে আর পড়ছে
ভাঙ্গছে আর গড়ছে।
আকাশের মুখ ভার!
ঢেউ কি ভাবছে?
সূর্য্যোকরোজ্জ্বল ধরণী
হাসি ওঠে ছল ছলিয়ে।
সমুদ্রের ঢেউ এ নয়!
নাই কোন গরিমা
ছোট নদী তর তরিয়ে যায় বয়ে
এ তারই বুকের স্পন্দন
দেহ আর প্রাণের বন্ধন
অনুপস্থিত যেথায়
মরা নদী ঝিমোয় সেখানে!
ছোট ছোট ঢেউ
খিলখিল করে হাসছে!
কোনদিক থেকে ভাটিয়ালী—
কোনদিক হতে বাঁশরী—
জীবনের পশরা ব'য়ে

কেহবা যায় কোথাও—
ঢেউ জেগে থাকে
সাবধ তার আত্মা।
ঢেউ শুধু ঢেউ
প্রাণের এ বেগ
গতির এ আবেগ
হয়ে ওঠে দুর্দম—
কার পরে আক্রোশ
কোন আক্রোশে?
ধমনীর মধ্যে গতি বাড়তে থাকে
মনে হয় কাটিয়ে দেবে
মনে হয় অনেক কিছু
কেঁদে ওঠে কারা—
শোনা যায় কার ও আকুতি
একটুকু সহায়তা—
একটুকু আশ্বাস—
ভাঙ্গা তরীর যাত্রীকে
কে আজ তুলে নেবে।
ছোট ঢেউয়ের কুটিলতা—
ভাটিয়ালীর আবিলতা
বাঁশীর মোহিনী সুর
উপহাস জেনে যায়—;
এমনি চলবে চিরকাল
সাবধান সব তরী
ঠিক ঠাক করে পাল
ঠিক মতো ধরো হাল
না ভেঙে ঢেউ
বিশ্বাস করে মনে
নাচাও তোমার তরী
উত্তাল ঢেউয়ের পর॥
তরঙ্গ দুর্দ্দম ঢেউ
বিলীন পদতলে॥

মিলন

গোপালহরি বন্দ্যোপাধ্যায়

পরো-পরো কামনার এ মিলন মৃত্যু মুখরিত
ডানায় ডানায় মাখা অতনুর সুরভিত রেণু
তারি মাঝে সৃষ্টিশিল্প বেদনার বৈজয়ন্তী লীলা
নব চেতনার বার্ত্তা নিত্যকার বিজয়ী ঘোষণা।

এ মিলন স্বপ্ন-মাখা অরুনাভ প্রদোষ-সম্ভবা
নব পরিণয়ে বৃদ্ধ দম্পতীর বেপথু শরীরে
এরি অঙ্কে ইতিহাস নিস্পন্দিত সৃজনে ভাঙ্গনে
ধনুকের ছিলা হ'তে দাঙ্গলের ফালে রূপান্তর।

অভিসার সজ্জাবতী পৃথিবীর প্রসাধনে তাই
আরও মধু ভ'রে ওঠে আরও স্বপ্ন রাঙায় গোধূলি
নভোনীল দর্পণেতে ছায়ালীন সে হাসির ছটা
রোমাঞ্চ তরঙ্গ তোলে : দক্ষিণার আনন্দ অবাধ।

ছন্দে সেই মন্দদোলা বৃন্ত-পাখা সুগম সুন্দর
প্রলয় সৃজনে মাতে আমার মানস প্রজাপতি
স্বপ্ন কামনার শিখা পুড়ে পুড়ে সারারাত জ্বলে
স্বপ্ন কামনার সূর্য এনে দেয় দক্ষিণ সকাল।

স্কট্ লেনে গোধূলি

(মৃণাল আচার্য্য বন্ধুবরেষু)

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দিন ও রাতের মাঝে গোধূলির রক্তিম আলোক
এখানে গলির মাঝে উঁকি মারে ক্ষণেকের তরে।
স্কট লেনে দেখেছি প্রেমিক আমি গোধূলির রঙ।
এমন ক্ষনটা তুমি হয়তো বা পেয়েছো অনেক
তবুও তোমার মনে তোলেনিকো কোন সুর কলি
কারণ বাসোনি ভালো গোধূলির অপূর্ব আলোক
বাসলেই পৃথিবীতে পেতে ঠিক অরূপের স্বাদ।

কারণ প্রকৃতি কারো করে নাকো কোনরূপ ছল।

স্কট লেনে দেখেছি প্রেমিক আমি অস্তগামী রবি,
দেখছি আকাশে ছেলে হাজারো আরক্তিম রঙ
হঠাৎ গির্জার কোণে ডুবে গেলো অস্তগামী রবি
এখানে গলির মাঝে রেখে দিয়ে পরম বিস্ময়।

বুঝিবা ভেবেছো তুমি দূর করে রক্তিম গোধূলি,
পাশছায়ে কালিমাকে ডেকে আনে কালো কালো কাক ;
অথচ এ নয় সত্য—, কাকেরাই গোধূলি আকাশে
ডেকে ডেকে ওড়ে—, বলে— গোধূলি আরও ক্ষণ থাক !

গতির প্রেমিক কাক – আঁধারে পাবেনা গতি তাই
ঘুরে ঘুরে ওড়ে—, বলে –, গোধূলি আরও ক্ষণ থাক !

এখানে গোধূলি নামে : নিরাশার স্বপ্নময় আশা॥

মায়া সোম

সাত্যকি

চমকে ওঠে অজিত, যেন একটা শিকলিকে চামড়ার চাবুক সশাং করে এসে পড়ে তার মুখে। গর্জে ওঠে তার আহত পৌরুষ; চাপা অথচ তীক্ষ্ণ স্বরে বলে ওঠে, কিন্তু কেন? অপাঙ্গে চাদরটা টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শুতে গিয়ে মায়া বলে, 'না'।

বিছানাতে উঠে বসে অজিত। একটা পরাজয়ের গ্লানি কালো আলকাতরার মতন চাটু চাটু করছে সর্বাঙ্গে: সমস্ত মুখটা নিমেষে শক্ত হয়ে ওঠে যেন বাসি মড়া। প্রাণপণে কামড়ে ধরে নীচের ঠোঁটটা—কুঁচকে ওঠে সমস্ত কপাল। বিমূঢ় অজিত মাথা নীচু করে ভাবতে থাকে। একটু পরে মায়াও উঠে বসে বিছানায়। চৌড়া খাটে অনেকখানি জায়গা—অন্ধকার হলেও অজিতের সান্নিধ্য অনুভব করতে কষ্ট হয় না—দু' হাত দূরেই একটা ঘনীভূত অন্ধকার।—"তুমি হয়তো খুব অসন্তুষ্ট হয়েছ কিন্তু স্ত্রী পুরুষের মধ্যে এই বিটলি রিলেশনটা আমার কাছে অসহ্য লাগে।"

অন্ধকারের একটা জমাট লৌহপিণ্ড যেন চেপে বসেছে অজিতের মাথায়। সামনের বালিশটা দুই হাতে সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরে কোন মতে সামলে নেয়, কিন্তু ঠিক পেরে ওঠে না—"তবে তুমি বিয়েতে রাজী হয়েছিলে কেন?"

"কারণ আমার পক্ষে বিয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।" একটু থেমেই মায়া আবার বলে, "অবিবাহিতা মেয়েকে সমাজে তোমরা যে ভাবে আদর করো তার হাত থেকে বাঁচতে হলে এ ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই। আমি সমাজের মধ্যেই থাকতে চাই।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর অনেকটা স্বগত ভাবেই অজিত বলে ওঠে, 'কিন্তু তুমি কি করে ধরে নিলে যে, আমার পিতা হওয়ার সাধ নেই।

"না সে রকম কিছু ধরে নিই নি," মায়ার কণ্ঠ ঈষৎ কেঁপে ওঠে। "কিন্তু আমি দুঃখিত যে তোমার সে সাধ মেটাতে পারবো না। আমার জীবনে একটা প্ল্যান আছে"—একটা দূরাগত কণ্ঠে মায়া সোম বলতে থাকে 'আমি নিজেকে পূর্ণ করে তুলতে চাই। তুমি কি চাও যে লেখাপড়া শিখে আমি নিজেকে প্রবৃত্তির যূপকাষ্ঠে বলি দিয়ে দিনের পর দিন ছোট-খাট কাজে নিজেকে নিঃশেষ করে দেব!"

আর ভাবতে পারে না অজিত। হঠাৎ মনে পড়ে গতকাল রাস্তায় দেখেছিল একটা থেংলে যাওয়া ব্যাঙ। সমস্ত শরীরটাই রাস্তার সঙ্গে পিষে চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছিল শুধু চারটে অসহায় পা দুলে আর্তছিল দেহের গ্রন্থি অস্বীকার করে। ওর চোখের সামনে যেন দুলছে চারটে বীভৎস ঠ্যাং—অসহায় ব্যাঙটা, মরেছে কী? একটু দেখবে নাকি জৎপিণ্ডটা নেড়ে চেড়ে? থাক, তার চেয়ে ভেবে নেওয়াই ভাল যে ওটা মরে গেছে। তাই বলে সমস্ত শরীরটা অমন থেংলে যাবে!

'তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, অজিত!' আবার চমকে ওঠে অজিত: কোথায় যেন শুনেছে এই গলা, কবে, কখন—ঠিক মনে পড়ছে না তো। আলো, না আলেয়া—মানবের কলুষ কালো পাথরের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে দিতে চায় দুইকে। নাঃ অন্ধকার সূচীভেদ্য—ফিরে আসে প্রাক্তন দৃষ্টি। পরক্ষণেই শুনতে পায় সেই কণ্ঠস্বর—"তুমি আমাকে ভুল বুঝো না অজিত। ভেবে দেখ এ ছাড়া আমার পক্ষে আর কি উপায় ছিলো! এ ক্ষেত্রে অন্য লোক হলে কি করতো তাও কিছুটা আঁচ করতে পারি। কিন্তু আমি জানি সে কাঁটা তোমার খচিতে বাজবে।"

ঃ অসহ্য। একটা তীব্র তাড়নায় অজিত বেড়িয়ে আসে ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বারান্দাটায়। চেষ্টা করে নিজেকে ফিরে পেতে। কিন্তু, নাঃ—কানের পাশে রক্তের শিরা দুটো নাচে কেন! অদ্ভুত, ক্রমেই বেড়ে চলেছে দপ্‌দপানি। ও যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, শিরার মধ্যে উত্তাপ রক্তকণিকাগুলো—আগুন, তরল আগুন—গরম লাভাস্রোতের মতো ছুটে চলেছে। জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে দেহের প্রতিটি লোমকূপ। না, না এ আর সহ্য হয় না—দুহাত বাড়িয়ে দেয় অজিত অন্ধকারে অপরাধীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু কোথায়—একটা তীব্র ব্যথা নিয়মভাবে দুচোখে দেয় অজিতের সমস্ত সত্তা। টলতে টলতে ও বসে পড়ে বারান্দার চওড়া পৈঠাটার উপর। ক্লান্ত—অসহ্য ক্লান্তিতে বুকে পড়ে মাথাটা সামনের দিকে। দুহাত বাড়িয়ে চেপে ধরে সিমেন্টের মেঝে। একটা পরাজয়—অভাবনীয় পরাজয়—কিন্তু কার কাছে? কেন? অজিত এর কোন উত্তর দিতে পারে না। হঠাৎ একটা সন্দেহ ওর মনের মধ্যে পাক খেতে থাকে। বুকটা নিমেষে কঠোর হয়ে ওঠে—যেন মাংস ছিঁড়ে বেড়িয়ে পড়েছে হাড়। কিন্তু পরক্ষণে মুহূর্ত মাত্র, তারপরেই নিজের মনে বলে ওঠে—'আমারও আছে আত্মসম্মান।'

যামিনীর শেষ প্রহর, অন্ধকার যেন গাঢ় হয়ে উঠেছে অজিতের চোখে। দূরে বহু দূরে তার ক্লান্ত আঁখি খুঁজে বেড়ায় ভবিষ্যৎ-লিপি। রাত্রি শেষের তারারা কী কথা বলে? কী বার্তা পাঠায় নিস্তব্ধ সমীরণের আলতো-ছোঁয়া অনুভবে? আর শিশির-ভেজা ঘাসের গন্ধে? অজিত জানে না—বুঝতে পারে না। হঠাৎ অকারণে নিঃশব্দে কেঁদে ওঠে অজিত। দুই হাটুর মধ্যে মাথা গুঁজে নিজেকে ছেড়ে দেয় অদৃশ্য কোন শক্তির হাতে। অনুভব করে ও নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে—যেন কত যুগ যুগান্ত ধরে কাঁদছে। কত শত দাবানল নুছে গেছে ওর চোখের জলে। গলে যায় অজিতের শরীরের আগুন—নেমে আসে কিছু কিছু বারিধারায়।

চোখের জল! তাও শুকিয়ে আসে। নিজের অবসাদিত হাটু থেকে মুখ তুলে সামনে তাকায় অজিত। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক ঝলক ভোরের হাওয়া ওকে জানায় অভ্যর্থনা। চোখে পড়ে একটা আলোর আভা। চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। আসছে দিন, আসছে প্রাণ। কলরব করে ওঠে পাখীরা—রাত্রির তপস্যা শেষে জেগে উঠছে প্রকৃতি। একটা আলোর কিরণ যেন শত সহস্র টুকরো করে ছড়িয়ে দিচ্ছে নিজেকে। অবাক বিস্ময়ে অজিত তাকিয়ে দেখে প্রাণের এই অভিব্যক্তি। ওর চোখ পড়ে বাগানের কোণে নার্গিস ফুটেছে। ছোট্ট সাদা ফুলের মতো আরও ছোট একটা হলুদ রঙের বাটী—অরুণ তপনের সবটুকুই যেন ধরে নিতে চায় নিজের বুকে। কতো সংক্ষিপ্ত ওর প্রাণ তবু ফুটেছে। অজিত অপলক তাকিয়ে থাকে নার্গিসের দিকে।

একটা মিষ্টি গন্ধে চেতনা ফিরে পায় অজিত। মনে পড়ে নার্গিসের ভুবন মাতানো গন্ধ। কতো ছোট্ট ফুল—কিন্তু কী পূর্ণ আবেদন। হঠাৎ ইচ্ছে হয় বাঁচবে—মনে হয় জীবন বৃথা নয় আছে, তারও আছে আবেদন। এক অবিশ্রান্ত আশায় অজিত ফিরে আসে। ক্লান্ত দৃষ্টিতে থাকে আর কারও অস্তিত্ব দেখা সে পায়—কিন্তু বুঝে উঠতে পারে না।

অস্বস্তিকর লাগে মায়ার এই দৃষ্টিকে। যতক্ষণ মানুষটাকে পেছন থেকে দেখছিল ততক্ষণ নানা চিন্তার জটিলতার মধ্যে দ্রুতবেগে বেড়িয়ে যাচ্ছিল সময়ের মুহূর্তগুলো। কিন্তু ওই না-তাকিয়ে-থাকা দৃষ্টির সামনে সব যেন স্থির হয়ে গেছে। হাতে চায়ের কাপটা যেন মনে হচ্ছে অসহ্য ভারী। কি চায় ওই দৃষ্টি। একটা অসমাপ্তা আক্ষর করে ফেলেছে মায়ার সত্তাকে। কী যেন বেরিয়ে আসতে চায় ঠিক বুকের ভেতর থেকে। বেরিয়ে আসছে কা। না আটকে যায় গলার কাছে। উঃ অসহ্য, একটা প্রচণ্ড চীৎকারের বিস্ফোরণে থামিয়ে দিতে ইচ্ছে হয় এই নিবাক অভিনয়। কিন্তু কই, কণ্ঠ স্তব্ধ। শুধু জ্বালা করে ওঠে চোখের দুই কোন—বোধ হয় এখনি ভেঙ্গে পড়বে কান্নার উচ্ছ্বাসে। সব কেমন গুলিয়ে যায়—তবুও মায়া শোনে কে যেন ফিস্‌ফিস্ করে বলছে—'তুমি মায়া সোম কী করছো তুমি—

এতো দুর্বল তোমার মন। জেগে ওঠে মায়া নিজের অজ্ঞাতেই। তাড়াতাড়ি চেপে ধরে দরজার চৌকাঠটা—ডান হাতে চায়ের পেয়ালায় ছলকে ওঠে তরল চা। ক্ষণিকমাত্রই, তারপর নিজেকে সামলে নিতে বেশি দেরী হয় না মায়ার। বেশ সংযতভাবেই চায়ের কাপটা—গরম ধোঁয়া উঠছে তখনো। ওখানে আর দাঁড়ায় না—মায়া স্থির পদক্ষেপে ফিরে আসে ঘরে। কিন্তু, এখন। কী করবে সে এখন। যেদিকে তাকায় শুধু একঘেয়ে ক্লান্ত বিষণ্ণ দৃষ্টি—কী যেন চায়। রজনীর কৃত্রিম আলোকে যে অভিনয় মানুষ করে দিবালোকে একি রূপ তার। ক্লান্ত—নিঃশেষিত মনে হয় নিজেকে মায়ার। কোথাও কি নেই এতটুকু আশ্রয়। শেষ-রজনীর অভিনয়ক্লান্ত মায়া সোম খুঁজে বেড়ায় শ্রীপুরমের স্বচ্ছন্দতা।

কিন্তু কোথায় শ্রীপুরম। সম্বিত ফিরে পেয়ে মায়া আবিষ্কার করে—কোথায়ও কিছু নেই—না অভিনয়, না দর্শক—শূন্য রঙ্গমঞ্চে সে শুধু একা। হ্যাঁ! এতক্ষণে আর অল্প মনে পড়ে—অজিতের পোষাকে অজিত ওর সামনে দিয়েই বেরিয়ে গেছে। অনেক বেলা হয়েছে কি? চেয়ার থেকে দূরে ম্যান্টেলপিসের উপর ঘড়িটা যেন পড়াই যায় না। থাক্ না—কতোই বা আর বেলা হয়েছে। আলস্য যেন পেয়ে বসে মায়াকে। কিন্তু—নাঃ এরকমভাবেই বা আর কতোক্ষণ থাকা যায়। চেয়ারের হাতল দুটো জোরে চেপে ধরতে গিয়ে ওর নজর পড়ে নিজের হাত দুটোর উপর। কয়েকবার সন্দেহ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হাত দুটোকে নিরীক্ষণ আরম্ভ করতে থাকে মায়া। বেশ কর্মক্ষম তার হাত দু'টী—অনেক কিছু করতে পারে—আর করতে চায়ও সে। শরীরের আরও অনেক জায়গায় তার দৃষ্টি ঠেকে যায়—কিন্তু তা নিয়ে আলোচনা করতে সে মোটেই রাজী নয়। হঠাৎ মায়া হাঁটু পর্যন্ত শাড়ীটা তুলে নিজের পা দুটো খুলে মেলে ধরে। বেশ দেখতে কিন্তু ওর মোটাসোটা পা দুটো। কাছে টেনে নিয়ে আসে—আর আস্তে আস্তে টিপতে থাকে মাংসল পা দুটো—একটা অদ্ভুত আরাম পায় মনে। নিজের উপর একটা বিশ্বাস পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তার সুগঠিত স্বাস্থ্যের মধ্যে।

টিক্ টিক্-ই-টক্-কু চং চং—বেজেই চলেছে দেয়াল ঘড়িটা। হাতের বইটা ধপাস করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় আর্কিটেক্ট অজিত সোম। জানলার কয়েক বর্গক্ষেত্র ফাঁকার মধ্য দিয়ে দেখা যায় কনট প্লেসের নিউক্লিয়াস একটুকরো সবুজ মাঠ আর তার পাশে এক ফালি রাস্তা। ঝকঝকে রাস্তা নিশ্চিন্তে দিবা নিদ্রায় সুষুপ্ত। গাছের ডালে নিঃসঙ্গ কাক—নীচে মাঠের উপর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে কেউ। অজিত সোমের অন্যমনস্ক দৃষ্টি আটকে যায় একটা গতিশীল সাইকেলের চাকায়। ঘন্ ঘন্ করে ঘুরছে চাকটা—আর সাইকেল চলছে এগিয়ে।

'কী হে, অতীতের কবর খুঁড়ে কিছু পেলে'—দরজা ঠেলে ঢুকতে ঢুকতেই জিজ্ঞেস করেন ফার্মের পার্টনার। অজিতের মনে হয় তামাকের গন্ধটা বেশ মিষ্টি। ততক্ষণে পার্টনার মিঃ শর্মা এসে দাঁড়িয়েছেন জানালার কাছে। শর্মা বাঙলা জানেন—বাঙালীকেও চেনেন। অজিতের কাঁধে একটা হাত রেখে জিজ্ঞাসু মুখে তাকান মিঃ শর্মা।

'না, এক জায়গায় এসে ঠেকে গেছি। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লিটির লাইফ কিসে সুস্থ হয়ে উঠবে! শুধু বাড়ী রোড, আর রাস্তা দিয়ে তো মানুষ বাঁচে না' চিন্তান্বিত অজিত হাতের পাঁচটা আঙুলই ঢুকিয়ে দেয় মাথার ঘন কালো চুলে। 'কুছেছ শর্মা—আই এম ইন্ সর্চ অফ্ লাইফ।'

হাঃ হাঃ হাঃ—হাসতে হাসতে ছেড়ে পড়ে পার্টনার মিঃ শর্মা। 'মাই ডিয়ার সোম, তোমার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চলবে না আমার। আর তাছাড়া, সত্যি কথা বলতে কী, প্রাণের খোঁজে প্রাণপাত করা আমার দ্বারা পোষাবে না। এনিওয়ে, ব্রিভোলিতে একটা ভাল পিকচার আছে'

'আচ্ছা থাক্। তাই এম এ বিট টায়ার্ড' অজিতের এপোলজি শেষ না হতেই শর্মা বলে ওঠে "ও—কে, চিয়ার্স অল বিগ বয়" একগাল মিষ্টি ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে যায় পার্টনার মিঃ শর্মা।

বেশ একটু রাত্রির করেই বাড়ী ফেরে অজিত। বগলে এক গাদা বই ও ফাইল। বাড়ীতে বসেই কিছু কাজ করতে হবে। সরকারী অফার, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিটির পরিকল্পনা পেশ করতে হবে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে। কড়া নাড়বার প্রয়োজন হয় না। নিঃশব্দে দরজা খুলে যায়। সুস্মিতা মুখে এগিয়ে আসে মায়া—হাত বাড়িয়ে দেয় বইগুলো ধরার জন্য।

অজিত তাকায় মায়ার মুখের দিকে। কি দেখে কে জানে। কিন্তু বিনা বাক্য ব্যয়ে বইগুলো ছেড়ে দেয় মায়ার হাতে। আস্তে আস্তে ঘরে ঢোকে অজিত—মনে হয় 'বেলেঘাটা থেকে ফিরছে অনেক দিন পর একে একে অজিতের পোষাক বদলায়—সবই হাতের কাছে টিলটপ্ পোছানো। সবত্রই যেন রয়েছে একটা ঝিমিঝিম টাচ।

বাথ্ রুমে গরম জল পেয়ে খুসীই হয়ে ওঠে অজিত। সারা দিনের ক্লান্তি ধুয়ে ফেলে গরম জলের উষ্ণতায়। স্নানের শেষে ঘরে এসে গা এলিয়ে দেয় ওর প্রিয় ইজি চেয়ারটায়। হাতে একটা মৃদু স্পর্শে তাকায় ভাঙলে ও উঠে পড়ে। খাওয়ার টেবিলে নিঃশব্দেই সময় কাটে। তারপর.....

অনুষ্ঠানের ব্যতিক্রম হয় না। খাওয়ার পরে অজিতের কফির নেশা মায়া ভোলে নি। ট্রেতে কফির ট্রে রেখে অজিতের ইজি চেয়ার ঘেসে একটা মোড়া টেনে বসে পড়ে মায়া। শাহাড়ী নদীর মত কলতান করে চলে যায় সময়—যেন একটা অফুরন্ত মুহূর্তের স্রোত। হঠাৎ একটা না বলা মুহূর্তে অজিতের একটা হাত মায়া তুলে নেয় নিজের কোলের উপর। 'একটা কথা বলবো, শুনবে?'

অনেক দূর থেকে ভেসে আসে অজিতের কণ্ঠস্বর, 'বেশতো কি বলবে বলো।'

'তুমি আমার উপর খুব রাগ করেছো, না। আচ্ছা, সত্যি করে বলো তো, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কি একটী বই আর কোন সম্বন্ধ নেই। জানো, আমি যতো বেশী করে ভুলতে চাই ততই মনে হয় ওর শিওরি সব মিথ্যে।' হঠাৎ মায়া লক্ষ্য করে অজিতের চোখ দুটো ভেসে চলেছে কোন সুদূরে। ওর উরুতে একটা ছোট্ট ধাক্কা দিয়ে বলে, "এই—দেখনা—দেখ আমার দিকে। তাকাও এদিকে তাকাও। আচ্ছা আমার এই দেহটাই তোমার কাছে এতো প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলো।"

ইজি চেয়ারে সোজা হয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করে অজিত। মায়ার হাত দুটো সাগ্রহে টেনে নেয় নিজের হাতের মধ্যে—"মায়া, আজ আমি বড়ই ক্লান্ত। একটু যদি একলা থাকতে দিতে।"

ক্রমে সব কিছুই আলাদা হয়ে যায়—বিছানা, ঘর, খাওয়ার সময়, বেরোবার সময় ইত্যাদি—ছুটী পাখীর মত বাঁধ ভাঙা বইতে থাকে পাহাড়ীয়ার উদাস হাওয়া। অবশ্য ব্যতিক্রমও দেখা যায় যখন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েন। আশঙ্কার অন্ত থাকে না, ডাক্তার, বৈদ্য, রাত জাগা যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে দিন কাটে। কিন্তু নিয়ম বাঁধা জীবনে কি এ রকম সৌভাগ্য বারবার ঘটে।

কাজেও ক্ষতি হয় বৈ কি? মায়া সোম আজকাল ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। সহরের সব কিছুতেই তিনি এখন অপরিহার্য্য। মহিলা সমিতি, ড্রামাটিক ক্লাব, বিজ্ঞানভবন বাস্তহারা মেয়েদের জন্য কারিগরি বিদ্যা শেখার স্কুল, বয়স্কদের জন্য দুপুরে স্কুল, সহরতলীতে স্বাস্থ্য উন্নয়ন—চারিদিকে কেবল কাজ। নিঃশ্বাস ফেলার সময় কই!

কাজ এসে ভীড় করে দাঁড়ায় আকাশের চার পাশেও। কালো, সাদা, লাল কতো রঙ বেরঙের কাজ। এক এক সময় হারিয়ে যায়—মানুষ, বাড়ী, রাস্তা, পার্ক, মনুমেন্টের জঙ্গলে। কেন, কেন নিজেকে বন্দী করে রাখার এই প্রয়াস মানুষের। অনেকটা ছাদগা বেড়া দিয়ে আটকে রাখা কাশোয়ারদের পশুশালার মতনই মনে হয় এই সহরগুলোকে। কতো বিনিদ্র রজনী কেটেছে অজিতের—খুঁজেছে সহরের প্রাণ—যদি বুকের কোন আনাচে পাওয়া যায় একটু ক্ষীণ ধুকধুক শব্দ। না, পাগল হয়ে ওঠে আর্কিটেক্ট অজিত সোম। কখনো মনে হয়, ঠিক্—সহরে নেই সবুজের ছোঁয়া। যাদ্ লেগে যায় সবুজ রঙ নিয়ে। আবার হতাশ হয়ে

পড়ে—কই কোথায় প্রাণ! ঝড়ের গতিতে জীপ্ হাঁকিয়ে চলে আসে সহরতলীতে—তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায় মানুষগুলোর দিকে। এরা খেটে খায়—খোঁজে মাথার উপর একটা আচ্ছাদন, তা সে যে চালের বা ঘরেরই হোক না কেন। ছোট ছোট খুপরি সার বেঁধে এক লাইনে মার্চ করছে—নম্বর দিয়ে পরিচয়, শুধু বাড়ীর নয় মানুষেরও। ওদিকে আকাশের বুকে পৌঁছাবার আগে চোখ আটকে যায় প্রাসাদের শীর্ষে—সেখানেও তো সেই প্রায়। একদলকে মেরে অন্যদল দুইসাইড করেছে। সহর ও সহরতলীর বিরাট কবরখানার নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর্কিটেক্ট অজিত সোম।

এক একদিন জোর করে পালিয়ে আসে অজিত। সারা দিন লুকিয়ে থাকে, চোরের মতন, বাগানে ভরা গাছটার কোণে। হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে যায় মায়ার সঙ্গে। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঢুকছে গেট খুলে—বাগানের দিকে চোখ পড়তেই বলে ওঠে—"আরে তুমি এখনও বাগানের বসে—চা খেয়েছ? আচ্ছা এখানেই চা আনতে বলি। 'রামকানাই, বাগানেই চা নিয়ে এস।' আমি অবশ্য একবার চা খেয়েছি। তাহোক তোমার সঙ্গে আই উড্ এনজয় এনাদার কাপ। যা বিশ্রী গরম পড়তে সুরু করেছে—কাজ করাই মুস্কিল।" অজিতের পাশে বসে চায়ের কাপে চুমুক দেয় সমাজের elite দলের অন্যতমা মায়া সোম। একটু পরেই তার নজরে পড়ে অজিতের সামনে টেবিলের উপর সদ্য আঁকা কয়েকটা ছবির অসমাপ্ত স্কেচ্। "বাঃ বেশ তো, তুমি আজকাল (Novice) নবিশীর কোঠা ছাড়িয়ে গেছ মনে হচ্ছে। আচ্ছা, তুমি স্কেচগুলো কমপ্লিট করো না কেন?"

বেশ কিছুক্ষণ পরে অজিত ধীরে বলে ওঠে—"গোলাপের আধ ফোটা কুঁড়িই আমার বেশী পছন্দ মায়া।"

এই রকমে কাটে একটা দিন। একবার চক্রাকারে ঘুরে যায় নিজের গ্রহে। আর একটা দিনও চলে যায় চলে যায় সারি বেঁধে তিন শ' পঁয়ষট্টি দিন—একবার নয়, তিরিশবার। প্রতিবার সূর্য্য পরিক্রমা শেষ করে বিদায়ী বছরের উদ্দেশ্যে পৃথিবী প্রণাম জানায় তুলসীমূলে।

এতদিন চোখে পড়ে নি, কিন্তু নিজের ঘরে জানালার কাছে আজ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন মিসেস সোম। দূরে পশ্চিমে সান্ধ্যবাসে সজ্জিতা পৃথিবী জানাচ্ছে বিদায়ী বর্ষকে তার শেষ প্রণাম। কী গভীর ঘন কালো চুল—পেছন থেকে অপলক নয়নে পৃথিবীর রূপ দেখতে দেখতে কখন যেন মিসেস্ সোম এক পা এগিয়ে এসে দুই হাত দিয়ে ধরেছেন জানালার গরাদ। আস্তে আস্তে সেই গভীর কেশরাশি ছড়িয়ে পড়ছে—সারা গগনে এক অদ্ভুত শিহরণ। কপালটা গরাদে ঠেকিয়ে মিসেস সোম দুই চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন সেই শুভ্রনগ্না অভিসারিকাকে। কাছেই টেবিলের উপর রাখা ফুলগুলো থেকে ভেসে আসে মাতালকরা হালকা মিষ্টি গন্ধ—আবেশে চোখ বুজে আসে মিসেস সোমের। কিন্তু দৃষ্টি প্রতিহত হয় না। তার চোখের সামনে ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে বিরাট অডিটোরিয়াম। গিস্ গিস্ করছে লোক। নিখিল ভারত মহিলা সমিতির বিদায়ী সভাপতি মিসেস মায়া সোমকে জানানো হচ্ছে অভিনন্দন। প্রথমেই বিশ্ব মহিলা সমিতির প্রতিনিধি দুইডিস্ ভদ্রমহিলা সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে জানান কিভাবে নারী সমাজের মুক্তির জন্য মিসেস সোমের অক্লান্ত সংগ্রাম। তিনি জগতের প্রত্যেকটী কর্মঠ নারীকে আহ্বান করেন মিসেস্ সোমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে—যেন করে এই মহিমাময়ী নারী তাঁর জীবনের তিরিশটী বছরের প্রতিটি দিন অতিবাহিত করেছেন নারীর কল্ [illegible] তার পরে চলে একের পর এক অভিনন্দন ও মানপত্র কতো লক্ষ, কতো প্রতিষ্ঠান নিয়ে এসেছে তাদের নৈবেদ্য—শ্রোতের মুখে ভেসে আসে শতদল ফুলের ডালি।

তারপর আসে মিসেস সোমের দু' কথা বলার পালা। উন্মুখ সুধীবৃন্দের সামনে উঠে দাঁড়ান তিনি। কিন্তু তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন তার পা কাঁপছে। অতীতের পৃথিবীর কতো কাছে হাজার হাজার শ্রোতার সামনে বক্তৃতা দিতে যিনি এতটুকুও বিচলিত হন নি সেই মিসেস্

সোমের কণ্ঠস্বর আজ বন্ধ হয়ে আসে। বিব্রত হয়ে পড়েন মিসেস্ সোম। মাথা নীচু করে ভাবতে থাকেন ছেলে আসা দিনের কথা—একটা কিসের বাধা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় বুক থেকে, বুঝতে পারেন না। তারপর যখন মুখ তুলে সামনে তাকান তখন দু' চোখে তাঁর নেমেছে বর্ষার শ্রাবণধারা। লজ্জা পাওয়ার অবকাশ ঘটে না—সে ধারায় ভেসে যায়, অভিটোরিয়ম, মুছে যায় জনতা। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েন মিসেস্ সোম—বিদায়ী সভাপতি।

নিজের ঘরেই চেয়ারের পরাদ ধরে থর থর করে কাঁপতে থাকেন মিসেস সোম। টেবিলের কোণাটা ধরে ধীরে ধীরে পেছিয়ে এসে চেয়ারটায় বসে পড়েন তিনি—দুর্বল, অসুস্থ রকম দুর্বল মনে হচ্ছে নিজেকে। এই তো কয়েকটা দিন আগেও স্বচ্ছন্দে কাজ করেছেন তিনি। কিন্তু আজ ক্লান্ত; করুণ দৃষ্টিতে তাকান তাঁর টেবিলটার দিকে—নিজের হাত দুটোর দিকে। এইখানে বসে কতো রাত তাঁর কেটেছে নিবেদনের কাজে, কতো প্রতিষ্ঠান সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর এক হাতের ছোঁয়াচে। এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে মিসেস সোম দেখতে থাকেন সব পুরনোটি। ক্লান্তি, এক অসহ্য ক্লান্তি নিঃশেষ করে দিচ্ছে তাঁকে। চেয়ারে বসে তিনি দেখতে চেষ্টা করেন ঘরের বাইরে আরও দূরে—চাললার বাইরে, বাগানের বেড়া ছাড়িয়ে, আরও দূরে ওই লাইট পোষ্টকে ফেলে রেখে। সন্ধ্যার ধূসর রহস্য ছাপিয়ে তখন নেমেছে আঁধারের বন্যা—শুধু বাইরে কোথায় যেন কী খোঁজে মিসেস্ সোমের দৃষ্টি

ক্রি, ক্রিং, ক্রী রি, রি, রিং—টেলিফোনের শব্দমুখর রিসিভারটার দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন, মায়া সোম—কী বলতে চায় ওটা! হাত বাড়িয়ে তুলে নেন—মুহূর্তে ভেঙ্গে যায় তন্দ্রা, রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে টেবিলের উপর কাৎ করে রেখে দেন রিসিভারটা। উঃ আর পারা যায় না—আজ কদিন ধরেই চলেছে কমপ্লিমেন্টের পালা। থেমে যায় টেলিফোন। কিন্তু কই বিরক্তি তো থামে না। মিসেস সোম দু' হাতে চেপে ধরেন নিজের মাথাটা। কী হয়েছে আজ তাঁর। দুর্বলতা তো ভাল নয়। আজ এসেছে তাঁর সুখভোগের দিন। নিস্পৃহভাবে কাজ করছেন সারা জীবন—সুখ্যাতি উপভোগের দিনে কেন এই দ্বিধা! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজের মনে অস্বীকার করে ওঠেন—কোথায় দ্বিধা। কই! সবই তো গ্রহণ করেছেন—নাম, যশ, ভালবাসা, প্রভুত্ব, স্বাধীনতা সব স-অ-অ-ব। পরক্ষণেই আবার ভুলে যান—কোথায়, কার কাছে রেখেছেন তাঁর এই গৌরবময় জীবনের সঞ্চিত সৌরভকে? তাইতো! হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন মিসেস সোম—

আঃ, আজ যেন কী হয়েছে মিসেস সোমের। বুকটা কিছুতেই শান্ত হতে চায় না। কাকে খোঁজেন, কী চান কিছুই বুঝতে পারেন না। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে গম্ভীরভাবে ভাবতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মনে হয় চারি দিক খালি ফাঁকা। নিজের অসহায়তায় নিজের উপরই বিরক্ত ধরে। আচ্ছা, ঘরটা আজ এত নিঃশব্দ কেন? ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে সব দিকে তাকিয়ে দেখেন মিসেস সোম। একা, তিনি একা বসে আছেন ঘরে। কেমন যেন একটু ভয় ভয় করে ওর নিজের উপস্থিতিকে সন্দেহজনক মনে হয় মনে হয়....

হঠাৎ খাপছাড়াভাবে সশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন মিসেস সোম যেন খুশী হন শব্দটা শুনে—স্তব্ধতার জমাট চাপটা যেন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ঠিক হয়েছে, এই সময় কারও বাড়ী গিয়ে খানিকক্ষণ আড্ডা দিয়ে আসতে পারলে বেশ হয়। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই কখন যেন আপন মনে হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্পের সুইচটা টিপে দিয়েছেন তিনি। একটু মৃদু হালকা সবুজ রঙে ঘরটার অন্ধকার আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, মিসেস্ সান্যালের বাড়ী যাওয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিধা করেন—মিসেস্ সান্যাল নিশ্চয়ই এখন ছেলেমেয়েদের পড়াতে ব্যস্ত ভদ্রমহিলা সংসারকে যেন বুক দিয়ে কাপ্টে রাখেন—কী যে ক্ষমতা! কাছেই অবশ্য মিসেস রায় থাকেন কিন্তু তিনি এখন মেয়েকে নিয়ে অবশ্যই ক্লাবে গেছেন—ষোড়শী মেয়েকে শার্ট করার

জন্য তার চিন্তার অন্ত নেই। মিসেস মণ্ডল ও মিসেস দত্তের কথাও মনে হয়। তাঁর সমবয়সী মিসেস ধর অবশ্য সন্ধ্যা বেলায় দুটো ছোট ছোট নাতনীকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। সংসারেই এদের সব। কিন্তু মিসেস দত্তের ছেলেটা খুব কৃতী। এই তো সেদিন ইতিহাসে ডক্টরেট পাওয়ার পর দেখা করতে এসেছিল। ছেলেটাকে একটু অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়েছেন অবশ্য কিন্তু বউটী ভারী সুন্দর মেয়ে যেমন রূপে তেমনি গুণে। মিসেস ধর তো সংসারের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত।

একটু হতাশই হয়ে পড়েন মিসেস সোম—সবাই সংসারের ছোট বড় কাজে ব্যস্ত—কোথায় যাওয়া যায়? টেবিল ল্যাম্পের সমুখ শেডটীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় যেন আলোটা অস্বাভাবিক রকমে কমে আসছে। মিসেস সোম স্থির নয়নে তাকিয়ে থাকেন কমে আসা সমুখ আলোটার দিকে।

আলোটা কি এতক্ষণে নিভে গেল। আর তাকিয়ে থাকতে পারেন না মিসেস সোম। আস্তে আস্তে এসে নিজের বিছানাটায় বসেন—অবসন্ন শরীরটা ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চায় কিন্তু শরীরকে চেপে রাখিয়ে ওঠে বৃদ্ধ বাড়া মন। তাই বা কতোক্ষণ—খোঁজে ছিদ্রপথ অবসর। শুধু কাজ চাই কাজের স্রোত। নিজের অজান্তেই মিসেস সোম জোরে ঘুমড়াতে থাকেন হাতের রুটিং প্যাডের টিনের ফ্রেমটা—কখন যেন তুলে নিয়েছিলেন টেবিল থেকে। বেশ শক্ত কিন্তু ফ্রেমটা। আরও জোরে চাপতে থাকেন তিনি। বেশ একটা উত্তেজনা আছে কিন্তু—কিছুতেই বেঁকতে চায় না। 'আচ্ছা দেখি তো' এই তো বেঁকছে—আর একটু—ব্যস। এখন! হাত থেকে ঠাস করে পড়ে যায় ঘুমড়ানো ফ্রেমটা।

কিন্তু তারপর। আর কোন কাজ নেই? ওঃ মনে পড়ে যায়, এখন তো তার বিশ্রাম। তিনি তো কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তা' বিশ্রাম কী করে নেবেন। কেউ কি তাকে একটু বলে দিতে পারে না। হঠাৎ মিসেস সোম বুঝতে পারেন তার বুকের ভেতর থেকে কি একটা বেরিয়ে আসছে। প্রাণপণে চাপতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তার সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে। দুই হাতে আকুল ভাবে বাধা দিতে গিয়ে বালিশে মাথা রেখে হু হু করে কেঁদে ওঠেন মিসেস সোম। সামান্য ফাটল ক্রমে বিরাট হয়ে ওঠে—ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকেন মিসেস সোম

তিরিশ বছরের চোখের জল—ভিজে যায় চোখের পাতা—ভেসে যায় বালিশ। তিরিশ বছর অনেকটা রাস্তা—চোখের জলের ঝাপসায় কি যেন খোঁজেন মিসেস সোম। বালিশে মাথা রেখে দেখতে চেষ্টা করেন তিনি। কিছু দেখা যায় কী। হঠাৎ একটু চমকে ওঠেন মিসেস সোম—রক্ত! বালিশে এত রক্ত কিসের। লাল টকটকে রক্তে—হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন তিনি। ওকি? রক্তের মধ্যে ওটা কি? যেন কার মুখ দেখা যাচ্ছে। চেনা যায় কী? ভয় হয়ে ওঠেন মিসেস সোম। সে-কি। এ হতেই পারে না। কিন্তু ওই তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তিরিশ বছর আগের এক তরুণীর মুখ। না, না না এ হতেই পারে না—এ কি করে হয়। ভুল, ভুল—এ নিশ্চিত মিথ্যা। কিন্তু তিরিশ বছরে কি তিনি বদলে গেছেন ওই পুবদিকে ছোট্ট জানলা—পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কিন্তু তবে রক্ত কেন। এ যে লাল টকটকে তাজা রক্ত—কোথা থেকে এল এই রক্তের স্রোত। রক্ত রক্ত—মাগো, ওগো মাগো—পুবদিকের ছোট্ট জানালার মুখ এত কাছাকাছি কেন সব রক্ত কি করে পড়েছে? কিন্তু মারে কে? আমি তো মিসেস সোম। ওই তো সেই মুখটা। ওঃ কী লাল রক্ত। না, না এ অসম্ভব। দুই হাতে মিসেস সোম ঢেকে ফেলেন মুখ—চীৎকার করে ওঠেন 'ওগো শুনছো'।

•

একটা ঘর জোড়া পুরনো ঘরটা। বৃদ্ধ আর্কিটেক্ট—অর্চিত সোম নিজের হাতে বসে ছোট বড় নানা মডেলের মধ্যে আসতে চেষ্টা করেন সহরের প্রাণ—মৃতের মাঝে জীবনের সাধনা। কে যেন কাঁদে। না, ও মনের ভুল। গত দশ বছরের অবসর জীবনে কতো বিনিদ্র রজনীতে তিনি শুনেছেন ওই শব্দ আবার প্রভাত এসেছে তাকে পরাস্ত করে। মানুষের কথা মনে ভুল হয় তার কি কিছু ঠিক আছে। সাবধানে নাড়াচাড়া করেন অর্চিত সোম তার সহরের মডেল।

চায়ের জন্মকথা

হরেন ঘোষ

চা আজকাল জাতীয় পানীয়ে পরিণত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি বাড়ীতেই ঘুম থেকে উঠেই চা চাই আমরা। বাড়ীতে কোন অতিথি এলেও আমরা চা দিয়ে আপ্যায়ন করি। চাকে নেশা বলেছেন অনেকে। নেশা হলেও এটি নিষ্পাপ নেশা।

আমরা চা পান করি কিন্তু কতটুকু জানি চা সম্বন্ধে। কবে কোথায় কিভাবে এর জন্ম হোলো সে খোঁজও রাখিনা।

দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি, আসামে প্রচুর পরিমাণে চা জন্মায়। চায়ের চাষের জন্যে দরকার ঢালু জমি—যেখানে জল দাঁড়ায় না, অথচ বৃষ্টি হয় প্রচুর। যাক সে কথা—চায়ের আবিষ্কার সম্বন্ধে একটি চমৎকার গল্প আছে—শুধু গল্প নয়, ইতিহাস বলা চলে।

আজ থেকে পাঁচ হাজার দু'শো বছর আগে, অর্থাৎ ৩২৫১ খৃস্ট পূর্বাব্দে চা আবিষ্কৃত হয়। তখন চীনের সম্রাট ছিলেন শি-নুন। তাঁকে "শিল্প পিতা" বলা হোত। প্রজাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তিনি খুব সচেতন ছিলেন। তাদের প্রায়ই উপদেশ দিতেন—"জল ফুটিয়ে খাবে, তাহলে কোন রোগ হবে না।"

প্রতিদিন সকালে এই জ্ঞানবৃদ্ধ তাঁর বাগানে যেতেন, চীনের অতি পরিচিত "শে" নামক এক প্রকার গুল্মের ডাল ভাঙতে। এই ডালপালা জ্বালিয়ে সেই আগুনে তিনি জল গরম করতেন। একদিন সকালে তাঁর অজ্ঞাতসারে কয়েকটি "শে" পাতা জলের পাত্রে পড়ে গেল। সেই জল পান করবার সময় তিনি তাতে মিষ্টি গন্ধ ও সুন্দর আস্বাদ পেলেন। দিনের শেষে তাঁর শরীরও অন্য দিনের চাইতে ভালো লাগলো। সেই সিদ্ধ জলে আবার পরিষ্কার জল ঢেলে ফুটিয়ে নিলেন,—তাঁর আরো ভালো লাগলো।

এর পর থেকে তিনি সেই শে-পাতা সিদ্ধ জল ছাড়া অন্য জল পান করতেন না। এমন কি তাঁর অন্যান্য খাদ্য গ্রহণের সময়ও এই জল পান করতেন। এবার তিনি তাঁর প্রজাদেরও এই 'শে-পাতা'র জল খাবার জন্যে উপদেশ দিলেন। কিছুদিন পরই তিনি প্রচার করলেন যে 'শে-পাতার' জল পান করলে, টাইফয়েড, ক্ষয়রোগ ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধি সেরে যায়।

কয়েক বছরের মধ্যেই 'শে-জল' চীনের জাতীয় পানীয়ে পরিণত হোলো এবং সমগ্র চীন-সাম্রাজ্যে 'শে-চাষ' শুরু হোলো।

এর পর ৭৮০ খৃষ্টাব্দে চীনের সম্রাট 'লো-ইউ' এই সুবর্ণ পানীয়ের গুণ বর্ণনা করলেন। তিনি 'শে-ওল' সম্বন্ধে লিখে গেছেন—"শে'র সুন্দর পাতাগুলো বর্ষাতে দিনে বা স্যাতসেঁতে আবহাওয়ায় কখনোই ছেঁড়া উচিত নয়। পরিষ্কার আবহাওয়ায় এই পাতা সংগ্রহ করতে হবে। পাতা সংগ্রহ করবার আগে ভালো করে হাত ধুয়ে পরিষ্কার করা দরকার। সবচেয়ে ফর্সা হাত এ কাজের উপযোগী। যে কর্মীরা এই গুল্ম দেখা-শুনা করবেন, তাদের পাঙ্খা ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় যখন এই পাতা রসে ভরপুর থাকে তখন এতে রক্তের প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা।"

সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজ ও ডাচরা মাকাও থেকে পর্তুগাল, চীন, লিসবন ও রটারডামে জাহাজ বোঝাই 'শে-পাতা' নিয়ে যায়। রটারডাম থেকেই তামাক ও কফি ব্যবসায়ী টমাস্ গারওয়ে এক জাহাজ 'শে-পাতা' নীলাম করবার জন্যে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে এনে রাখলেন। 'শে-পাতার' নাম তখন বদলাতে বদলাতে 'টে' ও 'টি'তে পরিণত হয়েছে।

টমাস গারওয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন—"এই পানীয় স্মরণশক্তি বাড়াতে সাহায্য করবে ও শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে সহায়তা করবে। তাছাড়া এই পানীয় পেটের গণ্ডগোল সারাবে ও অন্য নানা রোগ ভালো করবে।" এই বিজ্ঞাপনের ফলে তার এক জাহাজ চা-পাতা আপনিই বিক্রি হয়ে যায়।

কথায় আছে, অধিকাংশ মাদক দ্রব্য বা নেশার জন্মস্থান চীন। চা নিষ্পাপ নেশা হলেও, দেখা যাচ্ছে, এরও জন্মস্থান চীন। তবে চায়ের প্রচলন ইংলণ্ডেই সবচেয়ে বেশী। যদিও সমস্ত জগৎ জুড়ে আজ এর আদর।

চায়ের জন্মকথা শুনলে তো? এও কেমন অদ্ভুত আবিষ্কার একটা! চা আমরা অধিকাংশ লোকই পছন্দ করি, পান করি, অথচ কত কম জানি তার সম্বন্ধে!

শবলা

শ্রীঅমলেন্দু ভট্টাচার্য

ঋষি হবার আগে বিশ্বামিত্র ছিলেন রাজা। সৈন্য সামন্ত সেনাপতির অভাব ছিলনা তাঁর। বেশ সুখেই ছিলেন। কিন্তু এ সুখ তাঁর বেশী দিন সহ্য হ'ল না। একদিন রাজা বেড়াতে বেড়াতে সসৈন্যে এসে হাজির হ'লেন ঋষি বশিষ্ঠের আশ্রমে। ঋষি সাদরে অভ্যর্থনা করলেন রাজাকে। বললেন—আজ আমার কি পরম সৌভাগ্য, আপনার মত মহানুভব রাজাকে পেলাম আমার আশ্রমে। ধন্য হ'ল আমার আশ্রম

রাজা বিশ্বামিত্র—ঋষি, আপনার অমায়িকতায় আমি মুগ্ধ। কিন্তু বেশীক্ষণ বসার আমার সময় নেই। সৈন্যরা ভ্রমণ ক'রে ক্লান্ত। আমারও ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। ফিরে যাই রাজধানীতে—বিশ্রাম ও আহার করতে হবে তো।

হাত দুটি জোড় করে বললেন বশিষ্ঠ—দেব, অনুমতি করেন তো আমিই আপনার ও সৈন্যদের আহারের ব্যবস্থা করি। "আপনি?" বিস্ময়ে সোজা হয়ে বললেন রাজা। "বলেন কি? আপনি ঋষি মানুষ, আমার এই শত শত সৈন্যের আহারের ব্যবস্থা করবেন কেমন ক'রে?"

সে ভাবনা আপনাকে করতে হবে না। আপনি বিশ্রাম করুন। কিছুক্ষণ পরেই আপনাদের আহারের ব্যবস্থা করব।

এখন ঋষির ছিল একটি কামধেনু, নাম তার শবলা। তার গুণ ছিল যে তার কাছে যা চাওয়া যাবে তাই পাওয়া যেত। ঋষি তার কাছে এসে বললেন—মা শবলা, রাজা সসৈন্যে আমার অতিথি হয়েছেন। আমি রাজাকে উত্তমরূপে ভোজনে পরিতৃপ্ত করতে চাই। তুমি তার আয়োজন কর।

শবলা নিমেষে পায়স, মধু, ঘৃত, নানা প্রকার খাদ্য; এমন কি রাজার জন্য উৎকৃষ্ট মদ্য পর্যন্ত সৃষ্টি করলেন।

রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি ও সৈন্যদল সেই আহার্য্য গ্রহণ ক'রে তৃপ্ত হ'লেন।

রাজা বললেন—ঋষি, কিরূপে এ সম্ভব হ'ল আমাকে বলতেই হবে। আপনি কি যাদু জানেন?

ঋষি রাজাকে বললেন শবলার কথা। শুনে রাজা বললেন—মহর্ষি, রাজা আমি, আপনার কাছে এই ধেনুটি প্রার্থনা করছি।

বশিষ্ঠ বললেন—রাজা মশাই ঐটি আপনি বলবেন না। শবলার জন্যই আমি বেঁচে আছি। আপনি ওরূপ প্রার্থনা ক'রে আমায় লজ্জা দেবেন না।

বিশ্বামিত্র বললেন—মহর্ষি আপনাকে আমি এই একটি ধেনুর বদলে সহস্র ধেনু দেব, আর সোনা দিয়ে আপনার আশ্রম ভরে দেব। আপনি রাজী হ'ন।

বশিষ্ঠ বললেন—আপনি ওরূপ অন্যায় কথা বলবেন না।

তখন রাজা রাজোচিত ব্যবস্থা করলেন—শবলাকে জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে চললেন। শবলা সৈন্যদের হাত থেকে জোর ক'রে পালিয়ে এসে বশিষ্ঠকে বললেন—প্রভু, আপনি কি আমায় ত্যাগ করলেন?

বশিষ্ঠ বললেন—না শবলা, ত্যাগ করি নি। রাজা জোর ক'রে তোমায় নিয়ে যাচ্ছেন। যদি পার তো আত্ম-রক্ষা কর। রাজার অক্ষৌহিনী সেনা—আমি একা।

তখন শবলা 'হাম্বা' 'হাম্বা' রব করতে লাগলো। আর তার সেই আর্ত্তনাদের সাথে সাথে শত শত সৈন্য উৎপন্ন হয়ে বিশ্বামিত্রর সৈন্যর সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করল।

পরাজিত হ'লেন বিশ্বামিত্র। যুদ্ধে তাঁর সমস্ত সৈন্য এমন কি একজন ছাড়া সব কটি পুত্রও মারা গেল।

সেই পুত্রটিকে রাজ্য দিয়ে তিনি হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করতে লাগলেন।

কিছুকাল পরে রাজার কাছে মহাদেব এসে বললেন—কি বর চাও বৎস।

আমার যেন দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ সকলের অস্ত্র আয়ত্ত হয়—এই বর দিন।

মহাদেব বললেন—তথাস্তু।

বর লাভ ক'রে বিশ্বামিত্র সদর্পে বশিষ্ঠের তপোবনে এসে সব কিছু দগ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু বশিষ্ঠের ব্রহ্ম বলে বিশ্বামিত্রের সব তেজ নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। শেষে বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ তাঁর ব্রহ্ম তেজে নয় ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা রাজার ব্রহ্মাস্ত্র খণ্ডন করলেন। পরাজিত হ'লেন বিশ্বামিত্র দ্বিতীয়বার।

মনে মনে বললেন—ক্ষত্রিয় বলকে ধিক্। ব্রহ্ম বলই বল। আমি ব্রহ্ম বলই লাভ করবো।

ব্রহ্ম বল লাভের জন্য গভীর তপস্যা আরম্ভ করলেন রাজা বিশ্বামিত্র।

হিমালয়-দাদু

নীরদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

আমাদের ক্লাশে আছে 'হিমালয়-দাদু',
বুক তার ই-য়া বড় ডাক নাম হাঁদু।
গোল-গাল মুখখানি আঙুরের থোকা—
চেয়ে চেয়ে কেন যেন লাগে বোকা বোকা।

মোটরে আসেন তিনি গদিখানি ঠেসে,
গোফ্-দাঁড়ি-চাপকান বড়লোক বেশে।
সব বার মাঝখানে মাথা তার উঁচু,
(যেন) পাতা ভরা গাছটাতে এক থোক্ লিচু।

থপ্ থপ্ পা ফেলে মাংসেরই দলা,
চলা দেখে মনে হয় যেন হাতী চলা।
কথার আগেতে তার 'বড়-নাক' ডাকে,
যেন রামছোড় সিং 'কোই-হ্যাঁয়' হাঁকে,

সবাই অবাক হয় আমি হই বেশি—
হব না:—বল কি ভাই আমি পরদেশী॥

পুস্তক প্রসঙ্গ

আধুনিক ভারতের গল্প সঙ্কলন। অনুবাদক : বি বিশ্বনাথম্

দাম এক টাকা। পৃষ্ঠা ৮৬। প্রকাশক : সাধন সরকার, অরবিন্দ নগর, বেলঘরিয়া।

ভারতীয় চৌদ্দটি ভাষার গল্প সঙ্কলন (বাঙ্গলা বাদে) আলোচ্য এই অনুবাদ গ্রন্থ এবং সেই সংগে অনুবাদক নানা কারণে কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন।

নির্বিচারে বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ নিয়ে লেখক-প্রকাশক মহলে যখন হৈ-চৈ হচ্ছে বি বিশ্বনাথম্ এর তখন দৃষ্টি তখন একরকম অবহেলিত প্রাদেশিক সাহিত্য সম্পদের দিকে। যার ফলে আমরা এমন একটি লোভনীয় সঙ্কলন হাতে পেয়েছি। এদিক দিয়ে তাঁকে একরকম পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। নিঃসন্দেহে তিনি সাধু প্রচেষ্টার উদ্যোগী এবং অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

প্রসঙ্গতঃ বলতে হচ্ছে একজন অবাঙ্গালী যে কতো সুন্দর ভাবে বাঙ্গলা ভাষা আয়ত্ত করেছেন তা এই অনুবাদ না পড়লে টের পাওয়া যাবে না। তিনি যে অবাঙ্গালী তাও ভুলে যেতে হয় তাঁর অনুবাদের মাধ্যমে। বাঙ্গালা ভাষার idiom প্রয়োগে তিনি সফলতার পরিচয় দিয়েছেন—আমীন কামীল রচিত "এক বিঘৎ জমি আর একটি কুঁড়ে ঘর" নামে কাশ্মীরী গল্পটাতে।

গল্পগুলির সম্বন্ধে বলা যায় প্রতিটি গল্পই জীবনের বিভিন্ন বাস্তব সমস্যা নিয়ে লেখা রসোত্তীর্ণ গল্প। এবং গল্পগুলিতে বাঙ্গলা ছোট গল্পের প্রভাব বিদ্যমান এবং উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথমের কাছে আরো বেশী পরিমাণে এই ধরণের সংকলন আশা করি। বলা বাহুল্য যে আলোচ্য সংকলনটি নিশ্চয়ই বহুল প্রচার লাভ করবে এবং অনুবাদককে এই কাজে যথেষ্ট উৎসাহিত করবে।

বইয়ের প্রচ্ছদসজ্জা মনোরম, ছাঁপা বাঁধাই চলন সই। কিন্তু প্রুফের ভুল বিরক্তিকর। তবে প্রথম প্রচেষ্টার কথা মনে রেখে আশা করি পরবর্তী সংস্করণে অনুবাদক এবিষয়ে যত্ন নেবেন। অঃ

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

বর্ষানুক্রম সূচীপত্র

(আষাঢ়, ১৩৬৩—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪)

॥ প্রবন্ধ ॥

	পৃষ্ঠা
কৃষ্ণ কীর্ত্তন—বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত	৩
বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা—প্রাচীন যুগ—অধ্যাপিকা	৮
পৃথিবীর আদি মুদ্রক—শ্রীদীপঙ্কর সেন	১৮
লৌহ শিল্পে হাওড়া—শ্রীহারাধন হাজরা	১৯
বিশল্যকরণী—কবিরাজ জগেশ দাশগুপ্ত	২৩
বিক্রয় কর আইনের বিবর্ত্তন—শ্রীদেবেশ মুখার্জী	
আদি বাসীদের পাতানো বন্ধুত্ব—শ্রীচারুলাল মুখোপাধ্যায়	
আসামে মহাপুরুষীয়া ধর্ম—শ্রীহরেশ্বর দাস	
ভারত ও অঙ্কন—অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	
নবীনের আহ্বানে মিশর—অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ ধর	
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও তদীয় পত্নী প্রসন্নময়ী দেবী—শ্রীযুক্তা শোভনা নন্দী	
লোকমান্য তিলক ও জাতীয়তার উন্মেষ—শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পাল	
যুগান্তরের জন্ম—শ্রীপবিত্রতোষ খাঁ	
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (ইংরেজী হইতে)—অনুবাদক : শ্রীমণি বাগচী	
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও ভারত সভা—শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পাল	১৮৩
আন্তর্জাতিক পারমানবিক সংস্থা—অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ ধর	১৯৪
রামমোহনের যুগ—(১৮১৪—১৮৩৩)—শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পাল	২০১
নারীর সৌন্দর্য্য—ডাঃ ক্ষেত্রেন্দ্রকুমার পাল	২১০
বৈদিক যুগের নারী—শ্রীমতী মিনু খাঁ	২১৯
আলোক চিত্রের ভাষা—শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী	
পশ্চিম বঙ্গ ও সন্নিহিত রাজ্যগুলি—অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমতী মিনু খাঁ	
গজল গান—শ্রীঅরদেব রায়	
ছোটদের সাহিত্য জগৎ—শ্রীঅশোক সেন	
লাল্লনেদ ; আইসল্যাণ্ডীয় সাহিত্য—শ্রীআনন্দ দাশগুপ্ত	
ভারতে খাদ্য শস্য—অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	
আয়ুর্বেদের দান—চিকিৎসার উৎকর্ষ ও অবনতির ধারা—কবিরাজ জগেশ দাশগুপ্ত	
রেডিও-অ্যাকটিভিটি ও রেডিয়াম—শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্ত্তী	
সাম্প্রতিক বাঙলার নাটক ও রঙ্গমঞ্চ—শ্রী হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	

পরীক্ষা ব্যবস্থার পরীক্ষা—শ্রীসুরপতি নন্দী　৪৪৩
প্রাচীন ভারতের লৌহ-শিল্প—শ্রীমোহনলাল চৌধুরী　৪৪৮
কবি-সংখ্যা তথ্য অনুযায়ী নব-গঠিত রাজ্যসমূহ—অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী　৪৫০
বাংলা ছোট গল্পের ধারা—শ্রীবিনয় সাহা　৪৬০
আধুনিক স্থাপত্য কলা ও ভারতীয় ঐতিহ্য—শ্রীদত্তোষ ঘোষ　৪৬৬
ভারতের পাঁচটি তৈল বীজ—অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী　৪৭২
সাহিত্যের বাজারে নূতন ধারা—শ্রীঅমলেন্দু মিত্র　৪৭৩
নজরুল প্রতিভার গোড়ার কথা—জনাব আজাহার উদ্দিন খান　৪৭৩
ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্কট—শ্রীগৌরীশঙ্কর রায়চৌধুরী　৬০৬
স্মরণীয় বিপিনচন্দ্র পাল ও বিক্রমপুর—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত　৬৪১
প্রথম যুগের আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ—শ্রীসুধাংশুকুমার ভট্টাচার্য্য　৬৪৮
নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীতে বুনিয়াদী পদ্ধতি—শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য　৬৫২

॥ কবিতা ॥

তাকেই যে দেখেছিলাম—আবুল কাশেম রহিমউদ্দিন
কুন্তী কন্যা—[illegible]মা দেব
সত্য হোক মিথ্যা হোক—সুনীল দাশগুপ্ত
শায়ক—ফেদেরিকো গারথিয়া লরকা—অনুবাদক : সরিৎ তোকদার
আবার আষাঢ়—পরিতোষ খাঁ
আবার যদি—ভীষনানন্দ দাশ
মৃত-অহরার দেশে—আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন
জন্মদিনে—কালিদাস রায়
[illegible]-সাধনা—স্নেহাকর ভট্টাচার্য্য
দীপনকে চিঠি—জগদীশ মণ্ডল
বিংশ শতাব্দী—অরুণচন্দ্র চক্রবর্তী
তোমারই জন্য—কল্যাণাক্ষ বন্দোপাধ্যায়
তিনটি কবিতা—এজরা পাউণ্ড—অনুবাদক : নৃপেন্দ্র গুহ
প্রজ্ঞাময়ী ঘট—প্রদ্যুম্ন মিত্র
সে—নচিকেতা ভরদ্বাজ
শুধু কান্না—ফেদেরিকো গারথিয়া লরকা—অনুবাদক : সরিৎ তোকদার
উপহার—অর্দ্ধেন্দু বিশ্বাস
বিশ শতক—অনিলবরণ ভট্টাচার্য্য
সহর—গোপালকৃষ্ণ ভাস্কর
নক্ষত্র বিদায়ের পর—সুবোধকুমার গুপ্ত

আমি তোমাদের—আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন ৩৩১
স্বীকারোক্তি— উৎপলা মুখোপাধ্যায় ৩৩৩
স্মৃতি গন্ধী—বাসন্তী সেন ৩৩৬
তুমি—সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ৩৩৮
তখনও জেগে আছি—অরুণিমা ৩৩৭
একটি কোরাস—শিশির রায় ৩৫৪
ক্রোধ—বিনয় মজুমদার ৩৬৩
একটি গোলাপ গাছ—কল্যাণী বসু ৩৬৪
বুদবুদ—গোপালকৃষ্ণ ভাস্কর ৩৬৬
তুমি—গোপালহরি বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬৮
পৃথিবীর মানুষকে—সুধীর বসু ঠাকুর ৩৭৮
নির্জনতা—সুনীল দাশগুপ্ত ৪৩৩
তাবু বয়ে—বিষ্ণু দে ৪৩৪
পৃথিবী নিষ্ঠুর যদি—আবুল কাসেম রহিমউদ্দীন ৪৩৬
ঘুম—হোয়ান র‍্যামন হিমেনেথ—অনুবাদক : পরমেশ দত্ত ৪৩৭
শবরী—উৎপলা মুখোপাধ্যায় ৪৩৮
বিনিদ্র—বিনয় মজুমদার ৪৩৮ ক
দুটি কবিতা—সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ৪৩৮ খ
সেই মুখ—অর্ধেন্দু বিশ্বাস ৪৩৯
সে দিনের "বনলতা সেন"—অরুণিমা পাল ৪৪০
আমি এক মহাদেশ—সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত ৫৫৫
শার্ল বোদলেয়ার—এর একটি কবিতা—বুদ্ধদেব বসু ১৯
জীবন বীমা—গোপালকৃষ্ণ ভাস্কর ৫৫৮
যুগযাত্রী—সুবোধ রায় ৫৫৯
দুটি কবিতা—অমলেন্দু ঘোষ ৫৮৯
প্রিয়তম—সুপ্রিয় রায় ৫৯০
আমাকে ঘিরে—সামসুল হক ৫৯১
মানুষ! মানুষ!—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৬১৪
অনুভব—মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত ৬৫৮
ফুলডাক—বিমল দত্ত ৬৫৯
প্রবাহিকা—অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ৬৬০
ঢেউ—স্বদেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬৬১
মিলন—গোপালহরি বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৬৩
ছুটি লেনে গোধূলি—দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬৬৪

॥ উপন্যাস ॥

মুসাফির—সন্তোষ সেন
মা ও ছেলে—সোরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ভ্রমণ ॥

আমার চোখে দেখা সোভিয়েট দেশ—ডাঃ ইন্দ্রেন্দ্রকুমার পাল　১০৮, ২৫৯, ৩১৭, ৩৭৭, ৫০৫, ৬০০, ৬৩৪
কাগমারীতে দুই দিন—কাজী আবদুল ওদুদ　৩৬৯

॥ জীবন সাধনা ॥

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার জীবন সাধনা—হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত
ডাকটেন—পরিতোষ পাঁ

॥ রহস্য উপন্যাস ॥

শেঠজীর রক্ত বুকুট—বিপিনবিহারী রায় ও কানাই রায়

॥ স্মৃতি কথা ॥

স্মৃতি কথা (শরৎচন্দ্র)—যোগেশচন্দ্র মজুমদার　৪১৭, ৪১৮, ৪৭৮
বিপ্লব যুগের অবিস্মরণীয় কাহিনী—শোভনা নন্দী　৪৩০, ৪৯৮

॥ গল্প ॥

কুল কাঁটা—অজয় দাশগুপ্ত
পাড়ি—সমর বন্দ্যোপাধ্যায়
সীমা—সরিৎ তোকদার
অন্ধ—মোপাসা—অনুবাদ : বিজিত দত্তগুপ্ত
আস্বাদ—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী　১৫৬
সংগত—বিমল দত্ত　১৬৩
পাখি—সুবোধ ঘোষ　১৮০
স্বপ্ন প্রয়াণ—খগেন দত্ত　২০১
প্রত্যাবর্তন—আশীষকুসুম ঘোষ　২১৬
সম্রাট অশোকের অনুশাসন—অরুণচন্দ্র চক্রবর্তী　২৮০
ছোট বৌ—শিশির রায়　২৮৯
লেখকের ডায়েরী থেকে—বিমল কর　৩১৪
অবলাচারিণী—সমর চট্টোপাধ্যায়　৩২২
শিথিল শৃঙ্খল—অরণ্য চৌধুরী　৩২৫
ভয়—ভবানী মুখোপাধ্যায়　৩৮৯
হোলি—আশীষকুসুম ঘোষ　৩৯২
রং বদল—অজয় দাশগুপ্ত　৩০৪
মোহিনী—অজয় বিশ্বাস　৪৮২
লাল জল-নীল জল—আশীষ বসু　৪৯৪

দিদি—শচীন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়
ভায়ের শাসন—বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পোর্ট্রেট—বিমল দাশ
মায়া সোম—সাত্যকি

॥ সংকলন ॥

পশ্চিম বাংলার অধোগতি কেন ? (অনুদিত) ৩৮
প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যর্থতা—(অনুদিত)—আচার্য বিনোবা ৫৭
বাংলার বৈশিষ্ট্য—বিপিনচন্দ্র পাল ৪১
এ কালের ছড়া (সংগৃহীত)— ৬০
বাঙালীর প্রতিমা পূজা ও দুর্গোৎসব—বিপিনচন্দ্র পাল ১২৩
বৈষ্ণব কবিতার কথা—বিপিনচন্দ্র পাল ১৮৭
কয়েকখানি চিঠি—রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র পাল ২১৭
কিশোর ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিচালনার উপকরণ—বুধ পরিষদ ২৬৩
বর্ষ ও অর্ধ—বিপিনচন্দ্র পাল ২৯৮, ৩০৭
বাংলা ভাষা ও বিচার—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৯১
শিল্প সংগীত—সুরপতি নন্দী ২৯৪
কিশোর ও বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার পরিচালনার উপকরণ—বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ৩০৩
কাব্যের লক্ষণ—বিপিনচন্দ্র পাল ৩৬৩
শিশু কিশোর ও বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের উপকরণ—বুধ পরিষদ ৪০৩
অশ্বিনীকুমার দত্ত—বিপিনচন্দ্র পাল ৪১৭, ৪৯৭
চাষী—অতুলচন্দ্র গুপ্ত ৪৩৩
রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ—বিপিনচন্দ্র পাল ৫৬১
চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাচ্য বিদ্যাভবন—চেকোস্লোভকিয়ার বৈদেশিক দূতাবাস ৬২৩
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—বিপিনচন্দ্র পাল ৬২৫

॥ কিশোর জগৎ ॥

জীব জন্তুর দেশে—মিনতি সেন ও অশোক সেন ৩৩১
বক (কবিতা)—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ৪০০
পানকৌড়ি (কবিতা)—সুনীতিকুমার মুখোপাধ্যায় ৪০১
শ্রীকৃষ্ণের বিপদ—অমলেন্দু ভট্টাচার্য ৪০২
চাষের জন্মকথা—হরেন ঘোষ ৬৭২
হিমালয় দাদু (কবিতা)—নীরদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
শবলা—অমলেন্দু ভট্টাচার্য